আহমদ শরীফ রচনাবলী
২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ শরীফ রচনাবলী
২

আহমদ কবির সম্পাদিত

AMARBOI.COM

আগামী প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১২ মার্চ ২০০৬

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১ ১৩৩২, ৭১১ ০০২১
প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী
বর্ণ বিন্যাস কম্পিউটার মুদ্রণ শিল্প, ঢাকা
মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা

মূল্য : ৭০০.০০ টাকা

Ahmed Sharif Rachanaboli 2 :
Collected Works of Ahmed Sharif
Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Bangla Bazar, Dhaka-1100 Bangladesh.
First Published : March 2006

Price : Tk 700.00 only

ISBN 984 401 952 4

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমিকা

আহমদ শরীফ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল আরও বেশ আগে। কিন্তু নানা কারণে এই খণ্ডের প্রকাশের কাজ বিলম্বিত হতে হতে আহমদ শরীফের জন্মদিনে এসে ঠেকল (১৩ ফেব্রুয়ারি)। এটি বরং ভালো হল যে, খণ্ডটি একটি শুভদিনের স্পর্শ পেল।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেছিলাম, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, গবেষক ও লেখক আহমদ শরীফের বিপুল সৃষ্টি সম্ভার রচনাবলী রূপে প্রকাশ পাওয়াই সঙ্গত। সেই পরিকল্পনায় তাঁর মৌলিক গ্রন্থগুলিকে প্রকাশ কালের ধারা-বাহিকতায় এক একটা খণ্ডে পরিসজ্জিত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে প্রধানত পাকিস্তানি আমলে প্রকাশিত গ্রন্থগুলো। দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত কয়েক বছরের মধ্যে প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সব মিলিয়ে পাঁচটি বই—'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' (পরিচিতি খণ্ড), 'যুগ-যন্ত্রণা', 'কালিক ভাবনা', 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' এবং 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা'। 'সৈয়দ সুলতান : তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ' মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে আহমদ শরীফের মৌলিক গবেষণা এবং এটি তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ। 'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থটি আহমদ শরীফের মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য গবেষণার একটি অভিনিবেশী প্রাকাশ্য কাজ। বাকি তিনটি গ্রন্থ হল প্রবন্ধ সংকলন। সংকলিত প্রবন্ধগুলোর কোনটি ইতিহাসমূলক, কোনটি পরিচিতি জ্ঞাপক, কোনটি মননধর্মী গভীর প্রাজ্ঞ রচনা, কোনটি আবার সময় প্রবাহতড়িত মানুষ, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র ইত্যাদির নানা তরঙ্গ ও সংক্ষোভ নিয়ে বিচিত্র বিকাশ, অভিমত ও অনুভাবনা। ভরসা রাখি, মধ্যযুগের গবেষণা ও যুগ প্রসঙ্গ দুইয়ে মিলে খণ্ডটি পাঠকের নজর কাড়বে।

আহমদ শরীফ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ উপলক্ষে ধন্যবাদ জানাই আহমদ শরীফ পরিবারের সদস্যবৃন্দকে বিশেষ করে আহমদ শরীফের পুত্র ডক্টর নেহাল করিমকে তাঁর নিত্য তাগাদার জন্য। ধন্যবাদ জানাই আগামী প্রকাশনী স্বত্বাধিকারী ওসমান গনিকে যিনি আহমদ শরীফ রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

আহমদ কবির

ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

সৈয়দ সুলতান–তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ

প্রস্তাবনা ৩ ষোল শতকের চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক পটভূমি ৬ চট্টগ্রামে সংস্কৃতির বিকাশ ২৩ সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি, পরিচয় এবং সৈয়দ সুলতানের ভাব-শিষ্য কবিগণ ও আবির্ভাবকাল ৩৭ সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থসংখ্যা ৪৭ নবীবংশ পরিচিতি ৫৪ সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ'-এর আরবি-ফারসি উৎস ৮৯ আধ্যাত্ম সাধনা ও জ্ঞানপ্রদীপ ১০০ সৈয়দ সুলতানের সংগীত ও আধ্যাত্ম সাধনা ১৩২ চট্টগ্রামের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা ১৪৬ সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি ১৬১ ক. নবীবংশে সমাজ ও সংস্কার ১৬১ খ. সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমকালীন কবির কাব্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতি-চিত্র ১৮০ গ. বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মান ১৮৯ পরিশিষ্ট: ক. বাংলাভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব ২২১ খ. গ্রন্থপঞ্জী ২২৮

যুগ-যন্ত্রণা

বাক্-স্বাধীনতা ২৪১ বিকার ও প্রতিকার ২৪৫ সামাজিক উপদ্রব ও রাজনৈতিক উপসগ ২৫১ আধি ২৫৫ মনুষ্যত্বের আর এক নাম ২৬১ নাগরিক সহিষ্ণুতা ২৬৭ সমস্যা ও সহিষ্ণুতা ২৭১ লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি ২৭৪ ব্যক্তিত্বের প্রভাব ২৭৬ কল্যাণবাদ ২৭৯ ভবিষ্যতের বাঙলা ২৮২ নিরীহ ২৮৪ প্রতীক ও প্রতিম ২৮৭ বাঙালি সত্তার বিলোপ প্রয়াসে ১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র ২৯১ বিদ্যাসাগর ২৯৬ সাহিত্যবিশারদ ৩০১ কাজী আবদুল ওদুদ ৩০৫ একটি প্রশস্তি কবিতা ৩১২

কালিক ভাবনা

মাভৈঃ ৩২৭ নিষিদ্ধ চিন্তা ৩৩১ ইতিহাস তত্ত্ব ৩৩৩ জিগির তত্ত্ব ৩৩৫ গোড়ার গলদ ৩৩৯ পৈশাচিক জিগীষা ৩৪১ বিড়ম্বিত প্রত্যাশা ৩৪৫ আজকের ভাবনা ৩৫২ স্বাধীনতার দায় ৩৪৫ একগুচ্ছ প্রশ্ন ৩৫৫ বাঙালির মনন-বৈশিষ্ট্য ৩৫৮ শিক্ষা তত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব ৩৬৮ শিক্ষা সম্বন্ধে আজকের ভাবনা ৩৭৮ সংঘাত প্রসূন ৩৮০ জনবৃদ্ধি : বিশ্বের আতঙ্ক ৩৮৩ একুশের ভাবনা ৩৮৬ কবি বিহারীলাল ৩৮৯ কবি কায়কোবাদ ৩৯১ আজকের সাহিত্যের পরিধি ৩৯৩ সাহিত্যের বিবর্তন ৩৯৭ সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার ৩৯৯ বাঙলায় তত্ত্বসাহিত্য ৪০১ বাঙলাদেশের 'সঙ' প্রসঙ্গে ৪০৪ বাউল কবি ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে ৪০৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা ৪১৩ বাঙলার মৌল ধর্ম ৪৪৩ বাঙলার সূফী প্রভাব ৪৫০ বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ ৪৫৯ মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ ৪৬৬ নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ : ৪৭৭ প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৬ শতক) ৫৫৬ প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৭ শতক) ৬১৭ প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৮ শতক) ৬৭৯

প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

বাঙালি সত্তার স্বরূপ সন্ধানে ৭২৭ দু'হাজার বছর আগের গ্রামীণ সমাজ ৭৩৪ বাঙলার গতর-খাটা মানুষের ইতিকথা ৭৪০ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ৭৪৩ চেতনা-সঙ্কট ৭৪৯ সঙ্কটের মূলে ৭৫৪ প্রবাসী মন ও সংস্কৃতি ৭৫৮ সমকালীন সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি ৭৬৪ সংস্কৃতি প্রসঙ্গে ৭৬৭ বিচিন্তা ৭৭০ জুলুম ৭৭৫ মুক্তি-সংগ্রামের স্বরূপ ৭৭৭ স্বস্তির পন্থা ৭৭৯ আনন্দ-সুন্দর জীবন লক্ষ্যে ৭৮০ ভালোবাসার দায় ৭৮২ আর্তমানবতার প্রতি মানববাদীর দায়িত্ব ৭৮৪ বিকার ও নিদান ৭৮৬ পয়লা মে'র ভাবনা ৭৮৮ আজকের তৃতীয় বিশ্ব ৭৯১ শুভঙ্করের ফাঁকি ৭৯৩ অসাফল্যের গোড়ার কথা [একটি বিশ্ব-জরিপ] ৭৯৫ শিক্ষার কথা ৮০১ কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালি ৮০৮ বঙ্কিম-বীক্ষা : অন্য নিরিখে ৮৩৩ বাঙলা সাহিত্যে জীবনদৃষ্টির বিবর্তন ৮৪৮ সাহিত্যে যুগ-যন্ত্রণা ৮৫৪

গ্রন্থ পরিচিতি

সৈয়দ সুলতান–তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ ৮৫৭
যুগ-যন্ত্রণা ৮৫৮
কালিক ভাবনা ৮৫৯
মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ ৮৬০
প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ৮৬২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ

AMARBOI.COM

আহমদ শরীফ রচনাবলী—২/১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার
পত্নী ও পুত্রদেরকে
—যাদের অব্যক্ত আগ্রহ
এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে
প্রবর্তনা দিয়েছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবনা

ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন একাধারে কবি, পীর, সূফী-সাধক ও শাস্ত্রবেত্তা। তিনি মীর বংশজ। কাজেই তাঁকে ষোল শতকের একজন অভিজাত, শিক্ষিত, পণ্ডিত, ধার্মিক, সূফী, পীর ও কবি হিসেবে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ মেলে আমাদের। এজন্য তাঁকে আদর্শ মুসলমান, যুগ-সংস্কৃতির প্রতিভূ, সমকালীন সমাজ-মানসের প্রতিনিধিস্থানীয় চিত্রকর এবং লোক-মনীষার ধারক ও ভাষ্যকার রূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়। তাঁর রচনার পরিসরে তাঁর মানস-উপাদান বিশ্লেষণ করে আমরা ষোল শতকের বাঙলার অন্তত বাঙলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল—চট্টগ্রামের মুসলমানদের জগৎ ও জীবন-ভাবনার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারি—এ বিশ্বাসই সৈয়দ সুলতানের কাব্য পাঠে আমাদের উৎসুক করেছে। ধর্মবোধে ও আচরণে, ব্যবহারিক জীবন চর্যায়, সাংস্কৃতিক বোধে কিংবা সামাজিক আচার-আচরণে, লোক-মানসের যে-বিচিত্র অভিব্যক্তি ঘটেছে, গণসমাজের যে স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গির অন্তর্নিহিত প্রেরণাগত ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করা ও তাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াসই আমাদের লক্ষ্য।

কোনো জীবনই স্থান, কাল, ধর্ম ও সমাজ-প্রতিবেশ নিরপেক্ষ নয়। সে-জন্যই কাউকে স্বরূপে জানতে হলে তাঁর দেশ–কাল, বিশ্বাস-সংস্কার আর তাঁর আচারিক ধর্মের মৌলশিক্ষা ও লক্ষ্য এবং তাঁর দেশের প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই জানতে হয়, নইলে প্রাতিভাসিক ও যথার্থ সত্যের পার্থক্য নির্ণয়ের অক্ষমতা প্রসূত ধারণা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না।

সৈয়দ সুলতান নবী-কাহিনী, দেহতত্ত্ব তথা যোগতত্ত্ব ও সংগীত রচনা করেছেন। তাই আমরা ষোল শতকের ইসলাম, যোগ, সংগীত এবং রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসও সৈয়দ সুলতানের কাব্য-পাঠের ও মানস-বিচারের পটভূমিকা হিসেবে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করেছি। এতে কোন কোন বিষয়ের আপাত পরোক্ষ, বিস্তৃত ও আমূল আলোচনাও রয়েছে।

একালে সৈয়দ সুলতানকে আবিষ্কারের গৌরব আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদেরই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ'[১]-এ সৈয়দ সুলতানের 'নবীবংশ'-এর বিভিন্ন পর্বের পরিচিতি ছিল। কিন্তু তখন সৈয়দ সুলতান সম্বন্ধে বিদ্বানদের কোনো ঔৎসুক্য দেখা যায়নি। তার বিশ বছর পরে ১৩৪১ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক কবি 'সৈয়দ সুলতান' শীর্ষক এক প্রবন্ধে কবি ও কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় দেন। তখন থেকেই সৈয়দ সুলতান ও তাঁর কাব্যের প্রতি বিদ্বানরা উৎসুক হয়ে ওঠেন। তারপর থেকে কবির আবির্ভাবকাল ও পরিচয় সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচনা করেছেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুকুমার সেন, দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য,

---

১ প্রথম খণ্ড, ২য় সং[illegible] প্রথম সংখ্যা ১৩২১ সনে প্রকাশিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, আলী আহমদ, আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন প্রমুখ বিদ্বানগণ। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক আলী আহমদ 'ওফাত-ই-রসুল' পর্ব সম্পাদনা করে ছাপিয়ে দেন ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে। এটিই সৈয়দ সুলতানের প্রথম এবং আজ অবধি একমাত্র ছাপা গ্রন্থ।

সৈয়দ সুলতানের মনন-ধারায় প্রভাবিত অনুকারক কবির সংখ্যাও কম নয়। তাঁদের অধ্যাত্মবোধে ও সমাজ-ভাবনায় তাঁর চিন্তাধারা প্রবহমান দেখতে পাই। বলা চলে, নবজাগ্রতধর্মবুদ্ধির ও সমাজ-চিন্তার একটি School গড়ে উঠেছিল। তাই কেবল কবি-কৃতিতেই সৈয়দ সুলতানের পরিচয় সীমিত নয়। সৈয়দ সুলতান যে কবিমাত্র নন এবং তাঁর রচনাও যে পদ্যে বর্ণিত নিছক কাহিনী নয়, আরো বেশি কিছু, তা-ই আমাদের দেখবার-বুঝবার বিষয়।

সৈয়দ সুলতান দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের একটি পূর্ণাবয়ব রূপ অনুধ্যান ও উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর ধ্যান ও বোধের অনুরূপ একটি ইসলামী পরিবেশ ও প্রতিবেশ রচনার প্রয়াসও তাঁর ছিল। এই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যেই কলম ধরেছিলেন তিনি। সৃষ্টি-পত্তন থেকে হাসর অবধি ইসলামী ধারার জগৎ ও জীবন-চিত্র দানই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর ভাব-চিন্তার বৈশিষ্ট্য এতই প্রকট যে নিতান্ত অমনোযোগী পাঠকেরও তা দৃষ্টি এড়ায় না। 'ওফাত-ই-রসুল' অবধি রচনা করেই তিনি লেখনী ত্যাগ করেন। তাঁর অভিপ্রায়ক্রমে তাঁর প্রিয়শিষ্য কবি মুহম্মদ খান 'মক্তুল হোসেন' নামের কাব্যে তাঁর আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত করেন ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে।

নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যথ করিলা বাখান
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।...
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ। (মক্তুল হোসেন)

আমরা বিস্তৃত পটভূমিকার পরিসরে সৈয়দ সুলতানের ব্যক্তিত্ব ও কৃতির পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। দশটি পরিচ্ছেদে এবং আরো পাঁচটি উপবিভাগে [এদের দুইটি মূল কাব্য সংপৃক্ত] আমাদের আলোচনা পরিব্যাপ্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ :
দেশ ও কালের পরিচয় লাভের জন্যে চট্টগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমিকা দিতে হয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামের কোনো সুসংবদ্ধ ইতিহাস না থাকায়, স্বল্প কথায় ইতিহাসের ফলশ্রুতি ও প্রভাব বর্ণন সম্ভব হয়নি। বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলো সুবিন্যস্ত করতে আমাদের তেরো শতক থেকে ১৬৬৬ সনের মুঘল বিজয় অবধি সাড়ে চারশ বছরের ইতিহাসের বিস্তারে বিচরণ করতে হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :
সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে লোকজীবনে সংস্কৃতির বিকাশধারা আলোচিত হয়েছে। সেকালে ঐতিহ্যবোধ ও ধর্মাদর্শই ছিল সংস্কৃতির উৎস। পূর্বতন জীবন-ধারার মুখোমুখি ইসলামের ও মুসলমানদের ভূমিকা কি ছিল এবং সৈয়দ সুলতান কোন্ সমস্যা-সঙ্কটের সমাধান খুঁজলেন, তা বুঝবার জন্যে এ আলোচনা আবশ্যিক বলে মনে হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ :
সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি, পরিচয় এবং আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে জ্ঞাত তথ্য থেকে জানা যাবে যে, সৈয়দ সুলতানের ভক্ত ও অনুকারকের সংখ্যা নগণ্য ছিল না এবং তাঁর রচনার তথা মতাদর্শের প্রভাবও ছিল গভীর ও ব্যাপক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পরিচ্ছেদ :
সৈয়দ সুলতান রচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিরূপিত হয়েছে। নবীবংশ বিপুলকায় গ্রন্থ। লিখন, বহন ও পঠনের সুবিধার জন্যে নবীবংশের বিভিন্ন পর্বের পৃথক পৃথক পাণ্ডুলিপি চালু ছিল। আর সব পর্বের জনপ্রিয়তাও সমান ছিল না। হযরত মুহম্মদ-পূর্বযুগের নবীদের সম্বন্ধে লোকের ঔৎসুক্য সঙ্গতভাবেই কম ছিল। শব-ই-মেরাজ, ওফাত-ই-রসুল প্রভৃতি যে নবীবংশ নামের গ্রন্থের পর্বমাত্র, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত কোন কোন কবির উক্তি থেকে তা জানা যায়। কিন্তু একালে বিদ্বানদের আলোচনায় প্রত্যেক পর্ব স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছে। আসলে সৈয়দ সুলতান নবীবংশ, জয়কুম রাজার লড়াই, জ্ঞানপ্রদীপ ও পদাবলী রচনা করেছিলেন এবং এ চারটিই ধর্মসংপৃক্ত রচনা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ :
নবীবংশ কাব্যের বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার চেষ্টা আছে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিতে সৈয়দ সুলতানের রচনার সৌন্দর্যও উদ্ঘাটিত। এ বিপুল গ্রন্থ রচনার মহাপ্রয়াসের পশ্চাতে কি মহৎ পরিকল্পনা ছিল, তাও এ সূত্রে অনুধাবন করবার চেষ্টা করেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ :
নবীবংশ শ্রেণীয় আরবি-ফারসি কাসাসুল আম্বিয়া ও সিরাত গ্রন্থগুলোর সন্ধান মিলবে। এ প্রসঙ্গে কল্পিত ও অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব সূত্রও আলোচিত হয়েছে এবং সৈয়দ সুলতানের অনুসরণে রচিত বাঙলা কাসাসুল আম্বিয়া, রসুল চরিত ও রসুল বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের পরিচয় দেয়া হয়েছে।

AMARBOI.COM

সপ্তম পরিচ্ছেদ :
'অধ্যাত্ম সাধনা ও জ্ঞানপ্রদীপ' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে সৈয়দ সুলতানের তথা তাঁর সমকালীন বাঙালি মুসলমানের ধর্মতত্ত্ব, জীবন-দর্শন এবং সমাজ ও সংস্কৃতির স্বরূপ। এই পরিচ্ছেদেই সৈয়দ সুলতানের দানের ও ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রকটিত।

দেশ-কাল ও স্থানীয় ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ইসলাম যে একটি স্থানিক রূপলাভ করেছিল, ইসলামের প্রসারের জন্যে যে এর প্রয়োজন ছিল এবং এতে যে মুসলমান প্রচারকদের উদার ও দূরদৃষ্টির পরিচয় রয়েছে, তা যথাসম্ভব বিশদ করে বলবার চেষ্টা আছে এই পরিচ্ছেদে। এ সূত্রে তাঁর অনুসারী কবি ও কাব্যের পরিচিতিও বিধৃত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ :
সৈয়দ সুলতানের সংগীত চর্চা ও অধ্যাত্ম সাধনার পটভূমি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সংগীত সম্বন্ধে ইসলাম ও মুসলমান সমাজের ধারণাও আলোচিত হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদ :
সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা ও তাঁর প্রভাব ও প্রভাবের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে।

দশম পরিচ্ছেদ :

ক. পরোক্ষে প্রকটিত আচার-আচরণ, নিয়ম-নীতির আলোকে সৈয়দ সুলতানের সমকালীন বাঙালির সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে আলোকপাত করবার চেষ্টা আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িক কবির কাব্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র দেবার চেষ্টাও রয়েছে। ইতিহাস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যও অবহেলিত হয়নি।

গ. সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মান নিরূপণের প্রয়াসও এ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।

বাঙলাভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব কিরূপ ছিল, তার তথ্য-নির্ভর আলোচনা রয়েছে পরিশিষ্টে।

পরবর্তী দুই খণ্ডে সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থাবলীর সম্পাদিত পাঠ মুদ্রিত হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ
ষোল শতকের চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক পটভূমি

ত্রিপুরারাজ ছেঙথুম ফা সম্ভবত ১২৪০-৬০ খ্রীস্টাব্দের দিকে রাজত্ব করতেন। তাঁর আমলেই পার্বত্য ভোট-চীনা তিপ্‌রা জাতি চট্টগ্রাম জয়[১] করে বাঙলার রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়। সম্ভবত ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম বিজয়ের পূর্বে দামোদর দেব বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে কিংবা আরাকান অথবা ত্রিপুরার সামন্ত হিসেবে চট্টগ্রাম শাসন করতেন। মনে হয়, তাঁদের কারো হাত থেকে সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্ চট্টগ্রামের অধিকার ছিনিয়ে নেন (১৩৩৮-৩৯ খ্রী.)। চট্টগ্রামের কিংবদন্তীতে এবং শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায় এর সমর্থন আছে।[২] আমাদের ধারণায়, ইবন বতুতাও (১৩৪৬ খ্রী.) সাদকাউন (Sadkawan) নামে ফখরুদ্দীনের আমলের এই চট্টগ্রামকেই নির্দেশ করেছেন।[৩] কবি মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন'-এর ভূমিকাভাগ থেকে জানা যায় : ফখরুদ্দীনের আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন কদর বা কদল খান গাজী। তাঁর নামে একটি গ্রাম আজো কদলপুর বলে পরিচিত। এই কদর খানের আমলেই পীর বদরুদ্দীন আলাম ও কবির পূর্বপুরুষ মাহিআসোয়ার আরব বণিক হাজি খলিলের সঙ্গে চট্টগ্রামে উপনীত হন। ফখরুদ্দীন 'শায়দা' নামের এক দরবেশকে চট্টগ্রামের শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। এ ভণ্ড সাধু ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যা করার অপরাধে নিহত হয়। কবি মুহম্মদ খান গৌড়-সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) চট্টগ্রামস্থ কর্মচারী বা প্রতিনিধি রাস্তি খানের বংশধর। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের তালিকা দিয়েছেন :

মাহি আসোয়ার
↓
হাতিম
↓
সিদ্দিক
↓
রাস্তি খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পরাগলী ও ছুটি খানী।
মহাভারত সূত্রে)

↓

- পরাগল খান
  - ↓ ছুটি খান
- মীনা খান
  - ↓ গাভুর খান
  - ↓ হামজা খান
  - ↓ নসরত খান
  - ↓ জালাল খান
    - ↓ বিরহিম খান (ইব্রাহিম)
    - ↓ মুবারিজ খান
      - ↓ (কবি) মুহম্মদ খান[৪]

AMARBOI.COM

বদর আলাম, সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াই, কদর খান, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ এবং ইবন বতুতা (১৩৪৬ খ্রী.) চট্টগ্রামের ইতিহাসে প্রায় সমসাময়িক। দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে আরাকান ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অবধি উপকূল-লগ্ন বিস্তৃত অঞ্চলের বদর মোকামগুলো স্থানীয় জনগণের উপর পীর বদরের প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করছে। চট্টগ্রামের ধর্মীয় ইতিহাসে বদরের স্থান গুরুত্বপূর্ণ।[৫] সম্ভবত বিহারের পীর বদরউদ্দীন বদর-ই আলাম [মৃত্যু ১৩৪০ খ্রী.-- বর্ধমানের কালনায় যাঁর নকল সমাধি রয়েছে] আর চট্টগ্রামের পীর বদর অভিন্ন ব্যক্তি।[৬] কিন্তু অন্য অনেকের মতে ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে বদর আলামের মৃত্যু হয়।[৭] ইতিহাস ও মক্তুল হোসেন কাব্য সূত্রে জানা যায়, রাস্তি খানের বংশধরগণ (ইব্রাহিম ওরফে বিরহিম অবধি, ইনিও উজির ছিলেন) গৌড়, আরাকান ও ত্রিপুরা রাজার অধীনে (চট্টগ্রাম যখন যে-রাজ্যভুক্ত থাকত) চট্টগ্রামের শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রাস্তি খান স্বয়ং রুকনুদ্দীন বারবক শাহর (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) কর্মচারী ছিলেন।[৮]

পরাগল খান ও ছুটি খান ছিলেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.) ও নুসরৎ শাহর (১৫১৯-৩১ খ্রী.) আমলে ফেনী নদী ও রামগড় মধ্যবর্তী সীমান্ত-রক্ষী সেনানী বা লস্কর। হামজা খান, নসরত খান ও জালাল খান গৌড়, ত্রিপুরা ও আরাকানরাজের অধীনে শাসনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।[৯]

শিহাবুদ্দীন তালিস ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামে মুঘল বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা নির্মাণের কথা বলেছেন। তালিস স্বচক্ষে সে-রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখেছেন।[১০]

এখনো ফখরুদ্দীনের পথ (ফঅরদ্দিনের অদ) নিশ্চিহ্ন হয়নি। এ রাস্তা লালমাই অঞ্চল দিয়ে প্রসারিত ছিল। কাজেই ফখরুদ্দীনের সেনানী কদর খানের সৈনাপত্যে চট্টগ্রাম বিজয়ও স্বীকার করা চলে।[১১] ইনি মালিক পিণ্ডার খান খালজী ওর্ফে কদর খান নন। তিনি নিহত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে যে কয় মাস সোনারগাঁয়ে ছিলেন সে সময় বর্ষাকাল ছিল। কাজেই তিনি চট্টগ্রাম জয় করেননি।]

সম্ভবত ১৩৩৮ থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবদি চট্টগ্রাম গৌড় শাসনে ছিল। পনেরো শতকের গোড়া থেকে ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম যে গৌড়-সুলতানদের অধিকারভুক্ত ছিল, তার প্রমাণ বহু :

ক. চীনা দূতের ইতিবৃত্ত (১৪০৯, ১৪১২, ১৪১৫)[১২] খ. আরাকান রাজ নরমিখলের (মঙ সাউ মঙ) গৌড় দরবারে আশ্রয় গ্রহণ (১৪০৪-৩৩ খ্রী.) গ. চট্টগ্রামে তৈরি গণেশ (১৪১৭), মহেন্দ্র (১৪১৮) ও জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহর (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১) প্রাপ্ত মুদ্রাই তার সাক্ষ্য।[১৩] চীনা দূতেরা চট্টগ্রাম হয়েই গৌড়ে গিয়েছিলেন।

আবার চৌদ্দ শতকের রাজনৈতিক খবরও একেবারে বিরল নয়। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দের দিকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ফখরুদ্দীনের পুত্র ইখতিয়ারুদ্দীন গাজী শাহ থেকে চট্টগ্রাম সমেত[১৪] পূর্ব বাঙলার অধিকার লাভ করেন। এর পরে সিকান্দর শাহ (১৩৫৯-৮৯) ও তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) পনেরো শতকের প্রথম দশক অবধি রাজত্ব করেন। আযম শাহর আমলেই আরাকানরাজ নরমিখলে বা মঙ সাউ মঙ গৌড়ে আশ্রিত হন (১৪০৪ খ্রী.) এবং জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৬, ১৪১৮-৩১ খ্রী.) ১৪৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে আরাকান সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য আরাকানী বিদ্বানদের মতে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহই (১৪৩৩-৫৯) মঙ সাউ মঙকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ (১৩৮৯-১৪১০) যে চট্টগ্রামেরও শাসক ছিলেন, তা কেবল মঙ সাউ মঙের আশ্রয় গ্রহণ থেকেই নয়, বিহারের দরবেশ মুজাফফর শামস বলখী হজ যাত্রার সময় চট্টগ্রাম থেকে তাঁর কাছে যে-সব চিঠি লিখে ছিলেন, তা হতেও জানা যায়।[১৫] গিয়াসুদ্দীন চীন দেশে দূত পাঠিয়ে ছিলেন। চীনা সূত্রেও ধারণা হয় যে চট্টগ্রাম আযম শাহর অধীনে ছিল। তার পর সইফুদ্দীন হামজা শাহ, শিহাবুদ্দিন বায়াজিদ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, গণেশ, মহেন্দ্র, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, শামসুদ্দীন আহমদ শাহ এবং নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩০-৫৯) প্রভৃতি সুলতানের আমলেও চট্টগ্রাম গৌড়রাজ্যভুক্ত ছিল।

মঙ সাউ মঙের সিংহাসনে আরোহণ কাল (১৪৩০) থেকে আরাকানে মুসলমানদের প্রশাসনিক প্রভাব প্রবল হয়। রাজার মুসলিম নাম, মুদ্রায় কলেমা ও ফারসি হরফ তার প্রমাণ। ইলিয়াস শাহ বংশীয় সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহর রাজত্বকালে নরমিখলে বা মঙ সাউ মঙের ভাই মঙ খ্রী. (১৪৩৪-৫৯) ওর্ফে আলি খান রামুর কতকাংশ অধিকার করেন এবং সে-সূত্রে আরাকানরাজ গৌড়-সুলতানের প্রভাব মুক্ত হন। রামুর যে-অংশ আরাকানরাজের অধীনে গেল, সে-অংশ 'রাজার কূল' আর যে-অংশ চাকমা সামন্তের (?) অধিকারে রইল, তা 'চাকমার কূল' নামে আজো পরিচিত। মাহমুদ শাহর রাজত্বের শেষ বছরেই (১৪৫৯ খ্রী.) চট্টগ্রাম গৌড় সুলতানের হস্তচ্যুত হয়।

মঙ খ্রীর পুত্র বাসউ পিউ কলিমা শাহ (১৪৫৯-৮২ খ্রী.) পুরো চট্টগ্রাম জয় করেন।[১৬] এ জয় যে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, তার প্রমাণ, রাস্তি খানের (১৪৭৩-৭৪) উৎকীর্ণ মসজিদ লিপিতে মাহমুদ শাহর পুত্র রুকনুদ্দিন বারবক শাহকেই চট্টগ্রামের অধিপতি দেখি।[১৭] এর পরে এক সময় চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারভুক্ত হয়।

দ্বিজ ভবানীনাথের 'রামাভিষেক বা লক্ষ্মণদিগ্বিজয়' কাব্য ষোল শতকের প্রথম দশকে জয়ছন্দ বা জয়চাঁদ রাজার আগ্রহে রচিত। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে জয়ছন্দ ১৪৮২-১৫১৩ অবধি কর্ণফুলী ও শঙ্খনদ মধ্যবর্তী অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন আরাকান সামন্ত। এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য নির্ভুল হলে বুঝতে হবে শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহর (১৪৭৬-৮২) আমলে বা তাঁর পরে চট্টগ্রাম গৌড় সুলতানের হস্তচ্যুত হয়।

অতএব শামসুদ্দীন ইউসুফ কিংবা জালালউদ্দীন ফতেহ শাহর আমলে চট্টগ্রামে আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৫১২ খ্রীস্টাব্দ অবধি চট্টগ্রাম আরাকান শাসনে থাকে।[১৮] মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের উক্তিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তা হলে বলতে হবে চট্টগ্রাম ফতেহ শাহর শাসনাধীনে ছিল না। বিজয় গুপ্ত প্রস্তাবনায় বলেছেন: 'মুলুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া তকসীম। পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর। মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিতনগর।' ফতেহ শাহর (হোসাইনী) আমলে ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান শাহজাদা ওর্ফে খোজা সেরা, সইফুদ্দীন ফিরোজ শাহ, নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ কিংবা শামসুদ্দিন মুজফফর শাহর রাজত্বকালে চট্টগ্রাম আরাকান রাজার শাসনে ছিল। তারপর ১৫১২ সনে ত্রিপুরারাজ ধন্যমাণিক্য আরাকানীদের হাত থেকে চট্টগ্রামের উত্তরাংশ (কর্ণফুলী নদী অবধি) ছিনিয়ে নেন। এই সময় গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আলফা হোসাইনী বা আলফা খান নামের এক বণিকের সহায়তায় চট্টগ্রাম দখল করলেন।[১৯] এ রূপে ধন্যমাণিক্যের সঙ্গে হোসেন শাহর বিবাদ উপস্থিত হল। ধন্যমাণিক্য আবার সৈন্য পাঠিয়ে ১৫১৩ সনে হোসেন শাহর বাহিনীকে পরাজিত করে চট্টগ্রামে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মুদ্রা তৈরি করান :[২০]

তারপরে শ্রীধন্যমাণিক্য নৃপবর
চাটিগ্রাম জিনিলেক করিয়া সমর।
চৌদ্দশ পাঁচত্রিশ শাকে সমর জিনিল
চাটিগ্রাম জয় করি মোহর মারিল।
গৌড়ের যতেক সৈন্য চট্টলেতে ছিল
শ্রীধন্যমাণিক্য তাকে দূর করি দিল।

অথবা : 'চাটিগ্রাম হতে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা। মারণে কাটনে ভঙ্গ দিল গৌড় সেনা।'[২১] হোসেন শাহ প্রতিশোধ নেবার জন্যে ত্রিপুরা রাজ্য আক্রমণ করলেন। তাঁর সেনাপতি হৈতন খান (হায়াতুন্নবী) ও গৌড় মল্লিক (গৌড় মহল্লিক) ধন্যমাণিক্যের হাতে পরাজিত হন বটে, কিন্তু তার আগেই তিনি মেহেরকুলাদি অঞ্চল দখল করে মোয়াজ্জমাবাদ শিকভুক্ত করেন। ইতিমধ্যে এই বিবাদের সুযোগে আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুনর্দখল করেছিলেন। গৌড় মল্লিককে পরাজিত করে ধন্যমাণিক্যের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তিনি নারায়ণ ও চয়চাগের নেতৃত্বে বিপুল বাহিনী নিযুক্ত করলেন। ধন্যমাণিক্য নিজেও এঁদের সহগামী ছিলেন। [শ্রীধন্যমাণিক্য চলে চাটিগ্রাম লৈতে : রাজমালা] নারায়ণ রামু অবধি জয় করে 'রোসাঙ্গ-মর্দন' খেতাব লাভ করেন। কিন্তু সম্ভবত কয়েক মাসের মধ্যেই আরাকানরাজ চট্টগ্রাম পুনরাধিকার করেছিলেন। আরাকানীদের হাত থেকেই নুরসৎ খান পরাগল খানাদির সহায়তায় উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন। আরাকানরাজ কর্ণফুলী ও শঙ্খনদের মধ্যবর্তী চক্রশালায় ঘাঁটি করে গৌড়সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে সম্ভবত ১৫২৫ সন অবধি দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন। এ ব্যাপারের আভাস আছে কবি শাহ বারিদ খানের একটি পদবন্ধে।[২২] নুসরৎ খান পরবর্তী কোনো অভিযানে শঙ্খনদ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামও দখল করেন। দ্য বারোজের (De Barros) বর্ণনায় প্রকাশ : Joao de Silviera ১৫১৭ সনে চট্টগ্রাম বন্দর গৌড়-সুলতানের দখলে এবং আরাকানরাজকে গৌড়সুলতানের সামন্ত বলে জেনে ছিলেন।[২৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাকানরাজ মঙইয়াজা বা মঙ রাজা (১৫০১-২৩) এ বিপর্যয়েও আশা ছাড়লেন না। তিনি সেনাপতি ছেন্দুইজা, মন্ত্রী চাঙ্গেগ্রী ও রাজকুমার ইরে মঙের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম পুনরাধিকারের জন্যে ১৫১৭ সনে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। পরাজিত হয়ে চক্রশালার মুসলিম সেনানী-শাসক মুরাসিন (মীর ইয়াসীন) ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ঢাকার নারায়ণগঞ্জে (সম্ভবত চাঁদপুর হয়ে সোনারগাঁয়ে) আশ্রয় নেন।[২৪]

এ রূপে চক্রশালা আরাকান অধিকারে চলে গেল। আরাকানরাজের এই দিগ্বিজয়ী বাহিনী চট্টগ্রাম, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, লক্ষ্মীপুর ও ঢাকা জয় করে লক্ষ্মীপুরে শাসনকেন্দ্র স্থাপন করে এবং ১৫১৭-১৮ সনে আরাকানরাজ ঢাকা ভ্রমণ করেন।[২৫] কিন্তু আরাকানের এই দিগ্বিজয় স্থায়ী হয়নি। উত্তর চট্টগ্রামেও আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল না এ যুদ্ধে। তবু কর্ণফুলীর দক্ষিণ তীর অবধি গোটা অঞ্চল আরাকান শাসনে রয়ে গেল। ১৫২২ সনে ত্রিপুরারাজ দেবমাণিক্য উত্তর চট্টগ্রাম জয় করেন।[২৬] এর ফলে উত্তর চট্টগ্রামবাসী মঘেরা আরাকানে পালিয়ে যায় বলে কিংবদন্তী আছে। একে 'মঘধাওনী' (মঘ পলায়নী) বলে।[২৭]

এ অভিযানে ত্রিপুরার সেনাপতি ছিলেন রায় চাগ। সম্ভবত তিনি দক্ষিণ চট্টগ্রামও আক্রমণ করেন (রাজমালা)। দেবমাণিক্যও চট্টগ্রামে অধিকার প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেননি। এদিকে আরাকান সিংহাসনের তখন নিরাপত্তা ছিল না। গজপতি (১৫২৩-২৫,) মঙ সাউ (১৫২৫) থাতাসা (১৫২৫-৩১) প্রভৃতি জ্ঞাতিরা আট বছরের সময় পরিসরে সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন।[২৮] এই দুর্বলতার সুযোগে নুসরৎ শাহ ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দের দিকে চট্টগ্রামে স্বাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ সময় থেকে উত্তর চট্টগ্রাম ১৫৫৩ সন অবধি গৌড়-সুলতানের শাসনাধীন ছিল।[২৯]

AMARBOI.COM

হোসেন শাহ কিংবা নুসরৎ শাহ নাকি বিজিত চট্টগ্রামের নাম ফতেয়াবাদ রেখে ছিলেন। কিন্তু ফতেয়াবাদ নামের কোনো উল্লেখ রবীন্দ্র পরমেশ্বর বা শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে নেই। তবে ষোল শতকে চট্টগ্রাম শহর তথা রাজধানী যে ফতেয়াবাদ নামে পরিচিত ছিল, তা দৌলত উজির বহরাম খাঁনের 'লায়লী মজনু' কাব্যে পষ্ট উল্লেখ আছে এবং রাজধানীর নামানুসারে পুরো অঞ্চলটিও ফতেয়াবাদ রূপে পরিচিত ছিল হয়তো। এখনকার চট্টগ্রাম শহরের সাত মাইল দূরে ফতেয়াবাদ গ্রাম আছে। এখানে পুরোনো রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজো বিদ্যমান।

ষোল শতকের মাঝামাঝি সময়ে কোন এক নিযাম উত্তর চট্টগ্রামে (জাফরাবাদ গাঁয়ে) প্রতাপশালী জমিদার বা সামন্ত ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে দৌলত উজিরের উক্তি থেকে :

নগর ফতেয়াবাদ দেখিয়া পুরএ সাধ
চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ
চাটিগ্রাম অধিপতি হইলেন্ত মহামতি
নৃপতি নিযাম শাহা শূর
একশত ছত্রধারী সভানের অধিকারী
ধবল অরুণ গজেশ্বর।

'ধবল অরুণ গজেশ্বর' আরাকানরাজই চট্টগ্রামের সার্বভৌম অধিপতি ছিলেন। চট্টগ্রামে তাঁর সামন্ত শাসক ছিলেন নিযামশাহ। —চরণগুলির এই ব্যাখ্যাই সঙ্গত।

নৃপতি, শাহ, ধবল অরুণ গজেশ্বর* প্রভৃতি স্তোক জ্ঞাপক শব্দের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করা অনুচিত। ফাজিল নাসির, কবি চুহর, এতিম কাসেম, তমিজী, লোকমান প্রভৃতি কবি উচ্চবিত্তের সাধারণ লোককেও তোয়াজের ভাষায় নৃপতি, সুলতান, অধিপতি বলে অভিহিত করেছেন। কবি মুহম্মদ খানও তাঁর পূর্বপুরুষগণকে স্বাধীন নৃপতি রূপেই বর্ণনা করেছেন।[৩০] নিযামের নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরগনা নিযামপুর এখনো বর্তমান। বাহারিস্তান গয়বীতেও নিযামপুর পরগনার জমিদারের উল্লেখ আছে।[৩১]

এদিকে দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকানরাজ মঙ বেঙের (যৌবক শাহ ১৫৩১-৫৩) আমলে ত্রিপুরার সৈন্যেরা পার্বত্য পথে আরাকানের চট্টগ্রামস্থ অধিকারে ঘন ঘন হানা দিয়ে লুটপাট করত। ১৫৫৩ সনে কয়েক মাসের জন্যে উত্তর চট্টগ্রামও মঙ বেঙের দখলে ছিল, তা চট্টগ্রামে তৈরি তাঁর নামাঙ্কিত প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে প্রমাণিত।[৩২] আবার, গৌড়ের সুর বংশীয় সুলতান শামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহ গাজীরও উক্ত সনে চট্টগ্রামে তৈরি মুদ্রা মিলেছে। অতএব, ১৫৫৩-৫৪ সনে চট্টগ্রামে কিছুকাল আরাকানী আর কিছুকাল গৌড়ীয় শাসন ছিল।

গৌড় ও পর্তুগীজ সূত্রে জানা যায়, ১৫৩৯-৪০ সনে গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি খুদাবখশ খান ও হামজা খানের (আমীরজা খান) বিবাদের সুযোগে নোগাজিল (নওয়াজিস, নিযাম, খিজির?) শের শাহর হয়ে চট্টগ্রাম দখল করেন।[৩৩]

অতএব ১৫৫৩ সনে মঙ বেঙই সম্ভবত উত্তর চট্টগ্রামে হানা দিয়ে তা কিছু কাল দখলে রাখেন।

আরাকানরাজ মঙ বেঙের সময়েই দক্ষিণ চট্টগ্রামে মঘী কানি ও দ্রৌনে জমির পরিমাপ পদ্ধতি এবং মঘী সন চালু হয়। মঘী সন বাঙলা সনের পঁয়তাল্লিশ বছর পরে শুরু।

মুহম্মদ খানসুর ওর্ফে শামসুদ্দীন মুহম্মদ খান গাজী চট্টগ্রাম পুনর্দখল করে আরাকান আক্রমণ করেন। কিন্তু সম্ভবত আরাকান বেশি দিন তাঁর দখলে থাকেনি।[৩৪] যদিও আরাকানে তৈরি তাঁর মুদ্রা (১৫৫৪/৯৬২ হিজরী) মিলেছে।[৩৫] ১৫৫৬ সনে ত্রিপুরারাজ বিজয় মাণিক্য (১৫২৮-২৯–১৫৭০ খ্রী.) চট্টগ্রাম অবরোধ করেন :

আট মাস যুদ্ধ করে পাঠানের সনে
লইতে না পারে গড় চাটিগ্রাম স্থানে। (রাজমালা)

এই সময় বিজয় মাণিক্যের পাঠান সৈন্যেরা বিদ্রোহ করলে, তাদের হত্যা করা হয়। গৌড়ের পাঠান সুলতান এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শ্যালক মুবারকের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বাহিনী প্রেরণ করেন :

এই সব বৃত্তান্ত তাতে পাঠান শুনিল।
ক্রোধে গৌড়েশ্বর বহু সৈন্য দিল রণে
মমারক খাঁ সৈন্য সমে চাটিগ্রামে গেল
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য মগলে জিনিল। (রাজমালা)

কিন্তু সম্ভবত পুনরাক্রমণে মুবারক পরাজিত ও ধৃত হয়ে কালী কিংবা চর্তুশ দেবতার বেদীমূলে বলি রূপে প্রাণ হারান।[৩৬] বিজয় মাণিক্য ব্রহ্মপুত্র নদ অবধি জয় করে তথায় স্নান করেন। এই ঘটনার স্মারক মুদ্রা মিলেছে, 'শ্রীশ্রী লক্ষ্যাস্নায়ী বিজয় মাণিক্য দেব : (১৪৮১ শক ১৫৫৯ খ্রী.)'।[৩৭] মুবারক সম্ভবত মুহম্মদ শাহ গাজীরই শ্যালক। মনে হয়, ১৫৭৩ সন অবধি চট্টগ্রাম ত্রিপুরারাজের শাসনে ছিল। উক্ত সনে সম্ভবত দাউদ কররানী চট্টগ্রাম জয় করেন।[৩৮]

১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর অনন্ত মাণিক্য সম্ভবত দেড় বছর রাজত্ব করেন (১৫৭১-৭২)। তাঁকে নিহত করে সেনাপতি উদয় মাণিক্য সিংহাসনে বসেন (১৫৭২)। [চৌদ্দশ চুরানব্বই শকে উদয় রাজন। রাজমালা ২য় খণ্ড পৃ. ৬৯]। এ সময় সোলেমান কররানীরও মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র বায়াজিদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন। কাজেই দাউদ খান কররানীই (১৫৭৩-৭৬) ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম কেড়ে নেন (১৫৭৩)। দাউদের সৈন্যেরা বাধা পেল ত্রিপুরার কাছাকাছি খণ্ডলে। কিন্তু ত্রিপুরা বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে চলল পাঠান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী চট্টগ্রামের দিকে।[৩৯] এর পরে ফিরোজ আগ্নি আর জামাল খান পন্নীর নেতৃত্বে দাউদ আরো একদল সৈন্য পাঠালেন চট্টগ্রামে। এই দল মেহেরকুলে ত্রিপুরা বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হল। সম্ভবত পাঁচ মাস ধরে এই যুদ্ধ চলে (পঞ্চ বৎসর যুদ্ধ ছিল জামাল পন্নী সনে।) ১৫৭৬ সনে গৌড়ে মুঘল-বিজয় ঘটে। কাজেই পাঁচ বৎসর যুদ্ধ হওয়া অসম্ভব। পাঁচ মাস হওয়াই সম্ভব। এবারেও দাউদ খাঁর জয় হয়।

আইন-ই-আকবরীতে চট্টগ্রামের শেখপুর মহালের অপর নাম সোলায়মানপুর বলে উল্লেখ আছে[৪০]। আইন-ই-আকবরীতে বর্ণিত সাতটি মহালের কোনটিই শঙ্খনদের দক্ষিণ তীরে ছিল না। এতে বোঝা যায় দাউদ কররানীও শঙ্খনদ অবধি উত্তর চট্টগ্রামই দখল করেছিলেন।

গৌড়ে মুঘল বিজয়ের সুযোগেই সম্ভবত আরাকানরাজ মঙ ফালঙ (১৫৭১-৯৩) উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রাম মুঘল অধিকারভুক্ত হওয়ার আগেই কররানীর রেকর্ড থেকেই চট্টগ্রামের মহালগুলো তোডড় মল মুঘল তৌজিভুক্ত করেন। শিহাবুদ্দীন তালিস তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন :

> When Bengal was annexed to the Mughal Empire. Chatgaon was entered in the papers of Bengal as one of defaulting and unsettled districts. When the Mutasaddis did not really to pay any man whose salary was due they gave him an assignment on the revenue of Chatgaon.[৪১]

দক্ষিণ চট্টগ্রামের শাসনকেন্দ্র ছিল রামু। ম্যানরিক ও রালফফিচ রামুকে শাসনকেন্দ্র দেখেছেন। রামকোটে তার ধ্বংসাবশেষ আছে।[৪২]

রাজোয়াঙ-এ বর্ণিত যে-রনবী দ্বীপে আরবের জাহাজ ভেঙ্গে ছিল তাও সম্ভবত রামু। উত্তর চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে সম্ভবত ত্রিপুরা ও আরাকানে (১৫৮৫-৮৬ সনে) দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ চলছিল। এই যুদ্ধে সৈনাপত্য পান ত্রিপুরার রাজকুমার রাজ্যধর। ইনি রামু অবধি অগ্রসর হন। উকিয়ার শাসনকর্তা আদমের এলাকার সীমায় আরাকানীরা তাঁকে বাধা দিল। রসদ যোগাড়ে অসমর্থ হয়ে রাজ্যধর চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। আরাকান পক্ষ উকিয়ার সামন্তের মধ্যস্থতায় সন্ধির প্রস্তাব পাঠালে অমর মাণিক্য তা গ্রহণ করেন। রাজ্যধর ত্রিপুরায় চলে গেলে সন্ধিভঙ্গ করে আরাকানীরা চট্টগ্রাম দখল করে। অমর মাণিক্য রাজ্যধরকে আবার পাঠালেন। আরাকানরাজ চালাকী করে গজদন্ত নির্মিত এক মুকুট উপহার দিয়ে সন্ধির জন্যে দূত প্রেরণ করলেন। রাজ্যধরের সঙ্গে আরো দুইজন রাজপুত্র এসে ছিলেন। মুকুটের দাবি নিয়ে তিনজনের মধ্যে বিবাদ শুরু হল। আর আরাকানরাজ এ সুযোগে তাঁদেরকে চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করলেন। সেনাপতি রাজ্যধর সামুক ফুটে পঙ্গু হলেন। অপর এক রাজপুত্র যুঝমানিক্য নিজের মত্ত হাতীর আক্রমণে প্রাণ হারালেন।

এ কাহিনীতে সত্য আছে কিনা জানিনে। তবে ১৫৮৫ সনে Ralph Fitch চট্টগ্রামকে আরাকান অধিকারে দেখলেও ত্রিপুরার সঙ্গে আরাকানের স্থায়ী সংগ্রামের কথাও শুনেছিলেন[৪৩]। অবশ্য রাজোয়াঙ মতে অমর মাণিক্য সম্ভবত ১৫৮৫ সনে আরাকানরাজ্ থেকে চট্টগ্রাম ছিনিয়ে নেন। আবার আরাকানী সূত্রে জানা যায়, ১৫৮৬ সনে মঙ ফালঙ ত্রিপুরারাজ থেকে চট্টগ্রাম জয় করে নেন।[৪৪] আইন-ই-আকবরীর সমাপ্তি কাল ১৫৯৮ সন। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে :

> To the south-east of Bengal is a considerable Tract called
> Arakan which possesses the port of Chittagong.[৪৫]

কাজেই ১৫৯৮ সন অবধি অন্তত চট্টগ্রাম আরাকান অধিকারে ছিল, তা নিশ্চিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই বলেছি রাস্তি খানের সন্তান মীনা খান ও তাঁর বংশধরগণ অন্তত ১৬৬৫ সন অবধি চট্টগ্রামের শাসনকার্যে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। মীনা খাঁর পৌত্র হামজা খান (মসনদ-ই-আলা-মছলন্দ) গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহর আমলে (১৫৩৮ খ্রী. অবধি) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। খোদা বখশ খান নামে অপর ব্যক্তিও তাঁর সহকারী বা তাঁর সমকক্ষ অপর পদে দক্ষিণ চট্টগ্রামে নিযুক্ত ছিলেন। এই হামজা খানকে পর্তুগীজরা আমীরজা খান বলে উল্লেখ করেছে। গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর সময়ে এ দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, একজন ছিলেন পর্তুগীজদের বশে, অপরজন পর্তুগীজ বিদ্বেষী। দুই জনের দ্বন্দ্বের সুযোগে শেরশাহ প্রেরিত নোগাজিল (খিজির খান ?) সহজেই চট্টগ্রাম দখল করে নিলেন। এ সময় পর্তুগীজ Captain Sampayo মনস্থির করে কিছুই করতে পারলেন না। ফলে চট্টগ্রাম স্বাধিকারে পাওয়ার সুযোগ হারালেন তিনি Caslanheda তাই বলেছেন :

> Through the folly and indiscretion of Sampayo, the king of Portugal lost Chittagong which could easily have been taken possession of considering that Sher Shah was busily engaged on the other side of Bengal.[৬৪]

হামজা খান সম্বন্ধে মক্তুল হোসেন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তিনি ত্রিপুরা জয় করেন, এবং তিনি পাঠান বিজয়ীও। এতে কিছু সত্য নিহিত রয়েছে বলে মনে করি। হামজা খান শের শাহর সেনাপতি চট্টগ্রাম বিজেতা নোগাজিল-এর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তাই বোধ হয় গৌরব-গর্বী উত্তর-পুরুষ মুহম্মদ খানের বর্ণনায় 'লীলায় পাঠানগণ জিনি' পাচ্ছি। আর ১৫৫৩-৫৫ সনে বিজয় মাণিক্যকে বিতাড়িত করেন বলেই কবি 'করিয়া বিষম রণ জিনিয়া ত্রিপুরগণ' লিখেছেন। এতে বোঝা যায় নোগাজিলের বিজয়ের পরেও তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। হামজা খানের পর তাঁর পুত্র নসরত খানও পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। আরাকানী সূত্রে জানা যায়, নসরত খান গৌড়ের পাঠান সুলতানের তথা শামসুদ্দীন বাহাদুর শাহর (ওর্ফে খিজির খান ১৫৫৬-৬০) আমল থেকে সোলায়মান কররানীর (১৫৫৬-৭২) আমলের মাঝামাঝি কাল অবধি (১৫৬৯-৭০) চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন। কিন্তু এ সময় চট্টগ্রাম ত্রিপুরার দখলে ছিল– গৌড়ের নয়। অবশ্য ত্রিপুরারাজের উজির নসরত খান আরাকানরাজ সউলাহর (১৫৬৩-৬৪) নিকট আত্মরক্ষামূলক সাময়িক বশ্যতা স্বীকার করে সউলাহকে ভেট পাঠিয়ে তুষ্ট রাখেন। কিন্তু সউলাহর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মঙসিইটা বা মঙসিতা (১৫৬৪-৭১) সম্ভবত নসরত খানের আনুগত্য দাবি করেন। তখন দেয়াঙ্গ-চট্টগ্রামেরই পর্তুগীজেরা ছিল আরাকানরাজের বশে। আরাকানরাজের ইঙ্গিতেই নসরত খানের সঙ্গে পর্তুগীজদের বিবাদ বাধে এবং পর্তুগীজদের হাতেই ১৫৬৯-৭০ সনে তিনি প্রাণ হারান।[৪৭] উদয় মাণিক্যের (১৫৮৫-৯৬) সময়ে ঈসা খান সম্ভবত ত্রিপুরা রাজ্যের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামে কিছু কাল অবস্থান করে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর বাসভূমি আজো ঈসাপুর নামে পরিচিত।[৪৮]

নসরত খানের পরে তাঁর পুত্র জালাল খান পিতৃপদ লাভ করেন। অমর মাণিক্যের সঙ্গে আরাকানরাজের যুদ্ধের সময়ে (১৫৮৫ - ৮৬) জালাল খান গোপনে ত্রিপুরারাজের সহায়ক ছিলেন। অমর মাণিক্যের পরাজয়ে ও আত্মহত্যার সংবাদে জালাল খান নাকি ভয়েই প্রাণ হারান (১৫৮৬ খ্রী:) এবং জালাল খানের পুত্র কবি মুহম্মদ খানের পিতৃব্য বিরহিম বা ইব্রাহিম খান চট্টগ্রামে আরাকানী উজির হন (১৫৮৬)।

১৬০৭ Francois Pyvard প্যাগান রাজের (আরাকান রাজের) অধীনে চট্টগ্রামে যে-মুসলিম শাসনকর্তা দেখেছেন তিনি সম্ভবত ইব্রাহিম খান।[৪৯] ১৫৮৬-১৬০৭ সনের মধ্যে 'লায়লী মজনু' কাব্যোক্ত নিযামশাহ সুর চট্টগ্রামে আরাকানী শাসনকর্তা ছিলেন বলে ডক্টর করিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে অনুমান করেছেন তা যদি মানতে হয়, তা হলে উজির হিসেবে ইব্রাহিম খানের উপস্থিতি অস্বীকার করতে হবে।[৫০] জালাল খানের বিশ্বাস-ভঙ্গের পর থেকে চট্টগ্রামে আরাকানরাজের পুত্র কিংবা ভ্রাতা প্রধান শাসকরূপে নিযুক্ত হতে থাকেন।[৫১] এবং এটি রেওয়াজে পরিণত হয়। ফ্রায়ার ম্যানরিক (১৬২৯-৩৫) বলেন, The Principality of Chatigaon belonged by hereditery right to the second son (of the king). আরাকানরাজ মঙরাজাগী বা মঙ ইয়াজাগীর মুসলিম নাম ছিল সলিম শাহ (১৫৯৩-১৬১২)। তিনি নিজেকে আরাকান, বাঙলা ও ত্রিপুরার নরপতি বলে অভিহিত করতেন। চট্টগ্রামে উৎকীর্ণ তাঁর মুদ্রায় আররী, বর্মী ও নাগরী উৎকীর্ণ করান। এরপর থেকে ১৬৬৬ সনের জানুয়ারি অবধি চট্টগ্রাম আরাকান শাসনে ছিল। এ সময়ে শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদ খান আওরঙ্গজেবের পক্ষে চট্টগ্রাম জয় করেন।

এ যুগটা চট্টগ্রামে পর্তুজীগ প্রাবল্যের কাল। পরে বিস্তৃতভাবে পর্তুগীজ ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হবে।

১৬১৬ সনে বাঙলার মুঘল সুবাদার কাসিম খান, ১৬২১ সনে ইব্রাহিম খান ও ১৬৩৮ সনে ইসলাম খান চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অনেক কাল পরে আওরঙ্গজীব আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মা কর্তৃক সুজা হত্যার সংবাদে সম্ভবত অপমানিত বোধ করেন। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ বাঞ্ছায় শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন।

১৬৬৬ সনে ২৭শে জানুয়ারি শায়েস্তা খানের পুত্র বুজর্গ উমেদ খান উত্তর চট্টগ্রাম দখল করেন। অবশ্য মুঘল বাহিনী এগিয়ে যেয়ে রামু অবধি গোটা চট্টগ্রামই অধিকার করেছিল, কিন্তু বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় জলকাদার জীবনে অনভ্যস্ত মুঘল বাহিনী চট্টগ্রামে ফিরে আসে। দক্ষিণ চট্টগ্রামে আবার আরাকান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অধিকার ১৭৫৬ সন অবধি বহাল থাকে। আবদুল করিম খোন্দকার রচিত 'দুল্লামজলিসে' রামুর আরাকানী শাসকের প্রশস্তি আছে। 'সহস্রেক সাথে শতেক সাত' মগীসনে (তথা (১১০৭+৬৩৮) ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থ রচিত। তখনো মাতামুহুরী নদীর দক্ষিণ তীর তথা আধুনিক কক্সবাজার মহকুমাঞ্চল আরাকান অধিকারে ছিল।[৫২] ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দেই সম্ভবত মুঘল সীমান্তসেনানী আধু খাঁ বা তাঁর পূর্ববর্তী কেউ রামু জয় করে তা বাঙলা সুবাভুক্ত করেন।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের ভূমিকা

১৫২৮ সনে পর্তুগীজ Captain Martin Affonso-de-Mello-র জাহাজ চট্টগ্রাম ও আরাকানের মাঝামাঝি স্থানে ঝড়ের মুখে পড়ে ভেঙ্গে গেল। জেলেরা তাঁকে উদ্ধার করে চট্টগ্রামের শাসক খুদাবখ্শ খানের নিকট নিয়ে এল। খুদাবখস Mello-র সাহায্যে তাঁর এক প্রতিপক্ষকে দমন করেন, এবং ভবিষ্যতে এ প্রকার কাজে সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে Mello-কে বন্দী করে রাখেন। গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা Nuno-da-Cunha কাছে এ সংবাদ পৌছলে তিনি অরমুজের বণিক খাজা শাহাবুদ্দীনকে পর্তুগীজ কর্তৃক লুণ্ঠিত তাঁর জাহাজ ও পণ্য ফিরিয়ে দেয়ার শর্তে বশ করেন এবং ৩০০০ Cruzoedos বা টাকা মুক্তিপণ নিয়ে Mello-কে মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে খাজা শাহাবুদ্দীনকে দূত করে পাঠালেন গৌড় দরবারে। এ দৌত্য সাময়িকভাবে সফল হল।

১৫৩৩ সনে Mello আবার পাঁচখানা জাহাজ ও দু'শ অনুচর নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে এলেন। এলেন পথে পথে দেশী ও আরব বাণিজ্য তরী লুট করে করেই। বন্দরে এসে তিনি গৌড় সুলতান গিয়াসুদ্দীন মুহম্মদ শাহর কাছে Duarte-de-Azevedo-র নেতৃত্বে বারোজন লোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারফৎ বহুমূল্য উপহার পাঠালেন। উপহার সামগ্রীর মধ্যে বাঙালীর জাহাজ থেকে লুট করা গোলাপ জলের পিপাও ছিল। সুলতান লুণ্ঠিত দ্রব্য সনাক্ত করতে পেরে দরবারে প্রেরিত পর্তুগীজদের বন্দী করলেন এবং সানুচর Mello-কে বন্দী করার জন্যও নির্দেশ পাঠালেন। ইতিমধ্যে শুল্ক ব্যাপারে Mello-র বিবাদও বাধল চট্টগ্রামের শুল্ক কর্মচারীদের সঙ্গে। সুলতানের নির্দেশে আর এই বিবাদের সুযোগে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা Mello-র সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালেন। তাতে পর্তুগীজদের বিপুল ক্ষতি হল ধন-প্রাণের। এ সংবাদ পেয়ে পর্তুগীজ শাসনকর্তা প্রতিশোধ নেবার জন্যে ৩৫০ জন লোক দিয়ে Antoino-de-Silve Meneges-এর নেতৃত্বে এক নৌবহর পাঠালেন। Meneges চট্টগ্রামে পৌঁছে বন্দীদের মুক্তি দাবি করলেন। মাহমুদ শাহ পর্তুগীজ কারিগর প্রাপ্তির শর্তে, অপর মতে ১৫০০০ পাউন্ড মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু শর্তারোপে রুষ্ট হয়ে Meneges চট্টগ্রাম বন্দরে আগুন লাগিয়ে দেন এবং বহু লোক হত্যা করেন ও বন্দী করে নিয়ে যান। করমণ্ডলের পর্তুগীজ অধ্যক্ষ Diego Rebello ১৫৩৫ সনে সশস্ত্র অনুচর নিয়ে সপ্তগ্রামে আসবার পথে দুটো আরব বাণিজ্য-জাহাজকে বঙ্গোপসাগর থেকে বিতাড়িত করেন।

তবু শের শাহর আক্রমণে বিপর্যস্ত গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহ পর্তুগীজদের হাত করতে প্রয়াসী হলেন। ফলে Mello Rebello-কে শের শাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাজে লাগালেন। এই সুযোগে Rebello চট্টগ্রাম বন্দরের পূর্ণ অধিকার লাভ করলেন এবং এরূপে আরব-ইরানী ও অন্যান্য জাতির চট্টগ্রামের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হল। Villalobos এবং Joao Correa-র নেতৃত্বে শের শাহর বিরুদ্ধে Mello দুটো নৌবাহিনী দিয়ে ছিলেন। এই কৃতজ্ঞতায় মাহমুদ শাহ Mello-কে ৪৫০০০ রী (Reis) এবং পর্তুগীজ সৈন্যদের মাথাপিছু দৈনিক ১০ টাকা করে ভাতা দেন এবং চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে তারা কুঠি নির্মাণ ও শুল্কালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার পায়। এমন কি Nuno Fernandez Freire এবং Joao Correa যথাক্রমে চট্টগ্রামে ও সপ্তগ্রামে শুল্ক বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। এর পরে বাঙলায় এলেন Captain Affonso-de Brito। মাহমুদ শাহর সাহায্যার্থ গোয়া থেকে Vasco-de-Sampayo-র নেতৃত্বে নয়টি রণতরী প্রেরিত হয়। এ সময় মাহমুদ শাহর চট্টগ্রামস্থ শাসনকর্তা খুদাবখ্শ খান ও হামজা খানের (আমীরজাকাও) মধ্যে বিরোধ চলছিল। পর্তুগীজ শুল্কাধ্যক্ষ Fernandez হামজা খানের পক্ষাবলম্বন করেন। এ বিরোধের সুযোগে শের শাহর সেনাপতি খিজির খান [নোগাজিল?] চট্টগ্রাম বন্দরের অধিকার পান। কিন্তু শীঘ্রই সেমপাও-এর বাহিনী খিজির খাঁর প্রতিনিধিকে বিতাড়িত করেন। তখন শের শাহর পক্ষ থেকে পর্তুগীজদের আশ্বাস দেয়া হল– তারা আগের মতো সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পাবে। এতে পর্তুগীজ অধ্যক্ষ Fernandez হামজা খানের পক্ষ ত্যাগ করে খিজির খানের তথা শের শাহর পক্ষ নিলেন। কিন্তু তখনো সেমপাও-এর প্রেরিত পর্তুগীজ সৈন্যেরা হামজা খানের পক্ষে ছিল। তারা খিজির খানের অফিসারদের ধরে নিয়ে Sampayo-র জাহাজে বন্দী করে রাখল। এই বিবাদের ফলে ১৫৪০ সনের দিকে খিজির খানের হাতে পর্তুগীজদের ধন-প্রাণের ক্ষতি হল বিস্তর। এরূপে Sampayo-র অবহেলা এবং Fernandez-র অপরিণামদর্শিতার ফলে চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিকার প্রাপ্তির সুযোগটি পর্তুগীজদের হারাতে হল।[৫৩] অবশ্য পর্তুগীজেরা বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি দুটোই সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু ষোল শতকের শেষাবধি পর্তুগীজেরা বাঙলা দেশে দুর্গাদি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। যদিও চট্টগ্রামে (Porto-Grando) ও হুগলীতে (Golin or Porto Pequeno) তারাই প্রায় একচেটিয়া বাণিজ্যের উপায় করে নিয়ে ছিল। চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ভূমিকার প্রধান ঘটনাগুলো এই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. ১৫৬৯ সনে Ceasar Frederick সন্দ্বীপে মুসলিম বাশেন্দা ও মুসলিম সুশাসক রাজ্য দেখে ছিলেন।

খ. ডক্টর জেমস ওয়াইজ-এর মতে Father Manrique ১৬৩০ সনে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন।[৫৪]

গ. Francis Fernandez নামে গোয়ানিজ পাদ্রীর মৃত্যু হয় ১৬০২ সনে বন্দীরূপে চট্টগ্রামের কারাগারে। আরাকান রাজের পীড়নেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৫৫]

ঘ. ১৬০১ সনে যশোরে ও চট্টগ্রামে দুটো Jesuit Mission আসে। তখন দেয়াঙ্গে একটি Church'ও ছিল।

ঙ. ১৬০২ সনে পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে আরাকানী শাসক কর্তৃক উৎপীড়িত হয়ে সন্দ্বীপে ঘাঁটি করে। সন্দ্বীপ আগে বাকলা রাজের শাসনে ছিল, কিন্তু পরে গৌড় শাসনভুক্ত হয়। ১৫৬৫-৮৬ সনের দিকে সন্দ্বীপের মুসলমানেরা পর্তুগীজদের প্রতি প্রীতি ও সৌজন্য রাখত।

চ. বাকলা রাজের অনুগত Dominique Carvalho এবং Manuel-de Mallos-এর যুক্ত বাহিনী সন্দ্বীপ দখল করল। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই আরাকানরাজ তাদের বিতাড়িত করে সন্দ্বীপ পুনরাধিকার করে বাকলা জয় করেন (১৬০২), যশোরে হানা দেন এবং বাঙলা দেশ জয়ের হুমকি হাঁকেন। তখন Carvalho কিছু অনুচরসহ পালিয়ে শ্রীপুরে আশ্রয় নেন।[৫৬]

ছ. ১৬০৭ সনে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গ দখল করেন। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজ বাসিন্দাদের কিছু নিহত হয়, কিছু মেঘনার দ্বীপাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। এক মুঘল নৌ-অধ্যক্ষ ফতেহ খান সন্দ্বীপ দখল করে মুঘলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনিও পর্তুগীজ আর খ্রীস্টান দাসদের হত্যা করে উচ্ছেদ করেন। এ সময় Sabastian Gonzales Tibao এবং কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ দেয়াঙ্গ থেকে পালিয়ে গিয়ে দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করে। এ দিকে ফতেহ খান ১৬৬৫ সনে মুঘল সেনানী ইবন হোসেনের হাতে পরাজিত ও বন্দী হন।[৫৭]

জ. দস্যু Gonzales ক্রমে শক্তিশালী হয়ে সন্দ্বীপের স্বাধীন রাজা হন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বিশ্বাস ভঙ্গ করেন। আবার আরাকানরাজের ভ্রাতা আনোপোরমকে বশ করে তাঁর ভগ্নীকে বিয়ে করেন এবং কিছু কাল পরে তাঁকে হত্যা করে বহু ধন-রত্নের মালিক হন। Gonzales সন্দ্বীপে নয় বছর রাজত্ব করার পরে আরাকানরাজের হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পালিয়ে যান (১৬১৬)। এভাবে (Gonzales-এর) sovereignty passed like a shadow; his pride was humbled and his villainies punished.[৫৮]

পর্তুগীজরা এর পরে আর কোনো দিন রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ করেনি, তবে উপকূলাঞ্চলে অপ্রতিহতভাবে দৌরাত্ম্য করতে থাকে। হার্মাদদের জালিয়া দেখলে মুঘল নওয়ারাও ত্রস্ত হয়ে উঠত।

ঝ. বার্নিয়ার বলেছেন (১৬৬৮ খ্রী.), St. Augustine সম্প্রদায়ের এক ভিক্ষু Fra Joan কয়েক বছর ধরে স্বাধীনভাবে সন্দ্বীপে রাজত্ব করেছেন।

ঞ. বহু পর্তুগীজ শাহ সুজাকে (১৬৬০) আরাকানরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সহায়তা করেছে। সুজার পরাজয়ে এরা আরাকান থেকে পালিয়ে এসে বাঙলার উপকূলাঞ্চলে (সুন্দরবন, বাকলা ও হুগলী অবধি), ডাকাতি করে বেড়াত।

ট. ফ্রায়ার ম্যানরিক[৫৯]-এর (১৬২৮-৪৩) বর্ণনায় পাই :

১. পর্তুগীজরা আরাকানরাজের অনুমতি নিয়েই দেয়াঙ্গে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। বন্দর করবার জন্যেই পর্তুগীজরা আরাকানরাজ থেকে দেয়াঙ্গ ইজারা নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. আরাকানরাজ মুঘল শক্তিকে প্রতিরোধ করবার অভিপ্রায়েই পর্তুগীজ জলদস্যুদের সহায়তা করতেন, এমনকি এ কার্যে ওদেরকে তিনিই নিযুক্ত করতেন। এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের ও দাসের অর্ধেক পেতেন তিনি।

৩. দেয়াঙ্গে ও তার চার পাশের গাঁয়ে খাঁটি ও সঙ্কর পর্তুগীজের সংখ্যা ছিল সাড়ে সাতশ'। এ সব লোক কয়েকটি Company বা দলে বিভক্ত ছিল, আরাকানরাজ তাদের জায়গীর দিয়েছিলেন। ১৬১৬ সনে সন্দ্বীপের রাজা গনজালিস টিবাও আরাকানে হানা দিতে গিয়ে ব্যর্থ হন। দেয়াঙ্গের পর্তুগীজদের উপর গোয়ার গভর্নর-এর কোন কর্তৃত্ব চলত না। গনজালিস ও ব্রাইটো নিজেদেরকে গভর্নরের সমকক্ষ বলে দাবি করতেন।

৪. Manrique যখন দেয়াঙ্গে আসেন, তখন চট্টগ্রামের শাসক ছিলেন সুধর্মার ভাই। তাঁর মৃত্যুতে নতুন এক শাসক প্রেরিত হন। ১৬০০-১৭ সন অবধি পর্তুগীজ প্রতাপ অপ্রতিরোধ্য ছিল। তখন The Portugese had dreams of making and unmaking the rulers of Arakan বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবার জন্যে আরাকানরাজ দেয়াঙ্গে একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজীব দেয়াঙ্গের পেশাদার পর্তুগীজদের ঘুষে ও হুমকিতে বশ করে ছিলেন।

ঠ. শিহাবুদ্দীন তালিসের বর্ণনায়[৬০] আরো কিছু তথ্য মেলে :

১. চট্টগ্রাম দুর্গের ভেতরে একটি টিলায় একটি সমাধি আছে। ঐটি পীর বদরের আস্তানা নামে পরিচিত। মঘেরাও সমাধিকে তীর্থরূপে মানে, কয়েকখানি গ্রাম এই সমাধির জন্যে ওয়াকফ করে দেয়া হয়েছে।

২. কর্ণফুলীর অপর তীরে চট্টগ্রাম দুর্গের বিপরীত দিকে একটি সুদৃশ্য ও উঁচু দুর্গ আছে। এখানে প্রতিরক্ষার সব উপকরণ মজুত থাকে। আরাকানরাজের বিশ্বস্ত আত্মীয় বা জ্ঞাতি চট্টগ্রামে শাসনকর্তা থাকেন (১৫৮৬ সন থেকে এ ব্যবস্থা চালু হয়)। আরাকানরাজ নিজের নামে চট্টগ্রামে স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করান।

৩. অতীতে বাঙলার সুলতান ফখরুদ্দীন চট্টগ্রাম জয় করে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর অবধি রাস্তা (আল) তৈরি করিয়ে ছিলেন, এ রাস্তা শ্রীপুরের বিপরীত দিকে নদীর অপর পার থেকে শুরু। ফখরুদ্দীনের সময়ে নির্মিত মসজিদ ও সমাধি ছিল চট্টগ্রামে। সেগুলোর ভগ্নাবশেষই তার প্রমাণ।

৪. বাঙলার সুলতানদের রাজত্বের শেষের দিকে এবং মুঘল শাসনের প্রথমদিকে বাঙলা দেশে বড় বিশৃঙ্খলা বিরাজ করত :

Chatgaon again fell into the hands of the Maghs who did not leave a bird in the air or a beast on the land (from Chatgaon) to Jagdia : the frontier of Bengal increased the desolation, thickened the jungles, destroyed the AL and closed the road so well that even the snake and wind could not pass through. They built a strong fort and left a large fleet to guard it. Gaining composure of mind from the strength of the place they turned to Bengal and began to plunder it.

ইব্রাহিম ফতেহ জঙ্গ ব্যতীত কোনো মুঘল সুবাদারই শায়েস্তা খানের আগে এদের দমন করার চেষ্টা করেন নি। ফিরিঙ্গি ও মঘ সমন্বিত আরাকানী জলদস্যুরা জলপথে বাঙলাদেশের ভুলুয়া, সন্দ্বীপ, সংগ্রামগড়, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, বাকলা, যশোর, ভূষণা ও হুগলী লুণ্ঠন করত। তারা হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ ও বড়-ছোট নির্বিশেষে ধরে নিয়ে যেত। হাতের তালু ফুঁড়ে বেত চালিয়ে গরু-ছাগলের মতো বেঁধে নৌকার পাটাতনে ঠাঁই দিত। মুরগিকে যে ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দানা ছিটিয়ে দেয়া হয়, তাদেরও তেমনি চাউল ছুঁড়ে দেয়া হত খাবার জন্যে। এ অবহেলা ও পীড়নের পরেও যারা বেঁচে থাকত, তাদেরকে ভাগ করে নিত মঘে-পর্তুগীজে। মঘেরা অপহৃত লোকদের অবমাননাকর শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করত এবং পর্তুগীজেরা ওদেরকে ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসি বেনেদের কাছে, দাক্ষিণাত্যের বন্দরগুলোতে এমনকি তমলুক আর বালেশ্বরেও দাসরূপে বিক্রয় করত।

৫. কর্ণফুলীর মোহনাস্থিত (নদীর দক্ষিণ তীরে) পর্তুগীজ দস্যু-ঘাঁটির নাম ছিল ফিরিঙ্গি বন্দর। আরাকানরাজ ফিরিঙ্গিদেরকে তাঁর চাকুরে মনে করতেন, এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য অর্ধেক নিজে নিতেন।

৬. মগ-ফিরিঙ্গি দস্যুরা এমন ত্রাস সৃষ্টি করেছিল যে মুঘল নওয়ারা বা নৌ-বাহিনী এদের দেখে ভয়ে ছুটে পালাত এবং হার্মাদের কবলে পড়ার চাইতে ডুবে মরাই শ্রেয় মনে করত। পর্তুগীজ দস্যুরা হার্মাদ (আরমাডা দেশীয়) নামে পরিচিত ছিল।

৭. ১৬৬৫ সনে আরাকানরাজ ও চট্টগ্রামের পর্তুগীজদের মধ্যে বিবাদ বাধে। পীড়নের ভয়ে পর্তুগীজেরা মুঘলদের আশ্রয়ে চলে আসে। যুগদিয়া ও নোয়াখালীর মুঘল থানাদার ফরহাদ খান এদের সবাইকে সৈন্য বাহিনীতে নিযুক্ত করলেন। শায়েস্তা খান পর্তুগীজ Captain-কে হাত করবার জন্যে ২০০০ টাকা ইনাম এবং মাসিক ৫০০ টাকা বেতন ধার্য করে দিলেন। এদের সহায়তা শায়েস্তা খানের চট্টগ্রাম বিজয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৬১]

পর্তুগীজদের দোষের ফিরিস্তিই দেয়া হল। কিন্তু এদেশের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এবং ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নে পর্তুগীজদের দান কম নয়। দেশের বিচিত্র উৎপন্ন ও নির্মিত দ্রব্যের সঙ্গে এরাই আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। তামাক, আনারস, পেঁপে, বৈয়াম, বালতি-বোতাম-সাবান, কাদেরা-মেজ-আলমারি-জানালা, ইস্পাত, চাবি, আয়া, ছায়া, বরগা, তোয়ালে প্রভৃতি অসংখ্য ভাব ও নাম জ্ঞাপক শব্দই তার সাক্ষ্য।

বাঙলাদেশের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ইতিহাসের উপকরণ বিরল। ঐতিহাসিক যুগে চট্টগ্রামে কোনো রাজা-বাদশাহ রাজত্ব করেননি। তাই এর কোনো একক ইতিহাস লিখিত হয়নি। শাসকদের ইতিহাসে কেবল প্রাসঙ্গিকভাবেই চট্টগ্রাম সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা খবর মেলে। এ সব খবর জড়ো করে চট্টগ্রামের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কাঠামো তৈরি করা কঠিন কাজ।

চট্টগ্রাম সম্বন্ধে যে কয়টি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়েছে, তার কোনোটিই ক্রটিমুক্ত নয়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও তথ্য সমাবেশের প্রয়াস আছে বটে, কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয় নি।*

গৌড়, ত্রিপুরা, আরাকান রাজ্যের এবং পর্তুগীজদের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কক্ষেত্র, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর এবং বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান—এই চারটি ধর্ম সম্প্রদায়ের আবাসভূমি চট্টগ্রাম। গৌড়ের মুসলিম শাসক, ত্রিপুরার হিন্দু রাজা, আরাকানের বৌদ্ধ নৃপতি ও পর্তুগীজ খ্রীস্টান চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে লড়াই করেছেন। কিন্তু দেশবাসীরা স্বধর্মীর পক্ষ হয়ে প্রতিবেশীকে পীড়ন করেছে বলে প্রমাণ নেই। এখানকার মানুষ বিভিন্ন পরিবেশের, নানা সমস্যার ও বিচিত্র সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এ সব কিছুই তাদের মন, মেজাজ ও মননের উপর প্রভাব রেখে গেছে। এমনি বিচিত্র আবহে লালিত চট্টগ্রামী মানুষ ধর্মীয় কোন্দল ও জাতি বৈরকে তুচ্ছ জেনে এক উদার অথচ স্বধর্ম ও সংস্কৃতিনিষ্ঠ মনোভঙ্গির অধিকারী হয়েছিল বলে অনুমান করি। কেননা, মধ্যযুগে চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। এ সব গ্রন্থের কোথাও বিদ্বিষ্ট মনের পরিচয় নেই। স্বতন্ত্র থেকেও তারা সদ্ভাব ও সদিচ্ছা বজায় রাখতে জেনেছে। বৈচিত্র্যের মধ্যেও যে ঐক্য থাকে, এই তত্ত্ব ও আপ্তবাক্য, মনে হয়, তাদের জীবনে বাস্তবরূপ লাভ করেছিল। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর আভাস মিলবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* নিম্নোক্ত ইতিহাস গ্রন্থে নানা উপকরণ মেলে

ক. Revenue History of Chittagong-H. Cotton. 1860.

খ. Ahadisul Khawanin (Tawrikh-i-Hamidi) -K.B. Hamid-ullah Khan. 1871 (Persian)

গ. Eastern Bengal Disrict Gazetteer : Chittagong-0' Malley, 1908.

ঘ. চাকমাজাতি : সতীশচন্দ্র ঘোষ : ১৯০৯। এতে চট্টগ্রাম সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক তথ্য রয়েছে। এটি পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি তথ্যবহুল উচ্চমানের ইতিহাস।

ঙ. ইসলামাবাদ : আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ (১৩২৫-২৬ সন। ১৯১৮-১৯ খ্রী.) সম্প্রতি বাঙলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত। ১৯৬৪ খ্রী.।

চ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী। ১৯২০ খ্রী.।

ছ. A Short History of Chittagong : Syed Ahmadul Haq. 1948.

জ. চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল, নবাবী আমল ও ইংরেজ আমল নামে তিনখানি পুস্তিকা) ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ সনের মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত–মাহবুব-উল-আলম প্রণীত-৩য় সংস্করণও বের হয়েছে।

ঝ. History of Chittagong : S. M. Ali, 1964.

এটি কিছুটা ইতিহাস ও কিছুটা গেজেটিয়ার শ্রেণীর রচনা।

এছাড়া চট্টগ্রামের ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ মেলে রাজমালা, ত্রিপুর বংশাবলী, চম্পকবিজয় প্রভৃতি ত্রিপুরা রাজাদের ইতিকথা গ্রন্থে, আরাকানের রাজন্য-কাহিনী রাজোয়াঙ (রাজবংশ) Phayre, Scott, Harvey প্রভৃতির History of Burma, A.E. Hall -এর History of South East Asia প্রভৃতি আরাকান-বার্মার ইতিহাস গ্রন্থে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের বাঙ্গালার ইতিহাসে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal-এ, লামা তারানাথ, দ্য বারোজ রচিত গ্রন্থে, সিঙ মাহুয়ান, ইবন বতুতা, মার্কোপলো, ভারথেমা, ম্যানরিক, বারবোসা, রালফ ফিচ, বার্নিয়ার প্রমুখ পর্যটক বর্ণিত ভ্রমণ বৃত্তান্তে, Danvers Camos রচিত পর্তুগীজ ইতিহাসে এবং নানা গবেষণাপত্রে।

উৎস নির্দেশ

১ রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ২য় ভাগ, পৃ. ২৭, ১৩০৩।

২ History of Bengal : Dacca University, 1948. Vol. II. Pp 251-57.

২ I ibid, II Fathiyyah-I-Ibriyyah : (Shaista Khan in Bengal)- J. N, Sarkar, JASB, 1906, Pp - 257-60.

৩ ক. Ahadisul Khawanin : Hamidullah Khan.

খ. Studies in Mughal India : J. N. Sarkar, P. 122.

গ. Ibn Battuta : H. A. R. Gibb, Pp 267-68 Yule also indentified sadkawan to be Chittagong : Pp 366.

ঘ. Fathiyyah-i-Ibriyyah : Shihabuddin Talish.
Shaista Khan in Bengal : J. N.Sarkar, JASB, 1906 Pp 257-60.

ঙ Coins and Chronology of Early Independent Sultans, of Bengal : N. K. Bhattasali : Pp 145-49. (Cambridge, 1922).

৪ ক. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, ভূমিকা : সাহিত্য পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৬ সন।

খ. কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য : সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা : ১৩৬৯ সন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫ Badr Maqams : M. S. Khan; pp 17-46. JASP, Vol. II, 1962.
বদর পীর সম্ভবত দুইজন ছিলেন।

৬ ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব (১৯৩৫)– ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক
খ. পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম (১৯৪৮)
গ. Badr Maqams : M. S. Khan, Pp 17-46.
ঘ. Firozshahi Inscription in the Chhota Dargah (761 A. H) - Blochmann, JASB, Vol. XXXXII, 1873, p. 302.
জাহাংগীর সিমনানীর উক্তিতে দুইজন বদরের উল্লেখ আছে। (একাদশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য)

৭ Badr Maqams : Pp 36, 40.

৮ ক. History of Bengal : D.V. Vol. II.
খ. Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal : Dr. A. H. Dani, Appendix A. JASP, Vol. II, Pp28- 33,90, 1957.
গ. তোহফা—আলাউল (ভূমিকা), আহমদ শরীফ সম্পাদিত, ১৩৬৪ সন।

৯ ক. মক্বুল হোসেন, সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, ভূমিকা।
খ. Arakan Rule in Chittagong (1550-1660 A. D)- S. M. Ali, A paper read in History Conference at Dacca in 1961.

১০ Fathiyyah-I-Ibriyyah : JASP, 1906, Pp257-60, -J. N. Sarker.

১১ Tarikh-I-Mubarakshahi : K. K. Basu, Pp 106-07,

১২ ক. Political Relation between Bengal and China-Dr. P. C. Bagchi, Visva Bharati Annals; 1945, pp 127-34.
খ. চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা—ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : ১ম বর্ষ : ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪ সন।
গ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : সুখময় মুখোপাধ্যায়, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৯১/১-১০৩/২।

১৩ Coins and Chronology etc. : Dr. N. K. Bhattasali, Pp 119-26.

১৪ রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ২য় ভাগ : পৃ. ৩৬।
ক. Burma Research Society's Anniversary Volume, 1960.

১৫ ক. Correspondence of the two 14th Century Sufi Saints of Delhi and Bengal.--S. Hasan Askari : Proceedings of the 9th Session of Indian History Congress, 1956, Pp 206-44.
খ. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রী. পৃ. ৯৩।

১৬ History of Burma : A. P. Phyre, p 171. G. E. Harvey : Chapter on Arakan.

১৭ ক. Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal : Dr. A. H. Dani-P. 28.
খ. History of Bengal, Vol. II, Dacca University.
গ. Arakan : Dr.A. B. M. Habibullah, JASB 1945.

১৮ ক. বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : পৃ., ৬৬-৬৭।
খ. History of Burma—Phayre, Pp 77-78, Harvey, P. 139.

১৯ ক. চট্টগ্রামের ইতিহাস : (পুরানা আমল) মাহবুবউল আলম, পৃ. ৫৪-৫৫।
খ. History of Chittagong : S. M. Ali, P. 20.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. A Short History of Chittagong : S. Ahmadul Haq.

২০ কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৬৫৬, ১–২য় সংখ্যা, পৃ. ১৬-৩২।

২১ রাজমালা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পুঁথি, বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর গ্রন্থে উদ্ধৃত।

২২ বিদ্যাসুন্দরের কবি : সাহিত্য পত্রিকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৪ সন।

২৩ ক. De Barros, History of the Portuguese in Bengal (1919)-J. J. A. Campos, Pp 28, 30.

খ. Arakan : Dr. A. B. M. Habibullah : JASB, 1945.

গ. Bengal : Past and Present : 1944.

২৪ চট্টগ্রামের ইতিহাস : (পুরানা আমল) পৃ. ৫৮, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৫৫ খ্রী. এবং রাজোয়াঙ।

২৫ History of Bengal : D. U. Vol. II, Pp149-50.

২৬ রাজমালা : কালিপ্রসন্ন সিংহ, কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ. ৫২।

২৭ চট্টগ্রামের ইতিহাস : (পুরানা আমল) পৃ. ৭৫।

২৮ History of Burma : Harvey, Pp 371 - 72.

২৯ Ahadisul Khawanin : JASB 1871, 1872.

* ধবল ও অরুণ গজেশ্বর উপাধি বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক। এটি আরাকান রাজের উপাধি। কারো কারো অনুমান হয়তো নিজাম শাহ সুর এই রাজাকে তাড়িয়ে তাঁর ধবল অরুণ গজেশ্বর উপাধি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। তা না হলে কবির পিতা ও কবিকে দৌলত উজীর উপাধি বা পদ দিতে পারতেন না।

৩০ ক. লায়লী মজনু, ভূমিকা : বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৫৭।

খ. কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য : সাহিত্য পত্রিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৯।

গ. বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৬ সন।

ঘ. রাগতাল-নামা– ফাজিল, নাসির, আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি, কবি চুহর, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬০-৬২।

৩১ ক. Baharistan Ghaybi : Mirza Nathan Ed. by Dr. M. I. Borah; Vol. I Pp 407, 409. Vol. II, p. 842.

খ. কবি দৌলত উজির ও কবি মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য। সাহিত্য পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, পৃ. ২০৮-০৯, ১৩৬৯ সন।

৩২ History of Burma : Havrey, p. 140.

৩৩ History of Bengal Vol. II, D. U. Pp 173-74.

৩৪ Arakan : A. B. M. Habibullah, JASB, 1945.

৩৫ Catalogue of Indian Coins : S. Lane Poole. p. 56.

৩৬ ক. রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ. ৫৭-৫৮।

খ. History of Bengal : D. U. Vol. II.

৩৭. Bengal Cheifs' Struggle : Dr. N. K. Bhattasali; Bengal : Past and Present, July-dec, 1929,

৩৮ JASB-1950, p 218.

৩৯ ক. Analysis of Rajmala : Long, JASB, 1850.

খ. রাজমালা : কালিপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত : ২য় তরঙ্গ, পৃ. ৭১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০ Ain-I-Akbari : Vol. II, p 152, Jarret, annoted by J. N. Sarkar 1949.

৪১ ক. Eastern Bengal Gazetteers : Chittagong, O' Mallay.

খ. Studies in Mughal India- J. N. Sarkar, p. 122.

গ. রাজমালা–সিংহ, পৃ. ৩১৬।

ঘ. Fatheyya-I-Ibriyya : S. Talish (continuation : J. N. Sarkar).

৪২ ক. Early Travels in India : Ed. W. Foster. p. 26.

খ. Travels of F. S. Manrique : Vol. 1, p. 94.

৪৩ Bengal in the Sixteenth Century : S. N. Dasgupta. Pp 141-42—গ্রন্থে উদ্ধৃত।

৪৪ ক. Bengal : Past and Present; July-Dec, 1929, Bengal Chiefs' struggle : N. K. Bhattasali .

খ. রাজমালা। কৈলাস সিংহ, পৃ. ৩১৭, ১৫৩২ শকে এ যুদ্ধ ঘটে বলে উল্লেখ রয়েছে। তারিখটা ভুল।

৪৫ Ain : Jarret, anoted by J. N. Sarkar, 1949, p. 132.

৪৬ ক. Sher Shah, p. 138 : Dr. K. R. Qanungo, 1921.

খ. History of the Portuguese in Bengal : J. J. A. Campos, 1919, Pp 30. 36-38, 40, 43.

গ. Arakan : Dr. A. B. M.-Habibullah : JASB, 1945.

৪৭ চট্টগ্রামে পাঠান রাজত্ব : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৫৪ সন, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

৪৮ ক. রাজমালা : সিংহ, পৃ. ১৭০, ৩১৭।

খ. আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি—এতিম কাসেম, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে।

গ. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ : (ভূমিকা)।

৪৯ The voyage in Francois Pyvard : Trans : by Albert Gray Vol. I, Pp 326, London Hakluyt Society, 1887.

৫০ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০ সন, পৃ. ১৬।

৫১ Travels of Friar Manrique (1629—35) Oxford, 1927, Vol. I, Pp XLXVI-LI.

৫২ আলাউলের আত্মকথা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, History of Burma - Harvey : History of Bengal, K. U. Vol. II.

৫৩ Proceedings of the Pakistan History Conference, 2nd Session 1952, p. 270-M. H. Siddique.

৫৪ JASB, 1922-Dr. James Wise.

৫৫ Jobson.

৫৬ History of Bengal Vol, II, D. U. p. 360.

৫৭ History of Bengal Vol. II, D. U. p. 379.

৫৮ Fria Y Sousa III, p. 268

৫৯ The Land of the great Image etc. Pp. 78-79, 86-89, 96. .

৬০ The Feringi Pirates of Chatgaon, 1665 A. D. : J. N. Sarkar, JASB. 1907, pp 419-25, [Source; Fathyya-I-Ibriyya (continuation) by Shiahabuddin Talish.]

৬১ Talish and History of Bengal, Vol. II, D. U. Pp. 379-80.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

চট্টগ্রামে সংস্কৃতির বিকাশ

জন পরিচিতি

রমাপ্রসাদ চন্দ[১] প্রমুখ অনেকেই বাঙলার নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। S. B. Guha[২] গোটা ভারতে ছয়টি প্রধান গোত্রের এবং নয়টি উপগোত্রের মানুষের মিশ্রণ ঘটেছে বলে মনে করেন। তাঁর মতে ১. Negrito ২. Proto-Australoid ৩. Mongoloid ক. Palaco Mongoloids : (দুই শ্রেণীর Long headed & broad headed) খ. Tibeto-Mongoloids ৪. Mediterranean (Dravidians) ক. Palaco-Mediterranean খ. Mediterranean গ. The so-called Oriental types ৫. Western Brachycephals ক. Alpinoid খ. Dinaric গ. Armenoid ৬. Nordic.

এরা সবাই বহিরাগত। এদেশের আদি বাসিন্দা কারা ছিল, তা আজো জানা যায়নি। বাঙলায়ও মোটামুটি সব জাতের লোকের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে প্রথম তিন শ্রেণীর লোকেরই আধিক্য দেখা যায়।[৩] Negrito গোত্রের লোকেরা আফ্রিকা থেকে আরব-ইরানের ভেতর দিয়ে আসাম অবধি গোটা ভারতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ভারত অতিক্রম করে আন্দামান, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশ হয়ে নিউগিনি অবধি পৌঁছেছিল। অথবা মাদারগাস্কার থেকে নিউজিল্যান্ড অবধি পরিব্যাপ্ত ও অধুনালুপ্ত দ্বীপপুঞ্জ হয়ে তারা অস্ট্রেলিয়া অবধি বসতি স্থাপন করে। Negrito-র পরে পরে প্রবেশ করে Proto-Australoid বলে আখ্যাত Eastern Mediterranean area [পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয়] অঞ্চলের জনগণ। হিন্দুর কর্মবাদ তথা জন্মান্তর-তত্ত্বও এদেরই দান বলে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন।[৪] এরাও ভারত হয়ে সারা পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশের কোল, মুণ্ডা, খাসি গোত্রের ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডারী, হো, কোর্কু, শবর, গদব প্রভৃতি তাদেরই ভাষা। এখানেই শেষ নয় বর্মা থেকে নিউজিল্যান্ড অবধি অনেক ভাষাই এদের দান।[৫] এরা আমাদের জাতি পরিচয়ে নিষাদ, কোল, ভিল, শবর ও পুলিন্দ নামে অভিহিত।

এর পরে সম্ভবত Mediterranean তথা দ্রাবিড়েরা পাক-ভারতে প্রবেশ করে। অনুমিত হয় যে ময়েন জো দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা তাদেরই। আর্যরা তাদের দাস ও দস্যু বলেই জানত, ইরানেও তারা এ নামেই পরিচিত (Daha ও Dahyu)।[৬] ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব-উমা, বিষ্ণু-শ্রী, যোগতত্ত্ব, মন্দির উপাসনা, নারীদেবতা, জন্মান্তর তত্ত্ব, প্রতিমাপূজা, বৈরাগ্য, বৃক্ষপূজা, পশু-পাখির পূজা প্রভৃতি এদের থেকেই পাওয়া।[৭] আর্যনামে অভিহিত প্রথম প্রবাহের Nordic-রা গুজরাটে, মারাঠা অঞ্চলে এবং বাঙলা দেশেই অধিক সংখ্যায় বাস করত।[৮] দ্বিতীয় প্রবাহের আর্যভাষী Nordic-রা প্রধানত আর্যাবর্তে তথা উত্তর ভারতেই থেকে যায়। বাঙলাদেশে তাদের সংখ্যা নগণ্য।[৯] তৃতীয় প্রবাহে যে Short-headed Mongoloid-রা এসেছিল, তারা বর্মা হয়ে আরাকান ও চট্টগ্রামে ছড়িয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পগাঁ (পুকম, অরিমর্দনপুর) ও পট্টিকের রাজ্যের মধ্যে আমরা আনোরহটার আমলে যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছি,[১০] তাতে মনে হয় ভোট-চীনা গোত্রের লোকেরা কাছাড় থেকে বর্মা অবধি বিস্তৃত অঞ্চলে অনেককাল সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিল। চট্টগ্রামের ভাষার উপর বিশেষ করে ধ্বনি বিকৃতির দিক দিয়ে, ভোট-চীনা ভাষার প্রভাব লক্ষণীয়।[১১] বিদ্বানদের মতে, আসামের খাসি এবং বর্মার Mons অথবা Talaing-দের (এরা মূলত দাক্ষিণাত্যের তেলঙ্গ) জ্ঞাতিশ্রেণীর অস্ট্রো-এশীয় জনগোষ্ঠীই সম্ভবত আরাকান-চট্টগ্রামের আদিবাসী। এদের সঙ্গে পরে এসে মিশেছে ভোট-চীনা জনগণ। তারা এসেছে কুমিল্লা-নোয়াখালী হয়ে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে এসেছে কুকি-চীনা। অনেককাল পরে, বারো শতকের দিকেই সম্ভবত বর্মী Mranma গোষ্ঠীর মানুষেরা আরাকানে অনুপ্রবেশ করে।[১২] বৈশালী, ধান্যবতী, হংসবতী (পেগু), আনোরহটা (অনিরুদ্ধ বা অনুরুদ্ধ) এবং বৈশালী-ধান্যবতীর রাজাদের সংস্কৃত নাম, ভারতীয় বর্ণমালা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা, গণধর্ম হিসেবে বৌদ্ধমত গ্রহণ প্রভৃতি থেকে বোঝা যায় অযোধ্যা ও বিহার অঞ্চল থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হওয়ার আগেই সেখানে উপনিবিষ্ট হয়।[১৩]

ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অস্ট্রো-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দান সর্বাত্মক এবং অপরিমেয়। এ বিষয়ে বহু বিদ্বানের নানা আলোচনা রয়েছে।[১৪] আমরা কেবল ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত করে এর আভাস দেয়ার চেষ্টা করব :

> It is now becoming more and more Clear that the Non-Aryan Contributed by far the greater portion in the fabric of Indian Civilisation, and a great deal of Indian religious and cultural traditions. of ancient legend and history, is just non-Aryan Translated in terms of Aryan speech, ... the ideas of Karma and Transmigration, the practice of yoga. the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Visnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the vedic ritual of Homa ---all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin; a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is pre-Aryan; much of our material culture and social and other usages; e. g. the cultivation of some of our most important plants like rice, and some vegetables and fruits like Tamarind and Coconut, etc, the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of out popular religion, most of our folkcrafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and Turmeric and many other things would appear to be legacy from our pre-Aryan ancestors.[১৫]

এরপরেও বহু মানুষের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক মিলন-ময়দান চট্টগ্রামে লোক-সংস্কৃতির আরো বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল বলে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

॥ ২ ॥

সুপ্রাচীনকাল থেকেই যে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বন্দর ছিল, আজকাল তা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। খ্রীস্টীয় প্রথম শতক থেকেই ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে চট্টগ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সে সংবাদ Periplus of the Erythrean Sea গ্রন্থে পাই।[১৬] Strabo বলেছেন, রোমানেরা গঙ্গার মুখ অবধি যেত এবং ওখানকার দূত রোমান সম্রাট Augustus-এর কাছে এসেছিল।[১৭] এমনকি গ্রীকরাও আসত :

> Inside the Bay of Bengal, they (Greeks) knew the mouth of the Ganges and a few adventureres had sailed to the Mala Peninsula-The golden Chersonese'. Beyond this a certain Alexander had penetrated to the post of cattigara... Indian ships voyaging to the Ganges called Colandia.

আরব ইরানের সাথেও এমনি বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা সোলায়মান প্রমুখ আরব ভৌগোলিকের বিবরণ থেকে জানা যায়। এমনকি চাটগাঁও নামটিও নাকি আবরদের দেয়া (শাৎ-ই-গাঙ)। চৌদ্দ-পনেরো শতকে চীনাদের সঙ্গেও এদেশের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের দলিল মেলে। চট্টগ্রামের জলযান সাম্পান-এর অবয়ব ও নাম দুটোই চীনাদের থেকে পাওয়া। চীনারাজদূত চেঙ্গহোর (১৪০৫) দোভাষী (Interpretor) ছিলেন মাহুয়ান, তিনি বলেছেন, অনুকূল পবনে সুমাত্রা থেকে চট্টগ্রাম (Chahtigam) পৌঁছা যেত।

চট্টগ্রামী নাবিকের খ্যাতিও সুপ্রাচীন। সতেরো শতকের দ্বিতীয় পাদে Friar Manrique পর্তুগীজ বাণিজ্যতরীর বর্ণনায় বলেছেন :

> The Captain, master pilot were Portuguese, the crew Moslems the passengers Indians of various types some of the passengers being the wives of the crew.[১৮]

AMARBOI.COM

এ সব নাবিকদের (মাল্লাদের) মধ্যে চট্টগ্রামীও ছিল বলে অনুমান করি। পরবর্তীকালে মঘ ও মুঘল নওয়ারা গড়ে উঠে চট্টগ্রামী নাবিক দিয়েই।[১৯] আজো চট্টগ্রামী নাবিকেরা নীলসমুদ্রের ডাক অবহেলা করে না। এমনি করে দুনিয়ার এক প্রান্তের চীন থেকে অপর সীমার রোম কিংবা পর্তুগাল অবধি সে-যুগের সভ্যজগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বন্দর এলাকায় বন্দর জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ, বহু মানুষের রক্তের মিশ্রণে এবং বিচিত্র সংস্কৃতির স্পর্শে চট্টগ্রামের লোকের মনের দিগন্তও প্রসারিত হয়েছিল। সে বিষয় পরে আলোচিত হবে।

॥ ৩ ॥

আর্যবর্জিত অঞ্চল বলে (আসলে বৃষ্টিবহুল জলাভূমি বলে) বাঙলা দেশ অনেককাল উত্তর ভারতীয়দের কাছে অবজ্ঞাত ছিল। বৌদ্ধাধিক্যই সম্ভবত এ অবজ্ঞার অন্যতর কারণ। বর্ণবিহীন বৌদ্ধ সমাজের লোকেরা ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হওয়ার পর আদিশূর নামে কোনো এক রাজা বাঙলা দেশে কৌলিন্য প্রথার তথা সমাজে বর্ণ বিন্যাসের প্রবর্তক বলে জনশ্রুতি আছে। তবে আদিশূরের ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত নয়। যা হোক, এতে অন্তত এ ধারণা করা সম্ভব যে বল্লাল সেনের পূর্বেই এখানে বর্ণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত দশ শতকের দিকে পাল প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার মুখে ব্রাহ্মণ্য রেনেসাঁসের উন্মেষ হতে থাকে, তখনই হয়তো আদিশূর নামের কোনো সামন্তের নেতৃত্বে এদেশে মেল-বন্ধনের মাধ্যমে নির্জিত ব্রাহ্মণ্য সমাজে চেতনা ও শক্তি সঞ্চারিত হতে থাকে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজাদর্শ গ্রহণের ভিত্তিতে। তারপর বল্লাল সেন একে দৃঢ়মূল ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়াস পান। সেনেরা দাক্ষিণাত্যের লোক হলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির গোঁড়া পূজারী ছিলেন। এ ব্যাপারে বল্লাল সেনই ছিলেন বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উগ্র ও উৎসাহী। তিনি উত্তর ভারতীয় অভিজাত, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এনে দেশ ও জাতির আভিজাত্য-গৌরব বৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নে বিশেষ তৎপর ছিলেন। বল্লাল সেনের অভিপ্রায়ে পূর্ণতা দান করেন পরবর্তীকালের ঘটক দৈবকী, ধ্রুবানন্দ, নুলুপঞ্চানন প্রভৃতি। কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই, রাখা-ঢাকার একটি কৃত্রিম প্রয়াস। কেননা নির্বর্ণ বৌদ্ধ সমাজ ভেঙ্গে বর্ণাশ্রিত সমাজ বিন্যাসের নীতিটাই কৃত্রিম আর পদ্ধতিটাও কাল্পনিক। বল্লাল-চরিত-ধৃত কাহিনীগুলো এ সাক্ষ্যই বহন করে।

॥ ৪ ॥

বাঙালী মুসলমানের অধিকাংশই এদেশের ধর্মান্তরিত হিন্দু-বৌদ্ধ অধিবাসী। এদের মধ্যে উচ্চবর্গের চাইতে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও বৌদ্ধের সংখ্যাই ছিল বেশি।[২০] তুর্কী, আফগান ও মুঘল শাসনকালে তুর্কী-আফগান-মুঘল-ইরানী-আরব ও মধ্য এশিয়ার নানা গোত্রের কিছু কিছু লোক এদেশে এসে স্থায়িভাবে বাস করেছে। বারবক শাহর আমলে (১৪৫৯-৭৬ খ্রী.) এদেশে রাজকার্যে ও সৈন্যবিভাগে বহু হাবসীও নিযুক্ত হয়। ইরানে সাফাভী বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছু সংখ্যক ইরানী শিয়াও মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য শাসনকেন্দ্রে বসতি করতে থাকে। কিন্তু এ শ্রেণীর বা তাদের অনুগ্রহপুষ্ট অনুচর শ্রেণীর বিদেশাগত সব মুসলমান এদেশে শেষাবধি থাকেনি। ইংরেজ কোম্পানির বাঙলা-বিহারে অধিকার প্রতিষ্ঠার সময়ে অনেকেই উত্তর ভারতে হিজরত করে।[২১] এদেশে স্থায়িভাবে বাস করতে ওদের অনিচ্ছার আর একটি কারণ এই যে, নদী-নালা-খাল-বিল পূর্ণ, ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা উপদ্রুত বাঙলাদেশটি বিদেশী মুসলমানরা পছন্দ করত না। তাদের স্বাস্থ্যও টিকত না। ইবন বতুতা বলেছেন, খোরাসানীরা বাঙলাকে দোজখ-ই-পুর নিয়ামত (Hell of all good things) বলে মনে করত।[২২] হুমায়ুন যখন জাহিদ বেগকে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, তখন তিনি অনুযোগ করেছিলেন Your Majesty could not find a better place to kill me than Bengal.[২৩] গৌড়-বিজেতা মুনিম খান (১৫৭৫-৭৬) ও তাঁর সৈন্য টাঙ্গায় ও গৌড়ে বর্ষায় আর মহামারীতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। আকবরনামায় এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।[২৪] শাহজাদা সুজাও বাঙলার আবহাওয়ায় তাঁর ও তাঁর সন্তানদের স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার কথা শাহজাহানকে জানিয়েছিলেন।[২৫]

কাজেই বাঙলাদেশের বিদেশী মুসলমানের বংশধর তুলনায় বেশি নয় এবং নিম্নবর্ণের সংখ্যাই অধিক। তার প্রমাণ মুসলিম সমাজের বাউলের সংখ্যাধিক্য। কিন্তু তাই বলে এ ধারণাও সত্য নয় যে বাঙলা দেশের মুসলমানরা সব নিম্নবর্ণের হিন্দুর বংশধর। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরক্ত আজকের মুসলিম ধমনীতে একেবারে কম নয়। বৃন্দাবন দাস বলেছেন :

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।[২৬]

আমরা জানি, সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, ঈসা খান থেকে খণ্ডলের (ফেনীর) শমসের গাজী অবধি অনেকেই হিন্দু কন্যা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কালাপাহাড়, পিরালি মুসলিম, শাহজাদপুরের রাজারায়, মুর্শিদকুলি খান, কালিদাস গাজদানী, গণেশ পুত্র জালালুদ্দীনের আদেশে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ-মুসলিম প্রভৃতির কথাতো ইতিহাস সূত্রেই মেলে। এ ছাড়া, ধর্ষণে-হরণে,[২৭] বৈধব্য এড়ানোর আশায় এবং বিবাহসূত্রেও বহু বর্ণ-হিন্দুনারী মুসলমান হয়েছে। আর শাসক গোষ্ঠীর অনুগ্রহ লোভে এবং পীর ফকিরের মহিমামুগ্ধতায়ও যে বহু হিন্দু মুসলমান

হয়েছে, তা বাউল মুসলমানের আধিক্য এবং বৌদ্ধ যোগ-দেহতত্ত্বের চর্চার মুসলিমের আগ্রহের মধ্যে আজো পষ্ট হয়ে আছে।

বাঙলা-বিহারের বিলীয়মান নির্জিত বৌদ্ধদের প্রায় সবাই (কেবল ধর্মঠাকুর পন্থী এবং নাথ পন্থীরা ছাড়া) ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে ঐতিহাসিক কারণে বিশ্বাস করা চলে। নিরঞ্জনের রুস্মাতে সেই আভাসই আছে। কাজেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় এদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেড়েছিল, তার উপর বহুবিবাহ ও বিধবা বিবাহ মুসলিম জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসেবে ধরা যায়। ক্রীতদাসী ও যুদ্ধে বন্দিনী নারী সম্ভোগে শরীয়তের অনুমোদন থাকায়, মুসলিম রাজন্য, আমীর, সামন্ত ও ধনীর বেপরওয়া নারী সম্ভোগে অধিকার ও উৎসাহ ছিল। নওয়াব আলীবর্দী ব্যতীত কোনো সুলতান-সুবাদার-নাওয়াব একপত্নীক ছিলেন বলে আমাদের জানা নেই। সৈয়দ গিয়াসুদ্দীন মাহমুদ শাহর (১৫৩৩-৩৮) নাকি ১০,০০০[২৭ক] এবং নওয়াব সরফরাজ খানের ৫০০ রক্ষিতা ছিল। বিপ্রদাস পিপিলাই (১৪৯৫) বলেন :

শতেক বিবির সঙ্গে হাসান আনন্দে রঙ্গে
রভসে নিবসে সর্বক্ষণ।
অথবা, নিকা-বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদা খোসালিত অতিশয়।

সমকালীন হিন্দুর চক্ষে সাধারণ মুসলিম জীবন এরূপই ছিল। বার্বোসা বলেন,ওঊাবংড়হব যধং ঃযৎবব ড়ৎ ভড়ঁৎ রিাবং ড়ৎ ধং সধহু ধং যব পধহ সধরহঃধরহ। হিন্দু সমাজেও বহুবিবাহ চালু ছিল, কিন্তু তা ধনী ও কুলীনের মধ্যেই ছিল সীমিত।

বলেছি, সুপ্রাচীনকাল থেকেই চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দর। সেকালে সমুদ্রে ইচ্ছেমত বাণিজ্যতরী ভাসানো যেত না। দুর্যোগমুক্ত অনুকূল পবনের জন্যে অপেক্ষা করতে হত। কাজেই এক একটি বাণিজ্যতরী কয়েক মাস ধরেই চট্টগ্রামে থাকত। মানুষ বেচা-কেনার সে যুগে নাবিক ও বণিকরা যে নারী সম্ভোগ করেনি, তা বলা যাবে না। অতএব, চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় নানা বিদেশীর ঔরসজাত সন্তান থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া ইরানীদের অধিকাংশই শিয়া। তারা 'মো তা' (সাময়িক) বিয়েতে উৎসাহী ছিল। ইবন বতুতার নিজের উক্তিতে প্রকাশ, তিনি নানা স্থানে বিয়ে করেছিলেন। বিশেষ করে পর্তুগীজদের দেশী স্ত্রী গ্রহণের ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।[২৮] কাজেই আরব, ইরান ও অন্যান্য দেশের নাবিক-বণিকের বংশধর চট্টগ্রামে যে ছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা হলে মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায় আরব-ইরানীর ঔরসজাত সঙ্কর মুসলিম ছিল বলে বিশ্বাস করা চলে। এ প্রসঙ্গে দ্য বারোজ বর্ণিত আরব বণিকের চট্টগ্রামে সৈন্যদল গঠন, উড়িষ্যাযুদ্ধে গৌড়-সুলতানকে সাহায্যদান এবং গৌড়ে সুলতান হওয়ার বিবরণ স্মর্তব্য।

মুনিম খানের আমলে (১৫৭৬ সনে) গৌড়ে যে মহামারী দেখা দেয়, তার ফলে বহু গৌড়ীয় হিন্দু-মুসলমান চট্টগ্রামে পালিয়ে আসে। তারা আজো 'গৌড়িয়া' বলে আত্মপরিচয় দেয় এবং সে কারণে আভিজাত্য দাবি করে। এ সময়ে কররানীদের পদস্থ কর্মচারী ও আমীর বংশীয় লোক রোসাঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন বলেও লোকশ্রুতি আছে। অনুমান করি, এমনি রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজরোষ ও মহামারীর কালে ইতিপূর্বে এবং পরেও গৌড়িয়া লোকের প্রবাহ চট্টগ্রামে প্রবেশ করে।

সাগর বেষ্টিত ও পর্বত শোভিত চট্টগ্রাম পীর-ফকিরেরও বাঞ্ছিত ভূমি ছিল, তাই এ রম্যভূমে বহু পীর-ফকির যেতেন এবং থাকতেন। সে জন্যেই বারো আউলিয়ার সাধন পীঠরূপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টগ্রামের খ্যাতি আজো অম্লান। চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে, সমুদ্র পথে হজ্‌যাত্রার রেওয়াজ চালু হওয়ার পর চট্টগ্রামে পীর-ফকির ও আলিমের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। এ কারণেও সম্ভবত চট্টগ্রামে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। এমনি নানা কারণে চট্টগ্রামে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ে। আর কালে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামেও বৌদ্ধধর্ম কালে লোপ পায়। এখনকার চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের সবাই আরাকানীদের বংশধর। আরাকানী শাসনকালেই নানা উপলক্ষে এদের পূর্বপুরুষরা এদেশে বসবাস করে।

চট্টগ্রামে শাসনপদ্ধতি

প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থা

চট্টগ্রামের প্রাচীন শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কোথাও নেই। হিউ এন সাঙের বর্ণনায় পাই চট্টগ্রাম সমতট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[২৯] এবং সমতটে খড়গ ও বর্মণ বংশীয় রাজারাও রাজত্ব করেন। কাজেই তাঁরা হয়তো চট্টগ্রামেরও অধিপতি ছিলেন।[৩০] পাল আমলের শেষের দিকে চন্দ্র রাজারা পট্টিকের রাজ্য শাসন করতেন। চট্টগ্রামও পট্টিকের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তারানাথ রচিত ইতিহাসসূত্রে আমরা এ সংবাদ পাই।[৩১] এই চন্দ্ররা সম্ভবত ধান্যবতী ও বৈশালীর চন্দ্র রাজাদের জ্ঞাতি ও সামন্ত বংশীয় ছিলেন।[৩২] এঁদের আগে ধান্যবতী ও বৈশালীর আরাকানী চন্দ্র রাজারা[৩৩] এবং সম্ভবত কিছুকাল পগাঁ রাজারা[৩৪] আর কিছুকাল দামোদর দেববংশীয়েরা[৩৫] চট্টগ্রামে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন।

এঁদের কারো শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই। তবে মুসলিম বিজয়ের পূর্বে খড়গ, বর্মণ, চন্দ্র ও দেববংশীয়দের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পূর্বতন আরাকানী এবং গুপ্ত ও পালদের শাসন পদ্ধতির অনুকৃতি থাকা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। গুপ্ত, পাল ও সেনদের শাসন-ব্যবস্থার কিছু কিছু তথ্য মেলে।[৩৬] মুঘলপূর্ব গৌড়ীয় শাসন-রীতির তথ্যও নিতান্ত বিরল নয়। বারনী ও মিনহাজের ইতিহাস এবং উৎকীর্ণ লিপি থেকে এর একটি স্থূল ধারণা পাওয়া যায়।[৩৭] ত্রিপুরারাজ রত্নফাও তাঁর রাজ্যে গৌড়ীয় শাসনপদ্ধতি চালু করেন বলে রাজমালা সূত্রে জানতে পাই।[৩৮] অতএব, চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মতোই ছিল বলে অনুমান করা যায়।

সুর ও কররানী শাসনকালে (১৫৪০-৭৫) সরকার চট্টগ্রামের রাজস্ব শেরশাহী দামে[৩৯] গৃহীত হত। সরকার চট্টগ্রাম সাতটি মহালে বা রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত ছিল। সৈন্য ছিল : ১০০ অশ্বারোহী ও ১৫০০ পদাতিক বং রাজস্ব ছিল ২৮৫৬০৭ টাকা ৩০ দাম।[৪০]

বাঙলা সাহিত্য সূত্রে রাজকর্মচারীর ও খ্যাতনামা ব্যক্তির কোন কোন পদবীর সন্ধান মেলে : মজলিস-ই-আলা,[৪১] লস্কর পরাগল খান,[৪২] মসনদ-ই-আলা (মছলন্দ),[৪৩] দৌলত উজির মোবারক খান ও বাহরাম খান,[৪৪] সদরজাঁহা আবদুল ওহাব,[৪৫] নানুরাজা মহল্লিক, কাজী, মুহুন্দার[৪৬] (মজুমদার) প্রভৃতি। সেকালে জায়গীর দান করা হত। জায়গীর শিকে বিভক্ত ছিল। উজির হামিদ খান গৌড়-সুলতান হোসেন শাহ থেকে চট্টগ্রামে দুই শিক-পরিমিত জায়গীর ইনাম পেয়েছিলেন।[৪৭]

বাঙলা কাব্যে নানা যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ পাই। অবশ্য অধিকাংশই প্রাচীন কবি প্রসিদ্ধিজাত। তীর, ধনু, শেল, গুর্জ, সিফর (ঢাল), ভিন্দিপাল, তেগ, খঞ্জর, শমসের, গদা, তরবারি, খড়গ, শূল, নেজা, ভূষণ্ডি, নারোচ, নালিকা, মুদগর, কৃপাণ, চক্র, ভল্ল। বাণ ছিল বিভিন্ন প্রকারের—বক্র, ক্ষুর, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, উল্কা, শিলামুখ, সূচিমুখ প্রভৃতি।[৪৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরাকানী শাসননীতি

আরাকানের শাসনরীতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছুই জানা যায় না। তবে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বাবধি আরাকানরাজ চট্টগ্রামে সাধারণত মুসলিম প্রশাসকই নিযুক্ত রাখতেন। এই প্রশাসক উজির নামে অভিহিত হতেন। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে আরাকান-ত্রিপুরায় যে যুদ্ধ হয়, তাতে চট্টগ্রামের উজির জালাল খান সম্ভবত কর্তব্য পালনে ত্রুটি করেছিলেন। তখন থেকেই আরাকানরাজেরা চট্টগ্রামের শাসনভার তাঁদের পুত্র, ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের উপর অর্পণ করতেন। আর উজিরকে তাঁর অধীন করে দিলেন। পরাগল খানের সময় থেকে (১৫১৭) রাস্তিখান বংশীয়গণই–হামজা খান, নসরত খান, জালাল খান, ইব্রাহিম খান (১৫৮০) উজির ছিলেন বলে মুহম্মদ খানের 'মক্তুল হোসেন' কাব্যসূত্রে জানা যায়। কাজী দৌলত ও আলাউলের বর্ণনায় প্রকাশ, আরাকান রাজের কয়েকজন মুসলমান মন্ত্রী থাকতেন। ১৬২২-৮২ অবধি যে রোসাঙ্গ রাজের মুসলিম মন্ত্রী ছিল তার নিশ্চিত প্রমাণ মেলে এঁদের কাব্যে। আরাকানরাজ মসাউ মঙ (১৪০৪-৩৩) গৌড়ে প্রায় ছাব্বিশ বছর ছিলেন। তিনিই ম্রোহং বা রোসাঙ্গকে রাজধানী করেন এবং মুসলিম কর্মচারীর সহায়তায় গৌড়ে-লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গৌড়ীয় রীতির শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন বলে অনুমান করি। কারণ, তাঁর আমল থেকেই রাজা ও রাজপরিবারের লোকেরা মুসলিম নাম গ্রহণেও মোহে পড়েন। তাঁর ভাইয়ের নাম আলি খান, পরবর্তী রাজাদের কলিমা শাহ, হোসেন শাহ, যৌবক শাহ, সেলিম শাহ প্রভৃতি নামে পাই। মুদ্রাঙ্কনে এবং মুদ্রামান নির্ণয়েও গৌড়ীয় রীতি গৃহীত হয়। মুদ্রায় ফারসি হরফের ব্যবহার এবং কলেমা উৎকীর্ণ থাকত। কাজেই রোসাঙ্গে গৌড়ীয় মুসলিম শাসনপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

রত্নফা ও রত্নমাণিক্যও গৌড়দরবারের প্রভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে গৌড়ীয় রীতির শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তবু এক এক দেশের ধর্ম, লোকাচার, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সমাজাদর্শ, লোকচরিত্র এবং ধন-সম্পদ, জীবিকা-বৈচিত্র্য প্রভৃতিরও প্রভাব থাকে প্রশাসনিক ব্যবস্থায়। সে হিসবে আরাকান অথবা ত্রিপুরার রাজারা গৌড়ীয় শাসন-রীতির অনুকরণ করলেও তাঁদের স্বকীয় বিধিব্যবস্থাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তাই আমরা চট্টগ্রামে ঠাকুর, সাধা, পাঁঝা, খোয়াজা, ছুয়ানা, রোয়াঁঝা, সাদিউক, নবরাজ, উজির, মগটরে প্রভৃতি পদ ও উপাধিকর সন্ধান পাই। আজো কর্ণফুলীর পূর্বতীর থেকে টেকনাফ অবধি অঞ্চলে বহু অভিজাত পরিবার ঠাকুর, (তুল : শ্রীবড় ঠাকুর, মাগন ঠাকুর) সাধা, পাঁঝা প্রভৃতির বংশধর বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করে। কক্সবাজার মহকুমার অনেক গ্রামের নামও আরাকানী [যথা ফালঙ, সোয়াঙ]। ঠাকুর পদ (যুবরাজের পরেই) পরবর্তীকালে ত্রিপুরায়ও সৃষ্টি হয়। আরাকানী প্রবর্তিত মঘীসন আজো চলে। এটি খ্রীস্টাব্দ থেকে ৬৩৮ বছর কম। আরাকানরাজ মঙ বেঙ (১৫৩১-৫৩) প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থায় ৪০ শতাংশে এক কানি এবং ১৬ কানিতে একদ্রোণ হয়। তাও নিযামপুর পরগনা ছাড়া গোটা চট্টগ্রামে আজো অপরিবর্তিত রয়েছে। রোসাঙ্গেও কাজীর পদ ছিল ['সৈয়দ আসউদ শাহ রোসাঙ্গের কাজী'– আলাওল]।

সমাজ ও সংস্কৃতি

চট্টগ্রামের শাসকশ্রেণী

চটগ্রাম ঘন ঘন হাত বদল হয়ে আরাকান, ত্রিপুরা ও গৌড় শাসনে ছিল। এখানে পর্তুগীজদের আড্ডা ছিল। এখানে বারবার রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়েছে। এবং আক্ষরিক অর্থেই উলুখড় প্রাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়েছে। জনগণের গায়ে তার চোট বিশেষ লেগেছে বলে মনে হয় না। লাভের বন্দর অঞ্চল চট্টগ্রাম লোভের ছিল বলে, যুদ্ধে দেশ দখল করে, দেশবাসীর হৃদয় জয়ের মাধ্যমে রাজারা প্রাপ্ত অধিকার স্থায়ী করবার প্রয়াসী ছিলেন বলে মনে হয়। তাই চট্টগ্রামে রচিত কোনো গ্রন্থেই শাসকের উৎপীড়নের কথা নেই। পর্তুগীজেরা চট্টগ্রামে ও সন্দ্বীপে আড্ডা গেড়েছিল। তারা বাঙলার সমুদ্রে, উপকূলাঞ্চলে এবং নদী-তীরবর্তী গাঁয়ে ও বন্দরে ধন-সম্পদ ও মানুষ অপহরণ করত, কিন্তু আড্ডাস্থলে চট্টগ্রামবাসীর উপরে সে অত্যাচার করত না। তাদের জালিয়াদি তরীর নাবিক থাকত চট্টগ্রামবাসী, বিশেষ করে আরাকানরাজের সঙ্গে তাদের হৃদ্যতা স্থাপিত হওয়ার পর আরাকানরাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে লুণ্ঠন, মানুষ অপহরণ বা অন্য প্রকার উৎপীড়ন চালাবার প্রয়োজন আর অধিকারও তাদের ছিল না। আরাকানরাজ বিরূপ হওয়ায় সন্দ্বীপে গঞ্জালিসের রাজত্ব এবং দেয়াঙ্গের পর্তুগীজ বসতি নিশ্চিহ্ন হয়। এক সময় আরাকানরাজেরা পর্তুগীজদের দস্যুবৃত্তির সহায়ক ছিলেন, তখন আরাকানীরাও ('মঘের মুলুক' সে দৌরাত্ম্যের স্মারক) পর্তুগীজ দস্যুদের সহযোগী ছিল। আরাকানরাজ অপহৃত দ্রব্যের ও মানুষের অর্ধেক পেতেন। যেসব অপহৃতলোক আরকানরাজের ভাগে পড়ত, তাদের কৃষিকার্যে নিয়োগ করা হত, পর্তুগীজদের ভাগের লোক খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে দাসরূপে বিক্রীত হত।

চট্টগ্রামে অনেককাল রাস্তি খান ও তাঁর বংশধরগণ শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। এঁরা চট্টগ্রামবাসী ছিলেন বলে, শাসিত জনের প্রতি তাদের কর্তব্যবোধ ও স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল বলে মনে হয়। পুরুষানুক্রমে প্রশাসকের পদপাপ্তি থেকেও এদের দক্ষতা ও সুশাসনের ইঙ্গিত মেলে। এদিকে আরাকানরাজ মুসলিম মন্ত্রীও রাখতেন। আশরাফ খান, শ্রী বড়ঠাকুর, মাগনঠাকুর, সৈয়দ মুসা, সোলায়মান, নবরাজ মজলিস প্রভৃতির নাম কবি আলাউলের কাব্য সূত্রেই মেলে। এঁদের অনেকেই ছিলেন চট্টগ্রামবাসী। সে কারণে আরাকানী শাসনে চট্টগ্রামবাসী নিপীড়িত না হওয়ার কথা। ১৪৩০ সনে গৌড়-সেনাপতি ওয়ালী খান কর্তৃক মঙ সাউ মঙ আরাকান সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে রাজধানী রোসাঙ্গে কাজীও নিযুক্ত হন। আলাউলের বর্ণিত রাজা চন্দ্র সুধর্মার অভিষেক উৎসবে মুসলিম মুখ্যমন্ত্রী নবরাজ মজলিস শপথ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। অভিষেক অন্তে রাজা মন্ত্রীকেও (গুরুজন হিসেবে) সালাম করলেন। সীমান্তে সেনানী পরাগল খান ও তাঁর পুত্র ছুটি খানের সাহিত্য-প্রীতির কথা সবাই জানে। ফখরুদ্দীন মুবারক শাহর রাস্তা, রাস্তি খানের মসজিদ, সৈয়দ নুসরৎ শাহের মসজিদ ও দীঘি, বৌদ্ধ আরাকানরাজদের আগ্রহে নির্মিত রাস্তা, জলাশয়, কেয়াঙ্গ প্রভৃতির কিংবদন্তি আজো শোনা যায়।

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পারস্পরিক সম্পর্ক

চট্টগ্রামে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ এবং কিছু সংখ্যক খ্রীস্টান ষোল শতক থেকে আছে। বাঙলা সাহিত্যসূত্রে জাতি বিদ্বেষের কোনো ইঙ্গিত মেলে না। মুসলমানেরা পৌত্তলিকের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করত না। চৈতন্য-চরিতে ইসলাম যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তা হরিদাসকে বোঝানোর জন্যে মুসলমানেরা বলছে :

আমরা হিন্দুকে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত (বৃন্দাবন দাস-আদিলীলা)

—এ অবজ্ঞার কথা, বিদ্বেষের নয়। চট্টগ্রামে রচিত শাস্ত্রীয় গ্রন্থে কুফরী সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে বটে, কিন্তু কাফের-বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। পক্ষান্তরে চট্টগ্রামের বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে রচিত মনসা-মঙ্গলে ও বৈষ্ণব মহান্তরে জীবনী গ্রন্থে মুসলিম বিদ্বেষ সর্বত্র প্রকট। এ হচ্ছে শাসিত জনের বিজাতি শাসকের প্রতি স্বাভাবিক অপ্রীতির প্রকাশ। মুসলমানদের উদারতাও শাসকজাতি সুলভ উত্তম্মন্যতার অভিব্যক্তি। ব্রিটিশ আমলের মুসলমানেরা এই উত্তম্মন্যতা হারায়। তাই ব্রিটিশ আমলের পীর পাঁচালীতে, কিস্‌সায় ও আধুনিক সাহিত্যে কাফের বিদ্বেষ প্রকট। কিন্তু চট্টগ্রামে হিন্দু-বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মনে এ হীনম্মন্যতা প্রবেশ করতে পারেনি, কেননা এখানে পর্যায়ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিম শাসন চালু ছিল।

পরিবেষ্টনীর প্রভাব থেকে মানুষের মুক্তি নেই। বলেছি, বহু মানুষের বিচিত্র সংস্কৃতির স্পর্শে চট্টগ্রামী লোকের মনের দিগন্তও প্রসারিত হয়েছে। বিস্তীর্ণ আকাশের তলে নানা সংস্কৃতির মিলন ময়দানের আবহ তারা পেয়েছিল বলেই হয়তো পরমত সহিষ্ণুতা এবং বৈচিত্র্য আর বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্যতত্ত্বের পরিচয় তারা লাভ করেছিল।

পর্তুগীজ দস্যু, বণিক ও ধর্মপ্রচারকরা দেয়াঙ্গ (দেবগ্রাম) ও সন্দ্বীপে তথা চট্টগ্রামে আড্ডা গেড়েছিল। এবং আরাকানরাজের সঙ্গে মিতালি ছিল বলে মঘদস্যুরাও (আসলে পর্তুগীজরাই মঘদের দস্যুবৃত্তি গ্রহণে প্ররোচিত করে, কেননা, পর্তুগীজ আগমনের পূর্বে এরা দস্যু ছিল বলে জানা যায় না) এদের সহযোগী ছিল। কাজেই প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার গরজে এবং মিত্ররাজ্যে উপদ্রব সৃষ্টি না করার স্বাভাবিক নীতির মধ্যে আরাকানে ও চট্টগ্রামে পর্তুগীজরা ধর্মপ্রচার কিংবা লুটতরাজ ও রাহাজানি থেকে বিরত থাকত। Fariar Manrique-এর বর্ণনায় এর আভাস আছে। এ কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামে রচিত হিন্দু-মুসলমানের কোন গ্রন্থেই হার্মাদদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। যদিও হার্মাদের দৌরাত্ম্যের কথা তাদের অজানা ছিল না। মঘের মুলুক কিংবা হার্মাদের মুলুক অথবা হার্মাদী প্রভৃতি অভিব্যক্তি ওদের চরিত্রের ও আচরণের স্মারক হয়ে রয়েছে। হার্মাদের হাতে পর্যুদস্ত কবি আলাউল ফরিদপুর থেকেই যাত্রা করেছিলেন, এবং নসর মালুম গীতিকার হার্মাদেরা সতেরো শতকের শেষের কিংবা আঠারো শতকের। কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁদের কথা উঠে না।[৪৯]

বস্তুত পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা সবার সঙ্গেই সদ্ভাব বজায় রেখে চলত। তাদের দুর্ভাগ্য তারা আমাদের স্মৃতিতে কেবল দস্যুই।

চৈতন্য-চরিত কিংবা মনসামঙ্গলে আমরা যেমন মুসলিম বিদ্বেষের বা বিক্ষুব্ধ হিন্দু মনের অভিব্যক্তি পাই, চট্টগ্রামে রচিত কোনো গ্রন্থে আমরা তেমন কোনো বিদ্বিষ্ট তথা বিক্ষুব্ধ মনের পরিচয় পাইনে। অথচ চট্টগ্রাম আরাকানী বৌদ্ধ, ত্রিপুরার হিন্দু এবং গৌড়-সোনারগাঁ-ঢাকার মুসলিম– এ তিন ধর্মের লোকের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এমনকি পর্তুগীজ শাসনও অঞ্চল বিশেষে চালু ছিল।

আরাকানরাজ-দরবারে গোটা সতেরো শতক ধরেই মুসলিম উজিরের সাক্ষাৎ পাই। চট্টগ্রামেও ১৫৮৫ সনের পূর্বাবধি মুসলিম-প্রতিনিধি তথা উজির আরাকান-অধিকৃত অঞ্চল শাসন করতেন। ১৫৮৬ সন থেকে রাজার নিকট-আত্মীয় রাজপ্রতিনিধি থাকতেন। কিন্তু তাঁর অধীনস্থ উজির থাকতেন মুসলমান। হামজা খান (খ্রী. ১৫৫৯), নসরত খান (১৫৬৯), জালাল খান (১৫৮৫), ইব্রাহীম খান প্রমুখ সবাই বংশ পরম্পরায় আরাকানরাজের উজির ছিলেন।

এর কিছুই ব্যর্থ হয়নি। এক উদার মানবিক বোধের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি। স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকেও তারা মানুষ হিসেবে বর্ণবিহীন মানস চর্যায় ব্রতী হতে পেরেছিল। এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্ক আজো চট্টগ্রামকে স্পর্শ করে নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম

বৌদ্ধ ধর্ম

গাছ-পাথর পূজক pagan অস্ট্রো-দ্রাবিড় এবং ভূত পূজক ভোটচীনা চট্টগ্রামবাসীরা বিদেহ-বৈশালী থেকে আগত ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রভাবে হয়তো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করে। সম্ভবত মৌর্য ও গুপ্ত আমলে এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব প্রবল হয়। লামা তারানাথের বর্ণনা থেকে আভাস পাই, চট্টগ্রাম এক সময় বৌদ্ধ ও তীর্থিকদের শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র ছিল। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ পণ্ডিত বিহার ছিল প্রখ্যাত। এটি চক্রশালায় কিংবা আধুনিক আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ঝিয়রী গাঁয়ে অবস্থিত ছিল বলে লোকশ্রুতি আছে! চট্টগ্রামেরই এক ব্রাহ্মণপুত্র তিলকপাদ[৩০] (তিলপা) পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। এবং তিনি নাকি প্রজ্ঞাভদ্র নামে পরিচিত ছিলেন। পণ্ডিত বিহারকে তিনি তান্ত্রিকমত প্রচারের কেন্দ্র করেছিলেন বলেও প্রসিদ্ধি আছে। বৌদ্ধ মহাযান মতই তান্ত্রিকতা-প্রবণ চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের আদিমত।

পগাঁরাজ আনোরহটা আরাকান-চট্টগ্রাম জয় করলে সেখানেও তাঁর পুরোহিত তথা ভিক্ষু-প্রমুখ শিন অরহন প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন এবং মহাযান আরি মত উচ্ছেদ করে আনোরহটার সাম্রাজ্যে থেরবাদী হীনযান মতের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সাম্রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় লিপির স্থলে পালিভাষা ও তৈলঙ্গ লিপি চালু করেন।

এখনকার চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আরাকানীদের বংশধর। বৌদ্ধ সমাজে বর্ণবৈষম্য নেই। তাঁরা তিনটে কুলবাচী ব্যবহার করেন। একটি তাঁদের গোত্রীয় বড়ুয়া, অপর দুটো চৌধুরী ও মুৎসুদ্দী যথাক্রমে সম্পদ ও পেশা জ্ঞাপক। অর্ধশতাব্দী আগেও তাঁদের অনেকের বর্মী নাম ছিল।

AMARBOI.COM

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম

বলেছি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম গোড়া থেকেই চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ে বৈদিক ও লৌকিক এ দুটোই আচারিক ধর্ম হিসেবে মিশ্রিত রূপে গৃহীত হয়েছে। তবে চট্টগ্রামে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৌরাণিক রূপই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে হর-পার্বতীর লৌকিক কাহিনী চালু নেই। দ্বিজরতিদেবের মৃগলুব্ধ কিংবা রাজারামের মৃগলুব্ধ সংবাদ, কিংবা মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল অথবা কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকরনন্দীর মহাভারত, দ্বিজ ভবানী নাথের লক্ষ্মণ দিগ্বিজয় প্রভৃতি পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অনুসরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। চট্টগ্রামে মনসার পূজা হয়, কিন্তু মনসামঙ্গল রচিত হয়নি। চণ্ডীমঙ্গল এমনকি চণ্ডীমণ্ডপও সেখানে আজো অজানা। শীতলার পূজা, ষষ্ঠীর সেবা, সত্যনারায়ণের সিন্নি প্রভৃতি ক্বচিত চালু থাকলেও দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গে এঁরা যতটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, এখানে ততটা নয়। চট্টগ্রামের নমঃ শূদ্র হাড়ি-ডোমেরা আজো বৃক্ষ পূজাই করে। অশ্বত্থ বৃক্ষই প্রধানত পূজ্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীর দারুব্রহ্ম কিংবা দারুজগন্নাথ সেই অনার্য প্রভাবেরই ফল।

ইসলাম

চট্টগ্রামে ইসলাম সাধারণভাবে সূফী দরবেশরাই প্রচার করেন। ভোটচীনা বৌদ্ধপ্রভাবে এ প্রত্যন্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে অলৌকিকতায় ও কেরামতিতে বিশ্বাস বেশিই বলে মনে হয়। তাই বায়াজিদ বিস্তামীর মাজার, শেখ ফরিদের চশমা, কদম মুবারক, বড়পীর আবদুল কাদির জিলানীর দরগাহ, বারো-আউলিয়ার ধুনি প্রভৃতি মনভুলানো, লোক-ঠকানো তীর্থক্ষেত্র তৈরি হতে পেরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণভাবে বদর আলাম, (১৩৪০ বা ১৪৪০), মছলন্দর বা মোহসিন, পীর কাতাল, শাহ পীর, শাহ্ গদী, শাহ্ চাঁদ, শাহ্ উত্তম, শাহ্ বদল, শাহ্ জয়দ, শাহ সুন্দর, শাহ গরীব (১৬৯০-১৭০০) প্রমুখ কয়েকজন আরব-ইরানী, মধ্যএশীয় এবং উত্তর ভারতীয় সূফী সাধক চট্টগ্রামে বিস্তৃতির সহায়ক বলে গণ্য।

ফলে চট্টগ্রামে গোড়ারদিকে সূফীমতই প্রবল ছিল। তারপর সৈয়দ সুলতান, শেখ পরান, হাজি মুহম্মদ, আলাউল, শেখ মুতালিব, মীর মুহম্মদ শফী প্রভৃতির শরীয়ৎ-মারফৎ আলোচনার ফলেই সম্ভবত চট্টগ্রামে শরীয়ৎ-পন্থী প্রবল হয়। এবং শরীয়ৎ-মারফতে অর্থাৎ শাস্ত্রের ও সূফীতত্ত্বের রফা হয়ে একটি সমন্বিত রূপ লাভ করে। বাঙলার অন্যত্র পহাবী-আন্দোলনের পূর্বে এ প্রকার প্রয়াস কোথাও দেখা যায়নি। তবু স্থানিক প্রভাব মুসলিম সমাজ পরিহার করেনি, যোগ-দেহতত্ত্ব ছাড়াও অনেক পৌত্তলিক সংস্কার তাদের আচরণ ও বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। যেমন ওলা-ষষ্ঠী-দরদাহ পূজা, কাত্যায়নীর ভাত রান্না (আশ্বিনে রাঁধি কার্তিকে খায় যে বর মাগে সে বর পায়) লক্ষ্মীর জড়া (হাঁড়ি মুছে না খেয়ে লক্ষ্মীর নামে কিছু ভাত রেখে দেয়া) বুধবারে টাকা খরচ না করা, রোববারে ঝাড়ের বাঁশ না কাটা, শনি, মঙ্গল ও বৃহস্পতির বারবেলা প্রভৃতি মুসলমানেরা নিষ্ঠার সঙ্গে মানত। অতএব ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের আগে এদেশের লোকাচার-দুষ্ট লৌকিক ইসলামই মুসলিম সাধারণের ধর্ম ছিল।[২১] তবু স্বীকার করতে হবে, বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো চট্টগ্রামের মুসলমান সমাজে হিন্দু বা বৌদ্ধআচারের প্রভাব তত গভীর ছিল না। যেমন চট্টগ্রামে বাউলমত চিরকালই অজ্ঞাত থেকেছে। আরব-ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের ফলেই হয়তো চট্টগ্রামী মুসলিম সমাজে হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাব গভীর হতে পারেনি। আরব-ইরানী প্রভাবেই সম্ভবত চট্টগ্রামে বাঙলা ভাষায় ইসলামী শাস্ত্রের চর্চা ষোল শতক থেকেই শুরু হয় এবং বিভিন্ন লেখকের উদ্যোগে তা আন্দোলনের রূপ পায়। বাঙলাদেশের অন্য কোথাও বাঙলায় ইসলামী শাস্ত্রের গ্রন্থ আঠারো শতকের আগে রচিত হতে দেখি না।

খ্রীস্ট ধর্ম

পর্তুগীজ প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে খ্রীস্টধর্মও ষোল শতক থেকে শিকড় গেড়েছে। চট্টগ্রামের খ্রীস্টানরা পর্তুগীজদের দেশীস্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের এবং অপহৃত বাঙালির বংশধর। অবিমিশ্র পর্তুগীজ রক্তের খ্রীস্টান বিরল। Fariar Manrique-এর উক্তিতে প্রমাণ, বছরে অন্তত ৪৫০ জন অপহৃত লোককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দেয়া হত। না বললেও চলে যে দীক্ষিত লোকের প্রায় সবাই ছিল অপহৃত এবং বলপ্রয়োগে কিংবা প্রলোভনে ধর্মান্তরিত। এরা রোমান ক্যাথলিক এবং পর্তুগীজ নামের অনুরাগী। সাধারণ্যে এরা ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। ইংরেজি আমলের শেষের দিকে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এরা ইংরেজিকেই মাতৃভাষা করে নিয়েছে। তার আগে বাঙলা এবং মধ্যে হিন্দিও ছিল এদের ভাষা। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তারা স্রোতের পানা। আগে ছিল পর্তুগীজ ঐতিহ্যের অনুসারী, মধ্যে হল ব্রিটিশ সংস্কৃতির অনুকারী। এখন হয়েছে ইয়াঙ্কী Fashion-এর ভক্ত। পর্তুগীজদের মধ্যে আভিজাত্য ও মর্যাদা অনুসারে তিনটে ভাগ ছিল, খাস অমিশ্রিত পর্তুগীজ, দেশীস্ত্রীর গর্ভজাত পর্তুগীজ ও দেশী খ্রীস্টান।

চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা থেরবাদী হীনযান পন্থী। খ্রীস্টানেরা মুখ্যত রোমান ক্যাথলিক। হিন্দুরা পঞ্চোপাসক, শাক্তই বেশি, তারপরেই বৈষ্ণব। মুসলমানেরা সুন্নী, মজহাব, হানাফী, এখানে উনিশ শতক থেকে কুসংস্কারমুক্ত ওহাবীর সংখ্যা বাড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎস নির্দেশ

১. ক. Races of Bengal— R. P. Chanda.

খ. Linguistic Survey of India : Vol. I. Introduction G. A. Grierson 40 ff.

২. Racial Elements in the Population ; Oxford Pamphlets on Indian Affairs : Phamphlet No. 22 8. 1943.

৩. বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) : জাতি পরিচয় : নীহাররঞ্জন রায়।

৪. Kirata-Jana-Krti : Dr S. R. Chatterjee : JASB Vol. XVI. 1950.

৫. Ibid : 1950

৬. Ibid : P 151.

৭. ক. Ibid P152

খ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস- সি. কালহন-এর প্রবন্ধ।

৮. Kirata-Jana Krti P152

৯. বাঙ্গালীর ইতিহাস : জাতি পরিচয়।

১০. Kirata-Jana-Krti : P157

১১. Ibid PP231-32

১২. Ibid P232

১৩. Ibid P232

১৪. ক. Indo Aryan and Hindi : S. R. Chatterjee.

ঘ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস : সি. কলহনের প্রবন্ধ।

খ. Bibliographic Analytique des Travaux relatifs aux Elements an aryens dans la Civilisation et les langues de-i-Inde—Constant in Rigamey, Warsaw, in the Bulletin de l' Ecole Francaise de l' Extreme— Orient Vol. 34. 1935, PP 429-566.

ব. Non-Aryan Elements in Indo-Aryan : S. R. Chatterjee. Journal of the Greater Indian Society, Vol. III, 1936 No. 1. PP43-44.

ঙ. Prototypes of Siva in Western India : Hem Chandra. Roy Chowdhury, D L. Khandarkar Volume. Calcutta. PP301-303

চ. Some Etymological Notes : S. K. Chatterjee, Denison Ross Volume. Poona, PP68-74

ছ. India and Polynesia : Austric Bases of Indian Civilisation and thought : S. K. Chatterjee in Bharat Kaumudi (Studies in Indology in honour of Dr. Radha Kumud Mukherjee, Allahaad, 1945, PP193-208).

জ. Buddhist Survivals in Bengal : S. K. Chatterjee, B. C. Law, Volume pt 1, Calcutta, 1945 PP75-87.

ঝ. Dravadian Elements in Sanskrit and other Indo-Aryan languages—Bulletin of the School of Oriental Studies. 1948— T. Burrows and in 'Transactions of the Philosophical Society of London', 1948.

ঞ. History of Bengal D. U. Vo. 1.

ট. বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব।

ঠ. প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী : ডক্টর সুকুমার সেন।

Obscure Religious cult. etc, Dr. S. B. Das Gupta.

ড. বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস— আশুতোষ ভট্টাচার্য।

ঢ. Kirata-Jana-Krti : S. K. Chatterjee, JASB. 1950.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. Indo-Aryan and Hindi : PP31-32

১৬ ক. Strabo : Book XV, chapter I, Section 4.

খ. The Commeree between the Roman Empire and India by E. H. Warmington (Cambridge, 1928).

গ. Trade routes and Commerce of the Roman Empire : Charlesworth (Cambridge, 1928)

ঘ. History of Ancient Geography : Cambrige, 1948.

ঙ. Arab Sea-faring by G. F. Hourani, 1951, P29.

১৭. Ibid PP33, 35.

১৮. The Land of the great Image : Mauriee Collis (1342) being the experience of F. Manrique in Arakan, P68.

ক. History of Burma : Harvey, PP149-41.

১৯. History of Bengal, Vol. II. D. U. Conquest of Chittagong.

২০. ক. Tribes and Castes in Bengal : H. Risly : P. 91

খ. Census Report of Bengal : 1982. Beverley. P133.

২১. ক. British Policy & Musalmans in Bengal : Dr. A. R. Mallik

খ. Indian Musalmans etc. : W. Hunter.

২২ ক. British Policy etc. Dr. A. R. Mallik.

খ. Indian Muslims and Public Service : Z. Islam & R. H. Jeusen. JASP Vol. IX No. 1. 1964, PP. 85-101.

২৩. Ibn Battuta : H. A. Gibb : P267.

২৪. Akbarnama : Vol. I. P1757 : Jauhar. P30.

২৫. History of Bengal : Vol. II D. U. P193. Akbarnama : Vol. III, P226-29.

২৬. History of Bengal : Vol. II. D. U. P334.

২৭. চৈতন্য ভাগবত : (বসুমতী সং) পৃ. ৭৭।

২৮. বিজয় গুপ্ত : সেই ছিল হিন্দুর কন্যা তার কর্মফলে। বিবাহ করিল কাজী ধরি আনি বলে। (পদ্মাপুরাণ : বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃ. ৫৬)।

ক. মুহম্মদ খান—মক্তুল হোসেন : মাহি আসোয়ার আচার্যকে ভয় দেখিয়ে তার কন্যা বিবাহ করেন।

২৯. ক. Bengal under Akbar and Jahangir—Tapan Kumar Roy Chowdhury, P222.

খ. Manrique : Pyrard, Bengal Past and Present, 1952.

৩০. History of Bengal : D. U. Vol. I, Pp 85-86.

৩১. Ibid pp 85-89 and 197-204.

৩২. ক. Antiquity of Chittagong : Sarat Chandra Das. JASB, 1998, pp 21-23.

খ. History of Bengal : D. U. Vol. I, pp 182-87. 257-59.

৩৩. ক. History of Bengal. D. U. Vol. I pp 1, 82-197. 257-59.

খ. Some Sanskrit Inscriptions of Arakan : E. H. Johnston, Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London), Vol. XI. 1943-46, pp 357-65.

গ. History of Burma—Harvey, p 49.

৩৪. ক. History of Burma : Harvey, pp 135-138, 370.

খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : (পুরানা আমল) মাহবুব-উল আলম, পৃ. ২৮-২৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫. ক. History of Burma : Harvey—pp 30, 39, 49, 51.
খ. History of South East Asia : A. E. Hall, pp 125-26.
গ. Travels of Marco Polo—Gibb, Orion Press. pp 197-204.
৩৬. History of Bengal : Vol. I. D. U. pp 153-57.
৩৭. ক. বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়।
খ. প্রাচীন বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী : ডক্টর সুকুমার সেন।
গ. History of Bengal : Vol. I. D. U. Chapter X.
৩৮. ক. Social History of the Muslims in Bengal : Dr. A Karim, Asiatic Society of Pakistan, 1969.
খ. Hosain Shahi Bengal : Dr. M. R. Tarafdar, Asiatic Society of Pakistan, 1965/
গ. Administration of the Sultanate of Delhi : (2nd Edition)— Dr. I. H. Qureshi, Lahore, 1944.
৩৯. রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, পৃ. ৩৩, (২৮-৩৫)
৪০. দামে এক তঙ্কা বা টাকা।
৪১. Ain-Akbari, রাজমালা—সিংহ।
৪২. মসজিদ লিপি :
৪৩. নবী বংশ।
৪৪. মক্তুল হোসেন।
৪৫. লায়লী মজনু।
৪৬. মক্তুল হোসেন।
৪৭. বিদ্যাসুন্দর : শা' বারিদ খান।
৪৮. লায়লী মজনু : দৌলত উজির বাহরাম খান।
৪৯. ক. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ : মুহম্মদ খান।
খ. রসুল বিজয় : শেখ চান্দ। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৪৩, পৃ. ১০৪।
৫০. Bengal under Akbar & Jahangir : PP 226-229.
ক. Fariar-Manrique (1929-43 A. D.) Trans, Luard & Hosten Travels of Oxford 1927. Vol. I PP. XLXIV 21.
খ. লায়লী মজনু রচনার তারিখ : ডক্টর আবদুল করিম : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা : শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০।
৫১. বঙ্গে সূফী প্রভাব : ১৪৪-১৫৪। আরব বণিকেরাও চট্টগ্রাম বন্দরে ইসলাম প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন বলে অনুমান করা হয়।
৫২. পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম : পৃ. ১৩৭-৪২, বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ২১৭-২৪৯।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পরিচ্ছদ

সৈয়দ সুলতানের জন্মভূমি, পরিচয় এবং সৈয়দ সুলতানের ভাব-শিষ্যকবিগণ ও আবির্ভাবকাল

সৈয়দ সুলতান যে চট্টগ্রামের চক্রশালাবাসী ছিলেন, তা আজকাল আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কেননা তাঁর নাম নানা প্রসঙ্গে চট্টগ্রামবাসী অনেক কবির মুখেই শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। কবির নবীবংশ রচনারম্ভের কাল মিলেছে : "গ্রহশত রসযুগ– ৯৯৪ হি. (১৫৮৬ খ্রী.]।" এছাড়া কিছু পরোক্ষ প্রমাণ রয়েছে। যেমন :

১. শেখ মুতালিব 'কিফায়তুল মুসাল্লিন' নামের জনপ্রিয় শাস্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা। ইনি সীতাকুণ্ডবাসী কবি শেখ পরানের পুত্র এবং মীর মুহম্মদ সফীর পিতা সৈয়দ হাসান তাঁর পীর ছিলেন :

ক. কিফায়তুল মুসাল্লিন শুন দিয়া মন
বঙ্গভাষে কহে শেখ পরান-নন্দন।
সব মসায়েল তিনি করি একান্তর
কহিয়াছে কায়দানি কেতাব ভিতর।[১]

খ. পীরপদে প্রণামিএ সৈয়দ হাসান
মীর মুহম্মদ সফী তাহান নন্দন।[২]

গ. সীতাকুণ্ড গ্রামে শেখ পরান সুজন
তাহার নন্দন হীন মুতালিব ভান।[৩]

মুতালিব নবীবংশ কাব্যেরও উল্লেখ করেছেন।

ক. নবীবংশে যে সকল প্রসঙ্গ আছএ
পুনি তাক লিখিবারে উচিত না হএ।

খ. শবে মে'রাজে আছে যুদ্ধ বিবরণ
পুনি এথা কহি তাক নাহি প্রয়োজন।

শেখ মুতালিব আরবী আবজাদ রীতিতে তাঁর গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করেছেন :

ক. ইসলাম এবাদত নামাজ সমাপ্ত
সেই অনুবন্ধে কহি শুন দিয়া চিত্ত।
সপ্তমে হইল পুনি এবাদত নাম
যেই দিনে সাঙ্গ হৈল পুস্তক তামাম।

AMARBOI.COM

খ. পুস্তক সমাপ্ত হৈল দীন ইসলাম।
কিফায়তুল মুসল্লিন রাখিলাম নাম।

এ থেকে যথাক্রম ১০৪৮ ও ১০৪৯ হিজরী তথা ১৬৩৮-৩৯ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।[৪] শেখ মুতালিব তাঁর গ্রন্থের উপক্রমে অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫] ১৭৩৮ সনে মুতালিবকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক এবং পিতাপুত্রের বয়সের তফাৎ পঁচিশ বছর ধরে নিয়ে হিসাব করলে মুতালিবের জন্ম সন ১৬০৩ এবং তাঁর পিতার জন্ম সন ১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ বলে অনুমান করা সম্ভব। শেখ মুতালিব যদি দশ বছর বয়সে পিতৃহীন হন, তা হলে পরানের মৃত্যু-সন দাঁড়ায় ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দ। অতএব পরানের জীবৎকাল মোটামুটি ১৫৭৫-১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ বলে মনে করা যায়।

২. মুতালিবের পিতা শেখ পরান দু'খানি গ্রন্থের রচয়িতা : নূরনামা ও কায়দানি কেতাব। শেখ পরানও তাঁর 'নুরনামায়'[৬] সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের উল্লেখ করেছেন:

শাস্ত্রনীতি কথা কহি কর অবধান।
ফাতেমাক বিভা কৈল আলি মতিমান
নবীবংশ রচিছেন্তে সৈদ সুলতান।

কবি সৈয়দ সুলতান নবীবংশ রচনা শুরু করেন ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে। আবার, এই শেখ পরানই তাঁর কায়দানী কিতাবে[৭] হাজী মুহম্মদ ও তাঁর গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন ঃ

যদি বোল গোরে হোন্তে না উঠিব পুনি
কাফির হৈয়া যাইব নরকেত জানি।
'সুরত নামার' মধ্যে ইমাম সিফত
কহিছন্ত হাজী মুহম্মদ ভাল মত।
তেকারণে এথা মুঞি না কৈলুঁ সমস্ত
কিঞ্চিত কহিলুঁ মুঞি ইঙ্গিতে বুঝিত।

এতে মনে হয়, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরানের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ছিলেন। অতএব, আমাদের আগের অনুমান অনুসারে শেখ পরান ১৬১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন বলে ধরে নিলে হাজী মুহম্মদ ষোল শতকের শেষ দশকে 'সুরতনামা' রচনা করেছিলেন বলে অনুমান করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে সুরতনামা ও নূরজামাল অভিন্ন গ্রন্থ। দুটোই একই গ্রন্থের নাম।

৩. এদিকে সৈয়দ সুলতানের পৌত্র, শেখ মুতালিবের পীর সৈয়দ হাসানের পুত্র ও 'নুরনামা' লেখক শাহ মীর মুহম্মদ সফী হাজী মুহম্মদকে তাঁর পীর বলে উল্লেখ করেছেন[৮]।

ক. কহে মীর শাহ সফী আমি দুঃখমতি
এহলোক পরলোক সেই দুরগতি।
পিতামহ শাহ সৈয়দ জানহ দরবেশ
কিঞ্চিৎ জানাইলুঁ সেই পন্থের নির্দেশ।

খ. কহে মোহাম্মদ সফী হৃদে মনে তানে জপি
যার ঘর্মে সৃষ্টি উৎপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীর হাজী মুহম্মদ শিরে বন্দী তান পদ
পাইতে সে নুরের দরশন।

সৈয়দ হাসানের পুত্র ছিলেন মীর মুহম্মদ সফী। আর শিষ্য হলেন শেখ মুতালিব। অতএব সফী ও মুতালিব প্রায় সমবয়সী।

ছকে ফেলে দেখলে এরূপ দাঁড়ায় :

ক. কবি সৈয়দ সুলতান
↓
সৈয়দ হাসান
↓
পুত্র — শিষ্য
মীর মুহম্মদ সফী — শেখ মুতালিব

খ. হাজী মুহম্মদ
শিষ্য
↓
মীর মুহম্মদ সফী

গ. শেখ পরান
পুত্র
↓
শেখ মুতালিব

আগেই দেখেছি, সৈয়দ সুলতান ও হাজী মুহম্মদ শেখ পরানের পূর্বসূরি ছিলেন। হাজী মুহম্মদকে সৈয়দ হাসানের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সৈয়দ সুলতানের বয়োকনিষ্ঠরূপে কল্পনা করলে তাঁর আবির্ভাব কাল ১৫৬৫-১৬৩০ খ্রীস্টাব্দ বলে ধরে নেয়া চলে।

৪. মুহম্মদ খানের 'মোহাম্মদ হানিফার লড়াই' পর্বের লিপিকর মুজফফর উক্ত পুঁথির যে কয় জায়গায় নিজের ভণিতা যোজনা করে দিয়ে কবিযশ আত্মসাৎ করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন [অবশ্য মুজফফর নিজেও কবি ছিলেন। ইউনাম দেশের পুঁথি তাঁরই রচনা।*] তার একটিতে কবি সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন :

সুলতান দৌহিত্র হীন চক্রশালা ঘর
কহে হীন মুজফফরে এজিদ উত্তর।
মুই হীন অধম যে বুদ্ধি ক্ষুদ্র কহি
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ ধীর করে ছহি।

৫. 'লালমতি সয়ফুল মুলকের' কবি শরীফ শাহও সম্ভবত সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ছিলেন:

শাহ সুলতান সুত সর্বগুণে অলঙ্কৃত
তানপদে করিয়া ভকতি।
কাজী মনসুর মানি তাহার তনয় জানি
শরীফ যাহার ভবতি।

৬. চট্টগ্রামের নয়াপাড়া নিবাসী কবি মুহম্মদ মুকিম 'ফায়েদুল মুকতদী' নামের শাস্ত্রগ্রন্থ এবং 'গুলে বকাউলি' উপাখ্যান রচনা করেছেন। তাঁর ফায়েদুল মুকতদী রচিত হয় :

ঋতুবেদ চন্দ্র শত আশী আর নয়
ইতি সার জান মঘী সনের নির্ণয়।

অর্থাৎ ১০৪৬ + ৮০ + ৯ = ১১৩৫ মঘী তথা ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। ইতিপূর্বে কবি :

প্রেমরস কাব্য কলা সুগন্ধি শীতল
কালাকাম ভাঙ্গি কৈলুঁ পয়ার নির্মল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃগাবতী নামে আর পরীর নন্দিনী
মিত্র জনে শুনে সেই অপূর্ব কাহিনী।
মোরে আজ্ঞা দিল পীর রচিতে পয়ার
দেশী ভাষে রঙ্গ কথা লোকে বুঝিবার।
আয়ুব নবীর কথা আছিল কিতাবে
পয়ার না কৈলুঁ তাহে মন্দ কহে সবে।
সুরস কথন অতি দুঃখ ব্যবহার
কিঞ্চিৎ লেখিলুঁ তাহে প্রকাশি পয়ার।

অতএব কবি ফায়েদুল মুকতদী রচনার আগে কালাকাম, মৃগাবতী ও আয়ুব নবীর কথা রচনা করেন। এই তিনটেই আজো অপ্রাপ্ত। তাঁর পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র সৈয়দ মুহম্মদ সৈয়দ। সম্ভবত তাঁর শেষগ্রন্থ হচ্ছে গুলে বকাউলি। এটি এক শাহ আসহাবুদ্দিনের আগ্রহে রচিত। এতে রচনাকাল নেই, তবে একটি কথায় বোঝা যায় এটি ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের অনেক পরে রচিত :

ইংরেজ নৃপতি যে ডে ফিরিঙ্গির জাত।...
চিরদিন ইঙ্গরাজ এথা মহিপাল
ভালে ভাল মন্দে মন্দে তস্করের কাল।

এই মুকিম তাঁর গুলে বকাউলি কাব্যে পীর বন্দনায় বলেছেন :

ক. সৈয়দ সুলতান বংশে শাহাদুল্লা নাম।
একে তান ভ্রাতুপুত্র দ্বিতীয়ে জামাতা
সর্ব শাস্ত্র বিশারদ শরীয়ত জ্ঞাতা।
তান পুত্র শ্রীসৈদ মোহাম্মদ সৈয়দ
নিজপীর স্থানে সেই হইল মুরীদ।

খ. পীর মীর মুহম্মদ সৈদ-ক সালাম

গ. শ্রীযুত মুহম্মদ সৈয়দ পীরবর।
তান পদ প্রণামিয়া শ্রীলএ মুকিম
নর-পরী ভাব গ্রন্থ কহে সুকৃতিম।

অর্থাৎ সৈয়দ সুলতানের দৌহিত্র মুহম্মদ সৈয়দ মুকিমের পীর ছিলেন। আবার, মুকিম কবি প্রণামে বলেছেন :

এবে প্রণামিব আমি পূর্ব কবি জান
পীর মীর চক্রশালা সৈয়দ সুলতান।[১০]...

৭. 'শির্নামা' রচয়িতা শেখ মনসুরেরও (১৭০৩) পীর ছিলেন সৈয়দ সুলতান বংশীয় :
সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন
ভাগ্যফলে হৈলুঁ আমি তাহার অধীন।
তানপদ পাদুকার রেণু ভুরুদেশ
দিয়া মনে আশা করি আছিএ বিশেষ।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. 'আজরশাহ সমনরোখ' প্রণেতা মোহাম্মদ চুহর (১৮০৪-৫০ খ্রী.) চট্টগ্রামবাসী কবি প্রণামে বলেছেন :

আদ্যগুরু কল্পতরু সৈদ সুলতান
কবি আলাওল পীর মোহাম্মদ খান।[১২]

৯. পদকার ফতে খান বলেছেন :

কহে ফতে খান, সখি
উপায় আজএ নাকি
শ্রীযুত ইব্রাহিম খান
ভবকল্পতরু জানহ আমার
পীর মীর শাহ সুলতান।[১৩]

এই ইব্রাহিম খান সম্ভবত রাস্তি খানের পুত্র মীনা খান বংশীয় চট্টগ্রামস্থ আরাকানী উজির জালাল খানের (১৫৬৯-৮৫) পুত্র ইব্রাহিম খান। ইনিও চট্টগ্রামে আরাকানী উজির (১৫৮৫) ছিলেন। কবি মুহম্মদ খান তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। ফতে খান অপর একটি পদে আলাওল খান-এর নামোল্লেখ করেছেন। গোটা চট্টগ্রাম ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দ অবধি আরাকান শাসনে ছিল। কাজেই উক্ত আলাওল রাজধানী রোসাঙ্গ-প্রবাসী কবি আলাওলও হতে পারেন। ভণিতাটি এরূপ :

কহে ফতেখানি যো হি পাইল ধনি
সোহি পুরুখ বর জানি
পুরল মনোরথ সকল কলাবিত
শ্রী আলাওল খান।[১৪]

AMARBOI.COM

উপরে উদ্ধৃত তথ্যগুলো থেকে সৈয়দ সুলতানের একটি বংশলতাও দাঁড় করানো সম্ভব :

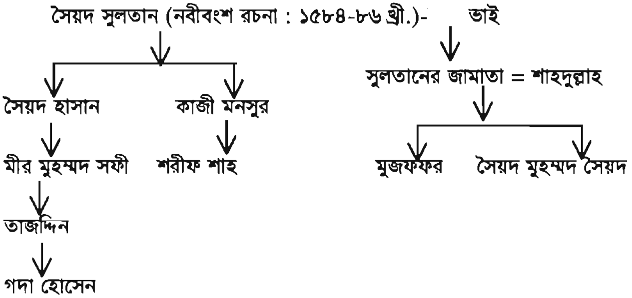

১০. আঠারো শতকে 'শমসের গাজী' নামে এক দুঃসাহসিক ব্যক্তি ফেনী অঞ্চলে এক রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁরই কীর্তিকথা বর্ণিত হয়েছে মনোহর রচিত শমসের গাজী নামায়। সৈয়দ সুলতানের এক বংশধর পীর মীর গদা হোসেন খোন্দকার শমসের গাজীর পীর ছিলেন। পীর শমসের গাজীকে একটি ঘোড়া ও একখানি তরবারি দিয়ে অনুগ্রহ করেন। আরাকানরাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতানকে একটি ঘোড়া ও একখানি তরবারি দিয়েছিলেন। শমসের গাজীকে প্রদত্ত তরবারিটি সেইটি, আর ঘোড়াটিও আরাকানরাজ প্রদত্ত ঘোড়ারই বংশধর। পীরের এক অনুচর শমসের গাজীর কাছে গিয়ে বলল :

গদা হোসেন খোন্দকার পাঠাইছে মোরে
তাহান গোচরে আজু নিবারে তোমারে।...
.. নম্রশির হই পীর ভজিলেক গাজী
প্রশংসিল পীর মীর আল্লা হৈল রাজি।
তবে তালিব কৈল ভেদাই মঞ্জিল
মারফত ভেদ কহে সকল শিখিল।
দিলেক হাজার তঙ্কা পীর মীর পায়।
পীরও- হাজার তঙ্কা মূল্যের ঘোড়া অস্ত্রবর
গাজীকে খেলাত দিলা কৃপার সাগর।
পীরে বোলে শুন কহি পিরুবান সুত
এহি ঘোড়া খড়গ জান কিম্মত বহুত।
রোসাঙ্গে মগর রাজা ধর্মিক আছিল
সৈদ সুলতান প্রতি এহি দ্রব্য দিল।
সুলতানে বকসাইল আপনা বেটারে
পর্যাক্রমে আসিয়া ঠেকিল মোর করে।
তাহান বংশের আমি ক্ষুদ্র এক বিন্দু
তপন ভুবন মাঝে সাগরেত ইন্দু।
নাসির যাইব মারা পাইবা জমিদারী
রাজবংশ ভঙ্গে দেশ হইবা অধিকারী।
এহি খড়গ অশ্ব তোমা দিনু মত কারণ
যুদ্ধে বিজয় হৈব জানিও আপন।
গাজীএ বুলিলা পীর কথেক বৎসর
পীর বোলে পঞ্চ বিংশ জানিও সত্বর।
এ বুলিয়া পীর মীর চলি গেলা দেশ।

তপন ভুবন মাঝে সাগরেত ইন্দু। ইন্দু-১, সাগর-৭, তপন-১২, ভুবন-৪, এ থেকে ১৭০০ + ১২ + ১৪ = ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। এই ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে নাসিরের মৃত্যু হলে শমসের জমিদারী পাবেন বলে পীর গদা হোসেন ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কাজেই শমসের উক্ত সনেই জমিদার হয়েছিলেন। অতএব ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দের আগেই শমসের গাজীর সঙ্গে গদাহোসেনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কবি শেখ মনোহরের পিতামহ তাহির উকিল শমসের গাজীর অনুচর এবং ঢাকার নওয়াব দরবারে গাজীর উকিল বা প্রতিনিধি ছিলেন। লোকশ্রুতি মতে শমসের গাজীর অভ্যুত্থানের সময় তাহির ঢাকার মাদ্রাসার ছাত্র ছিলেন। তিনিই শমসেরকে শনাক্ত করে নওয়াব সরকার থেকে সনদ পাইয়ে দেন। কবি শেখ মনোহর শমসের গাজীকে দেখেননি। তবে দীর্ঘজীবী পিতামহ তাহির উকিলের মুখে শোনা কাহিনীই তিনি গাজীনামায় বর্ণনা করেছেন। শেখ মনোহর ইংরেজ আমলের লোক। তাই খ্রীস্টাব্দ দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. দুল্লামজলিস (১৭৪৫ কিংবা ১৭৮৫-৮৮ খ্রী.) রচয়িতা আবদুল করিম খোন্দকার[১৫] ও সৈয়দ সুলতান কৃত নবীবংশ-এর উল্লেখ করেছেন :

বিশেষ ন কহি আমি আদমের কথা
নবীবংশ পুস্তকেত আছএ ব্যবস্থা।

দুল্লামজলিসে আদম, ইব্রাহিম, লূত, সুএব, আয়ুব, মুসা, সোলেমান, ঈসা, মুহম্মদ প্রমুখ নবী এবং ফাতেমা, আলি, সফী ইউসুফ, খালেদ, বিলাল, হাসান বসোরী, হাসীন কোরাইশী, সুলতান আবু সৈয়দ প্রভৃতি এবং রোজা ও বেহেস্তের বিবরণ আছে।

১২. আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি সৈয়দ নাসির তাঁর 'সিরাজ ছবিল'[১৬] নামক গ্রন্থে কবি প্রণামে সৈয়দ সুলতানের নামোল্লেখ করেছেন :

সৈয়দ সুলতান কবি আলাওল আর
দোহ পদে প্রণামিএ হাজারে হাজার।

১৩. শাহপরী, হাসনবানু প্রভৃতি উপাখ্যান এবং হায়রাতুল ফেকা রচক মোহাম্মদ আলি তাঁর শেষোক্ত 'নবীবংশ'-এর উল্লেখ করেছেন।[১৭] কবি মুকিমের নামোল্লেখ থেকে প্রমাণ ইনি আঠারো শতকের শেষার্ধের লোক।

তার কত অব্দ শেষে খলিফা সৃজিছে
তার সন নিরূপণ নবীবংশে আছে।

১৪. কবি মঙ্গলচাঁদ মঙ্গল কাব্যের আদলে রচিত তাঁর ইসলামের মহিমা জ্ঞাপক উপাখ্যান 'শাহজালাল মধুমালা' কাব্যে (১৬৬৫ খ্রী.) সৈয়দ সুলতান ও মোহাম্মদ খানের দোহাই দিয়েছেন :[১৮]

এসব বৃত্তান্ত কথা অনেক আছিল
পুস্তক বিশাল বলি তাহা না লেখিল।
আছিল এ সব কথা আদ্যের বিচার
হাজার বাহাত্তর সনে হৈল প্রচার।
সৈয়দ সুলতান আর মোহাম্মদ খান
এসবে করিয়া জ্ঞান মহামান্য জন।

১৫. 'মল্লিকার সাওয়াল বা ফকর নামা' নামের তত্ত্বগ্রন্থ লেখক শেরবাজ চৌধুরীও (সতেরো-আঠারো শতক) সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের উল্লেখ করেছেন :[১৯]

নৃপতি নন্দিনী বালা বৈল জিজ্ঞাসন
মাতাপিতা বিনে জন্ম বল কোন জন।
আবদুল্লাএ বলে, শুন, আয় দণ্ডধর।
মাতাপিতা বিনে জন্ম পঞ্চ পয়গম্বর।
প্রথমে আদম সফি দ্বিতীএ হাওয়ার
তৃতীএ হইল জন্ম নামে সালেহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থে হইল জন্ম নামে ইসমাইল
মরিয়ম সুত ইসা পঞ্চমে জন্মিল।
নবীবংশে লেখিয়াছে সে সব কথন।
রচিয়া কহিলে কথা নাহি কোন ভাল।

১৬. রাগমালা ও পদাবলী রচক চট্টগ্রামবাসী চম্পাগাজীও [আঠারো শতক] শ্রদ্ধার সঙ্গে সূফী সাধনার গুরু হিসেবে সম্ভবত সৈয়দ সুলতানকেই স্মরণ করেছেন :[২০]

এক গৃহের দশ দুয়ার ধরিয়াছে মুখে
শ্রীমুখের ধ্যান কহিলাম সুখে।
শাহ সুলতান পদ মানি চম্পাগাজী কহে
লাহুতের ঢেউ পড়ে মাণিক্য পলায়।

১৭. কক্সবাজারের পেতাগাজী পণ্ডিত ওর্ফে হাসান আলী তাঁর 'জমিদার পরিবার' নামক প্রশস্তি পুস্তিকায় (১৩২৪ সনে প্রকাশিত) কবি হিসেবে সৈয়দ সুলতানের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

১৮. কবির ভক্তিমান শাগরেদ কবি মুহম্মদ খান সৈয়দ সুলতানের রূপ-গুণের বর্ণনা দিয়েছেন :

ইমান হোসেন বংশে জন্ম গুণনিধি
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরস 'দধি'।
শ্যাম নব জলধর সুন্দর শরীর
দানে কল্পতরু পৃথিবী সম স্থির।
পূর্ণচন্দ্র ধিক মুখ কমল লোচন
মন্দ মন্দ মধু হাসি মধুর বচন।
শাহ সুলতান পীর কৃপার সাগর
সেবক বৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর।
ভাবে ভবকল্পতরু গুণে রত্নাকর
সিদ্দিক সিদ্দিক সম ধর্মেত উমর।
উসমান সদৃশ লজ্জা আলি সমজ্ঞান
অসীম মহিমা পীর শাহ সুলতান।...
উদরেত বৈসে তান জগতের গুণ
বিজয় করিলা শাস্ত্র পৃথিবী ত্রিকোণ।
হৃদয় মুকুর তান নাশে আন্ধিয়ার
বহু যত্নে এহি রত্নে কৈলা করতার।...
নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।

মুহম্মদ খানের এ বিবৃতি থেকে যে তথ্য মেলে, তা এই : সৈয়দ সুলতান ফাতেমীয় সৈয়দ ছিলেন। তিনি শ্যাম-সুন্দর পুরুষ ছিলেন। দানে, দয়ায় ও ভক্ত-বাৎসল্যে তিনি ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতুলনীয়। তাঁর ছিল আবুবকরের মতো সত্যবাদিতা, উমরের মতো ধার্মিকতা, উসমানের মতো লজ্জা ও আলির মতো জ্ঞান। অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞ, অনন্য জ্ঞানীপুরুষ সৈয়দ সুলতান ছিলেন আল্লার বিশিষ্ট সৃষ্টি।

সৃষ্টিপত্তন থেকে কেয়ামত অবধি ইসলামী ধারার একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিকথা রচনার ইচ্ছে ছিল সৈয়দ সুলতানের। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি আদি সৃষ্টিকথা থেকে ওফাত-ই-রসুল অবধি ইসলামী ধারার সব কিছুর বর্ণনা দিয়ে লেখনী ত্যাগ করেছেন। মুহম্মদ খানের বাচনভঙ্গি দেখে মনে হয়, ১৬৪৬ সনে 'মক্তুল হোসেন' কাব্য রচনা কালেও সৈয়দ সুলতান বেঁচে ছিলেন। তবু কি কারণে তিনি আরব্ধ কর্ম-সমাধা করেননি, গুরু-শিষ্য কারো উক্তি থেকে তার হদিস মেলেনি। সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ সনে নবীবংশ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সৈয়দ সুলতানের পীরের নাম সৈয়দ হাসান। কবির পুরো নাম ছিল মীর সৈয়দ সুলতান। পীরের নামানুসারে কবি পুত্রের নাম রেখেছিলেন সৈয়দ হাসান। তাঁর যে পীরালি-পেশা ছিল, তা তাঁর উক্তিতেই প্রকাশ:

মুঞি যদি গুরুপদে করিলুঁ সেবন
তবে জ্ঞান পাইবেক মোর শিষ্যগণ।
মুঞি যদি পদবন্ধ না করিতুম সার
মোহোর শিষ্যের হৈব এ হেন প্রকার।

॥ ২ ॥

বিশেষ করে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ রচনারম্ভ সনটি উক্ত কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া গেছে :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ ন সোঙরে।
গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।
আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খ যত
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক।

এই গ্রহশত রসযুগ থেকে ৯৯২ বা ৯৯৪ হিজরী সন তথা ১৫৮৪ বা ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দ মেলে। ডক্টর সুকুমার সেন 'দশশত রসযুগ' পাঠ গ্রহণ করে সৈয়দ সুলতানকে সতেরো শতকের (১৬৬৪-৬৫) কবি বলে অনুমান করেছেন।[২১] কিন্তু মুহম্মদ খানের দীক্ষাদাতাও কাব্যগুরু সৈয়দ সুলতান মুহম্মদ খানের পরবর্তীকালের লেখক হতে পারেন না। আবার অধ্যাপক আলি আহমদ[২৩] ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'রস'-এর মান ছয় ধরে ৯২৬ হিজরী সন নিরূপণ করেছেন। পর্বালোচিত পরোক্ষ তথ্য প্রমাণের উপর আস্থা রেখে আমরা সৈয়দ সুলতান ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে (৯৯২ হি.) নবীবংশ রচনায় হাত দেন বলে বিশ্বাস করি। সৈয়দ সুলতান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার লস্করপুরবাসী ছিলেন বলে দাবি করেন মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন[২৪] ও অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।[২৫] কিন্তু আমাদের পরিবেশিত তথ্য তাঁদের দাবি সমর্থন করে না। আবার, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক[২৬], অধ্যাপক আদমউদ্দীন[২৭] এবং অধ্যাপক আলি আহমদের[২৮] মতে সৈয়দ সুলতান পরাগলপুরবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের ধারণাও পুরো সত্য নয়। অবশ্য কবি পরাগলপুরে সাময়িকভাবে বাস করেছেন।[২৯] বিশেষ করে নবীবংশ শুরু করার সময় তিনি পরাগলপুরেই ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন :

লস্করের পুর খানি আলিম বসতি
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।

পরাগল খাঁ কর্তৃক পরাগলপুর পত্তনের ষাট-পঁয়ষট্টি বছর পরে (১৫৮৪-৮৬ সনে) সৈয়দ সুলতান 'লস্করের পুর'-এর উল্লেখ করেছেন, এতে দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এক, ১৫৮৪-৮৬ খ্রীস্টাব্দে পরাগলপুর অন্তত আঞ্চলিক শাসনকেন্দ্র ছিল। দুই, তখনো লস্কর বলতে প্রখ্যাত পরাগল খাঁই লোকস্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অথবা এই কেন্দ্রের শাসনভার তখনো লস্কর উপাধি কিংবা পদবীধারী কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল। তবে শেষোক্ত অনুমানের অবকাশ অল্প। কেননা, আমাদের উদ্ধৃত চরণ দুটোর আগেই কবি উল্লেখ করেছেন :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।

কাজেই লস্করের পুর যে পরাগলপুরই, তাতে সন্দেহই থাকে না। অতএব, আমাদের উপস্থাপিত তথ্যের সাক্ষ্যে সৈয়দ সুলতানের পৈত্রিক নিবাস ও জন্মভূমি চক্রশালা চাকলার আধুনিক পটিয়ার কোথাও ছিল বলে বিশ্বাস করি।[৩০]

AMARBOI.COM

উৎস নির্দেশ

১. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৭০।
২. ঐ : পৃ. ৬৩।
৩. ক. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২০০।
খ. সাধক কবি হাজী মুহম্মদ : বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ সন।
৪. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৫৮। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ১৯৯ ও সাধক কবি হাজী মুহম্মদ।
৫. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২০০।
৬. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৫৮। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ১৬৫।
৭. ঐ : পৃ. ৯২। ঐ নসীয়তনামা : পৃ. ১৬৫-৬৬।
৮. ঐ : পৃ. ৯৩-৯৪। ঐ পৃ. ২০২০২০৪।
৯. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ২৯-৩০।
১০. ১১, ২২, পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ১৫, ৯২, ৫১৯।
১৩. ও ১৪ মুসলিম কবির পদসাহিত্য : পদসংখ্যা : ২২৩, ১৯০।
১৫. পুঁথি-পরিচিত : পৃ. ২৪০-৪৬।
১৬. ঐ : পৃ. ৫৯৭।
১৭. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৬৩৬।
১৮. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২১৭।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৪২১।
২০. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : পৃ. ১৬৫।
২১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ১ম খণ্ড, অপর (১৯৬৩) : ৩য় স.। পৃ. ৩৪৩।
২২. ওফাতে রসূল (ভূমিকা)।
২৩. বাংলা সাহিত্যের কথা : (২য় খণ্ড, মধ্যযুগ) পৃ: ১২৩।
২৪. সওগাত : ১৩৪৩, ফাল্গুন।
২৫. ক. আল্ ইসলাহ : ৮ম বর্ষ, ১ম–৩য় সংখ্যা, পৃ. ১।
খ. বাঙ্গালার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি : পৃ. ১৩০–৩১।
গ. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫১ সন, ৫১ বর্ষ, ৩য়–৪র্থ সংখ্যা
২৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : ১৩৪২, ৪১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৩৮।
২৭. মাসিক মোহাম্মদী : ১৩৫২, বৈশাখ, পৃ. ২৭২–৭৩।
২৮. ওফাতে রসূল : ভূমিকা, পৃ. -১।
২৯. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ১৪৮।
৩০. ক. মোহাম্মদী : ১৩৫৯ সন, বাংলা সাহিত্যের কথা : ডক্টর শহীদুল্লাহ। পৃ. ২৯।
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ১৪৮।

AMARBOI.COM

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থসংখ্যা

সৈয়দ সুলতানের রচিত গ্রন্থ-সংখ্যা সম্বন্ধেও বিদ্বানদের মনে বিভিন্ন ধারণা বর্তমান। তার কারণ তাঁর মূলগ্রন্থ নবীবংশের বিভিন্ন পর্ব স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে চালু ছিল এবং তাঁর 'জ্ঞান-প্রদীপের' চৌতিশা অংশও 'জ্ঞান-চৌতিশা' নামে স্বতন্ত্র পুঁথিরূপে পাওয়া যায়। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ পুঁথি সংগ্রহকালে যখন যে-পর্ব পেয়েছেন, সে-পর্বের নাম গ্রন্থনামরূপে ধরে বিবরণ লিখেছেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ১৩৪১ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় নবীবংশ, শবে মেরাজ, হযরত মুহম্মদ চরিত, ওফাত-ই-রসূল, ইব্লিসের কিস্সা, জ্ঞান-চৌতিশা, জ্ঞান-প্রদীপ প্রভৃতিকে নবীবংশ; শবে মেরাজ এবং জ্ঞান-প্রদীপ– এই তিনটি মূল রচনার বিভিন্ন অংশ বলে মনে করেছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯৫৫ সনে) তিনি আবার বিভিন্ন পর্বকে পৃথক গ্রন্থরূপে মেনে নিয়ে সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থসংখ্যা দশখানা বলে উল্লেখ করেছেন। (মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য পৃ. ১৪৯)। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,[১] ডক্টর সুকুমার সেন[২] প্রমুখ বিদ্বানেরা পাণ্ডুলিপিগুলো দেখেননি। তাঁরাও সাহিত্যবিশারদের বিবরণ ও ডক্টর হকের প্রবন্ধ ও গ্রন্থের অনুসরণ করেছেন।

আমরা নবীবংশের পুরো পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করেছি। তাতে এক হযরত মুহম্মদের চরিত-কথার অংশ ব্যতীত অপরাংশগুলোর মধ্যে পর্ববিভাগজ্ঞাপক কোনো প্রারম্ভিক উক্তি নেই। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর হক যে-অংশটুকুকে 'শবে মেরাজের' উপক্রম বলে অভিহিত করেছেন, তা আসলে নবীবংশেরই প্রারম্ভিক উক্তি, 'শবে মেরাজ' পর্বে লিপিকর কর্তৃক সংযোজিত। সেই অংশটুকু তুলে ধরছি :

বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম
আল্লার মহিমা জান কহিতে অসীম।
প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার
আদ্যেত আছিল যাহা করিমু প্রচার।
দ্বিতীএ প্রণাম করি রসুল খোদার
নুর মুহম্মদ বুলি জগতে প্রচার।
তৃতীএ প্রণাম করি আছব্বা সবারে
চতুর্থে প্রণাম করি পীর পয়গাম্বরে

অপর পাঠ : (পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৫৪৮)

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আকাশ পাতাল ক্ষিতি সৃজন যাহার।
দ্বিতীএ প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আদ্যেত আছিল যাহা করিমু প্রচার।
যেরূপে আদম সফি হৈল উৎপন্নি
কহিবাম সেসব কিঞ্চিত বিবরণ।

অন্য পাঠ : (পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৫৫১)

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
আদ্যেত আছিল জাহা করিব প্রচার।
যেরূপে আদম ছফি হইল উৎপন
কহিম সেসব কথা বুঝিতে কারণ।
এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুয়ায়
প্রকাশ্যে সকল কথা মনে নাহি লয়।
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত-কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মুসলমান তাএ ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহ শত রস যুগে অব্দ গোঞাইল
দেশীভাষে এহি কথা কেহ ন কহিল।
আরবী ফারসী ভাষে কিতাব বহুত
আলিমানে বুঝে ন বুঝে মূর্খ যত।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসূলের কথা যত কহিমু অধিক।
লস্করের পুরখানি আলিম বসতি
মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলিমান গণে আমি মাগি পরিহার
ক্ষেমিবা পাইলে দোষ ন করি গোহার।
সৈয়দ সুলতানে কহে কেনে ভাবি মর
সহায় রসূল যার তরিবে সাগর।

অন্যত্র–

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী হইছে
একে একে সভানের পরস্তাব রৈছে।
এক পুস্তকেত এত লেখিবারে নারি
এক রসুলের যদি এক পুথি করি
তবে কথঞ্চিৎ জান লেখিবারে পারি।

রসূল চরিতের শুরু :

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
অর্ধেক যে আছিল কথা করিমু প্রচার।
যে-রূপে আদম সফি হইল উৎপন
কহিল কিঞ্চিৎ কথা সে সব বিবরণ।
এবে আহ্মি কহিবাম শুণ দিয়া মন।

অপর পাঠ (পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৪৭৫)

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার
অঙ্গিকার আছিল তাহা করিলুঁ প্রচার ...
দিতিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
নূর মোহাম্মদের কথা সুন বিবরণ।

অপর পাঠ (পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৪৭৯)

প্রথমে প্রণাম তর্ত্ত প্রভু নৈরাকার
আদ্যে যে আছিল তাহা করিলুঁ প্রচার।
যেরূপে আদম ছপি হৈল উৎপন
কহিবম সেসব কিঞ্চিৎ বিবরণ
দিতিএ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
নূর মোহাম্মদের কহিমু বিবরণ।

রসুল চরিতের গোড়ার দিকে এক জায়গায় :

কিতাবেত লিখিয়াছে যে সকল ভাল।
যেইমতে নিরঞ্জন সৃজিল সংসার
প্রথমে কহিএ আছি সে সব প্রকার!
পুনরপি সে সব কহিতে কার্য নাই।

অতএব সৃষ্টিপত্তন থেকে হযরত মুহম্মদের আবির্ভাব পর্ব অবধি কাব্যের প্রথম খণ্ড এবং রসুল চরিত দ্বিতীয় খণ্ড। এ সূত্রে লিপিকরদের কেরামতিও দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ২ ॥

শব-ই-মেরাজ-এর শুরুতেও পর্ববিভাগ জ্ঞাপক কোনো ভূমিকা বা অবতরণিকা নেই। রসুলের সানুচর মদিনা গমনের পরেই জমকছন্দে রচিত। মধ্যে রয়েছে কেবল প্রসঙ্গান্তরের ছেদ। যথা : পূর্ব প্রসঙ্গের শেষ চরণগুলো :

রসুলের আজ্ঞা পাই যথ জ্ঞাতিগণ
মক্কা ছাড়ি মদিনাতে করিলা গমন।
রসুলের পদযুগে করি পরণাম
রচিলেক পঞ্চালি অতি অনুপাম।
জমকছন্দ
হেন কালে অনাদি নিধন করতার
আদেশ করিলা সব ফিরিস্তা আল্লার।...
রজব চান্দের আজি সাতাইশ রাত্রি
ফিরিস্তা সকলে মিলি আন গিয়া তানে
আজি একত্র দোঁহ বসিমু সিংহাসনে।

মেরাজ পর্ব খদিজার মৃত্যুতে শেষ। অতএব 'শবে-মে'রাজ' স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়—পর্ব মাত্র।

॥ ৩ ॥

ইব্লিসনামাটি কোনো পর্বও নয়, শবে মেরাজের শেষের দিকে ইব্লিস তথা শয়তানের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া একটি কাহিনীর মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। শিক্ষামূলক এই আচার ও আচরণ বিধি স্বতন্ত্রভাবেও সম্ভবত চালু ছিল। আর হযরত মুহম্মদ-কথার উপসংহার প্রসঙ্গে কবি যে বলেছেন :

পয়গাম্বর সবের মহিমা প্রচারিলুম
পাপমতি ইব্লিসের অযশ ঘোষিলুম।

এখানে পয়গাম্বর অর্থে হযরত মুহম্মদও, এবং সৃষ্টিপত্তন কাল থেকে রসুলের মক্কা-জয় অবধি সর্বত্রই ইব্লিসের দৌরাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। সে অর্থেই 'ইব্লিসের অযশ ঘোষিলুম' উক্তি প্রযুক্ত হয়েছে। তাত্ত্বিক অর্থে এই উক্তি যথার্থ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

কেননা, শয়তান হচ্ছে পাপের প্রতীক। আর ধর্মকথা হচ্ছে পাপ এড়ানোর বিধি ও বুদ্ধির আকর।

॥ ৪ ॥

সাহিত্য-বিশারদ-উক্ত এবং পুঁথি পরিচিতিতে বিধৃত (পৃ. ৩৯) পুঁথির ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সংগৃহীত ২৬৮-৬৯ সংখ্যক পুঁথির ইব্লিসনামা ভণিতাবিহীন। ডক্টর হকের রসুল-চরিত পুঁথির শেষভাগে ইব্লিসনামাটি স্বতন্ত্রভাবে লিপিকৃত। আমাদের ধারণায় এটি ভিন্ন কবির রচনা। এর আরম্ভ এরূপ :

একদিন সৈন্য সমুদিত পয়গাম্বর
মেলা করি বসিছিলা আয়শার ঘর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেরূপে আমদ সফি হৈল উতপণ
(হেনকালে অকস্মাৎ)কহন্ত রসুলে বসি সে সব কথন।...
রসুলে বুলিলা এই ইব্লিস দুর্বার
আসিয়াছে মোর কাছে কহিতে উত্তর।

পুঁথিপরিচিতির (পৃ. ৩৮) ক্রমিক ৩৫ সংখ্যক পুঁথির পাঠ আর এ পাঠ অভিন্ন। বিশেষ করে ইব্লিসনামায় রসুল ও ইব্লিসের উত্তর-প্রত্যুত্তরের যে দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে (প্রায় ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী), তার সঙ্গে রসুল পর্বের কোনো সঙ্গতি নেই। রসুলচরিত পর্বের কোনো পাণ্ডুলিপিতেও তা পাওয়া যায়নি।

॥ ৫ ॥

মেরাজ কাহিনীর পর রসুলের ইসলাম প্রচার উদ্দেশে দেশ ও গোত্র বিজয় কাহিনীর কয়েকটি বর্ণিত। এর শেষে 'একে একে মারিল লৈল চল্লিশ শহর' বলে বিজয় বর্ণনা সমাপ্ত করে কবি এভাবে ওফাত-ই-রসুল শুরু করেছেন :

রসুলের মনেত বহুল হাবিলাস
শহীদ হৈয়া যাইতে এলাহির পাশ।

অতএব, এর আরম্ভটিও গ্রন্থ হিসেবে এর স্বাধীন সত্তার পরিপন্থী।

॥ ৬ ॥

ডক্টর হকের উদ্ধৃত :

জে সবে মোমিন হয় করুণা হৃদএ
নবীবংশ মেহেরাজ রাখিতে জুআএ।
এ দুই পুস্তক যদি পালিবারে পারে
আল্লার গৌরব হৈব তাহার উপরে।

–এই অংশটুকুতে লিপিকর প্রমাদ রয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। কেননা, এক, এই অংশটুকুর পাঠ আমাদের আলোচিত পাণ্ডুলিপিগুলোর একটিতে অন্যরূপ আছে :

(পুঁথি ১০২)

যে সকল মুমীন হএ করুণা হৃদএ
নবীবংশ পুস্তক রাখিতে জুয়াএ।
এহি পুস্তক যদি পারে রাখিবারে
আল্লার গৌরব হয় তাহার উপরে।

দুই, আগেই দেখিয়েছি মেরাজ কোনো স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়। তিন, মেরাজ অংশের গুরুত্ব যে কারণে নবীবংশে সে গুরুত্ব আরোপ করা যায় না। কবির উক্তি হলে তা হযরত মুহম্মদ কাহিনীর পুরো অংশের কথাই বলা হত। চার, কবি তাঁর রচিত অন্যান্য অংশের গুরুত্ব মনস্তাত্ত্বিক কারণেই নিজে থেকে অস্বীকার করতে পারেন না।

স্বয়ং সৈয়দ সুলতান তাঁর সমগ্র রচনাকে 'নবীবংশ' বলে অভিহিত করে হযরত মুহম্মদের ওফাত-পূর্বাবধি বর্ণনার পরে পাঠক ও শ্রোতার উদ্দেশে বলেছেন :

তোমরা সবের মুঞি জান হিতকারী
ইমা ইসলামের কথা দিলাম প্রচারি।
যেরূপে সৃজন হৈল এ তিন ভুবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেরূপে আদম হাওয়া সৃজন হৈল।
যেরূপে যথেক পয়গাম্বর উপজিল
বঙ্গেত এসব কথা কেহ না জানিল
নবীবংশ পাঁচালীতে সকলে শুনিল।

অথবা, এত ভাবি নবীবংশ পাঁচালী রচিলুম
আল্লা এক মনে ভাবি প্রচার করিলুম।
তে কারণে কত কত পশুবুদ্ধি নরে
কিভাব ভাঙ্গিলুম করি দোষএ আমারে।

ওফাত-ই-রসুলের উপসংহারে আছে :

উমর খত্তাব যদি শহীদ হইল
তার পাছে আমীর উসমান রাজ্য পাইল।
উসমান নৃপতি ছিল দ্বাদশ বৎসর
পরস্তাব তাহান আছএ বহুতর।
ভিন্ন এক পুস্তক রচিতে পারি যবে
কথঞ্চিৎ সেই কথা কহিতে পারি তবে।

রসুল মুহম্মদের পুত্র-কন্যার পরিচিতি-দান প্রসঙ্গেও সৈয়দ সুলতান বলেছেন :

তবে উমর সলিমাকে নিকাহা করিতে
বহুল আছিল শ্রধা উসমানের চিতে
সে সকল কথা আম্মি কহিবাম পাছে
এ সকল পরস্তাব বহুতর আছে।

আবুবকর, উমর প্রভৃতি নবী নন, তাই তাঁদের কাহিনী নবীবংশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এর জন্যে ভিন্ন পুস্তক রচনার প্রয়োজন ছিল। কবির অভিপ্রায়ও ছিল তাই। কিন্তু তিনি কোনো কারণে সে অভিপ্রায় কাজে পরিণত করতে পারেন নি। তাঁর আগ্রহে তাঁর শিষ্য কবি মুহম্মদ খান তাঁর বাঞ্ছা পূরণ করেন। তাঁর মুখে আমরা শুনতে পাই :

নবীবংশ রচিছিলা পুরুষ প্রধান
আদ্যের উৎপন্ন যত করিলা বাখান।
রসুলের ওফাত রচিয়া না রচিলা
অবশেষে রচিবারে মোক আজ্ঞা দিলা।
তান আজ্ঞা শিরে ধরি মনেত আকলি
চারি আছাব্বার কথা কৈলুঁ পদাবলী।
দুইভাই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া
প্রলয়ের কথা সব দিলুঁ প্রচারিয়া
অন্তে পুনি বিরচিলুঁ প্রভু দরশন
এহা হোন্তে ধিক কথা নাহি কদাচন।
দুই পঞ্চালিকা যদি একত্র করএ
আদ্যের অন্তের কথা সন্ধিযুক্ত হএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই পঞ্চালিকা নবীবংশ ও মক্তুল হোসেনকেই নির্দেশ করে। অতএব সৃষ্টিপত্তন থেকে ওফাত-ই-রসুল অবধি সমগ্র রচনার নাম নবীবংশ।

॥ ৭ ॥

'মক্তুল হোসেন' একাদশ পর্বে হাসর অবধি বর্ণিত হয়েছে। পর্বগুলো এরূপ :

১. আদিপর্বে ফাতেমার বিবাহ কহিব
দুই ভাইর জন্ম তবে পাছে বিরচিব।...
২. কহিব দ্বিতীয় পর্বে শুন দিয়া মন
চারি আসহাবার কথা শাস্ত্রের নিদান।...
৩. কহিব তৃতীয় পর্বে হাসানের বাণী
জয়নবকে বিবাহ করিলা মনে গুণি।...
৪. চতুর্থে মুসলিম পর্ব শুন দিয়া মন...
৫. কহিব পঞ্চম পর্বে যুদ্ধ অবশেষ ...
৬. ষষ্ঠমে হোসেন পর্ব কহিবাম পাছে...
৭. সপ্তমেত স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি...
৮. অষ্টমেত স্ত্রীপর্ব কহিবাম পুনি...
৯. নবমে ওলিদ পর্ব শুন গুণিগণ...
১০. দশমে এজিদ পর্ব কহিবাম এবে...
১১. একাদশ পর্ব তার পশ্চাতে কহিব
প্রলয় হইতে যথ অনর্থ হইব।
যেন মতে দজ্জাল পাপী ভুলাইব নর
যেন মতে আসিয়া পুনি ইসা পয়গাম্বর।
মোহাম্মদ হানিফা ইমাম সঙ্গে করি
যেমতে পালিবা লোক দজ্জাল সংহারি।
এয়াজুজ মাজুজ সেই দুই বাহিনী
যেন মতে হিসাব দিবেক সর্ব জানি।

এটি যে পীর সৈয়দ সুলতানের আরব্ধ কার্যে সমাপ্তি দানের জন্যে রচিত তাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে :

পীরের কথার প্রতিধ্বনি করে মুহম্মদ খানও বলেছেন :

হিন্দুস্তানে লোক সবে না বুঝে কিতাব
না বুঝি না শুনি নিত্য করে মহাপাপ।
তেকাজে সংক্ষেপ করি পঞ্চালি রচিলুঁ
ভাল মন্দ পাপ পুণ্য কিছু না জানিলুঁ।...
পঞ্চালি পড়িতে যবে মনে ভয় পাই
অবশ্য কিতাব কথা শুনিবেক যাই।
কিতাবে আল্লার আজ্ঞা শুনিবেন্ত যবে
দান ধর্ম পূণ্য কর্ম করিবেন্ত তবে।
অবশ্য মোহোরে সবে দিবে আশীর্বাদ
মহাজন আশীর্বাদে খণ্ডিব প্রমাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ পীরের আজ্ঞা না যায় লঙ্ঘন
রচিলুম পঞ্চালিকা তাহার কারণ।

॥ ৮ ॥

আর জ্ঞানচৌতিশা স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপে চালু থাকলেও তা জ্ঞানপ্রদীপেরই অংশ। সম্ভবত স্মৃতিতে ধরে রাখার সুবিধার জন্যেই জ্ঞান প্রদীপোক্ত সারকথা চৌতিশায় বিধৃত হয়েছে।

এছাড়া সৈয়দ সুলতান সাধনতত্ত্বানুগ পদাবলীও রচনা করেছেন। তাঁর রচিত প্রাপ্ত পদের সংখ্যা চৌদ্দ।

'জয়কুম রাজার লড়াই'-এর আরবি হরফে লিখিত একখানা আদ্যন্ত খণ্ডিত পাণ্ডুলিপি পেয়েছিলেন সাহিত্যবিশারদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালা থেকে তা কয়েক বছর আগে খোয়া গেছে। পুঁথিপরিচিতিতে [পৃ. ১৭৪] তার বিবরণ আছে। সম্প্রতি আরবি হরফে লিখিত আর একখানা পাণ্ডুলিপি আমার হস্তগত হয়েছে। সাহিত্য-বিশারদ সংগৃহীত পুঁথিটিতে ছিল জয়কুম রাজার কূপ-খনন থেকে মালেক শাহ বা মুলুকশাহর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন অবধি। আমার পুঁথিও আদ্যে ও মধ্যে খণ্ডিত। শেষ পত্র দুটো আছে। জয়কুমের রাজ্য-সীমায় পৌঁছে রসুল জয়কুমের কাছে যখন কাসেদ পাঠাচ্ছেন সেখান থেকেই শুরু। রসুল-রচিত পর্বের কোনো পুঁথিতেই এ কাহিনী মেলেনি। তাই মনে হয়, এটি কবির স্বতন্ত্র রচনা। কিন্তু এ নিছক অনুমান মাত্র। জয়কুম রাজার লড়াইর প্রথমাংশ পাওয়া গেলে হয়তো সহজেই বোঝা যেত এটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা কিংবা রসুল চরিতের একটি অংশ।

অতএব সৈয়দ সুলতান নবীবংশ, জ্ঞানপ্রদীপ ও পদাবলী রচয়িতা এবং জয়কুম রাজার লড়াই নামে একটি স্বতন্ত্র যুদ্ধ কাব্যেরও রচক।

AMARBOI.COM

উৎস নির্দেশ

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা।
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : অপরার্ধ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নবীবংশ পরিচিতি

কাব্যের 'নবীবংশ' নামটি 'রঘুবংশ' ও 'হরিবংশ'-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'নবীবংশ' নামটি একালের আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে তাৎপর্যহীন বলে মনে হবে। কেননা, এটি প্রথমত কেবল নবী-কাহিনী– তাঁদের কারুর বংশধরের বর্ণনা নয়। অবশ্য 'নবীবংশ'-কে দরাজ অর্থে আদম নবীর বংশধর-কাহিনী বলে ধরলে এ নামের কেবল আংশিক যাথার্থ্য খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ এ কাব্যে তাঁর সব বংশধরের কথা নেই। মনে হয় 'নবীবংশ' নামে কবি মুখ্যত নবীপরম্পরা নির্দেশ করেছেন। আমাদের অনুমান সত্য হলে 'রঘুবংশ' কিংবা 'হরিবংশ' নামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুকৃতি এ ক্ষেত্রে অসঙ্গত ও অসার্থক হয়েছে। কেননা 'বংশ'-এর যে-সামান্য অর্থ চালু রয়েছে, তার সঙ্গে এ অভিধা মেলে না। সব নবী অভিন্ন গোত্রেরও নন। অতএব, 'বংশ' শব্দটিকে কুল, পরম্পরা, সমূহ, গণ, বর্গ প্রভৃতি অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। এবং এই অভিধায় চিহ্নিত করলেই 'নবীবংশ' নামের যাথার্থ্য ও সার্থকথা স্বীকার করা সহজ হবে। এই তাৎপর্যে আস্থা রাখলে নামটি রঘুবংশ বা হরিবংশ-এর অনুকৃতি বলেও মনে হবে না।

বাঙালি কবি আরবদেশের চিত্রাঙ্কনে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর দেশের মানুষ, সমাজ, আচার, আহার্য প্রভৃতিই তাঁর কল্পনাকে ঘিরে রেখেছিল, তাই তাঁর হাতে আমরা মরুভূ আরবের কোনো আবহ পাইনে, বাঙলাদেশকেই তিনি আরব নামে চালিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য কেবল তিনিই নন, অন্য সব কবিও আরবের বিনামীতে বাঙলাদেশ ও বাঙালিকে তুলে ধরেছেন। যিনি লিখেছেন তাঁর যেমন সে-দেশ ও দেশের মানুষ সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তেমনি যারা পড়ুয়া ও শ্রোতা, তাদেরও কোনো ধারণা ছিল না। কাজেই কাহিনীর আবেদন কিংবা কাব্যরস কোথাও ব্যাহত হয়নি। আবার নবীদের সম্বন্ধে বর্ণিত কাহিনীগুলোও সব কাল্পনিক। অবশ্য সেগুলো সৈয়দ সুলতানের বানানো নয়, তাঁর আগে হাজার বছর ধরে ওসব কাহিনী লোকপরম্পরায় তৈরি ও পল্লবিত হয়ে তাঁর কানে এসেছে। সে যুগের বিশ্বাসপ্রবণ অজ্ঞ মানুষের সত্যাসত্য সম্পর্কে প্রশ্ন জাগেনি, সেদিক দিয়েও কাব্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়নি। বিশেষ করে বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব। কাজেই ধর্মকথায় যুক্তিতো অচল বটেই, বরং অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছু না থাকলে ঐশ্বরিক অভিজ্ঞান মেলে না। এ কারণে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে ব্যাপ্ত জগতে ও মহৎজীবনে অসামান্যকে প্রত্যক্ষ করাই লোক-চরিত্র। আজো মানুষের চরিত্রে এই লক্ষণ প্রবল। যে আমার তোমার মতো প্রকৃতি ও নিয়মের দাস, সে আর বড় কিসে। কাজেই মহত্ত্ব ও অসাধারণত্ব প্রমাণের জন্যে অলৌকিককে লোকায়ত, অসম্ভবকে সম্ভব এবং অস্বাভাবিককে মহতের স্বভাবধর্মে প্রত্যক্ষ করাতে হবে। অতএব, কেরামতি দেখাতেই হবে তা জাদু দিয়েই হোক আর টোনা করেই হোক।

তাছাড়া, অজ্ঞতাবশে সেকালের মানুষ ছিল অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রিয়, দৈবনির্ভর ও স্বাপ্নিক। তাদের মনোজগতে বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা ছিল অস্পষ্ট। যুক্তি-বুদ্ধির প্রভাব ছিল সামান্য। তাদের কাছে রূপকথা মনে হত বাস্তব আর বাস্তব ঘটনাও তাদের বর্ণনায় হয়ে উঠত রূপকথা। কেননা তারা ভূত-প্রেত-দেও-দানোতে বিশ্বাস রাখত। ঝাড়-ফুক, তুক-তাক ও দারু-টোনাতে পেত ভরসা। রোগে-শোকে, সুখে-সৌভাগ্যে ও দুর্যোগে-দুর্দিনে তারা অনুভব করতো অলৌকিক শক্তির অদৃশ্য হাতের লীলা। এর ফলে তাদের বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিচ্ছবি পাই তাদের আচরণে ও সাহিত্যে।

এও স্বীকার্য যে, মানুষের প্রবৃত্তিতেই নিহিত রয়েছে অতিভাষণের বীজ। তার নিদর্শন পাই তার ভাষায়, তার অলঙ্কার প্রয়োগ-প্রবণতায় ও বাগ্বিধিতে। মানুষের এ অতিভাষণেই তো কাব্য-কবিতার জন্ম। আবার, নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই বৃত্তি বা প্রবৃত্তির ভিন্নমুখী প্রকাশ ঘটে। শ্রদ্ধা বা ঘৃণা মানুষকে অতিকথনে এবং দোষগুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তিশ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা জোগায়। লোক-চরিত্রের এই প্রবণতা শ্রদ্ধেয় জনকে করে অতিমানুষ আর ঘৃণ্যজনকে বানায় অমানুষ। এ কারণেই মানুষের ইতিহাস, চরিতকথা এবং কিংবদন্তি যুক্তি-বুদ্ধি, বাস্তব-অবাস্তব এবং সম্ভব-অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করে এবং রূপকথাকেও সময় সময় হার মানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে রচিত আরবী-ফারসী নবী কাহিনীকে আদর্শ করে সৈয়দ সুলতান স্বাধীনভাবে তাঁর নবীবংশ রচনা করেছেন। তিনি বাঙলাদেশের পটভূমিকায় এঁদের জীবনচিত্র এঁকেছেন। কবির বিবৃত কাহিনীর কাঠামো নিম্নরূপ :

নর-রূপী ফিরিস্তা বৈদিক নবীরা তথা বৈদিক মানুষেরা যখন ইব্লিসের প্ররোচনায় আদর্শভ্রষ্ট ও অনাচারী হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্ রুষ্ট-বিরক্ত হয়ে বললেন :

না ধরিল পাপী সবে বেদের বচন।
বেদশাস্ত্র সৃজিয়া না কৈলা কোন কাজ
রাখ নিয়া চারিবেদ সমুদ্রের মাঝ।
মোর বাক্য লজ্ঘিলেক যথ পাপীগণ
তেকারণে কৈল আহ্মি সেসব নিধন।... ...
শূন্যকার পৃথিবী দেখিয়া নৈরাকার
আদমকে চাহন্ত ক্ষিতিত রাখিবার।

আদম যে-স্বর্গে বাস করতেন, তাও যেন বসন্তকালীন বাঙলাদেশ :

মন্দ মন্দ বায়ু বহে কোকিলে পঞ্চম গাহে
পত্রসব বিজুলি প্রকাশ।
চারিদিকে তরুগণ যেহেন গন্ধিনী বন
নবীসব বসে চারিপাশ।

একদিন আদম স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর বাম অস্থি থেকে সালঙ্কারা এক নারী আবির্ভূতা হলেন :

নতুনা যৌবন বালা রূপেগুণে অনুপমা
যেন চন্দ্র উদয় বিশেষ।

তারপর নিদ্রাভঙ্গে আদম এই রূপসীকে পাশে দেখে পুলকিত হলেন :

অন্যে অন্যে দেখা হৈল আঁখি আঁখি মিলাইল
হৃদএ ফুটিল কামশর।

পৃথিবী শূন্য রইল দেখে আল্লাহ্রও ইচ্ছা হল আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে পাঠানোর। এদিকে তাঁরা সাপরূপী শয়তানের শিকার হওয়ায়, সেকাজ ত্বরান্বিত হল। শাস্তিস্বরূপ আদমকে নিক্ষেপ করা হল সরন্দীপে আর হাওয়াকে জেদ্দায়। বিবস্ত্র আদমের হাতে ছিল 'আসা' আর আঙ্গুলে ছিল অঙ্গুরীয়।

সেই 'আসা' ও 'অঙ্গুরী' মুসা, সোলায়মান এবং অপর এক নবীও ব্যবহার করেছেন।

সরন্দীপে এক মৎস্যই আদমকে স্বর্গ থেকে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে এবং সে তার বন্ধু বানরকে এ সংবাদ দেয়।

এদিকে অনুশোচনায় হাওয়া বিলাপ করতে লাগলেন। আদমেরও দুঃখ ও আফসোসের অন্ত নেই। অবশেষে কোহ্-ই-কাফ-এর গোড়ায় বহুকাল পরে উভয়েরই মিলন হয়।

তারপর আদি মানব-মানবী গোধুমের রুটি করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে থাকেন। একদিন হাওয়া আদমকে সন্দেশ তৈরি করে খাওয়ালেন :

হাওয়ায় সন্দেশ সিদ্ধ করিতে লাগিল।
সিদ্ধ হৈল সন্দেশ দেখিয়া অনুপম।
ভোজন সময় কৈলা প্রভুক প্রণাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর জীবিকার জন্যে আদম কৃষিকার্য করতে মনস্থ করলেন :

বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিলা
জিব্রাইল সম্বোধিয়া আদমে বুলিলা।
ঈষ কুঁটি লাঙ্গল সে তাতে শোভে ফাল
সাপটা আনি জিব্রাইলে দিলেন্ত ততকাল।

এদিকে জিব্রাইল তিনটি প্রজনন বীজ এনে দুটো আদমকে এবং একটি হাওয়াকে খাইয়ে দিলেন, সেই থেকে হাওয়া রজঃস্বলা হন এবং নারী ধন-সম্পদে পুরুষের অর্ধেক অধিকার পায়। আল্লাহর অনুমতি পেয়ে আদম-হাওয়া রতিরস ভুঞ্জিতে থাকেন, স্বর্গ থেকেই তাঁদেরকে খাট, গালিচা, দুলিচা, গদী ও অন্তস্পট (পর্দা) দেয়া হল। আদম-হাওয়ার শৃঙ্গারের বর্ণনায় কবি সঙ্কোচ বোধ করেননি, তাঁর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি তা রসিয়ে বর্ণনা করেছেন :

মদন কমল পাশে যেন অলিরাজ
চকোর রহএ যেন শশোদর আশে
দিবাকর দেখি যেন নলিনী বিকাশে।
বঙ্ক নয়ানে হেরি ঈষৎ হাসিল ...
ভুরুযুগ কটাক্ষে কাম-সর সাধি
হাওয়ায় আদম-মন-পক্ষী কৈলা বন্দী।
অতি মোহে করে ধরি আলিঙ্গন করে
সঘন চুম্বএ অতি ললাট উপরে।
ভক্ষিবারে অন্ন যদি শ্রধা হৈল মনে
প্রথমে লোনেত কর বাড়াইলা যতনে।
জিহ্বা মূলে লোন যদি প্রথমে লাগিল
অন্ন খাইবারে তবে কর বাড়াইল।

এরপর হাবিল-আকিমা-কাবিলের কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। কাবিল হাবিলকে হত্যা করে আকিমাকে পত্নী করে নিল। মনুষ্য সমাজে এই প্রথম বিবাদ, হত্যা ও নারীর রূপবহ্নিতে পুরুষের আত্মাহুতি শুরু হল। কাবিল চিরকালের মতো শয়তানের খপ্পরে পড়ল। অন্যায়, অনাচারের এভাবেই শুরু। কাবিল বংশ থেকেই আবার পৌত্তলিকতার আরম্ভ। শয়তানের প্ররোচনায় কাবিল মাতাপিতার প্রতিমা গড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে থাকে।

আকিমার বিলাপ যে-কোন সদ্যবিধবা বাঙালি নারীর বিলাপ বলে ধরে নেয়া যায়। চৌতিশায় আকিমার বিলাপ বর্ণিত। আকিমা ও কাবিলের অনুশোচনাও অকৃত্রিম হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ।

আকিমা কাবিলের মনে নীতিবোধ জাগানোর শেষ চেষ্টা করল :

তোর মোর একজন্ম কেনে কর অপকর্ম
কিসকে করহ অবেভার
তোর মোর হৈল ঘর অপকৃতি হৈব বড়
রহিবেক কুলের খাখার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু সব বৃথা গেল, শয়তান যার মর্মমূলে আসন পেতেছে, তার মনে সুবুদ্ধির উদয় অসম্ভব।

অবশেষে শয়তানের প্ররোচনায় আকিমা কাবিলকে দেহদানে সম্মত হল। এখানেও সম্ভোগের বর্ণনা রয়েছে। আমাদের দেশী নারীর বস্ত্র অলঙ্কারও আকিমার দেহে প্রত্যক্ষ করি :

চুম্বিয়া যখন করে আলিঙ্গন
সঘন কিঙ্কিনী বাজে
নেপুর অনুক্ষণ বাজএ চরণ
রুণু ঝুণু শব্দে বাজে
ঘাগর কিঙ্কিনী শব্দ মাত্র ধ্বনি
কুমারী বিমোহে লাজে।
কাঞ্চুলি ফাড়িল বসন খসিল
ভুলিল যথ মান ...
বিশেষ ঘর্মজলে সিন্দুর কাজলে
একত্রে হই গেল মেল ...
চন্দন হইল দূর বসন খসিল উর
ছিঁড়িল কণ্ঠের মুক্তাহার
কুঙ্কুম কস্তুরী অঙ্গ পরিহরি...

কাবিলও শয়তানের পরামর্শে বনে কৃষিকার্য শুরু করল। আর

ঘৃত-দুগ্ধ-সর্করা খাঅন্ত বহুতর।

AMARBOI.COM

আদমের কাছে ওপারের ডাক এল, পার্থিব জীবনের মায়ামুগ্ধ আদম পথভ্রষ্ট পুত্র-কন্যার জন্যে দুঃখ করছেন :

স্ত্রীপুত্র শোকে নবী করন্ত বিলাপ।
পৃথিবীতে আর এক রহিলেক দুঃখ
যে হোন্তে কাবিল পুত্র হইছে বিমুখ।
আকিমার কারণে যে পোড়ে তন মন।

জীবন-সঙ্গিনীর জন্যেও–

আর না দেখিমু প্রিয়া তোহ্মার চাঁদ মুখ
এহিসে মনেত মোর বড় লাগে দুখ।
কোনরূপে নিদ্রা তুহ্মি যাইবা একসরী
কিরূপে বঞ্চিবা নিশি আহ্মা পরিহরি।

হাওয়াও আমাদের-চির-পরিচিতা নারী, আসন্ন বৈধব্য দুঃখে তিনিও বিলাপ করছেন :

নয়নের জল পড়ে জিনি জলধর
ক্ষিতিতে পড়িয়া বিবি বিলাপিলা অতি।

আদমের মরদেহ কুফাতে সমাহিত হল। হাওয়া দ্বাদশ মাস তথা এক বছর ধরে বিলাপ করলেন, সে-বিলাপ বৃদ্ধা বিধবার নয়, যুবতীর। এটি আঙ্গিকে বারমাসী, বিষয়ে বাহ্যত মরাকান্না। কিন্তু আসলে যুবতীর বিরহ বিলাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈত্রে– হতভাগী পুষ্প মুঞি আদম বিকাশ
মোহোর স্বামী নাহি মোর পাশ।

জ্যৈষ্ঠে– কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন
দক্ষিণ সমীর শমন সমান।
আনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ।

আষাঢ়ে– আহ্মার চাতক পিয়া গেলা দিগন্তর
জলধ হইয়া আহ্মি আছি একসর।

আশ্বিনে– কস্তুরী চন্দর অঙ্গে করহুঁ লেপন।
চন্দ্রিমার জোত মো'ত লাগে হুতাশন।

পিতৃশোকাতুর শিশকে জিব্রাইল প্রবোধ দান ছলে মানবজীবনের স্বরূপ জানাচ্ছেন:

জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতেক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।
স্বর্গের উৎপত্তি জান স্বর্গেত রহিব
কি কারণে তুহ্মি সবে এ শোক ভাবিব।

হাওয়াও যখন স্বর্গে গেলেন, তখন ছেলেমেয়েরা শোক করেছে। এবং সে রকম শোকের বিলাপ আমরা আজো ঘরে ঘরে শুনতে পাই :

বাপ বুলি কারে বোলাইমু আহ্মি আর
জননীর ঠাঁই অন্ন না খুজিমু আর।

বিশেষ করে– মলমূত্র যথেক সহিল মায়ের গাএ
আনের পরাণে এত সহন না যাএ।
মাক্ষি যদি পড়ে আহ্মা অঙ্গের উপর
গিরি হেন জানি মাএ খেদায় সত্বর।
ধুলা যদি আহ্মার অঙ্গেত লাগি যায়
অঙ্গের বসনে মায় মুছিয়া পেলায়।

আদম জান্নাতবাসী হলে তাঁর পুত্র শিশ নবী হলেন। তাঁর সঙ্গে শয়তানের শিষ্য কাবিল ও তাঁর সন্তানদের লড়াই শুরু হল। এ হচ্ছে মিথ্যার সঙ্গে সত্যের, পাপের সঙ্গে পুণ্যের, সুপথের সঙ্গে বিপথের, সুমতির সঙ্গে কুমতির সংগ্রাম।

কাবিলের মৃত্যুর পর, তার সন্তানেরা শিশের আশ্রয়ে আসে কিন্তু শয়তানের প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হতে পারেনি, তাই 'হৃদয়ে কপট ভাব মুখেত পীরিত' রেখে শিশকে মুগ্ধ করেছে। সরল শিশ–'আপনার পুত্র কিবা ভ্রাতৃর তনয়, ভিন্নভাব না ভাবন্ত।'

কিন্তু কাবিলের সন্তানেরা শয়তানের প্ররোচনায় যে-মক্কার গৃহ মুসলমানেরা প্রদক্ষিণ করে, সেখানে জনক-জননীর মূর্তি গঠন করে অনুদিন প্রমাণ করে এবং অজ কেটে পূজা দেয়। ফলে শিশের সঙ্গে তাদের বিরোধ উপস্থিত হয়। কাবিলের পুত্র কাজিব, উকাজিল, সতাইল, নমিম, গম্মাজ, কার্তিব, আকুবত, ওবেশ, কামদেব, অর্জুন, আতস, হোসান, হুদুত প্রভৃতি বীর শিশের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে মেতে উঠল। এই যুদ্ধে ইব্লিস তাদেরকে অস্ত্রের যোগান দিয়েছিল : সে অস্ত্র ছিল রাম-রাবণের ও বলিরাজার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।
বলি রাজা যথ অস্ত্র সব রাখিছিল
ইব্লিসে সেই অস্ত্র হরি লই আইল।

কাবিলের কাফের সন্তানদের সঙ্গে জীবনব্যাপী যুদ্ধ করে শিশ নবী ওফাত প্রাপ্ত হন। তিনি নয়শ' বছর পরমায়ু লাভ করেন।

শিশ আল্লার কাছ থেকে ত্রিশখানা নির্দেশপত্র পেয়েছিলেন :

এক পত্র লেখিয়াছে ব্রত ছয় মাস (রোজা)
প্রতিদিন নিরন্তর রহিতে উপাস।
আর লেখামাত্র তাত অজপা জপিতে
আর লেখা মক্কাগৃহ প্রদক্ষিণ হৈতে।
আর লেখা দান দেঅ যদি পার দিতে
আর লেখা মুখ-কর-পদ পাখালিতে।
আর লেখা প্রণামিতে প্রভু নৈরাকার।
নিশিদিশি অনুক্ষণ প্রণামিতে তার।
আর রেখা নিরঞ্জন এক হেন জান
আর লেখা ফিরিস্তাক সত্য মনে মান।
আর লেখা মোর পত্র সব জান দঢ়
লেখা মধ্যে যেই আছে সেসব কর।
আর লেখা নবী যথ হৈছে পৃথিম্বিত
সাঁচা হেন এ সকল জানিঅ নিশ্চিত।
আর লেখা বুঝন বুঝিব একদিন
পাপী কোন্ পুণ্যকারী লইবা পরিচিন।

শিশের পরে তাঁর পুত্র ময়াইল নবী হলেন। তিনি আটশ' বছর বেঁচেছিলেন। এঁর পরে এঁর পুত্র সমাইল নবুয়ত পেলেন। সমাইল অপরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর যুবতী পত্নী দুঃখে শোকে যোগিনীর বেশ ধরতে চাইলেন। কিন্তু যখন দৈববাণী শুনলেন যে তাঁর গর্ভে এক পুত্র হবে, তখন তিনি শান্ত হলেন। এই পুত্রই আখলাক ওর্ফে ইদ্রিস। চার বছর বয়সে তাঁকে :

পড়িবারে উপাধ্যার হাতে সমর্পিলা।
নিরঞ্জনে ফিরিস্তা পাঠাই প্রতিনিত
শিশুকে পড়াই কৈলা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
পণ্ডিত হইল যদি বড়হি অপার
ইদ্রিস করিয়া নাম থুইলা তাহার।

এখানে হাসান বসরী সম্বন্ধীয় একটি কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তারপরে ইব্লিসের কারসাজি দেখানোর জন্যে বরসিয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গুরুকে অমান্য করার বা গুরু নিন্দার পরিণাম দেখানো এর অন্যতর উদ্দেশ্য।

ইদ্রিস পয়গাম্বরের কাহিনী অদ্ভুত। একবার ইদ্রিসের প্রাণ আজরাইল হরণ করে নিল। কিন্তু ফিরিস্তার অনুরোধে আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইদ্রিসের :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্য শরীরেতে প্রাণ হইল সঞ্চার।
পুনরপি ইদ্রিসের প্রাণ ঘটে আইল
পক্ষী যেন বাসা হোন্তে নিকলি সমাইল।

ইদ্রিস পয়গাম্বর জীবিতাবস্থায় সশরীরে স্বর্গবাসী হন। ইদ্রিসের স্বর্গপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে নরকের বর্ণনা আছে এবং স্বর্গনারী হুরীদের রূপও বর্ণিত হয়েছে :

কথ কথ নারী বর্ণ জিনি পুষ্পরাগ
সর্বাঙ্গে সুন্দর তনু কেবল সোহাগ।
তনুহোন্তে মৃগমদ সুগন্ধি প্রসার
কস্তুরী কর্পূর গন্ধ সুবাসিত কার;
আবীর আম্বর যত কুসুম সৌরভ
সুগন্ধি আমোদ করে সেই তনুসব।
অরুণ জিনিয়া কান্তি গায়ের বরণ
নানা ভেশ করি সব অঙ্গত পৈরণ।
চাচর চিকুর সব কস্তুরী পুরিত
সিন্দুর লাবণ্য অতি শিরেত শোভিত।
বান্ধিয়া মোহন খোপা রত্তনে জড়িয়া
বেলন পাটের জাদ চৌদিকে বেড়িয়া।
ডালিম্বের বীজ জিনি দশনের ভাতি
নাসা তিল ফুল জিনি গঠন শুভিত।
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে লম্বিত কুন্তল
শশোদর পার্শে যেন নক্ষত্র সকল।

স্তন– গোল যে গঠন অতি উঞ্চল কঠিন
মধ্যে গঙ্গাধার বহি করিয়াছে ভিন।
দুই বাহু মৃণালের পদ্মজিনি আগে
করাঙ্গুল নখসব মেহিন্দি শুভিছে।
দুতিয়ার চন্দ্র জিনি অরুণ শুভিত
সে নখ উপরে দুই হইছে বিদিত।
নাভিকুণ্ড দেশেত ত্রিবলি শোভাকার
রোমাবলী রেখ গঙ্গা বহে জলধার।
মধ্যদেশ ডম্বরু জিনিয়া ক্ষীণ।

এরপর নুহ্নবীর কথা। নুহনবীর সঙ্গে কাবিল বংশজ দানিয়াল নবীর দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। একদিন এক খসুয়া কুকুর (সর্বাঙ্গে ঘা যুক্ত) দেখে নুহ ঘৃণায় মন্তব্য করেছিলেন–এমন কুৎসিত আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন! এতে নুহর প্রতি দৈববাণী হল :

পারনি এমন এক সৃজন করিতে
প্রভুর সৃজন তুমি লাগিলা দুষিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জিত ও অনুতপ্ত নুহ একশ' বছর কাঁদলেন। তিনি অনুশোচনার কান্না কেঁদেছিলেন, 'তেকারণে নুহ যেন হৈল তান নাম'। নুহ ছিলেন শিশের বংশধর, আর দানিয়াল কাবিল বংশীয়। রাজা দানিয়াল রাজকীয় আড়ম্বরে মূর্তি পূজা করছেন :

সভান সহিতে রাজা মূরতি পূজএ
আনন্দ উৎসব সবে বহুল করএ।
পুষ্ট অজা আনিয়া দেঅন্ত বলিদান
কাঁস করতাল বাহে করি সুরাপান।
কেহ সভা মধ্যে নারী করএ শৃঙ্গার
লাজ ভয় এক নাহি পশুর আকার।
পশু মেলে পশু যেন শৃঙ্গার করয়
তেহেন শৃঙ্গার করে মনুষ্য আলয়।
শঙ্খবাদ্য নানা যন্ত্র বাহে লাসবেশে
কা'ক মনে ভয় নাহি মনের উল্লাসে।
মহাসুখে উৎসব করন্ত সর্বজন
নৃপতির সনে সব আনন্দিত মন।

নুহ নবী যখন বাধা দিতে গেলেন, তখন তাকে সবাই বেদম প্রহার করল। নুহর উপদেশ যখন কেউ শুনল না, তখন আল্লাহর ইচ্ছায় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কাফেরেরা মনে করল নুহ বুঝি টোনা করে বৃষ্টি বন্ধ করে আকাল সৃষ্টি করেছেন। তারপর নুহ নবীর প্রার্থনা অনুসারে আল্লাহ এক বৃক্ষবীজ পাঠালেন। সে বীজ বপন করা হল। অল্প কালের মধ্যে তা মহীরুহে পরিণত হলে, তা কেটে জাহাজ তৈরি করলেন নুহ। নুহ প্লাবনের কথা জানিয়ে দিয়ে প্লাবন এড়ানোর জন্যে কাফেরদেরকে সৎপথে চলার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তারা তা শুনল না, আসন্ন প্লাবনে আত্মরক্ষার জন্যে তিনি ডিঙ্গা নির্মাণে মনোযোগ দিলেন। 'যথজীব সব আছে জোড়ে জোড়ে লৈলা। ডিঙ্গা প্লাবিত সপ্তদ্বীপ পৃথিম্বি ভ্রমএ নিরন্তর। সমুদ্রের মধ্যে ডিঙ্গা বিম্ব যেন ভাসে।' এভাবে ছয় মাস গেল। শয়তানের স্বস্তি নেই। সে এ ডিঙ্গা ডোবানোর এক উপায় খুঁজে পেল।

পাপিষ্ঠ ইব্লিস জান সভানের কাল
নিচিন্তে থাকিতে পাপী পাতএ জঞ্জাল।

সে বরাহের নাসায় কুটা দিল তখন বরাহ হাঁচিতে লাগিল, আর সে হাঁচি থেকে মূষিক বের হল, মূষিক স্বভাব-ধর্মে ডিঙ্গা কেটে ফুটো করল, জল উঠতে শুরু করল ডিঙ্গাতে। নুহর ফরিয়াদে আল্লার নির্দেশে জিব্রাইল এসে নুহকে বাঘের নাসায় কুটা দিতে পরামর্শ দিলেন, তাতে বিড়াল পয়দা হল। এভাবে ডিঙ্গা রক্ষা পায়। নুহ হাজার বছর জীবিত ছিলেন।

নুহর এক সন্তানের নাম ছিল সাম। সামের পুত্রের নাম আদম। এই আদমের বংশে নমরুদের উদ্ভব। নমরুদ গুপ্তধন পেয়ে :

সামদেশ মারিলা মারিলা তুর্কস্থান
হিন্দুস্থান মারি পাপী হৈলা প্রধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিম পূর্বর লোক সকল মিলিল
দক্ষিণ উত্তর লোক কর যোগাইল।

তাঁর ঔদ্ধত্যের সীমা নেই। সে রথে শকুন জুড়ে দিয়ে আকাশে কতদূর উঠে রক্তমাখা তীর নিক্ষেপ করে, পরে রক্তমাখা শর দেখিয়ে লোকদের বলে "আকাশের প্রভুরে মারিলুম এহি শরে।' এভাবে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করে সে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠে। তারপর কৃষ্ণ-কংস কাহিনীর মতোই ঘটনা বিবৃত হয়েছে। যখন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ বলল, বৃহস্পতিবার গতে শুক্রবার রাত্রে এক শিশুর জন্ম হবে এবং তার হাতে নমরুদ নিধন হবে। ভয়ে নমরুদ তখন রাজ্যের নারীপুরুষের মিলন বন্ধ করে দিল। ব্যূহ নির্মাণ করে করে এক ব্যূহে নারী ও অপর ব্যূহে পুরুষ রাখল। আর হামেলা নারীদের সবাইকে হত্যা করল। এতো করেও নিয়তিকে এড়ানো গেল না। আজর নামে এক মূর্তি-নির্মাতা নমরুদকেও দেবমূর্তি জোগাত। তারই ঘরে জন্ম নিল নমরুদের ভাবী ঘাতক ইব্রাহিম। বনের গুহায় জন্ম মুহূর্ত থেকে ফিরিস্তার প্রযত্নে লালিত হয়ে ইব্রাহিম যখন বিশ বছরের যুবা, তখন সে পিতৃগৃহে এসে পিতার মূর্তিব্যবসায়ে যোগ দিলেন। 'মূর্তির গলাত এক ডোর সঞ্চারিলা। গলে ডোর ধরিয়া ছেছঁড়ায় নবীবর।' এভাবে মূর্তির প্রতি অবজ্ঞা দেখাতেন তিনি। আর দেশের লোক সে মূর্তি কিনে মন্দিরে রেখে 'তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু মূর্তির বোলএ।' কিন্তু ইব্রাহিমের মনে অন্য প্রশ্ন :

মনে হৈল নক্ষত্র যদি সে প্রভু হৈত
তবে কেনে আকাশেত লুকাই রহিত।
তত্ত্বে যদি প্রভু হৈত আকাশের শশী
স্থির হই রহিত আকাশে নিশিদিশি।
পূর্বে উলিয়া রবি পশ্চিমে চলিলা ...
সুমেরুগিরির আড়ে গেলা দিবাকর
দিশি যাই নিশি আইল অতি ঘোরতর।
এথেক দেখিয়া ইব্রাহিম পয়গাম্বরে
লাগিলেন্ত বহু অনুশোচ করিবারে।
চন্দ্রসূর্য নিশি দিশি যাহার সৃজন
আকাশ পাতাল মর্ত্য যাহার স্থাপন।
সেই প্রভু মানিলুম না মানি এ সকল
চন্দ্র সূর্য সেবি মুঞি না হৈমু নিষ্ফল।

বছরে দুইবার সূর্য চন্দ্র ও নক্ষত্র পূজার জন্যে রাজ্যের লোক এক তীর্থক্ষেত্রে সমবেত হত। তখন পুরী থাকত নির্জন। এমনি এক সূর্য-পূজার দিনে ইব্রাহিম নমরুদের মূর্তিশালায় (মন্দিরে) যেয়ে লক্ষ লক্ষ মূর্তি দেখলেন।

তখন ইব্রাহিমে স্মরিলেন্ত প্রভু নিরঞ্জন
মূর্তি দেখি ক্রোধ বাড়ে যেন হুতাশন।

ফলে কাহার দক্ষিণপদ কার বাম কর
মূর্তি হোস্তে কাড়িয়া ফেলিলা নিরন্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার মুণ্ড কার কন্ধ কার ভাঙ্গে গাও
কার অর্ধ কলেবর উরু সমে পাও।

সব মূর্তি এভাবে ভেঙ্গে একটি বড় মূর্তি 'না ভাঙ্গি রাখিলা' এবং 'তাহার কান্ধেত এক কুড়ালি রাখিলা।' যেন বড় মূর্তিটিই ছোট মূর্তিগুলোকে কুড়ালের আঘাতে হত্যা করেছে, মূর্তির কর্ম-শক্তিতে যদি তারা বিশ্বাস না করে, তবে মূর্তি পূজে কেন– এ প্রশ্ন জাগিয়ে দেবার জন্যেই এ ব্যবস্থা :

যে আপনা লাঘব রুখিতে না পারিব
সে জনে আনের হিত কিরূপে করিব।

তারপর ইব্রাহিমের সঙ্গে শুরু হল নমরুদের সংগ্রাম। নমরুদের অত্যাচারের সীমা শেষ নেই। ইব্রাহিমের প্রতি শিলা নিক্ষিপ্ত হয়, সে শিলা পুষ্প হয়ে তাঁর গায়ে লাগে। তৈল-ঘৃত-কাষ্ঠ যোগে আগুন জ্বেলে তাতে তাঁকে পুড়িয়ে মারবার ব্যবস্থা হল, কিন্তু পারা গেল না। কেননা আগুন 'নিজ তেজ এড়ি রহে হইয়া শীতল।' আরো নানাভাবে ইব্রাহিমকে মারার চেষ্টা চলল, কিন্তু সব বৃথা হল, পরিণামে ইব্রাহিমেরই হল জয়, ধর্মপ্রাণ লোকেরা তাঁকে সত্যাশ্রয়ী ও নবী বলে স্বীকার করে মুসলমান হল, নমরুদের কন্যাও ইব্রাহিমের ভক্ত হল, তারও ইচ্ছা ইব্রাহিমকে কেশে 'বিমুছিতুম পাও, মস্তকে সেবিতুম'। এই কন্যাই ইব্রাহিম-পত্নী সারা। মতান্তরে সারা নমরুদের ভাগিনেয়ী। কারুর মতে নমরুদের কন্যা বা ভাগিনেয়ীর অন্য নাম ছিল। আর সারা ছিলেন খজাইল দেশের রাজার কন্যা। সারা স্বয়ম্বরা হয়েছিল এবং স্বয়ম্বর-সভায় বহু নৃপতির ও গন্ধর্বের সমাগম হয়েছিল। আজর পুত্র ইব্রাহিমই পেলেন বরমাল্য। শুভলগ্নে খজাইল রাজা ইব্রাহিমকে কন্যাদান করলেন। বললেন, 'ভালরূপে গৌরব করিবা তুক্ষি তানে/বিরস না জন্মে হেন কুমারীর মনে।' এখানে শুল্ক বিভাগের দুর্নীতির একটি চিত্র আছে :

মিশ্রির একান্ত সেই হাজ্জ নামে দেশ
মিশ্র হোন্তে সামেত যাইতে নরগণ
সে দেশের মধ্যে দিয়া করএ গমন।
ঘাট চৌকি থরে থরে দিছে দুরাচারে
ঘাটি না বোলাই সামদেশে যাইতে নারে।
বস্তুজাত লই তথা গেলে সাধুগণ
অবিচারে দান লএ লুটে সর্বধন।
বলে ছলে ঘাটিয়াল পাপিষ্ঠ ঘাঁটির
বহুদান সাধে আজ্ঞা পাই নৃপতির।
সঙ্গে যথ দেখে ধন সাধুরে না দিয়া
ভাল দ্রব্য যথ পায় লই যায় লুটিয়া।
আর এক কর্ম করএ দুরাচারে
নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে।
সুচরিতা নারী পাইলে লই যায় কাড়িয়া
পতিক বধিয়া নারী লই যায় হরিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশের রাজাও দুশ্চরিত্র :

রীতি আছে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতি শৃঙ্গার করে সে নারীক ধরি।
নরসবে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতির সাক্ষাতে লই যায় অকুমারী।
যারে মনে ইচ্ছা লাগে নিজ পাশে রাখে
মনেত না লাগে যারে সেই নারী উপেক্ষে।

এ যুগের মতোই ইব্রাহিম ঘাটিয়ালদের ফাঁকি দেবার জন্যে সারাকে সিন্দুকের ভেতরে রাখলেন। সারাও কিন্তু ধরা পড়লেন, রাজা তাঁর সতীত্ব হরণের চেষ্টা করলে অন্ধ হয়ে যান। পরে, সারার অনুগ্রহে তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন অবশ্য।

নমরুদ খোদা হতে চেয়েছিল। অবশেষে সেই নমরুদের নাসায় মশা প্রবেশ করে নমরুদের 'রক্ত পান করি মজ্জা লাগিল খাইতে।' অবশেষে নমরুদ চরম যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল।

ইব্রাহিম নবীর দুই পত্নী সারা ও হাজেরা। সারাই ইব্রাহিমকে এই নারীরত্ন উপহার দিয়েছিলেন। সারাই ইসহাকের মাতা, আর হাজেরা ইসমাইলের। সারা যখন শুনলেন, হাজেরার সন্তানও পয়গাম্বর হবে, তখন তিনি ইব্রাহিমকে বললেন :

সতিনীর সম্পদ দেখিতে ন পারিমু।

তাঁকে খুশি রাখবার জন্যেই হাজেরাকে জল, অন্ন ও খাদ্য বিরল পার্বত্যাঞ্চলে নির্বাসন দেয়া হল। এরপর মক্কা নামের সাধুর মক্কাপুরী স্থাপন, আব-ই-জমজম-এর উৎপত্তি প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসমাইলকে কোরবানীদানের কথা বর্ণিত হয়নি।

ইসমাইল ও ইসহাকের নবুয়ত কাল কবি বর্ণনা করেননি। তাঁর কৈফিয়ত এই :

সে দোহান পরস্তাব আছএ বহুত
সে সব লিখিলে হএ পুস্তক বিশাল।
এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নবী হৈছে
একে একে সভানের পরস্তাব রৈছে।
মূরতি পূজিতে নিষেধিবারে কারণ
পৃথিম্বিত নবী সকলের হইল সৃজন।
পদবন্ধ করি কথ কহিবারে পারি
এক পুস্তকেত এথ কহিবারে নারি।
তেকারণে কথ কথ নবীর বচন
এহি পুস্তকেত না করিলাম রচন।
এক রসুলের যদি এক পুথি করি
তবে কথঞ্চিৎ জান লেখবারে পারি।

এর পরে নবী হরির কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কৃষ্ণ ও কংসের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। পূতনা নিধন (নাম নেই কৃষ্ণের মাসীরূপে বর্ণিত) ও মহাকাল নরসিংহ রূপে অসুর নিধন, নাগনিধন (কালীয়দমন) প্রভৃতিও আছে। কৃষ্ণের রূপ :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিধান পীত ধটি কটিত কিঙ্কিনী।
মউরের পুচ্ছ শিরে বনমালা গলে
রত্তন কুণ্ড শোভে শ্রবণ মণ্ডলে।
কপালে তিলক ভাল ফাগু ছাড়ি পাএ।...
চন্দন কস্তুরী অঙ্গে করিয়া লেপন
চৌদিকে বালক যায় সমুখে গোধন।
ত্রিভঙ্গ করিয়া অঙ্গ পদে পদে রাখি ...
যদি সে বাঁশিতে নাদ পুরিতে লাগিল
মানিনীর মন ভঙ্গ লীলায় করিল ...
খণ্ডাইতে মনের বিয়োগ কুলবতী
গৃহকার্য তেজিল ভেজিল নিজ পতি।

এ বর্ণনা বৈষ্ণব কবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তারপর সবিস্তারে কৃষ্ণের গোপীসম্ভোগ বর্ণিত হয়েছে। এখানে অশ্লীলতার কথা বাদ দিলে কবির চিত্রকল্প তারিফের দাবি রাখে। ইব্লিসের ভারতীয় নাম ও অবয়ব হচ্ছে নারদ। হরির নবুয়তের বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে ঘরে ঘরে নারীদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গে রতি সম্ভোগে প্ররোচিত করে সে। নারদের খপ্পরে পড়ে কৃষ্ণও ব্রত ভুললেন। নারদ ঘরে ঘরে বলে বেড়ায় :

এহি যে বালক হরি না চিন তোহ্মারা।
কলিযুগে নিরঞ্জন ধরি নব রূপ
আপনে প্রচার হৈছে জানহ স্বরূপ।
পূর্বে এহি হরি জান কূর্মরূপ ধরি ...
কূর্মে বরাহরূপে মেদনী ধরিল
নরসিংহ রূপ ধরি অসুর মারিল।
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি বলি-ক ছলিল।
না ডংসিল নাগ সবে তার কলেবরে
গোবর্ধন গিরিরে ধরিলা বাম করে
যে নারী হরির সনে রস হয়ে যাএ
তাহার অদৃষ্ট ভাল হৈব সর্বথাএ।

পতিরা : যুবতী পাঠাই দিল হরির গোচর
জানিলেন্ত ভাল কর্মে আছে নারীগণ
হরি সনে যুবতীএ খেলে বৃন্দাবন।

শিশের বংশে এক নবী ছিলেন, তিনি হরিকে সদুপদেশ দিয়ে দূত পাঠালেন। অনুতপ্ত হরি ব্রজধাম ছেড়ে পুষ্পোদ্যানে একা বাস করতে থাকেন।

এদিকে মাঘ মাসেত যদি পঞ্চমী হইল
বসন্তের বাউ তবে বহিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন গোপীরা সেই পুষ্পোদ্যানে গিয়ে আবার হরিকে কামাসক্ত করে তুলল। হরি ফাগু খেলছেন আর নির্বিচারে শৃঙ্গার করছেন। তারপর হরি যখন শুনলেন :

ধর্মকার্যে তুহ্মি যদি না করহ ভয়
সবংশে সংহার তুহ্মি হইবা নিশ্চয়।
এ বাক্য শুনিয়া হরি হইল দুঃখিত ...
না রাখিলা গোপীগণ আপনার পাশ।

বিরহিণী গোপীগণ তখন থেকে :

পিতলের মূর্তিসব হরির আকারে
গঠিয়া যুবতী সবে পূজে ঘরে ঘরে।

আবার হরি অনুতপ্ত হলেন। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

বোলে হরি আমাকে সৃজিল করতার
পাপকর্ম নিষেধ করিতে যে কারণ
মোর বাক্য না ধরন্ত দুষ্ট নরগণ।
মূরতি গঠিয়া সবে পূজে অনুক্ষণ
মোকে পরমাত্মা বুলি ভাবে সর্বজন।
পরমাত্মা নহি আমি হইএ বিনাশ ...
সমুদ্রের কূল হই না হই সাগর
সূর্যের কিরণ হই নহি দিবাকর।
আহ্মি পরমাত্মা নহি জানিঅ নিশ্চয়
সভান উপরে প্রভু নিরঞ্জন হয়।
তবে কি আহ্মারে প্রভু করিছে সৃজন
নরসবে মানিবারে মোহোর বচন।
কথ কথ গুণ মোর ঠিক দিয়া আছে ...
তেকারণে মূর্খ সবে মোরে বোলে সার।

বিরক্ত হরি অর্জুনসহ 'গরুড়ের পিঠে চড়ে তথা গেলা, যথা অস্ত যায় দিবাকর'। সেখানে তিনি লোহার, রজতের, মুক্তার, সুবর্ণের, হীরার 'পৃথিবী তথা দেখিলা মনোহর।' হরি অর্জুনের কাছে আবেদন করলেন অর্জুন যেন লোকদের বলে, হরির মূর্তি পূজা করে হরিকে তারা যেন নিরঞ্জনের কাছে লজ্জিত না করে। কিন্তু অর্জুনের চেষ্টায়ও কিছু হল না।

মুসা নবীর কিস্‌সা

খোরাসানে মুসাহাব নামে এক সওদাগর (মতান্তরে নৃপতি) ছিল। তার পত্নী গর্ভে এক জারজ সন্তান হয়। তার নাম অলিদ। মুসাহাবের মৃত্যুর পর অলিদ সুরাপানে ও লাম্পট্যে বাপের সম্পত্তি নিঃশেষ করে কাঠুরিয়া হয়ে জীবনযাপন করে। খোরাসানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে মিশর অভিমুখে রওয়ানা হয়। অলিদকে লোকে ফিরোয়ান নামে ডাকে। পথে ছখরা নামক স্থনে হামানের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। হামান অলিদের ললাটে রাজদণ্ড লেখা দেখলেন–'নৃপতির প্রকৃতি ললাটে উলি আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরোয়ান রাজা হলে হামানকে উজির করবে শর্তে, উভয়ে মিশরে গেল। সেখানে মরফল বীজ বপন করে মরফল গাছ জন্মাল। এর আগে মিশরে এই গাছ ছিল না। এই ফল বিক্রি করে ফিরোয়ান ও হামান বহু অর্থ অর্জন করল। একবার হাটে হাট-কর নিয়ে ঘাটিয়ালের সঙ্গে হামানের বিবাদ বাধে। ঘাটিয়াল ফল ও বাগ নষ্ট করে। রাজার কাছে অলিদ নালিশ করলে রাজা ঘাটিয়াল থেকে ক্ষতির দশগুণ ধন পাইয়ে দিলেন।

এরপর ফিরোয়ান ও হামান মিশরের গোরস্তানে আশ্রয় নিল। এবং যে কেউ শব কবর দিতে আসে, তাদের থেকে অর্থ আদায় করে। এমনকি এক উজির যখন তাঁর কন্যাকে কবর দিতে এলেন, তাঁর কাছ থেকেও আড়াই হাজার তঙ্কা নিল। উজির রাজার কাছে অভিযোগ করলে ফিরোয়ান পত্রযোগে সবিনয়ে নিবেদন করল 'মৃতের পুণ্যের দান যেই পাই খাই' :

ভালরূপে মৃত্যুশালা উপস্কার করি।
মৃতের কারণে দান দিলে পুণ্য পাইব
ভিহিস্তেত যাই মৃত পাপ এড়াইব।

এই কৈফিয়তে তুষ্ট হয়ে মিশর-রাজ ফিরোয়ানকে মুখপাত্র করে নিল। উজির হিসেবে সে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিল। প্রজার চার বছরের খাজনা মাপ করে দিল। প্রজার সুখ-সমৃদ্ধির অবধি নেই। সুশাসনে সে প্রজার মন জয় করে নিল। কিছুকাল পরে মিশরের নিঃসন্তান নৃপতির মৃত্যু হলে, মিশরবাসীরা প্রজাপ্রিয় উজির ফিরোয়ানকে রাজা করল। কিন্তু

লোক সবে তাহাকে নৃপতি কৈলা যবে
নৃপতি না মানে বনি ইসরাইল সবে।

ফিরোয়ান বনি ইসরাইল বংশের এক নারীকে বনিতারূপে গ্রহণ করে ইসরাইলদের বশ করল। এই নারী বড় ধার্মিক ছিলেন।

তিনি পতি ফিরোয়ানকে শ্রদ্ধা করতে পারলেন না। কিন্তু ধনে কি না হয় :

ভিক্ষুক নৃপতি হয় ধনের কারণ,
ধনহোন্তে পৃথিম্বিত নরে মান্য পায় ...
ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবার ...

ধন হোন্তে অসাধ্য সাধিতে যথ পারি
বিনি ধনে এক কর্ম করিবারে নারি।
ধন হোন্তে লুকায় যথেক দোষ থাকে।

ফিরোয়ান যাদুবিদ্যা শিখল। যাদুকর হয়ে সে লোকদের বলল :

মুঞি প্রভু লোক সবে প্রভু বোল মোরে।

মিশরের লোকেরা তাকে 'হৃদে মুখে প্রভু বুলি লাগিল ভাবিতে।' দুই বৃক্ষ থেকে পীত ও রক্তবর্ণ তৈল বের করে পীতবর্ণ তেল নিয়ে লোকের ব্যাধি দূর করতে লাগল, আর রক্তবর্ণ তৈল যার গায়ে মাখে তার শরীর এমন লৌহ কঠিন হয় যে—

অস্ত্রে না কাটএ না ফুটএ লাঠি ছেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে এসব অদ্ভুত শক্তি দেখে 'ফিরোয়ানে প্রভু হেন লৈল মানিয়া।' একদিন ফিরোয়ান এক দুঃস্বপ্ন দেখল। যোষীরা বলল, আগামী তিন দিনের মধ্যে যে সব নারী গর্ভবতী হবে, তাদের কারো সন্তান রাজার কাল হয়ে দাঁড়াবে। রাজাদেশে ঘরে ঘরে প্রহরী নিযুক্ত হল যাতে কেউ রমণ না করতে পারে। কিন্তু নিয়তি অলঙ্ঘ্য। ইসরাইল বংশীয় এম্রান ফিরোয়ানের দেহরক্ষী। ফেরোয়ানের শয়ন কক্ষেই থাকে। তার স্ত্রী রোখাইজের মনে কামভাব জাগলে, সে মহলে যেয়ে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হল। সেদিনই সে গর্ভবর্তী হল। গোপনে গর্ভধারণ করে সন্তান প্রসব করল, দোশাধু (পুলিস) টের পেল না। সে সন্তান সিন্দুকে ভরে নীলনদে ভাসিয়ে দিল। ফিরোয়ান ও তার স্ত্রী সে সিন্দুক পেয়ে খুলে দেখল এক শিশু। নিঃসন্তান ফিরোয়ান পত্নী সে শিশুকে পালন করতে লাগল। সাগরে ভেসে যাওয়া বস্তুকে আরবেরা 'মুসা' বলে। সে কারণেই শিশু মুসা নামে অভিহিত হল। রোখাইজই শিশুকে স্তন্য দেবার জন্যে নিযুক্ত হল। 'মাসে একশত তঙ্কা নিয়ম করিলা।' এম্রানের প্রথম সন্তনের নাম হারুন। মুসা ও হারুন অনেকটা কৃষ্ণ বলরামের মতো।

মুসা বড় হয়ে দেশ ছেড়ে মদাইনের নবী সাহিব পয়গাম্বরের সাক্ষাৎ পেলেন। নবী-কন্যা দুটো সফুরা ও সগুরা ক্ষুধার্ত মুসাকে 'দুগ্ধ মধু অন্ন দিয়া অতিথি ভুঞ্জাইল'। মুসা তাতেই খুশি। কেননা 'পাইলে ক্ষুধায় অন্ন অমৃত তুলন।' মুসা সফুরাকে বিয়ে করে ঘর-জামাই হলেন। আর শ্বশুর থেকে উপহার পেলেন আদমের 'আসা'। এ আসা দিয়েই 'ফিরোয়ান পাপী তুক্ষি করিবা সংহার'। মুসা মিসরে ফিরে গেলেন। ফিরোয়ান বনি ইসরাইল গোত্র নিধন করতে কৃতসংকল্প জেনে, মুসা ইসরাইলদের নিয়ে নিশিতে হিজরত করলেন। ফিরোয়ানের দোশাধুরা পশ্চাদ্ধাবন করল। মুসা আসার স্পর্শে নীলনদের পানি দো-ভাগ করে সানুচর পার হয়ে এলেন। ফিরোয়ানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য ডুবে মরল।

বহু ছল-চাতুরী ও সত্যভঙ্গের কারণে মুসা ফিরোয়ান ও তার অনুচরদের ডুবিয়ে মারলেন। ফিরোয়ান মরবার আগে মুসাকে মিনতি জানিয়েছিল, কিন্তু নির্মম মুসার হৃদয় গলেনি। মুসা তাকে উল্টে বিদ্রূপ করেছিলেন।

ফিরোয়ান : কহে রক্ষা কর মুসা না কর সংহার
আপনাকে প্রভু মুঞি না বুলিমু আর।
মুসা বোলে তুক্ষি প্রভু কে মারিব তোরে
প্রভু কেনে দুঃখ পাও সাগর অন্তরে।
ফিরোয়ান : তোক্ষারে রসুল হেন মানিলাম নিশ্চয়
মানিবাম নিরঞ্জন রাখ মহাশয়।
না কর না কর মুসা মোহোরে সংহার
হৃদমুখে মানিলুম তোক্ষার করতার।
জলে ডুবি মরি আক্ষি বড় পাই দুখ
এবার উলটি মুসা চাহ মোর মুখ।
পুনি এহিবার তুক্ষি ক্ষেমা দেঅ মোরে
শিশুকালে যত্ন করি পালিছম তোক্ষারে।
বাপে সে করিলে দোষ পুত্রে লয় পালি
বাপেহো পুত্র প্রতি বহু দেন্ত গালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাতর হইয়া কহি তোহ্মার বিদিত
মায়ের বাপের দোষ ক্ষেমিতে উচিত।

মুসার মনে সেসব কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। ফিরোয়ানের মিনতি ব্যর্থ হল। আল্লাহও ফিরোয়ানের দুঃখে করুণাবোধ করেছিলেন। তাই তিনি মুসাকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করলেন :

[সে] যথ দিন মোহোর সমান বোলাইল
তবে হো তাহার দোষ যথেক ক্ষেমিল!
মোরে নিরঞ্জন মানি কহিল সেবিতে
তোহ্মারে রসুল হেন বুলিল মানিতে।
একবার মোত যদি করিত মিনতি
রাখিতুম তাহারে মুঞি সদয় হৈতুম অতি।
বারে বারে কাকুতি তোহ্মারে কৈল বাণী
গৌরব না কৈলা তুহ্মি তার বোল শুনি।

এতে মুসা ভারী লজ্জিত হলেন। ইতিমধ্যে সফুরার গর্ভে মুসার দুই কন্যা হয়। ফিরোয়ানের সাথে মুসার চল্লিশ বছর যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কন্যা দুটোর বয়েস চল্লিশ বছর হয়ে গেল, মুসা মদাইনে যেতে পারেননি বলে মেয়ের বিয়েও দিতে পারেননি। এখন অবসর পেয়ে মিসরে এনে কন্যা দুটোকে পাত্রস্থ করেন। এদিকে কোহ্-ই-তুরে যাবার জন্যে মুসার কাছে আল্লাহর নির্দেশ এল। মুসা হারুনের উপর পৃথিবী শাসনের ভার দিয়ে তুর পর্বতে গেলেন।

তুর পর্বতে মুসা তিন মাস যাবৎ কঠোর ব্রত পালন করলেন। তাঁর নিষ্ঠা পরীক্ষা করবার জন্যে প্রহার, শিলাবৃষ্টি ও তপ্তজল নিক্ষেপ করা হল। উপবাসী মুসা কিন্তু অবিচল রইলেন। মুসা আল্লাহকে দেখতে চাইলেন। আল্লাহ্ কেবল তাঁর দৃষ্টির আভাস দিতে রাজি হলেন, আল্লাহর দৃষ্টি মাত্র তুর পর্বত পুড়ে গেল। তুর এ অবিচারের জন্য আল্লাহর কাছে অনুযোগ করল। আল্লা জবাব দিলেন :

নরের নয়নে অঞ্জন লাগিব তোহোর
বহু পুণ্য পাইবা তুহ্মি স্বর্গের ভিতর।
তা শুনিয়া গিরিবর হৈলা সানন্দিত।

মুসার সঙ্গে চল্লিশ দিন ধরে আল্লার আলাপ হল। তারপর অদ্ভুত সুবর্ণ গাভীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গাভী কথা বলে আর নিজেকে নিরঞ্জন বলে দাবি করে।

'পাপিষ্ঠ গাভীএ নর চাহে ভোলাইবার।
বোলে মুঞি করতার অনাদি নিধান।
মোর সেবা তুহ্মি সবে কর সর্বক্ষণ
নর সবেরে দেখা দিবারে আইলুম।

লোকে গাভী পূজা শুরু করল। মুসা গাভীর উদরে শয়তানের স্থিতি টের পেলেন। আর গাভীটি হত্যা করে শয়তানের কারসাজি ব্যর্থ করলেন। কোরবানীর শুরু এ থেকেই। যা পূজ্য ছিল, তা-ই জবেহ করার রীতি চালু হওয়ায় দেবতারূপে পশু পূজার সংস্কার দূর হল। কোরবানীর তথা আল্লাহর নামে জবেহ-করা জীব :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবর্ণ শরীর হই স্বগেত রহিব
রত্তনের নয়ন হীরার নখ তার
মাণিক্যের চঞ্চু হৈব অতি শোভাকার।

জবেহ করার তর্তিব [নিয়ম] :

জবেহ করিলে পশু পায় মুক্তিপদ
যে জনে জবেহ করে সেহো পুণ্য পায়...
তবে যে জনে পশু জবেহ করয়
ভাল মতে অজু তবে করিব নিশ্চয়।
শরীর পবিত্র হই তীক্ষ্ণ খরশান
আল্লার অদ্ভুত তবে করি অবধান।
জবেহ নিয়ত ভাল মতে সে পড়িব
তবে সে পশুর' পরে তীক্ষ্ণ ছুরি দিব। [সুরা এমরান]

কিন্তু সামান্য কারণে জীব বধ করা অনুচিত :

অভ্যাগত যথ আইল উৎসবের কাল হৈল
পশুপক্ষী করিবা ভক্ষণ।
আপনে খাইতে যবে পশুপক্ষী বধ তবে
ভাল নহে এ সকল কর্ম
আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন
না করিব এসব অধর্ম।
খাইলে পশুর মাংস দেহ হয় ধ্বংস
অবোধে আত্তমা পায় জয়
দেহ মধ্যে পঞ্চ ভুল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

এখানে বলআমের কিস্‌সা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

বলআম পূর্বে ধার্মিক ছিল। কিন্তু মুসার বিরুদ্ধাচরণ করায় তিনি অভিশপ্ত হলেন। তাকে—

কুকুরের রূপ কৈল নারীর শরীর
পৃথিম্বিত তার যথ অযশ রাখিলুঁ।

মুসার কাহিনী সবিস্তারে বলেও কবি জানাচ্ছেন :

যথ কথা মুসা পয়গাম্বরের আছএ
সে সকল পরস্তাব কোরানে আছএ।
সহস্রভাগের ভাগ না কহিল আহ্মি...
কোরআনের মধ্যে আছে অনেক বারতা
তেকারণে পঞ্চালিত না লেখিলুম গাথা।

মুসা তউরাত কেতাব লাভ করেন। তিনি একবার অহঙ্কার করে বলেছিলেন :

যথেক বোলাইছে মোরে প্রভু করতারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্মাত্তু অধিক জানে হেন একজন
না জানিএ আছে কি না আছে ত্রিভুবন।

এতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে মুসাকে জানালেন, তোমার এরূপ বড়াই করা উচিত হয়নি। আমার সৃষ্টির কি খবর তুমি রাখ যে নিশ্চিতে এই গর্ব করলে। তুমি সাগরকূলে গিয়ে খোয়াজ-খিজিরের শিষ্য হও। 'তবে সে তোহ্মার যথ ধন্ধ হৈব দূর।' খোয়াজ-খিজির অমৃত কুণ্ডের জলে স্নান করে অমরত্ব লাভ করেছেন। ইউসা নামের এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মুসা খোয়াজ-খিজিরের সন্ধানে বের হলেন।

খিজির মুসাকে নানা তত্ত্ব কথা শুনালেন। বললেন :

আগে পাছে যথ লোক পণ্ডিত হৈছে
প্রভুর মহিমা এক বুঝি না পাইছে।

তারপর খিজির যে-নৌকায় সাগর পার হলেন, সে-নৌকা ফুটো করে দিলেন; পথে এক শিশু হত্যা করলেন, এক হেলে-পড়া দালান সোজা করে দিলেন। মুসা এই অদ্ভুত আচরণের কোন কারণ খুঁজে না পেয়ে খিজিরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

কি কাজে পরের নৌকা ভাঙ্গিয়া আইলা
কি কাজে পরের শিশু ধরিয়া কাটিলা।
পরের দালান কেনে কৈলা সমসর
স্বরূপ করিয়া কহ আহ্মার গোচর।

খোয়াজ-খিজির ব্যাখ্যা দিলেন, নৌকা ফুটো না করলে, দেশের রাজা যুদ্ধকার্যে লাগানোর জন্যে গরীবের নৌকাখানি কেড়ে নিয়ে যেত। শিশুটি ধার্মিক পিতামাতাকে কাফির হবার প্ররোচনা দিত। আর যার দালান সোজা করে দেয়া হল, তিনি অত্যন্ত দানশীল পরোপকারী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। দালানের নিচে ধন সঞ্চিত রয়েছে। ধার্মিক ব্যক্তিটির সন্তানেরা এখনো নাবালক, দালান ভেঙ্গে গেলে এই ধন অন্যের হাতে চলে যাবে, তাই দালান সোজা করে দেয়া হল।

অন্যান্য নবীদের কথা

আসমাইল নবী ইউসুফের ভাই ইবন আমীন বংশীয় তালুত নামের এক ব্যক্তিকে ইসরাইলদের রাজা করতে চাইলেন। ইবন আমীন রাজা ছিলেন না, কাজেই তালুত নৃপতি বংশীয় নয় বলে তাঁকে জনগণ রাজা করতে রাজি হল না। তারা ইউসুফ বংশীয় কাউকে রাজা করতে চাইল। অবশেষে আসমাইলের অনুরোধে তালুতকে নৃপতি করা হল। তারপর তালুত ও জালুতে (এক দস্যুরাজা) যুদ্ধ বাধল। এই যুদ্ধে জালুতকে যখন কোন প্রকারেই পরাজিত করা গেল না, তখন দাউদকে বললেন :

জালুতকে যদি সে মারিতে পার তুহ্মি
অর্ধরাজ্য সহিতে দুহিতা দিব আহ্মি।

দাউদ জালুতকে হত্যা করার পর তালুত দাউদকে কন্যা বিয়ে দিলেন বটে কিন্তু অর্ধরাজ্য দিলেন না। বরং রাজ্য হারাবার ভয়ে জামাতা দাউদকে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন। দাউদ দেশ ছেড়ে বনবাসী হয়ে কাল কাটাচ্ছিলেন। তালুতের মৃত্যু হলে দাউদ শ্বশুরের রাজ্য পেলেন। দাউদ নবী জবুর কেতাব পেয়েছিলেন। ইব্লিসের এক অনুচর অপূর্ব এক পক্ষীরূপ ধরে ছলনা দিয়ে দাউদকে বিপথগামী করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। এই পক্ষীই দাউদের সঙ্গে সেনাপতি উরিয়াপত্নী যুবতী বতসার পরিচয়ের নিমিত্ত হয়েছিল। উরিয়ার সুন্দরী স্ত্রী বতসাকে দাউদ নিকাহ করলেন। এই বতসার গর্ভেই নবী সোলেমানের জন্ম। সোলেমান জ্ঞানী, গুণী ও সূক্ষ্ম বিচার-পটু ছিলেন। পিতার কাছে তিনি তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। একবার দাউদের এক হেঁয়ালিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে সোলেমান বললেন :

প্রলয়ের কালে লোকে না জানিবা দূর
পাসরিয়া পরলোক না হৈবা ভোর।
সংসারের সুখ ভোগ কিছু নহে সার।
আত্মার সহিতে জান কায়ার প্রেম অতি
একের উপর আন অধিক পিরীতি।

সোলেমানের মুখে এ আশ্চর্য সমাধান শুনে :

সবে বোলে সোলমানে হৈব নরপতি
জ্ঞান আছে পালিতে পারিব বসুমতী।

সোলেমানকে আল্লাহ্ একটি অঙ্গুরী দিয়েছিলেন :

এ অঙ্গুরী অনুক্ষণ থাকে যার হাতে
যে আছে উদয় অস্ত দেখিব সাক্ষাতে।
এ অঙ্গুরী যার হাতে থাকে অনুদিন—
তাহার আদেশ কেহ লজ্ঘিতে না পারে
সে জন নৃপতি হএ সবার উপরে।

একটি আল্লাহ্-প্রদত্ত চাবুকও সোলেমান পিতা থেকে পেয়েছিলেন :

নরকের চাবুক পাঠাইছে করতারে
মারিলে তাহার বারি হরএ পরাণ।

দাউদ সোলেমানকেই তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেন। দাউদের মৃত্যু হলে সোলেমান পিতার জন্যে :

মনেত বিয়োগ রাখি কান্দিলা বিস্তর
আর– বাপের কারণে দান-ধর্ম বহু কৈলা
দরিদ্র দুখিত মন তুষিতে লাগিলা।

সোলেমান নবী অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। আল্লাহ-প্রদত্ত অঙ্গুরী প্রভাবে :

পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষদানবে নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে
দেবতা গন্ধর্বগণে অপসরা কিন্নর সনে
যথ আছে এ মহিমণ্ডলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষত : আজ্ঞা দিলা করতার সবে সেবা করিবার
ভূতপ্রেত পিশাচ সকলে
যেন মানে তান বাণী।

সোলেমান এক তক্ত তৈরি করালেন। তিনি সেই তক্তে চড়ে বসতেন আর নির্দেশ মতো পবন সেই তক্ত বিমানের মতো বিভিন্ন স্থানে বয়ে নিত। তারপর যম তথা আজ্রাইল কর্তৃক প্রাণ-হরণ বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সোলেমান রাজকোষের অর্থ গ্রহণ করতেন না। এই সূক্ষ্ম বিচারক রাজা :

আপনার করের খাঅন্ত উপার্জন
আনের আর্জনদ্রব্য না কৈলা ভোজন।
আপনার দুঃখের আর্জন যেবা খাএ
এহলোকে পরলোকে সুখ পদ পাএ।
শুদ্ধ দ্রব্য খাইলে তার হএ বাক্য সিদ্ধি
প্রভূত যে-কিছু মাগে পাএ নিরবধি।

একবার সোলেমান পৃথিবীর যাবতীয় জীবকে ভোজন করাতে চাইলেন। ক্রমাগত আট মাস ধরে অন্নব্যঞ্জনাদি রান্না হল, 'দেও আদি প্রেতজাতি পরীআদি নানা ভাতি সব নিমন্ত্রিত।' আল্লাহর নির্দেশে, এক মাছ এসে সোলেমানের কাছে ক্ষুধার অন্ন চাইল। আর এক গ্রাসেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবের জন্যে আয়োজিত অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়ে ফেলল। মৎস্য সাধারণত এমনি তিন গ্রাস অন্ন গ্রহণ করে। কাকেও পালনের শক্তি আল্লাহ ছাড়া মানুষের নেই, সোলেমান এটি উপলব্ধি করে লজ্জিত হলেন। সোলেমান দেও-পরী থেকে কীট-পতঙ্গ-পিঁপড়া অবধি সব প্রাণীর ভাষা জানতেন ও বুঝতেন।

AMARBOI.COM

পিঁপড়ার রাজাও রাজ-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন :

নৃপতি লোকেরে ভাল মন্দ না জানাইলে
সে নৃপতি পড়িবেক নরক কুণ্ডলে।
লোকের সঙ্কট হৈলে না কৈলে উদ্ধার
তাকে অধিকারী হেন নারি বুলিবার।
নৃপতি করিছে মোরে সভার উপরে
ভাল-অপচয় যদি না জানাই তাহারে।
এ সকল লোক যদি হৈল দুঃখিত
কি বুলি উত্তর দিমু প্রভুর বিদিত।

তারপর সোলেমান-বিলকিস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সূর্যোপাসিকা রাজকন্যা বিলকিস (Queen of Sheba)। বিলকিসের রূপমুগ্ধ সোলেমান বিলকিসের হৃদয় জয় করবার জন্যে তার নির্দেশে দুটো অপকর্ম করলেন ১. বিলকিসকে পিতার মূর্তি পূজার অনুমতি দিলেন ২. সোলেমান-নির্দেশেই পতঙ্গরা বিলকিসের পিতৃহন্তা, আর সোলেমানই বিলকিসকে পতঙ্গকুল ভক্ষণে সহায়তা করলেন। এতে সোলেমান আল্লাহর কাছে সরমেন্দা রইলেন।

সোলেমান কামুক ছিলেন :

সোলেমান রসুলের সানন্দ হৃদয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্ত শত অনুচরী তিনশত নারী
রাখিছিলা সোলেমানে পরম সুন্দরী।

সোলেমান চারটি কারণে খোদার কাছে জবাবদিহি রইলেন :

এক পাপ মূর্তি গঠিবারে আজ্ঞা দিল
আর পাপ হিতকারী পতঙ্গ বধিল।
আর পাপ পুত্র হৈতে প্রভূত না মাগিল ...
পুত্র জন্মিবারে আশা হৈলা রতি ভোগী
আর পাপ ধীবরের নন্দিনী দেখিয়া
কুশ্চিত আকার বুলি আছিলা নিন্দিয়া।

বলা বাহুল্য, সোলেমান শাহজাদী বিলকিসকে এবং এককালে কুৎসিত বলে নিন্দিতা, পরে রূপসী বলে বন্দিতা ধীবর-কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন।

রসূল চরিত

হযরত মুহম্মদের তাত্ত্বিক পরিচয় :

আহাদ হোন্তে নুর কৈলা মহাসূর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।
আহমদ রূপে আপনা দেখি পাই
সাধক হইয়া রূপ রহিল ধেয়াই।
প্রীতিরসে মগ্ন হইয়া প্রভু নৈরাকার
নুর মোহাম্মদকে লাগিলা দর্শিবার।

AMARBOI.COM

সৃষ্টি পত্তন :

আহাদ-আহমদ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই দৃষ্টি-রসে ঘর্ম উৎপন্ন হল, সেই ঘর্ম থেকে সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড, দুই জ্যোতি, ফিরিস্তা, আল্লাহর খাট-সিংহাসন, অনল, বারি, বরুণ, মৃত্তিকা ও স্বর্গ-নরক গড়ে উঠল। তারপর আল্লাহ এক জ্যোতির্ময় সুগন্ধ তরু সৃষ্টি করলেন। সে তরুর নাম জর্বনূর পরী। সে বৃক্ষে ময়ূর হয়ে নুর মুহম্মদ রইলেন। তারপর মান্যের ও মহিমার এবং ক্ষেমা প্রভৃতির সাগরে ডুবে রইলেন।

তারপর এক কন্দিলে নুর মুহম্মদকে রাখা হল (সিরাজম মুনিরা)। কন্দিলের নুরকে যারা তিনবার প্রণাম করেনি, তারা ...

হিন্দুকুলে জন্মি পুনি মুসলমান হৈলা।
আগে প্রণামিয়া পাছে না কৈলা সালাম
মুনাফিক হইয়া পাপী জন্মিলা ধরাধাম।

আর কাফিরত্ব মুনাফিক অধিক দুষ্কর।

মানুষেরা নুর মুহম্মদের বদন দেখে আউলিয়া, ললাট দেখে মুমীন, লোচন দেখে পণ্ডিত, পৃষ্ঠভাগ দেখে কাফির, পদতল দেখে মুনাফিক হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হযরত মহম্মদের পূর্বপুরুষ পরম্পরা :

আদম-শিশ-আতস-মহনাইল-সামাইন-বারদ-ইদ্রিস-সমরখ-মনক-তালুত-নুহ-সাম-আযম-আনফসনা-ফালেক-উদয়-সবারোহ-নাথুন-আজর-ইব্রাহিম-ইসমাইল-কানানত-কিজর-আদদ-আবাদ-আদিয়ান-মারুহ-নজর-ইনিয়াস-হামন-মজর-কনাক-খজীমত-কিনান-নজর-বনিজার-ফিহির-গালিম-মালিক-কায়ন-নজর-কাল বনওস - হাসিম -মনাফ-মতালিব-আবদুল্লাহ-মুহম্মদ।

এই বংশ লতিকায় ৪৮ পুরুষ পরম্পরার নাম আছে। আধুনিক হিসাবে আদম থেকে মুহম্মদ অবদি ১৬০০ বছর হয়। আর শাস্ত্রীয় হিসাবে হয় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার বছর। কেননা, হাজারোর্ধ্ব বছর পরমায়ু পেয়েছিলেন, তেমন নবীও ছিলেন। রসুলের আদি চরিতকার ইব্‌ন ইসহাকে এই বংশ লতিকা ভিন্নরূপ।

কান্দিল থেকে নুর-ই-মুহম্মদকে নিয়ে ভিহিস্তের রবু বৃক্ষে জ্যোতির্ময় সুগন্ধ পুষ্প রূপে রাখা হল। আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন ফিরিস্তাকে :

সেই বৃক্ষ হোন্তে এক পুষ্প লই যাও
আবদুল্লার অঙ্গে নিয়া সে পুষ্প পেলাও।
নুর মোহাম্মদ এই পুষ্প লক্ষ্য করি
আবদুল্লার অঙ্গেত রইল সঞ্চরি।

আবদুল্লার অঙ্গে সে-পুষ্প পড়ার পর আবদুল্লাহর দেহ কস্তুরীর মতো সুগন্ধ হল। ললাটের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল :

সাধকের মধ্যে যেন রবির প্রকাশ।

AMARBOI.COM

আরবের নারীদের আবদুল্লাহ কামনার ধন হয়ে উঠলেন। আমিনা 'ইচ্ছিলা গন্ধর্ব বিহা'। কিন্তু তার প্রয়োজন হল না। চারিজন মুসলমান ডেকে আনবার জন্যে সখীকে নগরে পাঠালে সখী চার নররূপ ফিরিস্তা নিয়ে এল। বিবাহান্তে 'জলুয়া দিলেন্ত নিয়া করি হুরাহুরি।' আমিনার পিতা নফলঙ্গ রাজা এই গোপন বিবাহের খবর জেনে বার হাজার সৈন্য নিয়ে মক্কা আক্রমণ করে। এবং আবদুল্লাহ নিজ হাতে সব সৈন্য ও নরপতিকে হত্যা করেন। তার জায়গায় আবুজেহেল মক্কাপতি হল। ইউসুফ কাহন নামে দৈবজ্ঞ আবুজেহেলকে জানাল আমিনার গর্ভে মোহাম্মদ নামে এক নবী হবেন, তিনি দুনিয়ার সর্বশাস্ত্র বাতেল করে নবশাস্ত্র প্রচার করবেন। 'লুকাইব বাপ-পিতামহর আচার।'

আবুজেহেল কংসের মতোই ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। পান্নার মতো এক ধাত্রী নিজের সন্তানের বিনিময়ে মুহম্মদের প্রাণ রক্ষা করলেন। 'সে শিশু বদলী দিমু তোর শির নিছি।'

হালিমা লুকানো শিশুকে পেয়ে পরম আগ্রহে নিয়ে গেলেন পালবার জন্যে। আবু জেহেল মুহম্মদ রূপী ধাত্রী পুত্রকে বোঝাবার চেষ্টা করল।

তুহ্মি মোর ভ্রাতৃসুত আচার কুমতি
হিন্দুর তনয় হই নিন্দ হিন্দুয়ানি
প্রচারিতে চাহসি আচার মুসলমানি।
প্রথমে, তোহ্মারে হিন্দু করিবাম আহ্মি
মৃত্যুকালে তবে পুণ্য পাইবেক তুহ্মি।

প্রথমে ললাটে তোর মূরতি লেখিমু
দ্বিতীএ তোহ্মার কান্ধে পৈতা চড়াইমু।

এরপরে মুনাফেকের সংজ্ঞা আছে।

মুহম্মদের জন্মের সময় ভেহেস্ত থেকে হাওয়া, মুসার স্ত্রী ও জননী, ঈসার জননী, ইব্রাহিমের কন্যা, আবা-নবীর কন্যা সফেরা প্রমুখ আমিনার কাছে এসেছিলেন। মুহম্মদের জন্ম মুহূর্তে রাজমুকুট খসে পড়েছিল, রাজা সিংহাসন থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়েছিলেন। অগ্নি উপাসনার ধূনি নিভে গিয়েছিল।

মুহম্মদের পিঠে মোহর-ই-নবুয়ত ছিল। মুহম্মদ :

প্রথমে হইব নবী পালিব ভুবন
দ্বিতীএ পাইব পয়গাম্বরী সুশোভন।
তৃতীএ মুর্শিদ হৈব আনিব কিতাব।

মুতালিব মৃত্যুর সময় পুত্র আবুতালিবের উপর মুহম্মদের লালনের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন :

পুণ্য পাইবা এহি শিশু করিলে পালন ....
পিতা নাহি শিশু যদি থাকএ সমুখে
চুম্বন দেঅ যদি আপনা পুত্র মুখে।
বুলিব মোহোর বাপ যদি সে থাকিত
এই রূপে মোহোর গালেত চুম্ব দিত।
এই রূপে ভাল বসন পেরাইত মোরে
এই রূপে উপহার দিত খাইবারে।
এ বুলি নিঃশ্বাস এড়িব ঘন ঘন
নিঃশাস এড়িয়া মনে করিব রোদন।
সে রোদনে কাঁপিব প্রভুর সিংহাসন।

এরপরে একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে মুহম্মদ তাঁর এক ছাগলকে ডালের বারি মারলেন, ছাগলের ফরিয়াদে আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাইল :

কাম ক্রোধ লোভ মায়া যথেক আছিল
রসুলের ঘট হোন্তে সব নিকালিল।

তারপর উমর কন্দিলের বিধবা খদিজার থেকে মূলধন নিয়ে তিনি ব্যবসায় শুরু করলেন। সাম দেশেই তাঁর প্রথম বাণিজ্য-যাত্রা। গুণমুগ্ধ খদিজা বয়োকনিষ্ঠ মুহম্মদকে পতি করে নিলেন।

প্রথমে আবুবকরই দীক্ষিত হলেন ইসলামে। নবীর কলিমা 'আবুবকরে কহিলা।' এবং আবুবকর কোরাইশদের কাছে 'কহেন্ত মুহম্মদ প্রত্যেকে।' তারপর শুরু হল বিবাদ। আবুজেহেল, ওমর প্রভৃতি শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। হামজা ইসলাম কবুল করলেন। ঘাতক উমর রক্ষক উমরে পরিণত হলেন। উমর উগ্র প্রকৃতির ছিলেন। তিনি তাঁর পিতাকে বলছেন :

উমরে বুলিলা বাপ হও মুছলমান
নহেত কাটিমু মুণ্ড লইমু পরাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুলের খদিজা, আয়েশা, সুধা, মায়মুনা, আকিমা প্রমুখা স্ত্রী ছিলেন। রসুলের ছেলেমেয়েদের এবং জামাতারও উল্লেখ আছে। এক অন্ধ আরব রসুলের প্রতি তীব্র বিদ্বেষভাব পোষণ করত। এমন কি রসুলের অনুগ্রহ কিংবা পদরেণু যোগে তার অন্ধত্ব ঘুচাতেও রাজি ছিল না। তার কন্যা গোপনে রসুলের পদরেণু চোখে মেখে দিয়ে তার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে ছিল বলে সে চক্ষু উপড়ে ফেলেছিল। এরপর হরিণীর কিস্‌সা বর্ণিত। মূর্তিও মুহম্মদকে নবী বলে ঘোষণা করল। আবুজেহেল-আদি কাফেরগণ দুশ্চিন্তায় পড়ল।

মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে থাকল। আবুজেহেলের প্রশ্নের উত্তরে নও-মুসলিম পণ্ডিতেরা বলল :

তৌরাত ইঞ্জিল আর জবুর কিতাব
পাইলাম আহ্মি তার মহিমা পরস্তাব।
তেকারণে রসুল মানিয়া কৈল সার
জানিলাম মুহম্মদ রসুল আল্লার।

আবুজেহেলের মতে তাদেরকে 'টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।' চাচা আবুতালিবের মৃত্যুকালে মুহম্মদ তাঁকে কলেমা পড়ে ইমান আনতে বললেন, আবুতালিব উত্তর দিলেন তোমাকে 'আল্লার রসুল তত্ত্ব জানিলাম আহ্মি'। তবে জ্ঞাতিরা নিন্দা করবে এই ভয়ে ইসলাম কবুল করতে পারছিনে, ওরা বলবে 'ছাবালের দীনে গেল পাপিষ্ঠ দুর্মতি।' মুহম্মদ পা ব্যতীত আবুতালিবের সর্বাঙ্গ জিহ্বায় চেটে দিলেন, যাতে প্রিয় পিতৃব্যের দেহে নরকাগ্নির স্পর্শ না লাগে।

ইসলামের প্রসার অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল। রসুল গন্ধর্বলোকে গেলেন :

গন্ধর্ব সকল মিলি আনিল ইমান
নমাজ পড়িতে সব পরীগণ আইলা
রসুল ইমাম হই নমাজ পড়িলা।

তারপর রসুল 'মক্কা দেশেত জ্ঞাতিগণ যতেক আছেন। আজ্ঞা দিলা মদিনাতে যাইতে নিশ্চয়।' জ্ঞাতিগণ (মুসলিমগণ) মদিনা চলে গেল।

রসুল মক্কায় রয়ে গেলেন। এই সময়েই মে'রাজ হয়। এই মে'রাজ মুখ্যত অপার্থিব তত্ত্বে ও তথ্যে জ্ঞান লাভ করার জন্যে।

আল্লাহ বেহেস্ত সজ্জিত ও সুগন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং রসুলকে আনবার জন্যে জিব্রাইলকে বললেন :

রজব চাঁদের আজি সাতাইশ রাত্রি
ফিরিস্তা সকলে মিলি আন গিয়া তানে
আজি একত্র বসিমু সিংহাসনে।

রসুল যাবার পথে– আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শন্যকার

সমুদ্র দেখিলা এক তাহার মাঝার।

সেই সমুদ্রে কলাকৃতির এক নৌকা দেখা গেল। সেই নৌকার ঘাটে ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত ইব্লিস রয়েছে। 'তার কর্ণচক্ষু মুখ হোন্তে জ্বলএ আনল।' রসুলের সঙ্গে ইব্লিসের আলাপ হল। রসুলের প্রশ্নের উত্তরে ইব্লিস জানায় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘাইট মাগিতে মোর ললাটেতে নাই
মুখেতে না আইসে মোর ঘাইট মাগিবার।

শয়তানের প্রভাবেই লোকে দাড়ি চাছে, মদ খায়, পরহিংসা-পরনিন্দা করে। মিথ্যা কথা বলে ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং পরের অমঙ্গল চিন্তা করে।

তারপর প্রথম আকাশে নবী :

দেখিলা নক্ষত্র সব আকাশ উজ্জ্বল
গৃহ হোন্তে ধিক দেখি সেই তারাগণ।

রসুল 'ইসমাইল' নামক তারার সঙ্গে আলাপ করলেন :

চারিশত লাখ রহে ফিরিস্তা তাহার।
এ সকল অধিকার ঠাঠার বিজুলির
পৃথিবীতে এ সকলে বরিখাএ নীর।

তারপর পাষাণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। পাষাণের অভিলাষ :

এহি ভায় মনে পুনি
নরকে নারকী দহিতে।

তারপর দ্বিতীয় আকাশে আদমের সাথে দেখা হল। রসুল :

আদমকে জিজ্ঞাসিলা করিয়া ভকতি।
বোল পিতা কিসকে চাহিলা বামপাশ
বহুল রোদন করি এড়অ নিঃশ্বাস।
ডানে বা চাহিতে হাসিলা কি কারণ।

আদম–

ডান পাশে হেরিতে দেখিলুম পুণ্যজন
হাসিএ সে সব দেখি হরযিত মন।
বামপাশে দেখি যথ নারকী সকল
কান্দিতে আছিএ মুঞি হইয়া বিকল।

তৃতীয় আকাশে ইসমাইল ফিরিস্তা :

নিশিদিশি প্রহরে প্রহরে
কুক্কুটের মুণ্ডে সেই দণ্ডবারি মারে
দণ্ডঘাতে সেই কুক্কুটে রোল কৈল যবে
পৃথিবীত কুক্কুট সবে বোল করে তবে।

মুসা পয়গাম্বর 'উচ্চস্বরে রোদন করন্ত নিরন্তর।' তিনি লজ্জায় কাঁদছেন। কেননা, তাঁর উম্মতেরা মুহম্মদ থেকে মুসার মহিমা বেশি বলে দাবি করে। 'এথ মিছা কহে মোর উম্মত দুর্মতি।'

স্বর্গের দুয়ারে গিয়ে মুহম্মদ নীলা, কষা, জমরুদ, মুক্তা ও হীরায় নির্মিত টঙ্গী দেখলেন। এসব টঙ্গী সতী নারীদের জন্যেই।

রহিবেন্ত সতী নারী টঙ্গীর ভিতর

থাকবেন আয়শা, ফিরোয়ান স্ত্রী, বিবি মরিয়ম, বিবি খদিজা ও ফাতেমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ আকাশে ঈসা পয়গাম্বর অবস্থান করেন। ঈসাও কাঁদছেন। রসূলের জিজ্ঞাসার উত্তরে :

বুলিলা তোমার লাজে কান্দি অনুদিন
অযুকত কথা বোলে আহ্মার উম্মতে
আহ্মি অতি ভাল হেন বোলে তোহ্মা হতে।
মাতৃমোর মরিয়াম তানে সর্বক্ষণ
আল্লার বনিতা হেন বোলে সর্বজন।
পাপী সবে মোরে বলে প্রভুর তনয়।

আজাজিল থাকেন পঞ্চম আকাশে। তাঁর অবয়ব :

এক লাখ হাজার চল্লিশ মুখ তার
এক লাখ পাখ তান ত্রিভুবন জুরি।

আল্লাহ – বৃক্ষ এক সৃজিয়াছে আকাশ উপর
সংসারেত জন্ম হএ যথ জীব সব
সেই বৃক্ষেতে জন্ম হএ তথেক পল্লব।
সে পত্রেতে লেখা আছে যথ জীবগণ
ততক্ষণে কথদিনে হইবে নিধন।
সে পত্রে যার নাম লেখন আছএ
মরিব চল্লিশ দিনে আকাশে পড়এ।

ষষ্ঠ আকাশে এক ভয়ঙ্কর মূর্তি :

মুখ কর্ণ চক্ষু নাসা হোন্তে আনল নিকলএ।
পরিধান তান যথ আনলের বাস
মুণ্ডের উপরে কেশ পর্বত আকার।
তালবৃক্ষ সমান লোম দেখিতে ভয়ঙ্কর।
নরক নৃপতি এহি বলবন্ত অতি।
প্রথম নরক মধ্যে লাঘব বহুল
দ্বিতীয় নরকে দুঃখ ষাট হাজার
পঞ্চাশ হাজার দুঃখ তৃতীয় নরকে
চতুর্থ নরকে দুঃখ চল্লিশ হাজার
পঞ্চম নরকে দুঃখ তিরিশ হাজার
ষষ্ঠম নরকে দুঃখ কুড়ি হাজার
পঞ্চম নরকে দুঃখ দশ হাজার।

এখানে নরকের বীভৎসতা ও নরক-যন্ত্রণা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। সপ্তম আকাশে মুহম্মদ :

দেখিলা এক গৃহ মনোহর
হীরা মণি মাণিক্য জড়িছে বহুতর।
বায়তুল মকাদ্দিস করি সেই ঘরের নাম।
সে মসজিদে ইব্রাহিম খলিল বৈসএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরিস্তা সকল সঙ্গে নমাজ করএ।
গৃহের চৌদিকে চারি নদী বহে নিত।

তারপর রসুল স্বর্গে প্রবেশ করলেন। স্বর্গে রয়েছে হুর। তাদের রূপের যদিও তুলনা নেই, তবু তারা আমাদেরই ঘরের নারী—রূপে, গুণে ও অলঙ্করণে।

তাদের অতি সুবলিত তনু ভুরু যুগ দুই ধনু
কটাক্ষে জিনিছে কামশর
দসন মুকুতা পাঁতি বিম্বফল জিনি ওষ্ঠ,
বিজুলি আকাশে জিনি হাস
অধিক লম্বিত কেশ সুগন্ধি আমোদ বেশ
কস্তুরী না হয় তান সম,
মুখশশী 'পরে শোভে নয়ান চকোর
রহিয়াছে অমিয়া আশে হই অতি ভোর
সেই পদ্ম 'পরে শোভে অলেখা ভ্রমর
ঘর্ম জল মধু বুলি পিয়ে নিরন্তর।
পদ্ম শশী দুই নহে তান সমসর।

তাদের কণ্ঠে মোতিছড়ি, অঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, কটিতে চন্দ্রহার, করে কঙ্কণ ও বাহুতে সুবর্ণের বাজুবন্দ।

বেহেস্তের চার নদী, তার একটি সুরাপূর্ণ। নদীর কূলে :
মউলিত বৃক্ষ পরে কুসুম মঞ্জরী।
সত্তর হাজার ডাল এক বৃক্ষ পরে
এক ডালে সত্তর হাজার পত্র ধরে।
আঙ্গারী বদরী বৃক্ষ অতি বহুতর।

তারপর ফিরিস্তাদের নিবাস দেখলেন। এ যেন আমাদের সেনানিবাস। ফিরিস্তারা আল্লাহর আজ্ঞার জন্যে প্রতীক্ষারত এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত। এরপরে অশ্বে আরোহণ করে আল্লার সাক্ষাতে গেলেন রসুল। আল্লাহ তাঁকে অভ্যর্থনা করে বললেন :

আপনা অংশে আহ্মি সৃজিছি তোহ্মারে
তুহ্মি আহ্মি একত্রে আছিল অনুদিন
এ বুলিয়া রসুলক নিলা নিজ পাশ
রবির কোলেত যেন চন্দ্রের নিবাস।

আল্লাহ রসুলকে ইচ্ছেমতো যাঞ্চা করবার স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু মুহম্মদ বললেন:

তুহ্মি বিনে তোহ্মাতে না মাগি আমি আর
তুহ্মি যদি মোরে হৈলে সকল আহ্মার।

কেবল— পাপ হোন্তে নিস্তারিবা উম্মত আহ্মার
মোহোর উম্মত প্রতি ক্ষেম যত দোষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ বললেন : যেমত ফকির তুহ্মি জানে সর্বজন

তোহ্মার মহিমা ভরি এ তিন ভুবন।
তুহ্মি আকাশের শশী কৈলা দুইখান
গন্ধর্ব সকল তুহ্মি কৈলা মুসলমান।
চারি বেদ আর চৌদ্দ শাস্ত্রের মাঝার
প্রচারিয়া দিছি আহ্মি মহিমা তোহ্মার
তৌরাত জবুর আদি ইঞ্জিল ফোরকান
এসব কিতাবে আছে তোহ্মার বাখান।

তারপর মুসা পয়গাম্বরের পরামর্শে তদ্বীর করে করে রোজা-নমাজের সংখ্যা ও পরিমাণ কমিয়ে তিনি মর্ত্যে ফিরলেন। ফেরবার পথে বৃহস্পতি, শুক্র, রবি, বুধ, মঙ্গল, সোম, শশী ও শনি রসুলকে প্রণাম করে গেল।

ফিরে এসে খদিজার জিজ্ঞাসার উত্তরে মুহম্মদ মে'রাজের কথা খদিজাকে বলেছিলেন। এর কিছুকাল পরেই খদিজার মৃত্যু হল। কেননা মে'রাজ বর্ণনায় :

প্রভুর পরম তত্ত্ব শুনি খদিজায়
ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

খদিজার মৃত্যুতে মুহম্মদ বড় আঘাত পেয়েছিলেন :

রসুলেহ খদিজার বিচ্ছেদ কারণ
মনেতে গৌরব ধরি করিলা রোদন।

এরপরে ইব্লিসের প্রভাব-কাহিনী শেখ নইমুদ্দীন দরবেশের কিস্‌সার মাধ্যমে বিবৃত। শয়তান নইমুদ্দিন দরবেশের ছদ্মবেশে এসে মুহম্মদকে বন্দী করে রাখবার জন্যে অথবা হত্যা করবার জন্যে আবুজেহেলদের পরামর্শ দিল। নইমুদ্দীন রূপ শয়তান 'জ্ঞানের প্রদীপে মুই সব দেখা পাই' বলে সবার আস্থা অর্জন করল।

এই হত্যার ভয়েই মুহম্মদ আবুবকরকে নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। পথে যে গিরিগুহায় তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মুখে মর্কট জাল বুনে রেখে ছিল এবং একজোড়া 'কবুতর ডিম্ব দিয়া উম দি' রহিল।' ইব্লিস যখন আরবদের পক্ষ নিয়ে মুহম্মদের খোঁজে গুহার কাছে এল, তখন জিব্রাইলে তাকে ধরি :

পাখ ছাট মুখে মারি,
পাপীক সমুদ্রে পেলাইলা।

মুহম্মদ মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলেন।

তারপর মক্কা বিজয়ের চেষ্টা চলতে লাগল। আরবেরা অকুশল চিহ্ন দেখল :

দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনি শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু আবুজেহেল সঙ্কল্পে অটল। সে শপথ নিল :

যদি মোহাম্মদ না মারিয়া ঘরে যাম
হন্নাত মন্নাত আঝর মাথা খাম।
এ বুলিয়া উট ভেড়া কাটি আর খাসী
সৈন্য সমুদিয়া সুরাপান করে বসি।

বদরের যুদ্ধে আবুজেহেল নিহত হয়। হত্যার পূর্বে ইমান আনবার শেষ সুযোগ তাকে দেয়া হল। কিন্তু আবুজেহেল মৃত্যু-ভয়ে কাতর নয়। সে উদ্ধত, সে বলে তোমাদের :

'প্রভুর সমান হই কৈল মহারণ
তবে আক্ষি কলিমা কহিমু কি কারণ।

বদরের যুদ্ধে রসুল-কন্যা যয়নবের কাফের স্বামী আবু আনসারীও বন্দী হল। যখন রসুল ঘোষণা করলেন যে 'বন্দীরা আপনা প্রাণ ধনে লউক কিনি।' তখন–

ধন পাঠাইয়া দিলা ছাড়াইতে প্রাণপতি
পূর্বে বিবি খদিজাএ করের কঙ্কণ
দুহিতাক দিয়াছিল জড়িত রতন।
স্বামী উদ্ধারিতে যেই কঙ্কণ পাঠাইলা
সেই কঙ্কণ রসুলে খদিজার হেন চিনিলা।
রুদিতে লাগিলা নবী খদিজা গুণ স্মরি
দুহিতাক ফিরাইয়া দিলা সেই কঙ্কণ।

আব্বাসও বন্দী হয়েছিলেন। তিনি এবার ইসলাম কবুল করলেন। বদরের যুদ্ধ থেকে ফিরে রসুল কন্যা ফাতেমার বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। সুচরিতা 'ফাতেমা সম সতী পৃথিবীতে না জন্মিব।' কাজেই অনেকেই তাঁর পাণিপ্রার্থী। জিব্রাইলের পরামর্শে রসুল ঘোষণা করলেন :

সভানের আগে যে পড়এ কোরান
বিভা দিব ফাতেমারে সেই বীর স্থান।

ঘোষণা শুনে–

উমর খত্তাব আবুবকর সিদ্দিক
পড়িবারে কোরান লাগিলা একে এক।
আর যথ আসব্বা সব নমাজে আছিলা
সকলে কোরান মেলি পড়িতে লাগিলা।
তবে আলি ওজু করি বসি তিনবার
লাগিলেন্ত সুরা এখলাস পড়িবার।

তিনবার সুরা এখলাস পড়লেই কোরান পাঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও পুণ্যলাভ হয়। অতএব, জিব্রাইলের পরামর্শে খুব ধুমধামের সাথে আলির সঙ্গে ফাতেমার বিয়ে দিলেন রসুল।

আগর চন্দন গুরু কাফুর কেশর
লোবানধূপিত আর আবীর আতর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেত সুগন্ধি লিপিবারে।
শুকল বসন সব অঙ্গেতে পরাইলা
সুর্মা কাজল দোহ নয়ানেত দিলা।
ভাল রূপে করিলা বিভার মেজোয়ানি ...
মিষ্টদ্রব্য এ সবেরে করাই ভোজন
যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিলা লেপন।

খদিজাকে স্মরণ করে রসুল বিলাপ করলেন :

খদিজারে স্মরিয়া অধিক মনো দুঃখী
চিনি নৈল আন্মারে রসুল না হৈতে
কঠিন পাষাণ দেহ না যাএ বিদার
তাহান বিচ্ছেদ আহ্মি নারি সহিবার।
দোহান যদি একত্রে মরি যাইত
তবে কার শোক কার মনে না লাগিত।

ফাতেমার বিবাহের বর্ণনা সংবলিত একটি সহেলা রয়েছে। চট্টগ্রামের বিবৃতিমূলক মেয়েলী গানেরই নাম সহেলা।

যথেক মহিষী মনেত হরষ বাসি
সুস্বরে সহেলা সবে গাহে
চতুঃসমে ভরি অঙ্গ করন্ত বিবিধ রঙ্গ
কবিলাস বরণ বাজাএ।
ঢাকঢোল ঝারি কাঁসি মৃদঙ্গ দোহরি বাঁশি
বাজায়ন্ত বেউল কল্লাল।
দুন্দুমির শব্দ অতি ডম্বরু ঝাঁঝরি তথি
দপভঙ্গ শুনি লাগে ভাল
উন্মত্ত যৌবন নারী নানাবর্ণ বস্ত্র পরি
আনন্দে সহেলা সবে গাএ।
বিবি ফাতেমার অঙ্গে আনন্দ কৌতুকে রঙ্গে
মহাসুখে তেলোয়াই চড়ান্ত
আইত সই মিলি করি অতি হুলাহুলি
ফাতেমার অঙ্গেতে নিপুণ।
জুমাবারে করাইলা গোছল
সেই মারোয়ার তলে সুগন্ধি দিউটি জ্বলে
বহুল ফানুস জ্বলে নিত।
যথেক আরব মিলি লই শাহা-মল্ল আলি
গস্ত ফিরাই আনাইলা
আগর চন্দন পরি বসাইল আমোদ করি
চলিলেন্ত অতি শোভাকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাটুয়াএ করে নাট রহি রহি বাট বাট
যন্ত্রসব বাজে চারি ভিত।
নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেউল কন্নাল গাজে।

আয়েশার দারিদ্র্য :

দীপ বিনে অন্ধকার হইছে মোর ঘর
আর মোর ঘরে তৈল নাই মহাশয়।
বসনেত এক মোর সুঁইচ আছএ।

অন্ধকারে সুঁই পাওয়া যাচ্ছে না। আশঙ্কা, রসুলের কোমল অঙ্গে পাছে সেই সুঁই ফুটে। রসুল শুনে হাসলেন :

হাসিতে প্রকাশ হৈল দসনের জুতি
দিবস সদৃশ হৈল অন্ধকার রাতি।

রসুল আয়েশার কাছে অহঙ্কার করে বললেন :

হারাই আছিলা সূচি হইল বেকত
ততোধিক জোত আছে দসনে আমার
দশ দিশ পারম পসর করিবার।

জিব্রাইল এসে বলে গেলেন :

যেই দসনের তুমি মহিমা দেখাইছ
সেই মুখে সেই দসনে পাইবারে ব্যথা।

কবিও মন্তব্য করছেন :

আপনেহ আপনা মহিমা না কহিও
আন হোন্তে আপনাক অধিক না জানিও।

রসুলের পায়ে একবার ব্যথা হয়েছিল। জিব্রাইলের পরামর্শে রসুল ইট পুড়িয়ে পায়ে সেঁক দিয়ে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। বিনা অপরাধে দগ্ধ হওয়ায় ইট আল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন, 'আপনা শরীর কিবা আনের শরীর। এক দেহ হেন জানিতে উচিত নবীর।' আল্লাহ ইটকে ওহুদ প্রান্তরে গিয়ে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। ওহুদের যুদ্ধে এই ইটই শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়ে রসুলের দাঁত ভেঙ্গেছিল। এভাবেই রসুলের অহঙ্কার আর অপরাধের শাস্তি হয়েছিল।

ওহুদের যুদ্ধ :

আবুজেহেলের পরে আবু সুফিয়ানই কাফেরদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

তিনি :

মহাবলী যোদ্ধাসব সমরে কেশরী
পদাতিক সৈন্য সব সমুদিত বেড়ি।
ধ্বজ-ছত্র পতাকা নানার বাদ্য বাজে
ভেউর কন্নাল শিঙ্গা নানা শব্দে গাজে।
খর্গরে চমকে যেন ছটকে বিজুলি
দুমদুমির শব্দে যেন মেদনী টলমল।
প্রলয় হৈল হেন জানিলা সকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যুদ্ধে রসুল পক্ষীয় মুনাফেকগণ 'হৃদেত কপট ভাব মুখেত পিরীত' রেখে রসুলকে ব্যূহ ছেড়ে যুদ্ধে যাবার জন্যে কুপরামর্শ দিল। রসুলের দাঁত ভাঙল। আমীর হামজা :

যুদ্ধে পরাজিত করে এক বৃদ্ধার
একে একে বার পুত্র ফেলিল কাটিয়া।
পুত্রশোকে সেই নারী রণস্থলে আসি
যুগপদে অশ্বের মারিল দরমারি
অশ্ব হইল উপরে আমীর হৈল অলে
সময় পাইয়া মারে কাফির সকলে।

ওহুদের যুদ্ধে হামজা শহীদ হন। ওহুদের যুদ্ধের মাঝখানে রসুলও ওফাত পেয়েছেন বলে রটে যায়। মুমীনরা এবং ফাতেমা ও রসুল পত্নীগণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। সবে-মুণ্ডে হাত দিয়া উচ্চস্বরে বিলাপিয়া বোলে আহ্মি হইল অনাথ।

আসলে জিব্রাইলের পরামর্শে রসুল :

গিরিত সুড়ঙ্গ পাই প্রবেশ করিয়া যাই
একসর বসিয়া রহিলা।

মুহম্মদ সন্ধি প্রার্থনা করলেন সুফিয়ানের কাছে। সুফিয়ান সন্ধিপত্রে 'রসুল' না লিখে 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ' লেখার শর্ত দিলেন। ফলে সন্ধি হল না।

এ সময় আল্লাহর নির্দেশে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল :

বায়ু বৃষ্টি হৈল অতি অন্ধকার হৈল রাতি
বিজুলি চমকে ঘন ঘন
কাকে কেহ না দেখএ আত্মপর পরিচএ
না পাওন্ত আরবের গণ।
অশ্ব উট সারি সারি রহিল ভূমিত পড়ি
কোন দিকে যাইতে নারিলা
যথ তাঁবু শামিয়ানা ধ্বজ ছত্র যথ বানা
বাতাসে উড়াই যথ নিলা
আপনার হাত পাও না দেখে আপনা গাও
না দেখে আপনে আপনারে
বরিষএ অনিবার নিশি হৈল অন্ধকার
কেহ কারে চিনিবারে নারে।

সুফিয়ানের দল মক্কায় ফিরে গেল। রসুল এবার য়ুহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। রসুল সায়াদের পরামর্শে বলবন্ত ছয় হাজার বন্দী য়ুহুদকে হত্যা করালেন। 'স্ত্রীপুত্র য়ুহুদের নিলা জনে জন। অশ্ব উট রথ যথ কাঞ্চন দ্রব্য জাত, বিবর্তিয়া লৈল যেন নবীর সাক্ষাৎ।'

চতুর্থ যুদ্ধ :

সুফিয়ানের কাছে দূত মারফৎ পত্র পাঠালেন রসুল :

পত্রেত আছিল লেখা নামাজ করিতে
মূর্তিসব না সেবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর লেখে পৈতা ছিঁড়ি ফেলিতে ব্রাহ্মণ
আল্লার সেবাতে মন দেউক যত্তন।
কলিমা কহুক লই রসুলের নাম
পরনিন্দা পরহিংসা তেজিয়া অকাম।
মালের জাকাত দিব রোজা এক মাস
মুসলমানি দীন সবে করিতে প্রকাশ।

মক্কাবাসীরা পত্রোক্ত শর্ত স্বীকার করল না। আবার যুদ্ধ বাধল। দুই মাস যুদ্ধ হল– 'এইমতে মহাযুদ্ধ হৈল দুই মাস।'

রসুলের সৈন্য হইল অধিক হতাশ।
একেত সদায় রণ আর অনাহার
রবির কিরণ জল নাই খাইবার।
কথ কথ সৈন্য গেলা রসুলক এড়ি
মদিনাত চলি গেলা রণ পরিহরি।
আল্লার হুকুমে– পাষাণেতু জলধার বহিতে লাগিলা
সৈন্য সবে ঘটি ভরা সকল ভরিলা।
দেখিলা বহুল ফল বৃক্ষের উপর ...
ফল জল পানে সৈন্য সন্তোষ হৈল।

বনু মস্তলক, বনু মস্তহাদ, বনু তবক প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধে রসুলের জয় হল। ওদের ছিল সব পাষাণের ঘর। আর 'লুকাই রহিল সব তাহার ভিতর।'

তবে রসুলের সৈন্যেরা 'পাষাণের গৃহসব আনলে তাপিল। আনলের তাপে ঘরে না পারে রহিতে।'

ঘর হোন্তে বাহির হৈল যেই জন
রসুলের সৈন্য তাকে করিল নিধন।
তারপর– সজীবে যেসব ছিল সে দেশের নর
সৈন্য সবে দাসদাসী কৈলা বহুতর।
হীরা মণি মাণিক্য লুটিলা সর্বজন
লুটিল যথেক সুচরিতা নারীগণ।
রজত কাঞ্চন দ্রব্য যথেক লুটিলা
উট গাভী গর্ভ ছাগল লুটি নিলা
এমরান হুজ্জাজবাসী বহুল লুটিলা।

খন্দকের যুদ্ধ :

এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মক্কাবাসীদের সম্বন্ধে রসুলের মনোভাব ছিল প্রীতির :

এক মোর জ্ঞাতিগণ আর ইষ্টজন
কার্য নাই এ সকল করিতে নিধন।
নারী সব বিধবা হইয়া গালি দিব
মোর প্রতি নারী সবে অযশ ঘোষিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নীতি স্থির করেই মক্কা অভিযানে বের হলেন রসুল।
এ অভিযান অন্য অভিযানের মতো নয় :

জন্মভূমি পুণ্যদেশ দেখিবারে শ্রদ্ধা বেশ
স্মরণে হৃদয় ফাটি যাএ।

কাজেই যুদ্ধ করা তাঁর ইচ্ছা নয়। আবু সুফিয়ান ও আরবদের নিকট সংবাদ পাঠালেন তিনি :

তারা কি কারণে মোর সনে করন্ত বিবাদ
আমি নাহি আসি তান সনে বুঝিবার
আসিয়াছি আপনার ভূমি দেখিবার।

বিনা বাধায় রসুল মক্কা প্রবেশ করলেন। হজ্জব্রত উদযাপন করলেন। জ্ঞাতি ও পরিচিতদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। এই পুণ্য মিলন দিনের স্মৃতি নিয়ে রসুল মদিনায় ফিরলেন। পর বৎসর মুহম্মদ মক্কা জয়ের সংকল্প নিয়ে বের হলেন। সামান্য যুদ্ধের পর মক্কাবাসীরা আত্মসমর্পণ করল। রসুল সবাইকে ক্ষমা করলেন। আর সুফিয়ানাদি সবাই ইসলাম কবুল করলেন। কাবা থেকে মূর্তি সব বের করিয়ে ভাঙ্গালেন। জমজম-কূপের পানি দিয়ে কাবা প্রক্ষালন করে পবিত্র করলেন।

তারপর নবী যুনিন-তাইপা-এ অভিযান করেন পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে। এরূপে তিনি রুম-সাম-হাবস-ইয়ামন প্রভৃতি 'চল্লিশ শহর মারি লৈল'।

AMARBOI.COM

ওফাতে রসুল :
হজ শেষ করে রসুল মদিনা ফিরলেন। তখন :

রসুলের মনেত হইল অভিলাস
শহীদ হৈয়া যাইতে ইলাহির পাশ।

তিন বছর পূর্বে খয়বরবাসীরা খাসীর মাংসে বিষ মিশিয়ে দিয়ে যে-মাংস রসুলকে খাইয়েছিল, এখন রসুলের :

শহীদ হইতে যদি ইচ্ছা হৈল মনে
উথলিল সেই বিষ আল্লার ফরমানে।

কেননা—

বিষের তাপের জারে মরে যেই জন
শহীদ হইয়া করে বেহেস্তে গমন।

তারপর মৃত্যু ও আজাজিল সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। আয়েশা, ফাতেমা, আলি, হাসান-হোসেন, আবুবকর, ওমর, উসমান প্রভৃতি থেকে বিদায় নিলেন রসুল। আয়েশা প্রশ্ন করলেন :

'আঁখির পুতলি তুহ্মি জীবের জীবন,
আজি কেনে তোহ্মা দেখি রাতুল চরণ।
কমল মুখের রূপ কোনে হরি নিছে,
কোন্ রাহু আসি মোর এ চাঁদ গিলিছে।'

আয়েশাকে বললেন :

সকল নারীতু তুহ্মি মোর প্রিয় অতি
তোহ্মার আহ্মার মধ্যে নাহি ভিন্নভেদ।
সোমবারে আহ্মা হোন্তে হইবা বিচ্ছেদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাতেমার সঙ্গে হাসর ও উম্মত সম্বন্ধে রসুলের কয়েকটি কথা হল। ফাতেমাকে রসুল বললেন :

প্রলয় হৈলে আহ্মি সন্তানের আগে
তোহ্মা সনে দর্শন করিমু অনুরাগে।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রসুল ফাতেমাকে বললেন :

মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুহ্মি বিনে নাহি আন
তুহ্মি মোর আঁখির পুতলি
মোর চিত্ত-বৃক্ষে ফল তুহ্মি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুহ্মি কলি।
জীবের জীবন তুহ্মি আঁখির আঞ্জন
হৃদয় বৃক্ষের ফল গাএর চন্দন।

আজরাইল এক আরবের বেশে এসে দাঁড়ালেন মুহম্মদের কাছে। ইহুদী আবকাসের কাহিনীও বর্ণিত আছে। নবীর পিঠে মোহর-ই-নবুয়ত দেখার অভিপ্রায়ে সে রসুল-ঘোষিত দায় পরিশোধ-বাঞ্ছার সুযোগ নিল। আর পিঠে চাবুক মারার ছলনায় মোহর-ই-নবুয়ত দেখে ইসলাম কবুল করল।

AMARBOI.COM

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ক. সৈয়দ সুলতানের নবী বংশ-এর আরবী-ফারসী উৎস

সৈয়দ সুলতান নবীবংশ রচনায় কোনো আদর্শ গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করেন নি। তাঁর গ্রন্থের উপক্রম যে মৌলিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য মৌলিক অর্থে আমরা এদেশে বানানো লোক-প্রচলিত কাহিনীর কাব্যিক রূপায়ণই নির্দেশ করছি। হিন্দুয়ানী সৃষ্টিতত্ত্ব, বেদ, সুরাসুর, শিব, কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতির বর্ণিত কাহিনী হচ্ছে হিন্দুর ধর্মতত্ত্বের মুসলমানী ভাষ্য। বলেছি, পারিবেশিক প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের অসারতা এবং যুগধর্ম হিসেবে ইসলামের উপযোগ প্রমাণের পটভূমিকা রূপেই এ অংশ লিখিত। 'এই চারি বেদে সাক্ষী দিছে করতার। অবশেষে মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।' সৈয়দ সুলতানের অনুসরণে পরবর্তীকালে কবি শেখ চাঁদও এ রীতি গ্রহণ করেছেন।

মনে হয়, সৈয়দ সুলতান কোনো একক গ্রন্থের অনুসরণে এ কাব্য রচনা করেননি। তাই তাঁর কাব্যে কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামোল্লেখ নেই। কয়েক স্থানে কোরআনই তাঁর বিবৃতির উৎস বলে দাবি করেছেন।

১. কহে সৈয়দ সুলতান শুন নরগণ
একমন হই শুন শাস্ত্রের বচন।
এহি সব পরস্তাব কোরানে আছিল
দেশী ভাষা করি তারে পঞ্চালি রচিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনিলে এসব কথা হরে সব পাপ
জানিবা শাস্ত্রের মূল খণ্ডিব সন্তাপ।

২. শাহ হোসেনের দাস সৈয়দ সুলতান
রচিলুঁ কোরান কথা এসব বয়ান।

৩. যথ কথা মুসা পয়গাম্বরের আছএ
সে সকল পরস্তাব কোরানে লেখএ।
ফোরকানের মধ্যে আছে অনেক বারতা
তে কারণে পঞ্চালিতে ন লেখিলুঁ গাথা।
কহে সৈয়দ সুলতানে শুন নরগণ
না কহিবা আন কথা শুন এ বচন।
বহু দুঃখে রচিআছম এ পদাবলী
ধর্ম কথা শুনিবা সে নাহি দিবা গালি।

৪. কিতাবেত লেখিয়াছে যে-সকল ভাল।
যেইমতে নিরঞ্জন সৃজিল সংসার
প্রথমে কহিএ আছি সে-সব প্রকার।

৫. কহে সৈয়দ সুলতানে শুন নরগণ
এহি হিন্দি নবী-বংশ শুন দিয়া মন।
আছিল আরবী ভাষে হিন্দি করিলুঁ
বঙ্গদেশী বুঝে মতি প্রচারিয়া দিলুঁ।
না বুঝি আরবী-শাস্ত্র জ্ঞান না পাইলা
হিন্দুয়ানী ভাষা পাই আচার জানিলা।

৬. অধিক উত্তম কথা কিতাবে দেখিয়া [১]
আলিম সভাত দিল বাঙ্গালা রচিয়া। [২]

অতএব, কবি পড়ে-শুনে যা আয়ত্ত করেছিলেন, তা-ই নিজের ভাব-চিন্তা-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। এবং রচনা করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা, ধারণা ও মানস-প্রবণতার আলোকে।

যে-সব আরবী ও ফারসী নবী-কাহিনী ও রসূল চরিত তাঁর কাব্যের পরোক্ষ উৎস সে-সবের কয়েকটির নাম এখানে বিধৃত করছি।

আরবী ঃ

ক. কাসাসুল আম্বিয়া ঃ

১. আদ্‌দুরার অল্‌ ফহিরা অর রন্‌দা অন্‌ নাদিরা—এটি ৭০৫ হিঃ বা ১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত। রচয়িতার নাম আবদুল কাহির অৎ তাজিফি বদরউদ্দীন অল হানাফী অল হলবি।

২. কিসাসুল আম্বিয়া ঃ মতাররিফ অল কিনানী অৎ তারাফ কৃত। ৪৫৪ হিঃ বা ১০৬২ খ্রীস্টাব্দে রচিত কিংবা লিপিকৃত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অরাইস-অল মাগালিস ফি কিসাস-অল আম্বিয়া। আবু ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম আত্তালাবি অল নিসাপুরী রচিত।
লিপিকাল ৪২৭ হিঃ বা ১০৩৫-৩৬ খ্রীস্টাব্দ।

৪. যুজুনল আতর ফি গাজাওয়াৎ সায়জিদ রাবিয়া ওয়া মুদার ওয়া ফি সামান ইলিহি হিজ আসফ সামাইল অল-বসর। ৬৯৪ হিঃ বা ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দে লিপিকৃত। রচয়িতা হচ্ছেন আবু উমর আবদুল আজিজ বিন মুহম্মদ বিন্ ইব্রাহীম ইজ্জউদ্দীন বিন জামাল কিনানী।

৫. বাদ্ আদ্ দুনিয়া ওয়া কিসাস অল আম্বিয়া। লেখকের নাম ঃ আবু বকর বিন আবদুল্লাহ্ অল কিসাই।

৬. বাদ অল কালকা ওয়া কিসাস অল আম্বিয়া। রচয়িতা আবু রিফায়া উমর বিন ওয়ালিমা বিন মুসা অল ফুরাত অল ফানসি অল ফাসাবি।

৭. কিসাম অল আম্বিয়া। আবুল হাসান বিন হাসম অল্ বুসানজী বিরচিত।

৮. উগালৎ অর রকিব ফি জিকির আশরফ অল মনকিব। লিপিকাল ৬৭০ হিঃ বা ১২৭০ খ্রীস্টাব্দ। গ্রন্থ-রচক মুহম্মদ বিন আলি বিন আজ্ জামলাকানি।

৯. মুখতাসার সিরাত অন-নবী। লেখক আবু ফৎ মুহম্মদ বিন আবু বকর মুহম্মদ ফতেউদ্দীন অল জামারী অল আন্দুলুসি আস সুফি বিন সৈয়দ আন্নাস। লিপিকাল ৬৬১ হিঃ বা ১২৬৩ খ্রীস্টাব্দ।

১০. বাঘাত অল মহফিল ওয়া বুগজাত অল আমাতিল ফিস সিজার ওয়াল আহলাখ ওয়াস সায়িল ফি সিরাত অল আওয়াহির ওয়াল আওয়ায়িল। লিপিকাল ৮৯৩ হিঃ বা ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দ। আবু জাকারিয়া ইমাদ উদ্দীন ইয়াহিয়া বিন আবুবকর অল আমিরী রচিত।

১১. আল মওয়াহিব অল্লা দুন্নিয়া ফি'ল মিনাহ অল মুহম্মদীয়া। লিপিকাল ৯২৩ হিঃ বা ১৫১৭ সন। রচয়িতার নাম আবুল আব্বাস বিন মুহম্মদ বিন আবু বকর অল খাতিব সিহাবউদ্দীন অল কস্তাল্লানি অসসা'ফী।[৩]

রসুল হযরত মুহম্মদ সম্পর্কিত রচনা দু'প্রকার মাগাজী ও সিরাত। মাগাজী হচ্ছে জঙ্গনামা বা যুদ্ধ-কাহিনী। রসুল পরিচালিত যুদ্ধের ঐতিহাসিক আলোচনাই এর বিষয়। আর সিরাত-এর বর্ণিত বিষয় রসুল চরিত বা জীবন। ওফাতের প্রায় শতেক বছর পর থেকে এগুলো রচিত হতে থাকে।

উমাইয়া বংশীয় খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজের আগ্রহে ও প্রতিপোষণে ইমাম যহরীই (মৃত্যু ১২৪ হিঃ) প্রথম মাগাজী ও সিরাত রচনা করেন। মাগাজী রচনায় তাঁকে অনুসরণ করেন মুসা বিন ও কবা (মৃঃ ১৪১ হিঃ) মুহম্মদ বিন-ইসহাক (মৃঃ ১৫১ হিঃ)। [এঁর মাগাজীর ফারসী তর্জমা শিবলী নোমানী এলাহাবাদে দেখেছিলেন।] ইবনে হিশাম (মৃঃ ২১৮ হিঃ), ওয়াকেদী (মৃঃ ২০৭ হিঃ), ইবনে সাদ (২৩০ হিঃ) প্রমুখ অনেকেই।

রসুলের সিরাত বা জীবনী গ্রন্থ যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে প্রাচীন হচ্ছেন-ও'রওয়া বিন যুবাইর (মৃঃ ৯৪ হিঃ), ইমাম শায়াবী (মৃঃ ১০৯ হিঃ), ওহাব বিন মুনাব্বাহ (মৃঃ ১১৪ হিঃ), আসিম বিন আমর বিন কাতাদাহ আল্ আনসারী (মৃঃ ১২১ হিঃ), মুহম্মদ বিন মুসলিম বিন্ শিহাব যহরী (১২৪), ইয়াকুব বিন ও'কবা (মৃঃ ১২৮ হিঃ),মুসা বিন ও'কবা (মৃঃ ১৪১ হিঃ), মুহম্মদ বিন ইসহাক (মৃঃ১৫১ হিঃ), হিশাম বিন ওর'ওয়া বিন যুবাইর (মৃঃ ১৪৬ হিঃ), আমর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন রাশেদ আল হজদী (মৃঃ ১৫২ হিঃ), আবদুর রহমান বিন আবদুল আজিজ আল-আউসী (মৃঃ ১৬২ হিঃ), মুহম্মদ বিন সালেহ বিন দিনারুত্ তামার (মৃঃ ১৬৮ হিঃ), আবু মাশর নজীহ আল মাদানী (মৃঃ ১৭০ হিঃ), আবদুল্লাহ বিন যাফর বিন আবদুর রহমান আল মাখজুমী (মৃঃ ১৭০), আবদুল মালেক বিন মুহম্মদ বিন আবু বকর আনসারী (মৃঃ ১৭২ হিঃ), আলী বিন মুজাহিদ (মৃঃ ১৮০ হিঃ), জিয়াদ বিন আবদুল্লাহ বিন তোফাইল বাক্কাখী (মৃঃ ১৮৩ হিঃ), সালমা বিন ফজল আল ইবরাশ আনসারী (মৃঃ ১৯১ হিঃ), আবু মুহম্মদ ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন আব্বান (মৃঃ ১৯৪ হিঃ), অলীদ বিন মুসলিম কোরায়ইশী (মৃ ঃ ১৯৫ হিঃ), ইউনুস বিন বাকীর (মৃঃ ১৯৯ হিঃ), মুহম্মদ বিন আমর আল-ওয়াকেদী (মৃঃ ২০৭ হিঃ), ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম আলযহরী (মৃঃ ২০৮ হিঃ), আবদুর রাজ্জাক বিন হুমাম বিন নাফে হামিরী, আবদুল মালেক বিন হিশাম আল হামিরী (মৃঃ ২১৩-১৮ হিঃ), আলী ইবনে মুহম্মদ আল মাদানী (মৃঃ ২২৫ হিঃ), আমর বিন শাব্বাতুল বসরী (মৃঃ ২৬২ হিঃ), মুহম্মদ ইবনে ঈসা তিমমিজী (মৃঃ ২৯৭ হিঃ), ইব্রাহিম বিন ইসহাক বিন ইব্রাহিম (মৃঃ ২৮৫ হিঃ), আবুবকর আহমদ বিন আবি খাইসামা, মুহম্মদ ইবনে আইয়জ দামশকী প্রমুখ। উল্লেখিত লেখকগণের অনেকেই ইমাম, মহাদ্দেস ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাই এঁদের রচনা বহুলাংশে তথ্যনিষ্ঠ।

এঁদের কারো কারো গ্রন্থ অবলম্বন করে যাঁরা ভাষ্য ও বিশ্লেষণ মূলক সিরাত রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান সাহেলী একজন। তাঁর 'রওজাতুল আনাফ' গ্রন্থটি মূলত মুহম্মদ বিন ইসহাক রচিত সিরাতের ভাষ্য। এছাড়াও তিনি আরো ১২০ খানা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তাঁর মৃত্যুকাল ৫৮১ হিজরী।

আর 'সিরাতে দামইয়াতী' রচনা করেন হাফিজ আবদুল মুমেন (মৃঃ ৭০৫ হিঃ), 'সিরাতে খালাতী' লেখেন আলাউদ্দীন আলি ইবনে মুহম্মদ খালাতী (মৃঃ ৭০৮ হিঃ)। সিরাতে গাজরুনী শেখ জহীরুদ্দীন আলি ইবনে মুহম্মদ গাজরুনীর (মৃঃ ৬৯৪ হিঃ) রচনা। 'সরফুল মুস্তফা' নামের দুটো গ্রন্থ রচনা করেন হাফিজ ইবনে জওজী ও হাফিজ আবু সায়িদ আবদুল মালেক। মালেকের গ্রন্থ আট খণ্ডে সমাপ্ত। এগুলো ছাড়া, ইবনে আবদুল বারের 'সিরাত', ইবনে সাইয়েদুনের 'ইয়ুনুল আসার,' ইব্রাহিম ইবনে মুহম্মদের 'নুরুন নাবরাস', হাফেজ জয়নুদ্দীনের 'সিরাতে মনজুম' এবং মুওয়াহিব লাজানিয়া জরকানী আলাল মুওয়াহিব, সিরাতে হালাবী প্রভৃতিও উল্লেখ্য।

রসুল চরিতের যেগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে তাদের মধ্যে ইমাম বোখারীর তারিখ-ই-সগীর ও তারিখ-ই-কবীর এবং ইমাম মুহম্মদ ইবন ইসহাক ও ওয়াকেদী রচিত সিরাত ও ইমাম তারাবীর তারিখ-ই-কবীর প্রখ্যাত এবং পণ্ডিত-প্রিয়[৪]।

মধ্যযুগে ফারসী ছিল পাক-ভারতের দরবারী ভাষা। কাজেই সৈয়দ সুলতানের উপর ফরাসী গ্রন্থের প্রভাবই অধিক থাকার কথা। এজন্যে Storey-র Catalogue থেকে কয়েকটি প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম করছি ঃ

ক. কিসাস অল আম্বিয়া—নবী ও ইমাম কাহিনী। এটির লেখক আহমদ বিন মুহম্মদ মনসুর। এ গ্রন্থে 'তকমিলাত অল লতিফ ওয়া নুজহত অৎ জরায়িফ' নামে আবু মুহম্মদ আবদুল আজিজ বিন উসমান অল জসি রচি'ত গ্রন্থের অনুসৃতি আছে। শেয়োক্ত গ্রন্থটি তেরো শতকের।[৫]

খ. তাজ-অল কিসাস ঃ রচয়িতা আবু নসর অল্ বোখারী। এতে হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি বর্ণিত।[৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. কিসাস-অল আম্বিয়া, সম্ভবত তেরো শতকের রচনা। এতে নবীদের ও খলিফাদের জীবনী আলোচিত।[৭]

ঘ. মকাসিদ-অল আউলিয়া ফি মহাসিন অল আম্বিয়া। এটি নবীদের ও চার খলিফার চরিত-কথা।[৮]

ঙ. কিসাস অল আম্বিয়া ঃ ফারসী মুতর্জম আবদুল্লাহ আল হানাফি অল তুসতরী। মূল আরবী গ্রন্থ আবুল হাসান বিন হাসম আল বুসানজী রচিত।[৯]

চ. মজমাউল হুদা—নবীদের ও ইমামদের কথা বর্ণিত।[১০]

ছ. জাদ-অল আখিরাহ—ফতে হোসাইনী রচিত। এতে আদম থেকে ওফাতে রসুল অবধি বর্ণিত।[১১] সৈয়দ সুলতানের নবীবংশও এই শ্রেণীর গ্রন্থ।

জ. মনাকিব-ই-আম্বিয়া—ইসলাম-পূর্ব যুগের নবীদের সম্বন্ধে যে-সব উপকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতি চালু ছিল, সেগুলো এ গ্রন্থে সংগৃহীত এবং হযরত মুহম্মদ ও চার খলিফার কথাও এতে সংক্ষেপে বিবৃত রয়েছে।[১২]

ঝ. আজায়িব অল কিসাস—নবীদের কাহিনী বর্ণিত।[১৩]

ঞ. রওদাৎ অল মুত্তাকিন— হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি নবীদের কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য।[১৪] এছাড়া আফযা অল আহওয়াল, আখবার অল আম্বিয়া, কিসাস অল আম্বিয়া প্রভৃতি নবী-কাহিনী রচিত হয়েছে।[১৫] একটি গ্রন্থে সৃষ্টিপত্তন কথাও নবীদের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[১৬]

উক্ত কোন গ্রন্থের সঙ্গেই সৈয়দ সুলতানের কাব্যের হুবহু মিল নেই। মুহম্মদ ইবন ইসহাকের A. Guillaume কৃত ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে কিংবা কুমিল্লা জেলার চাঁদপুরবাসী মরহুম মোহাম্মদ সায়ীদ রচিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত 'তাওয়ারিখে মোহাম্মদীর' সঙ্গে এর মিল সামান্য।

বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব ও স্থিতি। 'বিশ্বাসে মিলয় ধর্ম তর্কে বহুদূর' জাতীয় প্রবচনের সৃষ্টিও এ বোধের পরিচায়ক। ধর্মবিধি লোকে ও লোকান্তরে প্রসারিত জীবনের নিয়ন্তা। মানুষের যেখানে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির শেষ, সেখান থেকেই বিশ্বাসের, বিস্ময়ের, কল্পনার ও ভীতির শুরু। অতএব, বিশ্বাস মানুষের জ্ঞান, যুক্তি ও বুদ্ধির উর্ধ্বে। যা বাহুবলের আয়ত্তে নয়, যা জ্ঞান ও যুক্তি-বুদ্ধির অগোচর, তাতেই মানুষের ভয় এবং সেখানে মানুষ দুর্বল ও অসহায়, তাই সে ভীরু। ভীতির থেকে মুক্তির জন্যে চাই শক্তির আশ্রয় ও পোষণ। সে শক্তিও আবার হওয়া চাই আস্থা রাখার মতো, ভরসা পাওয়ার মতো এবং নির্ভর করার মতো অপরিমেয়, অসীম এবং বিস্ময়কর। তাই এ শক্তির উৎস হবে অপৌরুষেয়, অপার্থিব ও বোধাতীত। নইলে অন্ধ বিশ্বাস ও ভরসা রাখা অসম্ভব। মর্ত্য-মানবের মধ্যে যিনি এই অলৌকিক ও অপৌরুষেয় শক্তির Apostle হবেন বা প্রতিনিধিত্ব দাবি করবেন, তাঁর মধ্যে থাকা চাই অসামান্যতা ও অদ্ভুতাচরণের শক্তি। তিনি করবেন অসম্ভবকে সম্ভব, অস্বাভাবিককে স্বাভাবিক এবং অসাধ্যকে আনবেন সাধ্যের ভেতরে। তাই দুনিয়ার তাবৎ জাতির নবী, রসুল, পীর, অবতার, ফকির, সাধু ও সন্ন্যাসীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায়ের প্রথম ও প্রধান অঙ্গীকার হচ্ছে ঐশ্বর্য বা কেরামতী প্রদর্শন। হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি ইসলামী ধারার সব নবী-রসুলের জীবন তাই অলৌকিকতা দিয়ে শুরু ও শেষ। কেবল কয়েকজন ব্যক্তি ও ঘটনাস্থলেই মাত্র ঐতিহাসিক। অতএব, এগুলো 'ঐতিহাসিক' নাম-সার বানানো গল্প।

হযরত মুহম্মদের জীবনেও, নবুওত ও ওহি প্রাপ্তির অভিজ্ঞান স্বরূপ সিনাছাক, চাঁদ দ্বিখণ্ডিতকরণ এবং মে'রাজ ছাড়াও তাঁর আরো নানা মোজেজার কথা ভক্ত সমাজে ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়েছিল। যেমন, আবদুর রহমান ইবনে আবুবকর বলেছেন, একদিন হযরত মুহম্মদ বকরীর কলিজা ও গোস্ত একশ ত্রিশ জন লোককে পেটপুরে খাইয়েছিলেন, তারপরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল।[১৭] জাতকেও বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধে এমনি গল্প পেয়েছি। রসুল চরিতে এবং সহি হাদিসে এমনি নানা অলৌকিক কথ্য ও গল্প ঠাঁই পেয়েছে।

মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যেই রয়েছে অতিভাষণের বীজ। নিন্দায় কিংবা প্রশংসায় মানুষের একই স্বভাব ভিন্নমুখী অভিব্যক্তি পায়। শ্রদ্ধা কিংবা ঘৃণা মানুষকে অতি কথনে এবং দোষ বা গুণের বিকৃতি সাধনে প্রবর্তনা দেয়। ভক্তের অভিভূতির আচ্ছন্নতা যেমন মনোময় কল্পনার প্রশ্রয় দেয়, বিদ্বেষের তীব্রতাও তেমনি মনগড়া দোষের ফিরিস্তি বাড়ায়। ফলে, ভক্তি শ্রদ্ধার আতিশয্য যেমন অতিভাষণের প্রবণতা জাগায়, তেমনি ঘৃণা বা অবজ্ঞার আত্যন্তিকতা তিলকে তাল করে দেখার প্রেরণা দেয়।

অতএব, অতি প্রাকৃতের অঙ্গীকারে যহরী প্রমুখ মুমীন, ইমাম, মহাদ্দেস ও ঐতিহাসিকগণ যতটা তথ্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে অনুমান করি, পরবর্তীকালে ততটা তথ্যনিষ্ঠা বিরল ছিল। তত্ত্বপ্রবণতার প্রশ্রয়ে তথ্য বিকৃত হয়েছে। যতই দিন গেছে, লেখক সংখ্যাও বেড়েছে, কাসাসুল আম্বিয়া, মাগাজী আর সিরাতগুলোও সে-সঙ্গে তত্ত্বে, উপকথায় ও মোজেজা সংযোজনে স্ফীত হয়ে উঠেছে। কল্পনার ও কলেবরের সঙ্গে গ্রন্থগুলোর আকর্ষণও হয়তো বেড়েছে—যার পরিণামে ও পরিণতিতে আমরা দেশী পরিবেশে 'জঙ্গকুম রাজার লড়াই'র মতো বানানো কাহিনীও পাচ্ছি। কাবিল সন্তানদের হাতে দেখছি, রাম-রাবণের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র। বেদে মিলেছে হযরত মুহম্মদের নাম। আর পাই তরবারির সাহায্যে ইসলাম-প্রচার-গর্বের ফিরিস্তি। নবীদেরও দেখি ছলনার আশ্রয় নিতে। ইসলামের উন্মেষ যুগের ইসলাম-প্রচারক বীর রসুল, আলি, হামজা, হানিফা প্রভৃতিকে দেখি একহাতে তরবারি আর হাতে কোরআন নিয়ে কাফেরদেরকে বাহুবল প্রয়োগে দীক্ষিত করতে। এতে অমুসলমানদের কাছে মুসলমানকে করেছেন তাঁরা লজ্জিত, বীরদের করেছেন নিন্দিত, আর ইসলাম হয়েছে অবজ্ঞেয়। এ ব্যাপারে মৌলানা আকরম খানের মন্তব্য মূল্যবান ঃ

'মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কূল রক্ষা করার জন্য কতকগুলি আজগৈবী অনৈতিহাসিক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক গল্প গুজব ও উপকথার আবিষ্কার করেন এবং উচ্চ কণ্ঠে মহাপুরুষের নামের জয়জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে কথিত কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনীগুলি শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। (মোস্তফা চরিত পৃঃ ২)। পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইলেই প্রত্যেক মিথ্যা এবং প্রত্যেক অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক কিংবদন্তী ইতিহাসে এবং তাহা হইতে ত্বরায় উন্নীত হইয়া ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল (পৃঃ ১০)।'

এবং আদি জীবনীকার মুহম্মদ বিন ইসহাক (মৃঃ ১৫১ হিঃ) এবং [মুহম্মদ বিন ওমর] ওয়াকেদী (মৃঃ ২৩৭ হিঃ) থেকেই লিখিতভাবে এর শুরু।[১৮] আবার তকলিদ (অভিমত)-কে রেওয়াইত (সাক্ষ্য) বলে চালিয়ে দেয়ার ফলেও বহু মিথ্যা ও বিকৃতি প্রবেশ করেছে।[১৯]

খ. বাঙলা কাসাসুল আম্বিয়া, রসুল চরিত ও রসুল বিজয়

বারোশ' সাতষট্টি বাঙলা সনে তথা ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বটতলা থেকে একটি কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রকাশক কাজী সফিউদ্দীনের প্রবর্তনায় হুগলীর সায়ের রেজাউল্লা হিন্দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(উর্দু) থেকে এ গ্রন্থ তর্জমা করতে শুরু করেন। তাঁর উক্তিতে প্রকাশ—কাসাসুল আম্বিয়া—'ফারছি থাকিয়া যেহ হৈয়াছে হিন্দিতে।' তিনি হিন্দি থেকে 'এছলামি বাঙ্গলা ভাষে' রচনা করলেন লোক হিতার্থে। নুহনবীর কাহিনী কিছুটা লেখার পর রেজাউল্লার মৃত্যু হয়। তখন সফিউদ্দীনের আগ্রহে কলিকাতার কড়েয়াবাসী আমীর উদ্দীন এ গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। ষষ্ঠ বালাম [আবুতালেবের সঙ্গে হযরত মুহম্মদের সাম দেশে বাণিজ্য যাত্রা] অবধি আমীর উদ্দীনের ভণিতা মেলে। শেষাংশ রচনা করেছেন কড়েয়াবাসী অপর কবি আশরাফ। এ বিপুল গ্রন্থের অর্ধেক আমীর উদ্দীনের রচনা, 'কিতাব দেখিয়া' তাঁরা লিখেছেন বটে, কিন্তু কোথাও হিন্দি মুতর্জমের তর্জমার কিংবা মূল ফারসী গ্রন্থের বা লেখকের নামোল্লেখ করেননি। কাব্যটি দশ বালামে রচিত।

সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ থেকে এ গ্রন্থ কলেবরে অনেক বড়। সৈয়দ সুলতানের কাব্যে সব নবীর কাহিনী নেই। কাসাসুল আম্বিয়ায় এমন অনেক নবীর বিস্তৃত বিবরণ মেলে, যাঁরা নবীবংশে আলোচিত হননি। যথা হুদ, [এবং সাদ্দাদ] সালেহ, সিকান্দর, [এয়াজুজ মাজুজ], ইসমাইলের কোরবানী, ইয়াকুব, ইউসুফ, কালুত, সাকুস, শোয়েব [আসহাবে কাহাফ], হারকিল, নেসা, জেল কোফল, খানজেলা, আজির, জরজিস প্রভৃতি এবং চার খলিফার বর্ণনায় (আলির ওফাত অবধি) কাব্য সমাপ্ত। আর নবীবংশ ওফাত-ই-রসুল এর বিবরণেই শেষ।

কাসাসুল আম্বিয়ায় ও নবীবংশে বর্ণিত কাহিনী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভিন্ন। দুটো গ্রন্থই সৃষ্টিপত্তন দিয়ে শুরু। মুহম্মদই যে আদি সৃষ্টি তা দুটো কাব্যেই স্বীকৃত। কিন্তু সৈয়দ সুলতানের মতে পৃথিবীর আদি বাশেন্দা হচ্ছে নররূপী ফিরিস্তা, সুর (বৈদিক নবী ও মানুষেরা) আর কাসাসুল আম্বিয়ার মতে আগুনে তৈরী জীনেরা। কাহিনীর অনৈক্যের একটি নমুনা দিচ্ছি ঃ

নবীবংশে দেখি একদিন হযরত আয়েশার ঘরে তৈলাভাবে বাতি জ্বলেনি, সন্ধ্যার স্বল্পালোকে তিনি তাঁর গায়ের কাপড় সেলাই করছিলেন, অন্ধকার ঘন হলে তিনি সুঁই হারিয়ে ফেলেন। তখন রসুল আয়েশার ঘরে উপস্থিত হন। মৃদু হাসবার সময় তাঁর দাঁতের প্রভা বিচ্ছুরিত হয়, তাতে গোটা ঘর প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং সুঁইও কাপড়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল। এতে বিস্মিতা আয়েশাকে রসুল সগর্বে বললেন, 'এ দাঁতের জ্যোতিতে ভুবন আলো করতে পারি।' এই অহঙ্কৃত বচনের শাস্তি পেলেন ওহুদের যুদ্ধে দাঁত হারিয়ে। আবার, এক ইট আগুনে পুড়িয়ে তপ্ত করে একদিন তাঁর পায়ের তলার ক্ষতের চিকিৎসা করেছিলেন, দহন জ্বালা প্রাপ্ত ইট আল্লার কাছে রসুলের বিরুদ্ধে গোহারী করেছিল। ওহুদের যুদ্ধে সেই ইটই রসুল-দন্ত উৎপাটন করে প্রতিশোধ নিল। এ কাহিনী কাসাসুল আম্বিয়ায় নেই। তার বদলে পাই, শত্রুর নিক্ষিপ্ত পাথরে রসুলের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তারপর ঃ

টপকিতে ছিল খুন দান্দান হইতে
এয়াকুত সেরজান পয়দা হইল তাহাতে।

নবীবংশ কাহিনীর উৎস কোরআন বলেই দাবি করেছেন সৈয়দ সুলতান। কাসাসুল আম্বিয়ায় রওয়াইত ছাড়াও স্থানে স্থানে আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে।[২০]

॥ ২ ॥

শেখ চান্দের[২১] (সতেরো শতক) রসুল-নামা বা রসুল বিজয় নবীবংশের আদলে রচিত। অবশ্য এটি কেবল হযরত মুহম্মদেরই চরিত গ্রন্থ। এতে সৈয়দ সুলতানের নবীবংশের মতোই সৃষ্টিপত্তন বর্ণিত হয়েছে। আদি সৃষ্টি মুহম্মদ হচ্ছেন নুর-ই-ইলাহি। পুষ্পরূপে তিনি স্বর্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরাজ করছেন। জিব্রাইল সে ফুল নিয়ে আবদুল্লাহর হাতে দিলে তিনি ঘ্রাণ নিলেন, এরূপে মুহম্মদ আবদুল্লাহকে আশ্রয় করলেন। আবদুল্লাহর অঙ্গ হল সুরভিত, ললাটে তাঁর চাঁদের বিভা, নফলঙ্গ রাজকন্যা তাঁকে দেখে হলেন আসক্তা। তাঁদের গোপন বিয়ে পড়িয়ে দিলেন ফিরিস্তারা। মুহম্মদের জন্ম পূর্বের ও পরের ঘটনা কৃষ্ণ বৃত্তান্তের অনুরূপ। এখানে কংসের ভূমিকায় পাই আবু জেহেলকে। কন্যার স্থলে পাই ধাত্রী-শিশুকে। হালিমা-যশোদায়ও তফাৎ সামান্য। শেখ চান্দের গ্রন্থে কেয়ামত অবধি বর্ণিত। এ গ্রন্থে সিরাত ও মাগাজী অর্থাৎ রসুল জীবনী ও রসুলের যুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত। গ্রন্থটি আকারেও বিপুল।

সৈয়দ সুলতান যেমন বাঙলার মানস ও বহিঃপরিবেশে নবীদেরকে বিশেষ করে হযরত মুহম্মদকে হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রতিপাদন করে ইসলামের উপযোগ প্রমাণের জন্য নায়ক রূপে দাঁড় করিয়েছেন, শেখ চান্দের কাছেও 'কাফের' বাঙালী হিন্দুর প্রতিশব্দ মাত্র। উভয় কবি'র কাছে হিন্দু যেন কাফেরেরই পরিভাষা। তবু শেখ চান্দে বাঙালীয়ানা একটু বেশি। তাঁর তুলিকায় মুহম্মদ বাঙালী আলেম বা পীর ফকির ঃ

নবী মুহম্মদ শিরেত দস্তার বান্ধে জুব্বা দিল গাএ
ডাইন হাতে তসবি জপে আষা হাতে বাঁএ।
ইজার পিন্ধিল নবী পিরহান পরি—
পাএত পরিল নবী খড়ম এক জোড়া
দেখিতে তাহান বেশ যেন মত বুড়া।
তসবি জপিয়া নবী যাএ ধীরে ধীরে
রসুলেরে দেখি হাসে যথেক কাফিরে।

রসুলের ইসলাম প্রচারও চলছে যেন বাঙলা দেশেই ঃ

ধুতি উতারিয়া তারে ইজার পরাইল
টিকি মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল।
গিলাফ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা
তারপর— মুসলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা।
এবং এহি মতে তিন দ্বিজ মুসলমান হৈল
পুরাণ করিয়া রদ কোরান লইল।
মূর্তিপূজা রদ করি নমাজ পড়ে নিতি
হরির নাম রদ করি কলিমা করে স্থিতি।
টিকি মুড়াইয়া শিরে টুপি দিল ছদ।

তিন দ্বিজ মুসলমান হয়ে তাদের জ্ঞাতিদেরও সত্যধর্মে আহবান জানায়।
বাজি রেখে তারা— কোরান পুরাণ কৈল আতশে স্থাপন
পুরাণ পুড়িয়া গেল কোরান বাহুড়িল
কোরান বড় বুলি মানিয়া লৈল।

অতএব, সৈয়দ সুলতানের রসুল চরিত অংশের সঙ্গে শেখ চান্দের রসুল বিজয়ের মিলই বেশি। কবিত্ব সম্পদেও শেখ চান্দ সৈয়দ সুলতানের সমকক্ষ। মুহম্মদ ছমি নামে এক দোভাষী শায়েরও রসুল চরিত রচনা করেছিলেন বলে শুনেছি। (পুঁথি-পরিচিতি ঃ পৃঃ ৬৬৬)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৩ ॥

'দুল্লামজলিস'[২২] রচনা করেন আবদুল করিম খোন্দকার। এটি কোনো ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। তেত্রিশ বাবে সমাপ্ত। এতে হযরত আদম, ইব্রাহিম, লুত, শোয়েব, আয়ুব, মুসা, সোলেমান, হাসন বসোরী, হাসন কোরেশী ও সুলতান আবু সৈয়দ এবং রোজা ও বেহেস্তের বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে। এ গ্রন্থে বিভিন্ন নবী ও সাধকদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে নীতিশাস্ত্র ও ধর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। অতএব এ গ্রন্থ নবীবংশের মতো জীবনী কিংবা ইতিহাস মূলক নয়। আদম প্রসঙ্গে আবদুল করিম খোন্দকার নবীবংশের উল্লেখ করেছেন ঃ

বিশেষ না কহি আমি আদমের কথা
নবীবংশ পুস্তকেত আছএ ব্যবস্থা।

আবদুল করিম খোন্দকার হাজার মসায়েল ও তমিম আনসারী নামে আরো দুখানা গ্রন্থের রচয়িতা। দুল্লামজলিসে তিনি গ্রন্থটির রচনা কাল দিয়েছেন ঃ

ক. এবে শুন মুসলমানি সঙ্কেত কথন
এক সহস্র দুইশত আরব্যাহ সন।
খ. সহস্রেক সাইট সতেক সাইত অব্দ আর।
মঘীসন এ লিখন শুন পুনর্বার।

[অনুমিত শুদ্ধ পাঠ ঃ সহস্রেক সাথে শতেক সাত অব্দ আর।]

দুটো সনের সঙ্গতি সাধন অসম্ভব। তাই অনুমান করি, হিজরী সনটি ভুল এবং মঘীসনের পাঠ হবে ঃ সহস্রেক সাথে শতেক সাত অব্দ আর তথা ১১০৭ মঘী বা ১৭৪৫ খ্রীস্টাব্দ। কবির দীর্ঘ আত্মপরিচয়ে ম্রোহং বা রোসাঙ্গ রাজার উল্লেখ আছে। ১২০০ হিজরীতে রোসাঙ্গে রাজা ছিল না, কেননা তার আগের বছরে আরাকান ব্রহ্ম রাজ্যভুক্ত হয়। আর ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে রামু ছিল মুর্শিদাবাদের নওয়াবের চট্টগ্রামস্থ প্রশাসকের অধীনে। এসব নানা বিবেচনায়, আমরা ১৭৪৫ সনে[২৩] দুল্লামজলিস রচিত বলে বিশ্বাস করি।

॥ ৪ ॥

আবদুল করিম খোন্দকার[২৪] রচিত নুরনামা এবং রাজ্জাক নন্দন আবদুল হাকিম (১৬শতক)[২৫] রচিত নুরনামা আদিসৃষ্টি নুররূপী হযরত মুহম্মদ সৃষ্টি বিষয়ক। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা দুটোর বিষয় নবীবংশে বিবৃত হযরত মুহম্মদের সৃজন কিংবা শেখ চান্দ বর্ণিত নুররূপী মুহম্মদ সৃষ্টিকথা থেকে মূলত অভিন্ন। পার্থক্য কেবল ভাষার। বিভিন্ন কবির স্ব স্ব ভঙ্গিতে বিবৃত। নুরনামা রচয়িতা একজন দোভাষী শায়েরের কথাও শোনা যায়। তাঁর নাম মুহম্মদ খান।[২৬]

॥ ৫ ॥

মে'রাজ-নামা ও কাসাসুল আম্বিয়া লিখেছিলেন আর এক দোভাষী শায়ের মুহম্মদ খাতের। ইনি উনিশ শতকের মধ্যভাগের লোক। তাঁর কাসাসুল আম্বিয়ার মূল জানা যায়। ইসহাক আল নিসাপুরী রচিত 'কাসাসুল আম্বিয়া' উর্দু তর্জমা করেন গোলাম নবী ইবনে ইনায়েতুল্লাহ। সেই উর্দু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন খাতের। প্রকাশক তাজুদ্দীন মুহম্মদও প্রকাশকালে ভণিতায় নিজ নাম যুক্ত করে কবি কৃতির দাবীদার হন।[২৭] মনে হয়, রেজাউল্লাহ আমীরুদ্দীনের গ্রন্থও গোলাম নবী কৃত উর্দু গ্রন্থের তর্জমা। অন্তত স্থানে স্থানে বক্তব্য অভিন্ন, কেবল ভাষা ভেদ ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসহাবে কাহাফ ঃ খাতের ঃ

তাহারা কহিল ভাই আমা সবাকার
খানাপিনা কিছু গরজ নাহি আর।
গরজ নাহিক আর দুনিয়া মোকাম
আমাদের ভরসা খালি এলাহির নাম।
এই বলিয়া শুইল ফের খন্দকের বীচে
আজ তক আছে শুয়ে কিতাবে লেখিছে।
কেয়ামত তক তারা সেই হালে রবে।

আসহাকে কাহাফ ঃ আমীরুদ্দীন ঃ

বলিতে লাগিল তবে তাহার লাগিয়া।
খানাপিনা আমরা যে নাহি চাহি আর
দেলেতে না রাখি কিছু হুহরত দুনিয়ার।
আমাদের কাম আছে এলাহির সাথে
থাকিব জেন্দেগি ভর তারি এবাদতে।
বলিয়া এছাই বাত শুইলেন সবে
তাহার খবর লেখা আছেত কেতাবে।
আজ তক শুইয়া আছেন সেইখানে
উঠিবেন একেবারে হাসর ময়দানে।

রেজাউল্লার রচনায় পাই ঃ

প্রথম আসমান হৈল পানির টুকরাতে
দ্বিতীয় আসমান তামা টুকরা হইতে।
তৃতীয় আসমান হৈল টুকরাতে লোহার
চতুর্থ আসমান হয় রূপার টুকরার।
পঞ্চম আসমান সোনার টুকরায়
ষষ্ঠ আসমান মরত্তারিদ টুকরা।
সপ্তম আসমান এয়াকুতে

তুলনীয় ঃ সৈয়দ সুলতানের মতে মুক্তায় হীরায় মাণিক্যে সুবর্ণে এয়াকুতে রজতে ও জমরুদে যথাক্রমে সপ্ত আকাশ গঠিত।

খাতেরের কাসাসুল আম্বিয়ায়ও নুর ও বিশ্বসৃষ্টির বর্ণনা আছে। এ বর্ণনায় সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলত সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, রেজাউল্লাহ ও খাতেরের বক্তব্য অভিন্ন। না বললেও চলে এই সৃষ্টিতত্ত্ব কোরানানুগ নয়—সূফীতত্ত্বানুগ। সম্ভবত সূফীতত্ত্বের উদ্ভবের ও প্রসারের ফলেই এই তত্ত্ব ইসলামে প্রতিষ্ঠা ও প্রচার লাভ করেছে।

খাতের মে'রাজ-নামাও রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য। আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি। সেজন্যে আলোচনা করা সম্ভব হল না।

॥ ৬ ॥

রসুল ও ইরাকরাজ জয়কুমের বানানো সুপ্রাচীন যুদ্ধ-কাহিনী নিয়ে বাঙলায় অন্তত চারখানা কাব্য রচিত হয়েছে। জায়েনউদ্দীনের রসুল বিজয়, শা'বারিদ খানের (সাবিরিদ খান) রসুল বিজয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতানের জয়কুম রাজার লড়াই এবং আকিল মুহম্মদের জয়কুম রাজার লড়াই। উর্দুতেও এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। জয়কুম নাকি ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি এরাকের নন—আরমেনিয়ার রাজা ছিলেন।[২৮]

উক্ত চারখানা কাব্যের কোনোটিরই সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসেনি। তবে খণ্ডের মধ্যেই অখণ্ডের ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য মেলে। এক হাতে তরবারি ও আর হাতে কোরআন নিয়ে ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্যে রসুল তাঁর শিষ্য ও আত্মীয় বীর আবুবকর, উমর, উসমান, আলি, হামজা, হানিফা, ছায়াদ, খবাইল প্রভৃতিকে নিয়ে কাফের রাজ্যে হানা দেন, বিনাযুদ্ধে ইসলাম কবুল করলে তো সহজেই দ্বন্দ্ব মিটে যায়, নইলে যুদ্ধ বাধে।

জয়কুম রাজার চার পুত্র– সালার, মালেক শাহ, খাখান ও কওয়াস অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। রসুল পক্ষের বহু বীরের মধ্যে আলি ও হানিফার বীরত্বই বিশেষ করে সুপ্রকট। এ যুদ্ধে স্বয়ং রসুলও অস্ত্রধারণ করেছিলেন। জয়কুম সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধে হচ্ছে না দেখে গোপনে রণক্ষেত্রে পরিখা (কূপ) খনন করান। কূপে পড়ে আলি যন্ত্রণা ভোগ করেন। তারপরে কূপ থেকে উদ্ধার পেয়ে আবার যুদ্ধ করে জয়ী হলেন। শা'বারিদ খানের রসুল বিজয়-এ পাই রসুল পক্ষীয় বীর খাবাইলের সাথে জয়কুম কন্যার বিয়ের মাধ্যমে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে।

এ চারটি কাব্যের কাহিনী ভাগে কিছু কিছু উপেক্ষণীয় অমিল থাকলেও মূল কাহিনী অভিন্ন। বৈদগ্ধ্যে ও কবিত্বে এঁদের ক্রমিক স্থান এরূপ ঃ শা'বারিদ, সৈয়দ সুলতান, জায়েনউদ্দীন ও আকিল মুহম্মদ।

জায়েনুদ্দীনের আবির্ভাব কাল তর্কাতীত নয়। তাঁকে কেউ পনেরো শতকের, কেউবা আঠারো শতকের কবি বলে মনে করেন।[২৯] তিনি সুলতান রুকনউদ্দীনের পুত্র ইউসুফ খানের ১৫৭৬-৮৪, সোলায়মান কররানীর ভ্রাতা তাজ খানের পুত্র ইউসুফ খানের কিংবা আঠারো শতকের কোনো জমিদার ইউসুফ খানের প্রতিপোষণ পেয়েছিলেন।

শা'বারিদ খান সম্ভবত ১৫১৭ থেকে ১৫৫০ সনের মধ্যে তাঁর কাব্য রচনা করেন। তিনি চট্টগ্রামের নানুপুরবাসী ছিলেন।[৩০]

আকিল মুহম্মদের পুঁথি সম্প্রতি বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এ গ্রন্থের সংগ্রাহক অধ্যাপক আলি আহমদ।[৩১] এঁর সম্বন্ধে কোনো আলোচনা কোথাও হয়নি। এটি আঠারো শতকের রচনা বলে অনুমান করি।

উৎস নির্দেশ

১. গুনিয়া : ওফাতে রসুল : আলি আহমদ।

২ ক. আলিম সবের ঠাই যত জিজ্ঞাসিয়া–ঐ।

খ. আলিম সবের চাহ তাহা জিজ্ঞাসিয়া–ঐ।

৩. * Geschechte der Arabischen Literature by Von Carl Brockelmann, Band (Vol.) I & II. Berlin 1902.

১, ৪, ৮, ৯, ১০, ১১ (Suppl. 2) Vol. II. pp 70-73, p77, p71, p72

২, ৩, ৫, ৬, ৭ (Suppl. 1) Vol. I. pp 592-93, p350, p217 (Suppl. I),

৪. মৌলানা শিবলী নোমানী রচিত সিরাতুন্নবীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা থেকে এসব নাম ও তথ্য সংগৃহীত। এবং মোস্তফা চরিত : মোহাম্মদ আকরম খাঁ : পৃ. ১০২-০৮ দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. Persian Literature : a Bio-bibliographical Survey. by C. A. Storey, Section II, Fasciculus I Luzac & Co, 1935, London, P. 159.
৬. Ibid, p159. ৭ Ibid. p160. ৮. Ibid. p161 ৯ Ibid. p. 162. ১০ Ibid, p. 163. ১১ Ibid. 166. ১২ Ibid. p. 166. ১৩ Ibid. p. 167. ১৪ Ibid. p. 167. ১৫ Ibid. p. 170 ১৬ Ibid. p. 167.
১৭. তজরীদুল বুখারী : বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত : হাদিস সংখ্যা : ১১৫৭; পৃ. ৪৯৩।
১৮. মোস্তফা চরিত : পৃ. ১০২-০৮।
১৯. ঐ : ২য় পরিচ্ছেদ : পৃ. ৬-১১।
২০. কাছাছল আম্বিয়া : মোহাম্মদ সোলেমান, আফতাবদ্দিন আহাম্মদ ও কমরুদ্দিন আহম্মদ প্রকাশিত। ১৩৩৪, ৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
২১. কবির আবির্ভাব কাল অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।
২২. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ২৪০।
২৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের মতে ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দ। মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২৪৮-৫০
২৪. ক. পুঁথি-পরিচিতি : ২৬২- ৬৩
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২৪৮-৫০
২৫. ক. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ২৬০, ২৬৪
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : পৃ. ২০৫-১৩
২৬. পুঁথি-পরিচিতি : পৃ. ৬৬৮।
২৭. British Museum Catalogue (Catalogue of printed Vol. I. 27. Bengali Books in the library of the British Museum, 3 Vols).
২৮. Brumhardt : Catalogue.
২৯. ক. রসুল বিজয় : সাহিত্য পত্রিকা : শীত সংখ্যা, ১৩৭০ সন।
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক।
গ. বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন।
৩০. ক. সাহিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬৪ সন।
খ. মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য।
গ. বাংলা সাহিত্যের কালক্রম : সুখময় মুখোপাধ্যায়।
৩১. বাংলা কলমী পুঁথির তালিকা।

AMARBOI.COM

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অধ্যাত্ম সাধনা ও জ্ঞানপ্রদীপ

সূফীমত বলতে কোনো একক সূফীতত্ত্ব বুঝায় না। তত্ত্বসমষ্টিই নির্দেশ করে। প্রচলিত বিভিন্ন শাখার সূফীমতগুলো বিভিন্ন ধরনের। ইসলামের মৌল অঙ্গীকারের সঙ্গেও এগুলোর পার্থক্য কম নয়। এ না হয়ে পারেনি। কেননা সূফীমত একটি মিশ্রদর্শনের সন্তান। তাও আবার একক মত থেকে আসেনি। Von Kremer ও Dozy-র মতে বেদান্ত প্রভাবেই ইরানে সূফীমতের উদ্ভব। Merx ও Nicholson-এর ধারণা New Platonism থেকেই এর উন্মেষ। E. G. Brown মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন, বাস্তববাদী শামীয় (Semitic) আরবধর্ম ইরানের ভাবপ্রবণ আর্য-মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা-ই সূফীতত্ত্বে রূপ লাভ করে।

কিন্তু মানব-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অত ঋজুভাবে ঘটে না। কাজেই কোনো এক সরল পথে কিংবা কোনো এক মতবাদের প্রভাবে অথবা প্রতিক্রিয়ায় সূফীমত গড়ে উঠেছে বলে মনে করা অসঙ্গত। খ্রীস্টানদের মধ্যে বৈরাগ্য ছিল, ইহুদীরাও ছিল তত্ত্বজিজ্ঞাসু। আরবেরা এদের সান্নিধ্য পেয়েছে চিরকাল। স্বয়ং হযরত মুহম্মদ নবুয়ত লাভের পূর্বে মধ্যে মধ্যে হেরা পর্বতে নিভৃতচিন্তায় মগ্ন থাকতেন। ভোগবিমুখতা ও বিষয়ে অনাসক্তি তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সূফীমতের আদি প্রবক্তাদের অন্যতম জুনাইদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হি.) বলেছেন, সূফীর আটটি গুণ– 'ইব্রাহিমের মতো ত্যাগ, ইসমাইলের মতো আনুগত্য, আয়ুবের মতো ধৈর্য, জাকারিয়ার মতো বাক্‌সংযম, John-এর মতো আত্মপীড়ন, ঈসার মতো ভোগবিমুখতা, মুসার মতো পশমী পরিধেয় গ্রহণ এবং হযরত মুহম্মদের মতো দারিদ্র্য বরণ।"[১] এ সংজ্ঞা উসমান হুজুইরীরও সমর্থন পেয়েছে। হুজুইরীর মতে আত্মার পবিত্রতার সাধনাই সূফী সাধনা এবং পার্থিব বিষয়ে ও ভোগে অনাসক্তি আর সত্যসন্ধ মনই সূফীর বিশেষ লক্ষ্য।[২] দারিদ্র্যকে তিনি ভগবৎ প্রেম ও আনুগত্যের অনুকূল বলে জেনেছেন।[৩] অতএব যে আল্লাহ-প্রেমে বিশোধিত এবং আল্লাহ্‌তে (Beloved-এ) যে বিলীন (Absorbed) এবং যে সবকিছু ত্যাগ করেছে, সে-ই সূফী।[৪] ইরানে জোরাস্ট্রীয়রা তত্ত্ববিমুখ হলেও মানী ও মজদকীদের মধ্যে মরমীয়া ভাব ও তত্ত্বচিন্তা দুর্লভ ছিল না। বৌদ্ধ নির্বাণবাদ এবং গুরুবাদও মিশে ছিল অনেকের মজ্জায়।[৫] আর স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যে অনাড়ম্বর জীবন ছিল রসুল পার্ষদদের আদর্শ।[৬] এক সময় এমনি আদর্শ ধার্মিকেরা ভোগবিমুখতা ও বিষয়-বৈরাগ্যের জন্যে সাধারণ্যে 'ফকির' নামে পরিচিত হন। একই কারণে ফকির, দরবেশ ও সূফী কালক্রমে অভিন্নার্থক হয়ে ওঠে। ইরানে ইসলাম বিস্তৃতির পরে মানী, মজদকী, যিনদিকী (Zindiki) ও বৌদ্ধ সংস্কারের তথা দেশকালের প্রভাব এড়াতে পারেনি মুসলমানেরা। ফলে ইসলামের উদ্ভবের শতেক বছরের মধ্যেই মুসলিম-সমাজে সূফীমত অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে থাকে। হাসান বসোরী (মৃ. ৭২৮ খ্রী.) অথবা কুফার আবু হাশিমই (মৃত্যু ১৬২ হি.) প্রথম সূফী বলে পরিচিত। তিনি হুজুইরীর সংজ্ঞানুগ সূফী। আসলে ইব্রাহীম আদহম (মৃত্যু ১৬২ হি.), ফজিল আয়াজ (মৃত্যু ১৮৮ হি.), মারুফ কর্খী (মৃত্যু ৮১৫ খ্রী.), দাউদ তায়ী (মৃত্যু ১৬৫ হি.), হাসান বসোরী ও রাবিয়া বসোরী (মৃত্যু ৭৫৩ খ্রী.) প্রমুখের সাধনা ও বাণী থেকেই বিশিষ্ট হয়ে উঠে সূফীমত।[৭] সূফীমতের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন মিশরীয় কিংবা নুবীয় (Nubian) লেখক জুননুন (মৃত্যু ২৪৫-৪৬ হি.)। তিনি ছিলেন মালিক বিন-আনাসের শিষ্য। জুননুনের রচনাবলী সুসংকলিত ও সুসম্পাদিত করেন জুনাইদ বাগদাদী (মৃত্যু ২৯৭ হি.)।

সূফীমতবাদ সর্বেশ্বরবাদের রূপ নেয় ইরানের সূফীদের দ্বারাই।[৮] জুনাইদের পরে তাঁর শিষ্য খোরাসানের আস্‌শিবলীর (মৃত্যু ৩০৯ হি.) প্রচারণায় প্রসার লাভ করে এই মত।[৯] সর্বেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী সূফীদের মধ্যে হোসেন বিন মনসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩০৯ হি.), বায়জীদ বিস্তামী ওর্ফে আবু এযীদ (মৃত্যু. ২৬০ হি.), মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃত্যু ১২৪০ খ্রী.) প্রভৃতি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবে যেমন সূফীদের ভাববাদে এই অদ্বৈততত্ত্বের বা বাকাসিদ্ধির উদ্ভব, তেমনি বৌদ্ধ নির্বাণ তত্ত্ব হয়েছে ফানাতত্ত্ব উন্মেষের সহায়ক। যদিও বৌদ্ধ নির্বাণ ও ফানা অভিন্ন নয়; নির্বাণ বিলয় জ্ঞাপক আর ফানা অখণ্ডে আত্মমিশ্রণ (বাকা) কামী। এঁরা 'হুলুল'-এ বিশ্বাসী, অর্থাৎ জীবাত্মাকে তাঁরা পরমাত্মার অংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই জানেন। এ বিশ্বাস মূলত বৈদান্তিক। তবু আত্মা-পরমাত্মা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টির ব্যাপারে নব প্ল্যাটোনিক মতেরই প্রভাব বেশি।[১০]যিকর সূফীদের অবশ্য আচরণীয় চর্যা। এটিতে কোরআনেরও সমর্থন মিলে,–'আল্লাহ্‌কে ঘন ঘন স্মরণ কর'।[১১]

তাত্ত্বিক ও মরমীয়া হলেও সূফীরা ইসলামকে ভোলেনি, কোরআনের সমর্থনকে সম্বল করে জীবন ও ধর্মকে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছে। এতে দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদের স্বীকৃতিও সম্ভব করে নিয়েছে এবং তাতে আবার দোহাই কেড়েছে কোরআনের। ভোগ-পরিমিতিবাদের (পার্থিব ব্যাপারে অনাসক্তি, দারিদ্র্য প্রীতি, পবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র যিক্‌র) সূত্র ধরে বৈরাগ্যবাদও প্রশ্রয় পেয়েছে সূফীতত্ত্বে।

মুসলমানদের সাধারণ বিশ্বাস রসুল ব্যক্তিগত জীবনে তাত্ত্বিক তথা মরমীয়াও ছিলেন। এবং তাঁর প্রিয় সহচর আলি ও আবুবকরকে এই তত্ত্বে দীক্ষাও দিয়েছিলেন তিনি। কোরআনের এক আয়াতে আছে, "যেহেতু আমরা তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে রসুল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদের কাছে ওহী পাঠ করেন, তোমাদের দোষমুক্ত করেন, তোমাদেরকে 'কিতাবের' শিক্ষা ও প্রজ্ঞা (wisdom) দান করেন এবং যা তোমরা আগে জানতে না, তাই জানিয়ে দেন।"[১২] এই প্রজ্ঞাকে সূফীরা কোরআনোক্ত ব্যবহারবিধি বহির্ভূত 'অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞান' বলে ব্যাখ্যা করেন। আর একটি আয়াতে আছে, "এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে এবং তোমার নিজের মধ্যে তুমি কি তা দেখ না।"[১৩] "আবার আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের রগ বা শিরার চেয়েও নিকটতর।"[১৪] 'আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশের জ্যোতিঃস্বরূপ।'[১৫] 'উটের দিকে তাকিয়ে দেখ, কি কৌশলে তা সৃষ্টি হয়েছে। আকাশের মহিমা দেখ, পর্বতগুলো কেমন দৃঢ় করে স্থাপন করেছেন।'[১৬] 'বল তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বা শক্তি।'[১৭] 'আমরা কি তোমাদের প্রভু নই।'[১৮]–কোরআনের এসব আয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেই সূফীবাদের ইসলামী রূপ প্রতিষ্ঠিত। আবার জ্যোতিঃতত্ত্বে মানী ও মজদকী দর্শনের এবং আত্মতত্ত্বে সর্বেশ্বরবাদের এবং সৃষ্টির মহিমা ও বৈচিত্র্যতত্ত্বে ভাববাদের আশ্রয়ও মিলেছে। বৌদ্ধ নির্বাণবাদ যেমন ফানাতত্ত্বের সহায়ক হয়েছে, তেমনি অদ্বৈতবাদও বাকাতত্ত্বে উৎসাহ দিয়েছে। আর অধ্যাত্ম সাধনা মাত্রই গুরুকেন্দ্রী।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে পাক-ভারতে– ক. চিশতিয়া খ. কাদিরিয়া গ. সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া ও ঘ. নকশবন্দিয়া– এ চারটি শাখার সূফীমতই প্রধান। অন্যান্যগুলো এ চারটির উপমত বা প্রশাখা মাত্র।[১৯] সুতরাং শাত্তারিয়া, মদারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটি যে-কোন একটির উপমত মাত্র।

১. অদ্বৈতবাদ, ২. সর্বেশ্বরবাদ, ৩. দেহতত্ত্ব (কুণ্ডলিনী শক্তি), ৪. বৈরাগ্য, ৫. ফানাতত্ত্ব, ৬. সেবাধর্ম ও মানব-প্রীতি, ৭. গুরু বা পীরবাদ, ৮. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ, ৯. ইনসানুল কামেল বা সিদ্ধপুরুষবাদ, ১০. স্রষ্টার লীলাময়তা প্রভৃতি ধারণার বীজ বা প্রকাশ ছিল আরব-ইরানের সূফীতত্ত্বে। ভোজ বা বজ্র বর্মণের 'অমৃত কুণ্ডের' সঙ্গে বারো শতকেই বহির্ভারতীয় সূফী সমাজের পরিচয় ঘটে। ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রভাব প্রবল হতে থাকে সূফীতত্ত্বে। ফলে ভারতের বিভিন্ন সূফীমতের উপর স্থানিক প্রভাব পড়েছে প্রচুর।

বিভিন্ন সূফীমতবাদে আল্লাহ্‌র ধারণা তিন প্রকার– ১. আত্মসচেতন ইচ্ছাশক্তি, ২. সৌন্দর্যস্বরূপ, ৩. এবং ভাব, আলো কিংবা জ্ঞানস্বরূপ। শকীক বলখী, ইব্রাহিম আদহাম, রাবিয়া বসোরী প্রভৃতির ধারণায় আল্লাহ ইচ্ছাশক্তি স্বরূপ। সৃষ্টিলীলায় সেই ইচ্ছাশক্তিরই প্রকাশ। একত্ববাদ এর প্রাণ। তাই এটি আরবীয় বা শামীয় (Semitic)। পবিত্রতা, সংসার ধর্মে অনাশক্তি, আল্লাহ প্রেম ও পাপ ভীতিই এ মতের সূফীদের বৈশিষ্ট্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রওয়ার্দী মুসলিম জগতে স্বাধীন চিন্তার অন্যতম প্রবর্তক। তাঁর মতে আল্লাহ্ হচ্ছেন 'স্বয়ম্ভু জ্যোতি (নুর-ই-কহির)। Manifestation তথা মহিমার অভিব্যক্তি দানই এ জ্যোতির স্বভাব। এতেই তাঁর স্বতো প্রকাশ। কাজেই আলো-অন্ধকারের মগানীয় দ্বৈততত্ত্ব এখানে অস্বীকৃত। নিজের মধ্যে ও বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এই আলো দেখার আকুলতা মানুষের সহজাত। আলোর স্বরূপ উপলব্ধির ও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার সাধনই সূফীব্রত। এই সিদ্ধির ফলে মানুষ হয় ইনসানুল কামেল। 'আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ।[২১] আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।"[২২] এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত এগিয়ে যায় বিশ্বব্রহ্মবাদ বা সর্বেশ্বরবাদ তথা অদ্বৈতবাদের দিকে।

যিকর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে 'অতএব আল্লাহকে স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র।'[২৩] সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা ইরফান কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্য-চিন্তাই সূফীদের করেছে বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহউস্ত' (সবই আল্লাহ) বা বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাদ। এ-ই হল তৌহিদ-ই-ওজুদী তথা 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান'–এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপনের ভিত্তি। বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরাসানী (মৃ. ১০৪৯ খ্রী.) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। ইবনুল আরাবীর [মৃ. ১২৪০ খ্রী., সিরিয়ায়] প্রভাবে সূফী সমাজে অদ্বৈতবাদ [ওয়াহদাতুল ওজুদতত্ত্ব] দৃঢ়মূল হয়। তাঁর মতে নিজের দেহ ও মনের রহস্য বুঝতে পারলেই স্রষ্টার ও সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধ হয়। তাঁর মতে যা ব্রহ্মাণ্ডে আছে, তা দেহভাণ্ডেও মেলে এবং মানুষের মধ্যেই স্রষ্টার প্রকাশ ও লীলা।[২৪] অবতারবাদে তথা মানুষ ও ঈশ্বরের অভিন্ন সত্তায় আস্থা রাখতেন তিনি। জালালউদ্দীন রুমীও সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদকে জনপ্রিয় করেন। শাত্তারিয়া, নকশবন্দিয়া এবং কলন্দরিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। আবদুল্লাহ্ শাত্তারী ও শেখ গাউস গোয়ালিয়রী যোগসাধক ছিলেন। তাঁরাও স্বীকার করেন কুণ্ডলিনী শক্তি। ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড়রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই সাধনার লক্ষ্য। এটি শিবশক্তি মিলনজাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত।

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিলেন ইরান ও মধ্য এশিয়ার সূফীগণ। সূফী সাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা শুরু করেন নতুন সূফী চর্যা। পাক-ভারতের মুসলিম অধ্যাত্ম সাধনা যোগ ও দেহতত্ত্ব বিহীন নয় এ কারণেই। আর সঙ্গীত, বৌদ্ধ চতুষ্কায় ও ব্রাহ্মণ্য ষটচক্র এবং রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা, মায়াব্রহ্ম, হরগৌরী বিষ্ণুলক্ষ্মী প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালি মুসলমানদের অধ্যাত্ম তথা মরমীয়া সাধনার ভিত্তি। অবশ্য শেখ আহমদ সরহিন্দী নকশবন্দিয়া তরিকার মাধ্যমে দ্বৈতবাদকে সূফী-ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

অতএব বাঙলাদেশে সূফীতত্ত্ব ও সূফীসাধনা একটি বিশিষ্ট দেশী অবয়ব গ্রহণ করেছিল। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈততত্ত্ব এবং দেশী যোগ সাধনার প্রত্যক্ষ প্রভাবই এর মুখ্য কারণ। অবশ্য মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধমত ও বৌদ্ধভিক্ষুর প্রভাবে সিরিয়ায়, ইরাকে ও ইরানে গুরুবাদী, বৈরাগ্যপ্রবণ ও দেহচর্যায় উৎসুক কিছু সাধকের আবির্ভাব বারো শতকের আগেই সম্ভব হয়েছিল। বৈদান্তিক সর্বেশ্বরবাদও তাঁদের অজানা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব ভারতে আগত সূফীসাধকদের কাছে ভারতিক অধ্যাত্ম সাধনা তেমন নতুন কিছু ছিল না। পূর্ব পরিচয় প্রসৃত অনুরাগ বশে তাঁরা এদেশী সাধনতত্ত্বে সহজেই উৎসুক হয়ে ওঠেন। আবার তাঁদের কাছে দীক্ষিত দেশী জনগণও পূর্ব সংস্কার বশে অদ্বৈতচেতনা ও যোগপ্রীতি ত্যাগ করতে পারেনি। বিশেষ করে বিলুপ্ত বৌদ্ধ সমাজের 'যৌগিক কায়া সাধন তত্ত্ব' তখনো জনচিত্তে অম্লান ছিল। ফলে 'সূফীমতের ইসলাম সহজেই এদেশের প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোস করে নিতে সমর্থ হয়েছিল।'[২৫] এবং ঐ একই কারণে ও প্রতিবেশে পরবর্তীকালে সূফীদের প্রভাবে ভারতে ভক্তি ও প্রেমবাদমূলক সন্তধর্মের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উদ্ভব যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনি সূফীমতের সামঞ্জস্য হয়ে সহজিয়া ও বাউল মত বিকাশ পেয়েছে।[২৬]

সহজিয়া ও বাউল মত মূলত অভিন্ন। এই তত্ত্বের উৎস হচ্ছে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র। এবং তিনটেই সুপ্রাচীন দেশী তত্ত্ব ও শাস্ত্র। Pagan যুগের যাদু বিশ্বাস ও টোটেম স্তরের মৈথুন তত্ত্ব থেকে এদের উদ্ভব।[২৭] সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব বা দর্শন আর যোগ ও তন্ত্র এর দ্বিবিধ আচার শাস্ত্র।[২৮]এসব তত্ত্বের জড় রয়েছে আদিম মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার চিন্তায় ও কর্মে। কালিক বিকাশে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র পৃথক সত্তায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা পায়। কপিল সাংখ্য, পাতঞ্জল যোগ আর নারায়ণী পাঞ্চরাত্রের প্রভাব হয়েছিল গভীর, ব্যাপক ও কালজয়ী। বহিরাগত দ্রাবিড়, আর্য প্রভৃতি এবং উত্তরকালের মুসলিম— এদের সবাই স্বীকার করেছে এগুলোর প্রভাব এবং নানাভাবে গ্রহণ-বরণ করেছে এসব মত ও সাধনরীতি। যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধ যুগে। ব্রহ্মচর্য ও বামাচার এই দুই ধারার যোগ-তান্ত্রিক দেহ সাধনা বৌদ্ধসমাজে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ বিলুপ্তির যুগে প্রথমটি সম্ভবত কায়পন্থ ও দ্বিতীয়টি সহজযান রূপে অভিহিত হত।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য শিব ও বৌদ্ধ আদিনাথ অভিন্ন সত্তায় প্রতিষ্ঠা পান পূর্বতন বৌদ্ধ দিয়ে গড়ে ওঠা নব ব্রাহ্মণ্য সমাজে। এই আদিনাথ শিবকে অবলম্বন করে পুরোনো ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী সাধনা জনপ্রিয় হয়। এই মতের প্রচারক মীননাথ-গোরক্ষনাথের নামে এই মত আধুনিক যুগে নাথপন্থ রূপে পরিচিত। 'অমৃতকুণ্ড' সম্ভবত এদেরই শাস্ত্র ও চর্যাগ্রন্থ। এটি গোরক্ষ-পন্থীর রচনা বলে অনুমিত হয়।[২৯] ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমে কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। সহজিয়ারা বামাচারী। যোগ-তান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনে বামাচারের মাধ্যমে বিন্দুধারণ তাদেরও লক্ষ্য।

একসময় এই নাথপন্থ ও সহজিয়া মতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়, চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ব্রাহ্মণ্য মতে, ইসলামে ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি বলেই ব্রাহ্মণ্য সমাজে, ইসলামে, আর বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে। সেজন্যই বাউল মত আজো হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ ঐতিহ্য ও রিথ্‌ত। বৈষ্ণব সহজিয়া ও হিন্দু-মুসলিম বাউলেরা বজ্রকুল বৌদ্ধ সহজিয়ার উত্তর সাধক মাত্র। অন্যদিকে অদ্বৈতবাদ ও যোগপদ্ধতিকে সূফীরা নিজেদের মতের অসমন্বিত অঙ্গ করে নিয়ে যোগতত্ত্বে গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। কলন্দর, কবীর ও গাউস গোয়ালিয়রীই এ ব্যাপারে বিশেষ নেতৃত্ব দিয়েছেন। এর ফলেই মুসলিম সমাজে ও সাহিত্যে যোগের ও যোগসাধনার ব্যাপক প্রভাব ও চর্চা লক্ষ্য করি। এভাবে বহির্ভারতীয় সূফীমত এক বঙ্গীয় তথা ভারতীয় রূপ লাভ করেছে। এ কারণে বৌদ্ধ যোগী, গোরক্ষপন্থী যোগী এবং মুসলিম সূফীর সাধনমার্গ মূলত অভিন্ন। মুসলমানেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মীয় বাধার দরুন তন্ত্রাচার পরিহার করে চলবার চেষ্টায় ছিল। তবু কোন কোন শ্রেণীর সূফী-বাউলে তন্ত্রাচার বিরল ছিল না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আউলচাঁদ, মাধব বিবি, সৈয়দ মর্তুজা প্রমুখ সাধক-সাধিকার নামোল্লেখ করা যায়।

তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল–সবাই দেহচর্যাকেই মূল ব্রত করেছে। পার্থক্য রয়েছে কেবল সাধন প্রণালীতে। তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা রতি প্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে সাধনা করে। দুটোই যৌগিক প্রক্রিয়া-নির্ভর। একটি বামাচারী, অপরটি ব্রহ্মচর্যাশ্রয়ী। একটি রমণক্রিয়ার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানানুগ সাধনা, অপরটি কেবল বিন্দু ধারণ ও উর্ধ্বায়ন প্রণালী নির্ভর চর্যা। এর নাম উল্টা সাধনা। হঠযোগ এর অবলম্বন।

উজান উর্ধ্বগতি রতি চলিবে যাহার
সেইজন বেদবিধি হইবেক পার।
কেননা 'মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু ধারণং (শিবসংহিতা)।

মুসলমানেরাও এই সাধনায় আস্থা রাখে। দেহস্থ প্রাণ ও অপান বায়ু নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জনই এর লক্ষ্য। বৌদ্ধ চতুর্চক্র এবং পরে হিন্দু ষটচক্রই এ দেহ সাধনার অবলম্বন হয়েছে।

বৌদ্ধ দেহতত্ত্ব :

	দেহস্থান	কায়/চক্র	পদ্ম	দল
১.	নাভি	নির্মাণ	নাভি	৬৪
২.	হৃদয়	ধর্ম	হৃৎ	৩২
৩.	কণ্ঠ	সম্ভোগ	কণ্ঠ	১৬
৪.	মস্তক	সহজ	উষ্ণীষ	৪

বৌদ্ধ মতে গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা। এই শূন্যতাই নির্মাণ।

খ) হিন্দু দেহতত্ত্ব :

	দেহস্থান	চক্র	পদ্মদল
১.	গুহ্য ও জনন ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	মূলাধার	৪
২.	জনন ইন্দ্রিয়ের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিনী নাড়ী	স্বাধিষ্ঠান	৬
৩.	নাভিমূল	মণিপুর	১০
৪.	বক্ষ	অনাহত	১২
৫.	কণ্ঠ	বিশুদ্ধ	১৬
৬.	ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল	আজ্ঞাচক্র	২

এর উপরে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি রজঃবিষ বা কামবিষের প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দলাভ করাই সাধ্য।

সাধনপ্রণালী ঃ দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। তার মধ্যে তিনটে প্রধান–ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এ তিনটেকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র, রজঃ, নীর-ক্ষীর-রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ু চালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।

আবার শুক্র, রজঃ ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত–জীবনীশক্তি ও বিনাশ-বীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস, কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে গোটা দেহের উপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়ীতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতাই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম।

এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। তখন যে-শুক্রের স্খলনে নতুন-জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়ী মাধ্যমে ঊর্ধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি সংরক্ষিত হয়। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।

যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক সর্পস্বরূপ মনে করা হয়েছে। কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই কুণ্ডলিনী নাম পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাম বিষ। কামবিষ রূপ সৃষ্টিশীল শুক্র স্খলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনী শক্তি। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করা দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের ধ্বংস নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ীর মাধ্যমে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট-দেশে সঞ্চিত করে রাখলেই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। এটিই সিদ্ধি। আজকের যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে এক প্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, আর তাতেই তারা হয়তো মনে করে যে তারা অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।

সাধনার তিনটে স্তর ঃ ১. প্রবর্ত, ২. সাধক ও ৩. সিদ্ধি।

১. প্রবর্তাবস্থায় যোগী সুষুম্নামুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃতধারায় স্নাত হয়।

২. শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে অর্থাৎ বিন্দু ধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নামুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান।

৩. এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীপথে শুক্র ইচ্ছামত চালু রেখে অজরামরবৎ বোধগত সামরস্যজাত পরমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যমৃত পারাবারে স্নান। এতে স্থূল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাব স্বরূপ শৃঙ্গারানন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধভাণ্ড শৃঙ্গার রূপ মথনদণ্ড সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা যায়। এর ফলে জরা-গ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজমান থাকে।

বাঙলার সূফী সাধক ও সাধন তত্ত্ব

যে-সব সূফী বাঙলা দেশে ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জালালউদ্দীন তাবরেজী, বদর আলম, আলম যাহেদী, আদম শহীদ, বদরুদ্দীন,[৩০] সুলতান শাহরুমী, মখদুম শাহদৌলা শহীদ,[৩১] শাহ মুহম্মদ গজনবী (ওর্ফে শাহ রাহী), মাহী আসোয়ার,[৩২] জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ,[৩৩] শেখ শরফুদ্দীন তওয়ামা, তাঁর শিষ্য শেখ শরফুদ্দীন ইয়হিয়া,[৩৪] শেখ বদিউদ্দীন শাহ মাদার,[৩৫] মখদুম জাহানিয়া জাহান গসত,[৩৬] শেখ আখি সিরাজুদ্দীন উসমান, আলাউল হক, বদরুল ইসলাম, জাহাঁগীর সিমনানী,[৩৭] প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁরা ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী,[৩৮] শাহ আনোয়ার কুলি, হালবী,[৩৯] ইসলাইল গাজী,[৪০] মোল্লা আতা,[৪১] খান জাহাঁ আলি খান, শাহ জলাল দাখিনী (মৃত্যু : ১৪৭৬ খ্রী.)[৪২] শাহ মোয়াজ্জম দানিশ-মন্দ ওর্ফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)[৪৩] শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন, শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি প্রভৃতি দরবেশের নামও উল্লেখ্য।

জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যুঃ ১২২৫ খ্রী.), মুখদুম জাহানিয়া (১৩০৭-৮৩) ও শাহ জালাল কুনিয়াই (মৃঃ ১৩৪৬) সোহরওয়ার্দিয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরীদুদ্দীন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দীন (মৃঃ ১৩৭৫), আলাউল হক (মৃঃ ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নুর কুতব-ই-আলম (মৃঃ ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।

শাহ সফীউদ্দীন (মৃত্যু ১২৯০-৯৫) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন। শাহ আল্লাহ মদরিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশমন্দ ছিলেন নকশবন্দিয়া সূফী।[৪৪]

ষোল শতক অবধি চট্টগ্রামে সূফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ), শেখ ফরিদ, পীরবদর আলাম, কাতাল পীর, শাহ মসন্দর বা মোহসেন আউলিয়া শাহপীর, শাহচাঁদ প্রমুখ এবং (কবি) মুহম্মদ খানের মাতৃকুলে পীর শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহাঁ আবদুল ওহাব ওর্ফে ভিখারীর নাম মেলে।[৪৫]

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ, সিকান্দর শাহ, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু), রুকনুদ্দীন বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখের দরবেশ ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[৪৬]

আবার শাহ জালাল উদ্দীন কুনিয়াই, আলাউল হক, নুর কুতব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান জাহাঁ খান প্রমুখ সূফীরা রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।[৪৭]

আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "ভারতে সূফীপ্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সূফী মতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই।"[৪৮]

তাঁর মতে, এই ভারতীয় প্রভাব পড়ে ভারতীয় পুস্তকের আরবী-ফারসী অনুবাদের মাধ্যমে ও ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সান্নিধ্যে। এবং আলবিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্যতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ।[৪৯] বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধু দেশীয়) গুরু বু আলীর প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।[৫০]

তিনি আরো বলেন, "(বাঙলা) দেশে সূফীমতের প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা, বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফী মতবাদের সহিত, এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে এবং সূফী মতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে থাকে। চিশতীয়হ ও সুহরবরদীয়হ সম্প্রদায় দ্বয়ের সাধনা, ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতে অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে আগমনের পর, এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল, ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারতের বিখ্যাত সাধক কবির (১৩৯৮-১৪৪৮) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্য তীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও সূফীদের তত্ববফ বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের আর ভারতীয়েরা সূফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন"।[৫১]

আইন-ই-আকবরীতে[৫২] চৌদ্দটি সূফী খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে। আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন এক এক পীরকেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে ওঠার ফলে সম্প্রদায় সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে, আর অপ্রধানগুলো কালে লোপ পায়, অথবা স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল কথিত চৌদ্দ খান্দানের অনেকগুলিই লোপ পেয়েছে।

চিশতিয়া ও সুহরওয়ার্দিয়া প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।[৫৩] এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোল শতক অবধি চিশতিয়া, মদারিয়া ও কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্ন রূপ নিল এবং আচার ও চর্যার ক্ষেত্রে যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবিরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন-বিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পরে মুজদ্দদ-ই-আলফ-ই-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। কিন্তু সে-সংস্কার আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারেনি। নকশবন্দিয়া এবং কাদিরিয়া সম্প্রদায়েই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফ-ই-সানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া। বাঙলায় দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্যা ইসলামের বহিরবয়বের সঙ্গে মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করি।

ভারতীয় যোগ-চর্যা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল– তা অবশ্য কার্যত নয়, নামত। কেননা, আরবী-ফারসী পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামী রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এদের ষড় লতিফা বা আলোক কেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে ওঠে। এ হচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয়সত্তা। এর সঙ্গে সামরস্য জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৫৪]

সূফীর যিকর ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরাকে, সমরখন্দে, বোখারায়, বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতি বশে) সূফী সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সূফীমাত্রই তাই পীরমুর্শীদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর-পূজারও (দরগাহ-বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্তূপ পূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল। সূফীরা আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা সুরু করে। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশশেখ,' দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ'। প্রথমটি রাবিতা (গুরু-সংযোগ) দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহ (আল্লাহর ধ্যান)। এই মুরাকিবাহ্য় যৌগিক-পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি– এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দারা (আল্লাহর নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি) যাকী ইশক প্রভৃতি খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতির আমল থেকেই তাঁর খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।[৫৫]

সূফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন সাধারণ শরীয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধান বশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে "তাহারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লেখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরাপুরি বাঙালীই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না, দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল। তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার-বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ত দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ উদার ছিলেন। এখনও পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গীয় শয়খ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দুভাব, চিন্তা, আচার ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন রহিয়াছে। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।"[৫৬]

সূফী সাধনা ও সাধন পদ্ধতি

মোকাম, মঞ্জিল ও হাল

বহির্ভারতিক সূফীতত্ত্বেও মোকাম-মঞ্জিলের ধারণা এরূপ : মোকাম হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে স্থিতি। প্রথম মঞ্জিলের নাম শরিয়ৎ। এ শরিয়ৎ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি মানুষ বিশেষের স্বাভাবিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার অনুগ চর্যা (তওবা)। এ অঙ্গীকার পালিত হয় নাসুত মোকাম লক্ষ্যে। নাসুত মোকাম হচ্ছে পরিস্রুত মানবিক গুণের উজ্জীবিত অবস্থা। এর পরে তরিকত। আল্লার প্রসন্ন দৃষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিষয় বুদ্ধি ও সংসার চিন্তা ত্যাগ করে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লার ধ্যানে আত্মনিয়োগ করা (ইনাবত)। এ চর্যা গৃহীত হয় মলকুত মোকাম লক্ষ্যে। মলকুত মোকাম হচ্ছে ভগবৎ সাধনায় সমর্পিত। এর পরের স্তর হচ্ছে হকিকত। জাগতিক জ্ঞান লোপ করে আল্লার সন্ধানে কায়-বাক্-চিৎ নিয়োগ করাই হকিকত, (যুহদ্)। এর মোকাম হচ্ছে জবরুত– নিশ্চিন্ত নিঃস্বতা। এর পরে পাই মারফত মঞ্জিল। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর দেহ-মন-আত্ম সমর্পণ (তোয়াক্কাল)। এর মোকাম হল লাহুত তথা অহংবোধ শূন্যতা– লীলাময় আল্লাহ্‌র লীলা নিজ দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে অনুভব করা । এ ব্যাখ্যাই পাই কাশফ-অল-মাহজুব-এঃ

> Station (Moqam) denotes anyone's standing in the way of God, and his fulfilment of the obligation appertaining to that station and his keeping it until he comprehends its perfection so far as it is in a man's power. It is not permissible that he should quit his station without fulfilling the obligations there of. Thus the first startion is repentence (Towbat), then comes conversion (inabat), then renunciation (zuhd), then trust in God (Tawakkul) and so on; it is not permissible that anyone should pretend to

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

conversion without repentance. or to renunciation without conversion or to trust in God without renunciation.

(Tran: R.A. Nicholson: p181)

এর পরেও রয়েছে সর্বেশ্বরবাদীদের হাহুত তথা অদ্বৈত সিদ্ধি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, নাসুত হচ্ছে মানবিক, আর মলকুত হচ্ছে ফিরিস্তাসুলভ পবিত্রতার স্তর, এটি অধ্যাত্ম জগতের দ্বার স্বরূপ। জবরুত মোকামে অধ্যাত্ম শক্তি অর্জিত হয়, লাহুত মোকামে ফানাভাব তথা অহং এর ব্যবধান রহিত হয়।[৫৭]

হাল

হাল হচ্ছে সাধারণ সিদ্ধি রূপ আল্লার ধ্যান। মানুষের মোকাম সাধনা যদি অকৃত্রিম ও নিখুঁত হয়, তা হলে, আল্লাহ্ তাকে সাধনানুরূপ ফল দান করেন। মোকাম হচ্ছে সাধ্যকর্ম আর হাল হল এই সাধ্য ফল। হুজুইরি এ সম্পর্কে বলেন :

State (Hal) on the other hand, is something that descends from God into man's heart, without his being able to repeal it when it comes, or to retain it when it goes, by his own effort. Accordingly while the term 'Station' denotes the way of the seeker, and his Progress in the field of exertion, and his rank before God is in Proportion to his merit, the term 'State' denotes the favour and grace which God bestows upon the heart of His servant, and which are not connected with any mortification on the latter's part.' station belongs to the category of acts, states to the category of Gifts. Hence the man that has a 'station stands by his own self-mortification, whereas a man that has a 'state' is dead to self and stands by a 'state' which God creates in him" (Tran : R.A. Nicholson : P. 181.)

এই হাল হচ্ছে ধ্যান, আল্লার সান্নিধ্যবোধ, প্রীতি, ভয়, আশা, বিরহ বা ব্যাকুলতা (উদ্বিগ্নতা), ঘনিষ্ঠতা, শান্তি, সমাধি ও নিশ্চিত ভাবের অবস্থা।

সূফীর দেহতত্ত্ব, মোকাম, মঞ্জিল, হাল ও দর্শনের দেশী অবয়ব

বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রভাবে বাঙালী সূফীর যৌগিক কায়া-সাধনের উদ্ভব। বাঙালী সূফীরা দুই কূল রক্ষার প্রয়াসে দেহতত্ত্ব প্রভৃতি তাঁদের চিন্তায় নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। বাঙলা দেশের বাইরে কলন্দর, কবীর ও গাউস গোয়ালিয়রী প্রথম সমন্বয়কারী। তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যের দ্বারা বাঙলায়ও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অধ্যাত্ম সাধনা শুরু হয়। এ প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. বৌদ্ধ চতুষ্কায়ের আদলে তন লতিফু, তন কসিফু, তন বকাউ এবং তন ফানি কল্পিত।

খ. আবার চার দীলও পরিকল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী (বক্ষের দক্ষিণাংশে), দীল সনুবরী (বক্ষের বামাংশে) দীল মুজাওয়ারী (মস্তকে) দীল নিলুফারী (উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে)। এটিও বৌদ্ধ চার তত্ত্বের আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি। আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মোসাফির এই চার রুহ কল্পিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. হিন্দু ষট্‌ চক্র এবং ষড়পদ্মও স্বীকৃত। বিশেষ করে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রের বহুল প্রয়োগ সর্বত্র সুলভ।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরশিব শক্তিকে এরা জ্যোতি (লতিফা) নামে অভিহিত করেছে।

ঙ. আবার ষড়পদ্মের আদলে ষড় লতিফাও কল্পনা করা হয়েছে : কলব (হৃদয়), রুহ্ (আত্মা), সির (সুপ্ত হৃদয়), খাফি (গুপ্ত আত্মা), কস্‌ফ (বিবেকী আত্মা) ও নফস (দুস্প্রবৃত্তি)। এগুলো বিশেষ করে নকশবন্দিয়া খান্দানের পরিকল্পিত। (J.A. Sobhan.pp. 61-62, 149)। রুহ্‌ও চার প্রকার—ক. নাতকি, খ. সামি, গ. জিসিমি, ঘ. নাদি (সির্নামা)

চ. ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা) ও সুষুম্না (সরস্বতী) নাড়ী এবং প্রাণ অপান বায়ুর (দমের) নিয়ন্ত্রণ এবং উল্টা সাধনা এদেরও লক্ষ্য।

ছ. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধ দেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা ও তারার মতো কিংবা হিন্দু তন্ত্রের চক্র দেবতা ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চতুর্দ্বারের জন্যে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত।

জ. হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্র সঙ্গীতাদি প্রায় সব শাস্ত্র ও তত্ত্ব যেমন শিব-প্রোক্ত বলে বর্ণিত, তেমনি রসুলের পরই আলীর স্থান। এবং সব ইসলামী গূহ্যতত্ত্বই আলী-প্রোক্ত।

ঝ. শরীয়ৎ-নাসুত, তরিকত-মলকুত, হকিকত-জবরুত, মারফত-লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তত্ত্ব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন হয়েছে।

ঞ. অদ্বৈততত্ত্ব তথা সর্বেশ্বরবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত। এবং বাকাবিল্লাহ সাধনাও দুর্লক্ষ্য ছিল না (সবই আল্লাহ)। এবং হাহুত (পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম অবস্থা) লক্ষ্যের সাধনায় বৌদ্ধ নির্বাণবাদ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয়।

ট. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ প্রভৃতিও সূফীর যিকরের অপরিহার্য অঙ্গ হয়েছে। রেচক, পূরক, কুম্ভক সূফীদের দম নিয়ন্ত্রণ চর্যার অঙ্গ।

ঠ. বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রভাবেই পীরবাদ চালু হয়েছিল। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে সূফী সাধনায় পীরের অপরিমেয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধ্যাত্ম সাধনা মাত্রই গুরু নির্ভর। গুরুর আনুগত্যই সিদ্ধির একমাত্র পথ।

ড. প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা (গুরুসংযোগ) ও মুরাকিবাহ (আল্লার ধ্যান) তথা ফানাফিশ শেখ ও ফানফিল্লাহ পরিকল্পিত।

ঢ. আল্লাহকে বৌদ্ধ 'শূন্য'-এর সঙ্গে অভিন্ন করেও ভেবেছেন কোন কোন সূফী সম্প্রদায় :

দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিনিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেতে পরম হংস শূন্যে ব্রহ্ম জ্ঞান
তথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান। (জ্ঞান-প্রদীপ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ণ. পরকীয়া প্রেম সাধনা তথা বামাচারী যোগ সাধনাও কারো কারো স্বীকৃতি পেয়েছে :

স্বকীয়া সঙ্গে নহে অতি প্রেম রস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস। (জ্ঞান সাগর : পৃ. ৮০)

ত. ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টি পত্তন, তা সব বাঙালী সূফী মেনে নিয়েছেন।

সৃষ্টিতত্ত্ব যোগ ও দেহচর্চার ইতিকথা

জীবচৈতন্যের স্থিতি দেহাধার বিহীন হতে পারে না, এ সাধারণ বোধ থেকেই মানুষ দেহ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছে। আধেয় চৈতন্যের রূপ দেহাধার বিশ্লেষণ করেই উপলব্ধি করা সম্ভব। তাই গোড়া থেকেই মানুষ দেহের অস্থি-সন্ধি বুঝবার প্রয়াস পেয়েছে। জীবের জন্ম রহস্য, গর্ভে দেহ গঠন ও প্রাণের সঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের বিচিত্র চিন্তা ও অনুমান শাস্ত্রে, সাহিত্যে ও লোকশ্রুতিতে বিধৃত রয়েছে।

যোগতান্ত্রিক সাধনায় সৃষ্টিতত্ত্বের গুরুত্ব কম নয়। বাঙলা দেশের সূফীতত্ত্বেও দেশী প্রভাবে সে-ঐতিহ্য অবহেলিত হয়নি। সৃষ্টি-রহস্য বিমুগ্ধ মনে বিচিত্র চিন্তা জাগিয়েছে। কেউ ভেবেছে নারী যোনিই সৃষ্টির উৎস, কেউ জেনেছে পুরুষের লিঙ্গই সৃষ্টির আকর, আবার কেউ কেউ নারী-পুরুষের মিলনেই সৃষ্টি সম্ভব বলে মেনেছে। পুরুষ-প্রকৃতি, Yin-Yang, প্রজ্ঞা-উপায়, শিব-শক্তি, ব্রহ্মা-মায়া, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি তত্ত্বের উন্মেষ এমনি ধারণা থেকেই।

আবার স্রষ্টার হুকুমেই সৃষ্টি—এ তত্ত্বটিও শামীয় গোত্রগুলোর সাধারণ আস্থা অর্জন করেছে। 'একোহম বহুস্যাম' তত্ত্বও বিকশিত মননে সম্ভব হয়েছে। এর পরও রয়েছে আলো-অন্ধকার তত্ত্ব, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃবাদ আর সুন্দর-কুৎসিত, ভাল-মন্দ, মিত্র-অরি এবং কল্যাণ-অকল্যাণ তত্ত্ব। অনস্তিত্ব, অসুন্দর, অকল্যাণই অন্ধকার আর সৃষ্টিশীলতা, আনন্দ, সত্য, শিব ও সুন্দরই আলো। এই জ্যোতিঃ তত্ত্বে বাহ্য অনৈক্য থাকলেও মৌল অর্থে কোথাও কোনো অমিল নেই।

জোরাস্ট্রীয় মতে দেহে রয়েছে : চৈতন্য (Conscience), প্রাণশক্তি (Vital force), আত্মা (Soul/mind) বিবেক (Spirit/reason) আর ফরাবশী (Farawashi) ভগবদশক্তি স্বরূপ) --- এগুলোই যদি সৎচিন্তা, সৎকথা ও সৎকর্মের মাধ্যমে পরিচর্যা পায়, তা'হলে আদি জ্যোতিঃ (Primal Light) তথা পরব্রহ্মের সঙ্গে অদ্বয় এবং অবিনশ্বর হয়।[৫৮] ভারতিক যোগেও পাই --- "Plane of physical Body, Plane of Etherial Double, plane of Vitality, Plane of Emotional Nature, Plane of thought, Plane of Spiritual soul, Reason, the Plane of Pure spirit. "[৫৯] যোগের আট বিভূতি : ক. অনিমা (অনুবৎ হওয়া), মহিমা (বৃহৎ), লঘিমা (Light), গরিমা (Heavy) প্রাপ্তি প্রকাম্য (obtaining Pleasure) ঈশত্ব ও বশীত্ব।

সূফীরা ভারতিক যোগের আলোকে একে বিভিন্ন মোকামে ও মঞ্জিলে ভাগ করেছেন : Word of body নাসুত (দেহলোক), world of pure intelligence মলকুত (বোধিলোক), world of power জবরুত (শক্তি লোক) The world of negation লাহুত (ফানা বা আত্মবিলোপের জগৎ) The world of Absolute silence (বাকাবিল্লাহ তথা অদ্বয় অবস্থা)।[৬০]

॥ ২ ॥

তেরো শতকের গোড়া থেকেই ভারতিক যোগ ও বেদান্ত দর্শনের প্রভাব ইরানী তথা মুসলিম সূফীদের ওপর গভীরভাবে পড়তে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামরূপের ভোজর ব্রাহ্মণ (ভোজ বা বজ্রবর্মণ) নামে এক বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীর প্রদত্ত 'অমৃতকুণ্ড' নামে যোগ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের এক সংস্কৃত গ্রন্থ লখণোতির শাসক আলি মরদান খলজীর (১২১০-১৩) আমলের লখণোতির কাজী রুকনুদ্দিন সমরখন্দী (১২১০-২৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি বাঙলায় ছিলেন। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে বোখারায় মৃত্যু হয়) ফারসী ও আরবীতে অনুবাদ করেন।

পরে কামরূপের অপর ব্রাহ্মণ অম্ভবনাথের সাহায্যে আর এক অজ্ঞাত সূফীও এ গ্রন্থ আরবীতে তর্জমা করেন। Brocklemann -এর মতে এই অনুবাদক দামস্কের সূফী ইবনুল আরাবী।[৬১] শাত্তারিয়া খান্দানের সূফী গোয়ালিয়রের শেখ মুহম্মদ গাওসীর (মৃত্যু ১৫৬২) প্রবর্তনায় তাঁর শিষ্য মুহম্মদ খাতিরুদ্দিন বহর-অল-হায়াৎ নামে পুনরায় ফারসীতে এই গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এবার সহযোগী ছিলেন কামরূপবাসী কনাম (Kanama)। কাজী রুকনুদ্দিন সমরখন্দীর পুরো নাম ছিল কাজী রুকনুদ্দিন আবু হামিদ মুহম্মদ বিন-মুহম্মদ আলি সমরখন্দী। ইনি বোখারাবাসী ছিলেন। বাঙলায় ছিলেন ১২১০ থেকে ১২২৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি। ১২২৯ সনে বোখারায় তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই আরবী অনুবাদ চৌদ্দ শতকের মিশরেও সুপরিচিত ছিল। চৌদ্দ শতকে মিশরের সূফী মুহম্মদ আল মিসরী অমৃতকুণ্ডের উল্লেখ করেছেন।[৬২] মুসলিম জগতের সর্বত্র এ গ্রন্থ জনপ্রিয় হয়। তাই এ বইয়ের পাণ্ডুলিপি ভারত থেকে মিশর অবধি সর্বত্রই মিলেছে।

অমৃতকুণ্ড কামরূপের গ্রন্থ। কামরূপবাসী ভোজ বা বজ্র বর্মণ অম্ভবনাথ ও কনামের সাহায্যে প্রাপ্ত ও অনূদিত। এতে অনুমান করা চলে যে যোগীত্রয় ব্রাহ্মণ নন—বৌদ্ধ। গ্রন্থটিও সম্ভবত বৌদ্ধসংস্কৃত, প্রাকৃত কিংবা অবহট্টে রচিত ছিল। হিন্দু যোগ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ হলে এটি দেশে অবহেলায় লোপ পেত বলে মনে হয় না। বিশেষ করে অমৃতকুণ্ডে বর্ণিত সৃষ্টিপত্তন ও মানব-জন্ম রহস্য যোগ-তান্ত্রিক বৌদ্ধ ঐতিহ্য ধারার সঙ্গেই মেলে বেশি। তাছাড়া, আরবী অনুবাদের উপক্রমে কামরূপে বিদ্বান ও দার্শনিকদের বাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে :

> ...kamrup, the extreme territory of Hind where lived its learned men and philosophers and one of them came out to hold discussions with the learned divines of Islam. His name was Bhojar Brahmin etc.[৬৩]

আবার মোহসেন ফানী 'অমৃতকুণ্ড' গোরক্ষ শিষ্যদেরই শাস্ত্র গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৪]

কামরূপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তথা সমাজের প্রভাব সেকালে ছিল না। ওটি ছিল বৌদ্ধ বজ্রযান তান্ত্রিক সহজিয়া যোগীর প্রাণকেন্দ্র। আর ব্রাহ্মণ সম্ভবত বর্মণের বিকৃতি। কামরূপের বর্মণ রাজারা পূর্ববঙ্গেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।[৬৫]

অমৃতকুণ্ডের সূচিপত্র দেখলেই এর বিষয়বস্তু জানা যাবে। দশ অধ্যায়ে এবং পঞ্চাশটি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে বিষয়গুলো।

১ম অধ্যায় জীবসৃষ্টি, On the knowledge of Microcosm.
২য় ঐ জীবসৃষ্টির রহস্য ,, of the secrets of Microcosm.
৩য় ঐ মন ও তার তাৎপর্য ,, of mind & it meaning.
৪র্থ ঐ অনুশীলন ও তার পদ্ধতি of the exercises and how to practice them.
৫ম ঐ শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি On the knowledge of breathing and how it should be done.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ষ্ঠ ঐ বিন্দু ধারণ On the preservation of Semen
৭ম ঐ চিত্তচাঞ্চল্য On the knowledge of whims
৮ম ঐ মৃত্যুলক্ষণ On the symptoms of death.
৯ম ঐ ইন্দ্রিয় দমন On the subjugation of spirit.
১০ম ইন্দ্রিয় ও মানস জগতের বর্ণনা On the continuation of the story of physical and Metaphysical world.

তেরো-চৌদ্দ শতকের সূফী সাধক শরফুদ্দীন বু আলি কলন্দর (মৃত্যু ১৩২৪ খ্রী. কবর পানিপথে) আরবী-ফারসী পরিভাষা সমন্বিত একটি মুসলিম যোগপদ্ধতি প্রবর্তন করেন তা যোগ-কলন্দর নামে প্রখ্যাত হয়। বিশেষ করে বাঙলা দেশে আজো তা বিরল নয়। চণ্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম কলন্দরিয়া ফকিরের বাহুল্যের আভাস দিয়েছেন (ঋণকড়ি নাহি দেও, নহ কলন্দর) আর যোগকলন্দর পুঁথির বহুল প্রাপ্তিও কলন্দরিয়া সূফীমতের, অন্তত যোগপদ্ধতির বহুল প্রসার প্রমাণ করে।[৬৬]

॥ ৩ ॥

মুসলিম বিজয়ের পরে ভারতিক সূফীমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এককথায় সাধনার তথা মরমীয়াবাদের ভিত্তিই হল যোগপদ্ধতি।[৬৭] বৌদ্ধসিদ্ধা সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, হিন্দু শৈব, শাক্ত, মুসলিম সূফী ও হিন্দু-মুসলিম বাউলের মধ্যে আজো তা অবিরল। বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, গোর্খসংহিতায়, যুগীকাচে, চৈতন্য-চরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের 'স্বরূপ বর্ণনে' আর যোগচিন্তামণি, বাউল গান, যোগীর গান প্রভৃতি সব গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথা পাই।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, আলাউল, শেখ জাহিদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকিম, শেখ চাঁদ, যোগ কলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলি রজা, শুকুর মাহমুদ, রমজান আলি, রহিমুদ্দিন মুন্সী প্রভৃতিকে যোগপদ্ধতির মহিমা কীর্তনে মুখর দেখি। আলি রজার জ্ঞান সাগরে আছে :

পিরীতি উলটা রীত না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জিয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হয়ে বিমুখ সমুখ
পল্টা নিয়মে সব জগতে সংযোগ (পৃ. ৩৬-৩৭, আঃ করিম সম্পাদিত)
বিমুখে আগমপন্থ রাখিছে গোপতে
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্বমতে
সমুখের সবপন্থ বিমুখ করিয়া
পলটি বিমুখ পন্থে যাইব চলিয়া। (পৃ. ৩৮)

গোরক্ষ বিজয়-এ এই (পৃ. ১৪৭-- আঃ করিম সম্পাদিত) 'ষটচক্র ভেদ গুরু খেলাউক উজান'। এরই নাম উল্টা সাধনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ৪ ॥

প্রাণসঙ্কলি নামে সৃষ্টিপত্তন ও মানব-জন্মরহস্য শূন্যপুরাণে, ধর্মপূজা বিধানে, যোগীকাচে, ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতিতে[৬৮] রয়েছে। মুসলিম রচিত গোরক্ষ বিজয়, আগম, মোকাম মঞ্জিল, আদ্য পরিচয় প্রভৃতি গ্রন্থেও প্রাণসঙ্কলি দেখি। এটি যোগ গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ। কায়া-সম্ভেদে আছে :

প্রথম মাসেতে গর্ভে বর্ণ যব প্রমাণ
দ্বিতীয় মাসেতে গর্ভে বিন্দু বর্ণ আন।
তৃতীয় মাসেতে গর্ভে বিন্দু রক্ত গোলা
চতুর্থ মাসেতে বিন্দু স্থানে স্থানে স্থানা।
পঞ্চম মাসেতে গর্ভে বিন্দু অতি বড় সুখ
ষষ্ঠম মাসেতে গর্ভে বিন্দু অতি বড় দুখ।
সপ্তম মাসেতে গর্ভে বিন্দু সপ্ত ঋতু বসন্তি
অষ্টম মাসেতে গর্ভে বিন্দু গতাগতি।
অষ্ট অঙ্গে জোড় ধরে নয় মাসে।
গর্ভে বিন্দু উপবায়ু পবন আকাশে
নয় মাসে নির্মল মূরতি
দশ মাসে দশদিক মূরতি।[৬৯]

শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়েও এমনি গর্ভরহস্য বর্ণিত রয়েছে।

শেখ জাহিদের আদ্য পরিচয়ে ধর্মঠাকুর পন্থীদের প্রভাবও পড়েছে। এই গ্রন্থটির প্রস্তাবনা ও সৃষ্টিপত্তন অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :

গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী
বুঝিলে মুকতি হয় শুনিতে মধুর বাণী।
আউটি বিচার যেবা জানিব নিশ্চয়
জ্ঞান কর্মেতে তাকে সন্দেহ নাহি রয়।
জ্ঞান জন্মিব যেবা করিব ধেয়ান
ধ্যান না কৈলে তার কিবা গেয়ান।
দান ধ্যান যেবা করএ সমরস
যোগতন্ত্র সিদ্ধাতন্ত্র রাখে সব হএ বশ।
লোহ মোহ কাম ক্রোধ কিছু করিতে না পারে
আপনি অনুগ্রহ তারে করেন করতারে।
গর্ভের বিচার জানিলে বাড়িব রঙ্গ
যেমতে সৃষ্ট হয় মনুষ্যের অঙ্গ।
মায়ের যতেক দ্রব্য পিতার যত ধন
অনাদ্য ধর্মের যত বয়স রতন।
স্বর্গমর্ত্য পাতাল কহিমু স্থানে স্থানে
বাত, বরুণ, আনল বেশে যে যেইখানে।
চন্দ্র সূর্য আকাশে যত তারা সাজে
তুলনা দিমু সব শরীরের মাঝে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদ-নদী আর গঙ্গা ভাগীরথী
শরীরের মাঝে ঢেউ বহিছে দিবারাতি।
কিঞ্চিৎ কহিমু তাহা তরুর উপদেশ
তাহার প্রসাদে মুঞি জানিলুঁ বিশেষ।
আদ্য অনাদ্য গুরু কহিল শ্রবণে
সেই হইতে মোর জনমিল জ্ঞানে।
কহিল সকল কথা হৃদয়ে উতারি
কিঞ্চিৎ কহিমু সেই কথা অনুসারি।
ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে
গুনিলে যত হয় সহস্র উপরে।
এত শাকের মাঝে করিল প্রচার
পয়ার প্রবন্ধে কহি আত্মা বিচার।
জাহিদ কহে চিত্তে করি আছোঁ সার
সুহৃদ চরণ বিনে গতি নাঞি আর। [আদ্য পরিচয়]

বাঙালী মুসলমান সূফীদের লক্ষ্য, সাধ্য ও সাধনা এরূপই ছিল।

বৌদ্ধ-হিন্দু যোগ-তান্ত্রিক সাধনার ভিত্তি সম্ভবত এই ধারণায় : দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য যখন সম্ভব নয়, চৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হবে চৈতন্যাধার দেহবিশ্লেষণ করেই। এই চৈতন্যই আত্মা। আর সৃষ্টি আছে বলেই ধ্বংস আছে, কিংবা বিনাশ আছে বলেই সৃষ্টি সম্ভব। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করলেই ধ্বংসের পথও বন্ধ করা সম্ভব হবে। এই সৃষ্টি-শক্তি আয়ত্তে এনে সৃষ্টি ক্রিয়া বন্ধ করলে, সে সংরক্ষিত শক্তি (Energy) অজর ও অমর করবে। আবার পরম সুখ ও আনন্দের ধারণাও লাভ হয়েছে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই। মৈথুন তথা রমণাবস্থা হচ্ছে জীবনে উপলব্ধ চরম সুখাবস্থা। এই সুখই তাদের কাম্য। তাই মানস রমণাবস্থাই সাধ্য। এরই নাম সামরস্য-শিব-শক্তি বা প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন, তথা অদ্বয়াবস্থা। অতএব রতি নিরোধ তথা বিন্দু ধারণ করে চিরন্তন রমণাবস্থা-লব্ধ চরম সুখ উপভোগ করাই এ সাধনার সাধারণ লক্ষ্য। দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে রতির উর্ধ্বায়ন করে ললাটস্থিত সহস্রার প্রতিষ্ঠিত করাই যোগতান্ত্রিক সাধনা।

মুসলমান সাধকগণ ইসলামের প্রচ্ছায় গড়ে উঠেছে বলে এই তত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেননি। তবে চৈতন্য তথা আত্মার আগার এই দেহ তাঁদেরও কৌতূহলী করেছে। ভারতিক যোগাদির প্রভাবে দেহ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ বেড়েছে, এবং সেই জন্যেই যৌগিক প্রক্রিয়ার বিস্ময়কর প্রভাবকে তাঁরা অবহেলা করতে পারেননি। তাঁরা কায় সাধনটিকে যিকরের অনুকূল করে নেবার প্রয়াসী ছিলেন এবং ভারতীয় যোগ সাধনায় ফারসী আরবী পরিভাষা সৃষ্টি করে একে ইসলামী রূপ দেবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। ফলে ইসলামি নামের আবরণে হিন্দুয়ানী সাধনাই প্রাধান্য লাভ করেছে, এমনকি প্রকৃতজন এর তাত্ত্বিক প্রভাব থেকেও মুক্ত হতে পারেনি। তাই মুসলমান বাউল সম্প্রদায় আজো আমরা দেখতে পাচ্ছি। অন্য অনেকের মধ্যে আমরা শাহ বু আলি কলন্দর, কবির, গাউস গোয়ালিয়রী, দাদু, রজব, দারাশিকোহ্ প্রমুখ যোগী-সাধকের কথা জানি। কলন্দর প্রবর্তিত যোগপদ্ধতি 'যোগ কলন্দর' নামে বাঙলা দেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। এই যোগ নির্ভর কায়-সাধনই শেখ ফয়জুল্লাহকে গোরক্ষবিজয় এবং শুকুর মাহমুদকে গোপীচাঁদের সন্ন্যাস রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতই মহৎ আর নিখুঁত হোক, কোন আদর্শ, কোন বিধি বা কোন পদ্ধতিই সব যুগের ও সব দেশের মানুষের জীবনের বিচিত্র চাহিদা পূরণ করতে পারে না। দেশকালের প্রেক্ষিতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন কিংবা গ্রহণ বর্জনের প্রয়োজন থাকবেই। জীবন হচ্ছে বহতা নদীর স্রোতের মতো, নব নব বাঁকের বাধা স্বীকার করেই এবং সুকৌশলে তাকে অতিক্রম করেই স্ব-তেজে ও স্ব-ভাবে চলতে হয়। এজন্যে কোন বৃহৎ সাফল্যই সরল নয়–সর্পিল। নতুনকে বরণ করার মতো সুবুদ্ধি এবং স্বাঙ্গীকরণের মতো শক্তি না থাকলে কেউ বা কোন জাতি দেশ-কালের যোগ্য হয়ে বাঁচতে পারে না। আত্মবিকাশের অন্যতম প্রকাশ আত্মবিস্তারে। একদা আরব-তুর্কী-মুঘল মুসলমানেরা জগদ্ব্যাপী আত্মপ্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিল, ব্রতী হয়েছিল মানুষকে ইসলামের প্রচ্ছায় এনে মহান মানবতায় দীক্ষাদানের সাধনায়। ইসলামের বিকাশের ধারা অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাব, দেশকালের মননকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিয়েই মুসলমানেরা জয় করেছিল মানুষের হৃদয়। প্রাণময়তা ও উদারতা থাকলেই মানুষ গ্রহণশীল হয়। উঠতির যুগে মুসলমানেরা এমনি সহনশীল ও গ্রহণশীল ছিল বলেই কল্যাণ-বুদ্ধি নিয়ে আরব-বহির্ভূত দেশের মানুষের মনন ও জীবন চর্যার সঙ্গে আপোস করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। আর তাই ভারতে ইসলাম হয়েছিল সহজেই গ্রহণীয়। এ আপোসের নীতি ও পদ্ধতি কিরূপ ছিল, তা-ই আমরা জানতে এবং বুঝতে চেয়েছি এখানে।

খ. জ্ঞান প্রদীপ ও সৈয়দ সুলতান-প্রভাবিত কবিগোষ্ঠী*

জ্ঞান-প্রদীপ পরিচিতি :

সূফী বা যোগশাস্ত্র গ্রন্থ রচক হিসেবে সুলতানের স্থান হাজী মুহম্মদের নীচে। হাজী মুহম্মদের গ্রন্থে যে সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয়েছে, সাধারণের পক্ষে তা সম্ভবত দুর্বোধ্য ছিল। তাই সৈয়দ সুলতানের গ্রন্থ অধিক জনপ্রিয় হয়। এ কারণেই হাজী মুহম্মদের পাণ্ডুলিপি দুর্লভ আর সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানচৌতিশা আজো সুলভ।

সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপে আলোচিত বিষয় এই :

প্রথমে জানিব যত দরবেশী বিচার
দ্বিতীএ জানিব যত এবাদত খোদার
তৃতীএ জানিব সব তনের বিচার
চতুর্থে জানিব সেই লওহ আপনার।
পঞ্চ প্রকারে কহে দীনের বিচার
ষষ্ঠ যে প্রকারে কহে জিকির হুঙ্কার।
সপ্তম প্রকারে বুঝে পঞ্চ যথা রহে
অষ্টম প্রকারে কর আত্তমা পরিচয়।
নবমে জানিব তত্ত্ব কহিএ যাহারে
দশমেত কার্য করিবেক যে প্রকারে।

হর-গৌরীর পরিবর্তে আলির ও নবী মুহম্মদের প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে সব তত্ত্ব বর্ণিত।

* গ্রন্থগুলির বিস্তৃত আলোচনার জন্য 'বাঙলার সূফীসাহিত্য' – আহমদ শরীফ দ্রষ্টব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবী আলিকে বলছেন :

সাধিলে পরম তত্ত্ব হইবা অমর
ভাবিয়া আপনা কর ত্রিদশ ঈশ্বর।

নাড়ী পরিচয় :
শরীর বিচারে যদি ধর্মচিত্ত মন
তবে সে অমর হএ যোগের কারণ।
ইঙ্গল নাড়ীতে আছে বাউ যে পবন
তিন গাছি নাড়ী আছে তাহাত যতন।
পিঙ্গলা নাড়ীর কথা শুন অতি ভাল
একচল্লিশ নাড়ী আছে তাহাত বিনাল।
সুষুম্না নাড়ীর কথা শুন তত্ত্বসার
যথেক ভক্ষণ কর সকল তাহার।

অদ্বৈততত্ত্ব :
আহাদ আহমদ আদম এহি তিন জন
সাবধানে কর তুক্ষি ভুরু লক্ষ্যণ।

শূন্যতত্ত্ব :
[পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে] :
দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য। ইত্যাদি।

শেখ চান্দের তালিব-নামা, জ্ঞান-সাগর ও গোরক্ষবিজয়ের শূন্যতত্ত্ব তুলনীয়।

অমরত্বের উপায় : আলির জিজ্ঞাসা :
কহ নবী মহাশয় জিয়ে কেমন
কেমতে সাধিব আর কেমত চিন্তন।
অজর অমর হএ জিনি যমরাএ
যম 'পর যম হএ সাধি নিজ কাএ।

নবীর উত্তর :
আজ্ঞির যে তত্ত্ব মুঞি কহিলাম সার।
যথ কিছু দেখ আর মর্ত্যের মাঝার।...
আপনে শূন্যাকার আছে সৃষ্টিকর্তা
অজর অমর হএ চিন্তি নিরঞ্জন।

এরপর সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তারপর দেয়া হয়েছে দেহের প্রতীকী পরিচয় :

শরীর মধ্যে জান চারি চক্র হএ
আদি নিজ গরল উন্মত্ত চিত্রমএ।
শরীর মধ্যেত অপূর্ব তিন পুরী
শ্রীহাট, কামরূপ, শিরিপুরী।
হৃদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈসে
কামরূপ গর্ভে তালুত শ্রীহাট প্রকাশে।
অজুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদএ
স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যে বরিষা নিশ্চয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনাহত চক্রেত শরৎ বৈসএ
বিশুদ্ধ চক্রেত সেই শিশির প্রকাশএঁ।
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋত বৈসে
আজ্ঞাচক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।

ধর্মরাজ, যমরাজ, সিদ্ধা পদ্মাসন প্রভৃতি বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যের স্মারক।

চার বেদের স্থিতি :

মুখ মধ্যে অথর্ব বেদের জ্যোতি
নাভিমূলে যজুর্বেদ নিশ্চএ প্রকাশ
কণ্ঠ দেশে সামবেদ করএ নিবাস।
বক্ষদেশে ঋক্‌বেদ সব বেদ সার
এহি চারি বেদ জান হএ অঙ্গ সার।

তারপর, আসন নির্দেশ ও নাড়ীক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে :

ইঙ্গলাত বৈসে গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা
সরস্বতী মধ্যে বৈসে নামেত সুষুম্না।

যোগতত্ত্ব : সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী–
উরু হোন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
চক্ষু হোন্তে ভুরু মধ্য অর্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জানিও যোগের আদি মূল।
নাভি স্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবা রাত্রি নীর বিন্দু বহে।

চৌরাশী-আঙ্গুল-পরিমিত দেহচর্যায় সিদ্ধিলাভ করলে হয় 'চৌরাশী সিদ্ধা'।

মুদ্রা : এখনে কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ ...
প্রথমে কহিএ যে মুদ্রা খেচরী
সর্বসিদ্ধি হএ যে রোগ পরিহরি।
সাপে খাইলে তবে সে নাহি বাহে
নিদ্রাতে না টলে বিন্দু কামিনী পাশএ।
তালু মূলে সুষুম্নার পন্থের সন্ধান
জিহ্বা তুলি দিব সেই বন্দের বন্দান।
তুলিলে সে জিহ্বাএ অমৃত লাগ পাএ।
অমৃতের পানে যে অজর হএ কাএ।

মহামুদ্রা : প্রথমে বুক 'পর চিবুক পড়িব
গুহ্যদ্বারে বামপদ দড় করি দিব।
দক্ষিণ পাও তুলি দুই হাতেত ধরিব
পিঙ্গলাত পুরি বাউ যেমতে ভরিব।
যথাশক্তি কুম্ভকে পিঙ্গলাত রেচিব
কুম্ভকে পিঙ্গলাএ সমান করিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গলা-পিঙ্গলা যদি সমন্বয় হএ
তবে সেই মুদ্রা যেন এড়িতে জুয়াএ।

শরীর সাধনতত্ত্ব : সপ্তমে ভেদিলে জ্ঞান পরম পদ্ম পাএ। ...
একাদশে অগ্নিজ্বলে নাহিক মরণ।...
পঞ্চবিংশ ভেদিলে সে সর্বসিদ্ধ হএ ...
ষষ্ঠ বিংশ ভেদিলে সে ধর্মপদ্ম পাএ
অষ্টবিংশ ভেদিলে সে সমাধি নিশ্চয়।

চৌত্রিশ হরফের চৌতিশায় জ্ঞান-প্রদীপের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। এতে মূল কথাগুলো স্মৃতিতে ধরে রাখার সুবিধে হত। সে জন্যে জ্ঞান চৌতিশা জনপ্রিয় হয়েছিল, এবং তা বুঝতে পারি জ্ঞান-চৌতিশার পাণ্ডুলিপির সুলভতায়।

পরমাত্মা : আজ্ঞি সে পরম তত্ত্ব যুগল নয়ান
আজ্ঞি রূপে ত্রিখণ্ডে বিদিত নিরঞ্জন।
কায়াতে আছএ তত্ত্ব কায়াগুণ নিধি
কায়ালক্ষ্যে লক্ষিলে পাইবা তার শুদ্ধি।
কায়ানলে দহিতে আছএ সেই কায়া
কর্মদোষে পাপ ফলে চিনন না যায়।
খরতর স্রোতোধার কাম পয়োনিধি
ক্ষুদ্রতর শরীরেত ভাসে মহাদধি।
খণ্ডিলে খণ্ডন নাহি সেই অখণ্ডন
খণ্ড খণ্ড হৈয়া আছএ তে কারণ।

হিন্দুর অদ্বৈতবাদ, তন্ত্রের কাম প্রেম প্রভৃতি এ সূত্রে স্মর্তব্য।

ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার।...
জল কুম্ভ কুম্ভজল একহি মিলন।...
নির্মল উঝল যেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চয় সেরূপ বৈসে সভার অন্তর।...
ঢেউ-জল জল-ঢেউ নহে ভিন্নকার
এ তেল বারিত যেন বৈসে হুতাশন
তনু মধ্যে তেন মতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্রদলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।
থাবর-জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দিশি নিশি রবি-শশী নাহি স্থান স্থিত...
দিশি নিশি আপেত আপনা লক্ষণ ...
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন
প্রেম রসে মগ্ন হই করে নিরীক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরগৌরীসংবাদ ও তালিব-নামা স্মরণীয়।

বিন্দু বিন্দু নাথ বিন্দু নহে ভিন্ন ভিন্ন।

শুক্রই ব্রহ্ম, কৃষ্ণ, হেবজ্র প্রভৃতি তত্ত্বের প্রতিধ্বনি রয়েছে এই চরণে।

গুরু : ভজহ গুরুর পদ
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুরু সার।

অদ্বৈত সিদ্ধি: মিলাও জীবেত জীব তেজি আপনার।
জগত জীবন ব্রহ্মা মহাশিব কর
যত্ন করি রহিয়াছে সবার অন্তর।...
রবির কিরণ কিবা কহিবারে নারি
রবি হোন্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পারি।
লখন অলখ লখ লই তার নাম
লীন হই সর্বত্রে আছএ সর্বঠাম।...
বাউত করহ নর আয়ুব উদ্দেশ

সহস্রার : সহস্র দলেত গুরু শতদলে শিষ
ষটচক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।
সহস্র দলেত রঙ্গি দেখি সর্বময়
সূর্যের দৃষ্টিত যেন চন্দ্রের উদয়।

গুরু সাধন : শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হরে তিন
শক্তি, বিন্দু, ইচ্ছা, বাক্য গুরুর অধীন।

বায়ু : সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দধিয়া।

শিব-শক্তি : শিব-শক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।

ক্ষেমা [সংযম] :ক্ষেমা হোন্তে ধিক জ্ঞান নাহি পৃথিবীত
ক্ষেমা তপ জপ কৈলে আত্ম হিতাহিত।

এই তত্ত্ব, এই আচার এহেন ধর্মই বাঙলার প্রাচীনতম ধর্ম, আচার ও দর্শন। আমাদের বাউলেরা বাঙলার এই প্রাচীনতম তন্ত্র-ধর্মেরই ধারক এবং বাহক।

১. কবি শেখ চান্দ :

কবি শেখ চান্দের পিতার নাম ফতেহ মুহম্মদ। তাঁর পীর ছিলেন শাহ দৌলা। আধুনিক কুমিল্লা জেলার পাটিকের পরগনায়, কদবা চাকলায় ও হুড়ুয়া গাঁয়ে পীরের সান্নিধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। কুমিল্লা জেলার লালমাই রেলস্টেশনের আট-দশ মাইল দূরবর্তী বাকসার গাঁয়ে কবির সমাধি আজো বর্তমান। তাঁর রচিত 'রসুল বিজয়' কাব্যের শেষ পর্ব কেয়ামতনামার দুটো পাণ্ডুলিপিতে দুটো রচনা সন রয়েছে। তা থেকে ১৬১২ কিংবা ১৭১২ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ক ॥

শেখ চান্দ 'হরগৌরীসম্বাদ' ও 'তালিবনামা' নামের দুটো তত্ত্ব-গ্রন্থের রচয়িতা। দুটো গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু অভিন্ন। পার্থক্য কেবল এই যে হরগৌরীসম্বাদে উমার প্রশ্নের উত্তরে শিব জগৎসৃষ্টি ও জীবতত্ত্ব তথা মহাজ্ঞান কথা বলছেন, আর তালিবনামায় সে কথাগুলোই শেখ চান্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে পীর শাহদৌলা একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন।

হরগৌরীসম্বাদে গুরুতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, গুরু পরিচিতি, মনস্তত্ত্ব এবং চন্দ্র সংস্থান ও সঙ্গম-ফল বর্ণিত হয়েছে। শেখ চান্দ বর্ণিত দেহ পরিচয় এরূপ :

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ডাইনে বামে স্থিতি
কণ্ঠেত সুষুম্না নাড়ী ভবানী মুরতি।
বাসত্তর কোঠা তাতে নাভি দেশে ঠাম
অষ্টকলে কণ্ঠদেশে বাজে নিজ নাম।

তারপর রগ, যোগ, আসন, বায়ু, গুরু, মন, সঙ্গম-তত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

গুরুতত্ত্ব : তনের গুরু মন, মনের গুরু পবন
পবনের গুরু শূন্য, শূন্যের গুরু নির্গুণ।
ধ্যানের গুরু সাধন, সাধনের গুরু ধর্ম।

এসব কথা—'মহেশ গৌরীর বরে ভণে হীন চান্দে।'

॥ খ ॥

'তালিবনামা'র বিষয়সূচী এরূপ : সৃষ্টিরহস্য, দেহতত্ত্ব, আত্মাতত্ত্ব, চারচিজ, গুরুতত্ত্ব, মনতত্ত্ব, মঞ্জিলতত্ত্ব, চন্দ্রতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, আঞ্জিতত্ত্ব, বিষুতত্ত্ব, সপ্তাহতত্ত্ব, যাত্রাতত্ত্ব, তালিতত্ত্ব, দরবেশী মহল, এবাদতমহল, তন-বিচার, নাড়ীতত্ত্ব, জন্ম-বিচার, শৃঙ্গার তত্ত্ব ও মৃত্যুলক্ষণ।

কবির মতে : পীর ফকির জান আল্লাহ নিজ জাত।

শূন্যতত্ত্ব : শূন্যরূপ নিরঞ্জন বান্দার জীবন
শূন্য গুণে পালে প্রভুএ তিন ভুবন।
চক্ষের উপরে কালা তাত ফুটে জল
মণিতে বসতি নুর জগত উজল।...
অষ্টকলে তালি দিয়া রহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে অষ্টকলে সাজে
অষ্টগণ করি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ, মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোর মন
আকল ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম, শূন্যে খোম, শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জীউ, শূন্যে পিউ, শূন্যে সব জিন্দা।

উল্টা সাধনা : উজানে উজায় নৌকা লাহুতেত থানা
আমনা গমনা করে শূন্যে উড়ে মনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুক্র রহস্য : চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার।
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস।

চার মঞ্জিল তত্ত্ব : শরীয়ত পোস্ত জান গোস্ত তরিকত
হকিকত যে ব্যহন, চক্ষু মারফত।

এবং পয়গাম্বর শরীয়ত আউলিয়া তরিকত
হকিকত আদম সফি, এলম মারফত।

চার রুহ, চার চিজ, চার ঋত, চার মোকাম, চার প্রহরী, চার তন, চার কুতব প্রভৃতিও আলোচিত হয়েছে।

কবি বলেন, সাধনার দ্বারা, 'কায়া সিদ্ধি হৈলে তবে তরিবা যে ভবে।'

২. যোগকলন্দর : অজ্ঞাতনাম কবির রচনা এটি। সম্ভবত লোকসাহিত্যের মতো এটিও গণ-রচনা অর্থাৎ আদিতে হয়তো কোন ব্যক্তি একটি পদবন্ধ রচনা করেছিলেন, তা লোকশ্রুতিতে রক্ষিত ও লোকমুখে পল্লবিত হয়ে পরে লিপিবদ্ধ হয়। গ্রন্থের নামেই প্রকাশ : শাহ্ বু আলি কলন্দর-পন্থ বাঙলা দেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। এ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয় হচ্ছে; মোকামতত্ত্ব, তন-বিচার, সাধনতত্ত্ব, আসন, ধ্যান, মৃত্যু লক্ষণ ও রঙতত্ত্ব।

চার মোকামের সাধনা নিম্নরূপ :

প্রথমে দেহের সাধন—মূলাধার থেকে শক্তির (অনলের) উর্ধ্বায়ন ও লতিফা বা জ্যোতির উন্মেষ সাধন। দ্বিতীয় স্তরে মণিপুর তথা নাভিদেশে বায়ুর নিয়ন্ত্রণ ও নাসিকা লক্ষ্যে ধ্যান। এই স্তরে আত্মার দর্শন মেলে। তৃতীয় স্তরে কলিজাস্থিত অমৃতরূপ জলকুণ্ডে শশিদর্শন ঘটে। এখানে আত্মা ও নুর-মুহম্মদের মিলন হয়। নুর মুহম্মদ পরমাত্মার প্রতীক। চতুর্থ স্তরে দেহস্থ সহস্র দল পদ্মের ওপর জ্যোতির্ময় আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এভাবে দেহের মধ্যে চিনে নিতে হয় 'প্রভু নিরঞ্জন' আল্লাহকে।

আসনে বসে ধ্যান করলে ক্রমে মাণিক্য বর্ণ, গোশৃঙ্গে শস্য, মুক্তার কণা, লাল-জরদ-ছেহা-সফেদ বর্ণ, পুরুষ মূর্তি, লাল রঙের মধ্যে ছেহা বর্ণ প্রভৃতি দেখা যায়। এমনি করে একসময় পরম জ্যোতি দর্শন সম্ভব হয় এবং তাতেই আসে সিদ্ধি।

তন-তত্ত্বে বৌদ্ধ চতুর্চক্রের গভীর প্রভাব রয়েছে। তাই রাকিনী-ডাকিনী প্রভৃতির আদলে চার ফিরিস্তা প্রহরী কল্পিত হয়েছে।

কবির মতে : অরুণ উদিত জান সেই মূলাধার
জীবাত্তমা স্বামী হেন জানিঅ তাহার।...
অনুদিন আনল জ্বালিঅ সেই দেশে ...
শরীর অমর হএ সেই আনল হোন্তে
সাবধানে থাকিবা না নিবে যেন মতে।...
ঘট মধ্যে রাখ বাবি যেন মতে রহে
যাবত পবন আছে তাবত জীবন।
পবন ঘুচিলে হয় অবশ্য মরণ।...
সহস্র দলের মধ্যে আত্তমা বৈসএ
তার জোতে সকল শরীর পসর হএ।...
এইরূপে সহস্র দলে প্রভুর মোকাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়-মুকুর যদি হৈল মার্জন
তবে দরশন পাইব প্রভু নিরঞ্জন।

অতএব, 'ঘট মধ্যে চিনি লও প্রভু নিরঞ্জন'।

৩. হাজী মুহম্মদ : এঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'সুরতনামা বা নুরজামাল।' হাজী মুহম্মদ সৈয়দ সুলতানের বয়োঃকনিষ্ঠ, শেখ পরাণের সমবয়সী, এবং সৈয়দ সুলতানের পৌত্র 'নূরনামা' প্রণেতা মীর মুহম্মদ সফীর পীর ছিলেন। অতএব, হাজী মুহম্মদ ষোল শতকের শেষপাদের এবং সতেরো শতকের প্রথমার্ধের লোক। এ গ্রন্থের বর্ণিত বিষয় ইমান, নসিব, এবাদত, গোসল, ফরজ, তওবা, চার মঞ্জিল, জন্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ও আত্মাতত্ত্ব। কবি বলেন, যদিও শরীয়ত-দুগের আশ্রয়ে পাপ এড়ানো সম্ভব, তবু পরমকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্যে কঠিনতর সাধনায় ব্রতী হতে হয়। অনন্ত-অন্বেষা নিয়ে তাই চার স্তরের সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করতে হবে।

শরীয়ত চাপনি, সলিতা তরিকত
হকিকত তৈল যেন অগ্নি মারফত।
এক না থাকিলে তিনে কাম নাহি চলে
চারি একত্তর হৈলে সেই দীপ জ্বলে।

AMARBOI.COM

তরিকত মঞ্জিলে :

নুরজামালে দেখে বাতিনে অনুক্ষণ
আল্লা 'পরে আর কিছু না কল্পএ মন।

এবং এ সময় :

নুর তজল্লাএ হয় এ দিব্য শরীর।

হকিকত মঞ্জিলে :

হকিকত মঞ্জিলে আরোহা চিনিব.
আপনা জানিয়া ফানি 'হকে'ত মিশিব।

এবং, আরোহার (রুহ্ সমূহের) নুর সে রওশন অতিশয়।
এই স্তরে, বাহিরে ভিতরে তার হয় একাকার
আত্মপর ভেদ কিছু নাহি রহে তার।

মারফত মঞ্জিলে :

লাহুত মোকাম কিছু পাইলেক যবে
বাক্যসিদ্ধি কেরামত হয় তার তবে।

কবি হাজী মুহম্মদ উচ্চ দার্শনিক চিন্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদী। তাঁর কাছে সৃষ্টি-স্রষ্টা অভিন্ন :

সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু, হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে।
এক হোন্তে হৈল দুই, দুই হোন্তে সকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লা হোন্তে বান্দা সব হৈছে পয়দা
এ থেকে সে বান্দাসব সুরত আল্লার।...
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল

তবে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বও তিনি মানেন :

তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যায়।

তথাপি—আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে।

৪. মীর মুহম্মদ সফী : ইনি সৈয়দ সুলতানের পৌত্র ও হাজী মুহম্মদের মুরীদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'নুরনামা'। বর্ণিত বিষয়—নুরতত্ত্ব, নুরের রূপ, সৃষ্টিতত্ত্ব ও কন্দিল তত্ত্ব।

এতে বৌদ্ধ ও পৌরাণিক সৃষ্টি-পত্তন তত্ত্বের অনুসরণ রয়েছে। শক্তির মোহিনী রূপ-মুগ্ধ শিবের মতো নিরঞ্জনও নুরনবীর রূপমুগ্ধ। এ অনুপম রূপ দেখে তিনি চৈতন্য হারালেন। তারপর :

পবন মঞ্জিলে যদি জাগে নিরঞ্জন
জাগিয়া দেখিল প্রভু শামার রোশন।

এ অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষ করে :

হাসিতে হাসিতে প্রভু আকুল হইলা
এক গোটা মুক্তা আসি তাহাতে জন্মিলা।

সৃষ্টি পত্তন : নুরের সকল অঙ্গে ঘর্ম নিকলিল।
সেই ঘর্মে নিকলিল যথ কুদ্রতি।

তারপর নবী মুহম্মদের দেহের এক এক প্রত্যঙ্গের এক এক বিন্দু ঘর্ম থেকে দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্ট হল।

কন্দিলতত্ত্ব-প্রথম কন্দিলের নাম তওবা, দ্বিতীয় কন্দিল 'এলম', তৃতীয় 'আম্বা', চতুর্থ 'ফারোয়ার', পঞ্চম 'মুতওল্লা', আর ষষ্ঠ কন্দিল হল 'বিদ্যা'। সপ্তম কন্দিল সোনার বরণ এবং অষ্টম কন্দিলে নুরনবী ময়ূর রূপে বাস করেছেন অনেককাল।

নুরনবী—নিজ অঙ্গ নিজ সখা পাইতে প্রভুর দেখা
ভ্রমিলা যে কন্দিল মাঝে।

অতএব, অষ্ট কন্দিল পরিক্রমার পর সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব।

৫. কাজী শেখ মনসুর : শেখ মনসুর সম্ভবত রোসাঙ্গ রাজ্যান্তর্গত রামুর (আধুনিক কক্সবাজার মহকুমার অন্তর্গত) কাজী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ঈসা। তাঁর পীর ছিলেন : '(সৈয়দ) সুলতান বংশের কান্তি শাহ তাজুদ্দিন।' এই শাহ তাজুদ্দিন কবি সৈয়দ সুলতানের প্রপৌত্র। তাঁর কাব্য সির্নামা রচিত হয় ১০৬৫ মঘীসনে বা ১৭০৩ খ্রীস্টাব্দে।

কবির ভাষায় : যথ হইল মঘী সন লও পরিমাণি
এক পরে শূন্য ছয় পাঁচ দিয়া গুনি।

তাঁর গ্রন্থটিও 'আসাফল' নামের এক ফারসী পুস্তকের অনুবাদ:

আছাফল নাম এক কিতাবের বাণী।
সব প্রচারিয়া দিল রাখি খানি খানি।

অতএব, গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজনে স্বাধীনতা নিয়েই শেখ মনসুর এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর গ্রন্থনামও তিনি গ্রহণ করেছেন এক ফারসী কিতাব থেকে :

'আহারল মসা' এক কিতাব উপাম
'ছিরি' বুলি রাখিলাম পুস্তকের নাম।

আহারলমসা তথা আসরারুল মসা বা বীর্যরহস্যের বাঙলা পরিভাষা হয়েছে ছিরি (শ্রী) বা 'সির'। কবি দেশী যোগকেই আরবী,-ফারসী পরিভাষায় মণ্ডিত করেছেন। এই গ্রন্থে দরবেশী, এবাদত, তনতত্ত্ব, বার্বিতত্ত্ব, দীলতত্ত্ব, ঋতু-রহস্য ও রুহতত্ত্ব বর্ণিত রয়েছে। কবি আল্লাহ্ তত্ত্ব বর্ণনায় সাহস পাননি :

নবম ফসলে আছে ছিরি নিরঞ্জন
প্রচারিতে আজ্ঞা নাই গোপত বচন।

পরিভাষার নমুনা :

চন্দ্ররে বোলএ মনি আরবী বচন
চন্দ্র, ঋতু, মনি, নোৎকা, শুক্র, বীর্য, পানি,
একই ঋতুরে কহে এথ ভাষ খানি।

কিংবা, প্রাণেরে আরুহা বোলে আরবী ভাষায়।

রুহ্ চার প্রকার : মনুষ্যাত্মা-নাতকী, পশ্বাত্মা-সামী, উদ্ভিদাত্মা-জিসিমি ও শিলাত্মা-নাসি নামে পরিচিত।

দমই (শ্বাস বায়ু) রয়েছে সৃষ্টির মূলে :

ঈশ্বর পুরান (অনাদি) জান সেই এক দম
সে দমেতু হইয়াছে এই দুই আলম।

মুহম্মদের উৎপত্তি :

আদম আছিল শূন্য ছিল একাকার
মিম হোন্তে আহমদ হৈল প্রচার।

কবি অদ্বৈতবাদে আস্থা রাখেন :

যে জন ভাবিয়া আপে ব্রহ্মাতে মিশিল...
ব্রহ্ম যে ভাবিয়া ব্রহ্ম হএ সেই জন।

কবি গুরুবাদীও :

পীর-মুর্শিদ জান নায়েব খোদার।
পীর-মুর্শিদেরে হেন জানিব খোদাএ।

দীলও চার প্রকার—মোনাফিকের পাষাণ দীল, অলসের আঁধার দীল, মুমীনের জ্যোতির্ময় দীল ও আউলিয়ার দীল।

বায়ুও চার প্রকার : শুকা বাবি, মাহেন্দ্র বাবি, আত্মা বাবি ও বরুণ বাবি।

সির্নামা দেশী-বিদেশী সাধনতত্ত্বের সমন্বয়-প্রয়াসের স্বাক্ষর সংবলিত বিশিষ্ট রচনা।

৬. আলি রজা : আলি রজা আগম ও জ্ঞানসাগর নামে দুই পর্বে তাঁর অধ্যাত্ম শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইনি আঠারো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার ওশখাইন গাঁয়ে ছিল তাঁর নিবাস। এখনো বংশধর বিদ্যমান। তাঁর দুই পুত্রও—এর্শাদুল্লাহ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরফতুল্লাহ–পদ-রচয়িতা ছিলেন। কবির পীরের নাম শাহ্ কেয়ামুদ্দিন। আলি রজার দুই শিষ্যও –বালক ফকির ও মুহম্মদ মুকিম–কবি ছিলেন।

কবি আলি রজা ছিলেন সমন্বয়বাদী। অদ্বৈতসিদ্ধিতে, উল্টা সাধনায় ও পরকীয়া-পদ্ধতিতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। বৌদ্ধ শূন্যতত্ত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন :

শূন্য মধ্যে প্রথমে আছিল করতার
'তম' গুণ মণ্ডলীতে নিরঞ্জন সার।...
সত্ত্ব, রজঃ তমঃ হইল শক্তি আপনার

তারপর নিজের আদলে সৃষ্টি করলেন নূরমুহম্মদকে। নূরমুহম্মদ হলেন শক্তি ও মায়া স্বরূপ। এবং উভয়ের ঘর্ম থেকে সৃষ্টি হল সয়াল সংসার।

তনতত্ত্ব : রাখিয়াছে মহানিধি তনের ভিতর
তন-সিন্ধু বিচারিয়া যোগী হএ সার।

শূন্য-সাধনা : সংসারে ফকির শূন্য জপে শূন্য নাম
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সব কাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্ম জ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগী ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী।
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এক এই সে যুগল
যে সবে এ তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল।

উল্টা সাধনা : পিরীতি উল্টা রীতি বুঝ সাধুগণ
তত্ত্ব মূলে বুঝ সিদ্ধা পলটা পিরীত।
পিরীতি উল্টা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে না জিয়ে সংসারে।
সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পল্টা নিয়মে সব জগত সংযোগ।
বিমুখে আগম পন্থ রাখিছে গোপতে
চলিলে বিমুখ পন্থে সিদ্ধি সর্বমতে।
উত্তম উল্টা ভাষা না বুঝে সকলে
সিদ্ধি সব মহিমা উল্টা পন্থ মূলে।
উর্ধ্বেরে বুলিএ অধঃ অধঃ হএ উর্ধ্ব
শুদ্ধ বুলি অশুদ্ধ, অশুদ্ধ বুলি শুদ্ধ।
প্রভুর পরম তত্ত্ব উল্টা সাধন।

দেহতত্ত্ব : ষষ্ঠপদ্ম ষষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ ঋত গতি
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহত
আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান এই চক্র বুলি ঋত।
শ্রী গোলার হাটে তথা নিত্যানন্দ বাজার
পরম সুন্দরী বামা নিত্য দেয় পশার।
সর্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।...
পরাত্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত
তন মধ্যে সরোবর ত্রিপিনীর ঘাট
ত্রিপিনীর তিন নাম পুরে ইন্দ্রনাট।...
তন অন্তরে মন মনান্তরে জ্যোতি
জোতের অন্তরে ধ্বনি উঠে প্রতিনিতি।
অনাহত শব্দ কহে সে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম
সে হুঙ্কার মূলের পরম তত্ত্ব সার

সাধন রূপক : কায়া হয় কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন।...

এখানে রাধা-কৃষ্ণ রূপকের প্রভাব যেমন দৃশ্যমান, তেমনি সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বও প্রকট।

AMARBOI.COM

পরকীয়া সাধন : স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।

শুক্রতত্ত্ব : শরীরেত মণিচন্দ্র সবার উত্তম
তার তেজে যোগ সিদ্ধি সকল বিক্রম।
চন্দ্র হোন্তে জিয়ে নর চন্দ্র বিনু মরে
তা হেতু রমণ সিদ্ধা অধিক না করে।

যোগ মাহাত্ম্য : যোগবিনু পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।

আলি রজা আসলে বৌদ্ধ-হিন্দু যোগতত্ত্বেরই স্বাধীন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

৭. শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়'-এর প্রতিলিপি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সম্প্রতি শ্রীমণীন্দ্রমোহন চৌধুরীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়েছে। অমৃতকুণ্ডের আদলে এ গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব ও জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত। যথা :

গর্ভতন্ত্র যোগতন্ত্র সিদ্ধের কাহিনী
বুঝিলে মুকতি হএ শুনিতে মধুর বাণী।
আউটি বিচার যেবা জানিব নিশ্চয়
জ্ঞান কর্মেত তাক সন্দেহ নাহি রএ।
দান ধ্যান যেবা করএ সমরস
যোগতন্ত্র সিদ্ধাতন্ত্র রাখে সব হএ বশ।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দ্র সূর্য আকাশে যথ তারা সাজে
তুলনা দিমু সব শরীরের মাঝে।
নদ নদী আর গঙ্গা ভাগীরথী
শরীরের মাঝে ঢেউ বহিছে দিবারতি।

এই গ্রন্থে রচনা কাল দেয়া আছে :

ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে
গুনিলে যত হএ সহস্র উপরে।
এত লোকের (শাকের) মাঝে করি প্রচার
পয়ার প্রবন্ধে কহি আত্মা বিচার।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (রাবণের কর -২০, ব্রহ্মার আনন-৪ = ৪২০ + ১০০০) ১৪২০ শক বা ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে মনে করেন। এতে একটি অনুমানের অবকাশ মেলে। চিশতিয়া সূফী সাধক আলাউল হকের পুত্র নুর কুতবে আলমের (গণেশের সমকালীন) বাঙলা পদ পাওয়া গেছে। (মাহেনও অক্টোবর ১৯৬৪)। কাজেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তথা আলাউল হকের পৌত্র শেখ জাহিদ (যাঁকে গণেশ সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও লাঞ্ছিত করেছিলেন ... (History of Bengal. II D.U). হয়তো এ গ্রন্থের রচক।

কিন্তু কারো কারো মতে 'ব্রহ্মার আনন যত রাবণের করে'...২৪, ৮০, (৪ × ২০) কিংবা ২০৪ সংখ্যা নির্দেশক; অতএব, ১০২৪, ১০৮০ অথবা ১২০৪ বঙ্গাব্দে এ গ্রন্থ রচিত। এ থেকে যথাক্রমে ১৬১৭, ১৬৭৩ কিংবা ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দ মেলে।

নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলোর মধ্যেও যোগ ও দেহতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে :

ক. শেখ ফয়জুল্লাহর[৭০] (১৫৪৫-৭৫ খ্রীঃ) গোরক্ষবিজয়ে গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনীর মাধ্যমে যৌগিক কায়া-সাধন তথা উল্টা সাধনার মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে।

খ. মুহম্মদ আকিলের[৭১] (১৭ শতক) মুসানামায়ও সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত। এতে জীবসৃষ্টির পর্বে জীব-সম্ভব ডিম্ব নীরে ভাসমান ছিল বলে বর্ণিত হয়েছে।

গ, রজ্জাক-নন্দন আবদুল হাকিমের[৭২] (১৬ শতক) চার মোকামভেদ ও শিহাবুদ্দিন-নামা যোগ ভিত্তিক অধ্যাত্ম চর্যা গ্রন্থ।

ঘ. মোহসিন আলির[৭৩] মোকাম মঞ্জিলের কথাও একই তত্ত্বভিত্তিক গ্রন্থ।

ঙ. শেখ জেবু রচিত 'আগম' নামের একটি পুঁথি বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রয়েছে।

চ. রমজান আলির 'আদ্যব্যক্ত' একটি দোভাষী পুঁথি। এটি উনিশ-বিশ শতকে রচিত।

ছ. সিহাজুল্লাহ্ খানের যুগীকাচও দোভাষী পুঁথি এবং বিশ শতকে রচিত।

জ. মুন্সী রহিমুল্লাহর তনতেলাওতও দোভাষী পুঁথি। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গে প্রচলিত লোকগীতির অন্তর্গত যোগীর গান বা যুগীকাচের কয়েকটিও মুসলমানের রচনা।[৭৪]

উৎস নির্দেশ

১. Kashf-al-Mahjub : Osman Hujuiri : Trans : R.A. Nicholson, Chapter III on Sufism P. 40.
২. Ibid. Chapter on Sufism 31-32.
৩. Ibid. Chapter on Poverty PP. 19-25.
৪. Ibid. Chapter on Sufism : P 34.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. Arabic thought in History : O'Leary, PP 190-91,
৬. Ibid PP 186-87.
৭. Ibid PP 184 - 85.
৮. Ibid P 192
৯. Ibid P 192.
১০. Ibid PP 194-95, 201.
১১. সুরাহ্ ঃ ৩৩, আয়াত ৪১।
১২. ঐ ২, ঐ ১৪৬।
১৩. ঐ ৫১, ঐ ২০ - ২১।
১৪. ঐ ৫০, ঐ ১৫।
১৫. ঐ ২৪, ঐ ৩৫।
১৬. ঐ ৮৮, ঐ ২০।
১৭. ঐ ১৭, ঐ ৮৭।
১৮. ঐ ৭, ঐ ১৬৬।
১৯. a. Sufism : its Saints & Shrines, (Luknow 1938) - J.A. Sobhan. P 174.
b. Mohammadanism : H. A. R. Gibb (Oxford University Press 1953) Chapers VII & IX).
২০. Tasawwuf-I-Islam-Abdul Mazid (Azamgarh) P. 45.
২১. সুরাহ ঃ ২৪, আয়াত ৩৫।
২২. ঐ ঃ ৫০, ঐ ১৬।
২৩. -আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ঃ অমৃতকুণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৯ সন।
১-৪ সংখ্যা, পৃঃ ৬।
[উৎস ঃ ইবনুল আরাবী ঃ ফসুসুল হিকম, Cairo, পৃঃ ৭০-৭৮, Affifi, A.E-The mystical Philosophy of Ibnul Arabi. Legacy of Islam : পৃঃ ২২৪-২৬, মির্জা মোহসিনফানি, দবিস্তানুল মজাহিব, বোম্বাই, পৃঃ ৩০৪-০৮]
২৪. সুরাহ ঃ ৮৮, আয়াত ২১।
২৫. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪১।
২৬. উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ ঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃ ঃ ৬।
২৭. ক. History of Indian Philosophy : S. N. Dasgupta Vols I & III, PP81, 451-52.
খ. Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Philosophy, P18.
গ. Philosophy of India, P28. [দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত লোকায়তদর্শন গ্রন্থে উদ্ধৃত ঃ পৃঃ ৫১৩-১৪]
ঘ. রচনাবলী-২য় খণ্ডঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় পৃঃ ২৭৪-৮৩।
ঙ. বাংলার বাউল ও বাউল গান ঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ ঃ ১৮৬।
চ. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন (ভারত সরকার প্রকাশিত) ; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬।
২৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদর্শন ঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪, ৩৬, ৪২।
২৯. দবিরস্তান-অল মজাহিব; মোহসিন ফানি ঃ বোম্বাই সং. পৃঃ ১৪৪।
(Dr. M.R. Tarafdar কৃত Social History of Husain shahi Bengal-এ উদ্ধৃত)
৩০. ক. Bengal : Past & Present. Vol. LXVIII SL. No. 130, 1948, PP35-36.
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ পৃঃ ১৩২-৩৩।
৩১. গ. District Gazetteer—Pabna 1923, PP 121-26.
৩২. District Gazetteee—Bogra, PP 154-5.

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩. ক. Ibn Battuta-Gibb.
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব।
৩৪. ক. Hadith Literature in India (D.U)-Dr. M. Ishaq, PP 53-54.
খ. Islamic Culture: Vol. XXVII No. 1, Jan' 53, p. 10-note 9.
গ. Social History of the Muslims in Bengal Dr. A. Karim, pp 67-72.
৩৫. Ibid - P. 113
৩৬. ক. Sufism & its Saints etc. J.A. Sobhan. (1938) PP 236-37.
খ. Memoirs of Gaur & Pandua p. 92.
৩৭. ক. Bengal, Past & Present - 1948, p 36. note 13.
খ. Riyad-as-Salatin-Abdus Salam, pp 115-16.
৩৮. District Gazetteer : Hoogly : p 297 ff, pp 302-03.
৩৯. ক. JASB, 1874, p 215 ff, Risalat-al-Shuhda.
খ. বাঙালা একাডেমী পত্রিকা—ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার-১৩৬৭।
৪০. JASB, 1872, pp 106-07, 1873, p 290.
৪১. ক. Akhbar al Akhyar : p 173,
খ. Khazinat-al-Asfiya, Vol. I. p 300.
৪২. JASB, 1904, No. 2, p 104 ff.
৪৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ১৪৩-৪৪।
৪৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ৯৩-১১৯।
৪৫. বঙ্গে সূফী প্রভাব, ৯৩-১১৯।
৪৬. ক. History of Bengal, D.U. Vol. II.
খ. Social History of the Muslims in Bengal : Dr. A. Karim, PP. 52-54.
৪৭. History of Bengal, D.U. Vol II. Social History of the Muslims in Bengal L Dr. A. Karim, PP 52-56.
৪৮. বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃঃ ৭৪।
৪৯. ঐ পৃঃ ৭৫-৮০।
৫০. The Mystics of Islam : R.A. Nicholson : p 17.
৫১. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ৫৫
৫২. Ain-I-Akbari-Jarret, Vol. III. p 360ff.
৫৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ৫৫।
৫৪. Development of Metaphysics in Persia : Dr. M. Iqbal, pp 110-111.
খ. বঙ্গে সূফী প্রভাব ঃ পৃঃ ৮১; এই গ্রন্থে উদ্ধৃত ইরশাদ-ই-খালিকীয়হ-আবদুল করিম, ২য় সং, পৃঃ ১২৫-১৩৩।
৫৫. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব, পৃঃ ১৬৯-৮২।
খ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য ঃ ভূমিকা-আহমদ শরীফ।
৫৬. বঙ্গে সূফী প্রভাব ঃ পৃঃ ১৬৩-৬৪।
৫৭. ক. Sufism : its Saints and Shrines : J.A. Sobhan p. 75.
খ. Essays : Dr. HanqL p. 205.
৫৮. ক. Civilization of Eastern Iranians : Geiger, Vol. I. p. 124.
খ. Essays : Dr. Hanq. p. 205.
গ. Development of Metaphysics in Persia : Dr. MI Iqbal. pp 9-10.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৯. ক. Re-incarnation : Annie besant : p. 30.
খ. Op cit. Iqbal pp. 10-11.
৬০. Civilization of Eastern Iranians-Geiger : Vol. I.p. 104.
৬১. ক. Journal of the Pakistan Historical Society : 1953 Vol. I.p. I pp 46, 51-52.
খ. Islamic Culture : 1947, pp 190-91.
গ. Catalogue of the Persian MS. in the Library of the India office : Ethe; No. 2002.
ঘ. Social History of the Muslims in Bengal, down to 1538 A. D-Dr. A. Karim pp 6-7. 62-65. Social History of Bengal L Dr. A. Rahim pp 164-66.
চ. Brocklemann.
৬২. JASP. 1960. p 213, (Dr. A.B.M. Habibullah)
৬৩. Journal of the Pakistan Historical Society : 1953, Vol. I, pt. I pp 46 ff.
৬৪. Dabirstan-al-Majahib : Mohsen Fani Bombay edition p 144. Dr. M.R. Tarafdar. Social History of Husain Shahi Bengal-সূত্রে।
খ. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ ঃ অমৃতকুণ্ড, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৬৯ সন ১-৪ সংখ্যা, পৃঃ ১-১৬।
৬৫. History of Bengal, Vol. I, D.U.
৬৬. পুথি পরিচিতি—আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ।
৬৭. আবু মহামেদ হবিবুল্লা ঃ প্রগুক্ত, পৃঃ ৬ঃ—"মুহম্মদ আর্স-মিসৃরী নামক মিশরের ইল্‌হামিয়া সুফী ত্বরীক্বার একজন লেখক ১৫ শতকে মুসলিম অধ্যাত্মবাদের বিবরণ দিতে গিয়ে অমৃত কুণ্ডের উল্লেখ করে বলেছেন যে ভারতীয় সুফী সাধনায় যোগ হচ্ছে এক অপরিহার্য অঙ্গ।"
৬৮. গোর্খ বিজয়, ভূমিকা ঃ ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল পৃঃ জ-৩।
৬৯. ঐ উদ্ধৃত পৃঃ জ-৪।
৭০-৭৩ বিস্তৃত বিবরণের, জন্যে 'মুসলিম-বাঙলা সাহিত্য' ও বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৪ সন দ্রষ্টব্য।
৭৪. গোর্খ বিজয়, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত (১৯৫০ সন, পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ
সৈয়দ সুলতানের সঙ্গীত ও অধ্যাত্ম সাধনা

ইসলাম ও সঙ্গীত

ইসলাম পূর্বযুগে অন্য মানুষের মতো আরবেরাও ছিল সঙ্গীতপ্রিয়। আরবী ভাষায় গিনা, মুসিকী (গ্রীক)[১] এবং সামা (সিরীয়)[২] এই তিনটি শব্দ সঙ্গীত বাচক। আরবে পেশাদার গায়িকারা কইনাৎ (Qainat) কিংবা কিয়ান (Qiyan) নামে অভিহিত হত। দেশী গায়িকা ছাড়াও আবিসিনিয়া থেকে অনেক গাইয়ে মেয়ে আসত। এরা সমাজ-জীবনের অঙ্গ ছিল। ইসলাম পূর্বযুগের সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে আমরা মিযহার (Lute), মি যাফা (Psalter), কুসাবা (Flute),

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিযমার (Reed pipe) এবং ডাফ (Tambourine) সুর, নাকাড়া, তবলা (অতবল), সঞ্জ, জলাজিল প্রভৃতির নাম পাই। মক্কার উকায়-এ যে-বার্ষিক মেলা হত, তাতে গোটা আরবের গোত্রগুলো জড়ো হত নিজেদের শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখাবার জন্যে। মুয়াল্লাকাগুলো এখানেই গীত বা আবৃত্ত হত। তখনকার আরবে যাদুকর এবং গণকরাও তাদের পেশা চালাত গানের মাধ্যমেই। হজ উদযাপনের সময়ও গান চলত, তার রেশ রয়েছে তাহ্‌লিল ও তালরিয়ায়।[৩] 'আসবিক সবির কয়মা নুম্বির' এই আয়াত এখানো সুর করেই পড়া হয় মীনায় ইফাদা করবার সময়।[৪] আযানও ইসলাম পূর্বযুগের প্রথার অনুসরণ।[৫] নারী পর্দাপ্রথা চালু না থাকায় রসুলের আমলেও নারীরা উৎসবে, পার্বণে, যুদ্ধে, গানে-বাজনায় অংশ গ্রহণ করত। ওহুদের যুদ্ধেও নাকি রণগীতি গেয়েছিল নারীরাই।[৬]

দেবতা ও উপদেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্যেও গায়িকার গানই কার্যকর বলে মনে করা হত। এজন্যে তাদের অপর নাম ছিল দজিনা (Dajina) বা মদজিনা (Madjina)। তাই ইসলাম পূর্বযুগের আরবে নারীর প্রভাব সম্বন্ধে R.A. Nicholson বলেছেন, 'Wise women inspired the poets to sing and warriors to fight.'[৭]

কাফেলায় কিংবা সরাইখানাতেও গায়িকা পোষা হত।[৮] আবুল ফারাজ ইসফাহানীর কিতাবুল আগানি, ইবন আবদুববিবহির (মৃত্যুঃ ৯৪০ খ্রী.) ইকদুল ফরিদ, ভৌগোলিক আল মাসুদীর 'কিতাবুৎ আতরিহ ওয়াল ইশরাফ' প্রভৃতি পুরোনো গ্রন্থে এবং কোরআনে হাদিসে নানা প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রখ্যাত গায়কের নাম আমরা জানতে পাই। নাদির বিন হারিস[৯] , মালিক বিন যোবায়ের,[১০] হরায়রা,[১১] খুলায়দা,[১২] বিলাল হাব্সী,[১৩] শিরিন, সারা, কুরায়না, কুরিল্যা, আমর হামজা প্রভৃতি।

আমরা ইসলাম পূর্বযুগের আরবে উৎসবে-পার্বণে-হজে, অনাবৃষ্টিতে-অজন্মায়-দুর্ভিক্ষে, দেবতার আবাহনে, যুদ্ধে, যাদুতে ও ভাগ্যগণনায় গানের প্রয়োগ দেখেছি। তা'ছাড়া প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দের উপকরণ হিসেবে শুঁড়িখানায়, সরাইতে ও কাফেলায় পেশাদার গায়িকা পোষার রীতিও ছিল অবাধ। এসব গায়িকার সবাই আরব ছিল না, আবিসিনিয়া, গ্রীস ও ইরান থেকেও আসত।[১৪] এমনকি রসুলের আমলের যুদ্ধে ড্রামবাদক ছিলেন একজন ভারতীয়, তাঁর নাম বাবা Sawandik।[১৫]

এতে বোঝা যায়, আরবেরা সঙ্গীতপ্রিয় জাতি। কাজেই ইসলামোত্তর যুগে সঙ্গীত বিমুখ হওয়া তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনার মতোই দুষ্কর ঠেকেছিল। ফলে প্রবৃত্তির প্রতিকূল সংগ্রামে তারাও বেশিদিন আত্মরক্ষা করতে পারেনি। অবশ্যম্ভাবী রূপে শুরু হল খোঁজাখুঁজি ও ব্যাখ্যা-নিরীক্ষা কোরআন-হাদিসের সমর্থন লাভের আশায়। এবং অভীষ্ট ফল লাভে দেরি হল না।

কোরআন থেকেই সঙ্গীতে নানা আয়াতের অনুমোদন বা অনুমোদনের আভাস-ইঙ্গিত বের করা হল :

ক. নিশ্চয়ই গাধার ডাকই সবচেয়ে ঘৃণ্য স্বর।[১৬]

খ. তিনি ইচ্ছেমতো তাঁর সৃষ্টিতে বৃদ্ধি করেন সুন্দর স্বর।[১৭]

গ. এবং কোরআন আকর্ষণীয় করে পড়ো।[১৮]

এমনি আরো অনেক আয়াত থেকে পরোক্ষ ইঙ্গিত[১৯] সংগ্রহ করে সঙ্গীতের সমর্থনে ভাষ্য তৈরি হয়েছে। আবার একই পদ্ধতিতে সঙ্গীত বিরোধী তথ্যও উদ্ধার করেছে সঙ্গীত বিমুখ গোঁড়ারা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ২ ॥

সুফীরা প্রেম ধর্মে বিশ্বাসী। কিতাব উল লুম্বায় আবু নসর সারাজ এবং 'এহিয়া উল্ উলুম' ও 'কিমিয়া-ই-সাদত' গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম গাজ্জালী সঙ্গীতের তাত্ত্বিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। আচার বাদীদের কাছে যা গর্হিত মরমীয়াদের কাছে তা-ই কাম্য। এখানেই যাহের ও বাতেনের পার্থক্য। ফাসেকী ও সাদেকী তত্ত্বের উদ্ভব। অতএব তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সঙ্গীতে মানব-মনের একটি মহত্তর প্রকাশ স্বীকৃত হয়।

গাজ্জালীর মতে (কিমিয়া)[২০] সঙ্গীত হচ্ছে পাষাণে নিহিত সুপ্ত আগুনের মত। ঘর্ষণে শিলা থেকে যেমন আগুন বের হয়, এবং তা গোটা অরণ্য দগ্ধ করে, তেমনি সঙ্গীতের স্পর্শে আত্মার আগুন জ্বলে ওঠে। সোনা যেমন আগুনে পুড়ে বিশুদ্ধ ও রূপবান হয়, তেমনি হৃদয়কে সঙ্গীতের আগুন মুকুরে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় জগতের সৌন্দর্য। এ সৌন্দর্যের রূপভেদে তাত্ত্বিক নাম জমাল, হুসন ও তনাসুব। সঙ্গীত সৌন্দর্যকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নেয়। তাঁর মতে নিঃসঙ্গতায় মানুষ বাঁচতে পারে না। সে সঙ্গী খোঁজে। যাকে ভালবাসে তাকেই সে পেতে চায় সঙ্গীরূপে। কাজেই প্রেম বা মহব্বত করার জন্যে আল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছুই নেই। যাঁকে পেলে আর কিছুই পাবার থাকে না, একের মধ্যে সবকিছুই মেলে, সব অভাব মেটে, তাঁর সঙ্গেই তো প্রেম করার, তাঁকেই সাথী হিসেবে পাওয়ার কামনা করা উচিত। বিশেষ করে, আল্লাহও মানুষের প্রেমকামী।

ক. আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, তারা আল্লাহকে ভালবাসবে।[২১]

খ. আল্লাহপ্রেম, পিতামাতা, সন্তান ও ভ্রাতৃপ্রেমের চেয়ে বেশি।[২২]

গ. রসূলও বলেন : যে তার আর সব সম্পদের চেয়ে বেশি করে আল্লাহ ও রসূলকে ভালবাসতে না পারে, সে ধার্মিক নয়।

শরীয়তপন্থীদের মত সূফীরাও সঙ্গীতে অধিকারী-ভেদ মানে। তাই আবু নসর সারাজ যোগ্যতানুসারে শ্রোতাকে তিন শ্রেণীতে[২৩] ভাগ করেছেন :

ক. মুবতদী ও মুরীদ (Beginners and disciples)

খ. মুতওয়াস্সিত্ ও সিদ্দিকী (Advanced and Purists)

গ. আরেফিন (Mystics)

জুনাইদ বাগদাদীও স্থান (Makan), কাল (Zaman) ও পাত্র বা সঙ্গকে সঙ্গীত শ্রবণের ঔচিত্য ও অনৌচিত্য বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ (Akhwan) করেছেন।[২৪] হুজুইরীরও এই মত। তিনিও আমোদের জন্যে নয়, অধ্যাত্মচিন্তা উদ্রেক করার উদ্দেশ্যে গীত বা শ্রুত সঙ্গীতই বৈধ বা বাঞ্ছনীয় বলেছেন।

যদিও হযরত আয়েশা প্রমুখের দোহাই ও নজির দিয়ে সঙ্গীতকে বৈধ করে নেবার প্রয়াস ইসলামের উন্মেষ যুগ থেকেই শুরু হয়েছে, তবু বৈধ বলার চেয়ে অবৈধ বলার পক্ষে তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি যে বেশি, তা কেউ সহজে অস্বীকার করে না। আয়েশা-সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় ঈদের দিনে, বিবাহোৎসবে এবং অন্যদিনে নির্দোষ সঙ্গীত গীত ও শ্রুত হতে পারে। আর অধ্যাত্ম সাধনার বাহন হিসেবে সঙ্গীতের উপযোগে আন্তরিক বিশ্বাস রেখে কেউ যদি সঙ্গীত চর্চা করে কিংবা সঙ্গীতকে চর্চা হিসেবে গ্রহণ করে তা'হলে তার পক্ষে সঙ্গীত অবৈধ হতে পারে না। এমনি সব বিশ্লেষণ ও বিবেচনার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজে সঙ্গীত বৈধ হয়েছে।

অবশ্য পাপ বলে জেনেও যেমন মানুষ লোভের বশে আর দশটা অপকর্ম করে, মুসলমানেরাও তেমনি মানুষ হিসেবে ফাসেকী জেনেও সঙ্গীতকে পরিহার করতে পারেনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোনা যায়, বাদশাহ কুতুবউদ্দিন আইবক সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। ফলে তাঁর আমলে রাজ্যের জনগণও সঙ্গীতানুরাগী হয়ে ওঠে। ইলতুতমিসের সময় গোঁড়া মুসলিমরা রাজকীয় হুকুমে সঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেয়ার জন্যে ইলতুতমিসকে অনুরোধ করে। ইলতুতমিস কুতুবউদ্দীনের প্রতি শ্রদ্ধাবশে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করাই স্থির করলেন। ফলে মুসলিম শাসনের গোড়া থেকেই ভারতে সঙ্গীত মুসলিম সমাজে প্রশ্রয় পায়।[২৫]

পাক-ভারতে চিশতিয়ারাই মনে-প্রাণে সঙ্গীতকে সাধন-ভজন ও বোধনের মাধ্যম করেছিলেন। খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (১১৪২-১২৩৮) সুলতান মুহম্মদ ঘোরীর বাহিনীর সঙ্গে ১১৯২ সনে ভারতে আসেন এবং হিন্দুতীর্থ পুষ্করের কাছে আজমীরে খানকা তৈরি করেন।

॥ ৩ ॥

ভারতের এক বৃহত্তর অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তর ভারতে এই চিশতিয়ারাই ইসলাম প্রচার করেন। ইসলামের আলোদানকারী বলে তাঁদের প্রধানরা চেরাগী বলে অভিহিত হন। এঁদের মধ্যে কুতুবউদ্দিন দেহলবী, ফরিদুদ্দীন শকরগঞ্জী, জালালুদ্দীন পানিপথী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া বলখী (প্রকৃত নাম মুহম্মদ বিন আহমদ বিন দাখিয়াল অল বোখারী), মুহম্মদ সাদিক গুনগুবী ও শেখ সলিম ফতেপুরীর মাহাত্ম্য আজো অম্লান। আমীর খুসরুও বুজুর্গ বলে খ্যাত। এঁরা সবাই সঙ্গীতকে সাধনার অবলম্বন করেছিলেন। এবং হিন্দুরও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন এঁরা। 'গঞ্জ চিস্তিয়া' গ্রন্থে সঙ্গীতানুরাগ ও সঙ্গীত সম্বন্ধে এঁদের ধারণার আলোচনা রয়েছে। শিহাবুদ্দীন সোহরওয়ার্দী বলতেন, যারা সঙ্গীতের বিরোধিতা করে তারা রসুলের ও সাহাবীদের জীবন ও আচার সম্বন্ধে অজ্ঞ। তিনি তাঁর সন্তানকে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিত করতেন।[২৬]

Ya bunayya la tankir-i.'s sama
fa innaha lahwa wala ib.

|বৎস, সঙ্গীত পরিহার করো না, কারণ বহু মহাপুরুষ তা চর্চা করেছেন।|সূফীদের মতে সঙ্গীত অধ্যাত্মসাধনায় সিদ্ধি ত্বরান্বিত করে। ইকদুল ফরিদ বলেন সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মধ্যে আমি আমার দয়িতকে (আল্লাহকে) সমগ্র সত্তা দিয়ে দেখি।[২৮]

আবুল কাসিম অল বঘবী (Baghwi) বলেন : 'সঙ্গীত আত্মার (Spirit) খাদ্য। আত্মা যখন খাদ্য পায়, তখন সে দেহের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থ হয়।'[২৯]

জালালউদ্দিন রুমীও বলেন, আগার আজ বুর্জি মানি বুয়াদ সায়ের-ই-উ ফিরিশতাহ্ ফিরুমোনাদ আজ তায়ের-ই-উ[৩০]

(If the musician soars up to the pinnacle of ecstasy, the angel cannot follow in pursuit to him)

চিশতিয়া, সোহরওয়ার্দিয়া, কলন্দরিয়া, মদারিয়া, কাদিরিয়া এবং মখদুমিয়া সূফীদের দান বাঙলাদেশে ইসলাম বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ। আশরাফ জাহাঁগীর তাঁর একটি চিঠিতে সগর্বে লিখেছেন :

> In the blessed land of Bengali, there is hardly a village or town where a muslim sufi is not to be found and the innumerable graves of the muslim mystics which dot the country are a silent testimony to their self-denying devotion to their ideal.[31]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জালালউদ্দিন তাবরেজী সম্বন্ধে Siyar-ul-Arifin (p171) গ্রন্থে আছে :

> Shaikhul Mashaikh Jalaluddin Tabrezi went to Bengal. All the people of that (place) turned towards him and became his disciples. The Shaikh established a Khanqah there and started a free kitchen etc.

চিশতি সূফীদের মধ্যে সিরাজুদ্দিন উসমান ওর্ফে আখি সিরাজ তাঁর সাগরেদ আলাউল হক, তাঁর সন্তান নূর-কুতুব-ই-আলম, তাঁর শিষ্য শেখ হুসামুদ্দিন মানিকপুরী (কারা মানিকপুরের) বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠাবান ছিলেন। নূর কুতুব-ই-আলম ওয়াহাদাৎ-উল ওজুদ বিষয়ক পত্রের আলোকে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণব ধর্মের বিশ্লেষণ করলে এতে সূফী প্রভাবের আভাস পাওয়া যাবে।[৩২]

শরীয়তী ইসলাম আর পাক-ভারতে সূফী-দরবেশ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম এক নয়। কাজেই সূফী-দীক্ষিত মুসলমানেরা পাক-ভারতে অবাধে সঙ্গীত চর্চার সুযোগ পায়। বিশেষ করে চিশতিয়া খান্দানে তো সঙ্গীতের মাধ্যমেই সাধন-ভজন শুরু হয়। পরে কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রায় সব মরমীয়া সম্প্রদায়েই সামা, হাল্কা ও দারা সাধনার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়। সিন্ধুর লতিফ শাহ, পাঞ্জাবের বুলেহ শাহ, আজমীরের খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি, দিল্লীর নিযামউদ্দীন আউলিয়া, আমীর খুসরু এবং সূফী শেখ বাহাউদ্দীন, শের মোহাম্মদ ও মিয়া দলু, সাচল, বেদিল, রোহল, কুতুব, যারী, দরিয়া থেকে বাঙলার লালনশাহ ও আহমদুল্লাহ শাহ প্রভৃতি সবাই সঙ্গীতকে সাধনার উপায় রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের দরগায় আজো সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। কাজেই পাক-ভারতে মুসলমানদের সঙ্গীত চর্চা কলা-বিলাস মাত্র নয়, জীবনচর্যার তথা ধর্মাচরণের বাহন। ফলে সঙ্গীত সমাজে নতুন মহিমায় ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। কেবল তা-ই নয়, কবীর, দাদু, রজ্জব প্রমুখ দেশী মরমীয়ারাও সঙ্গীতকেই প্রচারের ও ভজনের বাহন করেছেন। আদি সূফী দরবেশদের মধ্যে কেবল খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি কিংবা বাহাউদ্দীন জাকারিয়া কোরাইশী মুলতানীই যে সঙ্গীতবিদ ও সঙ্গীত সাধক ছিলেন, তা নয়, আরো অনেক অখ্যাত দরবেশ ও তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য সঙ্গীতানুশীলন জনপ্রিয় করে তোলেন। হযরত বাহাউদ্দীন জাকারিয়া রাগ-রাগিণীরও স্রষ্টা।[৩৩]

AMARBOI.COM

কবীর যেমন সূফী ও ভারতিক মরমীয়া ধারার সমন্বয় সাধক,[৩৪] তেমনি আমীর খুসরুই মুসলিম (আরব্য-পারসিক তুর্কী) ও ভারতিক সঙ্গীতের মিশ্র ধারার আদি প্রবর্তক।[৩৫] এখন থেকেই পাক-ভারতে সঙ্গীতের সোনার যুগ শুরু হল।

ইসলামের উদ্ভবের মাত্র কয়েক বছর পরেই উম্মাইয়াদের[৩৬] আমলে মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা শুরু হয়। অবশ্য ইসলামেও স্বর-মাধুর্যে মর্যাদা আরোপিত হয়েছে। নামাজে শিরিন সুরে কেরাত পড়ার সামর্থ্য ইমামের অন্যতম যোগ্যতা বলে স্বীকৃত। কিন্তু তবু গোঁড়া শরীয়তী কোনো কালেই সঙ্গীতকে সুনজরে দেখেনি। তা সত্ত্বেও এর সর্বগ্রাসী মায়াবী প্রভাব থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয়নি অনেকের পক্ষেই। তাই গোঁড়া মুসলিম সুলতান সিকান্দর লোদী কিংবা নিষ্ঠাবান গোঁড়া শরীয়তপন্থী সম্রাট আওরঙজীবও প্রথম জীবনে সঙ্গীতবিমুখ হতে পারেননি। পরে ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে শাফী মজাহাবী হয়ে আওরঙজীব সঙ্গীত বিরোধী হলেন।[৩৭]

॥ ৪ ॥

বাঙালী মুসলমানেরাও যে সঙ্গীতকে অপার্থিব উৎকণ্ঠার তথা অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন করেছিলেন, তা চিশতিয়া, কাদিরিয়া, কলন্দরিয়া প্রভাবের প্রমাণ ছাড়াও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো শতকের কবি আলি রজার জবানীতে পাচ্ছি :

আলি হোন্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহ সব শান্ত হৈতে মন
রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
সর্বদুঃখ দূর হয় গীত যন্ত্র রাএ
গীত যন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ।
গীত যন্ত্র মহামন্ত্র বৈরাগীর কাম
রাগযন্ত্র মহামন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যথ আছে ভুবন ভিতর
সর্বঘটে যন্ত্র বাজে গীতের সুস্বর।
ঘটে গুপ্ত যন্ত্র গীত যোগিগণে বুঝে
তেকারণে সর্বজীবে সে সবারে পূজে।
গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তার মেলে।
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে
গীতরসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজন কবিও বলেন :

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার
রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তন মধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন-বেশী করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি
ছয় ঋত তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি।...
রাগঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেত বসিয়া দেখ ঘটে সর্বরূপ।

বাঙালী মুসলিম সমাজে সঙ্গীত চর্চা যে সূফী প্রভাবেরই ফল, আমাদের সে-অনুমান উক্ত চরণ কয়টির দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল। সৈয়দ সুলতান সূফী সাধক ও পীর। তাঁর সঙ্গীত প্রীতি সাধনার অনুগত। আর তত্ত্ব সঙ্গীত রচনার প্রেরণাও তিনি সাধন-সূত্রেই পেয়েছেন। আগেই বলেছি বাঙালী মুসলিম মরমীয়ারা যে-সাধন পন্থ গ্রহণ করেছেন, তা মূলত ইসলামী নয়। ভারতিক সূফীমতবাদও একান্তভাবে আরব-ইরানী নয়। এর অবয়বে যেমন ভারতিক প্রভাব পড়েছে, বাঙালী মরমীয়াদের দর্শনে, ধর্মে ও আচারে প্রচুর দেশজ তথা ভারতিক উপাদান রয়েছে। কাজেই এদেশে হিন্দু মুসলমান চিরকাল হাতে হাত মিলিয়ে ও মনে মন মিশিয়ে অধ্যাত্ম সাধনা করেছে। এভাবেই বাঙলা দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সাধনায় মরমীয়াদের উপমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি, মুসলিম অধিকারের পূর্বে ও পরে ভারতে যাঁরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন, তাঁরা সবাই সূফী ছিলেন। এই মরমীয়াদের অনেকেরই সঙ্গে শরীয়তের বাহ্যানুষ্ঠানের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। অথচ সাধারণের পক্ষে ধর্ম আচারিক ও আনুষ্ঠানিক না হলে ধর্মাচরণ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। ফলে মুসলমানেরা তাদের চারপাশেই অবলম্বন খুঁজেছে। এভাবেই তাদের তত্ত্ব দর্শনে পীরপূজা ও দেহচর্যা মুখ্য হয়ে উঠেছে, তাদের তত্ত্ব প্রকাশের মাধ্যম হয়েছে ভারতিক রূপকল্প। আরাধ্যের প্রতীক হলেন রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ, এমনকি কালীও।[৩৮]

॥ ৫ ॥

মরমীয়াদের মতে, সৃষ্টি হচ্ছে স্রষ্টার আনন্দ সহচর। কাজেই মানুষের সঙ্গে আল্লাহর বান্দা-মনিব সম্পর্ক হতে পারে না। হতে পারে না পিতা-পুত্রের কিংবা ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ। মানুষের সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্বের প্রণয়ের। যেখানে প্রণয় আছে, সেখানে গতিবিধি অবাধ হওয়াই স্বাভাবিক। কোনো নিয়ম-নীতির বাধা সেখানে অবাঞ্ছিত নয় শুধু, অসম্ভবও। কাজেই নামাজ-রোজার বা এই প্রকার আনুগত্যের প্রশ্নই অবান্তর। ফলে শরীয়ৎ সেখানে নিরর্থক। অনুরাগে প্রণয়ের উন্মেষ, বিরহবোধে উপলব্ধি এবং মিলনে এর সার্থকতা। প্রেমিক প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে, পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম। জীবাত্মা হচ্ছে পরমাত্মার খণ্ডিতাংশ। স্বরূপত খণ্ডের অখণ্ডে বিলীন হওয়ার আকুলতার নামই প্রেম।

গরজ খণ্ডের তথা জীবাত্মার, তাই সে প্রেমিক, তাই সে রাধা। পরমাত্মারও গরজ আছে। যেমন সমুদ্রও বারিবিন্দুর সমষ্টি মাত্র। বারিবিন্দু নিয়েই তার অস্তিত্ব। কিন্তু কোনো বিশেষ বিন্দুর জন্যে তার বিশেষ আকুলতা নেই। এজন্যেই জীবাত্মা সদা উদ্বিগ্ন, পাছে সে বাদ পড়ে। তাই রাধা বলে, 'এই ভয় ওঠে মনে, এই ভয় উঠে, না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি টুটে।' প্রেমের পরিণতি একাত্মতায়, যখন বলা চলে আনল হক কিংবা সোহম। এ অবস্থাটা সূফীর ভাষায় ফানাফিল্লাহ অথবা বাকাবিল্লাহ আর বৈষ্ণবের কথায় যুগল রূপ বা অভেদ রূপ। এ দুটোতে সূক্ষ্ম দার্শনিক তাৎপর্যের প্রভেদ আছে। তবে অবস্থা ও অভিপ্রায় মূলত একই।

'কুনফায়াকুন' দ্বৈতবাদের পরিচায়ক। আর একোহম বহুস্যাম অদ্বৈতবাদ নির্দেশক। সূফীরা মুসলমান, তাই দ্বৈতবাদী, কিন্তু অদ্বৈত সত্তার অভিলাষী বৈষ্ণবগণ ব্রহ্মবাদের প্রচ্ছায়ায় গড়া, তবু তাদের সাধনা চলে দ্বৈতবাধে এবং পরিণামে অদ্বৈত সত্তার প্রয়াসে। সূফী ও বৈষ্ণব উভয়েই পরমের কাঙাল। মানবাত্মার সুপ্ত বিরহবোধের উদ্বোধনই সূফী বৈষ্ণবের প্রধান কাজ। কেননা, রুমীর ভাষায় :

দানা চুঁ অন্দর জমিন পেনহা শওয়াদ
বাদ আজাঁ সারে সবজি বস্তা শাওয়াদ।

জীবাত্মা তখন বাঁশীর মতো বলে : বশোনো আজনায়েচুঁ কোয়েত মিকুনদ...।

জ্ঞানদাসও বলেন : 'অন্তরে অন্তর কাঁদে কিবা করে প্রাণ' অথবা 'পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে।'

রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন :

বিরহানলে জ্বালোরে তারে জ্বালো
রয়েছে দীপ না আছে শিখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই কি ভালে ছিল রে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।

এ জন্যে সূফীগানে ও বৈষ্ণবপদে আমরা মিলনপিপাসু বিরহী আত্মার করুণ কান্না শুনতে পাই। সূফীগজল ও বৈষ্ণবপদ মানবাত্মার চিরন্তন Tragedy-এর সুর ও বাণী বহন করছে। তার বেদনার অন্ত নেই। কেননা, সর্বক্ষণ 'চিত্তকাড়া কালার বাঁশি লাগিছে অন্তরে,' সে কারণেই চিরকাল 'কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে'।

এই প্রেমধর্মের আর একটি দিক হচ্ছে আত্মতত্ত্ব। কেননা, আত্মা এই প্রেমের এক পক্ষ তথা প্রেমিক। আর আত্মা পরমাত্মার অংশ তো বটেই। তাই সক্রেটিসের Knoweth thyself, উপনিষদের 'আত্মানাং বিদ্ধি,' হাদিস বলে অভিহিত ইসলামের 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাববাহু' কিংবা উপনিষদের 'তংবেদ্য পুরুষৎ বেদমা বো মৃত্যু পরিব্যথাঃ '—এই আত্মতত্ত্বের ভিত্তি ও লক্ষ্য দুই-ই। মুসলিম মরমীয়া কবিদের রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক গ্রহণের কয়েকটি কারণ অনুমান করেছেন অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।[৩৮] তার মধ্যে তিনটি প্রধান–ক. দেশজ মুসলমান পূর্বসংস্কার বশে চৈতন্যের প্রেমধর্ম প্রচার কালে রাধাকৃষ্ণ লীলারসে মুগ্ধ হয়ে নিজেরাও পদ রচনা করেছেন। খ. রেওয়াজের প্রভাবে রাধাকৃষ্ণের রূপকে পদ রচিত হয়েছে বটে, তবে কৃষ্ণ অনেক মুসলমান কবির কাছে অপৌরুষেয়। এবং 'কানু ছাড়া গীত নেই' যুগের নৈর্ব্যক্তিক নাগর কানাইরূপে লৌকিক প্রেমের নায়ক হয়েছেন। গ. আর সূফী মতের মুসলমানরা ভাব-সাদৃশ্য বশে জীবাত্মা-পরমাত্মাসূচক জনপ্রিয় দেশী রূপক হিসেবে রাধাকৃষ্ণের শরণ নিয়েছেন।

সৈয়দ সুলতান শেষোক্ত কারণেই রাধা-কৃষ্ণ রূপকে পদ রচনা করেছেন। সূফী হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের মনে রাধা-কৃষ্ণের রাস, মৈথুন প্রভৃতির কল্পনা প্রশ্রয় পাওয়ার কথা নয়। তাই তাঁরা রূপ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্ক সূচক ও ব্যঞ্জক বলে গ্রহণ করতে পারলেও বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতির সঙ্গে তাঁদের অধ্যাত্মতত্ত্বের মিল খুঁজে পাননি। সেজন্যে মুসলমানের লেখায় ওসব শ্রেণীর পদ সাধারণত পাওয়া যায় না। তাঁদের রচনায় অনুরাগ ও বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই বিশেষরূপে প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে, এটিই রূপ, সৃষ্টি বৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্ক বোধ জন্মে, এটিই অনুরাগ, এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে, এটিই বংশী, আর সাধনার আদি স্তরে পাওয়া না পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে, তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে আত্মসমর্পণ ব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয়, এটিই অভিসার। এর পরে সাধনায় এগিয়ে গেলে অধ্যাত্ম স্বস্তি আসে, তা-ই মিলন। মিলনে আত্মসমর্পণের আকুলতা প্রশমিত হয়, তা-ই ফানাবিল্লাহ। এরও পরে চরম আকাঙ্ক্ষা–একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা, যার নাম বাকাফিল্লাহ, এ-ই বিরহ। মৃত্যুর আগে সাধারণের পরম মিলন নেই, সেজন্যেই বাকাবিল্লাহ সূচক পদের অভাব। কেউ কেউ সে দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁরাই বাকাবিল্লাহ হন আর বলেন 'আনল হক' বা ' সোহম', যেমন মনসুর, বায়যিদ ও আদহাম বলেছেন।

এজন্যেই মুসলিম রচিত পদ রাগানুগ নয়। শশিভূষণ দাশগুপ্তও তাই বলেন :

> একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালার মুসলমান কবিগণ রাধা-কৃষ্ণকে লইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা কোন বিধিবদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় রচিত নহে। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈষ্ণবমতে রাধাকৃষ্ণের যত লীলা তাহার ভিতর মানুষের কোন স্থান নেই।... শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন বাসনাও বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ।... কিন্তু অন্যরূপ পরিণতির সম্ভাবনা দেখা দিল মুসলমান কবিগণের ভিতরে, কারণ তাঁহারা চৈতন্য প্রবর্তিত একটি সাধারণ প্রেম ধর্মের প্রভাব সামাজিক উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিলেন, একটা সাহিত্যিক বিষয়বস্তু এবং প্রকাশভঙ্গিও উত্তরাধিকার সূত্রেই পাইলেন. কিন্তু পাইলেন না রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধে কোন স্থিরবদ্ধ ভাবদৃষ্টি। সুতরাং বাঙ্গালার জনসমাজে যে সাধারণ ভক্তিধর্ম ও যোগধর্ম প্রচলিত ছিল, এই সকল কবিগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে সেই সকলের সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইলেন। বাঙ্গালা দেশের প্রেমপন্থী মুসলমান সাধকগণ অল্পবিস্তর সকলেই সূফীপন্থী। সূফীমতে প্রেমই হইল ভগবানের পরম স্বরূপ, প্রেমের দ্বারাই আবার এই জগৎ সৃষ্টি। নিজের অনন্ত প্রেম আস্বাদনের জন্যই এক পরম স্বরূপের বহুরূপে লীলা, ইহাই হইল সৃষ্টির তাৎপর্য। জীব হইল এই 'এক'-এর সৃষ্টিলীলার প্রধান শরিক লীলা দোসর।... সূফী প্রেমধর্ম এবং বাঙ্গালার প্রেমধর্ম জনগণের মধ্যে যে একটি জনপ্রিয় সহজ সমন্বয় লাভ করিয়াছে, বাঙ্গালাদেশের মুসলমান কবিগণ সেই সমন্বয়জাত প্রেমধর্মের আদর্শের সহিত রাধাকৃষ্ণকে অনেক স্থলে মিলাইয়া লইয়াছেন। ফলে, রাধার যে পূর্বরাগ অনুরাগ বিরহের আর্তি, তাহা কবিগণের জ্ঞাতে অজ্ঞাতে পরম দয়িতের জন্য নিখিল প্রেম সাধকগণের পূর্ববার বিরহের আর্তিতেই পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং সেই আর্তির ক্ষেত্রে কবি নিজেকে শুধু দর্শক বা আস্বাদক রূপে খানিকটা দূরে সরাইয়া লন নাই, নিখিল আর্তির সহিত নিজের চিত্তের আর্তিকেও বিলাইয়া দিয়েছেন। ইহারই ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণের ভাবদৃষ্টি অনেক স্থানে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুসলমান কবিগণের রচিত রাধাকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় ভণিতা লক্ষ্য করিলেই এই কবিগণের মূল ভাবদৃষ্টির ইঙ্গিত পাইব।[৪০]

উত্তর ভারতীয় সাধক কবিগণও রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণকে এমনি ভাবদৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, এবং নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করেছেন। দাদু, দরিয়া রজব, শেখ কাইম, এয়ারী, মইজুদ্দীন, আফসোস প্রমুখ কবির পদাবলী এ সাক্ষ্যই বহন করে।[৪১]

বাংলাদেশে রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতীক যেমন হয়েছেন, তেমনি দেহ ও আত্মা—ভক্ত ও ভগবানের রূপক হিসেবেও তাঁদের পাই। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে বাউল সাধনায় দেহতাত্ত্বিক তাৎপর্যেও রাধাকৃষ্ণ চিহ্নিত। অবশ্য দেহতত্ত্বের প্রতীকী প্রকাশে রাধা-কৃষ্ণ তন-মনের প্রতিনিধিত্বে সীমিত থাকেননি, তন-মনের অস্থির ও বিভ্রান্তিকর রূপকল্প হয়েছেন। একেতো সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা ধর্মান্তরিত ভারতীয়দের বংশধর, তাদের রক্তের সংস্কারে ভারতিক প্রভাব বিদ্যমান, তার উপর ইসলামের একটি বিশিষ্ট শাখা সূফীমতবাদ ভারতে প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং মুসলমানদের মন, ইন্দ্রিয়, আত্মা ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ভারতিক ভক্তিবাদ তাদের সহজেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল। তাই বাঙালী কবি শাহনূরের কথায় মুসলমানদের রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গ্রহণের সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই :

সৈয়দ শাহ নুরে কয় রাধাকানু চিন হয়
রাধাকানু আপনার তনে রে।

আরো স্পষ্ট হয় যখন শুনি :

তন রাধা মন কানু শাহ নুরে বলে।

অথবা : সৈয়দ শাহ নুরে কয় ভব কূলে আসি।
রাধার মন্দিরে কানু আছিলা পরবাসী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা, উসমানের কথায় :

রাধা-কানু এক ঘরে কেহ নহে ভিন
রাধার নামে বাদাম দিয়া চালায় রাত্রিদিন।
কানুরাধা এক ঘরে সদায় করে বাস
চলিয়া যাইবা নিঠুর রাধা কানু হইবা নাশ।

সৈয়দ মর্তুজাও বলেন :

আনন্দমোহন মওলা খেলাএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি
সৈয়দ মর্তুজা কহে, সখি, মওলা গোপতের চিন
পুরান পিরীতি খানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে স্মর্তব্য :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যান্যে বিলাসয় রসাস্বাদন করি।

বিকৃত বৈষ্ণব সাধক বাঙলার বাউল ও অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের অনেকগুলোই রাধাকৃষ্ণের রূপকে দেহতত্ত্ব তথা জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যভেদে প্রয়াসী।

॥ ৬ ॥

আজ অবধি সৈয়দ সুলতানের তেরোটি পদ পাওয়া গেছে।[৪২] তার মধ্যে বাৎসল্য রসাত্মক বিরহের একটি পদ পরবর্তী বিকৃতির ফলে মিলন এর পদে পরিণত হয়েছে।[৪৩] অতএব পদসংখ্যা বারোয় দাঁড়ায়। এর মধ্যেও আবার একটি পদ সৈয়দ মর্তুজার ভণিতায়ও মিলে।[৪৪] আর দুটো পদও মূলত একই পদের সামান্য রূপান্তরে দুটো হয়েছে। অতএব, আসলে তাঁর দশটি কিংবা এগারোটি পদই মিলেছে। সৈয়দ সুলতান যোগ-নির্ভর সাধনায়[৪৫] অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই জ্ঞান-প্রদীপ গ্রন্থ রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাঁর নবীবংশেও যোগের কথা এবং পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণ নামাঙ্কিত দেহতত্ত্বমূলক জীবাত্মা ও পরমাত্মা প্রসঙ্গযুক্ত কবিতাই বেশি পাই। তাঁর কোনো কোনো পদ বাউল গান থেকে অভিন্ন। কোনো কোনো পদে উপমা উৎপ্রেক্ষার অনবরত প্রয়োগে দেহতত্ত্ব উদ্ঘাটিত। একটি পদে আল্লাহর স্বরূপ চিত্রিত। অন্যান্য পদে জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মবোধন ও পরলোকচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে।

সৈয়দ সুলতানের মননে ও অভিজ্ঞতায় আল্লাহর স্বরূপ :

কত কত মোহন মোহনি জান। ধ্রু
কুটিল কুন্তলফান্দ বেড়িয়াছে মুখচান্দ
গোপীগণের বাঝাইতে আশ
যেহেন নির্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি
দেখা দিলে তিমির বিনাশ।
সুগন্ধি তিমির কেশ রহিয়াছে মোহাবেশ
মুখচান্দ রহিয়াছে ছাপাএ
একেবারে অনুপাম নিশিদিশি একি ঠাম
লক্ষিবারে লক্ষ্যণ না যাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্ন ভিন
এ চান্দ সুরুজ নহে তাত
সৈয়দ সুলতান কহুঁ সেই যে আমার পুহুঁ
দেখা না দে সবার বিদিত।

—আল্লাহ লীলাময়। তিনি কুটিল কুন্তল রূপ লীলারহস্যে (তথা আপাত-বিরোধী সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সৃজন করে) অন্তরাল তৈরি করে তাঁর স্বরূপ ঢেকে রেখেছেন, গোপীরূপী কৌতূহলী মানবকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করাই উদ্দেশ্য। তিনি মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো। এই রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হলে নির্মল শশীর মতো তাঁর স্বরূপ জানা যাবে। তাঁর সৃষ্টিলীলারূপ সুগন্ধকালোকেশে তাঁর মুখ রূপ স্বরূপ আচ্ছাদিত রয়েছে (কেননা, বিধাতার কার্যকলাপ দুরধিগম্য)। কিন্তু তাঁর মহিমা-রূপ সুগন্ধে মানুষ মোহগ্রস্ত না হয়েই পারে না। তিনি অনুপম, তিনি অদৃশ্য ও অদৃষ্ট। তিনি স্থান ও কালের অতীত। তাই তিনি অবিকৃত চিরন্তন সত্তার অধিকারী। তাঁর জ্যোতির কাছে চাঁদ-সূর্যের প্রভা তুচ্ছ। এই চিরন্তন লীলাময় সত্তাই সৈয়দ সুলতানের প্রভু বা রব। তিনি সাধারণের কাছে স্বরূপে ধরা দেন না অর্থাৎ জ্ঞানী, ভাবুক ও সাধক না হলে তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সৈয়দ সুলতানের আল্লাহর ধারণা (Conception) মুমীন ও শিক্ষিত মুসলমানের ধারণা। এতে ইসলামের আল্লাহ ও সূফীর লীলাময় আল্লাহর অভিন্ন রূপ প্রতিফলিত।

এবার দেহতাত্ত্বিক যোগী সৈয়দ সুলতানের আল্লাহর স্বরূপ দেখব ঃ

ক. চান্দ বাঁকা কানু বাঁকা ঐ কদম তটে
চম্পার কলিকার ফুল প্রতি ঘটে ঘটে।
কহে সৈয়দ সুলতান শুন গুণিগণ
ধড়ের ভিতর মুদ্রা করিছে রোশন।

এই পদে কুণ্ডলিনী, পদ্ম ও লতিফার ইঙ্গিত আছে।

খ. হুঙ্কারে মারহোঁ তীর দূরে গিয়া লাগে
ফিরি লাগে তীর কামানেরি আগে।
কহে সুলতানে এ ধড় খাখারা
যাইব মনুরা সব ফানারা।

এখানে সহস্রার, দেহের ও আত্মার কথা লক্ষণীয়।

গ. দেহতত্ত্বের আর একটি পদ ঃ
ক্ষিতিসিংহাসন বসন মেরি
অষ্ট সমীর মোর চামর ধারী।
শিরে নবদণ্ড ছত্র আকার
চান্দ সুরুজ দোহো শোভাএ তার।
দুই সূর শশী পাএ হামারি
তাহে কি বোলসি কাজ অনুসারি।
অজপা পঞ্চ শব্দ ঘড়ি ভালে
শ্রীহট্ট নগরে বাজএ এক তালে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পদে হঠযোগ, অজপা, শ্রীহাট, অনাহত ধ্বনি, আট পবন প্রভৃতির আভাস রয়েছে। ব্রজবুলিতে পদ রচনার প্রয়াসও লক্ষণীয়।

ঘ. দেহতত্ত্বের ইসলামি রূপান্তরের নমুনা :

আতসে বোলএ আর হৈল মোর মনস্তাপ
বাতে না ফুকে মেরে নিত
ঝড়ি না পাইলে ঘরে ধূলাএ পড়িয়া গড়ে
তনের দেখল বিপরীত।
লাহুতেত ডুব দিলুঁ কদলীর খোড় পাইলুঁ
মাহমুদা নাম জান তার
কাফ কুলুপ করি কলিজার বোঁটা ধরি
রহি আছে প্রভু করতার।
নাসুত আতস ঘর লাহুতেত ঢেউ বড়
নৌকাখান চলে বারে বার
মলকুত বাজারে হাট জবরুত মোকামে বাট
নীল নদী বহে চারিধার।
হেমন্তের হৈল জোর বসন্ত হইল কোড়
আগুন নিবাইল কাল সরে
চারিজন সঙ্গে ছিল সবে মোরে ছাড়ি গেল
নৌকা ঠেকিল বালুচরে।

দেহ-সাধন সম্পর্কিত একটি পদ :

ঙ. ওরে নিরঞ্জন জাতে দরবেশ জ্ঞানে পরম যোগী। ধূঃ
নামে নহি ব্রাহ্মণ জ্ঞানে নহি পণ্ডিত
ধ্যানে নহি পরম যোগী।
কায়া মোর কামিনী হইয়াছে সিদ্ধার বাণী
মুর্শীদ ভজিলুঁ একজনা।
পাইয়া ব্রহ্মার ভেদ চতুর্দিকে কৈলুঁ ছেদ
রবি শশী আমনা গমনা।
আমিতো ব্রাহ্মণ বড় আমি অক্ষর পড়ি সরু
ভাট ভট বসি আমি পড়ি
নব দ্বার বাঁন্ধিয়া ভাঁড়ার ঘর ছান্দিয়া
মন মোর সদায় নাগর।
আমি বড় চাষা গগনে আমার বাসা
শূন্য ' পরে মছল্লাত বসি।
মুখ আমার হাল জিহ্বা আমার ফাল
আমূল পরাণ ভূমি চষি।

চ. আত্মবোধন মূলক পদের কিছু অংশ :

কাঞ্চন মন্দিরে বন্ধুরে রাখিয়া
মুই পাপী আইলুম এতদূর। ধূঃ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামপরবাসী দূর হন্তে আসি
রহি গেলুম এহি ঠাঁই
দিন দুইচারি রহিছি বাসা করি
না জানি কোন্ ঘড়ি যাই।
মূড়ার উপর বুড়ার টঙ্গিঘর
হেঠে যমুনারি ধারা
উত্তর দক্ষিণে দুই গাছি বাহনে
মাঝে নব গিরি পারা।
অথবা, নৌকাখানি আনিলাম পানে
না করিলাম কোন ব্যবহার
আগে পাছে না গুনিলাম
মায়াজালে বন্দী হৈলাম
ওরে জিজ্ঞাসিলে কি দিব উত্তর।

সৈয়দ সুলতানের পদবলীতে আমরা চর্যাগীতির দূরাগত ধ্বনি শুনতে পাই। আর প্রত্যেকটি পদ অনবরত বাউল গান ও বাউল সাধন তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব সৈয়দ সুলতান বৈষ্ণবসুলভ কোনো পদ রচনা করেননি, যোগী-যোগ্য ভাব, তত্ত্ব ও তথ্যই পরিবেশন করেছেন। সৈয়দ সুলতানের জীবনচর্যার এই আভাস আমরা তাঁর নবীবংশে পেয়েছি, জ্ঞান-প্রদীপে তাঁর এই সাধন-ভজনের স্বরূপ জেনেছি। এসব দেখে আমাদের এই ধারণা হয়েছে যে কবীরের মতো সৈয়দ সুলতান ভারতীয় মুসলমান এবং ভারতীয় সূফী। তিনি ষোল শতকের উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের প্রতিভূ এবং প্রাচীনতম দেশী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

AMARBOI.COM

উৎস নির্দেশ

১. ক. Music in Islam : Dr. Makhan Lal Ray Chowdhury : JASB, Vol. XXII 1957. F. N. p54.
খ. Encyclopaedia of Islam III pp 749-55.
গ Ikhwan'as safa (Persian) : Maulana Ahmed, 1304. A.H.
২. ক. Music in Islam : p54, L. dictionary on Islam : Hughes : p 423
৩. ক. Essay on Manners and Customs of the Pre-Islamic Arabians : Sir Syed Ahmed Khan : p15 (1870)
খ. Music in Islam. p55.
৪. ক. Ibid. p55 L. Encyclopaedia of Islam vol. II. p250.
৫. ক. আল বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫৯, [বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত]
৬. ক. Muhammad : Muir : p259. L. Music in Islam : p 55.
৭. Literary History of Arabs : p. 88
৮. ক. Influence of Music from Arabic Sources : H.G Farmer : (1926 A.D). p.9
খ. Kitab-al-Aghani : Von Kremmer (as mentioned by Dr. M.L. Ray Chowdhury in F. Note No. 6p. 55).
৯. Quran : Tran : Muhammad Ali p. 801. (1948).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. Kitabul Aghani XVI, P. 48.
১১. Al-Masudi, Vol. III, p. 296.
১২. Al-Madrudi, p. 296.
১৩. Evliya Chelebi : Travels I, II p. 91. (as quoted by M.L. Roy Chowdhury, p. 56.)
১৪. Von Kremmer (was quoted by M.L. Roy Chowdhury).
১৫. Evliya Chelebi : Travels Vol. 19 (11), pp. 113, 226, 233-34.
১৬. ইন্না আনকার অল অসওয়াৎ-ই-লা সওয়াৎ-উল হাসির। সুরাহ ৩১,আয়াত ১৯।
১৭. ইয়াযিদু ফিল খালকি মা ইয়াশা ইন্নাল্লাহ অলা কুল্লি শায়িন কদির। সুরাহ ঃ ৩৫, আয়াত ১।
১৮. ওয়া রত্তিলি কোরআন তরতিলা। সুরাহ ঃ মুযাম্মিল। সুরাহ-৭, আয়াত ৩১-৩২।
১৯. Music in Islam, M.L.Ray Chowdhury. JASB 1957/ p90
২০. কিমিয়া-ই সাদৎ-গাজ্জালী।
২১. ইয়াহুব্বুহুম ওয়া ইয়াহুব্বুনাহু।
২২. কুল ইনকানা আবা উকুম ওয়া আব না উকুম। ওয়া আখাওয়ানাকুম।
২৩. Music in Islam, p 93. Kitabul Lumma : R.A. Nicholson.
২৪. Ibid p93. Kashfal Mahjub : R.A. Nicholson.
২৫. Sufism and its Saints and Shrines, by John Abdus Sobhan. p. 215.
২৬. ক. Ihqaqu's Sama/Abdul Bari P. 18. খ. Awarif Shihabuddin Suhrwardi.
২৭. Studies in Islamic Mysticism : Nicholson p. 188.
২৮. Odes, Music In Islam, p 99.
২৯. Ibid p 99
৩০. Ibid p99. Mathnawi.
৩১. Bengal : Past & Present, Vol. LXVIII, SL 13o, 1948 PP35-36.
৩২. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়।
৩৩. পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ, পৃঃ ৫, বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪ সাল।
৩৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব ঃ পৃঃ ৫৮-৫৯।
৩৫. History of Indo-Pak Music : A. Halim. page 8.
৩৬. মুয়াইয়া নিজে সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন এবং গায়িকা পুষতেন। Sardar Iqbal p278
৩৭. History of Indo-Pak Music : page 89.
৩৮. মুসলিম কবির পদসাহিত্য ঃ আলি রজা, আকবর, মীর্জা হোসেন আলি। ক্রমিক সংখ্যা ৩৭২, ৩৯৩, পৃঃ ১৯১।
৩৯. বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবিঃ ভূমিকা।
৪০. শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্য ঃ পৃঃ ৩২১-৩০।
৪১. ক. বাংলার হিন্দু মুসলমানের যুক্তসাধনা ঃ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী।
খ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য ঃ পৃঃ ৩১-৩২।
৪৩. ঐ ১৭৮ ও ২৫৮ সংখ্যক পদ।
৪৪. ঐ ৫৮ ঐ
৪৫. ঐ ২৯৩ ও ২৯৭ ঐ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম পরিচ্ছেদ

চট্টগ্রামের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা

আমরা ষোল শতকের সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করেছি। সৈয়দ সুলতানের মধ্যে আমরা যুগের সর্বপ্রকার প্রভাব লক্ষ্য করি। ভারতীয় সূফীদের উপর বৈদান্তিক অদ্বৈত তত্ত্বের ও যৌগিক দেহতত্ত্বের গভীর প্রভাব পড়েছিল। এবং চৈতন্যোত্তর যুগে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রভাব সর্বব্যাপী ও গাঢ়তর হয়েছিল, রাধাকৃষ্ণ জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক হয়ে ষোল-সতেরো শতকে বাঙালির মন হরণ করেছিল। কিছুটা চিশতিয়া সূফীর অনুমোদনে এবং কিছুটা দেশ ও কালের প্রভাবে মুসলমান সমাজে রাধা-কৃষ্ণ রূপকে সঙ্গীত সাধন-রীতির অঙ্গ হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে, তাও যুগ প্রভাবে, (কেননা বাঙলা দেশে রঘুনন্দনেরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং সে-সংস্কার আন্দোলনের পরেই চৈতন্যদেব নব-বৈষ্ণব মত প্রচার করেন) ইসলামী সমাজকে ধর্ম ও ইসলামের ঐতিহ্য-সচেতন করবার প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে ওঠে মুসলিম সমাজে।

সৈয়দ সুলতান ধর্মের ক্ষেত্রে যুগপুরুষ ও যুগন্ধর। কেননা, তাঁর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার পিছনে রয়েছে ঐতিহ্য-সচেতন করে মুসলমানদেরকে ধর্মবুদ্ধি দান করার উদ্দেশ্য, যাতে ইব্লিসের তথা পাপের পথ পরিহার করে ন্যায় ও সততার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম তার ইহলৌকিক নিরাপত্তা ও পারলৌকিক জীবনে শান্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারে। সৈয়দ সুলতান নীতি-ধর্মের ধারক, বাহক ও প্রচারক। তাঁর নবীবংশের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব হচ্ছে : শয়তান অন্যায় ও অপকর্মের প্রতীক তথা দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের উৎস। রিপু রূপেই শয়তান মানুষের জীবনে আবির্ভূত হয়। এতএব রিপুর উত্তেজনাই শয়তানের প্রভাবের সাক্ষ্য। মানুষের মনুষ্যত্বের অরি হচ্ছে শয়তান তথা evil force এর সঙ্গে অনবরত সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া তথা অন্যায় অপকর্ম থেকে বিরত থাকার সাধনাই মনুষ্য-সাধনা। এ সংগ্রাম আদম থেকে মুহম্মদ অবধি কিভাবে সার্থকভাবে পরিচালিত হয়েছে তার ইতিহাসই নবীবংশে বিধৃত। শয়তান যাদের পেয়ে বসেছিল তথা যারা যুগে যুগে শয়তানের সৈনাপত্য করেছে তাদের মধ্যে নূহর প্রতিদ্বন্দ্বী দানিয়াল, ইব্রাহিমের শত্রু নমরুদ, মুসার অরি ফেরাউন, দাউদের শত্রু আনসারী এবং মুহম্মদের শত্রু আবুজেহেল প্রধান। শয়তানের তো নিজের কোনো অবয়ব নেই। সেতো সত্য ও শিব বিরোধী মানুষ কিংবা রিপু চালিত দুর্মতি রূপেই প্রতিপক্ষতা করে কল্যাণ ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকামীর সঙ্গে। শয়তানের স্থায়ী প্রভাবের বাহ্যরূপ পৌত্তলিকতা। ইব্লিসের খপ্পরে পড়লে মানুষের যে কি মানসিক ও আত্মিক দুর্গতি হয়, তার কয়েকটি জীবন্ত চিত্রও রয়েছে নবীবংশে। কাজেই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রাখলে স্বীকার করতে হবে যে, নবীবংশ নীতি-ধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচিত। অতএব পীর, মীর ও সূফী মরমী কবি এই গ্রন্থ রচনা করে তাঁর সামাজিক কর্তব্য ও মুমীনের দায়িত্বই পালন করেছেন।

আমরা দেখেছি, বাঙলায় তথা পাক-ভারতে ইসলাম পরিচিত ও প্রচারিত হয়েছে সূফী সাধকদের অনলস প্রয়াসে। কাজেই কোরআন-হাদিসের ইসলামের সঙ্গে দেশজ মুসলমানের সম্পর্ক তখনো গৌণ। শিক্ষিত মুসলমানেরাও আজন্মের সংস্কার বশে দেশকালের প্রভাব এড়াতে পারেনি। তাই ভারতিক যোগানুগ মরমীয়া সাধনপদ্ধতিই মুসলিম সমাজে বহুল প্রচলিত হয়। এ প্রভাব থেকে আলিমও যে রক্ষা পাননি, তার প্রমাণ পীর সৈয়দ সুলতান, পীর হাজী মুহম্মদ, পীর শাহাবুদ্দীন, পীর শাহদৌলা প্রমুখ যোগ-সাধনায় বিশ্বাসী আলিমগণ।

কাজেই সৈয়দ সুলতান পীর হিসেবেই মুখ্যত শিষ্যের প্রয়োজনে এবং গৌণত জনগণের কল্যাণে সাধনপদ্ধতি এবং আনুষঙ্গিক মৌল-বিষয়ক জ্ঞান দানের জন্যেই জ্ঞান-প্রদীপ রচনা করেন। আর চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফীদের মতো অধ্যাত্ম সঙ্গীত রচনা করে একাধারে সাধন, ভজন ও আত্মবোধনের উপায় করেছেন। এভাবেই প্রকাশ পেয়েছে আত্মার আকৃতি আর তত্ত্বজিজ্ঞাসা খুঁজেছে নিবৃত্তির উপায়।

বস্তুত ষোল শতকে, মুসলিম সমাজে অধ্যাত্ম তত্ত্বচিন্তার মাধ্যমেই ধর্মান্দোলনের শুরু। এর একটি কারণ সম্ভবত উত্তর ভারতের সন্তধর্ম ও বাঙলার বৈষ্ণবমত এই সময়েই জনমনে বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মচিন্তা উজ্জীবিত করে তোলে। মুসলিম সমাজেও সেই চিন্তা পারিবেশিক কারণেই জাগা স্বাভাবিক ছিল। এর অন্যতর কারণ সমাজ, শাসন ও ধর্মের ক্ষেত্রে নতুন ও উদার চিন্তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া। এ সঙ্গে এও বিবেচ্য যে ষোল শতকে নও-মুসলিম সমাজ সুস্থ, স্বতন্ত্র এবং সুসংবদ্ধ হবার প্রয়োজন বোধ করেছিল, কেননা, তখন বৈষ্ণব মতের উদ্ভবের ফলে ইসলাম প্রচারের সুযোগ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, 'সূফী দরবেশদের'[১] প্রভাব-প্রতিপত্তিও কমে গিয়েছিল পীর-ফকিরের আধিক্যবশে (কলন্দরিয়া ফকিরদের কথা স্মর্তব্য : কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি, ঋণ কড়ি নাহি দেও, নহ কলন্দর মুকুন্দরাম)। এতে আত্মপ্রসারের বহির্মুখী দৃষ্টি অন্তর্মুখী হবার অবসর পেয়েছিল হয়তো, ফলে ধর্মবিধির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে সুগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। সে-যুগে রাজনীতিতে কিংবা যুদ্ধবিগ্রহে জনগণের যোগ ছিল না। এ যুগের নাগরিক বোধও তাদের বিশেষ থাকার কথা নয়। গোত্র চেতনা এবং ধর্মভিত্তিক ঐক্যবোধ অবশ্য ছিল, কিন্তু Nationalism বলতে এ যুগে যা বোঝায়, তা ছিল অজ্ঞাত। সেজন্যেই ১৫৩৮ সন থেকে ১৫৭৬ সন অবধি বাঙলায় ঘন ঘন শাসক পরিবর্তন, এবং মুঘল অধিকারে ভূঁইয়া বিদ্রোহ এবং পর্তুগীজ হামলা ঘটলেও জনপদের সমাজে তখন শান্ত প্রবর্তনার যুগ চলছিল। বৈষ্ণব বৈরাগ্যবাদের প্রভাবে জনমন যতটা আকাশচারী ও প্রীতিবাদী হয়ে উঠেছিল, ততটা বিষয়ী ছিল না। ফলে দেশজ ঐতিহ্যসূত্রে হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি ছিল।

কিছুটা শাসকশ্রেণীর পরোক্ষ প্ররোচনায় দেশজ মুসলমানরা জ্ঞাতিত্ব ভুলে (মাতৃভাষাকে 'হিন্দুয়ানী ভাষা' বলা এর এক প্রমাণ) শাসকশ্রেণীর জ্ঞাতিত্ব গৌরব-স্বপ্নে আরব-ইরান মুখী হয়ে উঠলেও হিন্দুদের প্রতি প্রতিবেশী সুলভ হৃদ্যতা ও শ্রদ্ধার ভাব মুছে ফেলতে পারেনি। তাই হিন্দু পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত মুসলমানদের সাহিত্যিক প্রয়াসে রূপকল্প ও কাহিনী যুগিয়েছে। এবং পরবর্তীকালে সত্যপীরাদি লৌকিক উপদেবতার যৌথ প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছে। এ যদি দেশজ মুসলমানের ঐতিহ্য লব্ধ হত, তাহলে বৌদ্ধ ঐতিহ্য লোপ পেত না। কাজেই এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে নিছক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফল। 'কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি। হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে।'

ফলে বাঙালী মুসলমানরা দেহতত্ত্ব ও যোগপদ্ধতি শিক্ষার মাধ্যমেই বাঙলায় ইসলামের সূফীরূপ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা দেশী ভাষায় দেশী কাহিনীর মাধ্যমে জনগণকে তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনপদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্যে লেখনী ধারণ করেছিলেন। শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষ বিজয়' ও 'সত্যপীর', শেখ চাঁদের 'হরগৌরী সম্বাদ' কিংবা শেখ জাহিদের 'আদ্য পরিচয়' এ প্রয়াসের ফল। সৈয়দ সুলতানের জ্ঞান-প্রদীপও এই শ্রেণীর গ্রন্থ। এদিক থেকে তিনি দেশ-কালের শাসনের ও রেওয়াজের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তবু তাঁকে যুগপুরুষ যুগন্ধর বলেছি এ কারণে যে তিনি এতে তুষ্ট হতে পারেননি, তাঁর যুগ-দুর্লভ মনীষা মুসলমানের জন্যে ইসলামী শিক্ষা-ভিত্তিক জীবন ও ঐতিহ্যানুগ আদর্শ কামনা করেছিল। বাঙালী মুসলমানদের ইসলামী জীবন চর্যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তিনি জনপ্রিয় নবী-কাহিনীর মাধ্যমে ইসলামের মৌল শিক্ষা অর্থাৎ ইব্লিস তথা evil force কিংবা রিপুর সঙ্গে সংগ্রামের তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করেছেন। কাহিনীর আদল ও উপকরণ পেয়েছিলেন এই ধরনের আরবী-ফারসী গ্রন্থ থেকেই। কাজেই সৈয়দ সুলতান যথার্থই বলেছেন :

লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি
কবীন্দ্র ভারত কথা কহিল বিচারি।
হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে
খোদা রসুলের কথা কেহ না সোঙরে।
গ্রহশত রস যুগে অব্দ গোঞাইল।
দেশীভাষে এহি কথা কেহ না কহিল।
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুম ঠিক
রসুলের কথা যথ কহিমু অধিক।
কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙালী উৎপন।
না বুঝে বাঙালী সবে আরবী বচন।
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিল।

অতএব, দেশী ভাষায় গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রচারের শুরু সৈয়দ সুলতান থেকেই। উল্লেখ্য যে, শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' মুখ্যত প্রণয়োপাখ্যান এবং জৈনুদ্দিনের ও শা'বারিদ খানের 'রসুল-বিজয়' মূলত যুদ্ধ-কাব্য তথা রসুলের দিগ্বিজয় কাহিনী।

সৈয়দ সুলতানের প্রভাব চট্টগ্রামের গণমনে গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। মধ্যযুগে অপর কোনো বাঙালী কবি এমন ব্যাপক গণশ্রদ্ধা অর্জন করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। তাঁর জ্ঞান-প্রদীপের অনুসৃতি পাই পরবর্তীকালে রচিত কয়েকখানি মুসলিম যোগপদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থে। অপর দিকে তাঁর নবীবংশের আদলে রসুলবিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর নবীবংশের আদলে রসুলবিষয়ক গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে চট্টগ্রামের মুসলমানের পরিচয় অর্ধ শতকের মধ্যেই নিবিড় হয়ে ওঠে, তার সাক্ষ্য রয়েছে শেখ পরাণের 'নুরনামায়' ও 'কায়দানী কেতাবে' নিয়াজের 'নসিয়তনামায়', শেখ মুতালিবের 'কিফায়তুল মুসল্লিনে' (১৬৩৯ খ্রী.) এবং আলাওলের 'তোহফায়' (১৬৬৪ খ্রী.)। এই অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই দেহতাত্ত্বিক সূফী সাধনা হ্রাস পেয়ে শরীয়তপন্থই সাধারণের আচারিক ধর্ম হয়ে ওঠে, এবং সূফীমতও স্থূলদেহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চর্যা থেকে সূক্ষ্ম মানসচর্যায় উন্নীত হল। সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী পরিভাষা গ্রহণের মাধ্যমে যোগী ও সূফীর সম্পর্ক দূরান্বিত হতে থাকে এবং ফখর-নামা বা মল্লিকার সওয়াল শ্রেণীর গ্রন্থ আগেকার গোপীচাঁদ, গোরক্ষবিজয়, হরগৌরী সম্বাদ প্রভৃতির স্থান দখল করতে লাগল। এই বাহ্যিক স্বাতন্ত্র্য পূর্ববঙ্গে মুসলিমের সংহত সমাজ গঠনের সহায়ক হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলে কোনো প্রতিভাধরের এই প্রকার প্রয়াসের অভাবে দেশজ মুসলমানরা গত শতকের ওহাবী আন্দোলনের পূর্বাবধি কেবল নামত মুসলমানই ছিল, কার্যত ছিল বৌদ্ধ-হিন্দু ঐতিহ্যানুসারী যোগতন্ত্র পন্থী। এদেরই সাধারণ নাম বাউল। বাউল ও প্রচ্ছন্ন বাউলের সংখ্যা বাঙলার মুসলিম সমাজে আজো কম নয়। মুসলমানেরা শিক্ষিত হলেই অবশ্য বাউল মত লোপ পাবে।

সৈয়দ সুলতানের প্রভাব আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগের সর্বত্র পড়েছিল। ত্রিপুরার কবি শেখচাঁদ, শেখ সাদী, নোয়াখালীর কবি আবদুল হাকিম প্রমুখ সৈয়দ সুলতানের প্রভাবে ইসলামী-সাহিত্য রচনা করতে থাকেন। এ প্রভাব পড়া সহজ ছিল, কেননা চট্টগ্রামের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে ত্রিপুরার (এখনকার কুমিল্লা ও ফেনী অঞ্চল) ঘনিষ্ঠ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর রোসাঙ্গ রাজ্যের মুসলিম সমাজে সৈয়দ সুলতানের অপ্রতিহত প্রভাব তো ছিলই। সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি ও প্রভাব গোটা সতেরো শতক অবধি অম্লান ছিল। তাঁকে পীর ও কবিগুরু হিসেবে পরবর্তী কবিগণ স্মরণ করেছেন, আঠারো শতকের শেষ দশকে রচিত 'শমসের গাজী-নামায় কবি শেখ মনোহর শমসের গাজীর পীর গদা হোসেন খোন্দকারের পরিচয় দিয়েছেন মীর সৈয়দ সুলতানের বংশধর বলে। কক্সবাজারের লোক-কবি বিশ শতকেও আদি কবি বলে সৈয়দ সুলতানকে স্মরণ করেছেন। এতেই বোঝা যায়, সে-যুগে চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সমাজ ক্ষেত্রে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকা ও ব্যক্তিত্ব গত শতকের রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতোই ছিল।

অতএব, সৈয়দ সুলতান ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করে চট্টগ্রামের মুসলমানদেরকে স্থূল হিন্দুয়ানী প্রভাব থেকে মুক্ত করেছিলেন।

তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ অনুসরণের ফলেই বাঙালী মুসলমান গোপীচাঁদ-ময়নামতী কাহিনী, গোরক্ষ-মীননাথ তত্ত্ব ও হর-গৌরীর মহাজ্ঞান তত্ত্বকে ধর্ম ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে পরিহার করে যোগকলন্দর, নুর জামাল বা সুরতনামা, মোকাম মঞ্জিলের কথা, মল্লিকার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা, মুসানামা, মুসার সওয়াল, তালিবনামা বা শাহদৌলা পীর, শিহাবুদ্দীন নামা, চারি মোকাম ভেদ প্রভৃতি রচনা করতে থাকেন।

আবার, যোগতত্ত্ব ও সাধনার পরিভাষা হল শরীয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারফত এবং নাসুত, মলকুত, জবরুত, লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি এবং দেহপূজা হল তনতেলাওত, দেহতত্ত্ব হল তনের বিচার, নির্বাণ হল ফানা, অদ্বৈতসিদ্ধি হল বাকা। বলেছি, বৌদ্ধ যোগতন্ত্রের গ্রন্থ অমৃতকুণ্ড থেকে এর শুরু।

এর পরের স্তরে মুসলমানরা শরীয়তানুগ জীবনচর্যায় উন্মুখ হয়, এর ফলে শেখ মুতালিবের কিফায়তুল মুসল্লিন (শরীয়তের আচারিক বিধি নিষেধ গ্রন্থ) এবং আলাওলের তোহফা (মুসলিম জীবনের হদিস) ও আব্দুল হাকিমের নসিয়তনামা লিখিত হয়। আরো পরে রচিত হয় নবীবংশের অনুকরণে আব্দুল করিমের দুল্লামজলিস ও হাজার মসায়েল এবং নসরুল্লাহ খোন্দকারের নসিয়তনামা ও হেদায়তুল ইসলাম। কিন্তু যোগ-তাত্ত্বিক ধারাও কখনো লুপ্ত হয়নি। আঠারো শতকের কবি আলি রজার আগম-জ্ঞানসাগর, সিরাজ কুলুব ও শেখ মনসুরের সির্নামা তার প্রমাণ। এদিকে শরীয়তী-মারফতী ধারাও স্বাভাবিক কারণে প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছিল। তাই আঠারো শতকে সৈয়দ নুরুদ্দিনের দাকায়েক, রাহাতুল কুলুব, রুহনামা, মুসার সওয়াল, সৈয়দ নাসিরুদ্দীনের সিরাজ সবিল, এতিম আলমের আব্দুল্লাহর হাজার সওয়াল, সেরবাজের মল্লিকার সওয়াল, বদিউদ্দীনের সিফৎ-ই-ইমান, কায়দানি কেতাব, আফজলের নসিয়তনামা, বালক ফকির ও মুকিমের ফয়দুল মুবতদী, বালক ফকিরের বুরহানুল আরেফিন, মুহম্মদ আলীর হায়রাতুল ফেকা প্রভৃতি; আর আব্দুল হাকিমের নুরনামা, শেখ চাঁদের রসুল বিজয়, মুহম্মদ খানের মক্তুল হোসেন প্রভৃতি রসুল-কাহিনীও রচিত হয়েছে।

সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাবের দেড়শ বছরেরও অধিক কাল পরে আমরা উত্তর বঙ্গে হায়াত মাহমুদকে সৈয়দ সুলতানের ভূমিকায় দেখতে পাই।

বৈদিক যুগ থেকেই সুপ্রাচীন অনার্য সাংখ্য ও যোগতত্ত্ব ভারতীয় ধর্মচিন্তায় ও অধ্যাত্ম সাধনায় কি ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক প্রভাবে কেমন করে হিন্দু শাক্ত-শৈব তন্ত্রমত গড়ে উঠেছে, এবং পরবর্তীকালে মুসলমানরাও এ যোগ-তন্ত্র কেন এড়াতে পারেনি—এসব কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি।

পনেরো শতক অবধি যে তত্ত্ব আচরণের মধ্যে ছিল, তাই ষোল শতক থেকে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আমরা যোগ ও যোগীর কথা কেবল হিন্দু-বৌদ্ধ সাহিত্যে নয়, বাঙলা ভাষায়ও নানা সূত্রে শুনতে পাই। কেবল চর্যাগীতিতে নয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্য-চরিত, মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতিতেও যোগীর সন্ধান পাই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যোগী-সন্ন্যাসী-পীর-ফকিরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণই ছিল। কুতুবউদ্দীন আইবক থেকে মীরজাফর অবধি দিল্লী ও বাঙলার সুলতানদের অনেকেরই জীবন পীর-ফকিরের পরামর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতেও সন্ন্যাসীর ভূমিকা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ওহাবী-ফরায়ইজী প্রভাবের পরেও আজকের দিনে শরীয়তী মুসলমান পীরও মারফতের মোহ ত্যাগ করতে পারেনি।

ষোল শতকে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবে যে ভাববিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণ ও ক্রুর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিক বোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসার এবং রুচির বিকাশ ঘটেছিল, চৈতন্যোত্তর যুগের মঙ্গল কাব্যগুলোতে অসূয়া-মুক্ত আবহ সৃষ্টি করা তাই সম্ভব হয়েছিল। এ সময় নিশ্চিতই রাধা-কৃষ্ণলীলা-মহিমা বাঙালীর চিত্তহরণ করেছিল। নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব করা যুগের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদার নীতি এই বোধ আরো উজ্জীবিত করেছিল। তাই, ষোল শতক বাঙালী জীবনে ছোটখাটো রেনেসাঁসের যুগ।

এই শতক অনিবার্য কারণে বাঙলা সাহিত্যেরও সোনার যুগ। পনেরো শতকের বাঙলা রচনা বিচ্ছিন্ন ও বিরল প্রয়াসে সীমিত। কিন্তু ষোল শতকের নব-বৈষ্ণবীয় উচ্ছল ভাববন্যায় বাঙালী হৃদয় প্লাবিত হয়ে ভাষা-সাহিত্যের আঙিনায়ও উপছে পড়েছিল। কবির সংখ্যাধিক্যে, সৃজন পটুতায়, রচনার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে এ শতক গোটা মধ্যযুগের মধ্যমণি। ভাবের, ভাষার, এবং রূপ ও চিত্রকল্পের স্বতোৎসারে এ শতকের সাহিত্য অনন্য।

কিন্তু এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণ প্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান। তাই অবৈষ্ণবেরা এই বিপ্লব বন্যায় বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোল শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল। এই বন্যার প্রথম তোড় মন্দা হবার মুখে ষোল শতকের শেষপাদে অবৈষ্ণবেরা সম্বিৎ ফিরে পেতে থাকে। কিন্তু তখন তাদেরও অজ্ঞাতে তাদের চিত্ত চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে সমর্পিত। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধদের যারা ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রচ্ছায়ায় নিজেদের ধর্মমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচ্ছন্ন রেখেছিল, তারাও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্রের দোহাই দিয়ে রাধা-কৃষ্ণলীলাবাদকে সম্বল করে নিল। এরাই নতুন বৈষ্ণব সহজিয়া। শাক্ত সমাজে শক্তির বাৎসল্য ও করুণাময়ী রূপের প্রাধান্যত শৈবসম্প্রদায়ে ভোলানাথ শিবের জনপ্রিয়তা এবং তান্ত্রিক কাঠিন্যে প্রীতিরসের প্রবণতা বৈষ্ণব প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

ষোল শতকে চৈতন্যোত্তর কালে তথা ষোল শতকের শেষপাদে আমরা নিশ্চিতরূপে দুইজন হিন্দু কবির সাক্ষাৎ পাই। দুইজনই রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল। এবং উভয়েই চৈতন্য চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। দ্বিজ মাধব বা মাধবাচার্য তাঁর গঙ্গামঙ্গলেরও এক ভণিতায় বলেছেন :

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণ কমল
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।

পনেরো শতকের হিন্দু কবি : বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, আর ষোল শতকের প্রথম পদের কবি হচ্ছেন, কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস, শ্রীকর নন্দী ও দ্বিজ শ্রীধর। এঁদের মধ্যে পাঁচজন সুলতান বা সামন্ত প্রতিপোষণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অতএব এঁদের সাহিত্যিক প্রয়াস নতুন গড়ে-ওঠা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রথম দান।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বিতীয় দান বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার প্রয়াস এবং হিন্দু মনে নতুন জীবন-স্বপ্নের উদ্ভাস [গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে]।

এর তৃতীয় দান উত্তর ভারতিক সন্ত ধর্মের অনুসরণের সূফীপ্রভাবে দক্ষিণ ভারতিক অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের ভিত্তিতে নব অচিন্ত্য দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব ও প্রেমবাদের উদ্ভব। চৈতন্যের ব্যক্তিক মনীষায় এই নব অধ্যাত্মবাদ প্রচারিত হলেও এ কোনো আকস্মিক অকারণ ঘটনা নয়।

জন্মসূত্রে বিন্যস্ত সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো পৈত্রিক পেশার নিগড়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে পুরুষানুক্রমিক পীড়ন, দারিদ্র্য, তাচ্ছিল্য ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না তাদের। এতে দেহ, মন ও আত্মার উপর যে জুলুম হত, নতুন কোনো আশার বা আদর্শের আলোর অনুপস্থিতির দরুন তা সহ্য করতে তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের ফলে তারা চোখের সামনে দেখল, আজ যে ক্রীতদাস; বুদ্ধি, সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বলে কাল সে বাদশাহী তখত অলঙ্কৃত করছে। দিল্লী ও গৌড়ে এই আজব কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। দেখতে পাচ্ছে সামান্যের মধ্যে রূপকথার নায়ককে। মানুষের আত্মপ্রসারের এই অনিঃশেষ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে তারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাঁধন ছিঁড়বার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। মানুষ অবিশেষের জীবনের বিরাট সম্ভাবনার সন্ধান যখন একবার পেল, তখন তাদের ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্য সমাজ যতই বাঁধন শক্ত করতে চাইল, ছিঁড়বার আশঙ্কা ততই বাড়ল। কিন্তু পাখি যখন নবদিগন্তের সন্ধান পেয়েছে, সে উড়বার চেষ্টা করবেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদীর এ প্রয়াস যখন ব্যর্থ হল, তখনি চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে স্মৃতি ও শর্মাদ্রোহী সমাজ গঠনান্দোলন শুরু হল। এবং এ উদ্দেশ্য মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। কেননা, অন্যথায় যারা ইসলাম গ্রহণ করত, মুখ্যত তারাই বৈষ্ণব হল, যেমন সমাজে পতিত হওয়ার পর খ্রীস্টধর্ম বরণ করা ছাড়া যাদের অন্য উপায় রইল না, তারাই ব্রাহ্মমত সৃষ্টি করে নতুনে পুরানে সন্ধি ঘটিয়ে স্বধর্মের প্রচ্ছায় আত্মরক্ষা করল।[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগেই বলেছি, বৈষ্ণব সাধন-পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচার আচরণে ইসলামী রীতিনীতির হুবহু অনুকৃতি রয়েছে অনেক। তবু মানুষের চারিত্রিক স্খলন-পতনকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা আর পতিতাত্মার জন্যে করুণাবোধ করা বৈষ্ণবীয় উদারতার সুন্দরতম প্রকাশ।

অতএব, মুসলিম সংস্কৃতির মোকাবেলায় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে যা ঘটেছে, ষোল শতকের বাঙলায়ও একই ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণে তা-ই ঘটেছে। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের সূচনা আগেই হয়েছিল, চৈতন্যদেবের মনীষা ও ব্যক্তিত্ব তাকে পূর্ণাবয়ব দিল। নতুন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পুরোনো জীবনবোধে যে বাস্তব ও মানস প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তা এই উপায়ে সিদ্ধ হল। সবাই অবশ্য বৈষ্ণব হয়নি। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য যে, কেউই আর স্বধর্মে ও স্বমতে সুস্থির থাকতে পারেনি, অবচেতনভাবে বৈষ্ণবীয় উদার মানবিকতার প্রভাবে পড়েছে। তারা স্বস্থ থাকতে পারল না বটে, তবে সুস্থ মানস-আবহ পেল। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ সে-উদারতা অবৈষ্ণবের মতো কাজে লাগতে পারে নি। যেমন শিখেরা পারেনি নানকের মত-সমন্বয়ী উদার আদর্শকে ধরে রাখতে। তারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎকণ্ঠ ও উগ্র হয়ে ওঠে। এবং এ উদ্দেশ্যে তারা সংকীর্ণতাকেই সম্বল করে। আত্মরতি সর্বাবস্থায় পরপ্রীতির পরিপন্থী। এ কেবল ব্যক্তি জীবনে নয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও সত্য। শিখদের মতো বৈষ্ণবেরাও উদার দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে নবগঠিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ-বিধি প্রণয়নে ও তাদের ধর্মতত্ত্বে আভিজাত্য আরোপ প্রচেষ্টায় সময়, শক্তি ও মনীষার অপব্যয় করতে থাকে। দৃষ্টি এমনি সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওয়ায় তারা নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে রইল।[৩] চৈতন্য ও তাঁর পার্ষদদের জীবনীগ্রন্থগুলো তাঁদের সংকীর্ণতার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন বৃন্দাবন দাস অবৈষ্ণব হিন্দুকে পাষণ্ডী বলেই জানতেন, বৈষ্ণব সুলভ বিনয় কিংবা সহিষ্ণুতাও তাঁর ছিল না। মনের মধ্যে তিনি সব সময় পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষ প্রসূত উত্তেজনা বহন করতেন। তাই একটি গালি তিনি ধূয়ার মতো আবৃত্তি করেছেন, 'এতো পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে, তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে'। ফলে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের আর একটি প্রাচীর উঠল। মিলনময়দানের পরিসর আর একটু সংকীর্ণ হল মাত্র। বৈষ্ণবেরা এভাবে যখন বাস্তব জীবন ও প্রয়োজনকে আড়াল করে পারলৌকিক জীবন-স্বপ্নে অভিভূত এবং দৃষ্টি মাটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে নিবদ্ধ করেছে, তেমনি সময়ে সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাব।

সৈয়দ সুলতানের মনীষার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এভাবে অভিভূত তথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এই প্রভাব স্বীকার করেও তিনি ইসলামী জীবন কামনা করেছেন। সূফীমতের অনুকূল ছিল বলে তিনি রাধা-কৃষ্ণ রূপক ব্যবহারে দ্বিধা করেননি। অদ্বৈত সিদ্ধি লক্ষ্যে যোগপদ্ধতিকে সম্বল করে এবং ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুসরণে জীবনচর্যা গ্রহণ করে তিনি ইসলামকে একটি বিবর্তিত স্থানিক রূপদান করেছিলেন। পারিবেশিক প্রভাবেই দেশকালের সঙ্গে বিদেশাগত ধর্মের এমনি সামঞ্জস্য কল্পনাও যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

এবার যোগ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণার পরিচয় নেয়া যাক। নবীবংশে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমারীক যোগশাস্ত্র জানাই নৃপতি
কঠিন হৃদয় হেন মোমের আকৃতি।

আদি মানব আদমের তথা মানুষের দেহ পরিচয় :

অধঃ রেত শিবশক্তি লিঙ্গেত রহিল
নাভিদেশে পঞ্চ-বাবি একত্র হইল।
দশমীর দ্বার থুইলা দশমীর পাট
চৌকি প্রহরী সব থুইলা ঘাট ঘাট।
অনাহত পঞ্চস্বরে বাজিবার তরে
লুকাই রাখিল তারে গহীন অন্তরে।
তিনশত ষাট শিরা দিলেন্ত টানাই
নাভিকুণ্ড দেশেত মিলিল সবাই।
সুষুম্নার মধ্যেত রহিল বড় থানা
হইবারে যথ কিছু আওনা গমনা।
ইচ্ছা সুখে শিব-শক্তি জীবাত্মা দিলা।

সমাজে যে যোগী-যোগিনীর প্রভাব ছিল তার প্রমাণ দুঃখিনী নারী বলছে :
(কাবিলের মৃত্যুতে)

ধরিমু যোগিনী বেশ কর্ণে দিমু কড়ি
এক হাতে পাত্র আর করে দণ্ডবারি।
অঙ্গেত লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কোথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।

অন্যত্র, সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

আমিষ ভোজনের ফল :

খাইলে পশুর মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস
অবোধে আত্তমা পায় জয়।
দেহ মধ্যে পঞ্চভূল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

দেহতত্ত্ব : দেখন শুনন বাক্য জানন অপার
প্রভুর এসব জান শরীর তোহ্মার।
সপ্তম আকাশ সপ্ত পৃথিম্বী মণ্ডল
একে একে আছে সব শরীরে সকল।
শিবশক্তি মূলাধার ধরে নাভিদেশ
সহস্র দলেত তোর করতার বেশ।
অনাহত দুমদুমি বাজএ নিরন্তর।
কনক মৃণাল পুষ্প তাত মনোহর।
ভালমতে শতদলে হৈছে প্রকাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা পুষ্প বিকাশ হৈছে চারিপাশ।
মধুপ ভ্রমরা তথা পাই দিব্যস্থান
কৌতুকে সদায় তারা করে মধুপান।

অদ্বৈততত্ত্ব :

১. আদমের বাক্য শুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার
তার মোর নহে ভিন এক অংশ পরিচিন
পিরীতি বড়হি মোর তার।

জীবনের উপমা :

২. জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।
৩. জীবরূপ ধরি প্রভু বৈসে সর্বঠাম।
সুচারু সুরূপ প্রভু ধরিছে উপাম।
ফটিকের অন্তরে যেন সুবর্ণের লত
কনক পত্রিকা পুষ্প বাহিরে বেকত।
আপনাকে আপনি চিনিতে পার যবে
প্রভু সনে তোহ্মার দর্শন হৈব তবে।
৪. সর্বঘটে ব্যাপিত আছএ নিরঞ্জন
আপনার ঘটেত পাইবা দরশন।
আপনারে আপে যদি পার চিনিবার
নিশ্চয় দেখিবা তুহ্মি প্রভু করতার
সর্বথায় পাইবা তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন।
৫. আহাদ আহমদ মহাসুর ভিন
এই মহাসুর মধ্যে ত্রিভুবন চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহাসুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।
আহাদ আহমদ পাইল দরশন...
হইয়া ভাবক রূপ আপনা দেখা পাই
সাধক হইয়া রূপ রহিল ধেয়াই।
প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার
নুর মোহাম্মদক লাগিলা দর্শিবার।

তুলনীয় : রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ উঠে মনে।

৬. আল্লাহর উক্তি :
আপনা অংশে আহ্মি সৃজিছি তোহ্মারে
তুহ্মি আহ্মি একত্রে আছিল অনুদিন
আহ্মা হোন্তে কথ দিন হইয়াছ ভিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭. মুহম্মদের উক্তি :
কিবা এথা কিবা তথা তুমি সর্বময়
সভানের স্থানে তুহ্মি নাই তোহ্মার স্থান।
সভান ব্যাপিত হই আপনে রহিছ
মহিমার লাগি আর্শ কুর্সী সৃজিয়াছ।

৮. প্রভুর পরম তত্ত্ব শুনি খদিজায়
সংসার অসার জানি মানে সর্বথায়।
ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

হিন্দুর পুরাণের ও হিন্দু সমাজের সঙ্গে গভীর পরিচয় ছিল কবির। তিনি এ পরিচয় কাজে লাগিয়েছেন। ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত শেষধর্ম এবং মুহম্মদ যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, আর তাঁর আবির্ভাবের ফলে পূর্বেকার নবীগণ প্রচারিত শিক্ষা ও আচার-আচরণ যে বাতেল হয়ে গেল, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে তাই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি হিন্দুর প্রধান দেবতা, অবতার ও ধর্মগ্রন্থে শয়তানের কারসাজিতে কি দোষ স্পর্শ করেছে তার বানানো কাহিনী বিবৃত করেছেন। সৈয়দ সুলতানের অনুসরণে পৃথিবীর বাশেন্দা পরম্পরার বিবরণ দেয়া হল :

প্রথমে দেও-দৈত্য তথা অসুরেরা সৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর অধিকার পেল। কিন্তু তাদের অনাচারে পৃথিবী পাপের ভার সইতে না পেরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাল, তখন :

ক্ষিতির যে নিবেদন শুনি প্রভু নিরঞ্জন
আদেশ করিলা সুরগণ
তেজ সুর এ আকাশ চলি যাও ক্ষিতিপাশ
অসুরকে করিতে নিধন।

তারপর সুরাসুরে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। কালনেমি, সুম্ভ-নিসুম্ভের যুদ্ধ প্রভৃতির পর দৈত্যেরা দেবতাদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাল। সুরেরাও ক্রমে অনাচারী হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে তাদেরও আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। অবশ্য তাদের মধ্যে :

পুণ্যের প্রভাবে রহিলেক কথজন
ক্ষিতিত আলোপ হই সদায় ভ্রমণ।

এরপরে ফিরিস্তারা নররূপ ধরে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল।

তারা চারি মহাজন স্থানে পাইল চারি বেদ।
সামবেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার
তবে যদি বিষ্ণুর হৈল উৎপন
যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।
তৃতীয় মহেশ যদি সৃজন হইল
ঋক্‌বেদ তান স্থানে পাঠাইয়া দিল।
চতুর্থে যদি সে হরি হইলা সৃজন
অথর্ব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ চারি বেদেত সাক্ষী দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার।

[স্পষ্টত: ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর কবি এই নামক্রম মেনেছেন এবং বিষ্ণু ও হরির পৃথক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেছেন।]

শিব পরমযোগী। তিনি :

কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মাথে জটা ধরে
সর্পসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপরে।
বৃষ পরে আরোহণ ভস্ম দিল অঙ্গে
প্রতিগৃহে ভিক্ষা নিত্য করিলেন্ত রঙ্গে।
দুইপাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা।
কায়মনে সদায় করিলা পরিচর্যা।

এহেন যোগী শিব সুরা পান করে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে :

দুহিতারে পত্নীরে দেখিয়া একাকার
বিচলিত হৈল মনে করিতে শৃঙ্গার।

কাজেই তিনি ব্রতভ্রষ্ট হলেন। তাঁকে দিয়ে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হল না। তারপর এলেন সোম। তিনিও গুরুপত্নীর সঙ্গে শৃঙ্গার করে দেহে সহস্র ভগচিহ্ন লাভ করলেন। এসব অনাচার ও পাপের ফলে পৃথিবীতে জলপ্লাবন হল। (তুলনীয় : নবী নুহর সময়কার প্লাবন) নুহর মতো ধার্মিক মুনি নৌকা তৈরি করিয়ে তাতে আশ্রয় নিলেন। এভাবে সৃষ্টির পবিত্রাংশ রক্ষা পেল। তারপর কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। এ সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর ও বলিরাজার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অবশেষে হরি আবির্ভূত হলেন।

সে হরির সনে রহি ইব্লিস দুর্বার
ধরিয়া আছিল পাপী মুনির আকার।
ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

ফলে হরি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং ব্রত ভুলে নারীসম্ভোগে কাল কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ রুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন ফিরিস্তাকে :

রাখ নিয়া বেদশাস্ত্র জলের মাঝার।

[বেদ যে একসময় হারিয়ে গিয়েছিল, তা পুরাণ এবং গীতা সূত্রেও জানা যায়। [The Indo-Asian Culture : Vol. 18. No. 3 July 1969. P. 13]

কিন্তু ইব্লিস দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কপিকে দিয়ে জল থেকে বেদ উদ্ধার করল এবং 'আপনা আচার যথ তাহাত লেখিলা'। এ ভাবে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপিষ্ঠ ইব্লিসে যদি বেদ পরশিল
নিরঞ্জনে বেদ হোন্তে তেজ হরি নিল।

ইতিপূর্বে বেদমন্ত্রের এমনি মাহাত্ম্য ছিল যে :

একালে কাটিয়া বৃষ খাইত ব্রাহ্মণে
বেদমন্ত্র পড়ি পুনি জিয়াইত তখনে।

এমনি করে ঐশী শাস্ত্র চতুর্বেদ বাতেল হয়ে গেল। কাজেই এখন ভারতীয়দের সত্যধর্ম হবে ইসলাম। বিশেষ করে :

এ চারি বেদেত সাক্ষি দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।

কবি এমনিভাবে শেষ নবীর আবির্ভাব ও ইসলাম-এর পরিহার্যতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছেন। দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের উপযোগ এবং এদেশের জনগণের ইসলাম বরণের যৌক্তিকতা উপরোক্ত কাহিনী ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন কবি। লক্ষণীয়, আরবের ইসলাম যে ভারতের সত্যভ্রষ্ট জনগণের জন্যেই প্রবর্তিত হয়েছে, এমনি একটা ধারণা দেবার চেষ্টাও আছে।

পক্ষান্তরে, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতি হিন্দু কবিগণ দেশের অধিবাসী মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেই উভয় জাতির সহঅবস্থান কামনায় পারস্পরিক মত-সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে মিলনসেতু রচনার প্রয়াসী ছিলেন। তাই কালকেতুর গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমাংশে মুসলিম প্রজা উপনিবিষ্ট হয়েছে। তারা সাধারণভাবে সৎস্বভাব, শান্তিপ্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ। হোসেনহাটির কাজী যদিও হিন্দুবিদ্বেষী, সাধারণ মুসলমান কিন্তু হিন্দুপীড়নে উৎসুক নয়। কাজী অবশ্য বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিষময় পরিণাম শেষে উপলব্ধি করেছেন।

মুঘল বিজয়ের পরে দেশে অর্ধশতাব্দী অবধি ১৫৭৫-১৬২৫ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, স্থানীয় ভুঁইয়াদের আনুগত্য লাভ করবার জন্যে মুঘলদের অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারপরে সতেরো শতকে মঘ-পর্তুগীজ দস্যুর উপদ্রবে বাঙলার সমুদ্রোপকূলাঞ্চলের নদীতীরস্থ গ্রাম উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। আঠারো শতকে শুরু হয়েছিল বর্গীর উপদ্রব, আভ্যন্তরীণ শাসন-শৈথিল্য এবং পীড়ন। সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকার ওপর যখন এমনি হামলা চলছিল, তখনো চৈতন্যের ও আকবরের উদার মানবিকবোধ হিন্দু-মুসলমানকে দুর্দিনের দুর্যোগে একই মিলন ময়দানে জড়ো করেছে। সেদিনের অসহায় মানুষ জীবনের মমতায় জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে নতুন দেবতার আশ্রয় খুঁজেছে। এভাবে মুখ্যত সত্যপীর তথা সত্যনারায়ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন স্থানিক উপদেবতা গোষ্ঠী—যাদের আনুগত্যে নিরাপত্তার সন্ধান করেছে গণমানব। সুখের দিনে মানুষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা লোভী হয় দ্বন্দ্বে-বিবাদে উৎসাহবোধ করে। আর দুঃখের অভিঘাতে দুঃখী মানুষ বেঁচে থাকার অবচেতন প্রেরণায় অগণিত সামাজিক ও আচারিক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে মিলিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের চিত্র পাই সত্যনারায়ণ পুঁথিতে, রায়মঙ্গলে, গাজীকালু-চম্পাবতীর কেচ্ছায়, জায়নুদ্দিনের গাজীনামায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব ষোড়শ শতকে দুঃখী গণমনে যে শুভ বুদ্ধির সূচনা, তা-ই প্রশাসনিক অব্যবস্থায় ও আর্থনীতিক অনিশ্চয়তায় গভীর, ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হতে থাকে। আচারিক বিভেদের প্রাচীর ভেঙে, স্বাতন্ত্র্যের বাঁধ লোপ করে, নতুন লৌকিক দেবতার মন্দির-চত্বরে একে অপরের প্রতি প্রীতি রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন পুরোহিত আর মোল্লায় বিরোধ ছিল না, কাফেরে-যবনে ভেদ ঘুচে গিয়েছিল। সত্যপীরের সিন্নি চণ্ডালে ব্রাহ্মণে-যবনে পাশাপাশি বসে খেল আর হাত মুছল মাথায়। ছোঁয়াছুঁয়ির অনাচারের কথা আর কারো মনে জাগল না।

সৈয়দ সুলতানের দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ :

যোগীরা পদ্মাসনে বসে যোগ সাধনা করত, তারা বায়ু ভক্ষণ করেই দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করতে পারত :

কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।

যোগীরা কানে কড়ি পরত, অঙ্গে ভস্ম মাখত, এক হাতে ভিক্ষা পাত্র, তথা করোটি ও অপর হাতে লাঠি ধরত। এবং দেশ পর্যটন করে বেড়াত। আর সিদ্ধারা থাকত অনাহারে।

ধরিমু যোগিনী বেশ কর্ণে নিমু কড়ি।
এক হাতে পাত্র আর করে দণ্ড বাড়ি।
অঙ্গে লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ।...
সিদ্ধা সম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

দৈবজ্ঞরা পাঁজি দেখে অঙ্ক কষে ভাগ্য গণনা করত :

পাঁজি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক।
... গুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

দেবতার পূজা ও বলিদান :

লক্ষ লক্ষ অজ আনি সমুখে রাখএ
তুহ্মি ব্রহ্ম তুহ্মি বিষ্ণু মূর্তিরে বোলএ।

এয়োরা শিষে সিন্দূর পরে :

শিষের সিন্দূর মুছি কৈলা দূর।

বৌদ্ধ অহিংসবাদ তখনো যোগীদের মধ্যে প্রবল। তাই আমিষ খাদ্যের কুফলের সংস্কারও অবিলুপ্ত :

আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন
না করিব এসব অধর্ম
খাইলে পশুর মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস
অবোধে আত্তমা পায় জএ
দেহ মধ্যে পঞ্চ ভুল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তার বাড়এ

সূর্যপূজারী, সৌর সম্প্রদায় তখনো লোপ পায়নি :

অনুদিন দিবাকর পূজে নরগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।

নিম্নবর্ণের লোকের হীনম্মন্যতা :

নারী বোলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।

ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান :

প্রথমে ললাটে তোর মূরতি লেখিমু
দ্বিতীএ তোমার কান্ধে পৈতা চড়াইমু।
তৃতীএ যথেক আছে আচার আমার
একে একে করাইমু সেসব আচার।
চতুর্থে করাইমু তোরে স্নান তপন
পঞ্চমে করিমু তোরে অনলে দাহন।
পরলোকে তবে সে তোহোর ভালগতি।

এদেশের মুসলমানেরা কাফের বলতে আরবের ও এদেশের কাফেরকে অভিন্ন জেনেছে। তাই কবিগণ নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাফেরদেরকে এদেশী হিন্দুর আদলে এঁকেছেন। কাফেরের যে চিত্র পাই তাঁদের বর্ণনায়, তা আমাদের হিন্দু সমাজেরই ছবি। এর কিছুটা চৌদ্দশ' বছর আগেকার পৌত্তলিক আরব সম্বন্ধে ধারণার অভাবপ্রসূত আর কিছুটা নতুন পরিবেশে হিন্দু পৌত্তলিকতার মোকাবেলায় ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের সচেতন অভিপ্রায়জাত। [মূরতি পূজিতে নিষেধিবারে কারণ, পৃথিম্বিত নবী সকলের হৈল সৃজন।] তাই সৃষ্টিপত্তন ও আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে শেষনবী মুহম্মদের ওফাত অবধি বর্ণিত ঘটনায় দেশী কাফেরের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কারই সর্বত্র বিবৃত হয়েছে। ফলে ভারতিক ঐতিহ্য দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে– একটি মুসলিম সংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, অপরটি পরিহার্য কুফরী বলে নিন্দিত হয়েছে। এভাবে আমরা আরবীয় আবহের বিনামে একটি অকৃত্রিম ভারতীয় পরিবেশ পাই।

এতে শাসক জাতি সুলভ প্রাণময়তা, জিজ্ঞাসা ও অসূয়াহীনতাও কিছুটা মুসলিম মনে ছিল বলে মনে করি। পক্ষান্তরে শাসিত হিন্দুমনের বিরূপতা মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি হিন্দুদের বিমুখ রেখেছিল বলেই মনে হয়। নইলে মুসলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যে ও হিন্দু পুরাণে যতখানি জ্ঞান লাভ করেছিল, ফারসী ভাষার মাধ্যমে হিন্দুর মুসলমানী বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ আরো বেশি হয়েছিল, কিন্তু বাঙলাদেশে হিন্দুরা মুসলমানের আচার-আচরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে-বুঝতে যে চেয়েছে, তার প্রমাণ বিরল। অপরদিকে মুসলমানেরা ভাষায় ও রূপ-প্রতীকে হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দু ঐতিহ্যের বহুল ব্যবহার করেছে।

এর অন্যতর কারণ হয়তো এই যে অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান বাঙালী অবিশেষের জন্যে বাঙলা সাহিত্য রচনা করতে যেয়ে মুসলমান লেখক ভারতের Classic ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতকে হিন্দুদের মতোই আদর্শ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। জনসাধারণের অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের আশ্রয় নেননি। যাদের জন্যে লেখা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে রচনা ব্যর্থ হত। খ্রীস্টান য়ুরোপ যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে সাহিত্যে Pagan Greek ও Latin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান লেখকেরা অনুরূপ কারণে অতি পরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাঙলায় সাহিত্য-সৌধ গড়ে তুলেছেন। অতএব, একে হিন্দুয়ানী প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব নয়, দেশী উপাদান গ্রহণ।

সৈয়দ সুলতান বিষয় ও উদ্দেশ্যানুগ প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দু পুরাণের কাহিনী ও রূপকল্পের বহুল ব্যবহার করেছেন।

আদম সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণনায় কবি হিন্দু পুরাণকে অবলম্বন করেছেন। অবশ্য তাঁর অজ্ঞতা ও আনাড়িপনার ছাপও সর্বত্র দৃশ্যমান। আগেকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-হরি-সোম-প্রমুখ নবীরা কিভাবে ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে আল্লাহ নির্দেশিত ব্রত ভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের নবুয়ত ব্যর্থ হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষনবী মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা এবং আপামরের ইসলাম বরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন তিনি।

তিনি রূপপ্রতীকে হিন্দু-পুরাণের ও রামায়ণ-মহাভারতের এবং ভারতিক উপমাদি ব্যবহার করেছেন :

১. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি
২. কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করহ লেপন
চন্দ্রিমার জোত মোত লাগে হুতাশন।
৩. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে।
৪. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।
৫. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।
৬. গাভীর গোবরে যথা করএ লেপন।
৭. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।
৮. পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষ দানবে নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।
৯. গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।
১০. ঈষৎ হাসিয়া কহে চাণক্য বচন।
১১. পাতালেত গিয়া দিমু লুক।
১২. দ্বিতীয় আকাশ প্রভু সৃজিলা হীরার
বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাঝার।
১৩. কালনেমি আদি যথ অসুর দুর্বার
সুম্ভ নিসুম্ভ আর মুণ্ড দুরাচার।
১৪. পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশম পরিচ্ছেদ

সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি

ক. নবীবংশে সমাজ ও সংস্কার

চট্টগ্রামে সৈয়দ সুলতানের মানস যে-পরিবেশে লালিত হয়, তা এই :

ক. রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরাকান, গৌড় ও ত্রিপুরার শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, তা'ছাড়া ছিল পর্তুগীজ শাসন ও পীড়নের অভিজ্ঞতা।

খ. ধর্মের ক্ষেত্রে শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, থেরবাদীতান্ত্রিক বৌদ্ধমত, যোগ-প্রভাবিত মারফত-প্রবণ ইসলাম, প্রচারশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মই ছিল উল্লেখ্য। তখন হিন্দু ও মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি, বৌদ্ধের সংখ্যা স্বল্প এবং খ্রীস্টান ও বৈষ্ণব তখনো নগণ্য। কিন্তু তাদের মতবাদ ছিল প্রভাবশীল ও প্রসারমুখী।

গ. চট্টগ্রাম বন্দর আজকের মতোই ছিল নানাদেশী বহু মানবের মিলন ময়দান। পর্তুগীজদের উৎসাহে তখন চট্টগ্রাম নতুনতর ভাব, চিন্তা ও পণ্যের প্রবেশদ্বার। ভূয়োদর্শনজাত উদারতা, বিচিত্র মানুষ ও বিভিন্ন সংস্কৃতি ধারণা প্রসূত পরমতসহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ দূরদৃষ্টি, নাগরিক সৌজন্য প্রভৃতি তাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে লাবণ্যমণ্ডিত করেছিল, প্রসারিত করেছিল তাদের মনের দিগন্ত। বিশেষ করে তখন মুসলিম সমাজে শুরু হয়েছে শাস্ত্র প্রবর্তনার যুগ। শরীয়তী ইসলামকে জানবার-বুঝবার আগ্রহ জেগেছে মুসলিম সমাজে এবং চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদের প্রভাবে হিন্দু সমাজে জেগেছে 'নরে নারায়ণ' এবং 'জীবে ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করার ঔৎসুক্য। চৈতন্যমতের প্রভাব নানা কারণে সর্বাত্মক হয়েছিল। এতে মানুষ ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা অকস্মাৎ বহু গুণে বেড়ে গেল, মানুষ হৃদয়বান হবার উৎসাহ পেল, দীক্ষা পেল মানুষের ত্রুটি ও পতনকে এক সহিষ্ণু ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার।

আগেই বলেছি, বাঙলার প্রতিবেশে লালিত কবি সৈয়দ সুলতান সুদূর আরবের আবহ নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্যে হিন্দু পুরাণ, ও দেশজ আচার-সংস্কারের ভিত্তিতে এদেশের সামাজিক, নৈতিক ও পার্বণিক জীবনের আলেখ্যই আরবী-জীবনের বিনামে চিত্রিত হয়েছে।

ক. তাই আদম-হাওয়া বাঙালী গৃহস্থ ও গৃহিণীর মতোই সংসার করেন। আদমের চাষাবাদের জন্যে ফিরিস্তা :

> বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিলা।
> ইষ কুঁটি লাঙ্গল যে তাতে শোভে ফাল
> সাপটা আনি জিব্রাইলে দিলেন্ত ততকাল।
> এক গাভী আনি দিল দুগ্ধ খাইবার।
> কেহ নে' বৃষ-গাভী, কেহ নে' তণ্ডুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই চরণগুলো শিবায়ণের শিবের কৃষিকর্মের উদ্যোগের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। হাওয়া বিবিও 'সন্দেশ সিদ্ধ করিতে লাগিল' এবং 'সিদ্ধ হৈল সন্দেশ দেখিয়া অনুপাম' স্বামী-স্ত্রী দুজন পরম তৃপ্তির সাথে আহার করলেন। এ যেন হর-পার্বতীর সংসার। আদম-হাওয়ার প্রেমও গভীর। এ যেন নাটকের নায়ক-নায়িকা; আদম হাওয়াকে বলছেন :

তোমার দরশনে মোর নয়ন চকোর
রহিছে অমিয়া আশে হই মতি ভোর।

হাওয়াও তখন : বঙ্ক নয়ানে হেরি ঈষৎ হাসিল
ভুরু যুগ কটাক্ষে শর সান্ধি মারিল।
হাওয়ায় আদম মন-পক্ষী কৈলা বন্দী।

খ. সৈয়দ সুলতানের সমকালে ইসলাম ছিল মারফতঘেঁষা। জ্ঞানপ্রদীপ প্রসঙ্গে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই মারফততত্ত্ব একান্তভাবে ইসলামী ছিল না। এর ভিত্তি ছিল যোগ ও দেহতত্ত্ব।

তাই রসুলে আরব সব করি মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জন্মাইলা জ্ঞান।

কিংবা ওমর বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জন্মাইলা জ্ঞান

হিন্দুর মধ্যে দেখি সূর্যপূজা, বলিপ্রথা এবং রাধা-কৃষ্ণ লীলা-প্রীতি। শেষোক্তটি নিশ্চিতই গোড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবের সাক্ষ্য। সৈয়দ সুলতান এই নব মতের প্রচার ও প্রসার স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন হোলী উৎসব, শুনেছেন কীর্তন। তাই গোপী-কৃষ্ণ প্রণয়-লীলার এমন জীবন্ত ও মনোরম বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

গ. সমাজে মৃতের কল্যাণে দান-খয়রাত ও শ্রাদ্ধ-জেয়াফত প্রভৃতির রেওয়াজ ছিল

: বাপের কারণ দান ধর্ম বহু কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা।

ঘ. ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ-জ্যোতিষীর প্রভাব রাজদরবার থেকে পর্ণকুটির অবধি সর্বত্রই সমান ছিল

পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

চ. মুসলিম সমাজেও পণ ও যৌতুক দানের প্রথা ছিল। ফাতেমার বিয়েতেও রসুল যৌতুক দিলেন। মুসা নবীও বিয়ে করে যৌতুক পেলেন।

মুসাকে : শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. শুভকর্মে তিথি-নক্ষত্র-ক্ষণ-লগ্ন মানা হত :

সন্তানের বিদ্যমান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

জ. পর্দাপ্রথায় শৈথিল্য ছিল না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলাও ছিল নিষিদ্ধ :

মুসাএ বুলিলা তুহ্মি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ন নারী দেখিবারে উচিত না আছে।

ঝ. মুসলিম সমাজে কদমবুচিও চালু ছিল :

বাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।

ঞ. পিতৃভক্তির মহিমাও ছিল পরশুরামের কালের মতো :

জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়াএ।

ট. আতিথেয়তাকে ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হত :

কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জাএ
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পাএ।

ঠ. মূর্তিপূজা, পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, গুরুনিন্দা এবং কোনো লোককে ছলে দাসে পরিণত করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে বিবেচিত হত :

প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ।
ভিন্নজন প্রকারে যদি সে করে দাস
আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস।
গুরু নিন্দা করে যেই সেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।
— এই চারিপাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।

ড. মানুষ সাধারণভাবে দেব-নির্ভর, কুসংস্কার-প্রবণ, দারু-টোনা, তুকতাক ও ঝাড়-ফুকে এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসী ছিল। সে-বিশ্বাস অবশ্য আজো অম্লান :

১. দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

— এসব অশুভ লক্ষণ।

২. বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।
৩. ফিরিস্তা সকলে তন্ত্র মন্ত্র শিখাইলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢ. সেকালে গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করতে হত, বারোয়ারী টোল-মাদ্রাসা ছিল বিরল। সাধারণত একক গুরু-উস্তাদের কাছে লেখাপড়া করতে হত। নবী ইদ্রিসকে তাই তাঁর মা—

পড়িবারে উপাধ্যায় হাতে সমর্পিলা।

নারীশিক্ষাও ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের কোরান পাঠ করার মতো শিক্ষাদানে মুসলমান সমাজে উৎসাহের অভাব ছিল না কোনোদিন। উদার পিতামাতার কন্যা উচ্চশিক্ষাও পেত। রসুল-চরিতে এক নারীর সম্বন্ধে শুনি : সে নারী পণ্ডিত ছিল যথ মর্ম বুঝি পাইল।

ণ. মুসলমান সমাজেও কৌলীন্য-চেতনা ছিল। তবে তা কেবল জন্মসূত্রে লব্ধ নয়, কর্মগৌরবেও লভ্য। শিক্ষায় ধন, ধনে কৌলীন্য। অতএব, আজকের মতোই মুসলমান সমাজে (এবং হিন্দু সমাজেও) কাঞ্চন কৌলীন্যের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চে।

ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হএ যথ কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবার।

তুলনীয় : অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
অকুলীনে ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।

কবি মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ' গ্রন্থে পাই :

ধনহীন দাতার বিপদে মনে দুখ
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনহীন স্বামী প্রতি প্রেম ছাড়ে নারী
মধুহীন ফুল যেন লএ শুক শারী।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক।
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর [সত্য ও কলির তর্ক]

হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। যেমন :

নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
আক্ষাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।

আবার, এহেন ধীবর সমাজেও আতরাফ-আশরাফ ভেদ আছে। তাই নবী সোলায়মানের সঙ্গে ধীবর-কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে ধীবর কন্যাকে ভর্ৎসনা করে বলছে :

জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে।

কথায় কথায় লোকে বংশগৌরবের গর্বও প্রকাশ করত :

ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আমি দুই ভাই।

ত. বিবাহোৎসবে মারুয়া বাঁধত, জলুয়া দিত, গস্ত ফিরাত, সহেলা গাইত আর তেলোয়াই দিত। এবং 'যথেষ্ঠ সুগন্ধি অঙ্গে করিত লেপন'। মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা, আঙুর, খোর্মা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আহার্য বলে গণ্য হত। সাবান ছিল না বটে, কিন্তু স্নানকালে:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগুরু, চন্দন, আতর, কাফুর, কেশর
লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর।
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।

আর স্নানান্তে আবার 'যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লেপিত।'

এবং 'সূর্মা-কাজল দোহ নয়ানেত দিত'। এ ছাড়া বাজি পোড়াত, নাচগান করত, নানা বাজনা বাজাত।

এসব ছাড়াও নারীর আভরণ, যুদ্ধাস্ত্র, ফুল, বাজি, প্রসাধন সামগ্রী, শাড়ীকাঞ্চুলি, ইজার-কাবাই প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে রয়েছে।

আর যে-সব উল্লেখ্য বিষয় রয়েছে, তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হল। এবং পরে সৈয়দ সুলতানের সমকালীন চট্টগ্রামের সমাজ-সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক চিত্রও দিতে চেষ্টা করেছি।

নারীর আব্রু : মুছাএ বুলিলা তুমি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ন নারী দেখিবারে উচিত না আছে।

কন্যা সম্প্রদান : ক. শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র-অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।

প্রতিযোগিতায় বরের যোগ্যতা বিচার :
সভানের আগে যে পড়এ কোরান
বিভা দিবা ফাতেমারে সেই বীর স্থান।
তবে সভানের মধ্যে কোলাহল ভাঙ্গিব
যে আগে কোরান পড়ে সে জনে পাইব।

শুভলগ্ন : গ. সভানের বিদ্যমান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

বিবাহোৎসবে জলুয়া : সখীসবে কুমার কুমারী পাটে তুলি।
জলুয়া দিলেন্ত দীয়া করি হুরাহুরি।

দৈবজ্ঞ, অদৃষ্ট :
পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
... শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

লোকাচার ও লৌকিক শাস্ত্র : ক. কুকুরের লোম যথা পড়িয়া থাকএ
সেই স্থানে ফিরিস্তা সকল না মিলএ।
গাভীর গোবর যথা করএ লেপন
সেই স্থানে ফিরিস্তার নাহিক গমন।
বসন না থাকে যদি মুণ্ডের উপর
না হএ ফিরিস্তা সেই সভান গোচর
খ. করপদ হোন্তে নখ কাটিতে উচিত
দেখিতে দীর্ঘল নখ লাগএ কুৎসিত।

ফাতেহাখানি, শ্রাদ্ধ : বাপের কারণে দানধর্ম বহু কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বোপার্জিত ধনের ক. আপনার দুঃখের অর্জন দ্রব্য যেবা খাএ
মর্যাদা : এহলোকে পরলোকে সুখপদ পাএ।
শুদ্ধদ্রব্য খাইলে তার হএ বাক্য সিদ্ধি
প্রভুত যে-কিছু মাগে পায় নিরবধি।
খ. যাহার আছএ জ্ঞান নামাগএ প্রভু স্থান
যে দিবেক দেউক আপনে।
লৌকিক বিশ্বাস : ক. সর্পের উদরে আজাজিল প্রবেশ করেছিল
এ কারণে সর্পে গরল উপজিল।
খ. নিশি দিশি প্রহরে প্রহরে দূতবরে
কুক্কুটের মুণ্ডে সেই দণ্ডবারি মারে।
দণ্ডাঘাতে সেই কুক্কুট রোল করে যবে
পৃথিবীকে কুক্কুট সবে রোল করে তবে।
দুর্লক্ষণ : দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘনঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।
কদমবুচি : বাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।
নৈতিক ; ক. আতিথেয়তা :
কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জায়
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পায়।
খ. মুমীনের কর্তব্য :
অন্নবস্ত্র দান কর দেখিয়া দুঃখিত
মিছাবাক্য বহুল না বোল কদাচিত।
মিছা সাক্ষি না করিবা না বুলিবা মন্দ
খেমহ মনের ক্রোধ খেমিবারে দণ্ড।
পরধন পর নারী না করিবা চুরি।
মান্যজন সন্তোষিবা মনে মান্য করি।
গ. একাগ্রচিত্ততা :
নয়ন চঞ্চল চিত্ত দশদিকে ফিরে
প্রভুর ভাবেত মন রহিতে না পারে।
ঘ. পিতৃভক্তি :
জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়ায়
ঙ. স্মৃতিপূজা :
স্মৃতি পূজা ভাল নহে যেন।
চ. অহঙ্কার :
আপনেহ আপনা মহিমা না কহিও
আন হোন্তে আপনাকে অধিক না জানিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারিলা যদি সে মহিমা আপনার
সর্বথাএ টুটিব মহিমা আপনার।

যাদু ও টোনা : বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা কবি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।

এতিমের প্রতি দয়া : রসুলে শিশুর বাপ নাহি হেন জানি
সজল নয়ানে বোলাইলা পুনি পুনি।

বংশগৌরব ক. নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
ও আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোন জাতি।
বর্ণ-বিদ্বেষ : দেখিলা ধীবর সব পাতিয়াছে জাল
বাঝিয়াছে জালে মৎস্য অধিক বিশাল।
ধীবরে শুনিলা যদি দুহিতার বোল
গালি দিয়া গজ্জিবারে লাগিলা বহুল।
তাহাকে না চিনি তোকে দিমু কি কারণ
পুনি না কহিও মোত এমত বচন।
জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গজ্জিবেক মোরে।

গ. ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আহ্মি দুই ভাই
সুচরিতা ভগ্নিক রাখিমু কার ঠাঁই।

AMARBOI.COM

হিন্দুয়ানী সংস্কারের প্রভাব :

ক. ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।
অথবা, রসুলে আরব সব করি মুসলমান।
যোগপন্থ জানাইলা জন্মাইলা জ্ঞান।

খ. দ্বিতীয় আকাশ হীরার এবং বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাঝার।
ষষ্ঠ আকাশ রজতের এবং দৈত্যগুরু শুক্র তাহার মাঝার।

গ. মৃত্যুর লক্ষণ : অধঃরেত শিবশক্তি লিঙ্গেত রহিল।...
ইচ্ছাসুখে শিবশক্তি জীবাত্মা দিলা।

ঘ. যোগিনী : ১. ধরিমু যোগিনী বেশ কর্ণে নিমু কড়ি
এক হাতে পাত্র আর করে দণ্ড বাড়ি।
অঙ্গেত লেপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কোথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।

২. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

উপমা–উৎপ্রেক্ষায় :

ঙ. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি

চ. পূর্বে রাম রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।

ছ. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে।

জ. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ. সৃষ্টিপত্তন : আহাদ ও আহমদের পারস্পরিক দৃষ্টিরসে :
ঘর্ম থেকে মন্ত্র, মন্ত্র থেকে ২৭ ব্রহ্মাণ্ড, তারপর জীবাত্মা-পরমাত্মা ও অনল বর্ণের জল সৃষ্টি।

ঞ. গন্ধর্ব : নবীর মহিমা শুনি গন্ধর্বের পতি ...
গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।

ট. পশুপক্ষী সুরাসরে যক্ষ দানব নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।

ঠ. সিন্দূর : শিযের সিন্দূর মুছি কৈলা দূর
নারীরা, 'ললাটে তিলক করি সিন্দূর' (পরত)

ড. সূর্যপূজা ; অনুদিন দিবাকর পূজে নরগণ।
উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।

ইসলামী সংস্কার :

ক. আদমের বাক্য শুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার
তার মোর নহে ভিন এক অংশ পরাচিন
পিরীতি বড়হি মোর তার।

খ. তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার
শত্রু মিত্র ভেদ নাহি নিকটে তোমার।
... সে যে প্রভু নৈরাকার ত্রিভুবন নাথ
ভালমন্দ সমসর তাহান সাক্ষাত।

ত্রিগুণাতীত শিবের ধারণা স্মর্তব্য।

গ. খদিজা : ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

ঘ. আল্লাহর উক্তি : আপনার অংশে আমি সৃজিছি তোমারে
অদ্বৈতবাদ তুমি আমি একত্রে আছিল অনুদিন।
সভানের স্থানে তুমি যাই তোমার স্থান
সভানে ব্যাপিত হই আপনে রহিছ।

ঙ. মুহম্মদ আল্লাতে লীন ছিলেন,
পুষ্পেত আছিল যেন গন্ধ ছাপাইয়া।

জীবন : জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।

শবদাহ : যদি বা পূর্বের শাস্ত্র আছিল লিখন
মৃত্যুকালে আনলেত করিতে দাহন।
আনলের সৃজন আছিল সেইকালে
তেকারণে আজ্ঞা দিলা দহিতে আনলে।
একালের নর সব মাটির সৃজন
মৃত্যু হইলে মাটিতে গাড়িব সর্বজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার্মিক জীবন : ক :	সর্বথায় না রহুক মূরতী সেবিয়া
নূহ্ নবীর বাণী	পরধন পরনারী না করুক চুরি
	সরা পান না করৌক না করৌক দারি।
	মিছাবাক্য না কহৌক ধর্মে দেউক মন
	পরহিংসা পরমন্দ তেজ সর্বক্ষণ।
	পবিত্র রহৌক অতি সিনান আচার।
খ. রসুলের বাণী :	পত্রেত আছিল লেখা নমাজ করিতে
	মূর্তি সব না সেবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে
	আর লেখে পৈতা ছিঁড়ি ফেলিতে ব্রাহ্মণ
	আল্লার সেবাতে মন দেউক যত্তন।
	কলিমা কহুক লই রসুলের নাম
	পরনিন্দা পরহিংসা তেজিয়া অকাম।
	মালের যাকাত দিব রোজা একমাস
	মুসলমানী দীন সবে করিতে প্রকাশ।
শহীদ :	যে সকল নরগণ রণে কাটা গেছে
	সে সকল মরা নহে জীবন্ত আছে।
ক্ষমার অযোগ্য	মাত্র প্রভু চারি পাপ ক্ষেমিতে না হএ
পাপ :	প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
	বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ
	ভিন্নজন প্রকারে যদি সে করে দাস
	আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস
	এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।
যমের ভূমিকা :	মুঞি যে জানিও সব করিব সংহার
	যুবতীর কোল হোন্তে লই যাইমু ভাতার।
	বাপ হোন্তে পুত্র নিমু, পুত্র হোন্তে বাপ
	যুবতীক হরি পুরুষের দিমু তাপ।
	সহোদর হোন্তে নিমু সহোদরগণ
	মিত্র হোন্তে মিত্র নিয়া করি অদর্শন।
জীবন-বৃক্ষ :	বৃক্ষ এক সৃজিয়াছে আকাশ উপর
	সংসারেত জন্ম হয় যত জীবসব
	সেই বৃক্ষেতে জন্ম হয় এথেক পল্লব
	সে পত্রেত লেখা আছে এথ জীবগণ
	কথক্ষণে কথদিনে হইব নিধন।

আরবী রীতি :

ক. দোষ খণ্ডাইতে যদি নারী ডালি পাইলা
রসুলে নারীর নাম 'হাজারা' রাখিলা
যে সকলে দোষ খণ্ডাইতে ডালি হএ
আরব সকলে তারে 'হাজারা' বোলএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. সাগরে ভাসিয়া যাইতে যেবা পাএ যারে
আরবের লোকে 'মুসা' করি ডাকে তারে।

রণনীতি : ভাল দ্রব্য দেখি রণে না করিবা মন
যেরূপে ভেদিবা ব্যূহ করিবা যত্তন।

বীরব্রত : কাফির সবেরে দেখি মনে পাই ভএ
রণেতে প্রবেশ তুহ্মি যদি না করএ।
এলাহির কৃপা তবে না হএ বিশেষ
সে সকল নরকেত করিব প্রবেশ।

রাজব্রত : অকর্ম করিলে শাস্তি দিবারে কারণ
ভালরূপে নরগণ করিতে পালন।
মহাজন সকলের করিতে গৌরব
দুর্জন অশিষ্ট হৈলে করিতে লাঘব।
নৃপতিএ যদি ভাল মন্দ না বিচারে
সে দেশেত উচিত না হএ রহিবারে।

হযরত মুহম্মদের মহিমা ও অদ্বৈততত্ত্ব :

ক. মুহম্মদ নামে তান প্রধান রসুল
পৃথিবীতে কেহ নাহি তান সমতুল।
তান প্রীতিরসে ভুলি প্রভু নিরঞ্জন
সৃজন করিলা প্রভু এতিন ভুবন।

খ. আহাদ আহমদ মহানুর ভিন
এই মহানুর মধ্যে ত্রিভুবন চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহানুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।

গ. যে দেখিল নুর মোহাম্মদের বদন
জগতেত আউলিয়া হৈল সেই জন।
যে দেখিল পুনি মোহাম্মদের লোচন
জগতেত পণ্ডিত হৈল সেই জন।
পিষ্ঠভাগে নুরের দেখিল যেই সবে
কাফির হইয়া সেই জন্মিলেক তবে।

নারকীর তালিকা :

ক. আল্লার সমান হেন আছে জানে।
খ. রসুল সবেরে যদি কেহ মিছা কহে।
গ. প্রলয় না হৈব বুলি যে সকলে বোলে।
ঘ. হিসাব (হাসর) না হৈব বুলি যে-সকলে বোলে।
ঙ. যেখানে মাটি হোন্তে হইছে সৃজন
সেখানতে যদি বোলে না হৈব নিধন।
চ. নমাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছ. কলিমা না পড়ে যেবা না করে জাকাত
যাইতে পারিলে যদি না যায় মক্কাত।
জ. যে সকলে সুরা পান করিতে আছএ।
ঝ. রজঃস্বলা নারী যদি করএ বেভার।
ঞ. মাতা-পিতা গুরু না মানে যেই জন।
ট. পরনিন্দা পরচর্চা পর-অকাম কহএ যদি।
ঠ. মনুষ্যের অকর্ম প্রচারে যেইজন।
ড. ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই।
ঢ. আলিমে নয়ানে দেখি মান্য না করিলে।
ণ. রতি ভুঞ্জি যে সকলে না করে গোছল।
ত. পরনারী দেখিয়া লোভে দৃষ্টি করে।
থ. ইষ্টমিত্র ভাই বন্ধু না করিলে দয়া।
দ. সাচা সাক্ষি না দি' যদি মিছা সাক্ষি দিল।
ধ. নৃপতির আগে কিবা পাত্রগণ স্থান।
যাই যদি 'না ডরাই' কহে কোন জন।
ন. পরের সম্পদ দেখি যে করে পিষুণ।
প. ভিক্ষা করিবারে যদি আইল দুয়ারে
গালি দিয়া কহে যদি বোলে মারিবারে।
ফ. কেহ যদি কার ধন বল করি লয়।
ব. দুইজন মধ্যে যদি ভেজায় কোন্দল।
ভ. পিতাহীন শিশুর কাড়িয়া খাইছে ধন।
ম. যে সকলে বাড়াধন তঙ্কা লাগাই খাইছে।
য. অনুদিন পতিসনে করিয়াছে দ্বন্দ্ব।
র. আনকার্যে যদি দিয়া থাকে গুপ্ত কড়ি। [ঘুষ] ইত্যাদি।

ফুলের নাম :

মাধবী মালতী লতা চম্পা নাগেশ্বর
জাতী যুথি লবঙ্গ কেতকী বহুতর।
বক ভূমিকেশর যে টগর ভূরাজ।

ঠ. নারী সম্বন্ধে :

পতি-মাহাত্ম্য : পতি যে নারীর গতি পতি সে ভূষণ
পতি সে কণ্ঠের হার পতি সে জীবন।
পতি বিনে অলঙ্কারে কিবা আছে কাজ
না শোভে বিধবা নারী রমণী সমাজ।

নারী ও পুরুষের সম্পর্ক : আনল নিকটে চাহি ঘৃত না রাখিতে
রাখিতে না চাহি মাংস কাকের সম্পাস
না রাখি ভ্রমর কাছে কুসুম বিকাশ।
মোমের দীয়টি যেন সুগন্ধি রাখিল।

৩. ত্রিয়া জাতি বড় শক্তি নানা উপদেশ ভক্তি
দম্পতির মধ্যে যে উত্তম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ড. অনুশোচনা মাহাত্ম্য :

আঁখির পড়িত জল অনুশোচ করি
আপনা মানিয়া মন্দ ধর্ম অনুসারি
নয়নের জলে পাখালিয়া যাইত পাপ
মন দুঃখে দূর হইতে মনের সন্তাপ।

ঢ. গুরুনিন্দা : তেকারণে গুরুনিন্দা করে যেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।

ণ. জ্ঞান :

১. পৃথিবীতে জ্ঞান হোন্তে ভাল নাহি আর
নিরঞ্জন সহিতে দর্শন হয় তার।
জ্ঞান যদি পাইল না লম্ভে তারে পাপে
যথেক এ কর্ম দূরে যাএ জ্ঞান তাপে।

২. জ্ঞানের কারণে নহে পাপের প্রবেশ।

মানবিক বৃত্তির সুকোমল প্রকাশ :

ক. মাতৃস্নেহ :
জননী পুত্রেরে ধরি শিরে দুই করে
রাখিছিলা কতক্ষণ শিরের উপরে।

খ. করুণা :
এসবে (যুদ্ধবন্দী) আপনা ধনে লউক কিনি
প্রাণরক্ষা করহ না কাট আর পুনি।

গ. পূর্বে বিবি খদিজাএ করের কঙ্কণ
দুহিতাক দিয়াছিল জড়িত রত্তন।
স্বামী উদ্ধারিতে সেই কঙ্কণ পাঠাইলা
সে কঙ্কণ রসুলে খদিজার হেন চিনিলা।
রুদিতে লাগিলা নবী খদিজা-গুণ স্মরি
দুহিতার পতির নাম বহুল বিসারি
মনে সেই স্নেহ ভাবি করিলা কান্দন
দুহিতার ফিরাইয়া দিলা সেই কঙ্কণ।

ঘ. খদিজার মৃত্যুতে রসুলের শোক :
কঠিন পাষাণ দেহ না যায় বিদার
তাহান বিচ্ছেদ আক্ষি নারি সহিবার।
দোহান যদি একত্রে মরিয়া যাইত
তবে কার শোক কার মনে না লাগিত।

ঙ. রসুলের বাৎসল্য (ফাতেমার প্রতি) :
মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন
তুমি মোর আঁখির পুতলি
মোর চিত্ত বৃক্ষফল তুমি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুমি কলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. ইটের গোহারী : [সংবেদনশীলতা]
(রসুল) মোরে দহি খণ্ডাইল বেদনা আপনার
না চিন্তিলা নিজমনে বেদনা আমার।
আপনার শরীর কিবা আনের শরীর
একদেহ হেন জানিতে উচিত নবীর।

প্রাণের মর্যাদা ; আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন।

ছ. জ্ঞাতিপ্রীতি ;
এক মোর জ্ঞাতিগণ আর ইষ্টজন
কার্য নাই এ সকল করিতে নিধন।
নারী সব বিধবা হইয়া গালি দিব।
মোর প্রতি জ্ঞাতি সব অযশ ঘোষিব।

জন্মভূমি : [স্বদেশ প্রীতি] জন্মভূমি পূণ্যদেশ দেখিবারে শ্রদ্ধা বেশ
স্মরণে হৃদয় ফাটি যায়

ঝড়বৃষ্টি : ঝড়বৃষ্টি হৈল অতি অন্ধকার হৈল রাতি
বিজুলি চমকে ঘন ঘন
কাকে কেহ না দেখএ আত্মপর পরিচয়
না পাওন্ত আরবের গণ
অশ্ব উট সারি সারি রহিল ভূমিত পড়ি
কোন দিকে যাইতে নারিলা।
যত তাম্বু সামিয়ানা ধ্বজছত্র যথ বানা
বাতাসে উড়াই যথ নিলা
আপনার হাত পাও না দেখে আপনা গাও
না দেখে আপনে আপনারে
বরিষএ অনিবার নিশি হৈল অন্ধকার।
কেহ কারে চিনিবারে নারে।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ : রথ, হস্তী, অশ্ব, বাণ, ছেল, গদা, ভিন্দিপাল, গুর্জ, নারাচ, নালিকা, সিফর, মুদগর, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, চন্দ্রবাণ, বজ্রবাণ, বিষবাণ, খঞ্জর ইত্যাদি।

অলঙ্কার : ১. সোনার অঙ্গুষ্ঠ আনি শ্রবণে পরাইলা।
ফুলিফুটি পিনতুর পরিল শ্রবণে।

কঙ্কণ, অম্বর, কটির চন্দ্রহার, নুপুর, কিঙ্কিণী, মুক্তাহার কুণ্ডল।
পোশাক ; কাবাই, বেলন পাটের শাড়ি, ঘাঘরা, কাঞ্চুলি।
প্রসাধন সামগ্রী : অগুরু, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, সিন্দুর।
হিন্দুর পার্বণিক পূজাচিত্র : রাজা দানিয়ালের প্রাসাদে :

১. সভান সহিতে রাজা মূরতি পূজএ
আনন্দ উৎসব সবে বহুল করএ।
পুষ্ট অজ আনিয়া দেয়ন্ত বলিদান
কাঁস করতাল বাহে করি সুরা পান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ সভা মধ্যে নারী করএ শৃঙ্গার।
লাজ ভয় এক নাহি পশু ব্যবহার।
পশু মেলে পশু যেন শৃঙ্গার করএ
তেহেন শৃঙ্গার করে মনুষ্য মেলএ।
শঙ্খ বাদ্য নানা যন্ত্র বাহে লাস বেশে
কাক মনে ভয় নাহি মনের উল্লাসে।
২. সিনান করিয়া তবে যথ পাপীগণ
যন্ত্রসব আনিয়া যে করত নাচন
পুষ্ঠ অজা আনিয়া যে দেয়ন্ত বলিদান
নাচন্ত গাহন্ত সবে সভা বিদ্যমান;
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু মূর্তিরে বোলএ।

মিশর ও শামের মধ্যবর্তী হামসা রাজ্যের নৃপতির দুর্নীতি :
১. বস্তুজাত লই তথা (হামসা) গেলে সাধুগণ
অবিচারে দান লয় লুটে সর্বধন।
বলে ছলে ঘাটিয়াল পাপী দুরাচার
বহু দান সাধে আজ্ঞা পাই নৃপতির
লয় যথ ধন দেখে সাধুরে না দিয়া
ভাল দ্রব্য যথ পাএ লই যাএ লুটিয়া।
২. আর এক কর্ম করএ দুরাচারে
নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে
সুচরিতা নারী পাইলে লই যাএ কাড়িয়া। ...
নিষ্ঠা আছে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতি শৃঙ্গার করে সে নারীক ধরি।

সায়রার স্বয়ম্বর সভা :
[সারা] রাজাসব পরি আইল উত্তম বসন।
নানা অলঙ্কার যথ করিয়া ভূষণ।
অশ্ব আরোহণ করি, গজ কান্ধে চড়ি
আইল গন্ধর্ব যব তেজি সুরপুরী।
রাজাসব বসিতে আসন আনি দিলা
একে একে সিংহাসনে সকল বসিলা।
চর্তুসম মৃগমদ ভৃঙ্গারের জল।
কস্তুরী কাফুর যথ সুগন্ধি সকল।
নৃপতি আপনা করে সহরিষ মন।
রাজা সকলের গাএ করিয়া লেপন।
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল আগে দিয়া
সভানের সমুখে রহিল দাণ্ডাইয়া।
মোহোর নন্দিনী ইচ্ছাবর মাগে নিত
বহাহ বসিতে চাহে সুবর সহিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যা বিদায় : জনক জননী দুই কান্দিলা অপার
ও
যৌতুক, একই দুহিতা ছিল না ছিল আর।
(সায়রা-ইব্রাহিম আজ্ঞা দিলা পতির সহিত যাইবার
দম্পতি) বহুল যৌতুক আনি লাগিয়া দিবার।
দাসদাসী অশ্ব-উট বহু অলঙ্কার
দিলেক বহুল আনি কুমারী নিবার।
(ইব্রাহিমকে) রসুলক সম্বোধিনা বুলিলা নৃপতি
মোহোর দুহিতা যাএ তোমার সংহতি।
ভালরূপে গৌরব করিবা তুমি তানে
বিরস না জন্মে হেন কুমারীর মনে।
তুলনীয় : কুলীনের পো তুমি কি বুলিব আমি ...
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও, পেট পুরে ভাত, (শিবায়ন)

এমনি অনুনয় অন্যত্রও মিলে। [মধুমালতী, সিকান্দরনামা দ্রষ্টব্য]।

আবদুল্লাহর রূপ :

মুণ্ড অতি সুগঠন চিকুর নিন্দিয়া ঘন
কস্তুরী জিনিয়া আমোদিত
ললাটের পাট অতি ঝলকে নির্মল জ্যোতি
ঘর্মবিন্দু মুকুতা গ্রথিত।
জিনি ধনুর্গুণ বাণ লোচন সুকামান
মৃগাক্ষ খঞ্জন গঞ্জন
নাসা তিল ফুল জিনি যেন গরুড় ফণী
সুগন্ধি নিশ্বাস বহে ঘন।
সুন্দর শরীর অতি গঠন সুবেশ ভাতি
মুখপদ্ম জিনিয়া প্রকাশ।
অধর সুরঙ্গ অতি দশন মুকুতা পাঁতি
হাস অতি সুধারস ধার
সে মুখের 'পর জ্যোতি' ঝলএ সঘন অতি
দিবাকর কিরণ প্রকার।
অঙ্গের সুগন্ধি পাই ষটপদগণে ধাই
উড়ি পড়ে জানিয়া উদ্যান
পুষ্প হেন অনুমানি মকরন্দ হেন জানি
শ্রম জলে করে গিয়া পান।

মুসলিম বিবাহোৎসব :

নারি সব আপনার ডাকিয়া রসুলে
ফাতেমার : সভানেরে আদেশ করিলা কুতূহলে।
বিবাহ তুহ্মি সবে বিবি ফাতেমাক বিভা দিতে
উপহার দ্রব্য আনি রাখ সমাহিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রসুলের মুখে শুনি উৎসবের কথা
যথেক মহিষীগণ হইলা উল্লাসিতা।
মাবিয়া কিব্রিক ডাকি রসুলে কহিলা
সুগন্ধি সকল সজ্জা করিতে বুলিলা।

স্নানের উপকরণ :

আগর চন্দন আতর কাফুর কেশর
লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।
যথ বিবিগণে মিলি গোসল করাইলা
শুকুল বসন সব অঙ্গেতে পরাইলা।
যথ আভরণ আছে পৈরাই সকল
আকাশেত শশী যেন উদিত নির্মল।
যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেতে লিপিলা
সুর্মা কাজল দোহ নয়ানেতে দিলা।
শিশি পরে রাখিলেন্ত আবীরের রেণু...

ভোজ : ভালরূপে করিলা বিভার মেজোয়ানি
উপহার দ্রব্য যথ খাইতে দিলা আনি।

নারী মজলিস : বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ
নারী মেলে বসিলেন্ত যথ নারীগণ।

আপ্যায়ন : মিষ্টি অন্ন এই সবেরে করাই ভোজন
যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিলা লেপন।
মধু ঘৃত দধি সর্করা যথেক আনিয়া
যুবতী সকলে খাইবারে দিলেক আনিয়া
উপহার ফল যথ দিল খাইবার
আঙ্গুর খোরমা আদি বিবিধ প্রকার।

সহেলা বা বিবাহ মঙ্গল : ফাতেমাকে বিভা দিতে আসিয়া সকল
সহেলা গাহন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।

আইসরে আইসরে গাই
ফাতেমার বিবাহ মঙ্গল। ধু
সে সকলে বিভা করে ফাতেমা বিবির বরে
জন্ম জন্ম রহুক কুশল।
যথ কুলবতী নারী বস্ত্র অলঙ্কার পরি
দেখ আসি ফাতেমার বিহা
ফাতেমার বিভা দেখি বর মাগ হৈয়া সুখী
পতি সনে হইতে স্নেহা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাহের আসর সজ্জা :

যথেক আরবগণ হই হরষিত মন
বান্ধিল আলাম [আমাল?]
চারিদিকে মারোয়ার অন্তস্পট শোভাকার
চতুর্দিকে শোভে ঝলমল
কির্মিজের তাম্বু অতি চমকে বিজুলি জুতি
স্থানে স্থানে টানাই রাখিলা
মুকুতা প্রবাল জ্বলে চৌদিকে চামর দোলে
যথ আর চান্দোয়া টানাইলা।

বাদ্য : চতুর্সমে ভরি অঙ্গ করন্ত বিবিধ রঙ্গ
কবিলাস রবাব বাজাএ
ঢাক-ঢোল দারি কাঁসি মৃদঙ্গ দোতারা (দোছড়ি) বাঁশি
বাজায়ন্ত ডেউল কন্নাল
দুন্দুভির শব্দ অতি মোহরি (ডম্বর) ঝাঁঝরি তথি
দফ-ভঙ্গ শুনি লাগে ভাল
উন্মত্ত যৌবন নারী নানা বর্ণ বস্ত্র পরি
আনন্দে সহেলা সবে গাএ

মারোয়া : সেই মারোয়ার তলে সুগন্ধি দেউটি জ্বলে
বহুল ফানুসজ্বলে নিত লোবান সিঞ্চন্তি সবে নিত
মোজামির সারি সারি জ্বলেন্ত চৌদিক ভরি
নিয়াসম (?) সুগন্ধি পুরিত

ফাগুয়া : আবীর আম্বর আনি মিলি যথ নারী গুণী
কৌতুকে লইয়া মুঠি ভরি
কেহ কার অঙ্গে গিয়া মনেতে হরিষ হৈয়া
অঙ্গেত লেপন্ত মায়া ধরি।...
হাস লাস সবে করি কস্তুরী চন্দন পুরি
উল্লসিত সব নারীগণ

তেলোয়াই : বিবি ফাতেমার অঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে
মহাসুখে তেলোয়াই চড়ায়ন্ত।

কনে-স্নান : এয়ো সই মিলি করি অতি হুলাহুলি
ফাতেমার অঙ্গে সুগন্ধি লিপিল
সাত দিন সাত রাত তেলোয়াই করন্ত নিতি
জুমাবারে করাইলা গোসল।
সুগন্ধি পুরিত তনু শিরে আবীরের রেণু
পৈরাইলা বসন উঝল অমূল।

বরের গস্ত ফিরানো :

যথেক আরবে মিলি শাহ মর্দ আলি
গস্ত ফিরাই আনাইলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাই শুকুল বাস মোজামির জ্বলে চারিপাশ
চারিদিকে দিউটি জ্বালিয়া

বাজি : হাউই ছোড়ন্ত নিত মহাতাপ প্রজ্বলিত
নিশি হৈল দিবস আকার
আগর চন্দন পরি বসাইল আমোদ করি
চলিলেন্ত অতি শোভাকার।

নাট-গীতি : নটুয়ায় করে নাট রহি রহি বাট বাট
যন্ত্র সব বাজে চারিভিত
নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেউল কন্নাল সাজে
শুনি সর্বজন উল্লসিত।

তক্‌বীর : সর্বলোকে অবিশ্রাম লয়ন্ত আল্লার নাম
তক্‌বীর বোলন্ত অবিশ্রাম।

বিয়ের খোত্‌বা : দুই পক্ষ একত্তর ঠেলাঠেলি বহুতর
লাগিলেন্ত খোত্‌বা পড়াইবার।
রসুলে আপনা মুখে নিকাহ পড়াইলা সুখে
চারি শর্ত করাইলা কবুল

জলুয়া : তক্তের দোহান তুলি সভান জলুয়া বুলি
বর-কনের আশীর্বাদ করিলা বহুল।
সাক্ষাৎ দামাদ-কন্যা দেখি অন্যে অন্যে হৈলা সুখী
দেখি অতি জন্মিল পিরীত।

রণবাদ্য : ধ্বজছত্র পতাকা নানান বাদ্য বাজে
ও ভেউল কান্নাল শিঙ্গা নানা শব্দে সাজে।
ধ্বজছত্র দুমদুমির শব্দে মেদিনী টলমল
প্রলয় হৈল হেন জানিল সকল।

শিক্ষা : পড়িবারে উপাধ্যার হাতে সমর্পিলা
ইদ্রিসকে : নিরঞ্জনে ফিরিস্তা পাঠাই প্রতিনিতি
শিশুকে পড়াই কৈলা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
পণ্ডিত হৈল যদি বড়হি অপার
ইদ্রিস করিয়া নাম থুইলা তাহার।

বারোমাসী :
বিবি হাওয়ার বারমাসীতেও বাঙলাদেশ ও বাঙালী নারীকে পাই :

জ্যৈষ্ঠ অশিষ্ট ভেল তাপিত তপন
কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন।
দক্ষিণ সমীর মোর শমন সমান।
অনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ।
আষাঢ়ে সংসার ভরি জলে ব্যাপিত
পিউ পিউ পক্ষীনাদ অতি সুললিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহ্মার চাতক পিয়া রৈল দেশান্তর
জলদ হইয়া আহ্মি আছি একসর।
শ্রাবণ যখন বরিখএ জল ধারে
গিরি 'পরে শিখী সবে সুখে নাদ করে।
মুঞি পাপী শিখিনীর জলে নিল হরি
সন্তাপে সাগর মধ্যে রহি একসরী।
ভাদর মাসেত অতি বরিখে গম্ভীর
ঘোর অন্ধকার নিশি শূন্য এ মন্দির।
কীট সব কোলাহল শুনি মনে ভীত
একসর শয়নে কম্পিত চিত নিত।...

আশ্বিনে : কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করহুঁ লেপন
চন্দ্রিমার জোত মোর লাগে হুতাশন। ইত্যাদি।

আপ্তবাক্য, সদুক্তি ও বাক্যালঙ্কার :

ক. ক্ষুধাতে যে ব্যঞ্জন বিশেষ নাহি ভাএ

খ. লোকে ঈদ গুজারিতে হরিষ যেমত
শত্রুরে সন্তাপ দিলে হএ তেন মত।

গ. নয়ন-চকোর রহে শশোদর আশে
ভুরু যুগ দুই ধনু থুইলা তার পাশে।
দসন ডালিম্ব বীজ দেখিতে সুন্দর।

ঘ. নয়নের জল পড়ে জিনি শশোদর

ঙ. জল মধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।

চ. হতভাগী পুষ্প মুঞি আদম বিকাশ
মোহর ভ্রমর স্বামী নাহি মোর পাশ।

ছ. কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করই লেপন
চন্দ্রিমার জোত মোত লাগে হুতাশন।

জ. নিমবৃক্ষ রুপি যদি অমৃত সিঞ্চএ
কদাপি তার তিক্ত কভু না ছাড়এ।
সহস্র গাভীর দুগ্ধে ধুইলে অঙ্গার
স্বভাব কালিম কভু না যায় তাহার।

ঝ. সমুদ্রের কূল হই না হই সাগর
সূর্যের কিরণ হই নহি দিবাকর।

ঞ. জ্ঞানবন্তে অল্প শুনি বহু মানি লয়।

ট. অবোধ পতঙ্গ যেন আনলে সংহার

১. কালি কেনে দিতে চাহ ধবল বসনে

২. গরুড়ে ধরিতে নাগ চলি গেল আশ
যেহেন পবনে কৈল মউরে গরাস।
সিংহের তরাসে হএ কম্পমান করী
মত্ত হই যেহেন হরিরে ধরে হরি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. পুনরপি ইদ্রিসের প্রাণ ঘটে আইল
পক্ষী যেন বাসা হোন্তে নিকলি সমাইল।
৪. বেলন পাটের খোপা শোভএ উপাম।
৫. গাঁঠিত রত্তন আছে যত্তনে না রাখি
গুঞ্জার ভোলেত ভুলি রত্তন উপেখি।
৬. শুকনা গাছেত যেন আনল বাঝিল।
৭. য়েহেন পাষাণ হোন্তে বরিখএ জল
দহিছে বৃক্ষেত যেন ধরিয়াছে ফল।
৮. আল্লাহ – এ বুলিয়া রসুলক নিলা নিজ পাশ
রবির কোলেত যেন চন্দ্রের নিবাস।
৯. ঈষৎ হাসিয়া কহে চাণক্য (চতুর) বচন।
১০. খড়েগর চমকে যেন ছটকে বিজুলি।
১১. দুই সৈন্য মুখামুখি যদি সে হৈল
সাগরেত যেহেন তরঙ্গ উথলিল।
১২. কাকের সহিতে শুয়া রহিতে না পারে
মূর্খ মেলে পণ্ডিত রহিতে অনুচিত।
১৩. অতিবৃদ্ধ নারীর মুখ কালির বরণ
ঝাঁটারা মুণ্ডের কেশ দীঘল লক্ষণ।
১৪. শত্রুভাবে মন্দ কৈলে সবে জান পাএ
মিত্রে যদি মন্দ করে লক্ষণ না যাএ
গরল মিশায় যদি মধুর সহিত
সে গরল লক্ষিতে না পারে কদাচিত।
১৫. মৃগে যদি সিংহের সহিত করে রণ
নিশ্চয় জানিও বাপ আপনা নিধন।
সর্পে যদি গরুড় সহিতে করে বাদ
নিশ্চয়ই জানিও সাপ আপনা প্রমাদ।
১৬. শুকনা কাষ্ঠের যেন আনল ভেজাইলা
অবোধ পতঙ্গ যেন আনলে সংহার
মধুলোভে পুড়ি যায় আনল মাঝার।
১৭. আকাশের নক্ষত্র কি পড়িল ভূতলে।
১৮. কাটা কুক্কুটের মত হৈল ধড়ফড়ি।

খ. সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমকালীন কবির কাব্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতি চিত্র

ক. পটভূমিকা

বিদেশী, বিজাতি, বিধর্মী ও বিভাষী শাসক মুসলিমের সামাজিক সাম্য ও মানুষের জীবন আর কৃতির মূল্যবোধ নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুমনে যে জীবন-চেতনা ও কর্মের ক্ষেত্রে যে প্রসারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিগন্তের সম্ভাবনা জাগিয়ে দিল, তার ফলে হিন্দু-সমাজে ভাঙ্গন ধরে। এর প্রতিকার প্রয়াসে ভারতের দিকে দিকে ধর্ম সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী উচ্চারিত হতে থাকে। রামানন্দ, কবীর, নানক, রামদাস, বল্লভাচার্য, চৈতন্যদেব প্রমুখের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষ স্মরণীয়।

বাহ্যত ধর্মশাস্ত্রে ও ধর্মাচরণে অধিকার প্রাপ্তি, সামাজিক জীবনে মর্যাদা-লাভ এবং পেশার ক্ষেত্র প্রসারের প্রয়াসে এ ধর্মান্দোলন শুরু হলেও, আসলে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ রক্ষার এবং ইসলামের প্রসার রোধে অবচেতন চেষ্টাই ছিল এর মূলে। অনতিকাল পরে দণ্ডধর মুসলিম-শক্তির প্রসারে বাধাদানের কিংবা সম্ভব হলে মুসলিম বিতাড়নের সচেতন প্রয়াস হিসেবেও এ প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব আন্দোলনে এ মনোভাবের আভাস আছে আর শিখ সম্প্রদায়ে তা সক্রিয় প্রয়াসে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু এসব ইতিহাসবেত্তা বিদ্বানের বিশ্লেষণ ও ভাষ্য। গণদৃষ্টিতে নতুন পরিবেশে অজ্ঞ মানুষের হৃৎ-অরণ্যে যে মূক জিজ্ঞাসা ও বোবা বেদনা গুমরে উঠেছিল, তা এসব সন্তদের বাণীর মাধ্যমেই দিশা পেল—পেল ভাষা। এক্ষেত্রে কবীর (১৩৮০-১৪৪০) ও নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) দানই সবচেয়ে বেশি। কবীরের বাণীতে ছিল দুই ধর্মের তাত্ত্বিক সমন্বয় ও দুই জাতির মানস ঐক্য বিধানের ইঙ্গিত। এদিক দিয়ে তিনি গণ-মানবের দিল-কা-বাত যথার্থই অনুধাবন করেছেন এবং অভিব্যক্তি দিয়েছেন তাদের বদ্ধ বাসনার। দুই হৃদয়-সাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মজমু-অল-বাহরাইন ঘটানোর মহৎ কৃতিত্ব তাঁরই। এভাবে কবীর হৃদয় ক্ষেত্রে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও মিলনের যে বীজ বপন করলেন, তা-ই তাঁর পরবর্তী সাধক নানকের সমাজ সমন্বয় প্রয়াসে বিশেষ ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়। কবীর হৃদয়-অরণ্যকে উদ্যানে পরিণত করলেন, আর নানক সমাজ-জীবনে সমন্বয় ও ঐক্য সাধনের জন্যে যে মিলন-ময়দান রচনা করলেন, তা শাসক-শাসিতের দ্বান্দ্বিক জীবনে অনেকখানি মাধুর্য ও লাবণ্য দান করেছিল। আর এসব সন্তের বাণীর, কৃতির ও আচরণের প্রভাব সর্বাত্মক এবং সর্বব্যাপী যে হয়েছিল, তার সাক্ষ্য পরবর্তী কালের ইতিহাস সগৌরবে বহন করছে। ষোল শতকে গোটা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস তাই এক অপরূপ স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রলেপে উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

এসব নানা কারণে ষোল শতক ভারত-ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ শতক ভারত-মনীষার পরিণতি ও পরিণামের কাল এবং সে কারণেই অনন্য ও অসামান্য গৌরবের যুগ। য়ুরোপীয় বণিকেরা এ শতকেই এ দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে। শাসক-শাসিতের মানস ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কও এই শতকেই ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ়ভিত্তিক হয়। এ শতককে তাই রেনেসাঁসের যুগও বলা চলে। এ শতকের শেষার্ধ আকবরের শাসনকাল। তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি, ধর্মসমন্বয়ের মাধ্যমে একজাতি গড়ে তোলার ভিত্তি রচনার প্রচেষ্টা, তাঁর শিক্ষাসংস্কার, তীর্থ ও জিজিয়া কর রহিতকরণ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমাজ-সম্মত বৈবাহিক সম্পর্ক প্রবর্তনে উৎসাহদান, কৃষির উন্নতি ও কৃষকের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা, সতীদাহ নিবারণ প্রয়াসে কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি দেশে ও সমাজে নতুন জীবনের ও জীবনবোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করল। আকবরের অধিকার সারা ভারতব্যাপী ছিল না সত্য, কিন্তু তাঁর উদারনীতি ও প্রবুদ্ধ জীবনের প্রভাব ভারতের সর্বত্রই পড়েছিল।

ধর্ম ও আচার সমন্বয় প্রয়াসে আকবর নিজে 'example is better than precept' নীতি গ্রহণ করেন। তিনি রাজপুতকন্যা বিয়ে করেছিলেন। তিনি সূর্য ও অগ্নি স্তব করতেন। তিনি শাবান চাঁদের পূর্ণিমায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা রাখিবন্ধন উৎসব করেন। ইলাহি ধর্ম প্রবর্তনও করেন তিনি।[১] তাঁর পুত্র জাহাঁগীর দীপালি ও শিবরাত্রি উৎসব পালন করতেন। সিকান্দ্রায় তিনি পিতৃশ্রাদ্ধও করেন।[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতে পৌত্তলিকতার প্রভাবে দেশজ মুসলিম সমাজে নানা বে-ইসলামী বিশ্বাস-সংস্কার আঁচার-আচরণ থেকে গিয়েছিল, তা বিদেশাগত সংখ্যালঘু মুসলিম পরিবারেও সংক্রামিত হয়। বিশেষ করে হিন্দুকন্যা বধূরূপে পরিবারে গৃহীত হলে, বধূদের মাধ্যমে হিন্দুয়ানী আচার-সংস্কার মুসলিম ঘরে প্রবিষ্ট হয়। মুঘল হেরেমও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এ-কারণে জাহাঁগীরের আমলে ভারতের কোথাও কোথাও মুসলিম সমাজেও সতীদাহ প্রথা চালু ছিল।[৩] দারাশিকোহ্‌ও মজমু-অল-বাহরাইন রচনা করে সমন্বয়ের উপায় খুঁজেছেন। আকবর নারীশিক্ষায়ও উৎসাহী ছিলেন। ফতেপুর-সিক্রীর মহলে তিনি একটি নারী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৪] সতীদাহ নিবারণে আকবরের প্রয়াসের কথা আকবরনামায় পাই :

> But since the country had come under the rule of his Gracious Majesty (Akbar), inspectors had been appointed in every city and district, who were to watch carefully over these two cases : To discriminate between them and to prevent any woman being forcibly burnt.

বার্নিয়ারের চিঠিতেও এর উল্লেখ রয়েছে।[৫]

॥ ২ ॥

এবার বাঙলা দেশের কথা বলি। বিজাতি, বিভাষী, বিধর্মী ও বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এদেশের হিন্দু-সমাজেও নানা পরিবর্তন হয়েছে। বিদ্বানেরা বলেন, দাক্ষিণাত্যের শঙ্কর, ভাস্কর, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ এবং উত্তর ভারতের রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, রামদাস, চৈতন্য প্রমুখের বৈষম্যবিহীন মানবতাবোধ ও ধর্মতত্ত্ব ইসলামের প্রভাবপ্রসূত।[৬]

মুসলিম সংস্পর্শে আসার পর উত্তর ভারতের মতো বাঙলার হিন্দু সমাজেও ভাঙ্গন ধরে। মুসলিম সমাজের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা এবং কর্মসূত্রে ভাগ্য পরিবর্তনের অবাধ সুযোগ (এসব বৌদ্ধ সমাজেও ছিল, কিন্তু তা তখন বিস্মৃত অতীতের কল্পচিত্র মাত্র) প্রভৃতি দেখে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমন বিচলিত হয়ে ওঠে। বাঙলা ও বিহারে নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরা ইসলামের প্রচ্ছায় জীবনের নতুন দিগন্ত দেখতে পেল। ব্যাপকহারে ধর্মান্তর শুরু হল, তখন স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, শলপাণি, বৃহস্পতি প্রমুখ শাস্ত্রবিদ হিন্দু-শাস্ত্রের বিধিনিষেধ সংশোধন করে হিন্দু সমাজকে ভাঙনের কবল থেকে রক্ষা করতে প্রয়াস পেলেন। নুলু পঞ্চানন 'গোষ্ঠী কথা' রচনা করে বর্ণবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও দৃঢ় ভিত্তিক করবার প্রয়াসী হলেন। জাতিমালা কাছারী নামে এক পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেও জনগণকে সমাজশাসনে রাখবার চেষ্টা করা হয়।[৭]

এত করেও যখন ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হল না, তখন বিশ্বম্ভর মিশ্র উত্তর ভারতিক সন্তধর্মের অনুসরণে এবং সূফীমতের অনুকরণে রাধা-কৃষ্ণ রূপকে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। এতে ইসলামের প্রসার রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। কেননা যে-সব সুযোগ-সুবিধা লোভে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ জেগেছিল, সেগুলোর সব কয়টিই চৈতন্য প্রবর্তিত সমাজে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবেই স্বীকৃতি পেল। সামা-কীর্তন, যিকর-নামজপ, হাল-দশা, দারিদ্র্য, বিনয়, আর্তের সেবা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, বর্ণবিহীন সমাজ, তালাক, নারীর পুনর্বিবাহ প্রভৃতি বাহ্য আচার-আচরণে ও সূফী-বৈষ্ণবে মিল প্রচুর। তাছাড়া, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, মদ্যপান, নর ও পশু বলিদান, সতীদাহ প্রভৃতি সুপ্রাচীন ব্রাহ্মণ্য প্রথা আর সংস্কারও মুসলিম প্রভাবেই বর্জিত হয়।[৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈতন্য-চরিতামৃতে[৯] পীর ও কাজীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের শাস্ত্রীয় বিতর্কের বিবরণ রয়েছে এবং তাঁর শিক্ষাষ্টক মন্ত্রেও রয়েছে সূফী প্রভাব। এতে মনে হয়, ইসলাম তথা সূফীতত্ত্বে চৈতন্যদেবের অধিকার ছিল। এভাবে হিন্দু ধর্মজীবনে মুসলিম প্রভাব দৃঢ়মূল হয়।

আবার, এক জায়গায় থাকলে প্রভাব পারস্পরিক হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সাধারণের তো কথাই নেই, এমনকি বাঙলার নওয়াবও হিন্দুয়ানী প্রভাব এড়াতে পারেননি।

নওয়াব আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র শাহমতজঙ্গ ও সৌলতজঙ্গ মোতিঝিলে, সিরাজদ্দৌলা মনসুরগঞ্জে এবং মীরজাফর গঙ্গাতীরে হোলি উৎসব পালন করতেন।[১০] মীরজাফর মৃত্যুশয্যায় কিরীটেশ্বরীর পাদোদকও পান করেছিলেন।[১১]

সাহিত্যে মুসলমানেরা রামায়ণ-মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবে হিন্দু পুরাণের বহুল ব্যবহার করেছেন—কাহিনী নির্মাণে ও উপমাদি প্রয়োগে। আর বৌদ্ধ যোগ-তন্ত্র ও বেদান্তের প্রভাব পড়েছে সূফী-বাউলের সাধনায়।[১২]

সত্যপীর, বড় খাঁ গাজী, কালুগাজী, বনবিবি, ওলাবিবি, বাস্তুবিবি, উদ্ধারবিবি প্রভৃতি লৌকিক পীর-দেবতার প্রভাবও পড়েছে নিম্নবর্ণের মুসলমানদের ওপর সবচেয়ে বেশি। আবদুল গফুরের গাজীনামায় গঙ্গা, দুর্গা, পদ্মা, শিব প্রভৃতি গাজীর আত্মীয় বলে বর্ণিত।[১৩] De Tassy -র মতে হিন্দুর দেবপূজা আর মুসলমানের পীর ও দরগা পূজায় কোনো পার্থক্য নেই।[১৪] সম্ভবত দেবপূজার সংস্কারই পীরপূজাকে অবলম্বন করে পার্থিব জীবনের স্বস্তি খুঁজেছে।[১৫]

॥ ৩ ॥

চট্টগ্রামে এর অতিরিক্ত আরো একটি দেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। তা হচ্ছে আরাকানী বৌদ্ধ প্রভাব। সাময়িক রাজনৈতিক বিযুক্তি সত্ত্বেও ১৭৫৬ সন অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এমনকি ইংরেজ আমলেও চট্টগ্রামীরা মুখ্যত আরাকানেই জীবিকা অর্জন করত। আরাকানী কিংবা বর্মী বৌদ্ধদের মধ্যে রক্ষণশীলতা ছিল না বলে বহু মুসলমান বর্মী-আরাকানী স্ত্রীও গ্রহণ করেছে চিরকাল। পর্তুগীজরাও চট্টগ্রামী ও আরাকানী স্ত্রী গ্রহণ করেছে।[১৬] মঘেরা পর্তুগীজদের বাবুর্চির কাজও করত।[১৭] মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-কেয়াং আকীর্ণ চট্টগ্রামে এতকাল পরে বৌদ্ধ প্রভাব খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। তবু পথিপার্শ্বস্থ তাল-তলায় কিংবা বুনো ঝোপে অপদেবতার সেবা দেয়া (মুরগীর বাচ্চা জীবন্ত উৎসর্গ করা, মোমবাতি বা দীপ দেওয়া, মাংস ডালি দেওয়া প্রভৃতি), মা-মঘিনীকে (মগধেশ্বরী) দুর্গা কিংবা তারার বিকল্পরূপে গ্রহণ করা, নমঃদুর্গাকে অপদেবতার কর্ত্রীরূপে জানা, জলে যক্ষের[১৮] এবং বট, অশ্বথ, তেঁতুল ও তালগাছে ভূত, প্রেতাত্মা ও অপদেবতার আবাস মনে করা প্রভৃতি বৌদ্ধসংস্কার আজো একেবারে জনসমাজ থেকে মুছে যায়নি। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা শাসক আরাকানীদেরই বংশধর। ইংরেজি শিক্ষা ও কংগ্রেসী জাতীয়তা গ্রহণের ফলে আজকাল এরা নামে ও আচরণে হিন্দু হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ নিতান্ত আধুনিক ব্যাপার। তার আগে মেয়েরা গামছা ও থামি এবং পুরুষেরা লুঙ্গি পরত। এগুলো আজো মুসলিম সমাজে চালু রয়েছে। বৌদ্ধদের আরাকানী নামই রাখা হত। বৌদ্ধেরা নির্বিচারে শূকর, গরু, মুরগী প্রভৃতি খেত। মধুভাত, তামাক আর শুঁটকি আরাকানী প্রভাবেই চট্টগ্রামে জনপ্রিয়। শিশু-চিকিৎসা-শাস্ত্র ও মহিলা চিকিৎসক চট্টগ্রামে আরাকানের শ্রেষ্ঠ দান। এ ছাড়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রভাবের ফলে তুক-তাক, দারু-টোনা-উচাটন, বাণ প্রভৃতিতে আজো চট্টগ্রামের লোক বিশেষ আস্থা রাখে।[১৯] আর এ-ব্যাপারে বৌদ্ধেরা ও হাড়িরাই বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান। কক্সবাজার মহকুমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরবাড়ির (কাঠের ঘর) আকৃতি এবং গাঁয়ের নাম (ফালঙ) আরাকানী প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে। হাতির পিঠের মতো করে ঘরের চাল তৈরি করাটাও আরাকানী। ভূমিব্যবস্থা, ভূমি পরিমাপ এবং মঘীসনও আরাকানের দান। মুঘল শাসন (১৬৬৬) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে চট্টগ্রামের শাসনপদ্ধতি মোটামুটি আরাকানী নিয়মেই চলেছে। অবশ্য নরমিখলার পুনঃপ্রতিষ্ঠার (১৪৩৩ খ্রী.) কাল থেকে তা গৌড়-প্রভাবিত।

মুসলিম শাসনকালে মুসলিম পোশাক বিশেষ করে কোর্তা, টুপি, শামলা, উষ্ণীষ, পাকপ্রণালী, মসলা, পিয়াঁজ, রসুন প্রভৃতি বিশেষভাবে চালু হয়। দরগাগুলোও অমুসলিমের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে ধর্ণার স্থল হয়ে ওঠে।[২০]

অধিকাংশ কাল আরাকান শাসনে থাকার ফলে মুসলিম সমাজ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়দের মতো বহির্মুখী দৃষ্টিজাত উন্নাসিকতায় স্বদেশে প্রবাসী হয়ে থাকেনি। তারা দেশের মাটি ও আবহাওয়ার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। যদিও ধর্মাদর্শে ইসলামকে পরম মমতায় আঁকড়ে ধরে রেখেছিল।

এক উদার মানবিক বোধে স্বস্থ চট্টগ্রামী মুসলমানেরা দীন ও দুনিয়াকে, আরবীধর্ম ও দেশী জীবনচর্যা উভয়কেই সম মর্যাদা দিয়েছে। তাদের মানস-কুসুম বিধৃত রয়েছে তাদের রচিত সাহিত্যে। তা' ছাড়া উচ্চ শীর্ষ পর্বতমালা এবং বিরাটহৃদয় সমুদ্রও তাদের স্বভাব গঠনে সহায়তা করেছে। তাদের চরিত্রে অনমনীয়তা (গোঁয়ার্তুমি), মর্যাদাবোধ আর উদারতা সমভাবে লক্ষণীয়। এর কিছুটা গোত্রজ আর কিছুটা পারিবেশিক প্রভাবজ।

আর একথা না বললেও চলে যে, কারো সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র থাকে না। কেননা ধর্ম কেবল মানস-জিজ্ঞাসা নিবৃত্তির উপকরণ নয়, ব্যবহার-বিধিও, তথা জীবনের আচার-আচরণ বিধিও। ধর্ম যদি বিদেশী হয়, তা হলে ধর্মসূত্রে পাওয়া সংস্কৃতিও বিদেশী। আবার শাসকগোষ্ঠীর সংস্কৃতির প্রভাব থেকেও নিষ্কৃতি নেই। শাসক যদি বিদেশী ও বিজাতি হয়, তা' হলে বিদেশী-বিজাতি সংস্কৃতিরও মিশ্রণ ঘটে। তা'ছাড়া, যেখানেই নতুন ভাব-ভাবনা, কিংবা প্রাত্যহিক জীবনে অপরিহার্য বা বিলাসে প্রয়োজন তেমন কোনো সামগ্রী আবিষ্কৃত কিংবা তৈরি হয়, তাও গ্রহণ না করে পারা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্থানিক সংস্কৃতি লুপ্ত হয় না, কেবল জটিলতা ও রূপান্তর লাভ করে মাত্র। স্থানিক আবহাওয়া, খাদ্যবস্তু, প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির প্রাচুর্য ও বিরলতা, উপযোগ প্রভৃতিই স্থানিক সংস্কৃতি বর্জন বা বিস্মৃতির বড় বাধা। যেমন বাঙালী ভাত, মাছ, শাক, পিঠা, গুড়, বাঁশ, বেত ত্যাগ করতে পারে না। যেখানে বছরে নয় মাস ভূমি জলসিক্ত থাকে, সেখানে লুঙ্গি, ধুতি, শাড়ি পরিহার করা অসম্ভব। গ্রীষ্মে দেহ যে দেশে ঘর্মাক্ত হয়, সেখানে জামা গায়ে রাখা দুঃসাধ্য।

চট্টগ্রামও চিরকাল বিদেশী ও ভিন্ন-গোত্রীয় লোক দ্বারা শাসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বন্দরের প্রভাবও স্বীকার করেছে। চারটি ধর্মের কোনোটাই স্থানীয় নয়। কাজেই তার সংস্কৃতিতে বহিঃপ্রভাবের বৈচিত্র্য আছে। ধর্মসূত্রে ন্যায়-অন্যায়জ্ঞানে, ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধে, সম্পত্তির উত্তরাধিকার পদ্ধতিতে, নৈতিক অপরাধ নির্ণয়ে, সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব বিধিতে, লৌকিক ও অলৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারে, বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ব্যবহারিক জীবনে স্থানিক প্রয়োজনে, প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর প্রভাবে, জীবন যাপনের উপকরণের অভিন্নতায়, প্রশাসনিক বিধি-ব্যবস্থায় একপ্রকারের সাংস্কৃতিক ঐক্যও রয়েছে। বলা যায়, এ একপ্রকার Unity in diversity.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চবিত্তের অভিজাত :

মুসলমান :

সা'বিরিদ খানের (শাহ্ বারিদ খানের) ভণিতাযুক্ত এক পদবন্ধে আছে :

আদ্য সৃষ্টি কহি জান শুন উপদেশ
ভাটিমধ্যে বাইশ বাঙ্গালা চাটিগাঁ প্রধান দেশ।
হাওলা, দেয়াঙ্গি মৈষামূঢ়া কাঞ্চনা মহম্মদপুর
হাসিমপুর বাজালিয়া এই আষ্ট শ্রী।
চক্রশালা বাঁধাইল রাজার নিজ বাড়ি।
তীরাতীরি গোলাগুলী সব গেল উড়ি।
কাঞ্চনা প্রহরী রৈল সমশের চৌধুরী
অলিমুন্দার, হাদুমুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভাই
ফরমানী মুন্দারী পাইল জামিজুড়ি যাই।
আলিমুন্দার হাদুমুন্দার বড়াইয়া মুন্দার ভঙ
হাওলার নিমুন্দার করে নানা রঙ।
রাজা দিল খোঁআঝাগিরি উজির দিল বাজি
তের ঘর খোঁআঝার মধ্যে সাত ঘর কাজি।
জগদীশ মনোহর তারা দুই ভাই
বর্ধমানী ছেগা পাইল গরুর মাংস খাই।
শঙ্খ নদীর দক্ষিণ কুলে শঙ্খ নদীর মোড়
সাধু খাঁ সাবিরিদ খাঁ তারা দুই ঘর।
মহন্ত সকল জান রাজার সঙ্গে ছিল
সেই সব সকলেরে খোঁআঝাগিরি দিল।
কহে হীন সাবিরিদ খাঁ এহার রহস্য
বচনে না ধরে যারে সে নহে মনুষ্য।

উদ্ধৃত ছড়ায় কবির সমকালীন (১৫১৭-৫০) দক্ষিণ চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশাবলীর পরিচয় রয়েছে। পদবন্ধের বক্তব্য এই :

একসময় পূর্ববঙ্গ ও আসামের কতকাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল। এই ভাটি বাইশটি অঞ্চলে (Region) বিভক্ত ছিল। চট্টগ্রাম এর একটি। কর্ণফুলীর পূর্ব-দক্ষিণ তীর থেকে মাতামুহরী নদী অবধি অঞ্চলের মধ্যে হাওলা (খরনদ্বীপ), দেয়াঙ্গ (দেবগ্রাম), মৈষামূঢ়া (শঙ্খতীরস্থ গ্রাম), কাঞ্চনা (সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম) মুহম্মদপুর, হাশিমপুর (পটিয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম), বাজালিয়া (সাতকানিয়া থানার অন্তর্গত) ও চক্রশালা (পটিয়ায়) এই আটটি সমৃদ্ধ গ্রাম বা চাকলা ছিল।

পটিয়া থানা থেকে দুই মাইল দূরে চক্রশালা গ্রাম অবস্থিত। বিরুদ্ধ-শক্তির আক্রমণ প্রতিরোধ করে এই চক্রশালাতেই আরাকানরাজের চট্টগ্রামস্থ অধিকারের শাসনকেন্দ্র স্থাপিত হয়। কাঞ্চনায় জমশের চৌধুরী সীমান্তরক্ষী সেনানী নিযুক্ত হলেন। জামিজুড়ি চাকলায় গিয়ে (জামিজুড়ি গ্রাম এখনো বিদ্যমান) আলিমুন্দার, হাদুমুন্দার ও বড়াইয়া মুন্দার এই তিন ভাই মুন্দারী (মুহুন্দারী মজুমদারী) ফরমান লাভ করেন। এই মুন্দারত্রয়ের মধ্যে হাওলার নিমুন্দার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐশ্বর্যে ও বিলাসিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি আরাকান-রাজ থেকে খোঁয়াজা খেতাব লাভ করেন এবং রাজমন্ত্রী তাঁকে ঘোড়া উপহার দেন। আরাকান রাজ্যান্তর্গত চট্টগ্রামে সরকারী খোঁয়াজা খেতাবধারী তেরটি সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবার ছিল। তাঁদের মধ্যে সাতটি কাজী বংশীয়। জগদীশ ও মনোহর ভ্রাতৃদ্বয় গোমাংস খেয়ে সমাজে পতিত হলে রাজার কৃপায় 'বর্ধমানী ছেগা' [জায়গীর] পেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। শঙ্খনদের বাঁকে সাধুখাঁ ও শা'বারিদ খান পরিবার দুটোর বাস। যাঁরা আরাকান-রাজের পার্ষদ ছিলেন তাঁরা সবাই খোঁয়াজা উপাধি লাভ করে।

লায়লী-মজনু'তে বাহরাম খান তাঁর পূর্বপুরুষ দুই শিকের অধিপতি হামিদ খানের কথা বলেছেন। কবি বাহরাম ও তাঁর পিতা মুবারিজ খান নিজাম শাহর দৌলত-উজির ছিলেন। 'নসলে উসমান ইসলামাবাদে'ও হযরত উসমানের চট্টগ্রামস্থ বংশধর ও শিষ্য পরম্পরার উল্লেখ আছে।[২১] 'মক্তুল হোসেন' কাব্যে মুহম্মদ খান তাঁর পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের বংশতালিকা দিয়েছেন। সে সূত্রে বলেছেন : চট্টগ্রাম-বিজেতা কদর খান গাজীর এগারো জন সহচরও চট্টগ্রামে বসতি করেন :

তান একাদশ মিত্র করম প্রণাম
পুস্তক বারএ হেতু না লেখিলুঁ নাম।
তান একাদশ মিত্র জিনিয়া চাটিগ্রাম
মুসলমান কৈলা চাটিগ্রাম অনুপাম।[২২]

চট্টগ্রামের কবিদের নাম থেকেই দেখা যায় মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, মীর, কাজী, খান (পাঠান) পরিবার ছিল। এছাড়া গৌড় থেকে আগত সম্ভ্রান্ত পরিবারও ছিল।[২৩]

AMARBOI.COM

হিন্দু :

হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ দিয়ে গঠিত। চট্টগ্রামে চণ্ডাল-বাগদী প্রভৃতি নেই। নমঃশূদ্রের মধ্যে কেবল হাড়ি ও ডোম (বাদ্যকর, পালকী বেহারা ও ধীবর) আছে। তাঁতী, নাপিত আর ধোপাও আছে। চট্টগ্রামে চক্রবর্তী ও ভট্টাচার্য বাচীধারী ব্রাহ্মণই ছিল এবং আছে। চট্টো-গঙ্গো-মুখো-বন্দ্যোপাধ্যায় বাচীর ব্রাহ্মণ ছিল না।

হিন্দুদের পেশা ও রাজদত্ত উপাধির মধ্যে খাস্তগীর, মজুমদার, বিশ্বাস, মল্লিক, দস্তিদার, ওহেদেদার, রায়, চৌধুরী, পাইক, সরকার দেখা যায়, অবশ্য এর অধিকাংশই মুঘল আমলের।[২৪]

বৌদ্ধ :

বৌদ্ধ সমাজে বর্ণবৈষম্য নেই। তাঁরা তিনটি কুলবাচী ব্যবহার করেন। একটি তাদের গোত্রীয় বড়ুয়া, অপর দুটো চৌধুরী ও মুৎসদ্দী যথাক্রমে সম্পদ ও পেশাজ্ঞাপক। ষোল শতকে এঁদের আরাকানী নাম ছিল।[২৫] বিশ শতকের গোড়ার দিকেও কোন কোন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আরাকানী নাম চালু ছিল।

খ্রীস্টান :

চট্টগ্রামের খ্রীস্টানরা পর্তুগীজদের বংশধর ও অপহৃত দেশজ লোকের বংশধর।[২৬] এরা রোমান ক্যাথলিক এবং পর্তুগীজ নামের অনুরাগী। এরা ফিরিঙ্গী নামে পরিচিত। ইংরেজ আমলের শেষের দিকে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এরা ইংরেজিকেই মাতৃভাষা করে নিয়েছে। এর আগে বাঙলা, মধ্যে হিন্দি ছিল এদের ভাষা। পর্তুগীজ প্রভাবের কালে পর্তুগীজ ভাষা ভারতের বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকায় Lingua Franca হিসেবে চলত। উচ্চাভিলাষীরা আগ্রহের সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষা শিখত।[২৭]

বৃত্তিগত শ্রেণীবিন্যাস :

যন্ত্রযুগের আগে সমাজে ব্যবহারিক ও বিলাস সামগ্রী তৈরি হত মানুষের হাতে। তখন এক একপ্রকার বস্তু তৈরির জন্যে এক একশ্রেণীর লোক থাকত, তারা গোত্রীয় পেশা হিসেবে পুরুষানুক্রমে একই বৃত্তি গ্রহণ করত। ফলে সমাজে কৃষিকার্য থেকে কারু-দারু ও চারু শিল্প অবধি সব কাজের জন্যেই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী ছিল। কামার, কুমার, ছুতার, নাপিত, তাঁতী, ধোপা, মোল্লা, পুরুত প্রভৃতি সবাইকে নিয়েই দেশ ও সমাজ। এ ব্যাপারে পাক-ভারতে কালিক বা স্থানিক পার্থক্য বিশেষ ছিল না। তা হিন্দু সমাজে ধন ও বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল আর অন্য সমাজে করেছে কেবল ধনবৈষম্য। হিন্দু সমাজের বৃত্তিজীবীদের পেশা বদলালেও সমাজ কাঠামো বর্ণবৈষম্যের দরুন অবিকৃতই আছে। মুকুন্দরাম মুসলমান বৃত্তিজীবী সমাজের একটি বর্ণনা দিয়েছেন, তাই এখানে বিধৃত করছি। এ অনুমানে যে চট্টগ্রামেও অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থাই ছিল :

রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা।
বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতি ঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে
তীরকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
কলন্দর হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রাঙ্গাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম,
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।

এমনি লবণ নির্মাতা মুলুঙ্গি, পান উৎপাদক বারুই, পালকী-বাহক কাহার। উত্তর চট্টগ্রামের নিযামপুর পরগনার অধিকাংশ লোক ফেনীর দাঁদরা পরগনা থেকে পালিয়ে এসে অবস্থিত হয়েছে বলে তাদের 'দাঁদরাইয়া' বলা হয়। আবার দক্ষিণ চট্টগ্রামের মুসলমানরা প্রায় চিরকাল রোসাঙ্গ তথা আরাকান-রাজের শাসনভুক্ত ছিল বলে গৌড়ীয় সংস্কৃতি থেকে কোনো কোনো ব্যাপারে বঞ্চিত ছিল। তাই এরা রোসাঙ্গী (রোয়াঙ্গি) নামে অবজ্ঞাত। মুকুন্দরাম মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজের একটি স্থূল অথচ আদর্শায়িত চিত্রও দিয়েছেন :

ফজর সময়ে উঠি　　বিছায়া লোহিত পাটি
　　পাঁচ বেরি করএ নামাজ
ছিলিমিলি মালা ধরে,　　জপে পীর পেগাম্বরে
　　পীরের মোকামে দেই সাঁজ।
দশ বিশ বেরাদরে　　বসিয়া বিচার করে
　　অনুদিন কিতাব কোরান
সাঁজে ঢালা দেই হাটে　　পীরের শিরনী বাঁটে
　　সাঁঝে বাজে দগড় নিশান।
বড়ই দানিশমন্দ　　কাহাকে না করে ছন্দ
　　প্রাণ গেলে রোজী নাহি ছাড়ি
ধরএ কম্বোজ বেশ　　মাথে নাহি রাখে কেশ
　　বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।
না ছাড়ে আপন পথে　　দশ রেখা টুপি মাথে
　　ইজার পরএ দড় করি
যার দেখে খালি মাথা　　তা সনে না কহে কথা
　　সারিয়া চেলায় মারে বাড়ি।

আসলে সমাজে বেনামাজী, চোর, ডাকু, লম্পট, মিথ্যাবাদী, জুয়াড়ী প্রভৃতি সবই ছিল। সৈয়দ সুলতানের শিষ্য কবি মুহম্মদ খান তাঁর 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদে' পাপমতি মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন, সৈয়দ সুলতান ইব্লিসের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে পাপকর্মাদি দেখিয়েছেন, আলাউল 'তোহফায়' পাপকর্মের কথা বলেছেন। তাঁদের বর্ণিত পাপকর্ম ও খল চরিত্র সমাজে বিরল ছিল না। নইলে তাঁদের নসিহতের প্রয়োজন থাকত না।

হিন্দু সমাজে বৃত্তিনির্ভর শ্রেণীর নাম আঠারো শতকের কবি ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় নিম্নরূপ :

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ

চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী শাঁখারী।
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতি মালাকার
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক
যুগী চাষা-ধোপা চাষী কৈবর্ত অনেক।
সেকরা ছুতার সুরী ধোপা জেলে গুড়ী
চাঁড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তেয়র
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর।
বাইজী পটুয়া কান কস্‌বী যতেক
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্তক অনেক।
[বিদ্যাসুন্দর : পুরবর্ণন]

গ. বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কৃতির মান

১. শিক্ষা :

বিদ্যাচর্চা সভ্যতার ভিত্তি এবং সভ্য সমাজের মৌল কর্তব্যের একটি। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী দেশজয়ের পরেই লখনোতীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। N.N. Law তাঁর 'Promotion of learing during Muhammadan Rule' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন :

> The Muhammadan invasions of India marked the beginnings of momentous changes not only in the social and political spheres but also in the domain of education and learning (p. XIV).

মুসলিম সূফী-দরবেশ ও আলিমেরা খানকা, মসজিদ, এতিমখানা, লঙ্গরখানা প্রভৃতির সঙ্গে মক্তব-মাদ্রাসাও স্থাপন করতেন, ব্রাহ্মণদের পক্ষেও সন্তানদেরকে শাস্ত্র শিক্ষাদান পেশার জন্যে অপরিহার্য ছিল। তাই টোল ও মক্তব-মাদ্রাসাতে সাধারণত শাস্ত্রশিক্ষায় নজর বেশি ছিল। কায়স্থ বৃত্তির জন্যে অবশ্য দরবারীভাষা, গণিত তথা knowledge of three R's অবহেলা পায়নি। আকবরের শিক্ষা সংস্কারে দেখতে পাই :

> His Majesty orders that every school boy should first learn to write the letters of the alphabet and also learn to trace their several forms. He ought to learn the shape and name of each letter, which may be done in two days, when the boy should proceed to write the joint letters. The boys should learn some prose and poetry by heart ... Care is to be taken that the learns to understand everything himself; but the teacher may assist him a little. ...... The teacher ought specially to look after five things; knowledge of the letter, meaning of words; the hemistich; the verse, the former lesson ..... Every boy ought to read books on morals, arithmetic, the notation peculiar to arithmetic, agriculture, mensuration, geometry, astronomy, physiognomy, household matters, the rules of Government, medicine, logic, the Tabii, riyazi, itahi sciences, and history, all of which may be gradually acquired. এই পদ্ধতি a new light on schools and cast a bright lustre over Madrasahs.

চট্টগ্রাম অবশ্য আকবরের অধিকারভুক্ত ছিল না। তবু চট্টগ্রামের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগ গৌড়-বঙ্গের সঙ্গেই ছিল চিরকাল, এমনকি উত্তর ভারতের সঙ্গেও এর সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ছিল। কেননা চট্টগ্রামের পীর-ফকির ও গৌড়ীয় শাসনকর্তারা মুখ্যত ছিল উত্তর-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয়। আবার, হিন্দুদেরও শাস্ত্র আর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল মিথিলা। তা যখন মুসলিম বিজয়ের পর ভেঙে গেল, তখন নবদ্বীপই হল ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার এবং বিদ্যার্জনের কেন্দ্র। নব্যন্যায়, স্মৃতির নতুন ভাষ্য ও গৌড়ীয় নববৈষ্ণবমত এখানেই সৃষ্টি হয়। নবদ্বীপের বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা হিন্দুজাতির অভ্যুত্থানের স্বপ্নও দেখতেন। তারই অভিব্যক্তি পাই 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবে হেন আছে,' উক্তিতে। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য-ভাগবতে' নবদ্বীপে বিদ্যাচর্চার এবং পড়ুয়ার আধিক্যের কথা শুনি :

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ পুরে ....
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ ...
সভে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে
বালকেও ভট্টাচার্য সনে কক্ষা করে।
নানাদেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়
নবদ্বীপে পড়ি লোক বিদ্যারস পায়।
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নির্ণয়। ....
চট্টগ্রাম নিবাসীও অনেক তথায়
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন তথায়।

এর আগে বৌদ্ধযুগে বাঙালীর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল নালন্দা, উড়্ডিয়ানা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি। কাজেই বাঙলার তথা চট্টগ্রামের সংস্কৃতির উৎস ও আদর্শ উত্তর-ভারতই। অতএব, আকবরের শিক্ষা-সংস্কার চট্টগ্রামেও অনুকৃত হতে বাধা ছিল না।

এক সময় চট্টগ্রামে বৌদ্ধ বিদ্বান পরিচালিত শাস্ত্র ও বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র পণ্ডিতবিহার ছিল। তীর্থিক তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং নাস্তিক পণ্ডিতও ছিলেন অনেক। তীর্থিকদের সঙ্গে বৌদ্ধপণ্ডিতের বিতর্কের সংবাদ আমরা তারানাথ সূত্রে পাই। প্রখ্যাত পণ্ডিতবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন তিলপা। আর লুইপা, সবরিপা, নাড়পা, অবধূতপা, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রী মৈত্র, বুদ্ধজ্ঞানপা, অনঙ্গবজ্র, তঘন প্রমুখ বৌদ্ধসিদ্ধ, আচার্য ও পণ্ডিতেরা পরিদর্শক বা অধ্যাপকরূপে উক্ত বিহারে ছিলেন বলে কিংবদন্তী আছে। অধ্যক্ষ তিলপা ওরফে প্রজ্ঞাভদ্র তান্ত্রিকমত প্রচারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি শ্রীসহজ শম্বরাধিষ্ঠান, অচিন্ত্য মহামুদ্রানাম চণ্ডচতুরোপদেশ, প্রসন্নদীপ, মহামুদ্রোপদেশ, দোহাকোষ, ষড় ধর্মোপদেশ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।[২৯]

মধ্যযুগে হিন্দু বিদ্বানের মধ্যে চৈতন্য-ভাগবত সূত্রে[৩০] চারজন পণ্ডিতের কথা জানতে পাই ঃ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বাসুদেব দত্ত ও মুকুন্দ দত্ত এবং গদাধর। পুণ্ডরীক মেখলা এবং বাসুদেব ও মুকুন্দ ভ্রাতৃদ্বয় চক্রশালাবাসী ছিলেন।

চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্যভক্ত আর
আসিয়া রহিলেন, নবদ্বীপে গুঢ়রূপে
শ্রীমুকুন্দ বেজ-ওঝা তার তত্ত্ব জানে
একসঙ্গে মুকুন্দেরও জন্ম চট্টগ্রামে।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত .....
মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত গদাধর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণে-বিন্যস্ত হিন্দু সমাজে শাস্ত্রীয় আচার পালনের জন্যেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রয়োজন। কাজেই বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত না থেকেই পারে না। ব্রাহ্মণের বৃত্তিই হচ্ছে যজন-যাজন। কাজেই পেশার খাতিরেই তাদের বিদ্যার্জনের প্রয়োজন ছিল, আবার, শূদ্রাদির শাস্ত্রে ও শিক্ষায় (কেননা ব্রাহ্মণ. কায়স্থ বা বৈদ্য অস্পৃশ্যকে পাঠদানে সম্মত ছিলেন না) অধিকার ছিল না বলে সমাজের বহু লোক পুরুষানুক্রমে অশিক্ষিত থাকত। বর্ণহিন্দুদেরও শাস্ত্রশিক্ষায় অবাধ অধিকার ছিল না। কাজেই তাদের কাছারীতে কাজ পাবার মতো সাধারণ বিদ্যা অর্জনের (কাঠাকালি, বিঘাকালি. সুদকষা. মণকষা ও পণকিয়া প্রভৃতি) দিকেই লক্ষ্য থাকার কথা। বৌদ্ধদের মধ্যে ভিক্ষুরাই বিশেষ করে শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে আগ্রহ রাখতেন। 'চণ্ডীমঙ্গলে' মুকুন্দরাম পড়ুয়ার পাঠ্যতালিকা দিয়েছেন।[৩১]

চট্টগ্রামে শিক্ষার প্রসার এবং জ্ঞানচর্চার আগ্রহ যে ছিল, তা বহু পীর-পণ্ডিতের ও কবির আবির্ভাব থেকেও অনুমান করা চলে। কবিদের উক্তিতে দেখা যায়, পীর ও গুরুরা সাধারণত জ্ঞানী ও পণ্ডিত ছিলেন। সাধারণ পণ্ডিত ও আলিমের সংখ্যাও কম ছিল না। সৈয়দ সুলতান, আলাউল, জায়েনুদ্দীন, মীর মুহাম্মদ সফী, মুহম্মদ মুকিম, শেখ মুতালিব ও আফজল আলির উক্তি এর সাক্ষ্য। চট্টগ্রামের কোনো মাদ্রাসার খবর কোনো সূত্রে মেলে না বটে, কিন্তু মাদ্রাসা যে ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। বক্তিয়ার খলজী দেশজয়ের পরেই লখনোতীতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৩২] সে আদর্শ অনুসৃত কিংবা সে প্রচেষ্টা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুকৃত হবে এ-ই স্বাভাবিক। পরোক্ষসূত্রে বাঙলাদেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষা সম্পর্কিত যে চিত্র পাই, তাতে এ অনুমান অযৌক্তিক নয়।

AMARBOI.COM

বিপ্রদাস পিপিলাই বলেন ঃ

মুসলমানেরা শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তব রুজু।

মুকুন্দরাম বলেন ঃ

যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবস্থান
মুখদুম পড়াএ পঠন।

আঠারো শতকের 'শমসের গাজীনামায়' আছে, শমসের গাজী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে আরবী, ফারসী ও বাঙলা পড়ানো হত।[৩৩] দায়াময়ের সারদামঙ্গলে পাই ঃ

চারি শাস্ত্রে সমুদয় পড়াবে সকল
নাগরী ফারসী কিংবা বাঙলা উৎকল।

চীনা দূতের দোভাষী মাহুয়ান (১৫ শতক) বলেছেন, 'The language of the people is Bengali. Persian is also spoken here.'[৩৪] সৈয়দ সুলতানের 'লস্করের পুরখানি আলিম বসতি' উক্তিতে এখানে বিদ্যার বহুল চর্চার আভাস মেলে। দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী-মজনু' কাব্যে পুত্রের শিক্ষাব্যাপারে আধুনিক পিতার উদ্বেগই লক্ষ করি ঃ

সদায় অনেক শ্রধা জনক মনএ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ।
ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার
বিদ্যা সে গলের হায় বিদ্যা সে শৃঙ্গার।

চোয়াড়িতে লায়লী-মজনু প্রভৃতি বালক-বালিকার বিদ্যাভ্যাসের বর্ণনায় গাঁয়ের অধিকাংশ ছেলেমেয়ে যে পাঠশালায় পড়ত তার আভাস আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আউয়ালের তোহফায় 'এলম' এর মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষাদান সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশের প্রতিধ্বনি শুনি ঃ

গুরুএ শিশুরে যদি বিস্‌মিল্লাহ পড়াএ
গুরু মাতাপিতা শিশু বিহিস্তেত যাএ।
হাজার আবিদ নহে আলিম সমান .....
কহিছে পয়গম্বরে হাদিসে খবর
সপ্তদিন আলিমেরে সেবে যেই নর।
করিলে প্রভুর সেবা হাজার বৎসর
হাজার শহীদ পুণ্য পায় সেই নর।

কাজেই হিন্দুটোল, বৌদ্ধ-বিহার এবং মক্তব-মাদ্রাসা চট্টগ্রামে কম থাকার কথা নায়। তবে সে যুগে লেখাপড়ার বহুল চর্চা কোথাও ছিল না। বিদ্যালয়েও ছাত্র মাত্রেরই বিদ্যা অর্জিত হয় না। আর মক্তব-টোল থাকলেই সবাই সন্তানকে শিক্ষাদানে আগ্রহী হয়, তাও নয়। কোনো রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতা না থাকলে লেখাপড়ার মূল্য ও মর্ম বুঝে সবাই সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠায় না। আজকের দিনেও তা দুর্লভ।

নারীশিক্ষাও সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। সম্রাট আকবর তাঁর ফতেপুর সিক্রীর মহলে নারীশিক্ষার জন্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৩৫] মালোয়া-রাজ গিয়াসুদ্দীনের ১৫,০০০ হেরেমবাসিনীর মধ্যে শিক্ষিকাও ছিল।[৩৬] মুঘল শাহজাদীদের প্রায় সবাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। এদেশে মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রথা সুপ্রাচীন।[৩৭] লীলাবতী প্রভৃতির নাম এক্ষেত্রে স্মর্তব্য। বাংলাদেশেও চন্দ্রাবতী প্রভৃতি মহিলা কবির নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। মক্তবে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদেরও প্রাথমিক শিক্ষাদানের (অন্তত কোরআন পাঠ শিক্ষা) প্রথা ইসলামের সমকালীন। চট্টগ্রামে যে নারীশিক্ষা চালু ছিল, তার প্রমাণ, আঠারো শতকের মহিলা কবি রহিমুন্নিসা ও হীরামণি বা হরিবরের ঝি।[৩৮] সৈয়দ সুলতানের নবীবংশে পাই ঃ

সে নারী পণ্ডিত ছিল যথ মর্ম বুঝি পাইল (রসুল-চরিত)

শিক্ষা বলতে সে-যুগে ধর্মশিক্ষা দানই মুখ্য ছিল বলে,[৩৯] ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের, হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পণ্ডিতের ঘরে টোল, আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব থাকত।[৪০] পাড়ার ছেলেমেয়েরা পণ্ডিত-আলিমের বাড়ি গিয়ে পড়ত।[৪১] সামান্য দক্ষিণা বা নজরানা দিত। তাও অনেক সময় কড়িতে নয়, ফসল তোলার মৌসুমে শস্যের বার্ষিক বরাদ্দে। আবার কোনো কোনো মসজিদেও সকালে মক্তব বসত।[৪২] কোথাও স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ধনী বা জমিদার গুরু, উস্তাদ বা পণ্ডিত মৌলবীকে সামান্য বৃত্তিদান করতেন। ভূমিদান রীতিও চালু ছিল।[৪৩]

যারা টোলে মাদ্রাসায় শাস্ত্রীয় শিক্ষা গ্রহণ করত না, তাদের জন্যে আলাদা পাঠলাশা বা চতুষ্পাঠী ছিল। এরূপ বিদ্যালয়ে সাধারণত ব্রাহ্মণেতর বর্ণহিন্দু সন্তানই পড়ত। এগুলোও পণ্ডিত বা উস্তাদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হত, তবে গাঁয়ের লোক সহযোগিতা করত। কোথাও কোথাও বিত্তবান লোকের অর্থ-সাহায্যে উচ্চ শিক্ষার টোল ও মাদ্রাসা স্থাপিত হত। সে-সব বিদ্যালয়ে একাধিক শিক্ষক থাকতেন।

তবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই বেশি ছিল।[৪৪] আমরা চৈতন্য-ভাগবতে দেখতে পাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা নিজেদের ঘরে ঘরেই টোল খুলেছিলেন। মুসলিম ঐতিহ্য-সূত্রে শুনি, শেখ, আলিম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূফীরা নিজেদের ঘরে বসেই পাঁচ-দশজন ছাত্র পড়াতেন। তাঁরা একাধারে ছাত্রের পোষক, উস্তাদ এবং পীর-মুর্শীদ ছিলেন।[৪৫]

শিক্ষকের মর্যাদা ঃ

সেকালে ধর্মীয় বিধিসূত্রেই গুরু-উস্তাদের অতুলনীয় মর্যাদা ও সম্মান ছিল। তার রেশ আজো অনুভূত হয় স্কুলে-কলেজে। মৌলবী-মুন্সী উস্তাদ-মোল্লা গাঁয়ের উৎসবে-পার্বণে ও বিবাহে শাস্ত্রীয় অংশ সম্পন্ন করতেন। মুরগী জবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজায় ইমামতি এবং মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ইমামের কাজ করতেন। তাঁদের ভূমিকা কবির ভাষায় নিম্নরূপ:

মোল্লা পড়ায়্যা নিকা দান পায় শিকা শিকা
দোয়া করে কলেমা পড়িয়া।
করে ধরি খর ছুরি কুকুড়া জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি
বকরি জবাই যথা মোল্লারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।[৪৬]

হিন্দু পণ্ডিতও পৌরোহিত্য, পাঁতিদান, কোষ্ঠিতৈরি, ভাগ্যগণনা ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় অংশ সম্পন্ন করতেন।

ছাত্র-শাসন পদ্ধতি ঃ

সে-যুগে প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বালক-কিশোর শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। ছাত্ররা শিক্ষকের চোখে গরু-গাধারও অধম ছিল। শিক্ষাদানের জন্যে লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ তাঁরা অপরিহার্য মনে করতেন। সে-শাস্তি ছিল প্রায় অমানুষিক। তার জের বিশ শতকের গোড়ার দিকেও ছিল। শাস্তির নামও ছিল বিচিত্র ঃ নাড়ু গোপাল (হাত-পা জড়ো করে রাখা, অনেকটা Kneeldown-র মতো), কপাল চিড়া (ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল কেটে বা ফুটো করে রক্ত ঝরানো), সূর্যমুখ (প্রখর সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা) প্রভৃতি। আবার বিছুটি পিঁপড়ে প্রভৃতিও গায়ে লাগিয়ে দেয়া হত।[৪৭]

দয়াময়ের 'সারদামঙ্গলে' আছে ঃ

শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে
মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।
কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়।
উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয়।[৪৮]

লেখাপড়ার উপকরণ

ক. কলম

সেকালে বালক-বালিকার লেখনী ছিল কঞ্চির তৈরি। আর বয়স্কদের কলম হত হাঁসের, শকুনের ও ময়ূরের পালকের। পালকের কলমেও শিল্পসৌন্দর্য কম থাকত না।

খ. কালি :

কালি তৈরির কয়েকটি পদ্ধতি ও উপকরণ ঃ

ক. কাজল গোমূত্রে রায়ের জল ভৃঙ্গ ভেলা দিয়ে তোল
পীত কাষ্ঠ দিয়ে রসি তোটে পত্র না তোটে মসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি   অর্কাঙ্গার যবার কুড়ি
গাবের ফল হরিতকী   ভৃঙ্গার্জুন আমলকী
বাবলা ছাল জাঁটির রস   ডালিম ছেছে করিবে কষ
ভেলায় কর‍্যা এক আলি   চারি যুগ না উঠবে কালি।[৪৯]

গ. তিন ত্রিফলা শিমূল ছার
ছাগ দুগ্ধে দিয়া তেলা
লোহা দিয়া লোহায় ঘসি
মসি বলে অকাট বসি।[৫০]

বালক-বালিকারা লিখত কলাপাতায় (ধূলায় খড়ি ও কুটা দিয়েও লেখানো হত) আর অন্যেরা লিখত তালপত্রে, ভূর্জপত্রে, বাকলে, পশুচর্মে, তেরট ও তুলোট কাগজে। মাহুয়ান বাঙলাদেশে মসৃণ তুলোট কাগজের বহুল ব্যবহার দেখেছিলেন।[৫১] গোবিন্দচন্দ্রের গানেও কাগজের উল্লেখ আছে।[৫২]

ছাত্র ও শিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, পাটি, ফরাস প্রভৃতির উপর। সেকালে ছাপাখানা ছিল না, চীনাদের আবিষ্কৃত ছাপা-কল য়ুরোপে ব্যবহৃত হল, আমাদের দেশের লোক এই কলে গুরুত্ব দিল না। গ্রন্থগুলো পাণ্ডুলিপির আকারে চালু ছিল। প্রতিলিপি তৈরি করবার জন্যে পেশাদারি লিপিকর থাকত। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে অবধি পাণ্ডুলিপি অগ্রথিত কাগজে লিখিত হত। তখন পাতার মধ্যস্থলে ডোর দিয়ে বাঁধবার জন্যে ফাঁকা স্থান থাকত। আঠারো শতক থেকে মুসলিম সমাজে গ্রন্থ আধুনিক পুস্তকের আকারে বাঁধাই হতে থাকে। মুসলমানেরা ডানদিক থেকেই লিখত। হিন্দুরা চিরকাল অগ্রথিত পাণ্ডুলিপিই তৈরি করত। মধ্যখানে সূত্র বা ডোররূপ গ্রন্থি দিয়ে বাঁধবার ব্যবস্থা ছিল বলে পাণ্ডুলিপির নাম গ্রন্থ। যেমন পুস্ত তথা চামড়ায় লিখিত হত বলে পাণ্ডুলিপির অপর নাম ছিল পুস্তক বা পুস্তিকা। এর থেকেই পুঁথি ও পোথা নামের উৎপত্তি।

পাণ্ডুলিপিতে পাঠ নির্দেশের জন্য পড়ুয়ারা ময়ূরপুচ্ছ প্রভৃতির নিশানা ব্যবহার করত। মুসলিম আমলে বিদ্যাচর্চার বহুল প্রচলন হয়, আর জিজ্ঞাসুকে জ্ঞানদানের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। হিন্দু সমাজে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনে অধিকারভেদ স্বীকৃত হত। ফলে জ্ঞান ও মন্ত্রগুপ্তি একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল।

তাই যদুনাথ সরকার বলেন ঃ

> We owe to the Muhammadan influence, the practice of diffusing knowledge by the copying and circulation of books, while the early Hindu writers, as a general rule, loved to make a secret of their production.[৫৩]

আলাউল, মাগনঠাকুর প্রভৃতির পরিচিতি থেকে জানা যায়, শাস্ত্রচর্চা ছাড়াও ফারসী, সংস্কৃত, প্রভৃতি ভাষা এবং যোগ, যৌনশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার, সঙ্গীত প্রভৃতি শাস্ত্র ও কলা উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর বাঙলার সাংখ্য, যোগ, নব্যন্যায়, ব্যাকরণ, স্মৃতির, ভাষ্য প্রভৃতি সাগ্রহে হিন্দু সমাজে পঠিত হত।[৫৪]

২. চিকিৎসাবিদ্যা

ধর্মশাস্ত্র, বিষয়কর্ম ও রাজকার্যে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি ছাড়া আর যা বৃত্তি হিসেবে শিখতে হত, তা চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দুদের মধ্যে শ্রেণীহিসেবে বৈদ্যেরাই আয়ুর্বেদ তথা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করত। মুসলমানেরা ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা তথা তিব্বিয়াশাস্ত্র শিক্ষা করে হেকিম বা তবিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত। বৌদ্ধরা মঘা তথা বর্মী চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করে চিকিৎসা ব্যবসায় চালাত। শিশু-চিকিৎসা-বিদ্যা ও নারী-চিকিৎসা চট্টগ্রামের আরাকানী শাসনের শ্রেষ্ঠ দান।

এ যুগের মতো সেকালে ঔষধের দোকান ছিল না। কাজেই চিকিৎসকেরা ঔষধও তৈরি করতেন। চট্টগ্রামে কবিরাজী তথা আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাই বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। আর শিশুরোগে মহিলা চিকিৎসকের মঘাশাস্ত্রই বিশেষ কার্যকর বলে মনে করা হত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে এখন মঘা {আরাকানী} শিশু-চিকিৎসা-রীতি লোপ পাচ্ছে।

এছাড়া, সেকালে কুসংস্কারের আধিক্যবশত মুসলমানী ঝাড়-ফুঁক ও দারু, বৌদ্ধ দারু-টোনা-তুকতাক-উচাটন, হিন্দুয়ানী মন্ত্র ও ঝাড় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। জ্বর থেকে মস্তিষ্ক বিকৃতি অবধি সর্বপ্রকার রোগেই এসব ঝাড়-ফুঁক তুকতাক প্রযুক্ত হত। দেও-তাড়নে মন্ত্রপূত দারু এবং রোগেও বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাব স্বীকৃত হত।[৫৫]

মোল্লার বচন এখন কাজির মনে লয়
তাবিজ লিখিয়া তখন সকলেই লয়।[৫৬]
ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা। (নবীবংশ)

কলেরা-বসন্ত প্রভৃতির জন্যে হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ নির্বিশেষে অপদেবতার পূজা-সিন্নী দিত, এখনো দেয়। শীতলা, ওলা ও মা মঘিনীর সংস্কার আজো প্রবল।

এছাড়া, তুকতাক, দারু-টোনা-উচাটন, বাণ-মারা প্রভৃতি বশীকরণে ও শত্রুনিপাতে বৌদ্ধ ডাকিনী-যোগিনী ধারা আজো জনপ্রিয়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আজো এসব গুহ্যবিদ্যায় সিদ্ধ বলে লোকের বিশ্বাস। দারু-টোনা আর বিষ ও রোগের মন্ত্রের পুঁথি বাঙলাদেশের সর্বত্র মিলে।[৫৭] এগুলো প্রাচীন। যদিও অজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে বিকৃতিও ঘটেছে প্রচুর।

AMARBOI.COM

আর আমাদের দেশে সেকালের লোক-বিশ্বাসে অধিকাংশ রোগেরই উৎপত্তি ছিল ভূত, জ্বীন, পরী, দেও ও কুনজর থেকেই। 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদের' গার্হস্থ্যবিধি নামক অধ্যায়ের এমনি নানা রোগের চিকিৎসাবিধি বর্ণিত রয়েছে।[৫৮]

গোয়ালেরা পশু-চিকিৎসক ছিল আর নাপিতেরা ছিল অস্ত্র-চিকিৎসক।

৩. খাদ্য

চট্টগ্রামের হিন্দু-মুসলমান খাদ্য ব্যাপারে ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলত। বৌদ্ধদের ও নমঃশূদ্রের আহার্য ব্যাপারে বিশেষ স্বাধীনতা ছিল। তারা শূকর, গরু, মোরগ ও নানা পাখীর মাংস খেত। বিশ শতকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে পড়ে তারা শূকর, গরু ও মোরগাদি খাওয়া ছেড়েছে। ডাল, মাছ, শাক, তরকারী ও ভাতই বাঙালীর প্রাত্যহিক খাদ্য। এরই বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে হয় বত্রিশ ব্যঞ্জন।[৫৯] চণ্ডীমঙ্গলে ও অন্য কয়েকটি কাব্যে রান্নার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে।[৬০] কাঁজি বা আমানি ছিল গরীবের হালকা-নেশাযুক্ত পানীয়।[৬১] নিম্নস্তরের লোকেরা হয়তো ইঁদুর, গোসাপ, শূকরাদি জীবমাংস ভক্ষণ করত। কোন কোন বৌদ্ধ সিদ্ধা কেবল কচু শাক খেতেন।[৬২] কাঁকড়া ও কচ্ছপ আজো বর্ণ হিন্দু ও বৌদ্ধের প্রিয় খাদ্য। চট্টগ্রামবাসীর খাদ্য ও রন্ধন পদ্ধতি বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত আহার্য ও পাক-প্রণালীর অনুরূপ। কেবল কিছুটা তাজা মাছের অভাবে আর মুখ্যত আরাকানী প্রভাবে তারা শুঁটকী (শুকনা মাছ) প্রিয়। শুঁটকী খায় বলেই তারা লঙ্কাও বেশি খায়। আহারের সময় তারা ঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্টদ্রব্য খাএ'– (তোহফা ঃ বাব ঃ ভোজন)

বাঙালীর পিঠা প্রধানত চালের গুঁড়ো, তালের, ইক্ষুর ও খেজুরের গুড়, রস, শর্করা, তেল, কৃচিৎ ঘি, তাল, কলা, দুধ প্রভৃতির যে-কোনো দুটো-তিনটের সংমিশ্রণে তৈরি হয়। এছাড়া চাল ভাজা, মুড়ি, মোয়া, চিঁড়া, বাতাসা প্রভৃতিও সুপ্রাচীন। এগুলোর মধ্যে স্বাদ-বৈচিত্র্য থাকলেও নৈপুণ্য বা উন্নত রুচির পরিচয় দুর্লক্ষ্য। বাঙালীর কৃতিত্ব (বিশেষ করে হিন্দুর) রয়েছে দুধের রূপান্তরে দধি, মাখন, ঘোল, ঘি, সন্দেশ, পায়েস, রসগোল্লাদি নানা মিষ্টান্ন তৈরিতে।[৬৩]

কুল, আম, আমলকী প্রভৃতির আচার (সালাদ) তৈরি-পদ্ধতি মুসলমানদের নিজস্ব।[৬৪] কিন্তু হিন্দুরা কাসুন্দি আমসি প্রভৃতি নানা জাতীয় টক তৈরি করত।* গরীবের ডাল ভাত, গরীব বিদেশী মুসলমানের ডাল-খোসকাই ছিল প্রাত্যহিক খাদ্য। আবার গরীবের খিচুড়ি আর নিরামিষ ভোজীর[৬৫] খিচুড়িতে পার্থক্য ছিল, যদিও সব শ্রেণীর মানুষই পছন্দ করত খিচুড়ি।[৬৬] আবুল ফজল বলেছেন, বাঙালী মাছ ভাত খায়,[৬৭] যদিও মাংস মুসলমানের প্রিয় ছিল।[৬৮]

আর তুর্কি ও মুঘলরাই মাংস রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি কোর্মা-পোলাও, কালিয়া, কবাব, কোপ্তা ও মদ্য প্রভৃতি উচ্চবিত্তের লোকে পার্বণিক খাদ্য হিসেবে চালু ছিল, সে সঙ্গে নানা মশল্লার ব্যবহারও।[৬৯] আরাকানী প্রভাবে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মাংস রান্না করা, মধুভাত জ্বলপিঠা, কক্সবাজার মহকুমায় কাঁঠাল পাতায় করে সকাল বেলা বিন্নিভাত বিক্রয় প্রভৃতি রেওয়াজ আজো চালু আছে।

AMARBOI.COM

৪. পোশাক

আবুল ফজল বাঙালীর আটপৌরে পোশাক সম্বন্ধে বলেছেন, Naked wearing only a cloth about the loins.[৭০] Manriuqe-এর বর্ণনায় পাই ঃ গরীবেরা হাঁটুর উপরে খাটো সাদা কাপড় পরত, মাথায় বড় পাগড়ী ও পায়ে জুতা থাকত।[৭১] বাঙালী হিন্দুরাও সেকালে পাগড়ী পরত।

হিন্দুর পোশাক হচ্ছে ধুতি, উত্তরীয় বা চাদর। গরীবের গামছার মতো খাটো কাপড়, কৌপীন, নারীর শাড়ি। মাথা নগ্ন রাখা এবং খালি পায়ে চলাই এদের রীতি। কেবল সম্ভ্রান্ত এবং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক কাঠের পাদুকা পরতেন।

সাধারণ মুসলিম তহবন, কুর্তা, টুপী বা পাগড়ী পরত, পরে আরাকানী প্রভাবে লুঙ্গী ধরেছিল। মুসলিম মেয়েরা আরাকানী প্রভাবে থামী পরত এবং উত্তরীয়ের মতো গামছা গায়ে দিত, আজো দেয়। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হলে জুতা-মোজাও পরত। গরীব মুসলিম মেয়েরা পাতলা কাঁথাও থামীর মতো পরে লজ্জা নিবারণ করত।

পূর্ববঙ্গ গীতিকায় (পৃঃ ১৪) আছে ঃ

> পরনেতে তহমান কালা কুর্তা গায়
> মাথার উঅর (উপর)টুবি (টুপি)।

শিক্ষিত উচ্চবিত্তের এবং সরকারী চাকুরে মুসলমান ইজার (পাজামা), কামিজ, কাবাই, চাপকান, পাগড়ী, শামলা, নাগরা জুতা ও মোজা পরতেন।[৭২] বার্বোসার বর্ণনায় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের গায়ে পাতলা সূতি আলখাল্লা, কাপড়ের দোয়াল, গলাবন্দ, হাতে (খাপে ঢাকা) ছোরা, মাথায় পাগড়ী, আঙ্গুলে রত্ন খচিত অঙ্গুরীয় থাকত। তারা আরামপ্রিয়, অমিতব্যয়ী, ভোজনবিলাসী, বহুপত্নীক, মদ্যপায়ী ও সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। তারা হামাম বা হাউজে স্নান করত।[৭৩]

চীনসূত্রে জানা যায়, মুসলমানেরা (নিশ্চয়ই শিক্ষিত, বিদেশী ও ধনীরা) মাথায় সাদা সূতি পাগড়ী, গায়ে লম্বা সূতির সাদা আলখাল্লা এবং পায়ে ভেড়ার চামড়ার উপর সোনালী ছবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজ করা জুতো পরত। নারীরা পরত কামিজ, সূতি কিংবা সিল্কের ওড়না। তারা এমনিতেই গৌরবর্ণা, সেজন্যে প্রসাধন দ্রব্য ব্যবহার করত না। তাদের কানে মণিখচিত আঙ্গটা, গলায় হার এবং মাথায় খোপা থাকত। হাতে নানা প্রকার খাড়ু, চুড়ি বালা, কঙ্কন প্রভৃতি এবং হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় পরত।[৭৪] এ বর্ণনা অবশ্য বাঙালী মেয়ের নয়, গৌড়ের তুর্কী হেরেমের। দরবেশরা কালো আলখাল্লা পরতেন ঃ

সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরম গম্ভীর
কাল বস্ত্র পরে সেই লোকে কহে পীর।[৭৫]

তাঁদের পাগড়ীও ছিল, মোল্লা-মৌলবীরা ইজার ও পাগড়ী পরতেন।[৭৬] তাঁরা সাদা পোশাকই পছন্দ করতেন। জালালউদ্দীন তাবরেজীও কালো আলখাল্লা পরতেন বলে শেখশুভোদয়ায় উল্লেখ আছে।

ধার্মিক মুসলমানেরা মাথার চুল চেঁছে ফেলত।[৭৭] আগে নেড়ামাথাওয়ালা বৌদ্ধভিক্ষুদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা অবজ্ঞা করে বলত—নেড়ে। বৌদ্ধ বিলুপ্তির পর নেড়া মাথায় সূফীরা এবং সে-সূত্রে মুলমানেরা নেড়ে বলে অভিহিত হয়। আরো পরে চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব বৈরাগী ও সহজিয়ারা নেড়ানেড়ী নামে পরিচিত হয়।[৭৮]

হিন্দুর ছিল চটক ধুতি, মটক ধুতি এবং গরাদের ধুতি। মেয়েদের ছিল ময়ূরপেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমান তারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঞা নেত, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুম্বুর, মেঘলাল, গঙ্গাজলি প্রভৃতি শাড়ি। বেলুনপাটের শাড়ি, নেতের শাড়ি প্রভৃতি বহুমূল্য পার্বণিক পোশাক। মেয়েরা কাঁচুলি (Bodice) এবং অন্তর্বাস বা ছায়া (Petticoat) পরত।[৭৯]

নারীর প্রসাধন সামগ্রী হচ্ছে কস্তুরী, চন্দন, কেশর, অগুরু, কুমকুম, সুর্মা, কাজল, সিন্দুর (হিন্দুর নারায়ণ তৈল, বিষ্ণু তৈল) প্রভৃতি।[৮০] বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা-কৃষ্ণের সজ্জাই আদর্শ হিন্দুসজ্জা। নতুন কাপড় পরা ও পুরোনো কাপড় ছাড়ার ব্যাপারে নানা কুসংস্কারও ছিল। এক্ষেত্রেও বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাব বিশ্বাস ছিল গভীর।[৮১]

শতেরো শতকের কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মুসলিম যোদ্ধার পোশাকের এরূপ বর্ণনা পাই ঃ

পরিল ইজার খাসা নাম মেঘমালা
কাবাই পরিল দশদিক করে আলা।
পামরি পটকা দিয়া বান্ধে কোমর বন্দ ....
কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভার মাথে
রামের ধনুক-শর সভাকার হাথে।
সকল বচনে তারা সঙরে খোদায়
এক রুটি পাইলে হাজার মিয়া খায়।

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান অভিজাত চট্টগ্রামবাসী জমিদার পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির ঘরোয়া জীবন-চিত্র থেকে যোল শতকের লোকের জীবন ধারণের মান সম্বন্ধে আভাস মেলে ঃ

দিব্যখট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।
তাই দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে
পট্ট নেত বালিস শোভএ চারিপাশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পান তাত।
দিব্য আলবাটি দুই শোভে পাশে
পান খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে।
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে।
কি কহিব যে বা কেশ ভারের সংস্কার
দিব্যগন্ধ আমলক বহি নাহি আর।
সমুখে বিচিত্র এক দোলা সাহেবানা।[৮২]

পনেরো-ষোল শতকে তাকেই কৃতী পুরুষ মনে করা হত ঃ

যে দোলা ঘোড়া চড়ে
দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে।[৮৩]

যোগীর কানে কুণ্ডল, গায়ে বিভূতি, কটিতে কৌপীন, কাঁধে কাঁথা ও ঝুলি থাকত। নাথ ও বৌদ্ধ যোগীরা মাথা নেড়া করত আর শৈব যোগীদের মাথায় থাকত জটা।[৮৪]

সমাজের শিক্ষিত উচ্চবিত্তের হিন্দুরা রাজ-সরকারে চাকরি নিয়ে সৈন্যদলে ভর্তি হয়ে কিংবা দেশের শাসক সমাজের সংস্কৃতির অনুকরণে মুসলমানী পোশাক, আদব-কায়দা প্রভৃতি গ্রহণ করে। কবি জয়ানন্দ হিন্দু (ব্রাহ্মণের) দাড়ি রাখা, মসনবী পড়া, জুতামোজা পরা, বিধবা ও ব্রাহ্মণের মৎস্যপ্রীতি, জগাই মাধাইর গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতির জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দু রাজার মুসলিম পোশাক এবং রাজ প্রাসাদের মুসলিম সাংস্কৃতিক আবহের বর্ণনা দিয়েছেন।[৮৫]

www.amarboi.com

৫. অলঙ্কার

মেয়েরা মাথায় সিঁথিপাট, টিকলি, কণ্ঠে হাঁসুলি, টাকার ছড়া, তাবিজের ছড়া, হার, হাতে কঙ্কন, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু, পৈঁচি, অঙ্গদ, নাকে কোর, চাঁদবোলাক, ডাল বোলাক, নাকমাছি, বেশর, কানে কানফুল, কমরফুল, ঝুমকা কুণ্ডল, কানবালা, বালি, পায়ে প্যাজব, পাঁসুলি, নূপুর, ঘুংঘুর, হাত-পায়ের আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, মল, উনচট,[৮৬] বাহুতে তাড়, বাজু, কেয়ুর, জসম, গ্রীবায় গ্রীবাপত্র, হাতের পাতার উপর আঙ্গুল সংলগ্ন রতনচূড়, কটিতে নীবিবন্ধ কিঙ্কিণী, চন্দ্রহার প্রভৃতি ধারণ করত।[৮৭]

আঙ্গুলে নালিকা গোলাপ নূপুর সুছন্দ
কাটিতে কিঙ্কিণী হস্তে বাহু বাজুবন্দ।
গলে দোলে রত্ন চন্দ্রহার চন্দ্রজ্যোতি
নাসায় বেশর চক্র শোভে গজমোতি হার
যুগল শ্রবণে দোলে রতন কুণ্ডল
সবিতার রশ্মিকা মধ্যে খরিকা উঝল।
ললাটে টিকলি বিন্দু শোভে মনোহর
খোপায় বেলন পুষ্প জাদ মুক্তাছড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৈড়ন বেলন শাড়ি বহু মূল্য ধরে
ঢাকন ঘোঁঘট লঙ্গে কাঁচুলি উপরে।[৮৮]

হার ছিল ত্রিছড়ি, সপ্তছড়ি। মল্লতোড়র, বাঁকপাতা, মল, মকরখাড়ু, বঙ্করাজ[৮৯] প্রভৃতি পায়ে শোভা পেত। শেখশুভোদয়ায় তালপাতার কুণ্ডল বা কানফুলের উল্লেখ আছে। শঙ্খ ও সিন্দূর হিন্দু এয়োর প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

ধনী-ঘরের মেয়েরা মণি-মুক্তা খচিত, নানা কারুকার্য সমন্বিত বহু বিচিত্র আকৃতির অলঙ্কার পরত। আর গরীবেরা সাধ্যানুসারে রূপার ও পিতলের জেবরে সজ্জিত হত। বাঙলা কাব্যে নারীর রূপ বর্ণনা সূত্রে নানা অলঙ্কারের বর্ণনা রয়েছে। কর্ণাট দেশীয় ছাঁদে (কানড়ী) বাঁধা খোঁপার সৌন্দর্যের কথাও সর্বত্র উল্লেখিত হয়েছে। খোঁপায় মণিমুক্তা ছাড়াও ফুল জড়ানো হত। নারীর শাড়িরও বিচিত্র নাম ছিল। কাঁচুলির বৈচিত্র্যের আর সৌন্দর্যের উল্লেখও মিলে সর্বত্র।

সৈয়দ সুলতানের সমকালীন কবি মুহম্মদ কবীর (১৫৮৮ খ্রী:) সুন্দরীর চিত্রল ছাঁচের খোপা, অলকে মণির খোপা, শীর্ষে সিন্দূর, চোখে কাজল, কানে কানড়দেশীয় কুণ্ডল, নাকে সোনার বেশর, গলায় সপ্তছড়ি মুক্তাহার, বুকে বিচিত্র কাঞ্চুলি, করে কঙ্কণ, আঙ্গুলে অঙ্গুরী, পায়ে নূপুর, পরনে হেমরি শাড়ি এবং শাড়ির জরি পাড়ের বর্ণনা দিয়েছেন:

সুরঙ্গ অঙ্গে জরি পাড় ঝরি গড়ে
ঝরি ঝরি পড়ে রূপ পালঙ্ক ভাসি যায়।[৯০]

পুরুষও বাহুতে কবচ ও বাজু, বাহুতে গলায় ও কটিতে তাবিজ, কানে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় একছড়ি হার পরত।[৯১] সাধারণ লোক গলায় কালো তাগা রাখত, আর ধার্মিক মুসলমানরা খিলালের প্রয়োজনে (সুন্নত হিসেবেও) লোহার বা পিতলের খিলালশলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

৬. নারী

চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা আরাকানীদের বংশধর বলে নারী পর্দায় বিশ্বাসী নয়। বর্ণ হিন্দুরাও মুসলিম প্রভাবে পর্দা করত। বার্বোসা সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল মুসলমান নারীর পর্দা ও অবরুদ্ধ জীবনের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন এরা স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে আর সাধ্যমতো সোনা-রূপার অলঙ্কার ও সিল্কের পোশাক পরায়। বার্বোসার মতে প্রত্যেকেরই তিন-চারটে অথবা সাধ্যানুসারে আরো বেশী স্ত্রী থাকত।[৯২]

মুসলমানরা হিন্দুর মেয়ে ও বিধবা বিয়ে করত।[৯৩] সম্ভবত আকবরের আমল থেকেই হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে সমাজগ্রাহ্য ও সমাজসম্মত বিয়ে চালু হয়। বাদশাহনামা সূত্রে জানা যায়, আওরঙ্গজীবই আইন করে তা নিষিদ্ধ করে দেন। তবু রাজপুত সমাজে বিশেষ করে মালিকানা রাজপুতদের মধ্যে এখনো হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে অবিরল। জোলা, বেদে প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর দেশজ মুসলিম মেয়েরা পর্দা মানত না, তারা পুরুষের সঙ্গে গোত্রীয় পেশায় যোগ দিত। জোলা বিধবারা পূর্ব সংস্কার বশে নিরামিশ খেত।[৯৪] সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রীর উপর শারীরিক পীড়ন ও তালাকদান বহুল প্রচলিত ছিল।[৯৫] শ্বশুর বাড়িতে বধূদের অধিকার বাঁদী-গোলামের চেয়ে বেশি ছিল না। শাশুড়ী-ননদীর মন যুগিয়ে চলতে না পারলে স্বামীর-ঘর করা সব সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব হত না। হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান মেয়েরা স্বামী এবং গুরুজনদের নাম উচ্চারণ করত না। মেয়েরা বাইরে যেতে ভদ্রঘরে বোরখা এবং অন্যেরা ছাতা ব্যবহার করত।

হিন্দু সমাজে গৌরীদান অর্থাৎ অনূর্ধ্ব আট বছরের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার রেওয়াজ চালু ছিল। বারো বছর বয়সের মধ্যে বিয়ে দিতেই হত, অন্যথায় সামাজিক নিন্দা, পাপ ও অকল্যাণের ভয় ছিল। তবু কুলীন ঘরে বয়স্কা অনূঢ়া মেয়ে দেখা যেত। হিন্দু প্রভাবে মুসলিম সমাজেও বাল্য বিবাহ বিশেষভাবে চালু হয়। Manrique-এর মতে হিন্দুর সমাজে এক পত্নী সাধারণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ালেও, বহুপত্নীক লোকের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। বিশেষ করে কুলীনেরা বহু স্ত্রী গ্রহণ করত।[৯৬] সতীদাহ প্রথা খুব প্রবল না হলেও[৯৭] চালু ছিল।

প্রাত্যহিক জীবনে কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না বলেই মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি থাকত, কিন্তু নিজের বাড়ি কখনো হত না। বৃদ্ধা নারীর মুখেও তাই বাপের বাড়ি কিংবা শ্বশুরের ভিটের কথাই শোনা যেত।

৭. বিবাহ

হিন্দু ও মুসলিম সমাজে সম্ভবত হিন্দু গৌরীদান প্রথার প্রভাবে অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে হত। Ralph Fitch বলেছেন, আট-দশ বছরের বালকের সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের বালিকার বিয়ে চালু ছিল।[৯৮] দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে দেখি বিদ্যাকে আট বছর বয়সে বিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। এমনকি শিশুদেরকেও সম্বন্ধে বিয়ে দেবার চেষ্টা হত।[৯৯] সব সমাজেই বিয়েতে পণপ্রথা চালু ছিল। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে পাই :

পণের নির্ণয় কৈলা দ্বাদশ কাহন
ঘটকালি পাবে ওঝা তুমি চার পণ।
পাঁচ গণ্ড গুয়া দিয়া গুড় পাঁচ সের
এহা দিলে আর কিছু না কহিবা ফের।
অথবা, আমি যে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাই।
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ হরিতকী দিয়া।[১০০]

এ হচ্ছে গরীবের বিয়ে। ধনীর বিয়ের প্রস্তাবে আছে ঃ

বহু মূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন
প্রদীপ সমান দাস রূমী একশত
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ ঃ[১০১]
অথবা, ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।[১০২]

মুসলিম সমাজে কন্যাপণ এবং হিন্দু সমাজে বরপণ বিশেষভাবে চালু ছিল। সেকালে পণ ও অলঙ্কারের ব্যাপারে বর ও কনে পক্ষ পরস্পরকে প্রতারণা করতে চাইত, (সম্ভবত দারিদ্র্যবশত, অবশ্য অভাবে করতে করতে তা স্বভাবে ও রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল)। তাই বিবাহ-সভায় ঝগড়া-বিবাদ, এমনকি মারামারি অবধি হত। হিন্দুর বিবাহে নানা আচার[১০৩] আছে বলে বিবাহোৎসবের রেশ কয়েক দিন ধরেই থাকে। লখীন্দর-বেহুলা কাহিনী তৈরি হওয়ার পর থেকে এর প্রভাবে প্রথম রজনীকে হিন্দুরা কালরাত্রি বলে ভয় করে। মুসলমানের বিয়েতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটা ভোজনোৎবের অবকাশ ছিল। বর-বাড়ি দেখা, বর দেখা, কনে দেখা, গায়ে হলুদ, তেলোয়াই, বিবাহ-বাসর, ওয়ালিমা, মেহেদী লাগানো, বাজি পোড়ানো, মেয়েলি নাচ-গান, পুতুল নাচ, বাজিগরের খেলা প্রভৃতি উৎসরেব অঙ্গ ছিল।[১০৪] এমনি করে বিবাহোৎসবে গৃহস্থের সাধ্যমতো খানাপিনারও ব্যবস্থা থাকত। ঘড়াকাঁজি বা আমানি তথা হালকা হাড়িয়া মদও উৎসবে খাওয়া হত। রঙের অভাবে কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি করে আনন্দিত উত্তেজনার অভিব্যক্তি দেয়া হত।

ঘরে-সংসারে বধূর কার্যত কোনো মর্যাদা ও অধিকার ছিল না বলে কনের মা-বাপকে চিরকাল জামাতা পক্ষের মন যুগিয়ে চলতে হত। 'যদি মারে ঝাটা, তবু না ছাড়ে ঝিয়ের ঘাটা।' ইত্যাকার ছড়া-প্রবচনে এর আভাস রয়েছে। কন্যার পিতা হিসেবে রাজা আর ভিখারীর একই অসহায় অবস্থা। জামাই বিদায়ের সময় শ্বশুরের মিনতি ঃ

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো্যো তুমি।
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত
প্রীতি কর্‌্য যেহেন জানকী রঘুনাথ।[১০৫]

অথবা, নারীজাতি অপরাধী পায় পায় দোষ
অপরাধ না লইবে না করিবে রোষ।[১০৬]

কন্যাদায় আজকের মতো সেদিনও বড় দায় হিসেবেই গণ্য ছিল ঃ

যোগ্য কন্যা যার ঘরে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তারে
নিরবধি মনে মনস্তাপ।[১০৭]

চট্টগ্রামের বৌদ্ধ-সমাজে ও তার প্রভাবে মুসলিম সমাজে নারীরাও বরযাত্রী হত।

আজকের মতোই হিন্দু মুসলমান সবাই কুলায় ধান, দূর্বা, হরিদ্রা রেখে আম্রকিশলয় দিয়ে মঙ্গলঘট বসাত, জ্বালত মঙ্গলদীপ। বহির্দ্বারে কলাগাছ পুতে পাশে রাখত কলস। এ ছিল অনুষ্ঠানের শুভ সূচনার মাঙ্গলিক। এ ছাড়াও হিন্দুদের পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতির মঙ্গলাচার তো ছিলই।

পর্তুগীজ সমাজে বিবাহিত নারীরা পর্দা করত, আচ্ছাদিত পালকীতে করে বাইরে যেত। Courtship-এর রেওয়াজ ছিল না। মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার পরত। একাকী বদ্ধ ঘরে থাকতে হত বলে তারা সাজসজ্জা ও গান-বাজনা-প্রিয় ছিল এবং প্রায়ই গোলাম চাকরের সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক স্থাপন করত।[১০৮]

ধনীরা উপপত্নী রাখত ও বারাঙ্গনা পুষত। তার জের উনিশ শতক অবধি ছিল।[১০৯] মুসলমানদের ক্রীতদাসী সম্ভোগে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই। তাই ধনী-জমিদারের থাকত নজরী ও নজরীজাত সন্তান। এটি রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাই এতে লজ্জার বা লুকোবার ছিল না কিছুই। এঁদের পত্নীদেরও এসব সহ্য ও স্বীকার করবার মানসিক প্রস্তুতি থাকত। সেজন্যে দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে হয়তো বিশেষ কোন অশান্তি বা বিপর্যয় ঘটত না। তাই বোধ হয় তোহফার মতো শরীয়ৎ-শাস্ত্রের গ্রন্থেও অসঙ্কোচে উচ্চারিত হয়েছে ঃ

যদি দাসী কিনি গৃতে আনে কোনজন
ত্বরামাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন।
উদর পবিত্র আগে বুঝিয়া নরম
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেচিলে বেচিব দাসী পবিত্র উদরে
মাসেক অবধি লও চরিত্র বুঝিবারে। (বাব, ১৮)
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল
কিনিয়া সুন্দর দাসী গোঞাইলে ভাল। (বাব, ১২)

৮. আদব-কায়দা

আদব-লেহাজ-তবিয়তে সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। আলাউলের তোহফায় মজলিসে আচরণ বিধির উল্লেখ আছে। এ ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে গুরুজনের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করা, গুরুজনের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, জুতো পায়ে গুরুজনের কক্ষে প্রবেশ না করা, গুরুজনের কাছ থেকে চলে আসতে হলে পিছু হটে আসা, গুরুজন ও মান্যজনের সামনে তামাক না খাওয়া, বাম হাতে কিছু দেওয়া-নেওয়া না করা, মজলিসে মান্যজনের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ও উচ্চশিরে কোনো কথা না বলা, মজলিসে একসঙ্গে খাওয়া শুরু করা এবং একসঙ্গে শেষ করা, মান্যজনের আগে আগে না চলা, গুরুজন– মান্যজনের দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক লোকদের নাম ধরে না ডেকে সন্তানের নাম করে অমুকের মা বা বাপ বলা, খাবার সময় ছোট গ্রাস ধরা, ঠোঁট বন্ধ করে চিবানো, বাসনে অল্প করে ভাত-তরকারী নেওয়া এবং গুছিয়ে রাখা, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা প্রভৃতি সামাজিক আদব-কায়দার অন্তর্গত ছিল।[১১০] হিন্দুরাও এসব রীতিপদ্ধতি মেনে চলত। মুসলমান সমাজেও কদমবুচি তথা পদধূলি গ্রহণ প্রথা চালু ছিল।[১১১]

ভদ্রলোকেরা পারিবারিক জীবনেও এসব বিশেষ গুরুত্ব সহকারে যত্নের সঙ্গে মেনে চলত। অশিক্ষিত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উৎসবে-পার্বণে মজলিসে এসব রীতিনীতি মেনে চলার চেষ্টা করত। উচ্চবর্গের মুসলমানের আদব-লেহাজের কথা বলেছেন এক বিদেশী পর্যটক : মজলিসে তাঁরা কথা বলতেন :

> in a very low voice, with much order, moderation, gravity and sweetness, often they speak into each other's ear and they put the end of their shoulder-sash of their right hand in front of their mouth, for fear of incoveniencing each other with their breath.[১১২]

৯. লোকচরিত্র :

বাঙালী চরিত্র সম্বন্ধে বিদেশীদের ধারণা ভাল ছিল না। De lact বলেছেন, তারা Subtle, but, depraved character এবং চুরি ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত। তাদের নারীরাও অপকর্মাসক্ত ও দুর্বিনীত। Schouten এর মতে :

> Lechery and foul commerce are ordinary things in the whole of India. But ...... in Bengal and some other countries in this respect, things are even worse than elsawhere.

> Manrique এর চোখে বাঙালীরা a languid race and pusillanimous meanspriited and cowardly.[113]

তারা 'শক্তের ভক্ত নরমের যম'। তাদের কাছে ' যে মারে সে ঠাকুর, যে না মারে সে কুকুর'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদ ও মাগে উচ্চবিত্তের লোকের সীমাহীন আসক্তিও ছিল।[১১৪] তাদের মর্যাদাবোধ-শূন্যতা এবং বীর্যহীনতা তথা ভীরুতাও Manrique-এর দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বলেছেন, তারা easily accustom themselves to captivity and slavery. Bowrey বাঙালী ব্রাহ্মণের মনীষার তারিফ করেছিলেন।[১১৫] একজন বাঙালী ইতিহাসবেত্তা বিদ্বানের ধারণায় প্রাচীন বাঙালীর চরিত্র এরূপ :

> শাস্ত্রচর্চা ও জ্ঞানচর্চায় বুদ্ধি ও যুক্তি অপেক্ষা প্রাণধর্ম ও হৃদয়াবেগের প্রাধান্য .... আবর্তন ও বিপ্লব, দুঃসাহসী সমন্বয়, সাঙ্গীকরণ ও সমীকরণ যেন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সনাতনত্বের প্রতি একটা বিরাগ যেন বাংলার ঐতিহ্যধারায়, ... বাঙালির বৃত্তি যথার্থত বৈতসী, যে আদর্শ, যে ভাবস্রোতের আলোড়ন, ঘটনার যে তরঙ্গ যখন আসিয়া লাগিয়াছে, বাঙলাদেশ তখন বেতস লতার মত নুইয়া পড়িয়া অনিবার্য বোধে তাহাকে মানিয়া লইয়াছে এবং ক্রমে নিজের মত করিয়া তাহাকে গড়িয়া লইয়া, নিজের ভাব ও রূপদেহের মধ্যে তাহাকে সমন্বিত ও সমীকৃত করিয়া লইয়া আবার বেতস লতার মতই সোজা হইয়া স্বর-রূপে দাঁড়াইয়াছে। যে দুর্মর অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি বেতস গাছের, সেই দুর্মর প্রাণশক্তিই বাঙালীকে বারবার বাঁচাইয়াছে।

বাঙালীর বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং ইসলাম গ্রহণের এবং গ্রহণ করে আন্তরিকভাবে বরণ না করার রহস্য এবং জৈব জীবনের তাকিদে তাকে প্রয়োজন মতো রূপ দেয়ার তত্ত্ব এখানেই নিহিত। বিভিন্ন বৌদ্ধ যান, যোগ, দেহতত্ত্ব কায়াসাধন, পার্থিব জীবনের মিত্র ও অরি দেবতার পূজা প্রবণতার কারণ এ-ই :

AMARBOI.COM

> প্রাচীন বাঙ্গালীর হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির ইঙ্গিত তাহার প্রতিমা শিল্পে এবং দেবদেবীর রূপ-কল্পনায় ধরা পড়িয়াছে। .... সিদ্ধারা বলতেন বিরাগাপেক্ষা পাপ আর কিছু নেই, সুখ অপেক্ষা পুণ্য নাই। ... অরূপের ধ্যান এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানময় অধ্যাত্ম সাধনার স্থান বাঙ্গালী চিত্তে স্বল্প ও শিথিল। বাঙ্গালীর বুদ্ধি, একটা শাণিত দীপ্তি লাভ করিয়াছিল ... বাঙ্গালী তাহার এই বুদ্ধির দীপ্তিকে সৃষ্টি কার্যে নিয়োজিত করে নাই। .... তখন (মুসলিম বিজয়কালে) রাষ্ট্রে, ধর্মে, শিল্পে, সাহিত্যে, দৈনন্দিন জীবনে যৌথ অনাচার নির্লজ্জ কামপরায়ণতা, মেরুদণ্ডবিহীন ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা, রুচিতারল্য এবং অলঙ্কার বাহুল্যের বিস্তার।[১১৬]

আমাদের ধারণায় বাঙালী-স্বভাবে নানা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ রয়েছে : ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধনভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বাঙালী ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তার হাসি-কান্না-ক্রোধ সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত ও সাময়িক। তার গীতিপ্রবণতার উৎস এখানেই। সে কালো পিঁপড়ের মতোই স্বাতন্ত্র্যে, ধূর্ততায় ও অস্থিরতায় আস্থা রাখে। তাই সে ধূর্তামি যত জানে বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না। ফলে আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলুষিত হয়, আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। আত্মরতি তার এতই প্রবল যে স্বতন্ত্র জীবন প্রচেষ্টায় সে সদা উন্মুখ, তাই তার সঙ্ঘশক্তি নেই। ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে সে একতার ও বুদ্ধির অবদান গ্রহণে অসমর্থ।

ভাবপ্রবণ বলেই বাঙালী মুখে তথা তত্ত্বচিন্তার ক্ষেত্রে আদর্শবাদী ও বৈরাগ্যধর্মী, কিন্তু প্রবৃত্তিতে সে একান্তই অধ্যাত্মবাদীর ভাষায় 'বস্তুবাদী', গণকথায় 'জীবনবাদী' আর নীতিবিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখে 'ভোগবাদী'। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে, বাঙালী ভোগী এবং ভোগ-মোক্ষবাদী। এজন্যে বাঙলাদেশে জীবনবাদ বা ভোগবাদ অধ্যাত্মচিন্তার ওপর বারবার জয়ী হয়েছে। তাই নৈরাত্ম নিরীশ্বরবাদী এবং নির্বাণকামী বাঙালী বৌদ্ধ যোগ-তান্ত্রিক দেহসাধনায় অমর হতে চেয়েছে। জীবনকে এবং জগৎকে সে ভালবেসেছে। এ মর্ত্যপ্রীতিই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে বৌদ্ধ-চৈত্যকে দেবদেবীর আখড়া বানাতে এবং নির্বাণের নয়, জীবনের ও জীবিকার, আরামের ও বিলাসের বরদাতা দেবতারূপে তাঁদের পূজা করতে।

বাঙালী ভোগলিপ্সু বটে, কিন্তু সে কর্মকুণ্ঠ, তাই পৌরুষের দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা জীবনোপভোগের প্রয়াস তার ছিল না। মহাজ্ঞান, তুকতাক, ডাকিনী-যোগিনী প্রভৃতির দ্বারা খিড়কী-দোর দিয়ে জীবনের ভোগ্য সম্পদ আহরণের অপপ্রয়াসই তার কর্মাদর্শ তথা জীবনের লক্ষ্য ছিল। পাল আমল এমনি করে কাটল।

আবার সেন আমলে উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ দৃঢ়মূল করার প্রয়াস হল, তখনো একই কারণে মায়াবাদ তথা জ্ঞানবাদ, পরব্রহ্মপ্রীতি কিংবা জীবাত্মা-পরমাত্মার রহস্য প্রভৃতিতে সে কোনো উৎসাহ বোধ করেনি। পরলোকে প্রসারিত জীবনে বস্তুত তার কোনো আস্থাই ছিল না। তাই সে চণ্ডী (অন্নদা বা দুর্গা), মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি অরি ও মিত্র দেবতা সৃষ্টি করে, তাঁদের পূজা দিয়ে জীবিকার ব্যাপারে স্বস্তি খোঁজে।

আবার একই উদ্দেশ্যে ইসলামোত্তর যুগে, বিশেষ করে মুঘল আমলে হিন্দুর পুরোনো ধর্মের জীর্ণতায় এবং ইসলামের নির্দেশের প্রতি অবহেলায় গণমানসে জেগে ওঠে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, বনবিবি-বনদেবী, কালুগাজী-কালুরায়, বড় খাঁ গাজী-দক্ষিণ রায়, ওলাবিবি-শীতলা, বাস্তুবিবি-বাস্তুদেবী প্রভৃতি জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা সহায়ক দেবতা। বৈষ্ণব সমাজের বিকৃতিও এ একই মানসিকতার ফল। অতএব কোন বৃহৎ ও মহতের সাধনা বাঙালীর কোনোকালেই ছিল না। চৈতন্যাদি মহাপুরুষের আবির্ভাব তাই ব্যতিক্রম এবং আকস্মিক। চৈতন্য ও রামকৃষ্ণের মতের প্রচার ও প্রসারক্ষেত্র তাই বাঙলাদেশ নয়। বলেছি, বাঙালী একান্তভাবে জীবনসেবী ও ভোগবাদী। এজন্যে সে আত্মা-পরমাত্মাকে তুচ্ছ জেনেছে, স্বর্গ-নরককে করেছে অবহেলা।

যেখানেই সে ভোগের সামগ্রী দেখেছে, সেখানেই তার লুব্ধ চিত্ত কাঙাল হয়েছে। পৌরুষ তার ছিল না। ভীরুতা ও কর্মকুণ্ঠা তার মজ্জাগত; তাই জীবন ধারণের প্রয়োজনে দেব-নির্ভর অথবা অপ্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তি ও উপায় সন্ধান করাই ছিল তার লক্ষ্য। তবে লোভের তীব্রতায় এবং ত্রস্ত জীবনের মমতায় কখনো কখনো সে ক্ষণকালের জন্যে মরীয়া হয়ে বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমেছে, সে সাহস দেখিয়েছে। কিন্তু জৈব ধর্মের প্রতিকূল নিছক অধ্যাত্ম চিন্তা তাকে প্রলুব্ধ করেনি। তবু, তার প্রাণ-প্রাচুর্যের ও স্বাধীন মননের লক্ষণ ফুটে উঠেছে তার স্বধর্মে ও স্বভাবে সুস্থিরতায়। বহিরাগত কোনো মত-আদর্শই সে কোনোদিন মনেপ্রাণে বরণ করেনি। এ স্বাতন্ত্র্য ও অনমনীয়তা একালে দেশ-বিদেশে তার মর্যাদা অবশ্যই বাড়িয়েছে।

প্রত্যন্ত প্রদেশ বলেই হোক, কিংবা পার্বত্য অঞ্চল বলেই হোক অথবা বাঙলাদেশ থেকে অনেককাল রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার ফলেই হোক, চট্টগ্রামের লোকচরিত্র একটু স্বতন্ত্র, বরং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের লোক-স্বভাবের সঙ্গে এদের মানসের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও রক্ষণশীলতা এদের চরিত্রে সহজেই লক্ষণীয়। ধর্মের ক্ষেত্রে এদের মতের বিবর্তন দেখা যায়নি। চট্টগ্রামের লোকধর্মের পরিচিতি প্রসঙ্গে আমরা বলেছি তারা হিন্দু ধর্মের পৌরাণিক রূপ এবং ইসলাম শরীয়তী অবয়ব রক্ষা করেছিল। আরাকানী প্রভাবে কিংবা পর্বত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সাগর বেষ্টিত চট্টগ্রামের প্রকৃতির প্রভাবে চট্টগ্রামী লোক সাধারণত উদার, অকপট ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন এবং এ-কারণেই সম্ভবত কিছুটা দুর্বিনীত ও রগচটা। ক্রোধ তাদের বেশি হলেও তারা প্রতিহিংসাপরায়ণ নয়, রাগ পড়ে গেলে সে সহজেই ক্ষমা করতে পারে, ভুলতে পারে অপরের দেওয়া আঘাত। একই কারণেই হয়তো সে তোষামোদেও অপটু। ফলে তারা স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে কারুর অনুগত হতেও জানে না। কাকেও নিজের অনুগত করে রাখতেও তারা পারে না। এ-সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে তারা আরাকানীদেরই সগোত্র। ইতিহাসসূত্রে জানা যায় খ্রীস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতক অবধি তো বটেই এমনকি একাদশ শতক অবধি আরাকানী-চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতিত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। [১১৭] অতএব এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

১০. নেশা

চট্টগ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তামাক সেবন করত। এক রসিক 'তামাকু পুরাণ' 'এবং অপরজন হুক্কাপুরাণ [১১৮]রচনা করেছেন। [১১৯] 'চৌদ্দ শত দরবেশ চলে আরবোলা হাতে' [১২০]-দ্বিজ ষষ্ঠীবর। আঠারো শতকের কবি শেখ সাদীর 'গদা-মল্লিকা' কাব্যে তামাক সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলা হয়েছেঃ

গদাএ বলে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ।
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্য হতে জানিব তামাক বড় ধন
তামাকু বৃদ্ধের বালকের রাখিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকের হাতে
হাঁটিয়া যাইতে লোকে পিব পথে পথে
খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাঁকফুক।

আঠারো শতকের শেষার্ধের কবি আফজল আলী তাঁর নসিহতনামায় বলেছেন, যারা তামাক সেবন করে এবং যারা এ ব্যাপারে সহায়তা করে হাসরে তাদের বদন 'ছেহা' বর্ণ হবে এবং 'এই দোষে না পাইব দেখা রাসুল আল্লার।' (পৃঃ ২১) ধেনো, চরস এবং চণ্ডুতেও কারো কারো আসক্তি ছিল। এটি সম্ভবত আরাকানী প্রভাবের ফল। এছাড়া গাঁজা ও মদ [১২১] (কারণবারি) শৈব-শক্তি সমাজে ধর্মীয় বিধির অজুহাতে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। 'মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে।' গাঁজার চলই ছিল বেশি। পান সুপারী ভক্ষণ ছিল মুখশুদ্ধির উপায় এবং জনগণের অন্যতম বিলাস। পান-সুপারী দিয়েই আগন্তুককে আপ্যায়ন করা হত।[১২২]

১১. গান বাজনা

গান-বাজনাও হিন্দু-মুসলিম সমাজে সমান লোকপ্রিয় ছিল। চট্টগ্রামে হিন্দুও মুসলিম রচিত রাগতালের ও গানের বহু গ্রন্থ মিলেছে। বিশেষ করে কলন্দরিয়া, চিশতিয়া ও কাদিরিয়া খান্দানের সূফীদের আগ্রহে চট্টগ্রামে গান-বাজনার বহুল চর্চা হয় মুসলিম সমাজে। প্রায় সব মুসলিম কবিই গান রচনা করেছেন। রাগতালের গ্রন্থও রচনা করেছেন অনেকেই।[১২৩] একসময়ে বৈষ্ণব পদাবলী গাইবার জন্যেও চারটি সুর তৈরি হয়- গড়েরহাটি, রেনিটি, মনোহরশাহী এবং মান্দারাণী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙ্গা ঢাক দোতারা
শঙ্গ সানাই কর্ণাল ফুকরে
মধুবেলি চঙ্কবাঁশি নানা বাদ্য রাশি রাশি
যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে।
(মুহম্মদ কবীর)

এছাড়া তবলা, মুরলী, রবা, সেতার, বেহালা, ভেউল প্রভৃতি তো ছিলই উচ্চবিত্তের ঘরে। আলাউল তো প্রথম জীবনে সঙ্গীত শিক্ষকই ছিলেন। তিনি কথা, সুর এবং তালও যোজনা করতে পারতেন, গাইয়ে-বাজিয়ে তো ছিলেনই।

পেশাধারী নর্তকী ছাড়াও মেয়েরা মেয়েদের মধ্যে মেয়েলী (সহেলা) গান গেয়ে নাচত।[১২৪] অন্য লোকেরা সঙ্গীতে ও নৃত্যে একেবারে অজ্ঞ ছিল না।

কেহো নাচে কেহো গায়, কেহো হাসি যন্ত্র বায়
রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
(মুহম্মদ কবীর)

চীনা সূত্রে বাঙালীদের সম্বন্ধে জানা যায় :

The Bengalees are good singers and dancers to enliven drinking and feasting.[১২৫]

AMARBOI.COM

১২. দাসপ্রথা

দেশে দাসপ্রথা চালু ছিল। মানুষ বেচাকেনা হত। অনেক সময় দলিল [১২৬] করেই বেচাকেনা হত। তাছাড়া গরু ছাগলের মতো বাজারেও বিক্রয় হত। বিগত শতকেও ভাগলপুরের বাজারে মানুষ বেচাকেনা হত বলে শুনেছি। সমাজে বাঁদী গোলামের সংখ্যাধিক্যেই আভিজাত্য ও ঐশ্বর্যের পরিমাপ হত।[১২৭] বেচাকেনা বন্ধ হলেও ১৯৩০ সন অবধি ভদ্রলোকদের গোলাম ছিল। এখনো আছে হয়তো।

১৩. ঘর-বাড়ি

রাজধানীতে ইট-পাথরের দালান-কোঠা অবশ্যই ছিল। জমিদার সামন্ত বাড়িও পাকা ছিল। কিন্তু সাধারণের বাড়ি মাটির ও বাঁশের তৈরিই ছিল। কুঁড়েঘর ও পাতার বা পর্ণগৃহের ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। কক্সবাজার অঞ্চলে কাঠের সুলভতা এবং আরাকানেরও পার্বত্য অঞ্চলের প্রভাব বশত কাঠের বাড়ি ছিল। আধুনিক সীতাকুণ্ড এলাকার কাঠঘরে আরাকানীদের কাষ্ঠনির্মিত দুর্গ ছিল।[১২৮] সন্দ্বীপে ফতেহ খান ও আবু তোরাব চৌধুরী বাঁশের দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। গত শতকের তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা প্রখ্যাত। আবুল ফজল বলেন :

Their houses are made of bamboos, some of which are so constructed that the cost of single one will be five thousand rupees.[১২৯]

মীর্জা নাথান সুপারী গাছ দিয়ে যশোরে ত্রিতল গৃহ নির্মাণ করেছিলেন।[১৩০] বাঁশের ঘর দোচালা ও চৌচালা হতে পারে। দোচালা ঘরের চাল হাতীর পিঠের আদলে তৈরি হত (ধনী লোকের ঘর আটচালা হত)। জলের মাঝখানে জলটুঙ্গী নামে বিলাসগৃহ এবং এযুগের Pavilion এর মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাওয়াখানাও বিলাসী, ধনীরা তৈরি করত। মুসলমানেরা সমুখের কক্ষকে হাতিনা, মধ্যের কক্ষকে পিঁড়া (চৈতন্য ভাগবতেও পিঁড়া inner apartment অর্থে ব্যবহৃত, পৃষ্ঠা ১৮৯) এবং পেছনের কামরাকে আওলা বলে। এই আওলা অনেক সময় রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বৈঠকখানাকে দেউরী বা কাছারী বলা হয়।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল সূত্রে জানা যায়, চৌচালা ও বাঙালা (Bunglow) ঘর জনপ্রিয় ছিল। চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরার বারমাসীতে গরীবের ঘরদোরের বদহাল প্রত্যক্ষ করেছি। Tavernier ঢাকার সূত্রধরদের ঘরবাড়ি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন Properly speaking only miserable huts made of bamboo and mud.

সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের একটি শ্লোকে :

'চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম।

বাতুপদার্থিমন্ত্রকাকীর্ণ জীর্ণং গৃহং মম।'

–এমনি দরিদ্র গৃহের চিত্র পাই। দুর্ভিক্ষ, ভিখারী, চোর প্রভৃতি শব্দ যখন যে-কোন ভাষায় সুপ্রাচীন, তখন দারিদ্র্যের থেকে মানুষের কোন কালে ও দেশে মুক্তি ছিল না। কেবল অনুপাতের তারতম্য ছিল। Manrique বলেছেন, আমাদের দেশের গরিবের চারটির বেশি মাটির হাড়ি, সরা, সানকিও ছিল না।[১৩১] 'প্রাচীন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' এবং 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী' গ্রন্থে ডক্টর সুকুমার সেন বাঙালীর দারিদ্র্যের তথ্যনির্ভর প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। গৃহ নির্মাণে ও গৃহ প্রবেশে বার-তিথি-ক্ষণের প্রভাব স্বীকৃত হত।[১৩২] চট্টগ্রামে 'চণ্ডীমণ্ডপ' নামের ঘর আজো আছে।

AMARBOI.COM

১৪. মুদ্রা ও বিনিময়

চট্টগ্রাম চিরকাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। পৃথিবীর নানা দেশের বাণিজ্যতরী ভিড় করত চট্টগ্রাম বন্দরে। কাজেই বিনিময় ব্যবস্থাও ছিল বিভিন্ন। দ্রব্যের বিনিময় এবং দ্রব্যের মুদ্রামান দুটোই চালু ছিল। আবার চট্টগ্রাম ঘন ঘন হাত বদল হয়ে গৌড়, আরাকান ও ত্রিপুরার শাসনে এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রে পর্তুগীজদের প্রভাবে থাকত। কাজেই তিন রাজ্যের মুদ্রাও চলেছে চট্টগ্রামে, কড়িও চলত।[১৩৩] কড়ির চল উনিশ শতকের শেষার্ধেও ছিল এবং বুড়ি-গণ্ডা-পণ ও কাহনের হিসাবে মূল্যমান নির্ধারিত হত।

১৫. কৃষি-শিল্পদ্রব্য

চট্টগ্রামে ধানই প্রধান সম্পদ। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলে তুলার চাষ এবং কাঠ মিলত। লঙ্কা, ইক্ষু, সুপারি প্রভৃতি জনগণের প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হত। শিল্পদ্রব্যের মধ্যে লবণই উল্লেখ্য। নৌকা ও জাহাজ নির্মাণও[১৩৪] তারা করত। পার্বত্যসেগুন, জারুল, গর্জন কাঠ তাদের রপ্তানী দ্রব্যের অন্যতম ছিল।

১৬. ব্যবসায়-বাণিজ্য

চট্টগ্রামবাসীর নৌ-বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য ও খ্যাতি ছিল।[১৩৫] গোটা বাঙলা ও কামরূপের (আসামের) এমনকি উত্তর ভারতের পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। কামরূপের চন্দন, উত্তর ভারতের গম-যব, সুতি ও সিল্কের কাপড়, মসলিন, কাঠ, চামড়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাউল প্রভৃতি এ বন্দর দিয়েই রপ্তানী হত। সে যুগের সমাজ বিন্যাসে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীরা স্ব স্ব পেশা নিয়েই থাকত, কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য উচ্চবিত্তের লোকদেরই পেশা ছিল। আর কৃষক ও পেশাজীবীরা স্থানীয় বাজারেই তাদের উৎপন্ন বা শিল্প দ্রব্য বিক্রয় করে সন্তুষ্ট থাকত।

আমদানী দ্রব্যের একটি আদর্শায়িত চিত্র :

সদাগড়ে বোলে শুন দাঁড়ি মাঝি ভাই
দ্রব্য সব নৌকায় তোল দেশে চলি যাই।
চাঁদোয়া চামর তোলে তার নাই ওর
শুভবস্ত্র আদি তোলে তশরের জোর।
শংখ চন্দন তোলে মুক্তা রাশি রাশি
মুক্তা শর্করা তোলে মনে মনে হাসি।
আর যত দ্রব্য তোলে তার নাই সীমা
লবঙ্গ জাতি ফল তোলে কি কহিমু মহিমা।
তামা পিতল তোলে নানা জাতি ফল ....
নানা জাতি বস্ত্র তোলে নানা উপকার
সুবাসিত জল তোলে করিতে আহার।[১৩৬]

বার্বোসা (১৫১৪) সম্ভবত সোনারগাঁকেই 'বাঙ্গালা শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন। কেননা Ralph Fitch বর্ণিত সোনারগাঁর সঙ্গে বার্বোসা বর্ণিত City of Bangala-এ মিল আছে।[১৩৭] বার্বোসা বলেন :

All of these are great merchants and they possess great ships after the fashion of Mica; others there are from china which the call 'Juncos' with are of great size and carry great cargoes. With these they sail to Choramandel, Malaca, Camatras, Pegu, Cambaya and Ceilon and deal in goods of many sorts with this country and many others.[১৩৮]

Ralph Fitch বলেন :

Sinnergan (Sonargaon) is a town six leagues from Serrepore (Sreepur, Dacca) where there is the best and finest cloth made of cotton that is in all India great store of cotton cloth goeth from hence and much rice wherewith they serve all India, Ceilon, Pegu, Malaca, Sumatra and many other places.[১৩৯]

অতএব, উভয়েই বলেছেন, সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা, কাম্বে, করমণ্ডল ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল প্রভৃতি নানা স্থান থেকে বাণিজ্য-তরী বাঙলা শহর বা সোনারগাঁয়ে আসত। বার্বোসা বলেছেন, চীনা বাণিজ্য তরীর নাম ছিলো জাঙ্কো এবং অন্য বিদেশী বণিকদের তরীগুলো ছিল মক্কার তথা আরবী জাহাজের আদলে তৈরি।

সোনারগাঁয়ে চট্টগ্রাম হয়েই যেতে হত। কেননা গঙ্গামুখ তখন চট্টগ্রামের অদূরেই ছিল।[১৪০] কাজেই ষোল শতকে চট্টগ্রাম বন্দরের রূপও এমনি ছিল। বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত কিংবা মুকুন্দরাম বাঙলার বহির্বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিশয়োক্তি কম। Ralph Fitch যখন চট্টগ্রামে যান (১৪৮৫ সন), চট্টগ্রাম তখন আরাকান অধিকারে এবং একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চট্টগ্রাম বন্দরের তুলা, চন্দন, মুসাব্বর (ঘৃতকুমারী -aloe) চাউল প্রভৃতি আবিসিনিয়া, গ্রীস, আরব, ইরান, এবং পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনে রপ্তানী হত। এককথায় , সে যুগের পৃথিবীর বাণিজ্য -কেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম। Periplus আরব ভৌগোলিক সোলেমান, মাসুদী, খোর্দাদবেহ, এবং দ্য বারোজ, বার্থেমা, ফিচ, ইবন বতুতা, মার্কোপলো, মাহুয়ান প্রভৃতির এবং বিভিন্ন চীনা বাণিজ্য মিশনের বর্ণনার মধ্যে এ বন্দরের আন্তর্জাতিকতা ও সমৃদ্ধির প্রমাণ মেলে। ষোল শতকে এদেশের সঙ্গে আরব-ইরানীর বাণিজ্য পর্তুগীজেরা গায়ের জোরে তথা লুটতরাজের মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়।[১৪১]

বার্বোসা এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের নামও করেছেন ঃ তুলা, ইক্ষু, আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, লেবু, শুষ্ক ফল এবং প্রাণীর মধ্যে ঘোড়া, গরু, মেষ, প্রভৃতি বহু পশুপাখীর সুলভতার কথা বলেছেন।

শিল্পদ্রব্যের তালিকায় আছে ঃ মিহি ও রঙীন বস্ত্র , সারবান্ত (শিরবন্দ) মামোলা, দোগায়জা (দোগজী), চৌতার চাদর, বিতিলহা প্রভৃতি বস্ত্র এবং চিনি প্রভৃতি। মাহুয়ানের বর্ণনায়ও বিচিত্র সুতি কাপড়ের কথা আছে ঃ চি চিহ, মান-চে-তি, শ-না-কিচ, হিন-চি-তুঙ্গ-তালি।[১৪২] ইবন বতুতা কাপড়ের এবং মার্কোপলো চিনির কথা বলেছেন। বার্বোসা খোজা (Eunuch) করা সম্বন্ধে লিখেছেন। হিন্দুর সন্তান ক্রয় করে ব্যবসায়ীরা খোজা করত। খোজারা অন্দরের চাকর, সৈনিক এবং শাসনকার্যে নিযুক্ত হত।[১৪৩]

AMARBOI.COM

১৭. লোকাচার ও কুসংস্কার

মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ'এ (পৃ.২১৮-২৪) এবং মুজাম্মিলে 'সায়াৎনামায়' লোকাচার ও নানা কুসংস্কারের বর্ণনা এবং আচারিক ও আনুষ্ঠানিক কর্তব্যাদির নির্দেশ রয়েছে। যেমন গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ, স্নান, নতুন বসন পরিধান, রোগ, ভূত-জীন-দেও তাড়ন, ব্যবসায় বাণিজ্যের শুভাশুভ, ঝাড়-ফুঁক-মন্ত্রের প্রয়োগবিধি, ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্রের শুভাশুভ প্রভৃতির বর্ণনা আছে।[১৪৪] এগুলো চট্টগ্রামবাসীর তথা বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের আচার-বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দু'একটি নমুনা দেই ঃ

গৃহ নির্মাণ ঃ বৈশাখে উত্তম বড় যদি কেহ নির্মে ঘর
ধনে জনে রাখে অনেকক্ষণ
জ্যৈষ্ঠে মন্দ অতিশয় মিত্র সব শত্রু হয়
আষাঢ়ে না রহে চতুষ্পদ।
স্নান ঃ সোমে-শুক্র ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে
আউ টুটি চিন্তা উপজয়
রোগ রবিবারে রোগ হয় সপ্তদিন মহাভয়
কিবা পঞ্চ দিবস সংশয়।
কৃষ্ণ কুক্কুটী দিব দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব
বুধবারে রোগ হয় যার।
ভূতদৃষ্টি ঃ ভূতদৃষ্টে হয় জান অজা-বৃষ দিব দান।[১৪৫]
বসন ঃ নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্ধিলে উত্তম বারে
পরিধান ঃ চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নববস্ত্র ফাড়ি যবে এহি রবিবারে তবে
ফাড়ির শাস্ত্রের পরমাণে।

হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জতুর গুঁড়ো, গাভীর হাড়, কালোমাটি, মাছের পিত্ত, হরিদ্রা, গন্ধক, কালো বিড়ালের ও মুরগীর বিষ্ঠা প্রভৃতিও প্রতিষেধক দারুর জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল। [সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ, পৃ.২২০-২৪]

এছাড়া বৌদ্ধ [মঘা] ও হিন্দু গণক, আচার্য ও জ্যোতিষের কোষ্ঠী, রাশি ও হস্তরেখা গণনা এবং মুসলিম নজুমের ফালনামায় তথা ভাগ্য গণনার প্রতি মানুষের আস্থা ছিল। [ওলিগণ গণিতে মাগিতে লাগিল ঃ মধুমালতী—কবীর] বর্ষশেষে ও নববর্ষে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখ মাসে আচার্য ব্রাহ্মণ গণকেরা ঘরে ঘরে গিয়ে পরিবারের সবারই ভাগ্য গণনা করত। আর ধান-চাল ও অর্থ উপার্জন করত। মুসলমানেরা ফালনামা তথা অদৃষ্ট গণনার পুঁথি রচনা করেছেন। (পুঁথিপরিচিতি)। সেকালের অজ্ঞ মানুষের সত্যপ্রীতি কুসংস্কার ভিত্তিক ছিল। তারা সত্য নির্ণয়ে পানিপড়া, চালপড়া, নলচালা, বাটিচালা প্রভৃতি মন্ত্রচালিত পদ্ধতির অনুরাগী ছিল। এগুলোতে আদিকালের অগ্নি, আসন, আঙ্গুরী, সর্প, লৌহ, তলা এবং ধর্মাধর্ম পরীক্ষা—এ অষ্টপরীক্ষার রেশ ও ঐতিহ্য রয়েছে।[১৪৬]

১৮. পীর-ফকির

মুহম্মদ খান তাঁর মাতৃকুলের সবাই পীর ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন ঃ শেখ শরীফুদ্দীন, মীর কাজী, খান কাজী, শেখ হামিদ, বাবা ফরিদ, হামিদ আলাম, শাহ নাসিরুদ্দীন, মোকাররম ও সদর জাঁহা আবদুল ওহাব ওরফে শাহ ভিখারী, শাহ আহমদ। দৌলত উজির বাহরাম খান পরের চারকুর্সির নাম করেছেন ঃ সদরজাহাঁ-জনুদ-মুহম্মদ সৈয়দ আসাউদ্দিন। সৈয়দ সুলতানের পীর ছিলেন সৈয়দ হাসান। সৈয়দ সুলতান নিজে মুহম্মদ খানের পীর। সৈয়দ সুলতানের পৌত্র মীর মুহম্মদ সফীর পীর ছিলেন কবি হাজী মুহম্মদ। সফীর পিতা ও সৈয়দ সুলতানের পুত্র সৈয়দ হাসান শেখ পরান-নন্দন শেখ মুতালিবের (কিফায়তুল মুসাল্লিন লেখক) পীর ছিলেন।

আঠারো শতকের কবি মুহম্মদ মুকিম চট্টগ্রামের কয়েকজন দরবেশের নাম উল্লেখ করেছেন ঃ

চট্টগ্রাম ধন্য ধন্য মহত্ত্ব বাখান
ধার্মিক অতিথশালা ফকীর আস্তান।
শাহ জাহিদ, শাহ পন্থী, আর শাহ পীর
হাদী বাদশা আর শাহ সুন্দর ফকির
শাহ সুলতান, আর শাহ শেখ ফরিদ
শহরের মধ্যে বুড়া বদরের স্থিত।

এরাঁ ছাড়া, কাতাল পীর, শাহমোহসিন বা মছন্দর, শাহ উমর, শাহ বদর, শাহ চাঁদ, শাহ জয়দ, শাহ গরীবুল্লাহ, মুল্লা সাঁই, শাহ মুল্লা মিসকিন, শাহগদী প্রমুখের নাম প্রখ্যাত।

আলাউল কাদেরিয়া খান্দানের এবং দৌলত কাজীর প্রতিপোষক রোসাঙ্গ মন্ত্রী আশরফ চিশতিয়া খান্দানভুক্ত ছিলেন। অতএব, চট্টগ্রামে মদারিয়া, কলন্দরিয়া, সোহরওয়ার্দিয়া, চিশতিয়া ও কাদেরিয়া সূফীমত চালু ছিল বলে অনুমান করা চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. জনগণের আর্থিক অবস্থা

সে যুগে হিন্দু সমাজে বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ অলঙ্ঘ্য ছিল। দেশজ মুসলিম সমাজের মধ্যেও পেশাভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ প্রায়ই ছিল– জোলা, বেদে, বারুই, হাজাম, কুমার প্রভৃতি। কাজেই চামার, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, মোল্লা, পুরুত, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, হাড়ি, ডোম, জেলে, পালকী-বাহক কাহার, তাঁতী প্রভৃতি বংশানুক্রমে আর্থিক অবস্থার হ্রাস-বৃদ্ধি লক্ষণীয়ভাবে হওয়ার কারণ ছিল না। সেকালে সাধারণ মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী ঋজু ছিল। অনাড়ম্বর জীবনে ভাত কাপড় ছাড়া চাহিদা ছিল সামান্য। তারা বছরের অধিকাংশ সময় খালি গায়ে থাকত, চিরকাল নগ্নপায়ে জীবন কাটাত। সোনার অলঙ্কার ধারণে কিংবা ইট-পাথরের ঘর নির্মাণে না-সওয়ার কুসংস্কারজাত ভীতি ছিল। অভিজাতরাও এদের উন্নত জীবনযাপনের ঔদ্ধত্য সহ্য করত না। এককথায় এরা ছোট ঘরে ছোট মন নিয়ে থাকত, জন্মসূত্রেই কর্মজীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হত। পুরুষের কৌপীন ও গামছাই ছিল আটপৌরে পরিধেয়, হাটে-বাজারে কিংবা কুটুমবাড়ি যেতে হলেই কেবল ধুতি-তহবন, চাদর-কুর্তা, ছাতা-লাঠির প্রয়োজন হত। তাও অনেক সময় পরিজন-প্রতিবেশী থেকে ধারে পাওয়া যেত। জমিদারদের শাসন ক্ষমতা ছিল বলেই দাপট ছিল অপরিমেয়। রায়তের জমিতে অধিকারও দৃঢ় ছিল না। ফলে জনগণ জমিদারের অর্ধ-দাসের মতোই ছিল। হুজুরের কাজকর্মে এদের বেগার খাটতে হত, আর অন্যত্রও হুজুর-মজুরের সম্পর্ক বান্দা-মনিবের সম্পর্কের চাইতে উন্নত ছিল না।

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং রোগ মহামারী প্রভৃতি প্রাণনাশকর বিপদপাতে এরা প্রায়ই নিঃস্ব হয়ে পড়ত। ফলে এদের আর্থিক জীবনে চিরকালই অনিশ্চয়তা ছিল। কাজেই দেশের অধিকাংশ লোক গরীব ছিল। রোগে দুর্ভিক্ষে-মহামারীতে তারা মারা পড়ত। এজন্যে সেকালে একালের মতো জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেত না। তাদের সর্বোচ্চ কামনা ছিল 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' কেননা উচ্চাকাঙক্ষার কোনো উপায় ছিল না সমাজ-ব্যবস্থায়। এজন্যেই সম্ভবত দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল। রাহাজানি হত। এমনকি জমিদার ও ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত চুরি-ডাকাতি করত, পরের যুগের দেবীসিংহ, শোভাসিংহ প্রভৃতির কাহিনী সবাই জানে। চৈতন্য-ভাগবতে (পৃঃ ২৯৫-৯৯) বৃন্দাবন দাস ব্রাহ্মণ সন্তানের চুরি-ডাকাতি পেশার উল্লেখ করেছেন। আর ভিখিরী ও ভেকধারী তো ছিলই। বৈষ্ণব, শৈব এবং কলন্দরী ভেকধারী ভিখিরী সম্মানিত ভিক্ষুক ছিল। মুসলমানেরা ভিখিরীকে ফকির বলে।

একদিন আসি এক শিবের গায়ন
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে
গাইয়া শিবের গীত বেরি নৃত্য করে।

[বৃন্দাবন দাস : পৃঃ ১৩২]

তখনো উচ্চ বর্ণের লোকদের ধনী বা দরিদ্র হবার পথ খোলাই ছিল। রাজসরকারে ও সৈন্য বিভাগে চাকুরি গ্রহণ, বিভিন্ন ব্যবসা চালানো, দালালী ও উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানাভাবে ধনোপার্জন সম্ভব ছিল। আবার লাম্পট্য, জুয়া, বিলাসিতা প্রভৃতির মাধ্যমে গরীব হওয়াও ছিল সহজ। বস্তুত অশিক্ষিত কৃষিজীবী গৃহস্থরা ডাল-ভাত ও শাক-তরকারীতে তুষ্ট থাকত বলে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক-পরিচ্ছদাদির প্রয়োজনবোধ করত না বলেই [১৪৭] সমাজে সচ্ছল জীবন যাপন করত। এরাই এ যুগের ভাষায় ছিল মধ্যবিত্ত। ধনীর সংখ্যা দেশীলোকের মধ্যে কমই ছিল। কেননা বড় চাকরি ও জায়গীর পেত শাসকগোষ্ঠীর অবাঙালীরাই। ফলে বাঙালীর ধর্মীয় ও আর্থিক সমাজ-কাঠামো প্রায় অপরিবর্তিত ও সমাজ অবিচল ছিল। মুকুন্দরাম অঙ্কিত ফুল্লরা ও মোল্লার[১৪৮] জীবন-জীবিকার চিত্র, বিজয়গুপ্ত প্রদত্ত জোলাসঞ্চিত চার পণ কড়ির বর্ণনা[১৪৯] এবং ইবন বতুতা বর্ণিত বাজারদর[১৫০] থেকে বোঝা যায় দেশের সাধারণ লোক দরিদ্র ছিল।

২০. গ্রাম্য-সমাজ :

গ্রামের অশিক্ষিত লোক-সমাজ, ধর্ম ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার মেনে চলায় অভ্যস্ত ছিল। এসব ব্যাপারে বিদ্রোহ করার কথা তাদের মনেও জাগত না। গাঁয়ে সর্দার তথা মাতব্বর ছিল। গোষ্ঠীপতির নির্দেশে ও পরামর্শে এক এক গোষ্ঠীর লোক পরিচালিত হত। আবার গোটা পাড়ার বা গাঁয়ের একজন বা একাধিক সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বর থাকত। তাদের নির্দেশে ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসা হত। কিংবা তারাই বিচার করে শাস্তি বা খালাস দিত। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বা জিয়াফৎ প্রভৃতি অনুষ্ঠানও তাঁদের কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে সম্পাদিত হত। বিদ্রোহী কিংবা অপরাধীকে (কায়িক শাস্তি দান অসম্ভব হলে) নাপিত, ধোপা ও মোল্লা পুরুত বন্ধ করে, সমাজে পতিত তথা একঘরে করে রাখা হত। এটি অত্যন্ত অপমানজনক চরম শাস্তি। পতিত বা একঘরে লোকের সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করত না। তার পক্ষে কোথাও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করাও হত অসম্ভব। নাপিত, ধোপা, বাদ্যকর, কামার, কুমার, স্বর্ণকার প্রভৃতি হিন্দু-মুসলিমের সমাজের যোগসূত্র স্বরূপ ছিল। এঁদের মধ্যে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু বিচিত্র। মুসলিম সন্তানের জন্ম থেকে বিয়ে অবধি সব অনুষ্ঠানে সে ছিল অপরিহার্য। সর্বদেশে নাপিতদের বাচাল বলে চিরকালীন কুখ্যাতি আছে। নাপিত যথার্থ অর্থে নরসুন্দর, সে পরিবারে সুখ-দুঃখের সাথী, সে অনেক রোগের চিকিৎসক, নানা খবরের ভাণ্ডারী। নাপিত, ধোপা (সাদা কাপড়ের ব্যবহার বেশি ছিল বলে) আর মোল্লাও (হিন্দুর) পুরুতকে বার্ষিক ধান্য দানের বিনিময়ে সবাইকে অবশ্যই নিযুক্ত রাখতে হত। ধনীরা ভূমিদানের বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে গ্রহণ করত। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পার্বণ এবং সামাজিক-বৈবাহিক উৎসবাদি অবশ্য করণীয় ছিল। অন্যথায় নিন্দায়, স্থায়ী কলঙ্কের লজ্জায় এবং সমাজপতির শাসনে জীবন দুর্বহ হয়ে উঠত।

২১. সাহিত্য :

চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্পদেও সমৃদ্ধ। বৌদ্ধযুগের চট্টগ্রামের পণ্ডিত-বিহার বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চার কেন্দ্র ছিল বলে তারানাথের ইতিহাস সূত্রে[১৫১] জানা যায়।

পনেরো-ষোল শতকে যখন সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণে ও আগ্রহে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়, তখন চট্টগ্রামবাসী অনেকেই লেখনী ধারণ করেন। এঁদের মধ্যে শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪১০ খ্রী:) 'ইউসুফ জোলেখা,' দৌলত উজির বাহরাম খান (১৫৫৩ খ্রী:) 'লায়লী মজনু', শা'রাবিদ খান (১৬২৫-৫০ খ্রী:) 'বিদ্যাসুন্দর' ও মুহম্মদ কবীর (১৫৮৮ খ্রী:) 'মধুমালতী' নামের লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে বিশুদ্ধ রস-সাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ দান করেন। জৈনুদ্দীনের (১৪৭৬-৮০ খ্রী:) 'রসুল বিজয়', শা' বারিদ খানের 'রসুল-বিজয় ও 'হানিফার দিগ্বিজয়' ইসলামের প্রচার ও প্রসারের গৌরব কীর্তন মূলক কাব্য। ষোল শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবি হাজী মুহম্মদ 'নূরজামাল' বা 'সুরতনামা' এবং শেখ পরান 'নুরনামা ও কায়দানী' কেতাব রচনা করে মুসলিম ধর্ম-সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেন।[১৫২] ষোল শতকে কবি আফজল ও ফতে খানকে পাই গীতি-রচয়িতারূপে।[১৫৩] এঁরা ছাড়াও সৈয়দ সুলতানের ভক্ত ও অনুকারকরূপে ষোল-সতেরো শতকের চট্টগ্রামবাসী অনেক কবির পরিচয় রয়েছে এ গ্রন্থের তৃতীয় ও অষ্টম পরিচ্ছেদে। হিন্দু কবির মধ্যে পরাগলী মহাভারতের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর, ছুটিখানী মহাভারত রচক শ্রীকর নন্দী, রামাভিষেক বা লক্ষণ দিগ্বিজয় কাব্য রচয়িতা দ্বিজ ভবানীনাথ খ্যাতিমান। চট্টগ্রামে চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল রচিত হয়নি। সতেরো-আঠারো শতকে কালিকামঙ্গল (বিদ্যাসুন্দর), সারদামঙ্গল, পৌরাণিক শিবায়ন (মৃগলুব্ধ, মৃগলুব্ধ সংবাদ) প্রভৃতি রচনা করেছেন। দ্বিজ রতিদেব, রামরাজা মুক্তারাম সেন, গোবিন্দ দাস প্রমুখ কবি।[১৫৪] বৈষ্ণব কবি দ্বিজ রঘুনাথ, হরিবরের ঝি, শঙ্কর, ভবানন্দ প্রভৃতি সম্ভবত ষোল শতকের কবি।

মধ্যযুগের চট্টগ্রামবাসী কবিগণ যে কেবল বাঙলায় সাহিত্য স্রষ্টাদের অগ্রণী ও প্রধান ছিলেন তা নয়, শিল্পদৃষ্টির অভিনবত্বে, রচনার বিষয়-বৈচিত্র্যে, ভঙ্গির নতুনত্বে ও লাবণ্যে কাহিনীর বিন্যাসসৌষ্ঠবে এবং রসিকচিত্তের লালনে তাঁদের সাহিত্যও ছিল বিশিষ্ট। ষোল শতকের শা'বারিদ খানই[১৫৫] সম্ভবত প্রথম কবি যিনি সূচিত শব্দের সুবিন্যাসে কাব্যদেহ নির্মাণ করে বাঙলা কাব্যের ভাষাকে গ্রাম্যতামুক্ত নাগরিক লাবণ্য দান করেন। এককথায় বলা চলে, বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার নতুন দিগন্তের সন্ধান দানের কৃতিত্ব অনেকাংশে চট্টগ্রামবাসী কবিদেরই।

AMARBOI.COM

উৎস নির্দেশ

১. Ain-I-Akbari II. Tran : Jarret, edited by J.N. Sarkar, P. 184.

২. The Muhammadan of Eastern Bengal : JASB, Vol. LXIII pt. III 1894, P. 34.

৩. ক. History of India, etc : Elliot & Dawson, Vol. VI.
   খ. Waqiat-I-Jahangiri, P. 376
   গ. British Policy & Muslim Education in Bengal : A.R. Mallick, P.7

৪. Promotion of learning during Muhammadan Rule : N. N.Law.P. 201.

৫. Bernier's letter to M. Chapelain, Dated Oct. 4, 1667 A.D.

৬. ক. Influence of Islam on Indian culture: Dr. Tarachand.
   খ. ভারতীয় দর্শন : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
   গ. বাঙলার নবজাগৃতি : বিনয় ঘোষ।

৭. বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস : নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ম খণ্ড, পৃ : ১৮৪।

৮. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
   খ. পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলাম। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
   গ. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : আহমদ শরীফ।

৯. আদি ও মধ্যলীলা।

১০. ক. British Policy, etc. A.R. Mallick, P. 5.
খ. Seir : Vol. I PP 258

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. ক. History of the Bengal Subah K.K. Datta : Vol. I PP. 99 – 95
খ. Seir Vol. II, P 258
১২. Bengali Literature : J.C. Ghose. P. 82.
১৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ : পৃ: ৯২৫।
১৪. On certain peculiarities in the Mohammadanism of India. Asiatique Journal, Vol. VI. 1831, o. 353.
১৫. The Muhammadans of Eastern Bengal : James Wise : JASB, Vol. LXIII, Pt. IIIx 1894, P. 34.
১৬. Frair Manrique : Tran : Maurice Collis.
১৭. Magh Bohmong : G.E. Harvey. Journal of the Burma Research, Society, Vol. XLIV (44), 1961, p.4.
১৮. ক. Yaksa belief in Early Buddhism : P.R. Barua. PP 1- 13, JASP, Vol. x, No. 1 1965.
১৯. চট্টগ্রামের বৌদ্ধ কৃষ্টি ও তাহার নিদর্শন : ধীরেন্দ্রলাল দাস : শারদীয়া পাঞ্চজন্য, ১৩৪৬ সন।
২০. The Feringi Pirates of Chittagaon 1665. (s. Talish) Tran : J.N. Sarkar, JASB, 1907, PP, 419-25.
২১. পুঁথি-পরিচিতি : পৃঃ ২৯০-৯৪৪
২২. সত্যকলি বিবাদ-সম্বাদ (ভূমিকা)।
২৩. ক. পুঁথি পরিচিতি : পৃ ৩৮০, ৬০০-১।
খ. লায়লী মজনু : দৌলত উজির বাহরাম খান।
গ. (চট্টগ্রামের) ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতি (পুস্তিকা) : আহমদ কবীর, ১৯১৮ সন। কবি নসরুল্লার পূর্ব পুরুষ বোরহানুদ্দীন ও কবি দৌলত উজিরের পূর্বপুরুষ হামিদ খান গৌড়দরবারের অমাত্য ছিলেন।
২৪. ক. চট্টল কায়স্থ পরিচয় : যাত্রা মোহন বিশ্বাস : ১৯১৪ সন।
খ. শ্রীবাৎস্যচরিতম : জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য : ১৯১৫ সন।
গ. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী (দেব বর্মণ) ১৯২০ সন।
২৫. পুরোনো দলিল দ্রষ্টব্য
২৬. Friar Manrique. P.23 (M. Collis).
২৭. ক. Bengal under Akbar and Jahangir, P. 228
খ. History of Urdu Literature: Ramchandra Saksena : Introductory chapter.
২৮. বসুমতী সং—পৃঃ ১০, ৩৫, ৪৯।
২৯. চট্টগ্রামের ইতিহাস : পুরানা আমল : মাহবুব-উল-আলম।
৩০. বসুমতী সং—পৃঃ ১২৬-২৮।
৩১. চণ্ডীমঙ্গল :
পঢ়য়ে শ্রীপতি দত্ত বুঝায় শাস্ত্রের তত্ত্ব—পঞ্জিকাটীকা, ন্যায়কোষ, সন্ধি, উজ্জ্বল বৃত্তি, বামনদণ্ডী, পিঙ্গল, ভারবী ও মাঘের কাব্য, ভট্টি, অভিধান, জৈমিনী ভারত, মেঘদূত, নৈষধ চরিত, কুমার সম্ভব, রামায়ণ, সাহিত্য দর্পণ প্রভৃতি এবং দ্বিজ বংশীদাসের মনসামঙ্গল, (ধন্বন্তরী ওঝা) বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ২১৭। হরিনামের চণ্ডীকাব্য, পৃঃ ৩১৫।
ভারতচন্দ্র :
ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কারাদি সাধ্যসাধন সাধক (অন্নদামঙ্গল)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২. Minhaj. P. 151. History of Bengal. D.U. Vol. II P 14. Social History of the Muslims of Bengal : Dr. A. Karim, P. 42.

৩৩. ক. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় : দীনেশচন্দ্র সেন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮৫৪।

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজি পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া
সুন্দিপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়া
কোরান পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল
আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
জগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।
ঢাকা হৈতে মুন্সী আনি পারসী পড়ায়
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখায়।
দিন মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি দু'ভাগে পড়িতে।
ভোর রাত্রি চারিদণ্ড আগাম্ভে প্রহর
পাঠের সময় করি দিল গাজিবর,

[শমশের গাজীনামাঃ বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় : পৃ : ১৮৫৪।
এতে শিক্ষকের তথা শিক্ষিত লোকের দুর্লভতার সাক্ষ্যও রয়েছে।

৩৪. Coins and Chronology of the Independent Sultans of Bengal : N.K. Bhattasali, P. 170

৩৫. Promotion of learning during Muhammadan Rule : N.N. Law. P. 2021.

৩৬. ibid. p. 201.

৩৭. গোবিন্দচন্দের গান : পাঠশালে পড়ি আমি যাই নিকেতন। ষোলশত যোগী লইয়া গোরক্ষ গমন। [ময়নামতির উক্তি]

৩৮. বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ১ম সংখ্যা। পুথি পরিচিতি, পৃঃ ২০৫, ৪৫৪।

৩৯. তোহফা : বাব 'এলম'।

৪০. পূর্বে উদ্ধৃত : মুকুন্দরাম, বিপ্রদাস পিপিলাই, বৃন্দাবনদাস।

৪১. চৈতন্যভাগবত : ১০, ৩৫, ৪৯।

৪২. Social History of the Muslim of Bengal : Dr. A. Karim P. 44-45.

৪৩. ibid. P. 45.

৪৪. ibid. pp. 66-67. 72. 82.

৪৫. মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ : মরদন, পৃঃ ১৫৮।

৪৬. চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৮৬।

৪৭. ক. Adam's Education Report : 1835.

খ. Aspects of Bengali Society from old Bengali Literature : Dr. Tamonash Dasgupta. P. 172.

৪৮. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় : দীনেশচন্দ্র সেন : ১৩৮৪-৮৫।

৪৯. ক. খ—পুঁথি পরিচয় : পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯১, ২য় খণ্ড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আব্দুল করিম, ২য় সংখ্যা : পৃঃ ১০৫।
৫১. Coins & Chronology etc: N.K. Bhattasali: P 171. Aspects of Bengali Society : T.N. Dasgupta. Chapter : Education.
৫২. বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় : ১ম খণ্ড, পৃ ৭১।
৫৩. India through the ages : P 52.
৫৪. ক. Bengal under Akbar and Jahangir : Dr. Tapan Kumar Roy Chowdhury. PP 146-48.
খ. পদ্মাবতী [মাগন প্রশস্তি]
৫৫. সত্যকলি বিবাদ-সংবাদ : পৃঃ ২১৯, ২২০০-২৪।
৫৬. পদ্মপুরাণ : বিজয় গুপ্ত : বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত, পৃঃ ৬১।
৫৭. ক. পুঁথি পরিচয় (১ম ও ২য় খণ্ড) : পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী।
৫৮. ক. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ-আহমদ শরীফ সম্পাদিত, পৃঃ ২১৯-২৪।
খ. চণ্ডীমঙ্গল :
কচ্ছপের নখ আন কুম্ভীরের দাঁত।
কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আঁত।
গ. মনসামঙ্গল : দ্বিজ বংশীদাসঃ
কাঁকড়ার বাম পাও, ইন্দুরের পিত্ত।
পেঁচার বাম চক্ষের কর কাজল রঞ্জিত।
৫৯. চণ্ডীমঙ্গল : পৃঃ ৫১০-১৬, মনসামঙ্গল : নারায়ণদেব, পৃঃ ৪৮।
৬০. বিজয়গুপ্ত : পৃঃ ৯৬-৭, চৈতন্যভাগবত, পৃঃ ১৫৮, ১৭৮, ১৮২।
৬১. শূন্যপুরাণ : চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
৬২. গোর্খ বিজয় : ভূমিকা, পঞ্চানন মণ্ডল।
৬৩. সৈয়দ সুলতান : ১০-ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। সত্যকলি বিবাদ সংবাদ : পৃঃ ১৭৯।
৬৪. Manrique | Quoted in Social and Cultural Hist. of Bengal : Dr. A. Rahim. PP. 290. 359.
* গোবিন্দদাসের পদাবলী : তাঁহার যুগ : পৃঃ ৪৮৬।
৬৫. Ralph Fitch: Purchas-His Pilgrims X, PP. 291.
৬৬. বিজয়গুপ্ত : পৃঃ ১৩৩ Op. cit. Dr. A. Rahim, P. 291.
৬৭. Ain : Vol. II-J.N. Sarkar, P. 132.
৬৮. Manrique : Op.cit, Dr. A. Rahim. P. 190, Visva Bharati Annals, Vol. 1945. PP. 96-134. মুকুন্দরাম : পৃঃ ৩৪৫।
৬৯. ক. Bengal under Akbar & Jahangir : Tapan Kumar Roy Chowdhury. P. 19 4.
খ. Visva Bharati Annals : Vol. 1. 1945, Dr. P.C. Bahchi. PP. 69-134.
গ. মুকুন্দরাম : পৃঃ ৩৪৫।
৭০. Ain-I-Akbari : Vol. P. 134.
৭১. Manrique I P. 62-64.
৭২. কৌশা মোজা পর যদি জরদ পরিও
অম্বুরী নিদানে প্রাপ্তি রাখ নিজ করে। (তোহ্ফা : ৪০ বার)
পাজামা নিমা টুপি পরি কটিবন্দ—দ্বিজ বংশীদাস, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, পৃঃ ২১৬।
৭৩. Book of Duarte Barbosa. II PP. 147-48 তোহফা (বাব, ৪০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৪. Visva Bharati Annals. Vol. I. 1945. P 122.

৭৫. চৈতন্যচরিতামৃত।

৭৬. ক. দস্তার জুব্বার পরি আষা করি হাতে—তসবী আঙ্গুলেতে-শেখচান্দঃসাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৪৩, পৃঃ ১০৪। Or Bengal under Akbar and Jahangir. P.20.

খ. মনসা বিজয় : বিজয়গুপ্ত।

৭৭. ক. মুকুন্দরাম : ধরয়ে কম্বোজ কেশ মথে নাহি রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি। পৃঃ ৩৮৮।

খ. Visva Bharati Annals : 1945, Vol. I. Pp. 96-134. (Chinesse Account).

গ. Coins and Chronology etc : N. K. Bhattasali. p. 170.

৭৮. বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্র ভট্টাচার্য।

৭৯. সূক্ষ্মরক্ত বস্ত্র ধনি ভিতরে পরিল। তাহার উপরে নীল বসন ধরিল (রাধা)।-যদুনন্দন দাস শাড়ীর নাম : ঠাকুরমার ঝুলি—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। নওয়াজিস খান—মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ : পৃঃ ১৯৭। আলাউল, কাজলরেখা, চণ্ডীমঙ্গল, মানিকচন্দ্র রাজার গান-চটক, মটক। জগজ্জীবন ঘোষাল—মনসামঙ্গল। Aspects of Bengali Society : PP. 270-88.

৮০. ক. নারায়ণ তৈল বিষ্ণু তৈল কেশের গোড়ে দিয়া—মনসামঙ্গল : জগজ্জীবন ঘোষাল।

খ. কুঙ্কুম চন্দন গন্ধ কাপড়েতে কয়।

গ. সর্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি চন্দন—কৃত্তিবাস।

ঘ. সৈয়দ সুলতান : ১০-ক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : ফাতেমার বিবাহে কনে সজ্জা।

ঙ. শাবারিদ খান : রসুল বিজয় :

কস্তুরী চন্দন করে বিলেপন
হরিযে কুমারী অঙ্গে
শিখেত সিন্দুর----গ্রন্থাবলী ও পুঁথি পরিচিতি, পৃঃ ৪৮২।

চ. শাহ মুহম্মদ সগীর :

কস্তুরী কুমকুম বিন্দ কপালে তিলকচন্দ
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ কেশর সুগন্ধি সঙ্গ
—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩, পৃঃ ১৫৩।

৮১. ক. সত্যকলি বিবাদ-সংবাদ—বসন (পৃঃ ২২০)

খ. সায়াৎনামা : মুজাম্মিল, পুঁথি পরিচিতি : পৃঃ ১৪৩।

৮২. চৈতন্যভাগবত : পৃঃ ১২৭।

৮৩. মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী—সুকুমার সেন, পৃঃ ৫১।

৮৪. ক. গোবিন্দচন্দের গান।

খ. দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ।

গ. সৈয়দ সুলতান : শিবের যোগীবেশ : ১০-ক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৮৫. ক. মধুমালতী—ভূমিকা।

খ. চৈতন্যমঙ্গল

৮৬. উনচট উঝটিকা পায়ের উপরে রত্ন উঝটিকা দিল—যদুনন্দন দাস।

৮৭. ক. Aspects of Bengali Society, Introduction p- XXVIII, chapters II & IV.
খ. Bengal under Akbar & Jahangir : PP. 194-95.

৮৮. নওয়াজিস খান : গুলেবকাউলি : মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, পৃঃ ১৯৭।

৮৯. ছোট ছোট বালকের মকরখাড়ু পায়—বিজয়গুপ্ত। রাতুলচরণে মল্লতোড়ন : শ্রীকৃষ্ণকীর্তনঃ চণ্ডীদাস। চরণে শোভ-এ মণিময় বঙ্করাজ—শেখচান্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁক পাতা মল পায়-দ্বিজ পশুপতি, চন্দ্রাবলী। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা—বংশীবদনের পদ।

৯০. মধুমালতী, পৃঃ ৮। কাব্যে সুন্দরীর রূপবর্ণন প্রসঙ্গেই অলঙ্কারের (ও শাড়ীর) নাম মেলে। সৈয়দ সুলতান আকিমা-সারা-ফাতেমা প্রভৃতির রূপবর্ণন প্রসঙ্গে (১০-ক পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) অলঙ্কার ও প্রসাধন দ্রব্যের নাম করেছেন। শেখচান্দ তাঁর রসুল বিজয়ে আমিনার রূপ বর্ণনায় (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ সন, পঃ ১০৩) তিলক ও চন্দনের বিন্দু, মণিরত্ন হার, মণিময় বঙ্করাজ, মুক্তাখচিত কেশর, মণিময় কুণ্ডল, কেয়ূর, কঙ্কণ, কনক নূপুরের উল্লেখ করেছেন। শাহ মহম্মদ সগীর জোলেখা প্রসঙ্গে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩ সন, পঃ ১৫৩) হার, কঙ্কণ, তাড়, অঙ্গুরী, কিঙ্কিনী ও নূপুরের বর্ণনা দিয়েছেন। দৌলত উজির লায়লীর রূপ বর্ণনায় (পৃঃ ২৩) রত্নমণি খচিত বেণী, চন্দন তিলক ও সিন্দুর শোভিত ললাট, মণি খচিত সোনার বেশরযুক্ত নাসা, কাজলে উজ্জ্বল নয়ন, মেহেদী রঞ্জিত নখ এবং সপ্তছড়ি হার, কনক কিঙ্কিনী, বাজুবন্ধ, কঙ্কন, অঙ্গুরী ও 'আভরণ বিবিধ ধাতব'-এর উল্লেখ করেছেন। দোনা গাজী, মুহম্মদ খান, শাবারিদ খান প্রমুখ সব কবির কাব্যেই এমনি বর্ণনা মেলে।

৯১. ক. Aspects of Bengali Society, op. cit. PXXVII chapters. II&IV.
খ. Bengal under Akbar & Jahangir, PP. 194-95.
গ. মুকুন্দরাম : কালকেতু।

৯২. Book of Duarte Barbosa, PP. 147-48.

৯৩. বিপ্রদাস, মুহম্মদ খান, বিজয় গুপ্ত (২য় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

৯৪. মনসা বিজয় : বিজয়গুপ্ত, পৃঃ ৫৯-৬০। বসন্তকুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

৯৫. বিপ্রদাস (২য় পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য) ; 'ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার
—বিদ্যাসুন্দর (ঘেসেড়ানী)

৯৬. Manrique—II অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতির দুই স্ত্রী ছিল।

৯৭. ক. ময়নামতী, চৈতন্য-মাতা শচীদেবী ও বেহুলা স্মর্তব্য।
খ. Bernier, Bengal in the 16th Century : JN. Dasgupta. C.U. 1914, PP. 44-45 Foornote.
গ. 'শিশুযুবা অবলা যাহার পতি মরে
বিধবা হইয়া সে থাকয় নিজ ঘরে।'—মনসামঙ্গল : ক্ষেমানন্দ, কলি বিঃ ১৯৪৯, পৃঃ ২৬১।

৯৮. England's Pioneers in India : edited by J. Hortion, Lyley, PP. 95-96.

৯৯. কাঞ্চনমালা, রূপভান প্রভৃতি রূপকথা স্মর্তব্য।

১০০. চৈতন্য ভাগবত : পৃঃ ৬০।

১০১. লায়লী মজনু : দৌলত উজির, পৃঃ ৬৮।

১০২. চৈতন্য ভাগবত : পৃঃ ১১।

১০৩. অধিবাস, বৃদ্ধি, ষোড়শ মাতৃকা প্রভৃতি।

১০৪. ক. সৈয়দ সুলতান : ফাতেমার বিবাহ (১০-খ পরিচ্ছেদ)।
খ. শা' বারিদ খান : রসুল বিজয় : পুঁথি পরিচিতি, পৃঃ ৪৮২।
গ. সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ-পৃঃ ১৩৪।

১০৫. শিবায়ন : রামেশ্বর ভট্টাচার্য।

১০৬. মনোহর মধুমালতী; সৈয়দ হামজা, এবং সিকান্দর নামা : আলাউল। সিকান্দরের হাতে রওসনয়ক তুলে দিতে গিয়ে এমনি অনুনয় করেছিলেন দারামহিষী।

১০৭. ঐ— সৈয়দ হামজা।

১০৮. Bengal under Akbar and Jahangir : P. 225.

১০৯. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ : শিবনাথ শাস্ত্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১০. ইজার না পিন্দ উঠা, পাগড়ী না বান্ধ বৈঠা
না হাঁটিব বৃদ্ধ আগে না বসিব উর্ধ্ব ভাগে
নারীর নাম ধরি না বোলাএ (বাব-৪৯ তোহফা)
মজলিসে গেলে মৌন ধরিয়া বসিব
বিনি জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিব।
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে (বাব–২২ তোহ্ফা)

১১১. সৈয়দ সুলতান : (পরিচ্ছেদ ১০-ক), মুসলিম কবিদের ভণিতায় পীরের চরণ বন্দন স্মর্তব্য।

১১২. Quoted from Bengal under Akbar and Jahangir : p 202.

১১৩. Quoted from Bengal under Akbar and Jahangir : PP. 207-8.
ক. De Lact গ. Bowrey ঙ. Schouten
খ. Manrique ঘ. Shihabuddin Talish.

১১৪. গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ : পৃঃ ৪৪৮-৪৯। বিমানবিহারী মজুমদার।

১১৫. Bengal under Akbar & Jahangir.

১১৬. বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব, : ৮৫২-৫৬।

১১৭. Kirata-Jana-Krti : JASB. 1950.

১১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায়।

১১৯. রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে।

১২০. মনসামঙ্গল : দ্বিজ ষষ্ঠীবর : বঙ্গসাহিত্য পরিচয় : পৃঃ ২৫৪।

১২১. ধনীরা ও সৈন্যেরা খুব মদ পান করত—সুফিয়ানের বাহিনী (সৈয়দ সুলতান)
প্রতাপাদিত্য। History of Bengal. D.U.II P 221

১২২. ক. Social and Cuttural History of Bengal : Dr. A Rahim, P. 297. (চৈতন্যমঙ্গল)
খ. মদন ছিল চার প্রকারের—ধেনো, নারকেলী, (জলজ গুল্মের) তালের ও ফলবীজের Visva Bharati Annals : Vol. I, 1995. PP 96-134.

১২৩. মুসলিম কবির পদসাহিত্য ও রাগতাল নামা।

১২৪. ক. সৈয়দ সুলতান (১০-ক পরিচ্ছেদ)
খ. শা'বারিদ খান : রসুলবিজয় : পুঁথি পরিচিতি : পৃঃ ৪৮২।
গ. মঙ্গল চাঁদ : শাহজালাল মধুমালা : মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ : পৃঃ ১৯৩-৯৪।

১২৫. Visva Bharati Annals : Vol. PP. 96-104.

১২৬. একখানা দলিল আমার নিকট আছে—লেখক।

১২৭. ক. Barbosa p. 147.
খ. বিজয়গুপ্ত : বসন্তকুমার সম্পাদিত : পৃঃ ৬১
গ. Ibn Battutah : Vol. IVP, 212,
ঘ. Coins & Chronology etc. Bhattasali : p. 136.

১২৮. Baharistan Ghyabi : Vol. II.

১২৯. Ain-I-Akbari : Vol. II P. 134_J.N.Sarkar.
Manrique : I P 64.
Tavernier - I P.128.
বাঙ্গালীর ইতিহাস -(আদি পর্ব) পৃ ৫৫০।

১৩০. Baharistan Ghyabi -I.p 138-39.

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩১. ক. Bengal under Akbar and Jahangir : p. 107.
খ. Manrique I. p. 64.
১৩২. ক. মুজাম্মিল : সায়াৎনামা, পুঁথি পরিচিতি : পৃঃ ১৪৩-৪৫।
খ. সত্যকলি বিবাদ সংবাদ : পৃঃ ২১৯-২০।
১৩৩. ক. Mahuan's Account of Bengal : JRAS, 1895, p. 530.
খ. Visva Bharati Annals. 1945. Vol. IPP. 117. 123, 125.
১৩৪. Mahuan's Account of Bengal : JRAS, 1495, P. 530 .
১৩৫. History of Burma : P. 141.
১৩৬. আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ প্রদত্ত সত্যপীর পাঁচালী, সংখ্যা ১৬৩।৯ পৃঃ ৬৮ বাংলা পুঁথির তালিকা—বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম।
১৩৭. ক. বার্বোসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ : ইতিহাস, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার ১৩৬৩ সন। পৃঃ ২২৯-৩১।
খ. New Values : Vol. X, No. 1, 1959pp. 20-23.
১৩৮. ক. ইতিহাস ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা : ১৩৬৩, পৃঃ ২৩০।
খ. The Book of Duarte Barbosa II, Footnote, pp. 135-47.
১৩৯. ইতিহাস : পৃঃ ২৩১। Ralph Fitch : Purchas : His Pilgrims X 1905, P 185 (Glasgow)
১৪০. Ain-I-Akbari : Jarret : Edited by J.N. Sarkar.
১৪১. Portugues in Bengal : A.J. Campos, pp. 328-38.
১৪২. বাঙ্গালীর ইতিহাস : পৃঃ ১৭৯।
খ. JRAS 1895, pp. 531-32.
১৪৩. Book of Duarte Barbosa II, p. 147.
১৪৪. সায়াৎনামা, পুঁথি পরিচিতি : পৃঃ ১৪৩-৪৬ সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, পৃঃ ২১৮-২০।
১৪৫. মন্ত্রপূত হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জতুরগুড়া, গাভীর হাড়, কালোমাটি, মাছের পিত্ত, হরিদ্রা, গন্ধক এবং কালো বিড়াল কুক্কুরটি প্রভৃতির বিষ্ঠা ভূত ও দেও-র ঔষধ। সত্যকলি বিবাদ সংবাদ পৃঃ ২২০-২৪।
১৪৬. ক. Aspects of Society etc : T.N.Das Gupta.
খ. মন্ত্রের পুঁথি : পুঁথি পরিচয় (বিশ্বভারতী), বাঙ্গলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ —আব্দুল করিম।
১৪৭. মাটিরহাড়ি, সরা, বেল্দুন, পালি খোড়া, খদ্দা, বচি, সানকি, কণ্ডি, ঝড়া, ঝিনুক ও নারকেলের মালাই ছিল তৈজসপত্র। আসবাবপত্রের মধ্যে সচ্ছল গৃহস্থের একটি সিন্দুক থাকত মাত্র।
১৪৮. চণ্ডীমঙ্গল বঙ্গবাসী সং পৃঃ ৮৬।
১৪৯. বিজয়গুপ্ত : বসন্তকুমার সম্পাদিত, পৃঃ ৬১।
১৫০. Hist. of Bengal, D.U.Vol. II P.P. 101-2.
১৫১. ক. Antiquity of Chittagong—Sarat Chandra Das : JASB. 1898.
খ. চট্টগ্রামের ইতিহাস, (পুরানা আমল) মাহবুব-উল-আলম, ১৯৫৫, পৃ২৩-২৯।
১৫২. ক. মুসলিম বাঙলা সাহিত্য : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক।
খ. বাংলা সাহিত্যের কথা (মধ্যযুগ) —ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
গ. পুঁথি পরিচিতি-আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।
১৫৩. মুসলিম কবির পদসাহিত্য : আহমদ শরীফ।
১৫৪. ক. বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ—আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ, ১ম ও ২য় সংখ্যা।
১৫৫. বিদ্যাসুন্দরের কবিঃ সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৩৬২ সন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট-১—ক

বাঙলা ভাষার প্রতি সেকালের লোকের মনোভাব

[ভাষা-বিদ্বেষ]

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃতই ছিল পাক-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহন রূপেই প্রথম দুটো বুলি পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্ম প্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠী ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্ট সাহিত্যের ভাষার রূপ পায়।

এরপরে মুসলমান আমলে ফারসী হল দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাববিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক পাক-ভারতিক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

এদিক দিয়ে পূবী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভাল। এ সব বুলি যখন সৃজ্যমান, তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্ট বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন-ভজনের মাধ্যম হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্য ভাষার (অবহট্ট থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুই স্তরের অন্তর্বর্তী কালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন-স্বরূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কী আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন-সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্য প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রীস্ট ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারের, হিন্দু-সমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানীর শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ সুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেনি, কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজীর চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

হয়ত দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশী ভাষার অনুশীলনের প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ, যেমন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান-সুবাদারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেককাল অভিজাতরা বাঙলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়ত বুলি বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনোদিন শক্তিমানের পরিচর্যা পায়নি। তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙলা ভাষায় সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারেনি। শেকসপীয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করছিলেন, তখন, আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাব হেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ।

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহন রূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়, 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার, পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'---এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হননি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করবার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন এবং এতে সাহিত্য শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে, তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না—লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্যসৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেনি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায় সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান-সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, মুসলমানরাও তাঁদের সাথে কলম ধরেছিলেন। এবং মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, ধর্মপ্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানব রসাশ্রিত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ' বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দুলেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাস-বাঞ্ছাই সে জীবনের আদর্শ। সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাক-ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানী সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এ দেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালীরা ইরানী, ও হিন্দুস্তানী ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই (বৈষ্ণব সাহিত্য ছাড়া) মূলত অনুবাদ এবং মুখ্যত পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেননি। অর্থাৎ সংস্কৃত কিংবা ফারসীতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেননি। বাঙলা তখনো তাঁদের চোখে বুলি মাত্র। এ যুগে শিক্ষিত জনেরা যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে-যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষার ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল।

এ ছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল ঃ ক. সেন রাজারা বাঙলায় উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশীয় সংস্কৃতি সৃজ্যমান ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে বিকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষা-গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন। এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার পথ রুদ্ধ করেছিলেন। তখন বস্তুত অবহট্টের যুগ। খ. সেই অবহট্টের যুগে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবী থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত। ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানদের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানী ভাষা বলে জানত। বিজাতি-বিধর্মী রাজার সমর্থন ছিল বলে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সমাজও নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাঙলা-চর্চা ব্যাহত করিবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন। ঃ

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি এ বিরূপতা যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে ঃ

কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুন-ঘেঁষে
--এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল। তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সুরে। এঁদের কেউ কেউ তীব্র প্রতিবাদীও।

শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯—১৪১০ খ্রস্টাব্দ) বলেনঃ

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দূষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আম্মি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতান বলেছেন ঃ

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।

ফলে,
আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।

কিন্তু,
যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।

তবু,
যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছএ দূষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেত পড়ি।
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানি করি।

অবশ্য,
মোহোর মনের ভাব জানে করতারে
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদ [ষোল শতক] নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধামুক্ত হতে পারেননিঃ

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিকে দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন ঃ

হিন্দুয়ানি অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর পরে আল্লি মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে-আল্লি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্রিদিন
দেশীভাষা দেখি মনে না করিও ঘীন।

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রী:) ভয় ঃ

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তেকারণে দেশীভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলুঁ।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।
মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষেমিবেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রী:) রচয়িতা আবদুন নবীরও সেই ভয় ঃ

মুসলমানি কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুঁ হৃদয়।

রাজ্জাকনন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন ঃ

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।"
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
যে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশীভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
এবং মাতাপিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

হিন্দুয়ানী মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম কবির দেখা যায় না।

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না, সে বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ মুহম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তি-প্রবণতার পরিচয় মিলে। উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা', উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানী' ভাষা, কারুর চোখে প্রাকৃত ভাষা' (দ্বিজ শ্রীধর [১৬ শতক] ও রামচন্দ্র খান, ১৬ শতক) কারো মতে 'লোক-ভাষা' (মাধবাচার্য ১৬ শতক), কেউ বলেন 'লৌকিক ভাষা' (কবিশেখর ১৭ শতক) অধিকাংশ লেখক 'দেশীভাষা' এবং কিছু সংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ ভাষার নাম ছিল 'গৌড়িয়া'।

॥ ২॥

মধ্যযুগে হিন্দুয়ানী ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতা রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

তুর্কী ও মুঘলেরা এদেশে মুসলিম-শাসন দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজনে বিদেশী ও দেশী মুসলিম মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। ধর্মের উৎসভূম আরব এবং শাসক ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্র ইরান-সমরখন্দ-বুখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকর্ষণ সৃষ্টি ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখার জন্য শাসকগোষ্ঠীর সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, তাঁর পুত্র নূর কুতবে আলম, জাহাঁগীর সিমনানী, আলফসানী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতির পত্রে এ মনোভাবের আভাস আছে। আর মুসলিম রচিত ইতিহাসের ভাষায় আর ভঙ্গিতেও হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। এই বর্হিমূখী মানসিকতা মুসলিম মনে অনুকূল পরিবেশে ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে। ইরানে সাফাভী বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছু সংখ্যক বাস্তুত্যাগী ইরানী নাকি বাঙলায় বাস করতে এসেছিল। সম্ভবত তাদের সাহচর্য আভিজাত্যলোভী দেশী মুসলমানদের বহির্মূখী মানসিকতাকে আরো প্রবল করেছিল। ফারসী ভাষার বাস্তব গুরুত্বে ও সংস্কৃতির মর্যাদায় প্রলুব্ধ বাঙালী তা গ্রহণে-বরণে [উনিশ শতকের বাঙালীর ইংরেজী ও বিলেতী সংস্কৃতি গ্রহণের মতই] আগ্রহ দেখাবে—এই ছিল স্বাভাবিক।

এমনিতেই আভিজাত্যলোভে শিক্ষিত দেশী মুসলমানরা চিরকাল নিজদের বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। ফজলে রব্বী খান বাহাদুর তাঁর 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' (অনুবাদঃ The Origin of the Mussalmans of Bengal, 1895 A. D.) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাঙালী মুসলমানের প্রায় সবাই বহিরাগত এবং আঠারো শতকে কোম্পানী শাসন প্রবর্তিত হলেও নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অনেককাল বিলীন হয়নি। ফারসী ছিল ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দ অবধি দরবারী ভাষা, কাজেই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সমাজ তখনো মধ্যযুগীয় আমীরী স্বপ্নে বিভোর। যদিও তাদের অজ্ঞাতেই তাদের পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছিল। যখন দুর্ভাগ্যের দুর্দিন সত্যই তাদের সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, তখনো হৃতসর্বস্ব মুসলমান উত্তর ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল জ্ঞাতির ঐশ্বর্যগর্বে নিজের দীনতা ভুলবার নিষ্ফল আশায়। তখন আরবী নয়, এমনকি ফারসীও তত নয়, উর্দূ-প্রীতিই তাদের মানসিক সান্ত্বনার অবলম্বন হল।

> উর্দুভাষা না থাকলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তা বিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙলা দেশের মুসলমান দিগের মাতৃভাষা বাঙলা হওয়াতে বঙ্গীয় মুসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তারা জাতীয়তা বিহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। (১৯২৭ সন—হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিতঃ ভূমিকা : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন। ইনি নিজে ছিলেন বাঙলা লেখক ও সাংবাদিক।

তাই নওয়াব আবদুল লতিফের (১৯২৬-৯৪) মুখে শুনতে পাই 'বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাঙলা আর অভিজাতদের ভাষা উর্দু।'

বাঙলার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কত বিচিত্র ছিল তার দু'একটি নমুনা দিচ্ছিঃ

> A Muhammadan Gentleman about 1215B.S(1804A.D.) enjoined in his death bed that his only son should not learn Bengali, as it would make him effiminate ---- Muhammadan gentry of Bengal too wrote in persian and spoke in Hindustani.

> (JASB, 1925 pp. 192-93, A Bengali Book written in Persian Script by khan Saheb Abdul Wali.)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদের পূর্বে উদ্ধৃত উক্তিও স্মর্তব্য।

মীর মোশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' (১৩১৫ সন) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"মুন্সী সাহেব (তাঁর শিক্ষক) বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। ... আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না।"

মীর মোশাররফ হোসেনের 'গৌরাই ব্রীজ বা গৌরীসেতু' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র (?) যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতেও মুসলিম সমাজ-মনের পরিচয় পাইঃ

'যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন ততদিন সে (হিন্দু-মুসলমানের) ঐক্য জন্মিবে না।"

[হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তখনো ছিল না, শাসক-শাসিত সুলভ অবজ্ঞা-বিদ্বেষের জেরই বিদ্যমান ছিল!]

'বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা' (নবনুর ঃ ভাদ্র ১৩১০ সনঃ 'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার'—লেখক কেন চিৎ মর্মাহতের হিতকামিনা। ইনি আবদুল করিম সাহিত্য -বিশারদ)।

'আমি জাতিতে মোসলমান, বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে।'['হিন্দু-মুসলমান' (ঢাকা ১৮৮৮সন) গ্রন্থ লেখক শেখ আবদুস সোবহান। ইনি 'ইসলাম সুহৃদ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

শাহ উয়ালীউল্লাহ, তাঁর পুত্র শাহ আবদুল কাদির ও ওয়াহাবী (মুহম্মদী) মত প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের বাহন ছিল উর্দু। সে আন্দোলনের সূত্রেও ইসলামী সাহিত্যের আধাররূপে উর্দু ধর্মভীরু ও জাতিপ্রাণ মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। একারণে শেখ আবদুর রহিম, নওসের আলি খান ইউসুফজাই, মৌলানা আকরম খান প্রমুখ অনেক বাঙলা লেখকও উর্দুর প্রয়োজনীয়তা (পাকিস্তানপূর্ব যুগেও) অনুভব করতেন। শেখ আবদুর রহিম বলেছেন ঃ

'বঙ্গীয় মুসলমান দিগের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না, ধর্মভাষা আরবী, তৎসহ ফারসী এবং উর্দু, —এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজী তৎসহ মাতৃভাষা বাঙলা।' (৮ই পৌষ ১৩০৬, সন মিহির ও সুধাকর)।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান বলেছিলেন ঃ

'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোসলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।' [তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন ঃ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ।]

সাধারণভাবে বলতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বাবধি (১৯২০) একশ্রেণীর বাঙালী মুসলমান উর্দু-বাঙলার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এঁদের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষিত এবং জমিদার অভিজাতরাই ছিলেন বেশি। বাঙালী মুসলমানের অশিক্ষার সুযোগে উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের, প্রথম তিন দশক অবধি স্বআরোপিত (Self assumed) নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, আমীর হোসেন (বিহারী), সৈয়দ আমির আলি, নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলি প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমের উর্দুভাষী বংশধরগণ। তাঁরাই বাঙালী মুসলমানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখপাত্র হিসেবে উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে বিদ্যালয়ে চালাবার স্বপ্ন দেখতেন। পাকিস্তানোত্তর যুগে তাঁদেরই বংশধর কিংবা জ্ঞাতিত্ব লোভীরাই উর্দুকে বাঙালীর ওপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াসী ছিলেন। আজো একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও সাহিত্যিক বাঙলায় আরবী-ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা উর্দুর স্বাদ পাবার প্রয়াসী।

অতএব, গোড়া থেকেই বাঙলাভাষার অনুশীলনে মুসলমানেরা বিবিধ কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আজো সে দ্বিধা থেকে তাদের অনেকেই মুক্ত নয়। এভাবে বাঙলা মুসলিম গুণীজ্ঞানীর আন্তরিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত ছিল। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান যতখানি থাকা বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক ছিল, তা মেলেনি। সৈয়দ সুলতানও এই দ্বিধাগ্রস্তদেরই অন্যতম। বহু যুক্তি দিয়ে তিনি একদিকে নিজেকে বাঙলা রচনায় উদ্বুদ্ধ করছেন, অপরদিকে বিরূপ সমালোচনা প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

খ. গ্রন্থপঞ্জী
আলোচিত তথ্যের উৎস নির্দেশ

AMARBOI.COM

ব্যবহৃত পাণ্ডুলিপিঃ

গ্রন্থনাম	কবির নাম	গ্রন্থাগার
আগম	আলি রজা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালা, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুঁথি পরিচিতিতে বিবরণ দ্রষ্টব্য
ইউনানদেশের পুঁথি	মুজাফ্ফর	ঐ
ইউসফ জোলেখা	শাহ মুহম্মদ সগীর	ঐ
ইউসুফ জোলেখা	আবদুল হাকিম	ঐ
কায়দানী কেতাব	শেখ পরান	ঐ
ঐ	শেখ মুতালিব	ঐ
ঐ	নেয়াজ	ঐ
কিফায়তুল মুসল্লিন	শেখ মুতালিব	ঐ
ঐ	আশরাফ	ঐ
গদা-মল্লিকার সওয়াল	শেখ সাদী	ঐ
গুলে বকাউলি	মুহম্মদ মুকিম	ঐ
ঐ	নওয়াজিস খান [রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত]	ঐ
চারি মোকাম ভেদ	আবদুল হাকিম	ঐ
ছুটিখানী মহাভারত	শ্রীকর নন্দী আমার পুঁথি	

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়কুম রাজার লড়াই	আকিল মুহম্মদ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড
দাকায়েক	সৈয়দ নুরুদ্দিন	ঐ
দুন্নামজলিস	আবদুল করিম খোন্দকার	ঐ
নসলে উসমান ইসলামাবাদ	উজির আলি	ঐ
নসিবনামা	মরদন	ঐ
নসিয়তনামা	আফজল আলি	ঐ
ঐ	নসরুল্লাহ খোন্দকার	ঐ
নূরনামা	শেখ পরান	ঐ
ঐ	মীর মুহম্মদ সফী	ঐ
পরাগলী মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস	ঐ
ফায়দুল মুকতদী	বালক ফকির	ঐ
ঐ	মুহম্মদ মুকিম	ঐ
ফালনামা	উমর	ঐ
বুরহানুল আরেফিন	বালক ফকির	ঐ
মক্তুল হোসেন	মুহম্মদ খান	ঢাকা বিশ্বঃ পুঁথিশালা
মল্লিকার সওয়াল	সেরবাজ চৌধুরী	ঐ
মুসার সওয়াল	নসরুল্লাহ খোন্দকার	ঐ
মোকাম মঞ্জিল ভেদ	মোহসেন আলি	ঐ
যোগকলন্দর	(অজ্ঞাত) এটিকেই সৈয়দ মর্তুজার রচনা বলে মনে করা হয়।	ঐ
রসুল-বিজয়	শা'বারিদ খাঁ গ্রন্থাবলী মৎসম্পাদিত।	ঐ
রসুল-বিজয়	শেখ চান্দ	ঐ
রাগতালনামা	—— মৎ সম্পাদিত	
শমশের গাজীনামা	শেখ মনোহর	আমার পুঁথি
শাহ জালাল মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	ঐ
শাহদৌলা পীর বা তালিব নামা	শেখচান্দ	বাংলা উন্নয়ন বোর্ড
শাহাবুদ্দীন নামা	আবদুল হাকিম	ঐ
শির্নামা	কাজী মনসুর	ঐ
সয়ফুল মুলক বদিউজ্জামাল	দোনা গাজী	ঐ
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ঐ
সিকান্দর নামা	আলাউল	ঐ
সিরাজ কুলুব	আলি রজা	ঐ
হরগৌরী সম্বাদ	শেখ চান্দ	ঐ
হাজার মসায়েল	আবদুল করিম খোন্দকার	ঐ
হানিফা ও কায়রাপরী (হানিফার দিগ্বিজয়)	শা'বারিদ খান (গ্রন্থাবলী মৎসম্পাদিত)	
হানিফার পত্রপাঠ	মুজাফফর	ঐ
হেদায়তুল ইসলাম	নসরুল্লাহ খোন্দকার	ঐ
ঐ	মোহম্মদ আলি	ঐ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহৃত মুদ্রিত কাব্য ঃ

গ্রন্থনাম	কবির নাম	সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রকাশকাল বাঙলা সন ও খ্রীস্টাব্দ
ওফাতে রসুল	সৈয়দ সুলতান	আলি আহমদ, ১৩৫৬
কবিকঙ্কণ চণ্ডী	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী	১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৪-২৬ ২। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। বঙ্গবাসী কার্যালয়, সং
গঙ্গামঙ্গল	দ্বিজমাধব	মুন্সী আবদুল করিম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩২৩
গোরক্ষবিজয়	শেখ ফয়জুল্লাহ	ঐ ১৩২৪
গোর্খ বিজয়	ভীমদাস সেন	পঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী ১৩৫৮
চর্যাপদ	----	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২
চৈতন্য-চরিতামৃত	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ৩য় সং, ১৩২২
চৈতন্যমঙ্গল	জয়ানন্দ	ঐ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩০৭
ঐ	লোচনদাস	নগেন্দ্রনাথ বসু, ঐ ১৩১২
চৈতন্যভাগবত	বৃন্দাবন দাস	বসুমতী, ৩য় সংস্করণ ৪৩৭, চৈতন্যাব্দ।
ছুটিখানী মহাভারত	শ্রীকর নন্দী	দীনেশচন্দ্র সেন ও বিনোদ কাব্যতীর্থ, বঃ সা; পরিষৎ, ১৩১২
জ্ঞানসাগর	আলি রজা	মুন্সী আবদুল করিম, ১৩২৪
তোহফা	আলাউল	আহমদ শরীফ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ, ১৩৬৪
ধর্মমঙ্গল	রূপরাম চক্রবর্তী	সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল ও সুনন্দা সেন, ২য় সং, ১৩৬০
পদ্মাবতী	আলাওল	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঢাকা ১৯৫০
পরাগলী মহাভারত	কবীন্দ্র পরমেশ্বর (বিজয় পণ্ডিত)	দীনেশচন্দ্র সেন ও নগেন্দ্রনাথ দাস,
বিদ্যাসুন্দর	দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ	আহমদ শরীফ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ; ১৩৬৪
ঐ	শা'বারিদ খান	ঐ ১৩৬৪
বৌদ্ধগান ও দোহা	চর্যাচর্যবিনিশ্চয়	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ বঃ সাঃ পরিষৎ ১৩৫৮
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস	ঐ ১৩৫০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুমালতী	মুহম্মদ কবীর	আহমদ শরীফ, বাংলা একাডেমী, ১৩৬৬
ঐ	সৈয়দ হামজা	১৩০৩
মধ্যযুগের কাব্যসংগ্রহ—		ঐ ১৩৬৯
মনসাবিজয়	বিপ্রদাস পিপিলাই	সুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৯৫৩
মনসামঙ্গল	কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ	কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৪৩, ১৯৪৯
মনসামঙ্গল পদ্মপুরাণ	বিজয় গুপ্ত	বসন্তকুমার ভট্টাচার্য, বরিশাল
মুসলিম কবির পদসাহিত্য	আহমদ শরীফ	বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ ১৩৬৮
মৃগলুব্ধ	দ্বিজরতিদেব	মুন্সী আবদুল করিম, বঃ সাঃ পরিষৎ ১৩২২
মৃগলুব্ধ সংবাদ	রামরাজা	ঐ ১৩২২
রসুল-বিজয়	জায়েন উদ্দিন	আহমদ শরীফ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ ১৩৭০
লায়লী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	ঐ বাংলা একাডেমী, ১৯৫৭
শিবায়ন	রামেশ্বর ভট্টাচার্য	ঈশানচন্দ্র বসু, ১৩১০
শূন্যপুরাণ	রামাই পণ্ডিত	চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৩৬
শেখ শুভোদয়া	হলায়ুধ মিশ্র	সুকুমার সেন, কলি, ১৯২৭
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	বড়ু চণ্ডীদাস	বসন্তরঞ্জন রায়, বঃ সাঃ পরিষৎ, ১৩২২/১৩৪২
শ্রীকৃষ্ণবিজয়	মালাধর বসু	খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৪
সতীময়না ও লোর চন্দ্রানী	কাজী দৌলত	সত্যেন্দ্র নাথ ঘোষাল, সাহিত্য প্রকাশিকা বিশ্বভারতী, ১৩৬২
সত্যকলি বিবাদ সংবাদ	মুহম্মদ খান	আহমদ শরীফ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্বঃ ১৩৬৬

AMARBOI.COM

ব্যবহৃত সাময়িক পত্র ঃ

Asiatique Journal : Vol. VI, 1831.
Bengal : Past and Present.
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, (1943-46, 1948).
Indian Historical Quarterly.
Journal of the Asiatic Society of Bengal : JASB
Journal of the Asiatic Society of Pakistan : JASB
Journal of the Royal Asiatic Society, Britain, London—JRAS
Journal of the Burma Research Society (1961)
Journal of the Pakistan Historical Society
Literary Review : Deptt. Of Bengali, Karachi University.
New Values, Vol.X, No. 1 1959
Proceedings of the Pakistan History Conference, 1951, 1952, 1953.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Proceedings of thd 9th Session of the Indian History Conference, 1956.
Visva Bharati Annals, 1945, Vol. I.

ইতিহাস—৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৩ সন।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,
বাংলা একাডেমী পত্রিকা
সাহিত্য পত্রিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নবনূর—ভাদ্র, ১৩১০
মাহে নও,
মাসিক মোহাম্মদী।

পুঁথি, মুদ্রা ও উৎকীর্ণ লিপির বিবরণাদি :

Bibliography of Muslim Inscriptions of Bengal : A.H.Dani, Appendix to JASP, Vol. II, 1957.
Catalogue of the Persian Manuscripts in thd Library of the India Office Oxford, 1903, —Charles Reiu.
Catalogue of the Persian Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, 1889. H. Ethe.
Catalogue of the Printed books in the Library of the British Museum, Brumhardt.
Catalogue of Indian Coins : S.Lane Poole., London, 1885.
Geschiche : Supplement, Leiden, 1938-Brockelmann.
Firoz Shahi Inscription in Chhota Dargah (761 A.H.) - Blochelmann, JASB XXXXII 1893.

বাংলা কলমী পুঁথির তালিকা—আলি আহমদ, ১৩৫৪
বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম ও ২য় সংখ্যা—মুন্সী আবদুল করিম, ১৩২০-২১
বরেন্দ্র মিউজিয়ামের পুঁথির তালিকা—মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী, ১৯৫৬
পুঁথি পরিচয়, ১ম ও ২য় খণ্ড, পঞ্চানন মণ্ডল, ১৩৫৮, ১৩৬৪, বিশ্বভারতী।
পুঁথি-পরিচিতি (আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সংকলিত—আহমদ শরীফ সম্পাদিত) —বাংলা বিভাগ, ঢাঃ বিশ্বঃ ১৯৫৮

পর্যটক-লিখিত বৃত্তান্ত :

Barbosa, Duarte : The Book Daurte Barbosa. Eng. Tr. by M.L. Dames, Hakluyt Society, London, 1918, 1921.
Barros, Joao de, : Decadas' (as quoted by Barbosa) the Book of Barbosa II, Appendix I, pp 239-48.
Barnier's letter to M. Chapelain dated Oct'4, 1667 A.D.
Ibn Batuta : The Rehla of Ibn Batuta :
Eng. Tr. by Mahdi Hasan in Gaekwad's Oriental Series; Baroda, 1953.
Ibn Battuta : H.A.R.Gibb. London, 1929. (Broadway Traveller's Series).
Mahuan : Kingdom of Bengala : Eng. Tr. by George Phillip, JRAS, 1895.
Mahuan's Account together with other Chinese Accounts, about Muslim Bengal : Eng. Tr. by Prabodh Chandra Bagchi.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Visva Bharati Annals. 1945, Vol. I.

Marco Polo : The Book of ser Marco Polo, Vol. II 3rd edition. Yule and Cordier, London. 1903.

Purchas, Samuel : Purchas His Pilgrims. Vol. X (Glasgow) 1905 (Accounts of C. Frederick and Ralph Fitch)

Souza, Faria, Y. The Portuguese Asia Vol. I. Eng. tran. by Stevens, London, 1895

Strabo—Book XV. Chapter I.

Varthema : Ludovico di. The travels of Varthema. Eng. tr. John Winter Jones, edited by G.P. Badger, Hakluyt Society, London, 1863.

Arab Sea-faring : H.G. Hourani, 1951.

Early Travels in India. Edited by W. Foster.

England's Pioneers in India : edited by J.Horton.

The Voyage in Francois Pyvard : Eng. Tr. by albert Gray, Vol. I, Hakluyt Society, London, 1887.

Travels of Friar S. Manrique (1629-35) Vol 1, Eng. tr. by Luard and Hosten Oxford, 1927.

Land of the Great Image : Being the Experience of Friar S. Manrique in Arakan : Eng. Tr. Maurice Collis, 1942.

Correspondence of the two 14th Century Saints etc.

S. Hasan Askari, Proceedings of the 9th session, Indian History Congress, 1956.

Fateyya-I- Ibriyya (Shihabuddin Talish) Continuation (conquest of Chatgaon) : J. N. Sarkar, JASB, 1906.

Kirata-Jana-Krti: S.K. Chatterjee, JASB 1950.

Magh-Bohmong : G.E. Harvey, Burma Research Society Journal, 1961.

Mediaeval Mysticism and Kavir : Visva Bharati quarterly, 1945.

Music in Islam : M.L.Ray Chowdhury, JASB, Vol XXII, 1957.

On Certain Peculiarities in the Mohamadanism of India : Asiatic Journal, Vol. VI. 1831

Spread of Islam in Bengal : M.M. Siddique, Proceedings of Pakistan Hist. Conference, 1952.

The Muhammadan of Eastern Bengal : J.Wise, JASB, Vol. LXIII, pt. III, 1894.

আওরা দ্য বারোজ প্রশস্তি :	আহমদ শরীফ	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৫
কবি চুহর :	ঐ	৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৭
কবি শাহ মুহম্মদ সগীর :	মুহম্মদ এনামুল হক	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৩
কবি শেখচান্দ:	ঐ	ঐ ১৩৪৩
কবি সৈয়দ সুলতান :	ঐ	ঐ ১৩৪১
কবি ভবানীনাথ ও রাজা জয়ছন্দ	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,	ঐ ১৩৫৬
কবি দৌলত উজির ও মুহম্মদ খান সম্বন্ধে নতুন তথ্য :	আহমদ শরীফ	সাহিত্য পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৯
চট্টগ্রামে মগ-পাঠান রাজত্ব :	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য	সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৫৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা :	এম. আর তরফদার	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৪
পাক-ভারতে খেয়াল গানের উৎপত্তি ও বিকাশ :	আবদুল হালিম	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪ সন।
প্রণয়োপাখ্যানের কবি মুহম্মদ জীবন :	আহমদ শরীফ	বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, রাজশাহী, ১৩৬৭
বাউলতত্ত্ব :	ঐ	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৭০
বাঙলা সাহিত্যের প্রতিপোষক :	আহমদ শরীফ	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬৬
বার্বোসার দৃষ্টিতে বাংলাদেশ :	এম. আর. তরফদার	ইতিহাস পত্রিকা, ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬৩
মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকগণের অত্যাচার :		কেনচিৎ মর্মাহতের হিতকামিনা-এটি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের রচনা দ্রষ্টব্যঃ পুঁথি পরিচিতিঃ পরিশিষ্ট-খ, পৃঃ ৬৮৩, ৫০ সংখ্যক প্রবন্ধ : নবনূর, ভদ্র, ১৩১০
যয়নবের চৌতিশা : ফয়জুল্লাহ :	আহমদ শরীফ	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৬৬
রাগতালনামা (আলাউল) ও পদাবলী :	আহমদ শরীফ	বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭০
সাধক কবি হাজী মুহম্মদ :	ঐ	৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬৭

AMARBOI.COM

আলোচিত আরবী-ফারসী ও উর্দু গ্রন্থ :

আইন-ই-আকবরী :	ব্লকম্যান সম্পাদিত বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিঃ ১৮৭৭ আখবার অল
আখিয়ার ফি আসরার অল আরবার :	শেখ আবদুল হক দেহলবী, দিল্লী ১৩৩২ হিঃ
আহাদীসুল খাওয়ানীন :	হামিদুল্লাহ খান, কলিকাতা, ১৮৭১
কাশফ-অল-মাহজুব :	উসমান হুজ্বইরী-নিকোলসন অনূদিত, ১৯১১
কিমিয়া-ই-সাদত:	গাজ্জালী, ইকবাল ফরিদ III, ইংরেজী অনুবাদ ব্লকম্যান, ১৮৭১-৭২ এশিয়াটিক সোসাইটি জর্নাল।
কিতাব উল লুমা ফিততসাউফ :	আবু নসর সারাজ, নিকোলসন অনূদিত, লণ্ডন, ১৯১৪
তারিখ-ই-ফিরোজশাহী:	জিয়া অলদীন বরনী, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ১৮৬২
ঐ	শাম্স-ই-সিরাজ আফিফ ঐ ১৮৯০
তবকত-ই-আকবরী :	নিজামুদ্দীন আহমদ, ৩য় খণ্ড, বি.দে.অনূদিত, ১৯২৭, ৩৬.৩৯
তবকত-ই-নাসিরী:	মিনহাজ সিরাজ ঐ ১৮৬৪
তসউফ অওর ইসলাম	আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী
তজকিরাতুল আওলিয়া:	ফরিদউদ্দীন আত্তার, নিকোলসন সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯০৫
দবীরস্তান আল মযাজির:	মোহসিন ফানী, বোম্বাই সংস্করণ [ডক্টর এম.আর. তরফদার কর্তৃক উদ্ধৃত]
রিয়াজ অল সালাতিন:	গোলাম হোসেন সলিম, বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা, ১৮৯৮
সিয়ার অল আরেফিন :	মৌলানা জামালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহৃত ইংরেজী ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ :

Adams, William : Report on Education in Bengal, 1835, C.U.
Ahmed. A: History of Shah Kalal and Jhadims, Sylhet, 1914.
Ali. Abid: Memoirs of Guar and Pandua, edited by Stapleton, Cal. 1931.
Arnold, T.: The Preachings of Islam, New edition, Lahore, 1956.
Ashraf, K.M.: Life and Condition of the people of Hindustan (1200-1550). JASB 1935, Vol. I. No. 2.
Bagchi, P.C.: Studies in Tantras pt. I, C.U. 1939.
Barua, K.L. : Early History of Kamarupa, Shillong, 1933.
Basu, K.K. : Tarikh-I-Mubarakshahi, (Eng. Tran.) Gaekwad's Oriental Series, Baroda, 1932.
Beverly, H. : Census Report of Bengal, 1872.
Bhattasali, N. K. : Coins and Chronolgy of the Early Independent Sultans of Bengal, Cambridge, 1922.
Besant, Annie : Re-incarnation.
Bose, M.M. : Post Chaitanya Sahajiya Cult of Bengal, C.U. 1930
Brown, E.G. : A Literary History of Persia, Vol. II, Cambridge, 1928.
Campos, J.J.A : History of the Portuguese in Bengal, 1919.
Chanda, R.P. : Races of Bengal.
Chatterjee, S.K. : Indo-Aryan and Hindi, 1944.
Damaut, G.H. : Risalat at Suhda (Eng. Tr.) JASB, 1874.
Das Gupta, J.N. : Bengal in the 16th Century, C.U. 1914.
do : India in the 17th Centuty, C.U. 1916.
Das Gupta S.B. : Obscure Religious Cults as the background for Bengali Literature, C.U. 1946.
Das Gupta, T.C. : Aspects of Society from Old Bengali Literature, C.U. 1935.
Das Gupta, S.N. : History of Indian Philosophy, Vols I-III.
Datta, K.K. : History of Bengal Subah.
De, S.K. : Early History of Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Cal. 1942.
De, B & Prashad, B. : Tabaqat-I-Akbari, Vol. III, Eng. Trans. Asiatic Society of Bengal, Cal., 1939.
Diksit, K.N. : Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 55. Delhi, 1938.
Elliot & Dowson : History of India as told by its own Historians.
Frazer, J. : Golden Bough,
Geiger : Civilization of Eastern Iranians.
Ghose,J.C. : Bengali Literature, Oxford, 1948.
Gibb, H.A.R.: Muhammadanism (Home University Library Series No. 197) 2nd edition, London 1953.
Grierson, G.A.I. : Linguistic Survery of India, Vol. I
Halim, A. : History of indo-Pak, Music, Dacca, 1961.
Hall, A.E. : History of the South East Asia.
Haq, S.A. : History of Chittagong, 1948.
Haug : Essays.
Harvey, G.E. : History of Burma, London, 1925.
Hodivala, S.H. : Studies in Indo-Muslim History, Bombay, 1939.
Hunter, W.W. : Annals of Rural Bengal.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Iqbal, M. : Development of Metaphysics in Persia, 1913.
Ishaq, M. : India's Contribution to the study of Hadith Literature, D.U. 1955
Jarret, H.S : Ain-I-Akbari (Eng. Tr. annotated by J.N. Sarkar) Asiatic Society of Bengal, 1949.
Karim, A. : Social History of the Muslims in Bengal. Asiatic Society of Pakistan, 1959.
Khan, F.A : 1. Recent Archaeological Excavations in East Pakistan, Mainamati.
1. Second Phase of Archaeological Excavations in East Pakistan, Mainamati,
Govt. Public Relations Deptt. Publications.
Law, N.N. : Promotion of learning during the Muhammadan Rule by Muhmadans.
London, 1916.
Majumder, R.C. : History of Bengal, D.U.Vol. I, 1943
Mirza Nathan, : Baharistan Ghyabi, Vols. I & II. Tr. M. I. Borah (Govt. of Assam)
Gauhati, 1936.
Mitra, R.C. : The Decline of Buddhism In India, Visva Bharati, 1945.
Moreland, W.H. : 1. India at the death of Akbar London, 1920
2. The Agrarian System of Moslem-India, Cambridge, 1929.
Mullick, A.R. : British Policy and Muslims of Bengal, Dac. 1962.
Nicholson, R.A. : 1. The Mystics of Islamic, London, 1914.
2. Select Poems from the Dewans of Shums Tabrazi, 1921.
3. Literary History of the Arabs.
4. Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921.
O'Leary. : Arabic thought in History.
O' Malley. L.S.S : District Gazetteers : Chittagong, 1908, Pabna 1923.
Phayre, A.P.: History of Burma, London, 1884.
Qanungos, K.R. : Sher Shah, Cal. 1921.
Qureshi, I.H. The Administration of the Sultanate of Delhi 2nd edition, Lahore, 1944.
Radha Krishnan, S. : Philosophy of India, Vols. I-II. London, 1927
Rahim, A. : Social & Cultural History of Bengal, Karachi, 1963.
Ray Chowdhuri, T.K. : Bengal under Akbar and Jahangir, Cal. 1953.
Risley, H.H. : Castes and Sects in Bengal.
Rubbie, K. Fuzle, : Origin of the Mussalmans of Bengal (Persian Haqiqat-I-
Mussalmani Bangala) Cal. 1895.
Saksena, R.C. : History of under Literature, 1930.
Sarkar, J.N.: 1. History of Bengal, D.U.II, 1948.
2. Studies in Mughal India.
Sastri, H.P. : 1. Discovery of Living Buddhism in Bengal, Cal, 1896.
2. Vallala Charita, Cal. 1901.
3. Lokayatas, D.U. 1925.
Scott, J. : History of Burma L 1925.
Subhan, J.A. : Sufism, Its Saints and Shrines, Lucknow, 1938.
Tarachand : Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad 1946.
Tarafdar, M.R.: Husain Shahi Bengal, Asiatic Society of Pakistan. 1965.
Warmington, E.H. : The Commerce between the Roman Empire and India, Cambridge. 1928.
Wise, J: Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London, 1883.
Worth, Charles, : Trade routes and Commerce of the Roman Empire. Cambridge, 1928.
Whittaker : Neo-Platonism.

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Yule, H. : Cathay and the way thither, Vols. I. & II, London, 1866.

OTHER BOOKS :

Encyclopaedia of Islam. Vol. II

Encyclopaedia of Religion and Ethics, Edinburgh, Vols. IX-XII.

History of Ancient Geography, Cambridge, 1948.

India Through Ages.

Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Philosophy.

Racial Elements in the Population, Oxford Pamphlet on Indian Affairs, No. 22, 1944.

ব্যবহৃত বাঙলা ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ ঃ

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য:	মুহম্মদ এনামুল হক ও আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ১৯৩৫.
ইসলামী বাংলা সাহিত্য ঃ	সুকুমার সেন, ২য় সং, ১৩৫৮
উপনিষদ ঃ ছান্দোগ্য, শ্বেতাশ্বতর, বৃহদারণ্যক।	
ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ ঃ	সুশীলকুমার গুপ্ত
রাজা গণেশের আমল ঃ	সুখময় মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁর যুগঃ	বিমানবিহারী মজুমদার,কলি ঃ বিশ্বঃ ১৯৬১
চট্টগ্রামের ইতিহাস ঃ পুরানা আমল ও নবাবী আমল, (২য় সং) ঃ	মাহবুব-উল-আলম, ১৯৫৫
চৈতন্যচরিতের উপাদান ঃ	বিমানবিহারী মজুমদার, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৩৯
জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য ঃ	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
দর্শনের ভূমিকা ঃ	সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দর্শন ও সাধনপ্রণালী ঃ	কল্যাণী মল্লিক, কলিঃ বিশ্বঃ ১৯৫০
পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম ঃ	মুহম্মদ এনামূল হক, ১৯৪৮
প্রাচীন বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী ঃ	সুকুমার সেন, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ ১৩৫৩
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ঃ	ভারত সরকার প্রকাশিত।
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ঃ	দীনেশচন্দ্র সেন, ৯ম সং, ১৩৫৬।
বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ঃ ১ম ও ২য় খণ্ড	দীনেশচন্দ্র সেন, ১৯১৪।
বঙ্গে সূফী প্রভাব ঃ	মুহম্মদ এনামূল হক, ১৯৩৫।
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ঃ	নগেন্দ্রনাথ বসু, ১ম-৩য় খণ্ড, ১৩৩১।
বাঙ্গালার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ঃ	রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়, ১৩২৪
বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ঃ	আশুতোষ ভট্টাচার্য
বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ ও অপরার্ধ, ৩য় সং ঃ	সুকুমার সেন।
বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) ঃ	নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৫৯।
বাঙলার নবজাগৃতি ঃ	বিনয় ঘোষ।
বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর (স্বাধীন আমল):	সুখময় মুখোপাধ্যায়।
বাংলার বাউল ও বাউল গান ঃ	উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৩৬৪।
বাংলার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মুসলমান কবি, ২য় সং ঃ	যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ১৩৬৮।
বাংলার সারস্বত অবদান ঃ	দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৩৫৮।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা সাহিত্যের কথা (প্রাচীন ও মধ্যযুগ) ২খণ্ডে — মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।
বাংলার হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা : ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী।
বৃহৎবঙ্গ-১ম ও ২য় খণ্ড : দীনেশচন্দ্র সেন, ১৩৪১-৪২।
বৌদ্ধ ধর্ম : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ভারত দর্শন সার : উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, বিশ্বভারতী।
ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় : অক্ষয় কুমার দত্ত।
মধ্যযুগের বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী : সুকুমার সেন, ঐ ১৩৫২।
মুসলিম বাংলা সাহিত্য : মুহম্মদ এনামুল হক, ১৯৫৭।
রচনাবলী, ১ম ও ২য় খণ্ড : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজমালা, ১ম ও ২য় তরঙ্গ : কালিপ্রসন্ন সেন, ১৩৩৬-৩৭ ত্রিপুরাব্দ
রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
লোকায়ত দর্শন : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
শাক্ত সাহিত্য : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত।
হঠযোগ দীপিকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগ-যন্ত্রণা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

জ্যেষ্ঠভ্রাতা
মরহুম আহমদ কবির স্মরণে

যাঁর সোহাগে-শাসনে
আমার বাল্য-কৈশোর নিয়ন্ত্রিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাক্ স্বাধীনতা

মানুষ সবকিছু সহ্য করে বা সহ্য করতে রাজি, কেবল নতুন কথা তার দুই চোখের বিষ, তার দুই কানের শূল, তার প্রাণের বৈরী। সে তার চারপাশের চোর, ডাকাত, বদমায়েশ, লম্পট, মিথ্যাবাদী, জালিম প্রভৃতি সবাইকে ক্ষমা করতে সদা সম্মত, কিন্তু কথাওয়ালা ব্যক্তিকে নয়। চোর, জুয়াড়ি, লম্পট ও জালিমকে সে একটু নিন্দা, একটু বিরক্তি, একটু ক্ষোভ প্রকাশ করেই ক্ষমা করতে প্রস্তুত—কিন্তু নাস্তিক বা অবিশ্বাসীকে সে কখনো মাফ করতে জানে না—তার প্রাণান্ত ঘটিয়ে তবে সে স্বস্তি পায়। যে পুরোনো সমাজ ও ধর্মের রীতিনীতি ও আচার-সংস্কারের বিরুদ্ধে বলে, সেই নাস্তিক, সেই অবিশ্বাসী, সেই বেঈমান। অথচ এই নতুন কথাওয়ালা তথা নাস্তিক ব্যক্তিটি কারো কোন বৈষয়িক ক্ষতি করে না। কেবল মুখে আস্তিক্য প্রকাশ করে অর্থাৎ পুরোনো রীতিনীতি নীরবে মেনে নেয়ার ভান করেই যে-কোনো চরিত্রহীন দুরাচারী সমাজে সাদরে ঠাঁই পায়। যদিও এরাই সামাজিক জীবনে যন্ত্রণা সৃষ্টির জন্যে দায়ী। যেমন আমার পাড়ায় চোর থাকলে আমার রাতের স্বস্তি লোপ পায়, লম্পট থাকলে সে আমার দিবারাত্রির উদ্বেগ, জালিম থাকলে সে আমার সর্বক্ষণের ত্রাস, এবং অসাধু বেনে আমার প্রাত্যহিক ক্ষতির কারণ। নিষ্ঠাহীন আস্তিক হচ্ছে মক্কর ও মোনাফেক। তার থেকে নৈতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে সমূহ ক্ষতি হয়। কিন্তু নাস্তিকেরা সাধারণত বিবেকবান, বুদ্ধিজীবী, যুক্তিবাদী, কল্যাণকামী ও নৈতিক সাহসে ঋদ্ধ। এজন্যে নাস্তিক থেকে নৈতিক বা বৈষয়িক ক্ষতির কোনো আশঙ্কা থাকে না। তবু তাকে লোক প্রমূর্ত উপদ্রব বলেই মনে করে। তাই নাস্তিকের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে সবাই সর্বক্ষণ প্রস্তুত।

নাস্তিক হওয়া সহজ নয়। এ এক অনন্য শক্তিরই অভিব্যক্তি। কেননা বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না। আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য নৈতিকশক্তিধর যুক্তিবাদী পুরুষের পক্ষেই তা সহজ।

তাই প্রাচীন ও আধুনিক দুনিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রখ্যাত নাস্তিকই সুজন, সুনাগরিক ও মনীষী। মানুষ হিসেবে এদের সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবোধ ও কল্যাণবুদ্ধি অপরের চাইতে তীক্ষ্ণ ও তীব্র। কিন্তু বাঁধাপথের যাত্রীদের চোখে এদের এ চেহারা ধরা পড়ে না।

পুরোনো নিয়মনীতির অনুগতরা যাদেরকে নাস্তিক বলে, তারা আসলে Nonconformist বা প্রতিবাদী-দ্রোহী। ওদের রীতিনীতি মানে না বলেই ওদের চোখে এরা নাস্তিক। দ্রোহীরা চিরকালই সনাতনীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে। মুসা-ঈসা-মুহম্মদ, সক্রেটিস-কোপারনিকাস-গ্যালিলিও-ব্রোনো, যোয়ান অব আর্ক, শিহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী ও প্রভৃতি কত কত মানুষ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম, সমাজ, বিদ্যা, জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন কথা উচ্চারণ করে নিপীড়িত ও নিহত হয়েছে তার হিসেব নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনুষ্যসমাজে প্রাচীনে নবীনে দ্বন্দ্ব চিরকালীন। প্রকৃতির জগতে কিন্তু নতুন পুরানে কোনো সংঘর্ষ নেই। গাছ যে বৃদ্ধি পায় সে তো নতুন পাতাকে ঠাঁই ছেড়ে দিয়ে পুরোনো পাতা ঝরে পড়ে বলেই। মনুষ্যসমাজে প্রাচীনে নবীনে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ বাধে বটে, কিন্তু পরিণামে জয় নতুনেরই হয়। তবু মানুষ চিরকাল ইতিহাসের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছে। প্রকৃতির এই নির্দেশ না মানার ফল ভালো হয়নি। রক্তে আগুনে পৃথিবী কেবল বারংবার বিপর্যস্ত হয়েছে। প্রাণঘাতী সংঘর্ষে মানুষ কেবল অশান্তি ও অমঙ্গলই ছড়িয়েছে। মানুষের ইতিহাস এই বৈনাশিক কোন্দলেরই ইতিকথা। কিন্তু প্রশ্ন জাগে কেন এমন হয়। চলমান জীবনে চলা মানেই সুমুখে এগিয়ে যাওয়া। আর এগুতে গেলেই স্থান ও কালকে পেছনে ছেড়ে যেতে হয়। কাজেই পুরোনোকে বর্জন ও নতুনকে গ্রহণের নামই হচ্ছে প্রগতি। আর কে না জানে যে গতিতেই জীবন, স্থিতিতে মৃত্যু। গতি মানেই স্বাভাবিক অগ্রগতি। পুরাতন হচ্ছে অতীত, আর নতুন মাত্রই ভবিষ্যতের প্রতীক। নতুনের প্রতি আসলে মানুষের কোনো অনীহা নেই। বরং প্রবল আগ্রহ রয়েছে। ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে মানুষ নতুনকে বরণ করবার জন্যে সদা ব্যাকুল। কিন্তু মানসক্ষেত্রে অর্থাৎ ভাব-চিন্তা-অনুভবের ব্যাপারে জীবনে আচরণীয় নিয়ম-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কারের যে-তৈরি ইমারত সে রিক্থ হিসেবে পায়, তার থেকে বেরিয়ে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে সে নারাজ। এ ব্যাপারে সে নিজে চিন্তা করবার গরজ বোধ করে না। এ বিষয়ে সে পরচিন্তাজীবী, গুরুবাদী। কুলগুরুর দীক্ষা সে কবজ হিসেবে মনে-মস্তিষ্কে সংলগ্ন করে ভবনদীতে নিশ্চিন্তে পাড়ি জমায় ঐহিক ও পারত্রিক প্রাপ্তির আশায় ও আশ্বাসে। তাই মানুষ সনাতনী এবং নতুনদ্বেষী। তার পুরাতন প্রাতী ও নতুন ভীতির রহস্য এখানেই নিহিত।

এ ক্ষতিটা করেছেন মহাপুরুষেরা। যদিও তাঁরা নিজেরাই পিতৃধর্ম ও সমাজদ্রোহী এবং নীতি-সত্যের চিরন্তনতায় আস্থাহীন, এবং নতুনের যুক্তিবাদী বিবেকবান প্রবক্তা ও প্রবর্তক, আর স্বকালের বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্ত মানুষকে পথের দিশা ও আলোর মশাল দিয়ে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করেন; তবু লোকস্মৃতিতে অমরত্বের মোহে পড়ে তাঁরা তাঁদের উদ্ভাবিত মত ও পথের উপযোগের চিরন্তনত্ব দাবি করে বিশ্বমানবের স্থায়ী ক্ষতির পথ ও কোন্দলের কারণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। নিজেরা জীবনে মানবকল্যাণে নতুন মত-পথ ও রীতিনীতি তৈরি করে গেছেন পুরাতন সবকিছু অকেজো বলে বর্জন করে, আর মনে কামনা করেছেন নিজেদের বাণী, প্রবর্তিত মতাদর্শ ও নিয়মনীতি চিরকাল সর্বমানবের জীবন-নিয়ামক হিসেবে পুরাতন ও সনাতন হয়ে টিকে থাক। এভাবে চিরন্তনতার বিরোধী চিরন্তনতারই শিকার হন। নশ্বরতার প্রতি বীতরাগ এবং অবিনশ্বরতা ও অমরত্বের প্রতি আকর্ষণ একটি মানবিক দুর্বলতা। এই দুর্বলতার ছিদ্রপথেই সমকালীন মানবপ্রেমিক গণহিতকামী ও প্রজ্ঞাবান পুরুষ নিজের অজ্ঞাতেই অমঙ্গলের নিমিত্ত হয়ে ওঠেন। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাতেই এর উৎপত্তি। তাঁরা অনুগত মানুষের মন-বুদ্ধি বন্ধ্যা করে দেন। ভক্ত মানুষেরা পুরুষানুক্রমে পিতৃধনের মতো এই পৈতৃক মতাদর্শ ও রীতিনীতি অনুসরণ করে নিশ্চিত জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই নতুন মহাপুরুষ যখন সমকালের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যার সমাধান মানসে নতুন কথা উচ্চারণ করেন, তখন তাঁকে সত্য ও শান্তি ভঙ্গের অপরাধে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হতে হয়। মানব কল্যাণে যুগের যন্ত্রণার নিরসন করতে গিয়ে মানবরক্তে মাটি সিক্ত করতে হয়। তাই পৃথিবীতে আজো নতুন যুগ সৃষ্টি হয় রক্তস্নানের মাধ্যমেই। অতএব, সমাজবিপ্লবে মানুষের সর্বদুঃখের আকর হচ্ছে এই সনাতনপ্রীতি বা রক্ষণশীলতা—যা মানুষকে গ্রহণ বর্জনের ঝামেলা এড়িয়ে স্থিতিকামী করে রাখে। কিন্তু পিতৃধনই যার সম্পদ, সে সম্পদের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাকৃতিক নিয়মেই যা-কিছু পুরাতন হয়, তাকে জড়তা ও জীর্ণতা গ্রাস করে। বিনাশের বীজ তার মর্মে প্রবিষ্ট। কাজেই নতুনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জড় ও জীর্ণ প্রাচীন বেশিদিন টেকে না। নতুনের অমোঘ প্রতিষ্ঠা ও প্রসার একসময় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একালেও ইতিহাস-জানা বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোকও নতুনের প্রতি বিরূপ এবং নতুনের প্রতিরোধে সমভাবেই উৎসাহী। সমাজতত্ত্ববিদরা একে কায়েমী স্বার্থ রক্ষণবাদীর প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে অভিহিত করেন। তাঁদের মতে কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশে যে-শ্রেণীর লোক বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, সে-শ্রেণীর লোক পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেদের বিপর্যয়ের আশঙ্কাতেই পুরোনো ব্যবস্থার স্থায়িত্ব কামনা করে এবং নতুনের বিরোধিতা করে।

এ তত্ত্ব স্বীকার করেও বলতে হয় তাদের মধ্যে এ-যুগের তথ্য-চেতনা থাকা বাঞ্ছনীয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীব্যাপী এখন যন্ত্রযুগ চলেছে। যন্ত্রের বদৌলত পৃথিবী আর বিশাল ও বিপুল নয়, এর দুরবিসারী কোনো স্থিতি নেই। সংহত পৃথিবী এখন বড়জোর একটি বড় শহর মাত্র। ইচ্ছে করলেই অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে আসা যায়, আর যন্ত্রযোগে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ আলাপ করা চলে। কাজেই এ-যুগে দেশ দুনিয়ার যে-কোনো প্রান্তে প্রচার-উদ্দেশ্যে উচ্চারিত একটি ক্ষীণ ধ্বনিও লুকোবার উপায় নেই। আগেকার দিনেও তা অশ্রুত অবস্থায় লুপ্ত হত না—তবে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগত। যিশুর রক্ত রক্তবীজ সৃষ্টি করে গেছে। দুনিয়া যিশুপন্থী লোকে পূর্ণ। সক্রেটিস কিংবা শিহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর মরতে হয়েছে। কিন্তু তাঁদের বাণীর ধারক-বাহকের অভাব ঘটেনি বিশ্বে।

বলছিলাম পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তে উচ্চারিত নতুন ভাব, চিন্তা, অনুভূতি বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। চাঁদ-সূর্যের রশ্মির মতোই তা অপ্রতিরোধ্য, বাতাসের মতোই তার অবাধগতি। এ শুধু কানের ভিতর দিয়ে মর্মে পশে না, প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করে মর্মমূলে বাসা বাঁধে—আসন পাতে। পৃথিবীর সর্বত্রই এখন মানুষের মিলন-ময়দান তৈরি হয়েছে। রাষ্ট্রসমূহের রাজধানীগুলো যেন এক-একটি বাজার, এখানে বিশ্বের সবজাতের ও মতের লোকের মিলন হয়। তাছাড়া রেডিও-টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, চিত্র ও গ্রন্থাদির মারফত সারা দুনিয়ার ঘরের ও ঘাটের, হাটের ও মাঠের সব খবরই কানে আসে, যার যে- সংবাদে আগ্রহ সে তা-ই গ্রহণ করে। অতএব ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার নিরাপত্তার নামে রাষ্ট্রের সরকারেরা বৃথাই চিন্তাবিদদের কণ্ঠরোধ করতে সচেষ্ট থাকে। শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সমাজতান্ত্রিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, ধর্মতত্ত্ববিদ সবাই কথা বলেন বটে, কিন্তু নতুন কথা বলেন কয়জনে? এক দেশে এক যুগে কয়টা কণ্ঠ নতুন চিন্তা, নতুন তথ্য, নতুন মত, নতুন আদর্শ উচ্চারণ করে! যাঁদের বলবার মতো নিজস্ব কোনো কথা নেই, তাঁরা পুরোনো কথার রোমন্থন করে কথার আবর্জনা বৃদ্ধি করেন মাত্র। কেননা তাতে শেখবার,জানবার, বুঝবার কিছু থাকে না। তাঁদের কথায় সমাজ-সংসারের কিংবা ধর্ম ও রাষ্ট্রের কোনো সেবা হয় না। ক্ষতি করার সাধ্য তো নেই। যে দু-একজন দুর্লভ প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি মানবকল্যাণে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উৎঘাটন করেন, কিংবা ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিয়ে দেন এবং সমস্যার সমাধান ও ত্রুটি নিরসন ব্যাপারে তাঁর মত দান করেন বা মত প্রকাশ করতে চান; তাঁদের প্রতি রক্তচক্ষু তুলে তাকানো কিংবা পীড়নের হস্ত প্রসারিত করা ব্যক্তির মানবিক অধিকারে হস্তক্ষেপের শামিল তো বটেই, তার চেয়েও বেশি। এতে বিশ্বমানবের কল্যাণ ও প্রগতির পথ রুদ্ধ করাও হয়। কারণ আপাত তিক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীয়মান হলেও নতুন চিন্তা বা মতবাদ পরিণামে বিশ্বমানবের কল্যাণই করে। তাদের সমাজ, নীতিবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, মানবিক ভাব-চিন্তা-অনুভূতি ও মানবতা এই নতুন চিন্তা ও মতবাদ অবলম্বন করেই বিকশিত হয়!

যুগে-যুগে দেশে-দেশে এমন কত দুর্লভ কণ্ঠ রাজশক্তি স্তব্ধ করে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। এতে মনুষ্যসভ্যতা ও মানবতার বিকাশ মন্থর হয়েছে মাত্র। দ্রুতবিকাশের প্রসাদ থেকে বিশ্বমানব বঞ্চিত হয়েছে কেবল। তবু নির্ভীক কণ্ঠ রোধ করা যায়নি, প্রাণের বিনিময়ে তাঁরা বিবেক নির্দেশিত বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছেন। এতে কারো কোনো ক্ষতি হয়নি, মানব-মনীষার মহিমা ও বৈচিত্র্যই কেবল প্রকটিত হয়েছে আর মানবনির্মিত সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও জীবন-চেতনা, মানবিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি পরিস্রুতি পেয়েছে। তা ছাড়া গড্ডলিকার মতো একভাবে যান্ত্রিক জীবনযাপনের যন্ত্রণা থেকে মানুষ পেয়েছে নিষ্কৃতি। একই ধর্মের বিভিন্ন মতবাদী শাখা, কিংবা বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম, দাদাবাদ, অস্তিত্ববাদ অবধি দুনিয়ার অসংখ্য দার্শনিক মত, বিবর্তনবাদাদি বৈজ্ঞানিক মতবাদ, গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, নায়কতন্ত্র প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ মানুষকে স্ব-স্ব রুচি অনুযায়ী জীবন দর্শন অনুসরণ করে জীবন অনুভব ও উপভোগ করার এবং জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করার অবাধ সুযোগ দেয়। জীবন যে বৈচিত্র্য চায়, মন যে বেবাম সমুদ্রে অবগাহন করে তৃপ্ত হতে চায়—এটা যে জৈবিক তথা প্রাকৃতিক তৃষ্ণা সে-কথাও মনে রাখা দরকার। মতবাদীর পারস্পরিক বা সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব-কোন্দল তো মানুষের হিংস্র-প্রবৃত্তির ও অসহিষ্ণুতার ফল। কোনো মতবাদই মানুষের অমঙ্গল কাঙ্ক্ষায় ঘোষিত হয়নি। প্রতিটি মতাদর্শই কল্যাণবুদ্ধির প্রসূন এবং মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসল। কাজেই কোনো মতবাদই বৈনাশিক বীজ বহন করে না, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব শেখায় না। প্রকৃতির জগতে যেমন আমরা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্য প্রত্যক্ষ করি, যত মন তত মত থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

কিন্তু সবাই নির্ভীক হয়ে মনের কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে পারে না। প্রাণের মমতা থাকা, জীবনকে, মাটিকে ও আকাশকে ভালোবাসা নিন্দনীয় নয়। তাই সক্রেটিসের মতো সবাই স্বেচ্ছায় হেমলক পান করতে পারে না কিংবা ক্যাটোর মতো জেনে বুঝে বিষপানে রাজি হয় না। শুনেছি ইমাম গাজ্জালী প্রথমে ধর্মদ্রোহী ছিলেন এবং পরে প্রাণভয়েই আপস করেছিলেন। শেখ সাদী রাজরোষ এড়ানোর জন্যে পালিয়েছিলেন। কত নাম করব! মধ্যযুগের এশিয়া-য়ুরোপে মুসলিম ও খ্রিস্টান সমাজে অসংখ্য গুণী-জ্ঞানী-ধার্মিক স্বমত ব্যক্ত করে নিহত, নির্যাতিত হয়েছেন। আজো কি তার অবসান হয়েছে? কিন্তু তবু তাদের উচ্চারিত বাণী বিলুপ্ত করা যায়নি, বাতাসের সঙ্গে মিশে তা মানুষের মর্মে প্রবেশ করে মানুষের অন্তর্লোক উদ্ভাসিত করে রেখেছে। অতএব চিন্তাবিদের মৃত্যু আছে—চিন্তার মৃত্যু নেই। মতবাদীকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু মতবাদ নির্মূল করা অসম্ভব। বিশেষ করে এ- যুগে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে উদ্ভূত নতুন মতবাদ বায়ুবাহনে নির্ভৃত গৃহকোণেও মানুষের কর্ণকুহরে অবাধে প্রবেশ করবার বৈজ্ঞানিক অধিকার লাভ করেছে যখন, তখন একটি রাষ্ট্র-ক্ষমতা হস্তগত রাখার অপপ্রয়াসে দুর্লভ মনীষার অবদান থেকে দেশের শাসনপাত্রদেরকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা বৃথা। এ- যুগে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিভাবকদেরকে নিন্দার কথা, ত্রুটির কথা, সত্য কথা এবং নতুন কথা শুনবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই জন্য তাদেরকে সহিষ্ণু, বিবেচক ও বিজ্ঞ হতে হবে। নইলে কায়েমী স্বার্থ ও সরকারি ক্ষমতা বারবার বিপন্নই হবে আর দুর্যোগ-দুর্দিন নেমে আসবে গণমানবের জীবনে এবং এর সবটাই অনভিপ্রেত ও অনর্থক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আজো দুনিয়ার প্রায় সব রাষ্ট্রেই তথাকথিত কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক, লেখক, ভাবুক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক অবাঞ্ছিত বক্তব্যের জন্যে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের অভিভাবকদের রোষাগ্নিতে পুড়ে মরছে। অথবা মনের কথা মনে চেপে রাখবার চেষ্টায়, বদ্ধ বেদনায়, বিবেকের দংশন-যন্ত্রণায় ছটফট করেছে। এক্ষেত্রে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ নেই। এখানে কাল স্তব্ধ, তাই কালান্তর নেই।

এভাবে কত না-বলা ভাব, চিন্তা, তত্ত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও বোধ হয়, সামগ্রিক হিসেবে বিশ্বমানবের কোনো সম্পদ হানি হয় না। হরণে-পূরণে পুষিয়ে যায়। যেমন কোনো কোনো দেশে কম্যুনিজম-বিরুদ্ধ কোনো কথা বলা চলে না, কোনো কোনো দেশে কেবল ধর্মশাস্ত্রানুগ কথাই বৈধ, কোনো কোনো দেশে কেবল পুঁজিবাদের মহিমাই কীর্তন করতে হয়, কোথাও জাতীয়তা, কোথাও আন্তর্জাতিকতা, কোথাও ভাববাদ, কোথাও নাস্তিক্যবাদ, কোথাও অস্তিত্ববাদ, কোথাও মানববাদ উৎসাহ পায়। কাজেই আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে মানুষের মানস-প্রয়োজন মিটে যায়।

কিন্তু বিড়ম্বিত হয় ব্যক্তি-মানুষ। যার বক্তব্য আছে, অথচ নির্যাতন সহ্য করবার সাহস নেই, সে হতভাগ্য অপ্রকাশের যন্ত্রণায় জ্বলে মরে। অসাফল্যের বেদনায় ভোগে, বিবেকের তাড়নায় অস্বস্তিবোধ করে। উপলব্ধ সত্য প্রকাশের যে আনন্দ, তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে বিঘ্নিত জীবনকে বৃথা ও ব্যর্থ বলে মানে। কী অসহ্য বিড়ম্বনা; বোধবুদ্ধির কী অমার্জনীয় অপচয়।

সব লেখক-ভাবুক-তাত্ত্বিকের স্বোপলব্ধ বক্তব্য থাকে না, তারা ধার-করা পুরোনো বুলির জাবর কাটে মাত্র। যে দু'একজন লোক দেশে নতুন কথা বলতে চায়, তাদেরকে বলার স্বাধীনতা দিলে দেশের ভাষা শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে সমৃদ্ধ হয় এবং দেশের মানুষও মানবিকবোধে, রুচি ও সংস্কৃতিতে উন্নত হয়। নতুন ভাবচিন্তা-অনুভবের উদ্ভব ও লালন ব্যতীত মনুষ্যত্ব ও মনুষ্যসভ্যতা বৃদ্ধি পায় না। আর এভাবে মনের ভুবন প্রসারিত না হলে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে সুষ্ঠু স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ থাকে অনায়ত্ত, অনাস্বাদিত। কেননা জীবনে উপভোগ তো দৈহিক নয়—মানসিক।

www.amarboi.com

বিকার ও প্রতিকার

যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করেছে এবং সময়ও বাঁচিয়ে দিয়েছে। অনেক অচিন্ত্য অসাধ্য কর্মকে সুসাধ্য করেছে। যন্ত্র মাত্রই জটিল। যন্ত্রের উৎকর্ষ বস্তুত জটিলতারই নামান্তর। যে-যন্ত্র বিস্ময়কর সব কর্ম সম্পাদনে সমর্থ, তার জটিলতা সাধারণের বোধাতীত। মনুষ্যসমাজও তেমনি যতই বিকাশের পথে এগিয়েছে ততই জটিলতর হয়েছে। বলতে গেলে রোজ জটিল হচ্ছে। তাতে মানুষ তাল মিলিয়ে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারছে না। তাই স্বচ্ছন্দ্যের সুর কেটে যাচ্ছে, বিপর্যয়ে বিশৃঙ্খলায় বেতালা-বেসুরো জীবনে কেউ আর সুখ পেতে কিংবা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছে না। পৃথিবীময় আজ তাই বিক্ষোভ-বিভ্রান্তি-বিদ্রোহ-বিপ্লব বিরাজ করেছে। সে সঙ্গে সব উপদ্রব প্রশমন-বিমোচন প্রয়াসেও মানুষ সদা সযত্ন। কিন্তু কুশল না হলে প্রয়াস সফল হয় না। যন্ত্রের নির্মাণে, প্রয়োগে ও শোধনে যেমন যন্ত্রবিদের পূর্ণপটুতা থাকা আবশ্যিক, তেমনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা বা দৃষ্টি থাকলেই আপেক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটা সুসমঞ্জস সমাজ বা রাষ্ট্র চালু রাখা সম্ভব।

যন্ত্রের যেমন ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব প্রত্যঙ্গই সমভাবে অপরিহার্য ও সমান গুরুত্বের, যে-কোনো একটির অনুপস্থিতি কিংবা অসামর্থ্য পুরো যন্ত্রটারই উপযোগ নষ্ট করে, তেমনি সমাজের অতি মূঢ় লোকটিরও অস্তিত্ব কিংবা গুরুত্ব অস্বীকার করলে সমাজদেহ হয় অসুস্থ, বিকলাঙ্গ হয় রাষ্ট্র। কাজেই যন্ত্রের যেমন একটি ছোট তার কিংবা 'নট' সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি সমাজের কোনো মানুষকেই অবহেলা করলে চলে না।

এ তত্ত্বটি এযুগের প্রতিবেশে সম্যক উপলব্ধি করতে হবে। আগের যুগে সরকার ছিল শাসক। এ-যুগে সরকার হচ্ছে সেবক। পূর্বে স্বৈরতন্ত্রের যুগে রাজ্যপতি ছিলেন প্রভু, একালে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন অভিভাবক। আগের দিনে নরপতি যথার্থই স্বামিত্বে স্বত্ববান ছিলেন, এযুগে রাষ্ট্রনায়ক তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। আগে নরপতিরা তাঁদের শাসন ও শোষণের অধিকারই স্বীকার করতেন, পালন ও পোষণের দায়িত্ব নিতেন না। রাজস্ব উসুলে নিশ্চয়তা লক্ষ্যেই কেবল রাজ্যসীমা সংরক্ষণে ও প্রজাকুলের নিরাপত্তা বিধানে সেকালের সরকার তৎপর থাকত। ব্যক্তিগত হৃদয়বানতার দরুন কিংবা পুণ্যার্জনের প্রেরণায় কোনো কোনো শাসক জনহিতকর কাজে কিংবা প্রতিষ্ঠানে অর্থব্যয় করে প্রজাদের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা অর্জন করতেন। এ কিন্তু কর্তব্য ছিল না, নিতান্ত দয়ার দান—দাক্ষিণ্য। আগে কেবল কর্তৃত্বই ছিল লক্ষ্য, এ-যুগে সেবার দায়িত্ব গ্রহণ ও কর্তব্যকরণ লক্ষ্যেই কর্তৃত্বের আসন লভ্য। আগে আনন্দ ছিল দণ্ডদানে ও মুণ্ড গ্রহণে। এখন দুঃখমোচনে ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেই নিহিত শাসকের গৌরব। পূর্বে প্রতাপ ও দাপট ছিল রাজার মূলধন। এখন প্রভাব ও জনপ্রিয়তাই হচ্ছে শাসকের পুঁজি। আগেকার রাজা ছিলেন প্রভু। রাজ্যশুদ্ধ লোক ছিল তাঁর সেবক ও শাসনপাত্র। এখনকার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন গৃহপতির মতোই একাধারে সেবক, পোষক, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনি শাসক নন—শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষক। আগে রাজ্য ছিল রাজার অর্জিত সম্পদ—একেবারে লাখরাজ মালিকানা ছিল তাঁরই। এখনকার রাষ্ট্র হচ্ছে সমবায় সংস্থা—রাষ্ট্রনায়ক তার প্রধান পরিচালক বা মহাধ্যক্ষ মাত্র। আগে রাজ্য রাজার ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল বলেই রাজা ছিলেন রাজ্যের ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মানসম্ভ্রম, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাস-ব্যসন, প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্যের প্রতীক ও প্রতিভূ। দেশের মানুষের কোনো পৃথক সত্তা ছিল না। সবকিছুই তাঁতে সংহত হয়ে, তাঁর রুচি-সংস্কৃতির ও খেয়াল-খুশির অবয়বে প্রতিবিম্বিত হত। তাইরাজার ঐশ্বর্যের, সুখের ও সংস্কৃতির মাপে রাজ্যের মানুষের সুখ-সম্পদ-সংস্কৃতির পরিমাপ হত। শুভঙ্করের এই ফাঁকির ফাঁক মানুষের দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে কয়েক হাজার বছর লেগেছে। একালেই মানুষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেমেছে। এই আত্মচেতনার প্রসূন হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবোধ—ব্যক্তিসত্তার সম-অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে চেতনা। এ চেতনাই সমাজে ও রাষ্ট্রে যুগান্তর ঘটিয়েছে—আগেকার সরল ও নিয়মবাঁধা জীবনের পরিক্রম পথ থেকে নিয়ে এ নবলব্ধ বুদ্ধি মানুষকে বহু ও বিচিত্র এবং বক্র ও বন্ধুর পথ-সমষ্টির কেন্দ্রে উপস্থিত করেছে। ব্যক্তি-মানুষ আজ দাসের আনুগত্য পরিহার করে মনিবের মাহাত্ম্য লাভে উৎসুক। সে হয়েছে স্ব-রাট, স্ব-অধীন। কাজেই শাসনের প্রভুসুলভ পদ্ধতি হয়েছে অচল-অকেজো। এ- যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকেই নিজে নিজের মনিব। তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার অঙ্গীকারের সহঅবস্থান ও সহযোগিতাই মানুষের কাম্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাধাও রয়েছে প্রবল। কেননা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-বোধিতে মানুষ সমভাবে এগোয়নি। আজকের দুনিয়ায় মানুষ অঞ্চল বিশেষে হাজার বছরে এগিয়ে ও পিছিয়ে রয়েছে একের সঙ্গে অপরের। আগেও এমনি ব্যবধান সমাজে অজ্ঞাত ছিল না। এরিস্টটল-প্ল্যাটো-সক্রেটিসের দেশে আদিম মানসের দাস থেকে নির্বোধ নিরক্ষর ধনী-মানীর অভাব ছিল না। কিন্তু তা তখন সমস্যা ছিল না লক্ষ-কোটি মূঢ়মূক জনের মধ্যে দু'চারজন পরিস্রুত বুদ্ধির মানুষ সমাজে বিপ্লব-বিপর্যয় ঘটাতে সমর্থ হতেন ক্বচিৎ। কাজেই সে-যুগে ঐ সচেতন মানুষগুলোই যুগোত্তর চিন্তা ও চেতনার জন্যে লাঞ্ছিত কিংবা নিহত হতেন।

সংস্কারপুষ্ট নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত গণমনের পাথুরে বিশ্বাসে ও নিশ্চিত জীবনরীতিতে কোনো বিচলন সহজে সম্ভব ছিল না। আসলে লাভের-লোভের বৈষয়িক জীবনে ছাড়া চিন্তাভাবনার জগতে সাধারণ মানুষ জড়-জীবনেই আসক্ত। এক্ষেত্রে তারা গড্ডলিকা-ধর্মী। ভাত-কাপড়ের বাস্তব প্রেরণায় বৈষয়িক জীবনে আবার প্রতি মানুষই স্বতন্ত্র ও আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও সুবিধা ছিল না। ইদানিং-পূর্ব যুগে মানুষ সর্বত্রই ক্রীতদাস ও ভূমিদাসরূপে জীবন কাটিয়েছে। রাজা ও তাঁর কয়েকশ সামন্ত নিয়েই ছিল free-society বা মুক্ত মানুষের সমাজ। এ যুগে যেমন কয়েক হাজার বেনে-বুদ্ধিজীবী হচ্ছে রাষ্ট্রের যথার্থ নাগরিক। আর সব তো অন্নদাস—হুকুম আর হুমকি শোনাই যাদের ললাট-লিপি। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার ফলে যন্ত্রনির্ভর জীবনের দ্রুত পরিবর্তন ও প্রসার ঘটেছে। নব নব আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে যান্ত্রিক জীবনের বাহ্য রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মানস- জগতেও বিপ্লব এসেছে। পূর্বকালে এমনটি সম্ভব ছিল না। সেকালে পাঁচশ-সাতশ বছরেও ব্যবহারিক জীবন ও জীবিকা পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য ছিল। তাই মানসজীবনেও পরিবর্তন ছিল নিতান্ত মন্থর। এত মন্থর যে প্রায় স্থিতিশীল বলা চলে। এই গতানুগতিক জীবনে সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিংবা আর্থিক কোনো সচেতন সমস্যা ছিল না। প্রকৃতি ও অদৃষ্টনির্ভর জীবনে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে অজ্ঞ অসহায় সাধারণ মানুষ সব যন্ত্রণায় ও বিপর্যয়ে আত্মপ্রবোধ খুঁজত। সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, আনন্দে-যন্ত্রণায়, শোকে-সৌভাগ্যে, আরামে-ব্যারামে, আত্মীয়-পড়শীর সাহায্য, সহযোগিতা ও সহানুভূতিই ছিল সম্বল।

এ যুগে জনসাধারণের মধ্যেও বিদ্যার বিস্তার হয়েছে, বিজ্ঞানের বদৌলত কলকারখানার প্রসারে মানুষের নগুরে জীবনের ঘটেছে ব্যাপ্তি। তাই ইতর-ভদ্র নির্বিশেষের মন জেগেছে স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও অধিকারবোধ। এ যুগে নিরক্ষর লোকে অনেক কিছুই শুনে শেখে, দেখে বোঝে এবং ঠেকে উপলব্ধি করে। তাই এ- যুগে মূঢ়-মূকের সংখ্যা কমেছে, বোধ-বুদ্ধির লোক বেড়েছে। সেজন্যে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছে প্রকট ও প্রবল। রাজ্য হয়েছে রাষ্ট্র। রাজার ধন-ভাণ্ডারও হয়েছে জাতীয় সম্পদ। শাসনদণ্ড হয়েছে জনসেবার দায়িত্ব, রাজার একাধিপত্যে ভাগ বসিয়েছে মানবাধিকার চেতনা। তাই পূর্বেকার নিয়মনীতি সব উল্টে পাল্টে গেছে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যারা মন তৈরি করতে পারেনি, আর যারা কালানুগবোধ অর্জন করেছে এবং যারা কালোত্তর চিন্তা ও দৃষ্টির দাবিদার—এই তিন শ্রেণীর লোকের সমবায়ে গঠিত সমাজ বা রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে তাই সব ব্যাপারে ঠোকাঠুকি লেগেই রয়েছে। এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়া মানুষেরা স্ব স্ব মনন ও দৃষ্টি নির্ভুলতার নিশ্চিত। তাই স্বপ্রতিষ্ঠার আপসহীন বিরামহীন সংগ্রাম চলেছে। হারজিতের এ- খেলায় আনন্দ-বেদনার আনুপাতিক হার যা-ই হোক, নিষ্ঠুরতা ও পীড়ন-প্রবণতা উপেক্ষণীয় নয়, অসহিষ্ণুতাই এর জন্যে মুখ্যত দায়ী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবের বৈচিত্র্য, মন ও মতের অনেকতা, স্বার্থের বিভিন্নতা এবং সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের পার্থক্য, মানুষের ঔদাসীন্য ও অনুরাগ, ঔদার্য ও সংকীর্ণতা, ক্রোধ ও তিতিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন থাকলে পরমতসহিষ্ণুতার অনুশীলন নেহাত কঠিন হত না। অবশ্য তেমন সংস্কৃতির মানস-পরিচর্যায় সুজন হবার বাসনা ক্বচিৎ কারো মনেই ঠাঁই পায়। আজো প্রায় সব মানুষই বাহুবলেই ভরসা রাখে। গায়ের জোরই তাদের কাছে খাঁটি জোর। সমাজের বা রাষ্ট্রের সব মানুষের পোষণ-তোষণের দায়িত্ব যার, তার রিপু-বশ্যতা অযোগ্যতা। তার আত্মরতি ও স্বশ্রেণী-প্রীতি অপরাধ। তার সামগ্রিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রয়োজন। কিন্তু তেমন মানুষ আজো বিরল। তাই রাষ্ট্রনায়ক কিংবা সমাজপতি সদিচ্ছা ও হিতৈষণা বশেও পরপীড়নে উৎসুক হন। সোহাগের সন্তানের কল্যাণার্থে প্রযুক্ত নিষ্ঠার শাসন পরিণামে সন্তানের অমঙ্গলই করে। এ-যুগের রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্র তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভুলে গেলে চলে না যে মানুষের মন বলে একটা চেতনা আছে এবং স্ব-লব্ধ একটি রুচিও রয়েছে; তাই সে প্রাণীমাত্র নয়, সেজন্যেই তাকে পোষা প্রাণীতে পরিণত করা চলে না—সে যন্ত্রও নয় যে তাকে অভিপ্রেত উপায়ে চালানো যাবে। এমনকি ম্যাশিনও পুরোনো হলে প্রাণ হারায়—অচল-অকেজো হয়। কাজেই কলুর বলদের মতো মানুষকে তার সম্মতি ব্যতিরেকে নিয়মের নিগড়ে বেঁধে চাকার মতো আবর্তিত করানো সম্ভব নয়। তাই কোনো একক মতবাদের খাঁচায় পুরে মানুষকে সযত্নে পোষার প্রয়াসও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ- কারণেই অর্ধশতাব্দ পরেও রাশিয়ার মানুষ সাম্যবাদে অভ্যস্ত হয়নি, বিশ বছর পরেও চীনদেশের মানুষকে সতর্ক পাহারায় রাখতে হয়। অথচ সব মানুষের ভাত-কাপড় যোগানোর এরচেয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থা আজো কল্পনাতীত। মন আছে বলেই মানুষ জীব মাত্র নয়। এ মন এক বিচিত্র অস্তিত্ব। তার মেজাজ বন্ধনভীরু। সে মঙ্গলের চেয়ে মুক্তিকেই পছন্দ করে বেশি। তার প্রয়োজন-চেতনার চাইতে বিলাস-বাঞ্ছাই অধিক। তাই কোনো সৎকথা, কোনো মহৎ ভাব, কোনো কল্যাণ সম্ভাবনা তাকে আশ্বস্ত ও আকৃষ্ট করে না; সে কেবল চঞ্চল শিশুর মতো বিচরণশীল। খেয়ালি শিবের মতো তার কাছেও শ্মশান-উদ্যান সমতুল্য। সম্পদ যেমন মানুষকে ভোগলিপ্সু করে, তেমনি জ্ঞান-বুদ্ধি ঋদ্ধ মনও ক্রমেই যেন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে। আগের অজ্ঞমনে যেটুকু সংযম ছিল, এ- যুগের বিজ্ঞমনে তা যেন আর ঠাঁই পায় না। মরীচিকা-প্রীতি যেন মনকে পেয়ে বসেছে। তাই কাম্য-সম্পদ ও বাঞ্ছিত ব্যবস্থা আয়ত্তে এলেই তাতে আকর্ষণ হারিয়ে মন নতুন কিছুর জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিছুই যেন মনের মর্জিমতো হয় না। প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সর্দারতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গুরুতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র, গণতন্ত্র,— কত তন্ত্রই না হল, কোনো কিছুতেই মনের সাধ মিটল না। মনের এই চারিত্র হয়তো অবচেতনভাবে আদিমসমাজেও অনুভূত হয়েছিল, সেজন্যই হয়তো লাঠ্যৌষধিই মনের মালিক মানুষকে শায়েস্তা রাখার একমাত্র ফলপ্রসূ উপায়রূপে আজো বিবেচিত। এ জন্যই ব্যক্তির সীমিত স্বাতন্ত্র্যস্বীকৃতি পেলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা আজো অস্বীকৃত।

এ প্রসঙ্গে মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত শ্রেণীর কথাও স্মরণ করতে হয়। এ যুগের সব সমস্যার মূলে রয়েছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, উচ্চবিত্তের লোকেরা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায় নীচের দিকে এবং নিঃস্ব লোকেরা ঈর্ষার চোখে তাকায় উপরদিকে, আর মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকেরা তাকায় কখনো ঈর্ষার দৃষ্টিতে উপরদিকে এবং কখনোবা ঘৃণার চোখে নীচের দিকে। সমাজে তাদের অবস্থান হচ্ছে মধ্যস্থলে। তারাই উচ্চবিত্ত ও বিত্তহীনদের মধ্যে যোগসূত্র। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্পর্কে তাদের বড় ছোট সর্বস্তরে সমান ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাধ গতি। তারা উভয়স্তরের লোকেরই আত্মীয় ও স্বজন। কেননা উচ্চবিত্তের পতনে এবং নিম্নবিত্তের বা বিত্তহীনের উত্থানে গড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত সমাজ। উচ্চবিত্তে উত্তরণ লক্ষ্যেই মধ্য ও নিম্নবিত্ত থেকে তাদের যাত্রা শুরু। তারা উচ্চাভিলাষী এবং উচ্চবিত্তের লোকের প্রতিযোগী আর নিম্নবিত্তের লোকের প্রতিদ্বন্দ্বী। কেননা তাদের কাছেও শোষণ ও বঞ্চনাই অভীষ্ট সিদ্ধির সোপান। সংখ্যার দিক দিয়েও তারা মাঝারি। উচ্চবিত্তেরা হচ্ছে সংখ্যালঘু আর নিম্ন ও নিঃস্ববিত্তেরা হচ্ছে সংখ্যাগুরু। আবার উচ্চবিত্তের লোকেরা যেমন মধ্যবিত্তের সহায়তায় স্বস্থানে সুস্থির থাকতে প্রয়াসী তেমনি নিম্ন নিঃস্ববিত্তেরাও তাদের সাহায্যেই উঠতে চায়। তাই মধ্যবিত্তের ভূমিকা হচ্ছে অনেকটা গ্রাম্য-টাউটের মতো। সব কাজের তারাই কাজি। তারা সাপ হয়ে কামড়ায় আর ওঝা হয়ে ঝাড়ে। তাদের স্বভাবও হচ্ছে কূর্মের মতো। তারা সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী। কচ্ছপের মতোই তারা গা বাঁচিয়ে চলতে পটু। সুবিধামতো মাথা তোলে আর বিপদ দেখলে মাথা লুকায়। সুযোগমতো এগিয়ে আসা, আর দুর্যোগে পিছিয়ে যাওয়াই তাদের নীতি। অথচ নতুন ভাবচিন্তা ও মত-আদর্শ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস তারাই যোগায়। আন্দোলন-বিক্ষোভ-বিদ্রোহ-বিপ্লব তারাই শুরু করে। তারপর লেলিয়ে দিয়ে ও লাগিয়ে দিয়ে তারা সরে পড়ে। লাভের লোভেই তারা উস্কানি-উত্তেজনা দানে উৎসুক, তাই ক্ষতির ক্ষেত্রে তারা সবসময়েই অনুপস্থিত। মধ্যবিত্তরা শুধু স্বার্থপর নয়, স্বার্থবাজও। তারা কোঁদলের নারদ। লড়াইয়ের সমজদার কিন্তু লড়িয়ে নয়। 'মধ্যবিত্ত'—এই পরিচয়ের মধ্যেও একটা ফাঁকির ফাঁক রয়ে গেছে। চাকুরি মজুরি না করেও যে ভাত-কাপড়ের অভাবে পড়ে না, অন্য কথায় যে ধারেও না, ধারায়ও না' তেমন আর্থিক অবস্থার লোকই যথার্থ মধ্যবিত্ত। কিন্তু আত্মসম্মান রক্ষার ও মর্যাদা বৃদ্ধির অপবুদ্ধিবশে বিত্তহীন সাক্ষর তথাকথিত ভদ্রলোক মাত্রই মধ্যবিত্ত বলে আত্মপরিচয় দিতে অভ্যস্ত। মনে-মনে কাঙাল ব্যক্তিরাই মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। যার আকাঙ্ক্ষা আছে, অথচ আকাঙ্ক্ষ পূর্তির সামর্থ্য নেই, তেমন মানুষ চরিত্র রক্ষা কর চলতে পারে না। ছল-চাতুরী ও অন্যায় অসত্যের বক্র ও গুপ্ত পথে তাকে অভীষ্ট-সিদ্ধি করতে হয়। এবং যা নেই তা চায় বটে, যা আছে তা হারানোর ঝুঁকি নেওয়াও সঙ্গত কারণেই তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সময়মতো যঃ পলায়তি সঃ জীবতি-ই তার নীতি। এ কারণেই বিপদের মুখে সে সবসময়েই বিশ্বাসঘাতক পলাতক। অভাবের যন্ত্রণা, উচ্চাভিলাষ, লিপ্সা ও অসুয়াই মধ্যবিত্ত মনে চাঞ্চল্য জাগায়। তবু সমগ্র সমাজ বা শ্রেণীর স্বার্থে সব বিষয়ী মানুষ চিন্তাভাবনা করে না, কথাও বলে না। কেবল কেউ কেউ চিন্তা করে, কেউ কেউ কথা বলে, স্বার্থের অনুকূল হলে অন্যেরা ছুটে যায়—হৈচৈ করে—এর নামই জনমত, গণ-আন্দোলন, অথবা বিদ্রোহ কিংবা বিপ্লব। কাজেই সমাজ থেকে শ্রেণীচেতনার বিলোপ প্রয়োজন। অবশ্য শ্রেণীহীন হলেই অর্থাৎ আর্থিক বৈষম্যের ব্যবধান বিদূরিত হলেই যে শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করবে তা নয়, তবে অন্য ব্যাপারে মতান্তর কিংবা মনান্তর কখনো তেমন প্রাণবিনাশী তীব্রতায় আত্মপ্রকাশ করবে না। দার্শনিক মতবাদের পার্থক্যের মতো অন্যক্ষেত্রেও মতানৈক্য তেমন দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টি করবে না। কেননা অর্থসম্পদ ব্যতীত অন্য প্রায় সবকিছুই জীবনে গৌণ প্রয়োজন মিটায় মাত্র। সেসব চাহিদা যেমন লঘু, তার প্রাপ্তির প্রয়াস-প্রেরণাও তেমনি মৃদু মন্দ—রক্তে-আগুনে প্রলয় ঘটানোর মতো আবেগের তীব্রতা ও অমোঘতা তাতে অনুপস্থিত। তার পরেও অবশ্য ঈর্ষা-অসূয়া, মান-যশ, জেদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ও প্রেরণা থেকে যায়। এসব ব্যক্তিক উপসর্গ ও ব্যক্তির প্রভাবে প্রতাপে সমাজে রাষ্ট্রে উপদ্রব-উপপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ। আগেকার যুগে palace intrigue হত এ কারণেই। যৌথজীবনে দলাদলিও হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্যেই। অবশ্য তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে নৈরাশ্যের নিশ্বাস ছাড়লেই চলে না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কথায় বলে—যেখানে মুশকিল সেখানেই আহসান। আল্লাহও বলেছেন—সব মুশকিলেরই আহসান আছে। কাজেই ভেবেচিন্তে সমাধানের নতুন নতুন উপায়, নবনব পদ্ধতি—আবিষ্কার করতে হবে। আমরা আশাবাদী। মানুষের মনীষায় ও সৌজন্যে আমরা আস্থা রাখি। তাই আস্তিক্য বুদ্ধির আশ্বাসে আস্থা রেখে বলা চলে—একপ্রকারের সামাজিক চুক্তিতে মানুষের দুরন্ত মনও বুঝ মানবে। যেমনটি আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক-জীবনে একপ্রকার নৈতিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি পাষণ্ড-পামরকেও কিছুটা নীতিনিষ্ঠ রাখে, আমাদের আর্থিক-রাষ্ট্রিক জীবনেও তেমন নৈতিক চেতনা আমাদের নীতিনিষ্ঠ রাখবে। কিন্তু তার আগে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শ্রেণীচেতনা বিলোপে মানুষের সমসুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। একটা স্বীকৃতমানের শিক্ষা, আর্থিক সঙ্গতি, সামাজিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ, বাক-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার মানুষকে অসূয়ামুক্ত ও পরমতসহিষ্ণু করে তুলবে। জাতবর্ণ-ধর্মের বিভেদ-চেতনা মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানগত উত্তম্মন্যতা কিংবা হীনম্মন্যতার কারণও অপসারিত করতে হবে। এভাবেই মানুষের মিলন-ময়দান তৈরি হবে। সর্বপ্রকার বিভেদ ও ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হবে। তাহলেই যে-কোনো অভাব-অভিযোগ কিংবা পরিবর্তন-বাঞ্ছা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাক-বিতর্কের মাধ্যমে গণমতের সমর্থনযোগে অভিব্যক্ত হবে। এবং গণমতের সম্মান ও সার্বভৌমত্ব অবশ্য স্বীকার্য হবে। মানুষের মন ও মত চিরস্থায়ী নয় এবং অভিজ্ঞতা ব্যতীত কল্যাণ-অকল্যাণ,সুবিধা-অসুবিধার তাত্ত্বিক ধারণাও কেজো নয়, কাজেই বাস্তব পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো মত, আদর্শ ও ব্যবস্থার গুনাগুণ যাচাই করা উচিত। কাজেই গ্রহণ-বর্জনের সহজ সামর্থ্য ও সদিচ্ছা থাকা দরকার। একগুয়েমির অশুভ ফল পৃথিবী অনেক ভোগ করেছে; সে- পথ পরিহার করাই শ্রেয়। ঠেকে আর ঠকেই মানুষ অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ হয়। কাজেই ঠেকবার ও ঠকবার মানস-প্রস্তুতি থাকা চাই। ক্ষতির ঝুঁকি এড়িয়ে লাভ করবার লোভ মানুষকে জুয়াড়ির ভাগ্যই দান করে। তাছাড়া মানুষ যদি আইনের সম্মান রাখতে শেখে আর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সদাচারী হয় অর্থাৎ অসত্য ও অন্যায়ের প্রতি বীতরাগ হয়, তাহলে লোভ ও অসূয়ামুক্ত বিবেকবান মানুষের সংখ্যাধিক্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন স্বস্তিকর হয়ে উঠবে। অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে মানুষের মানবতাবোধ ও মানববাদী চেতনার বিকাশের উপর। মানব-বাদী না হলে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের আপেক্ষিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব-চেতনা জাগে না। একটা সামগ্রিক দৃষ্টি না হলে সমাজগত ও রাষ্ট্রায়ত জীবনের সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা, মুশকিল ও আহসান, ভয় ও আশ্বাস সম্বন্ধে ধারণা লাভ সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনেও তেমনি মানুষের প্রীতি ও শুভেচ্ছার মতো খাঁটি সম্পদ, সার্থক সঞ্চয়, অক্ষয় পুঁজি ও নির্ভরযোগ্য পাথেয় আর কিছুই নেই। এই প্রীতির পরিচর্যা ও শুভেচ্ছার অনুশীলনই মানুষকে মানববাদী করে। দেশে দেশে মানববাদীরা সংখ্যাগুরু হয়ে না উঠলে আজকের মানবিক সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক উপদ্রব ও রাজনৈতিক উপসর্গ

দুষ্ট দুরন্ত শিশুর চঞ্চলতায় যেমন গৃহবাসীরা উদ্ব্যস্ত, রোগাটে শিশুর বিরক্তিকর মেজাজ ও কান্নায় মা-বোনেরা যেমন উত্ত্যক্ত, মানুষ নিয়েও সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসক-অভিভাব করা তেমনি চির উদ্বিগ্ন। তাদেরকেও নিয়মনীতির শাসনে রাখা চিরকাল দুঃসাধ্য। নিয়মকরা চায় তাদেরকে গড্ডলিকার শৃঙ্খলা দান করতে, আর মানুষ চায় বেঙের মতো যথেচ্ছাচারী হতে। কেউ কারো কাছে হার মানে না। তাই আদিকাল থেকেই যৌথ জীবনকামী মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে স্ব স্ব অভিপ্রায় পূরণের প্রয়াসে অক্লান্ত। হিতৈষী অভিভাবকরা চায় মানুষ সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, সৎ, স্নেহময়, প্রীতিবান, দায়িত্বসচেতন, কর্তব্যপরায়ণ, বিবেকবান, পরোপকারী প্রভৃতি হয়ে সব দৈবগুণের আধার হোক। আর মানুষের প্রবণতা হচ্ছে মিথ্যাচারে, অন্যায়ে, অসততায়, নিষ্ঠুরতায়, শত্রুতায়, দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলায়, পরস্বাপহরণে, বিবেকদ্রোহিতায় ও সর্বপ্রকার রিপু-বশ্যতায়। মনুষ্যাবয়বে এক-একটি শয়তান যেন! কিন্তু গৃহপতি, সমাজনেতা ও রাষ্ট্রপতির তো উদাসীন থাকলে সমাজ-সংসার চলে না। তাই ব্যর্থতার পরওয়া না- করেই তারা শয়তান ও শয়তানীকে শাসনে-প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ানোর ব্রতে ও সংকল্পে উৎসর্গিত জীবন। বিজ্ঞলোকেরা স্বভাবের কথা বলে বটে, কিন্তু কারো স্বভাব সহ্য করতে চায় না। কারণ গরজ বড় বালাই। মানুষের স্বভাবকে সম্মান করলে পারিবারিক ঐক্য, সামাজিক সংহতি ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই জোর-জবরদস্তি করে সবাইকে অভিভাবক-তত্ত্বাবধায়কের স্বমতের অনুগত করতে হয়। এরই নাম নিয়মনীতির শাসন।

কিন্তু এক্ষেত্রে পুরো সাফল্য অসম্ভব। তাই ভালোর সঙ্গে মন্দের, গুণের সঙ্গে দোষের, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, উপকারের সঙ্গে অপকারের, কোমলতার সঙ্গে কঠোরতার, প্রীতির সাথে অসূয়ার, স্নেহের সাথে ঘৃণার, মৈত্রীর সাথে বৈরের, পোষণের সাথে পীড়নের, ভরসার সাথে ভয়ের, করুণার সাথে নিষ্ঠুরতার, কর্তব্যের সাথে ঔদাসীন্যের, সাম্যের সাথে বৈষম্যের, রাগের সাথে বিরাগের, পোষণের সাথে শোষণের, সোহাগের সাথে শাসনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত মনুষ্যসৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকেই চলে আসছে। ধমকে-পীড়নে যদিবা কমেছে, কঠোর শাসনে দমেছে—নির্মূল হয়নি কখনো। কেননা এসব মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সংপৃক্ততার সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি প্রসূত। তার অস্তিত্ববিলোপ না করলে তার বৃত্তি-প্রবৃত্তির—প্রাণধর্মের বা জৈব স্বভাবের এসব বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা যাবে না। নির্মূল না করে যেমন বৃক্ষের বাড়-বিকাশ বন্ধ করা অসম্ভব।

জীবজগতে মানুষ দুটো হাতের বদৌলত আঙ্গিক শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মেই অন্য প্রাণীর জীবন মুখ-নির্ভর, তাই জীবিকার ক্ষেত্রে সে যৌথজীবনের গরজবোধ করে না। সে স্বনির্ভর। মানুষ কিন্তু হস্তনির্ভর। তাই পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবিকা সংস্থান তার পক্ষে সহজ। এ জন্য যৌথ জীবন তার কাম্য, এবং যৌথজীবনের ভিত্তিই হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়া। অর্থাৎ পারস্পরিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে চুক্তি হয়েছে আবশ্যিক। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

চুক্তি মানা ও ভাঙার নামই হচ্ছে দোষগুণ, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উপকার-অপকার, কতৃজ্ঞতা-কৃতঘ্নতা প্রভৃতি। প্রকৃতির জগতে এই সহযোগিতামূলক যৌথ জীবনটাই কৃত্রিম—জৈব-স্বভাবের ব্যতিক্রম।

তাই কৃত্রিমতার অনুশীলনই হচ্ছে মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা। এইজন্যই স্বভাবকে তার দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং বরণ করতে হয় 'বাঁচো ও বাঁচতে দাও"–নীতি। যুগে-যুগে বহু মানুষের চিন্তা-ভাবনা-প্রয়াসের ফলে রচিত হয়েছে নিয়মনীতি, বিধিনিষেধ—সবটাই পারস্পারিক ব্যবহার-নীতি। এই আচরণ বিধি-ব্যবস্থার তিন শাখা—শাস্ত্রবিধি, সমাজবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। প্রথমটা লঙ্ঘন পাপ (Sin), দ্বিতীয়টার অবহেলা নিন্দনীয় (Vice) এবং তৃতীয়-টার ব্যতিক্রম অপরাধ (Crime)। পারত্রিক ভয়, সামাজিক ভয় এবং রাষ্ট্রিক ভয়ও কিন্তু মানুষকে আশানুরূপ শায়েস্তা রাখতে পারেনি। শাস্তি এড়িয়ে অপরাধ করার প্রবণতায় আজো বিশেষ হ্রাস-বৃদ্ধি দুর্লক্ষ্য। সেদিক দিয়ে সব নিয়ম-শাসন, স্বভাব-নিয়ন্ত্রণের সব ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ প্রবল মাত্রই আত্মপ্রসারকামী এবং আত্মসাৎ করেই আত্মবিস্তার সম্ভব। তাই প্রবল দুরাত্মা হয় এবং দুর্বলের উপর কমবেশি দৌরাত্ম্য করে। এজন্যেই সমাজ জালিম-জুলুমবিহীন নয়। কৃত্রিম জীবনযাত্রার প্রেরণায় মানুষ নিজেদের বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্রমে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করেছে। সে আজ আকাশ ও পৃথিবীর মালিক। অন্য জীব-উদ্ভিদের জীবন প্রকৃতির অনুগত এবং প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। মানুষই কেবল প্রকৃতিকে তাঁর জীবন-জীবিকার অনুগত করেছে। তা সম্ভব হয়েছে তাঁর যৌথ জীবনের বদৌলতে। এবং স্ব-ভাবকে সংযত রাখাই হচ্ছে জীবনে যূথবদ্ধ তথা সমাজ-সদস্য হওয়ার প্রথম শর্ত। কারণ এ হচ্ছে দেয়া-নেয়ার কারবারের শরিক হওয়া। কিন্তু মানুষ এত সুশীল নয়। যে শক্তিমান, সে আত্মপ্রসারের প্রয়োজনে এবং যে দুস্থ সে আত্মরক্ষার তাগিদে পরস্বে লোভ করবে, অপরের অধিকারে হাত বাড়াবে। কাজেই মানুষের অভিভাবক, তত্ত্ববধায়ক; শাসক, সমাজপতি ও ধর্মনেতার শিরঃপীড়া আজো প্রবল। সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র তাই বলে হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে নেই। মনুষ্যবাহী জীবন-নৌকা বিদ্রোহ-বিশৃংখলার উর্মিমুখর ভবসমুদ্রে সে ভাসিয়ে রাখবেই–কেননা বাঁচাবার এ প্রেরণা বাঁচার আগ্রহপ্রসৃত। মানুষের সামাজিক আচরণ-যে চিরকাল অবিবর্তিতই রয়েছে তার সাক্ষ্য মেলে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার বেদে-বাইবেলে। প্রমাণ রয়েছে
তিন হাজার বছরের পুরোনো সাহিত্যে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে চলতি কথায় 'কুত্তার লেজ'—সংশোধনের বাইরে। সুযোগ-সুবিধেমতো তা আদি অকৃত্রিমরূপে প্রকটিত হয়। তবু ধর্মবেত্তা সমাজতত্ত্ববিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী প্রয়োজনের প্রেরণায় আশা নিয়ে অনিশ্চিতে পা বাড়ায় নতুন উপায়ের সন্ধানে। আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে দুনিয়ায় কত অসম্ভব সম্ভব হল, কত কল্পনা বাস্তব হল, কত স্বপ্ন সত্য হল; এ ব্যাপারেই কিছু করা যাবে না, কেন? মনুষ্যবুদ্ধির এই আশ্বাসে আস্থা রেখে আজকের দুনিয়ার সর্বত্র তত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, সমাজবিদ, ধর্মবিদ, রাষ্ট্রবিদ, বিজ্ঞানবিদ, দর্শনবিদ, শিক্ষাবিদ, মনঃবিদ, অর্থবিদ প্রভৃতি যত যত বিদ আছেন সবাই লেগে গেছেন উপায় উদ্ভাবনের কাজে। মাথা ঘামাচ্ছেন সবাই। এবং কাজও শুরু করেছেন গোড়া থেকেই। শিশু-বালক-কিশোর দিয়েই তারা সমাজের বাঞ্ছিত ভিত তৈরি করবেন। কারণ উপদ্রব তো এদের থেকেই হয় শুরু। ওরাই হচ্ছে প্রতিবাদী শক্তি। যাকে বলে Nipping in the bud কলিতে ডলে দেয়া বা অঙ্কুরে বিনষ্ট করা। তাঁরা সেই নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার মাধ্যমে অভিপ্রেত মানুষ তৈরির চেষ্টায় নিরত হয়েছেন। সে মানুষ সুশৃঙ্খল গড্ডলিকা, সুশীল পোষা প্রাণী কিংবা অন্তত যান্ত্রিক জীব হওয়া চাই—যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসন ও পোষণ করা যায়। নিদান বের করবার আগে কার্যের লক্ষণ বিশ্লেষণ করে কারণ জানতে হয়। কাজেই চলল অনুসন্ধান ও গবেষণা, কেউ দেখলেন পাঠ্যবিষয়ই দায়ী, কেউ বুঝলেন শিক্ষকই এর মূলে, কেউ বললেন এ ছাত্রের দারিদ্র্য-দোষ, কেউ জানলেন পারিবারিক পরিবেশেই গলদ, কেউ শুনলেন ধর্মশাস্ত্রে অজ্ঞতাই সর্বনাশের গোড়ায়, কেউ ভাবলেন কুরুচিপূর্ণ নাচ-গান-সিনেমার বাহুল্যই দায়ী। কেউবা মনে করলেন খেলাধূলা আমোদ ব্যায়ামের অব্যবস্থার দরুন এ ঘটছে। কেউ মানলেন শিক্ষিত যুবকের বেকারত্বই কারণ। এবারে নিদানের পালা, কেউ বলেন পাঠ্যবিষয় বদলাও কারো মতে Recreation-এর ব্যবস্থা দরকার, কেউ বলেন শাস্ত্র শিক্ষা দাও, কেউ চান বৃত্তিমূলক শিক্ষা। কারো কাছে মানববিদ্যার গুরুত্ব বেশি, কারো মতে বিজ্ঞান হচ্ছে মুক্তির পথ, কেউ বোঝেন প্রকৌশল-বিদ্যাই যুগের যন্ত্রণা ঘোচাবে, কারো ধারণায় ছাত্রবৃত্তিই সমাধান, কেউ বলেন স্কুলে স্কুলে ছাত্র কমাও, কেউ বলেন নীতিশিক্ষা দেয়া হোক, কারো মতে শিক্ষক বাছাই করা দরকার, কেউ বলেন ছাত্রের পারিবারিক প্রতিবেশ দোষমুক্ত হওয়া চাই। কারো ধারণায় এ যুগের হাওয়া—কাজেই অভিভাবকদের নৈতিক জীবন শোধন প্রয়োজন, কেউ বলেন ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হতে হবে, কারো অভিমত—ছাত্রের উপর স্কুলের নয়, বাড়ির প্রভাবই কার্যকর, কেউ বলেন সঙ্গদোষ সব গলদের মূলে, কাজেই নির্বিচার মেলামেশা বারণ করা দরকার। কেউ চান ঘরে-বাইরে কড়া শাসন। এমনি কত রকমের পরামর্শ মেলে। মনে হয় জীববিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির যৌথ প্রয়োগে তৃণভোজী বাঞ্ছিত জীব তৈরি করা সম্ভব।

মানুষের অধ্যবসায়ও কম নয়। সবটাই পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কিন্তু ফল রয়েছে পূর্ববৎ। একই ঘর পাঁচ সন্তান পাঁচ রিপুর দাস হচ্ছে, একই শ্রেণীতে ভালো মন্দ-মাঝারি স্বভাব প্রকট হয়, একই শিক্ষককে কেউ পছন্দ করে, কেউ করে না; টোলমাদ্রাসায় পড়েও খল-দুষ্ট হয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন কিংবা মানববিদ্যা অর্জন না করেও সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হচ্ছে। দরিদ্রও নির্লোভ হয়, ধনী সন্তানও অর্থলোভী থাকে। অসাধু ঘুষখোরের সন্তান সততায় অনন্য হয়। ধার্মিকের সন্তান চোর-লম্পট-মিথ্যাবাদী হচ্ছে। এক শয্যার সাথী অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর একজন মিলাদে অপরজন সিনেমায় যাচ্ছে—এমন নজির দুর্লভ নয়। সহোদর ভাইরা একই পরিবেশে মানুষ হয়, তবু কারো আত্মসম্মানবোধ তীক্ষ্ণ, কেউবা বেহায়ার চরম।

শেখে বলেই শিক্ষা; যা জানে তা জ্ঞান, বোধের বিকাশে জন্মে বুদ্ধি। এগুলোর সঙ্গে মানবস্বভাবের সম্পর্ক কী এবং কতটুকু! শিখতে চাইলেই শিক্ষা হয়, জিজ্ঞাসু হলেই জ্ঞান পায়, চিন্তা করলেই বুদ্ধি বাড়ে। মনোযোগ দিলেই একাগ্র চিন্তায় প্রজ্ঞা দুর্লভ নয়। বিদ্যা অর্জন করলেই বিদ্বান হয়, কিন্তু এতে স্বভাব-চরিত্র ভালোমন্দ হওয়ার কারণ ঘটে না। এ যুগে সমস্যা তো শিক্ষিত মানুষের চরিত্রহীনতার সমস্যা। সেকি অজ্ঞতার ফল, নির্বোধের অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞাত পাপ? ছল-চাতুরী,বঞ্চনা, প্রতারণা, জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ, অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, ঈর্ষা, অসূয়া, আত্মরতি, রিরংসা, প্রভৃতি যুগের সামাজিক যন্ত্রণার জন্য শিক্ষিত মানুষই তো দায়ী। অতএব বিদ্যাতে বুদ্ধি বাড়ে, চরিত্র গড়ে না। বিদ্যার প্রভাব বিষয়কর্মের নৈপুণ্যে, মন-মেজাজের নিয়ন্ত্রণে নয়। বিদ্যা যেন তরল পদার্থ, যে- আধারে প্রবিষ্ট হয়, সে আধারের রূপ পায়, অথবা তা সুলেমানী অঙ্গুরী—মালিকের অভীষ্ট সিদ্ধির সহায়ক মাত্র। মানুষ বিদ্যার অনুগত হয় না, বিদ্যাকে অনুগত করে উদ্দেশ্য সাধনে কাজে লাগায়। এজন্যই জ্ঞান শক্তি,—চরিত্র নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশিক্ষিত মানুষের মন বিশ্বাস-সংস্কার ও ভয়-ভরসা পুষ্ট বলে তারা আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক প্রভৃতি নানা শক্তির লীলা জীবনে ও প্রকৃতিতে অনুভব করে। সেই অলৌকিক শক্তিসমূহের রাগ-বিরাগ, কুদৃষ্টি-সুদৃষ্টি, শাপ-বর প্রভৃতির ভয়-ভরসায় জড়িত তাদের জীবন ও জীবিকা। তাই অমঙ্গলের আশঙ্কায় তারা সহজে পাপে-অপকর্মে মন দেয় না।

আফ্রো-এশিয়ায় কিশোর-তরুণগুলো রাজনৈতিক উপসর্গ আর য়ুরোপ-আমেরিকায় তারা প্রমূর্ত সামাজিক উপদ্রব। কারণ তারা প্রতিবাদী। তাই দুনিয়াশুদ্ধ লোক ছাত্র-তরুণ সমস্যায় বিব্রত। যেখানে বয়স্ক লোকেরা স্বার্থ বশে সর্বপ্রকার দুর্নীতিপরায়ণ, সরকারগুলো জনকল্যাণের নামে সত্য গোপনে ও মিথ্যা প্রচারে সদানিরত, দেশের ও দশের প্রয়োজনে সেবা ও সুশাসনের নামে ক্ষমতার লীলা প্রদর্শনে সদা উৎসুক, যেখানে ন্যায়-অন্যায় প্রবলের স্বার্থে নির্ণিত হয়, গায়ের জোরকে যুক্তি হিসেবে চালানোই যেখানে রেওয়াজ, সেখানে যুব-সমস্যাকেই সব দুঃখ-দুর্দশার আকর বলে আত্মদোষ গোপন রাখার একমাত্র উপায়। নইলে দু-চার হাজার টাকা বেতনের চাকুরে যদি উপরি গ্রহণ করেও সমাজে সম্মান পায়, তবে ছাত্ররাও দশ নম্বর বেশি পাওয়ার আশায় নকল করলে নিন্দা পাবে কেন? "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়!"

বলেছি মানুষের স্বভাব নির্মূল করা সম্ভব নয় ; কেবল সংযত করাই প্রয়োজন। কিন্তু তা আদেশে নির্দেশে উপদেশে পরামর্শে হওয়ার নয়, ধমকেও দীর্ঘদিন দমন রাখা যায় না। এর জন্য মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সুব্যবস্থা থাকা দরকার। মানুষের তো কথাই নেই, জীবমাত্রই স্বাচ্ছন্দ্যকামী। লোকজীবনে আর্থিক স্বাচ্ছল্য মাধ্যমে সেই স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিতে হবে। দুস্থজীবনে নৈতিক চেতনা তীব্র তীক্ষ্ণ রাখা সম্ভব নয়। কেননা ভাত-কাপড়-আশ্রয় সম্পর্কে মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। আর্থিক সাচ্ছল্য ও সম্পদের আনুপাতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলেই সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি শৃঙ্খলা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আসলে অনাড়ম্বর জীবনে মানুষের খাওয়া-পরার জন্যে চাহিদা সামান্যই। কিন্তু বড়াই-সুখ অনুভবের জন্য পড়শীর সঙ্গে ঈর্ষাকাতর মনের প্রতিযোগিতার স্পৃহাই মানুষকে চঞ্চল ও লোভী করে। কাড়াকাড়ির দম্ভ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাই মানুষের জীবনে প্রাত্যহিক হয়ে উঠেছে। অনন্য অন্তত সমকক্ষ হওয়ার গৌরব-গর্বে অধিকার লাভের জন্যেই মানুষ বৈষয়িক জীবনে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। যা নেই তার জন্যে মানুষের আকাঙ্ক্ষা নেই, যা অপ্রাপ্য তার অভাববোধও অনুপস্থিত। যেমন অকালে কেউ ফজলি আমের জন্যে হা-পিত্যেশ করে না। মৌসুমে তা ক্ষুধার খাদ্য বলেও কেউ মনে করে না। অন্যে খায়, তাই আমিও খেতে চাই, না- পেলে ঈর্ষ্যামনে ক্ষোভ জাগে, দীর্ঘশ্বাস বের হয়, বঞ্চিত বুকে অনির্দেশ্য বিদ্রোহ জাগে। সমাজবদ্ধ জীবনে পড়শী-পরিবেষ্টিত পরিবেশে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর প্রতিও নির্লিপ্ত উদাসীন থাকা জৈবধর্ম-বিরোধী। ঈর্ষ্যা মনের প্রতিযোগিতার প্রেরণাই নিত্য প্রয়োজনবোধ বৃদ্ধির কারণ। এ হচ্ছে জীবনে মানস-বিলাস। কিন্তু পুঁজিবাদী কিংবা বুর্জোয়া সমাজে মনস্তাত্ত্বিক কারণেই বিলাস-সামগ্রী বলে কিছুই নেই—সবটাই জীবনে অপরিহার্য। কেননা, সমাজে আর দশজনের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়, সেখানে সম্মান-শ্রদ্ধার আসন চাই, উপেক্ষিতের অপমান সহ্য করার মধ্যে কোনো মহৎ দর্শন নেই।

এসব নানা বিবেচনায় মনে হয় সমাজতন্ত্রই সামাজিক স্বস্তির, রাষ্ট্রিক শান্তির অধিক অনুকূল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধি

মানুষের স্বভাবেই রয়েছে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রসারের আকাঙ্ক্ষা। এ কারো চরিত্রে থাকে সুপ্ত আর কারো জীবনে হয় প্রকট। সক্ষম স্বজীবনেই স্বপ্রতিষ্ঠার আনন্দ উপভোগে উৎসুক। আর অলস অসমর্থ কাপুরুষ তা পরোক্ষ উপভোগের ব্যর্থ প্রয়াসে থাকে তুষ্ট। এই সচেতন বা অবচেতন বাঞ্ছার বেগ এত প্রবল যে কোনো যুক্তিবুদ্ধিই মোহগ্রস্তের মূঢ়তা ঘুচাতে পারে না। আত্মপরিচয়ের শূন্যতা তারা আত্মীয়পরিচয়ের মাধ্যমে পূর্ণ করতে আগ্রহী। স্বীয় রিক্ততা স্বজনের বিত্ত-মহিমায় ঢাকা দিয়েই তাদের তৃপ্তি। কাঙাল চিরকাল কল্পনা দিয়েই ঐশ্বর্যসুখ অনুভব করে। অসফল জীবনের অতৃপ্ত বাসনা পূর্তির এ এক বিকৃত পন্থা। অবুঝ মন এ আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে জেনেশুনে আত্মপ্রবোধ খোঁজে, এমনকি মূঢ়তার প্রাবল্যে আত্মপ্রসাদও লাভ করে।

অক্ষমের সান্ত্বনা লাভের এই আত্মপ্রতারণামূলক পন্থা শুধু ব্যক্তিক জীবনে নয়, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রিক বোধের মধ্যেও সংক্রমিত এবং স্বীকৃত। অসুস্থ মনের কোনো ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে স্বাস্থ্যের শ্রী থাকতে পারে না। আধির মতো রোগ নেই। শারীরিক ব্যাধির উপশম সম্ভব, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক আধির নিরাময় দুর্লক্ষ্য। অতীত যার অসাফল্যে ম্লান, বর্তমান যার নির্লক্ষ্য এবং ভবিষ্যৎ যার প্রত্যাশাশূন্য; সেই হতাশ, নিরাশ ও প্রত্যাশাহীন মানুষই এ আধির শিকার। সে মানুষ ব্যক্তি কিংবা গোটা সমাজ অথবা জাতি হতে পারে। নিজের বা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যে আস্থা না- থাকলেই এ রোগের উৎপত্তি হয়। এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় দুইভাবে— এক, অতীতমুখিতায় ও ঐতিহ্যগর্বে; দুই, পরনির্ভরশীলতায় ও পরমুখাপেক্ষিতায়। কুণ্ডয়নের মতো এ অনুভবের রোমন্থন-সুখে এ রোগের বিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটে। এ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি বা মৃত্যু। প্রত্যাশাবিহীন প্রয়াস অসম্ভব। তাই প্রত্যাশার প্রেরণাবিহীন মানুষ জড়তা ও জীর্ণতার শিকার। বহতা নদীই জীবনের তুলনা। স্রোতহীন জল আর আকাঙ্ক্ষাহীন জীবন—দুই ক্ষয়িষ্ণু ও জঞ্জালাক্রান্ত। জল হয় জীবাণু-দূষিত আর জীবন হয় সংস্কার-দুষ্ট। পৈতৃক ধনে যে ধনী, তার ধনের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই। স্বঅর্জিত ধনে মর্যাদা আছে, গৌরব আছে, আছে শ্রী।

জড়-জীর্ণ জীবনের পুঁজি হচ্ছে একটা আস্ফালন—'এখন আমার কিছু নেই বটে, কিন্তু আমার পিতৃপুরুষের কী না ছিল!' এদের গর্বোক্তি হচ্ছে— 'মড়া হাতিও লাখ টাকার' কিংবা নদী বুজে গেছে বটে কিন্তু রেখা তো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সে একদিন ছিল এবং তার রূপ ছিল, যৌবন ছিল, দাপট ছিল। অতএব চারদিকে যাদের দেখছ তারা হচ্ছে ভুঁইফোড়, আর আমরা হলাম বুনিয়াদি। অগ্রজের প্রাপ্য সম্মান অস্বীকার করা অর্বাচীনের কৃতঘ্নতা ছাড়া কিছুই নয়।'এর পাল্টা যে-যুক্তি চালু রয়েছে, তাতে তারা কান বা মন দেয় না। সে-যুক্তি হচ্ছে—'স্বনামা পুরুষ ধন্য পিতৃনাম্না চ মধ্যম' এবং চলতি তর্জমা হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপের নামে আধা
দাদার নামে গাধা
নিজের নামে শাহ্‌জাদা।

এর একটি মেয়েলি ছড়াও রয়েছে ঃ

বাপ রাজা তো—রাজার ঝি
ভাই রাজা তো—আমার কী!
স্বামী রাজা তো—বুজরগি।

এ হল অবশ্য সুস্থমনের অভিব্যক্তি। আর আগের যুক্তি হচ্ছে অক্ষমের অবলম্বন। আত্মবিশ্বাসে ও আত্মশক্তিতেই আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব—আত্মীয়নির্ভরতায় কিংবা জ্ঞাতি-কৃতিতে নয়। পর গললগ্ন মাত্রই পরের গলগ্রহ। অযোগ্য ও নিঃস্বলোক যোগ্য ও ধনবান আত্মীয়ের গৌরবে গর্ববোধ করে ও তাদের পরিচয়ে সম্মানিত হতে চায়, কিন্তু সেই যোগ্য ও ধনী আত্মীয় অযোগ্য স্বজনদের অবজ্ঞা করে এবং পরিচয়দানে সংকোচ বোধ করে। এ অযোগ্যদের অজানা নয়। কিন্তু যে ধনে-মনে কাঙাল তার অভিমান করলে চলে না, এ ব্যাপারে সে ত্রিগুণাতীত—ঘৃণা-লজ্জা-বুদ্ধিহীন। এমনি করে সে চিরকাল নির্লজ্জ-নির্বোধের স্বর্গে বাস করে। সে দেশ-দুনিয়ার সর্বত্র কৃতী ও কীর্তিমান স্বজন ও স্বজাতি খুঁজে বেড়ায়। আর আত্মীয়তার গৌরববোধে নিজেকে ধন্য মানে।

AMARBOI.COM

এমন একসময় ছিল, যখন জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্যে গোত্রীয় সংহতি আবশ্যিক ছিল, সেদিন আনাড়ি-অসহায় মানুষের স্বাতন্ত্র্যে বাঁচবার উপায় ছিল না—যদিও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণায় মানুষ স্বাতন্ত্র্য কামনা করে, তবু যৌথ শ্রমশক্তি ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যৌথ প্রয়াস সেদিনকার জীবনযাত্রায় অপরিহার্য ছিল। মানববুদ্ধির ক্রমবিকাশে জীবনধারণ পদ্ধতির বিবর্তন ধারায় গোত্রীয় জীবন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পটে স্ব স্ব স্বার্থে গোত্রসমষ্টির সহযোগিতা ও সহঅবস্থানের অঙ্গীকারে নতুন সম্ভাবনার দ্বারে উত্তীর্ণ হয়। এ স্তরে তার বাহ্য মিলন-রাখী ছিল ভরণপোষণ সামগ্রীর ও পদ্ধতির উৎকর্ষ ও দুর্লভতা। আর সহমর্মিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল বোধের জগতে–যেখানে বিপদে-সম্পদে আনন্দে-যন্ত্রণায়, জীবনে-মরণে এক বা একাধিক দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রভাব-প্রতাপ অনুভূত হয়। যেখানে জ্ঞানের শেষ, সেখানেই কল্পনা, ভয় ও বিস্ময়ের শুরু। যেখানে শক্তির শেষ, সেখানেই অদৃশ্যশক্তির ভরসা-বাঞ্ছার উৎপত্তি। কারণ ক্রিয়াতত্ত্বে অজ্ঞ বিভ্রান্ত মানুষ জীবনে সাফল্য ও ব্যর্থতার, লাভ ও ক্ষতির, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির, সুখ ও দুঃখের, রোগ ও মৃত্যুর কেবল আকস্মিকতাই প্রত্যক্ষ করে ; কোনো সঙ্গতি-সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না। এই বিমূঢ়তা থেকেই লীলাবাদ, অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ, পাপপুণ্যতত্ত্ব ও দৈবশক্তির রোষ-তোষ বাদের উদ্ভব। মানবমনীষার ক্রমানুশীলনে বিচিত্র দার্শনিকতত্ত্বে, বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এবং বহু মরমীয়া তত্ত্বে জগৎ ও জীবনের রহস্য বোধগত করার প্রয়াস পেয়েছে মানুষ। কিন্তু যার শুরু ও শেষ জানা নেই—জানবার উপায়ও নেই, তাকেই জানা-বোঝার আকুলতা মানুষকে বিরামহীন প্রয়াসে প্রেরণা যোগায়। নিছক কৌতূহলই এই আনন্দিত প্রয়াসের পুঁজি ও পাথেয়। এখানে সাফল্য ও ব্যর্থতা দুই সমমূল্যে বিকায়। কিন্তু মানুষ এই অসম্পূর্ণ ও অনিঃসংশয় রহস্যচিন্তাকে বাস্তব জীবন-জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনিশ্চিত ভাগ্যের উপর তার জীবন সমর্পিত, সে-ভাগ্যের নিয়ন্ত্রীশক্তির সচেতন-অবচেতন ধারণা প্রসূত ভয়-ভরসাকে জীবন-সংলগ্ন করে সে জীবনকে উপভোগ ও উপলব্ধি করতে প্রয়াসী। তাই মানুষ স্ব-ভাবে স্বাধীন নয়, বিশ্বাস-সংস্কার ও ভয়-ভরসার প্রভাবে কৃত্রিম ও বিকৃত। সরল গোত্রীয় জীবন থেকে শাস্ত্রানুগ জটিল জীবনে মানুষের এই উত্তরণ সতেরো-আঠারো শতক অবধি—যন্ত্রনির্ভর জীবন শুরু হওয়ার পূর্বমূহূর্ত পর্যন্ত—মানুষের গৌরব-গর্বের বিষয় ছিল। গোত্রগত সংহতির অভিন্ন শাস্ত্রে বিশ্বাসজাত ঐক্যে রূপান্তর- যে মনুষ্যসভ্যতা-সংস্কৃতির অগ্রগতির পরিচায়ক, তাতে সন্দেহ নেই।

কেননা, এই সম ও সহমতবাদীর ঐক্যবোধ স্থানান্তরের ও কালান্তরে মানুষের সংহতিসাধন করেছিল। গোত্রগত সংকীর্ণ জীবনে সাম্প্রদায়িক আত্মীয়চেতনা সেদিনকার জগতে এক সামুদ্রিক বিস্তৃতি ও ঔদার্য এনেছিল। কেননা রক্তের সম্পর্ককে অতিক্রম করে বর্ণ ও ভূমির ব্যবধান এবং ভাষার ও জীবিকার পার্থক্য তুচ্ছ জেনে মতের মিলের ভিত্তিতে সে পরকে আপন ভাবার দীক্ষা নিয়ে মানবতার পথে অনেক দূর এগিয়ে যায়।

কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের কথা এই যে কয়েক হাজার বছর ধরে মানবমনের অমিত সম্ভাবনাময় ও বিকাশ আকস্মিকভাবে ঐ স্তরেই স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যের অচলায়তন অতিক্রম করে আর এগোয়নি। অথচ সঙ্গত কারণেই প্রত্যশা ছিল প্রতুল। আশা ছিল মানুষ সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির উর্ধ্বে উঠে মনুষত্বের সুউচ্চমিনারে দাঁড়িয়ে মানবতার নামে মানুষকে সর্বপ্রকার ভেদবিলোপী মিলন ময়দানে আহ্বান জানাবে। প্রভেদের সুদৃঢ় প্রাচীর খাড়া রেখে মিলনক্ষেত্রকে খণ্ড ও ক্ষুদ্র রাখবে না, সংকীর্ণ হৃদয়ের অসূয়া ও অসহিষ্ণুতা মনুয্যমনে চিরকাল দৃঢ়মূল থাকবে না। কিন্তু মানুষের সে প্রত্যাশা আজো পূরণ হল না। ইতোমধ্যে বহু যুক্তিতর্ক, আকুল আবেদন, মহৎ বুলি, ও কল্যাণকামনা ব্যর্থ হয়েছে।

AMARBOI.COM

৩

আগেকার দিনে রাজ্য ছিল রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সে জন্য রাজার সঙ্গে প্রজার সমস্বার্থের যোগ ছিল না। তাই রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ছিল অচিন্ত্য। কেবল সহমতবাদী অর্থাৎ স্বাধর্ম্যমূলক একপ্রকার জাতিচেতনাই মধ্যযুগীয় মানব-সংহতির ভিত্তি ছিল। হোলি রোমান এম্পায়ার বা মুসলিম সাম্রাজ্যে রাষ্ট্রশক্তির উৎস ছিল এই ধর্মীয় ঐক্যচেতনা। অবশ্য তা কখনো তেমন দৃঢ় ছিল না।

জাতান্তরে, স্থানান্তরে ও কালান্তরে স্থানিক ও গোত্রীয় স্বার্থের প্রবলতায় ঐ স্বাধর্ম্যবোধ উষ্ণতা হারিয়েছে এবং মধ্যে মধ্যে পর্যুদস্তও হয়েছে। তবু সতেরো শতক অবধি তা-ই ছিল আত্মীয়তার সূত্র, আহ্বানের বীজমন্ত্র। কিন্তু আঠারো শতকে য়ুরোপে আমেরিকায় ধর্মের দেয়াল ভেদ করে জন্ম নিচ্ছিল ভাষিক, আঞ্চলিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাদ। বিশ শতকে ঐ বোধ ও 'বাদ' বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে বটে ; কিন্তু দেশ-দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষের চেতনায় এখনো মধ্যযুগীয় ঘোর রয়ে গেছে। এদের মনে কোনো সুষ্ঠ চেতনা সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত হয়ে ফোটেনি। তাই তারা নিশ্চিত-নিঃসংশয় আত্মপরিচয়ে স্বস্থ নয়। তাদের এই বিমূঢ়তা ও বিচলন তাদের জাগতিক জীবনে ও মানস-জীবনে একটা বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতা জিইয়ে রেখেছে। বাঙালিকে দিয়েই অবস্থাটা বিশ্লেষণ করা যাক। বাঙালি মুসলমান কখনো কেবল মুসলমান ছিল, কখনো ছিল কেবল পাকিস্তানি, কখনোবা কেবল বাঙালি। সে-যে একাধারে বাঙালি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান তা সে ভাবতে পারে না, অর্থাৎ লঘু-গুরুর আনুপাতিক সমতা তথা ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে শেখেনি। নইলে মানুষ কখনো একক পরিচয়ে চলে না। সে কারো সন্তান, কারো ভাই, কারো বন্ধু, কারো শত্রু। কিন্তু ওগুলো তবু তার পরিচিতি নয়। প্রাত্যহিক জীবনে আত্মপরিচয়ে তিনটে জিজ্ঞাসার জবাব থাকা চাই—কী নাম, কোথায় নিবাস আর কী পেশা! আন্তর্জাতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রেও আমাদের পরিচয় হচ্ছে আমরা জাতে বাঙালি, রাষ্ট্রে বাঙলাদেশী এবং ধর্মে মুসলিম বা হিন্দু। রাষ্ট্র নশ্বর, রাষ্ট্রসীমার হ্রাস-বৃদ্ধি আছে এবং রাষ্ট্রেরও জন্মমৃত্যু রয়েছে। কোনো বিশেষ ধর্মবিশ্বাসও অস্তিত্বের অঙ্গ নয়, আবরণ মাত্র। কিন্তু জন্মভূমিগত অর্থাৎ ভাষিক এবং নৈবাসিক পরিচয় মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত অবধি অবিমোচ্য। কেননা শৈশবে বা বাল্যে মানুষ যেখানে ও যে ভাষায় লালন পায়, সে জায়গা ও ভাষা তার মর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এটাকে তার সত্তার অংশ এমনকি ভিত্তিও বলা চলে। কাজেই মানুষ সেই নৈবাসিক ও ভাষিক পরিচয়েই চলে। তাই আমরা ইংরেজ-ফরাসি জার্মান-পর্তুগিজ-ইরাকি-ইরানি-এই দৈশিক পরিচয়েই মানুষকে অভিহিত করি, খ্রিস্টান বা মুসলমান বলে নয়। মধ্যযুগের ভারতে আমরা তুর্কি, মুঘল, আফগান, ইরানি, বোখারি, খোরাসানি, ইস্পাহানি, ইংরেজ-ফরাসি-দিনেমার-ওলন্দাজ ও পর্তুগিজদের তাদের দৈশিক পরিচয়েই জেনেছি। [উল্লেখ্য যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই তুর্কি-মুঘল নির্বিশেষে সবাইকে 'মুসলমান' নামে অভিহিত করে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষবিষ ছড়িয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। ইতিহাস গ্রন্থে যদি শাসকদের তুর্কী বা মুঘল নামে চিহ্নিত করা হত কিংবা আইবক, খালজি, তুঘলক, সৈদ, লোদি, তাইমুরি প্রভৃতি বংশগত পরিচয়ে আখ্যাত করা হত, তাহলে বিদেশী বিজাতি বিভাষী তুর্কি-মুঘল শাসকের প্রতি বিদ্বেষবশে হিন্দুরা দেশী মুসলমানকে পর, শত্রু ও অবজ্ঞেয় ভাবত না। দেশী মুসলমানরাও তুর্কি-মুঘলের মিথ্যা জ্ঞাতিত্ব-চেতনাবশে তুর্কি-মুঘলের নিন্দা-কলঙ্ক নিজেদের গায়ে মাখত না। ব্রিটিশ শাসন-শোষণপীড়নকে আমরা কখনো খ্রিস্টান শাসন-শোষণ-পীড়ন বলি না। যদি 'ব্রিটিশ' নামের পরিবর্তে 'খ্রিস্টান' নাম বসানো হয়, তাহলে আমাদের 'ব্রিটিশ খ্রিস্টান নিন্দা' সারা য়ুরোপের তথা বিশ্বের খ্রিস্টানদেরও গায়ে লাগবে, এবং ক্রুসেডীয় যুগের জাতি-বৈর জেগে উঠবে।]

এতেই দৈশিক বা ভাষিক কিংবা রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বা জাতীয়তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়। পরিচয়টাও হয় পষ্ট ও যথার্থ। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষেরও এ বিষয়ে মূঢ়তা ঘুচেনি। তাই সে বাঙালি ও বাঙলাদেশী হয়েও অর্থাৎ এ-যুগের দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তায় আস্থা রেখেও এবং স্বাধীনতার ও স্বাতন্ত্র্যের সমজদার এবং সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের নিন্দুক হয়েও, পররাজ্যগ্রাসী মুহম্মদ বিন কাসিম, সাহাবুদ্দিন ঘোরী, বাবর প্রভৃতি বিদেশীর বিজয়ে এবং দেশের পরাধীনতায় উল্লাস বোধ করে। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের সুবাদার সিরাজদ্দৌলাকে জাতীয় বীরের সম্মান দেয়, ঢাকার 'জাহাঙ্গীর নগর' নামে গৌরব বোধ করে। তারা তুর্কি-মুঘল বাদশাহদের স্মরণে রাস্তা ও এলাকার নামকরণে গর্বিত ও তৃপ্তমন্য।

এদের চেতনায় স্বাধর্ম্যবোধই প্রবল। এরা যে-মাটির লালন পায় সে-মাটির ঋণ স্বীকার করে না। ভূগোলের ভূমিকা এদের নজরে পড়ে না। তাই এরা মনে যাযাবর। ইহুদিরাও সেই মুসার আমল থেকেই এই স্বগোত্রের ও স্বধর্মীর মমতায় মুগ্ধ ছিল। মাটিকে তারা মায়ের মতো গ্রহণ করেনি। ধাত্রীর গুরুত্বে তারা আস্থা রাখেনি। তাই সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে তারা তাড়িত কুকুরের মতো যাযাবর। অশেষ পীড়ন ও লাঞ্ছনা পেয়েও তাদের বোধবুদ্ধির উদয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি, ঠেকে কিংবা ঠকে তারা কিছুই শেখেনি, তাই তাদের দুর্ভোগেরও অবসান হয়নি। আজকের কৃত্রিম ইসরাইল রাষ্ট্রই বা আমেরিকা কতকাল টিকিয়ে রাখতে পারবে!

হাজার বছর ধরে এই উপমহাদেশের মুসলমানও ঐ আধির শিকার। বিদেশী বিজেতারা স্বস্বার্থে দেশী মুসলমানকে দলে টানবার জন্যই স্বাধর্ম্যবোধে উৎসাহিত করে। সেই থেকে তারা মূঢ়তার কবলগ্রস্ত। অথচ বিদেশী বিজেতা মুসলমানরা সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক ব্যাপারে তাদের কখনো আপন করে নেয়নি, উচ্চপদও দান করেনি, বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেনি। ওদের পশ্চিম ও মধ্যএশীয় জ্ঞাতিরাই দলে দলে এসে এদেশের অর্থসম্পদ ও সরকারি সম্মান লুটেছে। কুতুবুদ্দীন আইবক থেকে মুহম্মদ রেজাখান অবধি কেউ ভারতীয় মুসলমান ছিলেন না, তবু চলতি কথার স্তন্যবঞ্চিত ছাগলছানার মতো স্বধর্মীর ভোগ-বিলাসেই তারা আত্মতৃপ্তি খুঁজেছে— উপভোগের কাল্পনিক আনন্দ ও গৌরব অনুভব করেছে। এ আত্মপ্রবঞ্চনার এক অনন্য নজির বটে!

মাটির ঋণ অস্বীকৃতির ফলে তাদের সেই ধর্মীয় তথা আদর্শিক জাতীয়তা তাদেরকে- যে কেবল স্বদেশে প্রবাসী করে রেখেছিল তা নয়, আত্মস্থ ছিল না বলে তাদের আত্মোন্নয়নের পথও ছিল রুদ্ধ। তাই বিগত হাজার বছরের মধ্যে দেশী মুসলমানের জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন কোনো কৃতি ও কীর্তির সন্ধান মেলে না। এমনকি প্রখ্যাত দরগাহ্গুলো পর্যন্ত কোনো দেশী দরবেশের নয়। তাই বোধহয় বাঙালি মুসলমানরা জ্ঞাতি-গৌরবে ও আত্মীয়-পরিচয়ে চলতে অভ্যস্ত। তারা দেশকালহীন এক ভাবলোকে বাস করে। এজন্যে তারা গৌরব-গর্বের অবলম্বন সংগ্রহের জন্যে দেশ-দুনিয়া চুঁড়ে কৃতী ও কীর্তিমান মুসলিম নামের তালিকা সংকলনে উৎসাহী। তাও আবার তাদের দুর্ভাগ্য বশে পাঁচশ বছর আগের সময়ের সীমায় স্তব্ধ। খ্রীস্টীয় সাত শতক থেকে পনেরো শতকের মধ্যেই তা সীমিত। গত পাঁচশ বছরের মধ্যে আর কোনো গৌরবের সামগ্রী মেলে না কোনো গিরি-মরু-কান্তারে কিংবা প্রান্তরে। যেন পৃথিবী পাঁচশ বছর আগে লোপ পেয়েছে। গৌরব-গর্বের এই কাঙালরা কথায় বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানের ভূমিকা, বিজ্ঞানে মুসলমানের দান, দর্শনে মুসলমানের অবদান, স্থাপত্যে মুসলমানের কৃর্তি, চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানের কীর্তি ইত্যাদির আস্ফালন করে এবং স্পেন থেকে খাখান অবধি বিস্তীর্ণ ভুবন চুঁড়ে বের করে কয়েকজনের নাম। কিন্তু ইসলাম ও মুসলিম জিন্দা থাকা সত্ত্বেও সে-কৃতির উৎস শুকিয়ে গেল কেন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষিত হল না কেন, এ- যুগে সেসব কৃতি-কীর্তির উপযোগ কী, পূর্বপুরুষের অতুল সম্পদের আস্ফালনে ভিক্ষাজীবী বংশধরের কী লাভ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর য়ুরোপীয় বিকাশকে তাচ্ছিল্য করবার স্পর্ধারই বা ভিত্তি কী—এসব খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখবার বুঝবার গরজ বোধ করে না।

গ্রিক-রোমক জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তি করেই মুসলিম বিদ্বানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার শুরু হয়। ওদের দানের তুলনায় মুসলমানদের দানও বেশি নয়—বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষের মাত্রাও তেমন চমকে দেয়ার মতো নয়, আরাস্তু-আফলাতুনের ন্যায় ও দর্শন তর্জমা ও বোধগত করতেই তাদের চারশ' বছর কেটে যায়। ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের শল্যবিদ্যা ব্যতীত উন্নতিও হয়েছিল মন্থরগতিতে। বিজ্ঞানের অনুশীলন জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নেই ছিল মুখ্যত সীমিত। কিন্তু ঐদিকে তেরো শতকের ইতালিতে তখন রেনেসাঁসের অরুণ পূর্বাশা রঙিন করে তুলেছে। তেরো শতকের পরেরকার পৃথিবীর জ্ঞান ও বিদ্যার ক্ষেত্রে মুসলিম একপ্রকার অনুপস্থিত। যদিও তখনো জানা-জগতের অধিকাংশই মুসলিম শাসিত এবং বস্তুত ১৯১৮ সন অবধি এশিয়া-য়ুরোপ ও আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলিম-শাসন চালু ছিল। ইসলাম রইল, মুসলিমও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকল, থাকল তাদের রাজ্যসম্পদও, তবু জ্ঞান-বিজ্ঞান হারিয়ে গেল কেন! গ্রিকরোমক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পুঁজি করাতে যদি মুসলিমদের লজ্জার কিছু না থাকে, তবে মুসলিমদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে য়ুরোপীয়রা দীক্ষা নেওয়াতে মুসলিমদের অহঙ্কারের কী থাকে! এই দেয়া-নেয়ার মধ্যে লজ্জা-গৌরবের কী আছে! কে কতটুকু আত্মস্থ করে নতুন সৃষ্টির সামর্থ্য অর্জন করল তা-ই বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথ ব্যাকরণের বই থেকে শব্দগঠন শিখেছিলেন, স্বল্পশিক্ষিত গৃহশিক্ষকের কাছে বর্ণমালা শিখেছিলেন, এর-ওর বই অধ্যয়ন করেছিলেন, এমনটি লক্ষকোটি লোকে করেছে, ঐ ঋণ গ্রহণেই যদি রবীন্দ্রনাথ কবি হয়ে থাকেন, তবে অন্যেরা হল না কেন? ঐ বৈয়াকরণ, ঐ গৃহশিক্ষক আর ঐসব গ্রন্থকার 'কবি রবীন্দ্রনাথ' তৈরি করেছেন বলে গর্ব করলে তা যেমন হাস্যকর হত, স্বধর্মীর গৌরব গর্বীরা তেমনি লজ্জাকর গর্ব করে।

আবার ওদের ইসলাম, মুসলমান ও আরব মক্কা-মদিনা সম্পৃক্ত। অথচ কুরআন ও হাদিসোত্তর জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-বিদ্যায় কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখায় মক্কা-মদিনার আরবের দান দুর্লক্ষ্য। মুসলিম দর্শনে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে-শিল্পে-স্থাপত্যে এমনকি ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও প্রশাসনিক উৎকর্ষে এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের দানের গৌরব করা হয় তারা ইরানী-ইরাকী-সিরীয়-মিশরীয় এবং মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের। ধর্মের ও দরবারের ভাষা আরবিতে লিখিত বলেই তা আরব-মনীষার দান নয় এবং সেকারণে আরব-সভ্যতারও ফসল নয়। যাদের দানে মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার, তারা ইসলাম-পূর্ব যুগের সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষের মুসলিম বংশধর। গোত্রীয় জীবনের অবসানে দুনিয়ার সব মানুষই নিবাসগত তথা দেশগত অভিজ্ঞানে চিহ্নিত। পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাই দেশগত নামে পরিচিত। আজকের আরবেরা ভাষিক জাতীয়তার জয়গানের মুখর, ইরানিরা আর্য ও পহলবী ঐতিহ্যে গর্বিত। বাঙালি মুসলমানরাও অন্যদের দৈশিক নামে অভিহিত করে এবং তাদের কৃতি-কীর্তির উল্লেখেও ধর্মীয় লেবেল লাগায় না। বিজ্ঞানে বৌদ্ধের, খ্রিস্টানের কিংবা ইহুদির দানের কথা না বলে সভ্যতায় চীনের, ইংরেজের, জার্মানের অবদানের কথাই বলে। কেবল নিজেদের বেলায় দেশ-কালাতীত মুসলিম-পরিচয়ে আগ্রহী। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে এ হচ্ছে হীনমনা নিঃস্বের আত্মসম্মান রক্ষার সচেতন প্রয়াসপ্রসূত। তার দৈশিক স্থিতি গৌরব-গর্বের অবদানে ঋদ্ধ নয়। কেননা সে সারা মধ্যযুগে শাসকের মিথ্যা জ্ঞাতিত্ব-গৌরবে স্বধর্মীয় ঐশ্বর্য-সুখে অভিভূত ছিল। ফলে সে ছিল স্বদেশে প্রবাসী, আত্মচিন্তায় ও স্বপ্রতিষ্ঠায় ছিল উদাসীন। ইংরেজ আমলে যখন মোহভঙ্গের উপক্রম হল, তখন সে বাইরে নিঃস্ব এবং অন্তরে রিক্ত। কাজেই আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রেরণায়, আত্মসম্মান বৃদ্ধির আশ্বাসে সে ধর্মীয় ঐক্যকে অবলম্বন করে আত্মীয়তার সূত্র ধরে স্বজন সন্ধানে ব্রতী হয়। তখন স্পেন থেকে মধ্যএশিয়া অবধি সর্বত্র সে তার জ্ঞাতি সন্ধানে ব্রতী হয়। তখন স্পেন থেকে মধ্যএশিয়া অবধি সর্বত্র আওয়ারা হয়ে মরীচিকার পিছু ধাওয়া করতে থাকে। গোবী মুর অবধি সর্বত্র আওয়ারা হয়ে মরীচিকার পিছু ধাওয়া করতে থাকে। আজো সে আত্মসম্বিৎ ফিরে পায়নি। তাই আজো সে স্বঘরে ফিরে সুস্থির হতে পারল না। স্বস্থ জীবনের প্রসাদ ও সুস্থজীবনের স্বাস্থ্য তাই আজও তার চরিত্রে ও ভাব-চিন্তা-কর্মে অনুপস্থিত।

অতএব তার দেশকালহীন এই স্বধর্মী প্রীতির, এই আত্মীয়তাবোধের, এই স্বজন-সন্ধানপ্রিয়তার ও এই জ্ঞাতিপরিচয় প্রবণতার মূলে নিহিত রয়েছে সেই আধি যার উৎপত্তি তার নিঃস্বতায়, রিক্ততায়, নৈরাশ্যে ও অসামর্থ্যে। এই আধির প্রভাবেই পাকিস্তান প্রাপ্তি সম্ভব হয়েছিল, আবার এই আধির আচ্ছন্নতায় বাঙালি সংখ্যালঘু শাসন-শোষণ ও প্রভুত্ব মেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছিল, করাচি-পিণ্ডিকে রাজধানী করেছিল, উর্দুকে করেছিল রাষ্ট্রভাষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি আর কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব ও সৈনাপত্য সংখ্যালঘুর হাতে ছেড়ে দিয়ে স্তন্যবঞ্চিত ছাগলছানার আনন্দে ছিল অভিভূত। এবং দায়িত্ব-মুক্তির স্বস্তিতে ঔপনিবেশিক প্রজার জীবনে ছিল তুষ্ট। আজকের দৈশিক জাতিচেতনা বা ভাষিক ঐক্যবোধ ও রাষ্ট্রিক বাঙালি জাতীয়তাবোধই এই আধির নিদান বটে, কিন্তু সুস্থ মানবিক চেতনার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা ও সহাবস্থান বুদ্ধিই কল্যাণের বিকাশের ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্রান্ত পন্থা।

মনুষ্যত্বের আর এক নাম

মানব সভ্যতার শামীয় গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে Time and Space বিহীন অর্থাৎ স্থানকালাতীত স্রষ্টার ধারণা অর্জন। এতেই বলতে গেলে মানব-মনীষার প্রথম সার্থক উন্মেষ। Animism ও Paganism থেকে মুক্তির পথে মানুষের প্রথম উত্তরণ। পার্স-ব্যাবিলন-সিরিয়া-পালেস্টাইন-মিশর এই অঞ্চলটুকুতে এ মনীষার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। লোকশ্রুত ঐতিহ্যে ও শাস্ত্রীয় ইতিকথায় আস্থা রেখে বলা চলে আব্রাহামই প্রথম স্থানকালাতীত নিরাকার শক্তির উদ্ভাবক ও প্রচারক। আব্রাহাম ব্যাবিলনীয় সর্দার রাজা নমরুদের আমলে ব্যাবিলন থেকে বিতাড়িত হন। এ প্রায় চার হাজার বছর আগের কথা। সেই থেকে আব্রাহাম বংশের নবী নামে খ্যাত গুণীজ্ঞানী সজ্জনেরা এই একেশ্বরবাদের প্রচার ও প্রচলন অবিলুপ্ত রেখেছেন। কেউ পুরোনো বাণীর অনুশীলন করেছেন এবং কেউবা নতুন বাণী ও নীতি শুনিয়েছেন। ইদ্রিস, ইব্রাহিম, ল্যুত, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, ন্যুহ্, মুসা, সালিহ, শুয়েব, ইউনুস, ওজায়ের, ইলিয়াস, দাউদ, হারুন, হুদ, সোলেমান, আয়ুব, জুলকরনাইন, জাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও মুহম্মদ প্রভৃতি কয়েকজনের নাম আজও চালু রয়েছে। একলক্ষ চব্বিশ হাজার প্রবক্তার অন্যান্যদের নাম কালপ্রবাহের হারিয়ে গেছে। এঁদের মধ্যে আবার তিনজনের—মুসা, ঈসা ও মুহম্মদের রয়েছে পুরো গ্রন্থ। কুরআনের মতে মুসা-ঈসার গ্রন্থে আরব্ধ নির্দেশ কুরআনে পূর্ণতা পায়। আর শাস্ত্রোক্ত ইতিকথার মধ্যে অবিনশ্বর হয়ে রয়েছেন পূর্বোক্ত কয়েকজন। এঁদের অরিরূপে অবিস্মৃত হয়ে আছে আজর, নমরুদ, ফেরাউন, হামান, কারুন, কেনান, আবুলাহাব, আবুজেহেল, নেবুকাদনেজার, পাইলেট, আর আদ, সামুদ, রস, তুব্বা প্রভৃতি গোত্র। ইয়াকুব (Jacob)-এর উপাধি ছিল ইসরাইল। সে-সূত্রেই ইয়াকুব বংশীয় জনগণ ও নবীরা 'বনি ইসরাইল' নামে খ্যাত। এঁরা ইব্রাহিমের পত্নী সারার পুত্র ইসহাকের বংশধর। ইব্রাহিমের সেবিকা হাজেরার সন্তান ইসমাইল বংশজ মুহম্মদই একমাত্র নবী। স্থানকালাতীত এই একেশ্বরবাদের তত্ত্ব প্রথম লিখিতভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং লোকগ্রাহ্য হয় মুসার আমল থেকে—তা প্রায় সাড়ে সাইত্রিশ-শ বছর আগের কথা। এঁদের প্রচারিত অপৌরুষেয় শাস্ত্র—মনীষাদীপ্ত সভ্যতার বক্র ও বিচিত্র বিকাশ মুহূর্তে—ঐশশক্তির আনুগত্য—ভিত্তিক বা আনুগত্যের অঙ্গীকারে নিয়মনীতির নিয়ন্ত্রিত সমাজ গঠন লক্ষ্যে প্রযুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকে-লোকান্তরে প্রসারিত অমর জীবনের অসীম সম্ভাবনা ও অশেষ মহিমার ধারণা উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অন্য জীবেতর অনন্য জীবন-চেতনায় ঋদ্ধ হবার প্রত্যাশী হয়। একটি পরিস্রুত সাংস্কৃতিক জীবন ও সুষ্ঠু সমাজ তাদের কাম্য হয়ে ওঠে। ফিনিশীয়, ব্যাবিলনীয়, কালদীয়, আশিরীয়, পার্থীয়, রোমীয় সভ্যতার লালন পেয়ে এই নিরবয়ব একেশ্বরবাদ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তৌরাত-ইঞ্জিল-ফোরকানে অর্থাৎ মুসাতে যে-তত্ত্বের সাম্প্রদায়িক উন্মেষ, ঈসাতে যার বিকাশ, মুহম্মদে তারই সার্থক পরিণতি। কালপ্রভাবে সব পুরোনো বস্তুতে জীর্ণতা আসে, তেমনি পুরোনো তত্ত্বেও ম্লানিমা নামে। তাই লোকব্যবহারে বিকৃতি যেমন স্পষ্ট, তেমনি আটপৌরে আচরণে তা তাৎপর্যহীন আচারে ও রেওয়াজে অবসিত। তাই আজকের দিনে ধর্মধ্বজী ও ধর্মদ্বেষী দুই পক্ষই অনুভূতিহীন অনুভবের আস্ফালনে বিড়ম্বিত।

উক্ত তিনটে শাস্ত্রই মানুষকে নানাভাবে বলতে চেয়েছে মাত্র একটি কথা—আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে আস্থা রেখে সদাচারী হও। মুসলিম সন্তান হিসেবে আমরা এখানে কেবল কুরআনোক্ত আস্থা ও সদাচার সম্বন্ধেই বলব, তা ছাড়া আমাদের উদ্দিষ্ট পাঠকও মুসলমান।

তার আগে কয়েকটি কথা বলে নিতে হয়। কুরআনের সর্বত্র সঙ্গত কারণেই স্থানিক-কালিক প্রভাব রয়েছে। কুরআন মুখ্যত ও বাহ্যত আরবদের জন্যে এবং গৌণত ও স্বরূপত বিশ্বমানবের উদ্দেশে অবতীর্ণ। এজন্যে স্থানিক ও সাময়িক প্রয়োজন ও সমস্যার পটভূমিকায় কুরআনকে আক্ষরিক অর্থে এবং মানবিক প্রয়োজন ও সমস্যার চিরন্তনতার তাৎপর্যে বুঝতে হয়। সর্ব ধর্মগ্রন্থেই সাময়িক সমস্যার সমাধানই উপলক্ষ। তৌরাতে ইসরাইলদের দাসত্বের দুর্ভোগ মুক্তির পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, ইঞ্জিলে আছে সামাজিক দুর্নীতি নির্মূলের প্রয়াস, গীতার বাণী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটে উক্ত।

কুরআনের বক্তব্য বিষয় কয়েকটি মাত্র। কিন্তু প্রায় সব কথাই অনবরত পুনরাবৃত্ত হয়ে স্ফীত কলেবর হয়েছে। নইলে সুরা ফাতেহা ও সুরা বাকারার মধ্যেই প্রায় সব কথা উক্ত হয়েছে। বড়জোর সুরা ইমরান ও সুরা নিসা অবধি কোনো কথাই আর অজ্ঞাত বা অকথিত থাকে না।

নানা প্রয়োজনে ও বিভিন্ন উপলক্ষে স্থান-কাল ও ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তেইশ বছরের পরিসরে একই কথা ও প্রসঙ্গ বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে মাত্র। এবং সব প্রসঙ্গের মর্মকথা হচ্ছে—আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে আস্থা রেখে সদাচারী হও। এ অঙ্গীকারে স্বীকৃতির পর আনুষঙ্গিক যে আচার-আচরণের প্রয়োজন তা মূলত ঐ অঙ্গীকারেরই প্রসূন, বিচ্ছিন্ন কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়।

অঙ্গীকারগত আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার আগে মূল প্রতিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝে নিতে হবে। যৌথ মানবিক জীবনযাত্রার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্যে নিয়মনীতির প্রয়োজন। নইলে অশান্তি নামে ও ব্যক্তিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব ঘটে। মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার-বিধিই ধর্মশাস্ত্র। ব্যবহারিক, সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ না থাকলে চলার পথ সুষ্ঠু ও নিরাপদ হয় না। নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্নে যাত্রার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক শক্তির প্রয়োজন, যা আবশ্যিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। নইলে সাধারণ যে-মানুষ জীবনের মহৎ চেতনায় উদ্বুদ্ধ নয় কিংবা উচ্চ নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিতও নয়, তারা কোন্ প্রেরণায় নীতিনিষ্ঠ ও সদাচারী হবে! এই কেন্দ্রীয় শক্তির ভয়-ভরসায় সংযত জীবনযাপনের প্রেরণা ও প্রবণতা জাগে। আল্লাহ হচ্ছেন সেই নিয়ন্তা—যাঁর শাসনের ভয়ে ও আশ্বাসের ভরসায় মানুষ নিয়ম-নীতির সীমা অতিক্রম করে উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী হবে না, অর্থাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরপীড়ক ও পরস্বাপহরী হবে না। আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থা এজন্যেই জরুরি। আর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও সর্বশক্তিমান অনপেক্ষ একক শাসক না হলে নির্দ্বন্দ্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।—এমনি একটি ধারণা থেকেই এই একনায়কত্বের উদ্ভব। এবং যারই আকার আছে,-তারই শক্তির ও অবয়বের সীমা আছে এবং তা স্থান—কালাতীত হতে পারে না এই বোধের প্রসূন হচ্ছে নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্ব। আবার শাসনের কঠোরতা প্রতিপাদন লক্ষ্যেই আত্মার অমরত্বে আস্থা জরুরি হয়েছে। ইহলোকে পরলোকে প্রসারিত অবিনশ্বর জীবনে শান্তি ও সুখ-বাঞ্ছা এবং তিরস্কার ও পুরস্কারের অজানা ভয়-ভরসা মানুষকে কাবু রাখার সহায়ক বলে স্বীকৃত। আশা আশঙ্কার দ্বান্দ্বিক প্রত্যয় এক আশ্চর্য আচ্ছন্নতায় মানুষকে স্বভাবচ্যুত করে, স্ব-ভাবে স্ব-প্রকাশ কোনো মতেই সম্ভব হয় না। বোধাতীত প্রত্যয়ে সবসময়েই একটি মস্ত 'যদি'র ফাঁক থাকে। এ ফাঁক নিশ্চিত ও নিশ্চিন্তভাবে পূরণ মানুষের সাধ্যাতীত। তাই প্রতীক্ষা-প্রবোধ এবং আশঙ্কা-প্রত্যাশাই মানুষকে প্রবর্তনা দেয়। অন্যায় অপকর্মজাত অপরাধ পরিহার মানসে আল্লাহর স্মরণ কামনাই হচ্ছে ইবাদত। আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বে আস্থা রাখলে তাঁর সার্বভৌম স্বাধিকার ব্যবস্থায়ও আস্থা রাখতে হয়। তিনি স্বয়ংশক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তি বটে, কিন্তু ন্যায় ও সত্য-স্বরূপ হয়েই এবং প্রয়োজনসিদ্ধ হয়েই সে-শক্তি প্রযুক্ত হয়। তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ফিরিস্তা, ওহি, হাশর ও নবীর অস্তিত্ব, ভূমিকা ও গুরুত্ব অবশ্য স্বীকৃতব্য। এবং সুনাগরিকের মতো তাঁর প্রতি আনুগত্য আবশ্যিক। আত্মকল্যাণেই চলনে-বলনে আচার-আচরণে ঐ অনুগত্য প্রকাশও করতে হয়। সরকার যেমন চায়, তেমনি আল্লাহও চান প্রশংসায়, ভয়ে ও বন্দনায় তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা হোক। এরই নাম ইবাদত। কেননা, আচরণবিহীন বিশ্বাস আর বিশ্বাসবিহীন আচরণ দু-ই বন্ধ্যা। প্রত্যয়বিহীন হৃদয় এবং প্রত্যাশাবিরহী কর্ম নির্লক্ষ্য। বালুকণা থেকে নক্ষত্র অবধি সৃষ্টির সবকিছুই স্রষ্টার বিস্ময়কর শক্তির ও অতুল মহিমার নিদর্শন। এই নিদর্শনের অশেষ রহস্য, অসীম বৈচিত্র্য ও বোধাতীত কৌশলময়তা মানুষকে স্রষ্টা সম্বন্ধে সচেতন রাখে। সৃষ্টির কিছুই তুচ্ছ নয়—নিরর্থক নয় সবটাই মানুষের জন্যে গুপ্ত ও ব্যক্ত সম্পদ। মানুষ স্ব-প্রয়াসে গুপ্ত সম্পদের উপযোগ আবিষ্কার করছে। এবং সৃষ্টির সব কিছুই স্ব-স্ব জীবনে ধন্য ও ঋদ্ধ। তাই সবকিছুই স্ব-স্ব পদ্ধতিতে স্রষ্টার বন্দনা করছে—বজ্রও করছে তাঁর বন্দনা। সবাক প্রশংসা ও সাঙ্গিক বন্দনা আনুগত্যের নিদর্শন বলে পরিগণিত। আনুগত্যের অঙ্গীকার পূর্ণতা পায় অনুগতের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে। অনুগতের জন্যে নির্দেশিত নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে এক কথায় মানবিক তথা সামাজিক সদাচার। কুরআনে তা স্বল্প কথায় ব্যক্ত হয়েছে—

ন্যায়পরায়ণতা বা সদাচার হচ্ছে : আল্লাহ, হাশর, ফিরিস্তা, কুরআন ও নবীতে বিশ্বাস রেখে আল্লাহপ্রীতিবশে নিকটাত্মীয়-এতিম-মিসকিন-মুসাফির-ভিখারিকে ও দাসের মুক্তির জন্যে অর্থদান করা, নামাজ কায়েম রাখা, নিত্য দান করা (যাকাত), অঙ্গীকার পালন করা এবং দুঃখ, বিপদ, অভাব ও ভয়ের সময়ে ধৈর্য ধারণ করা এবং এমনি মানুষই হচ্ছে সত্যনিষ্ঠ ও আল্লাহ-ভীরু। [সুরা বাকারা ২২/১৭৭]। না বললেও চলে, পর-দুঃখমোচনে যে অকাতরে অর্থদান করতে পারে সে পরস্বাপহরণ করে না, পরপীড়ন ও শোষণ তার পক্ষে সম্ভব নয়, অন্যায়-অবিচার মাত্রই তার ঘৃণ্য। সে মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে সচেতন। এই মানুষই সুজন, সুপড়শী, সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ এবং এ গুণই বাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব। কুরআনে আল্লাহ এমনি নীতিনিষ্ঠ সদাচারী মানুষ হবার জন্যেই বারবার আহ্বান জানিয়েছেন সর্বত্র। বলাবাহুল্য সদাচার সত্যাচারেরই নামান্তর। কেননা সত্যাচারী না হলে সদাচারী হওয়া অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি কুরআনের বাণীতে সমকালীন জীবনই মুখ্য ছিল, তাই তাতে স্থানিক-কালিক সমাজের ছাপ রয়েছে। উষর মরু আরবের দরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকাই মুখ্য লক্ষ্য বলে আল্লাহ সর্বত্র সালাতের সঙ্গে যাকাতের গুরুত্ব সমভাবে আরোপ করেছেন।

সালাত হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত—আত্মকল্যাণে আল্লাহর মহিমা-কীর্তন ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, আর যাকাত হচ্ছে আর্তমানবের দুখমোচনে আর্থিক সাহায্য। এ দুটো কেন সমান গুরুত্ব পেল তা ভেবে দেখবার মতো। আর্ত-মানবের আর্থিক সেবাও যে আল্লাহর ইবাদতের মতোই জরুরি তা কুরআনের সর্বত্র সালাত ও যাকাতের সহ নির্দেশ থেকে প্রমাণিত। এত গভীর মানবপ্রীতির নিদর্শন অন্যত্র সুদুর্লভ। আল্লাহ বলেছেন ধনীর ধনে গরিবের ভাগ রয়েছে। গরিবের সে দাবি মিটানো আবশ্যিক। এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন দানে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশে দিয়েছেন। [সুরা ২/রু-২২। আয়াত-২১৯]

সেদিনকার উষর আরবে মানুষ দরিদ্র ছিল। ধনী মানুষের প্রয়োজনও ছিল সীমিত। প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন তারা সঞ্চয় করে রাখত। ব্যবসা-বাণিজ্যে অপরিমেয় পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ ছিল না। তখনো যন্ত্রযুগ শুরু হতে হাজার বছর বাকি। উৎপন্ন পণ্যের বিরলতা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি, কৃষিজ সম্পদের অভাব প্রভৃতি মানুষের কর্মসংস্থানের— বেকারত্ব ঘোচানোর–জীবিকা অর্জনের দুরপনেয় অন্তরায় ছিল। কাজেই দরিদ্রকে দান-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করতে হত। সাধারণের স্থূলজীবনে তখনো পণ্য বিনিময়ই ছিল বাণিজ্যের মুখ্য অবলম্বন—মুদ্রা বিনিময় তখনো আজকের মতো এমন সর্বব্যাপী হয়ে উঠেনি। তাই যন্ত্রবিরল জনশ্রমনির্ভর সমাজে দাসপ্রথাও ছিল সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতির অপরিহার্য অঙ্গ। কুরআন ছিল মানবের আত্মিক ও আর্থিক মুক্তির দিশারী। সেজন্যেই কুরআনে আত্মিক জীবন ও আর্থিক জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়নি। আর্থিক জীবন ও আত্মিক জীবনের আপেক্ষিকতা বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। দুষ্ট আত্মীয়-পড়শী-পর্যটকের প্রতি এই দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি মানবতা ও মানববাদের পরিচায়ক। তেরোশ বছর আগেকার আরবে এই আর্থিক দান হয়তো স্বল্প-প্রয়োজনের মানুষের দুঃখ ঘোচানোর সহায়ক ছিল। কিন্তু যুগান্তরে তা মানুষের অভাব পূরণের সুব্যবস্থা নয়। মূল লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে যুগোপযোগী ব্যবস্থার প্রয়োজন—কুরআনের শিক্ষার তাৎপর্য তাতে অস্বীকৃত হবে না।

কারণ, এক : কোনো দেশই এখন কেবল মুসলামন-অধ্যুষিত নয়। ইসলামী শাস্ত্রানুগ সমাজব্যবস্থা অমুসলিমদের উপর চাপানো যাবে না।

দুই : জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনবসতির বিস্তৃতি এই ব্যক্তিগত দানের প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

তিন : এই যন্ত্রযুগে ধনীর ধনেরও উদ্বৃত্ত বলে কিছু নেই। অর্থ যত বাড়ে আনুপাতিক হারে তার ব্যবহারিক জীবনের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। এ-যুগে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-সামগ্রী বহু ও বিবিধ, বলা চলে প্রায় অশেষ। ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন ও বিচিত্র ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজনবোধ বাড়ে। তাদের সঞ্চিত ধনও ব্যাঙ্কে, বীমায়, শিল্প ও বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানে পুঁজিরূপে খাটে।

চার : তাছাড়া যারা শিল্প-বাণিজ্যের জগতে বিচরণ করে তাদের অর্জিত ধন পুঁজি হিসেবে প্রযুক্ত হয়—কাজেই তাদের দান করবার মতো উদ্বৃত্ত থাকে না।

পাঁচ : যে-শাস্ত্রীয় প্রেরণাবশে নবদীক্ষিত মানুষ দানে প্রবর্তনা পেত, জন্মসূত্রে পৈতৃক ধর্মের ধারক মানুষের পক্ষে সে-প্রেরণা লালন করা প্রায়ই সম্ভব হয় না। তার কাছে শাস্ত্রীয় নিয়মনীতি তাৎপর্যহীন আচার ও রেওয়াজ মাত্র। তাই সে দান করবার জন্য প্রাণে প্রেরণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করে না। শাস্ত্রীয় রেওয়াজের আনুগত্যবশে আপদে-বিপদে ও বিশেষ বিশেষ পর্বে যান্ত্রিকভাবে দানের সীমিত হস্ত প্রসারিত করে প্রথা রক্ষা করে মাত্র। মানবপ্রীতিবশে, আর্তমানবের প্রতি করুণাবশে যে-স্বতোস্ফূর্ত দান মানবতার ও মানবিক কর্তব্য-চেতনার পরিচায়ক তা এতে অনুপস্থিত।

সাড়ে তেরোশ বছর ধরে দেখা গেছে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালন করেনি। কারণ আল্লাহর শাসন ও তাঁর প্রদত্ত শাস্তি প্রত্যক্ষ নয়। তাই সাড়ে তেরোশ' বছর ধরে মুসলিম শাসনাধীন মুসলিম সমাজে ক্ষুধার অন্ন ও রোগের ঔষধের অভাবে কোটি কোটি লোক অকালে অপঘাত মৃত্যুবরণ করেছে ও আজো করছে। অনাহার ও অর্ধাহারক্লিষ্ট রোগজীর্ণ মানুষ রোজ হাজারে হাজারে অকালে অপমৃত্যু বরণ করছে। কাজেই আজ এই যাকাত রাষ্ট্রীয় নির্দেশে দেয় করতে হবে এবং তার পদ্ধতিও পালটাতে হবে। এবং সম্পদের আনুপাতিক বণ্টনই হচ্ছে নতুন ব্যবস্থা—এর নামই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সাম্যতন্ত্র। দুটোর মধ্যে মাত্রার প্রভেদ আছে বটে, তবে আদর্শ ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। গরিব দেশেই সমাজতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্রের প্রয়োজন। জনসংখ্যার অনুপাতে সম্পদ যদি কম হয়, অর্থাৎ ভোক্তা ও ভোজ্যের ভারসাম্য যখন বিপর্যস্ত হয়, তখনই Socialism অথবা Communism-ই আশ্রয় বা সমাধান। মুসলমানেরা সমাজবাদ বা সাম্যবাদের নাম শুনেই শঙ্কিত হয়ে উঠে। অথচ কুরআনের মূলসূত্রের অর্থাৎ যাকাতের তাৎপর্যের অনুসরণে মুসলিম সমাজেই আধুনিক সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক বা বাঞ্ছনীয় ছিল। আত্মীয়-পড়শীর আর্থিক অভাবমোচন ও আর্তমানবের দুঃখ ঘুচানোই যার ইবাদত, সে মানুষ—সে-মুমিনই তো এগিয়ে আসবে যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনায়। বিদ্যা, জ্ঞান বা শাস্ত্র বোধগত না হলে যে তা জীবনে সংকটবিনাশী সম্পদ না হয়ে অসাধ্য সমস্যা হয়ে ওঠে—এ তার এক অকাট্য প্রমাণ। ধার্মিক মুসলমান আজো শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যে যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় উৎসাহী। তাই সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার মরুভূমি মদিনায় সে আওয়ারা হয়ে ঘুরে বেড়ায় পুণ্যার্জনের প্রত্যাশায়। শাস্ত্রের তাৎপর্য বোধগত, জ্ঞানায়ত্ত কিংবা অনুভবযোগ্য করবার প্রয়াস পায় না। তাই তারা শাস্ত্রকে জীবনের অনুগত না করে জীবনকে শাস্ত্রের অনুগত করে জীবনের সমস্যার নিগড়ে জড়িয়ে পড়ে। শাস্ত্রানুরাগ ও শাস্ত্রানুগত্য যে এক কথা নয়, তা তারা বুঝতে চায় না। জীবনের প্রয়োজনেই শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্যে জীবন নয়—এ-কথা বোঝে না বলেই জীবনকে তুচ্ছ এবং শাস্ত্রকে উচ্চ করে তোলে। এমনিতে লোভের ও লাভের বশে শাস্ত্রকে তারা সর্বক্ষণই অবহেলা করে; কেবল জনকল্যাণের ক্ষেত্রে, শাস্ত্রের তাৎপর্যিক ব্যতিক্রমেও নয়—আক্ষরিক ব্যতিক্রম দর্শনেই বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ধন-সম্পদ-জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির মতো শাস্ত্রকেও জীবনের অনুগত করতে হয়, অর্থাৎ জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যে-কোনো বস্তুর বা তত্ত্বের, নীতির বা আদর্শের উপযোগেই তার সার্থকতা, নইলে তা জীবন-লগ্ন বোঝা মাত্র—যাকে বলে গলগ্রহ।

মুসলমানরা মুখে বলে বটে ইসলাম হচ্ছে একটা সুষ্ঠু ঐহিক জীবনবিধি—কিন্তু কার্যত করে রেখেছে পারত্রিক মুক্তিশাস্ত্র। নইলে খোলা চোখেই দেখতে পেত ইসলামের উন্মেষ-যুগে মুসলিমরা মদিনায় নিঃস্ব উদ্বাস্তু মানুষের পুনর্বাসনের জন্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করেছিল। ধনসম্পদ ঘরবাড়ির অংশ তো দিয়েইছে, এমনকি নিজেদের স্ত্রী পর্যন্ত দান করেছে। এ তো Communism -এরও বাড়া—চলতি কথায় বলা চলে Communism-এর বাবা। পরার্থপরতার এমন দৃষ্টান্ত জগতে অনন্য, অতুল্য ও অসামান্য। কাজেই সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদের নামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিমের—মুমিনের আঁৎকে ওঠা শোভা পায় না বরং তার আগ্রহ, সমর্থন ও সহযোগিতাই প্রত্যাশিত। এ তো তারই বাঞ্ছিত লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উৎসবের ভোজে ইচ্ছেমতো খাওয়া চলে, কিন্তু গরিবের সংসারে একসের চালের ভাত ও পাঁচ টুকরো মাছ সাতজনকে ভাগ করে খেতে হয়। সে ক্ষেত্রে ভাত-মাছ সতর্ক পাহারায় রক্ষা করা ও যত্নে সমভাবে বণ্টন করা গিন্নিরই দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অভাবপ্রসূত সমস্যার সমাধান এমনিভাবেই করতে হয়। নইলে কলহ-কোন্দল এড়ানো যায় না। অভাবেই লিপ্সা বাড়ায়, কাড়াকাড়ির প্ররোচনা দেয়। কারণ উদাসীন হবার মতো, প্রয়োজনকে অবহেলা করবার মতো উদারতা ক্ষুধার্ত-কাঙাল মনে ঠাঁই পায় না। তকদিরবাদে মানুষ এ-যুগে আস্থা হারিয়েছে। জঠর জ্বালায় অস্থির মানুষ আজ মারমুখো, পুঁজিবাদী সমাজে সে বিদ্রোহী। শোষিত সম্পদ সে ফিরে পেতে চায়। 'সে আপন প্রাপ্য অধিকার চায়, তার লাগি দেবে লাল রুধির'— এ তার সংকল্প। পুঁজিবাদী বুর্জোয়া সমাজেরও বুঝবার সময় এসেছে যে 'দিনে দিনে বাড়িতেছে দেনা শুধিতে হইবে ঋণ।' নইলে বঞ্চনা-বিক্ষুব্ধ জনতা ক্ষমা করবে না।

সেদিন নিঃস্ব মানবের অভাব মোচনের ব্যবস্থা হয়েছিল তোয়াঙ্গর মানুষের ত্যাগের মাধ্যমে। আজ গরিব দেশে তেমনি সমস্যা তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং যন্ত্রনির্ভর জীবন-জীবিকার প্রসারে। আজ তাই ধনীমানুষের নতুন করে ত্যাগের দীক্ষা নেয়া আবশ্যিক। মানবিক জীবন-সমস্যা মূলত অভিন্ন হলেও কালান্তরে ও দেশান্তরে তার রূপভেদ হয়, সে-কারণে সমাধান পদ্ধতিও পাল্টাতে হয়। সাড়ে তেরোশ বছর আগেকার বসতি-বিরল মরুভূ আরবের অনুন্নত রুগ্ন সমাজের নিদান কালান্তরে আক্ষরিকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। ধর্মশাস্ত্রের চিরন্তনত্ব তার Spirit-এ (মূল উদ্দেশ্যে), তার Form-এ নয়। কেননা Form-টা হচ্ছে দেশকালের প্রয়োজনপ্রসূত, আর Spirit-টা হচ্ছে সর্বমানবিক কল্যাণবুদ্ধিজাত। প্রাণবিরহী পূর্ণাঙ্গও একটা পরিহার্য দায়, আর খণ্ডিত অঙ্গেও প্রাণের স্থিতি দুর্লভ সম্পদ। তেমনি বিলুপ্ত তাৎপর্যের শাস্ত্র মানুষের কেবল অকল্যাণই করে। প্রত্যেক ধনীর সম্পদে যে নিঃস্ব মানুষের অংশ রয়েছে তা আল্লাহর নির্দেশক্রমে মুমিন মাত্রেরই স্বীকৃত তত্ত্ব। কাজেই কালপ্রভাবে কেবল মাত্রার তারতম্য ঘটেছে। এখন আর শতে আড়াই টাকা নয়, আনুপাতিক সমবণ্টনই বিধেয়। এখন অনিচ্ছুক মানুষের কাছে দানের জন্যে হাত পাততে কেউ রাজি নয়, দাবি আদায়ের জন্যেই হস্ত বাড়াতে চায়।

দেশ-কাল-ব্যক্তির প্রয়োজন উপেক্ষা করে শাস্ত্র-শাসনে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস মূঢ়তা মাত্র। মূঢ়জনেরা শাস্ত্রকে সর্বরোগনাশক বটিকারূপে পেতে চায়। শাস্ত্র যেন জীবনের সর্বব্যাপারে Outfitter and general order Supplier. শাস্ত্রবাণীর মূলে যে কল্যাণবাঞ্ছা নিহিত, তার আলোকেই কালান্তরে ও দেশান্তরে শাস্ত্রকে প্রয়োগ করতে হবে। শাস্ত্রের চিরন্তনতার ভিত্তি এখানেই।

ইসলাম মানবতার বাণীবাহক বলে মুসলমানরা বড়াই করে। অথচ মানবতার নামে মানববাদীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে মুসলমানদেরই অনীহা বেশি। আরো আশ্চর্য, এ অনীহা প্রকাশ করে ধর্মের দোহাই দিয়ে। কোটি কোটি নিঃস্ব মানুষের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে মানবতার নামে মানববুদ্ধির কাছে বিবেকবান মানববাদীর এ আবেদনে অশাস্ত্রীয় অনাচার কী আছে যে ডাক শুনেই ধার্মিক মানুষেরা মুখ ফেরায়! অথচ এর মধ্যে দুর্বোধ্য কোনো মারপ্যাঁচ নেই। 'কেড়ে বাঁচা, শুষে বাঁচা, মেরে বাঁচার পথ ছেড়ে দাও, বণ্টনে বাঁচো এবং তোমার আত্মীয়-পড়শী মানুষকে বাঁচাও। নিজেও বেঁচে থাকো, অন্যকেও বাঁচতে দাও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদিনার আদি মুসলিম সমাজের আলোকে দেখলে এ আহ্বানে অসঙ্গতি কোথায়, এ আবেদনের কোন্ তত্ত্ব অ-ইসলামি!

কুরআনে আল্লাহ বারবার বলেছেন—পার্থিক ধন কোনো সম্পদই নয়। এর রূপ আছে, জৌলুস আছে, কিন্তু গুণ নেই, গন্ধ নেই—যদি তা পরার্থে ব্যয়িত না হয়। 'যে ধনে হইলে ধনী, মণিরে না মানে মণি' সেই পারত্রিক ধন হচ্ছে আর্তমানবের সেবায় নিয়োজিত সম্পদ। ইসলামি সদাচারের প্রধান আচার হচ্ছে—অভাবগ্রস্তের দুঃখ মোচন। সরকারি কর্তৃত্বে ধনবণ্টনই এ-যুগের যাকাত! সামাজিক জীবনে 'সকলের তরে সকলে আমরা' এ তত্ত্ব ভুল্‌লে চলে না।

যে-কোনো নিরিখে কুরআনের বাণী যাচাই করলে দেখা যাবে মানুষকে ভালোবাসাই আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আর ভালো না বাসলে সেবা করার প্রেরণা আসে না। সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টা-প্রেম জাগানো যেমন সম্ভব, তেমনি স্রষ্টা-প্রীতিবশে তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসাও সহজ। এবং পরিণাম অভিন্ন। আর ভালোবাসার জনকে অদেয় কী থাকে?

এখন হয়তো বিতর্কের আশঙ্কা না করেই বলা চলে—মানুষের কল্যাণকামিতাই সদাচর। যে মানুষের কল্যাণকামী, অপরের মঙ্গলবাঞ্ছা যার অন্তরে সদা উপস্থিত, সে কোনো অন্যায়-অপকর্ম করতে পারে না। এমন নীতিনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ সদাচারী মানুষই আল্লাহর অভিপ্রেত। অতএব, মানবকল্যাণকামী গণহিতৈষী মানুষই কুরআন-কাম্য সমাজবাঞ্ছিত সদাচারী মানুষ। এই মানবকল্যাণকামিতাই তো মানবতা, মানবপ্রেম, মানববাদ এবং মনুষ্যত্ব। সুতরাং মনুষ্যত্বের আর এক নাম সদাচার।

AMARBOI.COM

নাগরিক সহিষ্ণুতা

জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের প্রভেদ-জাত ঘৃণা-বিদ্বেষ-বৈর মানুষের অশেষ অকল্যাণ করেছে। মানুষের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসকে করেছে কলঙ্কিত। মনুষ্যমানসের, মনীষার ও সমাজের বিকাশকে করেছে ব্যাহত। মানুষের জীবনকে করেছে শঙ্কাকাতর, বিঘ্নসঙ্কুল, ত্রাসময় ও ভয়াতুর। এই ঘৃণা-বিদ্বেষ-বৈরের শিকার হয়ে অকালে অপমৃত্যুর কবলে পড়েছে কোটি কোটি মানুষ।

সাড়ে চার হাজার বছর আগেকার মিশরে গোত্র-দ্বেষণা বশে ইসরাইলদের ক্রীতদাসেরও অধম করে রাখা হয়েছিল। ফেরাউন গোত্রীয়রা তাদেরকে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। বাধ্যতামূলক অমানুষিক পরিশ্রমে তাদের জীবনটাই ছিল যন্ত্রণা-বিশেষ। এমনকি ইসরাইলদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে একসময় শাসকগোষ্ঠী আইন করে তাদের পুত্রসন্তানদের বাঁচিয়ে রাখার অধিকার হরণ করল। মুসার জন্ম এই সময়েই। এজন্যেই তাঁকে সিন্দুকে পুরে নীলনদে ভাসিয়ে দেয়া হয়। আর ভাগ্যবলে তিনি লালিত হন স্বয়ং বাদশাহ ফেরাউন ঘরে। এখানেও কৃষ্ণ-কংসের সে বৃত্তান্ত—'তোমাকে বধিবে যে, প্রসাদে বাড়িছে সে'। মুসার নেতৃত্বে ইসরাইলরা মিশর থেকে পালিয়ে দুঃসহ নির্যাতন থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এদের হিযরতের ফলে ফারাউ এবং মিশরীয়রাও দুর্ভোগ থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। মুসার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চাদ্ধাবনকারী মিশররাজ ফেরাউ সসৈন্যে লোহিত সাগরে ডুবে মরেছিলেন তা বাইবেলে-কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। অন্য তাৎপর্যেও মিশরীয়রা ডুবেছিল। কারণ, ইসরাইলদের দেশত্যাগের ফলে অকস্মাৎ চাষী-মজুরের নয় শুধু, সর্বপ্রকার প্রকৌশলীর—কামার-কুমার-ছুতার -ওস্তাগার প্রভৃতিরও অভাব ঘটেছিল, দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দুর্লভ হল, দেখা দিল আর্থিক বিপর্যয়। সম্ভবত এর ফলে সমকালীন দুর্বল ফারাউ বংশ রাজ্যচ্যুত হয় এবং প্রতিবেশী রাজ্যের কেউ মিশর মসনদ দখল করে।

আশ্চর্য আদিপুরুষ আব্রাহাম থেকে ইসরাইলদের যে ভাগ্য বিপর্যয়ের শুরু, আজো তার অবসান হয়নি। আজ অবধি তার জের চলছে যেন এক অলৌকিক নিয়মেই। আব্রাহাম ব্যাবিলন থেকে বিতাড়িত হয়ে ফিলিস্তিনে ও মক্কায় বাস করেন। তারপর তাঁর প্রপৌত্র ইফসুফ ক্রীতদাসরূপে মিশরের মহামন্ত্রী 'আজিজ মিসির'-এর কাছে বিক্রীত ও পরে মিশর-রাজ ফারাউর উজির পদ লাভের পর দুর্ভিক্ষের সময় পিতা ইয়াকুব ও ভাইদের মিশরে নিয়ে যান। ইয়াকুবেরই খেতাব হচ্ছে ইসরাইল (আল্লাহ্‌র সৈনিক)। সেই থেকে ইয়াকুবের বারো সন্তানের বংশধরেরা দ্বাদশ শাখায় বনি-ইসরাইল নামে পরিচিত। এরাই মুসার নেতৃত্বে মিশর থেকে পলায়ন করে আবার ফিলিস্তিনে অধিবাস নির্মাণ করে। এখানে থেকে তাদের বন্দি করে আবার নিমেভায় নিয়ে যান সম্রাট নেবুকাদনেজার। পারস্য-সম্রাট সাইরাস তাদের পুনরায় স্বদেশে পুনর্বাসন দান করেন। এরপর ৭৮ খ্রিস্টাব্দে রোমানেরা তাদের আবার বিতাড়িত করে। সেই থেকে আজ অবধি এশিয়া-ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তারা কুকুরের মতো তাড়িত হয়ে ঘুরছে। এবং পুরোনো ফিলিস্তিনেই বৃটিশ, ফরাসি ও আমেরিকার রাজনৈতিক চালের ঘুঁটিরূপে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রে ওরা স্থিতি ও সংহতি লাভ করে। ইহুদি জাতির জীবনে স্বল্পকালীন সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় ঘটেছিল ইহুদি রাজ দাউদ সোলেমানের রাজত্বে।

চার হাজার বছর ধরে ইসরাইলদের ঠিকানাহীন নির্যাতিত যাযাবর জীবনের জন্যে ইহুদিদের আত্যন্তিক স্বাতন্ত্র্যবোধই দায়ী। তাদের দুর্ভোগের উৎস তাদের অনুদারতা ও অসহিষ্ণুতা। সেই ফারাউ'র আমল থেকে নির্যাতিত হয়ে হয়ে তারা বাঁচবার অবলম্বন করেছে গোত্রীয় সংহতি ও বিজাতিবৈরকে। সেই ঐতিহ্য নিত্য স্মরণের ফলে ভিন্ন গোত্র, সম্প্রদায় ও জাতির প্রতি তাদের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঘৃণা কখনো ঘুচেনি, তাই তারা অন্তরে অসহিষ্ণু এবং রক্ষণশীল। এ দুটোই একাধারে নির্যাতিত হওয়ায় কারণ ও প্রসূন, বীজ ও ফল।

অপরকে বন্ধু করতে তারা কখনো চায়নি। কূর্মস্বভাবের ইহুদিরা চিরকাল ব্যবধানের কঠিন প্রাচীরের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়াসী ছিল। এর ফলেই তারা বাস্তুচ্যুত হয়েও স্থিতিহীন জীবনে আচারিক স্বাতন্ত্র্য ও গোত্রীয় রক্তের অবিমিশ্রতা আজো রক্ষা করতে পেরেছে। এরা পৃথিবীব্যাপী বিচরণ করেও জিপসীদের মতো স্পর্শকাতর, সাঙ্কর্য ভীরু, স্বাতন্ত্র্য গৌরবগর্বী ও রক্ষণশীলতার মহিমা-মুগ্ধ। নইলে ইহুদি মনীষার উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে ও চার হাজার বছর ধরে তারা পাথুরে পর্বতের মতো বজায় রেখেছে তাদের অস্তিত্ব, তাদের ধর্মশাস্ত্র কিংবা আচার-প্রথা-পদ্ধতি- রেওয়াজ রেখেছে চালু। বলতে গেলে, মানব-মনীষার যে-আধুনিক ইউরোপীয় বিকাশ তার ঔজ্জ্বল্যে, উৎকর্ষে ও বিস্ময়করতায় মানুষকে চমকিত ও উপকৃত করেছে, তার অনেকটাই ইহুদি মনীষার দান। কার্লমার্কস-ফ্রয়েড-আইনস্টাইন এই তিনজন যুগস্রষ্টাই ধর্মে ইহুদি, গোত্রে ইসরাইল ও রক্তে সামীয়। কিন্তু তবু জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের উর্ধ্বে উঠে মানুষকে মানুষরূপে এবং কোনো বিধর্মীকে স্বজাতিরূপে এবং ভিন্ন রক্তের মানুষকে স্বজন বলে গ্রহণ করতে চায়নি বলে তাদের দুর্ভোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনো ঘুচেনি। পোল্যান্ডে জার্মানিতে রাশিয়ায় ইহুদি নির্যাতন এ শতকের বেদনাদায়ক ঘটনা। আত্মরতি ও আত্মকেন্দ্রিকতা ইহুদির জন্যে কখনো কোথাও মঙ্গলকর হয়নি, কেবল মারাত্মক, দুঃখজনক ও ক্ষতিপ্রসূই হয়েছে।

গ্রিকদের নগররাষ্ট্রে কেবল ভদ্রলোকদেরই অধিকার ছিল। দাসাদির কোনো নাগরিক অধিকার কিংবা সামাজিক দাবি ছিল না, এমনকি তাদের মানবিক অস্তিত্বও ছিল অস্বীকৃত। তার ফলে ওরা কখনো ভদ্রসমাজের স্বজন হয়ে ওঠেনি।

ধনবলে ও বুদ্ধিবলে ভদ্রলোকেরা অনেককাল প্রভুত্ব করলে ঐ কৃত্রিম শক্তির উৎস একসময়ে শুকিয়ে যায়। রোম-সাম্রাজ্যও গড়ে ওঠে ভদ্রলোকের উচ্চাভিলাষের প্রসূন হিসেবে। এখানেও অন্যদের অধিকার ছিল অস্বীকৃত। তাই একসময় ভদ্রগোষ্ঠীর ঐক্যবল ও বহুবল যখন নিঃশেষিত হল, তখন খ্রিস্টধর্মের দোহাই দিয়েও রাজ্যরক্ষা সম্ভব হল না। যদিও এই সেদিন অবধি নামসার 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' বাগর্থে বজায় ছিল। দেশের সম্পদে ও সমস্যায় দেশের অধিবাসীদের একটা Sense of Participation না থাকলে, তার অধিকার স্বীকৃতি না পেলে তার দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা জাগে না। পুরুষানুক্রমে বাস করেও সে থাকে স্বদেশে প্রবাসী। সঙ্গে থেকেও দেশের লোক তার সঙ্গী ও স্বজন হয় না, পাশে থেকেও হয় না পড়শী। সমস্বার্থের না হলে সহানুভূতি থাকে অলভ্য। তাই মনিবের বিপদকালে বান্দা ছিল উদাসীন অবিচল।

এ যুগেও দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রের মানুষ জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের ভিত্তিতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উৎসুক। এ যে আত্মহননের নামান্তর, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য হলেও তাদের হৃদয়বেদ্য হয় না। দেশে বা রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় স্বার্থবশে জনবলের দাপট দেখিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর ওপর দৌরাত্ম্য করে। ওদেরকে সম্পদ, সুযোগ ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে এক বর্বর আত্মপ্রসাদ লাভ করে। আবার ধনবলে ও অস্ত্রবলে বলবান সভ্যতাভিমানী ও বর্ণ-গৌরব-গর্বী সংখ্যালঘুও দুর্বল দরিদ্র সংখ্যাগুরুর উপর দানবিক দাপটে প্রভুত্ব করবার পৈশাচিক প্রেরণাও পোষণ করে। প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা রোডেশিয়া।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান আজকের স্বাধীন ও সচেতন মানুষ জীবিকার ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা ও সুবিচার প্রত্যাশী। সম্পদে অধিকার ও আর্থিক সাচ্ছল্যকামী মানুষ আজ সম্পদ ও জীবিকার ক্ষেত্রে একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, অদৃষ্টবাদে আস্থা নেই বলে বঞ্চনা ও ব্যর্থতা মাত্রই তাদেরকে সংঘাতে ও সংঘর্ষে উৎসাহিত করে। এই আর্থিক জীবন-জাত ঈর্ষা-অসূয়া-বঞ্চনা জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের প্রভেদপ্রসূত অনৈক্যের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাই আজ দুনিয়ার সর্বত্র বর্ণ ও ধর্ম দ্বেষণার আবরণে বঞ্চক বঞ্চিতে, শোষক শোষিতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই আছে। আফ্রিকায় গোত্রবিদ্বেষ,আমেরিকায় বর্ণবৈর, এশিয়ায় ধর্মদ্বেষণা, ইউরোপে মুখ্যত জাতিবিদ্বেষই আজ মানুষের হাতে মানুষের দারুণ দুর্ভোগের কারণ। আজকের উত্তর আয়ারল্যান্ড, সাইপ্রাস, ইসরাইল ও ফিলিপাইনে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা গণহত্যার উত্তেজনা যোগাচ্ছে।

দুনিয়ার কোনো কোনো রাষ্ট্রে নাগরিক নির্বিশেষের অধিকার-সাম্যের ও অপক্ষপাত সুযোগ-সুবিধার সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকলেও কার্যত জাত-বর্ণ-ধর্মের সংকীর্ণ চেতনা-মুক্তি সেখানেও সুলভ নয়। সেসব রাষ্ট্রেও গণমনে বর্ণ-নিরপেক্ষতা কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতা দুর্লক্ষ্য। মুখের কথা বুকের সত্য হয়ে না উঠলে নিষ্ফল হয়। প্রত্যয়হীন প্রতিশ্রুতি প্রাপ্তির কোনো প্রত্যাশাই জাগায় না। তাই আজো ঘরে-বাইরে কোথাও দুর্বলের ও সংখ্যালঘুর স্বস্তি-শান্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। তার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা নেই কোথাও। পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যয়হীনের প্রতিজ্ঞা গুরুত্ব ও গণ-আস্থা হারিয়েছে। সরকারের গালভরা আশ্বাসে ত্রস্ত মানুষ আশ্বস্ত হয় না। ফাঁকাবুলির ফাঁকিতে প্রতারিত হবার লোক আজকের দুনিয়ায় সত্যি দুর্লভ। দুরাত্মা প্রবলের উপদ্রবে মানবতা ও মানবিক আচরণ বিরলদৃষ্ট হয়ে উঠেছে। স্ববর্ণের, স্বদলের, স্বমতের না হলেই মানুষ ঘৃণ্য ও পরিহার্য—এই অমানবিকবোধ, এ বর্বরযুক্তি, এ জৈব-প্রেরণা সমাজের অধিকাংশ মানুষের চেতনা যতদিন আচ্ছন্ন রাখবে, ততদিন মানুষের ওপর মানুষের এই বর্বর ও দানবিক হামলার অবসান নেই।

মুসলমানদের আচরণে যদিও অনুপস্থিত, কিন্তু অন্তরে যেন ঐ স্বাধর্ম্য চেতনাজাত মধ্যযুগীয় গড্ডলিকা-স্বভাব একটু প্রবল। তারা কথায় কথায় মুসলিম-স্বাজাত্য গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দুনিয়ার যে-কোনো যুগের ও যে-কোনো মুসলিমের বা মুসলিম দেশ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে মমত্বের ও আপনত্বের বন্ধন অনুভব করে। বাহ্যত এটি সদগুণ ও ইসলামের দান বলে মনে হয় বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, হীনম্মন্যের কাঙালচিত্তে এর উদ্ভব ও স্থিতি। তাই তারা দেশান্তরে ও কালান্তরে স্বজাতি ও স্বজাতির গৌরব খুঁজে বেড়ায়।

মুসলিমদের উত্থান-যুগে কোনো দেশের বা গোত্রের মুসলমান দেশান্তরে কিংবা কালান্তরে এমনি আত্মীয় খুঁজে মানসবিচরণ করেনি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের সাড়ে তেরোশ বছরের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। আজকের দিনে খ্রিস্টানরা কিংবা বৌদ্ধরা তাদের স্বজাতির রাষ্ট্র-সংখ্যায় গৌরব প্রকাশ করে না; কিংবা আপদে-বিপদে স্বধর্মীর কাছে করুণ আবেদন জানায় না। কেবল মুসলমানদের মধ্যেই এ প্রবণতা প্রবল। তাই স্বদেশী মুসলিমদের স্বদেশের নয়, বিদেশী স্বধর্মীর গৌরবগর্ব স্তন্যবঞ্চিত তৃতীয় ছাগশিশুর উদার আনন্দ স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ, এ যদি যথার্থ চিত্তোৎকর্ষের পরিচায়ক হত, তাহলে আজকের মুসলিমের গ্রাম্য কিংবা শহুরে সমাজে, দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে সংহতি ও সদিচ্ছা সর্বত্র দেখা যেত। আরো প্রমাণ, মুসলিম হয়েও পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর আফ্রিকার উঠতি মানুষ আজ যদিও ইসরাইল বিদ্বেষবশে আরব জাতীয়তায় আস্থাবান, তবু রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্যে অটল ও আপসহীন। ইরানীরা আর্যগৌরবে আপ্লুত, তুর্কিরা দৈশিক স্বাতন্ত্র্যে স্বস্থ।

আজকের পৃথিবীতে এমন কোনো প্রান্ত নেই, এমন কোনো অঞ্চল নেই, এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যেখানে অভিন্ন বর্ণের, গোত্রের, ভাষার, ধর্মের কিংবা সংস্কৃতির লোক বাস করে। সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে সঙ্করতা ও বিভিন্নতা বিরাজমান। এই নানা জাত, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির লোক-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে কেবল সংখ্যাগুরুর কিংবা প্রবলের আধিপত্য ও ইচ্ছা অবাধ হলে অন্যেরা জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে মানবাধিকার-বঞ্চিত হয়। এজন্যই মানুষের পরিচয় হবে এ-যুগে জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষায় বা সংস্কৃতিতে নয়—একান্তভাবে মানুষ হিসাবেই। মানুষকে পছন্দ-অপছন্দ করা হবে তার দোষ-গুণের ওজনে—জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে নয়। লোকালয়ে মানুষের একমাত্র পরিচয় হবে কেবল লোক হিসেবে। জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা থাকবে ব্যক্তিমনের ও অঙ্গের ভূষণ কিংবা কলঙ্ক, আবরণ কিংবা আভরণরূপে। অন্য মানুষের বৈষয়িক স্বার্থে কিংবা ব্যবহারিক প্রয়োজনে তা বাধা হয়ে থাকবে না। ভেদবুদ্ধিজাত দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, অসূয়া মূলত স্বহিতৈষণায়, আত্মকল্যাণেই মন থেকে মুছে ফেলে মানুষকে পড়শী ও সহচর-সহযোগীরূপে গ্রহণ করে বাঘে-ছাগে একঘাটে জল খাওয়ার মতোই সবাইকে বুৎপত্তিগত অর্থেই সতীর্থ হতে হবে। পার্থক্য শুধু এই, বাঘে-ছাগে সহ-অবস্থান করে নিষ্ঠুর প্রভুর পীড়নভয়ে, আমরা চাই মানুষ সহ-অবস্থান করুক স্ব স্ব আত্মহিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঞ্ছায়—সুবিবেচনার প্রেরণায়, মানবিক বোধের ফলপ্রসূ অনুশীলনে, মানবিক মূল্য-চেতনার প্রাবল্যে, মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবশে, মানুষের সম্মান রক্ষার আন্তরিক তাগিদে এবং মানবাধিকারের গুরুত্ব নিষ্ঠাবশে।

তাছাড়া দেশ আজ আর কোনো রাজার রাজ্য নয়, রাজ্যও আজ আর রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, রাষ্ট্র আজ জনগণের এজমালি স্বত্ব। তাই এর রক্ষণ ও ঋদ্ধি নির্ভর করে প্রতিটি নাগরিকের অধিকারবোধ, দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধির ওপর। অধিকার-বঞ্চিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বা শ্রেণীর নাগরিকের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণের ও কর্তব্যকরণের প্রেরণা থাকে অনুপস্থিত। ঘরের লোককে, পরিজন-পড়শীকে পর করে রাখলে তার মন সহানুভূতি হারিয়ে বিরূপ হয়ে ওঠে, দুর্ব্যবহার ও বঞ্চনায় বিষিয়ে ওঠে তার মন। বিপদকালে সে সুযোগমতো শত্রুর সহযোগিতা করে প্রতিহিংসাবশে ও প্রতিশোধ লিপ্সায়। আর কে না জানে গৃহশত্রুকে প্রতিরোধ করার শক্তি আজো অনায়ত্ত, অস্ত্র আজো অনাবিষ্কৃত। অথচ কেবল প্রীতি ও শুভেচ্ছা দিয়েই ওদের আপন করা যেত; আত্মীয়, বন্ধু, মিত্র হয়ে উঠত সবাই। আর প্রীতি ও শুভেচ্ছায় ক্ষতি নেই কিছুই.লাভ যা হয় তা দুনিয়ায় দুর্লভ। আত্মকল্যাণেই আমাদের দেশে আজ নেড়ে-মালাউন-পাষণ্ডকে একঘাটে জল খেতেই হবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'অপমান' কবিতা স্মর্তব্য: 'যারে তুমি নিচে ফেল... সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

অন্তত সহিষ্ণুতার অনুশীলনে আজ মানুষের বড় প্রয়োজন।—পীড়ন-সংঘাত থেকে 'নইলে নাহিরে পরিত্রাণ।'

AMARBOI.COM

সমস্যা ও সহিষ্ণুতা

ধর্ম ও ধর্মবোধ কল্যাণকর কি-না তা নিয়ে তর্ক করা বৃথা। কেননা হাজার হাজার বছর ধরে ব্যাখ্যা, নিরীক্ষা ও পরীক্ষায় তার সুফল প্রমাণিত হয়েছে। চিরকাল মানুষ ধর্মকে ধারণ করেই বেঁচেছে—তা Paganism হোক আর Religion হোক। রাজনৈতিক মতাদির মতো এটিও একটি জীবন ও জীবনযাত্রা সম্পর্কিত মত, যা জীবনে ভয়-ভরসার ক্ষেত্রে আবশ্যিক ও অপরিহার্য বলে অনুভূত হয়। কথায় বলে 'যত মন তত মত'। কাজেই দুনিয়ায় জীবনের ও জীবিকার কোনো ক্ষেত্রেই অভিন্ন মত কখনো গড়ে ওঠবে না। গোত্রীয় জীবনে জ্ঞাতিত্বচেতনা এবং পরবর্তীকালে স্বধর্মীর ঐক্যবোধ ও আঞ্চলিক সীমায় নিবদ্ধ যন্ত্রবিরল জীবনে যৌথ প্রয়াস আত্মরক্ষার ও জীবিকা অর্জনের সহায়ক হয়েছে। কাজেই এগুলোর স্থানিক ও কালিক উপযোগ যে ছিল তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

আধুনিককালে দৈশিক, ভাষিক ও রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা ও জাতীয়তাবোধ গভীর, ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হয়েছে। একালে গোত্রীয় জাতীয়তা অচল, কেননা সামাজিক, আর্থিক, ধার্মিক, দৈশিক, ভাষিক ও রাষ্ট্রিক জীবন গোত্রগত নয়, —সঙ্কর। ধর্মীয় জাতীয়তাও অচল, কেননা দেশে বা রাষ্ট্রে কেবল এক ধর্মাবলম্বী লোক দুনিয়ার কোথাও বাস করে না। ভাষিক জাতীয়তাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবিধাজনক নয়। কারণ কেবল অভিন্নভাষী দিয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্র বিরল। যদিও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে দৈশিক জাতীয়তা সুফলপ্রসূ, কিন্তু বৃহৎ রাষ্ট্রে তা অচল। কাজেই রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধই কাম্য। কারণ এর গ্রহণ শক্তি অশেষ, বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাকে ঠাঁই করে দেয়ার সামর্থ্য কেবল এরই আছে।

মন যখন আছে মতও থাকবেই। এবং ব্যক্তিগত মত পোষণ করার অধিকার ও স্বাধীনতা এ-যুগে কার্যত না হোক—বচনত স্বীকৃত। কাজেই ধর্মমত, সামাজিক মত, নৈতিক মত, বৈষয়িক মত, রাজনৈতিক মত প্রভৃতি জীবন ও জগৎ সংশ্লিষ্ট অসংখ্য মত-সমষ্টিই জীবন-চেতনা—ব্যক্তিগত জীবনানুভূতি। এবং জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে অনুভূত চেতনাই জীবন। অতএব অনুভবের সমষ্টিই জীবন। এই অনুভূতি জাগে স্থান-কালের পরিবেশে ব্যক্তিগত বোধ, বুদ্ধি, রুচি ও স্বার্থচেতনা থেকে। বাইরের ধমকে, শাসনে কিংবা উপদেশে, পরামর্শে তা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা বদলানো যায় না।

এমনিতে প্রকৃতির পীড়নে মানুষ মরছে, পর্যুদস্ত হচ্ছে। রোগ-জরা-মৃত্যু, আগুন-পানি-ঝড়, উষ্ণতা-শৈত্য-কম্পন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপদ্রবে মানুষের জীবন চিরকাল দুঃখ, বিপদ ও যন্ত্রণাময়। এ সবের প্রতিকার হাতে নেই বলে অসহায় মানুষ চোখ-মুখ বুজে সহ্য করে এবং একপ্রকারের আধ্যাত্মিক প্রবোধ পাবার চেষ্টাও করে। কিন্তু মানুষের বারোআনা দুঃখ আসে অপর মানুষের থেকে। এই দুঃখে-পীড়নে মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে পায় না; তার মনে ক্ষোভ জাগে, প্রতিকার-শক্তির অভাবে যন্ত্রণা গভীর হয়ে আঘাত হানে। ব্যক্তিগত স্বার্থে পীড়ন তো আছেই। ব্যক্তিস্বার্থে ও অসহিষ্ণুতায় যে নির্যাতন তা কালে-কালান্তরে চালুও থাকে। দলগত স্বার্থে যে নির্যাতন, তা-ই মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন বিষিয়ে তোলে। এ পীড়ন আসে মতবাদী থেকে। তাই এ আরো ভীষণ। ব্যক্তির পীড়ন থেকে পলায়নের পন্থা আছে। দলীয় পীড়ন এড়ানোর উপায় নেই। কেননা অসহিষ্ণু ঈর্ষ্যু মতবাদী সর্বদা ও সর্বদা নির্যাতন-নিষ্ঠ।

স্বধর্মী না হলেই পর, স্বদেশী না হলেই শত্রু, স্বমতের না হলেই প্রতিদ্বন্দ্বী–এমন একটি অসুস্থ বদ্ধমূল ধারণাজাত দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করে সে তার চারদিককার মানুষকে। যে তার ধারণার যাথার্থ্যে নিশ্চিত—তার সে নির্ভুল ধারণা কোনো যুক্তিতর্কেই বদলে দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দুনিয়াতে এই মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক। তাই পৃথিবীতে হানাহানির অন্ত ছিল না কখনো। এ ব্যাপারে কালান্তর ঘটেনি। তাই প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বলে কোন যুগবিভাগ নেই এর ইতিহাসে। আরো আছে—স্ববর্ণের না হলে ঘৃণ্য, স্বশ্রেণীর না হলে অবাঞ্ছিত, স্বভাষার না হলে পরিহার্য। এভাবে দুনিয়া জুড়ে ধর্মমতবাদী, রাজনৈতিক মতবাদী ও জাতীয়তাবাদীরা দ্বন্দ্ব-কোন্দল জিইয়ে রেখেছে। মানুষের ইতিহাস এই সংঘর্ষ-সংঘাতের রক্ত-বর্ণে লিখিত ইতিহাস। বেদনার কথা এই যে ব্যক্তিস্বার্থের যে কোন্দল-পীড়ন তার মধ্যে লোভের বিষয় থাকে এবং তার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়। কিন্তু দলীয় কোন্দল ফলাকাঙ্ক্ষা নিরপেক্ষ, তাতে শুধু ঈর্ষা-অসূয়াবৃত্তিই চরিতার্থ হয়—তাতে জানে-মালে ক্ষতি যা হয় তা অমূল্য।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন—"তোমরা পরস্পরকে জানবে অর্থাৎ জানতে উৎসুক হবে—এই উদ্দেশেই আমি তোমাদেরকে বহু সম্প্রদায়ে ও পরিবারে বিভক্ত করেছি।" কিন্তু এই কি জানার রীতি ও পন্থা!

আশ্চর্য রক্তে আগুনে এই বিবাদ ঘটে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদের পার্থক্যে। অথচ তিনটেই মানব-মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত ও সৃষ্ট। বিবাদে মহৎ চিন্তা, কর্ম ও আদর্শ সংরক্ষণের কী জঘন্য উপায় ও মনোবৃত্তি! বাদী-প্রতিবাদী শক্তির এ লড়াই মানুষের জীবনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল ক্ষতির কারণই হয়েছে, বারবার অভিশাপরূপেই নেমে এসেছে, বিজয়ী-বিজিত কারো জীবনেই আশীর্বাদ হয়ে ওঠেনি।

ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত ও মতবাদের অস্তিত্ব ও সহ-অবস্থান যে কোনো মানুষের অকল্যাণ করে, তা নয়। কেবল প্রবলপক্ষ পছন্দ করে না বলেই তা অন্যায়, অনুচিত ও অবাঞ্ছিত। সর্বগ্রাসী আধিপত্যকামী মনের ঈর্ষা, অসূয়া ও অসহিষ্ণুতাই এর জন্য দায়ী। তবু বাহ্যত বিবাদ ও পীড়ন শুরু হয় মানব-হিতৈষণার নামে। হিতৈষণার এত বীভৎস বিকৃতি কল্পনাতীত।

ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ভাষাবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ আজ পৃথিবীব্যাপী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ-দুনিয়ার কোথাও শান্তি নেই। অথচ জনবহুল দুনিয়ায় আজ মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করাই দুঃসাধ্য হয়েছে। মানুষের বলবুদ্ধি সেই মানবিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত হওয়াই উচিত, কারণ এই গুরু সমস্যা সবাইকে স্পর্শ করে, প্রত্যেকের স্বার্থের সঙ্গে—বাঁচা-মরার সঙ্গে তা সংলগ্ন। জ্ঞানপ্রবুদ্ধ এযুগেও কত তুচ্ছ ও অবাঞ্ছিত বিষয়ে মানববুদ্ধি ও শক্তি অপচিত হচ্ছে।

ধর্ম, বর্ণ, জাত ও ভাষার ভিত্তিতে মানুষকে চিহ্নিত করার ইতরতা পরিহার না করলে মানুষের এই দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি নেই। সহ-অবস্থানের নীতিতে দীক্ষিত হয়েই মানুষ আত্মার এই গ্লানি মোচন করতে পারে—এই সর্বনাশা ব্যাধি হতে মুক্ত হতে পারে। অবশ্য শ্রেণীবিদ্বেষের মতো ধর্ম, বর্ণ, জাত ও ভাষা-বিদ্বেষের মূলেও অর্থনৈতিক কারণ ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ স্বার্থ ও শোষণের তত্ত্ব এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে তা সাধারণের পক্ষে অবচেতন ও পরোক্ষ প্রেরণা। অবশ্য নেতাদের কথা আলাদা। সচেতন প্রেরণা আসে অপ্রেম ও অসহিষ্ণুতা থেকে। এও দেখা যায় যেখানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও ভিন্ন মতবাদীর সংখ্যা নগণ্য, সেখানে একপ্রকার ঔদাসীন্য ও অবহেলা উপেক্ষা ও সহিষ্ণুতার রূপ নেয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অসহিষ্ণুতা এবং তজ্জাত দ্বন্দ্বপীড়ন শুরু হয় মতবাদীর সংখ্যাসাম্যে বা অনুপেক্ষণীয় সংখ্যার ভিন্নমতবাদীর উপস্থিতিতে। হয়তো এই দল-চেতনার গভীরে স্বার্থবোধ ও পরস্ব হরণের লিপ্সা নিহিত থাকে। অতএব জাতি, বর্ণ, ধর্ম ও ভাষাবিদ্বেষের আড়ালে সেই আর্থিক ঈর্ষাই ক্রিয়া করে। আর ঘরোয়া জীবনেই এর উদ্ভব। বাল্যকাল থেকেই পরিজনদের কাছে শুনে-শুনে মানুষকে জাতে, ধর্মে, বর্ণে ও শ্রেণীতে চিহ্নিত করে কথা বলতে শুরু করে বালকেরা। একটি লোক নয়—একজন হিন্দু বা মুসলমান কিংবা একটি ছেলে, একজন ভদ্রলোক, একটি বুড়ো—এই করে কথার শুরু।

যেমন রাস্তায় এক হিন্দু বলল, বাজারে নাকি ইলিশ মাছ আজ বারো আনা করে বিক্রি হচ্ছে।' মুসলমানে বা খ্রিস্টানে অর্থাৎ স্বধর্মীতে বললে যেন দামের তারতম্য হত ! এই অসচেতনভাবে ধর্ম বা জাত নির্দেশ করে কথা বলা, অবচেতন মনে এর এক প্রভাব পড়ে এবং তা অজান্তেই অনুদারতার জন্ম দেয়— মানুষকে মানববাদী হতে দেয় না। অথচ মানববাদী হওয়াই, মানুষকে সর্বাগ্রে মানুষরূপে মনে গ্রহণ করাই ছিল স্বাভাবিক। এভাবে নিজের অজ্ঞাতেই মানুষ অন্তরের মধ্যে বিভেদের অসংখ্য প্রাচীর তোলে। পারিবারিক সম্পর্কে যেমন আত্মীয়তাবোধ জাগে, তেমনি ঘরোয়া আবহাওয়ায় মনের বিদ্বেষও বিস্তার লাভ করে।

জাত, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ও শ্রেণীচেতনা মানুষকে কোনো মুক্তির দিশা, কোনো লক্ষ্যে উত্তরণের আশ্বাস দিতে পারে না। কেবল অমানবিক দোষে আচ্ছন্ন করে মাত্র। মানববাদই এ আত্মিক সঙ্কট ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যার সমাধান দিতে পারে। 'যত মন তত মত'—এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সত্য মেনে নিয়ে সহ-অবস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণুতা অনুশীলন করলেই জগতে ও জীবনে এ সমস্যা লোপ পাবে। কিন্তু মানুষকে কেবল নির্বিশেষ মানুষরূপে দেখার, জানার ও বোঝার দীক্ষা ঘরোয়া জীবন থেকেই শুরু হওয়া চাই। তাহলেই সহিষ্ণুতা আপনা থেকেই আসবে। পিতা-মাতার এ একটি বিশেষ মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। মানুষকে আজ বেঁচে থাকার গরজেই মানববাদী হতে হবে।

লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মানে গণ-আস্থাভাজন গণ-প্রতিনিধির শাসন। এক কথায় বলা চলে, নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা-তথা আইনের শাসন চালু রাখা, যাতে কারো স্বৈরাচার প্রশ্রয় না পায়। কাজেই শাসক-প্রশাসক যখন অজ্ঞাতে ভুল করেন কিংবা স্বস্বার্থে স্বেচ্ছায় অন্যায় করেন, তখন সে ভুল দেখিয়ে দেয়ার অথবা সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অধিকার জনগণের থাকা আবশ্যিক। নইলে গণতন্ত্র একটি বুলির সত্য হয়েই থাকে, বুকের ভরসা কিংবা নাগরিক জীবনে নির্ভরযোগ্য তথ্য হয়ে ওঠে না। অতএব নাগরিকের প্রতিবাদ করার, প্রতিকার প্রার্থনা কিংবা প্রতিরোধ করার আইনানুগ অধিকার স্বীকৃত না হলে এবং বাস্তবে প্রয়োগ করার নির্ভয়-নির্বিঘ্ন অধিকর না থাকলে গণতন্ত্র কখনো উদ্দিষ্ট ফলপ্রসূ হতে পারে না।

মানুষকে ভালো না বাসলে মানুষের সেবার প্রেরণা জাগে না, সেবার সদিচ্ছা না থাকলে কষ্টসাধ্য বিঘ্নসংকুল পথে নির্ভয়ে নিস্বার্থে সেবার জন্য এগিয়ে আসা কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ভালোবাসাই মানুষকে উদ্যোগী, নিষ্ঠ, সাহসী, ত্যাগপ্রবণ, সহিষ্ণু, প্রত্যয়ী, সংগ্রামী ও কল্যাণকামী করে। মানুষ নির্বিশেষের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধাবোধ, মানুষের কল্যাণকামিতা ও মর্যাদা-চেতনা তাই সেবাপরায়ণতার প্রথম শর্ত। সেবকের যোগ্যতা অর্জনের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে বুদ্ধিগ্রাহ্য বাস্তব প্রজ্ঞা—অর্থাৎ মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্বন্ধে বোধগত বাস্তব বিজ্ঞতা। তৃতীয় শর্ত হচ্ছে—যে-কোনো পরিণামের ঝুঁকি নিয়ে এমনকি প্রাণের বিনিময়েও নির্ভীক চিত্তে প্রতিকূলতার মধ্যে সদিচ্ছার রূপায়ণ প্রয়াসে নিরলস ও অবিরাম সংগ্রামে নিরত থাকা।

এমন মানবপ্রেমিক মানববাদী যখন গণতান্ত্রিক সংস্থায় শাসক ও প্রশাসক থাকেন, তখনই কেবল অনিচ্ছাকৃত ভুলের অজ্ঞতাপ্রসূত অপকর্মের প্রতিকার চাওয়া, প্রতিবাদ তোলা ও প্রতিকার করা নাগরিকের পক্ষে সম্ভব। নইলে শাসকগোষ্ঠী গোষ্ঠীস্বার্থে সুবিধে অনুযায়ী সুযোগমতো নাগরিকের Liberty-কে Licence এবং Licence-কে খরনবৎ্ বলে চালিয়ে দেন। নেতৃত্ব ও ক্ষমতাপ্রিয় শাসকরা সেবক হতে লজ্জাবোধ করেন, তাই শাসনপাত্রের প্রতিবাদী কণ্ঠের ঔদ্ধত্য তাঁরা সহ্য করেন না; অনুগতের সমর্থন, সহযোগিতা ও চাটুকারিতাই তাঁরা আশা করেন এবং দাবি করেন। দেশের সাধারণ ছাপোষা মানুষ অন্যায়-উৎপীড়নের অবিচার-অনাচারের প্রতিকার প্রার্থনায় কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধ প্রয়াসে উদ্যোগী হয় না। এতেই সেবকরূপী শাসকরা মনে করেন তাঁদের পেছনে গণসমর্থন রয়েছে, তাঁদের 'মিটিংকা বাত'রূপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তোকবাক্যে গণমন মুগ্ধ এবং এতেই বোবা মানুষকে তারা সম্মত ও সহযোগী মানুষ বলে ভুল বোঝেন। ফলে দু'চারজন—যাঁরা সমাজের বিবেকের ভূমিকা পালনে নিষ্ঠ—যখন দশের হয়ে অধিকার প্রার্থনা করেন কিংবা প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হন, তখন শাসকের স্বস্তিভঙ্গকারী বুদ্ধিজীবীদেরকে তাঁরা গণ-শান্তি-সুখের বিঘ্নস্রষ্টারূপে চিহ্নিত করে তাঁদের সাজা-শায়েস্তার ব্যবস্থা করেন—গণ-স্বার্থের নামে আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে। পীড়িত-শোষিত মূক মানুষের পক্ষ হয়ে যিনিই প্রতিবাদে মুখ খোলেন, তাঁকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যাত করেন, তখন তাঁরা স্বস্বার্থেই শাসক (rulers. regime. govt.). রাষ্ট্রকে (state) অভিন্ন সত্তায় প্রত্যক্ষ করেন। শাসকের (rulers) বিরুদ্ধাচারণ করলেও যে সরকারের (govt.) প্রতি আনুগত্যের অভাব হয় না কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী হবার কারণ ঘটে না, তা ক্ষমতাপ্রিয় গণসেবকরূপী শাসক মানতে চান না। তাই ল্যাটিন আমেরিকার ও আফ্রো-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে গণতন্ত্র বারবার ব্যর্থ ও বিফল হচ্ছে। যতদিন না গণপ্রতিনিধিরা নিজেদেরকে গণ-সেবক বলে আন্তরিকভাবে অনুভব করবেন এবং সরকারকে জনকল্যাণার্থ সমবায় সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করবেন, ততদিন গণতন্ত্রের সাফল্য ঐসব রাষ্ট্রে অসম্ভব; ততদিন ঐসব দেশে একনায়কত্ব কিংবা গনতন্ত্রের নামে দলীয় স্বৈরতন্ত্র চলতে থাকবে. সামরিক শক্তিই থাকবে দেশের মানুষের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা।

মানুষের রুচি-বুদ্ধি ও মন-মনন বিশেষ সাংস্কৃতিক স্তরে উন্নীত না হলে রাষ্ট্রিক ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিও কার্যত ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যক্তি-চরিত্রে ও ব্যষ্টিমননে মানবপ্রীতি, মানবিক মর্যাদা-চেতনা ও স্বাধিকারের সীমাবোধের উন্মেষ না ঘটলে রাষ্ট্রাদর্শ আসমানী বস্তু হয়েই থাকে—জীবনে প্রয়োগসাধ্য হয়ে ওঠে না। অপরের মনের ও মতের এবং আচার ও আচরণের প্রতি সহিষ্ণুতা ও শ্রদ্ধাবোধ না জাগলে; জগৎ ও জীবনকে, মানুষ ও মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব। কাজেই অপর মানুষের মন-মতের প্রতি, অপর মানুষের আচার-আচরণের প্রতি শ্রদ্ধার না হোক, অন্তত সহিষ্ণুতার দৃষ্টি প্রসারিত করতে না পারলে কোনো মানুষই অপর মানুষের সঙ্গে সমস্বার্থে সহযোগী হয়ে সমদর্শী পড়শীরূপে সদ্ভাবে ও শান্তিতে সহ-অবস্থান করতে সমর্থ হয় না।

আমাদের বুঝতে হবে, ধর্মমতও আর দশটি জাগতিক ও বৈষয়িক মতবাদের মতো জীবন-সম্পর্কিত একটি মত। পার্থক্য এই যে, ধর্মমতে ইহলোক-পরলোকে প্রসারিত জীবন সম্পর্কে আশৈশব লালিত একটি সামগ্রিক ও অপার্থিব চেতনা যুক্ত থাকে, অন্যান্য মত জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত এবং ক্ষুদ্র প্রয়োজন ও খণ্ডদৃষ্টি-প্রসূত। তাই অপরের সামাজিক, আচারিক, বৈষয়িক কিংবা দলীয় মতবাদের প্রতি সহিষ্ণু হওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সামাজিক ও আইনগত বাধার দরুন ঐ অসহিষ্ণুতা অন্তরে গোপন থাকে বটে; কিন্তু সুযোগ হলেই তা বীভৎসরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মতবাদ-অসহিষ্ণু রাজনৈতিক দলগুলো যখন কুৎসিত কোন্দলে লিপ্ত হয়, হানাহানির আগ্রহে মেতে ওঠে; তখন মানুষের মর্মমূলে প্রাণের মতো, রক্তের উষ্ণতার মতো যে-ধর্মসংস্কার আজন্ম লালনে দৃঢ়মূল হয়ে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে রয়েছে, তার বেলায় সহিষ্ণু ও সংযত হয়ে অন্য মানুষের সঙ্গে আপসে সহবাস করা স্বাভাবিক নয়। কাজেই নিজের মধ্যে শ্রেয়ঃবোধ ও মানবিক গুণের বিকাশ সাধন প্রয়োজন। আমি নিজের জন্য যে-দুঃখ, যে-বেদনা, যে-ক্ষতি, যে-পীড়ন, যে-পরপ্রভাব, যে-পরপ্রতাপ কামনা করিনে; অপরের জন্য সে-ব্যবস্থা কামনা করা অন্যায়—এই অঙ্গীকারে আস্থা রেখে যদি কোনো মানুষ তার সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, তাহলে কেবল সেই প্রত্যয়ী মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের বাঞ্ছিত নাগরিক হবার যোগ্য। মূলত মানববাদী না হলে অর্থাৎ ব্যক্তি-মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রীতিপরায়ণ না হলে কোনো মানুষই সংস্কৃতিবান সুনাগরিক হতে পারে না। আবার সংস্কৃতিবান না হলে কেউ সহজে সুবিবেচক হয় না। কাজেই বুনো মনের পরিশীলন ও পরিশুদ্ধি বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে আবশ্যিক। কেননা দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রাণীর স্বভাবসিদ্ধ, বলা চলে সহজাত। কাজেই বিশেষ নৈতিক ও মানবিক বোধের অনুশীলন ব্যতীত এসব জৈব-বৃত্তির কবলমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সযত্ন কৃত্রিম অনুশীলনেই কেবল মানবিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন সম্ভব। তার জন্য সদিচ্ছা ও সযত্ন প্রয়াস প্রয়োজন। আত্মিক শক্তির আধিক্য ও বিবেকবুদ্ধির শ্রেয়-চেতনার প্রাবল্যই কেবল এক্ষেত্রে সিদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে। তাই অন্তরে প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, মাধুর্য, কল্যাণ-চিন্তা, আত্মপ্রত্যয় ও সংযমের চাষ করা দরকার। আধুনিক পরিভাষায় হয়তো এককথায় বলা চলে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আস্থাবান হতে হবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাধিকার ও পরাধিকার সম্পর্কে সমভাবে সচেতন থাকতে হবে। স্বস্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন না করে কেউ স্বাধিকার দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করে না। সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সমদর্শিতার মাধ্যমেই যে কেবল পড়শীর সাথে সহাবস্থান সম্ভব—এই উপলব্ধি মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি ও গুরুত্ব-চেতনার প্রসূন।

AMARBOI.COM

ব্যক্তিত্বের প্রভাব

মানুষ মাত্রেই ভাবে এবং সচেতন ও অবচেতনভাবে অনেক কিছু অনুভব করে। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সবাই সবকিছু ভাবে না। মনের প্রবণতা অনুসারেই ভাবে, অর্থাৎ সে তার কৌতূহল ও আকর্ষণের বিষয় নিয়ে চিন্তা করে এবং স্পষ্ট ও অস্পষ্টরূপে অনেককিছুই অনুভব করে। ভাবে সবাই, কিন্তু লব্ধ তত্ত্ব ও অনুভূত তথ্য প্রকাশ করে মাত্র কৃচিৎ কেউ। অন্যের ঔদাসীন্য যেমন আছে, তেমনি অসামর্থ্যও রয়েছে। কবির ভাষায় :

সুর বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারি নে।

এই অর্থে প্রত্যেক মানুষই দার্শনিক। তার প্রয়োজনের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সেও তাত্ত্বিক। জগৎ ও জীবনের যেদিক তাকে আকৃষ্ট করে না, সে-সম্বন্ধে তার কোন চিন্তাভাবনাও নেই। এজন্য সবার সব তত্ত্বে জিজ্ঞাসা নেই, অনেক কথাতেই তাদের আগ্রহ নেই। কিন্তু যে-ভাবে যে-তত্ত্ব তার চেতনায় বিচরণ করছে ; কারো ব্যক্ত বাণীতে তা যদি সুপ্রকাশিত হয়, তাহলে সে সানন্দে সাড়া দেয়, অন্যের সমর্থন পেয়ে তার উপলব্ধ তত্ত্বের ও অনুভূত তথ্যের যাথার্থ্য সম্পর্কে সে হয় নিঃসন্দেহ।

অতএব অনুভবের জগতে মনের প্রবণতা অনুসারে কেউ-না-কেউ সচেতন বা অবচেতন মনে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট উপলব্ধি কিংবা অনুভব করেনি জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় তেমন কোনো নতুন ভাব-চিন্তা-তত্ত্ব নেই। সব যেন 'অতি পুরাতন কথা, নব আবিষ্কার।' এ কারণেই কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপাত নতুন কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতাদের কেউ-না-কেউ এর সৌন্দর্য, মাধুর্য ও তাৎপর্য মুহূর্তে উপভোগ ও উপলব্ধি করে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ভালো বলেই তা সে জীবনে আচরণ-সাধ্য সত্যরূপে গ্রহণ করে না। বুলির স্বীকৃতিতেই তার উপযোগ ফুরায়। অনুভূত তত্ত্ব ও তথ্যকে জীবনে আচরণযোগ্য সত্যে পরিণত করতে হলে ব্যক্তিত্বের প্রভাব প্রয়োজন। জেনেশুনে বুঝে ভালো কথা কম-বেশি সবাই বলতে পারে। কিছু-না-কিছু অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নেই তেমন মানুষ দুনিয়ায় দুর্লভ। তাদের মুখে এই পুরোনো পৃথিবীর মানুষ ভবের কথা, ভাবের কথা, মহৎ কথা, সত্য কথা, নীতির কথা, লাভের কথা, লোভের কথা অনেক শুনেছে, শুনবার মতো নতুন কথা সত্যি বিরল। কিন্তু শুনলেই যে মানতে হবে, তেমন কোনো অঙ্গীকার নেই। তাই কী বলছে তাতে মানুষ বিশেষ কান দেয় না, কে বলছে তাতেই তার আগ্রহ। একই কথা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বললে তার দাম অপরিমেয়, আর অন্যে বললে সে-কথার মূল্য কানাকড়িও নয়। কাজেই কথার মূল্য তার তাৎপর্যের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর বক্তার ব্যক্তিত্বের ওপর। বাক্য-বলের মতো বল নেই—যদি তা যোগ্য মুখ-নিঃসৃত হয়। ফকির-দরবেশ-সাধু-সন্তের সুপারিশ আল্লাহ শোনেন বলে যে সাধারণের বিশ্বাস, তাও এই ব্যক্তিত্বেরই স্বীকৃতি। জগতে মহাপুরুষ বলে খ্যাত ব্যক্তিরা যেসব বাণী উচ্চারণ করেছেন, তাদের সবগুলো যে সত্যগর্ভ, স্থানের ও কালের মাপে টেকসই মহৎ ও সর্বজনীন তত্ত্ব, তা নয়; তাঁদের অবিস্মরণীয় বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বই অর্থাৎ তাঁদের শ্রদ্ধেয়তাই তাঁদের বাণীকে দিয়েছে চিরন্তন সত্যের মর্যাদা এবং করেছে লোকগ্রাহ্য ও জীবনে আচরণ-সাধ্য।

অতএব, শাসনপাত্র ও অধীন মানুষ ছাড়া অন্য মানুষকে দিয়ে আদেশ, নির্দেশ উপদেশ, অনুরোধ, পরামর্শ পালন করাতে হলে ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন—বলা চলে একান্ত আবশ্যিক। একে নিঃস্বার্থে অন্যের অনুগত হয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই আর এ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয় নৈতিক শক্তির উদ্বোধনে ও অনুশীলনে। এই নৈতিক শক্তিই ব্যক্তিত্বের জনক। এরই নাম চরিত্র।

ভালোর প্রতি মানুষের স্বভাবতই একটা আন্তরিক আকর্ষণ রয়েছে। এইজন্য ভালো ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটা স্বাভাবিক আকুতি রয়েছে মানুষের চিত্তলোকে। মানুষ এই ভালোমানুষের টানেই ভালো হয়। ভালো কথা শুনে ভালো হয় না। ব্যক্তিত্বের প্রভাব ব্যতীত ভালো কথায় আকৃষ্ট হয়ে যদি মানুষ সদাচারী হত—তা হলে এতদিনে পৃথিবীটা স্বর্গসম হয়ে উঠত।

নৈতিক শক্তিপুষ্ট ব্যক্তিত্বে মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা কতখানি, তা হযরত মুহম্মদের জীবনে দেখতে পাই। হযরত যখন প্রথম ওহি পেলেন, তখন এই অলৌকিক ঘটনায় ও জিবরিলের চাপে তিনি বিমূঢ় ও ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পত্নী হযরত খাদিজা তাঁকে প্রবোধ দেবার ও আশ্বস্ত করার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন— 'আপনার শঙ্কিত হবার কারণ দেখিনে। আল্লাহ কখনো আপনাকে লজ্জিত করবেন না। কেননা আপনি আত্মীয়তা রক্ষা করেন, দুস্থের ভার বহন করেন, নিরন্নের অন্ন যোগান, অতিথি সৎকার করেন, সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।' আর একদিন হযরত তাঁর জ্ঞাতিদের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচারে আদিষ্ট হয়ে সাফা পর্বতের পার্শ্বস্থ ময়দানে জ্ঞাতিদের আহ্বান করলেন এবং ভূমিকাস্বরূপ বললেন আমি যদি বলি পাহাড়ের পেছনদিকে একদল সশস্ত্র সৈন্য লুকিয়ে রয়েছে এবং তারা এখনি আক্রমণ করে আপনাদের বিধ্বস্ত করে দেবে, তবে কি আপনারা বিশ্বাস করবেন?' জনতা বলল, 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। কারণ আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলেই জানি।" রোমসম্রাট হিরাক্লিয়াসও হযরতের কাছ থেকে ইস্‌লাম গ্রহণের আহ্বানপত্র পেয়ে হযরতের নিকট-আত্মীয় আবু সুফিয়ানের কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চেয়েছিলেন হযরত মুহম্মদের মিথ্যাবাদিতার অপবাদ আছে কিনা, সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেন কি-না এবং যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তারা কিছুকাল পরে বিরক্ত হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে কি-না। কেননা শ্রদ্ধেয়তা ও ব্যক্তিত্বের এগুলোই ভিত্তি ও নিরিখ। একবার এক আয়াতে ওহি নাজেলের সত্যতার প্রমাণ দানের জন্যে আল্লাহ মুহম্মদের চরিত্রকে সাক্ষ্যরূপে উল্লেখ করেছেন—'তুমি তো ইতোপূর্বে কোনো বই পড়নি আর হাত দিয়ে লিখও নি, যাতে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ করতে পারে।.......তুমি বলো, আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আমি তোমাদের কাছে ওহি পাঠ করতাম না, তোমাদেরকে জানাতাম না, আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মধ্যেই জীবনযাপন করেছি, তোমরা কি বোঝ না (যে আমি মিথ্যে বলি নে)? আল্লাহর বাণী গ্রাহ্য হতেও এমনি চরিত্র প্রসূত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়েছিল।

আততায়ী উমর যে মুহূর্তে হযরতের ভক্ত উমর হয়ে উঠলেন কিংবা বাবরের আততায়ী চৌহান যে বাবরের দেহরক্ষী বনে গেলেন, সে-তো ঐ ব্যক্তিত্বের প্রভাবেই। বাবরের নিজের জীবনের বিনিময়ে হুমায়ুনের মৃত্যু রোধের যে-কাহিনী মানুষ বিশ্বাস করে, তা তো বাবরের ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা বশেই। রত্নাকর দস্যুকে কিংবা নিযাম ডাকাতকে নিশ্চয়ই তাঁদের হিতকামী আত্মীয়বন্ধুরা পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করতে বহুবার বলেছেন। কিন্তু কোনো উপদেশ-পরামর্শ-মিনতি তাঁদেরকে বৃত্তিচ্যুত করতে পারেনি। অথচ ব্যক্তিত্বের আকস্মিক প্রভায় তাঁদের অন্তরের অন্ধকার বিদূরিত হল মুহূর্তেই। দস্যু হলেন দরবেশ। একদিন গোঁয়ার বিশ্বামিত্রকেও বশিষ্ঠের ক্ষণিক সান্নিধ্যে সারাজীবনের সংকল্প ত্যাগ করতে হয়েছিল। চোখের জলে তাঁর ঔদ্ধত্য গেল ভেসে। এ সেদিনও দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই চৈতন্যদেবের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে পরহিতব্রতী সুনাগরিক হয়ে ওঠল। এই নৈতিক শক্তির উপর আস্থা রেখেই যিশু বলেছিলেন একগালে চপেটাঘাত পড়ে তো অন্যগাল পেতে দাও, যাতে এই নৈতিক সহিষ্ণুতায় বিচলিত ও বিগলিত হয়ে মানুষ হয়ে ওঠে পাষণ্ড-পামর। গোটা মহাভারতই কৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব-প্রভায় প্রোজ্জ্বল। পারিতোষিকে নয়—মানুষ বশ হয় নৈতিক তোষণেই। এমন কত কত কাহিনী দুনিয়াময় লোকস্মৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রভাবে যাদের আস্থা নেই, প্রতাপের দাপটে যারা মানুষকে শাসনের শৃঙ্খলে ও নিয়মের নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছে চিরকাল তারা ব্যর্থ হয়েছে, নিজেরাও চিরকালের জন্য মরেছে এবং মরেছে লোক-শত্রু হিসেবে। নৈতিক শক্তিপুষ্ট চরিত্রবান মানুষই অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন, মানুষের চিত্তলোকে শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করেই। সমাজে ধর্মে রাষ্ট্রে যতটুকু ভালো তা ওঁদেরই দান। কারণ নীতিকথায় সত্যি চিঁড়ে ভেজে না। নৈতিক চরিত্রের সংস্পর্শেই মানুষের মন বদলায় :

As one candle enkindleth another
So nobleness ennobles others' heart.

নৈতিক শক্তি অর্জিত হয় সততায়, মানবিক দায়িত্ব সচেতনতায় ও মানুষের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠায়। এ গুণগুলোরই বিস্তৃত বিশ্লেষণ পাই কুরআনে, 'পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর।......প্রকাশ্যে ও গোপনে কোনো কুকার্যে লিপ্ত হয়ো না। এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ কোরো না। দ্রব্যের পরিমাণ ও ওজন ঠিকমতো করো। আমি কারো উপর সামর্থ্যের অধিক কর্তব্যভার অর্পণ করিনে। যখন কোনো কথা বলো, তখন তা আত্মীয়ের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায় কথা বলো। .... পুণ্য কাজ হল নিকট-আত্মীয়, এতিম, মিসকিন, মুসাফির ও ভিক্ষুককে এবং দাসের মুক্তির জন্য দান করা, নামাজ কায়েম রাখা, যাকাত দান করা, অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা এবং অনটন, দুঃখ, শোক ও ভয়ের সময়ে ধৈর্য ধারণ করা। যারা এসব কর্ম করে, সত্য কথা বলে তারাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধু ও সংযমী।' সর্বশাস্ত্রে ও জ্ঞানী-মনীষী-সাধকের বাণীতে এমনি কথা রয়েছে, আমরা নমুনাস্বরূপ কেবল কুরআনই উদ্ধৃত করলাম। সমাজে তেমন আদর্শ মানুষের দরকার, যাঁরা নিজেদের জীবনে নীতি-আদর্শ রূপায়িত করেন বাস্তব সত্যরূপে। প্রত্যেক মানুষই নিজের জানমালের নিরাপত্তা চায়, এ কামনা পারস্পরিক হলেই-যে কেবল নিরাপত্তা সম্ভব, তা লিপ্সা ও আত্মরতি বশে মানুষ বুঝতে চায় না। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানবিক নানা সমস্যার সমাধানের জন্য এই নৈতিক শক্তিপুষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন আজকের দিনেও বোধহয় কিছু কম নয়।

রাম-রহিম-টমের মুখে নীতিকথার মুখস্থ বুলি উচ্চারিত হলে কোনো কাজ হবে না। সেই পুরোনো Example is better than precept, কিংবা 'অপনি আচরি ধর্মে অন্যে শিখাইবে'— এই আপ্তবাক্য হয় তো আজো আমাদের জীবনে তাৎপর্যহীন নয়। চরিত্রবান না হয়ে চরিত্রবান করা যায় না। নীতিনিষ্ঠ মানুষ তৈরির জন্য নিজেদের নীতিবান হতে হবে। কেবল নীতিবিদ হলেই চলবে না। কারণ Sermon দেয়ার দিন বিগত। তাই আজকেও সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি, শিক্ষাগুরু, পীর-পুরোহিত—সবাইকেই এই নৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হবে, শ্রদ্ধাস্পদ হতে হবে। তা হলেই কেবল তাঁদের প্রভাবে তাঁদের শাসন-পাত্রগুলো সদাচারী হবে—দেশও অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা পাবে। প্রতাপজনিত দাপটের ব্যর্থতায় আপাতত এই ইশারাই মেলে।

AMARBOI.COM

কল্যাণবাদ

মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সব কল্যাণ চিন্তার উৎস—এই প্রত্যয়ের অঙ্গীকারে প্রযুক্ত যে-কোনো কল্যাণকর প্রয়াস নির্বিঘ্নে বা সবিঘ্নে, দ্রুত কিংবা বিলম্বে সফল হয়ই। কেননা প্রিয়জনের পরিচর্যার সদিচ্ছা সদুপায় আবিষ্কারের সহায়ক। তবে প্রীতি ও শুভেচ্ছার উদ্ভব মনের পরিশীলন ও সযত্ন পরিস্রুতি সাপেক্ষ। এজন্য স্ব-ভাবকে সংযত এবং মনকে নীতির অনুগত করতে হয়। এতেই নীতিনিষ্ঠ মনুষ্যত্বের সুবিকাশ সম্ভব। কারণ পরিস্রুত মনেই কেবল বিবেকের প্রভাব স্থিতি পায়, এমনি বিবেকবান মানুষের সংখ্যাধিক্যেই সমাজ জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার দুর্গ হয়ে ওঠে। জনকল্যাণ লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় শ্রমশক্তি। গণস্বাচ্ছন্দ্যও সাচ্ছল্য অর্জন ও রক্ষণপ্রয়াসে প্রযুক্ত হয় শাসনযন্ত্র, আর সমস্বার্থে সহযোগিতার ভিত্তিতে সহঅবস্থানের অঙ্গীকারে গড়ে ওঠে আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ক।

কিন্তু এ সিদ্ধির পূর্বশর্ত হচ্ছে মানবমাহাত্ম্যে আস্থা। মানবজীবন একাকীত্বে অসম্ভব। যৌথজীবনেই তার সার্থকতা ও পূর্ণতা। অনেকতায় অনৈক্য অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু ঐ দ্বন্দ্বে-মিলনেই তার জীবন হয় উপভোগ্য। ঢাকা শহরের সব সম্পদ পেলেও নির্জন শহর কোনো একক মানুষের কাম্যনিবাস হবে না, অরণ্যের মতোই তা আশুপরিত্যাজ্য হয়ে থাকবে। নিঃসঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের দুঃসহতাই প্রমাণ করে যে মানুষের মৌল উপজীব্য ধন নয়, মান নয়–বরং অন্য হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য। কেননা মানুষ বাঁচে অপর মানুষকে বিশ্বাস করে, তাদের উপর ভরসা রেখে ও নির্ভর করে। ভালবাসার মূল্যেই প্রীতির বিনিময়েই পেতে হয় এই বিশ্বাস,ভরসা ও নির্ভরতা। ভালোবাসার পুঁজি যে-মানুষ যত বেশি ও ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করতে জানে ও করে, তার জীবন ও ভুবন সে অনুপাতেই হয় বিস্তৃত, নিরাপদ ও উপভোগ্য।

কিন্তু জীবন থেকে ঈর্ষা-অসূয়াও হয়তো একেবারে নির্মূল করা যায় না, কেননা আত্মপ্রসার ও আত্মোন্নয়নের অবদমিত বাঞ্ছা ও অসামর্থ্য থেকেই ঈর্ষা-অসূয়ার জন্ম। বলা চলে অপূর্ণ বাঞ্ছাই বিকৃত হয়ে ঈর্ষা-অসূয়ার রূপ লাভ করে। তবু এও সত্য যে সদিচ্ছা ও প্রীতির পাশে এই ঈর্ষা-অসূয়াই মনুষ্যজীবনে উদ্যম, গতি ও বৈচিত্র্য দান করে। Positive-negative-এর সহস্থিতিতে যেমন বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্ভব, তেমনি শ্রদ্ধা-ঘৃণা, প্রীতি-দ্বেষ প্রভৃতির বৈপরীত্যই মানুষকে প্রাণচঞ্চল রাখে, জীবনও করে মন্দ-মধুর। অতএব, মানুষ নিয়েই মানুষের জীবনের কারবার। মানুষের সঙ্গেই তার লেনদেন। মানুষই মানুষের সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণার উৎস। তাই ব্যক্তি- জীবনের সব সমস্যার ও সব সমাধানের ভিত্তি ও অবলম্বন হচ্ছে মানুষ— কেবল মানুষ, একান্তই মানুষ, আর কিছু নয়। পরিজন হয়ে, প্রিয়জন হয়ে, প্রতিপালক হয়ে, পড়শী হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের উপায়-চিন্তা থেকেই সব নীতি-নিয়মের, তত্ত্ব-তাৎপর্যের উদ্ভব ও বিকাশ। জীবনের জন্য জীবিকার ক্ষেত্রে জাগে ধন-মান-যশের স্পৃহা—তাতে জাগে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঈর্ষা-অসূয়া, অভিযোগ-অভিসন্ধি, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, জয়-পরাজয়, নিবর্তন-উদ্বর্তন ইত্যাদি। অবশ্য নব নব কিশলয়ে জীবনকে বাড়িয়ে তুলতে হলে, জীবনবৃক্ষে ফুল ফুটাতে হলে ও ফল ধরাতে হলে জীবন নিয়ে শিল্পীর মতো, দার্শনিকের মতো, মরমিয়ার মতো, রসিকের মতো নানা ভাবনা ভাবতে হয়। কারণ জীবন কখনো অনায়াসে উপভোগ্য হতে পারে না।

এ জন্যে সহজাত বুনো মনের পরিশীলন-পরিস্রুতি প্রয়োজন, মনোভূম কর্ষণ করতে হয়, তাতে বিবেকরূপী বীজ বপন করে ভালো-মন্দের, কল্যাণ-অকল্যাণের, সুন্দর-কুৎসিতের, সংযম-অসংযমের, প্রীতি-দ্বেষের, ভোগ-ত্যাগের, রাগ-বিরাগের—পার্থক্য-বুদ্ধিরূপ ফসল জন্মাতে হয়। প্রাচীন সমাজবিদরা মনে করতেন ধর্মীয়, সামাজিক কিংবা বৈষয়িক ক্ষেত্রে গৃহীত ও স্বীকৃত নীতি-নিষ্ঠাই জীবনে শ্রী ও সাফল্য এবং সমাজে শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি আনয়নে সমর্থ। এ-তত্ত্ব আজো অস্বীকৃত নয়, যদিও তা' ডালে-মূলে জটিল ও স্ফীত হয়ে উঠেছে। জীবন যে সব ক্ষেত্রেই জীবিকা সংপৃক্ত তা আধুনিককালের আগে কেউ কখনো সচেতনভাবে উপলব্ধি করেননি। যদিও আর্থনীতিক অবচেতন প্রেরণাই ছিল তাঁদের সব সমস্যা-চেতনার মূলে। কিন্তু সমস্যার স্বরূপ অপরিচিত ও অস্পষ্ট ছিল বলে সমাধান হয়েছে গোঁজামিলে, অবচেতন ফাঁকির ফাঁক রয়ে গেছে চিরদিন।

মার্কস-ডারুইন-ফ্রয়েড প্রমুখের চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এখন আগেকার সেই কুয়াশা অপসৃত। কিন্তু জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ ও প্রযুক্তির জন্য জীবন ও জীবিকা, প্রাণ ও পৃথিবী, সমাজ ও স্বাধিকার, রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা অর্জন জরুরি। এর জন্য কিছু মানবিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা, কিছু শ্রেয় জ্ঞান ও গৃহীত বা স্বীকৃত নীতিনিষ্ঠা আবশ্যিক। এসব বোধ-বুদ্ধির ও জ্ঞান-গুণের উন্মেষ ও বিকাশের জন্য প্রবৃত্তি, পরিবেশ, প্রজ্ঞা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক কিংবা স্বাভাবিক উপায়ের উপর নির্ভর না করে অপরের অর্জিত জ্ঞান, লব্ধ অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত প্রজ্ঞা ও পরিস্রুত মনীষাগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে দ্রুত জানা-বোঝা সম্ভব বলেই লেখাপড়া চর্চাকে সর্বমানবের পক্ষে আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশের মানুষকেও স্বাধীনতার তাৎপর্য, নাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার জানা-বোঝার জন্য অবশ্যই অন্তত স্বল্পশিক্ষিত হতে হবে। কাজেই নিরক্ষরতার বিলোপ সাধন স্বাধীনতা উপলব্ধি-উপভোগের প্রথম ও প্রধান শর্ত। স্বদেশী, স্বজাতি, স্বধর্মী, স্বভাষী শাসক পেলেই যে-মানুষ স্বাধীন হয় না—স্বাধীনতা-যে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও সাচ্ছল্যের নিশ্চয়তা এবং অবাধ বিকাশ ও বিমুক্তির আশ্বাস—এ তত্ত্ব তাদের গোড়াতেই জেনে-বুঝে নিতে হবে। এবং শাসক, সরকার ও রাষ্ট্র বা দেশ-যে অভিন্ন নয়, তিনটে ভিন্ন সত্তার সহঅবস্থান মাত্র, তাও তাদের উপলব্ধি করতে হবে। নাগরিকের রাষ্ট্র বা দেশের প্রতি আনুগত্য হবে নিঃশর্ত ও আবশ্যিক। কিন্তু সরকার ও শাসকের প্রতি সমর্থন কিংবা তার বিরোধিতার স্বাধীনতা থাকাও প্রয়োজন। অবশ্য সব অধিকারেরই পূর্বশর্ত হচ্ছে দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যচেতনা। দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়িয়ে অধিকার ভোগ করা চলে না। এর জন্য প্রয়োজন প্রচারের, পর্যালোচনার ও সমালোচনার অবাধ অধিকার। বাক্‌স্বাধীনতার স্বীকৃতিই তাই সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকারের ভিত্তি। জনমানবের বাক্-স্বাধীনতার অঙ্গীকারেই কেবল স্বাধীনতা ফলপ্রসূ ও উপভোগ্য হওয়া সম্ভব।

অতএব গণশিক্ষা ও বাক্-স্বাধীনতা ব্যতীত স্বাধীনতা ও স্বাধিকার ভোগ, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। গণশিক্ষা ও বাক্-স্বাধীনতার অঙ্গীকারে উৎপাদনে, বণ্টনে ও অর্থনীতিতে সমাজতন্ত্রীর নীতি গ্রহণ করলে দেশ গণকল্যাণা প্রসূ রাষ্ট্র হিসেবে স্থিতি পাবে।

কিন্তু এর জন্য জননেতা ও শাসকদের মানববাদী হওয়া আবশ্যিক। কারণ মানববাদী না হয়ে কেউ যথার্থ কল্যাণবাদী হতে পারে না। সর্বমানবিকবোধে উজ্জীবিত হয়ে সর্বজনীন জীবনে সামগ্রিক কল্যাণ লক্ষ্যে চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করার জন্য মানববাদীর প্রয়োজন, মানববাদের জটিল তত্ত্বে প্রবেশ না করেই বলা চলে আজকের মানুষকে আত্মরতি সংযত করে পরপ্রীতির অনুশীলন করতেই হবে, আত্মকল্যাণ কামনায় সমাজকল্যাণ চেতনার ঠাঁই রাখতেই হবে। ব্যক্তিজীবন মাত্রই-যে সমাজ-সংস্থিত তা সর্বক্ষণ মনে জাগরূক রেখে কেবল সরকারকে নয়—ব্যক্তিকেও চিন্তায়, চেষ্টায় ও কর্মে সামগ্রিকভাবে সমাজকল্যাণবাদী হতে হবে, নইলে হাজারো জটিল সমস্যা থেকে 'নাহিরে পরিত্রাণ'। সেবা ও সততার অঙ্গীকারে, দায়িত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকার সংকল্পে মানববাদে প্রত্যয়ী মানুষই কেবল যথার্থ কল্যাণবাদীর ভূমিকা পালনে সমর্থ। তাই মানবতায়, মানবপ্রীতিতে, গণতন্ত্রে,সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ও ধর্মনিরপেক্ষতায় আস্থাবান ও স্বসত্তায় আচরণনিষ্ঠ চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি। আস্থাহীন ও চরিত্রহীনের মৌখিক স্বীকৃতি ও মুখ-নিঃসৃত স্লোগান নিষ্ফল বাগাড়ম্বর হয়ে বঞ্চনাই বাড়াবে শুধু। বাঙলাদেশের স্বাধীন মানুষের বুকে-মুখে কল্যাণবাদ আশ্রিত হোক, ঘরে-ঘাটে, হাটে-বাটে কল্যাণবাদ উচ্চারিত হোক, পথ-প্রান্তর কল্যাণবাদ ধ্বনিতে-স্লোগানে-ইস্তেহারে মুখরিত ও সুশোভিত হয়ে উঠুক—সদ্যলব্ধ স্বাধীনতার এই পরম উষ্ণ মুহূর্তগুলোতে এ-ই কামনা করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যতের বাঙলা

গত একশ বছর ধরে পৃথিবীর দার্শনিক চিন্তাধারায়, সমাজ-চেতনায়, ধর্মবোধে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়, অর্থনীতিতে,ইতিহাস বিশ্লেষণে ও সাংস্কৃতিক মননে কার্ল মার্কসের প্রভাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে জড়িত। মার্কসীয় তত্ত্বের এই সচেতন ও অবচেতন প্রভাব এড়িয়ে চলা মানুষের জীবন-জীবিকার কোনো ক্ষেত্রেই আজ আর সম্ভব নয়। তাই কল্যাণ-চিন্তা কিংবা শ্রেয়স-চেতনা মাত্রই আজ অল্প-বিস্তর মার্কসীয় তত্ত্ব-সংলগ্ন। মার্কসীয় প্রভাবের কয়েকটি স্থূল লক্ষণ এই :

(ক) মানুষ দেশ-জাত-ধর্ম-বর্ণ নিরপেক্ষ এক সর্বমানবিক বোধের জগতে উন্নীত হয়েছে।

(খ) মার্কসের প্রভাব মানুষের মন থেকে নিয়তিবাদে আস্থা মুছে দিয়েছে। ফলে অজ্ঞতার স্বরূপ হয়েছে দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং স্বাধিকার-চেতনা হয়েছে প্রবল। ধনগত বৈষম্য কিংবা পীড়ন-শোষণ নিয়তি নির্দিষ্ট যে নয়, তা উপলব্ধি করেই দুনিয়ার বঞ্চিত-শোষিত মানুষ পীড়ক-শোষকের প্রতি বিরক্ত-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে এবং আসমানী শক্তি-আদিষ্ট বলে চালু সমাজব্যবস্থা ও সম্পদ-বিধির বিরুদ্ধে অনাস্থা ও দ্রোহ আজ সার্বত্রিক রূপে সুস্পষ্ট।

AMARBOI.COM

(গ) অজ্ঞ, অসহায়, অক্ষমের বিশ্বাসে, বিস্ময়ে, কল্পনায় যে ধর্মবোধের জন্ম, আবেগে, অনুভবে ও ভীরুতায় যার লালন; সংস্কারে ও সভয় স্বীকৃতিতে যার স্থিতি এবং ত্রাসে-শঙ্কায় যার চিরায়ু, সেই শাস্ত্রীয় ধর্মের প্রাণমূলে বৈনাশিক আঘাত হেনে ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন করেছেন মুখ্যত কার্ল মার্কসই— বিজ্ঞান বা দর্শন নয়। কেননা বিজ্ঞান-দর্শনের ছাত্ররা আজো আস্তিক। আজ দুনিয়াব্যাপী নাস্তিকের আত্মশক্তিই মানুষের জন্যে সুস্থ ও স্বচ্ছ নতুন ভুবন রচনা করছে। সামাজিক শক্তি হিসেবে ধর্ম আজ ম্লান ও মৃতপ্রায়; যদিও ব্যক্তিজীবনে চালু ধর্মবোধ হয়তো অবিনশ্বর। কেননা দুর্বল মানুষের সুখ-বাসনা ও নিরাপত্তা-বাঞ্ছার অবলম্বনরূপেই এর অস্তিত্ব এবং তেমন মানুষের অভাব দুনিয়াতে কোনোকালেই হবে বলে মনে হয় না। তবু সামাজিক জীবননিয়ন্তার পদ হারিয়ে ধর্ম আজ ব্যক্তিমনের বিবরে আশ্রয় নিয়েছে। মার্কসীয় তত্ত্বের সচেতন ও অবচেতন প্রভাবে মানুষ আজ স্বনির্ভর এবং তাই জীবননিয়ন্ত্রণ ও জীবিকা সংস্থান আজ ঐশ্বরিক নয়—লোকায়ত। প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদনে ও বণ্টনেই কেবল মানুষের জীবন ও জীবিকার সামাজিক ও ব্যবহারিক সমস্যার সমাধান সম্ভব—এ আজ অল্পবিস্তর স্বীকৃত। তাই আজকের মানুষ মানববাদী।

(ঘ) মার্কসীয় তত্ত্বের প্রভাবে ব্যক্তিমনে যে স্বাধিকার-চেতনা জেগেছে, তার ফলে তার দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি স্বচ্ছ হয়েছে, সে-সঙ্গে তীক্ষ্ণ হয়েছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপ্রীতি ও আত্মসম্মানবোধ। আগে যেমন ধনীর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন তার স্বভাবসিদ্ধ হয়ে উঠেছিল, এ যুগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবলতায় তা দুর্লক্ষ্য। এ যুগে হবে গুণই কেবল শ্রদ্ধেয় এবং গুণীই কেবল মান্য। ধনে বা বলে বড়লোক হলেই কেউ সম্মান পাবে না। অর্থাৎ গুণী না হলে কেউ মানী হবে না। শোষিত ও পীড়নক্লিষ্ট মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সমমর্মিতা মানুষকে করেছে সহিষ্ণু, সচেতন, উদার, বিবেচক, বিশ্বমানববাদী ও আন্তর্জাতিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

(ঙ) তাছাড়া সরকার-যে শাসকসংস্থা নয়—সমবায় সংস্থা এবং অকল্যাণ ও অমঙ্গল এড়িয়ে কল্যাণ ও শ্রেয়সের প্রতিষ্ঠা প্রসার ও প্ররক্ষণই-যে সরকারের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব, তা আজ আর কেউ অস্বীকার করে না।

বাঙলাদেশ আজকের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কাজেই আজকের বাঙলার প্রবণতার প্রমাণে ও অনুমানে আমার চোখে ভবিষ্যতের বাঙলা এইরূপ : দেশে অদূর ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংস্থা প্রবর্তিত হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের ভারসাম্য যখন ব্যাহত হবে, তখন সাম্যবাদী সমাজ গড়ে উঠবে এবং বিদেশী পুঁজিবাদী শক্তির প্রভাব না থাকলে তার জন্যে হয়তো তিক্ত ও তীব্র রক্তক্ষয়ী দীর্ঘকালীন সংগ্রাম-সংঘর্ষের প্রয়োজন হবে না। কেননা, বাঙালির মধ্যে বিপুল সম্পদের অধিকারী, বিরাট শিল্পের মালিক কিংবা একচেটিয়া উৎপাদক ও ব্যবসায়ী এখনো গড়ে ওঠেনি। আর রাষ্ট্রীয় পোষণে গড়ে তোলার সময়ও হয়তো অপগত।

অধিকাংশ মানুষে শাস্ত্রীয় ধর্মবিশ্বাস অটল থাকবে। তবে তা হবে একান্ত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক মূল্য থাকবে তার সামান্যই। তখন ঐ ধর্মপীর, দরবেশ,দরগাহ ও বলি-পূজায় নিবদ্ধ থাকবে। কেননা রোগ, দুঃখ, বিপদ-বিপর্যয় সংলগ্ন হয়েই এই ধর্ম ভীতত্রস্ত ব্যক্তিচিত্তে আশ্রিত থাকবে। সমাজে, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, শিল্পে কিংবা রাজনীতি বা অর্থনীতিতে ধর্মের দৌরাত্ম্য থাকবে না। এসব ক্ষেত্রে ধর্ম মুমূর্ষু ও বিলীয়মান। এখন যেমন বিধর্মী হলে পর ও শত্রু বলে মনে করা হয়, তখন মানুষকে তার ধর্মমতের ভিত্তিতে গ্রহণ বা বর্জন করা হবে না। কাজেই সাম্প্রদায়িকতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, জাতীয়তা হবে ভূগোলভিত্তিক বা রাষ্ট্রভিত্তিক।

শিক্ষার প্রসারে দেশের মানুষের চিত্তলোকে মানববাদ প্রতিষ্ঠা পাবে এবং আজকের সংহত ও সংকীর্ণ ভুবনে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রজ্ঞা প্রয়োগে মানবিক সমস্যার সমাধানে ঈহা ও আগ্রহ প্রবল হবে। জীবন-জীবিকা সমস্যা আন্তর্জাতিক চেতনা বৃদ্ধি করবে এবং বর্ধিষ্ণু সমাজের ক্রমবর্ধমান সমস্যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করতে থাকবে। আর জাতীয়তাবোধের ক্রমে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ ঘটবে। কেননা সমস্বার্থে সহাবস্থান ও সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল পৃথিবীর ভাবীকালের মানুষ বাঁচতে পারবে। অতএব জাতিদ্বেষণা হবে বিলুপ্ত আর জাতীয়তাবোধও থাকবে না। নীতি হবে অহিংস আর প্রীতি, মৈত্রী ও আত্মীয়তার মাধুর্যে মণ্ডিত। কারণ মানববাদী না হলে কেউ সর্বজনীন কল্যাণকামী হতে পারে না। সর্বমানবিক ও সামগ্রিক কল্যাণসাধনা কেবল মানববাদীর পক্ষেই সম্ভব। তাই মানববাদী মাত্রই কল্যাণবাদীও।

স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবন উদার মানবিক বোধের ওপরই হবে প্রতিষ্ঠিত। সুরুচি-সৌজন্য ও শ্রেয়সই হবে তার সাংস্কৃতিক চরিত্র। প্রয়োজন-চেতনা ও সৌন্দর্য-বৃদ্ধির প্রেরণায় বর্জন ও গ্রহণ এবং সৃজন ও বরণের মাধ্যমে তার সংস্কৃতি বিচিত্র বিকাশ লাভ করবে। সে-সংস্কৃতি সংকীর্ণ বোধে সংকুচিত থাকবে না। দেশ ও জাতের রঙে অনন্য হলেও তা হবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যে সবল অর্থাৎ স্থানিক হয়েও হবে বিশ্বের এবং বিশ্বের হয়েও থাকবে স্থানিক বর্ণে উজ্জ্বল।

সমাজে থাকবে চতুর্বর্গ মানুষ—কৃষিশ্রমিক, মিলমজুর, কলমী চাকুরে ও ব্যবসায়ী। আর্থিক জীবনে বাঙালির আপাতত স্বাচ্ছন্দ্য আসবে; অবশ্য ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে তার সম্পদও বাড়াতে হবে। এটাই থাকবে সর্বক্ষণের বড় সমস্যা। কারণ লোক বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন কিংবা অর্থের আনুপাতিক সমতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য কর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষি কিংবা শিল্পক্ষেত্রে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেই চলে না, আন্তর্জাতিক বাজারে তার বেসাতির ভূমিকাও থাকা-চাই। কিন্তু জীবন-জীবিকার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যাপারে স্বনির্ভরতা ও পণ্যের বাজার দখলের যে প্রতিযোগিতা বিশ্বব্যাপী চলছে, তাতে সুবিধেমতো ঠাঁই করে নেয়া কোনো নতুন রাষ্ট্রের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়।

ইউরোপের ধনী ও বেনে রাষ্ট্রগুলোও আজ দারিদ্র্য-ভয়ে কাতর। এইজন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ যৌথ কারবারে আত্মত্রাণ সন্ধানী। অতএব এযুগে খণ্ড ক্ষুদ্র হয়ে কেউ বা কোনো রাষ্ট্র বাঁচতে পারবে না। সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সংহতি তাই কাম্য হয়ে উঠছে সর্বত্র। আগামী শতকের গোড়ার দিকে এই অঞ্চলেও পারস্পরিক গরজে একটি পূর্বাঞ্চলীয় যুক্তরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসংঘ বা ফেডারেশন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা তাই প্রবল।

নিরীহ

AMARBOI.COM

'নিরীহ' শব্দটি আমরা যত্রতত্র যেমন-তেমন করে ব্যবহার করে থাকি, অবশ্য শুধু এই শব্দটি বলেই নয়, ভাষার বহুল ব্যবহৃত শব্দ মাত্রেরই একই অবস্থা। বহু ব্যবহারে নানা হাতের স্পর্শে সবকিছুই মলিন হয়— জৌলুস হারায়। আটপৌরে ব্যবহারে বস্তুর কদর কমে, তা গুরুত্ব হারায়, শব্দের তাৎপর্য হয় লঘু এবং অজ্ঞের ব্যবহারে তা অর্থান্তরও লাভ করে। ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নিঃ—ঈহ—স্পৃহাহীন, ইচ্ছাবিহীন, অভিলাষের অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। যার স্পৃহা নেই, যে বাঞ্ছা বা ইচ্ছামুক্ত সে-ই নিরীহ। জীবিত জীবের পক্ষে এ একান্তই অসম্ভব। জীবের অন্তত ক্ষুৎপিপাসা আছে, এবং তা নিবৃত্তির জন্য প্রয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। জৈব ক্ষুধা-তৃষ্ণাও একপ্রকার স্থূলস্পৃহার জন্ম দেয়। অভাববোধ এবং অতৃপ্তিই তো আশা ও আকাঙ্ক্ষারূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই জীবজগতে 'নিরীহ' শব্দ অচল। অন্তত এর প্রয়োগস্থল নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। কেননা, যাকে আমরা উদাসীন বিবাগী বৈরাগী বলে থাকি তার মনেও হয়তো রয়েছে পরমের আকাঙ্ক্ষা কিংবা চরম কিছুর ভীতি তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে। অতএব সেও নিস্পৃহ কিংবা নিরীহ নয়।

তা'হলে নিরীহ শব্দটি আমরা আরো লঘু অর্থে সামান্য তাৎপর্যে প্রয়োগ করে থাকি। ভীরু হৃদয়ের যে ইচ্ছা, কাঙাল মনের যে ভীরু বাসনা দ্বন্দ্ব এড়িয়ে সংঘর্ষ বাঁচিয়ে চরিতার্থতা কামনা করে, তার অস্তিত্ব উপেক্ষা করার গাম্ভীর্য থেকেই হয়তো 'নিরীহ' শব্দের অর্থবহ প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। দুর্বল চিত্তের যে আকাঙ্ক্ষাবিরুদ্ধ প্রতিবেশে শীতকালীন ঔষধির মতো বিলুপ্তদেহ, তা' কখনো পরিজন-পড়শীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ ঘটায় না। অতএব, জীবন-জীবিকার কোনো ক্ষেত্রেই-যে অপরের প্রতিযোগী কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সে-ই 'নিরীহ'। 'নিরীহ' কি শ্রদ্ধেয় না অনুকম্পেয়! কথায় বলে বোবার শত্রু নেই, তেমনি নিরীহও অজাতশত্রু। অজাতশত্রু, কারণ সে কারো ক্ষতি করে না, কাকেও অমান্য করবার সাহস রাখে না,কারো অবাধ্য হবার শক্তি ধরে না। কাজেই সে কারো ঈর্ষা-অসূয়ার পাত্র নয়। 'নিরীহ' আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা বঞ্চিত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রসারের প্রত্যাশামুক্ত। 'ভিনি-ভিডি-ভিসি' গোছের কোনো অভিলাষ তার মনের কোণে উঁকি দেয়নি। আত্মসচেতন ও প্রতিষ্ঠাকামী মানুষ নিরীহের অস্তিত্ব স্বীকার করে কি? সম্ভবত উপেক্ষাই করে। প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিযোগী ছাড়া কেই-বা কাকে হিসেবে ধরে? নিরীহের নির্দ্বন্দ্ব, নির্বিঘ্ন, নিস্তরঙ্গ জীবনে শান্তি-সুখের স্বরূপ কী? সাফল্যের যে সুখ, বিজয়ের যে আনন্দ তা থাকে অনাস্বাদিত। প্রতিষ্ঠাকামীর সংঘাত-সংঘর্ষ সঙ্কুল জীবন কি কেবল দুঃখের ও যন্ত্রণার? তাহলে কিসের নেশায় তারা স্বেচ্ছায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়?

নিরীহের যে শান্তি-সুখ, তা সুলভ স্বস্তির আরাম। আর কাঙ্ক্ষীয় যে সুখ তা দুর্লভকে লাভ করার আনন্দপ্রসূত। এ সুখ সহজতায় লভ্য নয়, এ সুখের স্থিতি অনন্যতায়, অসামান্যতায়। সোনা যে মূল্যবান, তা সুন্দর বলে নয়, দুর্লভ বলে; রুপো যে শস্তা, তা' অকেজো বলে নয়, সুলভ বলে ; হীরার দাম তার দুর্লভতায়, কাচ কাজের হয়েও কদর পায় না কেবল প্রাচুর্যের কারণে। নিরীহ মানুষও হয়তো লোকবন্দ্য হত, যদি তারা সমাজে স্বল্প হত।

অবশ্য নিরীহেরও রকমফের আছে। এক হিসেবে মানুষ মাত্রেই জীবনের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে 'নিরীহ'। কেউ সামাজিক জীবনে, কেউ ধর্মীয় জীবনে, কেউ জুয়াড়ি জীবনে, কেউ সাংস্কৃতিক জীবনে, কেউ আর্থিক জীবনে, কেউ পারিবারিক জীবনে, কেউ যৌনজীবনে নিরীহ। একক জীবনে জাগতিক সর্বব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করা, স্পৃহা লালন করা অসম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে নিরীহও তারিফ পায়, নিন্দাও পায়, যেমন ধর্মীয় জীবনে যে নিরীহ, সে নিন্দার্হ, জুয়াড়ি জীবনে যে নিরীহ, সে প্রশংসার্হ।

আসলে ঝুঁকি-ঝামেলাহীন জীবনে উত্তেজনা নেই, নেই কোনো উদ্দীপনা। সে-জীবন অনেকাংশে জীবন্মৃতের। বৈচিত্র্যবিহীন জীবনে দিবারাত্রির চাঞ্চল্যসুপ্তির লীলা নেই–নেই চেতনাবৈচিত্র্য। ও হচ্ছে প্রাণধারণ পদ্ধতি, জীবনযাপন নয়। বিচিত্র অনুভূতির রঙে জীবন যদি রঞ্জিত না হল, রূপে-রসে তা যদি ঋতুপত্রের বিকাশ ও পরিণতি না পেল, তাহলে বাঁচা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। জড় ও জীর্ণ জীবনে সুখ নেই, স্থিতির স্বস্তি যদি বা থাকে। নিরীহ আসলে বদ্ধজীব, মুক্ত মানুষ নয়। সে ক্ষয়ভীরু, তাই প্রাপ্তি-বিমুখ। যে ক্ষয়ক্ষতি বাঁচিয়ে চলতে চায়, অবশেষে ক্ষয়ক্ষতির খপ্পরে পড়ে সে কেবল জীর্ণ হতে থাকে। কেননা অর্জনবিমুখ মানুষ ক্ষয় রোধ করতে পারে না। প্রাণ সম্পর্কে তার অতি সতর্কতা ও প্রযত্ন অবশেষে এই প্রাণকেই একটা অপরিহার্য বোঝা, একটা অনপনেয় দায় করে তোলে। অবহেলে তার জন্ম, উপেক্ষায় তার স্থিতি এবং অলক্ষ্যে তার মৃত্যু। সে সারাজীবন প্রাণী হয়েই থাকে, নিরীহ কখনো মানুষ হয়ে ওঠে না। তার দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি কখনো সংকীর্ণ পরিসর অতিক্রম করে বৃহত্তর জীবন ও জগতের পরিচয় পেতে আগ্রহী হয় না। সে শ্রদ্ধেয়ও নয়, অবজ্ঞেয়ও নয়, কেবল উপেক্ষেয়।

নিরীহকে বাহ্যত ভালোমানুষ এবং সমাজে বাঞ্ছিত মানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু তার স্থিতি গুরুতর ক্ষতি করে সমাজের। কেননা সমাজে নিরীহ লোকের সংখ্যাধিক্যই দুরাত্মাকে প্রবল ও লিপ্সু করে তোলে। আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ও আত্মবিস্তার লিপ্সু মানুষ তার পড়শীদের নিরীহতার সুযোগ নিয়ে পরস্বার্থ হরণে লিপ্ত হয়। পরস্বার্থ হরণের অনুষঙ্গ হচ্ছে পরপীড়ন। সমাজে শক্তিসাম্য রক্ষার জন্য নিরীহ লোকের সংখ্যাস্বল্পতা বাঞ্ছনীয়। যেখানে নিরীহতা ও দুর্বলতা, উপদ্রব শুরু হয় সেখানেই। দুর্বল রাজা, নিরীহ ধনী, উদাসীন গৃহস্থ তাই বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। অতএব জীবনযাত্রায় নিরীহতা পাথেয় নয়, প্রতিবন্ধক। নিরীহ লোকও তাই সমাজের দায়—সম্পদ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরীহতা গুণ নয়, দোষ। শক্তি ও সাহসের অভাব এবং আকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতিই মানুষকে নিরীহ করে। এ একপ্রকার মারাত্মক মানসিক জড়তা। নিষ্ক্রিয়তা এর বহিঃরূপ। উপনিষদ বলে ঃ ভূমৈব সুখম, নাল্পে সুখম অস্তি। এই বোধের উন্মেষ যে চিত্তে ঘটে না, সে-ই নিরীহ। কাজেই নিরীহতা ঋণাত্মক, ধনাত্মক নয়। যে-চিত্তে আকাঙ্ক্ষা উপ্ত হয় না, যে-হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, যে-বুকে আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি নেই, সেখানেই নিরীহতার জন্ম ও স্থিতি। প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, প্রতিযোগিতায় ও সংগ্রামেই জীবনের স্বাদ ও সার্থকতা নিহিত। লড়াই করে নয় শুধু, দেখেও সুখ। 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, মরার আগে যে দু'বেলা মৃত্যুভয়ে মুমূর্ষু, তার পক্ষে অবশ্য নিরীহ না হয়ে উপায় নেই। আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্তির পথে 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই এবং মরতে হবে— এই অঙ্গীকারেই জীবনে যাত্রা শুরু করতে হয়। সেই যে মহাজন বাক্য রয়েছে—প্রয়োজনমতো যে মরতে প্রস্তুত, বাঁচবার অধিকার তারই এবং সে-ই কেবল বাঁচতে জানে।

কিন্তু ঈহাগ্রস্ত মানুষ কি সুখী? সুখ, আনন্দ ও যশের সন্ধানে সেও তো জীবনব্যাপী চর্কির মতো ঘুরে বেড়ায়। একটা উত্তেজনা, একটা উদ্দীপনা তাকে সদা চঞ্চল রাখে। স্বস্তির যে সুখ, সে তো অজ্ঞাত। বিজয়-গৌরব সে পায় বটে, কিন্তু ব্যর্থতার বেদনাও তো সে এড়াতে পারে না। তবু আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা অবশ্যই জীবনদায়ী শক্তির উৎস। আর নিরীহের ভীরুতাই তার নিশ্চিত আশ্রয়। নিরীহের সুখ দরিদ্রের সুখ, ঈহাগ্রস্তের সুখ হচ্ছে ঐশ্বর্যবান বিলাসীর। দু'টোতে পার্থক্য বিস্তর বটে। কিন্তু এখানেও হয়তো রবীন্দ্রনাথের খাঁচার পাখি আর বুনো পাখির সে-ই মনস্তত্ত্বই ক্রিয়াশীল।

তুচ্ছ ভর্তা-ভাজার মধ্যেও স্বাদ আছে, যেমন আছে কোর্মা-কোপ্তায়। দুটোতে স্বাদ আলাদা বটে। কিন্তু কোনোটাতেই সর্বজনীন বিস্বাদ নেই। শ্রেয়ঃবোধের ক্ষেত্রেও মানুষ বিমূঢ় হয়ে পড়ে। আসলে ভয় ও ভরসার এবং ভীরুতা ও সাহসের পার্থক্যই সৃষ্টি করেছে ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ।

তবু পার্থিব জীবনে নিরীহ হচ্ছে শিকার আর ঈহাবান হচ্ছে শিকারী। নিরীহের পক্ষে পীড়ন বা লাঞ্ছনামুক্ত থাকা দুঃসাধ্য। আর ঈহাবানের নিরীহ হওয়াও কঠিন। বাহ্যত নিরীহের পরিচয় তার ব্যক্তিত্ববিহীনতায়। তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না, কারণ সে নিশ্চিত বর্তমানকে ছেড়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভরসা রাখে না, তাই অন্য সম্পদ না থাকলেও সে প্রাণের পুঁজি সযত্নে বাঁচিয়ে চলে।

কিন্তু নিরীহের চেয়েও অধম ও ঘৃণ্য প্রাণী সমাজে আছে। তারা হচ্ছে ঈহাবান তোসামুদে। তোয়াজই তাদের পুঁজি ও পাথেয়। সবচেয়ে অধম মানুষ ওরাই। কেননা তারা কোনো পাত্রের পূজারী নয়—শক্তির উপাসক। তারা সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতার বীজ তাদের মেদে রক্তে অস্থিতে ও মজ্জায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওরা সমাজদেহে দুষ্টক্ষত। ওদের কৃতক্ষতির থেকে সমাজের ধনী দরিদ্র কারো নিষ্কৃতি নেই। ওরা ব্যবহারে অনুগত কুকুর, কিন্তু স্বভাবে সাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক ও প্রতিম

শ্রেয় ও সৌন্দর্যচেতনা থেকেই সংস্কৃতির জন্ম এবং শ্রেয়বোধ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি অবশ্যই জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ-চিন্তাই মানুষকে নতুন নতুন আবিষ্কারে অনুপ্রাণিত করেছে। সংস্কৃতি এর আনুষঙ্গিক ফসল। বর্তমান অবস্থায়ও হাতিয়ারে অসুবিধা, অসন্তোষ এবং নতুন হাতিয়ার, পদ্ধতি ও নৈপুণ্য অর্জন লক্ষ্যে নিয়োজিত ভাবনা, বুদ্ধি ও প্রয়াস নতুন সৃষ্টির ও নৈপুণ্য লাভের সহায়ক হয়েছে। কিন্তু এ কাজ সবার দ্বারা হবার নয়, তাই সৃষ্টি বা আবিষ্কার কিংবা নৈপুণ্য মাত্রই বিশেষ ব্যক্তির দান এবং এমনি বিশেষ ব্যক্তি কোটিতে গুটিক মেলে। এরূপ ব্যক্তিকে আমরা প্রতিভা বলি। সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শন সবকিছুই এমনি লোকেরই কৃতি ও কীর্তি। অতএব সংস্কৃতি সমাজের হয়েও বিশেষ ব্যক্তির সৃষ্টি। প্রয়োজনটা গোষ্ঠীর বা সমষ্টির, আবিষ্কার উদ্ভাবনটা ব্যষ্টির। কেননা ব্যক্তির মনের আগ্রহ, নিষ্ঠা ও প্রয়াস না থাকলে কোনো সামাজিক চাহিদাই পূরণ হয় না।

মানুষের জীবন-জীবিকাজাত সংস্কৃতির বিশিষ্ট বিকাশ ঘটে তার ভাষায়। আপাতত মামুলি মনে হলেও ভাষা মানুষের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। চেতনাকে মানুষ কী করে ভাষার অনুগত করল তা আজো একটা অনুদ্ঘাটিত রহস্য। আজ আমাদের অনুভবের বাহন হচ্ছে ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাষা। ভাবকে রূপে এবং রূপকে ভাবে সঞ্চারিত ও রূপান্তরিত করা আজ মনে হয় যেন অনায়াসলব্ধ স্বাভাবিক সহজশক্তির ক্রিয়া। কিন্তু আদিতে প্রাণীর অন্যতম মানুষের সে শক্তি নিশ্চয়ই ছিল না। জিহ্বায়, দাঁতে,তালুতে,ঠোঁটে, কণ্ঠে মানুষ যে অনর্গল এত ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারবে, সে কথাই বা কখন 'কেমনে প্রকাশ পাইল প্রথমে কাহার কাছে।' ভাষা আবিষ্কারে তাই বড় বড় প্রতিভাবান মানুষের জীবনব্যাপী ঐকান্তিক নিষ্ঠায় চিন্তা-ভাবনা-অনুভব-উদ্যোগের প্রয়োজন হয়েছে। বহু যুগের বহু মানুষের সাধনায় ক্রমে ক্রমে ভাষার শব্দসম্পদ গড়ে উঠেছে। দৃশ্যবস্তুর না হয় যেমন-তেমন একটা নাম দেয়া যায়। গোষ্ঠীর সবার স্বীকৃতি ও সম্মতি নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ধ্বনিসমষ্টি যোগে নির্দেশ করলেই বস্তুটির নাম মিলে গেল—গরু, তরু, পানি, ধান ইত্যাদি। কিন্তু অনুভূতি প্রকাশের জন্য, অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি দেবার জন্য যেসব ধ্বনি উচ্চারিত হল, তা তৈরি হল কেমন করে! ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঘৃণা, ভালোবাসা প্রভৃতি না হয় চোখেমুখে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার আদলে ঐসব ভাব-নির্দেশক আদিধ্বনি তৈরি হয়েছিল। না হয় চারদিককার প্রকৃতি ও নিসর্গ থেকেও এমনি অনুভবসাধ্য কিছু কিছু ভাবের প্রতিশব্দ তৈরির সূত্র পাওয়া গিয়েছিল। তারপরেও তো বহু অনুভূতি-অভিপ্রায় থেকে যায়, যার আদল বা আভাস মেলে না প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ-জগতে। ওগুলো অভিব্যক্তির ভাষা পেল কী করে তা আজো রহস্যাবৃত্ত। আজকের দিনেও—মানে হাজার হাজার বছর পরেও আমাদের ভাষায় আমরা চিন্ চিন্, টন্ টন্, কন কন, রি রি প্রভৃতি ধ্বনিযোগে যেসব শারীরিক বেদনা-যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে চাই, সেগুলোর সঙ্গে ঐ ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলোর লেশমাত্র যোগও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। এ হচ্ছে অব্যক্তকে ব্যক্ত করার আকুলতাজাত পরোক্ষ উপায়। ঐ চিন্ চিন্ কিংবা টন্ টন্ অর্থে স্বতোসিদ্ধ বলেই আমরা উদ্দিষ্ট বেদনা-যন্ত্রণা উপলব্ধি করি, অর্থাৎ বক্তার বলার গুণে নয়, শ্রোতার সহানুভূতির ফলেই উক্ত ধ্বনিগুলো অর্থবহ।

বিদ্বানেরা বলেন বটে মানুষ প্রকৃতি ও পশু-পাখির ধ্বনির অনুকরণে কণ্ঠ-জিহ্বা-তালু-দন্ত-ওষ্ঠযোগে ধ্বনি তৈরি করতে থাকে তার জীবন-জীবিকার তাগিদে। যৌথজীবনও শুরু হয় একই প্রয়োজনে। আর যৌথ কর্ম ও পারস্পরিক নির্ভরতা যত বাড়তে থাকে, নানা অনুভূতি ও অভিপ্রায় প্রকাশের প্রয়াসে ধ্বনিও অর্থাৎ শব্দ সৃষ্টি হতে থাকে। কিন্তু সব গোত্রের অগ্রগতি সমান ছিল না। উদ্যোগী গোত্র-বিশেষের জীবিকার ক্ষেত্রে তার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনবোধ ও অভিজ্ঞতা তার ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রীর বৃদ্ধি এবং পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন, উন্নতি ও নির্মাণ অব্যাহত রাখে। এভাবে তারা বনের মর্মর,বায়ুর শোঁ শোঁ, জলের কল কল,তরঙ্গের ছলাৎছল,নানা পাখির কাকলি, বিভিন্ন পশুর ডাক, মেঘের গর্জন, বৃষ্টির ধ্বনি,পোকার ধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণে মুখে উচ্চারিত বহু ও বিচিত্র ধ্বনি সৃষ্টি করলেও তার অনন্য ও অসংখ্য অনুভূতি-অভিপ্রায়—অগুনতি শব্দে অভিব্যক্তি পাচ্ছে। এমনি অনুকৃতি, অনুসৃতি যোগে সে নানা রূপকে, সাংকেতিকে, প্রতিমে ও প্রতীকে, রূপকল্পে ও চিত্রকল্পে তার অপরূপ বাক্-প্রতিমা নির্মাণ করেছে। তার অনুভবের সৌকর্য, পাণ্ডিত্য, রসবোধ, সৌন্দর্যস্পৃহা, রূপতৃষ্ণা, মনীষার দীপ্তি, কবিত্বের মাধুর্য, চিন্তার উৎকর্ষ জড়িত করে এক-একটি ধ্বনিকে তাৎপর্যে মহাসমুদ্রের গভীরতা ও অসীম আকাশের বিস্তৃতি দান করেছে। এই দৃষ্টিতে এক একটি শব্দ, এক একটি তত্ত্ব, এক একটি দর্শন, এক একটি অনন্য অনুভূতি, এক একটি কবিতা, এক একটি ভাবজগৎ, এক একটি চিন্তা-সম্পদ, এক একটি অভিজ্ঞতার আকর এবং এক একটি প্রজ্ঞার প্রসূন।

সূর্যকে যখন অরুণ, তপন, রবি, দিনেশ,দিনবন্ধু, কমলেশ, অর্ক, ভানু, মিহির, মার্তণ্ড এবং চন্দ্রকে হিমাংশু, সুধাংশু, হিতাংশু, শশাঙ্ক, শশধর, শশোদর, সুধাকর, নিশানাথ, তারানাথ, সিন্ধুতনয় কিংবা সিংহকে কেশরী, পশুরাজ, হর্যক্ষ, তারাবাহন অথবা রাজাকে ভূপ, ভূপতি,নরপাল, নৃপ, নরেশ্বর; রামকে রঘুপতি, দাশরথি, সীতানাথ, রাবণারি, অযোধ্যানাথ, কৌশল্যানন্দন, কৃষ্ণকে যাদব, দামোদর, কংসারি, নাড়ুগোপাল, মথুরানাথ, রাধারমণ, রাখালরাজ, মুরারি, নন্দদুলাল, যশোদানন্দন, গিরিধারীলাল, মাধব, জনার্দন বলে তখন তাদের রূপগত কিংবা গুণগত পরিচয়ই দেয়া হয়। একটি অপরটির প্রতিশব্দ মাত্র নয়, নব প্রতীকে নতুন চিত্র মনশ্চক্ষে জীবন্ত হয়ে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আমরা এখন যাকে অবলীলায় প্রতিশব্দ বলছি তা তৈরি করতে কিন্তু বুদ্ধি, বিদ্যা, পর্যবেক্ষণ, রসবোধ, সৃজনশক্তি,কবিত্ব, চিত্রপ্রিয়তা ও বৈশিষ্ট্য-চেতনার প্রয়োজন হয়েছে, অতএব এক-একটি প্রতিশব্দ এক-একজন বিজ্ঞ-বিদ্বান, কবি-শিল্পীর সৃষ্টি। যেমন 'জসিমের মৃত্যুসংবাদে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম,' "স্তম্ভিত" শব্দটি আমরা অবহেলে ব্যবহার করি। কিন্তু 'স্তম্ভের মতো স্থির, নিষ্প্রাণ, নির্বাক, নিশ্চল, জড়বস্তুতে পরিণত হলাম'— দুঃসংবাদের প্রতিক্রিয়ার এতগুলো লক্ষণ একটি শব্দেই সংহত হয়ে অভিব্যক্তি পেল। পুরো একটি চিত্র,অবস্থার পুরো বর্ণনা একটি শব্দ উচ্চারণমাত্র মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠার কথা। তেমনি মারা গেল, মারা পড়ল, পটল তুলল, অক্কা পেল, তিরোভাব ঘটল, লোকান্তরিত হল, প্রয়াণ করল, মহাপ্রস্থান করল, চিরনিদ্রায় অভিভূত হল, স্বর্গে গেল, চিরশয্যা গ্রহণ করল, পরলোকগমন করল, চোখ বুজল, চিরবিদায় নিল, জান্নাতবাসী হল,ইন্তেকাল করল প্রভৃতির প্রত্যেকটিই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে বক্তার শ্রদ্ধা, ঘৃণা,উপহাস প্রভৃতির সঙ্গে বক্তার মৃত্যু সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ধারণাও প্রকাশ করছে। কারবালা কিংবা কুরুক্ষেত্র, রাবণের চিতা কিংবা মীরজাফর—কত ঘটনা, কত ইতিহাস, কত পরিণাম, কত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দোষ, কত গুণ আমাদের মুহূর্তে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারো ডাকনাম বা আসল নামে মা-বাপের কত গুপ্ত আশা, স্বপ্ন, দর্শন, অভিপ্রায়, রুচি,আদর্শ লুকিয়ে থাকে। এমনি করে প্রায় প্রত্যেকটি শব্দই এক-একটা রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সাঙ্কেতিকতা, প্রতীক, প্রতিম, রূপকল্প, রসকল্প, চিত্রকল্প ও ভাবকল্পের আকর ও বক্তার অভিপ্রায়ের আধার। ভাবকে রূপ দেয়ার, দৃশ্য করবার, শ্রোতার বুদ্ধিগ্রাহ্য ও হৃদয়বেদ্য করবার কী আকুলতা না প্রকট হয়ে ওঠে মানুষের ভাষায়। ভাবকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে অন্য মনে সঞ্চারিত করে দেবার এই বাসনা মানুষের স্বভাব-প্রসূত। এই একই প্রেরণায় মানুষ হয়েছে পৌত্তলিক-প্রতিমাপ্রিয়। সে যা জেনেছে,বুঝেছে ও অনুভব করেছে তাকে প্রমূর্ত করা— অবয়ব দান করাও একই বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রকাশ। বাক-প্রতিমা আর মৃৎ বা ধাতব বা পাথুরে প্রতিমার উদ্ভব ঘটে এমনি প্রবল প্রেরণা থেকেই। তার অনুভব, তার বোধ, তার রূপবুদ্ধি, তার সৌন্দর্যচেতনা, তার রসগ্রাহিতা, তার সৃজন-সামর্থ্য অন্যে দেখুক, জানুক, শিখুক, বুঝুক—এ-ই হচ্ছে তার অন্তরের অভিলাষ। আত্মপ্রকাশের, আত্মপ্রচারের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার এ-ও এক পন্থা। লক্ষ্য হচ্ছে—যশ, মান, খ্যাতি, প্রভাব, প্রতিপত্তির মাধ্যমে আত্মরতি চরিতার্থ করা—আত্মপ্রসাদ লাভ করা হয়। এবং শাস্ত্রীয় তথা ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, ঐতিহ্য বিষয়ক উৎসব-পার্বণ, ব্রত-তীর্থ, আচার-আচরণ ও স্মৃতিচারণার মাধ্যমে মানুষ তাদের লালিত বিশ্বাস-সংস্কার, পোষিত গৌরব-গর্ব প্রভৃতি ভাবকে রূপদান করে। হজ্বের বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা হিন্দুদের মূর্তিপূজা বা বৌদ্ধস্তূপ প্রভৃতি এক-একটি অনুভূত,উপলব্ধ কিংবা ঐতিহ্যিক তত্ত্বের রূপায়ণ। ভাবকে এমনি করে যেমন রূপ দেয়া হয়, তেমনি রূপেরও ভাবে উত্তরণ ঘটানো হয়। সমুদ্র-অরণ্য-পর্বত-মরুকে কিংবা চন্দ্র-সূর্য-তারা-মেঘ-গগন-তৃণ-তরুলতা কিংবা পশু-পাখিকে মানুষ নানা ভাব-প্রতীকে মনে ধারণ করছে। ঐগুলোর ওপর ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণ আরোপ করেছে। রূপ থেকে ভাবে এবং ভাব থেকে রূপে মানুষের এই বিচরণ তার আদিম জিজ্ঞাসার সমকালীন। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম মানুষ ভয়-ভরসার দৈব অদৃশ্য-অলৌকিক আবহ ও প্রবাহ স্বীকার না করে পারেনি। এভাবেই তার চেতনায় অস্তিত্ব ও স্থিতি লাভ করে অদৃশ্য শক্তিপ্রতীক দেবলোক কিংবা সার্বভৌম স্রষ্টা-তত্ত্ব। সে সঙ্গে নানা মন্দশক্তি ও উপ-অপদেবতা, প্রেত-পিশাচ, শয়তান-মার প্রভৃতি।

যারা এসব তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাদের মন-বুদ্ধি-বিশ্বাসের সঙ্গে এগুলোর গভীর নিবিড় অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল, তাই নানা আচার-আচরণ ও বিভিন্ন ভাব-তত্ত্ব ছিল তাদের অন্তর্জগৎ সংলগ্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের বিস্মৃততত্ত্ব বংশধরদের কাছে সেগুলো হল প্রাণহীন প্রথা, রেওয়াজের আচার। সেজন্য এগুলো উৎসবে-পার্বণে-আচারে অবসিত—এখন আর অন্তর্জীবনের অন্তরঙ্গ নয়। তাই এগুলোর ব্যক্তিজীবন কিংবা সমাজ-নিয়ন্ত্রণশক্তি ও প্রভাব বিলুপ্ত প্রায়।

ভাষার ক্ষেত্রেও সেরূপ অনুষঙ্গ-বিস্মৃতিগত বিভ্রান্তি ও বিকৃতি ঘটেছে। যেমন তিলের নির্যাসই কেবল তৈল, এখন কেরোসিনও তৈল! জননশক্তি প্রয়োগে জন্ম দেয় যে সেই জনক ও বাপ। এখন কিন্তু জাতিরও জনক হয়, যে-কেউ বাপ সম্বোধন পায়!

কেশরের শোভা-মুগ্ধ বক্তার কাছেই সিংহ-কেশরী। এখন মানুষ ও বীরকেশরী হয়, যেন বীরেরও সিংহসুলভ কেশর রয়েছে। সু-নর থেকেই 'সুন্দর', যেমন বানর থেকেই বান্দর। কাজেই "সুন্দর" বিশেষণ কেবল মানুষ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এখন বানরও সুন্দর, ঘোড়াও সুন্দর, ফুলও সুন্দর অর্থাৎ ত্রিভুবনের সবকিছুই যেন সু-নর! নানা তাৎপর্যে আদি নির্মাতারা যে শব্দ-সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, আজ তা নিশ্চিহ্ন, কালে কালে শব্দগুলো অনুষঙ্গ ও আদি অভিধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিয়ে অর্থান্তর লাভ করেছে। তেমনি এক-একটি আদি মূল ভাষার উচ্চারণে বিকৃতি ও বাক্যগঠন রীতি সম্পর্কে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অজ্ঞতা কালান্তরে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য ভাষার ও বুলির।

রূপ থেকে ভাবে অবগাহনেরও অবলম্বন হচ্ছে নতুন রূপ। যেমন গঙ্গাকে জীবনদায়িনী মাতৃরূপে, মেঘ কিংবা বায়ুকে বিরহী-বিরহিণী নায়ক-নায়িকার বাণীবাহক দূতরূপে কল্পনা, জীমূতকে মনের কালি কিংবা আল্লাহর রহমতরূপে বর্ণন, পর্বতকে পৃথিবীর ভাররূপে কিংবা দেবলোক কৈলাসরূপে গ্রহণ, তুলসীতরুকে দেবাসন বলে অভিহিত করা অথবা দেশের মাটিকে মা বলে বরণ করা প্রভৃতি রূপকে ও ভাবরসে সিক্ত করে নতুন অবয়ব দানের নন্দিত প্রয়াস মাত্র।

মানুষ তার চেতনার মুকুরে জগৎ ও জীবনকে প্রতিভাত করবার জন্য ভাষার আশ্রয় নেয়। তার অনুভব, তার উপলব্ধি, তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বোধ-বুদ্ধি, তার আনন্দ-যন্ত্রণা সবকিছুই সে-ভাষার আধারে লাভ করে। এই তাৎপর্যে ভাষাই জীবন। সে-ভাষাও আবার নিরবয়ব নয়, প্রতীকে প্রতিমে তা চিত্রিত হয়ে মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং তাতেই অদৃশ্য-অধরা শারীর প্রতিমূর্তি হয়ে ধরা দেয়। কাজেই ভাষা কেবল উচ্চারিত অর্থবহ ধ্বনিমাত্র নয়—প্রতীক ও প্রতিম, চিত্র ও প্রতিমা।

একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে মানুষ কিছুই যেন ধরতে ও ধরাতে পারে না। পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কিছু তাই বোধহয় মানুষের ধারণাতীত। সেজন্য বাঘ কীরকম জানতে চাইলে বলতে হয় বিড়ালের মতো। রূপেরও প্রতিরূপ চাই। এ কারণেই মানুষ পরী বানিয়েছে নারীর পিঠে পাখির পাখা লাগিয়ে, দেবতা গড়েছে মানুষের হাত-পা মুখের সংখ্যা বাড়িয়ে, দৈত্য গড়েছে শ্বাপদের নখ দন্ত ধার করে, স্বর্গ গড়েছে পার্থিব ফুল-ফল-সম্পদ দিয়ে। আর কোথা পাবে! তাই মানুষ মাত্রেই প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে পৌত্তলিক। ধরা-ছোঁয়া যায় তেমন অভিজ্ঞানকে স্মারক হিসেবে সঙ্গে রেখেই সে অধরাকে ধরে, অদৃশ্যকে দেখে, অপ্রাপ্যকে পায়, অবোধ্যকে বোধগত করে, অজানাকে জানে। ভাষাও তাই রূপে-রসে-চিত্রে-মূর্তিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সাংকেতিকতা, প্রতীক, প্রতিম, প্রবচন যোগে আমরা এ প্রমূর্ত ভাষাকে পাই—অভিপ্রেত কাজে লাগাই। অতএব, মানুষের মন সর্বক্ষণ ভাষা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেননা ভাব ও রূপ পরস্পরকে সর্বক্ষণ আকর্ষণ করছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে :

সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা,
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

অতএব, ভাষার শব্দ মাত্রই প্রতীক ও প্রতিম॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি সত্তার বিলোপ প্রয়াসে ১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র

১৯১১ সনে বঙ্গ-বিভাগ রদ হয়ে যাওয়ার ক্ষোভ বাঙালি মুসলমানেরা যেন আজো ভুলতে পারেনি। তারা হৃত সুযোগের জন্য আজো আফসোস করে। অথচ এতে মুসলমানদের জন্য লাভের-লোভের কিছুই ছিল না। শোনা কথায় কান দিয়ে তারা অকারণে অনুতাপে ভোগে। কেউই আর খুটিয়ে খতিয়ে জানবার-বুঝবার চেষ্টা করে না। বঙ্গ-বিভাগে মুসলমানদের সমর্থন ছিল বলে যে একটা কথা চালু রয়েছে, তাতেও তথ্যগত ভুল আছে। কেননা, সেদিন মুসলিম সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অশিক্ষিতজনদের কাছে এ খবরের কোনো গুরুত্বই ছিল না। মুসলিম সমাজে সেদিন যাঁরা স্বয়ংসিদ্ধ নেতা ছিলেন, তাঁদের গণসংযোগ ছিল না। আবার তাঁদের প্রধানরা ছিলেন উর্দুভাষী অবাঙালি সামন্তের বংশধর।

এমনকি তাঁরা যে বিদেশীর বংশধর এই বোধই ছিল তাঁদের আভিজাত্য-গৌরবের উৎস। দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি তাঁদের না ছিল মমতা, না ছিল কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য-চেতনা। সম্পদ-সূত্রেই তাঁরা স্বজাতির নেতৃত্ব গৌরবের দাবিদার। এসব অজাতমূল পরগাছারা সঙ্গত কারণেই ছিলেন সরকারের অনুগ্রহ-লোভী সুবিধাবাদী সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থবাজ দালাল। পাকিস্তান আমলেও বাঙলার উর্দুভাষী জমিদার ও বেনে পরিবারগুলোর ভূমিকায় এই ঐতিহ্য অনুসৃত। বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করেছিলেন ঐ সামন্ত-নেতারাই। তখনো শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী মুসলিম-সমাজে গড়ে ওঠেনি, কাজেই গুটিকয় স্থিতধী মুসলিম ব্যতীত এ সমাজে আর কেউই প্রতিবাদী ছিল না। এতে ব্রিটিশ সরকার স্বস্বার্থে প্রচার করে যে, বঙ্গ-বিভাগে মুসলিম-সমাজের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এবার বঙ্গ-বিভাগের গোড়ার কথায় আসা যাক। নতুন বন্দর কোলকাতায় একদিন ইংরেজ-আশ্রয়ে বেনিয়া-ফড়িয়া ও ফেরারির ভিড় জমেছিল। ওরা নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চাকুরে-মুৎসুদ্দি-ফড়িয়ারূপে কাঁচা টাকা সৎ ও অসদুপায়ে অর্জন করে সম্পদশালী হয়ে ওঠে। কোম্পানি শাসনের প্রসারের সাথে সাথে ওরাও বিত্তে এবং বিদ্যায়, সংখ্যায় আর সহযোগিতায় বেড়ে ওঠে। আঠারোশ ষাটের পরে সংখ্যায় ও সম্পদে ঋদ্ধ এই বিত্তবানেরা আত্মসম্মান বৃদ্ধির প্রেরণায় সরকারি রীতিনীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে উৎসুক হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে অবাধে অজস্র অর্জনের সুযোগ-মুগ্ধ এই ভূঁইফোঁড় বড়লোকেরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে, ওহাবি আন্দোলনে কিংবা সিপাহি বিপ্লবে কোনো উৎসাহ-সহানুভূতি প্রদর্শন তো করেইনি, বরং সোনার সুযোগ হারানোর আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিল। এখন প্রতিযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে উপার্জনের বাজার মন্দা হওয়ায় এবং প্রতুল ঐশ্বর্যে লোভের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ায় আর প্রতীচ্যবিদ্যার ছোঁয়া লাগায় ওরা মানের কাঙাল ও প্রতিষ্ঠার প্রার্থী হয়ে ওঠল। বিশেষ করে ধনী বাপের তরুণ সন্তানেরা ফরাসি বিপ্লবের মনোমুগ্ধকর বাণী মুখস্থ করে স্বাধীনতা ও সম্মান-সম্ভ্রম বিলাসী হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে ছিল প্রতীচ্য দর্শনের সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের ইন্ধন। পড়ে-পাওয়া বিদ্যার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

প্রভাব-প্রসূত এই চেতনা দেশের মাটিতে টবের তরুর মতোই ছিল বিলাস-বস্তু। এ সুরুচির প্রসূন বটে, কিন্তু সুচিন্তার ফল নয়। বৈঠকী আলাপের অবলম্বন হলেও, তা তখনো জীবনের প্রয়োজন-প্রসূত সম্পদ হয়ে ওঠেনি, তাই তা বুলির বলয় অতিক্রম করে প্রয়াসের প্রেরণায় পরিণত হয়নি। তবু ধনীর দুলালেরা স্বপ্নের রোমন্থনে সঙ্ঘ ও সংস্থা গড়ে নিষ্কর্মার সময়ের সদ্ব্যহারে উদ্যোগী হল। তুখোড় বুলির তোড় এবং সংস্থা-সঙ্ঘের অনেকতা দেখে সরকার সতর্ক হয়ে ওঠল। শত্রুকে ছোট ভাবতে নেই। বটের বীজ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু জন্ম দেয় মহীরুহের—সরকার তা জানে। কাজেই তাচ্ছিল্যে অবহেলা করতে নেই। অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা ভালো। এ সূত্রে অমৃতবাজার সম্পর্কিত ১৮৭৩ সনের প্রেস আইন স্মর্তব্য এবং এ প্রসঙ্গে ১৮৭০ সনের পরবর্তী গুপ্ত সঙ্ঘগুলোও স্মরণীয়। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তখন আধুনিক জাতিগঠন উদ্দেশ্যে জাতিবৈর জাগিয়ে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস চলছে, ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালে তা শুরু এবং হেম-বঙ্কিম-নবীনে তার বিকাশ। সবটাই কিন্তু পড়ে-পাওয়া বিদ্যার প্রসূন। তাই ওটা ছিল কৃত্রিম অকালবসন্তের স্বপ্ন-বিলাস—ঐসব উদ্যোক্তাদের ভাব-চিন্তার অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধী উক্তিই তার প্রমাণ। আরো কিছু পরবর্তীকালের দ্বিজেন্দ্রলাল, রমেশ দত্ত প্রভৃতির রচনা এবং জীবনকথাও এই সাক্ষ্যই বহন করে। ঠাকুর-পরিবারের বেকার সন্তানেরা স্বদেশী মেলা করেন বটে, কিন্তু বাড়ির মেজো সন্তান যে আই.সি.এস. সে গর্বও সর্বক্ষণ মনে জিইয়ে রাখেন। এ সবকে পড়ে-পাওয়া সুরুচিজাত স্বাপ্নিকতা বলছি একারণে যে, ওঁদের কেউই আন্তরিকভাবে জনকল্যাণ, শোষণ-মুক্তি বা স্বাধীনতা কামনা করেননি, কিংবা প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা ও ইংরেজ-বিদ্বেষ অন্তরে ঠাঁই দেননি। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যগর্বী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতীচ্য সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ ছিল, তাঁর সিভিলিয়ান সন্তান বিলেতেই পরিবার রাখতেন , ডি. এল. রায় দেশমাতার বন্দনা-গানের সঙ্গে ইংরেজ সম্রাটের জয়গানেও মুখর ছিলেন। স্বদেশপ্রেমের গানের রচক হলেও তিনি বিলেতি সভ্যতার স্তাবক ছিলেন। অবশ্য যুগসন্ধিক্ষণে—কালান্তরের জন্মমুহূর্তে এমনি অসঙ্গতির আলো-আঁধারই স্বাভাবিক। দেশের মাটি ও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে দেশের মানুষের মগজ-প্রসূত না হলে কোনো ধার-করা ভাব-চিন্তা-কর্মই ফলপ্রসূ হয় না। চাহিদা যথার্থ হলেই সরবরাহের ব্যবস্থাও হয়।

উনিশ শতক ছিল বাঙলার হিন্দু সমাজের পক্ষে প্রতীচ্য আদলে আধুনিক জীবন রচনার যুগ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উদার ও সংকীর্ণচিত্ত এবং বর্ণভেদ সমন্বিত সমাজে ভাঙা-গড়ার মুহূর্তে নতুন-পুরোনোর, ভালো-মন্দের, ত্যাগ-লিপ্সার, সৎ-অসতের টানাপড়েনে অসঙ্গতি-অসামঞ্জস্য ও স্বধিরোধিতা এড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই কারো মতে ও পথে, কথায় ও কাজে ঐক্য ছিল না, যাকে বলে Split Personality তা-ই ছিল প্রায় সবাই। বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণ প্রভৃতি দুর্লভ চরিত্রের লোকও ছিলেন অবশ্য। কিন্তু এসব ১৮৯০ সনের আগের অবস্থা। এতোমধ্যে বেশ কয়েক হাজার ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি দেশের সর্বত্র এমনকি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে। সে যুগের সরকারি সওদাগরি অফিসে বেশি চাকুরের ব্যবস্থা ছিল না। তাই ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পরও বেকার ও বেসরকারি পেশার শিক্ষিত লোক গ্রাম-গঞ্জে বিরল রইল না। তাছাড়া ইতোমধ্যে ইংরেজের মাহাত্ম্য-মুগ্ধতা এবং প্রতীচ্য-মহিমার প্রভাবও কিছু কমেছিল। তাই বোধহয় স্বস্থ বাঙালির আত্মসম্মানবোধ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার স্পৃহা যুগিয়েছিল। মোটামুটি ১৮৯০ সনের পর থেকে শোষণমুক্তির, স্বাধিকারের, স্বাধীনতার স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকল্পরূপে প্রকট হতে থাকে। অনুশীলন-যুগান্তর দল ও অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম, প্রমথ মিত্র-পুলিন দাশ-প্রফুল্ল চাকী, প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ সন্ত্রাসবাদীদের আবির্ভাব তখন থেকেই শুরু এবং ১৯৩৩ সন অবধি বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী দল ভারতব্যাপী কর্মতৎপর থাকে। মোটামুটিভাবে ১৮৮০ সনের পর থেকেই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিত্তশালী বাঙালির বর্ধিষ্ণু আগ্রহ এবং তরুণ বাঙালির সন্ত্রাসবাদে আস্থা দেখে ব্রিটিশ সরকার বিচলিত হয়ে ওঠে। তখনো কিন্তু ভারতের অন্যত্র বেনে-সামন্ত-চাকুরেরা আঠারো শতকী বাঙালির মতোই ব্রিটিশ মহিমায় মুগ্ধ এবং তাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী। কাজেই সাম্রাজ্যিক বিপদের বীজ উপ্ত হচ্ছে এই পূর্বপ্রান্তে। পূর্ব দিগন্তে ঝোড়ো মেঘের এই আভাসে বিব্রত ইংরেজ তা যাতে সর্বভারতে সংক্রমিত না হতে পারে তার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল। এ কারণেই হয়তো W.S Blunt ১৮৮৩ সনেই উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে দুটো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।

সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর আমল থেকেই বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়েই বাঙলা গঠিত। এর আগেও স্থায়ী সুবাদারের অভাবে উক্ত দুটো বা তিনটে অঞ্চল সাময়িকভাবে এক সুবাদারের শাসনে থাকত। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ আওরঙ্গজীবের বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র মুর্শিদকুলি খাঁ মেয়াদী সুবাদারিতে তাঁর জীবনস্বত্বভোগ করেন, পরে তা কায়েমী স্বত্বে ও পুরুষানুক্রমিক নওয়াবিতে তথা সামন্ত স্বত্বে পরিণতি পায়।

মুঘলের প্রতাপের দিনে সুবাদারি ছিল চার-পাঁচ বছরের মেয়াদী চাকুরি। মুঘলের পতনকালে শাহজাদাদের গৃহবিবাদ ও প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের সুযোগ সাম্রাজ্যের সুযোগ-সন্ধানী সুবাদারদের কেউ হল স্বাধীন, কেউবা হল স্বেচ্ছাচারী ও আনুগত্যে শিথিল। শেষোক্ত দলের অপুত্রক মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকেই উত্তরাধিকারী স্থির করেছিলেন কিন্তু জামাতা সুজাউদ্দীন ষড়যন্ত্রে সফল হয়ে পুত্রের আগে নিজেই হলেন নওয়াব। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগ্রহপুষ্ট কৃতঘ্ন আত্মীয় বিহারের নায়েব নাজিম আলিবর্দী তাঁর পুত্র সরফরাজকে ষড়যন্ত্রের জালে আটকে গিরিয়ার নামমাত্র যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদ দখল করেন। আবার তাঁরই ভগ্নীপতি ও অনুগ্রহজীবী মীর জাফর আলী খাঁ তাঁরই দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলাকে হত্যা করে বসলেন সুবাদারের আসনে। এবার জাফর আলীর জামাতাই ইংরেজের সঙ্গে যড়যন্ত্র করে শ্বশুর থেকে কেড়ে নিলেন মসনদ। তারপর ইংরেজরা হল মসনদের মালিক। এই সূত্রে স্মর্তব্য যে, পলাশীর যুদ্ধ কিংবা মীর জাফরের ইংরেজ-নির্ভরতা অথবা মীর কাসিমের পরাজয় ইংরেজদের 'সুবে বাঙলার' মালিক করেনি, দিল্লির দুর্বল সম্রাট-প্রদত্ত দিওয়ানিই ইংরেজকে দেশের দখল দান করেছিল। নইলে নওয়াবরা হায়দরাবাদের নিজামের মতো কিছুকাল পুতুল হয়ে থাকত হয়তো, কিন্তু দেশপতি হওয়ার সাধ বা সুযোগ হত না ইংরেজের।

অতএব, ১৭১২ সনে মুর্শিদকুলির সুবাদারির শুরু থেকে ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিভাগ অবধি একশ তিরানব্বই বছর ধরে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা ছিল একটি প্রদেশ। শাসনকেন্দ্র ছিল আগে মুর্শিদাবাদ পরে কোলকাতা এবং ইংরেজি শিক্ষায় অনগ্রসর বিহার-উড়িষ্যাবাসীর ভূমিকা ছিল নগণ্য, সর্বক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল বাঙালির।

প্রবুদ্ধ বাঙালি হিন্দুর সংহতি বিনষ্টির জন্য এবং তাদের বিকাশমান আধুনিক জাতীয়তাবোধ বিনাশের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা বঙ্গবিভাগে উদ্যোগী হয়। ১৮৯৮ সনে লর্ড কার্জন গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করেই বঙ্গ-বিভাগে মন দেন। ১৯০৩ সনে তিনি বিভাগের পরিকল্পনা তৈরি করেন, এবং ১৯০৪ সনের ১৬ অক্টোবর তা কার্যকর করেন। অবশ্য ১৮৫৩-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৪ সনে স্যার ব্রান্ট ও লর্ড ডালহৌসী প্রশাসনিক সুবিধার জন্যে একবার এই বিশাল প্রদেশকে বিখণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বাঙলাভাষীকে ত্রিধাবিভক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল না। এবারও মুখে বলেছে বটে, শাসন-সৌকর্যের জন্য বিরাট অঞ্চলটাকে দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করা জরুরি হয়ে ওঠেছে, কিন্তু ভাগ যেভাবে করল তাতে তাদের মতলব গোপন রইল না। বাঙলাভাষী অঞ্চলকে তিন টুকরো করে কিছু বিহারের সঙ্গে, কিছু উড়িষ্যার সঙ্গে এবং কিছু আসামের সঙ্গে জুড়ে দিল। এবং সর্বত্রই বাঙালি জনে ও জমিতে হল লঘু। এভাবে বাঙালির জনবল, ধনবল ও ভাষার বল খর্ব করার যড়যন্ত্র করেছিল ইংরেজ তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। এতে বাঙলা ও বাঙালি নামের অস্তিত্ব ও জাতের নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে যেত, তার ভাষাও বুলি হিসাবেই টিকত কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। প্রশাসনিক সদুদ্দেশ্যে প্রদেশ বিভাগ জরুরি হলে তারা ১৯১১ সনে যেভাবে ভাগ করল, সেভাবেই ১৯০৫ সনে বিভক্ত করতে পারত অঞ্চলগুলো। এত বড় জাত-বিনাশী যড়যন্ত্রও কিন্তু উর্দুভাষী অজাত-মূল মুসলিম সামন্ত-নেতাদের বিক্ষুব্ধ-বিচলিত করেনি। তাঁরা বরং এতে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং সর্বপ্রকারে ইংরেজের এই অপকর্মে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। ১৯০৬ সনে স্যার সলিমুল্লাহর আগ্রহে ও নেতৃত্বে ঢাকায় সরকার-অনুগত মুসলিম সামন্ত-বুর্জোয়াদের নিয়ে সরকারি আশীর্বাদপুষ্ট মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ সময় সলিমুল্লাহ জমিদারির ঋণশোধের জন্য সরকার থেকে দশ লক্ষ টাকাও পেয়েছিলেন, বাহ্যত ঋণরূপেই। কিন্তু তা কখনো পরিশোধ করতে হয়নি।

এর একাধিক কারণ ছিল, একে তো তাঁরা কোনোদিন দেশকে ধাত্রীরূপে বরণ করেননি, তাঁরা ছিলেন স্বদেশে প্রবাসী। দ্বিতীয়ত তাঁরা ছিলেন সরকারের অনুগ্রহজীবী কৃপালোলুপ সামন্ত, তৃতীয়ত মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চালু হলেও তখনো এদেশে মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া-জীবন মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামন্ত প্রতাপের আকর্ষণে তখনো আমাদের ভূঁইফোঁড় ধনীসমাজ মুগ্ধ। তাই দেখতে পাই আঠারো-উনিশ শতকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপুল অর্থ উপার্জন করেও ব্যবসা চালাবার, ব্যবসায়ী থাকবার আগ্রহ দেখায়নি কেউ। সবাই জমি কিনে 'জমিদার' হবার উৎসাহ বোধ করেছে। 'বাণিজ্যেই লক্ষ্মীর বাস'—প্রত্যক্ষ করেও সবাই বাণিজ্য ছেড়ে জমিদার হয়েছে। সামন্তযুগের প্রভুত্ব মহিমার কাছে বেণেজীবন যেন ইতরতায় ম্লান। আভিজাত্যের আকর ছিল প্রভুত্ব। চট্টগ্রামে চালু ইংরেজ আমলের একটি ছড়ায় এই মনোভাব সুপরিব্যক্ত :

কেউ ভালো মানুষ 'পড়ি'
কেউ ভালো মানুষ 'কড়ি'
কেউ ভালো মানুষ 'মনে মনে'
কেউ ভালো মানুষ 'জগতে জানে'

অর্থাৎ কেউ অভিজাত (ভালো মানুষ) হয় উচ্চশিক্ষিত হয়ে বড় চাকুরি করে, কেউ অভিজাত হয় অর্থশালী হয়ে, কেউ অন্যের স্বীকৃতি না পেলেও নিজেকে অভিজাত বলে মনে করে, আর কেউ সত্যি সত্যি—সর্বজনস্বীকৃত অভিজাত। এখানে প্রথম তিন শ্রেণীর আভিজাত্য অস্বীকৃত ও অবজ্ঞাত হয়েছে। মুসলিম সামন্ত-নেতারা আসামের আরণ্য আদিবাসীদেরকে হিসেবেই ধরেননি, ওরাও যে একদিন শিক্ষিত সভ্য হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হবে তা তাঁদের আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। এই অনুন্নত এলাকায় তাঁরা হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যাল্পতার সুযোগে প্রভুত্ব-গৌরবে ও সম্পদ-সামর্থ্যে অনন্য হয়ে উঠবার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিলেটি মুসলমানরা যেমন আসামে প্রভুত্ব করেছে, তেমনি একটা সুযোগ হয়তো কয় বছরের জন্যও মিলত না। হয়তো বলছি এজন্য যে, ১৯০৫ সনে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। অফিস-আদালত তখনো কোলকাতার মতোই হিন্দুতে আকীর্ণ থাকত। পাকিস্তান-পূর্বকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ববঙ্গের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত এই সাক্ষ্যই বহন করে। পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছয় বছর আয়ুষ্কালে মুসলিমরা এমন কী সুবিধা পেয়েছিল, তাও এ সূত্রে বিবেচ্য। তাছাড়া পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা বিশেষ করে ঢাকা বিভাগের হিন্দুরা বিত্তে ও বিদ্যায় তখনো পূর্ববঙ্গে প্রধান ছিল। তাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাওয়ার কারণ কিংবা হ্রাস করার উপায় তখনো মুসলমানের হাতে থাকত না। পূর্ববঙ্গ ও আসামে পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান জমিদার থাকলেও আর সব জমিদার ছিল হিন্দু। সেই ব্রিটিশ শাসনাধীন পূর্ববঙ্গের লোক উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে পালাত না। বরং মুসলমানদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের সুযোগে নানা বৃত্তি-বেসাতের হিন্দু পূর্ববাঙলায় আশ্রিত হত। তাছাড়া পূর্ববঙ্গ ও আসামে সামগ্রিক হিসেবে অমুসলিমই হত সংখ্যাগুরু। সরকারি হিসেবেই ত্রিপুরা, মণিপুর ও গভীর পার্বত্যাঞ্চল বাদ দিয়েই নতুন প্রদেশের লোকসংখ্যা ছিল তিন কোটি দশ লক্ষ এবং মুসলমান ছিল মাত্র এক কোটি আশি লক্ষ। ত্রিপুরা ছাড়াও লুসাই পর্বতের নাগা-মিজু-মণিপুরীরা যেভাবে মাথা উঁচু করে আজ দাঁড়িয়েছে, তাতে বাঙলা ভাষাও এই নতুন প্রদেশে পাত্তা পেত না। স্মর্তব্য যে, কয় বছর আগে এবং ১৯৭২-৭৩ সনে বাঙলা চাপাতে গিয়ে ঐ আসামেই বাঙালি নিহত ও বিতাড়িত হয়েছিল। তবু আসামের আদিবাসীদের অশিক্ষার ও আরণ্য জীবনের সুযোগে মুসলিম-নেতারা মুসলিম-ভোটের জোরে সরকারের প্রশাসন পরিষদে ও কাউন্সিলে সদস্য ও মন্ত্রী হবার সুযোগ পেতেন কয়েক বছর। বঙ্গ-বিভাগ রদ হবার পরেও যেমন তাঁরা কোলকাতায় সে সুযোগ পেয়েছেন, এবং ১৯৩৭-৪৭ অবধি পূর্ণ মাত্রায় সুবিধে ভোগও করেছেন।

মুসলিম নেতাদের কয়েক বছর ধরে এই সামান্য সুবিধাভোগের জন্য বহু শতক ধরে গড়ে ওঠা একটা জাতি-পরিচয়, একটা ভাষা ও সাহিত্য, একটা ঐতিহ্য, একটা সংস্কৃতি, একটা প্রবুদ্ধসমাজ, একটা উন্মেষিত জাতি-চেতনা চিরকালের জন্য বিনষ্ট করার ব্রিটিশ প্রয়াসে সমর্থন ও সহায়তা দান কি সদুদ্দেশ্যে সৎকর্ম বলে আজো বিবেচিত হবে, কিংবা ইতিহাসে পরিকীর্তিত হবে! বঙ্গ-বিভাগে মুসলিম জনগণের লাভের-লোভের যে কিছুই ছিল না, তা একালের শিক্ষিত মুসলমানের সহজে বোঝা উচিত, এবং বঙ্গ-বিভাগ ব্যর্থ হল বলে আফসোসের বদলে বরং আনন্দ করাই বিজ্ঞতা। বঙ্গ-বিভাগ বাতিল না হলে হয়তো বিখণ্ডিত বাঙালি মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কারো চোখে পড়ত না? আর এ অঞ্চল পাকিস্তানও হত না। বাঙালি হিন্দুর মরণপণ আন্দোলনে ব্রিটিশের এই জাতবিনাশী ষড়যন্ত্র ১৯১১ সনে ব্যর্থ হয়, এবং বিহার ও উড়িষ্যা আলাদা আলাদা প্রদেশরূপে স্থিতি পায়। আসামও পূর্বাবস্থায় থেকে যায়। বাঙলার বিপন্ন অস্তিত্ব ও বাঙালির সত্তা এভাবে নিশ্চিত বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা পায়।

পাকিস্তানোত্তর যুগে পূর্ববাঙলা থেকে হিন্দুরা বাস্তুত্যাগ করে চলে যাওয়াতে এবং ভারত থেকে মুসলিম আগমনের ফলে এখানে যে সুযোগসুবিধা পাচ্ছে, ব্রিটিশ শাসনকালে কয়েক লাখের সংখ্যাধিক্যে অশিক্ষিত মুসলিম সমাজ তা পেত না। কেননা অভিন্ন প্রভুর শাসনে কারো তখন বাস্তুত্যাগের কারণও ঘটত না। ধনবলে ও বিদ্যাবলে তখনো হিন্দুরাই থাকত প্রধান ও প্রবল। দাঙ্গা বাধিয়েও ব্রিটিশ শাসনকালে লোক তাড়ানো যেত না। বস্তুত ১৯০৫-১১ সনে পূর্ববঙ্গেও সরকারি চাকুরে ছিল হিন্দুই, মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। যেমন মুসলিম স্বার্থে ১৯২১ সনে প্রতিষ্ঠিত এবং মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলে নিন্দিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপকই ছিলেন হিন্দু, দু'চারজন ছিলেন মুসলিম। ১৯৪৭ সন অবধি অবস্থা এরূপই ছিল। বঙ্গ-বিভাগ রদ হওয়াতেও মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ; যে আশা নিয়ে মুসলিম সামন্ত-নেতারা পূর্ববঙ্গ প্রদেশ সমর্থন করেছিল, সে আশা ভঙ্গের কোনো কারণও ঘটেনি—কেননা বিহার-উড়িষ্যা-আসাম বিরহী বাঙলা প্রদেশে মুসলমানই রইল সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। তারা যা চেয়েছিল এমনি রদবদলের হেরফেরে তাই পেয়ে গেল। আর যদি কোলকাতার বিদ্বান ও বিত্তবান প্রতিদ্বন্দ্বীই তাদের ভীতির কারণ ছিল তাহলেও পূর্ববঙ্গ প্রদেশে সে ভীতি মুক্তির কোনো উপায় হত না। কেননা এখানেও ছিল বড় বড় হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী এবং শিক্ষিত হিন্দু। বস্তুত কোলকাতার ধনী-মানী হিন্দুর অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব বাঙলার। তাই এখানেও মুসলমানদের আর্থিক ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ সম্ভব হত না। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ঢাকায়-কোলকাতায় ফলগত পার্থক্যের কোনো কারণ ছিল না। অতএব বিভক্ত বঙ্গ কেবল নির্বোধ মুসলমানেরই স্বর্গ ছিল।

AMARBOI.COM

বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগরকে দেখিনি। শুনে শুনেই তাঁকে জেনেছি। ভালোই হয়েছে। দেখলে তাঁকে খণ্ড খণ্ড ভাবেই পেতাম। শুনে শুনে তাঁকে অখণ্ড ভাবে সমগ্ররূপে পেয়েছি। কেননা চোখের দেখা হারিয়ে যায়। অনুধ্যানে পাওয়াই চিরপ্রাপ্তি, সেই পাওয়া যেমন অনন্য, তার স্থিতি যেমন মর্মমূলে, তেমনি তার রূপও সামগ্রিক। বিদ্যাসাগর আমার কাছে এক মূর্তিমান জেদ, এক প্রমূর্ত সংকল্প, এক অখণ্ড সংস্কৃতি, এক অনুধ্যেয় ব্যক্তিত্ব।

উনিশ শতকী বাঙলায় অনেক কৃতীপুরুষ জন্মেছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সবকিছুর মূলে ছিলেন দুই অসামান্য পুরুষ। প্রথমে রামমোহন, পরে ঈশ্বরচন্দ্র। একজন রাজা, অপরজন সাগর। উভয়েই ছিলেন বিদ্রোহী। পিতৃধর্ম ও পিতৃসমাজ অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হয়েছে উভয়ের কাছেই। তাঁদের দ্রোহ ছিল পিতৃকুলের ধর্ম ও সমাজের, জাতির ও নীতির, আচার ও আচরণের বিরুদ্ধে। উভয়েই ছিলেন পাশ্চাত্য প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ। জগৎ ও জীবনকে তাঁরা সাদা চোখে দেখবার, জানবার ও বুঝবার প্রয়াসী ছিলেন। বিষয়ীর বুদ্ধি ছিল তাঁদের পুঁজি। সমকালীন জনারণ্যে তাঁরা ছিলেন Individual, ব্যক্তিত্বই তাঁদের চারিত্র। তাই তাঁরা ছিলেন চির-একা। তাঁদের কেউ সহযাত্রী ছিল না—বন্ধু ছিল না, সহযোগী ছিল না। তাই তাঁরা কেউ সেনাপতি নন, সংগ্রামী সৈনিক। অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর দুঃসাহসই তাঁদের সম্বল। নতুন করে গড়ব স্বদেশ—এ ছিল আকাঙ্ক্ষা, আর একাই কাজে নেমে পড়ার দুঃসাহস। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেয়ার পরিণাম জেনেও হাত বাড়িয়ে দেবার সংকল্পই হচ্ছে তাঁদের ব্যক্তিত্ব। এ ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রীতির সন্তান। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরই আমাদের দেশে আধুনিক মানববাদের নকিব ও প্রবর্তক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জরা ও জীর্ণতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁদের সংগ্রাম। তাঁরা ছিলেন কর্মীপুরুষ—নির্মাতা। মানুষের মনোভূমি শূন্য থাকে না। তাই গড়ার আগে ভাঙতে হয়। সেজন্য তাঁরা আঘাত হানলেন ধর্মের দুর্গে, ভাঙতে চাইলেন সমাজ ও সংস্কারকের বেড়া। কেননা বিশ্বাসী মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় শাস্ত্রীয় শাসনে ও আচারিক আনুগত্যে। যেসব প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা মানুষকে বদ্ধকূপের জিয়েল মাছ করে রেখেছে; যেসব বিশ্বাস ও সংস্কারের লালনে, যেসব আচার-আচরণের বন্ধনে তাঁদের জীবনে নেমে এসেছে জড়তা; সেসব লক্ষ্যেই তাঁরা কামান দাগালেন। গড়ার সংকল্প ও উল্লাস তাঁদেরকে দিয়েছিল মনোবল ও বৈনাশিক শক্তি।

উভয়েই ছিলেন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নির্ভীক কর্মীপুরুষ। রামমোহনের ছিল জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আবাল্য জিজ্ঞাসা। পশ্চিমের বাতায়নিক হাওয়ার ছোঁয়ায় সে জিজ্ঞাসা গভীর ও ব্যাপক হয়ে ওঠে এবং কালোপযোগী জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা তাঁকে দ্রোহী ও আপোষহীন বিরামহীন নির্ভীক সংগ্রামী করে তুলেছিল। কেননা তিনি স্বদেশী-স্বধর্মীর জন্যও এই জাগ্রত জীবনের প্রসাদ কামনা করেছিলেন।

রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর—প্রচলিত অর্থে কেউই ধার্মিক ছিলেন না। রামমোহনের জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল। আর শ্রেয়ঃবোধই ছিল বিদ্যাসাগরের ধর্ম। দুজনই ছিলেন জীবনবাদী মানবতাব্রতী মুক্তপুরুষ। তাই বিবেকই ছিল তাঁদের Boss. তাই তাঁরা ছিলেন ভেতরে বাইরে নিঃসঙ্গ। ভূতে-ভগবানে কারো বিশ্বাস ছিল না বলেই, তাঁরা জীবন-স্বপ্নের বাস্তবায়নে উদ্যোগী হতে পেরেছিলেন এবং এ কারণেই যুক্তিই ছিল তাঁদের যুদ্ধের অস্ত্র। যুক্তির অস্ত্রে শাস্ত্রকে বিনাশ করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।

AMARBOI.COM

রামমোহন আচারিক ধর্মকে বোধের জগতে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ধর্মের বৈদান্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তিনি তাঁর প্রয়াসে সিদ্ধি কামনা করেছিলেন। এতে অবশ্য স্বকালে তাঁর প্রত্যক্ষ সাফল্য সামান্য। সেজন্য তাঁর অসামর্থ্য দায়ী নয়—জনসমাজে প্রতীচ্য শিক্ষার অভাবই ব্যর্থতার কারণ। তবু এদেশে প্রতীচ্য-চেতনা-সূর্যের উদয় ঘটে রামমোহনের মাধ্যমেই এবং সে সূর্য মধ্যযুগীয় নিশীথের তমসা অপসারিত করে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর ছিলেন মেকলের উদ্দিষ্ট এ্যাঙলো-ইন্ডিয়ান—মন-মেজাজ ও প্রজ্ঞা ছিল যাঁদের প্রগতিশীল বিদ্বান প্রতীচ্য নাগরিকের, আর জীবনবোধ ছিল নাস্তিক দার্শনিকের, জীবনরসিক বিজ্ঞানীর। উভয়েই ছিলেন মানবতাবাদী। তাই হিতবাদী কর্মী না হয়ে তাঁদের উপায় ছিল না। রামমোহনের উত্তরসূরী বিদ্যাসাগর। রামমোহনের আরব্ধ কর্মে সাফল্য দানই ছিল বিদ্যাসাগরের ব্রত। রামমোহন সংশয়বাদী, বিদ্যাসাগর নাস্তিক। রামমোহন আন্তর্জাতিক, বিদ্যাসাগর জাতীয়তাবাদী।

বিদ্যাসাগর ছিলেন গরিব ঘরের সন্তান। সে ঘরে দুই পুরুষ ধরে আর্থিক স্বস্তি কিংবা আত্মিক প্রশান্তি ছিল না। ঘরোয়া কোন্দল, অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং আর্থিক দৈন্য সুস্থজীবনের পরিপন্থী ছিল। এমনকি পিতৃশাসনও ছিল প্রতিকূল। জন্মমুহূর্তে বিদ্যাসাগরের পিতামহের মুখে এক অমোঘ সত্য উচ্চারিত হয়েছিল—এঁড়ে বাছুর জন্মেছে।

গোঁ বা জেদই বিদ্যাসাগরের সব আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে। বলা চলে, ঈশ্বরচন্দ্রের অন্য নামই 'জেদ'। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই ঈশ্বর। ঈশ্বরের মতোই ছিল তাঁর অনপেক্ষ শক্তি। সেশক্তির উৎস জেদ ছাড়া কিছুই নয়। এরই শালীন নাম দৃঢ়সংকল্প। এ কারণেই বিদ্যাসাগর ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কর্মের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্ময়ের বিষয়, টুলো বামুন পরিবারে যাঁর জন্ম, দারিদ্র্য যাঁর আজন্ম সহচর, বাল্যে যাঁর ইংরেজি শিক্ষা হয়নি, রক্ষণশীল পিতা যাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যপ্রীতি বশে হিতাকাঙ্ক্ষীর পরামর্শ উপেক্ষা করে সন্তানকে শাস্ত্র শিক্ষাদানে সচেষ্ট—সেই বিদ্যাসাগর আবাল্য দেব-দ্বিজে আস্থাহীন। অনুজ শম্ভুচন্দ্র বলছেন—জ্যেষ্ঠমহাশয়ের ভগবানে ভক্তি ছিল না, তবে মাতাপিতাকে তিনি দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। বিদ্যাসাগর নির্বিচারে কিছুই মানেননি। বাল্যেও তিনি সর্বব্যাপারে মাতাপিতার অনুগত ছিলেন না, জেদ চাপলে তাঁকে শায়েস্তা করা সহজ ছিল না। তাঁর বিচারশীলতার ভিত্তি ও মান ছিল কল্যাণ। যা কল্যাণকর তা-ই বরণীয়; আর সব বর্জনীয়। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর বলতে পেরেছেন—বেদান্ত দর্শন ভ্রান্ত, দেশী ন্যায়শাস্ত্র অকেজো—তা পড়িয়ে কাজ নেই। মায়াবাদের কবলমুক্ত করে পাশ্চাত্য জীবনবাদী দর্শনের রাজ্যে নিয়ে যেতে হবে স্বজাতিকে। যেদিন তিনি আরশুলা গলাধঃকরণ করেছিলেন, সেইদিনই বোঝা গেল—কত বড় মানববাদী তিনি—কত গভীর তাঁর মানবতা।

কিন্তু সেদিন রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরকে বুঝবার লোক কোলকাতায় বেশি ছিল না। থাকার কথাও নয়। অগ্রসর চিন্তা-চেতনা কেবল কোটিতে গুটিকে সম্ভব। এজন্য অপরিচিত চিন্তার দীপ্তি সহ্য করবার মতো লোক 'লাখে না মিলএ এক'।

তাই বিদ্যাসাগরও ছিলেন স্বকালে অস্বীকৃত। কিন্তু মেঘ-ভাঙা রোদের মতো তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি, তাঁর চিন্তার দ্যুতি, তাঁর সংকল্পের বহ্নি বাঙালিকে বিরক্ত, বিচলিত ও ব্যস্ত করে তুলেছিল। প্রতিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য হলেও তাদের গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে হয়েছে—জড়তা জড়িয়ে ঝিমিয়ে থাকা আর সম্ভব হয়নি। তারা আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাগেনি, ঘা খেয়ে আর্তচিৎকারে জাগল।

AMARBOI.COM

বিদ্যাসাগরের জেদ যেমন তাঁর চরিত্রে দিয়েছে কাঠিন্য, সংকল্পে দিয়েছে দৃঢ়তা, তেমনি প্রজ্ঞা জানিয়েছে প্রগতির পথ।

বর্জন করার শক্তিই বিদ্যাসাগরকে অনন্য করেছিল। এমনি গুণ রামমোহনেরও ছিল। স্বধর্মের ও স্বদেশের আজন্মলব্ধ বিশ্বাস সংস্কার তিনি গায়ে-লাগা ধুলোর মাতো ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছিলেন। হিতবাদী দর্শনেই ছিল তাঁর আস্থা। তাই বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কিংবা বহুবিবাহ ব্যাপারে তিনি শাস্ত্রের পরোয়া করেননি। কেবল প্রভাবিত করার জন্যই শাস্ত্র আওড়িয়েছেন। তাঁর আত্মচরিত-সূত্রে প্রকাশ, এক আত্মীয়া নারীর মমতামুগ্ধ বিদ্যাসাগর বাল্যেই নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে ওঠেন। শরৎচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন বিদ্যাসাগরেরই মানস-সন্তান। প্রতীচ্য শিক্ষা ব্যতীত তাঁর উদ্দেশ্য-যে সফল হবার নয়, তা বিদ্যাসাগর গোড়াতেই বুঝেছিলেন, কেননা তাঁর মানববাদেরও উৎস ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ জীবন-চেতনা। কিন্তু জেদী বিদ্যাসাগর অপেক্ষা করবার লোক ছিলেন না। তিনি কাঁচা কলা পাকাতে চেয়েছেন, তাই ব্যর্থতাই বরণ করতে হল। বঙ্কিমচন্দ্রও বুঝেছিলেন ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেই কেবল বহুবিবাহ নিবারণ সম্ভব। কুন্দ ও হরলাল, নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল চরিত্র-মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা ও বহুবিবাহ সম্পর্কে সংস্কার-লালিত মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতও বিধবাবিবাহের অনুকূলে ছিল না। তবু কুন্দ-নগেনের বিয়ে তো বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রভাবেই সম্ভাব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী ছাড়া সব উপন্যাসেই বহুবিবাহ-বিরোধী মনোভাব সুপ্রকট।

শিক্ষাই যে মোহমুক্তির ও অন্ধতা বিনাশের একমাত্র ঋজু উপায়, তা সেকালে বিদ্যাসাগরের চাইতে বেশি কেউ উপলব্ধি করেনি। তাই শিক্ষাবিস্তারে তিনি দেহ-মন-আত্মা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োগ করেন। তিনি এ-ও বুঝেছিলেন মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত এবং নারী-পুরুষ সবারই জন্য সমভাবে শিক্ষার প্রয়োজন। সামাজিক নির্যাতন ও সংস্কারের বন্ধন কেবল শিক্ষার মাধ্যমেই ঘুচতে পারে—এ বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না। গাঁয়ে গাঁয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনই ছিল তাঁর ব্রত। বর্ণপরিচয়—বোধোদয়—আখ্যান-মঞ্জুরী— ইতিহাস, উপক্রমণিকা ও ব্যকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা—সীতার বনবাস প্রভৃতি তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত যাবতীয় গ্রন্থই পাঠ্যপুস্তক। প্রভাবতীসম্ভাষণ ও অসমাপ্ত আত্মচরিত ব্যতিত তাঁর সব রচনাই শিক্ষাবিস্তারের ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রচিত। এসব রচনায় তাঁর সাহিত্য-রুচি, শালীনতাবোধ, বৈদগ্ধ, শিল্পনৈপুণ্য, বর্ণনাভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও কল্পনার উৎকর্ষ আজকাল আর অস্বীকৃত নয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে আঠারো-শ পঁয়ষট্টি সালের পরে বিদ্যাসাগরের ভাষিক প্রত্যক্ষ প্রভাব অপগত। মোটামুটিভাবে আঠারো-শ সত্তর সালের দিকে পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রেও তিনি একক নন, তাছাড়া বিধবাবিবাহ কিংবা বহুবিবাহের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রয়াস তখন ব্যর্থ ও অতীতের দুঃস্বপ্নমাত্র। বাস্তব জীবনে এমনি করে তাঁর ভূমিকা ম্লান ও গৌণ হয়ে গেল আঠারো-শ পঁচাত্তরের দিকে। তিনি ছিন্নমুণ্ড তালতরুর মতো বেঁচে রইলেন আঠারো-শ একানব্বই সাল অবধি, তা হলে বিদ্যাসাগরের রইল কী? তাঁর কোন্ কৃতি কীর্তি হিসেবে গৌরব-মিনার হয়ে রইল?

সেই যে বাংলা গদ্যরীতির 'জনক' বলে তাঁর এক খ্যাতি আছে, সেই জনকত্বেই তাঁর স্থিতি। তিনি নতুন চেতনার জনক, সংস্কারমুক্তির জনক, জীবন-জিজ্ঞাসার জনক, বিদ্রোহের জনক, শিক্ষা ও সংস্কারের জনক, সংগ্রামীর জনক, ত্যাগ-তিতিক্ষার জনক। জনকত্বই তাঁর কৃতি ও কীর্তি। সমকালীন বাংলার সব নতুনেরই জনক ছিলেন তিনি। তিনিই ছিলেন ঈশ্বর। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর পরবর্তী কর্মীরা ছিলেন প্রবর্তনদাতা সে- ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় চালিত নিমিত্ত মাত্র।

বিধাতা সেকালের কোলকাতায় 'মানুষ' একজনই গড়েছিলেন, যিনি ধুতি-চাদর-চটির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যিনি জীবন ও জীবিকাকে আদর্শের পদানত করেছিলেন, যাঁর হিমাদ্রি-দৃঢ় সংকল্পের কাছে মাথানত করেছে ইংরেজ-ভারতীয় সবাই, যাঁর মানস-ঐশ্বর্যের কাছে হার মেনেছিল রাজ-সম্পদ, যাঁর আত্মসম্মানবোধের কাছে রাজকীয় দাপট ম্লান হয়ে গিয়েছিল। মানববাদী বিদ্যাসাগর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও প্রবক্তা। ব্যক্তিজীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অসুবিধার গুরুত্ব-চেতনা প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বের চেয়ে কম ছিল না তাঁর কাছে। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' মানুষ-বিদ্যাসাগরের অন্তর্লোকের পরিচয়বাহী। হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগরের পরিচয় 'দয়ার সাগর' খ্যাতিও বহন করছে।

আসলে হিন্দুকলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এজুরা বা ইয়াং বেঙ্গলেরাই অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে মৌখিক ও লিখিত আলোচনার মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে তা ছিল সুরুচি ও সংস্কৃতিসংপৃক্ত সমস্যা ও জাতীয় লজ্জা বিশেষ। এই শৌখিন বিদ্রোহীরা হিন্দুর ও হিন্দুয়ানির সবকিছুই নিন্দা করতেন এইগুলোও ছিল তার অন্তর্গত। এই এজুরা চল্লিশোত্তর জীবনে গোঁড়া হিন্দু বা নিষ্ঠ ব্রাহ্ম হয়েই তুষ্ট ছিলেন, হয়তোবা প্রথম যৌবনের ঔদ্ধত্যের জন্য লজ্জিত কিংবা অনুতপ্তও হয়েছিলেন। কাজেই বিদ্যাসাগরে যা ছিল তাঁর অস্তিত্বের মতোই সত্য, ডিরোজিও-দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলদের পক্ষে তা ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়োধর্মপ্রসূত শৌখিন সংস্কৃতিবানতা। তাঁরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন ; কেউ কেউ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্মী এবং লেখকও ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী থাকেননি। হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর মানবকল্যাণে 'আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ' ছিলেন না। তাই বিদ্যাসাগর মহৎ ও অনন্য। কেবল ভাষার ক্ষেত্রে নয়, জগৎ-চেতনা ও জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপারেও সংস্কৃতিবান বিদ্যাসাগর বাঙালি হিন্দুকে 'গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতে উদ্ধার' করে প্রতীচ্য সংজ্ঞায় আধুনিক সভ্য মানুষ করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর জীবিতকালেই তিনি স্বচক্ষে তাঁর এ সাফল্য দেখে গেছেন। স্বকালে বিদ্যাসাগরকে যথার্থভাবে বুঝেছিলেন কেবল মধুসূদনই। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন–"The man to whom I have applied has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of Bengali mother." —এর চাইতে বিদ্যাসাগরের যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আর কিছুই হতে পারে না।

রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্র বর্ণহিন্দু সমাজেই নিবদ্ধ ছিল। গণমানবের আর্থিক সমস্যা তাঁদের চেতনায় গুরুত্ব পায়নি। এমনকি শিক্ষাবিস্তার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর মুসলিম জনশিক্ষার দায়িত্ব নেননি। কিন্তু এজন্য বিদ্যাসাগরকে দায়ী করা চলবে না। প্রথমত, এঁদের শিক্ষা-সমস্যা কিংবা সমাজ-সমস্যা নিবদ্ধ ছিল কোলকাতা ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলাগুলোর উচ্চবর্ণের শিক্ষিত সমাজে। ইংরেজিশিক্ষাবিমুখ স্বসমাজের মানুষের সমস্যাও তাঁদের বিচলিত করেনি। দ্বিতীয়ত, সে-যুগে বৈষয়িক বা আর্থনীতিক ক্ষেত্র ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের সঙ্গে উচ্চবর্ণের ও বিত্তের হিন্দুসমাজের মধ্যযুগীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক কিংবা রাজনীতিক যোগসূত্র প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তৃতীয়ত, বিদ্যাসাগরের সমকালে নওয়াব আবদুল লতিফ প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তখনো অস্থির বিচার-বিবেচনা চলছে। আবদুল লতিফ স্বয়ং ছিলেন উর্দুভাষী এবং বিদেশাগত উচ্চবিত্তের উর্দুভাষী মুসলিম পরিবারগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। তাঁর বাঙলা বিরোধী সুস্পষ্ট উক্তি রয়েছে। তিনি ছিলেন মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে উর্দু প্রবর্তনের দাবিদার এবং দেশজ নিম্নবিত্তের মুসলমানদের জন্যও তিনি বিশুদ্ধ বাঙলা কামনা করেননি—চেয়েছিলেন নিদেনপক্ষে সন্ধিকালের জন্য সাময়িকভাবে আরবি-ফারসি মিশ্রিত দোভাষী রীতির বাঙলার প্রচলন, যাতে উত্তরকালে মাতৃভাষারূপে উর্দু গ্রহণ সহজ হয়। এমনি অবস্থায় বিদ্যাসাগরের পক্ষে মুসলমানের জন্যও বাঙলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সম্ভব ছিল না, তাঁর সে-অধিকারই ছিল না।

বহুবিবাহ সম্পর্কে আলোচনাকালে বিদ্যাসাগর বলেছেন : "বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে বাঙ্গলা দেশে হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যত দোষ ও যত অনিষ্ট ঘটিতেছে, বোধ হয়, ভারতবর্ষের অন্য অন্য অংশে তত নহে, এবং বাঙ্গালা দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও, সেরূপ দোষ বা সেরূপ অনিষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় না।" বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই জানতেন, চারের অধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলামে অবৈধ এবং ভোগবাঞ্ছাবশেই তারা বিয়ে করে-কন্যাদায়গ্রস্তদের উদ্ধার করবার জন্য পেশা হিসাবে বর সাজে না। তাছাড়া মুসলমান সমাজে তালাক ও পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই হিন্দুনারীর দাম্পত্য-বিড়ম্বনা কিংবা বৈধবা-যন্ত্রণা মুসলিম নারীতে অনুপস্থিত। তাই বিদ্যাসাগর মুসলমান কিংবা অন্য প্রদেশের হিন্দুর বহুবিবাহ নিবারণের জন্য আন্দোলন করেননি। বাঙলার হিন্দুসমাজেও পেশা হিসেবে বহুবিবাহ প্রথাটা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত ছিল। সুতরাং এটি ছিল একান্তই ব্রাহ্মণ পরিবারের সমস্যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইংরেজিশিক্ষাটা ব্রাহ্মণদের মধ্যেই বিশেষ করে প্রসার লাভ করে, তাই স্ব-স্বার্থেই প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের এ বিচলন ও আন্দোলন।

বাঙালি মুসলমান-সমাজে রামমোহনের মতো সংশয়বাদী আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন কর্মীপুরুষ কিংবা বিদ্যাসাগরের মতো মানবহিতবাদী নাস্তিক সংগ্রামী পুরুষ একজনও জন্মাননি। হয়তো যে কালিক প্রয়োজনে রামমোহন বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব, প্রতীচ্য-চেতনাবিমুখ মুসলিম-সমাজে তেমন কাল অনুভূত হয়নি। অথবা রামমোহন-বিদ্যাসাগর স্বসমাজের জন্য যা করেছেন, তা জাগরণ-মুহূর্তে প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রাপ্ত মুসলিম-সমাজকেও দিশা দিয়েছিল। পথিকৃতের চাইতে অনুগামীর স্বাচ্ছন্দ্য যে অনেক বেশি তা লোকে অস্বীকার করবে? বাঙালি মুসলমান প্রতিবেশীর পশ্চাদ্‌গামী ছিল বলেই অনায়াসেই অনেক সমস্যার অনুকৃত সমাধান পেয়েছিল। তবু বোধহয় প্রশ্ন থেকে যায় : রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো প্রত্যাশিত মুক্তচিত্ত দ্রোহী ও নাস্তিক মানববাদীর অনুপস্থিতি মুসলমান-সমাজের সৌভাগ্যের না দুর্ভাগ্যের কারণ?

সাহিত্যবিশারদ : কৃতি ও জীবনদৃষ্টি

AMARBOI.COM

ব্রিটিশের প্রচারণার বদৌলত কিনা জানিনে, বাঙালি হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিক্ষার আলো পেয়ে মৃত মুসলিমের—মরা হাতি তুর্কি-মুঘলের নিন্দাবাদে মুখর ও বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে কৃতার্থমন্য, তুর্কি-মুঘলের জ্ঞাতিত্ব গৌরব-গর্বী স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম লিখিয়েরা তখন হীনমন্যতার লজ্জা গোপন করবার অপচেষ্টায় ভারতের সীমা অতিক্রম করে মরুভূ আরব, ইরান ও মধ্য-এশিয়ার গলি-ঘুঁজিতে অতীত কৃতি ও কীর্তি সন্ধান-সুখে আত্মগ্লানি মোচনে নিষ্ঠ। হিন্দুরাও তখন আত্মমহিমার সন্ধানে প্রাচীন আর্যাবর্তে, উত্তর ভারতে, রাজপুতনার মরুতে এবং মারাঠা অঞ্চলে মানস-পরিক্রমায় নিরত। তখন কেউ স্বস্থ ছিল না। যে মাটির লালনে তারা মানুষ, সে মাটির দিকে, তার মানুষ ও প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন-চেতনা যেন ছিল না কারো। তখন হিন্দু শিক্ষিত হয়ে আর্য হচ্ছে, মুসলমান বিদ্যার্জন করে আরব-ইরানী বনে যাচ্ছে—বাঙালি থাকছে না কেউই। বাঙালি থাকা যেন অন্ত্যজ হওয়ার মতোই বড় লজ্জার অথবা বাঙলাদেশে যেন তাদের প্রবাসের বাসা। অন্ধ আভিজাত্য-গৌরবে কৃত্রিম স্মৃতিচারণায় তখন মিথ্যা তৃপ্তি খুঁজছে হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষিত বাঙালি। নবপ্রবুদ্ধ শিক্ষিত বাঙালি-সমাজের প্রায় সবারই মন-মেজাজ যখন এক আদর্শিক জাতীয়তাবোধের মউজে মশগুল, তখন আবদুল করিমের আবির্ভাব বাংলায় লিখিয়ে-সমাজে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ সাহিত্যিক হিসেবে নয়—সাহিত্যের সেবকরূপেই। তিনিও ছিলেন গৌরব-সন্ধানী। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর পদচারণাও ছিল গৌরব-গর্বের সম্পদ সন্ধানে। তবে পার্থক্য এই যে, তিনি স্বধর্মীর স্বাজাত্যে আস্থাবান ছিলেন না, তাই ধর্মীয় জাতীয়তার টানে তিনি স্বদেশের সীমা অতিক্রম করতে রাজি ছিলেন না। স্বদেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবেসে—স্বদেশের মাটি ও মানুষের পরিচয় জেনে তিনি তৃপ্ত ও কৃতার্থ হতে চেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২০ সনে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতির পূর্বমুহূর্ত অবধি সম্ভবত আবদুল করিমই একমাত্র মুসলিম লিখিয়ে, যাঁর সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি ছিল না। হিন্দুর মধ্যেও তখন চার-ছয়জনের বেশি দুর্লক্ষ্য। ইংরেজ শাসকের প্রবর্তনায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকার্য শুরু হয়েছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে শুরু করে সাম্প্রতকালের সংগ্রাহক অবধি কেউ মুসলিম-ঘরে অযত্নে বিলীয়মান পুঁথি সংগ্রহ-সংরক্ষণে আগ্রহী হননি। তাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে পুঁথির সন্ধান করেছেন বটে, কিন্তু মুসলিম-ঘরে উঁকি মেরে দেখার গরজ বোধ করেননি। অথচ পল্লীতে হিন্দু মুসলিম প্রায় পাশাপাশি ঘরেই বাস করে—শহরে বাস করে ঘেঁষাঘেঁষি গৃহে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই এক্ষেত্রে প্রথম মানুষ যিনি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের ঘরে হানা দিয়ে বাঙালির কৃতি ও কীর্তির নির্দশন—লুপ্তপ্রায় সাহিত্য-সম্পদ কালের কবল থেকে মুক্ত করতে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। বিদেশীদের বংশোদ্ভূত উর্দুভাষী সামন্ত নেতাদের প্রচারণায় দেশজ মুসলমান যখন উদুকেই হৃত 'মাদরী জবান' বলে ভাবতে গৌরব বোধ করছে এবং বাঙলাকে হিন্দুর ভাষা বলে অবজ্ঞা ভরে পরিহার করবার প্রবণতা দেখাচ্ছে, তখন আবদুল করিমই বাঙালি মুসলিমকে এই আত্মবিনাশী মরীচিকা-মোহ থেকে উদ্ধার করেছেন বাঙলা ভাষায় মুসলিম-রচিত সাহিত্যের সন্ধান দিয়ে। তখন হিন্দু মুসলিম সবাই সবিস্ময়ে দেখল এবং বুঝল দু'দশ পরিবার ছাড়া বাঙালিরা দেশজ মুসলমান। তাদের মাতৃভাষা চিরকালই বাঙলা। পঁচিশ বছর ধরে অর্থাৎ যখন থেকে বাংলায় লিখিত সাহিত্য-সৃষ্টির শুরু, তখন থেকেই হিন্দুর মতো মুসলিমরাও তাদের মনের কথা, ভাবের কথা, রসের কথা বাঙলায় রচনা করছে ও পড়ে-শুনে আস্বাদন করছে। এই প্রথম একালের বাঙালি মুসলিম চোখ তুলে তাকাল নিজের দিকে ও নিজের ঘরের পানে। তাকিয়ে দেখল, সে রিক্ত নয়, নিঃস্ব নয়, এদেশে প্রবাসী নয়। ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কীর্তি, গৌরব, সম্পদ—সভ্য মানব-কাম্য সবকিছুই রয়েছে তার। আরব-ইরান মধ্য-এশিয়ায় কিংবা উত্তর-ভারতে, রিকথের সন্ধানে আওয়ারা হয়ে এতিমের মতো ঘুরে বেড়াবার প্রয়োজন নেই তার। পিতৃপুরুষের ধনে সে ঋদ্ধ, পিতৃসম্মানে সে সম্মানিত, বৈদেশিক মর্যাদায় সে মর্যাদাবান। বাঙালি মুসলিমের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে, তাদের আরব-ইরানমুখিতা নিবারণে, তাদের সুস্থ মন-বুদ্ধি গঠনে আবদুল করিমের সাধনা গভীর ও ব্যাপকভাবে সহায়ক হয়েছে। এভাবে বাঙালি মুসলিম নিজেদের মধ্যে দৈশিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার একটা Locus standi বা অবলম্বন পেল। উর্দু-বাঙলা বিতর্ক হ্রাস পেল। যদিও তা ক্ষীণভাবে প্রায় ১২২৫-৩০ সন অবধি চলেছে।

২

১৮৭১ সনে তাঁর জন্ম। লিখিয়ে হিসেবে কলম ধরেন ১৮৯৪ সনে এবং ১৯৫৩ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ত্যাগ করেন সে-লেখনী। সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে তিনি পুঁথি সংগ্রহে-সংরক্ষণে, পরিচিতি সংকলনে, সম্পাদনায় ও সমালোচনায় নিরত ছিলেন। ইবাদতের মতো এই নিষ্ঠা, এই সাধনা, এই আত্মোৎসর্গ বিরলতায় বিশিষ্ট।

জীবন নিয়েই সাহিত্য। জীবনকে দেখবার, জানবার ও বুঝবার জন্যই রচিত হয় সাহিত্য। নিরবলম্ব আগুন যেমন নেই, সাহিত্যেও তেমনি অস্তিত্ব পায় জীবনকে অবলম্বন করেই। আবদুল করিম এই সাহিত্য পাঠ করেই জীবনের সুদীর্ঘ তিরাশী বছর অতিবাহিত করেছেন। সাহিত্যেই মানবিকবোধ ও মানবতার প্রকাশ। মানুষের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন প্রতিবেশে মানুষের বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিচিত্র প্রকাশ ও বিকাশ সাহিত্যে তিনিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর মন-মেজাজও ছিল কোমল ও প্রীতিপ্রবণ। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হয়তো সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও অসূয়ার উর্ধ্বে এক সবল ও উদার জীবন-দৃষ্টি অর্জনের সহায়ক হয়েছিল। নতুবা তিনি যে পরিবেশে জন্মেছিলেন এবং কৈশোর অবধি লালিত হয়েছিলেন, তা এমন মানুষ গড়ে ওঠার পক্ষে অনুকূল ছিল না। যে-গাঁয়ে তাঁর জন্ম, তা একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ গ্রাম। সুচক্রদণ্ডী নামটাও সংস্কৃত এবং প্রাচীন। গাঁটি হিন্দু-অধ্যুষিত—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ও কায়স্থের গাঁ। আর আনুষঙ্গিক কারণে দু'এক ঘর নাপিত, ধোপা ও হাঁড়ি। আর মূলত পাঁচটি মুসলিম-পরিবার। গাঁয়ের হিন্দুদের প্রায় সবাই মধ্য ও নিম্নবিত্তের এবং একটি মাঝারি গোছের নতুন জমিদার-পরিবার। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষা চালু হয়ে গেছে—পটিয়া ইংরেজি বিদ্যালয় গাঁয়ের প্রান্তেই প্রতিষ্ঠিত। মুসলিম-পরিবারগুলোর মধ্যে আবদুল করিমের পরিবারে লেখাপড়া পুরুষানুক্রমে চালু ছিল বটে, তবে উচ্চশিক্ষা ছিল না কারো। তাঁর চাচা (জন্ম ১৮৪০ খ্রি.) থেকেই সরকারি অফিসে চাকুরির শুরু। দুই পুরুষ ধরে মুখ্যত কেরানি পরিবার। আর্থিক দিক দিয়ে সচ্ছল গৃহস্থ—দ্রোন চারেক ধানীজমি আর দুটো ছোট তালুক—হাজারখানেক টাকা বার্ষিক আয়—তবে সব উশুল হয় না। তাঁর যৌবনকালেই পরিবারের কর্তা চাচা মুন্সী আইনুদ্দীন নানা দেওয়ানি মামলায় জড়িয়ে পড়েন। এতে ঋণে ঋণে সম্পত্তি নিলামে গেল অধিকাংশ। ফলে পরিবার দরিদ্র হয়ে গেল এবং আবদুল করিমদের চাকুরিজীবীই হতে হল। বলেছিলাম, পরিবেষ্টনীর প্রভাব তাঁর উদার সুজন হওয়ার অনুকূল ছিল না। পল্লীগ্রামে মানুষ সহজেই ঈর্ষা ও অসূয়ার শিকার হয় এবং মন-বুদ্ধি তাই অসুস্থ ও বিকৃত থাকে।

সংকীর্ণ পরিসরের বদ্ধজীবনে ধনগর্ব, জ্ঞানগর্ব, বংশ-গৌরব, মান-লিপ্সা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রবণতা ও প্রতিশোধ-বাঞ্ছা প্রভৃতি সাধারণত মানুষকে পেয়ে বসে। আবদুল করিম আবাল্য এসবের কবলমুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান ও আত্মীয়-অনাত্মীয় ভেদ ছিল না। গৃহভৃত্যকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং পরিজনের অধিকার দিতেন। চিরকাল প্রত্যহ কারোনা-কারো শিশু কোলে করেই তিনি অবসর উপভোগ করতেন। অপরের দুঃখ-শোকে ব্যথিত হতেন। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি তাঁর কাছে অসহ্য ছিল। পাকিস্তানোত্তর যুগেও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বলে মুসলিম লীগে তাঁর অশ্রদ্ধা ছিল। পাক-ভারতে বিধর্মী হত্যায় ও বাস্তুত্যাগে তিনি বিচলিত ও ব্যথিত হতেন। পুত্রার্থে আর একটি বিয়ে করার জন্য হিতৈষীদের পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করেন—তাঁর স্ত্রী মনে আঘাত পাবেন বলেই। বন্ধু আলতাফ আলীর অকালমৃত্যুতে তাঁর স্মৃতি অম্লান রাখবার বাসনায় নিজের একমাত্র কন্যার নাম রাখেন আলতাফুননিসা। মতান্তরে ও বিবাদে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, জেদ চেপে গেছে, আবার অবিলম্বে শিশুর মতোই সব ভুলতে পেরেছেন। তাঁর জেদটা বংশগত। জেদের বশে এ পরিবারের তিনজন সরকারি চাকুরি ত্যাগ করেছেন। স্বয়ং আবদুল করিমও স্কুল-ইন্সপেক্টর খাঁ বাহাদুর আহসানুল্লাহর দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য খাঁ বাহাদুর আবদুল আজিজের অনুরোধে ও মধ্যস্থতায় এ অবাঞ্ছিত ঘটনার অবসান ঘটে। যাদের সঙ্গে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলা চলছে, সেসব পারিবারিক শত্রুর সঙ্গেও তাঁর আলাপচারিতা বন্ধ হয়নি। পরিবারের এরূপ একজন চিরশত্রু কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধু অশিক্ষিত মাতব্বর ব্যক্তি মকবুল আলীই গাঁয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। গাঁয়ের বাড়িতে সপ্তাহ-অন্তে শনিবার সন্ধ্যা থেকেই সোমবার সকাল অবধি মকবুল আলীই তাঁর আড্ডার সাথী। শেষ বয়সে এক দেওয়ানি মামলায় আবদুল করিম ছিলেন বাদী আর মকবুল আলী বিবাদী, বাড়ির কাছের পটিয়া মুন্সেফি আদালতে দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনে একসঙ্গেই যেতেন। এ বর্ণনা রূপকথার মতোই অদ্ভুত অবাস্তব মনে হচ্ছে—কিন্তু সুচক্রদণ্ডী গাঁয়ে এখনো কয়েক-শ প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে। তাঁর ও তাঁদের বাড়ির লোকের ক্রোধ ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল না। তাই পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করাই তাঁর ও তাঁদের বংশগত ঐতিহ্য। তাঁর অন্তরে প্রীতি ছিল, করুণাবোধও ছিল প্রবল। কার্পণ্য তাঁর ছিল না— ধার করেও তিনি আমরণ গাঁয়ের কয়েকটি অনাথা ও এতিমকে অর্থসাহায্য করেছেন ; এ ব্যাপারে অধ্যাপক ইদরিস আলী, পটিয়া স্কুলের দু'একজন শিক্ষক ও বাজারের দু'একজন দোকানদার ছিলেন তাঁর মহাজন। আরো কারা ছিলেন আমার জানা নেই। বৈষয়িক ব্যাপারে চিরউদাসীন শিশুর মতো সরল এই মানুষটি আত্মীয়-বন্ধু কিংবা অতিথিকে আদর-আপ্যায়নে লৌকিকতা প্রদর্শন করতে জানতেন না বা পারতেন না। মনে হত যেন অতিথি তাঁর কাছে অনভিপ্রেত, যেন থাকা-খাওয়ার জন্য যে ক্ষীণ কণ্ঠে সাধছেন তাতে আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। অতিথি অভ্যাগতেরা হয়তো তাই মনে করতেন, অথচ পরিজনেরা জানত—ওতে এতটুকু খাদ নেই। পরের বাড়িতে কিছু গ্রহণে প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করাই দেশী রেওয়াজ—তা যেন তাঁর মনে থাকত না।

তিনি প্রথমজীবনে গ্রাম্য মধ্য ইংরেজি স্কুলে শিক্ষক এবং মধ্যবয়স থেকে বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে কেরানি ছিলেন। দেশের মাটি, মানুষ ও সাহিত্যের প্রতি কত গভীর মমতা থাকলে রোজ দশটা থেকে পাঁচটা অবধি কেরানির খাটুনির পরও একাগ্রমনে প্রাচীন হাতের লেখা দুষ্পাঠ্য পুঁথি নিয়ে কঠিন কর্মে নিশিরাত অবধি নিরত থাকা সম্ভব—তা অনুভব করলে বিস্মিত হতে হয়। কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তকে লেখা এক পত্রে তিনি বলেছেন, বিষয়কর্মে আমার আগ্রহ নেই, এই কর্ম চাচার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিতমনে সাহিত্যসেবা নিয়েই আছি।' এক অভিভাষণে তিনি বলেছেন : দেশের মানুষ—পাশের বাড়ির লোক কী কীর্তি রেখে গেছেন তা যদি না জানলাম তাহলে আরব-ইরানী ভাইয়ের কীর্তির খবর নিয়ে কী লাভ!' এই সুস্থ মন ও সুস্থ বুদ্ধিই তাঁকে ঋজু ও পরিচ্ছন্ন জীবনদৃষ্টি দান করেছিল।

সাহিত্যসেবী আবদুল করিমের পরিচয় তাঁর রচনায় ও সাহিত্যকর্মে বিধৃত রয়েছে। তাঁর পরিশ্রম, তাঁর নিষ্ঠা, তাঁর যোগ্যতা, তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর স্বদেশ-অন্বেষা ও সাহিত্যপ্রীতি গুহায়িত নেই। আমরা এখানে বাঙালি মুসলিম জীবনে তাঁর সাধনার দান ও সুফল এবং গুরুত্ব ও প্রভাব কতখানি তা জানবার-বুঝবার চেষ্টা করেছি মাত্র এবং সে প্রসঙ্গে মানুষ আবদুল করিমের অন্তরঙ্গ পরিচয়-সূত্র ও জীবন-দৃষ্টির আভাস দেয়ার প্রয়াস পেয়েছি। কয়েকটি কথায় তিরাশি বছরের কর্মবহুল ও ঘটনা-ঋদ্ধ সুদীর্ঘ জীবনের সামগ্রিক ধারণা দেয়া সম্ভব নয়। কেউ কোনোদিন তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভে ও তাঁর কৃতির মূল্যায়নে আগ্রহী হলে দেখবেন আবদুল করিম ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, গবেষণাক্ষেত্রেও তেমনি সত্যনিষ্ঠ ও সত্যসন্ধানী ছিলেন। কোনো প্রলোভনের বশে তিনি তাঁর বিবেক-বুদ্ধিকে ও জ্ঞান-বিশ্বাসকে প্রতারিত করেননি। স্কুলে তিনি আদর্শ শিক্ষক এবং অফিসে কর্তব্যনিষ্ঠ কেরানি ছিলেন। সৌজন্যেই যদি সংস্কৃতিবানতার পরিচয় মেলে, তাহেল মানতে হবে সুজন আবদুল করিম দুর্লভ মানবিক গুণসম্পন্ন সংস্কৃতিবান নাগরিক ছিলেন। তিনি জীবনে কোনো সংস্কারের দাসত্ব করেননি, এই যুগ-দুর্লভ মুক্তমন ও স্বচ্ছবুদ্ধি মানববাদী না হলে কারো আয়ত্তে আসে না।

মানুষকে-যে তিনি নিবর্ণ মানুষ হিসেবেই দেখেছিলেন, তার প্রমাণ মেলে ১৯৫২ সনে কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত সংস্কৃতি সম্মেলনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। তিনি মানবিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক সমাধানে আস্থাবান ছিলেন। তিনি-যে সংস্কারমুক্ত মানববাদী ছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাও অশীতিপর বৃদ্ধের উক্ত ভাষণে প্রকটিত। সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর বিচরণক্ষেত্র ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগের পরিসরে। কিন্তু তাঁর মন ও রুচি মধ্যযুগীয় ছিল না। এক উদার মানবিক বোধের প্রেরণায় তিনি আধুনিক ও মানববাদী ছিলেন। যে কোনো জিজ্ঞাসু তরুণের মতো স্বদেশের স্বকালের সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা জানবার-বুঝবার প্রবল আগ্রহ ছিল তাঁর। তাই তিনি তাঁর সমকালীন বাঙলাদেশের সব মাসিক-সাপ্তাহিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। সম্পাদক-লেখকদের সঙ্গে পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপন বাঞ্ছায় তিনি বাঙলাদেশের সব পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁর রচিত সাড়ে পাঁচশ-ছয়শ প্রবন্ধের সর্বত্র তাঁকে বাঙলাদেশের বাঙালিরূপেই প্রত্যক্ষ করি।

শিথিল-চরিত্র, বিকৃতবুদ্ধি, চাটুকার আকীর্ণ রুগ্‌ণদেশে আবদুল করিমের মতো খাঁটি মানুষের বহুলতা সমাজস্বাস্থ্য উদ্ধার ও রক্ষার জন্যই আবশ্যক। আবদুল করিমের চিত্তবৃত্তি ও কৃতি স্মরণে অন্তত দু'চারটি বুকে শ্রেয়স-চেতনা ও মূল্যবোধ জিইয়ে রাখার আগ্রহ জাগবে—এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়।

কাজী আবদুল ওদুদ

AMARBOI.COM

কাজী আবদুল ওদুদ আমাদের কালের একজন আদর্শ সংস্কৃতিবান ও পরিস্রুত রুচির মানুষ ছিলেন। আমাদের পরিজন-পরিচিতের মধ্যে এমন মানুষ বিরলতায় দুর্লভ। তিনি বিদ্বান ছিলেন, বুদ্ধিমান ছিলেন, বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু এমন মানুষ হাজার হাজার মেলে, কাজেই এগুলো তাঁর বৈশিষ্ট্যের কারণ নয়। তিনি বিবেকবান ছিলেন, সত্যসন্ধানী ছিলেন এবং সত্যানুরাগী ছিলেন; আরো ছিলেন সহিষ্ণু, উদার ও নিরপেক্ষ—তাঁর অনন্যতা এখানেই।

তিনি আত্ম কিংবা পরপ্রবঞ্চনায় উৎসাহবোধ করতেন না ; তিনি দেশকে, মানুষকে এবং মুসলমানকে ভালোবাসতেন, তাই তিনি সারাজীবন কল্যাণকামী ছিলেন। সাহিত্য তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু প্রিয়তর ছিল তাঁর স্বধর্ম ও স্বসমাজ। তাই আত্মোপলব্ধির জন্য করেছেন সাহিত্যানুশীলন আর আত্মশুদ্ধির জন্য করেছেন ধর্মের চর্চা, সমাজের পরিচর্যা। এসব খুব নাজুক বিষয় ও ক্ষেত্র। চালু রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে বললে লাঞ্ছনা-নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী। তাঁকেও তা ঢাকায় প্রথমজীবনে সহ্যাতীতরূপে সহ্য করতে হয়েছে। তবু নিখাদ বিশ্বাস ও অকৃত্রিম কল্যাণকামিতা তাঁকে বিলালের মতো ধৈর্য্যবান ও সহনশীল রেখেছিলেন। এখানেই তিনি চরিত্র-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। জ্ঞাতসারে তিনি তাঁর জ্ঞান-বিবেক-বিশ্বাসকে প্রতারিত করেননি। বিবেক-বুদ্ধি ছিল তাঁর চিন্তা ও কর্মের দিশারী এবং নিয়ামক। তাঁর চিন্তা ও কর্মে প্রেরণার উৎস ছিল প্রীতিপ্রসূত কল্যাণকামিতা। তাঁর 'সম্মোহিত মুসলমান' নামের যে- প্রবন্ধ রক্ষণশীলদের বিচলিত করেছিল, ক্ষুব্ধ করেছিল নির্বোধদের, আর তাঁর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়েছিল গোঁয়ারদের; প্রীতির-প্রেরণা ও শ্রেয়স-চেতনার প্রবলতা না থাকলে ঐ প্রবন্ধ রচনা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সমমর্মী ও সমমতবাদীদের নিয়ে মুসলমানদের হিতবাণী শোনানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে নেমেছিলেন তিনি। তাই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মুসলিম সাহিত্যসমাজ। এবং 'শিখা' নামে একটি সাময়িকী বের করেছিলেন এ উদ্দেশ্যে। আর তাঁকে কেন্দ্র করে সমস্যা ও সমাধান সম্বন্ধে বলতে চাইছি বলেই এভাবে বলছি। নইলে সৈয়দ আবুল হোসেন, কাজী মোতাহের হোসেন, আনওয়ারুল কাদির, আবদুল কাদির প্রমুখকে বাদ দিয়ে শিখা বা বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কথা বলা চলে না।বস্তুত সৈয়দ আবুল হোসেন ছিলেন প্রেরণার উৎস ও দলের মধ্যমণি, আর সবাই ছিলেন তাঁর সহযোগী।

সব বিদ্যারই শিক্ষক থাকে, চিন্তার থাকে মুর্শিদ, দীক্ষার থাকে গুরু। পরিবেশে বীজ না থাকলে কোনো চিন্তাই উদ্রিক্ত হয় না; আগুনের যেমন নিরবলম্ব কোনো রূপ নেই, তেমনি অকারণ চিন্তারও স্থিতি নেই। কাজী আবদুল ওদুদের চিন্তার কারণ ঘটিয়েছিল স্বদেশের নির্জিত মুসলিম সমাজ। চিন্তার আগ্রহ জাগিয়েছেন যে মুর্শিদ, তিনি বাঙলার রামমোহন; সমাধানের দিশা মিলেছে যাঁর কাছে তিনি হযরত মুহাম্মদ; আর পদ্ধতি পেয়েছেন গ্যটে থেকে। কাজী ওদুদ বীরপূজায় আসক্ত ছিলেন, কারলাইল বর্ণিত সেই 'হিরোওরশিপ'। মহৎ ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ওদুদ তিন ব্যক্তিত্বকে জীবনে ধ্রুবতারার মতো অনুসরণ করেছেন দিশারীরূপে। ব্যক্তিত্ব তাঁকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। চোখে দেখা তিনজন গুণী মানুষ—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম ও সুভাষচন্দ্র বসুও তাঁর শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কবিদ্বয় সম্বন্ধে বই লিখেছেন, আর কবি না হয়েও নেতাজি-প্রশস্তি রচনা করেছেন ছন্দে। আর ধ্যানে পাওয়া তিনজন মহাপুরুষ তাঁকে সারাজীবন সবিস্ময় শ্রদ্ধায় অভিভূত রেখেছিলেন, একজন হচ্ছেন পৃথিবীর মহত্তম মহামানব হযরত মুহাম্মদ, অপরজন স্বদেশের উনিশ শতকী মহত্তম পুরুষ রামমোহন এবং অন্যজন হলেন আঠারো-উনিশ শতকী য়ুরোপের মহত্তম মানুষ গ্যটে। এই তিনজনের ব্যক্তিত্বের ও কৃতিত্বের অনুধ্যানে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের মনীষায় ছিলেন মুগ্ধ। উক্ত তিনজনের ব্যক্তিত্ব, কৃতি ও কীর্তির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত তিনখানি গ্রন্থ রচনা করে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা, গুণগ্রাহিতা ও উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন। গ্যটে, বাঙলার জাগরণ এবং মহাপুরুষ মুহম্মদ—এই তিনখানি গ্রন্থে তাঁর রুচি, বোধ, প্রজ্ঞা, প্রবণতা, জীবনদৃষ্টি ও সমাজচিন্তা অভিব্যক্তি পেয়েছে। তাঁর শাশ্বত বঙ্গ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র ও তাঁর পরে প্রভৃতি গ্রন্থে ছাড়াও তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাসেও তাঁর সাহিত্য-বোধ, জীবন-চেতনা ও কল্যাণকামিতা সুস্পষ্ট। বলেছি তিনি অসামান্য ব্যক্তিত্ব তাঁর মন-মনীষা প্রভাবিত করেছিল। রামমোহনের সংস্কার-মুক্তি ও যুক্তিপ্রিয়তা, গ্যটের শ্রেয়ঃবোধ ও মানবতা আর মহামানব মুহম্মদের সামাজিক ও আত্মিক জীবনের অখণ্ডতাবোধ অর্থাৎ বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের অভিন্ন সত্তার উপলব্ধিপ্রসূত সমাজচিন্তা তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ করেছিল। এমনি জীবন-দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করতে প্রয়াসী ছিলেন এবং অন্যকেও সে-দৃষ্টি দানের জন্য আগ্রহ ছিল তাঁর। তাঁর অনুধ্যেয় জগৎ, জীবন ও সমাজ সুন্দর ছিল—তাতে সন্দেহ নেই। রোমাঁরোলা, কামাল আতাতুর্ক, জামালুদ্দীন আফঘানী প্রভৃতিও তাঁকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু এমন আদর্শনিষ্ঠ মানুষের সুন্দর স্বপ্ন, সুচিন্তা ও সদিচ্ছা সুফলপ্রসূ হবার ছিল না। তাই হয়ওনি। গোঁড়া গোঁড়াই রয়েছে, মূঢ় রয়েছে মূঢ় আর নাস্তিকও হয়নি আস্তিক কিংবা উদাসীন যে সেও হয়নি উদ্যোগী। শিখার তেল ফুরিয়েছিল শিগগিরই এবং শিখাও নিভে গিয়েছিল অতি অল্পকালেই, সলতেও হারিয়ে গিয়েছিল অবহেলায়। তাঁদের বাণী তাঁদের সমকালের কিংবা একালের অনুকূলে ছিল না। সেকালে অনুকূল ছিল না মানুষের মূঢ়তার জন্য, আর একাল অনুকূল নয় মানুষের বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রসারের দরুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজী আবদুল ওদুদ মুমিন ছিলেন। ইমানের ডিগদড়ি অঙ্গীকার করেই তিনি বক্তব্য শুরু করতেন। বিশ্বাসের স্বীকৃতিতে কথার শুরু, তাঁর সাক্ষ্য-প্রমাণ-ন্যায় Deductive—আরোহ প্রণালীসম্মত।

বিশ্বাসকে তিনি যুক্তিযোগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে আবিষ্কার করেননি। এতে পুরনো বিশ্বাস যুক্তি-আশ্রয়ী হতে চেয়েছেন মাত্র। ফলে বিশ্বাসও প্রাণ পায়নি, যুক্তিও পথ হারিয়েছে। কেননা যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তি অচল সেখানেই বিশ্বাসের জন্ম। এজন্যই যুক্তির পথ বেয়ে বিশ্বাসের তোরণে কখনো উত্তরণ ঘটে না। ভয়-ভরসার অনুভূতিতে বিশ্বাসের স্থিতি, আর জন্ম বিস্ময়ে, কল্পনায় ও অবজ্ঞায়। বিশ্বাসের অঙ্গীকারে যুক্তি-প্রয়োগ কিংবা যুক্তির অনুগত করে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস তাই বিড়ম্বনাকে বরণ করা মাত্র। যে কালে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তাঁরা বিশ্বাসকে বিশুদ্ধরূপে প্রত্যক্ষ করাতে চেয়েছিলেন, সেকালে বিশ্বাসী মানুষ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যুক্তি সহ্য করত না মূঢ়তা-বশে, এবং একালের মানুষ পছন্দ করে না পণ্ডশ্রম বলে। তাছাড়া এক্ষেত্রে কাজী ওদুদেরা একটা মৌল প্রতিজ্ঞা (Premise) উপেক্ষা করেছেন। বিশ্বাসের প্রসারে আসে সংস্কার—তা কু-ই হোক আর সু-ই হোক এবং তা ক্রমে বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এমনি সংস্কারকে বিশ্বাসের অন্তরঙ্গ বলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই রূপকে (Formকে) বাদ দিয়ে ভাবের (Spirit-এর) অনুশীলন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বাস একটি অখণ্ড স্বীকৃতি। বিশ্বাসীর চোখে বিশ্বাসে Rational-Irrational বলে কোনো ভাগ নেই। কাজেই বিশ্বাস সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন তুললে তা বিশ্বাসের মূলেই আঘাত করে, তাই বিশ্বাসীর পক্ষে তা অসহ্য। বিশ্বাস মানবার জন্যই, জানবার-বুঝবার জন্য নয়। জানা-বোঝা যুক্তি-বুদ্ধির এলাকায়, আর বিশ্বাস অনুভবের ও প্রবণতার আওতায়।

AMARBOI.COM

তাছাড়া লেখাপড়া জানা আর শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়। কেউ কেউ পাঠ্যবই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করেই শিক্ষিত হয়। পরীক্ষা লক্ষ্যে যারা পাঠ করে, তারা Proof Reader-এর মতোই খণ্ডদৃষ্টি ও খণ্ডলক্ষ্যে পাঠ শেষ করে, তাই তারা জীবনের ও সমাজের কোনো পরোক্ষ ও বৃহত্তর বিষয়ে মাথা ঘামায় না—এমনি লোকের সংখ্যাই হাজারে ন'শ নিরানব্বই। এবং তারা সর্ববিষয়ে সনাতনী বা রক্ষণশীল। আর প্রকৃত শিক্ষিতজন অধ্যায়নলব্ধ জ্ঞানকে প্রজ্ঞা-মিশ্রিত করে।

তাছাড়া উনিশ ও বিশ শতকে বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য পাশ্চাত্যবিদ্যার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত তত্ত্বের প্রতি জিজ্ঞাসু শিক্ষিতজন উদাসীন থাকতে পারে না। স্বজাতি-হিতৈষী রামমোহন কিংবা ওদুদ-আবুল হোসেন ছিলেন উদার পাশ্চাত্য জ্ঞান এবং জীবন-মুগ্ধ সংস্কারক। তাই তাঁদের মধ্যে দুই কূল রক্ষার প্রয়াস ও প্রবণতা। এ যেন রথে কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে মোটর-এঞ্জিন বসানোর আত্যন্তিক আগ্রহ। এ দ্রোহ নয়—আপস বা Compromise। তাঁদের ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল প্রাচীনের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যে। তাঁরা শৈশবলব্ধ ঘরোয়া বিশ্বাস-সংস্কার ছাড়তে চাননি অথচ নতুনকে বরণ করবার জন্যও ব্যাকুল। একটা পরিহার না করলে যে আর একটা গ্রহণ করা যায় না, তা তাঁদের বোধগত হয়নি। তাই তাঁদের বাণী ও প্রয়াস বিড়ম্বিত হয়েছে। শিক্ষিত সমাজের যে পরিবর্তন তাঁদের প্রভাবজ বলে প্রতীয়মান হয় কিংবা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়, তা আসলে উদার পাশ্চাত্য শিক্ষারই দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা কাজী ওদুদের হয়তো দৃঢ় ধারণা ছিল যে, আস্তিকের কাছে বিশেষ করে মুসলিমদের কাছে শাস্ত্রে আস্থার ও আনুগত্যের অঙ্গীকারে কথা না বললে সে-কথার কোনো আবেদন থাকবে না, কোনো সাড়াও মিলবে না। কিন্তু তাঁরা যে-কথা বলতে চেয়েছিলেন, তাতে ধর্মের ঐ জারকরস মিশ্রিত করা উচিত হয়নি, কেননা তাঁদের আবেদন ছিল বাস্তব সমস্যার ভিত্তিতে মানুষের বুদ্ধি, শ্রেয়ঃ-চেতনা, বিচার-শক্তি তথা যুক্তিবোধের কাছে। এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মীয় মোড়কে পরিবেশিত তত্ত্ব প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট করে এবং কেবল নতুন গোঁড়ামির জন্ম দেয়, যা আরো ক্ষতিকর হয়, অগ্রাহ্য হয়। তার প্রমাণ সম্রাট আওরঙ্গজীব, শাহ ওয়ালীউল্যাহ, তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও ওহাবী গোষ্ঠীর এবং কবি হালী, কবি ইকবাল, কবি হাফিজ জলন্ধরী ও কবি ফররুখের আবেদনের ব্যর্থতা। এঁরা সবাই ধর্মভাবের পুনর্জাগরণের ও ধর্মনিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিমদের মুক্তি ও উন্নতি কমনা করেছিলেন। আবার শাস্ত্রের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করলেও সহযোগী কোনো কোনো ছাত্র ইসলামী বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করে তাঁদের জীবনও বিপন্ন করেছিলেন। এজন্যেই শাস্ত্রকে অনুল্লেখে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। তাছাড়া বহুশ্রুত পুরোনো বাণীতে ও তত্ত্বে ঘষেমেজেও চমক লাগানোর মতো জৌলুশ সৃষ্টি করা যায় না। তাই প্রেরণা-উদ্দীপনা-উৎসাহ হয় ক্ষণস্থায়ী এবং তা ব্যক্তি বা সমাজকে কোনো নতুন লক্ষ্যে এগিয়েও নেয় না। হয়তোবা স্বস্থানে সুস্থির থাকতে কিছুটা সহায়তা করে মাত্র। নতুন চিন্তাই কেবল নতুন লক্ষ্যের সন্ধান দিতে পারে। তাই নতুন কথার দরকার। পুরোনোর পুচ্ছগ্রাহিতায় নয়, নতুনদের আবাহনেই যুগে যুগে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানান্তে মানব-মুক্তি সম্ভব হয়েছে, পথ মিলেছে অগ্রগতির, নতুনদের লক্ষ্যে উত্তরণের। আর না বললেও চলে—নতুনের জন্ম পুরোনো-দ্রোহিতায়। আপস এখানে অচল। ইতিহাস তার সাক্ষ্য। অতীতের স্মৃতি ও পুরোনো-প্রীতি কেবল পিছুটান দেয়, ধরে রাখে। নতুনের আকাঙ্ক্ষাই—স্বপ্নই এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয় এবং নতুনই ভরে দেয় শূন্যতা, জৌলুশ বাড়ায় জীবনের, প্রসারিত করে মনের দিগন্ত, ঋদ্ধ করে মণীষা। পুরোনো তার স্বকালে তথা জন্মকালে যা দেবার তা দিয়ে এখন রিক্ত। অক্ষত, উর্বর নতুনই কেবল নতুন ফসলে মানস-খাদ্য ও ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। জীবনে ও জগতে, মনে ও মানসে উৎকর্ষ আসে এই পথেই। যা গেছে নিঃশেষে গেছে—এই বোধ না জাগলে জীবনে-সমাজে কোথাও অন্ধতা ঘুচে না, আলোর দিশা মেলে না। অন্ধতা মানুষকে লাটিমের মতো কিংবা কলুর বলদের মতো ঘুরায়—এগিয়ে দেয় না। অথচ মানুষের কাম্য হচ্ছে অগ্রগতি—জরা ও জীর্ণতা এড়ানো আর নতুনকে পাওয়া।

তাঁরা বিশ্বাসের শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির দোহাই দিয়ে। আরো এক উপসর্গ দেখা দিয়েছিল তাঁদের অজ্ঞাতেই তাঁদের মনের গভীরে। তা হচ্ছে ইসলামের উন্মেষ-যুগের মুসলিমের উন্নতি-চমক। তাঁরা মনে করতেন কুসংস্কার-মুক্ত ইমান ও ইসলাম আজো মুসলিমদের তেমনি বিপর্যয়বিরহী বৈষয়িক সাফল্য ও আত্মিক উৎকর্ষ দান করতে পারে। এতে বোঝা যায়, বিশ শতকের বাঙলায় বসেও তারা তেরোশ বছর আগের মরুভূ মদিনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আরো কথা এই যে, ইসলাম যে কেবল মক্কা-মদিনাবাসীর জীবনেই বৈষয়িক বা রাষ্ট্রিক সৌভাগ্য এনেছিল, অন্যত্র দীক্ষিত মুসলানদের জীবনে যে বৈষয়িক কিংবা আত্মিক ক্ষেত্রে প্রাণদায়ী শক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়নি, অন্যেরা নতুন সমাজও যে গড়ে তোলেনি কিংবা দিগ্বিজয়ের গৌরবও যে অর্জন করেনি, বরং স্বদেশের স্বাধীনতা হারিয়েছে, বঞ্চিত হয়েছে স্বজনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে, আস্তিক তারা আগেই ছিল, নতুন তত্ত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কিছু নতুন আচার-আচরণ শিখেছে মাত্র, এবং হাড়ি-ডোম-জোলা-জেলে-নাপিত-কামার-কুমার-ক্রীতদাস যে ব্যবহারিক জীবন ও জীবিকায় কোনো সুখ-সৌভাগ্য অনুভব করেনি—এ তত্ত্ব ও তথ্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়েছে। অতএব তাঁদের প্রতিজ্ঞায় নিহিত ভুল তাঁদের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্তে সংক্রমিত হয়ে তাঁদের প্রয়াসকে করেছে পণ্ড। কাজেই যাদের তাঁরা কুসংস্কার-মুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাদের কাছে কু বা সু বলে কোনো সংস্কারের অস্তিত্বই ছিল না—সবটা ছিল ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ, আচারের অপরিহার্য অংশ ও আচরণের অবিচ্ছেদ্য ও আবশ্যিক বিষয়। তাঁরা যে-কিছুকে কুসংস্কার বলে আবর্জনারূপে দেখেছেন ওরা সেসবকে বিশ্বাসের আভরণ বলে জানত। কাজেই মূঢ়তার কাছে তাঁদের 'বুদ্ধির মুক্তির' আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল।

আর একালের যুক্তিবাদী মনে বিশ্বাসের আবেদন নিতান্ত ক্ষীণ। যুক্তিবাদীরা বিশ্বাসবাদীদের অনুকম্পার চোখেই দেখে। তাদের মতে বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া আর পুতুলে চোখ বসিয়ে দৃষ্টিদানের প্রয়াস সমার্থক ও সমপর্যায়ের। তারা বলে অবাঙমানসগোচররূপেই— অনুভবের সত্য হিসেবেই বিশ্বাসকে লালন করা উচিত, তর্কে তা অপ্রাপ্য। প্রত্যাশা থেকে যে-প্রত্যয়ের উদ্ভব, তাকে প্রমাণসাধ্য করার অপচেষ্টা না-করাই ভালো। তাছাড়া প্রমাণসাপেক্ষ করলে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও মহিমা কমে বই বাড়ে না। কেননা, যে-প্রত্যয় ঐতিহ্য ও পারত্রিক জীবনের নিয়ামক, যা লৌকিক-আলৌকিক বোধে প্রসারিত, যা লোকে-লোকান্তরে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে, ব্যক্ত-অব্যক্তে বিজড়িত, তা মনুষ্যবুদ্ধির গ্রাহ্য হলেই বা এমনকি গুরুত্ব বাড়ে, না হলেই বা অলীক হবে কেন।

বিশ্বাস বুকে পোষার ধন, বাজারে বিকোবার বস্তু নয়। তাকে অন্তরে পেতে হয়, তর্কে তা লভ্য নয়। বাস্তব-বৈষয়িক জীবনে বিশ্বাসকে আক্ষরিক অর্থে প্রয়োগ করার পথে বাধা অনেক। রাত্রের স্বপ্নকে সকালে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করার প্রত্যাশা যেমন মূঢ়তা, বিশ্বাসের প্রিয় অনুভূতিকেও ভিন্ন-মনের মানুষের সঙ্গে জাগতিক কারবারের লেনদেনে প্রয়োগ করতে চাইলে তেমনি বিড়ম্বিত হতে হয়। ঠেকে-ঠকে এ উপলব্ধি হয়েছে যাদের, তারাই বলছে যে, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচারণ একান্তই ব্যক্তিগত জীবনে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ তার সমাজানুগত্য প্রাপ্তির দিন ফুরিয়ে গেছে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতাবলম্বী-অধ্যুষিত রাষ্ট্রে ও বিশ্বে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণে সীমিত রাখলে ধর্মবিশ্বাসসঞ্জাত অনেক দ্বন্দ্বের কারণ লুপ্ত হয়, পরিচ্ছন্ন নাগরিকবোধ জন্মে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত করা সহজ হয়।

কাজী আব্দুল ওদুদ বুদ্ধির মুক্তি কামানা করেছেন বটে, অর্থাৎ তিনি যুক্তিবাদে আসক্ত ছিলেন সত্য কিন্তু তাঁর আদর্শ পুরুষ রামমোহনের মতো তিনি বেপরওয়া হতে পারেননি। রামমোহন ধার্মিক ছিলেন না, আস্তিক্যও তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ভিত্তিক ছিল না, সর্বসংস্কার তিনি পরিধেয় বস্ত্রের মতো কিংবা দেহের ধুলোর মতো পরিহার করতে পেরেছিলেন। নীতিনিষ্ঠ অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু মোক্ষকামী সন্তের আগ্রহ নিয়ে তিনি ব্রহ্মবাদ আবিষ্কার ও বরণ করেননি, ম্লেচ্ছ কোম্পানির সমাজ-পরিত্যক্ত চাকুরে ও উচ্ছৃঙ্খল এজুদের সমাজাশ্রয়ী করবার জন্য পরার্থপরতা কিংবা লোকাহিতৈষণা বশেই তিনি বুদ্ধি করে ব্রহ্মবাদের চাল চেলেছিলেন। তাঁর বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল আর ছিল সর্বসংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। তাই ব্রাহ্মবাদ অধার্মিকের কাজ-চলা-গোছের ধর্ম হিসেবে নড়বড়ে পায়ে দাঁড়িয়ে গেল। রামমোহন পৈতৃক ধর্ম পরিহার করেছিলেন। আর পৈতৃক ধর্মের প্রতি প্রীতিবশেই কাজী ওদুদ সংস্কারক। আবার গ্যটের অভিপ্রেত আদর্শ মানুষ— তাঁর নাটকের নায়ক প্রচলিত অর্থে ধার্মিক নয়—সংস্কৃতিবান শ্রেয়োকামী সুনাগরিক। ওদুদ কামনা করেছেন শাস্ত্র-নির্দেশিত সদাচারী মানুষ। কাজী ওদুদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সীমিত পরিসরে মুক্ত আঙিনায় দখিন হাওয়ার প্রত্যাশী ছিলেন। দিগন্তবিসারী প্রান্তরের কিংবা সমুদ্রসৈকতের বায়ু সম্বন্ধে ছিলেন স্পর্শকাতর। নতুনরূপে পেতে হলে নতুন কাঠামোও তৈরি করতে হয়, পুরোনো কাঠামো জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে নতুন করা চলে না। রামমোহন ভেঙে গড়েছিলেন। কাজী ওদুদ ছিলেন মেরামতে উৎসাহী। আবার কাল ছিল রামমোহনের পক্ষে। যুগ কিন্তু ওদুদের অনুকূলে ছিল না। পশ্চিমের মানুষ যে-নতুন ভাবচিন্তা, বিদ্যাবুদ্ধি, রুচি-সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল, তার সংস্পর্শ বাসন্তী হাওয়ার মতো কোলকাতাবাসীর মনে নতুন সম্ভাবনার ও চেতনার বীজ উপ্ত করে। প্রতীচ্য সেদিন এদেশে এসেছিল ঝড়ো হাওয়ার মতো কিংবা ঘূর্ণিঝড়ও হয়তো বলা চলে। তা যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই ভাঙন ধরিয়েছিল, রামমোহন সে সুযোগে আবর্জনা সরালেন মাত্র। যা গড়লেন তাও, বাহ্যত পুরোনো উপকরণে। সমাজ-বিতাড়িত লোকের পক্ষে তাই ছিল আশাতীত আশ্রয়। অন্যেরা রামমোহনকে করেছে উপেক্ষা, তাঁর আহ্বানকে করেছে অবহেলা। কাজী ওদুদেরা যখন সমাজ-সংস্কারে নামলেন, এদেশে পশ্চিম তখন পুরোনো; ইংরেজের প্রতি তখন সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধাবোধ প্রায় অপগত। তখন হিন্দুসমাজও সুস্থ। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে তারা তখন স্বাতন্ত্র্যগর্বী, জাতিবৈরে উৎসাহী; তখন ধুতি-চাদরের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত। নবশিক্ষিত মুসলিম-মনেও তখন আর চাঞ্চল্য নেই। চোখের সামনে হিন্দুদের দেখে সে-ও মুসলিম থাকতেই আগ্রহী। বিদ্রোহ-বিপ্লবের কাল তখন অপগত এবং অক্ষমের আত্মসম্মানবোধের প্রসারে ঐতিহ্যাশ্রয়ী অতীতমুখী স্বাতন্ত্র্যে ও রক্ষণশীলতাতেই গৌরব ও শ্রেয় নিহিত বলে প্রতিভাত ও প্রতিভাসিত হচ্ছে। কাজেই এমনি অকালে মুসলিম-সমাজে রামমোহনী ভূমিকা ফলপ্রসূ হয়নি, স্যাঁতসেঁতে মাটির উপর কাঁচাকাঠে আঁচ দেয়ার প্রয়াসের মতোই ব্যর্থ হয়েছে। রামমোহন-কামাল আতাতুর্কের মতো কাজী ওদুদেরাও চেয়েছিলেন সমাজে কালোপযোগী চিন্তার প্রবর্তন যাতে সমাজে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে জানবে এবং এভাবে পিছিয়ে-পড়া সমাজের আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটবে জীবনের সবক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে রামমোহন যেমন ছিলেন তাঁদের আদর্শ পুরুষ, তেমনি উন্নত হিন্দুসমাজের প্রতিও তাঁরা অবচেতনভাবে তাকিয়েছিলেন প্রতিযোগীর দৃষ্টি দিয়ে, অর্থাৎ ওদের মতো হওয়াই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু হিন্দুসমাজে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে-রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির প্রভাবে নয়। এঁরা সমভাবাপন্ন ব্যক্তিমনে সাহস যুগিয়েছিলেন অবশ্যই। এবং বড়জোর তাতে গতিবেগ বেড়েছিল। অশিক্ষিত আকীর্ণ মুসলিম সমাজেও তাই যুগোপযোগী ভাব-চিন্তা-কর্মের উদ্যোগ-আয়োজন করার লোল—তৈরী বাচনিক প্রয়াসে সার্থক হবার ছিল না। তবে এঁদের যুক্তিবাদ আর প্রয়াসও সমমতাবাদী ব্যক্তিমনে সাহস দিয়েছিল, যারা সুযোগসুবিধামতো সরব হবার উৎসাহ বোধ করেছিল। কাজী ওদুদেরা তরুণ-বয়সে যা করতে চেয়েও ব্যর্থ হয়েছিলেন, সমাজে প্রতীচ্যবিদ্যা বিস্তারের ফলে তা বিনা প্রচারণায় ও প্ররোচনায় স্বাভাবিকভাবেই হতে দেখেছেন তাঁদের বার্ধক্যে। তাঁদের অভিপ্রেত মানুষে তখন সমাজ ভরে উঠেছে। রামমোহনও হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে তাই দেখেছিলেন, আরো দীর্ঘজীবী হলে তিনিও দেখতেন ও বুঝতেন যে, বীজ অঙ্কুরিত ও বৃক্ষ ফলপ্রসূ হবার একটা মৌসুম আছে। সেজন্য অপেক্ষা করতে হয়। কলা-কাঁঠালের মতো সব ফল অকালে পাকানো যায় না। কৃত্রিম উপায়ে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভব নয়। বিধবা-বিবাহ প্রচলনে ব্যর্থতা তার প্রমাণ। তবু অবশ্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। মানুষ ভাগ্যের উপর ভরসা করে বসে থাকতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার হিন্দু-কলেজসৃষ্ট 'এজুরা'ও বয়োধর্মের প্রভাবে বিদ্রোহী-বিপ্লবীর আপাত ভূমিকায় সাড়ম্বরে অবতীর্ণ হলেও চল্লিশোত্তর জীবনে সবাই সনাতনশাস্ত্রে ও আচারে স্বস্তি ও শরণ সন্ধান করেছিল, মুসলমানরা ছিল হিন্দুর অনুবর্তী। কাজেই কোনো ক্ষেত্রেই তাদের পথিকৃতের ভূমিকা ছিল না—তার ঝুঁকি ও ঝামেলা তাদের স্পর্শ করেনি। পাষাণ- নির্মিত প্রশস্ত পথে হয়েছে তাদের যুগান্তরে উত্তরণ। তাই আমরা মুসলিম সমাজে একজন রামমোহন কিংবা একজন বিদ্যাসাগর পাইনি। শিখা-গোষ্ঠী বড় জোর ইয়ংবেঙ্গলের নকল মূর্তি। ইয়ংবেঙ্গল যদি বিদ্যুৎদীপ্তি নিয়ে আসে, তাহলে শিখা-গোষ্ঠী এনেছিলেন জোনাকির জ্যোতি। তাকে মুসলিম শিক্ষিত লোকেরা আলো বলে মানেনি, জেনেছিল উপদ্রব বলে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরও উপসর্গ ছিলেন, তবে তাঁদের সহ্য ও সমর্থন করার লোকও কিছু ছিল।

বাঙালি হিন্দুর উন্নতি বাঙালি মুসলিম-মনেও ঈর্ষা জাগিয়েছিল, কিন্তু তা নির্জিতের মনে প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেরণা যোগায়নি। নিজেদের শূন্যতার ও হীনতার লজ্জাগ্লানি লুকানোর জন্য তারা আরব-ইরানীর অতীত কৃতি ও কীর্তির গৌরব প্রচারে ব্রতী হয়েছিল, যেমন এই শ্রেণীর হিন্দুরা বিচরণ করত অতীতের আর্যাবর্তে-রাজস্থানে-দাক্ষিণাত্যে। পার্থক্য হচ্ছে হিন্দুতে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ছিল বলে প্রগতিবাদী আধুনিক মন-মতের মানুষের অভাব ছিল না—তাদের শক্তি-সামর্থ্য-মনীষা সনাতনীদের ছাপিয়ে উঠেছিল, কিন্তু মুসলিম-সমাজে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এ-সমাজে প্রগতিবাদী ছিল দুর্লভ। এমনকি পরমতসহিষ্ণু মানুষও ছিল দুর্লক্ষ্য। এই বিরল-অস্তিত্বের বাধার শিকার হয়েছিলেন কাজী ওদুদেরা। পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়ার স্বধর্মীর বর্তমানেরও নয়, অতীতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী ও কৃতিগর্বী মানুষ মুসলিম শিক্ষিত সমাজে আজো সংখ্যাগুরু। এক্ষেত্রে অশেষ মূঢ়তাবশে তারা কায়ানী-সাসানী কীর্তিকেও স্বধর্মীর ঐতিহ্য বলে জানে। অক্ষমের সান্ত্বনা লাভের এ এক বিকৃত উপায়। নির্বোধের স্বর্গসুখ-লিপ্সু এসব লোকের আধুনিক জাতীয়তাবোধও জাগেনি, তারা দেশকালাতীত এক আদর্শিক জগতে বাস করে। ঐ নিশ্চিন্ত নিবাসে তারা আজো যেন কৃতার্থমন্য। হিন্দুসমাজ ঈর্ষা করত ইংরেজকে, আর মুসলমানের ঈর্ষার পাত্র ছিল ধনী মানী হিন্দু। হিন্দুরা চেয়েছে জ্ঞানে-গুণে-গৌরবে ইংরেজ হতে। আর মুসলমানেরা কামনা করেছে ধনে-মানে হিন্দুর সমকক্ষতা। রামমোহনী ধারায় হিন্দুসমাজে আধুনিক মনের কিছু মানুষ তৈরি হয়েছিল। সেজন্য হিন্দুর বাসনা আংশিক পূর্ণ হয়েছিল। মুসলিম সমাজে আধুনিক মন-মতের মানুষ ছিল না, তাই তার কামনা আজো অপূর্ণ রয়ে গেছে। সে নেবার মতো মনই তৈরি করতে পারেনি, তাই দেবার মতো ধন আজো তার অনায়ত্ত। মন তার মধ্যযুগে বিচরণশীল, তাই 'ইসলাম-মুসলমানই' তার জিগির। এ-ই তার পুঁজি ও পাথেয়। আজকের বাঙলায় অবশ্য পুরোনো জীবন-দৃষ্টির আশু অবসানের আভাস মিলছে। তরুণ মনে নানা কারণে আধুনিকতার বীজ দ্রুত উপ্ত হচ্ছে।

কাজী আবদুল ওদুদের বিশিষ্ট মনীষার প্রভাব সমাজে বা ব্যক্তিমনে যে গভীর ও ব্যাপক হয়নি, তার কারণ ওটা চারিত্রে-ভাববিপ্লব ছিল না। পুরাতনের অস্বীকৃতিতে আসে ভাববিপ্লব। দুনিয়ার সব ভাববিপ্লবই বিদ্রোহের প্রসূন। পুরাতনকে বিধ্বস্ত করে উচ্ছেদ করে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠিত হয় নতুন। তার মধ্যে উত্তেজনা আছে, আছে উল্লাসবোধ, তার প্রতি আছে মানুষের এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। কাজী আব্দুল ওদুদের মধ্যে এই বিদ্রোহ ছিল না, ছিল না ঔদ্ধত্যও। তিনি ছিলেন সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রত্যাশী আপস-মীমাংসাপ্রবণ। পুরাতনের কাঠামোর প্রতি তাঁর মমতা ছিল; তা তিনি সংস্কার করে, মেরামত করে, চূণ লেপিয়ে, রঙ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চড়িয়ে তাকে যুগোপযোগী করে তাকে দিয়েই যুগের চাহিদা মেটাতে চেয়েছিলেন। সোজা কথায় তিনি বা তাঁর সহযোগীরা মুসলিম সমাজকে গোঁড়ামি মুক্ত গ্রহণশীল ও গতিশীল করতে চেয়েছিলেন। তাই এতে অন্যের আকর্ষণ ছিল কম, ভরসা ছিল সামান্য। অতএব কাজী ওদুদ ভাববিপ্লবী নন, এমনকি সাধারণ অর্থে দ্রোহীও নন। দুই কূল রক্ষা করে তিনি জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতীচ্য-প্রভাবজাত সমস্যা-সমাধানে ছিলেন প্রয়াসী। তাই তিনি স্থিতধী সংস্কারক, সহিষ্ণু, সনাতনী ও উদার হিতবাদী।

কাজী আব্দুল ওদুদের চিন্তাধারা আগে ছিল সনাতনীদের অবাঞ্ছিত আর ষাটোত্তর বাংলায় হয়েছে অপ্রয়োজনীয়। তাই বলে কাজী আব্দুল ওদুদের কোনো চিন্তা, কোনো প্রয়াসই বৃথা বা ব্যর্থ নয়। কারণ-করণতত্ত্বে আস্থা রেখে বলা যায় প্রত্যেক প্রয়াসেরই ফল আছে। কাজী আবদুল ওদুদের সেদিকার যুক্তিবাদ, সংস্কার মুক্তি, সোচ্চার হবার দুঃসাহস, নতুন চিন্তা, দীপ্ত মনীষা সেদিনের চেতনা-চঞ্চল মুসলিম তরুণ বুকের ভয় তাড়িয়েছিল। রাত্রির সমুদ্রে দিক্‌ভ্রান্ত পথসন্ধানী নাবিকের মতো স্বসমাজের হিত সাধনের পন্থা সন্ধানে ব্রতী তরুণকে আলোর ইশারা দান করেছে তাঁদের রচনা, প্রতিবাদে সরব হবার সাহস যুগিয়েছে। সমাজের সামগ্রিক সত্তায় চেতনা সঞ্চার সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু সমভাবাপন্ন ব্যক্তি চিত্তের বিকাশ সাধনের সহায়ক হয়েছে। এই প্রভাব দৃশ্য নয়, সত্য, কিন্তু ফলপ্রসূ। সমাজ-ধর্ম-আচার-রীতি-রেওয়াজ—রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরবর্তীকালের বহু বিদ্রোহী বিপ্লবীর অস্বীকৃত ও পরোক্ষ লালনকর্তা এঁরাই। কাজী ওদুদের যুক্তিবাদিতা, মনীষা, শ্রেয়-চেতনা, সত্যানুরাগ ও উদার নিরপেক্ষ দৃষ্টি প্রগতিবাদী বহু তরুণকে ঋণী করেছে, সন্দেহ নেই। কত হৃদয়ে তিনি চেতনা-কুসুম ফুটিয়েছেন, তা হয়তো কোনোদিন জানা যাবে না। কিন্তু অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এ প্রভাব মন্থর বটে, কিন্তু অমোঘ।

AMARBOI.COM

একটি প্রশস্তি কবিতা

॥সূচনা॥

মধ্যযুগের বাঙলায় খণ্ড কবিতা বিরল। পাঁচালীর উপক্রমে স্তব-প্রশস্তি-বন্দনাদি রয়েছে বটে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হিসেবে এরূপ রচনার অস্তিত্ব দুর্লক্ষ্য। হিন্দু-রচিত পাঁচালীতে থাকে নানা দেবদেবীর বন্দনা, মুসলিম-লিখিত কাব্যে পাই হাম্‌দ (আল্লাহ-স্মৃতি), না'ত (রসুল-প্রশস্তি) এবং আসহাব, পীর ও পিতামাতার উদ্দেশে প্রণাম। আমাদের আলোচ্য স্তুতিটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা। এটিই কবি ও কবিতার স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এর নাম দিয়েছিলেন 'জগদীশ্বর স্তোত্র'।[১] এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল 'ঈশ্বরবন্দনা' বললে এর তাৎপর্য অনেকখানিই থাকত অপ্রকটিত। কবিতাটি আঙ্গিকে স্তোত্র-জাতীয় হলেও কসিদা, স্তব কিংবা প্রশস্তিমূলক কবিতায় দুর্লভ ভাব-চিন্তা একে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ পাণ্ডুলিপি-পরিচিতি॥

৯´ × ৭´ পরিমিত কাগজের বই। ডান দিক থেকে শুরু। অর্ধছিন্ন ও নিতান্ত জীর্ণাবস্থা। ধরতেই পত্র ছিঁড়ে যায় এমনি অবস্থা। লিপিকাল কিংবা লিপিকারের নাম নেই। প্রায় দেড়শ বছরের পুরোনো। ১-১০ পত্রে সমাপ্ত। পুরো পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব। রচয়িতা জিনাত আলী।

॥ কবির আবির্ভাবকাল ॥

প্রতিলিপির বয়সই যদি দেড়শ বছর হয়, তাহলে কবির আবির্ভাবকাল আঠারো শতকের শেষার্ধে বলে অনুমান করা চলে। ভাষায় অবশ্য প্রাচীনতার ছাপ নেই। এমনকি উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও যদি এ কবিতা রচিত হয়ে থাকে, তাহলেও এর মূল্য কমে না। কেননা এতে যে উদার মন ও উন্নত চিন্তার পরিচয় পাই, তা সে- যুগে তো বটেই, একালের উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যেও দুর্লভ।

॥ কবিতার বৈশিষ্ট্য ॥

বলেছি আলোচ্য প্রশস্তিটি নানা গুণে বিশিষ্ট।

ক. এর দুটো ভাগ। প্রথম ভাগে আল্লাহর মহিমা বর্ণনা-প্রসঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও মানব-বোধের সত্য সম্পর্কে এক উদার ও নিরপেক্ষ আলোচনা রয়েছে। স্বল্প কথায় গভীর তত্ত্বের এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কবির অসামান্য ধীশক্তি ও প্রকাশ পটুতার পরিচায়ক। দ্বিতীয় ভাগে কবি আল্লাহর করুণা ও পাপমুক্তি কামনা করেছেন। দুটো ভাগে দুই প্রকার ছন্দও ব্যবহৃত।[১]

খ. ছন্দ : প্রথম ভাগে ব্যবহৃত ছন্দ মালঝাঁপ জাতীয় তরল পয়ার। মালঝাঁপে চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ণে মিল থাকে। তরল পয়ারে থাকে চরণের কেবল চতুর্থ ও অষ্টমে মিল। যেমন,

মালঝাঁপ :
সদাকাল সুরসাল হয় মাল ঝাঁপ
রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ।
চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার
মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি-অক্ষর আর।

তরল পয়ার :
চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার
ভিন্নকারে বলে তারে তরল পয়ার।

শেষাংশ সাধারণ পয়ারে রচিত।

গ. বিশ্বাসের অঙ্গীকারে ধর্মের উদ্ভব। ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে মানুষ সাধারণভাবে চিরকালই যুক্তিবিরোধী ও বিশ্বাসপ্রবণ, এবং সে কারণে গোঁড়া ও অসহিষ্ণু। চৈত্তিক সংকীর্ণতা ও গ্রহণবিমুখতা ধার্মিকতার অন্যবিধ লক্ষণ। আমাদের প্রাজ্ঞ কবি যুগ-দুর্লভ উদারতা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আস্তিক আর ধার্মিক হয়েও তিনি কত সহজে ধর্মবুদ্ধির

---

১ পুথি-পরিচিতি–১৫৭ সংখ্যক পুথির বিবরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসম্পূর্ণতার কথা দ্বিধাহীনচিত্তে অকপটে ব্যক্ত করেছেন, দেখে বিস্মিত মানি। কবি 'অন্ধ-হস্তী' ন্যায় প্রয়োগে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। "অন্ধের হস্তী দর্শন" নামের জনপ্রিয় গল্পের রূপক অবলম্বনে দুটো তত্ত্বের—ধর্মবুদ্ধি ও নাস্তিক্যের-রহস্য প্রকটিত। আটজন অন্ধের একজন ছিলেন রুগ্‌ণ। যেতে পারল না সে হাতি দেখতে। সাত অন্ধ ফিরে এল সাতপ্রকার ধারণা নিয়ে। আর সাতভাবে বর্ণনা দিয়ে তারা রুগ্‌ণ অন্ধটিকে হাতির স্বরূপ বোঝাতে পেল প্রয়াস। রুগ্‌ণ ব্যক্তিটি দেখল: " সপ্ত অন্ধ করে দ্বন্দ্ব অনৈক্য কথায়"। তখন তার মনে হল "ভবে হস্তী স্বয়ং নাস্তি"। হাতি যদি প্রকৃতই থাকত তাহলে এদের বর্ণনাও অভিন্ন হত। অতএব সে হল নাস্তিক। তাই সে বলে 'শুনগো, বুঝাই'— তোমাদের বর্ণিত 'রম্ভা, কুলা, ভাণ্ড, মূলা, স্তম্ভ, বেড়া বা লাঠি'-স্বরূপ হাতি বাস্তবের নয়—কল্পনার, এবং সবকিছুর সমন্বয়ে হাতির পুতুল তৈরি করে তোমরা ধোঁকা দিচ্ছ লোককে।

হস্তে ঠেলে হস্তী বলে শিশুরা খেলাএ
লোকে বোলে হস্তী চলে লোকের ভাঁড়াএ।

আবার সব ধর্মেই সত্য রয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সত্য কোথাও নেই। কোনো একক মানুষের বোধে সত্য পূর্ণাবয়বে ধরা দেয়নি। খণ্ডসত্যকে অখণ্ড রূপে চালিয়ে দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে তাদের জীবন ও মনন অপচিত। ধর্মান্ধদের গোঁড়ামি, চৈত্তিকসংকীর্ণতা, গ্রহণবিমুখতা ও অসহিষ্ণুতার মূলে রয়েছে এ সীমিত বোধ ও বুদ্ধি। আল্লাহর পুরো ধারণা দেয়া যাচ্ছে না বলে আল্লাহ্ নেই বলা যেমন নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহ সম্বন্ধে সামান্য বোধকে পূর্ণ জ্ঞান বলে দাবি করাও তেমনি নির্বোধের অহমিকা মাত্র। প্রত্যেকেই নিজের মত অভ্রান্ত বলেই জানে, কেননা এর মূলে রয়েছে অন্ধের মতোই স্বতোপলব্ধ সত্যের বীজ। বিশ্বাসের দৃঢ়তা এসেছে এ পথেই। এর ফলেই জেগেছে স্বধর্মে আস্থা, আর পরধর্মে অবজ্ঞা। স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির পরধর্মবিদ্বেষের তথা অন্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতার মূলে রয়েছে এসব কারণ। কবি তাই বলেন : 'শাস্তিকের নাস্কিকের ধর্ম সে-প্রকার।'

তার কথা মানে কোথা পর্শিয়াছে কবে
আত্মকথা সপ্ত বৃথা প্রত্য নাহি করে।

অর্থাৎ একজনের আত্মোপলব্ধ সত্যও অন্যের প্রত্যয় জন্মায় না। একের সত্য অপরের আস্থা অর্জন করে না। 'কেবল যার যেই শাস্ত্র সেই জানে এই সত্য।' কেননা, সবাই 'হস্তে ধরি দেখে করী মুদিয়া নয়ন'। ফলে 'জাতি যত শাস্ত্র তত নানা মত পাঁতি।' মনুষ্য-জীবনের ও সমাজের বিড়ম্বনার, অনৈক্যের, বিদ্বেষের, অপ্রেমের ও কোন্দলের বীজও নিহিত এখানেই। ধর্মবোধই লালন করে মানুষের মন-মনন, দান করে রীতি-নীতি-আদর্শ, নিয়ন্ত্রিত করে প্রাত্যাহিক জীবনের আচার-আচরণ, বিকাশ ঘটায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের। কাজেই বিচিত্র ধর্মবুদ্ধিই বিভিন্ন মতের সম্প্রদায় ও নানা দ্বান্দ্বিক সমাজ গড়ে তুলেছে। মানুষের জীবনের অর্ধেক দুঃখ-বিপদ এসেছে ধর্ম-বৈচিত্র্য থেকে। আজো হয়নি তার অবসান। হবেও না হয়তো কখনো। কেননা সব-জানার, সব-বোঝার ও সব-থাকার অহমিকা থেকে এর উৎপত্তি।

জ্ঞান অস্ত্রে শাস্ত্র শস্ত্রে যুঝে পরস্পর
কি আকারে পূঁজি তারে কি লিখি মহিমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. কবি বলেন:

আদি যার নাহি তার অন্ত কোথা পাই
বুঝ সার করতার আদি অন্ত নাই।

কবির ধারণায় আল্লাহ্ লীলাময়ও —

যেই মানে যে মানে পোষে দুই কুলে

আবার অকারণে, *কার মাতা কার ভ্রাতা কার হরে পতি।*
শিশু মরে যুবে মরে বৃদ্ধের সাক্ষাত।

কেবল তাই নয়, *আঁখি পলে রসাতলে ক্ষেপে সে ভূপালে*
সেই ক্ষণে সিংহাসনে বসাএ কাঙ্গালে।
আজি কবে কিবা হবে নাহি বুঝি আজি
অন্তস্পটে অপ্রকটে করে ছায়া বাজি।
কেবা জানে কোন স্থানে তাকে সে দয়াল
তিন ঘরে নৃত্য করে অসংখ্য পুতুল।

অতএব, *মহিমার সিন্ধু তার নাহি পাএ কূল।,*

আল্লাহ সম্বন্ধে যথার্থ ইসলামি ধারণাও রয়েছে তাঁর :

ছিলে যেন আছ তেন থাকিবে তেমনি।
কার মধ্যে নহ তুমি কারে ছাড়া নাই
যথা দেখি মহিমা' তোমার তথা পাই।
আঁখি হৈতে নিকটে ব্রাহ্মাণ্ড হৈতে দূরে।

আল্লাহর অপার মহিমা যে বর্ণনা-সাধ্য নয়, সে অনির্বচনীয়তার কথাও তিনি ইসলামি ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন (অবশ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে হিন্দু পুরাণে এমনি কথা রয়েছে) :

শক্তি কার কহে তার মহিমার সীমা
যদি, *সিন্ধু জলে বৃক্ষ ডালে লিখি নিরবধি*
তবু তার মহিমার অঙ্ক না পূরিবে।

ঙ. সৃষ্টিলীলায় বিস্মৃত ও বিমুগ্ধ একটি চিত্তের পরিচয় মেলে গোটা 'হামদে'। আল্লাহর মহিমার অপরিমেয়তার কথা বলতে গিয়ে আলাউল-চিত্তেরও এমনি আকুলি-বিকুলি শুনেছি আমরা পদ্মাবতীর 'প্রভুস্তুতি'তে।

আত্মত্রাণ-কামনায় কবি দ্বিতীয়াংশে যে-'স্তব' করেছেন তাও সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য-বর্জিত নয়। কবির কণ্ঠে পাই আবদারের সুর, সেই সুরে আছে স্বাতন্ত্র্য, আছে ভক্তহৃদয়ের মাধুর্য। কবি বলেন :

আমি হেন পাপীহ কাহারে নাহি পাই
তুমি হেন দাতাহ কেহ নাই।
তুমি দাতা আমি পাপী যার যে কর্তব্য
না হের আমারে হের আপনা দাতব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	আমি পাপী বলিয়া কি দাতব্য ছাড়িবে?
	সকলি তোমার সৃষ্টি কোথা খেদাইবে?
বিশেষত, যখন	*আমি দুঃখ পাইলে তোমার লভ্য নাই,*
তখন	*হইলে তোমার দয়া আমি রক্ষা পাই।*

কোনো পুণ্যকর্মের দাবিতে এই মুক্তি-প্রার্থনা নয়, কবির একমাত্র ভরসা যে তিনি মুমিন :

	সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড যেই সখার কারণ
	আমি তাকে তোমার প্রেমের সখা মানি।
আর,	*তোমাকে (আল্লাহকে) আমি দৃঢ় মনে এক জানি।*

সাধন-ভজনে অবহেলা সম্পর্কে নিজের সমর্থনে কবির যুক্তি এই :

	অন্তের অনন্ত তুমি অনাদ্যের অদ্য
	ভজিতে তোমারে আমি-পাপীর কি সাধ্য!
কাজেই,	*দয়া করে ক্ষমা কর পাপ হর দেহগো নিস্তার।*

পরিশেষে সব মুমিনের মতোই কবিও কামনা করেছেন, ইমানের সাথে মৃত্যু :

দীনহীন জিনতের এই মনস্কাম
দেহ ত্যাগে লইয়া তোমার আদি নাম।

চ. আল্লাহর মহিমার অনুধ্যানে কবি আশ্রয় করেছেন ইসলামি ইতিকথা। তিনি এ সূত্রে স্মরণ করেছেন শাদ্দাদ, নমরুদ, ফেরাউন, আবাবিল পাখি, হযরত আদম-হাওয়া, ইউসুফ, সোলায়মান রসুল মুহম্মদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

বলেছি, এ প্রশস্তি-কবিতাটি নানাগুণে অনন্য। ললিত-মধুর ছন্দের লাবণ্যে, কবিতার আঙ্গিক-সৌষ্ঠবে, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার অবতারণায়, আল্লাহ্‌র অনির্বচনীয় মহিমার অনুধ্যানে, মুসলিম ঐতিহ্যের অনবরত সুপ্রয়োগে, মনের স্বচ্ছলতায়, চৈত্তিক ঔদার্যে, বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতায়, সিদ্ধান্তের ঋজুতায় এবং পরিস্রুত মননের সামগ্রিক প্রতিফলনে কবিতাটি বিশিষ্ট।

হামদ

[জিনাত আলী বিরচিত]

নিরঞ্জন	**গুণ মন**	**লিখিতে [অশক্য]**
কত লিখি	যত দেখি	মহিমা [অসংখ্য]
[জন্তু জীবা]	বস্তু কিবা	নর অবতার
ইন্দু নিয়া	বিন্দু দিয়া	দশ নাম তার।
দশে শত	অহি মত	যথ দেহ বিন্দু
বিন্দু হোন্তে	কোন্‌মতে	পূরে গুণ সিন্ধু।...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদি যার   নাহি তার   অন্ত কোথা পাই
বুঝ সার   করতার   আদি অন্ত নাই।
বলে সন্ত   আদি অন্ত   না মিলিল সীমা
কি আকারে   পূজি তারে   কি লিখি মহিমা ।
বলি হেন   কহ কেন   কার্য কি আকার
কোথা তার   অলঙ্কার   বিনা স্বর্ণকার।
বিনা সূত্র   ধর মাত্র   কোথা সিংহাসন
মালাকার   বিনাকার   কোথা পুষ্পবন।
মুখে সার   চিত্রকার   বিনা চিত্রকার
বুঝ আর   কুম্ভকার   বিনা কুম্ভকার।
মহিমা কিং   লুকালুকি   পষ্ট দৃষ্ট অক্ষে
এ ব্রহ্মাণ্ড   কি প্রচণ্ড   স্থাপে বিনা লক্ষে।
সরুশশী   অহঃনিশি   নক্ষত্র বেষ্টিত
মহীমা [স]   বার মাস   কাল ষট ঋত।
সিন্ধু নীলা   জলে শিলা   শিলাতে অনল
অগ্নি মর্মে   ধূম্র জন্মে   ধূম হোন্তে জল।
জল প্রতি   বিন্দু প্রতি   বিন্দুতে মহিমা
বিন্দু হোন্তে   কত মতে   গড়এ প্রতিমা।
শুক্তোদরে   বিন্দু করে   মুক্তামোতি জাতি
হস্তী দাঁতে   বিন্দু পাতে   জন্মে গজমোতি।
ভেকোদরে   বিন্দু করে   মানিক উঝল
ভক্ষে ফণী   জন্মে মণি   আর হলাহল।
বসুমতী   গর্ভবতী   বিন্দুতে উৎপতি
অবিশ্রান্ত   প্রসবন্ত   অনন্ত সন্ততি।
কি অসংখ্য   কোটি লক্ষ   রূপে একোদরে
দিবারাত্র   পুত্রীপুত্র   জন্মে ভূ ভূধরে।
নানা বর্ণ   নানা তৃণ   অবলা [সবল]
নানা বৃক্ষ   মুখ্য সূক্ষ্ম   অফল [সফল]
নানা ক্ষেতে   নানা ঋতে   ন্যানা ফলফুল
মকরন্দে   নানা গন্ধে   মধুপ ব্যাকুল।
তরু পর্ণ   ভিন্ন বর্ণ   বিরঙ্গ প্রসূন
ফল তার   অন্যাকার   মহিমার গুণ।
কলিকার   গন্ধ কার   নাসিকা না পাএ
বিকাশিলে   গন্ধ মিলে   কহ কে জন্মাএ।
দেনু কোড়ে (?)   রেণু করে   রেণুকে অঙ্কুর
কার শ্রমে   ক্রমে ক্রমে   বাড়এ প্রচুর।
উপমার   কথাটার   এক আম্রফল
শিশু কশ   পক্ক রস   যুবকে অম্বল।

AMARBOI.COM

পনসের চর্ম হের কে গঠে কণ্টক
মর্মে মর্মে রোয়া[১] জন্মে কে তার গঠক।
? তিন চর্মে সেরা পুবাপুর
[ফলে তার] বীজ আর বীজেহ অঙ্কুর।
লেহ্য পেয় চুষ্য চর্ব্য চারি ভক্ষ্য হএ
মিষ্ট ধক কশ টক তীব্র উগ্র হএ।
দেখ দৃষ্টে এক মিষ্টে স্বাদ লক্ষে লক্ষে
আর পঞ্চ স্বাদ নঞ্চ (?) দেখহ প্রত্যক্ষে।
ক্ষুধা যোগে ফল ভোগে মলে মূত্রে ধ্বংস
গুণ তার অঙ্গে সার করে কত অংশ।
অস্থি করে অঙ্গ ভরে শোণিত নিপুণ
লোভ ক্রোধ মায়া বোধ কাম রক্ত গুণ।
লোভ ক্রোধ কর রোধ কত শত মত
মায়া যথ কর কথ জানেন জগত।
শিশু মায়া ভক্তি কায়া গুরুমায়া দয়া
মিত্র মায়া প্রেম ছায়া জায়া মায়া [কায়া]।
বুঝ মনে সর্ব জনে মহিমা প্রভুর
কাম পীড়া রতি ক্রীড়া সব কামাতুর।
পুত্র মাতা ভগ্নী ভ্রাতা পিতাসুতা সঙ্গে
কার প্রতি কার মতি নহে রতি রঙ্গে।
ভার্যা প্রতি রতি প্রতি আরতি সম্প্রতি
যবে মনে সেই ক্ষণে জন্মনে দম্পতি।
প্রেমে মাতে ক্রমে তাতে দেখা এ মহিমা
ঘর্ম বিন্দু করে ইন্দু সুন্দর প্রতিমা।
সহকারী করে বৈরী অরি হএ মিত্র
ভূহিল্লোলে অম্বানলে মিশাএ একত্র।
দীর্ঘ করে পাশে হরে গড়ে পুত্তলিকা
চারি মাসে আত্মা আসে মহা বিভীষিকা।
মৎস্য তীরে নর নীরে গেলে মাত্র মরে
জল স্থলে কার বলে আনন্দ উদরে।
[দম ফাটে মরে ঝাটে] শ্বাস হৈলে বন্দী
ছয় মাসে বন্ধ শ্বাসে না মরে কি সন্ধি।
শিশু কালে কোলে পালে লক্ষ পয়োপান
কাম ক্রোধ লোভ বোধ দেয় মায়া জ্ঞান।

---

১ মূল পাঠ ঃ রত্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে লিখে   শাস্ত্র শিখে   দেখে আদি মূল
মহিমার   সিন্ধু তার   নাহি পাএ কূল
মজুচানী   মগধানী[১]   নস্রানী হুলমী
হিন্দুয়ানী   মুসলমানী   এমানী আগমী।
তা সবার   বিনা আর   আছে কত জাতি
জাতি যথ   শাস্ত্র তথ   নানা মত পাঁতি।
জ্ঞান-অস্ত্রে   শাস্ত্র-শস্ত্রে   যুঝে পরস্পর
আগমী বা   করে কিবা   সকলি ঈশ্বর।
শাস্ত্রকার   দ্বিপাকার   প্রভু প্রতি ঘটে
আত্মতেজে   অন্যে সৃজে   নিজে নহি [টুটে]।
বলে কেহ   এক দেহ   অংশ নাহি তার
কেহ কহে   এক নহে   আছে পরিবার।
কার কথা   প্রভু কোথা   বৃথায় ভজন
হস্তে ধরি   দেখে করী   মুদিয়া নয়ন।
অষ্ট অন্ধ   ছিল ধন্ধ   মাতঙ্গ কিমত
শুনিলেক   কোথা এক   আছে ঐরাবত।
সপ্তজন   তথক্ষণ   দেখিয়া আইল
ভাগ্য মন্দ   রোগা অন্ধ   যাইতে নারিল।
রোগা বোলে   প্রাণ জ্বলে   না দেখিনু করী
কহ সব   অবয়ব   অনুমান করি।
বিনা অক্ষে   কর লক্ষে   যে যথা ধরিল
সপ্ত মতে   ঐরাবতে   সপ্ত বাখানিল।
সর্ব গুরু   পর্শে উরু   বোলে স্তম্ভাকার
গুঁজা পুচ্ছে   ধরে তুচ্ছে   বোলে লাঠি তার।
সুরঙ্গ যে   কর্ণ গজে   পর্শে বোলে কুলা
বুদ্ধিমন্ত   ধরে দন্ত   বলে বড় মূলা।
বুদ্ধি সরু   রম্ভা তরু   বাখানিল শুণ্ডে
বোলে ভাণ্ড   যে ভূষণ্ড   ধরেছিল মুণ্ডে।
যে মাতঙ্গে   পর্শে অঙ্গে   বোলে বেড়া ন্যায়
সপ্ত অন্ধ   করে দ্বন্দ্ব   অনৈক্য কথায়।
রোগা কহে   শুন অহে   দ্বন্দ্বে কার্য নাই
ভবে হস্তী   স্বয়ং নাস্তি   শুনগো বুঝাই।
রম্ভা কুলা   ভাণ্ড মূলা   স্তম্ভ বেড়া লাঠি
জোড়া দিয়া   টানে নিয়া   লোকে খাএ মাটি।

---

১ মগদানি।

১ মূল পাঠ ঃ জেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হস্তে ঠেলে হস্তী বলে শিশুরা খেলাএ
লোকে বোলে হস্তী চলে লোকেরে ভাঁড়াএ।
তার কথা মানে কোথা পর্শিয়াছে করে
আত্ম কথা সপ্ত বৃথা প্রত্য নাহি করে।
রোগা হস্তী বিনা নাস্তি নাই বোলে আর
শাস্ত্রিকের নাস্তিকের [ধর্ম] সে প্রকার।
যার যেই শাস্ত্র সেই জানে এই সত্য
বাক্য যুদ্ধে বহু উর্ধ্বে যেন দেব দৈত্য।
মনে কথা অনৈক্যতা নাহি পাএ মর্ম
মুখে কএ হএ হএ প্রভু এক ব্রহ্ম।
চিনাইতে শিখাইতে সৃজে মুখ্য সূক্ষ্ম[2]
দশ মানে তত্ত্ব জানে নাহি মানে লক্ষ।
মন্ত্র সাথে খর্গ হাতে সখা পাঠাইল
কত এল কত রৈল কত যমে দিল।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে গেল যমালয়
সর্ব ধরা সসাগরা করিল বিজয়।
তার পরে আজ্ঞা করে না বুঝিঅ আর
ক্ষণে যোধ ক্ষণে রোধ যে আজ্ঞা তাঁহার।
আজ্ঞা দিলে এক তিলে মিলাএ সংসারে
[যে অবোধ যেবা বোধ] কে বুঝিতে পারে।
যে না মানে প্রভু জানে কারে নাশে মূলে
যেই মানে যে না মানে পোষে দুই কূলে।
কারে তোষে কারে রোষে হেন নাহি করে
দোহে হরে দোহে পূরে দুই জন্মে মরে।
কার পিতা কার মাতা কাহার যুবতী
কার মাতা কার ভ্রাতা কার হরে পতি।
শিশু মরে যুবে হরে বৃদ্ধের সাক্ষাত
বিশ্‌শেত (বিশ্বেত) রাখে কত কার গর্ভপাত।
আঁখি পলে রসাতলে ক্ষেপে যে ভূপালে
সেই ক্ষণে সিংহাসনে বসাএ কাঙ্গালে।
আজি কবে কিবা হবে নাহি বুঝি আজি
অন্তস্পটে অপ্রকটে করে ছায়া বাজি।
কেবা জানে কোন্ স্থানে থাকে সে দয়াল
তিন ঘরে নৃত্য করে অসংখ্য পুতুল।
প্রাণ বায়ু সূত্র আয়ু ঝলাএ ফুকাএ

২ মূল পাঠ ঃ মুক্ষ সুক্ষ | >মুখথ-সুখথ ?]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূতে জাত ভূতে পাত ভূতলে লুকাএ।
কত নর চরাচর কতেক মক্ষিকা
কোন মত কব কত কীট পিপীলিকা।
কত জল কত স্থল কত বৃষ্টি ধারা
কত রেণু পরমাণু স্বর্গে কত তারা।
কত সূক্ষ্ম কত মুখ্য তৃণ বৃক্ষ সব
কত বর্ণ কত পর্ণ কতেক পল্লব।
কত মূল কত ফুল কত ফল তার
কত ত্যাজ্য কত ন্যায্য কে কার আহার।
কত ধন নিরঞ্জন সৃজে কত মতে
কত জলে কত স্থলে কত বা পর্বতে।
কত গেল কত এল কত আছে আর
যে মরিল কোথা নিল আনে কোথা কার।
সিংহাসনে কত জনে কৈল রঙ্গ নাট
কি হইল কারে দিল তার রাজ্য পাট।
কোথা নৃপ কোথা দর্প কোথা অহঙ্কার
কোথা গেল যে বুলিল নিজে কর্তার।[১]
বৃথা কর্মে স্বর্গ নির্মে না পূরিল আশ
কার দর্প কাষ্ঠ সর্প করিল বিনাশ।[২]
কোথা পারে ভাঙ্গিবারে তার পুর ধামে
অশ্বে গজে সৈন্য মজে পাখীর সংগ্রামে।[৩]
পাত্র প্রজা সেনা রাজা মশকে খাওয়াএ[৪]
তিন দোষে মিত্র রোষে না ছাড়ে কাহাএ।
দুষ্ট বাক্যে ভার্যা ভক্ষে গিয়া অল্প গম
স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে পড়ে বংশ পাএ শ্রম।[৫]
আপনার সু-আকার যেই বাখানিল
কূপে বাস স্ত্রীর দাস কারাগারে নিল।[৬]
ত্রিভুবনে সর্ব জনে জনে যেই মানে
বায়ু শিরে লএ ফিরে যাহাকে বিমানে।

১ শাদ্দাদ।

২ ফেরাউন। মুসার আষা যে জাদুপূত নবুয়তের অভিজ্ঞান নয়, তা প্রমাণ করবার জন্যে জাদুকরদের দিয়ে তিনি লাঠিকে সাপে পরিণত করাতে চেয়েছিলেন।

৩ হস্তীর যুদ্ধ। আবাবিল পাখি-নিক্ষিপ্ত পাথর কণার আঘাতেই মিশররাজের বিপুল গজবাহিনী ধ্বংস হয়।

৪ নমরূদ।

৫ আদম-হাওয়া।

৬ ইউসুফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্ম ফের ধীবরের কন্যাকে নিন্দিল
রাজ্য নিল কন্যা দিল মৎস্য বেচাইল।[৭]
সখা তিলে বাখানিলে দশন কিরণ
শত্রু হাতে শিলাঘাতে ভাঙ্গে সে দশন।[৮]
শক্তি কার কহে তার মহিমার সীমা
প্রতি জন্মে প্রতি কর্মে প্রভুর মহিমা।
সিন্ধুজলে বৃক্ষ ডালে লিখি নিরবধি
পত্র বায়ু দীর্ঘ আয়ু প্রলয় অবধি।
জল বায়ু ডাল আয়ু সব ফুরাইবে
তবু তার মহিমার অঙ্ক না পুরিবে।
সর্ব মুনি সর্ব গুণী ভাবি অবিরত
নাহি পাত্র মহিমাএ কে পারে জিনিত।

নিস্তার-স্তুতি

অহে প্রভু ভক্ত-বৎসলের আদি সীমা
স্মৃরিতে তোমারে মোর সর্বাঙ্গ রক্তিমা।
যে-সব তোমার ভাবে চিত্ত নিত্য লীন
অজানিত ক্ষুদ্র দোষে মাত্র হএ ভিন্ন।
মহা মহা পাপ করি যত মনে লএ
এক পাপ বিচারিলে আমি হই লএ।
পাপ কর্ম করিতে আমারে সৃজ নাই
আপনা ইচ্ছাএ আমি পাপ পথে যাই।
লোভে ধেনু পর শস্য নষ্ট করে গিয়া
না বধে রক্ষক তাকে আনে ফিরাইয়া।
তুমি বিনা কেহ নাহি আমার রক্ষক
নিস্তার করহ প্রভু ক্ষমিয়া পাতক।
পুণ্যবলে মুক্তি পাই কোথা সে কপাল
কেবল ভরসা তুমি আপনে দয়াল।

AMARBOI.COM

৭ সোলায়মান। ইনি এক জেলেকন্যাকে কুৎসিত বলে নিন্দা করেছিলেন। আল্লাহ্র অভিপ্রায়ক্রমে সেই ধীবরকন্যা রূপবতী হয়ে উঠল (অনেকটা চিত্রাঙ্গদার মতো)। হৃত-অঙ্গুরী রাজ্যচ্যুত সোলায়মান সেই ধীবরকন্যার প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে বিয়ে করেন। তখন নিঃস্ব নবী জেলের মজুর ছিলেন।

৮ হযরত মুহম্মদ। বিবি আয়েশা এক সন্ধ্যায় তাঁর পরিহিত ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছিলেন। ঘরে তৈলাভাবে বাতি ছিল না। এমনি সময় রসুল গেলেন তাঁর কাছে। অতর্কিত ডাকে আয়েশা সুঁই হারিয়ে ফেললেন। রসুলের স্মিতহাস্যের ফলে তাঁর দাঁতের জ্যোতিতে ঘর হল আলোকিত। আয়েশা খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাহি জানি করিতে প্রণতি স্তুতি ভক্তি
পূজিবারে তোমারে আমার কিবা শক্তি।
পবনের গতি পুষ্পে-বিষ্ঠাতে সমান
সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণে সুঘ্রাণ কুঘ্রাণ।
পুণ্য মুখে সরে বাণী যেন মকরন্দ
পাপ-মুখে নিষ্ঠা বাক্যে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ।
দিবারাত্র যেই মুখে পাপ প্রবঞ্চনা
হেন ছার মুখে তব কি করি ভজনা।*
পাপে পুণ্য পুণ্যে শূন্য নাহি সেবা শিক্ষা
দীন হীন অধমেরে মুক্তি দেহ ভিক্ষা।
ধনীগণ উপলক্ষ তোমারি ভাণ্ডার
যেই যত দান করে তোমারি একার।
আমি হেন পাপীহ কাহারে নাহি পাই
তুমি হেন দাতাহ কোথায় কেহ নাই।
তুমি দাতা আমি পাপী যার যে কর্তব্য
না হের আমারে হের আপনা দাতব্য।
আমি পাপী বলিয়া কি দাতব্য ছাড়িবে
সকলি তোমার সৃষ্টি কোথা খেদাইবে।
আমি দুঃখ পাইলে তোমার লভ্য নাই
হইলে তোমার দয়া আমি রক্ষা পাই।
কাতর হইয়া এই চাই তব ঠাঞি
যে বোঝা তুলিতে নারি না দিহ গোসাঞি।
সৃজিলে ব্রহ্মাণ্ড যেই সখার কারণ
তিন লোকে জানে যার অবৃথা বচন।
তিনি তাকে তোমার প্রেমের সখা মানি
তোমাকেহ আমি দৃঢ় মনে এক জানি।
দিক পাশ বংশনাশ নাহিক তোমার
হীন দ্বন্দ্ব নিত্যানন্দ নিত্য নিরাকার।
হীন জন্য কাল ভিন্ন চৈতন্য সতত
ছিলে যেন আছ তেন থাকিবে তেমত।
কার মধ্যে নহ তুমি কারে ছাড়া নাই
যথা দেখি মহিমা তোমার তথা পাই।

---

* পেলেন সুঁই। তাঁর বিস্মিত প্রশ্নের উত্তরে রসুল অহঙ্কার করে বললেন ; তাঁর দাঁতের প্রভায় ভুবন আলোকিত করতে পারেন। আল্লাহ রুষ্ট হলেন তাঁর অহঙ্কৃত বাক্যে। এর ফলেই ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত ভাঙল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁখি হৈতে নিকটে ব্রহ্মাণ্ড হৈতে দূর
নিজে স্থান নাহি সবে রাখ দিব্যপুর।
অন্তের অনন্ত তুমি অনাদ্যের আদ্য
ভজিতে তোমারে আমি পাপীর কি সাধ্য।
সর্ব কর্তা সর্ব হর্তা সর্ব রক্ষাকার
ক্ষমা কর পাপ হর দেহ গো নিস্তার।
রহিলাম সাক্ষাতে অষ্টাঙ্গে নম্র শিরে
কর যাতে বাক্য তব সখার না ফিরে।
দীন হীন জিনন্তের এই মনস্কাম
দেহ ত্যাগে লইয়া তোমার আদি নাম।

AMARBOI.COM

কালিক ভাবনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

আমার বিগত বিপন্নদিনে সহায়

রেণু-সানু, চন্দন-দলিল, স্বপন, রহিমারহমান-আহমদুর রহমান, মানিক-বখতিয়ার, মাহমুদ নুরুল হুদা, আবু রশিদ মাহমুদ, আহমদ সোবহান, ইব্রাহিম হোসেন, মানিক-হাবিব, ডক্টর এ.বি.এম. হবিবুল্লাহ্, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ স্বজন ও সুজনের কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণের কথা স্মরণ করছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাভৈঃ

সম্পদ ও শক্তির একটা মারাত্মক মাদকতা আছে। এই বিত্ত ও বল মানুষকে দাম্ভিক, উচ্ছৃঙ্খল, নির্ভীক ও বেপরোয়া করে তোলে। এরা কোনো যুক্তিবুদ্ধির তোয়াক্কা করে না, গায়ের জোরেই সবকিছু জয় করতে চায়।

শক্তিমত্ত মানুষ চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে বাধা-ব্যবধান স্বীকারও করে না, সহ্যও করে না। এরা অন্ধ আবেগে চালিত এবং ঈর্ষা, অসূয়া ও লিপ্সা তাড়িত। ন্যায়নীতি, সত্য, বিবেকবুদ্ধি, বিবেচনা তাদের কাছে অবহেলিত। মনুষ্যত্ব তাদের কাছে মূল্যহীন আর মানবিকবোধ ও গুণ তাদের চোখে দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতা। নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতা, ছলচাতুরী ও বঞ্চনাই তাদের পার্থিব প্রভুত্বের পুঁজি। আর শক্তিমানের ইচ্ছাটাই আইন, তার কর্ম ও আচরণ মাত্রই বৈধ। কারণ King can do no wrong. ঐশ্বর্য যে মানুষকে কেমন অমানুষ বানিয়ে ছাড়ে, তার সুন্দর রূপক রয়েছে হিন্দু- পুরাণে। সাগরকন্যা লক্ষ্মী হচ্ছেন পরমা সুন্দরী। ঐশ্বর্যের ঐ অপরূপা রূপসী দেবতার বাহন হচ্ছে কিন্তু কদাকার প্যাঁচক। সে দেহে-মনে কুৎসিত। আলো ও সৌন্দর্য, রূপ ও রঙ সে সইতে পারে না। তাই সে নিশাচর। জীবনযাত্রার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ধনসম্পদের প্রয়োজন—এ না থাকলে যেমন নিঃস্বের জীবন রিক্ত, দারিদ্র্যদুষ্ট ও ব্যর্থ; প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনও আবার মানুষকে নীতি-নিষ্ঠাহীন ও সদাচারভ্রষ্ট করে। যেমন জল না হলে জীব বাঁচে না, তাই জলেন নাম জীবন। জল জীবন রক্ষা করে বলে স্থলের প্রাণীকে জলে ডুবিয়ে রাখলে জীবন বাঁচে না, বরং চিরতরেই যায়। তেমনি লক্ষ্মীর প্রসন্ন দৃষ্টি সবারই কাম্য, সবার জীবনেই তাঁর দয়া দরকার। কিন্তু অতিস্নেহে তিনি যদি সিন্দবাদের ভূতের মতো কারো ঘাড়ে চাপেন, তাহলে তার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে তাকে প্যাঁচা বানিয়েই ছাড়েন। শক্তিমান ও ঐশ্বর্যবানের মনুষ্যত্ব তাই দুনিয়ায় দুর্লভ। অর্থের অনুষঙ্গী যেমন মদ ও মেয়েমানুষ, শক্তির অনুষঙ্গীও তেমনি জোর ও জুলুম। শক্তি ও সম্পদ পরিমিতি মানে না। নিয়মনীতির বেষ্টনীর মধ্যে বিত্ত ও বলের বিভা ও বিকাশ প্রকটিত হয় না। তাই অনিয়মের লালন। অনীতিই এর অনন্যতা।

একটা কথা চালু আছে যে, শাসনের দায়িত্ব যার, তার নরম হলে চলে না। প্রভু স্বৈরাচারী না হলে মানায় না, কারণ প্রভুত্বের জন্যে প্রবল প্রতাপ প্রয়োজন। বিধিবিধানের মাধ্যমে প্রতাপের প্রকাশ সম্ভব নয়, স্বেচ্ছাচারিতাই দাপট দেখানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। ছল-বল-কৌশল; জোর-জুলুম-বঞ্চনা, শঠতা-কপটতা, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা প্রভৃতি পৌরুষ-লক্ষণ শাসক ও প্রভুর স্বভাবে থাকা আবশ্যিক। নইলে দুষ্ট লোক প্রশয় পেয়ে পরপীড়নে উৎসুক হয়। এজন্যেই সাধারণের পক্ষে যা গর্হিত, যা অন্যায় ও অমার্জনীয় , প্রভু ও শাসকের পক্ষে তা-ই বৈধ ও বরণীয়। দেশ-দুনিয়া জবরদখল করাই রাজনীতি। কাড়া-মারা সবই বৈধ। বস্তুত পরস্বাপহরণ ও অঙ্গীকারলঙ্ঘন, কাপট্য, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা প্রভৃতি রাজধর্ম এবং একই নীতি ঘরে-বাইরে প্রযুক্ত। তার প্রীতিও "বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ"। Ethical Code

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা নৈতিক বিধি ও নীতিহীনতাই সরকারি নীতি। সেনাবাহিনী তো আসলে খুনী বাহিনী—নরহত্যা করার জন্যেই নিযুক্ত। হিটলার-পূর্বযুগ অবধি পররাজ্য গ্রাসকারী খুনী-লুটেরাই জগতে শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক বীর। সাইরাস থেকে নেপোলিয়ন অবধি সব নরহন্তাই নরবন্দিত মহাবীর। কেবল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকেই লোকে যুদ্ধবাজদের ঘৃণা করতে শুরু করেছে। হাদিস অনুসারে রাজনীতিতে, দাম্পত্যজীবনে এবং বিবাদ মীমাংসায় মিথ্যাভাষণে দোষ নেই।-(তিরমিজি) শুধু শাস্ত্রের সম্মতি নয়, অন্য আপ্তবাক্যের সমর্থনও রয়েছে—'There is nothing unfair in love and war এবং in war Truth is the first casualty. সমরে সত্যই প্রথম শহীদ। আর কে না বোঝে যে শাসক ও শাসিতে ব্যক্ত কিংবা অব্যক্ত দ্বন্দ্ব, বাক্‌যুদ্ধ কিংবা সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র লড়াই সর্বদা চলছে। অতএব, সরকারকে মিথ্যাশ্রয়ী হবার জন্য দোষ দেয়া যায় না। তাই ন্যায়নীতি ও রাজনীতি কখনো অভিন্ন নয়। সাধারণে যা দোষ, শাসকে তাই-ই গুণ।

জানিনে এর মধ্যে হয়তো গভীর তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে। কারণ দেখা গেছে, ন্যায়নিষ্ঠ বিবেকবান হৃদয়বান সদাচারী সংযমী রাজা-বাদশাহ প্রায়ই দুর্বল বলে প্রমাণিত হয়েছেন; এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দমনে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অনেক সময় রাজ্য হারিয়েছেন। হৃদয়বান লোক নিষ্ঠুর হতে পারে না, তাই ত্রাস সৃষ্টি করতে জানে না। বিবেকবান লোক শঠের মোকাবেলায় শঠ হতে অসমর্থ, তাই শঠের কাছে হারে। ন্যায়নিষ্ঠ লোক ছলচাতুরী প্রয়োগে কার্যসিদ্ধি করতে অক্ষম, তাই প্রবলের প্রতিপক্ষতার মুখে সে নিরুপায়। মিথ্যা তার মুখে আসে না, কাজেই মিথ্যা দিয়ে সে কারো মন ভুলাতে পারে না। সংযমী মানুষ সহিষ্ণু হয়, তাতে দুষ্ট লোক আশকারা পায়। তার সদাচার ভীরুতা, তার ক্ষমা দুর্বলতা, নরহত্যায় তার অনীহা অযোগ্যতা, তার নীতিনিষ্ঠা নির্বুদ্ধিতা বলে উপহাস পায়। কাজেই শাসক হওয়া তাকে সাজে না, প্রভুর আসনে তাকে মানায় না। এজন্যেই বোধ হয় সরকার মাত্রই সত্যভীরু! সরকার নিজেও সত্য বলে না। অন্যকেও বলতে দেয় না। সত্য গোপন ও মিথ্যাপ্রচার, দেদার আশা ও আশ্বাস দান, মনে মুখে অনৈক্য ও কথায় কাজে অসঙ্গতি এবং সরকারি স্বার্থে আইনের অপ্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহারই হচ্ছে রাজনীতি বা শাসননীতি। সরকারি প্রয়োজন মাত্রই ন্যায় ও বৈধ। তার সাথে জনস্বার্থের যোগ থাকুক আর না-ই থাকুক।

সরকারি নীতিতে অযুক্তিই যুক্তি, অন্যায়ই ন্যায়, অসত্যই সত্য, তাই সরকারের সকাল-সন্ধ্যার কথায় কিংবা কাজে কোনো পারম্পর্য, কোনো সঙ্গতি সামঞ্জস্য থাকে না। কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। মুখের উপর কারো কথা বলবার অধিকার নেই, চোখে আঙুল দিয়ে কেউ দেখিয়ে দিতে সাহস পায় না, তাই রক্ষা। বরং চাটুকার দিয়ে বলিয়ে নেয়, হাঁ এ-ই সত্য, খাঁটি সহি কথা, কাজ ও ব্যবস্থা। সরকার যেখানে সদাচার ও সততা পরিহার করার নীতিই সুষ্ঠু শাসনের মোক্ষম উপায় বলে জানে, সেখানে সরকারি কর্মচারীরাও দুর্নীতিকে রেওয়াজ বলে মানে। অথচ এরাই জন-সাধারণের তথা শাসনপাত্রের সততা দাবি করে। অসদুপায় ঢাকবার এ এক অদ্ভুত নমুনা—উৎকোচপ্রিয়, চোরাকারবারী যেমন গৃহভৃত্যের অসততা সহ্য করে না।

প্রতিবাদ মানে প্রভুর সার্বভৌম অধিকারে হস্তক্ষেপ, অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য, মারাত্মক বিদ্রোহ; তাই সরকার সমালোচনা সহ্য করে না। মুখে বলে বটে, জনগণের জন্যেই সরকার; আসলে সরকারের জন্যেই জনগণের স্থিতি। আরো বলে, সরকার হচ্ছে জনসেবক; আসলে জনশাসক। বলে, জনগণই রাষ্ট্রের মালিক; আসলে সরকারই প্রভু। সরকারি চাকুরেরা নামে চাকর বটে, কাজে মনিব। সরকারি জনপ্রতিনিধিরা খাদেম বলে আত্মপরিচয় দেন বটে, কিন্তু কার্যত মখদুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে কাঁধে বসেন। সবটাই যেন একটা লুকোচুরির ব্যাপার, কাপট্যের খেলা। তাই মনুষ্য-বাঞ্ছিত নীতির সঙ্গে রাজনীতির মিল নেই। মনুষ্যনীতির লক্ষ্য মেষ-স্বভাব অর্জন, আর কূটনীতির উদ্দিষ্ট হচ্ছে শিয়াল-নৈপুণ্যের প্রয়োগ। সরকার হচ্ছে মানুষের জান-মাল গর্দানের মালিক। অতএব সেই সরকার-প্রভুর প্রশংসা করো-বন্দনা গাও, প্রয়োজনমতো সরকারের হয়ে রাতকে দিন, দিনকে রাত বলো; তা হলেই তুমি অনুগত সুজন ও সুনাগরিক। খেতাব পাবে, চাকরি পাবে, পদোন্নতি হবে, আর অপকর্ম করবার, আইন ভঙ্গ করবার খোলা লাইসেন্স পেয়ে যাবে।

ঘরে-বাইরে রাজনীতি হচ্ছে ধূর্ততার খেলা। জুয়ারীর ঝুঁকি নিয়ে নামতে হয় এ খেলায় ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, ন্যায়, নীতি, সত্য—এই ষড়গুণাতীত হয়ে। 'হারি-জিতি নাহি ক্ষতি'র অঙ্গীকারে খেলা শুরু করতে হয়। মুখে রাখতে হয় মহৎ বুলি। ঠোঁটে মাখতে হয় মিষ্টি হাসি আর চোখ করতে হয় রাঙা।

কিন্তু তবু পতন রোধ করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাজতন্ত্রের যুগে নয় কেবল, নায়কতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রের কালেও প্রভুর করুণ ও আকস্মিক পতন-ধ্বনিতে পৃথিবী প্রায়ই প্রকম্পিত হয়। মেষের অমায়িকতার আবরণে শিয়ালের ধূর্ততার পুঁজি নিয়ে বাঘের লিপ্সা পূরণের নৈপুণ্য না থাকলে এ-খেলায় জেতা সহজ নয়।

মাস্টার মাত্রই যেমন মেষ নয়, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মোষও থাকে, যারা স্ববলে পদোন্নতির পথ করে নেয়; তেমনি রাজনীতিক মাত্রই শিয়াল নয়, দৈত্যের সাহস ও বাঘের বল নিয়ে কেউ কেউ দিকে-বিদিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়। বলের সঙ্গে তাই বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষিত হয় না। ফলে পতন হয় অনিবার্য।

ইতিকথায় ও ইতিহাসে এমনি বেপরওয়া অকুতোভয় জালিমদের আকস্মিক পতনের চমকপ্রদ কাহিনী রয়েছে অনেক। তাতেই মনে হয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন উঠতির শুক্লপক্ষের পরে পড়তির কৃষ্ণপক্ষ অনিবার্য। চোখের সামনে দেখছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে নরত্রাস হয়ে উঠেছে। বন্ধুর বেশে আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে হিতৈষী হয়ে প্রবেশ করে রক্তে আগুনে দেশটি রাঙা করে দিয়ে আততায়ী হয়ে ঘরে ফিরে। এ এক মায়াবী দানব। জানমাল দিয়ে তার হিতৈষণার দাম দিতে হয়। একবার ধরা দিলে তার ক্ষমতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তি নেই। রক্তবমি করিয়ে হাড়-মাংস গুঁড়ো করে দিয়ে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অবস্থা এমন করে দেয় যে যতই তার পীড়ন বাড়ে, ততই সে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। পঙ্গু করে দিয়ে প্রিয় হওয়ার এ এক অদ্ভুত মায়াবী নৈপুণ্য। তাকে ছাড়াও চলে না, সহ্য করাও যায় না। পৌরাণিক রাহুও বুঝি এমনি প্রাণঘাতী নয়, কেননা সেও একসময় নিষ্কৃতি দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অজগরের গ্রাসে দুনিয়াটাকে ধীরে নীরবে ও নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততায় গ্রাস করতে উন্মুখ। সাপের মতোই তেমনি শীতল মসৃণ মমতায় গভীর ও নিবিড়ভাবে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বেষ্টন করে অঢেল পয়সা দিয়ে সে মিত্র কেনে, হৃদয় দিয়ে বন্ধু করে না। তার বেনেবুদ্ধি দেয়া-নেয়ার চোরাকারবারে তাকে দেউলে করবে। সে সবাইকে দান দিয়েছে, এবার তার দাগা পাবার পালা। আনুগত্যের অঙ্গীকারে অর্থদানের এই নীতি শেষাবধি মার্কিন সরকারকে প্রতারিত করছে। সেই বিত্তধর বিশ্বমহাজন বীরবাহু বিশ্বত্রাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতুল প্রভাবে ফাটল আজ প্রকট হয়ে উঠেছে। এবার বুঝি তার কৃষ্ণপক্ষ শুরু হল। প্রতাপের উত্তাপ এবার থেকে শীতল হতে থাকবে। কথায় বলে : বাঘের বিক্রম বারো বছর। তা-ই বুঝি সত্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে করেই হোক, প্রবল প্রতাপ পীড়নপ্রবণ অত্যাচারী শক্তির পতন প্রায় ক্ষেত্রেই আকস্মিকভাবে ঘটে। তার প্রতাপ বাস্পের মতো উড়ে যায়, সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো হয় বিলীন। নিদারুণ নির্যাতনের শিকার দাস ইসরাইলরা নিরস্ত্র মূসার হাতে পেল প্রবল প্রতাপ ফেরাউনের কবল থেকে ত্রাণ। ফেরাউনও সসৈন্যে ডুবে মরল। অমন অপরাজেয় বীর গোলিয়থ প্রাণ হারাল ডেভিডের নিক্ষিপ্ত টুকরো পাথরের আঘাতে। পরাক্রান্ত আবরাহার চতুরঙ্গ বাহিনী ধ্বংস হল পাখীর ঠোঁট-নিঃসৃত নুড়ির ঘায়ে। দুনিয়াজোড়া পারস্যসাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল প্রজাপুত্র তরুণ আলেকজান্ডারের পদাঘাতে। দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সিজার জবাই হল কেবল তার অসহ্য ঔদ্ধত্যের জন্যেই। তিনটি মহাদেশ জুড়ে যে তুর্কি সাম্রাজ্য অটল গিরির মতো স্থিতি পেয়েছিল, তা কোথায় যেন ফুঁয়ে উড়ে গেল। বিজয়ী হয়েও ব্রিটিশকে সাম্রাজ্য ছাড়তে হল। জার-সাম্রাজ্য যখন কলেবরে স্ফীত হচ্ছে সেই সময়ে ঘটল তাঁর পতন। কে ভাবতে পেরেছিল অতুল বিক্রমশালী নেপোলিয়ন, হিটলার, মুসোলিনীর ঐ আকস্মিক পরিণাম! জাপান কি জানত তার স্বপ্নফল বিপরীত হবে!

আসলে বোধহয় শোষিত-নির্যাতিতরা সয়ে সয়ে এবং সরে সরে যখন দেয়ালে পিঠ পেতে দাঁড়ায়, তখনই পায় তারা প্রতিহত করার শক্তি। সে মরিয়া হয়ে প্রত্যাঘাত করে বলেই তা সহ্য করার শক্তি হারায় পরপীড়ক দানব। নিপীড়িতের এ শক্তি জনবল কিংবা ধনবলের ওপর নির্ভর করে না, মনোবলই এ শক্তির উৎস। ঐ আকস্মিক শক্তি চিরকাল সুপ্তই থাকে—তার উপরে থাকে ভীরুতার ও অসামর্থ্যের আবরণ,— কেবল চরম নির্যাতন মুহূর্তেই তা আগ্নেয়গিরির মতো উষ্ণ লাভা উদ্‌গীরণ করে ডুবিয়ে ভাসিয়ে দেয় পরিপার্শ্বকে। এই প্লাবনকে প্রতিহত করবার শক্তি কোনো মর্ত্যমানবের কোনোকালেই আয়ত্তে ছিল না, আজো নেই। তাই বোধ হয় বিসুবিয়াসের জ্বালা নিয়ে স্বল্পসংখ্যক মুক্তিকামী যখন রুখে দাঁড়ায় তখন প্রবলপ্রতাপ সম্রাটের চতুরঙ্গ বাহিনীও রণে ভঙ্গ দেয়। জল স্থল আকাশের প্রভুও পালায়। মুক্তিসংগ্রামীর পরাজয় নেই। পাখির ঠোঁট-নিক্ষিপ্ত পাথরকুচির ঘায়ে আবরাহার নিহত হাতির মতোই দুরাত্মা দানব হয় পর্যুদস্ত, তার দৌরাত্ম্যের হয় অবসান। তখন জনজীবন হয় অর্থবহ। শিশুর হাসি, নারীর রূপ, ফুলের রূপ-রস-গন্ধ, কবিতার মাধুর্য হয় জীবনে তাৎপর্যময়।

আকাশ ও পৃথিবী, মাটি ও মানুষ তখন আপন হয়ে আশ্রয় হয়ে ওঠে। তরুর ছায়া, নদীর মায়া হয়ে ওঠে জীবনের পোষক। জল হয় জীবন, বায়ু হয় বুকের ধন। আলো হয় দৃষ্টি, আঁধার হয় নিভৃত নিলয়, পণ্য হয় প্রাণ; প্রেম হয় পরশপাথর। প্রিয়া ও পৃথিবী, রূপ ও রূপসী, ভূমি ও ভূমা তখন একাকার। এ হচ্ছে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দান, মুক্তির প্রসাদ, আত্মত্যাগ ও রক্তের মূল্যে অর্জিত অক্ষয় ও প্রাণপ্রসূ সম্পদ; এজমালি হয়েও যা চাঁদ-সূর্যের মতোই প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। প্রাণরস দিয়ে সৃষ্ট জীবনরসের উৎস, প্রাণপদ্মের রক্তলাল সূর্য। জাগ্রত জনতার জয় রুখবে কে?

গণমানবের আহবে দুরাত্মা দানবের পরাভব অবশ্যম্ভাবী। তার প্রভাব প্রতাপ খর্ব হবেই। মুক্তি আসন্ন। সামনে নতুনদিন, পলাশলাল অরুণ পূর্বাশা রাঙা করে তুলছে। অতএব, মাভৈঃ। নেপথ্যে নবসূর্যের আশ্বাস শোনা যাচ্ছে : ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। কাজেই নাহি ভয়, হবে জয়। অতএব তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিষিদ্ধ চিন্তা

জীবনে সমাজে রাষ্ট্রে যা-কিছু সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের ও আনন্দের তা দ্রোহেরই দান। দ্রোহী মানুষই নতুনের, কল্যাণের উদ্‌গাতা ও প্রবর্তক। আজ জীবন, সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেসব অর্জিত সম্পদে আমরা আনন্দিত, যেসব লব্ধ চিন্তা-গৌরবে গর্বিত, যেসব আদর্শ-গর্বে আমরা ধন্য, যেসব প্রাপ্তি সুখে আমরা তুষ্ট, যেসব কৃতি সাফল্যে আমরা হৃষ্ট, তার সবগুলোই দ্রোহীর দান। আজ আমরা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তার আশু প্রতিষ্ঠা-স্বপ্নে বিভোর; মানবকল্যাণকর এসব আদর্শের রূপায়ণ-প্রয়াসে উদ্যোগী। কিন্তু এর প্রত্যেকটিই এক কালের নিষিদ্ধ চিন্তার ফল। এ চিন্তা উচ্চারণ করতে যেয়ে কত মানববাদী মানুষকে লাঞ্ছিত ও নিহত হতে হয়েছে, তার হিসেব নেই।

সনাতনী প্রতিবেশে যারা সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকে, তারাই নতুন চিন্তার ও নতুন কথার বৈরী। গৃহপতি ও সমাজপতি, শাস্ত্রধর ও দণ্ডধরেরাই নিজেদের নিরাপদ নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবনের ও জীবিকার বিঘ্ন স্রষ্টারূপে লাঞ্ছিত ও নিহত করেছে নতুন চিন্তার জনককে। নয়া চিন্তার ধারক, বাহক ও কথকরাও নিষ্কৃতি পায়নি। তবু চিন্তাবিদ্‌কে হত্যা করে কিংবা ধারক-বাহককে খতম করে চিন্তার বীজ নির্মূল করা যায়নি। সে বীজ দূর্বার মতো দুর্বার হয়েই বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। সে বীজ রক্তবীজ হয়ে তৈরি করেছে অসংখ্য মন। বায়ুর মতো প্রবিষ্ট হয়েছে অগণ্য বুকে, সাড়া জাগিয়েছে মুমূর্ষু প্রাণে। তবু উচ্চারিত চিন্তার-যে মৃত্যু নেই, বরং তার প্রসার ও বিবর্তন আছে, —এ সত্য আজো স্বার্থসচেতন লোভী মানুষ গায়ের জোরেই অস্বীকার করে। এবং ঐ ঔদ্ধত্যের পরিণাম-যে কখনো শুভ হয়নি, এ উপলব্ধিও লিপ্সাবশে ভুলে থাকতে চায়। তাই আজো জীবনে, সমাজে, ধর্মে, রাষ্ট্রে কোথাও স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশেরও ও প্রচারের অবাধে অধিকার স্বীকৃতি পায় না।

আগের যুগের যেসব নিষিদ্ধ চিন্তা ও নীতি আজকের মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা ঘুচিয়েছে, সেগুলোর গুরুত্ব-চেতনা ও কল্যাণকরতা আজকের মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষ—সেদিনকার গোঁড়া মানুষদেরকে অবজ্ঞা ও উপহাস করতে শেখায়। অথচ তারাই আবার ভবিষ্যতের মানুষের কল্যাণার্থে নতুন চিন্তার উদ্ভব ও লালন সহ্য করে না। অতীতের যে-মানুষের নির্বুদ্ধিতার ও রক্ষণশীলতায় তারা বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ, তারা নিজেরা অতীতের নিষিদ্ধ চিন্তার প্রসাদভোগী হয়েও অবিকল সেই মানুষের মতোই আচরণ করে। ফলে আজো নতুন চিন্তার জন্ম, লালন, পোষণ, প্রকাশ ও প্রচারের জন্যে বহুকাল ধরে বহু মানবের ত্যাগ, নির্যাতন, নিধন বরণ আবশ্যিক হয়েই রয়েছে। কারণ দুনিয়ায় লিপ্সু, ভোগী মানুষের সংখ্যাই সর্বাধিক। সুযোগ-সুবিধাকামী ও লাভ-লোভী মানুষ বিবেক-বুদ্ধির আনুগত্য করে না, তারা আপাতলভ্য বা লব্ধ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদ-সাচ্ছল্যের অনুগত হয়। তাই তারা সনাতনী ও স্থিতিকামী। পরিবর্তনকে তারা বিপর্যয় বলে মানে, তাই তারা নতুন-ভীরু ও প্রাচীন-প্রিয়। তারা আবর্তনকে নিয়ম ও নিয়তি বলে জানে, তাই বিবর্তনকে ভয় করে। তাই তারা যা আছে তাই নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে; যা নেই তা পাবার প্রয়াস করে না, পেয়ে দুঃখ ঘুচাবার বাসনা রাখে না। এরও কারণ মানুষও আর দশটি প্রাণীর মতো স্বভাবেই বেড়ে ওঠে। মন-মানসের অনুশীলনে ও পরিচর্যায় প্রাণিশ্রেষ্ঠ যুক্তিবাদী বিবেকচালিত মানুষ হয়ে উঠবার জন্যে সচেতন প্রয়াস করে না। কাজেই রিপুতাড়িত মানুষে সর্বজনীন শ্রেয়স্কর কিছু প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনাকে বরণ করার নামান্তর মাত্র।

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে মানুষ তাই অকারণে অমূল্য সম্পদ বলে মানে। নিরবধি কাল পরিসরে কখনো কখনো কোথাও কোথাও বিদেশী-বিজাতি-বিধর্মী-বিভাষীর শাসন কায়েম থাকলেও স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী স্ব-ভাষী, স্বদলের ও স্বমতের লোকশাসিত রাজ্য-রাষ্ট্র বিশ্বে কখনো বিরল ছিল না। তাই বলে মানুষ-যে স্বাধীন স্ব-রাষ্ট্রে সুখে-স্বচ্ছন্দে, নির্দ্বন্দ্বে নির্ভয়ে বাস করতে পেরেছে, তেমন কথা ইতিহাস বলে না। কারণ স্বাধীনতা স্বয়ং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নয়—সুখ, শান্তি, আনন্দ, আরাম অর্জনের উপায় মাত্র। স্বাধীনতার পুঁজি প্রয়োগে ঐসব কাম্য সম্পদ অর্জন করতে হয়। দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবুদ্ধি ও অধিকার-চেতনার উদ্ভব ঘটিয়ে সেই বোধগত জীবনের বিকাশ-প্রসার কামনায় উদ্যোগী মানুষই কেবল দায়িত্ব পালনে, কর্তব্য সম্পাদনে এবং অধিকার অর্জনে ও রক্ষণে সমর্থ। ঐসব গুণের উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের জন্যে ব্যক্তিজীবনেও আত্মদ্রোহমূলক সংগ্রাম প্রয়োজন। সে সংগ্রামে জয়ী হয়ে আত্মবিধ্বংসী রিপুকে বশ করতে হয়। তা হলেই স্বাধীনতার প্রসাদ, লাবণ্য ও শ্রী নিজের আয়ত্তে আসে।

অবশ্য ব্যক্তিমানুষের অধীনতার সীমা-সংখ্যা-মাত্রা নেই। ব্যক্তিমানুষ স্বভাবতই হাজারো বাঁধনে বদ্ধ। সে মনের অধীন, মেজাজের বশ, সে বিশ্বাসের পুতুল, সংস্কারের পিঞ্জর। সে লোভের বশ, ক্ষোভের শিকার। সে ঈর্ষার দাস, হিংসার পোষ্য ও ঘৃণার অনুগত। সে কামে আসক্ত, মোহে মুগ্ধ। সে মদে মত্ত, মাৎসর্যে অন্ধ। সে লিপ্সাতাড়িত ও লাভ-চালিত। সে ভয়ে ভীত, ত্রাসে ত্রস্ত এবং শঙ্কায় শঙ্কিত। সে লজ্জা-ভীরু ও ক্ষতি-কাতর। সে শাস্ত্রোক্ত পাপ-ভীরু, সে সামাজিক জীবনে নিন্দা-ভীরু; সে রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট শাস্তি-ভীরু। সে রীতির বন্দি, নীতির অনুগত ও শরমে সংকুচিত । বন্দিত্ব, দাসত্ব ও দুর্বলতা রয়েছে তার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে, রক্তে মাংসে জড়িয়ে। তাই সে স্বাধীন হতে পারেনা। কেননা কোনো বন্ধন—তা-'নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিংবা বিশ্বাস-সংস্কার-শরম-সংকোচের' হোক, অথবা রুচি-আদর্শের হোক, তার থাকেই। এমন মানুষ কখনো গতানুগতিকতা পরিহার করে নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের অনুগামী হতে পারে না। সযত্ন অনুশীলনে-পরিশীলনে-পরিচর্যায় ঐসব বৃত্তি-প্রবৃত্তি দমন ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। যারা অবহেলাপরায়ণ, যারা আত্মদর্শনে অক্ষম, আত্ম-জিজ্ঞাসায় অসমর্থ; তাদের নাগরিক স্বাধীনতা আত্মকল্যাণে প্রয়োগ মাত্রই তা সামাজিক-রাষ্ট্রিক অকল্যাণের নিমিত্ত হয়ে ওঠে।

সদাচারী মানববাদীর চিন্তা ও কর্ম সবসময়েই সামষ্টিক কল্যাণমুখী, তাই তারা মানবহিত-কল্পে নতুন করে ভাব, চিন্তা ও কর্ম উদ্ভাবনে নিষ্ঠ। মানুষের বৈষয়িক ও মানসিক উন্নয়ন উৎকর্ষ ওঁদেরই দান। জগতে চিরকাল ওঁদের সংখ্যা নগণ্য। জনবল ও গণসমর্থনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে স্বার্থবাজ দুরাত্মারা তাঁদেরকে লাঞ্ছিত ও নিহত করে তাঁদের বাণী স্তব্ধ করে দেয়ার প্রয়াস পায়। চিন্তাবিদ মরে, কিন্তু উচ্চারিত বাণী মরে না। কৃতকর্মও তার প্রভাব রেখে যায়। তাই তার ক্রিয়া মনুষ্যমনে ও সমাজে অদৃশ্যে মন্থরভাবে গভীর ও ব্যাপক হতে থাকে। একদিন সে-চিন্তা অধিকাংশকে আচ্ছন্ন করে এবং এমনি করেই নিষিদ্ধ চিন্তা স্বীকৃত তত্ত্ব, প্রমাণিত তথ্য ও গৃহীত সিদ্ধান্তরূপে সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে স্থিতি পায়। নির্বোধ গোঁড়া মানুষের ঔদ্ধত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যেই মানব-মনীষা যুগে যুগে অপচিত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই মনুষ্য-আরোপিত মানব-দুর্ভোগ আজো অবসিত হয়নি। মনুষ্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মানব-মনীষা অগ্রসর হয়নি আনুপাতিক হারে। অতএব, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার প্রসাদ পেতে হলে আগে বুনো মন-মেজাজকে পরিশীলিত বিবেকের অনুগত করতে হবে। তাহলেই দেশের মানুষ স্বাধীনতাপ্রসূত সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করতে পারবে এবং তা উপভোগের যথার্থ যোগ্য হবে। নইলে স্বাধীনতা তাৎপর্যহীন বুলি হয়েই থাকে। অন্ধ যেমন দিবারাত্রি বোধবিরহী, তেমনি বিবেকের প্রভাব মুক্ত মানুষও হিতাহিত বোধবিহীন।

স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিককে অবশ্যই মুক্তিকামী হতে হবে। সে মুক্তি চাইবে অশিক্ষা থেকে, সংস্কার থেকে, অন্ধতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অকল্যাণ থেকে, লিপ্সা থেকে, স্বার্থপরতা থেকে, অনুদারতা থেকে, অতীত-প্রীতি থেকে, স্থিতির মোহ থেকে। তাহলেই কেবল সরকার ও সাধারণ মানুষ কল্যাণকর নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম—সহ্য করার, গ্রহণ করার যোগ্য হবে। এবং তেমনি অবস্থাতেই কেবল ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে সংস্কার-মুক্তি ও গ্রহণশীলতা, আর্থিক জীবনে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব-চেতনা ও অধিকার বোধ, নাগরিক জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা ও সৌজন্য প্রভৃতি কাম্যবস্তু অর্জন সম্ভব হবে। এর জন্যেও নাগরিকের নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের অধিকার স্বীকৃত হওয়া আবশ্যিক। চিন্তা করবার, চিন্তা প্রকাশ করবার এবং প্রচার করবার অবাধ অধিকার যেখানে নেই, সেখানে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা থাকা না-থাকা সমান। কেননা বদ্ধকূপের জিয়ল মাছ হয়ে বাঁচা মনুষ্যস্বভাব নয়। তার চোখ সুমুখে, তার পায়ের পাতা সামনে, তাই তার গতিও সামনের দিকে, তার জীবনও তাই চলমান। কৃত্রিম উপায়ে গতি থামিয়ে দিলে তার জীবনও লক্ষ্যচ্যুত এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। জীবনে চলমানতা আসে নতুন চিন্তার প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে, নতুন অনুভবের প্রেরণায় এবং নতুন কর্মের উদ্যমে। সেই প্রেরণার উৎসমুখ বন্ধ করে দিলে বন্ধ্যাজীবন বিকৃত-বিশুষ্ক হয়ে বিড়ম্বিত হয়। সমকালীন ও ভাবী মানুষের এতবড় ক্ষতি আর কিছুতেই হয়না।

ইতিহাস-তত্ত্ব

মানুষের চিন্তা-ভাবনার কিংবা কর্মপ্রয়াসের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের বা ক্রমবিবর্তন ধারার তথ্যই ইতিহাস। এ দৃষ্টিতে মানব-অভিব্যক্তির সবকিছুরই ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত রয়েছে। এমনকি সৃষ্টির এবং প্রকৃতির পুষ্টি ও বিবর্তনধারার ইতিহাসও আছে। কিছু আগের কালের মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ব্যাপক ধারণা ছিল না। তাই আদিকালে মানুষ দেও-দেবতার কাল্পনিক ইতিবৃত্ত তৈরি করেছে এবং সামন্তযুগে তারা রাজরাজড়ার সন্ধিবিগ্রহ ও জয়-পরাজয়ের কাহিনীকেই কেবল ইতিহাস বলে মানত। সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবনপ্রবাহই-যে ইতিহাসের উপাদান ও উপকরণ, সে-বোধ জাগতে সময় লেগেছে কয়েক হাজার বছর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর আধুনিক যুগে সর্বপ্রকার মানব-অভিব্যক্তিকেই ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করবার গরজ মানুষের বোধগত হয়। কেননা ইতিহাস জানা মানার জন্যে নয়, প্রতিবেশের পরিপেক্ষিতে মানব-স্বভাব বোঝার জন্যে, শ্রেয়সকে আবিষ্কার করার জন্যেই। এর ফলে এ-যুগে কেবল দেশ-কাল-সমাজেরই ইতিহাস রচিত হয় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ধর্মদর্শনের, ভাবচিন্তার কিংবা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার মানবিক প্রয়াসেরই ইতিবৃত্ত রচিত হচ্ছে। কিন্তু ইদানীং পূর্বযুগ অবধি মানুষ রাজরাজড়ার কাহিনী-মুখ্য ইতিহাসকে প্রেরণার উৎস বলে জানত। এই মারাত্মক ভুল ধারণার বশে দেশে দেশে মানুষ জাতীয় কিংবা স্থানীয় ইতিহাস বিকৃত-তথ্যে পূর্ণ করে গৌরব-গর্বের আকর করবার চেষ্টা করেছে। ফলে সত্যসন্ধ মানুষের কাছে ইতিহাস 'Legends agreed upon' বলে নিন্দিত ও অবজ্ঞাত হয়েছে।

ইতিহাস কিংবা ঐতিহ্য কখনো প্রেরণার উৎস হতে পারে না। যদি তাই-ই হত, তবে গ্রিস-রোম-পারস্যের পতন হত না এবং ইতিহাস বা ঐতিহ্যের অভাবে দুনিয়ায় কোনো নতুন সভ্যতা-শক্তির উন্মেষও ঘটতে পারত না।

প্রেরণার আকর হিসেবে ইতিহাস তৈরি করতে যেয়ে মানুষ কেবল আত্মস্বার্থে ও স্বপ্রয়োজনে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে আর কামনা করেছে ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তাদের সে-বাঞ্ছা কোনোদিন সফল হয়নি। কেননা সত্য অতিরঞ্জিত হয়ে মিথ্যায় পরিণত হয় এবং বানানো তথ্য লোকপ্রিয় হলেও সত্য হয় না। কাজেই প্রতিজ্ঞা (Premise) যদি ভুল হয়, সিদ্ধান্ত (Inference) অসার-অসত্য হতে বাধ্য। স্বার্থবশে এতকাল মানুষ দেদার মিথ্যার বেসাতি করেছে, তাই ইতিহাস-পাঠ ফলপ্রসূ হয়নি। বরং ইতিহাস-পাঠে উত্তেজিত মানুষ কখনো কখনো কোথাও কোথাও ক্রোধবহ্নি ও অসূয়াবিষ ছড়িয়ে বৈনাশিক উল্লাসে মত্ত হয়েছে। তাই আজ অবধি মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাস রিপুপরবশ মানুষের রক্তস্নানের ইতিকথারই নামান্তর মাত্র। আসলে ইতিহাস প্রেরণার উৎস নয়, বরং তা এড়াবার জন্যেই ইতিহাস রচন ও পঠন প্রয়োজন। ইতিহাস-চেতনা জীবনে আবর্তন কামনা করে না, বিবর্তন ও অগ্রগতিই বাঞ্ছা করে। মানুষের জীবিকাগত ও রিপুগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ নিরূপণ এবং মনুষ্য-স্বভাব সম্পর্কে সতর্কতার ও তার সংশোধনের এবং তার উৎকর্ষের ও উন্নয়নের বুদ্ধি ও পন্থা লাভ লক্ষ্যেই ইতিহাসের রচন ও পঠন নিয়ন্ত্রিত হওয়া কাম্য। এই বোধের অনুগত হয়েই আজকের জ্ঞানী মনীষীরা ইতিহাসকে 'বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করেছেন এবং দেশকালগত মানুষের সামগ্রিক জীবনজিজ্ঞাসা, জীবিকাপ্রয়াস ও জীবনপ্রবাহগত আনন্দ ও যন্ত্রণাকে এবং সম্পদ ও সমস্যাকে ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাই আজকের ইতিহাস কেবল তথ্যের সংকলন নয়—শুধু লাভ-ক্ষতির পরিসংখ্যানও নয়, এমনকি ভূত-ভবিষ্যতের তৌলে মূল্যায়নও নয়, বিশ্বমানবিক সমস্যার আলোকে আন্তর্জাতিক কার্য-কারণ সূত্রের নিরিখে বিশ্লেষণাত্মক সিদ্ধান্তও।

অতএব, এ-যুগের কোনো আঞ্চলিক ইতিহাসও বিশ্ব-বিচ্ছিন্ন তথ্যের আকর হিসেবে অবাঞ্ছিত—একে বিশ্বসংলগ্ন হতেই হবে। আজকের সংহত বিশ্বে মানুষের ব্যক্তিক চিন্তা এবং কর্মও আপেক্ষিক। আজ তাই ইতিহাস রচকের বা পাঠকের কেবল ইতিহাসজ্ঞ হলেই চলবে না। তাঁকে আনুষঙ্গিক বিষয়েও অবহিত থাকতে হবে। কেবল সত্যসন্ধ ও তথ্যপ্রিয় হলেই ইতিহাস পড়ার বা লেখার যোগ্যতা বর্তাবে না, সে-সঙ্গে তাঁকে দেশকালগত সামাজিক, ধার্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক, প্রশাসনিক চিন্তা-চেতনা এবং লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও নৈতিক নিয়ম-রেওয়াজ সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে। এক কথায় সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের পটভূমিকায় সত্যসন্ধ তথ্যনিষ্ঠ প্রজ্ঞাবান ও কারণ-করণ বিশ্লেষণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বানই কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাস রচনার ও আলোচনার যোগ্য। তেমন মানুষই শুধু ইতিহাসপাঠের ফলশ্রুতি মানবিক সমস্যার সমাধানে সুপ্রয়োগ করতে পারেন।

দেশের ইতিহাস-প্রিয় ও ইতিহাসবেত্তা জ্ঞানী-মনীষীরা নিজেদের উদ্যোগে ও যোগ্য নেতৃত্বে আমাদের দেশের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বিস্মৃত, অর্ধ-বিস্মৃত, বিকৃত ও বিশৃঙ্খল ইতিহাসের আলো-আঁধারি ঘুচাবেন, অপসারিত করবেন আমাদের বিভ্রান্তি ও বিমূঢ়তা এবং ইতিহাস-বিজ্ঞান ও ইতিহাস-দর্শন প্রয়োগে সুপরিকল্পিতভাবে সামগ্রিক সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবনপ্রবাহের বিশ্লেষণমূলক যুগোপযোগী দৈশিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হবেন, তাঁদের কাছে এইটি আমাদের প্রত্যাশা নয় কেবল, দেশের গণমানবের স্বার্থে জাতীয় জীবনের স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজনে আমাদের দাবিও। আজকের দিনে মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যেই; বিশ্বমানবের সহাবস্থান, সহযোগিতা ও সর্বাত্মক কল্যাণের জন্যেই যথার্থ ইতিহাস-চেতনার বড় প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনে সংস্কৃতি ও কীর্তি সাফল্যের চিহ্ন এবং গৌরব-গর্বের অবলম্বন বলে ঐতিহ্য হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকে কিন্তু জাতির নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার কথাও স্মরণে না রাখলে কেবল গৌরব-গর্বের আস্ফালনের মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা পাওয়া যায় না, ফাঁকি দিয়ে অন্যকে প্রতারিত করা গেলেও নিজেকে প্রতারণা করা চলে না। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রত্যয় অকৃত্রিম হয় না, তাতে চোরাবালির উপর পা রাখার মতো জাতীয় জীবনে সংকট ও সম্ভাবনার মুহূর্তে বিড়ম্বনার, বিপর্যয়ের ও অসাফল্যের শিকার হতে হয়। এই জন্যই নবজাগ্রত স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রকৃত পরিচয় —তার বক্র ও বিচিত্র বিকাশ ও বিবর্তন ধারার ইতিকথা জানা ও জানানো আবশ্যিক।

এই ইতিহাসই দেবে জাতিকে প্রজ্ঞা-দৃষ্টি, দেবে আঁধার পথে আলোকবর্তিকার মতোই নির্ভুল পথের দিশা। ইতিহাসে লভ্য প্রজ্ঞাই হবে জন ও জাতীয় জীবনের পাথেয়। আগের যুগে এবং এখনো অনেক দেশে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারের আপাত স্বার্থে ইতিহাসের ঘটনা ও পরিণামকে বিকৃত করার রেওয়াজ চালু ছিল ও রয়েছে, কিন্তু এ বৃথা প্রয়াসের ফল কখনো ভালো হয়নি। মহাকালের অমোঘ নিয়মেই শেষ অবধি সত্যকে মিথ্যার আবরণে গোপন করা যায়নি। আমরা আশা করব আমাদের দেশেও সমকালীন তথা বর্তমানের ইতিহাস রচনায় কোনো সরকারি বাধা থাকবে না।

জিগির তত্ত্ব

জীবনের সর্বপ্রকার চেতনা জীবন-চাহিদা থেকেই-যে উদ্ভূত, তা গোড়াতেই স্বীকার না করলে জীবন ও জগৎ-ভাবনা সম্পর্কে সর্বপ্রকার ধারণা ও সিদ্ধান্ত ভুল হতে বাধ্য।

মানুষ আত্মকল্যাণেই প্রতিবেশ-উদ্ভূত সর্বপ্রকার সমস্যার ও অভাবের আপাত সমাধান ও পূরণ প্রত্যাশা করে এবং সেভাবেই জীবন-যন্ত্রণার আশু উপশম কামনা করে। গণপতি ও দলপতিরা তাই লোক-মনোরঞ্জক বুলি ও জিগির তুলে জনমত ও গণশক্তিকে সংহত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুনিয়ন্ত্রিত করে উদ্ভূত সমস্যার আপাত সমাধান দিয়ে নিশ্চিন্ত হন এবং আত্মম্ভর নেতা তাঁর মানস-প্রসূনকে চিরন্তন তত্ত্ব ও জীবন-সত্যের মর্যাদাদানে থাকেন উৎসুক। তাই কালান্তরেও বিভ্রান্ত জনতা মানসদ্বন্দ্বে ও বিমূঢ়তায় ভোগে।

ভারতের ইতিহাস থেকেই দু-চারটি দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। মারাঠা অভ্যুত্থানে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত মুসলিম রাজন্য স্ব-স্বার্থেই একদিন আহমদ শাহ্ আবদালীর সহযোগিতা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে একে মুসলিম সংহতির নিদর্শন বলে ভুল করা সম্ভব। কিন্তু পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পরিণামে সুবিধে হল কেবল ব্রিটিশেরই। আত্মবিনাশী ঐ যুদ্ধের পরে হীনবল রাজন্য আত্মরক্ষার শেষ উপায় হিসেবে স্বদেশ, স্বধর্মী ও স্ব-জাতির স্বার্থ উপেক্ষা করে আত্মকল্যাণে ইংরেজ-ফরাসির আশ্রয় ও প্রশ্রয় কামনা করে ত্বরান্বিত করেন নিজেদেরই বিনাশ। স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নে কেউ তখন পারস্পরিক সমঝোতা কিংবা আপসের কথা চিন্তা করেননি। স্বদেশ-স্বধর্মী প্রীতিও গেল উবে। আবার উনিশ শতকে ব্রিটিশ-প্রজা হিন্দু ও মুসলমান প্রথমে স্ব স্ব শাস্ত্রানুগত জীবনে চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মকল্যাণ কামনা করেছে। ফকির-সন্ন্যাসী-আর্যসমাজী-ব্রাহ্ম-ওহাবী-বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদ প্রভৃতি আন্দোলন তার সাক্ষ্য।

তারপর ব্রিটিশ-রাজত্বে অভিন্ন শাসকের বিরুদ্ধে যখন সমস্বার্থে একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হবার প্রয়োজন হল, তখন কিন্তু খাইবার পাস থেকে সিঙ্গাপুর অবধি বিস্তৃত ভুবনে জাত, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, ভাষা প্রভৃতি কিছুই যেন সংহতির পথে বাধা হয়ে নেই। তখন কেবল একটি জিগির—"বিদেশী তাড়াও।" আরও পরে যখন শিক্ষালব্ধ চেতনা একটু গাঢ় হল, তখন আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থচেতনা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সময়কার জিগির হল—"বিদেশীর সাথে বিধর্মীও তাড়াও।" হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগ এ ভূমিকাই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে।

তারপর পাকিস্তানে আবার একই আঞ্চলিক স্বার্থে জিগির উঠল—"বিভাষী তাড়াও।" ভারতের দাক্ষিণাত্যে ধ্বনিত হল নূতন জিগির—"হিন্দি হঠাও, গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব দাও।" আসামে, বিহারে জিগির উঠল—"বাঙলা খেদাও।" আর অন্য অঞ্চলে দাবি উঠল জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্যে স্বীকৃতির।

অন্যান্য অঞ্চলেও আঞ্চলিকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফলে, এককালের অখণ্ড ভারত ও অভিন্ন জাতি-চেতনা গেল মিলিয়ে। আর ঠাঁই নিল গোত্র-চেতনা, আঞ্চলিকতাবোধ, ভাষা-বিদ্বেষ ও স্বাতন্ত্র্য-প্রীতি। পাকিস্তানেও পাকতুন, বালুচ ও সিন্ধির ঐ একই দাবি। সবটাই জাগছে স্বার্থবুদ্ধি থেকে। সব বোধেরই উৎস হচ্ছে শাসন ও শোষণ-শঙ্কা। সব প্রেরণার উৎস হচ্ছে লাভের লোভ। তাই পাক-ভারতে একই জিগির—"ভাষাভিত্তিক গোত্রগত রাজ্য চাই।" ভারতে তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কেরালা, হিমাচল, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোল্যান্ড, মণিপুর প্রভৃতি এভাবেই গড়ে উঠেছে। তেলঙ্গনা, বিদর্ভ প্রভৃতিও গড়ে উঠবে। পাকিস্তানেও একই সমস্যা।

কাজেই যে-পরিবেশে অভিন্ন জাতীয়তার অঙ্গীকারে অখণ্ড ভারত-চেতনা জেগেছিল, সেই পরিস্থিতির অনুপস্থিতি খণ্ডভারতে অসংখ্য জাতি চেতনা জাগিয়েছে। সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে আপস না হলে বিচ্ছিন্নতা হবে অপ্রতিরোধ্য ও অবশ্যম্ভাবী।

ধর্মীয় অভিন্নতা ছিল বলে পাকিস্তানে শোষিত বাঙালীর জিগির ছিল—"বিভাষী হঠাও।" তার আনুষঙ্গিক ধ্বনি বা যুক্তি এল—ধর্মবিশ্বাস ব্যতীত বাঙালীর জাতি-বর্ণ, ভাষা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি আর সবকিছুই স্বতন্ত্র। ব্রিটিশ ভারতে এই বাঙালী মুসলিমই এইসব যুক্তিতে কখনো কান দেয়নি। কিন্তু ভিন্ন পরিবেশে ভাষিক ও গৌত্রিক চেতনার বাঙালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল উদ্বুদ্ধ। এ তাৎপর্যে ভারতীয় বাঙালীরা বাঙালী-জাতিভুক্ত। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে আবার রাষ্ট্রিক প্রয়োজনেই, রাষ্ট্রিক জাতীয়তার অঙ্গীকারে জাতীয়তাবোধ সীমিত করা জরুরি হয়ে উঠল। যাঁরা দ্বি-জাতিভিত্তিক পাকিস্তান-তত্ত্বটি ভুল বলেই ইদানীং উপলব্ধি করেছেন, তাঁরাও কিন্তু অখণ্ড ভারত আর কামনা করেন না। ধার্মিক দ্বি-জাতিতত্ত্বে আস্থা হারিয়েও তাঁরা ভাষিক জাতিতত্ত্বে আস্থা রাখেননি। অর্থাৎ স্ব-স্বার্থেই তাঁরা নাম পাল্টে স্বাতন্ত্র্যই কামনা করেন। আগে যা-কিছু করেছেন ধর্মের নামে, পরে যা করেছেন ভাষার নামে, তাই এখন রাষ্ট্রের নামে করছেন অর্থাৎ রাষ্ট্রিক জাতিতত্ত্বের যুক্তিতে স্বতন্ত্র জাতীয়তার অনুগত করছেন জীবনকে। কালান্তরে আজকের পরিবেশে এটি অবশ্যই শুভবুদ্ধিপ্রসূত। কিন্তু স্বার্থপরবশ মানুষের বিবেককে এ অসংগতি পীড়িত করে না। এ ঘন ঘন জিগির বদলানোর বিড়ম্বনা বিচলিত করে না বুদ্ধিকে। অখণ্ড ভারতওয়ালারা যেমন এখন খণ্ড-রাষ্ট্রের কামনায় উৎসুক, তেমনি সদ্যস্বাধীন বাঙলাদেশীরাও বিদেশী, বিধর্মী, বিভাষীর অভাবে আঞ্চলিক স্বার্থ ও সুবিধা-সচেতনতার প্রবণতা দেখাচ্ছে।

তার কারণ আসলে আর্থিক লাভ-লোভের ক্ষেত্রে মানুষ চিরকাল এমনি করে সজ্ঞানে কিংবা অবচেতন প্রেরণায় নতুন নতুন আবেগে তাড়িত হয়েছে এবং তার অনুকূলে যুক্তিজাল রচনা করেছে—উদ্দেশ্য সাধনে ও সাফল্য-বাঞ্ছায়। সম্পদ-নির্ভর জীবনে পাথেয়কামী পথিক কিংবা জীবিকা-সন্ধানী জৈব প্রবৃত্তিবশেই, প্রাকৃতিক নিয়মেই জীবনের দাবি স্বীকার করে। এবং উপযোগ-বুদ্ধির প্রয়োগে দ্বান্দ্বিক চেতনার টানাপড়েনে বিক্ষত হয়েও আপাতপ্রয়োজনে সাড়া দেয়। তাই চিরকাল মনুষ্যচিন্তা ও মনুষ্য-আচরণ দ্বন্দ্ব-সংলগ্ন, স্ববিরোধী ও বৈপরীত্যাভিসারী। এ-কারণেই যে-কোনো মনুষ্যচিন্তা কালিক ও স্থানিক এবং যুগান্তরে হৃত-উপযোগ আর স্থানান্তরে ও কালান্তরে সমস্যা ও যন্ত্রণার আকর। কেবল এই প্রত্যয়েই মানুষের ইতিহাসের বিবর্তন ধারার এবং সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের ব্যাখ্যাদান সম্ভব।

অতএব প্রায় জৈবিক প্রয়োজনেই স্থান-কাল-প্রতিবেশের প্রভাবে মানুষ কখনো প্রেমিক, কখনো হিংসুক, কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন, কখনো ত্যাগী, কখনো ভোগী, কখনো উদার, কখনো অসহিষ্ণু, কখনো গ্রহণোন্মুখ, কখনো বর্জনশীল, কখনো পোষক, কখনো শোষক। মনুষ্য-মনের ও আচরণের বিকাশ ও বিকৃতি—দু-ই অভিন্ন মূল। দ্বন্দ্ব-মিলন একই স্বার্থের প্রসূন। আজ অবধি জাত, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, শ্রেণী বা স্থানগত যত দ্বন্দ্ব-মিলন ঘটেছে, তার সবটাই জীবিকাগত—এ-যুগের পরিভাষায় আর্থিক শোষণ বা পোষণগত। কোনো না-কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অজুহাতে অথবা কোনো না-কোনো সচেতন বা অবচেতন জৈবিক প্ররোচনায় সন্ধি-বিগ্রহ জরুরি হয়েছে। যেমন একসময় 'বন্দে মাতরম' মুসলিম-কণ্ঠেও ধ্বনিত হত। তারপরে রাজনৈতিক অভিসন্ধিবশে তা ঈমানবিরুদ্ধ বলে পরিত্যক্ত হয়। এখন আবার রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে দেশ ও দেশমাতৃকার বন্দনাগানে বাঙালী মুসলিম মুখর।

অতএব, যে-কোনো জিগির বা যে-কোনো দ্বন্দ্ব-মিলনের মূলে রয়েছে স্থানিক, কালিক, সামাজিক ও ব্যক্তিক প্রয়োজন ও সাময়িক যৌক্তিকতা। গণমনে আবেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়োজনেই তাতে আত্মিক ও আদর্শিক মাহাত্ম্য, মহত্ত্ব ও গুরুত্ব দেয়া হয় মাত্র। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীর চোখে তাই এগুলো ঐতিহাসিক বিবর্তন বা আবর্তনতত্ত্বরূপে গুরুত্বপূর্ণ হলেও মানব-মহিমার বা মানবিক মূল্য-চেতনার পরিচায়ক নয়। কাজেই স্থায়ী মানবকল্যাণ ও স্থায়ী মূল্যবোধ এতে অনুপস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিহাসে তাই আমরা বহু পুরোনো জাতি ও রাজ্যের জন্ম-মৃত্যু প্রত্যক্ষ করি। প্যাগান রোমক জাতি কিংবা হলি রোমান এম্পায়ার কাল-পবনে মিশে গেছে। বাবিল-আসিরীয়-কল্‌ডীয়-কপ্ট কিংবা শক-হুন-কুশান গোত্রের পরিচয় আজ নিশ্চিহ্ন। চোখের সামনে জার্মানি, কোরিয়া, ইন্দোচীন, মালয়, আরবভূখণ্ড খণ্ডিত বা দ্বিখণ্ডিত। আবার নাইজেরিয়া, ফরমোজা, আয়ারল্যান্ড, ইথিওপিয়া ও কাশ্মিরের বেলায় অন্য তত্ত্ব, ভিন্ন নীতি ও বিচিত্র যুক্তি স্বীকৃত।

কাজেই স্বার্থে স্বজাতিও শত্রু হয়, স্বদেশীয়ও হয় পর, স্বভাষী কিংবা স্বদেশীও হয় পরিহার্য। ব্যক্তিক, জাতিক কিংবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাই গরজ ও বিবেকের দ্বন্দ্বে, স্বার্থ ও যুক্তির সংঘাতে, লাভ ও ন্যায়ের মোকাবেলায় সাধারণত সাময়িক গরজ, স্বার্থ ও লাভ-লোভেরই জয় হয়।

স্বদেশ থেকেই এবার গরজের দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। পাকিস্তানে বাঙলা ভাষাকে শব্দে, বানানে ও বর্ণে বিকৃত করে এবং রবীন্দ্রনাথকে বিতাড়িত করে বাঙালীর জাতি-চেতনা ভোঁতা করে দেয়ার চেষ্টা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রয়োজনে। এ নীতি নতুন ছিল না। গ্রিক সাম্রাজ্যবাদ কিংবা তারও আগে থেকেই সাম্রাজ্যবাদীরা এ নীতি-নিয়ম চালু করেছিল এবং শাসিতরাও দুর্বলতাবশে চিরকাল তা প্রায়ই মেনে চলেছে। শাসকের ভাষা চিরকালই শাসিতের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়েছে। এতে কোনো কোনো শাসিতের দুর্বল ভাষা চিরকালের মতো লোপ পেয়েছে—যেমন লোপ পেয়েছে বাঙালীর গোত্রীয় অস্ট্রিক ভাষা, যেমন নিশ্চিহ্ন হয়েছে কপ্ট ভাষা, যেমন দেশচ্যুত হয়েছিল হিব্রু ভাষা।

পাকিস্তান আমলে তাই আমাদের জাতিসত্তা অক্ষত রাখার গরজে আমরা রবীন্দ্রাশ্রয় কামনা করেছি। বিদেশী বিভাষীর হামলা এড়ানোর জন্যে রবীন্দ্রদুর্গ ছিল সেদিন প্রায় অভয়শরণ। সেজন্যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত রাখার সংগ্রামে নেমেছিলাম। আজ স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবর্তিত পরিবেশে আমরা সমাজতন্ত্রের অঙ্গীকারে জীবন শুরু করেছি। এ সময় আমাদের সামাজিক-বৈষয়িক জীবন-চেতনার ও প্রেরণার প্রতিকূল, অকল্যাণকর এবং প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ। তাই রবীন্দ্রনাথকে জানতে ও মানতে হবে ঐতিহ্যরূপে—সম্পদ হিসেবে নয়। আমাদের চেতনায় রবীন্দ্রনাথ আকাশচুম্বী গৌরব-মিনার হয়ে, আত্মার সমুদ্রসম আধার হয়ে, হিমালয়সম দিগন্তবিসারী ঐতিহ্য হয়ে থাকবেন, কিন্তু সমাজবাদীর নিশ্চিত আশ্রয় কিংবা কেজো সম্পদ হয়ে নয়। আগেরও এরকম নজির রয়েছে।

বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ আবির্ভূত নন। ১৮৬১ সনে তাঁর জন্ম। ১৯৪১ সনে তাঁর মৃত্যু। পাকিস্তান তৈরির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ১৯৪০ সনে রবীন্দ্রনাথের সামনেই। ১৯৪৭ সনে প্রতিষ্ঠিত হল পাকিস্তান, তখন রবীন্দ্রসাহিত্য সামনে রেখেই রাম-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিহার করার জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম করেছিলাম আমরা। আবার ১৯০৫-১১ সনে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা-প্রবন্ধ-গান মুসলমানদের প্রভাবিত করেনি, ষাট-সত্তর বছর পরে তা প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়াল কেন—সে রহস্য বিশ্লেষণ করলেও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য হবে। আসলে বিভাষী শোষণে বিক্ষুব্ধ আমরা ভাষিক বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হয়েই মনের ও বাঞ্ছার প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করেছি রবীন্দ্র-বাণীতে। যেমন এ সময় নিজেদের মনের কথা খুঁজে পেয়েছি জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। তাছাড়া সমাজবাদ অঙ্গীকার করে যে স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু, তাতে রবীন্দ্রপ্রভাবই প্রবল ছিল বললে স্ববিরোধিতা প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ রবীন্দ্রনাথ সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, রবীন্দ্রপ্রভাব স্বীকার করে মানুষ শাস্ত্রীয় সমাজের অনুগত হয়, আর্থনীতিক সমাজ কামনা করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের দিনে আমাদের সামনে এমনি বাধা আরও রয়েছে, তার মধ্যে ব্রিটিশ আমলের 'উপমহাদেশীয়' ধারণা অন্যতম। দেশী মুসলমানরা যেমন প্যান-ইসলামের মোহবশে আরব-ইরানের সীমা অতিক্রম করে স্বদেশের মাটিতে মানসপ্রতিষ্ঠা পায়নি, স্বঘরে চিরকাল ছিন্নমূল প্রবাসীর বিড়ম্বিত জীবনযাপন করেছে; তেমনি বাঙালীরাও দুহাজার বছর ধরে উত্তর-ভারতকেই তার শ্রেয়সের আকর বলে জেনেছে। ফলে সে কখনো স্বভূমে স্বস্থ হতে পায়নি। তার ঐ মিথ্যা জ্ঞাতিত্ব-চেতনা তার পক্ষে কখনো কল্যাণকর হয়নি, মরীচিকা-প্রবঞ্চিতের বিড়ম্বনাই কেবল সে পেয়েছে। বাঙলাদেশ যে ভৌগোলিক অবস্থানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত, তা আজ আত্মকল্যাণেই স্বীকৃত হওয়া জরুরি। আমাদের সামাজিক-বৈষয়িক-আর্থিক-রাজনৈতিক কারণেও তা আবশ্যিক হয়ে উঠেছে। সুদূর অতীতেও বাঙালীরা ঐ দক্ষিণ-পূর্ব দিকেই আত্মকল্যাণ খুঁজেছে। আত্মবিকাশ ও বিস্তার কামনা করেছে ব্রহ্মদেশে-শ্যামে-মালয়ে শ্রীবিজয়ে বা ইন্দোনেশিয়ায়। অস্ট্রিকরা বাঙলায় একদিন এসেওছিল ঐ পথ ধরেই। উত্তর-পশ্চিম ভারত বা এশিয়ার সঙ্গে আমাদের ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক যোগ চিরকালের বটে, সে ঐতিহ্য-চেতনা ও সংযোগসূত্র বৈষয়িক-রাজনৈতিক জীবনে আমাদের পক্ষে কখনো কল্যাণকর হয়নি। আমাদের জাতিসত্তা সেই মোহবশে স্বতন্ত্র বিকাশের সুযোগ পায়নি। উত্তর-পশ্চিম এশিয়া আজ আমাদের আর কিছুই দিতে পারে না। বর্ধিষ্ণু জনতার এই দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজে, এই দেশের মানুষের বেঁচে-বর্তে থাকার প্রয়োজনেই আমাদের মুসলিম আরব-ইরান মোহের মতো উপমহাদেশীয় জ্ঞাতিত্ব ও অভিন্ন সত্তামোহ ত্যাগ করতেই হবে। সে-সুবুদ্ধি যত দ্রুত জাগে ততই মঙ্গল।

প্রশ্ন উঠতে পারে নামে কী আসে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে—নাম বদলের পরিণামও মারাত্মক কিংবা শুভঙ্কর হতে পারে। যেমন, ব্রিটিশ-শাসনকে কেউ কখনো খ্রিস্টান শাসন বলেনি, কিন্তু ইংরেজ আমলে তুর্কি-মুঘল শাসনকে মুসলিম-শাসন বলে চিহ্নিত করার ফলেই হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিষময় হয়ে অনেক দুর্ভোগ ও রক্তস্নানের কারণ হয়েছে। তুর্কি-মুঘল নাম ব্যবহৃত হলে ওদের নিন্দা-কলঙ্ক দেশী মুসলিমের গায়ে লাগত না, হিন্দুরাও প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হত না, ব্রিটিশ আমলের পরে যেমন হইনি দেশী খ্রিস্টানের প্রতি।

গোড়ায় গলদ

জীবন সম্পর্কে শ্রেয়স্কর মতবাদই ধর্ম। এবং এই মতবাদের তাত্ত্বিক ও আচারিক নির্দেশাবলিই হচ্ছে শাস্ত্র। কাজেই ধার্মিক মাত্রই সজ্জন হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাকে তেমন দেখিনে কেন? ধর্মবোধ যখন একটা মতবাদ, বোধ-বুদ্ধিই তার ভিত্তি হওয়া উচিত এবং আচারও শ্রেয়স্কর সচেতন লক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মানুষের ধর্মাচার দেখে শেখা এবং ধর্মবোধও শুনে পাওয়া সংস্কার মাত্র। কৃচিৎ কারো জীবনে ধর্মবোধ সাধনালব্ধ। ফলে অনুকৃত আচার ও শুনে-জানা তত্ত্ব ও জ্ঞান শৈবালের মতো কেবল বোধ-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই আমাদের পরিচিত ধার্মিক মানুষ মাত্রই এক একজন তোতাপাখি কিংবা কলের পুতুল। এই যান্ত্রিক মানুষ সমাজের সম্পদ নয়, সমাজের জগদ্দল পাথর। সমাজের তার অস্তিত্ব সর্বক্ষণ দৃশ্যমান কিন্তু তার অবদান অদৃশ্য। সমাজে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টিতে, স্বাতন্ত্র্যরক্ষায়, পুরোনো প্রীতিতে, নতুন ভীতিতে, স্থিতিকামনায়, গতিবিরূপতায় বলতে গেলে তার জুড়ি নেই। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট পথিক, তত্ত্ববিচ্যুত মরমী ও রেওয়াজের অনুবর্তী আচারিক সমাজে বোঝা হয়ে, বাধা হয়ে কিন্তু মাকালের রূপ নিয়ে ও সজ্জনের মর্যদা নিয়ে শোভা পায়। তার বহিঃরূপ আত্মিক স্বরূপের প্রতিরূপ বলে প্রতিভাত হয়। এই প্রাতিভাসিক রূপটাই অকল্যাণের উৎস। কেননা এটিই সাধারণ্যে ধার্মিকতা বলে পরিচিত। তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনাবিচ্যুত আচার যে পচাদ্রব্যের মতোই অস্বাস্থ্যকর, তা সাধারণের চোখে কখনো ধরা পড়ে না, বিশেষত ধার্মিকে যখন নিষ্ঠার অভাব নেই এবং কাপট্য অনুপস্থিত, তখন তাকে অস্বীকার করবার কিংবা তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার কারণ থাকে না। তার সব নিষ্ঠা, সাধনা ও সদিচ্ছা যে বোধের অভাবে অর্থহীন ও পণ্ড হয়, তা কখনো চক্ষুগ্রাহ্য করার জো নেই। তাই যুগ যুগ ধরে এই বিভ্রান্তি ও বিড়ম্বনা সগৌরবে চালু থাকতে পেরেছে এবং হয়তো চিরকাল পারবে।

যথার্থ ধার্মিক মানুষমাত্রই পাপী-তাপী-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষের বন্ধু ও অভয়শরণ হওয়ার কথা। কিন্তু আমরা তথাকথিত ধার্মিকদের এ-গুণ দেখিনে। ধার্মিকের দুর্বুদ্ধিপ্রসূত উত্তেজনা দুনিয়াতে মানুষের যত বুকের রক্ত ঝরিয়েছে, এমনটি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও সম্ভব হয়নি। ধার্মিক জিতেন্দ্রিয় হবে, রিপুর প্রভাব সংযত রাখবে— এ-ই মানুষ আশা করে। কিন্তু অভিপ্রেত মানুষ চিরকালই দুর্লভ দুর্লক্ষ্য রয়ে গেছে। ধর্মনীতির তাৎপর্য ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করবে তেমন মানুষের সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পাবে তেমন ভরসা পাওয়ার কারণ বড় ক্ষীণ। বরং ভরসার ইঙ্গিত রয়েছে অন্যত্র। আজকের দিনে নাস্তিক, সংশয়বাদী ও মানববাদীর সহিষ্ণুতাই মনুষ্যসমাজে নিরাপত্তা ও স্বস্তিদান করেছে। এমন মানুষের সংখ্যাধিক্যে মানুষের সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক জীবনে সুদিন আসবে।

মগ্নচৈতন্যের এক কর্তব্য-বুদ্ধি মানুষকে শাস্ত্রের অনুগত করে। কিন্তু তা জীবনের তাৎপর্য-সচেতনতাবিরহী বলে যান্ত্রিক আচরণে পরিণতি পায়, ফলে তা অনুদারতা, অসহিষ্ণুতা ও ভেদ-বুদ্ধির জন্ম দেয়; ধর্মবুদ্ধির ও শাস্ত্রানুগত্যের এই গোড়ার গলদ মানুষের জীবনের সব বৃহৎ আদর্শ ও সম্ভাবনাকে বীজে বিনষ্ট করে। ধার্মিকের এই ত্রুটি অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত বলেই তা কখনো সংশোধিত কিংবা বিমোচিত হবার নয়। তাই ধার্মিককে আমরা কখনো তার ইপ্সিত ভূমিকায় ও অভিপ্রেত সত্তায় পাব না। ধার্মিকের মৌল লক্ষ্য—মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। জীবনকে যথাসাধ্য পুষ্পিত ও ফলবন্ত করাই উদ্দেশ্য। মানুষের সমাজে তার স্থিতি মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে। মানুষকে প্রীতিদান ও মানুষের প্রতি অকপট শুভেচ্ছাই তার ধার্মিকতার প্রসাদ। এমনি যথার্থ ধার্মিক সমাজের অভিভাবক এবং নিরাপত্তার ও শান্তি-স্বস্তির প্রহরী আর মনুষ্য-মহিমার প্রতীক। কিন্তু এমন ধার্মিক দুর্লভ। কেননা তারা ধর্মের আচারিক তাৎপর্য ও নির্দেশের ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তত্ত্ববিরহী আচার এবং আচারবিরহী তত্ত্ব-চেতনা—দু-ই বৃথা ও ব্যর্থ, প্রখ্যাত সাধক সন্ত কবীরের উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য :

প্রেমের রঙে মন না রাঙিয়ে কাপড় রাঙাল যোগী
আহার বিহার ত্যাগি তাহার সাজিল নেহাত রোগী।
জীবে না তুষিয়া, শিবে না ভজিয়া পাথর পূজিল গৃহী
প্রেম না দিয়া দিল ধুপ দীপ, দিল ফলমূল ব্রিহী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি, জীবন সম্পর্কে শ্রেয়স্কর মতবাদই ধর্মশাস্ত্র। এই মতবাদ নানা মানুষে নানারূপ। এই বিভিন্নতা সত্ত্বেও ধার্মিকে ধার্মিকে দ্বন্দ্ব হওয়ার কথা নয়। কারণ যথার্থ ধার্মিক—প্রেমিক ও সহিষ্ণু না হয়ে পারে না। প্রসন্নদৃষ্টিতে বিধাতার সৃষ্টির বৈচিত্র্য ও আপাত-অসঙ্গতির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধির চেষ্টাই হচ্ছে তার সাধনা। বিস্মিত মুগ্ধ আপ্লুত চিত্তে মহিমময় কুশলী বিধাতার প্রতি তার আত্মনিবেদনই তার উপাসনা। বিধাতার সৃষ্টিকে ধার্মিক প্রসন্নদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবে—এই প্রত্যাশাই করে মানুষ। সৃষ্টির সবটাই সুন্দর নয়, সুসমঞ্জস্যও নয়; এতে ভাঙা-মরা-শুকনা-পচা-বন্ধুর সবকিছুই রয়েছে। এই আপাত-অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য বৈচিত্র্যের মধ্যে সঙ্গতির সামঞ্জস্যের ও কল্যাণের ইঙ্গিত আবিষ্কারই ধার্মিকের ব্রত ও লক্ষ্য। সমাজে তেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি প্রেমিক ধার্মিকই আবশ্যক। সাম্প্রদায়িক কিংবা দলীয় নেতারূপী শাস্ত্রবিদ ধার্মিক কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। ধার্মিকের কাছে মানুষ করুণা ও মৈত্রীর প্রত্যাশী-ঘৃণা-বিদ্বেষ কিংবা পীড়নের নয়; অথচ ধার্মিকরা প্রায়ই অভিভাবক ও শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াতে উৎসাহী। বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী হলেও যথার্থ ধার্মিকে ধার্মিকে বিরোধ থাকার কথা নয়। কেননা পথ ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য অভিন্ন, গন্তব্য এক। সবাই সেই পরমের কাঙাল, —তাঁর দয়ার ও দানের, তাঁর প্রীতির ও প্রসন্নতার প্রত্যাশী।

AMARBOI.COM

পৈশাচিক জিগীষা

মানুষের প্রবৃত্তির গভীরে নিহিত রয়েছে জিগীষা। সেই ভিনি-ভিডি-ভিচির প্রেরণা। আমি জানি, আমি পারি এবং আমি করি—এই গৌরব-গর্ব অর্জনে মানুষ সদা উন্মুখ। আবার জিগীষায় পরমাণুর মতো নিহিত রয়েছে অনন্যতার প্রশংসা প্রাপ্তির লিপ্সা। ঘরে- বাইরে পরিবারে সমাজে সর্বত্র নানা ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ তুচ্ছ কর্মে ও আচরণে মানুষ এই কৃতি-গৌরব প্রশংসা-সম্পদ ও কৃতজ্ঞতা-সুখ-সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই সুখ-সম্পদ-গৌরব বিচিত্রভাবে অর্জিত হয়—কখনো প্রীতি দিয়ে, কখনো প্রীতি পেয়ে, এমনিভাবে সোহাগ করে, সোহাগ পেয়ে, কেড়ে নিয়ে, সেধে দিয়ে, আত্মসাৎ করে, আত্মত্যাগ করে, সেবা দিয়ে, সেবা পেয়ে, মার খেয়ে, মার দিয়ে, উপকার করে, অপকার করে, মরে, মেরে, হেরে, জিতে, উদ্দেশ্যভেদে ও স্থান-কাল ব্যক্তির পার্থক্যে, বিভিন্ন সম্পর্কে ও অবস্থায় এবং ভিন্ন ভিন্ন রিপুর প্রবলতায়। সুখ-সম্পদ-গৌরব সম্বন্ধে ধারণাও বহু এবং বিচিত্র। কাজেই জিগীষাও বহু ও বিচিত্ররূপে মানবমনকে প্রভাবিত করে। বাহ্যত জরু-জমি-জওহর তজ্জাত ধন-মন-যশ প্রাপ্তির তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার বাঞ্ছাই জিগীষা। কিন্তু এতো যথার্থই বাহ্য। এই সরল পথে যে স্থূল জয় সম্ভব, মানুষের অন্তরের চাহিদা তার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, জটিল ও অধিক। হারিয়ে পাওয়া ও বিলিয়ে পাওয়ার তত্ত্ব আরো গভীরে নিহিত। এ তত্ত্ব স্বরূপে উপলব্ধি না করেও মানুষ এ পাওয়ার তাড়নায়ও প্রিয়-পরিচিতের কাজ করে চলেছে। কারো মুখে একটু হাসি ফুটাবার জন্য, কারো মনে একটু স্বস্তি দেবার জন্য, একটি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা পাবার জন্য, মানুষ অন্যত্র ছলচাতুরী-কৌশল প্রয়োগে কিংবা জোর-জুলুম করে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহে কিংবা কর্মসম্পাদনে অনুপ্রাণিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তবজীবনে এই জিগীষা চরিতার্থ করবার পথে বিধিনিষেধের বাধা আছে। শক্তি-সামর্থ্যেরও সীমা আছে, তাই মানুষ ক্রীড়ার মাধ্যমে এই জিগীষাবৃত্তির চরিতার্থতা খোঁজে। প্রতিপক্ষ পরমাত্মীয় হলেও মানুষ নিজের জয়ই কামনা করে, আবার এমনকি, চিত্তের গভীরে প্রিয়জনের অমঙ্গল কামনাও জাগে—তার ক্ষতির জন্যে নয়, কেবল প্রিয়জনের দুর্যোগ-দুর্ভোগের দিনে তার সেবা করে, তাকে সাহায্য করে, তার জন্যে ত্যাগ স্বীকার করে কৃতজ্ঞতার ও কৃতার্থমন্যতার সুখ অনুভবের জন্যে। এই জিগীষার মধ্যে কোনো মহৎ আদর্শ-উদ্দেশ্য নেই; আছে প্রবল আত্মরতি। এর প্রভাবে মানুষ অভিভূত, ফলে তার শ্রেয়বোধও হয় বিপর্যস্ত, অবলুপ্ত। তাই দুনিয়ার সর্বত্র মানুষ এই জিগীষা বা দিশাহারা জয়ের মালা চেয়ে চেয়ে প্রায়ই হার মানছে। এতে তার মনের ভুবনে ক্ষয়-ক্ষতি যা-ই হোক—ব্যবহারিক জগতে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে, সামাজিক রীতিনীতির লঙ্ঘনে বহু মানুষের জীবনে বিপর্যয়ও সৃষ্টি করে। শ্রেয়-চেতনা ও সার্থকতাবোধের এই বিকৃতি ও বিপর্যয়ে মানুষের ইতিহাস দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিকথার অন্য নাম।

আত্মকল্যাণই এই পরপীড়নের কারণ। অথচ ব্যক্তিক জীবনে প্রায় সবাই আস্তিক এবং তারা ধর্মশাস্ত্র মানে। শাস্ত্র হচ্ছে সার্বভৌম আসমানী শক্তির আনুগত্যের অঙ্গীকারে মানুষের পারস্পরিক ব্যবহার-বিধি বা জীবন-যাত্রানীতি। স্ব স্ব দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমায় আঘাত না দিয়ে এবং আঘাত না-পেয়ে স্ববৃত্তে অটল থেকে নির্বিঘ্ন জীবনযাপনই লক্ষ্য। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রথম ও প্রধান পরিচয় হচ্ছে—সে মানুষ। তার মানবিক দায়িত্ব গ্রহণের ও কর্তব্যকরণের প্রতিজ্ঞা পূরণার্থে স্বাধিকার সীমায় মানবিক গুণের ও বোধের বিকাশসাধন তথা মনুষ্যত্বে উত্তরণই সবার লক্ষ্য। অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে উত্তরণের জন্যে কারো শাস্ত্রীয় নীতি ইসলাম, কারো মুসাপ্রদর্শিত পদ্ধতি, কারো গৌতম-নির্দেশিত উপায়, কারো যিশু-প্রবর্তিত পন্থা কারো বা ব্রাহ্মণ্য-বিধি। অতএব মানুষের নাম, নিবাস ও বৃত্তির মতো এক্ষেত্রেও তাঁর পরিচয়ের অভিজ্ঞান— -সে মানুষ, আর লক্ষ্য মনুষ্যত্ব এবং সে লক্ষ্য অর্জনে তার সম্বল হচ্ছে তার মনোনীত নীতি-পদ্ধতি। প্রাণীর মধ্যে সে মানুষ, গন্তব্য তার মনুষ্যত্ব এবং তার বাহন তার মনোনীত শাস্ত্রীয় নীতি-পদ্ধতি। অথচ উদ্দেশ্য তার কবে হারিয়ে গেছে, সে উপায়কেই উদ্দেশ্য বলে জানে এবং লক্ষ্য বলে মেনে নিশ্চিন্ত। তাই স্ব স্ব উপায়ের শ্রেষ্ঠত্ব, গৌরব ও গর্ব জাহির করার প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালু রাখাই তার জীবনের মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই ধর্মদ্বেষণা ও বিধর্মী-বিদ্বেষের অবসান আজো দুর্লক্ষ্য। এর সঙ্গে জাত-বর্ণ-দ্বেষণাও যুক্ত। এবং সমাজের সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী মানুষেরা এই বিদ্বেষকে আর্থিক, বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক জীবনে পুঁজি হিসেবে কাজে লাগায়, আর রেষারেষি, কাড়াকাড়ি, মারামারিও হানাহানি চিরকাল জিইয়ে রাখে।

ফলে সংখ্যালঘু দুর্বল পক্ষ চিরকাল বঞ্চনা ও পীড়নের শিকার হয়ে দুর্বহ অভিশপ্ত জীবন অতিবাহনে বাধ্য হয়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে বোধে-বুদ্ধিতে মানুষ এত এগিয়েছে, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের ও উপভোগের এত সামগ্রী সৃষ্টি হয়েছে, সুখ-শান্তির জন্যে এত আয়োজন রয়েছে, কিন্তু তবু দুনিয়ায় দুর্বল মানুষের দুঃখ ঘুচল না।

দৈশিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবনেই জাত-জন্ম বর্ণ-ধর্ম-দ্বেষণা সীমিত নেই। আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক জীবনেও তা তার নখদন্ত নিয়ে অনুপ্রবিষ্ট। এখানেও সেই আত্মরতি ও জিগীষা ঐ দ্বেষণা ও পীড়নের রূপ নিয়ে প্রকটিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যদিও রাষ্ট্রনায়করা মুখে শ্বেতকপোত, কিন্তু স্বভাবে বাজ ও আচরণে বাঘ। তাই তাদের শাঠ্য-কাপট্য জোর-জুলুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো আবরণে ঢাকা থাকে না। এখানেও যার ধনবল ও অস্ত্রবল আছে তার অন্যায়, তার দুর্নীতি, তার জুলুমের সমর্থনে এগিয়ে আসে কৃপাজীবী-সুবিধাবাদী রাষ্ট্রগুলো-তাদের ভূমিকা সেই মোসাহেব চাটুকারের। জাতিসঙ্ঘ সংস্থার সভায় সেই সামন্তযুগের দরবারি আবহই বর্তমান। সেখানেও প্রবল শক্তিগুলোর প্রতিবেশী-সুলভ দ্বেষ-দ্বন্দ্বের খেলা ঈর্ষা-অসূয়ার সর্পিল প্রকাশ, সেই জিগীষার ক্রূর কুটিল অভিব্যক্তি। দলাদলিতে কন্ডুয়নের মতো যেন একটি আপাতসুখ আছে, তাই মানুষ অনেক সময় ঈর্ষা-অসূয়া ও জেদের বশে দলাদলিতে মাতে। এটি রাষ্ট্রিক সম্পর্কেও সর্বত্র প্রকট। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা গঠনে আদর্শিক সদুদ্দেশ্য থাকলেও আন্তরিক সদিচ্ছা সঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠাতা বৃহৎ শক্তিবর্গের যে ছিল না,তা গোড়াতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাদের ভেটো প্রয়োগের অধিকার দাবিতে। সেই থেকে বিবদমান দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে তারা যেরূপ বেদেরেক ব্যবহার করছে, তাতে অতিবড় আশাবাদীরও নিরাশ হতে হয়। পরিণামে তাদের এই নিষ্ঠুর খেলার শিকার হয় কোটি কোটি নিরীহ মানুষ যারা আত্মীয়-পরিজন নিয়ে রোগশোক দুঃখদৈন্যের মধ্যেও স্নেহ-মমতার নীড়ে জীবনে তিক্তমধুর স্বাদ পাবার প্রত্যাশী। শক্তির দম্ভে মত্ত এইসব বৃহৎ রাষ্ট্রনায়করা বিনাদ্বিধায় ঘর ভাঙে, দেশ ভাঙে, সুখের নীড়ে বিভীষিকা জাগায়। হত্যা-পীড়ন-অনটন তাদের খেলার হাতিয়ার। দু হাজার বছর ধরে দেশত্যাগী আওয়ারা ইহুদি এনে বসায় ফেলিস্তিনে হাঘরে ইহুদিদের প্রতি মানবিক মমতার উছিলায়। আদর্শের প্রতি আনুগত্যবশে যেমন তারা জার্মানি, কোরিয়া, ইন্দোচীন,আয়ারল্যান্ড, মেসোপটেমিয়া দ্বিখণ্ডিত করে, তেমনি ঐ নীতি-আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশেই ইরাক-কঙ্গো-নাইজেরিয়া-ভারত-ইথিওপিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রের অসন্তুষ্ট মানুষের গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকারে ও তাদের স্বাধীনতার দাবি সমর্থনে বৃহৎ শক্তিগুলো অসম্মত। আবার যুক্তরাষ্ট্রের কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার, রোডেশিয়ার সংখ্যাগুরু অধিবাসী কালো মানুষদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তারা উদাসীন। মানবতার সেবায়ও অবশ্য তাদের আগ্রহ কম নয়। জর-ঝড়-খরা-কম্পন-বিধ্বস্ত কিংবা দুর্ভিক্ষ-মহামারী-কবলিত মানুষের সেবায় তারা এগিয়ে আসে। কিন্তু মানুষকে সুকৌশলে ক্রীড়ার আনন্দে দুস্থ বানিয়ে পরে দুস্থ মানবতার সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়া যেন গরু মেরে জুতো দানের তত্ত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। আন্তরিকভাবে মানববাদী না হয়ে মানবতার প্রতি এই মমতা অভিনয়ের মতো দেখায়, এই প্রত্যয়হীন প্রয়াসে মানুষের স্থায়ী পরিত্রাণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

ইন্দোনেশিয়ায়, পাকিস্তানে সামরিক জান্তা দখলীকৃত সরকার বিদ্রোহ দমনের নামে পোকা-মাছি-পিঁপড়ে মারার মতো দানবীয় দাপটে গণহত্যা চালাল, কয়েক লক্ষ মানুষের রক্তে মাটি হল কাদা, নদী হল লাল, দেশ হল নরকঙ্কালে-করোটিতে আকীর্ণ। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউ নিষ্কৃতি পেল না। নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করল, ঘরবাড়ি পোড়াল, কোটি লোক প্রাণ নিয়ে দেশান্তরে পালাল। এক কথায় রক্তে আগুনে প্রলয়কাণ্ড ঘটাল, তবু তা বিশ্বরাষ্ট্রগুলোর কাছে অভ্যন্তরীণ শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষার নিয়ম-রেওয়াজমাফিক ব্যবস্থা মাত্র। গণহত্যা কখনো কারো ঘরোয়া ব্যাপার হতে পারে! নিজের সন্তানকেও তো হত্যার অধিকার মা-বাপের নেই। দেশের সরকার দেশের নাগরিকের শাসক বলে কি তার জানেরও মালিক! পরের ছেলেকে পথে পেয়ে সোহাগ করা চলে কিন্তু তাকে আঘাত করার অধিকার মেলে না। মঙ্গল করবার মানবিক আগ্রহ আর নির্যাতন-নিধনের দানবিক দৌরাত্ম্য দু'টোই কিন্তু জাতিসঙ্ঘের সমান সমর্থন পায়। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা যেন বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি-কূটনীতি খেলার জন্য তৈরী ক্লাব। অবশ্য রাজনীতিকদের নিষ্ঠুর খেলা চিরদিন এমনিভাবেই চলে। কিন্তু যখন মানববাদের মহৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলি আওড়াচ্ছে সবাই, তখন মানুষের জানমাল নিয়ে এই দানবীয় দৌরাত্ম্যে মানববাদীর বেদনা বাড়ে। আমাদের আপত্তিও এজন্যই। বাজের মতলব নিয়ে শ্বেত-কপোতের ছদ্মবেশে বিচরণ করতে থাকলে আশ্বাস-প্রত্যাশী প্রতারিত মানুষের যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে ওঠে। জাতিসঙ্ঘ সংস্থা বাহ্যত গড়া হয়েছে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, মানব-প্রয়োজন মিটানো ও মানবকল্যাণ সাধনই এর লক্ষ্য। এজন্য মানবাধিকার, সেবা, শিশু, স্বাস্থ্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, বিপদত্রাণ, শ্রমিকস্বার্থ রক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ উপসঙ্ঘ, সংস্থা ও পরিষদ রয়েছে। সর্বপ্রকার সদুদ্দেশ্য, সৎকর্ম ও হিতচিন্তার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। বিশ্বরাষ্ট্রগুলোর সমঝোতার ভিত্তিতে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে জাতিসঙ্ঘ সংস্থা গঠিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রগুলোর প্রতিযোগিতা চলছে অস্ত্রসংগ্রহের ও নির্মাণের —এ কোন্ মহৎ মতলবে! কার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার জন্যে! জাতিসঙ্ঘের সদস্যরা তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহারের জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। পয়োমুখ বিষকুম্ভের মেসাল বুঝি এক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মানুষকে ভালো না বেসে মানববাদী হওয়া যায় না। মানবপ্রেমই মানুষকে মানববাদী করে। আর মানববাদী না হলে কারো পক্ষে কম্যুনিস্ট হওয়া সম্ভব নয়। কেননা দুস্থ মানবের প্রতি দরদই মানুষকে সমাজবাদী ও সাম্যবাদী হতে অনুপ্রাণিত করে। বাঙলাদেশে গণহত্যার ব্যাপারে চীন-যে কেবল উদাসীন ছিল তা নয়, সে জল্লাদ-সরকারকে হত্যাকাণ্ডে উৎসাহিতও করেছে সক্রিয়ভাবে। তা হলে কম্যুনিস্ট চীনের মানবদরদ কি ছলনা মাত্র! তাও নয়, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রেরও রাজনীতি-কূটনীতি আছে ; এটি সে-নীতিরই বাস্তবায়ন। ভারত-বিদ্বেষবশেই মুখ্যত পাকিস্তানের জল্লাদ- সরকারের সমর্থনে ও সাহায্যে এগিয়ে এসেছে চীন। কিন্তু খুঁটিয়ে-খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় হিতৈষীর বেশে দেখা দিলেও চীন পাকিস্তানেরও হিতকামী নয়। পাকিস্তানকে দিয়েই পাকিস্তান ভাঙার পথ তৈরি করেছে। কেননা তারা Self-help-এ স্বনির্ভরতার নীতিতে আস্থা রাখে, স্বাবলম্বনে ভরসা রাখে।

'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে' তত্ত্বে ও অঙ্গীকারে আস্থা রেখে কংসের রাজ্যে ভগবান কৃষ্ণের মতো কিংবা ফেরাউন-ঘরে মুসার লালনের মতো তারা দেশেই সরকর-বৈরী তৈরি করায়। সরকার-অনুষ্ঠিত হত্য কাণ্ডের পর বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী বাঙালী যে আপসহীন সংগ্রামের সংকল্প ও শপথ গ্রহণ করবে এবং তা যেমন গেরিলা পদ্ধতিতে হবে পরিচালিত, তেমনি তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা হবে সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত—এ অনুমান করা অসঙ্গত ছিল না।

কাজেই বাঙলাদেশে কম্যুনিজমের দ্রুত প্রসার লক্ষ্যেই চীন পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য দিচ্ছিল। তাছাড়া গণহত্যা কিংবা রক্তের বন্যা দেখলে সাম্রাজ্যবাদীদের মতো কম্যুনিস্টরাও বিচলিত হয় না। এ রক্তে হোলিখেলার দীক্ষা নিয়েই তাদের যাত্রা হয় শুরু। নরহত্যার মাধ্যমে নর-সেবার স্থায়ী সুযোগ করে নেয়াই তাদের নীতি। বিরুদ্ধ শক্তিতে হত্যা করে উচ্ছেদ করার নীতিতে তারা আস্থাবান। কাজেই বাঙলাদেশে তাদের নীতি-আদর্শের খেলাফ হয়নি। এখানেও সেই আত্মরতি! জিগীষার এ-ও আর-এক রূপ।

আসলে পুঁজিবাদী ও কম্যুনিস্ট বৃহৎ শক্তিগুলো নবতর সাম্রাজ্যবাদে আসক্ত। দুনিয়ার দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে তারা তাদের প্রভাবিত ও সংরক্ষিত তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে সচেষ্ট, যাতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের মতোই আর্থিক শোষণ চালু রাখা যায়। আদর্শবাদের নামে পর-প্রীতির আবরণে বিশ্বমানব-কল্যাণের অজুহাতে আত্মপুষ্টির এ এক আধুনিক উপায়। দুর্বল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রের মানুষ যে এ কপটতা না বুঝে তা নয়। কিন্তু তার দারিদ্র্য ও বলহীনতা 'রা' করার সাহস থেকেও তাকে বঞ্চিত রেখেছে। পৃথিবীর ঘরে ঘরে মানববাদীর সংখ্যা না বাড়লে এই উপদ্রব থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই দুর্বল দরিদ্রের। স্বার্থের ও লিপ্সার জগতে জিঘাংসা জিগীষার প্রায়ই নিত্যসঙ্গী। তাই আজকের জগতে দানবিক জিগীষা ও পৈশাচিক জিঘাংসা সর্বত্রই সহচর। আর এ প্রবৃত্তির শিকার হচ্ছে দুনিয়ার দুস্থ মানবতা। যারা বিশ্বাস করে এবং বলে 'মানবের তরে মাটির পৃথিবী, দানবের তরে নয়', তারা কিসের ভরসায় এবং কোন্ আশ্বাসে এ কথা বলে জানিনে। মানববাদী-সাম্যবাদী সাম্রাজ্যবাদী নায়কদের অন্তরের পৈশাচিক রূপ এবং আচরণের দানবিক দাপট দেখে মনে হয় না গণমানবের কখনো সত্যিকার জয় হবে, দেহে-মনে সে মুক্তির স্বাদ পাবে। যে-সুন্দর বিশ্বে সুন্দর মনের ও সচ্ছল জীবিকার স্বচ্ছন্দ জীবনের উদ্রিক্ত কল্পনাও স্বপ্ন নিয়ে দুনিয়ার দুস্থ মানুষ আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে ও ভরসায় বুক বেঁধে দিন গুনছে, তা কী কখনো সত্য ও বাস্তব রূপ নেবে! স্বপ্নভঙ্গের বিড়ম্বনা ও আশাহতের বেদনা এড়ানোর জন্যে অন্তত প্রত্যয় ও প্রত্যাশা রাখা যাক—শতাব্দীর সূর্য আমাদের প্রতারিত করবে না।

AMARBOI.COM

বিড়ম্বিত প্রত্যাশা

বর্ষণের পূর্বে যেমন মেঘাড়ম্বর আবশ্যিক, গাওয়ার আগে যেমন রাগ ও সুর নিরূপণ করতে হয়, তেমনি সর্বপ্রকার কর্ম ও আচরণের পিছনে থাকে ভাব, চিন্তা, চেতনা ও পরিকল্পনা। আগে পরিকল্পনা, পরে প্রকল্পের বাস্তবায়ন। আগে স্বপ্ন ও সাধ, জীবনে তার রূপায়ণ-প্রয়াস। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির যেমন প্রস্তুতি প্রয়োজন, তেমনি তা ভোগের জন্যেও যোগ্যতা দরকার।

আমরা যখন শোষণমুক্তি লক্ষ্যে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে যেয়ে নানা কারণ-ক্রিয়ার যোগসাজসে স্বাধীনতাই পেয়ে গেলাম, তখন আমরা প্রায়ই দিশেহারা। একপ্রকারের বিমূঢ়তা বা অভিভূতি আমাদের পেয়ে বসল। এ অভিভূতি আনন্দের নয়, বেদনার নয়, বিক্ষোভেরও নয়। এ হচ্ছে আকস্মিকতার অনুভূতি, অপ্রত্যাশিতের বিমূঢ়তা। গোড়ায় আমরা শোষণমুক্তি চেয়েছি, ন্যায্য ভাগ ও অধিকার দাবি করেছি, স্বাধিকারের সংগ্রামে মেতেছি অসূয়াতপ্ত চিত্ত নিয়ে। তাতে উত্তেজনা ছিল, উদ্দীপনাও ছিল; ছিল না কেবল সৃষ্টি-সম্ভব কল্পনা। যে প্রলয়ে নূতন সৃজন-সম্ভব, তা 'জীবনহারা অসুন্দরে' লয় করেই নবজীবনের উন্মেষ ঘটায় এবং সে জীবন দূর্বার মতো প্রাণের ঐশ্বর্যে দ্রুত আত্মপ্রকাশ করে ও আত্মবিকাশে চঞ্চল হয়ে ওঠে। আমাদের যে-স্বপ্ন ও যে-সাধ ছিল না, যা কৃত্রিমভাবে চিত্তলোকে জাগিয়ে তোলার মুহূর্তেই সিদ্ধি অভাবিতরূপে হাতের মুঠোয় এসে গেল, তখন সে স্বপ্ন ও বাস্তব এবং সাধ-সাধ্য ও সাধিত একাকার। মানস-প্রস্তুতি ছিল না বলেই আমরা এমন অচিন্ত্য সৌভাগ্যের মুহূর্তেও আকস্মিকতার শিকার হয়ে স্বাধীনতার মতো দুর্লভ ঐশ্বর্যের চেতনা, বিরল সম্পদের প্রসাদ অনুভবগত করতে পারলাম না। চিত্তলোকে যখন আকাঙ্ক্ষা জাগে এবং যখন তা জীবনস্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়, তখন তার বাস্তবায়নের সাধ জাগে, সে-সাধ ঐকান্তিক ও নিষ্ঠা হয়ে চরিত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংকল্পিক দৃঢ়তা আনয়ন করে। এমনিভাবে চরিত্র থেকে সংকল্প, সংকল্প থেকে শক্তি এবং শক্তি থেকে সিদ্ধি আসে। এটি আমাদের ছিল না। তারই ফলে আমাদের উল্লাসের মুহূর্তগুলো দ্রুত উবে গেলেও বিমূঢ়তা বা অভিভূতির ঘোর দুবছরেও কাটেনি।

যারা নিতান্ত অবুঝ সেই অকপট নিরক্ষর গণমানুষ কারো আহ্বানে কখনো ফেরুপালের মতো সমবেতকণ্ঠে উল্লাসধ্বনি তুলেই তুষ্ট ও তৃপ্তমন্য। কখনোবা কাকের মতো প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ। দুটোই ক্ষণিক ও সাময়িক এবং নির্লক্ষ্য ও পরিণামশূন্য।

সাক্ষর-সরল সাধারণ লোকেরা ঘরে-ঘাটে কখনো বিস্মিত, কখনো বিক্ষুব্ধ, কখনো আশ্বস্ত, কখনোবা ভীত-শঙ্কিত হয়ে চারদিককার চালাকির লীলা প্রত্যক্ষ করেও প্রাত্যহিকতার চাকায় নীরবে ঝুলছে।

সাক্ষর চালাকেরা ঐকতানিক তত্ত্বে নিষ্ঠ। ওরা কুশলী বহুরূপী। সময় ও সুযোগ জ্ঞানে ওরা জ্যোতিষীর চেয়েও পাকা। ক্ষণ-তিথি-লগ্নমাফিক ওরা ঝোপ বুঝে কোপ মারতে ওস্তাদ। লাভের-লোভের বশে ওরা প্রয়োজনমতো বোল ও ভোল পাল্টাতে পটু এবং ভেলকিবাজিতে অনন্য। সমাজে এদের সংখ্যাই বেশি এবং এদেরই দুর্নীতির শিকার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র। এদের অনুচর-অনুষঙ্গী রয়েছে অনেক এবং প্রতিদিন এদের দল যারা ভারী করছে, তারা স্বভাবে তোতাপাখি-অনুকারী। এদের দেশ-কাল-শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র কোনোটার প্রতিই কোনো বিশেষ আগ্রহ নেই-আত্মরতি ও আত্মসুখের খাঁচায় পোষমানা প্রাণ নিয়ে লাভ-লোভের উঞ্ছবৃত্তিতেই এরা তৃপ্ত। এরা ভয় দেখালে পিছু হটে, প্রশ্রয় দিলে আগ বাড়ায়।

মহৎ আদর্শ ও সুন্দর স্পৃহাহীন মানুষ এমনটিই হয়। সুষ্ঠু কল্যাণচেতনাবিরহী মানুষে অন্যকিছু প্রত্যাশা করাই বাতুলতা। কল্যাণমাত্রই যে সামগ্রিক, খণ্ড-কল্যাণ বলে যে কিছু হতেই পারে না—তা এ মানুষের বোধাতীত। তাই সব সাধারণ মানুষই আত্মকল্যাণে, আত্মসুখসন্ধিৎসায় ছুটছে, ঘুরছে, ছটফট করছে চিরকালই। কোনো মানুষই অলস উদাসীন হয়ে বসে নেই। বৈরাগ্যও নেই কারো মধ্যে। কেবল রুচিভেদে পথ-পাথেয় ভিন্নমাত্র। ফলে ব্যক্তিকল্যাণ-প্রেরণাপ্রসূত কাড়াকাড়িতে কেবল কল্যাণকর সম্পদ ছিঁড়ছে আর ভাঙছে, আর অকেজো হয়ে অপচিত হচ্ছে। ত্যাগের প্রেরণা আসে ভালোবাসা থেকে। ভালো না বাসলে সেবা ও ত্যাগের যোগ্যতা জন্মায় না। যারা আত্মরতিবশে ত্যাগের ভান করে ভাবী-ভোগের পুঁজি বিনিয়োগ করে, তারাই সুযোগ বুঝে আত্মপক্ষ সমর্থনেও আত্মস্বার্থ আদায় লক্ষ্যে বলে 'ত্যাগ করেছি বিস্তর, ভুগেছি অনেক—এখন জয়-অন্তে ভোগ করবার অধিকার আমারই। সিদ্ধি যখন এসেছে আমারই সংগ্রামে, তখন সাধ মিটিয়ে ভোগ করার দাবি আমারই।' এমন মানুষ জয়ের শেষে লুট না করে পারে না। অথচ ত্যাগ যার চরিত্রের অঙ্গ, চিত্তের সম্পদ, ভোগ তার বিষবৎ। ভোগীর ত্যাগী হওয়া সম্ভব, কিন্তু যথার্থ ত্যাগীর ভোগী হওয়া অসম্ভব। সাগরে বিচরণ যার, পুকুরে তার আকর্ষণ জন্মানো দুঃসাধ্য।

অতএব স্বাধীনতাপ্রাপ্তির মুহূর্ত থেকে আজ অবধি আমরা সবাই আকস্মিকতার শিকার। অপ্রস্তুতিপ্রসূত বিমূঢ়তা বা অভিভূতি আমাদের কাকেও করেছে লুটেরা, কাকেও করেছে ফেরু, কাকেও করেছে মর্কট, কেউ হয়েছে বায়স আর অন্যরা রইল নিরীহ। তাই কেউ সুখ পাচ্ছেও না, কাকেও দিচ্ছেও না। দেশজুড়ে লোফালুফি, কাড়াকাড়ি, ডাকাচুরি, হানাহানি চলেইছে। মার খাচ্ছে নিরীহরা। মানুষের প্রতি ভালোবাসা নেই, তাই সেবার ও ত্যাগের প্রেরণা নেই; দেশের মানুষের সামগ্রিক স্বার্থে কল্যাণকর কর্মের উদ্যোগ-আয়োজন নেই। খণ্ড ও ক্ষুদ্র স্বার্থে ততোধিক ক্ষুদ্র বুদ্ধি প্রযুক্ত হয়ে ব্যতিক্রম ঘটাচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের মধ্যে যারা অর্জিত বিদ্যার জোরে বুদ্ধিজীবী আখ্যার দাবিদার তাঁরাও চরিত্রানুসারে বিভিন্ন মতলবের। এঁদের কেউ সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। বোল ও ভোল পাল্টাতে, শক্তের ভক্ত হতে, জনপ্রিয় বুলি কপচাতে, প্রভুর সুরে সুর মেলাতে ও চাটুকারিতার সুনিপুণ অনুশীলনে তাঁদের জুড়ি নেই। চালের ভুলে কখনো লাথি বা লাঠি খাওয়ার অবস্থায় পড়লে ও হাসিমুখে অদৃষ্টকে সহ্য করে ও সারমেয়সুলভ উদারতায় আনুগত্য স্বীকারে তাঁরা আরো উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাঁদের জীবনদর্শনে এটিই আত্মশুদ্ধির প্রকৃষ্ট পথ। তাঁদের আমরা ভদ্র ভাষায় বলি 'সরকার-ঘেঁষা।' আর একদল আছেন তাঁরা হচ্ছেন সরকার-ভীরু—তাঁরা গা-পা বাঁচিয়ে চলতেই ব্যস্ত। কোনো ঝুঁকি নিতে নারাজ বলেই তাঁদের লাভের লোভও সামান্য। অনুগ্রহ পেলে বর্তে যান, না- পেলেও যা আছে তার নিরাপত্তার আশ্বাসেই তুষ্ট। তাঁরা নিরীহ সংজ্ঞায় পরিচিত। ক্ষতি করার সাহস তো নেই-ই, উপকার করার সামর্থ্যও তাঁরা রাখেন না। সে হিসেবে ওঁরা সমাজের দায়—অবাঞ্ছিত বোঝা। কেননা ওঁদের বহুল উপস্থিতি অন্যদের সাহস সঞ্চয়ে বাধাস্বরূপ। আর একদল আছেন, এঁরা সংখ্যায় চিরকালই নগণ্য। তাই বিরলতায় বিশিষ্ট। মনীষায় অনন্য না হয়েও এঁরা রেওয়াজ-বিরুদ্ধ বেসুরো বেমক্কা কথা বলেন বলেই সহজেই সমাজ-সরকারের নজরে পড়েন, এবং তাতেই এঁদের প্রভাব প্রতাপ প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তবু এঁদের ভিন্ন চিন্তা ও অনন্য সাহসের দৃষ্টান্ত লোকমানসে যে-আপাত দুর্লক্ষ্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, পরিণামে তা-ই সমাজে-রাষ্ট্রে পরিবর্তন আনে। এঁরা স্বকালে সমাজ, শাস্ত্র ও সরকার-শত্রুরূপে পরিচিত ও লাঞ্ছিত। কিন্তু কালান্তরে লোকবন্দ্য হয়েই লোকস্মৃতিতে অমর হয়ে থাকেন। এঁরা সাধারণত ন্যায়-নিষ্ঠ ও জনকল্যাণকামী। কিন্তু বিদ্যাপুষ্ট এসব বুদ্ধিজীবী কখনো সমাজে, শাস্ত্রে ও রাষ্ট্রে বিপ্লব-বিবর্তন আনিতে পারেন না। উত্তেজিত গণসমর্থন ভাঙতে সমর্থ হলেও গড়ার সাধ্য এঁদের থাকে না। কারণ এঁরা স্বদেশে ও স্বকালে স্বপ্রতিবেশ থেকেই চিন্তা-চেতনা লাভ করেন। অতীত এঁদের বিস্মৃত ঐতিহ্য, ভবিষ্যৎ এঁদের অজ্ঞাত-কামনা। যথার্থ মনীষাসম্পন্ন, বুদ্ধিজীবী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও চেতনাকে বোধিতে ও প্রজ্ঞায় উন্নীত ও সমন্বিত করতে সমর্থ। অবশ্য তেমন মানুষ কোটিকে গুটিকও মেলে না। হাজার বছরেও কোনো দেশে বা সম্প্রদায়ে তেমন মানুষ না জন্মিতে পারে। কেবল তেমন মানুষই নিকট-অতীতের প্রভাবের নিরিখে অদূর-ভবিষ্যতের প্রয়োজনের আপেক্ষিকতায় বর্তমান সমস্যার কারণ-ক্রিয়া বিশ্লেষণ ও সমাধান নিরূপণ করতে পারেন। এই সীমিত অথচ প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার তথা প্রজ্ঞার প্রসূন হচ্ছে আজ অবধি অর্জিত তাবৎ মানব-প্রগতি। আবার প্রজ্ঞার এই দৈশিক ও কালিক সাফল্য ও সার্থকতাকে আত্মরতিবশে চিরকালীন ও সর্বজনীন মানবিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান বলে চালিয়ে দেয়া ও গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে মানব-দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগের বীজ। বিশ্বাস-সংস্কার ও রক্ষণশীলতার মূলে থাকে ঐ চিরন্তনতায় আস্থার অনপনেয় প্রভাব।

আমাদের এই মুহূর্তের বুদ্ধিজীবীরা নিতান্ত সামান্য চিন্তা-চেতনায় নিবদ্ধ তো বটেই, তাছাড়া সরকার-ঘেঁষা এবং সরকার-ভীরুও। আর সরকার-শত্রু তো বিরল বটেই। কিন্তু এতেও নিয়মের ব্যতিক্রম উৎকট ও নৈরাশ্যজনকভাবে দৃশ্যমান। সবাই আকস্মিকতা ও অপ্রস্তুতির কবলগ্রস্ত। তাই বিলাপে, স্মৃতির রোমন্থনে, কৃতিত্বের আস্ফালনে, ভুলভাষণে, সত্য গোপনে, বিকৃত তথ্য পরিবেশনে কিংবা চাটুকারিতায় অথবা শঙ্কা-ত্রাসে তাঁরা দুবছর কাটিয়ে দিয়েছেন। যাঁরা নিজেদের স্বচ্ছ ও সুবিজ্ঞ দ্রষ্টা বলে জানেন, তাঁরা গতানুগতিক স্বরে ও সুরে পুরোনো চিন্তা-চেতনা নতুন করে পরিবেশনে ব্যস্ত। কেউ কেউ বিষয়বুদ্ধি বশে মামার জয়গানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখর। কেউ কেউ পর-প্রবঞ্চনার লোভে আত্মহননে লিপ্ত। আবার কেউ কেউ রুচিবিকারের শিকার। অনেকেই বক্তব্য নেই জেনেও বলতে উৎসুক। কৃচিৎ কেউ বিক্ষুব্ধচিত্তে গালি পাড়তে আগ্রহী। কিন্তু কোথাও নতুন দিনের সংবাদ, নতুন মনের পরিচয়, নতুন প্রতিবেশের প্রসাদ লভ্য নয়। এ নিশ্চিতই দুর্দিন। এ যেন রুগ্নদেহে জীর্ণবস্ত্রে স্বাস্থ্য ও সজ্জার গৌরব অনুভব করার মিথ্যা প্রয়াস।

প্রবুদ্ধ জাতির নবজাগ্রত আত্মসম্মানবোধই জাতীয় জীবনের নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন বিকাশ লক্ষ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। কাজেই নবতর চিন্তা-চেতনা, উদ্যোগ-আয়োজন স্বাধীনতার নিত্যসঙ্গী। উচ্ছল প্রাণময়তা, তীব্র বিকাশ-বাঞ্ছা, উজ্জ্বল দৃষ্টি, সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনা, মনন-বৈচিত্র্য ও চিত্ত-চাঞ্চল্যই সদ্যস্বাধীন জাতির বৈশিষ্ট্য। এসব গুণ আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত। অর্জিত সম্পদের গৌরব-গর্ব থেকে আমরা বঞ্চিত, প্রাপ্ত ঐশ্বর্যের দাপটদম্ভ আমাদের অবলম্বন। তাই আমরা মনে-মেজাজে একটুও বদলাইনি। নিকট-অতীতে যেমন আমরা আগে মুসলমান, আগে পাকিস্তানি ছিলাম,. এখন হয়েছি আগে বাঙালী। কখনো একাধারে ও একই সময়ে বাঙালী মুসলমান ও মানুষ হবার ইচ্ছা আমাদের জাগেনি। মানুষ হবার ব্রত কিংবা সাধনা আমাদের নয়। আমরা লাটিমের মতো আবর্তিত হচ্ছি—এগুচ্ছি না মোটেই। তবু মনে করছি বাঁকা রাস্তায় হলেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকছে। আমাদের বুদ্ধিজীবী সংস্কৃতিজীবীরা একসময় মুসলমান হবার তীব্র উৎসাহে ভাষায়-সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে-চিন্তায়-চেতনায় সাহারার চমক ও গোবির মায়াঞ্জন প্রলিপ্ত করে ইসলামি লাবণ্য সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। তারপর তাকেই পাকিস্তানি সুরমার প্রলেপে বর্ণাঢ্য করার অপপ্রয়াস চলে। এখন আবার সেই একই স্থূল বিষয়-বুদ্ধিবশে তারা একান্ত বাঙালী হবার উগ্র উত্তেজনায় চঞ্চল। এবং সেই সিদ্ধি লক্ষ্যে আরবি-ফারসি নাম-শব্দ-চিহ্ন বা তৎসম্পৃক্ত জ্ঞান-বিদ্যা-সংস্কৃতি বিমোচনে তারা তৎপর। এর মধ্যে কোনো কল্যাণবুদ্ধি কিংবা নবচেতনা নেই। সুবিধাবাদীর চাটুকার চরিত্র-লক্ষণই মাত্র সুপ্রকট। ফেরু-স্বভাব এমনিভাবেই অভিব্যক্তি পায়। তাদের সারমেয়-স্বভাব আরো প্রবল। নতুন প্রভুর মেজাজ- মর্জির অনুগত করে নিজেদের তৈরি করার সেই পুরোনো ফন্দি-ফিকির কৃত্রিম আনুগত্যের অঙ্গীকারে অনুগ্রহলাভের প্রয়াসে অবসিত হয়। আত্মপ্রত্যয়ী বিশ্বের দিকে দিকে আত্মপ্রসারে হয় উন্মুখ, স্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মসংকোচনের মাধ্যমে আত্মরক্ষার নির্বোধ গৌরবে অভিভূত হয় না। স্বাতন্ত্র্য ভিন্নতায় নয়, উৎকর্ষে ও বৈচিত্র্যে—এ তত্ত্ব তাঁহাদের বোধগত নয়। রুগ্ন দেহের স্ফীতি যে মৃত্যুলক্ষণ, শয্যাশায়ী রোগীর অস্থিরতা যে প্রাণবন্ত সুস্থ শিশুর চাঞ্চল্য থেকে প্রকৃতিতে পৃথক; সে বোধ আমাদের নেই। আমরা যে এখনো মানস জরা-জীর্ণতার শিকার, তা আমাদের সার্বক্ষণিক মননে-আচরণেও সুপ্রকট। নইলে আমাদের নিষ্ঠ রাজনীতিকরা এখনো দিল্লি-মস্কো-ওয়াশিংটনে মানস-ভ্রমণ করেই আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত কেন ? স্বদেশের ও স্ব-সমাজের প্রতিবেশে মানবিক সমস্যার সমাধান সন্ধানে নিরত নন কেন? আমাদের স্বাধীন বাঙলার নাগরিকরা বিজয়-সংগ্রামে নিহত আত্মীয়-বন্ধুর জন্যে দুবছর ধরে বিলাপ-বিলাসে নিষ্ঠ কেন? লড়তে গেলে মরতেও হয়; রক্ত-সাগরেই স্বাধীনতা-সূর্য উদিত হয় জেনেও স্বাধীনতার গৌরবানন্দ ভুলে হৃতসর্বস্ব কাঙালের মতো কিংবা অনাথা বিধবার মতো বিলাপানন্দে আমরা কৃতার্থন্মন্য কেন? আমাদের সৃজনশীল আঁকিয়ে-লিখিয়েরা এখনো বালসুলভ স্বদেশপ্রেমের গানে, মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বকথনে, ধর্ষিতা নারীর চণ্ডরূপ অঙ্কনে কিংবা বেদনা-করুণ কাহিনী নির্মাণে, রাষ্ট্রনীতির স্তাবকতায়, ব্যক্তিপূজায় অথবা স্বাধীনতা-স্বাপ্নিকের নৈরাশ্যের ও হতবাঞ্ছার চিত্রদানে নিরত। মন যার বিমূঢ়, মননে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দ্বিধা-বাধা থাকবেই। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুচ্ছগ্রাহিতায়, পৌনঃপুনি-কতায়,যান্ত্রিকতায় ও পল্লবগ্রাহিতায় আমাদের প্রয়াস সীমিত। আঁকা-লেখার ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন বিশেষ প্রকট—তা হচ্ছে অশ্লীলতাকে পরম উদারতায় আর্টের উদার অঙ্গনে নিঃসংকোচে প্রতিষ্ঠা দান। এ-ও মুক্তি বটে, তবে এ বন্ধনমুক্তি মনের না রসলিপ্সার সেটাই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন করার সঙ্গত কারণও রয়েছে; যেমন ছাড়া-বউ ও বিধবা বিয়ে করতে মুসলমানদের অনীহা দেখা যায় না। এমনকি পর-স্ত্রীকেও বশে এনে ঘরে তোলে। এতে বোঝা যায় পুরুষকে স্বেচ্ছায় দেহদানের পরেও কোনো নারীতে মুসলমানের অবজ্ঞা নেই। অথচ সেই মুসলমানই ধর্ষিতা নারীকে ঘরে তুলতে, সমাজে ঠাঁই দিতে, স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে এল না। কিমাশ্চর্য অতঃপরম! এর পরেও কি বলা চলে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে, কিংবা স্বাধীনতা আমাদের যোগ্যতালব্ধ সম্পদ!

এসব কিছুর মূলে রয়েছে একটা তত্ত্বকথা। আমাদের অজ্ঞাতেই শ্রেণীস্বার্থচেতনা আমাদের মর্মমূলে ক্রিয়াশীল থাকে। তাই আমরা যখন সচেতনভাবেই গণপ্রীতি বশে ও সদুদ্দেশ্যে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু ভাবতে-বলতে-করতে চাই, তখনো কিন্তু এক অতিসূক্ষ্ম অবচেতন প্রেরণায় ও প্রভাবে নিজেদের অজ্ঞাতেই শ্রেণী-স্বার্থানুগ তত্ত্বই ভাবি ও বলি এবং কাজও করি সেভাবে। আমরা গণমানবের দোহাই দিয়ে সব কথা বলি ও সব কাজ করি বটে, কিন্তু আসলে আমরা যা ভাবি, বলি ও করি তা কেবল শিক্ষিত উঠতি বর্ধিষ্ণু মধ্যবিত্তের তথা ভদ্রলোকের স্বার্থেই। কার্যত আমরা দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র বলতে ঐ ভদ্রলোকদেরই বুঝি। তাই গাড়ি-বাড়ি, ফ্রিজ-ফ্যান-ফোন, বিমান-সিট্রাক, কেবিন, রেডিও, টিভি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, চাকরি, কমিশন-পরিকল্পনা প্রভৃতির বেলায় কেবল ভদ্রলোকের স্বার্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতিই মনকে প্রভাবিত করে। শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, নাচ-গান, নাটক-সংস্কৃতি, সংবাদপত্র, নাগরিক অধিকার, বাক্-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক মুক্তি, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা প্রভৃতি সবকিছুই ভদ্রলোকদের জন্যেই প্রয়োজন। আমাদের চিন্তা-চেতনায় কেবল আমরা রয়েছি বলেই আমরা অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, প্রদর্শনী, সম্মেলন-জলসা, আলোচনা-চক্র করি। সবকিছুর স্রষ্টা এবং ভোক্তা শিক্ষিত মধ্যবিত্তই। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরোক্ষে উপকৃত হয় গণমানবও। কিন্তু কোনো সরকারি বা সামাজিক চিন্তায় ও কর্মে তারা প্রায় কখনোই উদ্দিষ্ট নয়।

যেমন নিরক্ষর গণমানব বিনা দাবিতে ভোটাধিকার পায় ভদ্রলোকের সর্দারীর তৃষ্ণা মেটাবার এবং শাসনক্ষমতা লাভের উপায় বলেই। দেশের গণমানবের প্রায় সবাই নিরক্ষর চাষী-মজুর। আঞ্চলিক বুলি ছাড়া দুনিয়ার কোনো ভাষাতেই তাদের অধিকার নেই। তাই লিখিত বাঙলাভাষাতেও নেই। তাদের পক্ষে রাষ্ট্রভাষা বাঙলা হওয়াও যা; উর্দু, ইংরেজি, ফরাসি হওয়াও তা। কাজেই ভাষা-সংগ্রামও ভদ্রলোকের স্বার্থ ও সম্মানবোধের প্রসূন। দেশের সাতকোটি মানুষ যে ভাষা-প্রসাদ থেকে বঞ্চিত সে-ভাষার জন্যে প্রাণ দেয়ার গৌরব এবং সে-ভাষায় মর্যাদা দেয়ার গর্ব তাই গণমানবের পক্ষ থেকে করা চলে না। আজ যে মোহররমের মতো সপ্তাহ-পক্ষ-মাস-ব্যাপী সর্বজনীন পার্বণ চলছে ও ইমামবাড়ার মতো বারোয়ারি শহীদ মিনারে ফুল-চন্দন-আলিম্পন পড়ছে তা কাদের উৎসব? এর সঙ্গে সাতকোটি নিরক্ষর মানুষের সম্পর্ক কী? শিক্ষিতদের মধ্যে ইংরেজির বদলে বাঙলা চালু হলে গণমানবের কী লাভ? তাদের ভাত-কাপড়-আশ্রয়ের কিংবা নিরক্ষতার সমস্যা কী এতে মিটবে? কিংবা দেশের আর্থিক, নৈতিক,চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, কৃষি-শৈল্পিক বা বাণিজ্যিক কী উন্নতি হবে? এমনি করে নিরক্ষরতা বিমোচনের কিংবা গণশিক্ষাদানের জন্যে ভদ্রলোকেরা প্রাণপণ সংগ্রামে নামে না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? শিক্ষিত বেকারের জীবিকা সংস্থানের জন্যে সমাজ-সরকার মাথা ঘামায়, গণমানবের ভাত-কাপড়ের নিশ্চয়তা-দানের চেষ্টা হয় না কেন?

এই-যে জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন, বহু অর্থব্যয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল, তা কাদের বিলাসবাঞ্ছা পূরণের জন্যে, কাদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে? অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। অন্য সব বিদ্যা হচ্ছে, তথ্য তত্ত্ব ও জ্ঞানগর্ভ আর সাহিত্য হচ্ছে অনুভবের প্রসূন। জীবনের জন্যই জীবন নিয়ে সাহিত্য—যে জীবনে রয়েছে শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-সংস্কৃতি, নিয়ম-নীতি, অর্থবাণিজ্য, কৃষি-শিল্প এবং তজ্জাত শাসন ও শোষণ, পীড়ন ও পোষণ, আনন্দ ও যন্ত্রণা, সম্পদ ও সমস্যা। কাজেই সাহিত্য সম্মেলন কখনো জীববিদ্ উদ্ভিদবিদ কিংবা পদার্থবিদদের সম্মেলনের মতো জ্ঞান-বিদ্যা-আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রদর্শনী হতে পারে না। সেখানে থাকে কেবল জ্ঞানচর্চা,—জীবন-জীবিকা সম্পৃক্ত কোনো অনুভব বা নীতি আদর্শ নয়।

কিন্তু সাহিত্য জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত সর্বপ্রকার চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কেননা সাহিত্যের কোনো নির্দিষ্ট অবলম্বন নেই। শাস্ত্র, সমাজ, সরকার এবং আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, জৈবিক, প্রাবৃত্তিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক, বাণিজ্যিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার সমস্যা ও সম্পদ তার অনুভব ও বক্তব্যের অবলম্বন। তাই জাতীয় সাহিত্য সম্মেলনের উদ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল রাষ্ট্রিক চারনীতির সাহিত্যে রূপায়ণ-সম্ভাব্যতা, তার সুফল-কুফল, ঔচিত্য-অনৌচিত্য প্রভৃতি বিবেচনা করা ও লোকহিতে দিশা ও সিদ্ধান্তদান করা। জীবনাশ্রয়ী সাহিত্যের তো তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু তার বদলে অধ্যাপক-সাংবাদিকদের একত্র করে সাহিত্যের উরস কিংবা সর্বজনীন বারোয়ারি বাণী-অর্চনার নামে বিভিন্ন ও বিচিত্র কণ্ঠের যে হট্টগোল সপ্তাহব্যাপী চালু রাখা হল, তার থেকে কী দিশা বা ধারণা পেল লিখিয়ে-পড়িয়েরা?

শিক্ষিতমনকে প্রভাবিত করার জন্যেই আমরা গণসাহিত্য সৃষ্টি করি—দুস্থ নিরক্ষর চাষী-মজুররূপী গণমানবের দুঃখ-দুর্দশার কথা লিখি এবং বলেও বেড়াই। অথচ আমাদেরও মনে মেজাজে ও আচরণে পরিবর্তন দুর্লক্ষ্য। অঙ্গীকৃত সমাজতন্ত্র বিড়ম্বিত হচ্ছে তো এ কারণেই! সাত কোটি নিরক্ষর বাঙালীর লোকজীবনে লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য তো রয়েইছে। তা, ভদ্রলোকের বিদ্যা-জ্ঞান অর্জনের জন্যে নিশ্চয়ই চর্চারও প্রয়োজন। কিন্তু ভৌতিক বিশ্বাস-সংস্কারের দুর্গে আবদ্ধ অজ্ঞ-অশিক্ষিত অপটু মানুষের সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য নিয়ে গৌরব ও গর্ব করার কী আছে? বরং দুঃখ লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলো দেয়া যায়নি বলেই ওদের মধ্যে আমরা কত সক্রেটিস, প্লেটো, গেলিলিও-কপার্নিকাস, হোমার-কালিদাস, ফেরদৌসী-খৈয়ামকে হারিয়েছি, এখনো হারাচ্ছি; কত সম্ভাব্য রবীন্দ্রনাথ-লালন ফকিরই থেকে যাচ্ছেন। শিল্প-সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞান-প্রকৌশলে সভ্যতা-সংস্কৃতির এ স্তরে উঠে, আবার সেই অজ্ঞতার ও অসামর্থ্যের অপটুতা ও স্থূলতাকেই আমাদের রুচি-সংস্কৃতির উৎস ও অবলম্বন বলে জানতে এবং মানতে হবে? লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি গৌরবের ও গর্বের হলে দুনিয়ার মানুষ কেন জ্ঞান ও নৈপুণ্যসুন্দর পরিশীলিত জীবন কামনা করছে?

আগেই বলেছি দেশমাত্রেই ভদ্রলোকের। সেই ভদ্রলোকদের নেতৃত্ব দেন বুদ্ধিজীবীরা—যাঁরা আঁকিয়ে-লিখিয়ে-বলিয়ে-করিয়ে লোক হিসেবে পরিচিত ও সম্মানিত। তাঁদের নেতৃত্ব যখন বন্ধ্যা হয় অর্থাৎ তাঁরা যখন সময়োপযোগী নতুন ভাব, নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যোগ কিংবা নতুন কর্মের দিশা দিতে ব্যর্থ হন, তখনই তাঁরা পুরোনো গৌরব-গর্বের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো সাফল্যের, বিজয়ের, সুকৃতির রোমন্থন-সুখে অভিভূত থাকতে চান এবং লোকজীবনেও তার আবর্তন কামনা করেন।

তাই গত দু-বছরের অনুষ্ঠানে, পার্বণে, স্মৃতিসভায়, সম্মেলনে, আলোচনা-চক্রে এবং গল্পে-উপন্যাসে-গানে-কবিতায়-নাটকে-প্রবন্ধে-স্মৃতিকথায় শোকের, কৃতির, বীরত্বের, বিজয়ের রোমন্থন-সুখ আস্বাদনের প্রয়াস দেখতে পাই। এক্ষেত্রে হিন্দু ও ভারতবিদ্বেষী কট্টর তমদ্দুনওয়ালা ও ঘোর পাকিস্তানওয়ালা বুদ্ধিজীবীদের ভাষা ও জাতি-প্রীতি এবং বিলাপনৈপুণ্য সঙ্গতকারণেই মাত্রা ছাড়িয়েছে।

এসব কারণে ভাবী বিপদ-সম্পদ-সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি রেখে বর্তমানের চলতি সম্পদ-সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার লোক দেশে সত্যই বিরল। তাই আমরা আজ অদূর অতীতাশ্রয়ী। কাজেই আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিন্তাও লাটিমের মতো কেবলই আবর্তিত হচ্ছে, কাঙ্ক্ষিত বিবর্তন পাচ্ছে না, এবং আমাদের আনুষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক কথায়-কাজে যেমন; তেমনি আমাদের সাহিত্যেও চলতি সমস্যার কিংবা অন্যায় পীড়নের প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংকেত সুস্পষ্ট নয়।

অতএব আকস্মিকতার অভিভূতি সযত্নে ও সচেতনভাবে পরিহার করে এই স্বাধীনতা-উত্তরকালেই আমাদের স্বাধীন নাগরিকের যোগ্য মন-মেজাজ তৈরি করতে হবে। এর প্রধান শর্ত ও ভিত্তি হচ্ছে চরিত্র। লক্ষ্যে উত্তরণের সংকল্প আসে চরিত্র থেকেই এবং সংকল্প থেকে আসে শক্তি, শক্তিপ্রয়োগে আসে সাফল্য। আমাদের আজকের সবচেয়ে বড় অভাব চরিত্রের। আজ চরিত্র-সঙ্কটই বড় সঙ্কট। চরিত্রবান মাত্রই সদাচারী ও কল্যাণকামী—সে-কল্যাণ সর্বজনীন। এ মানুষের সংখ্যা সমাজে বাড়লে 'দাও দাও, পাই পাই, খাই খাই' জাতের মানুষ কমবে এবং স্বাধীন দেশের বাঞ্ছিত সুনাগরিকের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমা-সচেতন মানুষ দেশের সর্বাঙ্গীণ ও সর্বজনীন কল্যাণে তথা বহুজনহিতে ভাব, চিন্তা ও কর্ম নিয়োজিত করবে।

আমাদের দৈশিক ধারণায় আষাঢ়ের বৃষ্টিপাতে ধরণী সৃষ্টিসম্ভব হয়। প্রকৃতির জগতে আসে জীবনের জাগরণ। প্রাণের ঐশ্বর্যে ও স্বাস্থ্যের লাবণ্যে প্রকৃতি তখন ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে যৌবনবতী, নিরুপমা ও ফলসম্ভবা। তখন সবুজের সমারোহে পৃথিবী ভরে উঠতে থাকে। তেমনি স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর আমরাও সকারণেই প্রত্যাশা করেছিলাম সৃষ্টিসম্ভব নতুন চেতনা, নতুন চিন্তা, নতুন দৃষ্টি, নতুন জিগির, নতুন তত্ত্ব, নতুন ভাব, নতুন উদ্যোগ, নতুন আয়োজন ও নতুন যুগ। আমাদের সেই প্রত্যাশা আজ আহত। তাই আমাদের মতো শত-সহস্র প্রত্যাশী আজ বিড়ম্বিত।

তবু দেশের মানুষের উপর বিশ্বাস রাখব, তবু প্রত্যাশায় থাকব। কারণ, নিশ্চয়ই জানি—'এদিন যাবে, রবে না।' কেননা 'কোনদিন যাহা পোহাবে না, হায় তেমনি রাত্রি নাই।' খণ্ড ও ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যক্তিক প্রচেষ্টায় কেবল দ্বন্দ্ব-কোন্দল বাড়ে। কেননা তাতে ঈর্ষা-অসূয়া-প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়ানো অসম্ভব। সেঁচা জলের শরিক অনেক। আকাশের বৃষ্টি থেকে যেমন কেউ বঞ্চিত হয় না, তেমনি সমস্বার্থে সামগ্রিক কল্যাণ-লক্ষ্যে সমবেত প্রয়াসের প্রসাদ থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না। অতএব, আত্মপ্রত্যয় ও সদ্বুদ্ধি সম্বল করে বহুজনহিতে বহুজনসেবায় ভাব-চিন্তা-কর্ম-নিয়োজিত করলে পর-কল্যাণের সঙ্গে আত্মকল্যাণ আপনিতেই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের ভাবনা

জীব-উদ্ভিদ দুনিয়ার তাবৎ প্রাণীই জীবনকে ভালোবাসে এবং জীবনের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশ কামনা করে। আর সব জীব-উদ্ভিদের জীবন প্রকৃতিনির্ভর। তাই তাদের জীবন প্রকৃতির নিগড়েই আবর্তিত হয়। আঙ্গিক-উৎকর্ষের দৌলতে মানুষ প্রকৃতিকে কৌশলে বশ করে বান্দার মতো তার ইচ্ছার অনুগত করেছে। তাই মানুষ প্রকৃতিও প্রবৃত্তিবিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবন রচনার ও জীবিকাসৃষ্টির সামর্থ্যগৌরবে গর্বিত। সে জীবশ্রেষ্ঠ, মন ও মননধনে ধনী। তার সমাজ ও শাস্ত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতি তার চিন্তা-চেতনার প্রসূন- তার জীবনের নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশলক্ষ্যে নিয়োজিত তার জীবিকা-পদ্ধতির ফসল। জীবনটাই তার এক পরম ঐশ্বর্য। পৃথিবীর ব্যক্ত ও গুপ্ত সব পদার্থই তার সম্পদ। সৃষ্ট সম্পদ ও শক্তির উপযোগ সৃষ্টি করে সেও স্রষ্টার মতো আনন্দিত।

এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষার অশেষতায় ও অপরিমেয়তায়। জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল অভাব ও বাঞ্ছা জাগায়। তাই আশা ও আকাঙ্ক্ষা হয়ে উদ্যম, উদ্যোগ ও প্রয়াস সৃষ্টি করে। জীবনে মন মননের বিকাশ ও বিস্তার ঐ আকাঙ্ক্ষা এবং প্রয়াসেরই প্রসূন। ভাব-চিন্তার প্রয়োগে পাই কর্ম। সে-কর্মের ফসলই জীবনের পাথেয়। ভাবচিন্তা-কর্ম তাই জীবনের পুঁজি। জীবনটাই একটা অসীম সম্ভাবনা-প্রসূ সম্পদ। ঐ ঐশ্বর্য-চেতনাসম্পন্ন মানুষই জীবনের মুহূর্তগুলো সম্পদ-সৃষ্টিতে ও বৃদ্ধিতে নিয়োগ করে। জীবন-জমি আবাদ করলেই ফলে সোনা। জীবনেও থাকে চাষের মৌসুম, বোনার ঋতু আর ফসল তোলার কাল। আবাদের অতিক্রান্তকালে ফুল ফোটাবার, ফল ধরাবার প্রয়াস ব্যর্থ হবেই। এ-বোধ যাদের আছে, তারাই আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে-অর্জনে-সঞ্চয়ে-রক্ষণে সদা-সচেতন। সফল ও সার্থক জীবনের প্রসাদ তাদেরই প্রাপ্য। জাতীয় জীবনেও এ তথ্য ও তত্ত্ব প্রযোজ্য। কিন্তু এর জন্য নতুন চেতনার প্রয়োজন। কেননা নতুন চেতনাতেই নতুন স্বপ্নের, সাধের ও আকাঙ্ক্ষার জন্ম।

পুরাতনের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, সন্দেহ ও অনাস্থাই নতুন চেতনার লক্ষণ। তৃপ্ত ও তুষ্ট হৃদয়ে দ্রোহ নেই। দ্রোহবিরহী প্রয়াস-প্রযত্ন অসম্ভব। কেননা দ্রোহ ব্যতীত পুরাতন-পরিহারের প্রেরণা এবং নতুন-বরণের বাঞ্ছা জন্মায় না। তৃপ্তি ও তুষ্টি জড়তা ও জীর্ণতার শিকার। তৃপ্তি ও তুষ্টি তাই বন্ধ্যা ও বৈনাশিক। পুরোনো জীবননীতি ও জীবিকারীতির মধ্যে স্থিতি-কামীর আপাতসুখকর নিশ্চিন্ত ও নিষ্ক্রিয় জীবন পরিণামে বৈনাশিক বীজের আকর হয়ে ওঠে। তাই স্থিতিতে মরণ। অতৃপ্তি ও অসন্তোষ নিগড় ভাঙার উদ্যম ও উদ্যোগের জনক, প্রয়াস-প্রযত্নের প্রসূতি, সৃষ্টিশীলতার ও সৃষ্টির উৎস। এজন্যেই গতিতে জীবন।

জিজ্ঞাসার, আকাঙ্ক্ষার ও চেতনার কথা এত করে বলতে হচ্ছে এজন্য যে, আমরা আকস্মিকভাবে এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনভ্যস্ত সম্পদ সম্প্রতি পেয়ে যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর জন্য যে আমাদের মানস প্রস্তুতি সম্যক ছিল না, তা সততার সঙ্গে স্বীকার করা কল্যাণকর। কেননা আমাদের যোগ্যতা অর্জনে ঐ স্বীকৃতিই প্রবর্তনা দেবে। এই নতুন ও সুদুর্লভ সম্পদটি হচ্ছে স্বাধীনতা। শশাঙ্ক ও গণেশগোষ্ঠীর কথা বাদ দিলে বাঙালী জীবনে এই প্রথম স্বাধীনতা-সম্পদ অর্জিত হল। স্বাধীনতা কি সূর্য-প্রতিম! হয়তো তা-ই। কেননা পার্থিব প্রাণ সূর্য-সম্ভব এবং এর লালনও সূর্য-নির্ভর। আজকের দিনে দৈশিক ও জাতিক জীবনও তেমনি স্বাধীনতা-সূর্যমুখী। কারণ একালে মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য ও বিকাশ দৈশিক বা জাতিক স্বাধীনতাভিত্তিক। আগের কালের বোকা মানুষেরা স্বদেশী, স্বধর্মী ও স্বজাতি রাজা পেলেই স্বাধীনতার গৌরব-গর্ব-সুখ অনুভব করে তৃপ্ত থাকত। এ-যুগ রাজার রাজত্বের নয়, —গণমানবের সমবায়-সংস্থার। তাই এ-যুগে স্বাধীনতার তাৎপর্য ভিন্ন। এ-যুগে সামরিক স্বনির্ভরতা ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতার নামই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতা। গণমানবের জীবন-জীবিকার বিকাশ-বিস্তারই হচ্ছে স্বাধীনতার প্রসাদ।

নতুন চেতনাতেই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মের জন্ম, নতুন নীতির উদ্ভব এবং নতুন বস্ত্র আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্ভব। আবার নতুন চেতনার অনুকূল প্রতিবেশেই নতুনের লালন ও বৃদ্ধি সহজ ও স্বাভাবিক হয়। রাম না জন্মিতেই নাকি রামায়ণ রচিত হয়েছিল। লোকে তা বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমরা করি। কেননা মনোজগতে মানসপ্রতিমা রচিত না হলে বাহ্যজগতে মূর্তি তৈরি হতে পারে না। চিৎ না থাকলে চিত্র আসবে কোথা থেকে! কল্পলোকে কল্পনা চাই, পরিকল্পনা চাই—তবে তো তার বাস্তবায়ন! স্বাধীনতা অর্জনের আগেও তেমনি স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষা চাই, স্বাধীনতা উপভোগের নীতিরীতি জানা চাই, স্বাধীনতা অনুভবের জন্যে চিৎপ্রকর্ষ চাই। স্বাধীনতা প্রয়োগের নৈপুণ্য চাই। যে-কোনো বস্তু ও শক্তির উপযোগ-বুদ্ধি থাকা চাই, নইলে সুলভ বা লব্ধ হলেও তা কখনো সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে না। উপযোগ-বুদ্ধিই বস্তু ও শক্তিকে কেজো করে—জীবিকানুগত করে। অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণ দ্বেষী-না হলে কেউ কখনো বিবেক-বুদ্ধির আনুগত্যে স্বীকারে সমর্থ হয় না। তেমন মানুষ নাগরিকত্বের অযোগ্য। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি, দাবি ও অধিকার-চেতনা কখনো বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হতে পারে না, তাদের সম্পর্ক বলতে গেলে অঙ্গাঙ্গী কিংবা ঐকান্তিক।

সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহিষ্ণু মানুষের সঙ্ঘশক্তির প্রয়োগে দৈশিক জীবনে গণমানবের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্যে মানবিক বিকাশ ও বিস্তার কামনায় আনুপাতিক সাম্যের ভিত্তিতে বণ্টনে বাঁচার ব্যবস্থা করা ছাড়া আজকের দুনিয়ায় মানবিক সমস্যার সমাধানের বোধগত অন্য কোনো উপায় আপাতত নেই। বহু-পরীক্ষিত কাড়াকাড়ি, বঞ্চনা, ষড়যন্ত্র, মারামারি ও হানাহানিতে এ-যুগে-যে সমাধান কিংবা কারো কল্যাণ নেই, তা আশুউপলব্ধ হওয়া উচিত। নির্ভয়ে নির্বিরোধে সহাবস্থান করবার জন্যে আজকের মানুষকে মানববাদী হতে হবে এবং আত্মকল্যাণেই পড়শী-প্রীতির অনুশীলন করে সেবা, সততা ও ত্যাগপ্রবণতার বিস্তার ঘটাতে হবে। এ না হলে কেউ স্বাধীনতা অর্জনের ও অনুভবের এবং রক্ষণের ও উপভোগের যোগ্য হয় না।

প্রকৃতির জগতে দেখা যায় বুনোপাখি খাদ্যরূপেই ঠোঁটে কিংবা পেটে করে দূরদূরান্তের নানা বৃক্ষবীজ স্থানান্তরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। এতে ভাগ্যবলে কোনো বীজ প্রাণ পায়, অনুকূল পরিবেশে মহীরুহ হয়ে ধন্য হয়। কিন্তু সব বীজ সে সুযোগ পায় না, হতভাগ্যের সংখ্যাই অধিক। মনুষ্যজীবনেও ভাগ্য কৃচিৎ প্রসন্ন হয়। ভাগ্যের বরাত দিয়ে বসে থাকলে ভাগ্য প্রায়ই প্রতারিত করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ্যবিড়ম্বিতের কাছে জীবনটা কখনো মরীচিকা, কখনো মরুমায়া এবং কখনোবা মরুশিখাও। জাতীয় জীবনেও তেমনি দায়িত্ব ভুলে কর্তব্য এড়িয়ে ভোগ করতে উৎসুক হলে, ভাগ্যের হাতে মার খেতে হবে। কাজেই অর্জিত স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্যতা অর্জনই আমাদের আশু কাম্য। অন্যায়-অসততা-অকর্মণ্যতা অনুরোধে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধে প্রতিকার করার যোগ্যতাই হবে প্রাথমিক লক্ষ্য। এবং তার জন্য দরকার মন-জাগানো ও মন-বানানো।

স্বাধীনতার দায়

First deserve then desire—'আগে যোগ্য হও, পরে কামনা কর'-বলে একটি আপ্তবাক্য চালু রয়েছে। এর তাৎপর্য হচ্ছে কোনো নতুনকে, কোনো বাঞ্ছিতকে পেতে হলে, তা পাবার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। কেননা অকালে ও অপাত্রে প্রকৃতি কিংবা বিধাতা কিছুই দান করে না। জিজ্ঞাসা থেকে অভাববোধ, অভাবচেতনা থেকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে প্রয়াস, জাগে উদ্যম, শুরু হয় উদ্যোগ। জিজ্ঞাসা জাগে তখনই, যখন পুরোনো নীতির দুর্গে ফাটল ধরে, পুরোনো রীতি উপযোগ হারায়, পুরোনো বিশ্বাস জীর্ণতা পায়, পুরোনো সংস্কার নিগড়রূপে প্রতিভাত হয়, পুরোনো পাথেয় অকেজো হয়ে যায়, পুরোনো জীবিকা-পদ্ধতি অভাব পূরণে ব্যর্থ হয়, পুরোনো সম্পদ বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, পুরোনো জীবননীতি ও জীবিকারীতির প্রতি সন্দেহ, অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস না জাগলে নতুনের আকাঙ্ক্ষা জাগে না, আর আকাঙ্ক্ষা না জাগলে প্রাপ্তির প্রয়াসও থাকে অনুপস্থিত। পুরোনোতে আস্থা হারালেই প্রাপ্তির প্রয়াস প্রাকৃতিক নিয়মেই হয় শুরু। এটি কোনো বিশেষ মানবিক গুণ নয়, নিতান্ত জৈবিক প্রয়োজন। ইতিহাস বলে, মানবিক প্রয়াস মাত্রেরই পেছনে রয়েছে প্রাণী হিসেবেই মানুষের জৈবিক চাহিদা। বিদ্বানেরা বলেন, মানুষের যাবতীয় বিকাশ জীবিকাসংপৃক্ত। অর্থাৎ জীবনের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য লক্ষ্যে মানুষ জীবিকার ক্ষেত্রে অনবরত যে অনলস প্রয়াস চালিয়েছে বা আজো চালিয়ে যাচ্ছে, তারই ফলে সমাজে ও শাস্ত্রে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে মানুষ আজকের এই মুহূর্তের বিকাশের স্তরে উন্নীত। যে-মানুষের জিজ্ঞাসা নেই—কৌতূহল নেই, সে-মানুষ কেবল পোষা প্রাণীর মতো পরান্নজীবী ও পরবুদ্ধি-নির্ভর হয়ে যান্ত্রিকভাবে জীবনের দিনগুলো নষ্ট করে মৃত্যুর শিকার হয়। গোত্র বা জাতির সম্পর্কেও এ তথ্য প্রযোজ্য, তাই দুনিয়ায় আজো আদি আরণ্যমানব সুলভ এবং একদা-বর্দ্ধিষ্ণু বহু গোত্র আজ নিশ্চিহ্ন।

চেতনায় নতুন স্বপ্ন না জাগলে, নতুন কিছু চাওয়া কিংবা পাওয়া অসম্ভব। আগে অভাববোধ, পরে প্রাপ্তি-প্রয়াস, আগে পরিকল্পনা, পরে বাস্তবায়ন। চাওয়া-বিরহী পাওয়া-বস্তু সম্পদ নয়, কেননা উপযোগবুদ্ধি বিজড়িত নয় বলে তা অকেজো।

জীবনকে ঐশ্বর্য বলে যারা জানে, স্বাধীনতাকে তারাই সম্পদ বলে মানে। জীবনবৃক্ষে ফুল ফোটাবার জন্যে, ফল ফলাবার জন্যে স্বাধীনতা দরকার। বিকাশ কেবল স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার মধ্যেই সম্ভব। এ ব্যক্তিক জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি প্রয়োজন। অতএব স্বাধীনতাকে যারা সম্পদরূপে আবিষ্কার করে না, অর্জন করে না, তাদের কাছে স্বেচ্ছাচার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বৈরাচারের অধিকারই স্বাধীনতা। তেমন মানুষের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন কিংবা রক্ষণ সম্ভব নয়, কেননা স্বাধীনতার উপভোগ- সামর্থ্য তার নেই বলেই স্বাধীনতার মূল্য-মহিমাও তার অজ্ঞাত এবং সে-কারণে স্বাধীনতার প্রসাদ তার অনায়ত্ত ও অনাস্বাদিত।

স্বাধীনতা অনুভবের ও উপভোগের সম্পদ। এর জন্য যোগ্যতা প্রয়োজন, ব্যষ্টিমনে ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও নৈতিক দায়িত্বচেতনা এবং কর্তব্যবুদ্ধি স্পষ্ট হয়ে না জাগলে এবং ব্যক্তি-মানুষ তা পালনে নিষ্ঠ না হলে প্রাপ্তির ও ভোগের দাবি ও অধিকার জন্মায় না, দাবির সঙ্গে দায়িত্ব ও অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য বর্তায়।

অন্যায়, অসুন্দর ও অকল্যাণের প্রতি ঘৃণা, বিবেকবুদ্ধির আনুগত্য, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবুদ্ধি, দাবি ও অধিকার-চেতনা প্রভৃতিই নাগরিকের যোগ্যতার নিদর্শন। এমনি মানুষই কেবল স্বাধীনতা অর্জন, রক্ষণ ও উপভোগের যোগ্য। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই সব কল্যাণ-চিন্তার ও সুফলপ্রসূ কর্মের উৎস। সেবা, সততা ও ত্যাগবৃত্তি ঐ ভালোবাসারই প্রসূন।

আগের যুগে স্বদেশী, স্বধর্মী ও স্বজাতি দেশের শাসক হলেই লোকে নিজেদের স্বাধীন বলে গর্ববোধ করত।

আদিকালে স্বাধীনতা ছিল কেবলই গৌরব-গর্বের বিষয়, গণমানবের তেমন কোনো বৈষয়িক সুখ-সুবিধা প্রত্যক্ষভাবে কিংবা লক্ষণীয়ভাবে স্বাধীনতা-সংলগ্ন ছিল না। এ-যুগে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে প্রতি মানুষের জীবন-জীবিকা বিজড়িত। আজকের দিনে স্বাধীনতা ব্যষ্টি-মানুষের অস্তিত্বেরই অপরিহার্য অঙ্গ। এই নতুন তাৎপর্যে স্বাধীনতা মানুষের জীবনে জীবিকায় নিরাপত্তার, স্বাচ্ছন্দ্যের ও বিকাশের ভিত্তি ও অবলম্বন। এ কারণেই সামরিক স্বনির্ভরতা ও আর্থিক স্বয়ম্ভরতাই হচ্ছে এ-যুগের স্বাধীন সার্বভৌম তথা অনপেক্ষ শক্তির প্রতীক।

তাই স্বাধীনতা উপভোগের জন্য অনুকূল প্রতিবেশ সৃজন করতে হয়—যে-প্রতিবেশে থাকবে ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয়ঃ বরণের ও সংস্কার বর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব-নিষ্ঠা ও অধিকার-চেতনা। আমাদের চেতনার মধ্যে স্বাধীনতার এ গুরুত্ব সম্যকস্বরূপে ধারণ করা আশু-প্রয়োজন। তাহলেই দুর্লভ চরিত্র ও সুদুর্লভ স্বাচ্ছল্য আমাদের আয়ত্তে আসবে।

একগুচ্ছ প্রশ্ন

পাকিস্তান আমলে ২১শে ফেব্রুয়ারি তথা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতিচারণ আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার, জাতিসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার ও সংগ্রামী-চেতনা অর্জনের জন্যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সেদিন তা ছিল উদ্দীপনার, উত্তেজনার ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উৎস। স্বাধীন বাঙলাদেশে সে-পর্ব চুকে গেছে। আজ একুশে ফেব্রুয়ারির পার্বণিক উদ্‌যাপন আমাদেরকে কেবল বিজয়ী ও কৃতার্থম্মন্যের আত্মপ্রসাদ দিতে পারে। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐতিহ্যস্মৃতির রোমন্থন-সুখ নতুন কোনো লক্ষ্যের সন্ধান কিংবা আকাঙ্ক্ষার জন্ম দেবে না। দেশে আজ ২১শে ফেব্রুয়ারি মোহররমের মতো তাৎপর্যহীন পার্বণে এবং শহীদমিনারগুলো পৌরাণিক পবিত্রতায় ইমামবাড়া বা বুদ্ধস্তূপের মতোই শোভা পাবে। এই নির্লক্ষ্য আচরণের নাম আচার, তাৎপর্যভ্রষ্ট অনুসৃতির নাম প্রথা। দুটোই বন্ধ্যা এবং জীবনে বোঝা ও বাধা। অতীতাশ্রয়ী মনে অর্থাৎ ঐতিহ্যের গৌরবগর্বী মনে একপ্রকার তৃপ্তম্মন্যতা আসে, তার অনুভব-সুখ মানুষকে উদ্যমহীন ও উদ্যোগ-বিরহী করে তোলে। যেমন, ধনীর সন্তান আলস্যসুখে অভিভূত থাকে। অর্জনে সম্পদবৃদ্ধির আন্তঃপ্রেরণা সে অনুভব করে না অভাবজাত যন্ত্রণাবোধ থাকে না বলেই।

কাজেই যার এগিয়ে যেতে হবে, তার সুখস্মৃতির জন্যে কিংবা গৌরব-গর্বের জন্যে বারবার ও ঘনঘন পিছু তাকালে চলে না। রক্তক্ষরা লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে স্বাধীনতা এসেছে, লোক তো মরবেই, কিন্তু স্বাধীনতাও চাইব আর লড়িয়ে মৃতের জন্যে বারোমাস অনিবার নানা ছলে কাঁদব—এ বীরধর্ম তো নয়ই, স্বস্থ ও সুস্থ মানব-স্বভাবও নয়। প্লেটোর রিপাবলিকে এ বিলাপের কুফল সম্বন্ধে উচ্চারিত বাণী স্মর্তব্য।

গৃহগত জীবনে মানুষের মা-বাপ, ভাইবোন, ছেলেমেয়ে মরে, তাই বলে কি তারা সারাজীবন ধরে প্রিয়জনের জন্যে কাঁদে, না সর্বক্ষণ তাদের স্মরণ করে কাজে ও কর্তব্যে অবহেলা করে?

বিগত দুই বছর ধরে আমরা যে উৎসাহে প্রায় প্রত্যহই জাতীয় বিলাপ-ব্রত উদ্‌যাপন করছি, তাতে আমাদের বিমূঢ় বন্ধ্যা মন ও অসুস্থ জীবনদৃষ্টির পরিচয় মেলে।

তাও আমরা সব নিহত মানুষের জন্যে দুঃখ করিনে। কেবল 'বুদ্ধিজীবী' সংজ্ঞাভুক্ত শিক্ষিত লোকদের জন্যেই সভা করে কাঁদি। তাদের পরিবার-পরিজনদের কথাই ভাবি। আফসোসটা যেন এই—ওরা বাঙালী মারবেই যদি, তাহলে মুটে-মজুর-চাষীদের মেরেই সাধ মিটাল না কেন, ভদ্দরলোকের প্রাণে হাত দিল কেন? এ-ই হচ্ছে শিক্ষিত ও সমাজতন্ত্রী বাঙালী-মনের স্বরূপ! সারাদেশে ভদ্রলোক মরেছে কয়জন; আর অশিক্ষিত বলি হয়েছে কত? তাদের খবর নিল কে? তাদের বউ কি বিধবা হয়নি? তাদের সন্তান কি এতিম হয়নি? তারা কি সরকারি-বেসরকারি বৃত্তি পেয়েছে? তারা কি করে খায় জানবার কৌতূহল আছে কি কারো?

সৈনিকের নারীধর্ষণ কি অভিনব উপসর্গ, দেশে নারীসঙ্গ সহজলভ্য না হলে কিংবা বেশ্যালয় না থাকলে জৈব প্রয়োজনেই মানুষ কি ব্যভিচারের পথ করে নেয় না? হোটেলে ক্যাবারে বারবনিতা যোগাড় হয় না? তালাক দেয়া নারী বা বিধবা বিয়েতে যে-মুসলমানের কোনোকালেই অরুচি ছিল না, সে-মুসলমান অনিচ্ছায় ধর্ষিতা নারীকে স্ত্রীরূপে-বধূরূপে গ্রহণ করতে এগিয়ে এল না কেন? কাজ দিয়ে অশন বসনের সমস্যা মিটিয়ে দিলেই কি নারীর সামাজিক মর্যাদা রক্ষিত হয় কিংবা যৌবনজাত জীবন-সমস্যা মেটে? গৃহগত জীবনে জায়া-জননীর অধিকার-বঞ্চিতা নারীর ভাত-কাপড়ে কী সুখ?

তিথি স্নান, রথযাত্রা, উরশ প্রভৃতি নানা উপলক্ষে যেমন আমাদের দেশে এক থেকে এক সপ্তাহব্যাপী পার্বণিক মেলা বসে, তেমনি ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষেও জানুয়ারি থেকেই উৎসবের উদ্যোগ-আয়োজন চলতে থাকে। নিয়মিত পত্রপত্রিকা ছাড়াও অসংখ্য পার্বণিক পত্রিকা বের হয়। তাতে ভাষা আন্দোলন ও শহীদ-সংপৃক্ত গল্প-কবিতা-নাটক-প্রবন্ধ যা ছাপা হয়েছে, তা দিয়েই একটা ছোটখাটো গ্রন্থাগার ভর্তি করা যাবে। তাছাড়া ওয়াজি মৌলবীর মতো এসময় একদল বক্তা সর্বত্র অগ্নিগর্ভ জ্বালাময়ী ভাষায় ও বজ্রকণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব লিখিয়ে-বলিয়েরা সারাবছর বাংলাভাষার উন্নতির জন্যে কিংবা গণহিতে কী কাজ করেন, সে-বিষয়ে কেউ প্রশ্ন তোলে না। তাঁরা নিজেরা কোনো দায়িত্বগ্রহণ কিংবা কর্তব্যপালন করেন না, কেবল উপদেশ খয়রাত করেন। এ করেই তাঁরা লোকপ্রিয় ও প্রখ্যাত।

আবার সাত কোটি অশিক্ষিত মানুষ যেখানে লিখিত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন, বাঙালীমাত্রেই যেখানে ঘরে-বাইরে বাংলা বুলিতে কথা বলছে, সেখানে নানা কারণে কয়েক হাজার বাঙালী অফিসের ফাইলে ও নিজেদের মধ্যে সরকারি বিষয়ে চিঠিপত্রে ইংরেজি লিখলে বাঙালীর সামাজিক, আর্থিক, কৃষি-শৈল্পিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক ও বৈষয়িক জীবনে কি বৈনাশিক ক্ষতি হয়, আর বাংলা সর্বকাজে ব্যবহৃত হলেই বা সামাজিক, আর্থিক ও বৈষয়িক জীবনে কোন্ সমস্যা মিটবে, কী পরমার্থ লাভ হবে, তা কেউ খুলে বলে না। এসব লিখিয়ে বলিয়ে বুদ্ধিজীবীরা গণ ও বয়স্কশিক্ষার কথা, নতুন কলকারখানা স্থাপনের কথা, কোনো সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা, কোনো যৌথ খামারের প্রস্তাব, এমনকি ভাগচাষীর তেভাগার কথাও উত্থাপন করেননি। 'নাঙ্গল যার জমি তার' ধ্বনি শুনলে তো তাঁরা ক্ষেপে যান। দেশ বলতে, জাতি বলতে, মানুষ বলতে কেবল মধ্যবিত্তকেই বোঝায়। ভাব-চিন্তা-কর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য,রাজনীতি-বিদেশনীতি সবটাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থেই নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত। মধ্যবিত্তের জাগ্রত আত্মসম্মানবোধ অনাহত রাখবার জন্যই স্বাধীনতা কাম্য হয়। তাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যের জন্যেই বিদেশী শোষণ-মুক্তি জরুরি হয়ে ওঠে। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি লাভের জন্যেই মাথাগুনতি ভোটের প্রয়োজনে গণতন্ত্র তাদের বাঞ্ছিত হয়। জনগণের প্রয়োজনের নামে তারা মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রসার দাবি করে, কিন্তু গাঁয়ে যেতে চায় না, আত্মসুখ সন্ধানে বিদেশে পাড়ি জমায়। শহরের হাসপাতালে ভদ্রলোকদের সুবিধার জন্যে কেবিন বৃদ্ধির দাবি জানায়, বড় ডাক্তারের উপস্থিতি চায়, কিন্তু গাঁয়ে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবি জানায় না। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসার কামনা করে, কিন্তু লোকশিক্ষার ব্যবস্থা বা বিস্তার দাবি করে না। মধ্যবিত্তদের কর্মসংস্থান ও বেতনবৃদ্ধির কথা বলে, গণমানবের কর্মসংস্থান কিংবা খোরপোশের কথা চিন্তা করে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা নকল করে বয়ে যাচ্ছে—সে দুশ্চিন্তায় সবাই জর্জরিত; গণমানবের শিক্ষার-যে কোনো ব্যবস্থাই নেই, সে-কথা কেউ ভাবে না, শিক্ষিতদের বেকারত্ব ঘুচানোর জন্য সমাজ-সরকারের মাথাব্যথার অন্ত নেই। অশিক্ষিত বেকারদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার গরজও কেউ বোধ করে না। রেডিও-টিভি-ফোন-ফ্যান-ফ্রিজ-গ্যাস-সি-ট্রাক-মোটর-কোচ, আভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন প্রভৃতি কাদের প্রয়োজনে আসে! জাপানি টেট্রন কার জন্য, বিলাসসামগ্রী কার ভোগের জন্যে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিংবা প্রদর্শনী কার মনোরঞ্জনের তাগিদে, পনেরোখানা খবরের কাগজ কাদের স্বার্থে, সিমেন্ট্র-পেট্রোল আমদানি কাদের প্রয়োজনে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-সংস্কৃতি সম্মেলন ও ক্রীড়া অনুষ্ঠান কোন্ শ্রেণীর মানুষের জন্য, এমনকি কলকারখানা-ব্যবসা-বাণিজ্য চলে মুখ্যত কাদের স্বার্থে? গণমানবেরা কোনো কোনোটি থেকে পরোক্ষে উপকৃত হয় বটে, কিন্তু গণমানবের স্বার্থে একান্তই তাদের জন্য সরকারও সহজে কিছু করে না। এভাবে দেখলে বোঝা যাবে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে গণস্বার্থ গৌণ ও পরোক্ষ, আর মধ্যবিত্ত স্বার্থই মুখ্য ও প্রত্যক্ষ।

শহরে ভদ্দরলোকের জন্য এক বিঘার বাড়ি, চওড়া রাস্তা, পার্কের ব্যবস্থা রয়েছে, আর বস্তির এক বিঘা জমিতে গড়ে আড়াইশ মানুষ বাস করে গেরস্থের বাথানের চেয়েও ছোট এবং নিকৃষ্ট ঘরে। চাকুরেদের জন্যে সরকার-নির্মিত বাসগৃহও থাকে, কিন্তু বস্তিবাসীর পক্ষে বিনে-পয়সার প্রাকৃতিক আলোবাতাসের এক কণাও দুর্লভ। মধ্যবিত্তরা কি ওদের অধিকার ও দাবি স্বীকার করে? অতএব দেশের নামে, জাতির নামে এবং জনগণের নামে সমাজে সরকারে যা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু করা হয়, তা আসলে মধ্যবিত্তের স্বার্থে মধ্যবিত্তরাই করে। জমির খাজনা মাফ হয় মধ্যবিত্তেরই স্বার্থে। তেভাগার সুবিধেও যারা পেল না, সেই ভূমিহীন ভাগচাষীর কিংবা ক্ষেতমজুর কল-শ্রমিকের এতে কী লাভ হল? জমিদারি উঠে গেছে বটে, কিন্তু খাসজমি নামে-বেনামে রাখার ব্যবস্থা হল কাদের স্বার্থে? শহরে বাড়িভাড়া দিয়ে জমিদারের চাইতেও বড় ধনী হয় কারা? স্বস্বার্থেই এরা গণমানবকে উত্তেজনা দিয়ে দাঙ্গা বাধায়, ওদের দিয়ে সভা-মিছিল করিয়ে ওদের বাহুবলে ও ভোটবলে প্রতাপ-প্রতিপত্তি অর্জন করে। আর চিরকাল অজ্ঞ অসহায় মানুষকে প্রতারিত-প্রবঞ্চিত করে। শিক্ষার মাধ্যমে ওদের চোখ ফুটিয়ে না দিলে স্বার্থসচেতন ও লাভ-ক্ষতির হিসেব নিপুণ হয়ে ওরা আপন প্রাপ্য কখনো দাবি করতে জানবেও না, পারবেও না। জাতীয় বাজেটের কয় পয়সা একান্তই ওদের স্বার্থে ব্যয় হয়? মধ্যবিত্ত শহুরেদের হল-হোস্টেল-ক্লাব-স্টেডিয়াম-জিমনেসিয়াম-সাঁতার সরঃ- সরোবর তৈরি করতে ও টিকিয়ে রাখতে যত খরচ হয়, তার সিকিভাগ অর্থে একটি জিলার বয়স্কশিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে। দেশ গরিব বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে-কোনো কাজ শুরু করার আগে ইমারত চাই, ধনে কাঙাল হলে কী হয়, সরকার কিন্তু মনে-মেজাজে সামন্ত। অল্পে ও অনাড়ম্বরে তার সুখ নেই। সে তার সাধ ও সাধ্যের অসঙ্গতিকে মনে ঠাঁই দেয় না। তাই লক্ষ্য 'মারি তো গণ্ডার, আর লুটি তো ভাণ্ডার।' এজন্যে কোনো এক গাঁ, ইউনিয়ন, থানা বা মহকুমা পর্যায়েও কোনো জনকল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব হলেও গোটা দেশে করা সম্ভব নয় বলে, তাও করে না।

মধ্যবিত্তরা দেশ, জাতি ও জনগণের স্বার্থের জিগির সর্বক্ষণ মুখে জিইয়ে রাখে বটে, কিন্তু কর্ম ও আন্দোলন সবটাই স্বস্বার্থ লক্ষ্যেই করে। তারা এমন বিবেকহীন অমানুষ যে, ঝড়-বন্যা-মারীগ্রস্ত মুমূর্ষু গণমানবের ত্রাণের জন্যেও গাঁটের পয়সা ছাড়তে চায় না। নাচ-গান-নাটক-সিনেমা-ক্রীড়ার চ্যারিটি শো করে তাদের থেকে পয়সা আদায় করতে হয় কী বর্বর মন ও অমানবিক রুচি তাদের! ক্ষুধিত মুমূর্ষু মানবতা তাদের বিবেক বিচলিত করে না, ত্রাণ তহবিলে স্বেচ্ছায় পয়সা দেয় না—প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যে প্রতীকী প্রণামী রাখে। লক্ষ কোটি মানুষের যন্ত্রণার সময়েও তাদের আনন্দ- আমোদ উপভোগে লজ্জা হয় না।

স্বাধীনতা-উত্তরকালেও আমাদের ভাব-চিন্তা-কর্ম পুচ্ছগ্রাহিতা-দুষ্ট, আবর্তনক্লিষ্ট ও অনুকৃতিপ্রবণ। নতুন কিছু আগে ভাবার, আগে বলার ও আগে করার সাধ-সাধ্য যেন কারো নেই; সবার যেন বন্ধ্যা মন ও ভোঁতা রুচি, সবাই যেন কৃতার্থম্মন্য ও অতীত স্মৃতিরোমন্থন সুখে অভিভূত। জাগরণের, উদ্যমশীলতার, কল্যাণবুদ্ধির, মানবপ্রীতির, গণদরদের, উন্নয়নকামীর ও উঠতি-বাঞ্ছার লক্ষণ এ নিশ্চিতই নয়।

বাঙালীর মনন-বৈশিষ্ট্য

সমবেত দর্শনবিৎ ও সুধীবৃন্দ

দর্শন আমার অধীত বিষয় নয়। দর্শনচর্চায় আমি অনধিকারী। কিন্তু ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে কারণ আবিষ্কার কিংবা লক্ষণ বিচার করে রোগ নির্ণয় ও নিদান নিরূপণ যেমন সম্ভব, তেমনি বাঙালীর আচার-আচরণে যে নীতি-আদর্শ অভিব্যক্তি পেয়েছে, তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করে বাঙালীয়ানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা বাঙালীত্বের স্বরূপলক্ষণ জানা যাবে,-এ বিশ্বাসে আমি বাঙালীর ঐতিহাসিক আচরণের ধারা অনুসরণ করছি। এ বাঙালীর কোন্ জীবন-দৃষ্টির ও জগৎভাবনার ইঙ্গিত বহন করে–তার দার্শনিক স্বরূপ নিরূপণের দায়িত্ব দর্শনশাস্ত্রবিদ্‌দের।

প্রাণীমাত্রই বাঁচতে চায়, আর বাঁচার প্রয়োজনেই আসে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের বৃদ্ধি ও প্রয়াস। অন্য প্রাণীর কাছে তা সহজাত বৃত্তি প্রবৃত্তিমাত্র, মানুষের তা-ই জীবনসাধনা।

যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই ভয়-বিস্ময়-অসহায়তা। তাই জীবনের নিরাপত্তার জন্য জীবনকে ও জীবনপ্রতিবেশকে চেনা-জানার মানবিক প্রয়াসও শুরু হয়েছে মানুষের আদিম অবস্থাতেই। মানবশিশুর মতো মানবিক প্রয়াসও হাত-পা নাড়ার, হামাগুড়ির ও হাঁটতে শেখার স্তর অতিক্রম করে আজকের অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। যেখানে উদ্যোগী উদ্যমশীল বুদ্ধিমান মানুষ সুলভ ছিল, সেখানকার সমাজের বিকাশ হয়েছে দ্রুত। এভাবে কেউ সৃজন করে আর কেউ অনুকরণ করে এগিয়েছে। যারা সৃজনও করতে পারেনি, গ্রহণও করেনি, সেই আরণ্য-মানব আজো প্রায় আদিম স্তরেই রয়ে গেছে।

মানুষের মন-বুদ্ধি-প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে দুইভাবে—ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটানোর কাজে এবং মননের উৎকর্ষসাধনে। মূলত সবটাই ছিল জীবন-জীবিকা সংপৃক্ত। বিকাশের ধারায় জীবন যখন বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য পেয়ে–পেয়ে জটা-জটিল হয়ে উঠল, তখন তনু-মনের চাহিদা বাহ্যত ভিন্ন হয়ে দেখা দিল। একদিকে আজ গ্রহাভিসারী যন্ত্র যেমন দেখছি, অন্যদিকে অস্তিত্ববাদাদি নানা তত্ত্ব-চিন্তারও তেমনি উদ্ভব হয়েছে। অজ্ঞতাপ্রসূত ভয়-বিস্ময়-কল্পনাই ক্রমে মানুষকে কারণ-ক্রিয়া সচেতন করে তোলে। ভয়-বিস্ময় থেকে যে-জিজ্ঞাসার উৎপত্তি এবং অজ্ঞের কল্পনা দিয়ে তার উত্তরস্বরূপ যে-জ্ঞান লব্ধ, তা কখনো যথার্থ হতে পারে না। তবু কৌতূহলী মন বুঝ মানে না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার, সাধ ও সাধ্যের, প্রয়াস ও প্রাপ্তির অন্তরায়রহস্য মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেই ভাবনা সর্বপ্রাণবাদ, জাদুবিশ্বাস, টোটেম-টেবু তত্ত্ব প্রভৃতির জন্ম দিয়েছে। তার বিসূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপ পাই পুরাতত্ত্বে বা Metaphysics-এ। অদৃশ্যকে দেখার, অধরাকে ধরার, অচিন্ত্যকে চিন্তাগত করার, অজ্ঞেয়কে জানার এই প্রয়াস নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অসাফল্যে বিড়ম্বিত। তবু 'নিশি-পাওয়া' লোকের মতো কিংবা বিবাগীর মতো পথ চলে পথের দিশা খুঁজে অনিঃশেষ পথে বিচরণের আনন্দটাকে বিশ্বাসীজন জীবনের পরম সার্থকতা বলেই মানে।

জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাসের জন্ম। বন্ধ্যা মনেই বিশ্বাসের লালন, যুক্তিহীনতার বিশ্বাসের বিকাশ। কাজেই যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা পুতুলে চক্ষু বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি দানের অপপ্রয়াসেরই নামান্তর।

কিন্তু চিরকাল অজ্ঞ-অসহায় মানুষ বিশ্বাসকে আশ্রয় করে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভরসা পেতে চেয়েছে, চেয়েছে নিশ্চিন্ত হতে। তাই তার কল্পনালব্ধ জ্ঞান তাকে চিরকালই আশ্বস্ত করেছে।

এই জ্ঞানই তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রজ্ঞা নামে হয়েছে পরিচিত এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞাশ্রয়ী শাস্ত্রই ধর্ম ও ধর্মবোধ রূপে সমাজে পেয়েছে স্থিতি। শাস্ত্র অবশ্য সেদিন গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে বৃহত্তর গণসমাজ গড়ে তুলে মানুষের বিকাশ ত্বরান্বিত করেছিল। তাই তখনকার শাস্ত্রের কালিক উপযোগ অবশ্য স্বীকার্য। এই Metaphysical জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্বাসের অঙ্গীকারে দৃঢ়মূল হয়ে আচার-সংস্কারে পরিণতি পায়। তখন লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই মানুষের জীবনযাত্রার ভিত্তি ও জীবনযাপনের দিশারী হয়ে ওঠে। তখন বিশ্বাস-সংস্কারের নিয়ন্ত্রণেই মানুষের জীবন যান্ত্রিকভাবে হয় চালিত। তখন তনুর জীবন ও মনের জগৎ হয়ে পড়ে আলাদা এবং মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন তনুকে তুচ্ছ জেনে মনকে করে তোলে উচ্চ। তেমন স্তরের মনের প্রেরণায় উচ্চারিত হয়–

"বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।"

এই Metaphysical তত্ত্বের প্রসারে পাই Philosophy. Philosophy'র সাধারণ অভিধা হচ্ছে 'প্রজ্ঞা-প্রীতি', 'দর্শন'-এর সাধারণ লক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখা। দুটোই মূলত এক চেতনার গভীরে জীবন–সংপৃক্ত জগৎকে কিংবা জগৎ-প্রতিবেশে জীবনকে তার সামগ্রিক স্বরূপে ও তাৎপর্যে উপলব্ধি বা ধারণ করার চেষ্টা।

সাধারণভাবে দর্শনশাস্ত্রাশ্রয়ী অর্থাৎ শাস্ত্রের তাত্ত্বিক তাৎপর্য সন্ধানই ছিল দার্শনিকদের লক্ষ্য। এতে যে প্রত্যয়ানুগত্য, প্রতিজ্ঞানুসরণ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্টতা ছিল, তাতে সংকীর্ণ-সরণীতে মানস-বিচরণ সম্ভব ছিল বটে কিন্তু নিরপেক্ষ, অনপেক্ষ কিংবা সার্বিক শ্রেয়সের তত্ত্ব থাকত অনায়ত্ত। বলতে গেলে পুরোনোকালে কেবল গ্রিসে ও ভারতেই বিশুদ্ধ তত্ত্বচিন্তা কিছুকাল প্রশ্রয় পেয়েছিল।

কোনো সীমিত চিন্তাই অখণ্ড তত্ত্ব বা সত্যের সন্ধান পায় না। শাস্ত্রীয় দর্শনও তা-ই দেশ-কাল-জাত-বর্ণ-গোত্রের ছাপ এড়িয়ে সর্বজনীন হতে পারেনি। আবার বিশুদ্ধ তত্ত্ব-চিন্তাও শাস্ত্রানুগত বিশ্বাসী মানুষকে তার সংস্কার-লালিত পুরোনো প্রত্যয়ের দুর্গ থেকে মুক্ত করতে পারে না। তাই দর্শনচর্চা ব্যক্তিক রুচি, মন ও মনন যতটা উন্নত ও প্রসারিত করে, সমাজমনে তার প্রভাব ততটা পড়ে না। তবু একসময় আচার-সংস্কাররূপে তার তাত্ত্বিক প্রভাব গোটা সমাজ-মানসকে চালিত করে। দর্শনের গুরুত্ব ও সার্থকতা তাই অপরিমেয়। বলা চলে মনুষ্য–সংস্কৃতির উৎকর্ষ পরোক্ষে দর্শন ও দার্শনিকেরই দান।

ভূমিকা না বাড়িয়ে এবার বাংলার ও বাঙালীর দর্শনের কথা বলি।

বাঙালীরা রক্তসঙ্কর জাতি। বিভিন্ন গোত্রীয় রক্তের আনুপাতিক হার অবশ্য আজো অনির্ণীত। তবু প্রমাণে-অনুমানে বলা চলে শতকরা সত্তরভাগ অষ্টিক, বিশভাগ ভোট চীনা, পাঁচভাগ নিগ্রো এবং বাকি পাঁচভাগ অন্যান্য রক্ত রয়েছে বাঙালী-ধমনিতে। বাংলাদেশও ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং ভৌগোলিক বিচারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারই অন্তর্গত। বাহ্যত প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উত্তরভারত-প্রভাবিত হলেও অন্তরে এর মানস-স্বাতন্ত্র্য এবং স্বভাবের বৈশিষ্ট্য কখনো হারায়নি। মিশ্ররক্তপ্রসূত স্বভাবের সাঙ্কর্যই হয়তো বাঙালীর এই অনন্যতার কারণ। অবশ্য তার সবটা কল্যাণপ্রসূ হয়নি কখনো।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র বরণের মাধ্যমে বাঙালীর সঙ্গে উত্তরভারতীয় ভাষা-সংস্কৃতি-সভ্যতার পরিচয় ঘটে। এভাবেই বাঙালীর আর্যায়ন সম্ভব হয়। এতে বর্বর যুগের বাঙালীর ভাষা-পোশাক, বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়মনীতি, প্রথা-পদ্ধতির প্রায় সবখানিই বাহ্যত পরিত্যক্ত হয়। তবু থেকে গেছে বিশ্বাস-সংস্কারের অনেকখানি–যার স্থিতি বাঙালীর মর্মমূলে। এই থেকে-যাওয়া অবিমোচ্য স্বাতন্ত্র্য ও স্ব-ভাবই তার অনন্যশক্তির উৎস এবং স্বতন্ত্র-স্থিতির ভিত্তি।

বাঙালী বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু কোনো ধর্মই সে অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলামকে সে নিজের পছন্দমতো রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে। নৈরাত্ম্য নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম এখানে মন্ত্রযান, কালচক্রযান, বজ্রযান-সহজযানে বিকৃতি ও বিবর্তন পায়। বৌদ্ধ চৈত্য হয়ে ওঠে অসংখ্য দেবতা-অপদেবতার আখড়া। জৈনধর্ম পরিত্যক্ত হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাহ্মণ্যধর্মও স্থানিক দেবতা-উপদেবতা-অপদেবতার প্রবল প্রতাপের চাপে পড়ে যায়। ইসলামও ওয়াহাবি-ফারায়েজি আন্দোলনের আগে পীরপূজায় অবসিত হয়। বিদ্বানেরা এর নাম দিয়েছেন লৌকিক ইসলাম। উল্লেখ্য যে, এসব দেবতা-পীর ঐহিক জীবনেরই ইষ্ট বা অরিদেবতা পারত্রিক পরিত্রাণের নয়। এতেই বোঝা যায় বাঙালী ঐহিক জীবনবাদী অর্থাৎ জীবনজীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যকামী—ভোগলিন্সু। অবশ্য সব ধর্মই কালে কালে স্থানে স্থানে বিকৃত হয়, কিন্তু বাঙালীর ধর্মের বিকৃতিতে বাঙালী-স্বভাব ও মনন যত প্রকট, এমনটি অন্যত্র বিরল। বাঙালী তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছে, তার কারণ বাঙালী কখনো তার অনার্য সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র নামের দর্শনে ও চর্যায় তার আস্থা ও আনুগত্য হারায়নি। ঐ নিরীশ্বর তত্ত্বে ও চর্যায় তার নিষ্ঠা কিছুতেই কখনো বিচলিত হয়নি। তার কারণ বাঙালী মুখে মহৎ বুলি আওড়ায় বটে, কিন্তু আসলে সে এ জীবনকেই সত্য বলে মানে এবং পারত্রিক সুখকে সে মায়া বলেই জানে। তাই সে এই মাটির মায়াসক্ত জীবনবাদী। সে বস্তুতান্ত্রিক, ভোগলিপ্সু, তাই সে সশরীরে অমরত্বকামী। এজন্যেই সাংখ্যের প্রাণ-রসায়নতত্ত্ব, আয়ুবর্ধক যোগ ও শক্তিদায়ক তন্ত্র তার প্রিয় হয়েছে। চিরকালই তার সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসা ও প্রয়াস জীবনভিত্তিক ও জীবনকেন্দ্রী। তার সাধনা বাঁচার জন্যেই। তাই সে দেহাত্মবাদী। সে জানে দেহাধারস্থিত চৈতন্যই জীবন। দেহ ও আত্মার আধার-আধেয় সম্পর্ক, একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব। তার কাছে ভবসমুদ্রে দেহ হচ্ছে মন-পবনের নাও। মন-পবনের সংস্থিতি ও সহস্থিতিই রাখে দেহ-নৌকা ভাসমান ও সচল। তবে যৌগিক চর্যার মাধ্যমে দেহকলে বায়ু সঞ্চালন আয়ত্তে রাখতে হয়। আর ভূতসিদ্ধির জন্যে তান্ত্রিক সাধনা স্ব-স্ব আঙুলের মাপের চৌরাশি অঙুলি পরিমিত দেহ-নৌকাকে কাণ্ডারীর মতো স্বেচ্ছা-পরিচালনার শক্তি যে অর্জন করে সে-ই হচ্ছে চৌরাশি-সিদ্ধা। এ সাধনা ভোগলিপ্সুর দীর্ঘ-জীবনোপভোগের সাধনা। আত্মরতিই তার মূল জীবন-প্রেরণা। তাই স্ব-স্বার্থেই সে নিঃসঙ্গ সাধনা করে। আত্মকল্যাণেই সে সদ্‌গুরুর দীক্ষা কামনা করে বটে, কিন্তু তার আত্মিক কিংবা অধ্যাত্মসাধনায় সমাজ-চেতনা নেই। এই জীবনতত্ত্ব তার বৈষয়িক জীবনকেও গভীরভাবে করেছে প্রভাবিত। বজ্রযানী ও সহজযানীরা ছিল যোগতান্ত্রিক—তাদের লক্ষ্যই ছিল আত্মকল্যাণ ও আত্মমোক্ষ বজ্র-সহজযানীর উত্তরসাধক সহজিয়া বৈষ্ণব কিংবা বাউলেরা আজো তাই ভোগমোক্ষবাদী। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমমোক্ষবাদও কোনো পার্থিব কিংবা সামাজিক শ্রেয়সের সন্ধান দেয়নি। সবাই আত্মকল্যাণেই বৈরাগ্যবাদী। বাস্তব ও বৈষয়িক জীবনকে তুচ্ছ জেনে ঐসব পরান্নজীবী মোক্ষকামীরা বাঙালীর সমাজে-সংসারে বৈরাগ্য মাহাত্ম্য প্রচার করে বাঙালীর ক্ষতি করেছে অপরিমেয়। কেননা, যে মানুষ ভোগলিপ্সু অথচ কর্মকুণ্ঠ তার জীবিকা অর্জনের পথ দুটো -ভীরুর পক্ষে ভিক্ষা এবং সাহসীর জন্যে চুরি। বৈষয়িক দায়িত্বে ও কর্তব্যে ঔদাসীন্য ও ভিক্ষাজীবিতা এদেশে অধ্যাত্মসিদ্ধির রাজপথ বলে অভিনন্দিত হয়েছে সেই ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন মুনি-ঋষি-যোগী-শ্রমণদের আমল থেকেই। ফলে আজো ভিখিরিরা সাধু-ফকির রূপে সম্মানিত। এদেশের বামাচারী-ব্রহ্মচারী যোগী-সন্ন্যাসী কিংবা পীর-ফকিরেরা পারত্রিক শ্রেয়সের নামে মানুষকে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট করে বৈষয়িক জীবনকে বন্ধ্যা করে রাখতে চেয়েছে; চিরকালানুতিক কর্মে ও কর্তব্যে কখনো তাদের অনুপ্রাণিত করেনি কেউ। কিন্তু তত্ত্বকথা শুনতে ভালো হলেও তাতে জৈব প্রয়োজন মেটে না, তাই মানুষ প্রবৃত্তিবশেই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে আত্মকল্যাণ খুঁজেছে। বহুজন-হিতে বহুজন-সুখে যেহেতু কখনো সংঘবদ্ধ প্রয়াসের প্রেরণা মেলেনি, সেহেতু বাঙালীমাত্রই ব্যক্তিক লাভ ও লোভের সন্ধানে ফিরেছে কালো পিঁপড়ের মতো। সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রিক জীবনে সামগ্রিক কল্যাণলক্ষ্যে যে যৌথপ্রয়াস আবশ্যিক, তার অভাবে বাঙালী কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি স্বয়ম্ভর কিংবা স্বাধীনভাবে। তাই সে চিরকাল বিদেশী-বিভাষী-শাসিত ও শোষিত। বিরুদ্ধ পরিবেশে তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার উদ্যম স্বার্থপরতায়, তার শক্তি ঈর্ষায়, অসূয়ায় ও পরস্বাপহরণে অবসিত এবং সে আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে দেবানুগ্রহে ও পরানুগ্রহে বাঁচতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সে স্বসৃষ্ট দেবাশ্রিত। লৌকিক দেবতা ও কাল্পনিক পীরপূজার উদ্ভব ও প্রসার বাংলাদেশে এভাবেই ঘটেছে এবং ঘটেছে অন্তত ঐতিহাসিকভাবে বৌদ্ধযুগ থেকে। জীবন-জীবিকার অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিকে তোয়াজে-তোষামোদে তুষ্ট রেখে দেবানুগ্রহে নিশ্চিন্ত-নিষ্ক্রিয় জীবনোপভোগকামী বলেই কর্ম ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে আত্মশক্তির ও পৌরুষের প্রয়োগ বাঙালী জীবনে বিরলতায় দুর্লভ।

অতএব কর্মকুণ্ঠ ভোগলিপ্সু বাঙালীর জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা দুভাবে প্রকটিত হয়েছে : এক, দীর্ঘজীবনলাভ ও জীবনকে নির্বিঘ্নে উপভোগ-বাঞ্ছায় অলৌকিক শক্তিধর হবার জন্যে দেহাত্মবাদী বাঙালীর যোগতান্ত্রিক সাধনায় এবং তুক-তাক, বাণ-টোনা, ঝাড়-ফুক, দারু-উচাটন, জাদুমন্ত্র, কবজ-মাদুলি, মারণ-বশীকরণ প্রভৃতির অনুশীলনে ও প্রয়োগে; দুই, বিভিন্ন শক্তি ও ফলপ্রতীক স্বসৃষ্ট লৌকিক দেবতা ও পীরের স্তুতি-স্তাবকতায়। এবং সবটাই চলেছে বিদেশাগত বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি শাস্ত্রের নামে। যদিও তখনো মূল শাস্ত্রগুলোও শাস্ত্রবিদ ও সমাজপতির স্বার্থে ক্ষীণভাবে চালু ছিল।

ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে বাংলায় স্মরণীয় পুরুষ বিরল ছিলেন না। মীননাথ- গোরক্ষনাথ-শীলভদ্র-দীপঙ্কর-অম্বরনাথ-হাড়িপা-কানুপা - রামনাথ - রঘুনাথ - রঘুনন্দন- চৈতন্য রামমোহন রামকৃষ্ণ প্রমুখ অনেকেই বাঙালী মনীষার প্রমূর্ত প্রতীক। কিন্তু এঁদের দেহাত্মবাদ, নির্বাণবাদ, মোক্ষবাদ, প্রেমবাদ, সেবাবাদ কিংবা শাস্ত্রানুগত্য মাটির মানুষের কোনো জাগতিক কল্যাণ সাধন করেনি।

মধ্যযুগে বিজাতি-বিদেশী-বিভাষী বিধর্মীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্জিত শ্রেণীর মধ্যে যে চেতনা, চাঞ্চল্য ও দ্রোহ দেখা দিল, উত্তর-ভারতীয় আদলে ইসলামি সাম্য ও সুফিতত্ত্বের অনুসরণে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশ বাঙলায় চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তা রূপ পেল। এই বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন এবং ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল বটে, কিন্তু তা পরিণামে বাঙালীর পক্ষে কল্যাণকর হয়নি। আবার উনিশ শতকে কোলকাতার ম্লেচ্ছস্পর্শ দোষে সমাজ-পরিত্যক্ত ভদ্রলোকদের হিন্দু রাখার প্রত্যক্ষ প্রেরণায় রামমোহন প্রবর্তন করেন ব্রাহ্মমত। উভয়ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল বটে, কিন্তু কোনটাই সমাজ-বিপ্লবের রূপ নিয়ে বাঙালী জীবনে সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার কিংবা চেতনায় নবরাগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

বাস্তব ও বৈষয়িক জগৎকে আড়াল করে দেহাত্মবাদী বাঙালী নিঃসঙ্গভাবে যে আত্ম ও আত্মিক উন্নয়ন কামনা করেছে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে তা মনন ও অধ্যাত্মক্ষেত্রে গৌরব-গর্বের বিষয় ছিল। তার মনন ও জীবনদৃষ্টি ঐহিক-পারত্রিক সুখলোভী আস্তিক মানুষের আত্মপ্রীতিপ্রবণ চাহিদা মিটিয়েছিল। এদেশে আজীবিক ছিল, কপিল-চার্বাকচেলা নাস্তিক ছিল, বৌদ্ধ নির্বাণবাদপ্রসূত উচ্চ দার্শনিক চিন্তার প্রসূন শূন্য ও বজ্রতত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল। গুণরত্ন-চেলাদের লোকায়তিক দর্শন বিকাশ পেয়েছিল। প্রতিবেশী ভোট-চীনার প্রভাবে যোগতান্ত্রিক সাধনাও প্রাধান্য পেয়েছিল। আজো বাঙালীর অধ্যাত্মসাধনামাত্রই যোগতন্ত্রভিত্তিক। শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈতবাদ, গৌড়ীয় ন্যায়, গৌড়ীয় স্মৃতি, পীর-নারায়ণ সত্যের অভিন্ন অঙ্গীকারে মানুষের মিলনসাধনা, শাক্তদের নবমাতৃতত্ত্ব—রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণে যার বিকাশ; রামমোহনের ব্রহ্মবাদ প্রভৃতি মননক্ষেত্রে বাঙালীর বিশ্রুত ও অক্ষয় কীর্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা হয়তো বাঙালী মননের ঐ ধারায় ত্রুটি আবিষ্কার করবেন। তাঁরা বলবেন, চিরশোষিত দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকজীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে সেই নির্মিত ভুবনে বিহার করে সার্থককাম ও আনন্দিত হতে চেয়েছে পৌরুষহীন, কর্মকুণ্ঠ, দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। কিন্তু রক্তসঙ্কর বাঙালীর মন ও রুচি আলাদা। কবির ভাষায় তার বক্তব্য হয়তো এরূপ:

এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ
চাহিনে করিতে বাদ প্রতিবাদ
যে কদিন আছি মানসের সাধ
মিটাব আপন মনে।
যার যাহা আছে তার থাকা তাই
কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই
শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই
একটি নিভৃত কোণে।

দেহতাত্ত্বিক বাঙালীর বিশ্বাস 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা-ই আছে দেহভাণ্ডে'। তাই আজো সে দেহাধারে সব-পাওয়ার সাধনা করে। তাই রবীন্দ্রনাথও বলেন :

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না
এই জানারই সাথে সাথে
তোমায় জানা।

AMARBOI.COM

এটি এদেশের সুপ্রাচীন উচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা। মর্ত্যজীবনের মাধুর্যে আকুল, দেহাধারে অমৃত সন্ধানী বাঙালী বলে :

কিংতো দীবে কিংতো নিবেজ্জেঁ
কিংতো কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ।
কিংতো তিত্থ-তপোবন জাই
মোক্‌খ কি লবভই পানী হ্নাই।

—কী হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কী হবে তোর? তীর্থ-তপোবনই বা তোকে কী দেবে? পানিতে স্নান করলেই কি মুক্তি মেলে?

আজকের বাউল-সাধকেরও সে-বিশ্বাস অটুট :

সখীগো জন্মমৃত্যু যাঁহার নাই
তাঁর সনে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তাঁর
দেহের সাধন সর্ব সার
তীর্থ ব্রত যার জন্য—
এ দেহে তার সব মেলে।

দেহাত্মবাদী নিরীশ্বর বাঙালী বিদেশী শাস্ত্রের প্রভাবে আস্তিক হলেও তার দেহভিত্তিক সাধনা ও দেহানুরাগ বিচলিত হয়নি কখনো। তাই লালন কিংবা রবীন্দ্রনাথের মুখে একই ব্যাকুলতা ধ্বনিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন বলেন : আমাদের এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে
তারে জনমভর একবার দেখলাম নারে
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে।

অথবা— এই মানুষে সেই মানুষ আছে
আমার হল কি ভ্রান্ত মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন।

এবং একবার আপনারে চিনলে পরে।
যায় অচেনারে চেনা।

রবীন্দ্রনাথও বলেন : আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে
দেখতে আমি পাইনি
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানে চাইনি।

কাজেই বাঙালী মননের তথা জীবনচেতনার ও জগৎভাবনার গতিপ্রকৃতিই আলাদা এবং তা দুহাজার বছর ধরে মূলত অভিন্নই রয়েছে। আদিকালের বাঙালীমাত্রই দেহাত্মবাদী ও নিরীশ্বর। সাংখ্যই তার দর্শন, যোগ-তন্ত্রই তার চর্যা। এবং বিদেশীতত্ত্ব প্রভাবিত অধ্যাত্মবাদী বাঙালীমাত্রই অদ্বৈতবাদী ও কায়াসাধক।

বাঙ্গালী মুসলিমের ক্ষেত্রেও এ তথ্য প্রযোজ্য। মধ্যযুগের মুসলিম কবি-সাধকরাও ছিলেন যোগপ্রিয় ও অদ্বৈতবাদী। এমনকি বামাচারও কেউ কেউ পছন্দ করতেন। সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, শেখ চান্দ, মীর মুহম্মদ শফী, আলী রজা, শেখ মনসুর, শেখ যাহিদ, নেয়াজ, মোহসিন আলী, শেখ জেবু, রমযান আলী, রহিমুল্লাহ, সিহাজুল্লাহ প্রভৃতি তো যোগ ও অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থই রচনা করেছেন। রহিমুল্লাহর গ্রন্থের নাম *তনতেলাওৎ*—মানে কায়াসাধন। গর্ভলক্ষণ, প্রাণসঙ্কলি, শুক্রতত্ত্ব, নাড়িতত্ত্ব ও মৃত্যুলক্ষণ প্রায় সব গ্রন্থেরই মুখ্য আলোচ্য বিষয়।

বাঙালী চিরকাল দেহতত্ত্ব দিয়েই জীবনরহস্য ও জগৎতত্ত্ব বুঝাবার সাধনা করেছে। এভাবেই তার আনন্দিত জীবন-স্বপ্ন রূপ পেয়েছে। সবটাই অবশ্য আত্মরতিপ্রসূত আত্মসাধন সংপৃক্ত। তবু সংকীর্ণ সরণীতে হলেও সে উচ্চমার্গের সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তায় সমর্থ হয়েছে। মানব-মনীষার ক্ষেত্রে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর এ অবদান চিন্তাজগতে তথা বিশ্বের মনন সাহিত্যে আমাদের কীর্তিমিনার।

বাঙালীর জীবনদৃষ্টি এরূপ ভিন্ন ছিল বলেই সে অতীতে কখনো রাজ্যগৌরব, শাসনদণ্ড, ধনগর্ব, ক্ষমতার দাপট কিংবা বাহুবলের প্রতাপ কামনায় বা অর্জনে উৎসাহবোধ করেনি। সে নিজের মতো করে নিজেকে জেনেই তৃপ্ত থেকেছে, আত্মসমাহিত জীবনে সে আনন্দিত ও পরিতুষ্ট রয়েছে। দুর্বৃত্তের সামাজিক ও দুর্ধর্ষের রাষ্ট্রিক শাসন-পীড়ন, শোষণ-পেষণ তাকে মনের দিকে বিচলিত করেনি, করেনি স্বভাবভ্রষ্ট। কিন্তু সমাজস্বার্থ নিরপেক্ষ ঐ জীবনতত্ত্ব বাঙালীর বৈষয়িক ও নৈতিক জীবন বিড়ম্বিত করেছিল। সমাজের বিশেষ মানুষ যখন জীবনতত্ত্ব বিশ্লেষণে ও মোক্ষতত্ত্ব আবিষ্কারে নিষ্ঠ ও একাগ্রচিত্ত, তখন সাধারণ মানুষ জৈবিক ও বৈষয়িক প্রয়োজনে, শ্রেষ্ঠ মানুষের নেতৃত্বের ও নির্দেশের অভাবে, ব্যক্তিগত প্রয়াসে প্রাণ বাঁচানোর যথেচ্ছ উপায় অবলম্বনে ব্যস্ত। যারা বাঙালীর জীবনদৃষ্টির খবর জানত না, সেই বিদেশী শাসক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যটকরা হাটের-ঘাটের বাটের-মাঠের ইতর মানুষকে বাঙলার ও বাঙালীর প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষ বলে পটু বলে বাঙালীর নিন্দা রটিয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে। নিন্দিত বাঙালী আজো তা স্মরণে লজ্জিত হয়।

এ অবধি আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙালীর জগৎচেতনা ও জীবনভাবনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে প্রয়াস পেয়েছি। এবার আধুনিক বাঙালীভাবনার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে প্রতীচ্য শাসন ও শিক্ষার, বিদ্যা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বিশ্বের উন্নত ও জাগ্রত জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালীর মানস-সংযোগ ঘটে। এর ফলে এদেশের জড় সমাজে বিচলন ও সংস্কার-জীর্ণ বন্ধ্যাচিত্তে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। বন্দর-নগরী ও রাজধানী কোলকাতায় নবশিক্ষিতরা দেখল রেনেসাঁস-রিফর্মেশন-রেভেলিউশনের প্রসাদপুষ্ট ও ইনকুইজিশন-মুক্ত বুর্জোয়া য়ুরোপ বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে-সাম্রাজ্যে, ধনে-যশে-মানে, সেবায়-সৌজন্যে-মানবতায়, উদ্যোগে-উদ্যমে-প্রাণময়তায়, প্রতাপে-প্রভাবে-দাপটে প্রদীপ্ত ভাস্করের মতো আশ্চর্য বিভায় শোভমান। আর নিজেদের প্রতি তাকিয়ে দেখল সংস্কারজীর্ণ, আচারক্লিষ্ট বন্ধ্যাসমাজ মধ্যযুগের বর্বর নারকীয় পরিবেশে স্থির হয়ে আছে। এ লজ্জা তাদের শিক্ষার্জিত নবজীবন-চেতনায় ও নবলব্ধ আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত হানল। য়ুরোপীয় আদলে জীবন রচনার ও সমাজ গড়ার এক অতি তীব্র অন্ধ আবেগ তাদের পেয়ে বসল। জীবন ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে নতুন কিছু করার জন্যে তাই তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল—বলা চলে আবেগ-প্রাবল্যে উৎকণ্ঠাবশে তারা দিশেহারার মতো ছুটোছুটি শুরু করল।

কিন্তু গোড়ায় রয়ে গেল গলদ। য়ুরোপ তাদের মনে যত আকাঙ্ক্ষা জাগাল, যত উত্তেজনা দিল, সে পরিমাণে 'য়ুরোপীয় চিত্ত' তাদের বোধগত হল না। তাই তাদের আন্তরিক প্রয়াস প্রত্যাশা-পূরণে হল ব্যর্থ। প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতাপ্রীতি, কল্যাণবাদ, মানবতা, প্রগতি, লোকহিত, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনোটাই স্বরূপে উপলব্ধি করবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে, প্রগতির নামে নির্লক্ষ্য দ্রোহকেই তারা বরণ করে। লোকহিত তাদের কাছে ছিল স্বশ্রেণীর কল্যাণবাঞ্ছা মাত্র। জাতীয়তা তাদের কাছে স্থান-কালহীন স্বধর্মীর সংহতি মাত্র। বাঙলার প্রশাসনিক ক্রান্তিকালে অন্ধ বিজাতি-বিদ্বেষ যেমন ফকির-সন্ন্যাসীদের নির্লক্ষ্য লুটেরা বানিয়েছিল, তেমনি ওহাবিদের কিংবা আর্যসমাজীদের করেছিল স্থান-কালহীন স্বধর্মীর হিতবাদী, তেমনি রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম হয়েছিলেন স্বশ্রেণীর কল্যাণকামী। সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জেগেছিল বটে, কিন্তু বিধবা-বিবাহ প্রচলনে, বহুবিবাহ নিবারণে কিংবা নারী-পর্দা বর্জনে ও নারীশিক্ষা দানে বাস্তব উৎসাহ দেখা যায়নি। স্বাধীনতা-প্রীতি জাগল, ফরাসি বিপ্লব মুগ্ধ করল এবং সাম্য-ভ্রাতৃত্ব-স্বাধীনতাসার্বক্ষণিক উচ্চারণের বিষয় হল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্য তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি, সমর্থন পায়নি সিপাহি-বিপ্লব। কোঁতের হিতবাদ ও নাস্তিকতা শিক্ষিত বাঙালীর-বঙ্কিমেরও—মন হরণ করল বটে, কিন্তু নাস্তিক রইল দুর্লভ, গণমানবের হিত-কামনা রইল বিরল। রামকৃষ্ণের-বিবেকানন্দের লোকসেবা দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত—মানবতার নামে উৎসর্গিত নয়। জমিদারসমিতি গড়ে উঠল, কৃষকসমিতি তৈরী হল না। য়ুরোপে দেখল রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, আর নিজেদের জন্যে কামনা করল ধর্মীয় জাতিসত্তা। তাই বাঙ্গালী হিন্দু শিক্ষিত হয়ে হিন্দু হয়েছে, মুসলিম হয়েছে মুসলিম—কেউ বাঙালী থাকেনি। হিন্দু কংগ্রেস ময়দানী বক্তৃতায় ভারতবাসী মাত্রেরই মিলন ও সংহতি কামনা করেছে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্জিত স্বধর্মীর কায়িক স্পর্শকে জেনেছে অপবিত্র বলে। তাই হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগই এদেশে টিকল, বাঙালী হিন্দু দিল্লির অভিভাবকত্বে পেল স্বস্তি, বাঙালী মুসলিম করাচীর কর্তৃত্বে হল নিশ্চিন্ত। বাংলা ও বাঙালী যে খণ্ডিত হল, বিচ্ছিন্ন হল, তাতে দুঃখ করবার রইল না কেউ। দেশ নয়, ভাষা নয়, গোত্র নয় ধর্মই আজো বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তি।

উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালী-হিন্দু প্রেরণার উৎসস্বরূপ গৌরব-গর্বের ঐতিহ্যিক অবলম্বন খুঁজেছে আর্যাবর্তে, ব্রহ্মাবর্তে, রাজপুতনায় ও মারাঠা অঞ্চলে, মুসলিমরা ঢুঁড়েছে আরবে, ইরানে ও মধ্য এশিয়ায়। এমনকি দেশের এ-যুগের মহত্তম মানবতাবাদী পুরুষ রবীন্দ্রনাথও এ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেননি। পাণ্ডববর্জিত বাঙলার অধিবাসী হয়েও ব্রাহ্মণ্যসংস্কারবশে তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের আর্য উত্তরভারতে, রাজপুতনায়, মারাঠা অঞ্চলে, শিখ ইতিহাসে ও বৌদ্ধপুরাণে স্বজাতির গৌরব গর্বের ইতিকথা খুঁজেছেন, বিদেশী তুর্কি-মুঘলের প্রতি অশ্রদ্ধাবশে সাতশ' বছরের ভারত-ইতিহাসকে তিনি এড়িয়ে গেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে অস্বীকৃত হয়েছে সাতশ বছরকাল পরিসরে দেশী মুসলিমের অস্তিত্ব। স্বাধীনতাকামী সন্তানরূপে হিন্দুভারতেরই স্বাধীনতা কামনা করেছে, তার আগেও হিন্দুমেলাওয়ালারা স্বধর্মীর বাঙলা তথা ভারতেরই স্বপ্ন দেখেছে। সন্ত্রাসবাদী স্বদেশপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ মানবকল্যাণকামী হয়েও অবশেষে যোগীসাধক শ্রীরবিন্দ রূপে প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার চোরাবালিতে মানবমুক্তির সন্ধান করেছেন। মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব বাঙলায় বা ভারতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিতদের কেউ মনের দিক দিয়ে সুস্থ ও স্বস্থ ছিলেন না। তাঁরা কেবল হিন্দু কিংবা শুধু মুসলমান ছিলেন। যে প্রতীচ্য বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-সমাজ-রাষ্ট্র তাঁদের আধুনিক জীবনভাবনায় অনুপ্রাণিত করেছে, তার Spirit চেতনার গভীরে ধারণ করা যায়নি বলে তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে বিকৃতি ও বৈপরীত্য এসেছে। ফলে তাঁদের সব প্রয়াস অসামঞ্জস্যের শিকার হয়ে বিড়ম্বিত ও ব্যর্থ হয়েছে। প্রতীচ্যের অনুকৃতি ও প্রাচ্য-স্বভাবের টানাপোড়নে আলোচ্য যুগের কথায় ও কর্মে কিছু জটিলতা দেখা দিলেও আধুনিকতার আবরণ উন্মোচন করলে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-তিতুমির-দুদুমিয়া-মেহেরুল্লাহ-মৌলানা বাকী-আকরম খাঁ সবাইকেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী মন ও মননের প্রতিভূরূপেই দেখতে পাই। সেই শ্রেণী-চেতনা, সেই স্বাধর্ম্য, সেই বৈরাগ্য, সেই আধ্যাত্মিকতা, সেই সংকীর্ণজীবন-চেতনা ও বাস্তব বিমুখতা, সেই নিঃসঙ্গতা, সেই আত্মরতি তাদের মনে-মননে, কথায়-কর্মে অবিকৃতভাবেই অবিরল রয়েছে। চোখ-ধাঁধানো ও মন-ভোলানো আধুনিকতা তাদের মনে-মননে প্রলিপ্ত চন্দনের মতোই বিজড়িত বটে কিন্তু অন্তরঙ্গ নয়। তাই যে-মাটি মায়ের বাড়া, হাজার বছরের পরিচিত জ্ঞাতি-বিধর্মী যে প্রতিবেশী তাদের পর করে পরকে প্রিয় ভাবতে তারা এতটুকু বেদনাবোধ করেনি। গত দেড়শ বছর ধরে বাঙলাদেশে বঙ্গপ্রবাসী হিন্দু ছিল মুসলমানও ছিল কিন্তু বাঙালী ছিল না।

দৈশিক জাতীয়তায় বাঙালী দীক্ষিত হয়নি, এ যন্ত্রযুগেও যৌথকর্মে পায়নি দীক্ষা। জনে জনে জনতা হয়, মনের 'সায়' না থাকলে একতা হয় না, একত্রিত হওয়া সহজ কিন্তু মিলিত হওয়া সাধনা সাপেক্ষ। সে-সাধনা বাঙালী করেনি, তাই আবেগবশে সে ক্ষণিকের জন্যে উদার হয়, উত্তেজনাবশে সে ক্ষণিকের জন্য মরণপণ সংগ্রামে নামে, মৌহূর্তিক স্বার্থবশে ঐক্যবদ্ধও হয় কিন্তু কোনোটাই টেকে না। তাই চৈতন্যের সাম্য ও প্রীতিভিত্তিক প্রেমবাদও বাংলায় ব্যর্থ হল। এজন্য বাঙালী বৈষয়িক জীবনে কোনো বৃহৎ কর্মে উদ্যোগী হলেও সফল হয় না। লীগ-কংগ্রেসের জন্ম বাঙলায়, বিদ্বান বুদ্ধিমানও বাঙলায় সুলভ ছিল, তবু নেতৃত্ব বাঙালীর হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকেনি। সঙ্ঘশক্তি নেই বলে সে চিরকাল বিদেশী শাসিত-শোষিত ও দুস্থ। নিজে বঞ্চিত স্বধর্মীর গৌরব ও ঐশ্বর্যগর্বে সে গর্বিত ও আনন্দিত থাকে।

আজো বাঙলাদেশে এমন একজন অবিসম্বাদিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানববাদীর আবির্ভাব হয়নি, যাঁকে আদর্শ মানুষ ও মানবপ্রেমিক বা নিরপেক্ষ গণকল্যাণকামী পুরুষ বা নারী হিসেবে সন্তানের সামনে অনুকরণীয় বলে স্মরণ করা যায় কিংবা ঘরে প্রতিকৃতি টাঙিয়ে রাখা চলে অনুপ্রাণিত হবার সদুদ্দেশ্যে। সমাজের বা ইতিহাসের এর চেয়ে বড় ব্যর্থতা আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে আমাদের দেশে মার্কসবাদ জনপ্রিয় ও বহুল আলোচিত হতে থাকে। তার কারণ যুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়ায় দরিদ্রদেশের মানুষ পুরোনো 'যোগ্যতমের উর্দ্বতনবাদ সমর্থিত কেড়ে-মেরে-শোষণে-বঞ্চনায় বাঁচার তত্ত্বে আস্থা হারিয়ে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে মার্কসীয় বণ্টনে বাঁচাতত্ত্বে ভরসা রাখে। মানবিক সমস্যা সমাধানের এই নতুন প্রত্যাশা হতাশ মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশ্বস্ত করে তোলে। তাই আজকের দুনিয়ায় নিঃস্ব, দুস্থ গণমানবের জিগির ও স্বপ্ন হচ্ছে সমাজবাদ ও সাম্যবাদ। এ-তত্ত্বের মূলকথা আধুনিক কায়াসাধন-তনুর সেবা। কাজেই এ-তত্ত্বে আসমানী কিছুই নেই, আছে মানুষকে প্রাণী হিসেবে গণ্য করে প্রাণে বেঁচে থাকার জন্মগত মৌলিক ও সঙ্গত অধিকারে স্বীকৃতি দান। শারীরিক ক্ষুৎপিপাসা নিবারণতত্ত্বভিত্তিক বলেই এ হচ্ছে নিতান্ত বস্তুবাদী দর্শন। কাজেই সমাজ বা সাম্যবাদী মাত্রই মানববাদী এবং মানববাদের দীক্ষার প্রথম শর্ত হচ্ছে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষকে কেবল 'মানুষ' হিসেবে জানতে ও মানতে হবে; মানুষের মৌল মানবিক অধিকার সর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। অতএব সমাজবাদ কিংবা সাম্যবাদ অঙ্গীকার করতে হলে পুরোনো শাস্ত্রে এবং সেই শাস্ত্রভিত্তিক সমাজে ও সরকারে আনুগত্য পরিহার করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কারণ এগুলোর ভিত্তিই হচ্ছে দল-চেতনা। মানুষে মানুষে বৈরিতা ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। সম ও সহস্বার্থেই দল গড়ে ওঠে। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল-গঠনের ভিত্তি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্নদলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্য দলের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ না করলে স্বদলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ পায় না। সব দলই একরকম। পার্থক্য কেবল এই যে, শাস্ত্রীয় দল অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন সংপৃক্ত বলে অনন্ত শাস্তির ভয়ে ঐটিতে মানুষের জীবনব্যাপী অনড় আনুগত্য থাকে। অন্য পার্থিব দল সময় ও সুযোগমতো স্বার্থবশে ক্ষতির ঝুঁকি না নিয়েই বদল বা লোপ করা চলে। কিন্তু শাস্ত্রীয় দল অবিনশ্বর। এ কারণে ধর্মীয় দলের কোন্দল চিরন্তন ও মারাত্মক। অতএব শাস্ত্রীয় আনুগত্য পরিহার করেই কেবল মানুষ উদার মানবতাবোধে নির্বিশেষ মানবের মিলন-ময়দান তৈরি করতে পারে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা হারালেই মনবুদ্ধি মুক্ত ও নিরপেক্ষ হয়। অন্য পার্থিব দল ক্ষণজীবী, সেজন্য সেগুলো কোন স্থায়ী ও সর্বজনীন সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই অন্য দল মানবিক সমস্যার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অতএব সমাজবাদী বা সাম্যবাদী তথা মানববাদী হতে হলে প্রথমেই শাস্ত্রীয় আনুগত্য তথা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার আবশ্যিক। তাহলে সে-সঙ্গে শাস্ত্রভিত্তিক পুরোনো সমাজ-সরকারে আনুগত্যও লোপ পাবে। আজকের মানবশাস্ত্র ও মানবধর্ম হবে—সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহাবস্থানের স্বীকৃতিতে বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকার।

উগ্রজাতীয়তা, গোত্রদ্বেষণা, বর্ণবিদ্বেষ ও ধর্মভেদপ্রসূত অভিশাপ বিমোচনের অঙ্গীকারে ডক্টর গোবিন্দ দেব প্রমুখ চিন্তাবিদেরা সহিষ্ণুতাভিত্তিক যে সমন্বয়ী মানবতার তত্ত্ব প্রচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসুক, তা বুর্জোয়া উদারতার পরিচায়ক মাত্র। শুনতে ভালো হলেও সেই পুরোনো তত্ত্বে মানবিক সমস্যা সমাধানের শক্তি নেই, কোনোকালে ছিলও না। ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার চেষ্টা সোনায় পাথরবাটি বানানোর মতোই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা এবং পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞাই শাস্ত্রানুগত্য বা ধার্মিকতার মৌল শর্ত। একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর সহিষ্ণু হতে পারেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে, কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধাবান হতে পারেন না।

আজ দেশে সমাজতন্ত্রের জিগির উঠেছে, এ উচ্চারিত বুলি বুকের সত্য হয়ে উঠলে আমাদের প্রত্যাশিত সুদিন শিগগিরই আসবে। কেননা শাস্ত্রে আস্থা পরিহার করলে বাঙালীর স্বভাব বদলাবে। বাঙালী আধুনিক জাগ্রত ও স্বস্থ বিশ্বের নাগরিক হয়ে উঠবে আর একান্তই বাঙালী থাকবে না। নিরীশ্বর-নাস্তিক অন্তত শাস্ত্রদ্রোহী মুক্তবুদ্ধি মানববাদী বাঙালীর উপর নির্ভর করছে বাঙালীর সুন্দর ভবিষ্যৎ। সামনে নতুন দিন। প্রত্যাশী ও আশ্বস্ত আমরা সেই নতুন সূর্যের উদয়-লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকব। অতএব মাভৈঃ।

কথায় বলে-

সজ্জনাঃ গুণমিচ্ছন্তি
দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।

আমি আজ পামরের ভূমিকাই পালন করলাম—তবে সবটাই সদুদ্দেশ্যে। আপনাদের সৌজন্যের সুযোগ নিয়ে আপনাদের ধৈর্যের উপর এতক্ষণ পীড়ন চালিয়েছি, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিচ্ছি।*

AMARBOI.COM

শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব

শিক্ষণশাস্ত্রও আজকাল শিক্ষা-বিজ্ঞান নামে পরিচিত। এবং সবাই জানে যে বিজ্ঞান মাত্রই তথ্য-প্রমাণ নির্ভর। তবে প্রাকৃত বিজ্ঞানের মতো এই বিজ্ঞান ততটা তথ্যভিত্তিক নয়, যতটা তত্ত্বসংশ্লিষ্ট। বিজ্ঞান প্রমাণভিত্তিক আর তত্ত্ব গ্রহণসাপেক্ষ। তাই এখানে মতগত বিতর্কের ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতার অবকাশ অনেক।

আসলে শিক্ষাশাস্ত্র বিজ্ঞান নয়। এ যুগে বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাবশে যে-কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ও পদ্ধতিবদ্ধ শাস্ত্র ও তত্ত্বকে 'বিজ্ঞান' বলে চালিয়ে দেয়ার আগ্রহ থেকে এ বুলির উদ্ভব ও প্রসার।

মূলত শিক্ষাতত্ত্বটি হচ্ছে নৈতিক, আর শিক্ষানীতিটি হচ্ছে বৈষয়িক। প্রথমটি মানবিক, দ্বিতীয়টি জৈবিক। একটি জীবন-সম্পৃক্ত, অপরটি জীবিকা-সংলগ্ন। একটি চেতনা সঞ্জাত মানববিদ্যা, অপরটি বিজ্ঞানপ্রসূত প্রযুক্তি বিদ্যা। তাই একটি নীতিমূলক, অপরটি বৃত্তিমূলক। আমরা এখানে শিক্ষার নৈতিক দিকটাই অধিক গুরুত্বে আলোচনা করতে চাই। জীবনকে অবলম্বন করেই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস-প্রেরণা হয় আবর্তিত। জীবনই সর্বপ্রকার

* *১৯৭৪ সনের ২২ জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ দর্শন সম্মেলনে শাখা-সভাপতির ভাষণ।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তাচেতনার কারণ। জীবন হচ্ছে দেহ ও মনের সমন্বিত রূপ। দেহে যেমন ক্ষুধা আছে, মনেরও তেমনি রয়েছে চাহিদা। দেহ আধার, মন আধেয়। দেহ যন্ত্র, মন যন্ত্রী। এজন্যই জীবন ও জীবিকা-প্রয়াস অবিচ্ছেদ্য। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও বিকাশ লক্ষ্যেই মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াস নিয়োজিত। তবু জীবনের জন্যই জীবিকা, জীবিকার জন্য জীবন নয়, তেমনি জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা আবশ্যক। শিক্ষাকে তাই জীবনের অনুগত করতে হয়, জীবনকে শিক্ষার ছাঁচে ফেলে টবের তরুতে পরিণত করলে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে জীবন বিকৃত হয়। শিক্ষাকে তাই জীবন-সংলগ্ন করতে হবে।

শিক্ষাবিজ্ঞানীরা শিক্ষাদানে অর্থাৎ এডুকেইট করার সুফলপ্রসূতায় গভীর আস্থা রাখেন। আমরা এডুকেইট করার পক্ষপাতী নই। আমরা চাই মানবিক জ্ঞানের অবাধ বিকাশের জন্য কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানদান বা ডেসিমিনেশান অব নলেজ। অর্থাৎ আত্মা ও আত্মবিকাশের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির, শ্রেয়ঃবোধের ও সৌন্দর্য-চেতনার স্বাধীন বিকাশ লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা কামনা করি। পেশাগত, বৈষয়িক যোগ্যতাগত বিদ্যাদান এ স্তরে আমাদের বাঞ্ছিত নয়। কেননা আমরা কেবল কর্মী ও কর্মযোগ্য প্রাণী চাইনে। মানবিক গুণবিশিষ্ট সামাজিক মানুষ তৈরিই আমাদের লক্ষ্য। যে-মানুষ পারস্পরিক কল্যাণ ও মৈত্রী লক্ষ্যে প্রীতি ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি নিয়ে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে সহ-অবস্থানে আগ্রহী হবে। তাই শেখানো বুলিতে বা আরোপিত বিশ্বাসে কিংবা নিপুণ যন্ত্রীতে আমাদের আস্থা নেই। অর্জিত জ্ঞানজ প্রজ্ঞায় ও বোধিতে যে মানুষের মন-মেজাজ পুষ্টি ও বিকাশ পায়—এই তত্ত্ব আমরা স্বীকার করি। এবং তাই জ্ঞান-যে মানবিক গুণের উন্মেষ ও বিকাশ লক্ষ্যে অর্জিত হওয়া উচিত, তাও আমরা স্বীকার করি। মানবিক গুণ বলতে আমরা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ, সামাজিক শ্রেয়ঃ-চেতনা ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ বুঝি। আবার মানুষের মানসপ্রবণতার বৈচিত্র্য স্বীকার করি বলেই সব মানুষের সমবিকাশ যে অস্বাভাবিক ও অসম্ভব, জ্ঞান-যে সবক্ষেত্রে শোধনে সমর্থ নয়, তাও মানি। কেননা বিশ্বাস সংস্কার বন্ধ্যা, তার ভবিষ্যৎ নেই। মুক্তমনের অঙ্গনে অনুকূল প্রতিবেশে যে-কোনো বীজ উপ্ত হবার সম্ভাবনা থাক। তাছাড়া দুঃশীল অমানুষও সংখ্যাগুরু সুজন সুনাগরিকের প্রতি সমীহবশে সংযত আচরণে বাধ্য হয়। তাই আমরা মাধ্যমিক স্তর অবধি (১৫ বছর বয়স পর্যন্ত) উদার ও সাধারণ শিক্ষানীতির পক্ষপাতী। এ স্তরে থাকবে ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে সাধারণ জিজ্ঞাসা জাগানোর ব্যবস্থা; বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টির মতো প্রাথমিক সূত্রগুলোর পরিচিতি এবং সর্বপ্রকার সংস্কার মুক্তির আনুকূল্য দান। কেননা আরোপিত বিশ্বাস-সংস্কার মানুষের চিন্তাশক্তিকে বন্ধ্যা রাখে, আর মানুষকে করে ভীরু।

সততা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সময় ও নিয়মানুবর্তিতা, স্বাস্থ্য, দায়িত্ব-চেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতির মূল্য-চেতনা হবে উক্ত শিক্ষার প্রসূন ও ফসল। এক কথায় জীবন-প্রতিবেশ এবং সমাজ সম্পর্কে কল্যাণকর নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টি দানই হবে শিক্ষার লক্ষ্য।

সৎ শিক্ষার পথে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার-সৃষ্ট বাধা

সরাসরি শিক্ষাতত্ত্বে প্রবেশ না করে আমরা একটু প্রাসঙ্গিক উপক্রমণিকার অবতারণা করতে চাই। আর সব প্রাণী সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তি এবং নিয়তি-নির্দিষ্ট বৃদ্ধি ও শ্রেয়বোধ নিয়ে প্রকৃতির আনুগত্যের অঙ্গীকারে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করে। মানুষ তার অবয়বের শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগে গোড়া থেকেই কৃত্রিম জীবন রচনায় উৎসাহ বোধ করেছে। তাই সে প্রকৃতির প্রভুত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্বীকার করে, তাকে বশ ও দাস করে জীবনের সুখ, স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনে উদ্যোগী হয়েছে।

হাতকে যখন হাতিয়াররূপে জানল, তখন মানুষ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যদান লক্ষ্যে হাতের কাজ উদ্ভাবনে মন দিল। আর এতেই তার চিন্তাশক্তির বিকাশ হল শুরু। এমনি করেই তার জীবন ও জীবিকা-পদ্ধতি সংলগ্ন চিন্তাভাবনার প্রসার হতে থাকে। প্রকৃতির নিয়ম ও রহস্য অনুধাবন করে করে-সে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করার বুদ্ধিও আয়ত্ত করেছে। যৌথ কর্ম ও সহচারিতার গরজে তার ভাবনাচিন্তা প্রকাশের ও বস্তুনির্দেশের জন্য সে নব নব ধ্বনিও সৃষ্টি করেছে, তাতেই তারা ভাষা হয়েছে ঋদ্ধ। তার অপ্রাকৃত, কৃত্রিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের বহু প্রসারের ধারায় আজ অবধি সে যা অর্জন করেছে, তা-ই তার সম্পদ ও সঞ্চয়, তা-ই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি। অতএব মানুষের সর্বপ্রকার প্রয়াসের ও বিকাশের মূলে রয়েছে তার জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য বাঞ্ছা। প্রত্যাশার প্রবর্তনাতেই সে আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে, নির্মাণে ও বৈচিত্র্যদানে প্রয়াসী।

জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে তার অভাববোধ ও অতৃপ্তিই তাকে কাঙ্ক্ষী, জিজ্ঞাসু ও উদ্যোগী রেখেছে। তাই গতিশীলতা ও চলমানতাই তার চেতনার গভীরে মূল জীবন-প্রেরণা। স্থিতিতে তাই তার স্বস্তি-শান্তি নেই। অবচেতনভাবে মানুষ তাই এগিয়ে চলার আগ্রহে নতুন চিন্তায়, আবিষ্কারে, উদ্ভাবনে ও নির্মাণে নিরত। স্থিতি ও স্থায়িত্বে জরা ও জীর্ণতা বাসা বাঁধে। নব নব কিশলয় যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধির লক্ষণ, তেমনি পুরোনো রীতি-রেওয়াজ ও মতাদর্শ পরিহার সামর্থ্যেই নিহিত থাকে মানব-প্রগতি। সব মানুষ অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না, তারা পরনির্ভরতায় নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। তা ছাড়া তাদের শক্তি ও প্রবণতা বিভিন্ন ও বিষম। তাই গোটা মানব-সমাজের হয়ে কেউ কেউ চিন্তায়, উদ্ভাবনে, আবিষ্কারে ও নির্মাণে নিরত হয়। এজন্যেই বিশ্বের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কয়েকশত মানুষও মেলে না, যাদের চিন্তা ও মনীষার ফসলে, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনার দানে মানুষ আজ বিশ্ববিজয়ী ও নভশ্চর। এমনি করে একের দানে অপরে হয় ঋদ্ধ। একের সৃষ্টি বিশ্বমানবের হয় সম্পদ।

এ তথ্য জেনেও শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার চিরকালই স্থিতিকামী। মানুষকে একটি নিয়মের নিগড়ে নিবদ্ধ করে শাস্ত্র, সমাজ ও শাসক চিরকালই নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছে। নইলে ঝামেলা বাড়ে, শাস্ত্রকার, সমাজপতি ও রাজ্যপতির স্বস্তি-সুখ নষ্ট হয়। জীবনের ও মননের প্রবহমানতা ও স্বাভাবিক অগ্রগতি অস্বীকৃতির ফল কোনকালেই ভাল হয়নি। চিরকাল সর্বত্রই রক্তঝরা প্রাণঘাতী ধর্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটেছে। সনাতনী ও স্থিতিকামীর পরাজয়ে পরিবর্তন-প্রত্যাশীর ও গতিকামীর জয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও আজো শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার নতুন ভাব-চিন্তার জন্ম-নিরোধে সমান উৎসাহী।

তাই জগতে নতুন চিন্তার, তথ্যের ও তত্ত্বের জনকমাত্রই ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দ্রোহী-বিপ্লবী। তাকে চিরকালই নির্যাতিত ও নির্বাসিত কিংবা লাঞ্ছিত ও নিহত হতে হয়েছে। তবু প্রসূত চিন্তা, তথ্য ও তত্ত্ব নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় না। দূর্বার মতো দুর্বার প্রাণশক্তি নিয়ে তা জনমনে কেবল আত্মবিস্তার করতে থাকে। বাতাসের মতোই তা হয় সর্বগ, আলোর মতো হয় সর্বপ্লাবী। এমনি করে এককালের অনভিপ্রেত নিষিদ্ধ ভাব-চিন্তা লোকগ্রাহ্য ও লোকপ্রিয় শ্রেয়স্কর ধর্মাদর্শ, কাম্য সমাজপদ্ধতি ও বাঞ্ছিত রাষ্ট্রতত্ত্ব হয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। আজ অবধি মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির যা কিছু সার-তত্ত্ব, যা-কিছু গৌরবের ও গর্বের, যা-কিছু মানব-মনীষার ও মহিমার স্মারক তার সবটাই দ্রোহীর দান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু স্বার্থচেতনা, নিষ্ক্রিয় স্থিতি-কামনা মানুষের বিবেকবুদ্ধি ছাপিয়ে ওঠে। আপাত শ্রেয়-চেতনার প্রবলতায় ভাবী শ্রেয়বোধ তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই কল্যাণের নামে, শৃঙ্খলার নামে, আনুগত্যের স্বস্তির নামে কোনো রীতিনীতির পরিবর্তন, কোনো ত্রুটির শোধন, কোনো অন্যায়ের প্রতিকার, কোনো অশুভের প্রতিরোধ, কোনো বাদের প্রতিবাদ, কোনো প্রতিহিংসার প্রতিশোধ তারা অবাঞ্ছিত উপদ্রব বলে মনে করে। যারা যুক্তি-প্রমাণে ফাঁকির ফাঁক দেখিয়ে দিতে চায়, তাদেরকে শাস্ত্র, সমাজ, সরকার উপসর্গ বলেই জানে।

তাই চিরকাল জ্ঞানের নামে অজ্ঞানকে, বিজ্ঞতার নামে অজ্ঞতাকে, শ্রেয়সের নামে অকল্যাণকে, সত্যের নামে মিথ্যাকে, তথ্যের নামে কল্পনাকে, তত্ত্বের নামে বিশ্বাসকে, ভক্তির নামে বিস্ময়কে, অমঙ্গলের নামে ভীরুতাকে লালন করতে তারা আগ্রহী। ফলে মানুষের কল্যাণ-চিন্তা ও কর্ম স্বাভাবিক স্ফূর্তি পায়নি। মানুষের সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশও আনুপাতিক হারে হয়েছে মন্থর। মানবিক সমস্যাও তাই হয়েছে জটিল, বহু ও বিচিত্র।

যদিও মনুষ্যসমাজের ক্রমবিকাশের ধারায় সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রাদর্শ প্রভৃতি গড়ে উঠেছে এবং ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্যে ত্রিধারায় মানুষের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব বহন করছে, তবু স্বস্বার্থে শাস্ত্রপতি, সমাজপতি, কিংবা রাষ্ট্রপতি, সনাতন রীতি পরিহারে চিরকালই নারাজ। জ্ঞানমাত্রই-যে অসম্পূর্ণ, অভিজ্ঞতা-যে ত্রুটিমুক্ত নয়, সত্য-যে উপলব্ধি নির্ভর, শ্রেয়চেতনা-যে আপেক্ষিক, তথ্য-যে প্রমাণপ্রসূত, তত্ত্ব-যে তাৎপর্য নির্ভর, ভক্তি-যে প্রবণতার প্রসূন, উদ্যমের অনুপস্থিতিতেই-যে স্থিতি-কামনার জন্ম, প্রত্যাশার অভাবই-যে সনাতনপ্রীতির মূলে, অজ্ঞতাই-যে বিস্ময়ের আকর, বিশ্বাস-যে যুক্তিবিরহী, ভয়-যে আত্মপ্রত্যয়ের অভাবপ্রসূত, কল্পনার গুরুত্ব-যে বুদ্ধিহীনতায়, যুক্তির সন্তান-যে প্রজ্ঞা, প্রমাণ-যে পাথুরে হওয়া আবশ্যিক, জ্ঞান-যে উপলব্ধির মাধ্যমে প্রজ্ঞায় পরিতৃপ্তি পায়—তা স্বীকার করলে তাদের চলে না।

যা জানা যায় তাই জ্ঞান। জ্ঞান জিজ্ঞাসার প্রসূন। বিৎ বা বিদ মানে জ্ঞেয় যে-জানে অর্থাৎ বেত্তা। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানকে বলি অভিজ্ঞতা। আর অপরের অভিজ্ঞতা শুনে জানার নাম জ্ঞান। দৃশ্য ও অদৃশ্য, গুপ্ত ও ব্যক্ত শক্তি ও বস্তু সমন্বিত বিশ্বে কোনো জ্ঞানই আজো পূর্ণ কিংবা অখণ্ড হতে পারেনি। তাই এককালের জ্ঞান অন্যকালে অজ্ঞতা ও মূর্খতা বলে উপহাস পায়। স্থান, কাল ও অন্যান্য প্রতিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে কারণ-ক্রিয়া নিরূপণজাত সিদ্ধান্তই জ্ঞান। স্থান-কাল প্রতিবেশ কখনো অভিন্ন থাকে না। তাই কোনো লব্ধজ্ঞানও সর্বজনীন আর সর্বকালীন হতে পারে না। ফলে আমাদের যে-কোনো অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও ধারণা সর্বক্ষণ সংশোধন-সাপেক্ষ। তেমনি কোনো আচার বা পদ্ধতিই ত্রুটিমুক্ত নয়।

এসব তত্ত্ব-যে শাস্ত্রবেত্তা, সমাজনেতা কিংবা রাষ্ট্রশাসকের অজানা, তা নয়। কিন্তু স্থিতিশীল সমকালীন পরিবেশ তাদেরকে যে-সুযোগ-সুবিধে দান করে, তার পরিবর্তনে স্ব স্ব জীবনে ও স্বার্থে অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয় ডেকে আনতে তারা নারাজ। কেননা তা তাদের বিবেচনায় আত্মবিনাশের শামিল। তাই সুপ্রাচীন কাল থেকেই শাস্ত্রবিদেরা কেবল শাস্ত্রকেই চির-মানবের চিরন্তন জ্ঞান ও আচরণ-বিধির আকর বলে প্রচার করে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অভ্রান্ত জ্ঞান শুধু শাস্ত্রেই মেলে। অন্যসব জ্ঞান মানবিক অজ্ঞতার প্রসূন। কাজেই যা কেতাবে নেই, তা চোখে-দেখা হলেও জগতে নেই। শাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞান কিংবা চিন্তা তাই নিষিদ্ধ। ঐরূপ চিন্তা, জ্ঞান কিংবা কর্ম বর্জনই শ্রেয়। কারণ 'অর্জন অমঙ্গলের আকর।' তাই সেকালের রোম থেকে সেদিনকার ইয়ামেন-লিবিয়াতেও আমরা অশাস্ত্রীয় বিদ্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ দেখেছি। পাকিস্তানেও ইসলামি জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব বিঘোষিত ও বিকীর্তিত হতে শুনেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর আদমের আমল থেকেই গৃহপতি, গোত্রপতি ও সমাজপতিকে কৌলিক, গৌত্রিক ও সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-সংস্কার সংরক্ষণে সদাসতর্ক দেখা যায়। এরাও দ্রোহ সহ্য করে না। কল্যাণকর নতুন কিছু বরণ করার ঔদ্ধত্য কঠিন হস্তে দমনে এদের অনীহা নেই। এদেরও এক বুলি—যা শাস্ত্রসম্মত নয়, কিংবা লোকাচার-দেশাচার বিরুদ্ধ, যা নতুন তা-ই অনভিপ্রেত, তা-ই অবৈধ ও পরিহার্য। কারণ অন্যথায় তাদের স্বার্থ ও স্থিতি বিপর্যস্ত হয়, সমাজে প্রতাপ বিনষ্ট হয়।

তেমনি শাসকের স্থিতি, স্থায়িত্ব ও স্বার্থের প্রতিকূল যা-কিছু, তা-ই রাজ্য বা রাষ্ট্রের অমঙ্গলকর-অনভিপ্রেত বলে চালিয়ে দেয়ার রেওয়াজও আজকের নয়। রাজ্য পত্তনের মুহূর্ত থেকেই তার শুরু। এজন্য প্রতিকার প্রার্থনা, প্রতিবাদ উচ্চারণ, কিংবা প্রতিরোধ প্রয়াস শাসনপাত্রের ক্ষমার অযোগ্য ঔদ্ধত্য ও অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত।

শাস্ত্রকার যেমন শাস্ত্রের অনুগত মেষ-স্বভাব মানুষ চায়, সমাজপতি যেমন মানুষকে গড্ডলিকা বানাতে উৎসুক, সরকারও তেমনি নাগরিককে অনুগত-স্তাবক ও অনুগ্রহজীবী অনুচররূপে দেখার প্রত্যাশী।

অতএব, মানুষকে কেউ ধার্মিক বানাতে উৎসুক, কেউ সমাজ-শৃঙ্খল পরাতে উদ্যোগী, কেউবা শাসনের নিগড়ে বাঁধতে ব্যস্ত।

শান্তি-শৃঙ্খলার নামে সবাই আনুগত্যের অঙ্গীকারকামী। ব্যষ্টি ধার্মিক, সামাজিক ও নাগরিক হোক এই-ই কাম্য; কিন্তু বিবেকবান হোক, ন্যায়পরায়ণ হোক—এক কথায় মানুষ হোক—এমন কামনা যেন কেউ-ই করে না।

AMARBOI.COM

মানবিক গুণের স্বাভাবিক বিকাশের ধারা

আমাদের শৈশব-বাল্যজীবনে আমাদের ঘরোয়া জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার ও রীতি-নীতির প্রভাব এমন একটি জীবনবোধ, এমন একটি চেতনা দান করে যা প্রত্যয়ের ও প্রথার, বিশ্বাসের ও ভরসার, স্বস্তির ও সংস্কারের, এক অদৃশ্য অক্ষয় পাথুরে দুর্গ তৈরি করে। ঝিনুক-কূর্মর দেহাধারের মতোই তা সংস্কারার্জিত চেতনাকে সর্বপ্রযত্নে লালন করে।

জ্ঞানজ প্রজ্ঞা ও মানববিদ্যায় লভ্য তাৎপর্যবোধ মানুষের এই আরোপিত চেতনার দুর্গে আঘাত হেনে তাকে বদ্ধ চেতনার আশ্রয়চ্যুত করে। নিঃসীম আকাশের নিচে মানবিক বোধের উদার প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন শুনে-পাওয়া প্রত্যয় ও দেখে-শেখা আচার ছাপিয়ে অর্জিত জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা ও অনুশীলিত বিবেক প্রাধান্য পায়। তখন প্রজ্ঞা ও বিবেকের প্রভাবে আস্থায় ও আত্মীয়ে, স্বভাবে ও সংসারে, জীবনে ও জগতে, বিদ্যায় ও বিশ্বাসে, বিবেকে ও বিষয়ে, প্রজ্ঞায় ও প্রত্যয়ে দ্বন্দ্ব কমে এবং তেমন মানুষের হাতে অপর মানুষের বিপদ-সম্ভাবনা ঘুচে। এমনি সুজন সুনাগরিক সৃষ্টিই শিক্ষার লক্ষ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংবাদের সিন্দুক করা নয়, সুন্দর ও সুস্থ জীবন রচনায় প্রবর্তনা দেয়া, সফল সার্থক জীবনযাত্রার পথ ও পাথেয় দান। তেমনি জীবনযাত্রা সুখকর করবার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে এবং দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদনে ও তাদের উপযোগ সৃষ্টিতেই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিয়োজিত। পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটানো ও নিরাপত্তা সাধনই বিজ্ঞানের কর্তব্য। কিন্তু চিত্তক্ষেত্রে সামষ্টিক জীবনের কল্যাণ-প্রত্যাশায় প্রীতি, করুণা ও মৈত্রীর চাষ করা এবং ফসল ফলানো হচ্ছে বিবেকী আত্মার দায়িত্ব। বিজ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও জিজ্ঞাসা। এ অন্বেষা প্রসারিত করে বহির্দৃষ্টি। এর নাম বিজ্ঞান। জ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিদান করে এবং শক্তির সুপ্রয়োগেই আসে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। যন্ত্রশক্তি তাই আজ অজেয় ও অব্যর্থ। কিন্তু ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনযাত্রার সৌকর্য বাঁচা নয়, বাঁচার উপকরণ মাত্র। কারণ মানুষ বাঁচে তার অনুভবে ও বোধে, তার আনন্দে ও যন্ত্রণায়। সে অনুভবকে সুখকর সম্পদে, সে-বোধকে কল্যাণপ্রসূ ঐশ্বর্যে পরিণত করতে হলে চাই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা-কল্যাণ ও সুন্দরকে প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা প্রয়াসী।

বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার, প্রয়োজন ও প্রীতির সমতা রক্ষিত না হলে আজকের মানুষের প্রয়াস ও প্রত্যাশা ব্যর্থতায় ও হতাশায় অবসিত হবেই। কেবল তা-ই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসা জিইয়ে রাখবে দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও সংঘর্ষ-সংঘাত। অতএব, আজ যন্ত্রের সঙ্গে জ্ঞানের, কালের সাথে কলিজার, ম্যাশিনের সাথে মননের, কলের সাথে বিবেকের নিকট ও নিবিড় যোগ এবং প্রাপ্তির সাথে প্রীতির, জ্ঞানের সাথে প্রজ্ঞার, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিবেকের সমন্বয় ও সমতাসাধনই আজকের মানবিক সমস্যা সমাধানের পথ ও পাথেয়। উদ্দেশ্যনিষ্ঠ উপায়চেতনা আন্তরিক করার জন্যই আজকের মানুষকে মানববাদী হতে হবে।

কিন্তু কোনো মানুষের মনের 'সায়' না থাকলে তাকে জোর করে বাঞ্ছিত ভালো বা মন্দ করা যায় না। তাই কোনো নিয়মের নিগড়ে রেখে অভিপ্রেত বুলি শিখিয়ে অভীষ্ট ফল পাওয়া যাবে না, কেননা মানুষ ম্যাশিন নয়। তার মন বলে যে-শক্তিটি রয়েছে তার অবাধ বিকাশেই কেবল সে সুষ্ঠু মানুষ হতে পারে, এর জন্যে দরকার বিশ্বের সর্বপ্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে তার যথাসম্ভব ও যথাসাধ্য পরিচয়। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠক্রমে যে-কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার্থীর মন-মেজাজ পঙ্গু করবেই। এ স্তরদুটোতে তাই স্পেসিয়ালাইজেশন বা বিষয়-বিশেষে প্রবণতা সৃষ্টির প্রয়াস মারাত্মকভাবে ক্ষতিকর হবে।

AMARBOI.COM

ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা

শাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ ঘুচবার নয়, শিক্ষার আপাত উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন। কেননা জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানমাত্রই বর্ধিষ্ণু। কারণ জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা অশেষ , তা-ই জ্ঞানও কোনো সীমায় অবসিত নয়। নব নব চিন্তা-ভাবনায় ও আবিষ্ক্রিয়ায় জ্ঞানের পরিধি-পরিসর কেবলই বাড়ছে। যত জানা যায়, তার চেয়েও বেশি জানবার থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধির অনুপাতে তথ্যের স্বরূপ ও তত্ত্বের গভীরতা ধরা পড়ে। এজন্য জ্ঞানের সাথে ধর্মশাস্ত্র সমতা রক্ষা করতে অসমর্থ। কেননা ধর্মশাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে চিরন্তনতায় ও ধ্রুবতায় অবিচল। তার হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিমার্জন নেই। পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান। তার উন্মেষ, বিকাশ ও প্রসার আছে, আছে বিবর্তন ও রূপান্তর। নতুন তথ্যের উদঘাটন, নবসত্যের আবিষ্কার, পুরোনো জ্ঞানকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে তথ্যগত ও তত্ত্বগত সত্যের রূপান্তর ঘটেছে এবং জিজ্ঞাসু মানুষ তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে ও করছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে প্রত্যয়জাত সত্যের পরিবর্তন নেই বেদে-বাইবেলে। জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের বিরোধ এখানেই। জ্ঞান প্রমাণ-নির্ভর আর বিশ্বাস হচ্ছে অনুভূতি-ভিত্তিক। জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ আর বিশ্বাস হচ্ছে মনোজ। শৈশবে বাল্যে শুনে-পাওয়া বিশ্বাস মানুষের মর্মমূলে ঠাঁই করে নেয়। তাই চিত্ত-লোকে আজো মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত এবং বিশ্বাসের অরণ্যে পথের সন্ধানে দিশেহারা। ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা লৌকিক সংস্কার-নিষ্ঠা বন্ধ্যা, পক্ষান্তরে জ্ঞান সৃজনশীল। এজন্যই রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপকও পড়াপানিতে পান রোগের ও দুর্ভাগ্যের নিদান, পদার্থবিজ্ঞানী ঝাড়ফুঁকে পান বৈদ্যুতিক সেঁকের ফল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলপাতার মর্যাদা আলাদা। জীববিজ্ঞানীও হুতুম, পেঁচা কিংবা টিকটিকির দৈব প্রতীকতায় আস্থা রাখেন। ফলে প্রায় কেউই অধীতবিদ্যাকে অধিগত-বোধে পরিণত করতে পারে না। জর্ডন-জমজম-গঙ্গার পানি, বার-তিথি-নক্ষত্র, হাঁচি-কাশি-হোঁচট, জীন-পরী-অপ্সরা, ভূত-প্রেত-দৈত্য অথবা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও দৈব-কাহিনী তাদের জীবনে ও মননে তদের অধীতবিদ্যা ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের চেয়ে বেশি সত্য ও বাস্তব থেকে যায়। তাই নিজের সন্তানই যখন পিছু ডাক দেয়,তখন সে আর আত্মজ থাকে না, মুহূর্তের জন্য হয়ে উঠে দৈবপ্রতীক। তেমনি হাঁচি কিংবা কাশি থাকে না নিছক দৈহিক প্রক্রিয়া—বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে হয়ে উঠে দৈব ইশারা। সেরূপ কাক, হুতোম, পেঁচক কিংবা টিকটিকির ডাক হয়ে যায় দৈববাণী। এমনি করে আমাদের জীবনে অধীতবিদ্যা ও লব্ধজ্ঞান মিথ্যা হয়ে যায়। লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের জীবন। ফলে বিদ্যা আমাদের বহিরঙ্গের আভরণ ও আবরণ হয়েই থাকে, আর বিশ্বাস-সংস্কার হয় আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পদ। একারণে অর্জিত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান, আর লালিত বিশ্বাসের টানাপোড়েনে আমাদের ব্যক্তিত্ব হয় দ্বিধাগ্রস্ত, সত্তা হয় অস্পষ্ট। ভাব-চিন্তা-কর্মে আসে অসঙ্গতি।

যাঁরা ধর্ম ও বিজ্ঞানের, যুক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয় চান, তাঁরা চাঁদ-সূর্যের অদ্বয়রূপে উপস্থিতিই কামনা করেন। এবং তা নিষ্ফলতাকে—বিড়ম্বনাকেই বরণ করার নির্বোধ আগ্রহ মাত্র। সামাজিক মানুষের জীবনে মূল্যবোধ জাগে যুক্তি অথবা বিশ্বাস থেকে। মূলত উপযোগ-চেতনা মূল্যবোধের উৎস হলেও যুক্তি ও বিশ্বাসই তার বাহ্য অবলম্বন। কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ। বলতে গেলে যুক্তির অনুপস্থিতিই বিশ্বাসের জন্মদাতা। যুক্তি দিয়ে তাই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তির অবতারণাও তেমনি বিড়ম্বনাকে বরণ করা ছাড়া কিছুই নয়। আজকাল একশ্রেণীর জননেতা, শিক্ষাবিদ ও সমাজকল্যাণকামী মনীষী শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের, যুক্তি ও নীতিবোধের সমন্বয় ও সহ-অবস্থান কামনা করছেন। নতুন ও পুরোনোর, কল্পনার ও বাস্তবের, যুক্তির ও বিশ্বাসের অথবা দুই বিপরীত কোটির সত্যের সমন্বয়সাধন করে নতুনে ও পুরাতনে, সত্যে ও স্বপ্নে সঙ্গতিস্থাপনে তাঁরা আগ্রহী। তাই পুরোনো ধর্ম ও পুরোনো নীতিবোধের সঙ্গে আধুনিক জীবনচেতনার মেলবন্ধনের উপায় হিসেবে তাঁরা বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মশিক্ষা দানেও উদ্যোগী। কিন্তু এর পরিণাম-যে শুভ হবে না—অন্তত যে হয়নি, তার প্রমাণ পাদরি স্কুল ও নিউস্কিম মাদ্রাসা। এ-শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ কখনো সন্দেহ-তাড়িত, কখনো বা বিশ্বাস-চালিত। এই মানুষের জ্ঞানে-বিশ্বাসে দ্বন্দ্ব কখনো ঘুচে না। তাই তার জীবন হয় দ্বৈত সত্তায় বিকৃত। ব্যক্তিত্ব থাকে অনায়ত্ত।

আজকের দিনের শিক্ষা-সমস্যা

বলেছি স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে চিরকাল নেতারা নামান্তরে একই নীতি-পদ্ধতি চালু রেখেছে। আদিকালে গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্যের নামে, পরে উপাস্যের অভিন্নতার আবেদনে এবং একালে দৈশিক, রাষ্ট্রিক, ভাষিক, ধার্মিক কিংবা মতবাদীর ঐক্যের নামে মানুষে মানুষে বৈরিতার কারণ জিইয়ে ও ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া রেখেছে। শাস্ত্রানুগত্যপ্রসূত নীতিবোধ ও স্বার্থচেতনাজাত স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি ধর্ম ও জাতীয়তার নামে বন্দিত হচ্ছে এবং ঐ দুটোর নামে চিরকাল যেমন দেশে-দেশে নর-বিধ্বংসী যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে তেমনি আজো হচ্ছে—অদূর ভবিষ্যতেও হবে। কেননা আজো শাসকেরা সেই সনাতন নীতির সুফলপ্রসূতায় আস্থাবান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেজন্যই আজকাল রাষ্ট্রও রাষ্ট্রাদর্শের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে ব্যক্তিকে, পারিবারিক সামাজিক ও নাগরিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভাব-চিন্তা-কর্ম, আচার-আচরণ. রীতি-রেওয়াজ, নীতি-নিয়ম, বিধি-বিধান প্রভৃতি নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষ-যে ম্যাশিন নয়, পোষা প্রাণীও নয়. জীবন-যে যান্ত্রিক নয়, মন-যে মানব-ব্যবহারনিয়ম তা স্বীকার করলে ওদের চলে না।

শিক্ষাব্যবস্থাও জীবন-জীবিকা সংলগ্ন। তাই দেশে দেশে শিক্ষানীতিতে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্মের প্রলেপ-প্রসাধনের ব্যবস্থাও বাঞ্ছিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফল দুনিয়ার কোথাও কখনো ভালো হয়নি। তবু স্বার্থবুদ্ধির প্রাবল্যে সদ্‌বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের শিক্ষিত লোককে—বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারে বড় ভয়। কেননা ওদের চিন্তা ও উদ্যোগই তাদের কায়েমী স্বার্থে ও সুস্থজীবনে বিপর্যয় ঘটায়। তাই সরকারমাত্রই নানাভাবে শিক্ষানিয়ন্ত্রণে প্রয়াসী। বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি সরকারি আগ্রহের মূলে রয়েছে ঐ নীতি। অথচ কোটি কোটি অশিক্ষিত লোক থেকে সরকারের—সমাজের কোনো বিপদ-বিপর্যয় নেই বলে তাদের সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামায় না। ভয়ই দরদের আবরণে শিক্ষিতদের প্রতি সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য গুরুতর করে তোলে।

জ্ঞানার্জনের, বিদ্যাভ্যাসের কিংবা কৌশল আয়ত্তকরণের বা নৈপুণ্য-লাভের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, সাচ্ছল্য ও উৎকর্ষসাধন। জ্ঞান উপায়, উদ্দেশ্য নয়। জ্ঞান কোন সাফল্যে উত্তরণ ঘটায় না। কেননা জ্ঞানের তিনটে স্তর—শেখা, জানা ও বোঝা, তথা শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। যে শিশু 'কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল' শেখে, সে কোনো পদেরই অর্থ বোঝে না। যে বালক এ চরণ জানে, সেও তার তাৎপর্য বোঝে না। বয়স হলে বোঝে। 'বরিশালে ধান ও পাট জন্মে'— এ তথ্য জ্ঞানমাত্র। ধান ও পাট উৎপাদনের প্রয়োজন-চেতনাই তথা তাৎপর্যবোধই প্রজ্ঞা! অতএব জ্ঞান জিজ্ঞাসার সন্তান আর প্রজ্ঞা উপলব্ধির ফসল। সুতরাং যা শেখানো হয় তাই শিক্ষা, যা জানা যায়, তা-ই জ্ঞান বা বিদ্যা এতে মানুষের কোনো উপকার হয় না—যদি না তা বোধের স্তরে উন্নীত হয়ে বোধি হয়। লোক-প্রচলিত বিশ্বাস—শিক্ষা ও জ্ঞান মনুষ্য-চরিত্র উন্নত ও নির্দোষ করে এবং মনুষ্য-রুচি, মার্জিত করে। কিন্তু এ তত্ত্বেও কোনো তথ্য নেই। শিক্ষায় বা বিদ্যায় মানুষের চরিত্র বদলায় না বরং যার যা চরিত্র ও রুচি, তা স্বকীয় লক্ষণে বিকশিত হবার সুযোগ পায় মাত্র। পৃথিবীর অধিকাংশ নরদেবতা ছিলেন নিরক্ষর-অশিক্ষিত, তেমনি নরদানবদের অধিকাংশ ছিল শিক্ষিত ও জ্ঞানী। আমাদের দেশেও আজ দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা তো শিক্ষিত লোক-সৃষ্ট সমস্যা।

কাজেই জ্ঞানার্জনের প্রয়োজন জ্ঞানজ প্রজ্ঞা লাভের জন্যই। সে-প্রজ্ঞার লক্ষ্যে নিয়োজিত না হলে-যে জ্ঞানচর্চা বৃথা, তার সাক্ষ্য ইতিহাস।

এমন এক সময় ছিল, যখন আমরা বলেছি, আমরা আগে মুসলমান পরে ভারতিক। তারপরে বলেছি আগে পাকিস্তানি পরে বাঙালী, এখন বলছি আমার একমাত্র পরিচয় আমি বাঙালী অর্থাৎ আমি আগে বাঙালী পরে মুসলমান বা হিন্দু। অতএব, আমরা কখনো মুসলমান, কখনো পাকিস্তানি, কখনোবা বাঙালী। আমাদের লক্ষ্য যেন কখনো 'মানুষ' হবার দিকে ছিল না, এখনো নেই। বড়জোর আমরা বাঙালী মানুষ হব, মানুষ বাঙালী হবার বাসনাই যেন মনে ঠাঁই পায় না। অবশেষে হয়তো একদিন সেই পুরোনো বিলাপ কিংবা খেদ শোনা যাবে—'রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করোনি'। আজকের আবেগের কুয়াশা ও উচ্ছ্বাসের ধূলিঝড় অবসিত হলে আমরা স্বস্থ হয়ে হয়তো স্বীকার করব সখেদে—'রয়েছি বাঙালী হয়ে মানুষ হইনি'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-যুগে কিন্তু ঠকে শেখার প্রয়োজন হয় না, দেখেই শেখা যায়। তাই ধর্মীয় ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-চেতনা যে মানব-দুর্ভোগের কারণ এবং এ-যুগে দুনিয়ার কোথাও-যে একক ধর্মের ও একজাতের মানুষের বাস সম্ভব নয়, সর্বক্ষেত্রেই সংমিশ্রণ ও সাঙ্কর্য অপরিহার্য, তা জেনে-বুঝে একালে ওদুটোর বাজারমূল্য কমিয়ে দেয়াই কল্যাণকর, তা-ই বাঞ্ছনীয়। আমরা পারিবারিক-সামাজিক জীবনে একাধারে কারো সন্তান, কারো বন্ধু, কারো শত্রু, কারো মনিব, কারো বান্দা; তাতে একটা অপরটার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তেমনি দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-চেতনা নিয়েও আমাদের প্রথম ও শেষ পরিচয় আমরা মানুষ। বিশেষ রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়েও আমরা বিশ্বের নাগরিক এবং আন্তর্জাতিক হতে পারি।

রাষ্ট্রাদর্শ অনুগ তথা সরকার-বাঞ্ছিত শিক্ষাপদ্ধতি কতকগুলো তোতা পাখি কিংবা পোষমানা প্রাণী তৈরি করতে হয়তো সমর্থ কিন্তু সুষ্ঠু মানসের মানুষ গড়তে পারে না। সার্কাসের বাঘ-সিংহ যেমন যথার্থ শ্বাপদ নয়—তাদের বিকৃত রূপ, তেমনি আরোপিত আদর্শের ও নীতি-চেতনার খাঁচায় লালিত বিদ্বানও সম্পূর্ণ মানুষ হয় না। টবের গাছ ও হাঁড়ির মাছ কখনো স্বাভাবিক বাড় পায় না। জ্ঞানের জগতে শিক্ষার্থীদের অবাধে ছেড়ে দিলে তাদের মন-মেজাজ-মনন স্বাধীন বিকাশ লাভ করবে। আর এটাই কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। জ্ঞানের জগতে দেশকাল-জাতিধর্ম নেই, আছে কেবল তথ্য ও তত্ত্ব এবং মানুষের আবিষ্কৃত তথ্যে ও উদ্ভাবিত তত্ত্বে সর্বমানবিক উত্তরাধিকার রয়েছে।

তত্ত্বকথা বাদ দিয়েও বলা যায়—কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার তথা পাঠক্রমে তথ্য ও সত্যের প্রতি আনুগত্য রেখে জাতীয়, ধর্মীয় কিংবা রাষ্ট্রীয় আদর্শ-উদ্দেশ্যের প্রতিবিম্বন বা প্রতিফলন সম্ভব নয়। তাহলে কেবল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃহৎ পৃথিবীকে, নিরবধি কালকে, বিশ্বের লব্ধজ্ঞানকে লুকিয়ে ছাপিয়ে গাড়ির ঠুলিপরা ঘোড়ার কিংবা ঘানির চোখবাঁধা বলদের মতো নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টির বিভ্রান্ত মনের নরম মনোভূমে বিকৃতির বীজ উপ্ত করে কতগুলো আধা-মানুষ তৈরি করে কী লাভ! কেননা, দেখা গেছে কোনো কল্যাণকর চিন্তা বা কোনো সুখকর সৌন্দর্য থেকে মানুষকে কোথাও বেশিদিন বঞ্চিত রাখা যায়নি, বিশেষ করে আজকের বিশ্বে তা নিতান্ত হাস্যকর ব্যর্থ প্রয়াস।

এই যন্ত্র-যুগে বিশ্বের কোনো প্রান্তের কোনো ভাব, চিন্তা, কর্ম, মত, আদর্শ কিংবা সংগ্রাম সেখানেই নিবদ্ধ থাকে না, তারে-বেতারে, লোকমুখে কিংবা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা বিশ্বময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এখনকার সংহত বিশ্বের মানবিক ভাব-চিন্তা-কর্ম আলোর মতো, বাতাসের মতো সর্বমানবের উপভোগ্য ও উপজীব্য হয়ে ওঠে। কেউ কাকেও শত প্রযত্নেও বঞ্চিত করতে পারে না। তা ছাড়া নতুন ভাব, চিন্তা, কর্ম, মত বা আদর্শ চিরকালই একক মানুষের দান। সে-মানুষ কোথায় কখন কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তা কেউ আগে থেকে জানতে পায় না। ঐ একজনের আবির্ভাবের ভয়ে অসংখ্য মানুষকে পঙ্গু করার ব্যবস্থা রাখা অমানবিক। ফেরাউন কিংবা কংসের ব্যর্থতার কথা এ-সূত্রে স্মর্তব্য।

এও উল্লেখ্য যে, আজ আমরা আমাদের রাষ্ট্রের যে চতুরাদর্শের কথা ভেবে গর্বিত, তাদের প্রত্যেকটিই এককালের নিষিদ্ধ-কথা এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদের উদ্ভব আর প্রত্যেকটির জনক বা উদ্ভাবকও একক ব্যক্তি। এসব চিন্তার জনককে হয়তো লাঞ্ছিত নয়তো নিহত হতে হয়েছে। প্রথমদিকে ধারক-বাহকদেরও নিয়তি ছিল অভিন্ন। কিন্তু তবু উচ্চারিত চিন্তা বা মত বা আদর্শের সংক্রমণ থেকে পৃথিবী মুক্ত থাকেনি। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে ও স্বীকৃতি পেতে সময় লেগেছে বটে, কিন্তু নিরবধি কালের তুলনায় তা কিছুই নয়। অতএব শিক্ষার মাধ্যমে অনুগতজন তৈরির রাষ্ট্রিক প্রয়াস বৃথা ও ব্যর্থ হবেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃটিশ আমলে দায়ে ঠেকে এদেশের সীমিত সংখ্যার মানুষকে কেরানি ও চাকুরে বানাবার জন্য শাসকগোষ্ঠী ইংরেজিশিক্ষা চালু করেছিল বটে, কিন্তু এদেশে উচ্চশিক্ষায়ও ক্যামব্রিজ-অক্সফোর্ডের অনুকৃতি ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-দর্শনের কোনো কেতাব থেকেই এদেশী ছাত্রকে বঞ্চিত করা হয়নি। এ বিদ্যায় যে-কয়জন মানুষ হবার হয়েছে, যারা না হবার হয়নি। কিন্তু শিক্ষাবিস্তারের কোনো ইচ্ছাই সরকারের ছিল না। এ সরকারি নীতি আজ অবধি এদেশে অপরিবর্তিত রয়েছে।

অবশ্য বিশুদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে ধর্মীয়, জাতীয় কিংবা রাষ্ট্রিক আদর্শ ও নীতি কেজো ও প্রয়োগযোগ্য না হলেও বৈষয়িক বিদ্যা রাষ্ট্রিক প্রয়োজনানুগ হতে পারে—যেমন প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা বিদ্যা, নৌবিদ্যা, সমরবিদ্যা, খনিজবিদ্যা, ভূবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা প্রভৃতি জীবিকা-সংস্থান লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক বিদ্যায় রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ অসঙ্গত নয়। এসব বিদ্যালয়-ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গণমুখী, দৈশিক, জাতিক কিংবা আঞ্চলিক করা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত করাও অযৌক্তিক হবে না।

কিন্তু মানুষ গড়া অর্থাৎ মানবিক বোধ-বিবেকের উৎকর্ষসাধন লক্ষ্যে শিক্ষাদান করতে হলে মানববিদ্যায় গুরুত্ব দিতেই হবে। কেননা মানববিদ্যাই মানুষের মানসজগৎ প্রসারিত করে। বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন মিটায় কিন্তু যে নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মানুষকে নির্বিশেষ মানুষ ও মানববাদী করে তা বহুলাংশে মানববিদ্যার প্রভাবপ্রসূত। প্রাণ থাকলেই প্রাণী, জীবন থাকলেই জীব, তেমনি পরিস্রুত মন থাকলেই হয় মানুষ। মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে মনের ঐশ্বর্য চাই। নইলে জৈব-জীবন অসার। ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতিই মানুষের মনের হীনতা, সংকীর্ণতা, অজ্ঞতা, অসূয়া, অসহিষ্ণুতা ঘুচিয়ে উদারবোধের জীবনে উত্তরণ ঘটাতে পারে। কেননা প্রজ্ঞা, প্রীতি ও কল্যাণবুদ্ধির পরিশীলন ও বিকাশ এ মানববিদ্যার উদার অঙ্গনেই সম্ভব। আজ যন্ত্র ও যান্ত্রিকতা মানুষের বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই মানববিদ্যার মাধ্যমে মনের পরিচর্যা আজ আরো জরুরি হয়ে উঠেছে। কেননা যন্ত্রীর মন যদি কল্যাণকামী না হয়, তাহলে যন্ত্র কখনো কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না।

জ্ঞানকে আমরা চোখের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখি। চোখের দৃষ্টি আমাদের চলার পথ নির্বিঘ্ন করে, জীবন-জীবিকার সর্বক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। জ্ঞানও তেমনি প্রজ্ঞারূপে আমাদের মানসজীবন উদ্দীপ্ত, নিরাপদ ও স্বস্তিকর করে।

উপসংহার

আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের আলোচনা প্রত্যক্ষ ও বাস্তব সমস্যাভিত্তিক না হয়ে পারোক্ষ ও অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যে অবসিত হল বলে মনে হবে। ভাববাদী বলে নিন্দিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলব—এ-যুগের জটিল জীবনচেতনার এবং দুঃসাধ্য জীবিকা-সংস্থান প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে মানবিক চেতনার ও জীবিকার ভারসাম্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব এখন শিক্ষালয়ে শিক্ষকের। সেইজন্যই জৈবিক ও মানবিক বৃত্তির একটি সমন্বয়সাধন অত্যন্ত জরুরি। আর এই ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে হলে মানবিক গুণের স্বাধীন ও সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত না করেই জৈবিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রয়োজনানুগ বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়। তাই আমরা মনে করি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কেবল মানববিদ্যা ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম পড়ুয়াদের গ্রাহিকা-শক্তি অনুযায়ী তৈরি হওয়া আবশ্যিক। প্রাথমিক স্তরে পড়ুয়াদের কৌতূহল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও জিজ্ঞাসা জাগানোই থাকবে প্রধান লক্ষ্য। মাধ্যমিক স্তরে (বয়ঃসীমা পনেরো) বুদ্ধিবৃত্তি, সৌন্দর্যচেতনা ও শ্রেয়বোধ জাগানোর লক্ষ্যেই পাঠক্রম রচিত হবে। এবং উচ্চশিক্ষায় পড়ুয়াদের প্রবণতা অনুসারে বৃত্তিমূলক বিদ্যা নির্বাচনে স্বাধীনতা থাকা দরকার। অবশ্য কৃষিবিদ্যা, কৃৎ-কৌশল, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, সমুদ্রবিদ্যা, নৌবিদ্যা, সমরবিদ্যা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সামর্থ্যানুযায়ী সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত নয়। কারণ রাষ্ট্রের জনগণের ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করা শেষাবধি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলে মানুষ নির্বিশেষের মানবিক গুণ বিকাশের স্বাধীন অধিকার থেকে কাউকেও বঞ্চিত রাখা এ-যুগে নিশ্চয়ই অমানুষিক অপরাধ। তাই কেবল কর্মী ও যন্ত্রী হওয়া কিংবা বানানো জীবনের বা রাষ্ট্রের লক্ষ্য হতে পারে না। এ কারণেই শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা মাধ্যমিক স্তর অবধি কেবল মানুষ গড়ার পদ্ধতি উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারে গুরুত্ব দিতে চাই।

শিক্ষায় মানুষমাত্রেরই যে জন্মগত অধিকার রয়েছে, তা আজ আর অস্বীকৃত নয়। তাই কাজ দেয়া যাবে না বলে সাধারণ শিক্ষা থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা চলবে না এই সাধারণ শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তর অবধি জীবন-সংলগ্ন রাখতে হবে, যেমন উচ্চশিক্ষা হবে জীবিকা-সংপৃক্ত। কারণ বোধশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই মনুষ্যত্বের সোপান। তাই সর্বজনীন তথা গণশিক্ষার প্রবর্তন ও বয়স্কশিক্ষার আশু ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

এ সূত্রে বিশেষ স্মর্তব্য যে, সাধারণ মানববিদ্যার সঙ্গে যেমন বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যারও কিছু সংলগ্নতা কাম্য ও আবশ্যক, তেমনি উচ্চবৃত্তিমূলক বৈষয়িক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের যে-কোনো একটি পাঠ্য রাখা দরকার। তাহলেই কেবল বিবেকবান আনাড়ি-মানুষ বা হৃদয়হীন যন্ত্রী-মানুষ তৈরির সমস্যা থেকে সমাজ মুক্ত থাকবে। এ ছাড়া বিবেচক মানববাদী মানুষ তৈরির অন্য উপায় আজো অনাবিষ্কৃত।

AMARBOI.COM

শিক্ষা সম্বন্ধে আজকের ভাবনা

শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোটা জাতির স্বার্থ জড়িত। এবং জাতীয় জীবনে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই নেই। কেননা আজ অবধি মানুষের জীবন-জীবিকা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত লোকেরাই নিয়ন্ত্রণ করে। নিরক্ষরতার যুগেও সামাজিক প্রয়োজনে মৌখিকভাবে ও ঘরোয়া পরিবেশে 'লোকশিক্ষা'র ব্যবস্থা চালু ছিল। এই 'লোকশিক্ষা'র বিষয় ছিল নৈতিক, বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শাস্ত্রীয় আচরণসংপৃক্ত রীতি-পদ্ধতি ও আচার-পার্বণ সম্বন্ধীয় নীতি-রেওয়াজ। ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন, আপ্তবাক্য, ইতিকথা, রূপকথা ও কিংবদন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে লোকায়ত ও গৃহগত বিশ্বাস-সংস্কার, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান, আদর্শ-উদ্দেশ্য চেতনা প্রভৃতি প্রচারিত ও প্রচলিত থাকত। পুরুষানুক্রমে মুখে মুখে ও কানে কানে চালু থাকত শাস্ত্র সমাজ-রোগ-চিকিৎসা প্রভৃতি জীবন-জীবিকাসংপৃক্ত সর্বপ্রকার শিক্ষা। এসব শিক্ষায় যারা জ্ঞানী-গুণী ও অভিজ্ঞ হত, তারাই থাকত দলপতি বা সমাজপতি-সর্দার। আজো অজগাঁয়ে কিংবা আরণ্যমানবে তা বিরল নয়। নিরক্ষরতার যুগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞ প্রধান ব্যক্তিমাত্রই ছিল শ্রদ্ধেয়, মান্য ও উপদেষ্টা। রূপকথার রাজ্যে সঙ্কটকালে তাই অবসরপ্রাপ্ত বুড়ো মন্ত্রীর ডাক পড়ত সঙ্কটত্রাণের উপায় বাতলে দেয়ার জন্য। নিরক্ষরতার যুগে অভিজ্ঞতাই ছিল নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ বা প্রজ্ঞাবান জ্ঞানী হবার উপায়। নিজের জীবনের ঘটনা থেকে শেখার নাম অভিজ্ঞতা আর অন্যের অভিজ্ঞতা জেনে শেখার নাম জ্ঞান। ব্যক্তির সীমিত জীবনে অভিজ্ঞতাও থাকে সীমিত ও স্বল্প। কেবল উদ্যমশীল দুঃসাহসী পর্যটকের—অভিযাত্রীর জীবনেই বহুদর্শিতালব্ধ অভিজ্ঞতা ক্বচিৎ বহু ও বিচিত্র হত। সেরকম অনন্য মানুষও ছিল দুর্লভ।

হরফ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে লেখার মাধ্যমে পরের বিভিন্ন বিষয়ক সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা জেনে নিয়ে জ্ঞানী হওয়ার পথে উৎসুক মানুষের আর কোনো বাধা রইল না। আর কে না-জানে জ্ঞানই শক্তি! এই জ্ঞান দিয়েই আমরা জগৎকে জানি, জীবনকে বুঝি, সমাজ গড়ি, জীবিকা সংগ্রহ করি, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সুখ সৃষ্টি করি। এ লক্ষ্যেই তৈরি হয়েছে শাস্ত্র-সমাজ-রাষ্ট্র-সংস্কৃতি-সভ্যতা সবকিছু। জীবন-জীবিকা সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ করে জীবনে নির্বিঘ্নে চলার পাথেয় তথা যোগ্যতা অর্জন করার সাধারণ নাম শিক্ষা। অতএব সাধারণভাবে শিক্ষিত জ্ঞানীরই নামান্তর মাত্র। যেহেতু জ্ঞানই শক্তি, সেহেতু মানুষের ব্যক্তিক, ঘরোয়া, পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নাগরিক, ও রাজনীতিক জীবন দুনিয়ার সর্বত্র শিক্ষিত মানুষের নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়।

এ শিক্ষা বা জ্ঞান যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তাহলে মানুষ হয় অমানুষ। তখন জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে নেমে আসে বিপর্যয়। অর্থাৎ বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির, জ্ঞানের সঙ্গে প্রজ্ঞার, বোধের সঙ্গে বিবেকের, উদ্যোগের সঙ্গে আয়োজনের, উদ্দেশ্যের সঙ্গে আদর্শের, কর্মের সঙ্গে নীতির, দায়িত্বের সঙ্গে চরিত্রের, কর্তব্যের সঙ্গে সদিচ্ছার, সেবার সঙ্গে সততার, ত্যাগের সঙ্গে তিতিক্ষার, ভোগের সঙ্গে সংযমের আনুপাতিক সংযোগ-সামঞ্জস্য না ঘটলে বিদ্যা-বৃদ্ধি-জ্ঞান-কর্মনিষ্ঠা যে জীবনে-সমাজে-সংসারে বিপর্যয় ঘটিয়ে বহু দুঃখের আকর হয়ে দাঁড়ায়, আজকের অনগ্রসর রাষ্ট্রগুলোতে শিক্ষিত লোকের চরিত্রহীনতা/প্রসূত দুর্নীতি-বাহুল্যই তার সাক্ষ্য। নির্ধন-নিরক্ষর-নিঃস্ব-নিঃসহায় কোটি কোটি মানুষ দুনিয়ার অনগ্রসর, অনুন্নত দেশগুলোতে বিবেকবর্জিত শাসক-প্রশাসক-শাস্ত্রী-সার্থবাহনদের শাসন-শোষণ-পেষণ-পীড়ন-নির্যাতনের প্রভাব ও প্রতাপের শিক্ষার রূপে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য হয়ে অকালে অপমৃত্যুর কবলে পড়ে। অশেষ সম্ভাবনাময় জীবনে বিকাশের, বিস্তারের, আনন্দের, অবদানের ও উপভোগের দিগন্তদুয়ার থাকে চিররুদ্ধ। এমনি করে দুর্লভ মানবজীবন হয় অপচিত ও অবসিত।

প্রীতিহীন হৃদয়, প্রত্যয়হীন কর্ম এবং বিবেকবিরহী বিচার যে বন্ধ্যা, তা যে নিজের কিংবা পরের কোনো কল্যাণ করতে অসমর্থ, শিক্ষার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ চেতনাদানই শিক্ষার মৌল লক্ষ্য হওয়া আবশ্যিক। মানুষ এমনি শিক্ষা না-পেলে মানবিক সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব।

আজকাল শিক্ষার অর্থকর উৎপাদন-যোগ্যতার তথা বৃত্তিমূলকতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন কর্ম যেমন নিষ্ফল, তেমনি চরিত্রবর্জিত শিক্ষিত মানুষও সমাজের দায়—সম্পদ নয়। কেননা তার চিন্তা ও কর্ম বহুজনহিত ও বহুজন সুখ-লক্ষ্যে নিয়োজিত হয় না। তাই আমরা শিক্ষার নৈতিকতা ও বৃত্তিমূলকতার সহস্থিতি আবশ্যিক বলে মানি। কিন্তু কেবল শিক্ষায়তনে শেখা নীতিকথায় মানুষের চরিত্র গড়ে ওঠে না। তাছাড়া জ্ঞান শক্তি দেয়, চরিত্র গড়ে না। চরিত্র গঠিত হয় পারিবারিক পরিবেশে। আজ আমাদের শিক্ষালয়গুলো নৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈন্যপ্রসূত দুর্নীতি ও অরাজক উচ্ছৃঙ্খলার আকরও বটে, কিন্তু তা' বিদ্যালয়ের দোষে নয়—পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে ও সমাজ-প্রতিবেশে নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের প্রেরণা পায় না বলেই। ব্রিটিশ-শাসনের অবসানে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিক্ষিত উঠতি মধ্যবিত্ত বয়স্ক মানুষেরা লাভের-লোভের প্রায় নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন সুযোগ পেয়ে চরিত্র হারায়। সেই দূষিত ঘরোয়া ও সামাজিক প্রতিবেশে যারা মানুষ হল তারাও আবার একটি বিপ্লবের নয়, আকস্মিক বিপর্যয়ের সুযোগে নৈতিক-চারিত্রিক ক্ষেত্রে শিথিল-শাসনের প্রশ্রয়ে শঙ্কা-সঙ্কোচ-শরম পরিহার করে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। পাপ-নিন্দা-অপরাধ-চেতনাবিরহী এই মানুষকে নীতি ও নিয়মনিষ্ঠ করে তেমন সাধ্য কারুর বা কিছুর নেই। কাজেই আজকের পরিস্থিতির জন্য কেবল শিক্ষক, ছাত্র, সরকার, অভিভাবক দায়ী নয়, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে দায়ী গোটা শিক্ষিতসমাজ। অতএব আমাদের নৈতিক-শৈক্ষিক-সামাজিক বিপর্যয় আকস্মিকও নয়, অহেতুকও নয়— কাজেই অভাবিত নয়। মূল্যবোধেরই অপর নাম যে সংস্কৃতি—সেকথা আমরা কখনো মনে রাখিনি। তাই এ পরিণাম!

এই দুর্নীতি ও অরাজক বুনো পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে আজ দেশের সামগ্রিক জীবন-প্রবাহ বিশৃঙ্খল-বিপর্যস্ত। গোটা জাতির ঘরোয়া, সামাজিক, নৈতিক, আর্থিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন আজ কলুষিত, বিক্ষত, বিষাক্ত ও অনিশ্চিত। জাতীয় জীবনে এরচেয়ে দুর্যোগ-দুর্দিন আর কিছুই হতে পারে না। আজ দেশের মানুষের চরিত্রহীনতাই সমাজের সর্বস্তরে মূল সমস্যা, প্রায় অধিকাংশ দুঃখের আকর বা উৎস।

সারাদেশের এ সমস্যার সমাধানের শক্তি, সামর্থ্য, অধিকার কিংবা উপায় আমাদের নেই। তবে সচেতন নাগরিক হিসেবে 'স্ব'-এর ও স্বজনের হিতে অন্তত আমরা ঘরোয়া, সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনে স্ব-স্ব এলাকায় যদি নীতি ও নিয়মনিষ্ঠ হই এবং সাহস করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অন্যের দুর্নীতি ও অপকর্মে সাধ্য ও সুযোগমতো নৈতিক কিংবা বৈধ বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করি, তাহলে নেহাত নিষ্ক্রিয়তার গ্লানি, মূল্যবোধহীনতার লজ্জা এবং বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পেতে পারি।

সংঘাত প্রসূন

ছোটবেলায় শুনতাম 'বিদেশী তাড়াও, সুখ আসবে'। বিদেশী বিতাড়িত হল, কিন্তু সুখ এল না। তারপরে শুনতাম 'বিধর্মী হঠাও' সুখ আসবে,'—দাঙ্গা-হত্যার মাধ্যমে তাও হয়েছিল আংশিকভাবে, কিন্তু সুখ এল না। শেষবার শুনলাম 'বিভাষী বিতাড়নে সুখ আসবে।' কিন্তু সুখ আসেনি, বরং যন্ত্রণা বেড়েছে নানাভাবে। ভাত-কাপড় ও নিরাপত্তার অভাব-প্রসূত যন্ত্রণাই মুখ্য। এ যন্ত্রণার মানস-উপশম নেই—কেননা, প্রবোধ পাবার আগেকার কারণগুলো অপগত। এখন যাঁদের শাসনে রয়েছি, তাঁরা আমাদের স্বদেশী স্বধর্মী-স্বজাতি আত্মীয়-বন্ধু ও ভাই। না-পারি পর ভাবতে, না-পারি গালি পাড়তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে শাসক বদলালেই সুখ আসে না। স্বজন হলেই স্বস্তি মেলে না। সুখের ভিত্তি ও স্বস্তির কারণ রয়েছে অন্যত্র। সেই ভিত্তি ও কারণ সম্পর্কে নানাজনের নানা মত। তবে সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য সবার কাম্য এবং তা কালগত—এ ধারণা আজকাল কমবেশি প্রায় সবাই পোষণ করে। সত্য-ন্যায়-নীতি-আদর্শ এবং রীতি-পদ্ধতির চিরন্তনতা, অনপেক্ষতা কিংবা দেশান্তরে ও কালান্তরে ঐগুলোর অভিন্নতার তত্ত্ব আজ আর বিশেষ স্বীকৃত নয়। সমস্যা যে জীবনের নিত্যসঙ্গী এবং চলমানতার অনুষঙ্গী তাও আজ আর অস্বীকৃত নয়। নতুন কাল ও নতুন জীবনমাত্রই নতুন সমস্যার নামান্তর। স্বকালে মানুষ স্ব-সৃষ্ট সমস্যার মধ্যেই বাঁচে এবং স্ব-স্বার্থে সমাধানপ্রয়াসই জীবনচেতনা-প্রসূত জীবন-ভাবনা ও জীবন-প্রেরণার তথা ভাব-চিন্তা ও কর্মের প্রসূতি। একাকীত্বের অভাব-অসহায়তা বিমোচনের জন্যে প্রাণী স্ব-শ্রেণীর সমাজ-সংলগ্ন এবং প্রাণিজগতের বিশেষ বিকাশের ফলে মানুষের সমাজ দায়িত্ব ও কর্তব্যবহুল, জটিল ও অনন্য। তাই প্রাণিজগতে মানুষের সমস্যা ও সমাধান বহু ও বিচিত্র এবং সদাবর্ধিষ্ণু। তার দেহ- মনের উৎকর্ষ তাকে করেছে কুশলী ও অপ্রাকৃত কৃত্রিম জীবন-পদ্ধতি রচনায় উদ্যোগী ও উৎসাহী। তারই ফলে স্ব-শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে তারা দ্বন্দ্বে-মিলনে, প্রীতি অসূয়ায়, সদ্ভাবে-সংঘাতে অসামান্য। দানে-প্রতিদানে, লোভে-ত্যাগে, রাগে-বিরাগে, প্রীতি-ঘৃণায়, সহায়তায়-শত্রুতায়, উপকারে-অপকারে, আনুগত্যে-দ্রোহে, লাভে-ক্ষয়ে, সেবায়-বঞ্চনায়, আর কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিতে মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবন-প্রবাহ আজকের এই স্তরে রূপ নিয়েছে—সবটাই হয়েছে আত্মকল্যাণে ও শ্রেয়সের সন্ধিৎসায়।

আশ্চর্য, মানুষের কোনো পরিবর্তন কিংবা বিবর্তন আপসে ও আপ্সে হয়নি। চিরকাল একটি আঘাত, সংঘাত, উপপ্লব কিংবা বিপ্লব প্রয়োজন হয়েছে এবং তা ঘটেছে মড়ক-ঝঞ্ঝা-প্লাবন-ভূমিকম্প-অগ্ন্যুৎপাত কিংবা জরু-জমি ঘটিত সংঘাতে অথবা সামাজিক-নৈতিক-শাস্ত্রিক বিসংবাদে বা লোভ-অসূয়াবশে বৃত্তিচ্যুতির ফলে সংঘটিত সংঘর্ষ-সংগ্রাম-বিপ্লব-উপপ্লবের পরিণামে। অব্রাহাম-মুসা-গৌতম-মহাবীর-ঈসা-মুহম্মদের আমল থেকে আজ অবধি মানুষের যাবতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতি ঐ দ্বন্দ্ব-সংঘাতপ্রসূত। সমস্যা ও যন্ত্রণা থেকেই জাগে মুক্তির প্রেরণা ও প্রয়াস। এজন্য সমস্যা ও যন্ত্রণা, সংঘর্ষ ও সংঘাত অভিশাপ নয়, অভিপ্রেত সুযোগ। কবির কথায়—

আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছু আলো।

অতএব দুঃখ-বিপদ-সমস্যা, ক্ষয়ক্ষতি-যন্ত্রণাই মানব-প্রগতির প্রসূতি। তাই কবি বলেন—'আঘাত সে যে পরশ তব, সেই তো পুরস্কার'।

এই পাপবিমোচনের জন্য দুনিয়ার বহু বহু নবী-অবতার-দেবতা-সম্রাট ছিলেন লড়িয়ে—রক্তক্ষরা সংগ্রামে নিরত। সে-যুদ্ধ ছিল হত্যার রূপকে সত্যাগ্রহ ও সত্যের উদ্বোধন। অব্রাহাম-মুসা-দাউদ-সোলায়মান-নূহ-লুৎ-হুদ-সালেহ-শোয়েব-ইন্দ্র-কালী-শিব-রাম-কৃষ্ণ প্রমুখের কৃতিত্বের অনেকখানি হচ্ছে প্রমূর্ত পাপরূপী নরদানব ও সমাজ বিনাশ-বিনষ্ট করা। সেই ধ্বংস দেখে কেবল নির্বোধই ভয় পেয়েছিল, পাপী-দানবই কেবল ত্রস্ত ও বিলুপ্ত হয়েছিল। প্রাজ্ঞরা জানত এ 'প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন' এবং 'আসছে নবীন জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন।' যুগে যুগে ঝঞ্ঝা-প্লাবন-মড়ক-দ্রোহ-বিপ্লব-উপপ্লব-সংঘাত-সংঘর্ষ ও রক্তস্নানের মাধ্যমেই জন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয় নতুন ভাব-চিন্তা, মন-মনন, সমাজ-শাস্ত্র-রাষ্ট্র, রীতি-নীতি-আদর্শ, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস। জেগে ওঠে নব-চেতনা, জন্ম নেয় নবমানবতা। মনুষ্য-সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ যেখানে যতটুকু হয়েছে, তা হয়েছে এভাবেই।

য়ুরোপকেন্দ্রী আধুনিক দুনিয়ার ইতিহাস আমাদের এ ধারণাই সমর্থন করে। ইতিহাসের সাক্ষ্য থেকে পাই, নেদারল্যান্ডের মুক্তিসংগ্রাম, কৃষকবিদ্রোহ, Inquisition-এর বিরুদ্ধে Huss ও Luther-এর গণবিদ্রোহ তথ্য প্রোটেস্টান্ট মতবাদ, কপারনিকাস-গ্যালিলিও-র উচ্চারিত তথ্য, ফরাসি বিপ্লব, নেপোলিওঁর দিগ্বিজয়, বিজ্ঞানবৃদ্ধি, দার্শনিক তত্ত্ব, শিল্পবিপ্লব, মার্কসবাদ প্রভৃতি বহুতর সমাজ, শাস্ত্র, রাষ্ট্র, মনন, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব, তথ্য, আলোড়ন-আন্দোলন-সংঘাত-সংঘর্ষ-বিবর্তন-পরিবর্তনই য়ুরোপ-প্রসূত ও প্রভাবিত আধুনিক বিশ্ব তৈরি করেছে।

আঠারো শতক থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া দার্শনিক চিন্তাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে। আস্তিক্য-নাস্তিক্য এবং সংশয়বাদী ও হিতবাদী দর্শন বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে মানসগতির যেমন সমতা রক্ষা করেছে, তেমনি কবি-সাহিত্যিকগণও মানব-মুক্তির দিশাসন্ধানী হয়েছেন। ভল্ট্যায়ার, গ্যেটে, ভিক্টর হুগো, টলস্টয়, রোমাঁরোলা, ডস্টয়ভস্কি, এরিয়ারেমার্ক, টমাসম্যান প্রমুখ বহুতর মনীষী মানব-চিন্তায় যেমন প্রবুদ্ধ, তেমনি মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন-মাও-চেগুয়েভারা প্রভৃতিও লোকায়ত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক ও নতুন সমাজবাদের প্রয়োগ-প্রয়াসী সংগ্রামী। এই নতুন-পুরনো বীর-মনীষীরা সবাই বিপ্লব-উপপ্লবের সন্তান। সবাই দেখা দিয়েছেন উপসর্গ হিসেবে এবং পরিণামে প্রতিভাত হয়েছেন আশীর্বাদরূপে।

এই শতাব্দীর সূর্য সংঘাত-সংগ্রামের মাধ্যমে নির্জিত-শোষিত মানুষের সর্বপ্রকার মুক্তির আশ্বাস ও বাণী নিয়েই হয়েছে উদিত, তাই আত্মপ্রত্যয় ও মুক্তি-প্রত্যাশা চেতনাকে করেছে চঞ্চল, প্রয়াসকে করেছে প্রবল। প্রথম মহাযুদ্ধের রক্ত-সাগরে জন্ম নিয়েছিল League of Nations, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান United Nations' Organisation, প্রথম মহাযুদ্ধের দান মার্কসীয় তত্ত্বের বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ। আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার নির্জিত সমাজে নতুন চিন্তাচেতনার সূচনা, বলকান রাষ্ট্রগুলোর উদ্ভব, আফ্রো-এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করার স্পৃহার উন্মেষ, সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম ও যান্ত্রিক জীবনের বিকাশ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দান আফ্রো-এশিয়ার জাতিগুলোর স্বাধীনতা অর্জন, চীনে কম্যুনিজমের প্রতিষ্ঠা, বলকান রাষ্ট্রগুলোসহ রাশিয়া-প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, বলকান রাষ্ট্রগুলোসহ রাশিয়া-প্রভাবিত অঞ্চলসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রসার ও যন্ত্র-জীবনের বিস্তার এবং ক্রুর ঔপনিবেশিক বর্বরতা ও স্থূল সাম্রাজ্যবাদের অবসান, মার্কসবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও পুঁজিবাদের প্রতি ঘৃণার প্রসার।

তৃতীয় মহাযুদ্ধ প্রয়োজন মানববাদের পূর্ণ স্বীকৃতির জন্যই। ছলনাময় বর্বরতা ও বঞ্চনার কবল থেকে বিশ্বমানবকে উদ্ধারের জন্যই তৃতীয় মহাযুদ্ধ আবশ্যিক। বৈনাশিক আঘাত-সংঘাতের বেদনা এবং ক্ষয়ক্ষতির অনুশোচনা ব্যতীত মনুষ্য-মন-মননের পরিবর্তন হয় না। তাই রক্তক্ষরা বেদনার প্রয়োজন, মর্মদাহী অনুশোচনা দরকার এবং দুটোই মেলে রক্তসাগরে ও জ্বলন্ত লাভাস্রোতে। ইতিহাসের সাক্ষ্যে গুরুত্ব দিলে শান্তি-কপোতেরাও তা স্বীকার করবেন। একদিন মধ্যএশিয়ায় জনবহুলতার শিকার মানুষেরা নগ্ন তরবারি হাতে তুরঙ্গসোয়ার হয়ে বিজয়ীর বেশে চারদিককার পররাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা ও আত্মবিস্তার করেছে। বলা চলে পররক্ত পান করেই তারা নিজেদের প্রাণরস সংগ্রহ করেছে। ষোলো শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনবহুল য়ুরোপ নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করে জনসংখ্যার বৃদ্ধি-প্রসূত সমস্যার সমাধান পেয়েছে। সেই বর্বরতার যুগ আর নেই যে, তেমনি বুনো পদ্ধতিতে আজকে মানবিক সমস্যার সমাধান মিলবে। আজ সমস্বার্থে, সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষকে বাঁচতে হবে—'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।' নীতিকথায়, তত্ত্বচিন্তায়, প্রীতি-মৈত্রী-করুণার আবেদনে সাড়া দিয়ে কেউ যে মানবকল্যাণে ক্ষতি স্বীকারে রাজি হবে, তেমন প্রত্যাশা সাধারণত বিড়ম্বিত হয়। আমাদের ধারণা, আজকের এশিয়ার অপ্রতিরোধ্য জনসংখ্যা-বৃদ্ধিপ্রসূত অসমাধ্য সমস্যার প্রতিকার রয়েছে তৃতীয় মহাযুদ্ধোত্তর সম্ভাব্য তীব্র-তীক্ষ্ণ মানববাদী-চেতনায়। যে-চেতনা বিস্তৃত ভুবনে আনুপাতিকহারে জনবিন্যাসে ও খাদ্য বণ্টনে আপত্তি তুলবে না, জাত-জন্ম-বর্ণ-ধর্মের দ্বিধা-বাধা অতিক্রম করে মানুষকে কেবল মানুষ হিসাবেই গ্রহণ করতে প্রবর্তনা দেবে! বাঁচার গরজই আমাদের এই স্বপ্নকে বাস্তব, এই সাধকে সাধ্যায়ত্ত করতেই হবে। অন্তত বাঁচার শেষ-প্রয়াস এ পথেই চালিত করতে হবে। সর্বপ্রকার তাৎপর্যেই জীবন মানে চলমানতা এবং পাথেয় সন্ধানের ও সঞ্চয়ের সংগ্রাম। কে না-জানে, জীবন জয়ীরই ভোগ্য এবং জিতের পরিণাম মৃত্যু! জীবনের জন্যই জয় প্রয়োজন। তাই প্রাণীমাত্রই জিগীষু! আমরাও প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচব। শতাব্দীর সূর্য আমাদের সে-প্রত্যাশাই জাগায়।

AMARBOI.COM

জনবৃদ্ধি : বিশ্বের আতঙ্ক

জনসংখ্যা আজো গণনাতীত না হলেও এর দ্রুতবৃদ্ধি বিশ্ব-সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। অবশ্য বৃদ্ধির হার সর্বত্র সমান নয়। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থনীতিক মান ও অবস্থান অনুসারে আনুপাতিক তারতম্য রয়েছে। তাই এ সমস্যা এখনো আঞ্চলিক, দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বমানবিক সমস্যা হিসেবে গুরুতর হয়ে ওঠেনি। সেজন্যই এ সমস্যা আলোচনার বিষয় হলেও আন্তরিক উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে জন্মনিরোধ প্রয়াসাদি আজো রাষ্ট্রসমূহের পর্যায়ে রয়ে গেছে—বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত হয়নি। কাজেই এখনো কোথাও গাণিতিক হারে, কোথাও জ্যামিতিক হারে জনসাংখ্যা বেড়েই চলেছে।

আগেও মানুষের প্রজননশক্তি এমনিই ছিল। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত উচ্চ ছিল না। কারণ প্রসূতি ও সন্তান বাঁচানো দুষ্কর ছিল। মানুষের অজ্ঞতা ছিল তখন প্রায় পর্বতপ্রমাণ। অজ্ঞতার সমুদ্রবেষ্টিত হয়ে মানুষ জ্ঞানের ক্ষুদ্রদ্বীপে নিবদ্ধ ছিল। প্রকৃতি তখনও বশীভূত হয়নি। সর্বপ্রকার প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ প্রকৃতির দয়ার ওপর আত্মসমর্পণ করে ভয়-ত্রাস-আশার মধ্যে বাঁচত। রোগ ছিল, কিন্তু রোগের প্রতিষেধক জানা ছিল না। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক শক্তি নির্ভরতায় তারা দ্বিধা-শঙ্কা-আশ্বাসের এক মিশ্র অনুভূতিতে অতিপ্রাকৃত প্রবোধ খুঁজত। তুকতাক, দারুটোনা, ঝাড়ফুঁক, উচাটন কিংবা দোয়া-মন্ত্রের তাবিজ কবজ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদুলী অথবা স্থূল দ্রব্যগুণ-নির্ভর চিকিৎসাই ছিল রোগে বিপদে তাদের অবলম্বন। সব রোগ ও রোগের কারণ জানা ছিল না। সব রোগই প্রায় দেবতা উপদেবতা ও অপদেবতার কুদৃষ্টি ও ক্রোধের প্রভাব বলেই মনে করা হত। তাই পূজা-শির্নি-প্রার্থনার মাধ্যমে দেবতার তুষ্টিসাধনের চেষ্টাই ছিল মুখ্য, চিকিৎসা ছিল গৌণ। আজো অনুন্নত দেশের অশিক্ষিত মানুষেরা কলেরা-বসন্ত-প্ল্যাগ প্রভৃতিকে অপদেবতার প্রকোপ-প্রসূত বলেই জানে। মহামারী মাত্রেই ক্ষুব্ধ ও দুষ্ট দেবতার প্রতিহিংসাপরায়ণতা বলেই তাদের ধারণা। কাজেই তাদের কাছে বাঁচাটা দৈবানুগ্রহ এবং মরাটা দৈবনিগ্রহ।

একবার মহামারী লাগলে গাঁ উজার হয়ে যেত। সমসংখ্যক মানুষ সৃষ্টি করতে আবার বিশ ত্রিশবছর লেগে যেত। অবশ্য মধ্যে আবার কলেরা-বসন্ত-প্ল্যাগের প্রার্দুভাব দেখা না-দিলে তবে তা সম্ভব হত। কিন্তু এমন সৌভাগ্য তাদের জীবনে ক্বচিৎ দেখা গেছে। একারণেই পৃথিবীর আদিম গোত্রগুলোর অধিকাংশই লোপ পেয়েছে। আজো অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড-আমেরিকার আদিম পদ্ধতির জীবনযাত্রী আদিবাসীরা লোপ পাচ্ছে।

আবার আগেকার কাড়াকাড়ির যুগে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও হানাহানি প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনাই ছিল। গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-লড়াই ছাড়াও ব্যক্তিক বিবাদও হানাহানিতে পরিণতি পেত। তাতেও মরত অনেক মানুষ। তাছাড়া অনাহারক্লিষ্ট ও রোগজীর্ণ-দরিদ্র ঘরে আজো মৃত্যুর হার অধিক। আজো অশিক্ষিত দরিদ্র ঘরে যত শিশু জন্মায় তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশই বেঁচে থাকে। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেও ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর-প্লীহা-যক্ষা-সূতিকা কলেরা-বসন্তে লক্ষ লক্ষ লোক আমাদের দেশেও মারা যেত।

১৭৭০-এর দশকে রাজস্ব নিরূপণের প্রয়োজনে ওয়ারেন হেসটিংস-এর নির্দেশে চট্টগ্রাম শহরের চারদিকের চারটে গাঁয়ের মানুষের চারবছরের জন্ম-মৃত্যুর হার নিয়ে দেখা গেছে, কোনো গাঁয়ে পাঁচ-দশজন বেড়েছে এবং কোনো গাঁয়ে কমেছে এবং গড়ে প্রায় স্থিরই ছিল।

আজকাল যক্ষ্মা-বহুমূত্র-ক্যানসার-আল্‌সার-মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ-হৃৎরোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিরও প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে অকালে মৃত্যু পথ প্রায় রুদ্ধ হয়ে গেছে। আগে বাঁচাই ছিল দুঃসাধ্য দৈব ব্যাপার, এখন মরাটাই হচ্ছে দুর্ঘটনা। বস্তুত দুর্যোগ-দুর্ঘটনা এবং যুদ্ধ ছাড়া এযুগে অকালে মৃত্যুর এলাকায় পৌঁছা প্রায় অসম্ভব। তাই পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চক্রবৃদ্ধিহারে বা জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বাড়ছে। এক-শতকের মধ্যেই কোথাও জনসংখ্যা দ্বিগুণ-আড়াইগুণ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব সমস্যা ভয়ঙ্করভাবে গুরুতর।

আদ্যিকালেও সভ্যতর সমাজে অর্থাৎ জীবন-জীবিকা পদ্ধতি যাদের উন্নততর ছিল এবং টোট্‌কা চিকিৎসাবিদ্যা যাদের আয়ত্তে এসেছিল, সেই উন্নত সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেদিন তাদেরও সামনে তা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেদিনও অজ্ঞ মানুষের পক্ষে তার সমাধান সহজ ছিল না। তখন অবশ্য বিস্তৃত ভুবন ফাঁকা পড়েছিল, কিন্তু যানবাহন ও হাতিয়ারের অভাবে অপটু মানুষের পক্ষে তখনও তা দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য। তাছাড়া সেদিনও মানুষ স্বার্থপর ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। কাজেই সেদিনও বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে করে অগ্রসর হতে হয়েছে। মানুষের আত্মবিস্তারের ক্ষেত্রে গোত্রীয় সংগ্রামের যুগ দীর্ঘস্থায়ী ছিল। সেই প্রাকৃতিক 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' নীতি অনুযায়ী প্রবল শক্তি দুর্বলকে উচ্ছেদ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মবিস্তার করত।

তবু যতই দুর্গম-দুর্লঙ্ঘ্য হোক, বেঁচে থাকার গরজে জীবনের চাহিদা পূরণের জন্যই মানুষকে সেদিনও মরিয়া হয়ে এগিয়ে যেতে হত। তাই দেখতে পাই, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তারা আফ্রিকার উত্তর উপকূলে, ভারতে ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। এমনকি সুদূর অস্ট্রেলিয়া অবধি বিপদসঙ্কুল পাড়ি জমিয়েছিল। আবার এমনি সমস্যার সমাধানমানসে মধ্যএশিয়ার আর্যরা এশিয়া-য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মঙ্গোলীয়রা পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার ফিলিপাইন অবধি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐতিহাসিক যুগেও আমরা মধ্যএশিয়ার শক-হূন-ইউচি-কুশানদের প্রবল পরাক্রমে চারদিকে বেরিয়ে পড়তে দেখেছি। যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিংবা অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্য ও চারণ ভূমির অভাব দেখা দিয়েছে, তখনই প্রাণের দায়ে বাঁচবার তাগিদে তারা আরবে, ইরানে, ভারতে, চীনে, রাশিয়ায় ও বলকান অঞ্চলে পরাক্রান্ত শক্তি রূপে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করে আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। এই সেদিনও তুর্কি-মুঘলের দাপটে এশিয়া বারবার প্রকম্পিত হয়েছে—বিধ্বস্ত হয়েছে কত নগর-জনপদ। এটিলা, চেঙ্গিস, হালাকু, কুবলাই, তৈমুর তাদের প্রাণের পোষক বলেই তাদের জাতীয় বীর। তারা জানত সামনেই তাদের জীবনের আশ্বাস, পশ্চাতে মৃত্যুর বিভীষিকা। তাই তাদের তুরঙ্গগতি ছিল অপ্রতিরোধ্য, বিজয়ীর গৌরবই ছিল তাদের প্রাপ্য; পরাজয়ের কলঙ্ক তাদের ললাটে কখনো লিখিত হয়নি। এরাই বুঝি কুরআনের এয়াজুজ-মাজুজ! এদের ভয়ে নির্মিত চীন-ককেসাসের দুর্ভেদ্য প্রাচীরও কখনো রোধ করতে পারেনি এদের অগ্রগতি।

পনেরো-যোলো শতকের য়ুরোপে এমনি জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্র্যই মানুষকে নীল সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার প্রেরণা যুগিয়েছিল। পনেরো শতকের শেষ দশক থেকে উনিশ শতক অবধি নতুন ভুবন সন্ধানে অভিযাত্রীদের অবচেতন প্রেরণার উৎসই ছিল এই বাঁচা ও স্বজনকে বাঁচাবার তাগিদ। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গল আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্ষুধা মেটেনি। তারপরেও য়ুরোপবাসীরা দুর্ধর্ষ শক-হূন-মোঙ্গলদের মতোই দুনিয়ায় দু-দুটো প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে। তারা রাহুর মতোই এশিয়া-আফ্রিকা গ্রাস করেছিল, আর জোঁকের মতো করেছে শোষণ। নতুন ভুবনে প্রাপ্ত ঐশ্বর্যে গত পাঁচশ বছর ধরে য়ুরোপ ধনে-মানে প্রতাপে-প্রভাবে-পৃথিবীর সেরা হয়ে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ রাষ্ট্রে অবাধ প্রবেশাধিকার আছে বলে এবং দু-দুটো মহাযুদ্ধ ঘটে গেল বলে য়ুরোপে লোকবৃদ্ধি আজো বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কাজেই লোকবৃদ্ধির এ সমস্যা বিশেষভাবে এশিয়ার।

কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন : আকাশ ও পৃথিবীর সব ব্যক্ত ও গুপ্ত সম্পদ আমি মানুষকে তার ভোগের জন্য দিয়েছি। বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াই এই গুপ্ত সম্পদ/ফলে আমাদের যে যন্ত্রনির্ভর জীবন চালু হয়েছে তার বিকাশ-সম্ভাবনা কল্পনাতীতরূপে অপরিসীম। বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপ্রয়োগে মানুষের খোর-পোষের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করা হয়তো সম্ভব। যেমন বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে স্কাই-স্ক্রেপার তৈরি করে, খাদ্যসমস্যার সমাধান হতে পারে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য-বস্তুর সৃষ্টিতে। সে-চেষ্টা বিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবু তা সময়, সাধনা ও ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া গণমানবের মানসবিকাশের সাথে সাথে তার প্রয়োজন, বৃদ্ধি ও চাহিদা বাড়ছে, সে আর এখন কেবল উদরসর্বস্ব নয়। তাই উদর-পূর্তিতেই তার সমস্যা মিটে না। তার স্বাচ্ছন্দ্য-চেতনা ও রুচি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর তালিকা বৃদ্ধি করছে এবং তা লোকবৃদ্ধি সমস্যাকে জটিল ও গুরুতর করে তুলছে।

স্বতন্ত্রভাবে আজকাল প্রায় রাষ্ট্রই প্রতিকার-পন্থা উদ্ভাবনে তৎপর। জন্মনিরোধের মাধ্যমে জনসংখা নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে প্রধান। কৃষিজাত ও শিল্পজাতদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতিও এ প্রচেষ্টার অন্তর্গত। কিন্তু আজকের সংহত পৃথিবীতে স্বতন্ত্র ও খণ্ড প্রয়াসে এ সমস্যার সমাধান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশ্বব্যাপী যৌথ প্রয়াসে এর অন্তত আপাত সুব্যবস্থা সম্ভব। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, একে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক সমস্যা হিসেবে অবহেলা করা যাবে না। এটিকে বিশ্বের গুরুতর মানবিক সমস্যা রূপে প্রত্যক্ষ করতে হবে। শুনেছি জাপানে জন্মহার স্বল্প। কিন্তু ভারতে ব্রাজিলে বিপুল। এতে সামগ্রিকভাবে সমস্যার কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না এবং মানুষের প্রতি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য রয়েছে—মানুষকে ভালোবেসে তার দুঃখ-অভাব মোচন করতে হবে— এই নীতিবাক্য উচ্চারণেও সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর। কিছুটা বৈধ-বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা না হলে মানবিক সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

আমাদের ধারণায় পৃথিবী অন্তত আরো এক শতাব্দীকাল অনিয়ন্ত্রিত মানুষের ভরণপোষণে সমর্থ। কেননা আমেরিকা, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে এখনো অনাবাদী ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে। তাছাড়া মানুষের বিজ্ঞান বুদ্ধি ও উদ্ভাবন-শক্তিতে আমরা আস্থাবান। কিন্তু রাষ্ট্রসমূহের সদ্বুদ্ধি ও বিশ্বমানবের সামগ্রিক কল্যাণচিন্তা ব্যতীত লোকবৃদ্ধিজাত সমস্যার সমাধান-প্রয়াস ফলপ্রসূ হবে না এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি পাবে। কেননা অভাব থেকেই বিবাদের উৎপত্তি। ঘরে-সংসারে দেখা যায় পরিবারের পোষ্য সংখ্যার অনুপাতে আয় না-থাকলেই অশান্তি ও কোন্দল শুরু হয়। রাষ্ট্রিক জীবনেও তাই ঘটে। লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে লোকের প্রয়োজন পূরণের আয়োজনে সমতা রক্ষা করতে না পারলে বিদ্রোহ-বিপ্লব-আন্দোলন দেখা দেয়। এগুলো তো অভাব-বোধ ও দারিদ্র্য-যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। কম্যুনিজম, সোস্যালিজম, ঔপনিবেশিকতা প্রভৃতি তো এই অভাব ও দারিদ্র্যের সন্তান। অর্থাৎ জনগণের অভাব ঘুচানোর উপায়রূপে সব মতবাদ উদ্ভাবিত। আজ সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ লুপ্তপ্রায় এবং পুঁজিবাদ হয়েছে ঘৃণ্য। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে যদি দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তাহলে এক শতাব্দীর জন্য এ সমস্যার সমাধান সম্ভব। এক, পৃথিবীব্যাপী আনুপাতিক সমতায় লোক ও খাদ্য বণ্টন (equitable distribution of population and food), আর দেশরক্ষার প্রয়োজনে অনুৎপাদক (unproductive) অস্ত্র নির্মাণ-ক্রয় ও সৈন্যবাহিনীর বিলোপসাধন। রাষ্ট্রসঙ্ঘই সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে গঠিত একটি সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে।

জানি, আমাদের এ চিন্তা বিষয়ী লোকের উপহাসের বস্তু। তবু কি একান্তই দিবাস্বপ্ন—নিতান্তই আকাশকুসুম!

একুশের ভাবনা

দুটো বহুলপ্রচলিত জনপ্রিয় আপ্তবাক্যের পুনর্বিবেচনা দরকার এবং যেগুলো লোকশ্রুত আস্থার দুর্গে আঘাত হানার জন্যে জরুরি। এর একটি হচ্ছে 'ঐতিহ্য প্রেরণার উৎস' এবং অপরটি হচ্ছে 'ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়'।

ঐতিহ্য যদি প্রেরণা যোগাত তাহলে গ্রিস-রোম-ব্যাবিলন-মিশর-ইরানের কখনো পতন হত না, কিংবা এতিহ্যবিরহী কোনো নতুন দেশ-জাত-পরিবারের নবোত্থান সম্ভব হত না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি-পরিবার-দেশ-জাত-বর্ণ কারো সম্পর্কেই উক্ত আপ্তবাক্য কখনো সাধারণভাবেও সত্য হয়নি। জীবন-জীবিকার তাগিদেই জ্ঞান-বুদ্ধি-উদ্যম-রুচি-আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির সুপ্রয়োগ-বাঞ্ছাই মানুষকে জিগীষু করে এবং সেই জিগীষাজাত নিষ্ঠা ও কর্মোদ্যমই এমন এক অমোঘ সামর্থ্য দান করে যা অদম্য, অজেয় এবং উদ্দিষ্ট ফলপ্রসূ। এ যখন যে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতের মধ্যে জাগে, তখন জীবন-জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভাবনে-আবিষ্কারে, ভাবে-চিন্তায়-কর্মে তার বিচিত্র বিকাশ বিস্তার সম্ভব হয় এবং তা-ই প্রত্যাশিত ও স্বাভাবিক বলে সবাই মানে।

ইতিহাসও প্রেরণার উৎস নয় এবং ইতিহাস কখনো পুররাবৃত্ত হয় না, হয়নি। ঘটনা ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর জন্যে নয়, বরং তা এড়াবার জন্যেই ইতিহাসের শিক্ষা তথা ইতিহাস-চেতনা প্রয়োজন। ইতিহাস রচনার ও পাঠের সার্থকতা এখানেই। এই তাৎপর্যেই ইতিহাস প্রজ্ঞার আকর। ইতিহাস-চেতনা জীবন, ঘটনা ও পরিণামের আবর্তন কামনা করে না, বিবর্তন ও অগ্রগতিই বাঞ্ছা করে। মানুষের প্রবৃত্তিগত ও জীবিকাগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলানুসন্ধিৎসা এবং মনুষ্যস্বভাবের সংযমণ ও উৎকর্ষসাধনের উপায় উদ্ভাবন লক্ষ্যেই ইতিহাস রচনা-পাঠের সার্থকতা। ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক কিংবা জাতিক জীবনে ঐতিহ্য কোন্‌টি? অতীতের সব কর্মপ্রচেষ্টাই ঐতিহ্য নয়। কেবল সাফল্যের, সম্মানের, গৌরবের ও গর্বের অংশটুকই ঐতিহ্য। এর মধ্যেই রয়েছে আত্মপ্রবঞ্চনার ও আত্মদর্শন-ভীতির বীজ। জীবনের লজ্জার অংশ গোপন রেখে গৌরবের অংশ উচ্চকণ্ঠে প্রচারকে আমরা স্বাভাবিক বলেই জানি ও মানি বটে; কিন্তু এর মধ্যে চারিত্রিক দৌর্বল্য ও সামান্যতা আছে। এ ফাঁকিতে ফাঁক পূরণ হয় না। তাই সাধারণত ঐতিহ্যগর্বের রোমন্থন পরিণামে দুর্বলতার, নিষ্ক্রিয়তার ও ক্ষয়িষ্ণুতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। পিতৃধনের ক্ষয় আছে, বৃদ্ধি নেই। পিতৃগৌরবেরও তেমনি জীর্ণতা থাকে, অনুপ্রাণিত করবার শক্তি থাকে না। কারণ অনবরত পুনরাবৃত্ত হয়ে তা প্রভাবিত করার শক্তি হারায়। তাই তা দুর্বল, অসমর্থ ও অলস উত্তর-পুরুষের নিষ্ফল দাম্ভিকতার অবলম্বনরূপে, আত্মসম্মান রক্ষার হাস্যকর ভিতররূপে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যকে প্রেরণার আকর হিসেবে ঔজ্জ্বল্য ও গুরুত্ব দেয়ার জন্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করতে যেয়ে মানুষ কেবল আত্মস্বার্থে ও স্বপ্রয়োজনে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে আর কামনা করেছে ঘটনার ও পরিণামের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তাদের সে-বাঞ্ছা কোনোদিন সিদ্ধ হয়নি। হবার নয় বলেই হয়নি।

২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল বিদেশী-বিভাষী শোষক-শাসকের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশের, আত্মবোধন ও স্বজনের সংহতি কামনার দিন। আজ পরিবর্তিত পরিবেশে ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের কার বিরুদ্ধে উত্তেজনা দেবে? কোন্ সংগ্রামে প্রবর্তনা দেবে? ব্রিটিশ আমলে পলাশী যুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও সংগ্রামী চেতনার উৎস ছিল। আজ পলাশী যুদ্ধ ইতিহাসের অসংখ্য যুদ্ধের একটিমাত্র। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সাড়ে তেরোশো বছর আগেকার কারবালা যুদ্ধ আজ মুসলমানদের কাছে একটা বার্ষিক পর্ব ও তাৎপর্যহীন আচার মাত্র।

জীবন বর্তমানেরই নামান্তর। কেননা জীবনের সব চাহিদাই সাময়িক। ব্যক্তি মানুষেরও শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যের চাহিদা অভিন্ন থাকে না। অতীত মাত্রই উপযোগ হারায়, আর ভবিষ্যৎ জাগায় প্রত্যাশা। অতীতকে পিছে ফেলে ভবিষ্যতে প্রত্যাশা রেখে বর্তমানের প্রতিবেশে শারীর ও মানস বাঁচাই হচ্ছে জীবন। অতীতকে ধরে রাখা মানেই হচ্ছে বর্তমানকে অবহেলা করা ও ভবিষ্যৎকে অস্বীকার করা। যে পিছনে তাকায় সে সুমুখ-দৃষ্টি হারায়। পিছু তাকাতে হলে দাঁড়াতে হয়, দেহ ফিরাতে হয়, সুমুখগতি স্তব্ধ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'২১শে ফেব্রুয়ারি পর্ব' উদ্‌যাপনে আমাদের আগ্রহ-উৎসাহ যত প্রবল থাকবে, সে পরিণামেই আমাদের মানস-বন্ধ্যাত্ব, উদ্যমহীনতা ও আকাঙ্ক্ষাহীনতা প্রকট হয়ে উঠবে। একে মুহররমের মতো এবং শহীদ মিনারকে ইমাম-বারার মতো করে তোলার মধ্যে নতুন চিন্তা-চেতনা ও কর্ম-পরিকল্পনার অভাবই পরিলক্ষিত হবে। ইতিমধ্যেই অবশ্য শহীদ মিনারের গুরুত্ব কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বাহান্নের চেয়ে একাত্তরের শহীদরা সরকারি সম্মানের বেশি দাবিদার বলে স্বীকৃত হয়েছে। এ-ই নিয়ম ও স্বাভাবিক। বেদনাদায়ক হলেও এ সত্য আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ২১শে ফেব্রুয়ারি চিরকাল এমনি উৎসাহে উদ্‌যাপন করবার মতো মন সঙ্গতকারণেই থাকবে না। প্রবহমান জীবনে আরো দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষের হাজারো সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক কারণ ঘটবে। তাই নিয়ে আমরা বিচলিত, ক্ষুব্ধ, মত্ত ও সংগ্রামরত থাকব। চলমান জীবনে নিত্য-নতুন পথের বাধা অতিক্রম করে করে এগুতে হয়—পাথেয় সংগ্রহ করতে হয়। এজন্য ভাব-ভাবনার প্রয়োজন হয় জীবন-জীবিকার সামগ্রিক বিকাশ-বিস্তার এভাবেই হয় সম্ভব। গতিই জীবন, স্থিতি জড়তা ও জীর্ণতার শিকার। তাই জীবনেরই তাগিদে প্রত্যাশা নিয়ে নতুন কিছু আগে ভাবার, আগে বলার, আগে করার লোক দরকার। সে-লোক আসে বুদ্ধিজীবীশ্রেণী থেকেই। তারা হুজুগের দাস নয়, নতুন হুজুগের স্রষ্টা। ঐতিহ্য ও ইতিহাস তাদের কাছে উৎসব-পার্বণের বিষয় নয়, প্রজ্ঞাদৃষ্টিলাভের সহায়ক মাত্র।

এ দৃষ্টিলাভের জন্য অতীতের লজ্জা-গৌরব দুটোই সমগুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে হিতবাদী ও হিতকামী করতে হলে ভালো-মন্দ, লজ্জা-গৌরব দুটোই স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। সত্য ও সৎদৃষ্টি এভাবেই লভ্য। আত্মপ্রত্যয় আসে নিজের শক্তি ও দুর্বলতার সমন্বিত পরিমাপ-চেতনা থেকেই। তাহলেই সতর্ক প্রয়াসে অভীষ্টসিদ্ধি সম্ভব।

বুদ্ধিজীবীর বন্ধ্যা নেতৃত্বই মানুষকে কেবল ভাব-চিন্তা-কর্ম ও পার্বণের আবর্তনে তৃপ্ত রাখে। বন্ধ্যাত্বের সাধারণ নাম রক্ষণশীলতা। সৃষ্টিশীল উদ্ভাবনী নেতৃত্ব নতুন ভাব-চিন্তা-কর্মে দীক্ষা ও দিশা দেয়। প্রচারণার মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারির পার্বণিক পালনে উৎসাহ-উদ্দীপনা দানের ফলে যে কৃত্রিম দায়িত্ব-চেতনা লোকমনে সঞ্চার করা হয়, তা কোনো শ্রেয়সে উত্তরণ ঘটায় না। বরং স্বতস্ফূর্তভাবে যারা যতটুকুই এই দিনটি স্মরণ করে, ততটুকুই খাঁটি এবং ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে আত্ম-বোধনের ও হিত-চেতনার সহায়ক। প্রবহমান জীবনে নিত্যনতুন চলার পথে সমস্যা ও যন্ত্রণা এড়িয়ে কেবল সম্পদ ও আনন্দ আহরণ করা যায় না। বস্তুত সমস্যা আছে বলেই সম্পদের প্রয়োজন, যন্ত্রণা-মুক্তির জন্যই আনন্দের আয়োজন। জ্ঞানী-গুণী-প্রাজ্ঞ মনীষী বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে বর্তমান ও সম্ভাব্য ব্যক্তিক, নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা সম্পর্কে সতর্ক সচেতন করে দেয়া, দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়ে তোলা, শোষণ-পেষণ-পীড়ন-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রেরণা দেয়া, শ্রেয়বোধ জাগিয়ে, হিতচেতনা দিয়ে পাপ ও পীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা। পুরাতনের রোমন্থনে এ কখনো সম্ভব নয়, কেবল নব-নব উদ্ভাবনে ও আবিষ্কারেই সম্ভব। সমকালীন প্রতিবেশে প্রয়োজনানুগ সম্পদ সৃষ্টির ও সমস্যা বিনষ্টির, আনন্দবৃদ্ধির ও যন্ত্রণামুক্তির উপযোগী নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম ও বিবেক সৃষ্টিই বুদ্ধিজীবীর দায়িত্ব। এভাবেই গণমনে প্রত্যাশা ও উদ্যম জাগে—তখন প্রাণে জাগে প্রেম, চিত্ত হয় হেম, দিল হয় দরিয়া, প্রিয়া হয় পৃথিবী, জীবন হয় ঐশ্বর্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু জ্ঞানী যদি গুণী না হয়, বুদ্ধিমান যদি ধূর্ত হয়, জ্ঞান যদি প্রজ্ঞায় পরিণতি না পায়, বুদ্ধিজীবী যদি সমাজের বিবেকের দায়িত্ব ও দেশের মঙ্গলের প্রতিরক্ষীর ভূমিকা পালন না করে, তাহলে বাক্‌বিস্তার বাচালতায়, কর্মপ্রচেষ্টা ব্যক্তিক ও দলীয় স্বার্থপরতায় বিকৃতি পায়। বুদ্ধিজীবীর পরিচয় তার চিন্তা-কর্মের অনন্যতায়, নতুনত্বে ও শ্রেয়স্করতায়। ফেরুস্বভাব বুদ্ধিজীবীতে অভাবিত। যদি নতুন কিছু ভাবা কিংবা করা সম্ভব না-ই হয়, তাহলে অন্তত ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আজকের এই মুহূর্তের চলতি শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অশুভ, অভাব-আপদের প্রতিকার, প্রতিরোধ, প্রতিবাদ বা প্রতিশোধ দিবসরূপে উদ্‌যাপন করাই বাঞ্ছনীয়।

কবি বিহারীলাল

প্রতীচ্য-প্রভাবিত আধুনিক সাহিত্যে গীতিকবিতা একটি প্রধান শাখা। রবীন্দ্রনাথের আগে যাঁরা ইংরেজির আদলে গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন তাঁদের কারো রচনায় গীতিকবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা পায়নি। ঐসব কবিতায় অনুকৃতি ছিল, অনুসৃতি ছিল, কিন্তু কাম্য আমেজটি ছিল না। মধুসূদন, হেমচন্দ্র কিংবা নবীনসেন অনেক কবিতাই লিখেছেন, কিন্তু মেজাজে তাঁরা যেন গীতিকবি ছিলেন না। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন প্রতীচ্য বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত।

বাঙলায় আধুনিক গীতিকবিতার আমেজ প্রথম যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি বিহারীলাল চক্রবর্তী-জন্ম ১৮৩৪ সনে আর মৃত্যু ১৮৯৪ সনে। বিহারীলাল ইংরেজি বিদ্যায় পটু ছিলেন না। তবে রামকমল ভট্টাচার্য, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সেকালের জ্ঞানী-গুণী-বিদ্বানের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ পেয়েছিলেন তিনি। তাঁদের কাছে শুনে শুনে তিনি পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। ফলে তিনি মেজাজে ও জীবন-চেতনায় একজন পুরোপুরি আধুনিক য়ুরোপীয় মানুষ হয়ে ওঠেন। সেই মেজাজ ও চেতনার প্রসূন হচ্ছে তাঁর কাব্য। মধুসূদন কিংবা হেম-নবীনের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। বিহারীলালের মধ্যেই কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মার আহার ও আনন্দ খুঁজে পান। কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিকাশে বিহারীলালের প্রভাব তুচ্ছ নয়। বিহারীলালের রূপলক্ষ্মী সারদা আর রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' মূলত অভিন্ন।

বিহারীলাল ছিলেন জীবনবাদী কবি এবং সে-জীবনের অবলম্বন ছিল প্রেম ও সৌন্দর্য। আর সে-জীবন-চেতনার মূলে ছিল পার্থিব জীবনের মাহাত্ম্য-মুগ্ধতা। জীবনটা যে একটা ঐশ্বর্য এবং সে ঐশ্বর্য যে মাটি ও মানুষের প্রতিবেশেই ভোগ করতে হবে—এ চেতনা বিহারীলাল গোড়াতে লাভ করেছিলেন। যা ভালো লাগে তা-ই ভালোবাসার বস্তু এবং ভালোবাসার দৃষ্টিতে সবই সুন্দর। বিহারীলাল আমরণ এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও দিশেহারা ছিলেন। বৈষয়িক জীবনকে তুচ্ছ জেনে, বাস্তবজীবনকে আড়াল করে বিহারীলাল রূপ ও সৌন্দর্যের, প্রেম ও পৃথিবীর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াসী ছিলেন। পৃথিবীর রূপে মুগ্ধ জীবন-রসের রসিক কবি জাগতিক রূপ ও রসের উৎস যে সৌন্দর্যস্বরূপা তাঁকেই জানবার-বুঝবার প্রয়াসে, তাঁর অনুধ্যানে আমৃত্যু রত থাকেন। এভাবে প্রেম ও সৌন্দর্যলিপ্সু কবি অবশেষে তাত্ত্বিক ও মরমীয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধক কবিতে পরিণত হলেন। তাঁর 'সারদামঙ্গল ও সাধের আসন' কাব্যদুটিতে ভূমি ও ভূমা, প্রিয়া ও পৃথিবী, রূপ ও রূপসী একাকার হয়ে গেছে। তাই বিহারীলাল দুর্বোধ্য, তাত্ত্বিক ও মরমী। নইলে বিহারীলালও এ জীবনের ও জগতের কবি। অধ্যাত্ম তত্ত্ব-চিন্তা কখনো তাঁর প্রশ্রয় পায়নি। প্রথমজীবনে রচিত 'বঙ্গসুন্দরী', 'বন্ধুবিয়োগ', 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'প্রেম প্রবাহিনী' প্রভৃতি কাব্যে বিহারীলালের চেতনা একান্তই ভূমি-নির্ভর, সরল ও ঘরোয়া জীবন-ঘেঁষা। ঘুমন্ত স্ত্রীর সুন্দর মুখের পানে তাকিয়ে উল্লসিত কবি লিখেছেন :

—আহা এই মুখখানি
প্রেম-ভরা মুখখানি
ত্রিলোক সৌন্দর্য আমায় কে দিল আনিয়া!

মানুষকে ভালোবেসে, নারীকে প্রেম করেই বিহারীলাল বিশ্ব-প্রকৃতির ও নিসর্গের এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধারণা বোধগত করেন। সারাজীবন রূপ-তৃষ্ণা তাঁকে বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত রেখেছে। তাই তিনি পরলোককে অস্বীকার করেছেন, স্বর্গসুখকে জেনেছেন তুচ্ছ বলে। বলেছেন— স্বরগে অনন্ত সুখ, অহো এ কি যাতনা! অতএব দুঃখ-সুখের এই পার্থিব জীবনকেই তিনি বিচিত্রভাবে অনুভব, উপভোগ ও উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। অবিকৃত ও একঘেঁয়ে স্বর্গসুখকে যন্ত্রণাকর বলে জেনেছেন।

এই নরজন্মকেই তিনি দুর্লভ ও সার্থক বলে মেনেছেন এবং বলেছেন, এজন্যই স্বর্গের দেবতাও দুনিয়ায় রাখালরূপে নর-লীলার আনন্দ-ভোগে ধন্য হতে চেয়েছেন। জীবনে যে একবার এই রূপরসের সন্ধান পেয়েছে, তার মতো সার্থকজন্মা আর কে! তাই কবি সৌন্দর্যস্বরূপার উদ্দেশে বলতে পেরেছেন :

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক গে বসুমতী যার খুশি তার।

AMARBOI.COM

আগেই বলেছি, প্রতীচ্য আদলে প্রথম সার্থক গীতিকবি ছিলেন বিহারীলাল। কিন্তু তবু তাঁর মধ্যেও আমরা গীতিকবিতার বিশুদ্ধ নমুনা পাইনে। তার কারণ বোধহয়, একদিকে যেমন ইংরেজিটা তাঁর পুরো শেখা ছিল না বলে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগ হতে পারেনি, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশী ও স্বশাস্ত্রীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং তাত্ত্বিকতাও তাঁর অজ্ঞাতেই তাঁকে প্রভাবিত করেছে। ফলে জীবনবাদী কবি প্রাণের কথা সহজভাবে বলতে যেয়ে আকস্মিকভাবে রহস্যময় হয়ে উঠেছেন। তাঁর কাব্যও তাই তাত্ত্বিকতার মরুতে দিশা হারিয়েছে। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও এই আধ্যাত্মিকতার অরণ্য অপ্রত্যক্ষ নয়। অতএব, তাত্ত্বিকতা প্রাচ্য কবিদের স্বভাব।

তবু কাব্যে নতুন জীবন-চেতনার প্রবর্তক হিসেবে বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিহারীলালের গৌরব অম্লান থাকবে। এই মাটি ও মানুষের পৃথিবীকে তিনি সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছিলেন। পারত্রিক সুখ-স্বর্গ তাঁকে প্রলুব্ধ করেনি। প্রিয়া ও পৃথিবীর রূপে তিনি ছিলেন মুগ্ধ, জীবনের মাধুর্যরসে ছিলেন অভিভূত। তাই বলতে পেরেছেন:

ভালোবাসি নারীনরে
ভালোবাসি চরাচরে
মনের আনন্দে রই।

এর আগে যখন হৃদয়ে এই প্রীতি জাগেনি, তখন বলেছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বদাই হুহু করে মন
বিশ্ব যেন মরুর মতন।

এভাবে বিহারীলাল কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মভাব সাধনার একটি স্বকীয় জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। স্বাতন্ত্র্য ও বলিষ্ঠতায় তাঁর কাব্য আজো উজ্জ্বল। বিহারীলালের জীবনবাদ ও মর্ত্যপ্রীতি এবং সৌন্দর্য-চেতনা আধুনিক মানববাদের স্বগোত্রীয়। মানবজীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও সম্ভাবনাময় মহিমাই তাঁর কাব্যে পরিব্যক্ত হয়েছে। এ জীবন-দর্শন বাংলাসাহিত্যে সেদিন ছিল একাধারে নতুন ও বিস্ময়কর।

সহজ করে বলতে গেলে, বিহারীলালের কাব্যে তত্ত্ব বা তথ্য যা আছে, তা এই—'রূপসীরে করে পূজা, প্রেয়সীরে ভালোবাসে কবি।' তবে রূপ ও রূপসী, প্রিয়া ও পৃথিবী, ভূমি ও ভূমা, কায়া ও ছায়া কখনো স্বতন্ত্র হয়ে, কখনো একাকার হয়ে কবিকে কখনো বিচলিত, কখনো উল্লসিত এবং কখনো বা দিশেহারা করেছে। কায়া, ছায়া ও মায়া তাঁকে সমভাবে প্রলুব্ধ ও অস্থির রেখেছে। বাঙালী-চিত্তে নতুন জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা সৃষ্টিতে বিহারীলালও একজন পথিকৃৎ। তাই বাঙলার সাহিত্য, মনন ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিহারীলাল চিরকাল একটি সগৌরবে স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে। জয়তু বিহারীলাল!

AMARBOI.COM

কবি কায়কোবাদ

কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিকরাও স্বকালের মানুষ। দেশ-কালের প্রভাব এড়িয়ে তাঁরাও স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি করতে পারেন না। সাধারণ শক্তির আঁকিয়ে লিখিয়ের তো কথাই নেই, এমন কি প্রতিভাবানেরাও কালান্তরের জগৎ জীবন-সম্ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট অনুমান করতে অক্ষম। কাজেই যাঁদের আমরা যুগোত্তর প্রতিভা বলি, তাঁরাও আসলে চমকপ্রদ ভাবজগৎই সৃষ্টি করেন, নতুন জগৎ নয়। ফলে দেশান্তরে বা কালান্তরে কারো ভাব-চিন্তা-কর্মের তেমন কোনো প্রয়োগ-সম্ভব উপযোগ থাকে না। নতুন দিনে নতুন মানুষের প্রয়োজন কেবল সমকালীন মানুষই মিটাতে পারে। কেননা আদিকালের এই পুরনো পৃথিবী নতুন মানুষের কাছে নবরূপে ও নবরসে বিস্ময়করভাবে প্রতিভাত হয় বলেই পৃথিবী জীর্ণতামুক্ত। পৃথিবী চির নতুন ও সুন্দর। প্রতি নতুন মানুষ নতুন করে এই জগৎ ও জীবনকে আবিষ্কার করে। নতুন মনের নতুন চোখের নব-আবিষ্কারই পৃথিবীকে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য দান করে একে ভালোবাসার যোগ্য করে রাখে। তবু মানুষমাত্রই ইতিকথার অনুরাগী। সেই অনুরাগবশেই আমরা অতীতের দিকে ফিরে তাকাবার প্রেরণা পাই। এক বেদনা-মধুর অনুভবে আমরা শিহরিত হতে ভালোবাসি। কল্পনা ও স্বপ্নময় কুয়াশা-ঘেরা অতীত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে—সে-ডাক নিশির ডাকের মতো মোহময়। সে-আহ্বানে সাড়া না-দিয়ে মানুষ সাধারণত পারে না।

কায়কোবাদের রচনায় ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে রয়েছে সমকালীনতা আর দৃষ্টি ও কামনার জগৎ হয়েছে ফেলে-আসা সুদূর ও অদূর অতীত। মহাশ্মশান, মহররম শরীফ, শিবমন্দির কাব্যাদি আমাদের ঐ ধারণার সাক্ষ্য। মহররম শরীফ দূর অতীতের মুসলিম-জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপর্যয়ের ইতিকথা, মহাশ্মশান নিকট-অতীতের মুসলিম-জীবনের দুর্যোগের কাহিনী। শিবমন্দির সমকালীন স্বদেশী মুসলিমদের দুর্ভাগ্য-দুর্দশার চিত্র।

উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদ অবধি যেসব মুসলমান সাহিত্যক্ষেত্রে লেখনী ধারণ করেন, তাঁদের কেউ উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। অসম্পূর্ণ ও স্বল্পশিক্ষা তাঁদের জ্ঞান-মনীষা ও প্রজ্ঞা-প্রতিভা বিকাশের বিশেষ অন্তরায় ছিল। জ্ঞানের স্বল্পতা বড় প্রতিভার বিকাশেও প্রবল বাধাস্বরূপ। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মুসলিম লিখিয়েদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। প্রতীচ্য জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল পরোক্ষ—হিন্দু লিখিয়েদের বাঙলা রচনার মাধ্যমে। কাজেই চিন্তা ও চেতনার বদ্ধতা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। এই সীমিত শক্তি ও চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে কায়কোবাদের সাহিত্যেও। কাজেই এতে যদি আমরা আমাদের প্রত্যাশার পূর্তি খুঁজি, তাহলে আমাদের হতাশ হতেই হবে।

সেকালের মুসলিম লিখিয়েদের কৃতিত্ব কিংবা গুরুত্ব উচ্চমানের সাহিত্য-সৃষ্টিতে নয় বরং সমকালের জীবনপ্রবাহে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে। প্রতীচ্য বিদ্যা ও জীবন থেকে প্রেরণা পেয়ে শিক্ষিত হিন্দুরা যেমন স্বাজাত্যে ও স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়াসী ছিলেন, স্বল্পশিক্ষিত মুসলিমরাও ওঁদের অনুকরণে স্বজাতির ও স্বসমাজের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেন। তখন বাঙালী মাত্রই স্বজাতির অতীত ঐতিহ্য ও গৌরবাশ্রয়ী। হিন্দুর অনুধ্যানে এল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা গৌরব-বৃত্ত। মুসলিমের চিত্ত-পরিক্রমার ক্ষেত্র হল আরব, ইরান ও মধ্যএশিয়া। কায়কোবাদেও এই চেতনা প্রকট। উনিশ-বিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর রচনায় স্থানিক জীবনচেতনা দুর্লভ। অতীতমুখী স্বধর্মীর গৌরব-গর্বী বাঙালী শিক্ষিত কেবল হিন্দু কিংবা শুধু মুসলমান হয়েছে—কখনো বাঙালী হয়নি। এই বিড়ম্বনামুক্ত হতে আমাদের বিশ শতকেরও ষাট-সত্তর বছর লেগেছে।

AMARBOI.COM

অতএব কায়কোবাদকে বিচার করব উনিশ শতকী বাঙালী মনের নিরিখে, যদিও তিনি জৈবজীবনে ছিলেন স্বকালোত্তর। ১৮৫৮ সনে তাঁর জন্ম, আর ১৯৫২ সনে মৃত্যু। কালের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আর মনের দিক দিয়ে রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র ও নবী নিসেনের সমধর্মী। স্বজাতি, স্বসমাজ ও স্বদেশহিতৈষণাই হচ্ছে কায়কোবাদের তথা সে-যুগের লিখিয়েদের লক্ষ্য। তাঁদের ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধ, ক্রটিপূর্ণ হিতচিন্তা ও অতীতাশ্রয়ী জীবনচেতনা পরবর্তীকালে আমাদের অনেক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁদের সততায়, আন্তরিকতায় ও সীমিত মানবতাবোধে সচেতন ফাঁকি ছিল না। কাজেই উনিশ শতকী ও বিশ শতকের গোড়ার দিককার সাধারণ বাঙালীর জীবন-ভাবনার ও জগৎ-চেতনার সাক্ষ্য হিসেবে কিংবা দেশের সাধারণ ও সামগ্রিক জীবনপ্রবাহের আদর্শিক আলেখ্য হিসেবে অন্যান্যদের রচনার মতো কায়কোবাদের রচনাও ঐতিহাসিক মূল্য বহন করে। সেদিনকার নির্জিত স্বসমাজের জন্য তাঁর দরদ, আকুলতা, হিতৈষণ্য আমাদের মুগ্ধ করে—তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করে।

কায়কোবাদের কাব্যবস্তু প্রায়ই বেদনার, বিরহের, বিচ্ছেদের ও পরাজয়ের। কারুণ্য ও হতাশ্বাসই মূল সুর। করুণই প্রধান রস। দুনিয়ার তাবৎ মহৎ সাহিত্যের উপকরণ-উপাদান ঐ Tragic রসাশ্রিত। সেদিক দিয়ে কায়কোবাদ যথার্থ রুচিবোধের পরিচয় রেখে গেছেন। কবিভাষার ক্ষেত্রে কায়কোবাদ ছিলেন নবীন সেনের অনুসারী। নবীন সেনও ছিলেন মহৎভাবের ও বৃহৎ তত্ত্বের সাধক। তবে তাঁর সাধ ও সাধ্যে সমতা ছিল না। তেমনি কায়কোবাদেরও লক্ষ্যে এবং সামর্থ্যে ফাঁক ছিল বিস্তর। তাই কায়কোবাদ মহৎ কিংবা বিশিষ্ট কবি নন। আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ছিলেন রবীন্দ্রপূর্বযুগের কবিগোষ্ঠীর ও কাব্যধারার অনুসারী। কিন্তু কালের দিক দিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রযুগের। তাই তাঁর কাব্য হচ্ছে অতিক্রান্ত ঋতুর ফসল—মৌসুমী নয়। কাজেই কালান্তরে ভিন্ন ঋতুর ফল পাঠকসমাজে আদর-কদর পায়নি। তখন বাঙালী রবীন্দ্রকাব্যরসে অভিভূত এবং প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জীবন-ভাবনায় বিচলিত, আর ত্রিশোত্তর লিখিয়েদের বদৌলত জীবন-তত্ত্ব ও জগৎ-চেতনা রূপান্তরিত। কাজেই কায়কোবাদ ঠাঁই কিংবা স্থিতি পেলেন না কোথাও। রইলেন প্রায় না ঘাটকা না ঘরকা হয়ে। তাঁর প্রাপ্য সম্মান রইল অপ্রাপনীয় হয়ে। তবু প্রাক্তন পাকিস্তানে স্বদেশী-স্বভাষীরা তাঁকে জিইয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাঁচা ও টিকে থাকা—দুটোই নির্ভর করে প্রাণশক্তি ও আত্মশক্তির ওপর। কায়কোবাদের কাব্যে ঐ দুটোরই অভাব। কায়কোবাদ সুদীর্ঘ পঁচানব্বই বছর বেঁচেছিলেন। বারো বছর বয়েস থেকেই শুরু করেছিলেন কাব্যরচনা। অতএব তাঁর সুদীর্ঘ তিরাশি বছরের সাধনার ফসল তুলনায় বেশি নয়। ঐ কদরের অভাবেই হয়তো তাঁর শেষ ত্রিশ বছরের রচনা তাঁর জীবৎকালেই অনাদরে অমুদ্রিত অবস্থায় পড়েছিল।

তবু সেদিন কায়কোবাদ এক নির্জিত সমাজের প্রতিনিধি-প্রতিভূ কিংবা মুখপাত্র হিসেবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্বসমাজের মুখরক্ষা করেছিলেন সাহিত্যের আসরে ও আধুনিক জীবন-চেতনার চত্বরে। একান্তে জ্বলেছিলেন খদ্যোতের মতো। তাতেও তাঁর স্বসমাজের লোক পেয়েছিল প্রাণের প্রেরণা ও পথের দিশা। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন বলেই আমরা এই মুহূর্তেও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি মহাশ্মশানের কবিকে। তাঁর জাতিক ও দৈহিক জীবনে তিনি যে মহাশ্মশান ও শ্মশানভস্ম দেখে নৈরাশ্যে ও বেদনায় বুকফাটা নিশ্বাস ফেলেছেন, যে কারবালা তাঁকে কাঁদিয়েছে, তাঁর জীবৎকালেই পাকিস্তান রাষ্ট্র দেখে তিনি নিশ্চয়ই সেসব শোক ভুলেছিলেন, আজ দেশ ও জাতি সে-অভিশাপও মুক্ত হয়ে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে—এতে কি তাঁর কোনো পরোক্ষ দান নেই! যদি আত্মা থাকে, তাহলে আজ অশ্রুমালার কবির কান্না থামবে। তাঁর আত্মা খুশি হবে।

আজকের সাহিত্যের পরিধি

সাহিত্য হচ্ছে জীবন ও জীবন-ভাবনার প্রতিরূপ বা প্রতিচ্ছবি, তবু তা' স্থূল জীবনালেখ্য নয়—জীবনের উদ্ভাস। কেননা, দৃশ্যমান জীবন আচরণে-বিচরণে সীমিত। তাতে সমাজ-সদস্য মানুষরূপে কিংবা সমাজ-নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে পূর্ণ অবয়বে দেখা যায় না। বহু যুগসঞ্চিত ও কালান্তরে বিবর্তিত ও রূপান্তরিত বিশ্বাস-সংস্কার, নিয়ম-রীতি-নীতি, রেওয়াজ-প্রথা-পদ্ধতি ও বৃত্তি-প্রবৃত্তি দিয়ে নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত জীবনের বক্র-বিচিত্র, জটা-জটিল ও বিকার-বিকৃত বিকাশ ও প্রকাশ শাদাচোখে সাধারণে অনুধাবন করতে পারে না। জীবনের ঐ বক্র-বিচিত্র বিকার-বিকাশও কারণ-ক্রিয়া নিরূপণ-বিশ্লেষণ মাধ্যমে চিত্রিত করার দায়িত্ব পালন করেন জীবন-শিল্পী। জগৎ-চেতনার প্রতিবেশে যে-জীবন-ভাবনা চিত্রলোকে মুকুলিত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মপ্রয়াসে পুষ্পিত এবং সাফল্যে কিংবা নিষ্ফলতায় অবসিত, সে-জীবনের ইতিকথা আনন্দ-যন্ত্রণার নিরিখে যাচাই করতে হয় কালগত ও স্থানগত আপেক্ষিক তাৎপর্যে।

আদিকালের মানুষের জীবন ছিল দৈবনির্ভর। তখন আসমানী দেবতা তার দেহ-মন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তখন রিজিকের মালিক ছিলেন রাজ্জাক, প্রতিষেধকবিহীন রোগের নিরাময় ছিল দৈব-কৃপানির্ভর, রোদ-বৃষ্টি ছিল দেব-দয়ার দান। ফলে জীবনে সমস্যা-শঙ্কা-ত্রাস ছিল বটে, কিন্তু কোনোটারই প্রতিকার কিংবা সমাধানের উপায় ছিল না আয়ত্তে। দারুণ দেবতাকে করুণ করার, বিরূপ বিরক্ত দেবতাকে অনুরক্ত করার, অরি দেবতাকে মিত্র করার উপায় উদ্ভাবনে ও সাধনায় নিরত থাকত তখনকার অসহায় ভীত মানুষ। পূজা-শিন্নি, তুক-তাক, মন্ত্র-তন্ত্র সে-প্রয়াসের প্রসূন।

নিয়তির শিকার মানুষের হাতে তখনো একটা গুরু দায়িত্ব ছিল। তা হচ্ছে যৌথ জীবনে পারস্পরিক নিরাপত্তার প্রয়োজনে সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে গোত্রীয় সংহতি রক্ষার দায়িত্ব। তারই জন্য জরুরি ছিল ন্যায়-নীতি, পাপ-পুণ্য, ঘৃণা-লজ্জা-ভয়, প্রীতি-মৈত্রী-করুণা, মান-যশ-খ্যাতি প্রভৃতির প্ররোচনায় ও প্রেরণায় নিয়মনিষ্ঠ সংযত জীবনধারণের পরিণাম-মাধুর্যে আসক্তি দান। তাই আমরা প্রাচীন সাহিত্যে সদ্বৃত্ত-সদাচারী ও দুর্বৃত্ত-দুরাচারী মানুষের পরিণাম-চিত্রই কেবল পাই। সেখানে মানুষ হয় অতি ভালো অথবা অতি মন্দ। সেখানে মানুষ ও মানবিক অনুভূতি গৌণ, মুখ্য হচ্ছে নীতিনিষ্ঠা ও নীতিহীনতার পরিণাম প্রদর্শন। জীবন-যে স্থান-কাল ও প্রতিবেশ-প্রয়োজনযুক্ত, মানুষ-যে শুধু ভালো কিংবা কেবল মন্দ নয়, কখনো ভালো কখনো মন্দ, কারো কাছে ভালো কারো কাছে মন্দ, কারো প্রতি দারুণ আর কারো প্রতি করুণ এবং সবটাই যে আপেক্ষিক তা ইদানীং-পূর্বকালে কখনো কোথাও কারো কাছে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে লক্ষ কোটি মানুষ শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের নিয়ম-নীতি-ন্যায়ের খড়্গে বলি হয়েছে। "To know all is to pardon all" তত্ত্বটি তার যথার্থ তাৎপর্যে কখনো সম্মানিত হয়নি। বৃত্তচ্যুতি মাত্রই শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সরকারি বিপর্যয় সৃষ্টি করে—এ প্রত্যয়বশে নিয়ম-নীতি-ন্যায়ের দোহাই উচ্চারণ করে শাস্ত্রী, সমাজপতি ও শাসক গণস্বার্থে চিরকালই গণহত্যা চালিয়েছে। এমনি করে নিয়মের খাঁচায় নিবদ্ধ মানুষ যান্ত্রিক জীবনে ও মননে অভ্যস্ত হয়ে পীড়ক-পীড়িত রূপে স্থানুর জীবনে নিশ্চিত ও আশ্বস্ত থাকতে চেয়েছে, ব্যতিক্রম সহ্য করেনি, কিংবা বিবর্তন কামনা করেনি।

তবু জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞা সমন্বিত প্রয়াসে মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির প্রভু হয়ে বসেছে। কুশল মানুষ সর্বপ্রকার প্রতিকূল প্রতিবেশকে জীবনের অনুকূল করে তুলেছে। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে যা-কিছু রয়েছে, সেগুলোকে জীবন-জীবিকার অনুগত করে জীবন-জীবিকাকে স্বায়ত্তে আনতে সমর্থ হয়েছে মানুষ। আত্মশক্তিপুষ্ট আজকের আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ জগৎ-চেতনা ও জীবন-ভাবনার ক্ষেত্রে একান্তই ভূমিলগ্ন— আকাশচারী নয়। অন্ন-আনন্দ প্রাপ্তি জন্য কিংবা অভাব-অস্বস্তি-অসুস্থতা। বিমোচনের তাগিদে এখন কেউ আর আসমানী দেবতার কৃপার প্রতীক্ষায় থাকে না। প্রতিকার-প্রতিরোধ কামনায় সরকারি অফিসের তৎপরতাই প্রত্যাশা করে। মড়ক-ঝঞ্ঝা-প্লাবন-ভূকম্প-লাভাস্রাব কিংবা ভাত-কাপড়-রোগ-অভাব-অনটন প্রভৃতি জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত সর্বপ্রকার আপদ-অভাব-বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার ও আত্মত্রাণের উপায় উদ্ভাবনে বহুলাংশে সফল হয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাপ্রবুদ্ধ উদ্যোগী কৌশলী মানুষ।

তাই আজকের সাহিত্যে দেবতা-নিয়তি, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি গুরুত্ব পায় না। পায় জীবন-জীবিকাসংপৃক্ত সমস্যাবলি। অন্য কথায় শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-শাসিত ব্যক্তিক, পারিবারিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে অনুকূল ও প্রতিকূল প্রতিবেশে মানুষ কীভাবে দুঃখ-বেদনা, অভাব-অনটন, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা, রোগ-শোক-বুভুক্ষা-দুর্দশা-দুর্ভোগ প্রভৃতির শিকার হচ্ছে অথবা সুখ-আনন্দ-প্রাচুর্য-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রভাব-প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও উপচিকীর্ষার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হচ্ছে; কিংবা দয়া-দাক্ষিণ্য, সেবা-সহানুভূতি, প্রীতি-মৈত্রী, করুণা, সৌজন্য অথবা ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা-বঞ্চনা-প্রতারণা-কার্পণ্য-নির্দয়তা-লিপ্সা-রিরংসা-জিগীষা-জিঘাংসা প্রভৃতি মানুষের জীবনে যে কল্যাণ অথবা বিপর্যয় প্রসূত যে যন্ত্রণা ও বিনষ্টির অভিশাপ বয়ে আনছে, তা দেখা-দেখানো জানা-জানানো বোঝা-বোঝানোই সাহিত্যশিল্পীর কাজ। শ্রেয়সের সন্ধান এভাবেই মেলে। শ্রেয়সের প্রতি আকর্ষণ এমনি করেই জাগে। কল্যাণ-কামনা এ-পথেই প্রবল হয়। দৃষ্টির প্রসারও ঘটে এভাবেই। তাই মানুষের প্রতি অনুরাগ, ক্ষমার আগ্রহ, ন্যায়ের প্রতি আসক্তি সাহিত্যের মাধ্যমেই সহজে বৃদ্ধি পায়।

শাস্ত্র-সমাজ-সরকার তিনটিই শাসনসংস্থা। মানুষ আত্মকল্যাণেই শাসিত হতে চায়, শাস্ত্র-সমাজ-সরকার যখন পোযণের জন্য শাসন করে, তখন মানুষ স্বেচ্ছায় আনুগত্য ও সহযোগিতা দান করে। এবং যখন শোষণের জন্য শাসন চালায়, তখনই দেখা দেয় দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। শাসনসংস্থা যৌথজীবনে আবশ্যিক। কেননা, শাসনের প্রতাপে ও প্রভাবেই মানুষ সংযত জীবন যাপন করে। মানুযের অসংযম ও অনিরুদ্ধ লিপ্সা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তিজীবনে নিরাপত্তাদানই শাসনের লক্ষ্য। মানুয স্বেচ্ছায় যে শাসন চায়, তা সৌহার্দ্যের শাসন; শাস্ত্র-সমাজ-সরকার যে শাসনপ্রবণ তা হচ্ছে শোযণের শাসন, শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্ব তাই প্রায় চিরন্তন হয়েই রয়েছে। আর মানুযের হাতে মানুযের পীড়ন-লাঞ্ছনা-বঞ্চনাও তাই আজো অশেষ। অনুরাগবশে যে আনুগত্য তা-ই অকৃত্রিম ও স্থায়ী; ভীতিবশে যে আনুগত্য তা নিষ্ফল। জোরে অনুগত করা চলে, অনুরাগী করা চলে না। ভালোবেসে ও ভরসা দিয়েই অনুরাগী ও অনুগত করা সম্ভব।

মানুয মাত্রই—হয়তো প্রাণীমাত্রই—শাক্ত। শক্তির প্রতি আসক্তিই দুর্বলকে শাক্ত করে। কাজেই প্রতি মানুযেরই শক্তিধর ও শাক্ত হবার বাসনা সুপ্ত থাকে। সুযোগ পেলেই দুর্বলও শক্তিচর্চা করে—আত্মপ্রতিষ্ঠায় ও আত্মপ্রসারে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। লাভের লোভ তার বৃত্তচ্যুতি ঘটায়। তখন মানুয পরস্বাপহরণে হাত বাড়ায় এবং সে-মুহূর্তেই মানুষ পরপীড়ক। প্রবল-মাত্রই পরপীড়ক ও শোযক। প্রবলে প্রশ্রয় না দিয়ে সংযত রাখাই প্রবলতর শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের লক্ষ্যগত দায়িত্ব ও কর্তব্য। সুযোগই শক্তির উৎস। লিপ্সু মানুষকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখার উপায়ের নামই হচ্ছে শাস্ত্রীয় বিধি, সামাজিক নীতি ও সরকারি শাসন। এ তাৎপর্যেই 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'-আপ্তবাক্যটি আজো চালু রয়েছে।

নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত চলমান জীবনে বৃত্তচ্যুতি মাত্রই অন্যায়-অপরাধ নয়, শ্রেয়সের সন্ধিৎসায় পুরোনোর পরিহার বাঞ্ছনীয়। এভাবেই আসে মানবিক অগ্রগতি। কিন্তু লোভ-লালসাবশে ব্যক্তিক বৃত্তচ্যুতিই অন্যায়, অনর্থকর ও অমার্জনীয় অপরাধ। আশ্চর্য, ব্যক্তিস্বার্থে যে বৃত্তচ্যুতি, মানুয তা উদারতার সঙ্গে ক্ষমা করতে রাজি, কিন্তু মানবকল্যাণে ভাব-চিন্তা-নীতি-রীতির পরিবর্তন ও বিবর্তনকামী মানুযকে কেউই সহ্য করতে চায় না। মানবিক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ এমনি রক্ষণশীলতায় নিহিত। বলা চলে মানব-জীবনের অধিকাংশ Tragedy-র জন্য সংস্কারদুষ্ট ঐ রক্ষণশীল কূর্মপ্রবৃত্তিই দায়ী। শাস্ত্র-সমাজ-সরকার স্ব স্ব স্বার্থে ঐ কূর্মপ্রবৃত্তিরই সংরক্ষক।

শাস্ত্র-সমাজ-সরকার-শাসিত প্রতিবেশে ব্যক্তিক, ঘরোয়া, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূলে রয়েছে বহু জনহিত লক্ষ্যে সামগ্রিক সদিচ্ছা ও কল্যাণ-বুদ্ধির অভাবপ্রসূত জটিলতা। কর্তার হৃদয়ে নির্বিশেষ মানুষের মঙ্গলকর সদিচ্ছা না জাগলে, খণ্ডদৃষ্টি ও ক্ষুদ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থের শিকার যে-কর্তা, তার শাসনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাড়ে, সমস্যা হয়ও বিচিত্র, মন-মানস হয় ক্রূর ও জটিল। তারপরে বহু বহু বছর পরে একদিন ভূকম্পের মতো, মড়কের মতো, ঝঞ্ঝার মতো, জলোচ্ছ্বাসের মতো, লাভাস্রোতের মতো, বৈনাশিক শক্তি দ্বন্দ্ব-দ্রোহ, উপদ্রব-উপসর্গ, বিপ্লব-উপপ্লবরূপে নব সৃষ্টিসম্ভব প্রলয় ঘটায়। ইতিহাসের এ-ই সার কথা।

রাষ্ট্র (state), শাসন-সংস্থা (govt.) এবং শাসক (regime) যে অভিন্ন নয়, তা আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী ও জনসাধারণকে যেমন বোঝানো যায় না, তেমনি নাগরিকদের দুঃখের কথা, অভাবের কথা, প্রয়োজনের কথা, দাবির ও অধিকারের কথা প্রকাশ করা ও রাজনীতি (politics) যে ভিন্ন বিষয় তাও তাদের উপলব্ধির বাহিরে। তাই তারা কখনো প্রকাশ্যে তাদের চাহিদার কিংবা দুর্দশা-দুর্ভোগের কথা নিজেরা বলতে সাহস পায় না, পাছে তা পলিটিক্স হয়ে যায় এবং সরকার বা শাসক-গোষ্ঠীর হাতে মার খায়, এই ভয়ে। তাদের হয়ে কোনো শাসক-বিরোধী দল তাদের অভাব-দুর্ভোগের প্রতিকার দাবি করুক, কোনো অন্যায়ের তাদের হয়ে প্রতিরোধ করুক, কোনো অবিচারের তাদের হয়ে প্রতিবাদ করুক, এমনি কুলবধূসুলভ অসহায়তা ও প্রত্যাশা আমাদের জনসাধারণের। তাই কোনো রাজনৈতিক দলভুক্ত বেকার মানুষ ছাড়া অন্য কেউ কোনো সরকারি স্বেচ্ছাচারিতা, অসামর্থ্য, অবহেলা কিংবা দুর্বুদ্ধি, অযোগ্যতা ও ত্রুটির কথা ঘরের বাইরে উচ্চারণ করতে ডরায়। পূর্বকালের প্রকৃতি-নির্ভর মানুষ যেমন খরায় ক্ষেত জ্বললে কিংবা প্লাবনে মজলে অসহায় হয়ে ঘরে বসে আফসোস ও ছটফট করত, তেমনিভাবে আজো অজ্ঞ ভীরু মানুষ ঘরে বসেই ক্ষোভ প্রকাশ করে। তাই অনুন্নত দেশে লৌকিক বিশ্বাসে শাসকদলই একাধারে সরকার ও রাষ্ট্র। ফলে অনুন্নতদেশে শাসকগোষ্ঠী বিনা দ্বিধায় ও বাধায় স্বৈরাচারী প্রভু হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ব্যক্তিক ও সামষ্টিক জীবনে সরকারসৃষ্ট ভাত-কাপড়ের অভাবের কথা, দুর্মূল্যের কথা, ক্ষতির কথা, অন্যায়ের কথা, নির্যাতনের কথা আবেদন-নিবেদন-অভিযোগ বা প্রতিকার প্রার্থনার আকারে কিংবা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মাধ্যমে শাসককে জানিয়ে দেয়া প্রত্যেক মানুষেরই যে নাগরিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সে-বোধ যতদিন গণমনে জাগ্রত না হবে, ততদিন গণতন্ত্র নিস্ফল ও নিস্প্রাণ শাসনযন্ত্র মাত্র। শাসনের পদ্ধতি ও লক্ষ্য সম্পর্কিত কোনো বিশিষ্ট মতাদর্শ নিয়ে ক্ষমতা দখলের জন্য যে-দল গঠিত হয়, তা-ই কেবল রাজনীতিক দল। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং ন্যায্য দাবি আদায়ের ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে যদি কোনো জনতা প্রতিকার-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করবার জন্য, এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে উদ্যোগী হয়, তখনো তাকে পলিটিক্স বলা যাবে না। ঘরোয়া জীবনে যেমন স্ব-স্বার্থে মানুষ আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে কোন্দল করে, স্ব-ক্ষতিতে প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ ও মামলা করে, তেমনি সামষ্টিক ক্ষতিতে, দুর্ভোগে-অভাবে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কণ্ঠে ধ্বনিত করে তোলা, প্রতিকারের দাবি উচ্চারণ করা, প্রতিরোধ করা কিংবা প্রতিশোধ চাওয়া নিশ্চয়ই রাজনীতি নয়। লোকজীবনের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্যই সরকার। কাজেই যে-কোনো অভাব-অসুবিধার কথা জানানো, ঐগুলো বিমোচনের জন্য তাগিদ-তাগাদা দেয়া ও প্রয়োজন হলে দ্রোহ করা নাগরিক অধিকার।

আজকের সাহিত্য বাস্তবজীবনের আলেখ্য বলেই আজকের সাহিত্যে শাস্ত্র, সমাজ, ভাত, কাপড়, গৃহ, চিকিৎসা, অর্থ, বিত্ত, দারিদ্র্য, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, বাজারদর, বেচাকেনা, আইন-শৃঙ্খলা, যান-বাহন, রাজনীতি, কূটনীতি প্রভৃতি আলোচ্য বিষয়ক কথায়। জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত সব ভাব, চিন্তা, কর্ম ও বস্তুই সাহিত্যের বিষয়বস্তু। কেউ কেউ সাহিত্যে শিল্পই মুখ্য, কাজেই বক্তব্য গৌণ গুরুত্ব পাওয়া বাঞ্ছনীয়। জীবনের কথা বলার জন্য, জীবনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখানোর জন্য এবং জীবনের সমস্যার প্রতিকার-বাঞ্ছাই যদি সাহিত্যসৃষ্টির মুখ্য কারণ হয়, তাহলে স্বীকার পেতেই হবে, যে জল ও তরঙ্গের মতো, রবি ও রশ্মির মতো বক্তব্যও শিল্প পরস্পর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের। ত্বক-মাংসের মতোই বক্তব্যময় শিল্প কিংবা শিল্পমণ্ডিত বক্তব্য একই তাৎপর্য দান করে। বক্তব্য সুবিন্যস্ত ও সুব্যক্ত হলেই শিল্প হয়। শিল্প বলে আলাদা কোনো বস্তু নেই—দেহের রূপের মতো বক্তব্যের লাবণ্যই শিল্প। অতএব বক্তব্য সুবিন্যস্ত ও সুব্যক্ত হলেই লাবণ্যময় হয়, ঐ লাবণ্য বক্তব্যকে শ্রোত্ররসায়ন করে এবং ঐ রসরূপের নামই শিল্প। তাই বক্তব্য ও শিল্পের সমন্বিত রূপই সাহিত্য।

শিল্পে বক্তব্য-নিরপেক্ষ কাব্যিক কিংবা সাঙ্গীতিক আনন্দস্বরূপের প্রত্যাশী যাঁরা, তাঁদের নান্দনিক রুচির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলা দরকার—জীবন-জীবিকা-সঙ্কট উত্তরণের জন্যই আজ কেবল 'ফলিত' (applied) সাহিত্য চাই।

সাহিত্যের বিবর্তন

অন্য সব চিন্তা ও কর্মের মতো সাহিত্যও জীবন থেকে উৎসারিত। সাহিত্য জীবনেরই গান। জীবন হচ্ছে অনুভূতির প্রবাহ। তাতে রয়েছে সুখ-দুঃখ, ভয়-ভরসা, বিস্ময়-কল্পনা ও আনন্দ-যন্ত্রণা। আদিকাল থেকেই অনুভব-তাড়িত মানুষ তার আবেগ ব্যক্ত করেছে, সে-প্রকাশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হলে তা সর্বজনীন ও চিরন্তনত্বের দাবিদার হয়ে ওঠে। অবশ্য ভাব-ভাবনা সর্বজনীন ও চিরন্তন হলেও তার অবলম্বন বা আবেগবাহন স্থানে কালে ও পাত্রে বিভিন্ন ও বিচিত্র হয়, জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচির স্বাতন্ত্র্যে মানুষের মন-মনন কিংবা মত-মর্জির পার্থক্য ঘটে। তাই সাহিত্যের রূপ ও রস, অঙ্গ ও অঙ্গী বিবর্তিত হয়েছে, অভিব্যক্তির আধার বা অবলম্বনও পেয়েছে রূপান্তর।

আদিকালে অজ্ঞ মানুষ ছিল প্রকৃতি-নির্ভর, তাই তাদের রচনায় পাই প্রকৃতি-প্রতীক দেও-দেবতার কথা। ভয়-ভরসা-বিস্ময়ের প্রেরণায় অসহায় মানুষ সেদিন কেবল তোয়াজ-স্তুতিই করেছে আত্মরক্ষার তাগিদে। তারপর মানবিক বোধ-বুদ্ধি ও শক্তির বিকাশ-ধারায় মানুষের বক্তব্য বদলেছে বারবার। এইভাবে দেবকথা, রূপকথা, উপকথা হয়ে সাহিত্য আজ রূঢ় জীবন-কথায় এসে পৌঁছেছে।

অন্য সব রচনা থেকে সাহিত্য পৃথক। সে-পার্থক্য রূপগত ও রসগত। সূচিত শব্দের সুবিন্যাসে যে-ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি হয়, তা-ই তার লাবণ্য এবং পরিমিত ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা থেকে জন্মে ছন্দ। এই পরিমিতি, মধ্যমিল, অন্ত্যমিল প্রভৃতি ধ্বনিবিন্যাসের নানা নৈপুণ্যে বৈচিত্র্য এসেছে ছন্দে।

এই কাব্য-অবয়বে নানা আভরণ যুক্ত হয়েছে কালে কালে। স্বল্পবুদ্ধি শিশু যেমন কেবল রাঙা বস্তুতে আকৃষ্ট হয়, তেমনি সংস্কৃতির শৈশবে মানুষের কাব্য-ছন্দ ও বক্তব্য ছিল অমার্জিত ও স্থূল। মোটা রুচির মানুষ একসময় অলঙ্কারবাহুল্যের মধ্যেই নারী-সৌন্দর্য আবিষ্কার করত। আজ সংস্কৃতিবান মানুষ নিরাভরণার লাবণ্যে মুগ্ধ। এই মানুষই আজ কাব্যদেহও নিরাবরণ আর নিরাভরণ দেখতে চায়। তাই পূর্বের মিলান্ত ছন্দে বাঁধা গতের অলঙ্কারে তার রুচি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন-তথ্যের ও অনুভব-তত্ত্বের আবেগগত অভিব্যক্তির আধার বলে কাব্যের রসও তাই রসিকবেদ্য। কাব্য জ্ঞান বাড়ায় না, অনুভবের দিগন্ত প্রসারিত করে, চিত্তাকাশের বিস্তার ঘটায়।

লোকে বলে, আদিকালে নিরক্ষর মানুষ শ্রুতি-স্মৃতির প্রয়োজনে বক্তব্য ছন্দোবদ্ধ করত এবং বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে কাম্য সাধ মিটাবার জন্য প্রবৃত্তিসঞ্জাত কল্পনা-মুখ্য রসচর্চা করত। এতে কোনো তথ্য নেই। সত্য এই যে, মানুষের চিন্তা ও কর্ম মাত্রই ছন্দ-সংলগ্ন। রুচিবৈচিত্র্যে স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। মোটাবুদ্ধির ও স্থূলদৃষ্টির উদাসীন মানুষ কেবল কাব্যের ক্ষেত্রে নয়—জীবনের অন্য এলাকাতেও ছন্দ আবিষ্কারে চিরকাল অসমর্থ। সাহিত্যের গদ্যে-পদ্যে ছন্দ চিরকাল ছিল, এবং চিরকাল থাকবে, তার বাহ্যরূপ যেমনই হোক না কেন। আগে সব কথা পদ্যে লেখা হত, তাই পাঁচালি-মহাকাব্য গড়ে উঠেছে। আজকাল একটি আবেগই কবিতায় ব্যক্ত হয়, তাই কবিতা আকারে ছোট। আগে সবটাই সুর করে গাওয়া হত, তাই বিশেষ ছন্দ ও সুর-তালের প্রয়োজন হত। আজকাল গাওয়ার জন্য আলাদা গান বাঁধা হয়, মন ও মর্জিভেদে সে-গানের ছন্দ, সুর ও তাল হয় বিচিত্র ও নতুন।

সাহিত্য বা কাব্যরসও কখনো জীবন-বিচ্ছিন্ন ছিল না, জীবনপরিবেশ-অনুগই ছিল। প্রকৃতিনির্ভর অসহায় মানুষ দৈবানুগ্রহজীবী ছিল বলেই তার জীবনে দেবতা ও নিয়তি ছিল নিত্যসহচর, তাই তার জীবনকথা হয়েছে নিয়ন্তা ও নিয়তি নিয়মিত। তার জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণার আকস্মিকতা সে ঐভাবেই ব্যাখ্যা করেছে।

অজ্ঞ-অক্ষম মানুষ ভয়ে-বিস্ময়ে তাকিয়েছে বিরাট বিচিত্র আকাশ ও পৃথিবীর পানে। তার অসংখ্য জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার প্রয়াসপ্রসূত ভূতপ্রেত, দেও-দানু, হুরপরী, রাক্ষসখোক্ষস স্থিতি পেয়েছে তার বিশ্বাসে সংস্কারে। তাই তার সাহিত্যও হয়েছে ঐ বিশ্বাস-সংস্কারের আকর। অদৃশ্য অরি ও মিত্রশক্তি হয়েছে তার জীবনে সংলগ্ন।

কালের চাকা ঘুরেছে। মানুষের আত্মশক্তি জেগেছে। প্রকৃতির প্রভু হয়েছে সে। কলে-কৌশলে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রত্যয়ে-প্রজ্ঞায় হয়েছে সে পাকা, তাই তার মন-মনন থেকে—ফলে তার সাহিত্য থেকে দেও দেবতা, রাক্ষস-খোক্ষস গেছে উবে। বিভিন্ন শাস্ত্রীয়, সরকারি, সামাজিক ও আর্থিক তথা জীবিকাগত প্রতিবেশে তার সাহিত্যের অঙ্গগত, রসগত, বিষয়গত, বক্তব্যগত রূপান্তর ঘটেছে। এমনি করে চিরকাল ঘটবে। যেমন সুখী সমাজের সুখী মানুষ ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি ও বিশ্বতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাব-ভাবনা নিয়োজিত রাখবে; দুঃখী মানুষ ভাত-কাপড়ের অভাবজাত যন্ত্রণার কথা লিখবে; নিপীড়িত দরিদ্র মানুষ শোষণ-পেষণের বিরুদ্ধে এবং বণ্টনে বাঁচার কথা বলবে, বিপ্লবের সময় বিদ্রোহের বাণী শুনাবে এবং যুক্তকলে উত্তেজনাকর গান গাথা হবে রচিত। যেহেতু কোনো দেশে কালে সব মানুষ সমভাবে বিকশিত থাকে না, জ্ঞান-বুদ্ধি-রুচি কখনো অভিন্ন হয় না, সেজন্য যে-কোনো দেশে ও কালে সামগ্রিক জবীন- প্রবাহে নানা বিরুদ্ধ মত ও মনের দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান অবশ্যম্ভাবী, কেউ শাস্ত্রীয় জীবনে, কেউ সরকার-তোষণে, কেউ সমাজানুগত্যে যেমন ইষ্ট কামনা করবে; তেমনি বিচলনে, দ্রোহে, নয়া মত-পথের সন্ধানে, জীবন ও সমাজের তাৎপর্য সন্ধিৎসায়ও থাকবে নিরত। উল্লেখ্য যে, নতুন সূর্য নতুন মন, নতুন মানুষ তৈরি করে। আবর্তন নয়—বিবর্তন ও পরিবর্তনই জগতের ও জীবনের নিয়ম। আবর্তনে স্থানকাল বদলায় কিন্তু বিকাশ বা উন্নতি হয় না, বরং জীর্ণতা ও জড়তা আসে ঐ পথেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের কাব্যের বিকাশধারায়ও ঐসব লক্ষণ বিদ্যমান, দস্তুর ভঙ্গে কেবল নির্বোধই খেপে ওঠে, মনে করে অনাচার। কাজেই বিগত দিনের কাব্য যেমন আজ অচল, আজকের কাব্যও তেমনি আগামীকালের কোনো প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে না। শুধু কাব্যের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো পুরোনো নতুনের চাহিদা মিটাতে পারে না, কোনো অতীত পারে না বর্তমান হতে। নতুন দিনে, নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের কণ্ঠে স্বকালের মানুষের মনের কথা, প্রয়োজনের কথা, কামনা-বাসনার কথা ধ্বনিত হবে। সে-উচ্চারিত বাণীর রূপ, রস ও সুর হবে ভিন্ন। এভাবেই তো মানুষের সমাজ-সভ্যতা এগিয়েছে। এরই নাম চলমানতা ও প্রগতি।

সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার

আগেকার দিনে মানুষ ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে সহাবস্থানের প্রয়োজনে কতকগুলো নিয়মনীতি ও আদর্শের বাঁধনে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। এবং ঐ নীতি-আদর্শের কাঠামোর মধ্যেই তাদের শিল্প-সাহিত্যাদির প্রায় সব কলাই রূপায়িত হত। তাই পূর্বকালে ন্যায়-অন্যায় বা ভালোমন্দ প্রতিপাদন উদ্দেশ্যেই সাধারণত সাহিত্য রচিত হত। ফলে সেকালের ছাঁচে-ঢালা সাহিত্য ছিল ঘটনাপ্রধান, অর্থাৎ বাহ্য ঘটনা ও আচরণের স্থূলচিত্র দানই ছিল লক্ষ্য। মানুষের মন তেমন গুরুত্ব পেত না। তাই রস বলতে শৃঙ্গারাদি নানা রসের সমাবেশ থাকত বটে, কিন্তু জীবনরস থাকত স্বল্প ও গৌণ। তবু সেকালের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লিখিয়েরা স্ব স্ব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দিয়ে চরিত্রের মনের সঙ্গে বাহ্যাচরণের সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করতেন। এতেই তাঁদের রচনা কালজয়ী উৎকর্ষ লাভ করত। শেক্সপিয়ার, ভিক্টর হুগো, মোপাসাঁ, ডিকেন্স কিংবা ডস্টয়েভস্কি প্রভৃতি অনেকেই তাই লোকবন্দ্য শিল্পী।

মেঘ-বৃষ্টি-রোদ, সুবাস-দুর্বাস, সুন্দর-কুৎসিত, লোভ-ক্ষোভ-অসূয়া কিংবা আরাম-আনন্দ-আকর্ষণ যে মানুষের মন ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে বা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও প্রাতিবেশিক অবস্থান যে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে; ফ্রয়েডীয় বা এখনকার মনোবিজ্ঞান না জেনেও তাঁরা তা বুঝেছিলেন। মন ও বাহ্যাচরণের মধ্যে যে কারণ-ক্রিয়া সম্বন্ধ রয়েছে, তা সেকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না বটে, কিন্তু মানুষ সহজবুদ্ধি দিয়ে তা বুঝত। এজন্য সাহিত্যে-শিল্পে যা অস্বাভাবিক, যা পারিবেশিক কারণে অসঙ্গত, তা কখনো লোকগ্রাহ্য হত না।

ফ্রয়েড মানুষের অবচেতন প্রবৃত্তি ও যৌনবোধকে আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়ে এই শতকে এক নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। বিভিন্ন প্রতিবেশে অবদমিত মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিস্ময়কর সব তত্ত্ব ও তথ্য উদ্‌ঘাটন করে একালের মানুষকে তিনি মাতিয়ে দিলেন। বৃত্তি-প্রবৃত্তির লীলার সে-চমকপ্রদ তথ্য ও তত্ত্ব আধুনিক মানুষের মন হরণ করল। আর এই তত্ত্বের প্রয়োগে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেয়ার ও তাৎপর্য নিরূপণের প্রবণতা প্রায় সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখিয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর দেখা দিল। আজ যদিও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের যাথার্থ্য তর্কাতীত নয় এবং অন্য মনোবিজ্ঞানীরা নতুনতর এবং বিশুদ্ধতর তথ্য আবিষ্কারের দাবিদার, তবু সাহিত্যশিল্প-ক্ষেত্রে নতুন জীবনদৃষ্টি প্রাপ্তির জন্য এবং নতুন যুগ সৃষ্টির জন্য আঁকিয়ে লিখিয়েরা ফ্রয়েডের কাছে অপরিশোধ্যভাবে ঋণী।

এমনি করে পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারসংলগ্ন জীবন-প্রত্যয় গেল উবে। নতুন প্রত্যয়-প্রসূত জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনদৃষ্টি যে-মূল্যবোধ জাগাল, যে-সংস্কৃতির জন্ম দিল, তাতে সেকাল ও একালের যোগসূত্রটি গেল হারিয়ে। ফলে বহুযুগের অভ্যস্ত নিয়মনীতি ও মূল্যবোধ ঐ নবচেতনার অভিঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে গেল; পুরোনো মানুষ নতুনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারল না। তাই চেতনার এ বিপ্লবকে তারা মনে করল উপদ্রব, তরুণদের জানল সামাজিক উপসর্গ বলে, বিপ্লব হল উপপ্লব। পরিবর্তমান সমাজের এ অসঙ্গতি ও দ্রোহ সনাতন নিয়ম-নিশ্চিত নিস্তরঙ্গ জীবনে আনল এক অনিশ্চয়তা—যা সনাতনীরা চিহ্নিত করল বৈনাশিক বিচলন বলে।

তবু সামাজিকভাবে মানুষের জীবনে এল প্রগতি, আত্মা হল উন্নত, বিবেক হল প্রবল, সংস্কৃতি পেল উৎকর্ষ। কেননা, রক্তমাংসের মানুষ এই প্রথম জৈবজীবনকে অকপটে স্বীকার করে নিল। মানুষ-যে নিয়মনীতি-আদর্শের আদলে গড়া পুতুল নয়, তার যে বোধবুদ্ধির বিকাশ ও বৈচিত্র্য রয়েছে, এক-একটি মানুষ যে এক-একটি স্বতন্ত্র জগৎ এবং সে-জগৎ-যে বরণ-বিচ্যুতি ও ভালোমন্দ নিয়েই সামগ্রিক সত্তায় একটি বিশিষ্ট আশ্চর্য সৃষ্টি, তা এ-যুগে প্রথম সাধারণভাবে স্বীকৃতি পেল।

আগেকার দিনে মানুষকে নিছক ভালো কিংবা অবিমিশ্র মন্দ বলে চিহ্নিত করা হত। সাহিত্যে নিখুঁত ন্যায় ও নির্ভেজাল অন্যায়ই কেবল দেখতে পেতাম। ফলে সদুদ্দেশ্যেই কৃত্রিম তৌলে মানুষকে যাচাই করতে যেয়ে চিরকাল লক্ষকোটি মানুষকে নির্যাতিত করেছি, হরণ করেছি কত মানুষের বাঁচার অধিকার।

মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের ফলে আজ জেনেছি—মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম বিভিন্ন মানস-কারণ ও প্রতিবেশের প্রসূন। মানুষ তার অনেক কর্ম ও আচরণের ব্যাপারে অবস্থার দাস। স্বভাবেও সে পুরো স্বাধীন নয়। তাই মানুষ ভালোও নয়, মন্দও নয়; কখনো ভালো, কখনো মন্দ, কারো কাছে ভালো, কারো কাছে মন্দ। কারো মিত্র, কারো শত্রু। আপেক্ষিকতার এ বোধে উত্তরণ ঘটেছে বলেই আজ আমরা অধিক সহিষ্ণু, সহজেই ক্ষমাশীল, বেশি প্রীতিপরায়ণ ও সহাবস্থানের অনেক বেশি যোগ্য হয়ে উঠেছি। মানবিক বোধের ও মানববাদের বিকাশ মনস্তত্ত্বজ্ঞানের ফলে দ্রুততর হয়েছে। জগৎ জীবন এবং নর ও নারায়ণ সম্পর্কে এই উদার ও সহিষ্ণু দৃষ্টি ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের বহুলচর্চার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

আমাদের দেশে ত্রিশোত্তর সাহিত্যে ও শিল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্তু আঁকিয়ে লিখিয়েদের নিষ্ঠ অধ্যয়ন ও আন্তরিক অনুধ্যানের অভাবে প্রয়োগ ও বিশ্লেষণক্ষেত্রে বঙ্কিমের রোহিণী-হত্যার মতো আনাড়িপনার স্বাক্ষরই বেশি দেখা যায়। সুষ্ঠুভবে অধিগত বিদ্যার প্রয়োগ-নৈপুণ্য ক্বচিৎ নজরে পড়ে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়— রবীন্দ্রনাথের *আপদ, রোববার, ল্যাবরেটরি* প্রভৃতি বহু গল্পে; *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে; তারাশঙ্করের *কালাপাহাড়, পিতাপুত্র, আরোগ্যনিকেতন* প্রভৃতি অনেক রচনায়; বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের *পথের পাঁচালী, আরণ্যক* কিংবা বিভূতিভূষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোপাধ্যায়ের *নীলাঙ্গুরীয়, রাণুর* প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ; মানিক্ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *প্রাগৈতিহাসিক, শৈলজ শিলা, পুতুলনাচের ইতিকথা*; মণি গঙ্গোপাধ্যায়ের *রমলা*, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* কিংবা *কাঁদো নদী কাঁদো* প্রভৃতি গল্পে-উপন্যাসে এবং সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক প্রভৃতি অনেক তরুণের রচনাতেই মনস্তত্ত্বের সুপ্রয়োগ লক্ষণীয়। এক কথায় আজকের উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় গল্প-উপন্যাস-লেখকমাত্রেরই উৎকৃষ্ট রচনায় মনস্তত্ত্বের সুসঙ্গত প্রয়োগ দুর্লভ নয়।

বাঙলায় তত্ত্বসাহিত্য

জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোনো মানুষই উদাসীন থাকতে পারে না। জীবন-ভাবনা ও জগৎ-রহস্য তাকে জন্মকাল থেকেই বিচলিত রাখে। তার মনের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে চরিতার্থ করার প্রয়াসী। যে-কোনো জিজ্ঞাসার মনোময় উত্তর খোঁজা ও তৃপ্তিকর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছা তার পক্ষে তার আত্মার আরামের জন্যে আবশ্যিক হয়ে ওঠে। এই অর্থেই মানুষমাত্রই দার্শনিক। কিন্তু আদ্যিকালের ভয়, বিস্ময় ও কল্পনাপ্রবণ অজ্ঞ মানুষ স্থূলবুদ্ধি ও মোটা কল্পনা দিয়ে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা এবং বিশ্ব-নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কে যেসব মীমাংসায় ও সিদ্ধান্তে উপনীত হল, ক্বচিৎ উপলব্ধির চমকপ্রদ কিছু দীপ্তি থাকলেও তার মধ্যে তথ্য যেমন বিরল, চিন্তা ও যুক্তির স্থূলতা এবং অসারতাও তেমনি প্রকট।

সব মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, রুচি-কৌতূহল একরকমের নয়, এক মাপেরও নয়। তাই মানুষের রহস্য-চেতনা এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। দেশে দেশে, কালে কালে, গোত্রে গোত্রে ও শাস্ত্রে শাস্ত্রে তাই মানুষের তত্ত্ববুদ্ধি বহু ও বিচিত্র হয়ে প্রকাশ ও বিকাশ পেয়েছে। বহু যুগের বহু মানবের অনবরত প্রয়াসে ও মননশক্তির উৎকর্ষে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে জগৎ ও জীবন, সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কিত তত্ত্বচিন্তা কয়েকটি বিশেষ সূত্রে সংহত হলেও, তা কখনো সর্বমানবিক কিংবা সর্বসম্মত তত্ত্বের মর্যাদা পায়নি। কখনো পারেও না হয়তো। তাই দর্শনমাত্রই বিতর্কিত ও তর্কসাপেক্ষ বিষয়। সীমিত শক্তির ইন্দ্রিয় দিয়ে অতীন্দ্রিয়ের ধারণা কখনো পূর্ণ ও নির্ভুল হতে পারে না। তাই দর্শনে তথ্য ও তত্ত্ব বিমিশ্র হয়ে অভিন্ন সত্য হয়ে ওঠে না। দার্শনিক যুক্তিও তাই প্রায়ই একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট। অদৃশ্যকে কথা দিয়ে দৃশ্যমান করা, অধরাকে বাক্‌চাতুর্যে ধরা, অবোধ্যকে যুক্তি দিয়ে বোধগত করা— পুতুলে হাত-পা-চোখ বসিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার দাবি করার নামান্তর মাত্র। তবু জীবন-চেতনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা মানুষমাত্রেরই স্বভাবজ বলে মানুষ রহস্য আবিষ্কার প্রয়াসে চিরঅক্লান্ত। কেননা ক্ষণে ক্ষণে সে অনুভব করে—জীবনের মূল রয়েছে কোনো এক রহস্যলোকে, গতি হচ্ছে এক অদৃশ্যজগতে এবং সম্ভাবনা তার বিপুল ও অনন্ত। তাই অসীমের সীমা খোঁজা, অজানাকে জানা, অদৃশ্যকে দেখা তার চির অসাফল্যে বিড়ম্বিত মায়াবী আকাঙ্ক্ষার অন্তর্গত। অকূলে কূল পাবার, অসীমের সীমা খোঁজার, অরূপের রূপ দেখার আকুলতা প্রকাশেই এর সার্থকতা। কেননা এতেই আত্মার আকুতি আনন্দময় প্রয়াসে নিঃশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবার সুযোগ পায়। ইরানী কবির জবানীতে জগৎ হচ্ছে একটি ছেঁড়া পুথি—"এর আদি গেছে হারিয়ে,অন্ত রয়েছে অলেখা।" কাজেই এর আদি-অন্তের রহস্য কোনোদিনই জানা যাবে না। তবু অবোধ মন বুঝ মানে না— তাই ঘরও নয় গন্তব্যও নয়; পথে নেমে, পথ চলে, পথের দিশা খুঁজে, পথ বাড়ানোর খ্যাপামি তাকে পেয়ে বসে। এই মোহময়ী মরীচিকাই দিগন্তহীন আকাশচারিতার আনন্দে অভিভূত রাখে। জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত আবেগ, এই আনন্দিত অভিভূতিই যথার্থ লাভ। কেননা বিবেকের বোধনে, আত্মার উৎকর্ষসাধনে ও বিকাশে এবং শ্রেয়সে উত্তরণে এই ভাব, চিন্তা ও অনুভব উপলব্ধিই পুঁজি।

জগৎ ও জীবনের নিয়ামক ও তাৎপর্য সন্ধান করতে যেয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে ভূত-প্রেত, দেও-দানু, জীন-পরী, দেবতা-অপদেবতা, হুর-গন্ধর্ব-অপ্সরা, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির হাজারো বিশ্বাস-সংস্কার-সমন্বিত ইমারত। এর মধ্যেই নিশ্চিত বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত সুস্থিরতায় স্বস্থ জীবনধারণের আশ্বাসে মানুষ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য উপভোগে প্রয়াসী। এমনি করে জীবনকে অজানা থেকে অসীমতায় প্রসারিত করে মানুষ তার যৌথ জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য কামনা করেছে। তারই ফলে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা। গড়ে উঠেছে জাত-ধর্ম-রাষ্ট্র, আনুষঙ্গিকভাবে এসেছে ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণা, প্রীতি-সেবা-ত্যাগ। মানুষ হয়েছে ইষ্ট ও অরি। বহু যুগের বহু মানুষের সাধনায় ও দ্বন্দ্বে-মিলনে মানবসমাজ আজকের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে— যদিও সব মানুষের ও সব সমাজের বা গোত্রের উত্তরণ সমপর্যায়ের নয়। আদিম আরণ্য-মানব যেমন রয়েছে, তেমনি প্রাগ্রসর মানুষেরও অভাব নেই। তার কারণ, সব মানুষের প্রতিবেশ ও মনন-শক্তি সমভাবে বিকাশ-পথ পায়নি। স্থূল চিন্তার স্বাক্ষর আজো তাই প্রকট। বিশেষ করে শাস্ত্রীয় চিন্তার স্থূলতা ও সংস্কার থেকে অধিকাংশ মানুষ মুক্ত নয় বলে মানবভাগ্য ও তার জীবন-জীবিকার যন্ত্রণা, তার শাসন-পেষণ-শোষণের বিকার আজো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষও রয়েছে পূর্ববৎ। তবু মানবভাগ্যের নিয়ামক নিয়ন্তা হিসেবে দর্শন ও দার্শনিকের ভূমিকা কখনো গুরুত্ব হারাবে না। মানবপ্রগতি চিরকালই তত্ত্বচিন্তার প্রসূন হয়ে থাকবে। কেননা মানুষ বাঁচে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে, এবং এ দুটোই জন্মে চিত্তলোকে। এগুলো যুক্তিজাত নয়, বাঁচার গরজপ্রসূত। জন্ম-মৃত্যুর পরিসরাতীত অনন্ত জীবনতৃষ্ণাই মানুষকে প্রত্যয়ী ও প্রত্যাশী রাখে।

বাংলাদেশের মুসলমানের তত্ত্বচিন্তা তিন ধারায় প্রকাশিত হয়েছে : ক. শাস্ত্র-সংলগ্ন রচনায় তথা ধর্ম-সাহিত্যে , খ. যোগতাত্ত্বিক চর্যাগ্রন্থে তথা সুফি সাহিত্যে এবং গ. সওয়াল সাহিত্যে।

ক. ধর্ম-সাহিত্যে উল্লেখ্য হচ্ছে :

নেয়াজ ও পরানের (১৭ শতক) *কায়দানি কেতাব*, খোন্দকার নসরুল্লাহর (১৭ শতক) *হেদায়তুল ইসলাম*, *শরীয়ৎ নামা*, শেখ মুত্তালিবের (১৬৩৯ খ্রি:) *কিফায়তুল মুসল্লিন*, আলাউলের (১৬৬৪ খ্রি:) *তোহ্ফা*, আশরাফের (১৭ শতক) *কিফায়তুল মুসল্লিন*, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৮ শতক) *হাজার মসায়েল*, আবদুল্লাহর (১৮ শতক) *নসিয়ত নামা*, কাজী বদিউদ্দীনের (১৮ শতক) সিফৎ-ই-ইমান, সৈয়দ নাসির উদ্দীনের (১৮ শতক) *সিরাজ সবিল*, মুহম্মদ মুকিমের (১৮ শতক) *ফায়দুল মুবতদী*, বালক ফকিরের (১৮ শতক) *ফায়দুল মুবতদী*, সৈয়দ নুরুদ্দীনের (১৮ শতক) দাকায়েকুল হেকায়েক, মুহম্মদ আলীর (১৮ শতক) হায়রাতুল ফিকাহ্, হায়াত মাহমুদের (১৮ শতক) *হিত জ্ঞানীবাণী*, আফজল আলীর (১৮ শতক)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নসিয়তনামা প্রভৃতি। এসব গ্রন্থের সব কথা কোরআন-হাদিস-অনুগ নয়, সদুদ্দেশ্যে বানানো নানা কথাও রয়েছে। দৈশিক ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবও প্রবল। শাস্ত্রকথার সঙ্গে মিশে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব, অধিবিদ্যা এবং দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব প্রভৃতি। এসব গ্রন্থে সাধারণভাবে স্রষ্টার প্রতি মানুষের শাস্ত্রসম্মত আনুগত্য, দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক তথা মানবিক আচার-আচরণবিধি আলোচিত হয়েছে।

খ. সুফী-সাহিত্যে মূল্যবান রচনা হচ্ছে :

ফয়জুল্লাহর (১৬ শতক) *গোরক্ষ বিজয়*, অজানা লেখকের *যোগকলন্দর*, মীর সৈয়দ সুলতানের (১৬ শতক) *জ্ঞান প্রদীপ-জ্ঞানচৌতিশা*, হাজী মুহম্মদের (১৬ শতক) *সুরতনামা বা নূরজামাল*, মীর মুহম্মদ সফীর (১৭ শতক) *নূরনামা*, শেখ চান্দের (১৭ শতক) *হর-গৌরী সম্বাদ* ও *তালিবনামা*, নিয়াজের (১৭ শতক) *যোগকলন্দর*, আবদুল হাকিমের (১৭ শতক) *চারি মোকামভেদ* ও *শিহাবুদ্দীন নামা*, আলীরজার (১৮ শতক) *আগম ও জ্ঞানসাগর*, বালক ফকিরের (১৮ শতক) *জ্ঞান চৌতিশা*, মোহসীন আলীর (১৮ শতক) *মোকামমঞ্জিল কথা*, শেখ জাহিদের (১৭ শতক) *আদ্য পরিচয়*, শেখ জেবুর (১৮ শতক) *আগম*, শেখ মনসুরের (১৮ শতক) *সির্নামা*, রমজান আলীর (১৯ শতক) *আদ্যব্যক্ত*, রহিমুল্লাহর (১৯ শতক) *তন-তেলাওত* ও সিহাজুল্লাহর *যুগীকাচ*। যোগচর্যা-নির্ভর অধ্যাত্মসাধনার কথাই এসব গ্রন্থে আলোচিত। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য দেহতত্ত্ব এবং সুফির ফানা, বৌদ্ধ নির্বাণ আর অদ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি উচ্চ ও সূক্ষ্ম দার্শনিক প্রত্যয়গুলির ইঙ্গিত রয়েছে। শেখ ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ, সৈয়দ সুলতান, আলী রজা ও শেখ চান্দ অধ্যাত্মদর্শনে পণ্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে শেখ ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ ও আলী রজা ছিলেন উচ্চ ও সূক্ষ্ম মননশক্তির অধিকারী। অধ্যাত্মসাধনার ও সিদ্ধির তথা মারিফত পন্থা ও চর্যার তত্ত্ব এবং সে-সূত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব মোক্ষতত্ত্ব প্রভৃতিই এসব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। এতেও বিশ্বাস-সংস্কারের প্রবলতা যেমন প্রকট, তেমনি ইসলামি ও বৌদ্ধ-হিন্দুয়ানি তত্ত্বচিন্তা আর সাধনতত্ত্বের অসঙ্গত ও অসমঞ্জস মিশ্রণও অবিরল।

এ ছাড়া প্রণয়োপাখ্যানগুলোতেও কোনো-না-কোনো প্রসঙ্গে যোগী ও যোগচর্যা এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। অভেদ বা অদ্বৈততত্ত্ব প্রায় সব বাঙালী তথা ভারতিক মুসলমানের মন হরণ করেছিল। প্রণয়োপাখ্যানে এবং মুসলিম-রচিত রাধাকৃষ্ণ পদে ও বাউল গানে আহাদ ও আহমদকে প্রায় সর্বত্র অভিন্ন করে দেখা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বেও আল্লাহর নূরে মুহম্মদ এবং তাঁর নূরে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি বলে বর্ণিত হয়েছে। এতে 'কুন ফায়াকুন' এর নয়— 'একোহম বহুস্যাম' তত্ত্বের প্রভাবই সুস্পষ্ট।

গ. সওয়াল-সাহিত্যে পাই :

মুহম্মদ আকিলের (১৭ শতক) *মুসানামা*, খোন্দকার নসরুল্লাহ (১৭ শতক) *মুসার সওয়াল*, আলিরজার (১৮ শতক) *সিরাজ কুলুব*, শেখ সাদীর (১৭ শতক) *গদামালিকার সওয়াল*, এতিম আলমের (১৮ শতক) *আবদুল্লাহর সওয়াল*, সৈয়দ নূরুদ্দিনের (১৮ শতক) *মুসার সওয়াল*, অজানা কবির *মুসার রায়বার*, খোন্দকার আবদুল করিমের (১৭ শতক) *মুসার সওয়াল*, সেরবাজ চৌধুরীর (১৮ শতক) মালিকার সওয়াল বা *ফকর নামা* প্রভৃতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব গ্রন্থ প্রশ্নোত্তরের বা সওয়াল-জওয়াবের আকারে রচিত বলেই আমরা এগুলোকে সওয়াল-সাহিত্য নামে অভিহিত করেছি। এসব গ্রন্থে সৃষ্টি, স্রষ্টা, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, জীবন, সমাজ, শাস্ত্র, নীতি, আচার-আচরণ, বৈষয়িক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক এমনকি ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বিষয়েও নানা জিজ্ঞাসার উত্তর রয়েছে। 'আবদুল্লাহর সওয়ালে' ইহুদিরাজ আবদুল্লাহ কর্তৃক হযরত মুহম্মদের নবুয়ত পরীক্ষাচ্ছলে নানা তথ্য ও তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে। গদা-মালিকা, বা মালিকার সওয়ালে রাজ্ঞী মালিকা তাঁর পাণিপ্রার্থী জ্ঞানী পুরুষ হালিম বা আলিমের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা পরীক্ষাচ্ছলে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, সেসবের উত্তর রয়েছে। এখানে রয়েছে হেঁয়ালি ধাঁধা থেকে নানা সাধারণ জাগতিক জ্ঞানের সন্নিবেশ। এসব গ্রন্থ সেকালের মানুষের পক্ষে জ্ঞানের আকর। সেকালের এগুলো ছিল একালের 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'র মতো। লোক-সাধারণ এসব গ্রন্থের মজলিশি পাঠ শুনে-শুনে নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করে নিরক্ষর সমাজের সুশিক্ষিত সদস্য হয়ে উঠত। তাদের জীবন-ভাবনা ও জগৎ-জিজ্ঞাসা এসব গ্রন্থোক্ত তথ্যে ও তত্ত্বে নিবৃত্ত হত। অবশ্য সেদিন মানুষের বিচরণক্ষেত্র ছিল অঞ্চলে সীমিত। সে জীবনের পরিধি ছিল সংকীর্ণ; সে-জ্ঞানের পরসরও ছিল ক্ষুদ্র এবং জ্ঞানও ছিল খণ্ড সত্যে বা প্রাতিভাসিক সত্যে নিবদ্ধ।

আকরগ্রন্থ

১। পুথিপরিচিতি: আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত, আহমদ শরীফ সম্পাদিত, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত : ১৯৫
২। বাঙলার সূফী সাহিত্য : আহমদ শরীফ, বাঙলা একাডেমী প্রকাশিত ঃ ১৯৬৯।
৩। সওয়াল সাহিত্য : আহমদ শরীফ।

AMARBOI.COM

বাঙলাদেশের 'সঙ' প্রসঙ্গে

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম মাত্রই জীবন ও জীবিকাসংপৃক্ত। জীবনের জীবিকা দু'রকমের—একটি শারীর ক্ষুধা-তৃষ্ণা সম্পর্কিত, অপরটি বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংপৃক্ত। স্বাভাবিক জীবনের জন্য দুটোই প্রয়োজন। অবশ্য সুলভতা ও দুর্লভতার নিরিখে মানুষ তার প্রয়োজনকে লঘু ও গুরু কিংবা উচ্চ ও তুচ্ছ শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে দেখতে ও ভাবতে অভ্যস্ত। তাই বলে মানুষের কোনো চাহিদার তাত্ত্বিক গুরুত্ব কমে না।

বাঁচার প্রয়াসের মধ্যে বাঁচাই হচ্ছে জীবন। এ তাৎপর্যে জীবন সংগ্রামেরই নামান্তর। একাকীত্বে মনুষ্যজীবন অসম্ভব বলেই যৌথজীবনে প্রয়োজন হয়েছে—শান্তি ও সংহতি। অপরের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে, নির্ভর করেই মানুষকে সংযম, সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে বাঁচতে হয়। কাজেই শান্তি, সংহতি ও সহযোগিতা যৌথজীবনে ব্যক্তিক জীবন ও জীবিকার জন্য একান্ত আবশ্যিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ উপলব্ধি থেকেই আদিম নরগোষ্ঠীর মধ্যেও আমরা গোত্রীয় সংহতির গুরুত্ব-চেতনা দেখতে পাই। সংহতি-শান্তি রক্ষার গরজেই তৈরি হয়েছিল নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ, আচার ও আচরণ পদ্ধতি। এভাবেই ক্রমবিকাশের ধারায় গড়ে উঠেছে শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার।

উক্ত ত্রিবিধ শাসনেও মানুষকে সংযত-শায়েস্তা রাখা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি কোনোকালেই। শাস্ত্রীয়-সামাজিক-সরকারি শাসন-পীড়নকে তাচ্ছিল্য করে যুগে যুগে দেশে দেশে দ্রোহীরা নিয়ম-নীতি, শাসন-শৃঙ্খলা ভেঙে উপদ্রব-উপপ্লব সৃষ্টি করেছে। তাই মানুষের সমাজে কখনো নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম ভোগ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। সমাজ-প্রহরীরূপে কিছু মানুষ চিরকালই সদাসতর্ক ও সদাশঙ্কিত দৃষ্টি রেখেছে শাস্ত্রীয়, সামাজিক ও সরকারি নিয়ম-নীতি রক্ষার ও মানানোর কাজে। এঁরাই হলেন গম্ভীর প্রকৃতির শাস্ত্রী , সমাজপতি ও রাষ্ট্রনায়ক।

অন্য অসংখ্য মানুষ যারা এ দায়িত্ব স্বীকার করেনি, তারা জগৎ ও জীবনের প্রতি তাকিয়েছে কৌতুক, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে। জগৎ ও জীবনের অন্ধিসন্ধির অন্তত কিছুটা বোঝা সম্ভব হয়েছে কেবল এদের পক্ষেই। কেননা মনটা পুরো খোলা না থাকলেও চোখ তাদের খোলা থাকেই। আর মনের পুরো সহযোগিতা থাকে না বলে তাৎপর্য-চেতনায় তথা কারণ-ক্রিয়াবোধে ক্রুটি থাকলেও নির্ভুল অনুকরণ সম্ভব।

কৌতূহলী মানুষের কৌতুকবোধের প্রসূন হচ্ছে অনুকরণ-স্পৃহা। এই স্পৃহার অভিব্যক্তি ঘটেছে দুপ্রকারে— একটি আদি রসাত্মক, তার প্রকাশ মস্করায়; অন্যটি নিন্দাত্মক, তার প্রকাশ ঠাট্টায়, বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে , উপহাসে ও পরিহাসে। উচ্চারিত ধ্বনিযোগে, ভেংচি বা মুখভঙ্গি যোগে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে অপরের অনুচিত কথার, কর্মের ও আচরণের অসঙ্গতির অনুকৃতি তাই প্রাগৈতিহাসিক। গোড়ায় যা নির্লক্ষ্য, নিরুদ্দিষ্ট, অনাবিল কৌতুকরস উপভোগের জন্য শুরু হয়েছিল, তা-ই ক্রমে শাস্ত্র-সমাজ-সরকার স্বার্থে নীতিবোধ জাগানোর লক্ষ্যে নিয়োজিত হয়। নিন্দাত্মক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাস মাধ্যমে চরিত্রশোধনের মতো মহৎ উদ্দেশ্যে এই শিল্পচেতনাকে কাজে লাগানো শুরু হল এভাবেই। সামাজিক শাসনের মতো এ সামাজিক নিন্দা-বিদ্রূপ সমাজ-স্বাস্থ্য ও ব্যক্তি-চরিত্র অক্ষুন্ন রাখার জন্যে প্রয়োজন হয়েছে। কেউ যে সচেতনভাবে সমাজ-কল্যাণের মহৎ লক্ষ্যে এ নিন্দা-বিদ্রুপ পরিহাস শুরু করেছিল, তা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু ক্রমে তার সামাজিক উপযোগ অবচেতন ভাবেই হয়তো অনুভূত হয়। পৃথিবীর সর্বত্রই তাই এরূপ বিদ্রূপাত্মক রচনা গান, গাথা, ছড়া, কিংবদন্তী ও প্রহসনরূপে চালু রয়েছে।

আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে নিয়ম-নীতি লঙ্ঘনকারকে লজ্জা দিয়ে, তার নিন্দা রটিয়ে কলঙ্কিতের দুর্বহ জীবনযাপনে বাধ্য করা হত। 'ধর্মঘট' ও 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' এ দুই অনুষ্ঠানই বাঙলার বৌদ্ধযুগের। তাছাড়া শাসিতজনের অপরাধে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁ-ছাড়া করে কিংবা মিছিল করে তাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দৃষ্টান্তিক শাস্তির মাধ্যমে গণমনে নৈতিকতা ও সংযমের গুরুত্ব-চেতনা দেয়া হত। সমাজের ধনী-মানী-বলীকে শায়েস্তা করবার অন্য কোনো উপায় সেকালেও ছিল না, একালেও নেই। কারণ এই শ্রেণীর লোক প্রতাপে-প্রভাবে শাস্ত্রী, সমাজপতি ও শাসককে সহজে বশে রাখতে পারে।

বাংলাদেশের সঙপ্রসাঙ্গে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর মনোগ্রাফ সিরিজ। কলিকাতা, ১৯৭২ সন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮+১৫৩+২৪৫। মূল্য ২০ টাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগের কালে আমাদের এই দেশে পার্বণিক উৎসবে কিংবা আনন্দের আয়োজনে পাড়া-প্রতিবেশীরা—যারা সামাজিক নিয়মনীতি কিংবা রীতি-রেওয়াজ লঙ্ঘন করে অন্যের অধিকারে ও স্বার্থে আঘাত হানত, তাদেরকে 'একঘরে' করত। জনতার মধ্যে উচ্চকণ্ঠে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা হত এবং নিন্দা রটানো হত, তারপর তা শ্রুতিমধুর ও মুখরোচক হলে পাড়ার লোকেরা গান-ছড়া-নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে রসোপভোগের জন্যে তা প্রচার করে বেড়াত। এভাবেই ওগুলো গান, কবিতা, যাত্রা, এবং কথকতার বিষয় হয়ে ওঠে। আজো তেমনি অসামান্য ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নিয়ে গ্রাম-কবি 'কবিতা' রচনা করেন। আজো গাজন-গানে, আদ্যের গম্ভীরায়, কবিগানে, যাত্রায়, কথকতায়, মহররমের কিংবা ঈদের মিছিলে সামাজিক দুর্নীতি, অনাচার, ব্যক্তিচরিত্রের ত্রুটি প্রভৃতি প্রত্যক্ষভাবে লোকগোচরে আনবার জন্যে 'সঙ' সাজানো হয়। বলা চলে, উক্তরূপ অনুষ্ঠানই হচ্ছে আমাদের সুপ্রাচীন 'গণআদালত'। এর ফল ও প্রভাব সামাজিক জীবনে গভীর ও ব্যাপক ছিল।

আমরা যখন কথা বলি, তখন কেবল উচ্চারিত ধ্বনি দিয়েই বক্তব্য শ্রোতার হৃদয়বেদ্য করতে পারিনে। তার সঙ্গে অভিপ্রায়-অনুগ তথা অনুভূতিপ্রকাশক কণ্ঠস্বর ও চোখ-মুখ-হাতের বিভিন্ন ভঙ্গির সহযোগ আবশ্যিক। এই উপলব্ধি থেকেই যে-কোনো বক্তব্য ও ঘটনা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত করে তুলবার জন্যে অবিকল অনুকৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এর থেকেই 'সঙ'-এর, যাত্রার ও নাটকের উৎপত্তি বলে অনুমান করা যায়। তাছাড়া আদিম আরণ্য ও গুহামানবেরাও জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে, বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্যে, প্রার্থনা জানাবার জন্যে, প্রয়াসে সিদ্ধির জন্যে জাদুবিশ্বাস বশে নৃত্য, চিত্র ও অন্যান্য প্রতীকী অনুষ্ঠানের আশ্রয় নিত। মূর্তিনির্মাণ ও মূর্তিপূজা এ ধারারই বিকশিত রূপ। নৃত্যের মাধ্যমে বাঞ্ছা নিবেদন ও দেবতুষ্টিসাধন এই সেদিনও দেবপূজার আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। কাজেই 'সঙ' সাজার ও সাজানোর, বহুরূপী সাজার এবং সঙ-সাহিত্য রচনার প্রেরণা সেদিক দিয়েও আদিম এবং ঐতিহ্যিক। এ একাধারে গ্রামীণ art ও ritual।

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সমঅঙ্গ' থেকেই 'সঙ' নামের উৎপত্তি বলে মনে করেন। আমরা এ-বিষয়ে অজ্ঞ। কাজেই তাঁর সিদ্ধান্তেই আস্থা রাখি। কিন্তু স+অঙ্গ=সোয়াঙ্গ> সোয়াঙ>সঙ-ও কি কল্পনা করা চলে না! অর্থাৎ ঘটনার বা আচরণের কেবল মৌখিক বর্ণনা নয়, আঙ্গিক অভিব্যক্তিদানও যার লক্ষ্য সে-ই 'সঙ্গ' বা স্বঙ্গ। সম+অঙ্গ যদি সমাঙ্গ না হয়ে সমঅঙ্গ> সঙ্গ হয় তবে স+অঙ্গও 'সাঙ্গ' না হয়ে 'সঙ্গ' হতে বাধা কী? বিদ্বানদের মনে অন্বেষা জাগানোই আমাদের এই বিনীত প্রশ্নের লক্ষ্য।

১৫১ পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ ভূমিকায় গ্রন্থকার ও সংগ্রাহক শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক তথ্য সন্নিবিষ্ট করেছেন, সে-সূত্রে কিছু অপ্রাসাঙ্গিক তথ্যেরও ঠাঁই করে দিয়েছেন, যেমন কোলকাতার কশাইখানা স্থানান্তর প্রয়াস ও হিন্দুদের আপত্তি বিষয়ক বিস্তৃত তথ্য 'সঙ' সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু বাঙালীমাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এজন্যে যে, তিনি এ অবহেলিত বিষয়ে অতি নিষ্ঠার সঙ্গে কষ্ট ও শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এ বিষয়ে ভাবীকালে বিস্তৃত ও বহুমুখী আলোচনার ভিত্তিও তিনিই রচনা করে দিলেন। অবশ্য তার আগে পশ্চিমবঙ্গের ও বাঙলাদেশের 'সঙ'সাহিত্য বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। দেশের সাহিত্যসেবীরা তা করবেন এ প্রত্যাশা অসঙ্গত নয়। তাঁর ভূমিকাটিও বস্তুসন্ধিৎসা, তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের নিদর্শন। 'সঙ'-এর গান, গাথা, কবিতা ও ছড়া সংগ্রহে তাঁর অধ্যবসায়ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশংসনীয়। এ ছাড়া বহুরূপী, মুখোশ, বসাসঙ ও পুতুল, বিদূষক, ভাঁড় ও আহ্লাদে প্রভৃতি সঙ সম্পর্কে আলোচনাও প্রাসঙ্গিক ও তথ্যনির্ভর হয়েছে।

আমাদের উপরের আলোচনা দেখে কেউ যেন মনে না করেন, 'সঙ' সাহিত্যে কিংবা গাজনে, গম্ভীরায়, ঈদ-মহররমের মিছিলে, গানে, অভিনয়ে অথবা কবিগানে, যাত্রায়, কথকতায় কেবল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, পরিহাস, মশকরাই থাকে। সে-সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক অসঙ্গতি, দুর্নীতি ত্রুটি সংশোধনের জন্যে নীতিকথাও উচ্চারিত হয়। সমাজস্বার্থে জনগণমনে আদর্শ-চেতনা জাগানো ও আদর্শদানের চেষ্টাও থাকে।

বিদ্বানদের কাছে এই বইয়ের আদর-কদর নিশ্চিতই প্রত্যাশা করা যায়। বইয়ের প্রচ্ছদ দৃষ্টি-সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই চমৎকার। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর প্রকাশনা এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা গ্রন্থের গুরুত্ব এবং গ্রন্থকারের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

AMARBOI.COM

বাউল কবি ও তত্ত্ব প্রসঙ্গ

স্বকালের জীবনপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির কথা সমকালের মানুষ গানে-গাথায়-চিত্রে- স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে কিংবা স্মৃতিকথায় ধরে না রাখলে তা চিরতরে হারিয়ে যায়। পরে আর শতচেষ্টায়ও তা কায়া-প্রতীক হয়ে উঠে না, মায়া ও ছায়া হয়ে জিজ্ঞাসুকে কেবল বিভ্রান্তই করে। কল্পনা ও অনুমান-যোগে সত্য নির্ধারণের প্রয়াসে তাই কোনো দুই ব্যক্তি একমত হতে পার না। একারণেই অতীত সম্বন্ধে প্রাতিভাসিক সত্য ও তথ্য নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্ক-বিবাদ চলতেই থাকে—সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা থাকে চিরঅনায়ত্ত।

বলতে গেলে অক্ষয়কুমার দত্ত ব্যতীত উনিশ শতকে কেউ বাউল মত ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না। অক্ষয় দত্তও বিভিন্ন শাখার বাউল মতের সংক্ষিপ্ত সাধারণ অস্তিত্বের কথাই কেবল লিখেছিলেন। তা যে বাঙলার ও বাঙালীর নিজস্ব ধর্ম-সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বিশ শতকে প্রতিভাবান লোক-কবি লালনের প্রতি আকর্ষণবশেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গান 'হারামণি' নামে প্রবাসীতে প্রকাশিত করেন। তারপর থেকেই লালন ও লোকগীতি সম্পর্কে কোনো কোনো বিদ্বানের কৌতূহল জাগে। এভাবেই ক্রমে লালনচর্চা ও বাউলমত আলোচনার শুরু। পাকিস্তান আমলে লালনকে মুসলমান বানিয়ে গৌরব-গর্বের অবলম্বন করবার অপপ্রয়াসে বাউলতত্ত্ব, বাউলকবি ও বাউলগান বহুল ও প্রায় নিত্য আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

পঞ্চাশোর্ধ্বকাল ধরে বহুলোকের চর্চার ফলে তথ্য ও তত্ত্ব বহুল ও বিপুল হয়ে উঠেছে এবং তা-ই প্রায় অসাধ্যরূপে জটিলও হয়েছে। কাজেই সমস্যাও পূর্ববৎ প্রবল। প্রতিজ্ঞায় (Promise-এ) প্রমাদ থাকলে সিদ্ধান্ত নির্ভুল হতেই পারে না। মূল সমস্যা চারটি : ক. বাউল নামের উৎপত্তি নিরূপণ, খ. বাউল মত নির্ণয়, গ, লালনের জাতি পরিচয়, ঘ. লালনের জন্মস্থান নির্দেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব সমস্যার সমাধানের পথে তথ্য-প্রমাণের বিভ্রান্তি যত-না আছে, তার চেয়ে বেশি প্রতিবন্ধক রয়েছে আলোচক-গবেষকের মানসপ্রবণতায়।

'বাউল' নামের উদ্ভব ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এযাবৎ যাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি মত ব্যক্ত করেছেন। সম্ভাব্য সব রকমের অনুমানের আকর প্রায় নিঃশেষ। তবু মীমাংসা হল না।

বাউলমতকেও কেউ যোগ, কেউ তন্ত্র, কেউবা সাংখ্যসম্ভূত বলে অনুমান করেন, কেউবা সুফিমত বলে চালিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ একে একটি মিশ্রমত বলে আপস খোঁজেন। সম্প্রতি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাঙলাদেশ' জার্নালে (এপ্রিল ১৯৭৩ সন) ডক্টর হরেন্দ্রচন্দ্র পাল 'চারিচন্দ্র-তত্ত্বের উৎস কোরআনের আয়াত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া জন্ম-সূত্রে বৌদ্ধ, শৈব বা বৈষ্ণব সংলগ্নতার দাবি তো রয়েইছে। বাউলমতের প্রবর্তক হিসেবে পাই চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ, বীরভদ্র, আউলচাঁদ, মাধববিবি প্রভৃতিকে।

গোড়াতে লালনের জাতিপরিচয় সম্পর্কে একটি আপসমূলক সিদ্ধান্ত চালু ছিল-লালনের জন্ম হিন্দুর ঘরে আর পালন মুসলিম-সংসারে এবং পোষণ হিন্দু-মুসলিমে মিশ্রিত বাউলসমাজে। ইদানীং তাঁকে শুদ্ধ মুসলমান কিংবা কেবল হিন্দু বানাবার জোর প্রয়াস চলছে। এ শতকের গোড়ার দিকে ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের প্রভাবে বাউলদের দেখা হত মুসলিম-সমাজের লজ্জা, দায় ও বোঝারূপে। ইসলামের নামে বাউলবিরোধী ও বিধ্বংসী ফতোয়া বের হল—লাঞ্ছিত হল কত বাউল। এখন লালন শাহ্‌র প্রতিভামুগ্ধ ও লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্যগর্বী বিদ্বানেরা বাউলমত, বাউলকবি ও বাউলগানকে সম্পদরূপে বিবেচনা করেন, তাই শুরু হয়েছে দাবি-প্রতিষ্ঠার লড়াই।

জন্মস্থানের অধিকার নিয়েও তাই শুরু হয়েছে সংগ্রাম-ছেউড়িয়ায়, ভাঁড়ারায় ও হরিশপুরে। এ সংগ্রামে প্রযুক্ত অস্ত্র হচ্ছে শতোর্ধ্ব বয়সের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, লালনের জ্ঞাতি, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের কবলা এবং রাজস্বের ও স্বত্বের মামলার দলিল। আপাতদৃষ্টিতে এগুলোকে অব্যর্থ প্রমাণক বলেই মনে হয়। কিন্তু সমকালে 'লালন' নামের একাধিক মানুষের অস্তিত্বের সম্ভাবনা, অশিক্ষিত মানুষের বয়সের হিসেবে ক্রটি, জ্ঞাতিত্বে প্রমাণের অভাব, দলিল-দস্তাবেজে নামগত সাদৃশ্যজাত বিভ্রান্তির সম্ভাব্যতা প্রভৃতি প্রশ্ন সদুত্তরের অপেক্ষা রাখে। সম্প্রতি দুদ্দুশাহ রচিত লালনের জীবনপরিচিতি মিলেছে। আমিও অধ্যাপক এস.এম.লুৎফর রহমানের কাছে এর প্রতিলিপি দেখেছি। দুদ্দুশাহ নিজে গান বাঁধতেন। ঐ রচনার ভাষায় ও ছন্দে স্বভাবকবির স্বাচ্ছন্দ্য নেই। শব্দবিন্যাসে ও প্রয়োগে এবং ছন্দে ক্রটি সর্বত্র দৃশ্যমান। তাছাড়া সাক্ষর দুদ্দুশাহ নিজের বাঁধা গান কখনো খাতায় লিখে স্থায়িত্বদানের চেষ্টা করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তিনি হঠাৎ ৭০-৮০ চরণে লালনগুরুর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করতে গেলেন কোন্ প্রেরণায়? লালন সম্পর্কে আধুনিক বিদ্বানদের যতটুকু তথ্য প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই মেলে উক্ত দুদ্দুরচিত জীবনচরিতে। এতেই এর যথার্থ্য সম্বন্ধে জাগে প্রশ্ন। অথচ বহু শিষ্যের সিদ্ধগুরু ও গানের রাজা লালন-জীবনের নানা লৌকিক-আলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা থাকা ছিল প্রত্যাশিত। এতেই এর অকৃত্রিমতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রবল হয়। সরকার যেমন শাসনের প্রয়োজনে অসত প্রচারে আগ্রহী থাকে, গবেষকরাও তেমনি সত্য উদঘাটনের নামে মানসপ্রবণতার প্রতি সোহাগবশে তথ্যের বিকৃতি ঘটিয়ে পছন্দসই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

আমি নিজেও একসময় বাউলতত্ত্ব, বাউলগান ও লালন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করেছি। আজ মনে হয় সেসব তথ্য ও তত্ত্বের সবটা যথার্থ নয়। আমার এখনকার ধারণা :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাউলমত বাঙলার ও বাঙালীর মৌলিক ধর্ম। মঙ্গোলীয় তথা ভোটচীনা রক্তে সঙ্কর ও ভোটচীনা পরিবেষ্টিত ও প্রভাবিত অস্ট্রিক বাঙালীর মানস-প্রসূন এই ধর্ম। আমাদের ভুললে চলবে না যে, বাঙালী মুখে বহির্দেশীয় ধর্ম ও দর্শন গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু নিজের জীবন-জীবিকার অনুকূল না হলে তা কখনো বুকের সত্য কিংবা মর্মের তত্ত্বরূপে বরণ করেনি। তাই এখানে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ইসলাম বিকৃত হয়েছে। বাঙালী সাংখ্যসম্মত যোগতন্ত্রভিত্তিক জীবনচর্যা গ্রহণ করে নামসার বৌদ্ধমতের আবরণে। কালক্রমে তারই বিবর্তিত রূপ পাই বজ্র-সহজ কালচক্র-মন্ত্র প্রভৃতি বিকৃত বৌদ্ধযানে বা মতে। দেহতাত্ত্বিক এই নাস্তিক্য সাধনার জয় রয়েছে দেহতাত্ত্বিক ঐ নাস্তিক চর্যায় ও ভোটচীনার তন্ত্রাচারে। বস্তুত অস্ট্রো-মোঙ্গল সংস্কৃতির প্রসূন ঐ কায়াভিত্তিক জীবনসত্য ও জগৎতত্ত্ব বাঙালীচিত্তে বজ্রসত্ত্ব কালতত্ত্ব সহজানন্দ শূন্যরূপে বিশিষ্ট বা অনন্য দৈশিক রূপ লাভ করে। একসময় তা হয়তো নিরক্ষর নির্জিত সমাজে জনপ্রিয় হয়ে সর্বভারতীয় হয়ে উঠে। গোরক্ষনাথীর ও কবীরপন্থীর চর্যার সঙ্গে তাই এর সাদৃশ্য খুঁজে পাই।

ব্রাহ্মণ্য অভ্যুত্থানে বৌদ্ধ-বিলুপ্তির সময়ে নির্যাতিত বৌদ্ধনামধেয় উক্ত বজ্র-সহজযানীরা ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্মগোপন করে এবং অনতিকাল পরে আত্মরক্ষার গরজে ইসলামাশ্রিত হয়। তখন নবধর্মের আচারিক প্রভাবের প্রাবল্যে অত্যুৎসাহী শাস্ত্রকারদের শাসনে তারা সাধারণত প্রকাশ্যে স্বধর্মাচরণ বন্ধ রেখেছিল, তারপর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও মুসলিমদের প্রাথমিক উৎসাহে শৈথিল্য এলে ওরা স্বধর্মাচরণে সাহসী হয়ে ওঠে। মাঝখানের দুশো-আড়াইশো বছরের স্তব্ধতা ও আংশিক বিরতি নিরক্ষর নির্জিত গণমানবের আত্মপরিচয়ে বিস্মৃতি ঘটায়। এর ফলেই চৌদ্দ-পনেরো শতকে বাউল সম্প্রদায় পরিচয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ও শাস্ত্রবিরহী ভুঁইফোড় হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে 'বাউল' নামের ও মতের উদ্ভব নিরূপণে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াইয়ের সুযোগ ঘটেছে। আমার এখনকার ধারণা 'বজ্রকুল' থেকেই কালে 'বাউল' শব্দের উদ্ভব এবং বজ্র-সহজযানী থেকে নাথশৈব, যোগী, বৈষ্ণব- সহজিয়া ও বিভিন্ন গুরুবাদের বেনামে হিন্দু-মুসলিম বাউলসম্প্রদায়গুলোর বিকাশ কিংবা বিকৃতি ঘটেছে। মধ্যখানে ব্রাহ্মণ্যসমাজ, ইসলাম ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আশ্রিত হয়েছিল বলে তাদের মধ্যে আস্তিক্যবোধ ও অধ্যাত্মবুদ্ধি দৃঢ়মূল হয়েছে। এবং তা রাধাকৃষ্ণ, মায়া-ব্রহ্ম, আল্লাহ-মুহম্মদ, শিব-শক্তি, নাথ-শূন্য প্রভৃতি নানা আরাধ্যের রূপকে কোরআন-পুরাণাশ্রিত হয়েছে। বিদ্বানদের বিভ্রান্ত হবার কারণও ঘটেছে এভাবেই। নইলে এরা পূর্বাপর দেহাত্মবাদীই— দেহাধারেই প্রাণপুরুষের পরশপ্রয়াসী। এক তত্ত্ব সম্বন্ধেই তারা জিজ্ঞাসু—সেটি হচ্ছে দেহতত্ত্ব। নাস্তিক্য সাংখ্যযোগতন্ত্রই এ তত্ত্বের উৎস, বারোশতকের 'অমৃতকুণ্ড', চর্যাগীতি, প্রাণ-সঙ্কলি, হাড়মালা, সাধনমালা প্রভৃতি যোগ ও তন্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ কিংবা বিবর্ত বিলাস প্রভৃতি সহজিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থগুলোর আলোকে বাউলমত বোঝা কঠিন নয়। যা বললাম তার জন্যে পাথুরে প্রমাণ পেশ করতে পারব না, তবে এই অনুমানে গবেষণা করলে বোধহয় আমরা সত্যের সন্ধান পেয়েও যেতে পারি।

বাউল ও লালন সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আবু তালিব বিপুলকায় গ্রন্থ রচনা করেছেন, অধ্যাপক আনওয়ারুল করীম, অধ্যাপক খোন্দকার রিয়াজুল হকের বইও ছোট নয়। অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান এবং আবুল আহসান চৌধুরীর গ্রন্থও প্রকাশনের পথে। রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সতীশচন্দ্র দাস, করুণাময় গোস্বামী, ভোলানাথ মজুমদার, বসন্তকুমার পাল, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, ডক্টর মতিলাল দাস, পীযূষকান্তি মহাপাত্র, ডক্টর মযহারুল ইসলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ.এইচ. এম. ইমামুদ্দীন, বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর প্রভৃতি অনেকেই নানাভাবে বাউলগান ও বাউলকবি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন ও করবেন। তত্ত্ব কিংবা পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কেউ কখনো শেষ কথা বলতে পারে না। বিতর্কে-বিবাদে-বিসম্বাদে প্রতিবাদী গবেষণা ও আলোচনা চালু রাখাই হচ্ছে জ্ঞানচর্চা। আনুষঙ্গিকভাবে আসে নতুন তথ্য, তত্ত্ব ও তাৎপর্য। এভাবেই মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকাশ ও প্রসারলাভ করেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহকে
এবং
আর যাঁরা সত্যকে, স্বদেশকে ও মানুষকে ভালোবাসেন
তাঁদেরকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজ-সংস্কৃতির বিকাশ-বিবর্তন ধারা

এই সৌরজগৎ ও পৃথিবী কত লক্ষ কোটি বছর পুরনো তার সঠিক অনুমান সহজ নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রায় আটকোটি বছর আগে থেকেই অঙ্গ এবং মস্তিষ্ক এক ধারায় বিবর্তন শুরু করে। আর অন্তত পাঁচ-ছয় লাখ বছর আগে থেকেই আজকের মানুষের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের সূচনা হয়। সে-সব জটিল তত্ত্ব সাধারণের পক্ষে জানা-বোঝা সহজ নয়, তাই শুনেও বিশ্বাস-বিস্ময়ের দ্বন্দ্ব ঘোচে না। তবে কিছুটা প্রমাণে এবং অনেকটা অনুমানে আজকের বিদ্বানেরা স্বীকার করেন যে, মোটামুটি গত দশ হাজার বছরের বুনো, বর্বর ও ভদ্র মানুষের বিচ্ছিন্ন, কঙ্কালসার ও আনুমানিক একটা আবছা ইতিহাস খাড়া করা সম্ভব। যদিও আজকের মানুষের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভব ঘটেছে অন্তত পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ হাজার বছর আগে।

তাছাড়া বিজ্ঞানীরা গত দশ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক বিবর্তনের তত্ত্বও জ্ঞানগত করেছেন বলে দাবি করেন। বরফ বা তুষার যুগ, হিমবাহ যুগ ঐ দশ লাখ বছরে অন্তত চারবার এসেছে। ফলে জীব-উদ্ভিদ জীবনেও ঘটেছে শ্রেণীগত জন্ম-মৃত্যু-উন্মেষ-বিনাশ। গত দশ হাজার বছরের মানুষের জীবন-জীবিকা রীতির ধারণাও আমাদের স্পষ্ট কিংবা নিশ্চিত নয়। তবে গত ছয়–সাত হাজার বছরের ভাঙা–ছেঁড়া, টুটা-ফাটা জীবন-জীবিকা-চিত্র নানা সূত্রে কিছু কিছু মিলেছে, এখনো মিলছে। তাতে বাস্তবের কাছাকাছি একটা সমাজ-চিত্র তথা রৈখিক নকশা তৈরি করা চলে। মানুষের জীবন, মনন ও জীবিকার আঞ্চলিক বিবর্তনধারা মোটামুটিভাবে জানবার-বুঝবার জন্যেই এর গুরুত্ব অশেষ।

জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানুষের বিকাশ-বিস্তারধারায় তার ভাব-চিন্তা-কর্মের কতখানি তার প্রাণিসুলভ সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রসূন, আর কতখানি তার মননলব্ধ তথা অর্জিত ও সৃষ্ট, তা পরখ করে দেখার জন্যেও স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে গৌত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বিকাশধারা অনুধাবন করা আবশ্যিক।

মানুষের পুরাতত্ত্ব জানতে হলে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, সমাজ-বিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর উদঘাটিত ও অনুমিত তত্ত্বে আস্থা রেখে, ঐগুলো স্বীকার করে ও ভিত্তি করেই সন্ধানে, বিশ্লেষণে ও সমন্বয়ে এগুতে ও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হয়।

নৃ-বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের জীবনের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও মনন-উৎকর্ষ জীবিকা-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। জীবিকা-পদ্ধতি আবার প্রাকৃতিক প্রতিবেশের প্রসূন। আমরা জানি, দুনিয়ার সর্বত্র সে-প্রতিবেশ অভিন্ন নয়। উত্তর মেরুর বরফ-ঢাকা এলাকায় এস্কিমোরা যেমন আজো তুষার যুগ অতিক্রম করতে পারেনি, তেমনি সৃষ্টিশীল কিংবা গ্রহণকামীও নয় বলে সভ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিম বুনো মানুষও দুর্লভ নয়। আফ্রিকা এবং এশিয়া-য়ুরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা ছোট-বড় দ্বীপে বাস করেছে, তারাও উদ্ভাবন-আবিষ্কার-প্রয়াসের অভাবে কিংবা খাদ্যাভাব ও জনবৃদ্ধি প্রসূত প্রয়োজন প্রেরণার অনুপস্থিতির ফলে আদি মানবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথা পুরোপোলীয় যুগের জীবন-জীবিকা স্তরেই রয়ে গেছে। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ও গোত্রের মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিবেশ-নিয়ন্ত্রিত জীবিকা-পদ্ধতি-প্রসূত প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণবিধি এবং ঐহিক পারত্রিক চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়েছে। জীবিকা অর্জন সর্বদা ও সর্বত্র কখনো সহজ, সরল ও সুসাধ্য ছিল না। কেননা অজ্ঞ-আনাড়ি-অসহায় মানুষ তখন ছিল একান্তই প্রকৃতির আনুকূল্য-নির্ভর। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-শৈত্য-খরা-কম্পন ছাড়াও ছিল অপ্রতিরোধ্য শ্বাপদ-সরীসৃপ আর নিদানবিহীন লঘু-গুরু নানা রোগ। গা-পা যেমন ছিল নিরাবরণ, মন-মেজাজও তেমনি ছিল আত্মপ্রত্যয়বিহীন। এমন মানুষ ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রবণ হয়, আর বিশ্বাস-ভরসা রাখে ও বরাভয় খোঁজে অদৃশ্য অরিমিত্র দেবশক্তিতে। তার চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতির ও ব্যর্থতার এবং অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির কিংবা বিকলতার অভিজ্ঞতা থেকেই এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের ও প্রভাবের ধারণা অর্জন করে সে। তখন থেকেই তার জীবন-জীবিকা ইহ-পরলোকে প্রসারিত। স্বায়ত্ত নয় বলেই জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্যের কামনা তাকে দৈবাশ্রিত হতে বাধ্য করেছে।

প্রাণী হিসেবে মানুষেরও কিছু সহজাত বুদ্ধি, নিরাপত্তা-প্রয়াস, জীবিকা-চেতনা, ও জ্ঞাতিত্ববোধ ছিল, অর্থাৎ প্রাণিসুলভ একটা জীবনোপায়বোধ ছিলই। কিন্তু তার আঙ্গিক সৌকর্যপ্রসূত অনন্যতা এবং অনন্য মননশক্তি তাকে একান্তই বৃত্তি-প্রবৃত্তি-নির্ভর প্রাণী রাখেনি। তার অনন্যতম কারণ ছয়টি—প্রত্যঙ্গের বিশিষ্টতা, মস্তিষ্কের বিশেষ বিকাশ-শক্তি, বিশেষ যৌথ জীবন-প্রবণতা, বাকশক্তি, হাতিয়ার ব্যবহারের সামর্থ্য ও মননশক্তি। আসলে সবটাই তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপজাত। ফলে শীঘ্রই সে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট-অবচেতন মনে আত্মশক্তির অনুভবে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে প্রকৃতি-দ্রোহী হয়ে ওঠে। তার সমস্ত বিকাশ-বিস্তারের মূলে রয়েছে ঐ আত্মপ্রত্যয়প্রসূত দ্রোহ। তাই মানুষ মাত্রই প্রকৃতি-দ্রোহী। আঙ্গিক সুষ্ঠুতা ও সৌকর্য তাকে দিয়েছে হাতিয়ার ব্যবহারের প্রবর্তনা। কাজেই হাতিয়ারবিরহী মানুষ কল্পনাতীত। হাতিয়ার-বিহীন মনুষ্য-জীবিকা তাই আমাদের ধারণার অসম্ভব। অতএব মানুষ বলতে সহাতিয়ার মানুষই বোঝায়। ফলে মানুষের ইতিহাস হচ্ছে প্রকৃতি-জিগীষু, যুধ্যমান, জয়শীল, হাতিয়ারস্রষ্টা এবং জীবিকার উৎকর্ষ ও প্রসারকামী মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বন্ধ, ও পতন-অভ্যুদয়ে বন্ধুর পথ অতিক্রমণের বহু বিচিত্র দীর্ঘ ইতিকথা। কাজেই শ্রম, হাতিয়ার ও মনন প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশ ও দাস করে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন এবং আনুষঙ্গিক ভাবে ভাব-চিন্তা-কর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগমন তথা জীবন-প্রবাহে সার্বিক পরিস্রুতি আনয়ন-প্রয়াসই মনুষ্য জীবনচর্যার ইতিবৃত্ত। আগেই বলেছি, নানা কারণে এ কারো পক্ষে হয়েছে সম্ভব, কারো কাছে রয়েছে আজো আয়ত্তাতীত। বিকাশের এক স্তরে মনুষ্য ইতিহাস ও সমস্যা সংহত হয়ে মুখ্যত জীবিকা-সম্পদ-প্রতীক বিনিময় মুদ্রার অধিকারে তারতম্যপ্রসূত শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নেয়। এবং সে-মুহূর্ত থেকেই জীবিকা অর্জন ও জীবন-ধারণ পদ্ধতি জটা-জটিল হয়ে ওঠে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষে তখন জীবন-জীবিকা দুঃসহ, দুর্বহ, যন্ত্রণাময় হয়ে পড়ে। একালে দুনিয়াব্যাপী সেই যন্ত্রণামুক্তির উপায় উদ্ভাবনে, প্রয়াসে, সংগ্রামে, দ্বন্দ্বে-সংঘর্ষে-সংঘাতে মানুষ কখনো মত্ত, কখনো আসক্ত, কখনো বা পর্যুদস্ত। জয়-পরাজয়ের আবর্তে কখনো আর্ত, কখনো আশ্বস্ত। প্রবহমান জীবনে যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সমাধান, বর্জন ও অর্জন, দ্বন্দ্ব ও মিলন, বিনাশ ও উন্মেষ চিরকাল এমনি দ্বান্দ্বিক সহাবস্থান করবে। চলমান জীবনস্রোতে নতুন দিনে নতুন মানুষের নতুন পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যা ও সম্পদ, যন্ত্রণা ও আনন্দ থাকবেই। কেননা চলমানতার এসব নিত্য ও চিরন্তন সঙ্গী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মে-আচরণে যা কিছু অভিব্যক্তি পায়, তার কিছুটা প্রাণিসুলভ সহজাত, আর কিছুটা মনন-লব্ধ তথা অর্জিত। এ দুটোর সংমিশ্রণে অবয়ব পায় মানুষের চরিত্র, অভিব্যক্ত হয় জীবনাচরণ। অনুশীলন পরিশীলনের স্তরভেদে কোনো বিশেষ স্থানে ও কালে ব্যষ্টি ও সমষ্টির আচারে-আচরণে কখনো প্রাণিসুলভ স্থূল-অসংযত স্বভাব প্রবলভাবে প্রকাশ পায়, কখনো বা অর্জিত আচরণ প্রাধান্য পায়। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কখনো অবিমিশ্র বা অনপেক্ষ কোনো আচরণ সম্ভব নয়। তাই আজকের সভ্যতম সংস্কৃতিবান মানুষেও আদিম মানুষের আচার-আচরণের ছিটে-ফোঁটা মেলে—কখনো আদিরূপে, কখনো বা রূপান্তরে।

বিভিন্ন স্থানে বিচিত্র ব্যবহারিক-বৈষয়িক প্রয়োজনে ও মানসিক কারণে নানা স্থানে গোত্রীয় মানুষের সম্পর্কজাত নানা পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের শাস্ত্র, সমাজ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনা বহুমুখী, বিচিত্রধর্মী ও দুর্লক্ষ্য জটিল হয়ে উঠেছে। কারা কাদের প্রভাবে কী পেয়েছে কিংবা কী হয়েছে, তা আজ নিঃসংশয়ে বলা-বোঝা অসম্ভব। তবু আমাদের জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে হয়, এবং সন্ধানে, নিদর্শনে, বিশ্লেষণে, প্রমাণে ও অনুমানে যা মেলে, তা দিয়েই মনোময় উত্তর তৈরি করে আমাদের কৌতূহল মিটাই এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো কোনো মানবিক সমস্যার মূলানুসন্ধানে, কারণ-করণ নিরূপণে ও সমাধান চিন্তায় সে জ্ঞান ও সিদ্ধান্ত কাজে লাগাই।

জগৎ ও জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা যেমন নানা তথ্য উদ্ঘাটন ও তত্ত্ব উদ্ভাবন করে বিভিন্ন পদার্থের ও জীব-উদ্ভিদের উদ্ভব ও বিকাশের নানা স্তরবিন্যাস করেছেন, তেমনি নৃ-বিজ্ঞানী এবং সমাজ-বিজ্ঞানীরাও মানুষের ক্রমবিকাশ ও বিস্তারের নানা স্তর আবিষ্কার ও অনুমান করেছেন। সাধারণভাবে বন্য, বর্বর ও ভব্যকালে ও শ্রেণীতে মানুষকে বিভক্ত করে মনুষ্য জীবনপ্রবাহের ক্রমোন্নতি নিরূপণের চেষ্টা হলেও দীর্ঘকাল পরিসরের পরিপ্রেক্ষিতে কালিক স্তর ও হাতিয়ারের উপকরণ ও উপযোগ অনুসারে যুগবিভাগ করার স্বীকৃত রীতি-নীতিও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাতিয়ারের উপকরণ অনুসারে হাতিয়ারবিহীন ফল-মূল-পাতাজীবী আদিম মানুষের যুগ খাদ্য সংগ্রহে কাঠ-ঢিল-পাথরখণ্ড ব্যবহারকারী পুরোপোলীয় যুগ বা পুরনো পাথর যুগ, অস্ত্ররূপে ঘষা-মাজা পাথর প্রয়োগকারী নব্যপোলীয় বা নবপাথর যুগ, তামা আবিষ্কারের ও ব্যবহারের তাম্রযুগ, পিত্তল আবিষ্কারের ও ব্যবহারের পিত্তল বা ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহ আবিষ্কারের ও প্রয়োগের লৌহ যুগ। এর মধ্যেও নানা বস্তুর আবিষ্ক্রিয়া, কৌশলের উদ্ভাবন এবং বস্তুর ও কৌশলের উপযোগ সৃষ্টি-ভেদে ও ক্রমবিকাশে নানা উপস্তর তৈরি হয়েছে। হাতিয়ার তথা যন্ত্র মানুষের আঙ্গিক শক্তির বহুল বিস্তৃতিতে ও সুনিপুণ, সুষ্ঠু, সু-প্রয়োগে অপরিমেয় সহায়তা দিয়েছে। আধুনিক বৈদ্যুতিক-আণবিক যন্ত্র সেই যন্ত্র বা হাতিয়ার আবিষ্কার-উদ্ভাবনের প্রবণতা ও প্রয়াসেরই ক্রমপরিণত রূপ।

এই যন্ত্র-চর্চা কেবল অগ্নি-অন্ন, আসবাব-তৈজস, অস্ত্র-শস্ত্র, বস্ত্র-বর্ম, কাস্তে-কোদাল, জাল-জাহাজ নির্মাণে অবসিত হয়নি, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র ও জল-বায়ুর গতিবিধি ও মেজাজ-মর্জি জানা-বোঝার প্রবর্তনাও দিয়েছে। এভাবে মানুষ আকাশ ও মাটির এবং এদের মধ্যেকার সমস্ত গুপ্ত ও ব্যক্ত পদার্থকেই কেজো সম্পদে পরিণত করার সাধনায় হয়েছে নিরত।

মানুষের ক্রমবিকাশ ত্বরান্বিত করেছে যেসব আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন সেসবের মধ্যে মুখ্য হচ্ছে ভাষা, আগুন, টাকা, লিপি, লোহা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও সম্পদ-প্রতীক বিনিময় মুদ্রা। মানুষের জীবন-পদ্ধতি আর প্রাকৃত রইল না, হল কৃত্রিম ও স্বসৃষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালপ্রবাহের ময়াটি-ক্ল্যান, ফ্রাটি-ট্রাইব, সম্প্রদায়-সমাজ, দেশ-রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে জীবন-জীবিকার প্রত্যক্ষ প্রয়োজনে। সহজে কিংবা সরলভাবে নির্বিঘ্নে কিছুই হয়নি। কোনো কোনো বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে আজো মানুষ ক্ল্যান স্তরেই রয়ে গেছে।

মননের ক্ষেত্রেও অনেক মানুষ আজো সর্বপ্রাণবাদের, যাদু-বিশ্বাসের, টোটেম-টেবু তত্ত্বের, প্রেত-সংস্কারের ও প্যাগান-বোধের নিগড়ে নিবদ্ধ। এভাবে পাথর-মাটি-দূর্বা, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, কূর্ম-কুমির-মকর-হাঙ্গর-মৎস্য, ফুল-ফল-তরুলতা থেকে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র এবং অদৃশ্য অনেক কল্পিত শক্তি মানুষের ভয়-ভরসার কারণ রূপে পূজ্য ও আরাধ্য হয়েছে। পরে প্রমূর্ত প্রতিমা হয়ে কেবল মনে নয়, ঘরে-সংসারেও ঠাঁই পেয়েছে। এ বিচিত্র বিবর্তন-বিকাশ হতে সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। মনন শক্তির বিকাশে, যুক্তি-বুদ্ধির ও রুচির উন্মেষে টোটেম পেয়েছে স্রষ্টার ও দেবতার মর্যাদা, সংস্কার উন্নীত হয়েছে শাস্ত্রে, বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ধ্রুব সত্যে। টোটেম-টেবু তত্ত্বের উদ্ভব হয়তো খাদ্য ও নিরাপত্তার অনুকূল ও প্রতিকূল চেতনাপ্রসূত।

প্রচলিত ধর্মের মধ্যে বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নানা কারণে বিশিষ্ট। দুনিয়ার আর আর ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তি-প্রবর্তিত ধর্ম, আর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হচ্ছে বিবর্তিত ধর্ম। সুদীর্ঘকালের পরিসরে লোকহিতকামী বহু জ্ঞানী মনীষীর কালিক অনুভব, প্রয়োজন-চেতনা, শ্রেয়োবোধ ও মননপ্রসূত তথ্য, তত্ত্ব, নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য-নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য-নির্দিষ্ট আচার-আচরণ বুদ্ধি থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় এর স্বাভাবিক-উদ্ভব ও প্রসার। তাই এতে মনুষ্য-চেতনার ও আচারের আদিম রূপ যেমন মেলে, মনুষ্য-মননের সূক্ষ্মতম বিকাশ ও উচ্চতম বোধও তেমনি এতে দুর্লভ নয়। টোটেম যুগের কূর্ম-বহরা-অশ্ব-অশ্বতর, বৃক্ষ, কুকুর, রক্ষঃ, পেচক, গরুড়, হনুমান, সাপ, মকর, গজ, গরু, মহিষ, বিল্ব অশ্বথ, তুলসী, শিলা প্রভৃতি দেবকল্প কিংবা দৈত্যকল্প জীব-উদ্ভিদ ও পদার্থ যেমন বধ্য কিংবা পূজ্য রয়েছে, রয়েছে টোটেম কিংবা টেবু হয়ে, তেমনি ঔপনিষদিক তত্ত্বচিন্তা এবং নিরীশ্বর দার্শনিক চেতনাও সমভাবে আদর-কদর পেয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে, সংহিতায়-পুরাণে যে-সব ইতিবৃত্ত বিধৃত রয়েছে, সেগুলো দিয়েই ভারতীয় মানুষের বুনো-বর্বর-ভব্যস্তরে ক্রমোন্নয়নধারার ইতিকথা রচনা করা সম্ভব।

খাদ্য-সংগ্রাহক যাযাবর মানুষ, খাদ্যশিকারী যাযাবর মানুষ, পশুপালক যাযাবর মানুষ, কৃষিজীবী অর্ধ-যাযাবর মানুষ, কৃষি-শিল্পজীবী স্থায়ী বস্তির মানুষ, পণ্যবিনিময় স্তরের মানুষ, মুদ্রা বিনিময় স্তরের নাগরিক মানুষও যে সর্বত্র সমান কুশলী, মননশীল কিংবা উন্নত সামাজিক ও সংস্কৃতিবান মানুষ ছিল, তা নয়—যেমন আজকের পৃথিবীর বুনো কিংবা শহুরে মানুষ আজো সমস্তরের নয়। প্রাকৃতিক পরিবেশে দেশ, কাল ও মানুষভেদে তারতম্য থেকেই যায়। তবু মানুষের জীবন-প্রয়াস যে অন্য প্রাণীর মতোই খাদ্য ভিত্তিক তা মিথ্যা হয়ে যায় না। খাদ্যের আহরণে, সংরক্ষণে ও সুলভতায় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা দান প্রয়াসেই মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়োজিত। এই প্রয়াসের মুখ্য ও গৌণ কারণ এবং ফলস্বরূপ এসেছে মানুষের আর আর আনুষঙ্গিক আবিষ্ক্রিয়া ও উদ্ভাবন যা ব্যবহারিক, বৈষয়িক কিংবা মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করে। অতএব খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যে শ্রম ও হাতিয়ার প্রয়োগই মানুষের সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের মূল। খাদ্য সংগ্রাহক ও শিকারী মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানত না বলে উদার ছিল, উদরপূর্তির পর উদ্বৃত্ত খাদ্য অপরকে দিতে দ্বিধা করত না। কিন্তু পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষ সঙ্গত কারণেই সম্পদ-সচেতন ও স্বার্থপর হয়ে ওঠে। তখন থেকেই বৈষম্যবীজ ও শ্রেণীচেতনার অনির্দেশ্য ও নিরুদ্দিষ্ট উন্মেষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৃ-বিজ্ঞানীরা যেমন মানুষের আঙ্গিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় ও শ্রেণীনিরূপণ করেন, সমাজ-বিজ্ঞানীরা তেমনি মুখ্যত জীবনচর্যার মাপে মানুষের বিকাশধারা বুঝতে চান। নৃ-বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দেন চোখ-চুল-নাকে, মাথা-চোয়াল-কপালের গড়নে, আর আদিম জীবনাচরণ ও মননধারার নমুনায়। সমাজ-বিজ্ঞানীরা সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি আদর্শ-উদ্দেশ্য, উৎপাদন-বণ্টন, মন-মনন, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির গঠন-বৈচিত্র্যের ও বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণপ্রবণ। তবু নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রায় অভিন্ন। কেননা একটা ছেড়ে অন্যটা অচল। বলতে গেলে, এগুলো মানব-পরিচিতির একাধারে তিনটে দিক ও স্তরমাত্র। এবং সবকয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সামষ্টিক জীবনধারায় অভিব্যক্ত জীবনচর্যার স্বরূপ নিরূপণ।

ব্যক্তি হিসেবেও মানুষের জৈবিক, নৈতিক, বৃত্তিক, বৌদ্ধিক, তান্ত্রিক ও শ্রেণিক বা সামাজিক আচরণ তার বলনে-চাহনে-চলনে কিংবা ক্রীড়ায়-কর্মে-ভঙ্গিতে, হাসি-ঠাট্টায়-ক্রোধে-ক্ষোভে, দয়ায়-দাক্ষিণ্যে-সেবায়-সমবেদনায় ঈর্ষায়-অসূয়ায়, লিপ্সায়-নিষ্ঠুরতায় নিত্য প্রকাশমান। ব্যষ্টি নিয়ে সমষ্টি, সেই সামষ্টিক আচরণে একটা সমাজ-সত্তার বা জাতি-সত্তার সামান্যীকৃত আচরণ বা অভিব্যক্তি নিরূপণই নৃতাত্ত্বিক, গোত্রতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকের সন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য।

মানুষের মনন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় জন্মসূত্রে লব্ধ পারিবারিক-সামাজিক-শাস্ত্রিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ, প্রথা-পদ্ধতি-প্রতিষ্ঠান, উৎসব-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, প্রভৃতির প্রভাবে। এদিক দিয়ে কোনো মানুষই স্বাধীন ও স্বসৃষ্ট নয়, হাজার অদৃশ্য 'বাগে' ও বাঁধনে তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত। অতএব সামাজিক আচরণমাত্রই কৃত্রিম তথা অর্জিত, অনুশীলিত ও পরিস্রুত।

এই বহু ও বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, উৎসব-পার্বণ, প্রথা-পদ্ধতি, দারু-টোনা-ঝাড়-ফুঁক-তাবিজ-মাদুলী-বাণ-উচাটন প্রভৃতির সম্ভাব্য উৎস নির্দেশ, তার আদি ও রূপান্তর নিরূপণ, টোটেম-টেবু-যাদুর জড় আবিষ্কার প্রভৃতি আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য বা প্রায় অসাধ্য বটে, তবে আমাদের তথ্য পরিবেশনা বিদ্বান-বিজ্ঞানীদের তত্ত্ব নিরূপণের ও মূলানুসন্ধানের সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই আমাদের এ প্রয়াস এবং প্রয়াসের সার্থকতাও এখানেই।

আমরা প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের শ্রেণী ভাগ করেছি। সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক এই উপকরণগুলো প্রায় পাঁচশ বছরের পরিসরে রচিত গ্রন্থাবলি থেকে সংগৃহীত ও সংকলিত। সে-যুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলের যন্ত্রগুলো আবিষ্কার-পূর্ব যুগে সমাজের বিবর্তনের গতি ছিল স্থবিরপ্রায় মন্থর। আবর্তনই ছিল স্বাভাবিক। পাঁচশ বছরেও দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন ছিল দুর্লক্ষ্য। বরং সে যুগে মনন-বিবর্তন যত সহজ ছিল, তত স্বাভাবিক ছিল না ব্যবহারিক-বৈষয়িক-জীবনধারার পরিবর্তন। তাই জন্ম-মৃত্যু শাসিত জীবনস্রোত তথা লোকপ্রবাহ ছিল , কিন্তু তেমন ক্রমবিবর্তন ছিল না—জীবনযাত্রার ধারায় কেবল আবর্তিত প্রবাহই ছিল স্বাভাবিক। জন্মসূত্রে পাওয়া সংস্কার ও ধর্মশাস্ত্রই যে মানুষের মনন ও আচরণ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে, তা কেউ অস্বীকার করে না। সে জন্যই আমরা কেবল মুসলিম-রচিত বাঙলা-সাহিত্য থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেছি যাতে দেশজ মুসলমানের শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতিগত আচার-আচরণের একটা সার্বিক ও সামগ্রিক রূপ মেলে এই প্রত্যাশায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঞ্চয়বুদ্ধিই যৌথ জীবনের প্রবর্তনা দেয়। তাই মানুষ ছাড়াও উই-পিঁপড়ে-মৌমাছির মধ্যে এ যৌথজীবন-পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি। এমনকি সন্তান জন্মানোর ও লালনের জন্য নীড় নির্মাণ করতে হয় বলে কাক-কবুতর-বক-বাবুই প্রভৃতি অনেক পাখীর মধ্যেও সাময়িক দাম্পত্য বা যৌথ জীবনাসক্তি দেখতে পাই। কোনো কোনো পশু-পাখির মধ্যেও সর্বগণমান্য দলপতি বা গোষ্ঠীপতি, তথা পরিচালক বা নেতা, অগ্রগামী খাদ্যসন্ধানী দল এবং রক্ষক প্রহরী ও রক্ষাব্যূহের ব্যবস্থা দেখা যায়। সংগৃহীত খাদ্যবস্তু বাইরে সঞ্চয় করে রাখার সামর্থ্য নেই বলে ছানার জন্যে সংগৃহীত খাদ্য এরা উদরেই রাখে কিছুক্ষণ। গরিলা-শিম্পাঞ্জি-গিবনদের মধ্যেও রয়েছে দাম্পত্য। তাছাড়া তোতা-কাক-শকুন-হাঁস-শিয়াল-বানর-ভেড়া-শূকর-হাতী-বেবুন-গিবর-গরিলা-শিম্পাঞ্জি -ওরাঙউটা প্রভৃতি বহু বহু প্রাণীও জ্ঞাতিত্ববোধে, যৌথ জীবনে এবং এক প্রকারের সামাজিক দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত। কাজেই প্রাণী হিসেবে হয়তো আদি মানুষও যূথবদ্ধ হয়েই থাকত। তবে তার আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ও মননশক্তি তার যৌথ জীবনে উৎকর্ষ ও বিকাশ দান করেছে দ্রুত। যূথবদ্ধ থাকতে হলে নেতা ও নীত ভাগে স্বীকৃতি দরকার, তার সঙ্গে আবশ্যিক সমস্বার্থে বা স্ব-স্ব স্বার্থে সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতার স্থায়ী অঙ্গীকার। যৌথজীবন এ না হলে চলতেই পারে না। এ বোধ থেকেই পালনীয় ও বর্জনীয় নিয়মনীতিস্বরূপ আইন এবং প্রয়োগকারী সংস্থা সরকারের ক্রমোদ্ভব। তাই আমরা আদি মানুষে পাই দৃঢ় ক্ল্যান-চেতনা, তা থেকে ক্রমান্বয়ে ফ্রাটি, ময়াটি ও ট্রাইব। এই ট্রাইব বা গোত্রীয় জীবন বন্য, বর্বর ও ভব্য জীবনে দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তারপর সর্বপ্রাণ-টোটেম-টেবু-যাদু-প্যাগান তত্ত্ব-চেতনার ক্রমোন্নতিতে যখন বিবর্তিত বা প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় ধর্মে উত্তরণ ঘটল, তখন সহ ও সম-মতবাদীর দল বা সম্প্রদায় গড়ে উঠল। এভাবেই পরে কালপ্রবাহে অগ্রসর মানুষের পরিচয় দেশ-গোত্র-জাত-বর্ণ-ধর্ম-বৃত্তি-শ্রেণী-সম্পদভিত্তিক হয়ে দাঁড়াল। অনগ্রসর বুনো ও বিচ্ছিন্ন মানুষ আজো ক্ল্যান-ফ্রাটি ময়াটি-ট্রাইব স্তরে আটকে রয়েছে, আদিরূপে কিংবা বিবর্তিত রূপে তা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিক কিংবা সামাজিক আচরণে কখনো কখনো প্রকট হয়েই প্রকাশ পায়।

জীবনচর্যার উৎস প্রতিবেশ প্রভাবিত জীবিকা হলেও হাতিয়ার ও নৈপুণ্যের বিবর্তনধারায় তা জটিল পথে মুখ্য-গৌণ, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ হয়ে পড়ায় কারণ-ক্রিয়ার বোধসূত্র লোক-স্মৃতিতে গেছে হারিয়ে। তাই অনেক আচার-সংস্কারই হয়ে পড়েছে আপাত নিরুদ্দিষ্ট ও তাৎপর্যহীন। ফলে সম্পর্ক-স্বরূপ নির্ণয় হয়েছে দুঃসাধ্য। যেমন নাচ-গান-চিত্র—এগুলো ছিল আদিতে শিকার-সাফল্যের, অনুকূল রোদ-বৃষ্টির আবহসৃষ্টির ও বিপদমুক্তির প্রাকৃত বা দৈবিক আবহসৃষ্টির বাঞ্ছাপ্রসূত উদ্ভাবন। এখন নাচ-গান-চিত্র আমাদের মানসিক-নান্দনিক বিলাসক্রিয়া মাত্র।

যখন মানুষ খাদ্যরূপে ফল-মূল সংগ্রাহক মাত্র ছিল, যখন খাদ্য সংগ্রহ কালে সঙ্গী-সহচর থাকলেও ঐ কার্যে সহযোগী-সহকারীর প্রয়োজনই ছিল না, তখনো কিন্তু জৈবিক কারণে নারী-পুরুষের মিলন কাম্য ছিল। তখনো হয়তো ব্যক্তিক বিবাদের কারণ ঘটত নারী সম্ভোগ নিয়ে—জীবজগতে আমরা যেমনটি দেখতে পাই। তাছাড়া মনুষ্যস্মৃতিতে কামই বিপদ-বিবাদের উৎস। আদম-ইভের স্বর্গচ্যুতি ঘটে কাম-চেতনা জাগার ফলেই। প্রথম পার্থিব বিবাদ ও নরহত্যার মূলে ছিল নারীর লাবণ্য। কাবিলের হাবিল-হত্যা দিয়েই শুরু ভ্রাতৃ-হননের তথা নরনিধনের। গ্রিক-হিন্দু পুরাণেও রয়েছে দেব-দানবের নারীকেন্দ্রী বিবাদ-বিগ্রহের কাহিনী। হোমার-বাল্মীকি-ব্যাসের কাব্যে নয় কেবল, দুনিয়ার রূপকথা, উপকথা ও ইতিকথার মূলেও রয়েছে পুরুষ-ভোগ্য নারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই 'জমি'র আগে 'জরু'ই ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের উৎস। তারপর পশুপালক ও কৃষিজীবী মানুষের জীবনে বিবাদ-বিগ্রহের কারণ দাঁড়াল দুটো—জরু ও জমি। আরো অনেক পরে যুক্ত হল আর একটি কারণ তা হচ্ছে 'জওহর'।

সংস্কারমুক্ত স্বৈরিণী নারীর যে-কোন পুরুষকে দেহদানে হয়তো আপত্তি ছিল না, কিন্তু সন্তানধারণ ও লালনের জন্যে সে নিশ্চয়ই সহকারীর প্রয়োজন অনুভব করত। সেই আদি জৈব-জীবনে কে করবে কার সহায়তা! তাই বোধহয় সামাজিকভাবে নারী এক বিশেষ পুরুষের প্রতিই প্রীতি রাখত সাহায্য-সহযোগিতা লাভের প্রত্যাশায়। আজকের মতো এতো সচেতন কিংবা সূক্ষ্ম না হোক, নারী কিংবা পুরুষ একেবারে দুর্লভ-দুর্লক্ষ্য না হলে সেদিনও হয়তো অবচেতন রুচিরও একটা প্রেরণা ছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহলে মানতেই হবে যে পুরুষ ও নারী মাত্র অবিচারে একে অপরের কাম্যজন ছিল না। সেদিনও হয়তো পুরুষে পুরুষে বিরোধ-বিবাদের কারণ ঘটত যৌবনবতী স্বাস্থ্যসুন্দর নারীর রূপ-যৌবন উপভোগের দাবি নিয়েই। নারীও হয়তো ঝুঁকে পড়ত সবল-সুরূপ-পৌরুষ-দৃপ্তপুরুষের প্রতি। তাই আপ্তবাক্যে 'জরু ও জমি বীরভোগ্যা।'।

অতএব নারী-সমস্যাই মনুষ্যজীবনের আদি ও গুরু সমস্যা—এ অনুমান অসঙ্গত নয়। তাই নিয়ন্ত্রিত কামচর্চার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান খুঁজেছে আদি সমাজ। আদম-ইভের প্রতিবারের সন্তান হত বিপরীত লিঙ্গের যমজ। তাদের মধ্যে বিয়ে হতে পারত না। আদিম বুনো বর্বর সমাজে যখন ব্যক্তি-বিয়ে চালু হয়নি, তখন যে নির্বিচার সঙ্গমের রেওয়াজ চালু ছিল, তাতে দেখা যায় স্ব-ক্ল্যান সঙ্গম ছিল টেবু বা নিষিদ্ধ। দুই ভিন্ন ক্লানের নারী-পুরুষে হত কামচর্চা—এরই নাম যৌথ বিয়ে। দ্রৌপদীকে পাঁচভাই বিয়ে করলেন বটে, কিন্তু বিরোধ-বিবাদ এড়ানোর জন্যেই ভাইদের মধ্যে পালাভাগ ছিল। আজো হিন্দুদের মধ্যে জ্ঞাতি বিয়ে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ জাতক মতে রাম-সীতা ছিলেন ভাই-বোন। চারভাইয়ের এক সুন্দরী বোন থাকলে ভ্রাতৃবিরোধ ও ভ্রাতৃহত্যা এড়ানো অসম্ভব দেখেই কেবল ভাই-বোনে নয়, বিশেষ বিশেষ নিকটাত্মীয় বিয়ে আদি সমাজেই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তবু আগে যাদের মধ্যে সঙ্গম-সম্পর্ক হতে পারত, পরবর্তীকালে তা অনভিপ্রেত হলেও, আজো ঠাট্টা-মস্করার মধ্যে সে-সম্পর্ক স্মৃতির রেশ মেলে। উনিশ শতকেও আরাকানে বর্মায় রাজা 'মা' ছাড়া সব পিতৃপত্নীর সম্ভোগ অধিকার পেত উত্তরাধিকার সূত্রেই। কোনো কোনো বুনো মানুষ সসম্পত্তি বিধবা মামীকে পত্নীরূপে পায়। কোথাও কোথাও মামা ভাগ্নী বিয়ে করতে পারে। অনেক সমাজেই নিজের পিতা-মাতার সন্তান ছাড়া, ভাই-বোন সম্পর্কিত নিকটাত্মীয়দের বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। ইসলামে চৌদ্দরকম সম্পর্কের আত্মীয়-কুটুম্বে বিয়ে নিষিদ্ধ। যখন মাতৃ-কেন্দ্রী ক্ল্যান ছিল, তখনো হয়তো রানি মৌমাছির মতোই সঙ্গমের কিছু প্রাকৃত বা উদ্ভাবিত বিধি-বিধানের বেড়ার বাধা ছিল। নানা কারণে মনে হয়, আদি মানুষের মধ্যেও কামচর্চা ছিল কোনো রকমের বিধি-নিয়ন্ত্রিত—তা গোত্রপতির নির্দেশেই হোক কিংবা যাদু-সংস্কারবশেই হোক। মানতেই হবে যে সমাজে যেদিন ব্যক্তিক বিয়ে চালু হল, সেদিন থেকেই সে-সমাজে আধুনিক সংজ্ঞার পরিবার-পরিজনও গড়ে ওঠে। সভ্যতা-সংস্কৃতির পত্তন সে-মুহূর্ত থেকেই। যথার্থ আত্মীয়, আত্মীয়তা ও আত্মীয়-সমাজ গড়ে ওঠে ব্যক্তিক বিয়ে ভিত্তি করেই। জরু নিয়ে নিত্য বিবাদের আশঙ্কা এভাবেই ঘুচল। কিন্তু জমি নিয়ে বিবাদ বৃদ্ধির কারণও বাড়ল।

ব্যক্তিক বিয়ে থেকেই সামাজিক স্বীকৃতির উদ্দেশ্যেই হয়তো বিয়ের উৎসব ও ভোজ চালু হয়। আর নারী যখন প্রবল পুরুষের ভোগ্যা, তখন রূপ-গুণ-যৌবনবতী নারীও বেচা-কেনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পণ্য হল। পণ আভরণ ও নামান্তরে বিক্রি কিংবা ভাড়ামূল্যই। এই দাম্পত্য-লব্ধ সন্তানই নন্দন-নন্দিনী। কাজেই তেমন সন্তানের জন্মে আনন্দ-উৎসবের এবং কল্যাণে নানা আচার সংস্কারের উদ্ভব। অতএব স্থায়ী দাম্পত্য মানবিক বৃত্তি-বিকাশের ও মানব-সমাজ-সংহতির একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি ও স্তর। দাম্পত্য-ভিত্তিক পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-কুটুম্বের পারস্পরিক প্রীতি প্রসূত বিশ্বাস-ভরসা ও নির্ভরতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব-চেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধি মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান ও আচার-আচরণকে মিলনমুখী ও কল্যাণধর্মী করতে সহায়তা করেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশে এসবের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল। অবাধ কামচর্চা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল বলেই হয়তো অবৈধ কামচর্চা আজো গুরুতর পাপ, লজ্জা, নিন্দা ও শাস্তির বিষয়। বন্ধু-সখী মহলে এমনকি দাম্পত্য জীবনেও রতিক্রিয়ার আলোচনা অশ্লীল, অনভিপ্রেত ও লজ্জাকর।

ঘুমে-অচেতন মানুষ স্বপ্ন দেখে। তা থেকেই সে সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে, দেহ ও চৈতন্য পৃথক সত্তা। তাছাড়া স্বপ্নে মৃত মানুষকেও সে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পায়, সে-কায়াধারী মৃত মানুষ অশনে-বসনে-আসনে-কথায়-কাজে অবিকল জীবিত মানুষের মতো। এর থেকেই মানুষের ধারণা ও নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছে যে, আত্মা নামে জীবচৈতন্য অবিনশ্বর-অমর। কাজেই আনুষঙ্গিকভাবে পরলোক-প্রেতলোক-আত্মলোক, দেবলোক, স্বর্গ-নরকলোক কল্পনা করা ও সেগুলোর অস্তিত্বে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বিদেহী আত্মার অমরত্বে আস্থা রাখলে সে-সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা এড়ানো যায় না। পারলৌকিক দায়িত্ব-কর্তব্যও বর্তায় এবং তাতে দেহ-মনের কাজ বাড়ে। নিজের জন্যে তো বটেই, মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্যে কিছু করতে হয়। জীবিত মানুষই খাদ্য চায়, কাজেই জীবিত আত্মারও খাদ্য দরকার। এর জন্যে খাদ্য পানীয় প্রভৃতি জীবিতের যাবতীয় আবশ্যিক বস্তুর ব্যবস্থা করতে হয়। আবার আত্মা যেহেতু অমর এবং কায়াহীন আত্মার স্থিতি এখনো ধারণাতীত, সেহেতু মমী করেও দেহ রাখার ব্যবস্থা। মৃতের সৎকার, প্রার্থনা, শ্রাদ্ধ, ভোজ, মমী, পিণ্ডি, জানাজা, জেয়ারত, পিতৃপুরুষ পূজা, প্রেত পূজা, শোক প্রকাশ প্রভৃতি আচার-প্রথা-পদ্ধতি তাই স্বরূপে কিংবা রূপান্তরে আদিম এবং সর্বজনীন। শব কেউ কবর দেয়, কেউ পোড়ায়, কেউ শকুনকে বিলায়, কেউ ভাসায়। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে বিলুপ্ত (১৬০০০০ বছর আগে উদ্ভূত এবং ৪০,০০০ বছর আগে বিলুপ্ত) Neanderthalers জাতীয় আদি মানুষেরা পশ্চিম এশিয়ার ও উত্তর য়ুরোপে বাস করত। তাদের মধ্যে প্রাণি-পূজা, যাদু ও মৃতের শাস্ত্রীয় সৎকারের রীতি চালু ছিল। শিকার-সহায় 'ভালুক' টোটেমরূপে অবলম্বন ছিল—পরে নব্য পোলীয় যুগের য়ুরোপে দেখি ষাঁড়, ইরাক-ইরান-মোয়েনজোদাড়োতেও পাই ষাঁড়। উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপেও সাইবেরিয়ায় টোটেমরূপে পিতৃপুরুষ প্রতীক 'ভালুক' পূজার রেওয়াজ ছিল। স্মৃতি-রক্ষার জন্যে চিতায়-কবরে সৌধ রচনাদি নানা ব্যবস্থা আজো অবিরল।

আবার প্রত্যক্ষ বাস্তব ঐহিক জীবন থেকে কাল্পনিক পারত্রিক জীবন কখনো অধিক কাম্য হতে পারে না। তাই মৃত্যু ও মৃত দুই-ই বিনাশ প্রতীক ও ভীতিপ্রদ। ন্যায়-অন্যায়, সুকর্ম-দুষ্কর্ম, শাপ-বর ও পাপ-পুণ্য চেতনাক্রমে সেই ভয় বৃদ্ধি করেছে। আগে থেকেই তো জগৎ ও জীবন-নিয়ন্ত্রী একটা বা একাধিক সার্বভৌম অদৃশ-অলৌকিক শক্তির ধারণা ছিলই, শাস্ত্রীয় যুগে তা তত্ত্ব-দর্শনের বিষয় হয়ে সুসমঞ্জস, সুসংহত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অমিত শক্তির আধার এবং দান-দয়া ও দণ্ড-মুণ্ডের মালিক রূপে চিরন্তন স্থিতি পেল। কাজেই মানুষের জন্ম-জীবন-জীবিকা, ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণ প্রভৃতির মালিক, নিয়ন্তা ও বিচারকরূপী স্রষ্টা বিধাতাও উপাস্য হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁকে বা তাঁদের এড়ানো সরানো চলে না বলেই তাঁর বা তাঁদের শাসন-লালন মানতেই হয়। তাই সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, লাভে-ক্ষতিতে আনুগত্য অবিচল রাখতে হয়—বিদ্রোহ কেবল বিপদ-যন্ত্রণাই বৃদ্ধি করবে—এ বিশ্বাস মানুষের জীবনে এতো গভীর যে তার প্রভাবে কোনো আস্তিক মানুষই আত্মিক শক্তিতে আস্থা রেখে কোনো কাজেই সাফল্য সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয়ী হতে পারে না। তাই আস্তিক মানুষ মাত্রেই দেবনির্ভর। ধর্মের মূল্যের, গুরুত্বের ও ধর্মে আনুগত্যের কারণ এ-ই। গোত্রীয় মানুষকে মতবাদভিত্তিক ঐক্য ও সংহতি দান করে ধর্মমত সেইদিন দুশমন ও দূরের মানুষ নিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও সম্প্রদায় গঠনের কারণ হয়েছিল এবং মনুষ্য-সভ্যতার ক্রমোন্নতি ত্বরান্বিত করেছিল। গোত্রীয় জীবনধারার অবসানের পরেও পশুপালন এবং কৃষিকার্য দুটোই সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে যৌথ প্রয়াস ও কর্ম সাপেক্ষ ছিল। জীবিকা উৎপাদন ও বণ্টন যখন জনবৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক সমতা রক্ষায় ব্যর্থ হয় তখনই শক্তিবৈষম্য ও জীবিকা সম্পদে হ্রাস-বৃদ্ধি প্রকট হয়ে ওঠে। কায়িক শক্তিতে-বুদ্ধিতে-কৌশলে ও সম্পদে যে দুর্বল সে-ই প্রবল দুর্জনের দৌরাত্ম্যের শিকার হল। জীবিকার জন্যেই বাহুবল, ধনবল, বুদ্ধিবল যার বা যাদের ছিল, তারাই অনন্যোপায় দুর্বলকে বশ বা দাস করতে পারল। দাসদের খাটিয়ে মালিকের পক্ষে তার পশুর বৃহৎ পাল পোষণ ও চাষের জমির সীমা বৃদ্ধি করা সম্ভব হল। এমনি করে ধনী আরো ধনী ও গরিবরা দাসে পরিণত হচ্ছিল; পরিণামে তা-ই সামন্ত সমাজের উদ্ভব ঘটাল। গোত্রীয় জীবনের অবসান মুহূর্তে যদি বিনিময় প্রতীক মুদ্রা চালু থাকত, তাহলে হয়তো দাস-প্রথা এমন সর্বব্যাপী ও দীর্ঘস্থায়ী হত না। কারণ সে-ক্ষেত্রে এখনকার মতো মুদ্রামূল্যেই মজুর মিলত।

ক্রমবিকাশের ধারায় যেখানে যেখানে জীবিকার সৃষ্টি ও অর্জন পদ্ধতি বৈচিত্র্য লাভ করেছিল এবং জীবনধারণে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় কিংবা স্বাচ্ছন্দ্য সামগ্রী বা বিলাস-ব্যসন বস্তু নব নব আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে বৃদ্ধি পাচ্ছিল; তখন সেই বহু ও বিচিত্র দ্রব্য ও পণ্য নির্মাণে, উৎপাদনে কিংবা অন্য প্রকার উপযোগ সৃষ্টির কাজে বর্ধিতহারে শ্রমশক্তি বিনিয়োগ আবশ্যিক হয়ে ওঠে অর্থাৎ কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বং ধোয়া-মোছা-কাটা ছাড়াও ঘর-ঘট, বাট-মাঠ-মন্দির নির্মাণ, পূজা-সিন্নি, পঠন-পাঠন, রোগ-নিদান-চিকিৎসা শুশ্রূষা প্রভৃতি হাজারোরকম প্রাত্যহিক কর্তব্য ও কাজ দেখা দিচ্ছিল। তখন দায়িত্ব ও কর্মভাগ আবশ্যিক হল। ক্রমে উচ্চ-তুচ্ছ, লঘু-গুরু, শক্ত-সহজ, কুশল-অকুশল, প্রয়োজন-বিলাস ও ক্ষয়-অর্জন ভেদে শ্রমিকেরও ধন-মান-যশ ও গুরুত্বভেদ হল, এবং পরিণামে পৃথিবীব্যাপী সর্বত্র ধর্মভেদে জাত-জন্ম-মান-বর্ণভেদ দেখা দিল। তাই দুনিয়াব্যাপী সর্বত্র মানুষের সমাজে নানা প্রকারের বৈষম্য-বিভেদ-বিরোধ-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সংঘাত-পীড়ন-পোষণ-শাসন-শোষণ আজ অবধি রয়েছে, কেবল তা কোথাও গণমানবের অজ্ঞতা-অসহায়তার দরুন গুরু, কোথাও বা নানা কারণে লঘু। সেটার আধুনিক নাম শ্রেণীদ্বন্দ্ব। সুবিধাভোগী ধনী-মানীরা স্ব-স্বার্থেই স্রষ্টা, শাস্ত্র ও সমাজের দোহাই দিয়ে সেই বৈষম্যকেই চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছে, এখনো চায়। ফলে যারা পীড়ক-শোষক তারাও যেমন এর মধ্যে অন্যায়-অবিচার দেখে না, যারা পীড়িত-শোষিত তারাও ঐ বঞ্চনা দুর্ভোগকে অদৃষ্ট বলেই মানে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এদের জীবন-মনন চিত্র স্বল্পকথায় সঠিক অভিব্যক্ত !

স্ফীতকায় অপমান

অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া, বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই যে দাঁড়ায়ে নত শিরে
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী, স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দ গতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে; নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনো মতে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

সাহিত্যও শিল্প-জীবন—শিল্প। জগৎ-পরিবেশে জীবিকা-সম্পৃক্ত এবং মনন ও অনুভবপুষ্ট জীবনের উদ্ভাস, প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুকৃতিই সাহিত্য। অতএব সাহিত্য হচ্ছে জগৎ ও জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনানুকৃতি। জীবনে যা ঘটে, যা চাওয়ার ও পাওয়ার, যা সম্ভব ও সম্ভাব্য, যা প্রাপ্য ও প্রত্যাশার, যা অনভিপ্রেত ও পরিহারযোগ্য, তার সবটাই পাই সাহিত্যে। তাই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, সম্পদ-সমস্যা, স্নেহ-প্রীতি-প্রেম, ঈর্ষা-অসূয়া-রিরংসা, লোভ-ক্ষোভ-তেজ-তিতিক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতা, রাগ-বিরাগ প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রভাবিত জীবনের চিত্রাঙ্কনই সাহিত্য কর্ম। জীবিকা-সম্পৃক্ত জীবনাচারণই তথা ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে জীবনের সার্বক্ষণিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। অন্য কথায় মনুষ্যজীবনের অর্জিত স্বভাবের সার্বিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। তবু সূক্ষ্ম, পরিস্রুত ও সুন্দর-শোভন অভিব্যক্তিকেই আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলি। কাজেই সংস্কৃতি ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে প্রকটিত জীবনেরই লাবণ্য। এই তাৎপর্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিরই প্রসূন। সাহিত্যেও সংস্কৃতিরই প্রকাশ। প্রাণধর্মের তাগিদেই জীবন সর্বক্ষণ প্রকাশ ও বিকাশপ্রবণ—নানাভাব-চিন্তা-কর্মে আচরণে জীবনের বাস্তব ও মানস অভিব্যক্তি ঘটছে। অর্থাৎ তার সৃষ্ট ভাব-জগৎ, তার আচারিক ব্যবহারিক জীবনাচরণ পদ্ধতি এবং তার নির্মিত ও ব্যবহৃত বস্তুজগৎ তার সংস্কৃতির নিদর্শন। অতএব জীবনধারণের ও উপভোগের প্রয়াসপ্রসূত মানবক্রিয়া মাত্রই সংস্কৃতি। তাই সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নীতি-আদর্শ, উৎসব-পার্বণ থেকে ব্যবহারিক জীবনের ঘর-ঘাট-হাট-বাট, তৈজস আসবাব, অশন-বসন-আসন কিংবা মানস জীবনের দারু-চারু-কারুশিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ইতিহাস-দর্শন-গণিত-বিজ্ঞান সবটাই কোনো বিশেষ দেশ-কালের ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামাজিক, সার্বিক ও সামগ্রিক সংস্কৃতি এবং যুগপৎ সাংস্কৃতিক নিদর্শন—যাকে বলা চলে বিশিষ্ট দ্বৈতাদ্বৈত। সবটাই চলমান জীবনে তার অনুভব, মনন ও ব্যবহারিক প্রয়োজনবোধের প্রসূন।

যাহোক, আমাদের সংস্কৃতির কোথাও মর্মে, কোথাও বা অবয়বে আদিম সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি ও অনুকৃত সংস্কৃতির ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। ভাব-চিন্তা-কৃতির যে অংশ হিতকর ও গৌরবের তা-ই যেমন ঐতিহ্য বলে খ্যাত, তেমনি জীবনচর্যার যে অংশ সুন্দর-শোভন ও কল্যাণকর তা-ই সংস্কৃতি, বাদবাকি কৃতি বা আচার মাত্র। এ তৌলে যাঁরা মাপেন তাঁদের কাছে জীবনচর্যার কিংবা জীবনযাত্রার সবটাই সংস্কৃতি নয়। তাঁদের সংজ্ঞায় নগরবিহীন সভ্যতাও নেই। আমাদের ধারণায় সংস্কৃতির উৎকর্ষে সভ্যতার উদ্ভব। সংস্কৃতির বস্তুগত ও মানসসম্ভূত অবদানপুষ্ট জীবনপদ্ধতির সার্বিক ও সামগ্রিক উত্তরাধিকারই সভ্যতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ২ ॥

মধ্যযুগের মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্যে বিধৃত সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন আমরা এ গ্রন্থে সংগ্রহ ও সংকলন করেছি। বিষয়ানুসারে গুচ্ছবদ্ধ করলে স্থান, কাল ও কবিগুরুত্ব হারাত, তাই সে-চেষ্টা করিনি।

কোনো দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান অতি বড় জ্ঞানী-মনীষী গবেষকের পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ সমাজ-সদস্য হলেও মানুষের ব্যক্তিক ভাব-চিন্তা-রুচি-আচরণের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য কিছুটা থাকেই এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষকে অনুকরণ করার প্রবণতা অন্য মানুষের সাধারণ স্বভাব। এতে অতি মন্থরগতিতে এবং অলক্ষ্যে সামাজিক আচার-আচরণ, প্রথা-পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান বদলায়।

বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করে জীবনরস। তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ। কখন কোন্ বিশ্বাস, সংস্কার, আদর্শ বা অভিপ্রায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন্ ভাব, চিন্তা অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তাছাড়া সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা ও আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। মানস-গড়ন, রুচি, প্রবণতা, প্রয়োজন-বুদ্ধি প্রভৃতি থেকেই জাগে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা—তাই কেউ ক্রীড়া জগতে, কেউ বাণিজ্য জগতে, কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে মানস-বিচরণ করে; কেউ কৃষি-উৎপাদনে, কেউ শিল্প উৎপাদনে হ্রাস-বৃদ্ধি-বৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামায়। কেউ সাহিত্যে, কেউ সঙ্গীতে, কেউ চিত্রকলায়, কেউ নৃত্যকলায়, কেউ সংস্কৃতিতে, কেউ নৃতত্ত্বে, কেউ সমাজতত্ত্বে, কেউ ধনবিদ্যায়, কেউ বা বিজ্ঞানে, কেউ বা দর্শনে, কেউ ইতিহাসে, কেউ গণিতে, কেউ জ্যোতির্বিদ্যায়, কেউ জীব-উদ্ভিদ বিজ্ঞানে আগ্রহী। এজন্যই কোনো ভ্রমণ বৃত্তান্তে, কোনো জীবনীগ্রন্থে, কোনো ইতিহাস গ্রন্থে কোনো দেশের বিশেষ স্থানের ও কালের জীবনযাত্রার, কর্ম ও নর্ম প্রবাহের, ধন-ধর্ম-আচার-আচরণ-সংস্কৃতির একটা সার্বিক বর্ণনা মেলে না। কেউ ধর্মের কথা, কেউ বাজার দরের কথা, কেউ খাদ্যবস্তু ও রান্নার কথা, কেউ খেলাধুলার কথা, কেউ তরুলতা-ফুল-ফল-মূলের কথা, কেউ পশুপাখির বর্ণনা, কেউ উৎসব-পার্বণের কথা, কেউ শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বর্ণনা রেখে গেছেন বা রাখেন বটে, কিন্তু দেশকালগত সামষ্টিক তথা সামাজিক জীবনধারার পূর্ণাঙ্গ চিত্র দান কোনো একক জ্ঞানী-মনীষী-পর্যটক, ঔপন্যাসিক, কাব্যকার বা ইতিবৃত্তকারের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। আল্‌বেরুনী, আবুল ফজলরা তাই চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন।

জীবনের সর্বতোমুখী চেতনা কোনো একক মানুষের চিন্তা, কর্ম কিংবা আচরণে ধরা দেয় না। এ যুগেও পরিবেশ কিংবা জীবনসচেতন কোনো মহৎ কথাশিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন জীবনের ও ঘটনার সব খবর মেলে না। মনের প্রবণতা অনুসারে তুচ্ছ ঘটনাও কারো কাছে গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষয়ও পায় অবহেলা। তাছাড়া দৃষ্টি আর বোধেও থাকে ভঙ্গি ও মাত্রাভেদ। জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে কেউ প্রত্যক্ষ করতেও পারে না। বিদ্যা-বুদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ-নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি ও বোধ নিয়ন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ নয়, সবারই রয়েছে রঙিন চশমা, আপেক্ষিক বোধ ও বিচার পদ্ধতি।

আমাদের আলোচিত পাঁচালী কাব্যগুলো মুখ্যত রাজপুত্র-রাজকন্যার কাহিনী। সে সূত্রে উজির-কোটাল-সওদাগরের কথাও কিছু রয়েছে। কৃচিৎ মালিনী-পরিচারিকার কথাও মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর অশুভ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে উপস্থিত রয়েছে দেও-দৈত্য-রাক্ষস, কৃচিৎ সাপ-বাঘ-পাখী। কারণ এ হচ্ছে সামন্ত যুগের সাহিত্য। তখনো ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে কৌতূহল জাগেনি। মনোসমীক্ষণ রীতি তখনো অজ্ঞাত। স্থূল চেতনায় আকাশচারিতাতেই চরম দার্শনিকতা ও কল্পনা-বিলাসিতা সীমিত। দেবলোক ছেড়ে সবেমাত্র মর্ত্যে নেমেছে মানবকল্পনা ও কৌতূহল। বাহ্য জাঁকই কৌতূহল জাগার আর কৌতূহল নিবৃত্তির অবলম্বন। গোত্রীয় ঐক্য, আঞ্চলিক সংহতি, ধর্মীয় একাত্মতা এবং রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দীর ভিত্তিতে সমাজ রচিত এবং জীবন নিয়ন্ত্রিত। প্রবল দুরাত্মাই শাসন-শোষণ ও পোষণ-পেষণের মালিক। তখন রাজা-শাসক-সামন্তরূপ মালিক-প্রভুর ঐশ্বর্য, সুখ, বিলাস, মান-যশ, প্রভাব, প্রতাপ, প্রতিপত্তিই শাসিত জনগণের সুখ-যশ-মান ও ঐশ্বর্যের প্রতীক ও প্রতিভূ। তাই রাজা ও রাজপুত্রই সাহিত্যে নায়ক। সে-সমাজে ছিল ছিটে-ফোঁটা কৃপাভোগী মন্ত্রিপুত্র ও সওদাগর, দুরাত্মা-দুর্বৃত্ত কোটাল আর দর্প ও দাপটপ্রবণ বিলাসী সামন্তমানস। এবং যশমান-প্রতাপলিপ্সু ভোগ-প্রিয় ছিল সে-জীবন। তাই বাহুবল, মনোবল ও বিলাস-বাঞ্ছাই সে-জীবনের আদর্শ, সংগ্রামশীলতা ও বিপদের মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠাই সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এককথায় সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই সাধারণত সামন্তযুগের সাহিত্যে পরিব্যাপ্ত।

সে-কালে সাধারণের কাছে ভবনের বাইরের ভুবন ছিল অজ্ঞাত। স্বল্প চাহিদার অজ্ঞ মানুষের গ্রামীণ জীবন ছিল স্বনির্ভরতার প্রতীক। কুয়োর মাছের মতোই সঙ্কীর্ণ পরিসরে তাদের কায়িক জীবন হত আবর্তিত। নানা সূত্রে শোনা যেত মহাসমুদ্রের কল্লোল ও তার তটস্থ দিগন্ত পারের পৃথিবীর কথাও। কল্পভ্রমণে মিটিয়ে নিত বিশাল পৃথিবী পরিভ্রমণের সাধ। তাই অলৌকিক অস্বাভাবিক-ভৌতিক-দৈবিক চেতনাই ছিল তাদের সম্বল। ঝঞ্ঝা-সংকুল সমুদ্রই ছিল দূর-যাত্রার একমাত্র পথ। ডাক কিংবা তার-বেতারের ব্যবস্থাও ছিল না। তাই স্বপ্ন, ছবি ও পক্ষীর দৌত্যে জাগত পৃথিবীর নাম-না-জানা প্রান্তের রাজকন্যার প্রতি প্রেম। তাই যাদুতে ও দৈবশক্তিতে আস্থা রাখতেই হয়েছে, দৈত্য-রাক্ষস যেমন হয়েছে অরি, তেমনি কখনো কখনো পশু-পাখী হয়েছে নায়কের সহায়। প্রকৃতির সঙ্গে মননের ও হৃদয়ের যোগ হয়েছে ঘনিষ্ঠ।

সে-যুগে কিছুই সহজে পরিবর্তিত হত না। যান্ত্রিক যান-বাহনের অভাবে তখনো পৃথিবীর আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ঘোচেনি। বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মানুষের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ তখন সহজে গড়ে উঠত না। তাই নতুন ভাব-চিন্তা-কর্ম কিংবা বস্তুর আবিষ্কার বা উপযোগ উদ্ভাবন ছিল মন্থর। জ্ঞান-বিদ্যা-মননেরও এমন বিচিত্র ও বহুধা বিকাশ-বিস্তার হত না। তাই পাঁচশ বছরেও সমাজে আচারে চিন্তায় কিংবা ব্যবহার সামগ্রীর লক্ষণীয় পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। শাস্ত্র-শাসিত জীবনে-সমাজে স্বাধীন চিন্তার অবাধ সুযোগ ছিল না, সমাজানুগত্যও ছিল ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যতামূলক। ফলে শাস্ত্রীয় ও সামাজিক শাসনের কঠোরতা সমাজ-চিন্তা ও আচারকে রেখেছিল স্থিতিশীল তথা গতিহীন ও অপরিবর্তিত। এজন্য কালিক ব্যবধানে সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে পার্থক্য দেখা যেত সামান্য।

যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা ছিল না বলে একই দেশে অভিন্ন শাস্ত্রীয় সমাজের মধ্যেও অঞ্চলভেদে সামাজিক-সাংস্কারিক-আচারিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকত। যন্ত্রযানের বদৌলতে এ যুগে পৃথিবী অখণ্ড, সংহত ও ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। পৃথিবীব্যাপী মানুষ পারস্পরিক অনুকৃতির মাধ্যমে অথবা উন্নতদের অনুকৃতির ফলে ঘরোয়া জীবনযাত্রার তৈজসে-আসবাবে, আহার্যে-আচারে, অস্ত্রে-বস্ত্রে, প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও সামাজিক আদব-কায়দায় প্রায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া ভাব-চিন্তা-আদর্শে, বিদ্যা-বিজ্ঞানে, কৃৎকৌশলে ও যন্ত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মানুষ আজ স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-যুগেও অবশ্য স্বল্পমাত্রার বাণিজ্যিক, পরাক্রান্ত জাতির সাম্রাজ্যিক এবং শাস্ত্রীয় সম্পর্ক বিভিন্ন দূরাঞ্চলের মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠত। সে-সূত্রে বিদেশী বিজাতি বিভাষী বিধর্মীর সাংস্কৃতিক, ভাষিক, প্রশাসনিক ও আচারিক প্রভাব স্বীকার করতেই হত। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের বিকাশ ছিল না বলে সে-প্রভাব এ-কালের পর-প্রভাবের মতো তেমন ত্বরায় প্রকট হয়ে উঠত না—সর্বজনীন বা সর্বব্যাপীও হত না।

॥ ৩ ॥

এ-কারণেই দেশজ মুসলমানের মধ্যে বৌদ্ধ-হিন্দু পিতৃপুরুষের আচার-সংস্কার, রীতি-রেওয়াজ, তত্ত্ব-চেতনা ও মনন-ধারা থেকে গিয়েছিল। নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষ সূফী-দরবেশের ব্যক্তিত্ব ও কেরামত প্রভাবে ইসলামে দীক্ষিত হল বটে কিন্তু প্রতিবেশ ছিল প্রতিকূল। শাস্ত্রটি ছিল দূরদেশের এবং অবোধ্য ভাষায়। তার আচারিক কিংবা তাত্ত্বিক আবহ ছিল না এদেশে। তাই ব্যবহারিক ও মানস-চর্যায় বৌদ্ধ-হিন্দুর আচার-সংস্কারই রইল প্রবল। দেশী মুসলমানের এই ধর্মাচরণকে বুঝবার সুবিধের জন্যে বিদ্বানেরা চিহ্নিত করেছেন 'লৌকিক ইসলাম' নামে। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম বাঙালী নির্বিশেষের মর্মমূলে রয়েছে সেই ঐতিহ্যিক কায়াসাধন তত্ত্ব। যোগ-তান্ত্রিক বামাচারী কিংবা বামাবর্জিত সাধনা বাঙালীর মজ্জাগত ধর্মসাধনা। রজঃ-বীর্য সংযত, ধারণ ও উর্ধ্বায়ন করেই চলে সাধনা। কৃষ্ণের কালীয় নাগ দমনও ঐ কাল কামবিষ দমনেরই রূপক। চন্দ্রাবলীর সর্পদংশনও ঐ কামবিষের প্রতীক।

এ সূত্রে এ-ও উল্লেখ্য যে সংখ্যালঘু মানুষ শাসক, সামন্ত কিংবা প্রভু হলেও সামাজিক-বৈষয়িক জীবনে সংখ্যাগুরুর প্রভাব এড়াতে পারে না। সংখ্যালঘু যে আচারে-সংস্কারে, রুচি-সংস্কৃতিতে কিংবা ভাষায় স্বাতন্ত্র্য ও স্ববৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পারে না, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতের শাসক তুর্কি-মুঘলের (প্রথম যুগের ইংরেজদেরও) জীবনে। সংখ্যাগুরুদের প্রভাবে তারা তাদের ভাষা, খাদ্য, আচার-সংস্কার ও জীবন-ধারণ পদ্ধতির প্রায় সবই হারিয়েছিল। অবশ্য প্রভুকে অনুকরণ করার শাসিতসুলভ হীনম্মন্যতা-প্রসূত আগ্রহের ফলে শাসকদেরও খাদ্যের, পোশাকের ও দরবারি ভাষার এবং বস্তুসংলগ্ন ও মানস-সম্ভূত সংস্কৃতিও কিছুটা রয়ে গেল।

দৈশিক প্রতিবেশে দেশজ মুসলমান মাতৃভাষায় দৈশিক রীতি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অনুসরণে সাহিত্য-চর্চা করেছেন; এজন্যে তাদের রচনায় দেশী আবহই বিশেষ করে বর্তমান। আগেই বলেছি, যে-ধর্মশাস্ত্রের তারা অনুসারী, তাতে পুরো আনুগত্য রক্ষা করার মতো সে-শাস্ত্র জানা-বোঝা বা শোনার সুযোগ-সুবিধে তাদের ছিল না। তাই স্বশাস্ত্রীয় অপূর্ণ জ্ঞানের শূন্যতা পূরণ করেছে তারা দেশী বৌদ্ধ-হিন্দু সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র, দেহতত্ত্ব, রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ কাহিনী ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দিয়ে। ফলে মুসলিম শাস্ত্রকথায়ও দেশী পুরাণ ও সংস্কারের প্রভাব পড়েছে। আর মুসলিম অধ্যাত্মতত্ত্বে ও মারফত-মরমীয়া সাধনায় যোগতন্ত্র ও বাউল প্রভাব প্রকট। তাছাড়া বৌদ্ধ গুরুবাদ তথা পীরবাদ, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশ্বরবাদও নির্দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে। তাই বৌদ্ধ-হিন্দু বিষয়ভিত্তিক [নাথ-সাহিত্য, গোরক্ষবিজয়, হরগৌরীসম্বাদ, রাধাকৃষ্ণ, যোগতত্ত্ব] সাহিত্য-রচনায় কিংবা অধ্যাত্মতত্ত্ব বর্ণনায় মুসলিম তাত্ত্বিক-দার্শনিক-অধ্যাত্মবাদীর উৎসাহ লক্ষণীয়।

মুসলিম-রচিত বাঙলা সাহিত্যের প্রায় সবটাই হিন্দি-আওধি-ফারসি-আরবি গ্রন্থের কায়িক, ছায়িক বা ভাবিক অনুবাদ। অনুবাদকরা সর্বত্র ইচ্ছেমতো গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজনের স্বাধীনতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করেছেন। প্রণয়োপাখ্যানগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিম কাহিনী হলেও মুসলিম কবির নীতিবোধের বা সামাজিক রীতির পরিপন্থী ছিল না। দেবপূজাদির কথা ছাড়া অন্য ব্যাপারে রীতি-নীতি ও সংস্কারে হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্য ছিল না হয়তো। বিদেশী-বিভাষা থেকে অনুবাদ হলেও নৈতিক সামাজিক আচার-আচরণে দৈশিক আবহ ও সংস্কার রক্ষিত হয়েছে। আবার হিন্দু নায়ক-নায়িকার কাহিনী বর্ণনায় কবি অজ্ঞাতে মুসলিম রীতি-নীতির প্রয়োগ করেছেন, কিংবা সুদূর অতীতের প্রথা প্রয়োগ করেছেন—যেমন লোকরাজ কর্তৃক বামন-বউ চন্দ্রাণীহরণ ও স্ত্রীরূপে গ্রহণ।

এখনকার দিনে শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-সুরুচি, দেশপ্রেম, মানবপ্রীতি, মানবতা, সুনাগরিকতা প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের বিবেকবুদ্ধি, নীতিরোধ ও সদাচারবোধ জাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়, নিয়ন্ত্রিত হয় নৈতিক চরিত্র।

সে-যুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের নৈতিক চেতনার মুখ্য উৎসও ছিল ধর্মবিধি ও শাস্ত্রানুশাসন। ফলে নৈতিক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্যে রচিত হত সাহিত্য। নীতিকথা নিরপেক্ষ কাব্য-উপাখ্যান কিংবা শাস্ত্র নিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচনা ছিল বিরল প্রয়াসে সীমিত। অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্য-শ্লোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন তত্ত্ব কথা বা জ্ঞানগর্ভ বাণী ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রেরই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এগুলোও ছিল ধর্ম-শাস্ত্রের মতো অদৃশ্য অপার্থিব বিশ্বাস-সংস্কারের প্রলেপে আবৃত।

পূর্ব-পুরুষের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক বাঙালি মুসলিমরা আল্লাহর পরিভাষা হিসেবে ধর্ম (সগীর ও দৌলত উজীরের কাব্যে), নাথ, নিরঞ্জন এবং হিন্দু ঐতিহ্যের প্রভাবে করতার (কর্তার) ব্যবহার করেছেন। আরবের আল্লাহ ইরানে হয়েছেন 'খুদা' এবং ইসলামের মৌলিক তত্ত্বপ্রতীক শব্দগুলোও ইরানি রূপান্তর পেয়েছে। ফলে সালাৎ, সিয়াম, মলক, জান্নাৎ, জাহান্নাম, নবী-রসুল যথাক্রমে নামাজ , রোজা, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, পয়গাম্বর হয়েছে। ফারসি দরবারি ভাষা ছিল বলেই তার প্রভাবে ক্রমে ফারসি প্রতিশব্দগুলো জনপ্রিয় হয় মুসলিম সমাজে। দেশজ মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙলায়ও সংস্কারে-বিশ্বাসে, ঐতিহ্যে ও পুরাণে গড়ে উঠেছে দেশী শব্দের বাকপ্রতিমা। তাই মুসলিম রচিত সাহিত্যের ভাষায়-ভঙ্গিতে উপমাদি-অলঙ্কারে, বাকপ্রতিমা নির্মাণে মুখ্যত দেশী উপাদান-উপকরণ, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিই বক্তব্য প্রকাশের বাহন হয়েছে।

॥ ৪ ॥

প্রেম সম্পর্কে ইসলামে তেমন কোনো স্পষ্ট শাস্ত্রীয় নির্দেশ নেই। মুসলিম কবি প্রণয়কাহিনী রচনা করতে গিয়ে রূপজ প্রেম তথা দর্শন-শ্রবণজাত পূর্বরাগ-অনুরাগ দিয়ে বর্ণনা শুরু করেছেন; মিলনের পথে দুস্তর বাধাই স্মরণ-চিন্তন মাধ্যমে প্রেমাকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য, বিরহবোধ গভীর ও মিলনপ্রয়াস তীব্র করে তুলেছে। অবশেষে নায়ক-নায়িকার যখন গোপন মিলন হচ্ছে তখন সঙ্গম বা রমণ ছাড়া চুম্বন আলিঙ্গনাদি বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে (আবদুন নবীর 'আমীর হামজা' কাব্য)। কাজেই পরপুরুষ কর্তৃক দেহ-স্পর্শ মাত্র নারীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ার মতো রামায়ণী সঙ্কীর্ণতাকে এঁরা প্রশ্রয় দেননি। কেবল মৈথুনেই, অথাৎ রতিরমণেই সতীত্ব নষ্ট হয়—এ-ই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। অমুসলিম নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে সত্য-সাক্ষী করে মালা বদল করলেই গান্ধর্ব বিয়ে হয়ে যায়। অবশ্য সতীত্ব দেহে কিংবা মনে তা' আজো তত্ত্বের ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে নির্ণিত হয়নি। নারীর সতীত্ব যে পুরুষ-ভোগ্য বস্তুর ধারণা থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের একাধিপত্যের বা একক-পুরুষ নিষ্ঠারই সামাজিক স্বীকৃতিমাত্র—তার বেশি কিছু নয়, বড়জোর সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আরোপ করার জন্য পিতৃত্ব নির্দিষ্ট রাখার প্রয়োজনপ্রসূত, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার গরজে এ সত্য কখনো স্বীকৃতি পায় না। যদিও প্লেটো থেকে কার্ল মার্কস অবধি অনেকেই বিয়ের তথা সতীত্বের গুরুত্ব স্বীকার করেননি। পুরাণে মহাভারতেও সতীত্বের এমন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কোনো কোনো বুনো সমাজে অন্তত পার্বণিক উৎসবে মা-মেয়ে প্রভৃতি কিছু রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়া ব্যতীত যে-কোনো নারীর সঙ্গে সঙ্গম করা শাস্ত্র ও সমাজসম্মত রীতি। একে 'গণ-সঙ্গম' পার্বণও বলা চলে। পুরাণে মহাভারতে ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক, বিরোচন প্রভৃতির উক্তিতে ও কাহিনীতে বোঝা যায় পরস্ত্রী সম্ভোগ একসময় সামাজিক সদাচার বহির্ভূত ছিল না।

॥ ৫ ॥

দুনিয়ার সব আদিম মনুষ্য-সমাজে জীবন-জীবিকার ও নিরাপত্তার অবলম্বন ছিল যাদু-বিশ্বাস। যাদু ঐন্দ্রজালিক শক্তির জনক। মন্ত্রেই তার আবাহন। আনুষঙ্গিক কিছু মুদ্রাভঙ্গি ও উপচারও থাকে। এই আদিম বিশ্বাস-সংস্কার আজো উন্নত সভ্যতা ও উঁচু সংস্কৃতির স্রষ্টা ও ধারক-বাহকদের মধ্যেও অবিরল রয়ে গেছে। ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জীন-পরী প্রভৃতি মন্দশক্তির প্রতীক আজো শঙ্কা-ত্রাসের কারণ হয়ে সাধারণ মানুষের মনোলোকে বেঁচে-বর্তে রয়েছে।

বৌদ্ধ প্রাবল্যের যুগে অলৌকিক শক্তিধর সিদ্ধপুরুষ ও নারী ডাক-ডাকিনী, যোগী-যোগিনীর প্রভাবে এ বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার গভীর ও ব্যাপক হয়। বৈদিক মন্ত্র কিংবা যজ্ঞও ঐ যাদুনির্ভর—ঐন্দ্রজালিক শক্তির উদ্বোধনই লক্ষ্য। এসব যাদু-মন্ত্র-প্রসূত তুক-তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-উচাটন, বাণ-ফোঁড়, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতি মঙ্গোল গোত্রীয়দের প্রভাবে বহু ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। ডাকিনী-যোগিনীর সঙ্গে কামরূপ-কামাখ্যার সম্পর্ক ও ঐতিহ্য এভাবেই গড়ে উঠেছে এবং লোকস্মৃতিতে তা আজো অম্লান। তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচারও তিব্বতী-চীনা মঙ্গোলীয়দের দান। তুক-তাক-মন্ত্রের জগৎ একটি দুর্ভেদ্য রহস্যলোক। মানুষকে মারা-বাঁচানো ছাড়াও মানুষের জন্ম-মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ থেকে মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম-আধি-ব্যাধি, রূপান্তর-দেহান্তর, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিসরে দৃশ্যে বা অদৃশ্যে বিচরণ অবধি সার্বিক জীবন-নিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখে ঐ যোগসিদ্ধি বা কায়াসিদ্ধি। গোরক্ষবিজয়ে ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদের গানে এই চৌরাশি আঙুল পরিমিত দেহ-সাধনায় সিদ্ধ 'চৌরাশিসিদ্ধা'য় তথা কায়াসাধক বৌদ্ধ নাথ-সহজিয়াদের কেরামতির কথাই বিবৃত হয়েছে।

আধুনিক প্রতীচ্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ও ঔষধ এদেশে চালু হবার আগে সেই আদিম বা বুনো মানুষের মতো এদেশী মানুষও রোগমাত্রকেই দৈব-নিগ্রহের কিংবা অরি-অপদেবতার কুনজর বলেই বিশ্বাস করত। বিশেষ করে যে-সব রোগের নিদান ছিল না, সেগুলো সম্পর্কে বদ্ধমূল ছিল এ ধারণা। দেশী কলেরা-বসন্ত-প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর তো বটেই, আয়ুর্বেদে তথা দেশী চিকিৎসা শাস্ত্রে কিংবা ইউনানী তিব্বিয়ায় সব রোগের চিকিৎসা-নিদান ছিল না, আজকালের মতো আশু উপশম দানের ব্যবস্থাও ছিল স্বপ্ন। দ্রব্যগুণ-নির্ভর টোটকা চিকিৎসাই ছিল বাস্তব ব্যবস্থা। কাজেই কলেরা-বসন্ত-শিশুরোগ প্রভৃতির জন্যে ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী প্রভৃতি অপদেবতা তো ছিলই, অন্য অনেক দুরন্ত দুশ্চিকিৎস্য অনির্ণীত অনির্দেশ্য রোগমুক্তির জন্যে ঐসব মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়-ফুঁক, পানিপড়া, তাবিজ-কবজ, পূজা-সিন্নি, মানত-ধর্ণা, বলি-সদ্‌কা, কাঙাল-মিসকিন-ভোজন প্রভৃতিই ছিল ভরসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই তুক-তাক, দারু-টোনা, তন্ত্র-মন্ত্র, উচাটন-বশীকরণ, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজে মানুষের আস্থা ছিল প্রবল, ভরসা ছিল অপরিমেয়। সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে কিংবা ময়নামতীর গানে দেখি মন্ত্রবলে মানুষ ইচ্ছেমতো কীট, মাছি, পশু, পাখি, সাপ, ব্যাঙ সবকিছুতে রূপান্তরিত হতে পারত, অপর মানুষের রূপ গ্রহণ করে আত্মগোপন কিংবা ছলনা করতেও ছিল না কোনো বাধা। এমনকি মন্ত্রবলে দর্পণে নারী সৃষ্টি করা, মৃতে ও জড়বস্তুতে প্রাণ-সঞ্চার করা, অন্য মানুষের ওপর অদৃশ্যে 'ভর' করা প্রভৃতি সহজ ছিল। 'পরঘট সঞ্চারিতে আক্ষি মন্ত্র জানি' (সত্যকলিবিবাদ)। তবে এসব ছিল যোগ-তান্ত্রিক কায়াসাধন সাপেক্ষ—ভূতসিদ্ধি, খেচরসিদ্ধি, কায়াসিদ্ধি প্রভৃতি ছিল কঠোর সাধনা লভ্য।

মন্ত্রবলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধগতি। যুদ্ধে অস্ত্র জোড়ার সময়েও মন্ত্রপূত অস্ত্রের লক্ষ্য হত অমোঘ। 'নানামন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রবাণ' (সত্যকলি)। রামায়ণ-মহাভারতেও আমরা অগ্নি-বায়ু-সর্প-চন্দ্র প্রভৃতি বহু বিচিত্র বাণের ব্যবহার দেখি। ভূত-প্রেত-জীন-পরী-দেও-দানুর প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস ছিল অবিচল। ভূত-প্রেত-দেও-দানব-জীন-পরী ছাড়াবার তাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিধ, তাতে অমানবিক নির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হত। তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-স্বস্ত্যয়ন, দোয়া-কোরআনখানী, পূজা-সিন্নি, দান-সদকা, বলি-কুরবানী অনুষ্ঠানেও ধূপ-ধুনো-লোবান, সোনা-রুপা-লোহা প্রভৃতির ধোয়া-জলে ও লোহা ধারণে ছিল অপ-দেবতার হামলাভীত মানুষের নির্ভর ও ভরসা। এমনি হাজারো ঘরোয়া, নৈতিক ও সামাজিক কুসংস্কার নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের ভাব-কর্ম-আচরণ। এগুলো যে নিরাপত্তাকামী আদি মানব-গোষ্ঠীর ভয়-বিস্ময়-কল্পনাপ্রসূত যাদু-বিশ্বাস ও আচারের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত সংস্কার ও রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনি রূপান্তরে আদিম বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার দুনিয়ার সভ্যতম সমাজেও জগদ্দল হয়ে আজো টিকে আছে।

নানা শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মে ছাড়াও গৃহ-নির্মাণে ও গৃহ-প্রবেশে, স্নানে, বিশেষ করে পার্বণিক স্নানে, নববস্ত্র পরিধানে কিংবা পরিহার কালে মাস-দিন-ক্ষণ-গ্রহ-নক্ষত্র-রাশি নির্ভর শুভাশুভ জানতে ও মানতে হত, এখনো হয়। অনেক রোগই ভূত-প্রেত-দেও-দানু-জীন-পরীর কুদৃষ্টির ফল, তাই রোগ এড়ানোর জন্যেও কথায় , কাজে, চলায়-ফেরায়, কালাকাল মানতে হয়। মুহম্মদ খানের 'সত্যকলিবিবাদ সম্বাদে', আলাউলের 'তোহফা'য়, মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবার্তায়' এবং আরো অনেক গ্রন্থে প্রাসঙ্গিকভাবে গ্রহ-নক্ষত্র-রাশির প্রভাব কিংবা অপদেবতার অপদৃষ্টি বা কুনজরের লক্ষণ, নিদান, এবং তা এড়ানোর উপায় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

যেমন শ্রাবণ-ভাদ্রে নতুন ঘর করলে সে-ঘর সর্বদা রোগ, শোক, আপদে আকীর্ণ থাকে। স্পষ্টত বর্ষাকালে নির্মিত ঘর স্যাঁতসেঁতে হবে এবং তজ্জাত রোগও অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আশ্বিনেও ঝঞ্ঝা-বন্যার আশঙ্কার সঙ্গে গৃহ-উপকরণও দুর্লভ-দুর্মূল্য হবে।

সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার স্নান করলে ধন বাড়ে। শুক্রবারে স্নানও উত্তম। মঙ্গলবারে স্নান করলে আয়ু কমে এবং দুশ্চিন্তা বাড়ে। গাছতলায় দিগম্বর মানে নেংটা হলে রোববারে রোগে ধরে এবং মানুষের কুদৃষ্টি পড়লে কিংবা ভূতে ভর করলে হাঁস বা ছাগল দান করে আরোগ্য লাভ করা যায়। বুধবারে যে-রোগের শুরু তা থেকে আরোগ্যের উপায় হচ্ছে কালো মুরগি দান। ভূতদৃষ্টিজাত রোগের নিরাময়ের জন্যে ছাগ-বৃষ দান করতে হয়। অশ্বের কপালের লোম পুড়ে ধূঁয়া দিলে ও ময়ূরের পুচ্ছ নিয়ে তালপাতা বা ছাতার মতো ধরলে দেও-এ ভর করা মানুষ নিষ্কৃতি পায়। হিঙ্গুল, কস্তুরী, শস্যধূম, জতুর গুঁড়ো, কালো-মাটি, গাভীর হাড়, মাছের পিত্ত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদ্রা, চিলের মাংস, প্যাঁচার নখ, কালো বিড়াল ও কালো মুরগীর বিষ্ঠা, গন্ধক প্রভৃতিও বিভিন্ন চিকিৎসার উপকরণ। শুক্রবারে নববস্ত্র পরিধান এবং রোববারেই নববস্ত্র ছেঁড়া বিধেয়।

বিবাহ ও অন্য পুণ্য কর্ম শুক্রবারে, শনিবারে মৃগয়া, রোরবারে গৃহনির্মাণ, বাণিজ্যোদ্দেশে শনিবারে বিদেশ যাত্রাই শুভ আর যুদ্ধ মঙ্গলবারে শুরু করাই ভালো।

॥ ৬ ॥

আগেই বলেছি, সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রই তৈরি করেছে বাঙালির অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তি। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ, হিন্দু কিংবা মুসলিমে ভেদ মতগত নয়, আচার-পদ্ধতিগত। সবাই দেহসাধনায় আস্থা রাখে। দেহতত্ত্ব সবারই অবশ্য জ্ঞেয়। নির্বাণকামী বিকৃত বৌদ্ধদের দেহবাদ, ঈশ্বরবাদী হিন্দু-মুসলিমে দেহাত্মবাদে রূপান্তর পেয়েছে। বৈরাগ্য-সন্ন্যাসের ঐতিহ্য আরো পুরনো, নাস্তিক আজীবিক, জৈন শ্রাবক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বজ্রযানী-সহজযানী-তান্ত্রিক-কাপালিক-বীরা-চারী-বীভৎসাচারী-চীনাচারী নানা তান্ত্রিক-ব্রহ্মচারী, যোগী-সন্ন্যাসী বৈষ্ণব-সহজিয়া-বাউল-বৈরাগী আকীর্ণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙলায় যোগীর আদর-কদর ছিল অসামান্য। বৈরাগ্যে, সেবায়, সততায়, সুচিকিৎসায়, অলৌকিক শক্তিধর সাধনসিদ্ধ নির্গৃহ যোগী ছিল লোকচক্ষে আদর্শ মানুষ। বাঙলা সাহিত্যের গোড়া থেকে রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক অবধি আমরা এজন্যেই বিশ্বাস, ভরসা ও নির্ভর করবার মতো আদর্শ-চরিত্র মানুষ হিসেবে পাই কেবল যোগী সন্ন্যাসীকেই। ঘর-সংসার করেও বৈষয়িক মানুষ যে আদর্শনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ, সত্যসন্ধ ও ত্যাগপ্রবণ হতে পারে, তা যেন আমাদের দেশের মানুষের কাছে সুপ্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি অজ্ঞাত। তাই আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যে (বঙ্কিমসাহিত্য অবধি) পরহিতব্রতী উপচিকীর্ষু, ঈর্ষা-অসূয়ামুক্ত, সেবা-সততা-ত্যাগ-তিতিক্ষাসুন্দর মানুষ মাত্রই যোগী-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী। তাই সাধু আমাদের চেতনায় বেনে নয়, সন্ন্যাসী। সংসারী বিষয়ী মানুষের সততায় ও মনুষ্যত্বে এদেশের মানুষ চিরকাল এমন আস্থাহীন যে, এদেশে রাজনীতির নেতা হতেও বৈরাগ্যের ভাণ ও ভেক দরকার।

গায়ে ছাই, কানে কড়ি, গলে মালা, হাতে নড়ি ও খাপর, কাঁধে কাঁথা ও ঝুলি—এমন যোগীর সাক্ষাৎ মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সাহিত্যের সর্বত্র মেলে। বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলিমের মারফত-সাধনায়ও যোগ ও যোগ-পন্থাই হয়েছে অবলম্বন। শাহ শরফুদ্দীন বুআলি কলন্দর, গউস গোয়ালিয়র থেকে সৈয়দ সুলতান, ফয়জুল্লাহ, হাজী মুহম্মদ, শেখ চাঁন্দ, আবদুল হাকিম, আলি রজা প্রমুখ সবাই যোগভিত্তিক সূফী সাধনাতেই আস্থা রেখেছেন। এ সাধনাতত্ত্বের প্রাপ্ত উৎস হচ্ছে ভোজবর্মণ রচিত 'অমৃতকুণ্ড'। 'বাঙলার সূফী সাহিত্য' গ্রন্থে এসব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের 'নবীবংশ' প্রণেতা পীর মীর সৈয়দ সুলতান বলেছেন। 'হযরত মুহম্মদ ও উমর যোগপন্থ শিখাইলা, শিখাইলা জ্ঞান।' কিংবা 'ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা।' এই-ই হচ্ছে নবী ও খলিফা প্রচারিত ইসলাম! মারফত ও মরমীয়া সাধনার ক্ষেত্রে সূফীবাদের আবরণে মুসলমানরা সাংখ্যতন্ত্র ও যোগতত্ত্ব বরণ করলেও কিন্তু তারা সচেতনভাবে পৌত্তলিকতাবিরোধী ও বিদ্বেষী। যদিও হজব্রত উদ্‌যাপনকালে কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ (তো'য়াব) করা, পাথর চুম্বন করা, অদৃশ্য শয়তানের প্রতি পাথর ছোড়া, হযরত হাজরার স্মৃতির সম্মানে ছুটো-ছুটির অভিনয় করা প্রভৃতি মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য এবং গুরুজনে কদমবুসি, পীর-পূজা, দরগাহ জেয়ারত ও কবর সালাম করা, খিজির কিংবা সত্যপীরে সিন্নিদান, ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী-বনবিবি ও হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত জলে-ডাঙায় হাঙর-কুমির-সাপ-বাঘ-হাতী প্রভৃতিকে অরি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবতা জ্ঞানে মান-মানতে বশ করা প্রভৃতি তাদের অনেকেরই জীবনাচরণের অঙ্গ, তবু এসব তাদের চোখে পৌত্তলিকতা নয়। এসব সংস্কার-বিশ্বাস-আচার মিলে বাঙালী মুসলমানের আচরণীয় মুসলমান ধর্ম বা লৌকিক ইসলামের উদ্ভব।

॥ ৭ ॥

বিবাহে পণ-প্রথা চালু ছিল; হিন্দু সমাজে বরপণ এবং মুসলমান সমাজে ছিল কন্যাপণ। বাল্যবিবাহ জনপ্রিয় ছিল। ধনীরা সাধারণত বহুপত্নীক এবং গরিবেরা একপত্নীক থাকত। নজর, শিকলি, যৌতুক দানও সামাজিক রেওয়াজের আবশ্যিক অঙ্গ ছিল। পণ ও নির্ধারিত অলঙ্কার প্রভৃতির দেনা-পাওনার ব্যাপারে অভাবে কিংবা স্বভাবদোষে পারস্পরিক প্রতারণার ঘটনা বিরল নয়, সুলভই ছিল। তাই বিয়ের আসরে ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি, বিয়ে-ভাঙা প্রভৃতি প্রায়ই ঘটত। বিয়ের প্রস্তাব-পয়গাম পাঠানো থেকে বিয়ের পরের কয়দিনও উভয় পক্ষের মধ্যে ভোজ-উৎসব চলত নানা অজুহাতে, যেমন ঘর-বাড়ি দেখা, বর-কনে দেখা, পাকাকথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ের ভোজ, কনে-ভোজ, বর-ভোজ প্রভৃতি। বিবাহোৎসবে বা খৎনা, কান-ফোড়ন, আকিকা, অন্ন-প্রাশন, নাম-রাখা, গায়ে হলুদ ও হাতে-মেহদি প্রভৃতিতে বাদ্য-বাজি, নাচ-গান, আবির-ফাগু, সোহাগ, কেশর-অগুরু-চুয়া, আতর, রঙ মাখা-ছোড়া, কাদা-ছোড়া, মেয়েলী নাচগান, পুতুল নাচ, যাদুকরের খেলা প্রভৃতির ব্যবস্থা আর্থিক সাচ্ছল্যানুসারে থাকতই।

ঘরজামাই বরের বা শ্বশুর ঘরে বউয়ের তেমন কোনো মর্যাদা ছিল না। বিশেষ করে মেয়েদের বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুর বাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি বা সংসার থাকত না। বধূর উপর পীড়ন-আশঙ্কায় বিবাহিতা মেয়ের মা-বাপ-ভাই-বোন সবসময় বর-পরিবারের সঙ্গে তোয়াজের ভাষায় ব্যবহার করত অর্থাৎ বরপক্ষের মন যুগিয়ে চলতে হত তাদের। কন্যার পিতা হিসেবে এক্ষেত্রে রাজা ও ভিখারীর মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। 'পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে' —এটি শিশু বালিকারাও জানত-বুঝত, পুতুল খেলায় তা ছিল সুপ্রকট। পুরুষ-প্রধান সমাজে নারী ছিল নর-পোষ্য, তাই অসহায় ও স্বাধীনসত্ত্বাবিহীন। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর, মাতারূপে সন্তানের আশ্রয়ে ও অভিভাবকত্বে জীবন কাটে তার। একারণেই হয়তো অপরিচিত মনিব বাড়ির বালক-ভৃত্যের মতো পরকে আপন করার, অনাত্মীয় নিয়ে ঘর করার, এবং নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর, স্বভাবের ঐশ্বর্য ও মানস প্রস্তুতি থাকে তার বালিকা বয়স থেকেই। স্বয়ম্বরের কাল তখন অপগত বটে, কিন্তু জামাতা (গদা-মালিকা দ্রষ্টব্য) নির্বাচন কালে তার শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা প্রভৃতির পরীক্ষা হত। অশিক্ষিতের মধ্যে হত হেঁয়ালি-ধাঁধা দিয়ে। বর-ঠকানো নানা হেঁয়ালি তখন খুব চালু ছিল। বিয়ের সময় দিন-ক্ষণ-তিথি-লগ্ন মানা হত। বিবাহানুষ্ঠানের জন্যে সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি হত, কলাগাছ পোঁতা হত, আমের ডাল জলপূর্ণ মঙ্গলঘট তথা কলসির মুখে বসানো হত। উপরে থাকত চাঁদোয়া—এই আচ্ছাদনের অপর নাম আলাম বা ছত্র। মেঝেয় আলপনা আঁকা হত। ঐ মঞ্চের নাম ছিল মারোয়া। এর মধ্যেই বর-কনের চারিচোখের মিলন হত। দুইপক্ষের সখী-বন্ধু-আত্মীয়রা তখন হর্ষধ্বনি ও শুভ কামনার সঙ্গে ঠাট্টা-মস্কারা ও নানা রঙ্গরস করত। এর নাম জুলুয়া বা জোলুয়া (জলুস?)। 'জলুয়া দিলেন্ত দীয়া (দীপ) করি হুড়াহুড়ি'। বর-কনের মধ্যে তখন পাশাদি ক্রীড়া চলত। বর-কনে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষরূপে ফুলের স্তবক দিয়ে ছোড়া-লোফা খেলাও খেলত। পদাবলির সেই 'ফুলের গেরুয়া (স্তবক) সঘনে লোফএ' ক্রীড়াও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরকমেরই। এ খেলার নাম ছিল গেরুয়া খেলা। এ যেন বিবাহোত্তর Courtship। শরম সঙ্কোচ ভাঙার জন্যেই হয়তো এ ব্যবস্থা। [কবি আইনুদ্দীনের গেরুয়া খেলা দ্রষ্টব্য]। বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা থাকত। এর নাম 'গস্‌ত্ ফিরানো।' নিরক্ষর গরিব মুসলিম ধুতি পরেই বর সাজত। অন্যদের তখনো বর-পোশাক ছিল ইজার-পাগড়ি, তাঞ্জাম-চৌদোল ও শিবিকা বা পালকিই ছিল বর-কনের বাহন।

সাধারণের বিয়েতে মেয়ে মহলে বাঁদীশ্রেণীর ভাড়া-করা নারী কিংবা গৃহস্থ ঘরের বৌ-ঝিরা নাচ-গান করত। ধনীগৃহে উৎসব কালে নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে বেশ্যা আনা হত। বেশ্যারা সমাজে খুব ঘৃণ্য ছিল না। 'বাইজী' সম্বোধন ও পরিচিতির মধ্যেই রয়েছে সামাজিক স্বীকৃতির আভাস। তাছাড়া ধনী-লোকের 'নজরী' রূপে দাসীসম্ভোগ ও উপপত্নী রাখা নিন্দার কিংবা অগৌরবের ছিল না।

বিবাহাদি অনুষ্ঠানে নানা রীতি-রেওয়াজ ও আচার-সংস্কার রয়েছে। কালো অস্ট্রিকরা হলুদ মেখে স্নান করে গাত্রবর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে। আলপনা-আঁকা কুলা বা ডালায় ধান, দূর্বা, দীপ, হলুদ ও জলপূর্ণ ঘটের মুখে আম্রপত্র রাখে, ঘরের দ্বারে কলাগাছ পুঁতে, বিয়ের পূর্বদিনে বর-কনের বাড়িতে দই-মাছ পাঠায়, বর-যাত্রার সময় বরের কোলে একটা শিশু বসায়। এসব হচ্ছে আদিম যাদু-সংস্কার। ধান খাদ্য-সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধির প্রতীক, দূর্বা জীবনীশক্তির, কলাগাছ ও আম্রপত্র দীর্ঘ আয়ু ও প্রাণশক্তির, হলুদ সৌন্দর্যের, মাছ প্রজনন শক্তির, বরের কোলে শিশু সৃষ্টিশীলতার, ও দীপ আশার প্রতীক। পৃথিবীর আদিম ও বুনো সমাজে এগুলো নানাভাবে ও বিভিন্ন আকারে রয়েছে। জরু যে জমির মতোই বীরভোগ্যা, অর্থাৎ বাহুবল ও পৌরুষ দিয়ে আয়ত্ত করতে হয় এবং আদি যুগে যে নারীকে হরণ করেই বরণ করার প্রথা চালু ছিল, তার রেশ রয়ে গেছে দরজায় বর আটকানো প্রথায়। পূর্বে কনেপক্ষ সত্যি বাধা দিত; এখন ছদ্ম বাধা সৃষ্টি করে আর্থিক ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়; এখন তা ঠাট্টা-সম্পর্কিত জনদের আমোদ-ফুর্তির উপলক্ষ মাত্র। পাঁচ পুকুরের পানি মিশিয়ে পাঁচ হাতে স্নান করানো, পাঁচ হাতে মেহেদি লাগানো, শুভকর্মে বন্ধ্যা ও বিধবা-ভীতি প্রভৃতি আমাদের বিস্মৃত আদিম পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ঐতিহ্য, আচার ও উত্তরাধিকার। সংস্কার যে মর্মমূলে কিভাবে চেপে বসে তার প্রমাণ বেহুলা-লখিন্দরের বাসর রাতের দুর্ভাগ্যভীত বাঙালি হিন্দুরা বিয়ের প্রথম রাত 'কালরাত্রি' হিসেবেই মানে।

॥ ৮ ॥

সাড়ে-চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে মধ্যবিত্ত কিংবা উচ্চবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ের লেখা-পড়ার জন্যে "হাতেখড়ি" অনুষ্ঠান হত। এতে উৎসবের আয়োজন হত। ভোজ-পায়েস-সিন্নি-গুড়-বাতাসা-মিষ্টি এবং পান ও তেল (তেলোয়াই) যোগে উপস্থিত জনেরা অভ্যর্থিত ও আপ্যায়িত হত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা ও শাস্ত্রশিক্ষার সঙ্গে রতিশাস্ত্রও কখনো কখনো কোথাও শিক্ষা দেয়া হত। বাৎসায়নের 'কামসূত্র' কিংবা 'নায়িকা লক্ষণ' প্রভৃতি সে-যুগে তেমন লজ্জাজনক গুহ্যবিদ্যা ছিল না। তাই কাব্যে-উপাখ্যানে রতি-রমণের ও নারীরূপের, বিস্তৃত বর্ণনা থাকত। সামন্ত ঘরে চিত্রাঙ্কন ও সূচীশিল্পেরও চর্চা ছিল। তবে সাধারণের শিক্ষা-সূচীতে শাস্ত্র, ব্যাকরণ, সাধারণ গণিত (জল, জমি ও বস্তুর মাপ ও হিসাব সংক্রান্ত আর্যাদিই ছিল প্রধান), কাব্য, অলঙ্কার ও পত্র-দলিল-দস্তাবেজ রচনা প্রভৃতিই থাকত। সামাজিক উৎসবে-পার্বণে, নাচ-গান-বাদ্য-প্রমোদের জন্যে ছিল নীচ জাতীয় গাইয়ে-বাজিয়ে-নাচিয়ে-নাটুকে বৃত্তিজীবী। উচ্চবিত্তের অভিজাত সামন্ত ও রাজ-পরিবারের লোকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলা চর্চা করত নিজেদের বা অন্তরঙ্গজনের চিত্তবিনোদনের জন্যে। নারীশিক্ষাও একেবারে বিরল ছিল না।

শিক্ষা বলতে সে-যুগে ধর্মশিক্ষাই মুখ্য লক্ষ্য ছিল বলে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ও হিন্দু-মুসলমানের বিদ্যালয় পৃথক ছিল। সাধারণত পণ্ডিতের ঘরে টোল ও আলিমের ঘরে বা মসজিদে মক্তব থাকত। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাদের কাছে পড়ত। কিছু দক্ষিণা বা নজরানা দিত। তা-ও সবসময় কড়িতে নয়, ফসল তোলার মৌসুমে ধানাদি শস্য কিংবা ফলমূল তরকারির আকারে ও বার্ষিক বরাদ্দে। সাধারণ শিক্ষার জন্যে কোথাও কোথাও পাঠশালা ছিল। উচ্চশিক্ষার জন্যে কৃচিৎ কোথাও সরকারি বা সামন্ত সাহায্যে পরিচালিত টোল-মাদ্রাসা থাকত। সে-যুগে সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সে অধিকারও ছিল না। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের দীক্ষিত মুসলিম সমাজেও ঐতিহ্যাভাবে বিদ্যার্জনে আগ্রহ ছিল না। কাজেই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ই বেশি ছিল এবং পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল নগণ্য। গুরু-ওস্তাদের শাস্ত্রীয় সংস্কারপ্রসূত মর্যাদা ও সম্মান ছিল। শাপে সর্বনাশ হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে পড়ুয়ারা তো বটেই অন্যেরাও গুরু-ওস্তাদকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করত, তাছাড়া বিদ্বান ও জ্ঞানী বলেও তাঁরা সম্মানিত ছিলেন। হিন্দু পণ্ডিত পৌরোহিত্য, পাঁতিদান-কোষ্ঠী তৈরি, ভাগ্যগণনা ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রীয় সামাজিক ও পার্বণিক অনুষ্ঠানে স্ব-স্ব কর্তব্য পালন করে অর্থোপার্জন করতেন।

মৌলবী-মুনশী-ওস্তাদ-মোল্লা-খোন্দকারেরাও গাঁয়ের শাস্ত্রীয় উৎসবে-পার্বণে, বিবাহে-মৃতসৎকারে শাস্ত্রীয় দায়িত্ব পালন করতেন। মুরগি জবেহ, ফাতেহা পাঠ, জানাজায় ইমামতি, মসজিদে মুয়াজ্জিন ও ইমামের কাজ প্রভৃতি ছিল তাঁদেরই! প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নিষ্ঠুর শারীরিক পীড়নের শিকার ছিল :

> শিখিতে না পারে তবু শিখাইতে না ছাড়ে
> মারিয়া বেতের বাড়িএ ঠেঙ্গা করে।
>
> কভু কভু বান্ধ্যা রাখে বুকে বসে রয়
> উচিত করএ শাস্তি যেদিন যে হয় *(দয়াময়ের সারদামঙ্গল)*

এখানেই শেষ নয়, নাড়ুগোপাল করা (হাতপা জড়ো করে রাখা), ধান বা কাঁটা দিয়ে কপাল চিরে রক্ত ঝরানো, সূর্যের দিকে মুখ করে বসানো, বিছুটি পিঁপড়ে প্রভৃতি গায়ে লাগিয়ে দেয়া ছিল স্বাভাবিক শাস্তির অঙ্গ। কলম ছিল কঞ্চি কিংবা হাঁসের, শকুনের বা ময়ূরের পালকের। বালকেরা কলাপাতায়, অন্যেরা লিখত তুলোট কাগজে, তালপাতায়। কালি তৈরি হত বিভিন্ন পদ্ধতিতে। ছাত্রশিক্ষকেরা বসতেন চাটাই, মাদুর, পাটি, কুশাসন ও ফরাস প্রভৃতির উপর। ছাপাখানা ছিল না বলে সব গ্রন্থ ছিল হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। পেশাদার লিপিকর থাকত।

॥ ৯ ॥

গান-বাজনা সমাজে লোকপ্রিয় ছিল। শরীয়তপন্থীরাও যেন তখন তেমন রক্ষণশীল ছিল না। তাই সর্বপ্রকার উৎসবে-পার্বণে নাচ-গানের আসর বসতে দেখা যায়। চট্টগ্রামের হিন্দু ও মুসলিম রচিত রাগ-তালের বহু গ্রন্থ ষোলো শতক থেকেই মিলছে। বিশেষত সঙ্গীত (হালকা-দারা-সামা) কলন্দরিয়া, চিশতিয়া ও কাদিরিয়া সুফিদের সাধন-ভজনের অঙ্গ। প্রায় সব মুসলিম কবিই গান রচনা করেছেন, কেউ কেউ রাগ-তালের গ্রন্থও। কবি আলাউল তো প্রথমজীবনে সঙ্গীত শিক্ষকই ছিলেন। গাইয়ে-বাজিয়ে তো ছিলেনই, তিনি সঙ্গীত রচনা ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাগতালনামা'ও রচনা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, সবার সব সঙ্গীতই রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়-রূপকে রচিত। ব্যতিক্রম ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

॥ ১০ ॥

ঘরে-সংসারে একরকমের নেশা চালু ছিল। উনুনের কাছে জলভরা ঘড়ায় প্রতিদিন একমুষ্টি ভাত রেখে কয়েকদিন পর ভাতপচা পানি ছেকে নিয়ে পান করত তারা, এর নাম আমানি বা ঘড়া কাঁজি। এতে সামান্য নেশা ধরত। এ ভেতো মদের আরাকানী নাম 'সিফত'। তাছাড়া ধেনো, তালো, খেজুরে মদ, গাঁজা, চরস, চণ্ডুও বহুল প্রচলিত ছিল। মুখশুদ্ধির জন্যে পান-সুপারি তো ছিলই। কিন্তু পরে যখন প্রায় নির্দোষ ব্যসন 'তামাক' চালু হল, তখন তামাক সেবনের নিন্দায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছে সমাজহিতৈষীরা। 'তামাকু' সেবন গোড়াতে ছিল শাহ-সামন্ত অভিজাতদের দর্প ও দাপট প্রকাশের প্রতীক। তাই মনিব ও মান্যজনের সম্মুখে তামাকু সেবন ছিল বেয়াদবি, ঔদ্ধত্য, অসৌজন্য ও অসংস্কৃতির লক্ষণ ও প্রকাশ। পরে এ অভ্যাস যখন গণমানবে সংক্রমিত হল, তখনো তামাকু সেবন রইল অবজ্ঞেয় ও নিন্দনীয়। এর কারণ বোধহয় তামাকু সেবনলিপ্সু ব্যক্তিরা অধৈর্য হয়ে হুঁকা কেড়ে নিয়ে ধূমপান করতে চায়। তাই আমরা আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী ও আফজল আলিকে তামাকু সেবীর নিন্দায় মুখর দেখি। রামপ্রসাদ, শান্তিদাস ও সিত কর্মকার যথাক্রমে 'তামাকুমাহাত্ম্য', 'তামাকুপুরাণ', ও 'হুঁকাপুরাণ' রচনা করে তামাক-খোরকে বিদ্রূপ করেছেন এবং দ্বিজ রামানন্দ সঙ্গীতে গাঁজা-তামাকুর মহিমা প্রচারে হয়েছেন মুখর। ফকির-দরবেশেরাও তামাক-খোর হয়ে উঠেছিলেন। 'চৌদ্দশত দরবেশ চলে আরবোলা হাতে' *(দ্বিজ ষষ্ঠীবর)*।

॥ ১১ ॥

সে-যুগে নারীর অলঙ্কার-বাহুল্য ছিল। মেয়েরা মাথায় সিঁথিপাটি, টিকলি; কণ্ঠে হাঁসুলী, মালা, টাকার ছড়া; এক, তিন ও সাত লহরী হার, তাবিজ; হাতে কঙ্কণ, বালা, তাড়, চুড়ি, খাড়ু পৈঁচি, অঙ্গদ, অনন্ত; আঙুলে অঙ্গুরীয়; নাকে কোর, চাঁদ বোলাক, বালি, ডালবোলাক, গোলক, নাকমাছি, নাকছবি, বেশর, কানে কানফুল, বোলতা, কুমরোফুল, ঝুমকা কুণ্ডল, নোলক, ঝিঙাফুল, কুণ্ডল, কানবালা, বালি; পায়ে পাজব, পাঁসুলি, নূপুর, ঘুঙুর, মকর, খাড়ু, মলতোড়র, বাঁকপাতা, বঙ্করাজ, মল, উনচট, উঝটি; কোমরে চন্দ্রহার, ঝুমঝুমি, নীবিবন্ধ, কিঙ্কিণী; হাতের পাতায় আঙুল-সংলগ্ন রতনচূড়; গ্রীবায় গ্রীবাপত্র; বাহুতে তাড়, কেয়ূর, জসম, বাজুবন্ধ, বাজু প্রভৃতি বহু ও বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার ছিল। আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থান ভেদে এগুলো তালপাতা, ঝিনুক, শিঙ থেকে তামা-পিতল-শিলা-রুপা-সোনা-মুক্তা হীরা মাণ কাচ পাথর প্রভৃতি যে-কোনো উপাদানে তৈরি হত। সেকশুভোদয়ার তালপত্রে নির্মিত কর্ণাভরণের কথা আছে। কাঁচুলী নানা বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয় ও জরি-রত্ন খচিত ছিল। অবশ্য কাঁচুলী অভিজাত ও ধনী ঘরের নারীই কেবল ব্যবহার করত। নানা ছাঁদের বেণী ও কবরী হত। কানাড়ি (কর্ণাটদেশীয়) ছাঁদে বাঁধা কবরীর কদর ছিল বেশি। কবরীতে বেণীতে নানা রঙের ফিতা ছাড়াও ফুল জড়ানো ছিল সর্বজনীন রীতি। বেণীর প্রান্তে ফুল বাঁধা থেকেই হয়তো গ্রন্থের সর্গ বা গ্রন্থ সমাপ্তিজ্ঞাপক 'পুষ্পিকা' নামের উৎপত্তি।

পুরুষেরও বাহুতে কবচ ও বাজু, বাহুতে, গলায় ও কটিতে তাবিজ, কানে কুণ্ডল, হাতে বলয় ও গলায় একছড়ি হার বা কালো সুতার 'তাগা' থাকত। ধার্মিক মুসলমানেরা খিলালের প্রয়োজনে লোহার বা পিতলের খিলাল শলাকা গলায় ঝুলিয়ে রাখত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীর প্রলেপ প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে ছিল সিন্দুর , চন্দন, মেহেদি, কুমকুম, কস্তুরী, কাফুর, কেশর, অগুরু, কাজল, অঞ্জন, সুর্মা, তেল, আতর ও ঠোঁটে তাম্বুলরাগ। পুরুষেরাও এসব প্রসাধন দ্রব্য উৎসব পার্বণকালে অঙ্গে ধারণ করত। চুল-দাড়ি রাঙানো মুসলিম ধার্মিক সমাজে বহুল প্রচলিত ছিল।

শাহ সামন্ত-অভিজাত এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ঘরে নারীপর্দা ছিল, তবে শাসন-প্রশাসনে জড়িত বা নিয়োজিত নারীর পর্দা-নীতি শিথিল ছিল। নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের ঘরে পর্দা কখনো প্রথারূপে চালু ছিল না। পর্দাপ্রথা ছিল না বাউল-বৌদ্ধ-বৈষ্ণবদেরও। দরিদ্র ঘরের নারীদের ঘরে-বাইরে, ক্ষেতে-খামারে, হাটে-ঘাটে জীবিকা অর্জনের জন্যে কিংবা স্বামী-সন্তানের সাহায্যকারী হিসেবে যেতে হত। ভিখারিনী তো ছিলই। আর দাসী-বান্দী-ক্রীতদাসীর পর্দা রাখার তো নিয়মই ছিল না। তাছাড়া তান্ত্রিক-কাপালিক-সহজিয়া-বাউল প্রভৃতি কায়াসাধকরা বামাচারী। মণ্ডল, ভৈরবীচক্র, নৈশমিলনচক্র, গৌপীচক্র রসের, ভিয়ান, রজঃ শুক্র পান প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক ও যৌথ রতি-রমণ হচ্ছে সাধনার অঙ্গ। কাজেই এদের মধ্যেও পর্দাপ্রথা ছিল না।

॥ ১২ ॥

গরিবেরা কাজের সময়ে কৌপীন, গামছা ও অন্য সময়ে খাটো শাদা ধুতি বা তহবন পরত। মাথায় টুপি (কাপড়ের, তালপাতার বা বেতের) ও পাগড়ি পরত। জুতা পরা হয়তো বিয়ের মতো পার্বণিকই ছিল। হিন্দুরাও কৌপীন, গামছা, খাটো ধুতি ও গায়ে উত্তরীয় পরত, কেউ কেউ মাথায় পাগড়িও বাঁধত। পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতিতে হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ছিল। চট্টগ্রাম ছাড়া অন্যত্র নারী মাত্রই শাড়ি পরত। চট্টগ্রামে আরাকানীশাসন প্রভাবে 'ঘামচা' ও 'উড়নী' দুই খণ্ড কাপড় পরত মেয়েরা। রাজপুরুষ ও সামন্ত অভিজাত উচ্চবিত্তের শিক্ষিতরা পরত ইজার, কামিজ, কাবাই, চাপকান, আসকান, আলখাল্লা, চৌকা, সিনাবন্দ্ (waist coat) কোমরবন্দ্ ও পাগড়ি, শামলা কিংবা টুপি। গলাবন্দ্, দোয়াল, অঙ্গুরীয়ও তারা পরত। শাসকশ্রেণীর অনুসরণে হিন্দু রাজপুরুষ, ধনী এবং অভিজাতরাও পরত এসব পোশাক (কাল ধল রাঙা টুপি সবার মাথে/পাসরি পটকা দিয়া বান্ধে কোমরবন্ধ। —রূপরাম চক্রবর্তী, ধর্মমঙ্গল)।

আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা কিংবা সরকারি চাকরিভেদে এসব পোশাক, সুতোর, রেশমের, জরির কিংবা সোনা-রুপা-মুক্তা-মণিখচিতও হত। ধনী ঘরের বউ-ঝিরা কাঁচুলী (Bodice) এবং অন্তর্বাস বা ছায়া (petti coat) পরত। গরিব ও মধ্যবিত্তের পোশাক ছিল মোটা তাঁতে নির্মিত। ঘরে ঘরে চরকায় সুতা তৈরি হত। তাঁতী শুধু বানিয়ে দিত।

চটক, মটক, গরাদ, ধুতি ছাড়াও শাড়ির মতো মোটা-পেড়ে নানা ধুতি ছিল। মেয়েদের ছিল ময়ূর পেখম, আগুন পাট, কালপাট, আসমান তারা, হীরামন, নীলাম্বরী, যাত্রাসিদ্ধি, খুঁঞা, নেত, মঞ্জাফুল, অগ্নিফুল, মেঘডুম্বুর, মেঘলাল, গঙ্গা-জলি প্রভৃতি নানা নামের শাড়ি। মসলিন, পাটাম্বর তথা রেশমের (সিল্কের) কারুখচিত বহুমূল্য শাড়ি ছাড়াও উচ্চমূল্যের বেলন পাটের (সিল্কের) নেতের শাড়িও আনুষ্ঠানিক ও পার্বণিক প্রয়োজন মিটাত।

॥ ১৩ ॥

বৃত্তিভেদে নিম্নবিত্তের নিরক্ষর দেশজ মুসলিম সমাজ

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রদত্ত বিবরণ :

রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা
তাসন করিয়া নাম ধরাইল জোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলদে বাহিয়া নাম বলয়ে মুকেরি
পিঠা বেচিয়া নাম ধরাইল পিঠারী।
মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাইল কাবারী
নিরন্তর মিথ্যা করে নাহি রাখে দাড়ি।
সানা বান্ধিয়া নাম ধরে সানাকার
জীবন উপায় তার পাইয়া তাঁতিঘর।
পট পড়িয়া কেহ ফিরএ নগরে
তীরকর হয়্যা কেহ নির্মএ শরে।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরাইল কাগতি
কলন্দর (ফকির) হয়্যা কেহ ফিরে দিবারাতি।
বসন রাঙাইয়া কেহ ধরে রঙ্গরেজ
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।
সুন্নত করিয়া নাম বোলাইল হাজাম
গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই ...
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা...।

সাধারণভাবে সৈয়দ, শেখ, তুর্কি মুঘল, পাঠান প্রভৃতি বিদেশাগত মুসলমানরা অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষিতদের মধ্যে কাজী, মোল্লা, শাস্ত্রবিৎ, আলিম, সুফিসাধক ফকির প্রভৃতি সমাজে মর্যাদাবান ও সম্মানিত ছিলেন। শিয়া-সুন্নি এই দুই মুখ্যভাগেও নানা উপসম্প্রদায় এখনকার মতোই ছিল, শিয়ারা আঠারো শতকে মুর্শিদাবাদ-ঢাকা প্রভৃতি শাসনকেন্দ্রে প্রবল হয়। সুন্নিদের মধ্যে হানাফী, সাফী, আহমদী ও হাম্বলী-মযহাব বা সম্প্রদায় ছিল। হানাফীরা ছিল সংখ্যাগুরু, অন্যদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তেমনি সুফিদেরও ছিল বিভিন্ন গুরুপন্থী খান্দান—চিশতিয়া, সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া, নক্‌সবন্দিয়া, কাদেরিয়া, মাদারিয়া প্রভৃতি। গুরুবাদে বা পীরবাদে শরীয়ত পন্থীদের অবিচল আস্থা ছিল।

বৃত্তি ও বর্ণভেদে হিন্দুসমাজ

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বর্ণিত বিবরণ :

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন।
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টারব
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব।
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধি ভেদ
চিকিৎসা করএ পড়ে কাব্য আয়ুর্বেদ।
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী
বেনে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারী-শাঁখারী।
গোয়ালা তাম্বুলী তিলি তাঁতি মালাকার
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার।
আগরী প্রভৃতি আর নাগরী যতেক
যুগী-চাষী, ধোপা-চাষী কৈবর্ত অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্‌রা ছুতার সূরী ধোপা জেলে গুড়ী
চাঁড়াল বাগ্‌দী হাড়ী ডোম মুচি শুঁড়ী।
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালী তেয়র
কেলি কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজিকর।
বাইজী পটুয়া কান কসবী যতেক
ভাবক ভক্তিরা ভাঁড় নর্তক অনেক।

এমনি ছত্রিশ জাতের ও বৃত্তি-বেসাতের লোক নিয়ে ছিল হিন্দুসমাজ।

প্রাচীনকালে হিন্দুদের মধ্যে সেলাই-করা কাপড়-জামা পরার রেওয়াজ ছিল না বলেই 'কাটিয়া কাপড় জোড়ে' রূপে দরজির পরিচয় দেয়া হয়েছে। এমনি লবণনির্মাতা মুলুঙ্গী, পান উৎপাদক বারুই, পালকি বাহক কাঁহার, সূত্রধর, কুমার, ঘরামি, কলু, বাজিকর, গায়েন, নট, বেদে ইত্যাদি। মন্থর হলেও মুসলিম সমাজ বিদ্যা ও ধন-মান যোগে বিবর্তন বা পরিবর্তনশীল ছিল।

এ সূত্রে স্মর্তব্য—'গতবছর জোলা ছিলাম, এবার শেখ হয়েছি, ফসল ভালো হলে আগামী বছর সৈয়দ হব।'

অথবা, আগে ছিল উল্লা-তুল্লা পরে হৈল মামুদ
পিছনের নাম আগে নিয়া এখন হৈল মোহাম্মদ।

অতএব, সমাজে বৈষম্য ছিল ধনী-নির্ধনে, আশরাফে-আতরাফে। এবং সম্পদ শিক্ষা, সংস্কৃতি, পদ, বৃত্তি ও বংশভেদে কেউ ঘৃণ্য ও অবজ্ঞেয়, কেউ বা শ্রদ্ধেয়-সম্মানিত ছিল। তবু মুসলিম সমাজে হিন্দুর মতো জন্মসূত্রে জাতে-বর্ণে ঘৃণ্য-সম্মানিত হত না। মুখ্যত ধনই ছিল মানের মাপকাঠি। কাঞ্চনে অর্জিত কৌলিন্য কেউ ঠেকাতে বা অস্বীকার করতে পারত না।

ক. ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হয় যথ কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবারে ।

[সৈয়দ সুলতান : নবীবংশ]

খ, অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
অকুলীন ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।

[চট্টগ্রামের প্রাচীন ছড়া]

গ. নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক।
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।

[সত্যকলিবিবাদ সম্বাদ]

একালের মতো কৃতী ও কীর্তিমান পুরুষ ছিল সেই —
'যে দোলা ঘোড়া চড়ে,
আর
দশ বিশজন যার আগেপাছে নড়ে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তি-বেসাত ঘৃণ্য ছিল। সামাজিক- বৈবাহিক সম্পর্ক অবাধ ছিল না কখনো।

ক. নারী বলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোনো জাতি।
খ. জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে গঞ্জিবেক মোরে।
[নবীবংশ]

সে-যুগেও আভিজাত্যের উৎস ছিল তিনটে—ধন, বিদ্যা ও পদ। সমকালে তো বটেই ধন-বিদ্যা-পদধারীর বিচ্যুত বংশধরগণ অতীত স্মৃতির পুঁজি নিয়েও কয়েকপুরুষ ধরে এমনকি চিরকাল সেই আভিজাত্য-গৌরব-গর্ব সামাজিক-বৈবাহিক জীবনে সুফলপ্রসূ রাখত। এরাই এবং মোল্লা-পুরুত-কায়স্থ-গোমস্তা-মুৎসুদ্দী ও ছোট বেনেরাই ছিল মধ্যযুগের সেই শাহ-সামন্ত শাসিত সমাজে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। সামন্ত প্রশাসকদের পরেই নিরক্ষর সমাজে ছিল এদের দাপট। এরাই ছিল গ্রাম্য-সমাজে প্রধান। তবে রাজতন্ত্রের যুগে রাজনীতি দরবার বহির্ভূত ছিল না বলেই এদের কোনো রাজনৈতিক ভূমিকা ছিল না। কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতির এরাই ছিল ধারক ও বাহক। সে-যুগে সমাজ-সংস্কৃতি ছিল স্থাণু ও স্থায়ী আচার ও অনুষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত। কেননা, নতুন ভাব-চিন্তা-চেতনা কিংবা আচার অশিক্ষা-আচ্ছন্ন দুর্গম গ্রামীণ সমাজে সহজে পৌঁছত না।

দরিদ্র, অনাহার, দুর্ভিক্ষ ও দুর্জনের দৌরাত্ম্য কোনো যুগেই নতুন কিংবা অনুপস্থিত ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাত-কাপড়ের কোনো বিলাস কিংবা প্রাচুর্য ছিল না কোনো কালেই। ‘দুধভাত’ই তার পার্বণিক পরমান্ন।

AMARBOI.COM

তরুণং সর্ষপ শাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি
অল্প ব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্য জনো মিষ্ট মশ্নাতি।
(বৃত্তরত্নাকর : কেদার ভট্ট)

কচি সরিষার শাক দিয়ে নয়া চালের ভাত আর
পাতলা দই—সুন্দরি, অল্প ব্যয়ে এমনি ভালো খাদ্য গ্রাম্য লোকে খায়।

নির্জিত লোক বেঁচে থাকাতেই তুষ্ট থাকত। সেক শুভোদয়ায় বিজয় সেনের জবানিতে পাই : “আমার স্ত্রীপুত্র আছে, ঘরে ভাঙা খোরা আছে, কলসীতে খুদ আছে। তা-হলে আমি হতভাগা কিসে” *(সুকুমার সেন : প্রাচীন বাংলা ও বাঙালি পৃ. ১৭)*। আবার তখনো এমন দরিদ্র ছিল যার জীর্ণতম কুটির মেরামতের মতো আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, আজো যেমন রয়েছে অসংখ্য নীড়হারা নিগৃহ পরিবার। মুকুন্দরাম বর্ণিত ফুল্লরারও এমনি দুর্দশা স্মর্তব্য।

চলৎ কাষ্ঠং গলৎ কুড্যমুত্তানতৃণ সঞ্চয়ম্
পণ্ডূ পদাথি মণ্ডূকাকীর্ণংজীর্ণং গৃহং মম।
—কাঠ খসে পড়ছে, দেয়াল গলে পড়ছে, চালের তৃণ জড়ো
হয়ে গেছে। আমার জীর্ণ ঘর কেঁচো-সন্ধানী
বেঙে আকীর্ণ।

বস্ত্রেরও অভাব ছিল। শীতের রাতে বস্ত্রহীনার করুণ দুর্দশার চিত্রও রয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূমৈরশ্রু নিপাতয় দহ শিখয়া দহন মলিনয়াঙ্গারৈঃ
জাগরয়িষ্যতি দুর্গত গৃহিণী তাং তদপি শিশিরনিশি।
[৩০৪নং আর্যাসপ্তশতী : কবি গোবর্ধন আচার্য]

ধোঁয়ায় চোখে পানি ঝরে, দহনে দেহ উত্তপ্ত (দগ্ধ) হয়, অঙ্গারে
দেহবর্ণ মলিন হয়, তবু দুর্গত গৃহিণী সারা শীতরাত্রি (হে অগ্নি)
তোমাকে জ্বালিয়ে রাখে।

গাঁয়ে তখনো শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণ ছিল। প্রবলের প্রতাপ, দুর্জনের দৌরাত্ম্য, দুর্বলকে সেকালেও পৃষ্ট ও ক্লিষ্ট করতঃ

প্রতি দিবস ক্ষীণ দশস্তবৈষ বসনাঞ্চলোহতিকর কৃষ্টঃ
নিজনায়কমতি কৃপণং কথয়তি কুগ্রাম ইব বিরলঃ
[৩৭১ সং আর্যাসপ্তশতী]

বারবার হস্ত-ধৃত হয়ে দিনে দিনে ক্ষীণ দশা প্রাপ্ত তোমার সুতোবিরল
বস্ত্রাঞ্চল,-অতি করভারে পীড়িত জনবিরল কুগ্রামের মতো (এই
সত্যই) নির্দেশ করে যে তোমার নিজপতি অতি কৃপণ।

বোঝা যাচ্ছে শোষণের করভারে পীড়িত গ্রামবাসী গাঁ ছেড়ে পালিয়ে যেত। ভিক্ষাবৃত্তিও ছিল (৪৯২), অরাজকতা ছিল (২৭), অত্যাচার-অবিচার-নিষ্ঠুরতাও ছিল (৩১৫ আর্যাসপ্তশতী)।

কবি-পণ্ডিতদের কাম্য জীবন :

১. গোষ্ঠীবন্ধ : সরস কবিভির্বাচি বৈদর্ভীরীতির্বাসো
গঙ্গা পরিসরভুবি স্নিগ্ধভোগ্যা বিভূতি।
সৎসুস্নেহঃ সদসি কবিতাচার্যকং ভূভূজাং মে
ভক্তির্লক্ষ্মী পতিচরণয়োরস্তু জন্মান্তরেহপি। *(ধোয়ী)*

বঙ্গানুবাদ

সহৃদয় কবিদের সঙ্গে সৌহার্দ্য, বেদর্ভী রীতিতে কাব্য রচনা, গঙ্গাতীরভূমিতে বাস, ধনৈশ্বর্য আত্মীয়-স্বজনের ভোগে লাগা, সজ্জনের সহিত মৈত্রী, রাজসভায় আচার্য কবির সম্মান এবং লক্ষ্মীপতির চরণ কমলে ভক্তি যেন আমার জন্মান্তরেও হয়।

(সুকুমার সেন প্র: বা: বা: পৃ. ২৭)

২. আদর্শ মানুষের সংজ্ঞা এরূপ :
মাতোবাসীৎ পরস্ত্রীভবতী পরধনে ন স্পৃহা যস্য পুংসো
মিথ্যাবাদী ন যঃ স্যান্ন পিবতি মদিরাং প্রাণিনো যো ন হন্যাৎ।
মর্যাদাভঙ্গভীরু ঃ সকরুণ হৃদয়স্ত্যক্ত সর্বাভিমানো
ধর্মাত্মা তে স এষ প্রভবতি ভগবন পাদ পূজাং বিধূধাতুম
(রামচন্দ্র কবিভারতী : ভক্তিশতক।)

(সুকুমার সেন: প্রা: বা: বা: পৃ. ৪১)

—পরস্ত্রী যার কাছে মাতৃসমা, যে পুরুষ পরধনে নিস্পৃহ, যে মিথ্যাবাদী, মদ্যপায়ী, প্রাণিহন্তা নয়, যে মানীর মান ভঙ্গে ভীত, যে করুণহৃদয়, যে নিরভিমান, সে মহাত্মাই ভগবানের পূজার অধিকার পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ১৪ ॥

আদব-লেহাজ-তবিয়তেই সংস্কৃতির মুখ্য প্রকাশ। কবি আলাওলের তোহফায়ে 'মুসলিম আচরণ' বিধির উল্লেখ আছে। অন্যত্র তেমন কিছু মেলে না। পিতামাতা, পীর ও গুরুজনদের কদমবুসি করা, মান্য ও গুরুজনদের চোখে চোখ রেখে কথা না বলা, গুরুজনদের সুমুখ থেকে উঠে আসতে পিছু হঠে আসা, লাঠি হাতে, বা জুতো পায়ে গুরুজনদের সামনে না যাওয়া, তাঁদের সামনে তামাক না খাওয়া, উচ্চাসনে বা সুমুখ, সারিতে না বসা, বামহাতে দেয়া-নেয়া না করা, গুরুজন কিংবা মান্যজনকে কিছু দিতে বা তাঁর থেকে কিছু নিতে হলে জোড় হাতে নতশিরে দেয়া-নেয়া করা, তাঁদের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে বা রূঢ় কণ্ঠে কথা না বলা, পথে তাঁদের আগে না চলা, মজলিসে বা ঘরে মান্যজনের নেতৃত্বে একসঙ্গে খাওয়া শুরু ও শেষ করা, মান্যজনের দেহের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা, বৈঠকে বা সারিতে বা মজলিসে দু'জনের মধ্যদিয়ে চলতে হলে দুই বাহু প্রসারিত করে দেহ বাঁকিয়ে (রুকুহ্‌র মতো) চলা, বয়োজ্যেষ্ঠদের নাম ধরে না ডাকা, বয়স্ক কনিষ্ঠদেরও সন্তানের নাম করে অমুকের বাপ বা মা বলে ডাকা, বাসনে অল্প অল্প করে খাদ্যবস্তু নিয়ে ছোট ছোট গ্রাসে খাওয়া এবং ঠোঁট বন্ধ করে চিবানো, পা দেখিয়ে বা ছড়িয়ে না বসা, মান্য ও বয়োজ্যেষ্ঠকে সালাম দিয়ে সম্ভাষণ করা প্রভৃতি ছিল সার্বক্ষণিক সাধারণ আদব-কায়দার অঙ্গ। গাঁয়ে অধিকাংশ লোক ছিল দরিদ্র ও অশিক্ষিত, তাই এসব অমান্য করবার মতো উদ্ধত দ্রোহী ছিল বিরল।

AMARBOI.COM

॥ ১৫ ॥

নবজাতককে, খৎনায় কিংবা কানফোড়নে ছেলেমেয়েকে, বিবাহে নব দম্পতিকে ও নতুন কুটুম্বকে নজর, শিকলি ও উপহার দেওয়াও ছিল রেওয়াজ। নাপিত-ধোপা-মোল্লা-মুয়াজ্জিন-ওস্তাদ-ভৃত্য-গোলাম-বাঁদী প্রভৃতিও এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে বকসিস পেত। সমাজে নাপিতের ভূমিকা ছিল বহু ও বিচিত্র। এরা প্রতি ঘরের পরিজনই যেন ছিল। উৎসবে অনুষ্ঠানে তারা ছিল অপরিহার্য। ধনী ও অভিজাতদের দু'দশ ঘর গোলাম-বাঁদী থাকত।

সাধারণের ঘর-বাড়ি হত মাটির ও বাঁশের । গরিবের দোচালা, সাধারণের চৌচালা এবং উচ্চমধ্যবিত্তের আটচালা ঘরও থাকত। গরিবের ঘর-কুটির, মধ্যবিত্তের বাড়ি-ভবন, ধনীর অট্টালিকা, রাজার প্রসাদ-মহল। বাড়ি হত সাধারণত চক-মিলানো। চট্টগ্রামের মুসলমানেরা ঘরের প্রবেশ কক্ষকে 'হাতিনা', মধ্যকক্ষকে 'পিঁড়া' ও পেছনের শেষ কক্ষকে 'আওলা' বলে। 'পিঁড়া'র উল্লেখ বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতেও মেলে।

গাঁয়ের মানুষের এক বা একাধিক (ঈর্ষা-অসূয়া জাত দলাদলির কারণে অথবা আশরাফ-আতরাফ ভেদে) 'মাহালত' বা সমাজ থাকত। একজন প্রধান সমাজপতি, সর্দার বা মাতব্বরের নেতৃত্বে প্রতি গোষ্ঠী-নেতার সহযোগে সামাজিক, পার্বণিক, আনুষ্ঠানিক কাজ এবং মৃতের সৎকারাদি, জেয়াফত-বিবাহাদি ও দ্বন্দ্ব-বিবাদাদির সালিশ-ইনসাফ-মীমাংসা হত।

॥ ১৬ ॥

অদৃষ্টবাদী কুসংস্কারপ্রবণ সমাজে নজুম-গণক-দৈবজ্ঞ-দরবেশের কদর ছিল। দান-সদকায় 'বলা-বালাই এড়ানোর সহজ পন্থা ছিল সবারই প্রিয়। ফাতেহাখানি-কুলখানি-জেয়াফত-মেজবানি যোগে ভোজ দিলে মৃত ব্যক্তির পাপমোচন হয়—এ আদিম মানবিক ধারণা শাস্ত্রীয় প্রশ্রয়ে আজো প্রবল এবং মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্যে বুনো-বর্বর-ভব্য নির্বিশেষে মানুষ চিরকালই দান-পান-ভোজন অনুষ্ঠান আবশ্যিক বলে জানে ও মানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরক্ষর দরিদ্ররা তো বটেই, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও ফুল ও বাগানের আদর-কদর ছিল বলে মনে হয় না। কেননা আজকের দিনেও গাঁয়ে ফুল বা ফুলের বাগান দুর্লক্ষ্য। তবু সাহিত্যে ফুলের নাম করতে হয় বলেই প্রথাসিদ্ধ উপায়ে কবিগণ কিছু ফুলের নাম করতেন; মাধবী, মালতী, চম্পা, নগেশ্বর, জাতী, যুঁথী, লবঙ্গ, কেতকী, বক, ভূমিকেশর, টগর, ভূরাজ, গোলাপ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে দরিদ্র গৃহস্থ ঘরে তৈজস—হাড়া-সরা-পাতিল-বাসন-কর্দা-কর্তি (পানপাত্র) সবটাই ছিল কুমারের তৈরি মাটির। নারকেলের মালা ও ঝিনুক ব্যবহৃত হত চামচ রূপে। কিন্তু সাহিত্য-গ্রন্থে এসব মেলে না। কারণ সাহিত্যে সব কিছু কৃত্রিম এবং আদর্শায়িত রূপে চিত্রিত হওয়াই ছিল নিয়ম। তাছাড়া সে-যুগে সাহিত্যের বিষয় ছিল দেবতা ও রাজা-বাদশার কাহিনী। কাজেই গরিব ঘরের তৈজস আসবাবের কথা সেখানে মেলে না। হর-পার্বতী, ফুল্লরা, হরিহোড়ের মতো কোনো কোনো দরিদ্রের কিছু খবর মিলে বটে, কিন্তু তা পূর্ণচিত্র দেয় না। Manrique ও অন্যান্য পর্যটকের বিবরণ থেকে দরিদ্রের ভাঙা ঘরে সম্পদের মধ্যে ছেঁড়া কাঁথা-মাদুর-চাটাই ও মাটির হাড়া-সরা-ঘড়ার এবং জীর্ণ-ছিন্ন বস্ত্রের কথা মাত্র ক্বচিৎ মেলে।

বিভিন্ন ব্যঞ্জন রান্না ছাড়াও বাঙালির পিঠা সাধারণত গুড়, চালের গুঁড়ো, তেল, ঘি, দুধযোগেই তৈরি হত। তাল, কলা, নারিকেল, খেজুর রস, প্রভৃতিও কোনো কোনোটাতে মিশ্রিত হত। এছাড়া চালভাজা, খই, দই, চিড়া, মুড়ি-মোয়া-বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি সুপ্রাচীন। দুধের রূপান্তরে দই, মাখন, ঘোল, ঘি, সন্দেশ, পায়েস, রসগোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন তৈরিতে এদের কৃতিত্ব গৌরবের।

বাদ্যযন্ত্রের নামেও দেখি প্রাচীনতা ও গতানুগতিকতা। ঢাক-ঢোল, ধামা, পিনাক, সারিন্দা, পাখোয়াজ, দোহরিমোহরি, চঙ্গ, বাঁশি, ভরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝরা, করতাল, কর্ণাল, ভেঁউর, রবার, বেণু, সিঙ্গা, কাড়া, কবিলাস, ডম্বুর, মন্দিরা, তাম্বুরা, জঙ্গলা, শঙ্খ, দুমদুমি, নাকাড়া, দমা, মঞ্জীর, সানাই, বীণা, দোনা, তবল, ভুষঙ্গ, কাঁস, ভাঙ্গরি, ইত্যাদি।

তেমনি যুদ্ধাস্ত্রগুলোও সেই রামায়ণ-মহাভারত যুগের। নতুন অস্ত্রের তথা কবির সমকালীন অস্ত্রের নাম মেলে না। শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, নারোচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুর্বাণ—অগ্নি, সিংহ, সর্প, চন্দ্র, অর্ধচন্দ্র, গজ, বরুণ, মেঘবাণ ইত্যাদি। এগুলো মন্ত্রপূত হলে অমোঘ হয়। যুদ্ধবাহন—অশ্ব, গজ, রথ। যুদ্ধে বাদ্যও প্রয়োজন।

॥ ১৭ ॥

অস্ট্রিক মঙ্গোলীয় বাঙালীর কৌম-সমাজের রীতি-নীতির কিছু কিছু রূপান্তর আজো বিদ্যমান। সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-দেহতত্ত্বাদি তাদের মানস বিকাশের সাক্ষ্য। জড়বাদসুলভ বিশ্বাস-সংস্কার ও প্রাকৃত শক্তির পূজাও তাদের মধ্যে চালু ছিল। নারী-বৃক্ষ-পশু ও পাখি দেবতা, দেহ চর্যা, জন্মান্তরে আস্থা, ঘট ও পাথর প্রতীকে দেবপূজা তাদের মধ্যে চালু ছিল। বর্ণাশ্রম ছিল না, বৃত্তিভাগ ছিল। নিরক্ষর সমাজে বৃত্তিগত সংস্কৃতি ছিল, সমাজে নৈতিক-চেতনা তেমন দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। নিষাদ-কিরাত সমাজে কৈবর্ত-শুঁড়ি-চণ্ডাল-হাড়ি-ডোম-তাঁতী-কামার-কুমার-নাপিত-চাষী-ওঝা-চিকিৎসক প্রভৃতি বৃত্তিই ছিল প্রধান।

মৌর্য আমলে জৈন-বৌদ্ধ মতের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় শাস্ত্র-সমাজ-শাসন-ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে থাকে এ দেশীয়রা। সে-সময়েও জৈন-বৌদ্ধ সমাজে বর্ণবিন্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণ্য গুপ্ত ও শশাঙ্কের আমলে বর্ণবিন্যাস শুরু হয় এবং সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণতা পায়। বৃহদ্ধর্ম পুরাণোক্ত অস্পৃশ্যতাদুষ্ট ছত্রিশ জাতি এভাবেই বিন্যস্ত হয়। উত্তর-ভারত থেকে সাগ্নিক যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়ন গুপ্ত আমলেই শুরু হয়, তবু সেনেরা নতুন একদল ব্রাহ্মণ আনয়ন করে এখানে গীতা-স্মৃতির প্রভাব প্রবল করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন ধরনের পূজাপার্বণ ও শাস্ত্রসংপৃক্ত আনন্দ-উৎসব চালু হয়। জাতকর্ম, ষষ্ঠী, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, শালাকর্ম, অশৌচ, শ্রাদ্ধ তিথি নক্ষত্রে উপবাসাদি ব্রত পালন ধর্ম-সংপৃক্ত শাবরোৎসব, কামমহোৎসব, হোলি, নৃত্য-গীত-কথকতার অনুষ্ঠান, বিবাহাদি সামাজিক উৎসব প্রভৃতি ছিল। জুয়া, মদ, বেশ্যা—এ তিনে লোকের আসক্তি ছিল, এবং পার্বণিক উৎসবে সামাজিকভাবেই উপভোগ করা হত এসব।

হিউ-এনৎ-সাঙের সময়ে সমতটের লোক ছিল শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তিবাসীরা ছিল দৃঢ় ও সাহসী, চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা ছিল সৎ ও অমায়িক। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'দশোপদেশ' কাব্যে বাঙালী ছাত্রদের ক্ষীণকায়, উগ্র ও মারামারিপ্রবণ বলে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞানেশ্বর ও পরবর্তীকালের অনেক পর্যটক বাঙালীকে কুঁদুলে বলে জানতেন। বাৎস্যায়ন ও বৃহস্পতির মতে রাজপুরীতে ও উচ্চবিত্তের অভিজাতদের ঘরে নারীরা ব্যভিচার ও দুর্নীতিপরায়ণা ছিল। নারীর শাড়ি ও পুরুষের খাটো ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল, সাধারণ লোক কায়িক শ্রমকালে পরত গামছা-কর্পটি। নারী বা পুরুষের উর্ধ্বাঙ্গ কৃচিৎ ওড়না-চাদরাবৃত থাকত। চৌলি-কাঁচুলির আটপৌরে ব্যবহার নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মেয়েদের মধ্যে ছিল না। অলঙ্কারে নারী-পুরুষে প্রভেদ ছিল সামান্য। বিত্তভেদে অলঙ্কার হত তাল-পাতার, শঙ্খের, পিতলের, কাচের, রুপার, সোনার ও মণিমুক্তার। অঙ্গুরী, কুণ্ডল, হার, কেয়ুর, বলয়, মেখলা, মল প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত অলঙ্কার। বাঙালী নারী-পুরুষের কোনো শিরোভূষণ ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ও ভিক্ষুরা কাঠের খড়ম পরত, গৃহস্থ সৈনিকরা চামড়ার জুতা ব্যবহার করত, ছাতা ছিল পাতার ও কাপড়ের, বিজনী ছিল তালপাতার, বাঁশের ও বেতের। সিন্দুর, কুমকুম, চন্দন, আলতা প্রভৃতি ছিল প্রসাধন দ্রব্য। বীণা, বাঁশি (বিভিন্ন ধরনের), মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, করতাল, ডম্বুরু, কাণ্ড, (কাড়া) কাহল প্রভৃতি ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। মন্দিরে দেবদাসীরা ও বেশ্যারা এবং হাড়ি-ডোমেরা গাইয়ে-বাজিয়ে নাচিয়ে ছিল। ভেলা-নৌকা-গরু-টানা শকট ছিল যানবাহন। এছাড়া বড়লোকের বাহন ছিল ঘোড়া, গাধা ও হাতী। ধান, ইক্ষু, কলাই, নারিকেল, সুপারি, আম, কাঠাল, কলা, লেবু, পান প্রভৃতিই প্রধান ফল ও ফসল ছিল। এদেশেও ক্ষৌম (শনের সুতার তৈরি), দুকূল ও সুতি কাপড় তৈরি হত। রঙ ও নকশার ব্যবহারও ছিল। সাধারণের গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজনীয় দারু-কারু ও চারুশিল্প এবং মূর্তিশিল্পের শিল্পী ছিল অবশ্যই দেশীলোক। খাজা, মোয়া (মোদক)। নাড়ু, খাঁড়, পিঠা, ফেনি (বাতাসা), কদমা, দুধশাকব (পায়েস), ক্ষীরসা, দই, শিখারিনী (ঘি দই গুড় আদা দিয়ে তৈরি—সুকুমার সেন) প্রভৃতি ছিল মিষ্টান্ন। জাড়ি, ভাণ্ডী, হাঁড়ি, তেলাবনী (তেলোন) প্রভৃতি ছিল মৃৎপাত্র। অবশ্য শাস্ত্র, শিক্ষা, বিত্ত ও বৃত্তিভেদে খাদ্য, আসবাব-তৈজস-পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরদোর প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পার্থক্য ও বৈচিত্র্য ছিল। আমরা কেবল সাধারণ-রূপের কথাই বললাম।

এ সূত্রে একটা কথা উল্লেখ্য যে, আর্যরা 'ঋক' বেদের কতকাংশ সঙ্গে করে বিজেতা হিসেবে ইরান থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ইরানে জ্ঞাতিদ্বন্দ্বে এরা ছিল দেশত্যাগী। আর্যরা ছিল প্রাকৃত শক্তির হোতা ও পশুপালক এবং সে-কারণে অর্ধযাযাবর। ইষ্টফল বাঞ্ছা করে তারা ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতশক্তির উদ্দেশে যাতবেদের (অগ্নির) মাধ্যমে যজ্ঞ হোম করত। এস্তরে পশু পালনই ছিল তাদের মুখ্য জীবিকা। তখনো তাদের মধ্যে দেব পূজা চালু ছিল না। গোধনই তাদের প্রধান ধন। ক্রমে সংখ্যাগুরু দেশীলোকের প্রভাবে তাদের মধ্যে দেশী জন্মান্তরবাদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মবাদ, ধ্যান, মন্দির-উপাসনা, মূর্তিপূজা, বৃক্ষ-পশু-পাখি ও নারীদেবতা পূজা চালু হল, সে-সঙ্গে এল নানা ব্রত-পূজা-পার্বণ এবং লৌকিক ও স্থানিক বিশ্বাস সংস্কার। এভাবেই তাদের বৈদিক জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা ক্রমে দৈশিক দেহতত্ত্বে ও পরলোক তত্ত্বে প্রভাবিত হয় এবং দৈশিক সাধনাতত্ত্বও গ্রহণ করে তারা। ফলে দেশী সাংখ, যোগ ও তন্ত্র ব্রাহ্মণ্য মতের, শাস্ত্রের ও সাধনার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে, এমনকি ব্রাহ্মণ্য তথা আর্যতত্ত্বচিন্তার চরম বিকাশ-প্রতীক উপনিষদও পূর্ব ভারতের অনার্য-মননে ঋদ্ধ বলে কারো কারো ধারণা। আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্ত তথা উত্তরাপথ বহির্ভূত বাঙলায় আর্য ধর্ম-সংস্কৃতি প্রবেশ করে অনেক পরে এবং তা জৈন-বৌদ্ধ প্রাবল্যের ফলে গণ-মানবে কখনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই বাঙলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সেন আমলেও পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এ কারণে বাঙলায় আমরা গীতা-স্মৃতি-সংহিতার পাশে দেশজ লৌকিক দেবতার প্রাধান্যও দেখতে পাই। দুই বিরুদ্ধ মত ও সংস্কৃতির পুরাণ মাধ্যমে আপসের ফলে গড়ে উঠেছে বাঙলার ব্রাহ্মণ্যবাদী পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজ। এতে আর্যভাগ নগণ্য, অনার্য লক্ষণ প্রধান ও প্রবল। মুসলিম সমাজেও ছিল স্থানিক ও লৌকিক বিশ্বাস-আচারের প্রবল প্রভাব। উনিশ শতকের ওহাবী ফরায়েজী আন্দোলনের ফলে লৌকিক ইসলাম আজ বাহ্যত প্রায় অবলুপ্ত।

॥ ১৮ ॥

মধ্যযুগের সাহিত্যে যথার্থ কিংবা পূর্ণাঙ্গ সমকালীন সমাজচিত্র মেলে না। মুখ্যত বর্ণিত বিষয় ও বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক না হলে কিছু বর্ণনা করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া সে-যুগের সাহিত্যের বিষয় ছিল প্রাচীনকালের তথা অতীতের দেব-দৈত্য-নর কিংবা রাজা-বাদশাহ-সামন্ত-সর্দার। আজকালকার গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের মতো সমকালের ও স্বস্থানের জগৎ-জীবন-জীবিকা, সমাজ-সংস্কৃতি, সমস্যা-সম্পদ কিংবা আনন্দ-যন্ত্রণা সে-যুগের লিখিয়েদের রচনার বিষয় ছিল না, তাই সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র সেখানে দুর্লভ। ক্বচিৎ কবির অনাবধানতায়-অজ্ঞতায়-কল্পনার দৈন্যে সমকালীন প্রতিবেশ ক্ষণিকের জন্যে উঁকি মেরেছে মাত্র। তাই আমাদের লোকায়ত জীবনে, লোকাচারে, লোক-সংস্কারে, বিশ্বাসে, প্রথা-পদ্ধতি-অনুষ্ঠানে যে আদিম লোক-বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-রীতি-রেওয়াজ অবিকৃত কিংবা রূপান্তরে আজো রয়ে গেছে, সে-তথ্য আমরা লিখিত সাহিত্যে পাইনে, পাই লোক-সাহিত্যে, লোক-আচারে ও গ্রামীণ উৎসবে-পার্বণে-অনুষ্ঠানে নানা আচার ও রীতি পদ্ধতির মধ্যে। আল্পনায়, লোকনৃত্যে, পার্বণিক লোক-সঙ্গীতে—যেমন গাজনে, গম্ভীরায়, লোকবাদ্যে, যেমন—একতারায়-দোতারায়-শিঙায়-বাঁশিতে, ভেঁপুতে, মন্দিরায়-খঞ্জনীতে ও ঢাকে-ঢোলে, আঁতুর ঘরের আচারে, ষষ্ঠীপূজায়, সাধভক্ষণে, গায়েহলুদে, পানিভরণে কিংবা কলাগাছ-ঘট-আমসারতীতে, ধানে-দূর্বায়-হলুদে-দীপে-ধূপে-ধূনায়-তেলোয়াইতে (অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবার মাথা তেলসিক্ত করা—অভ্যর্থনা আপ্যায়ণ ও বরণ করার জন্যে), মারোয়া সাজানোর আচারে, দুধ-মাছ-তত্ত্বে, তুক-তাক-যাদু-উচাটনে, বসুমতীপূজায়, কুমারীর বীজবপনে, পানি মাঙনে ও নানা কৃষি ও বুনন সংক্রান্ত ব্রতে, শক্তিপ্রতীক কাল্পনিক পীরপূজায়, বুনো হিংস্র জীব পূজায়, মহামারীর দেবতা পূজায় এবং প্রতিবেশানুকূল খেলাধুলায় আদি অস্ট্রিক-মঙ্গোলের অবিকশিত বুনো সমাজের ধ্যান-ধারণা ও আচার-সংস্কারের রেশ রয়ে গেছে—সেগুলোর কিছু কিছু আজো আমাদের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আরণ্য মানবে ভিন্নাকারে দেখা যায় এবং অন্য দেশের বিভিন্ন আদিম বুনো মানুষের সংস্কারে সেগুলোর জড় মেলে। বিভিন্ন 'মটিফে' বিন্যাস বিশ্লেষণ হলে আচারে ও তাৎপর্যে সাদৃশ্য যাচাই করা সহজ হবে। [১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার মৌল ধর্ম

সাংখ্য ও যোগ এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা একরকম সুনিশ্চিত।

না বললেও চলে যে বাঙালী গোত্র-সঙ্কর বা বর্ণ-সঙ্কর জাতি। বাঙালীর মধ্যে অস্ট্রিক প্রাধান্য থাকলেও ভোট-চীনার রক্ত মিশ্রণ যে বহুলপরিমাণে ঘটেছে, তা নৃতাত্ত্বিক বিচারেই যে প্রমাণিত তা নয়, তাদের নানা আচার-আচরণেও দৃশ্যমান। বলতে কী বাঙালীর দেহে আর্যরক্ত বরং দুর্লক্ষ। আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাবেই আভিজাত্যকামী বাঙালী আর্য নামে পরিচিত।

বাঙালীর শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানসপ্রসূত। তেমনি অনাদি-আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে 'নাথ' গ্রহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব-রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্বযুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজোদাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।

কোনো সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হূন-ইউচি-তুর্কি-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশিদিন রক্ষা করতে পারেনি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয়।

বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগপদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া, দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান এবং কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্ব দেশী মনন-প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন এবং একই লক্ষ্যে নিয়োজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রম-বিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র—তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্য শাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করে।

অতি প্রাচীন শিব—কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী-তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আদিরূপও—তথা বৃষ্টি, শস্য ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তান উৎপাদনের [সূর্য] দেবতার স্মারক-গুণও বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত দেবাদিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগ-পন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথপন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।

এই যোগই শিব-সংপৃক্ত হয়ে বৌদ্ধতান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক, নাথপন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথপন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্বও তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবিক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও এ যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেসানেস, হিউএন সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবনবতুতা, প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে (শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির প্রভাব ও উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে 'হুঙ্কার' তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কুলবৃক্ষ 'বকুল', আভরণ 'রুদ্রাক্ষ' ও কর্ণে কড়ি, আহার্য 'কচুশাক', শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যরই স্মারক :

মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম, ঝুলি, ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া। *(গোরক্ষ বিজয়)*

এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিসরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের।

দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহ নিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের অঙ্গি-সন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ-অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ী, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্যে পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন, এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ইঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী চতুষচক্র বা ষটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উলটা সাধনা প্রভৃতি নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।

এই সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ-সূর্য বা অগ্নি, ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ-শুক্র ও রজঃ-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগজ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। ['সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধ কা জোগ'—গোরখবাণী ' ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, পৃ. ১৬]।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালী তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করেনি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলাদেশেই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :

হাড়িফা পূর্বেতে গেল দক্ষিণে কানফাই
পশ্চিমেতে গোর্খ গেল উত্তরে মীনাই।

হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে-জ্বালন ধারায়-সমন্দরে?) কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এঁদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল।

পূরবদেশ পছাঁহী ঘাটি
[জনম] লিখ্যা হমারা জোঁগ
গুরু হমারা নাঁবগর কহী এ
মৈটে ভরম বিরোগঁ— *[গোরখবাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।]*

—পূর্বদেশে [আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে [আমি] যোগী, গুরু [আমার] ভব-সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।

শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের 'গোর্খা-নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান; মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলাদেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল গীতি, যোগীর গান ও যুগী কাচ আজো বাঙলাদেশেরই সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত। এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি, চাঁড়ালই ছিলেন।

AMARBOI.COM

ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রণা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি গোটা কাড়ি লীয়া পবন খলি দীয়াঁ ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী
তেল গোটা পীড়ি লীয়াঁ খুলী দীবী মেলী।

[গোরখবাণী, পিতাম্বর সম্পাদিত, পৃ. ১১৭]

এতেও এঁদের বাঙালিত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।

এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্মরহস্য থেকে মৃত্যুলক্ষণ অবধি সবকিছুর সন্ধান করেছেন। এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জর হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র, শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃতরসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টি-শক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী-শক্তি অক্ষত থেকে আয়ু বৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসের পথও হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের —

দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম থানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাটদেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়—এরই নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া ও আধুনিক বাউল।

চৈতন্যরূপ আত্মার রজঃ ও শুক্রতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজঃ ও শুক্ররূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজঃ, রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহাধারে আবদ্ধ রাখে।

সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম। কেননা এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। এখানেই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোঁহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউলগীতি, ধর্মমঙ্গল, শূন্যপূরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষবিজয়, অনিলপুরাণ, যোগীর গান, যুগীকাচ, হাড়মালা, জ্ঞানপ্রদীপ, যোগকলন্দর, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্যপরিচয়, নূরজামাল, গোর্খসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক-তাক, দারুটোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষও বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি। বাঙলা-পাক-ভারতের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধশাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী—উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল-রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র-শাসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীনকালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত ভারতবর্ষকে দান করেছে বাঙালীই।

চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালী। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। 'চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ'—অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত *[সৈয়দ সুলতান]*। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীসিদ্ধা রূপকাত্মক। তিনি বলেন, "চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মত চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যামাত্র।" *[ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খবিজয়'-এর ভূমিকাস্বরূপ নাথপন্থের 'সাহিত্যিক ঐতিহ্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১--খ (৬)]* ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তও সন্দেহ পোষণ করতেন।

(Obscure Religious Cult.)

মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এইজন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তার মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালীর এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালীর জীবনে এবং মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য মত ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে। এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈশিষ্ট্যে এনেছে ঔজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ-বিকৃতির ফলে পেলাম মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্যবিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা; ইসলামি বিকৃতিতে এল সত্যপীরকেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর—যাদের দু-চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতিনীতিতে আদিম Animism, Magic-belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিকথের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিকভাবেই সত্য। তিনি বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech ------ the ideas of 'Karma' and transmigration, the practice of 'Yoga', the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of Puja... ... as opposed to the Vedic ritual of Homa—all these and much more in Hindu religious thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the cocoanut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our istinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from Pre-Aryan ancestors.'
>
> *[Indo-Aryn and Hindi PP. 31-32]*

যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচারবর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচারবর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষ মতবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জ্বালন্ধরী পাদের অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাপালিকযোগী। নাথপন্থীরা ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। আর পা-পন্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমতভিত্তিক তথা আদি সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে 'নাথ' হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য-প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেবরূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য-মননপ্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।

দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এজন্য দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাস রূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্য বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।

দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও অপ্রাণ বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :

মন থির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্দ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।

[অক্ষয়কুমার দত্ত, 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ১১৮।]

বাঙালী মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু'চারটা আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা এরং রাকিনী প্রভৃতির বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া-সাধনাকে ইসলামি রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকিরের 'বালকানামা'য় পাই:

দিল্‌সে বৈঠে রাম-রহিম দিল্‌সে মালিক-সাঁই
দিল্‌সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান ভেস্ত পাই।
ঘরে বৈঠে চৌদ্দ ভুবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বহিছে ধারা। ......

[প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮]

অতএব, বাঙলার ও বাঙালীর আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামি আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন—পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলাদেশেও আল্লাহ-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে[১]।

যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধসমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে ওঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব-ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।

এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য এবং

১. শাহ্ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা'য় ও দৌলত উজির বাহরাম খানের 'লায়লী মজনু' কাব্যে ধর্ম বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। নাথ ও নিরঞ্জন, আদ্য ও পুরুষ পুরাণ সব রচনার সুলভ। ইউসুফ জোলেখায় :
   ক. মনে মনে ধর্ম আরাধন।
   খ. বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাত্র।
   গ. ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
   ঘ. ধর্মপথে ইউসুফ মাগন্ত যেহি রব।
   ঙ. জলিখাএ বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
   চ. ধর্মপথ স্মরি সত্বরে গমন।
   ছ. ধর্মের প্রসাদে আজি পূরিলেক আশ।
   জ. ধর্ম-আজ্ঞা তোমায় পুরিব মনস্কাম। ইত্যাদি অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেত্রপ্রাধান্যও—তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তাছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার 'হরধনু' ভঙ্গ করে তথা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে [লাঙ্গলের ফাল] গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে [যাতে হল পড়েনি] প্রাণ দান প্রভৃতি রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয়-নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।

জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়া ও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতন্ত্রে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছাসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কী বাধা আসে। কারণ-কার্য জ্ঞানের অভাবে প্রাতিকূল্য কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি ও মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারেনি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে। অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়-ধ্বংস হয় না। সে-বীজও বিচিত্র —কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড আবার কখনোবা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব—কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব। তাছাড়া স্বপ্নের অভিজ্ঞতাও তাকে এক্ষেত্রে প্রত্যয়ী করেছে।

আবার অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতীকের মাধ্যমে জানাতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং আত্ম-ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতীকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জরামুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।

মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা-পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপেক্ষার।

কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের নিয়ামক। এরই আধুনিক নাম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোনো কোনোটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত প্রতিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতা রূপে পরিকীর্তিত। যে-কোন সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি।

অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত-ধর্ম নয়—লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান—জনমানবের জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন, গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণ-সংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালীর পরিচয় ও আধুনিক বাঙালীর ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক।

বাঙালীর ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্য আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম্য-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পলোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরিবঘরের প্রতারিত-প্রবঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়।

তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখী-দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তোবা পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্যজীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।

AMARBOI.COM

বাঙলায় সূফী প্রভাব

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে সূফী দরবেশ এসেছিলেন কিনা ইতিহাস তা বলতে পারে না।[১] তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি[২] ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং হুদুদুল আলম গ্রন্থের বিবরণে প্রমাণে[৩] স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আটশতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য `Periplus in the Erythrean Sea' -এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্কে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহির সম্বন্ধ পাতিয়েছিল কিনা জানা নেই। তবে পরবর্তী কালের পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবন-যাপন রীতির কথা স্মরণে রাখলে এ সম্পর্কিত অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালী মুসলমানেরা বর্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে

১. সাহিত্য পত্রিকা : বর্ষা সংখ্যা ১৩৭০। বাঙলাদেশে মুসলমান আগমনের যুগ : ডক্টর আবদুল করিম পৃ. ৯২-১০২।
২. ক. পূর্ব পাকিস্থানে ইসলাম : ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ. ৯২।
খ. Memoirs of the Archaeological Survey of India : K.N. Diksit. P. 87.
গ. F.A. Khan : Pakistan Quarterly (মাহেনও, মার্চ ১৯৬৪ সন)
৩. History of India etc.: Elliot & Dawson Vol. I P. 2.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়নামতিতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কিনা বলা যাবে না। কেননা তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ ইসলাম প্রচারে আগ্রহী হয়নি, কী এমন কথা ভাবব কেন! আমাদের মনে হয় তখনো মুসলিম সমাজে সূফী মতবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যারা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দরবেশ না হলে তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতি রক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর মতো সূফীরা এসেও থাকেন, তাহলেও মুসলিম বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁদের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না। সূফীমত প্রসারের সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাহ্-কেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।

কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীর সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাঙলাদেশে তার আগেই বহু সূফীর আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর সাগরেদ[১] সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম শরকীর নিকট লিখিত পত্রে আছে :

> God be praised ! What a good land is that Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying buried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh Ahmad Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharifuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharifuddin Maneri, is lying buried at Sonargoan. And then there were Hazrat Bad Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal, what to speak of the cities, there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone underearth but those still alive are also in fairly large number.[2]

এতে বোঝা যায় চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে সূফীপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে-কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহ্র খবর আমরা জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদমশহীদ।[৩] বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহীদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিতম' সম্ভবত এঁরই জীবনচরিত[৪] —লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত

১. Akbar-al-Akhyar : P. 166.
২. Bengal : Past & Present : Vol. LXVII St. No. 130; 1948. P. 35-36.
৩. JASB. 1889 Vol. LVII. P 12ff.
৪. JASB. 1896 (N.N. Basu) PP. 36-37.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি।[৫] নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে[৬] বল্লাল্ সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।

চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং 'বদর মোকাম' খ্যাত বদর শাহ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ।[১]

শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম 'সেকশুভোদয়া'-র সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ একে জাল-গ্রন্থ মনে করেন[২]। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণসেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রীস্টাব্দের পরে বেঁচে থাকেন, তাহলে 'সেক শুভোদয়া' তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে ভাষার বিকৃতিতে ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাসবিরল সে-যুগে গ্রন্থকার হিসেবে হলায়ুধ মিশ্রের ও লক্ষ্মণসেনের নাম ও সত্য কাহিনী জড়িয়ে, আর্যা প্রভৃতির প্রাচীনরূপ রক্ষা করে ষোলো-সতেরো শতকে জাল-গ্রন্থ রচিত হয়েছে—অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। 'শেখশুভোদয়া' সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হলায়ুধ তাঁর কীর্তি-কথা বর্ণনা করেছেন 'সেকশুভোদয়া' (শেখের শুভ উদয়)[৩]

আবদুর রহমান চিশতির[৪] মতে জালালুদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দীর সাগরেদ ছিলেন।[৫] তিনি কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া নিযামুদ্দিন মুগরা ও দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লি এলে তাঁকে সুলতান ইলতুতমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালুদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাঙলায় আসেননি। আসলে শেখ বাঙলা থেকেই দিল্লি

---

৫. Social History of the Muslims in Bengal down to 1538 A.D. : Dr. A. Karim P. 87.

৬. JASB, 1896, pp. 36-37.

১. ক. বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ১৩২-১৩৩
   খ. Dist Gazetteers : Chittagong 1908, P 56. Dinajpur, 1912, P 20
   গ. মুসলিম বাঙলা সাহিত্য, মুহম্মদ এনামুল হক, পৃ. ২৩

২. ক Memoirs of Gaud and Pandua : A. A. Khan & Stapteton. PP. 105-6.
   খ. বা. সা. ই. পূর্বার্ধ : সুকুমার সেন
   গ. সেক শুভোদয়া

৩. ক. Ain-I-Akbari : Vol II
   খ. Akhbar-al-Akhyar : P 44.
   গ. Khazinat-al-Asfiya, Vol I, P 278 ff
   ঘ. Social History of Bengal, Dr. A. Rahim.
   ঙ. Social History of Muslims in Bengal down to 1538 A.D— Dr. A. Karim PP. 91-96.

৪. Mirat-al-Asrar : D. U. MS. No. 16/AR/143, Folio 19.

৫. Akhbar-al-Akhyar : PP. 44-45.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালালুদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজী বহুল আলোচিত সূফী।[১]

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমী নামে এক সূফীর দরগাহ্ আছে। ইনি ৪৪৫ হি. বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিল সূত্রে দাবি করা হয়।[২] এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetteer-এ উল্লেখ আছে।[৩] কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪] অতএব, উক্ত কোচ-রাজা কোনো কোচ-জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহীদের দরগাহ।[৫] ইনি জালালউদ্দিন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন।[৬] অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওরফে শাহ্ রাহী পীরের দরগাহ্ আছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।

বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ্ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হি. ১৬৮৫-৮৬) মিলে।[৭] তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত।[৮] ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎস্যাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগিজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ্ জালালউদ্দিন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[১] ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

---

১. পূর্বোক্ত গ্রন্থাদির অতিরিক্ত (ক) Khurahidi-Jahan Numa-Ilahi Baksh in JASB, 1895.
(খ) Sufiism and Saints etc. : J. A. Sobhan P. 331.
(গ) Tadhkirat-I-Auliya-Hind : Pt, I Mirza Muhammad Akhtar Dellawari. P. 56.
(ঘ) বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৯৬
(ঙ) Afdalul Fawad—Amir Khusru, P. 47.
(চ) বাংলার ইতিহাসে দুশো বছর (১৩৩৮-১৫৩৮) : সুখময় মুখোপাধ্যায়।
২. বঙ্গে সূফী প্রভাব : (১৯৩৫) পৃ. ১৩৮
৩. District Gazetteer : Mymensingh 1917 : p. 152.
৪. History of Assam. 1926; E. Gait : P. 46ff.
৫. District Gazetteer, Pabna 1923 : P: 121-26
৬. Sufism and Saints etc: J. A. Sobhan P. 236.
৭ ক. District Gazetteer Bogra : 1910, PP. 154-5.
খ. JASB, 1878, PP. 92-93.
৮. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৪০-৪১।
১. Ibn Battuta : Gibb.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মখদুম-উল-মুলক্ শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দিন আবু তওয়ামাহ্ সোনারগাঁয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রিস্টাব্দে[২] এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেন'-এ মুহম্মদ খান বর্ণিত শেখ শরফুদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি কি-না বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দিন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর।[৩] ইনি সম্ভবত শূন্যপুরাণোক্ত নিরঞ্জনের রুস্মার দম-মাদার এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ্ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশ-তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সূফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।[৪]

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দীন সুরক্ পুশ্ (Surkpush) নামে এক দরবেশও বাঙলায় এসেছিলেন। জাহান গস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে এবং 'উছ'-এ (Uchh) তাঁর সমাধি আছে।[৫]

শেখ আখি সিরাজুদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাই', তাঁর পুত্র নূর-কুতুব-ই-আলমের সাগরেদরা নূরী[৬] এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সূফীরা হোসেনী নামে পরিচিত ছিল। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ-যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর-কুতুব-ই-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর-কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নূর-কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুস্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ ওরফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[১]

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম সরকীর সমসাময়িক

---

২. (ক) Hadith literature in India : Dr M. Ishaq PP. 53-54
 (খ) Islamic Culture : Vol XXVII No I. January 1953, P. 10, note 9.
 (গ) Social History of Muslims in Bengal : Dr. A. Karim, PP. 67-72

৩. (ক) Mirat-I-Madar by Abdur Rahman Chisti : A. H. 1064, Mr. D. U. No. 217.
 (ডক্টর আবদুল করিমের Social History : পৃ. ১১৩-এ উদ্ধৃত)।

৪. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১১২—১৩।

৫. (ক) Memoirs of Gaud and Pandua, P. 92
 (খ) Sufism and its Saints etc. J. A. Sobhan (1933) PP. 236-37

৬. Bengal : Past & Present : Prof. S. Hasan Askari : 1948. P. 36, note 13.

৭. Social History of Bengal : Dr. A. Rahim. P. 77.

১. Riyad-as-Salam. P. 115—16.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন। সিমনানী ইব্রাহিম সরকীকে লিখিত এক পত্রে বদ্আলম ও বদর আলম যাহিদ নামে দুজন সূফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে-পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ সোহ্রাওয়ার্দিয়া ও রুহানিয়া সূফীকে হত্যা করেন।[২]

> Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. Its is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrwardia and Ruhania saints of the past that in near future that kingdom of Islam will be freed from the hands of the luckless non-believers.

শেখ বদরুল ইসলাম নূর-কুতুব-ইআলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস সালাতিন-এ বর্ণিত ঘটনার প্রকাশ : রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না-করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।

এরাঁ ছাড়া শাহ সফীউদ্দীন, জাফর খান গাজী[৩], খান জাহান আলী, শাহ আনোয়ার কুলি হালবী[৪], ইসমাইল গাজী[৫], মোল্লা আতা[৬], শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রি.)[৭], শাহ মোয়াজ্জেম দানিশ মন্দ্ ওরফে মৌলানা শাহ দৌলা (রাজশাহী, বাঘা)[৮], শাহ আলি বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরীদউদ্দীন শাহ লঙ্গর, শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি[৯] প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালউদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রি.)[১] মখ্দুম জাহানিয়া (১৩৭০-৮৩) ও শাহ্ জালাল কুনিয়াঈ (মৃ. ১৩৪৬) সোহরাওয়ার্দিয় মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দিন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮) শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, শেখ নূর-কুতুব-ই-আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।[২]

শাহ্ সফীউদ্দীন (মৃ. ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন। শাহ আল্লাহ্ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশ মন্দ্ নকশ্বন্দিয়া সূফী ছিলেন।[৩] ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ সুলতান বলখী (বায়জীদ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলম, কাতালপীর শাহ্ মসন্দর বা মোহ্সেন আউলিয়া, শাহ্পীর, শাহ্ চাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহাঁ আবদুল ওহাব ওরফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পীরের নাম মেলে।

---

২. Bengal Past & Present 1948, PP. 36-37

৩. -

৪. District Gazetteer : Hoghly P. 297ff, PP. 302-03.

৫. (ক) JASB, 1874, P. 215 ff. (খ) Risalat-al-Shuhda; (গ) বাংলা একাডেমী পত্রিকা : ১৩৭৬ সন, ডক্টর মমতাজুর রহমান তরফদার।

৬. JASB. 1872, PP 106-07, 1873, P 290.

৭. (ক) Akhbar-al-Akhyar; P 173, (খ) Khazinat-al-Asfiya Vol. 1. P 399.

৮. JASB. 1904. No. 2. p. 108 ff.

৯. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ১৪৩-৪৪

১. Akhbar-al-Akhyar PP. 44-45.

২. Riyasal-al-Salatin PP. 115-16

৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৯৩-১১৯)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্, সিকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ্, জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (যদু), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ, হোসেন শাহ প্রমুখের দরবেশ-ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্ জালালুদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নূর-কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঁগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলি খান, খান জাহান খান প্রমুখ সূফী রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সূফীগণ মন জয় করেন।

॥ ২ ॥

মুসলমানদের বিশ্বাস হযরত মুহম্মদ, হযরত আলিকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। সে জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কামীন বিন জয়দ ও হাসান বসরী আলি থেকে প্রাপ্ত হন। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসরী (মৃ. ৭২৮ খ্রি.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহম (মৃ. ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দারুদ তায়ী (মৃ. ৭৮১), মারুফ করখী (মৃ. ৮১৫) প্রমুখই সূফীমতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সূফী জুননুন মিসরী (মৃ. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে লিপিবদ্ধ সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। 'আল্লাহ্ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ'।[৪] 'আমরা তাঁর (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।[৫] এইপ্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত বিশ্বব্রহ্মতত্ত্বের বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে এগিয়ে যায়। যিক্‌র বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে : 'অতএব (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র'।[১]

সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্য বোধি তথা 'ইরফান' কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সূফীদের বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহ উস্ত' (সবই আল্লাহ্), বিশ্বব্রহ্ম তত্ত্ব তথা 'সবং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই হল তৌহিদ-ই ওজুদি তথা আল্লাহ্ সর্বভূতে বিরাজমান এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন। বায়াজিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরাসানী (মৃ. ১০৪৯) প্রমুখ প্রথমযুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। শরিয়ত-পন্থবিরোধী এসব সূফীর অনেককেই নূতন মত পোষণ ও প্রচারের জন্য প্রাণ হারাতে হয়। মনসুর হল্লাজ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ এভাবেই শহীদ হন।[২]

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন : 'ভারতে সূফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই'।[৩] তাঁর মতে এই ভারতীয় প্রভাব ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ

৪. কোরআন সূরাহ্ ২৪ আয়াত ৩৫।
৫. ঐ ঐ ৫০ ঐ ১৬।
১. কোরআন সূরাহ্ ৮৮ আয়াত ২১
২. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৩৪
৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৭৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে এবং আল-বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ।[৪] বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু বু-আলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।[৫] তিনি আরো বলেন : 'বাঙলাদেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগ সাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সূফীমতবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফীমতবাদ ও সাধনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। ....চিশতীয়হ ও সুহরবরদীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারত-বিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০ খ্রি.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগসাধনা ও সূফীদের 'তস্বরফ্' বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও সুফিদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন'।[১] আইন-ই-আকরবীতে[২] চৌদ্দটি সূফী খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে।

আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন এক এক পীরকেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে ওঠার ফলে সম্প্রদায়-সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে। আর অ-প্রধানগুলো কালে লোপ পায়, স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল কথিত চৌদ্দটি খান্দানের অনেকগুলিই লোপ পেয়েছে।

চিশ্‌তিয়া ও সুহ্‌রাওয়ার্দিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।[৩] এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরো পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোলো শতক অবধি চিশ্‌তিয়া, মাদারিয়া ও নকশবন্দিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মাদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্নরূপ নিল। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবীরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন-বিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পরে মুজদ্দদ-ই-আলফ-সানী শেখ আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। কিন্তু সে সংস্কার আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারেনি। নকশবন্দিয়া এবং কিছুটা কাদিরিয়া সম্প্রদায়েই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফা-সানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া। বাঙলায় দেশী তত্ত্বচিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহিরবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করি। ভারতীয় যোগচর্যাভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ

---

৪. ঐ : পৃ: ৭৫-৮০।

৫. The Mystics of Islam : R.A. Nicholson, P. 17.

১. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৩৮, ৪৫।

২. Ain-I-Akbari-Jarrat. Vol. III. P. 360ff.

৩. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ. ৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা আবশ্য কার্যত নয়—নামত। কেননা, আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামি রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোক-কেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে উঠে—এ হচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয় সত্তা—এর সঙ্গে সামরস্য জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধি চিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[৪]

সূফীর যিক্র ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়ম ও জপের রূপ নিল। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরানে সমরখন্দে বোখারায় বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দুপ্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকের অনুসৃতি বশে) সূফীসাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সূফীমাত্রই তাই পীর-মুর্শিদ নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যেই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর পূজারও (দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর স্তূপপূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল। সূফীরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশ শেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ্'। প্রথমটি 'রাবিতা' গুরুসংযোগ, দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 'মুরাকিবাহ'য় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন) দা'রা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি) সাকী, ইশক প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।[১]

সূফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন সাধারণ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানবশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে তাহারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরাপুরি বাঙালিই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না ; '........ দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল। তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার-বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ তো দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন। .....এখনও পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গীয় 'শয়খ' শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দুভাব, চিন্তা, আচার ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন (রয়েছে)। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।[২]

---

৪. (ক) Development of Metaphysics in Persia : Dr. M. Iqbal PP 110, 111
(খ) বঙ্গে সূফী প্রভাব পৃ. ৮১ (এক গ্রন্থে উদ্ধৃত : ইরশাদি-ই-খালকীয়হ আবদুল করিম, ২য় সং, পৃ. ১২৫-১৩৩)।

১. (ক) বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ-১৬৯-৮২ (খ) মুসলিম কবির পদসাহিত্য : ভূমিকা

২. বঙ্গে সূফী প্রভাব : পৃ: ১৬৩-৬৪।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগে কোনো বুলিই লেখ্যসাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হত না। আদিযুগে সংস্কৃতই ছিল বাঙলা-ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতি ও বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের ভাব-বিনিময়ের বাহন। বৌদ্ধ ও জৈনমত প্রচারের বাহনরূপেই প্রথম দুটো বুলি—পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যিক ভাষার স্তরে উন্নীত হয়। তারপর অনেককাল রাষ্ট্রশাসন কিংবা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগেনি বলে আর কোনো বুলিই লেখ্য-ভাষার মর্যাদা পায়নি। পরে সাহিত্যের প্রয়োজনে নাটকে শৌরসেনী, মারাঠি ও মাগধী প্রাকৃত ব্যবহৃত হতে থাকে। আরো পরে রাজপুত-রাজাদের প্রতিপোষকতায় শৌরসেনী অপভ্রষ্ট বা অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ভাষায় রূপ পায়।

এরপরে মুসলমান আমলে ফারসি হল দরবারি ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশী জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব এল, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক ভারতিক আর্যভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সূচিত হল। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। এ ব্যাপারে রামানন্দ, কলন্দর, নানক, কবীর, দাদু, একলব্য, রামদাস, চৈতন্য, রজব প্রভৃতি সন্তগণের দান মুখ্য ও অপরিমেয়।

AMARBOI.COM

এদিক দিয়ে পূর্বী বুলিগুলোর ভাগ্যই সবচেয়ে ভালো। এসব বুলি যখন সৃজ্যমান তখন এদের জননী অর্বাচীন অবহট্‌ঠ বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ের যোগ-তন্ত্র-শৈবমত প্রভাবিত এক উপশাখার সাধন ভজনের মাধ্যমে হবার সুযোগ পায়—যার ফলে আধুনিক আর্যভাষার (অবহট্‌ঠ থেকে ভাষাগুলোর সৃষ্টিকালের বা দুইস্তরে অন্তর্বর্তীকালের বা সন্ধিকালের) প্রাচীনতম নিদর্শন রূপ চর্যাগীতিগুলো পেয়েছি।

তুর্কি আমলে রাজশক্তির পোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হল। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হল চৈতন্য প্রবর্তিত মত। আবার আঠারো-উনিশ শতকে খ্রিস্ট ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের, হিন্দুসমাজ সংস্কারের এবং কোম্পানির শাসন পরিচালনের প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগসুবিধা পেয়েও বাঙলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীন বিকাশ লাভ করেনি; কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোনোদিন জাতীয় ভাষার বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি। আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগে পুষ্ট।

হয়তো দেশ শাসনের প্রয়োজনেই দেশী ভাষার অনুশীলনের প্রবর্তনা দিয়েছিলেন সুলতান-সুবাদারগণ। যেমনটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দেখেছি পরবর্তীকালে। কিন্তু সুলতান সুবাদারের প্রবর্তনা সত্ত্বেও সাধারণভাবে অনেককাল অভিজাতরা বাঙলা ভাষার প্রতি বিরূপ ছিল। হয়তো 'বুলি' বলেই এ অবজ্ঞা। ফলে উনিশ শতকের আগে বাঙলা কোনোদিন

শক্তিমানের পরিচর্যা পায়নি, তাই অন্তত দশ শতক থেকে বাঙলা ভাষায় সৃষ্টিকর্ম শুরু হলেও তা সময়ের অনুপাতে অগ্রসর হতে পারেনি। শেক্সপিয়র যখন তাঁর অমর নাটকগুলো রচনা করেছিলেন, তখন আমাদের ভাষায় মুকুন্দরাম ও সৈয়দ সুলতানই শ্রেষ্ঠ লেখক। প্রতিভার অভাবহেতুই আমাদের হিন্দু-মুসলমানের রচনা পুচ্ছগ্রাহিতায় তুচ্ছ।

মধ্যযুগে হিন্দুরা বাঙলাকে ধর্মকথা তথা রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের বাহনরূপেই কেবল ব্যবহার করতেন। মালাধর বসুর কথায়—'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার। পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব-সংসার'—এ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অতএব, তাঁরা গরজে পড়ে ধর্মীয় প্রচার-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যশিল্প গড়ে তুলবার প্রয়াসী হননি। দেবতার মাহাত্ম্যকথা জনপ্রিয় করার জন্যেই তাঁরা প্রণয়-বিরহ কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন, এবং এতে সাহিত্য-শিল্প যা গড়ে উঠেছে তথা সাহিত্যরস যা জমে উঠেছে,তা আনুষঙ্গিক ও আকস্মিক, উদ্দিষ্ট নয়। কাজেই বলতে হয়, মধ্যযুগে হিন্দুদের বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস ছিল না। লৌকিক ধর্মের প্রচারই লক্ষ্য ছিল। এর এক কারণ এ হতে পারে যে শিক্ষা ও সাহিত্যের বাহন ছিল সংস্কৃত। কাজেই শিক্ষিত মাত্রই সংস্কৃত-সাহিত্য পাঠ করত। তাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টির গরজ কেউ অনুভব করেননি। তাঁরা অশিক্ষিতদেরকে ধর্মকথা শোনানোর জন্যে ধর্ম-সংপৃক্ত পাঁচালী রচনা করতেন। তাতে রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণের অনুসৃতি ছিল। পরে সংস্কৃতের প্রভাব কমে গেলেও এবং বাঙলা প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব পেলেও পূর্বেকার রীতির বদল হয়নি আঠারো শতক অবধি। আঠারো শতকেই আমরা কয়েকজন হিন্দু প্রণয়োপাখ্যান রচয়িতার সাক্ষাৎ পাচ্ছি।

বাঙলাদেশের প্রায়-সবাই দেশজ মুসলমান। তাই বাঙলা সাহিত্যের উন্মেষ-যুগে সুলতান-সুবেদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলায় সাহিত্য সৃষ্টি করেননি; মুসলমানরাও তাঁদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগের বাঙালি মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেবধর্ম-প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্যরস পরিবেশনের জন্যে তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধসাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্যদানের গৌরবও তাঁদেরই। কেননা, সবরকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানের দ্বারা এই মানবরসাশ্রিত সাহিত্যধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানি ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এদেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে এবং একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাজাত্যবোধ ইরানি সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে ছয়শ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু-লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেননি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সংপৃক্ত।

মুসলমান রচিত সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবিকতা—যা মানুষ সম্বন্ধে কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই নির্দেশ করে। বাহুবল, মনোবল আর বিলাসবাঞ্ছাই সে-জীবনের ব্রত এবং ভোগই লক্ষ্য। এক কথায়, সংঘাতময় বিচিত্র দ্বান্দ্বিক জীবনের উল্লাসই এ সাহিত্যে অভিব্যক্ত।

বাঙলা-ভারতে মুসলমান অধিকার যেমন ইরানি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এদেশবাসীর পরিচয় ঘটিয়েছে, তেমনি একচ্ছত্র শাসন ভারতের অঞ্চলগুলোর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এরূপে বাঙালিরা ইরানি ও হিন্দুস্তানি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে এ দুটোর আদর্শে ও অনুসরণে নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্যা করে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ঋদ্ধ হয়েছে।

অবশ্য হিন্দু-মুসলমানের প্রায় সব রচনাই (বৈষ্ণবসাহিত্যও) মূলত অনুবাদ ও অনুকৃতি এবং মুখ্যত পৌনঃপুনিকতাদুষ্ট। মৌলিক রচনা দুর্লক্ষ্য। এর কারণ প্রতিভাধর কেউ সাধারণত বাঙলা রচনায় হাত দেননি, অর্থাৎ সংস্কৃতে কিংবা ফারসিতে লিখবার যোগ্যতা যাঁর ছিল, তিনি বাঙলায় সাধারণত লেখেননি। বাঙলা তখনো তাঁদের চোখের 'বুলি' মাত্র। এ-যুগে শিক্ষিতজন যেমন লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা পাঠে বিমুখ, সে-যুগে তেমনি তাঁরা বাঙলা ভাষা ও বাঙলা রচনার প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাচ্ছিল্যজাত এ অবহেলা বাঙলা-ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ মন্থর করেছিল।

এ ছাড়াও আর দুটো প্রবল কারণ ছিল : (ক) সেন-রাজারা বাঙলায় উত্তর-ভারতিক ব্রাহ্মণ্যসমাজ ও সংস্কৃতি গঠনে তৎপর ছিলেন। পাছে দেশী সংস্কৃতি সৃজ্যমান ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকে বিকৃত করে, সম্ভবত এই আশঙ্কায় শূদ্রের শিক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছিলেন, এভাবে দেশী লোককে মূর্খ রেখে দেশের ভাষাচর্চার পথ রুদ্ধ রেখেছিলেন তাঁরা। আর তখন বস্তুত অবহট্‌ঠের যুগ। তাই অবহট্‌ঠের যুগে সংস্কৃতচর্চায় উৎসাহ দান করা রাজকীয় ব্রত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। (খ) অপরদিকে দেবভাষা সংস্কৃত ও স্বর্গীয় ভাষা আরবি থেকে শাস্ত্রানুবাদ পাপকর্ম বলে গণ্য হত; ভাষান্তরিত হলে মন্ত্রের বা আয়াতের মহিমা ও পবিত্রতা নষ্ট হবে—এ ধারণা আজো প্রবল। মুসলমানদের অতিরিক্ত একটা বাধা ছিল, তারা বাঙলাকে হিন্দুয়ানি ভাষা বলে জানত। এদিকে বিজাতি-বিধর্মী রাজার সমর্থন ছিল বলে ব্রাহ্মণদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব হয়নি বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যসমাজ নৈতিক প্রতিরোধের দ্বারা বাঙলা চর্চা ব্যাহত করবার প্রয়াসী ছিলেন। তাঁরা পাঁতি দিলেন:

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

আঠারো শতক অবধি ঐ বিরূপতা-যে ছিল, তার প্রমাণ মিলে অবজ্ঞাসূচক একটি বাঙলা ছড়ায়। এতে কাশীরাম দাসের নাম রয়েছে :

কৃত্তিবেসে কাশীদেসে আর বামুণ-ঘেঁষে
—এ তিন সর্বনেশে।

শাস্ত্রকথার বাঙলা তর্জমার প্রতিবাদে মুসলমান সমাজেও সতেরো শতক অবধি মুখর ছিল, তার আভাস রয়েছে বিভিন্ন কবির কৈফিয়তের সূত্রে। এঁদের কেউ কেউ তীব্র প্রতিবাদীও : যেমন—

শাহ্ মুহম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৩৯০ খ্রিস্টাব্দে) বলেন :

নানা কাব্য-কথা-রসে মজে নরগণ
যার যেই শ্রদ্ধাএ সন্তোষ করে মন।
না লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পায়
দুষিব সকল তাক ইহ না জুয়ায়।
গুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা
না হয় ভাষায় কিছু হএ কথা সাচা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ সুলতান [১৫৮৪ খ্রি.] বলেছেন :

কর্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালী উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।

ফলে, *আপনা দীনের বোল এক না বুঝিলা*
প্রস্তাব পাইয়া সব ভুলিয়া রহিলা।

কিন্তু *যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন*
সেই ভাষা হয় তার অমূল্য রতন।

তবু, *যে সবে আপনা বোল না পারে বুঝিতে।*
পঞ্চালি রচিলুঁ করি আছেত দুষিতে।
মুনাফিক বোলে মোরে কিতাবেতে পড়ি
কিতাবের কথা দিলুঁ হিন্দুয়ানী করি।

অবশ্য, *মোহোর মনের ভাব জানে করতারে*
যথেক মনের কথা কহিমু কাহারে।

আমাদের হাজী মুহম্মদও [ষোলো শতক] নিঃসংশয় নন, তাই তিনি দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি :

যে-কিছু করিছে মানা না করিঅ তারে
ফরমান না মানিলে আজাব আখেরে।
হিন্দুয়ানি লেখা তারে না পারি লিখিতে
কিঞ্চিৎ কহিলুঁ কিছু লোকে জ্ঞান পাইতে।

মনের দিক দিয়ে নিঃসংশয় না হলেও যৌক্তিক বিচারে এতে পাপের কিছু নেই বলেই কবির বিশ্বাস। তাই তিনি পাঠক সাধারণকে বলছেন :

হিন্দুয়ানী অক্ষর দেখি না করিঅ হেলা
বাঙ্গালা অক্ষর প'রে 'আজ্ঞি' মহাধন
তাকে হেলা করিবে কিসের কারণ।
যে-আজ্ঞি পীর সবে করিছে বাখান
কিঞ্চিৎ যে তাহা হোন্তে জ্ঞানের প্রমাণ।
যেন তেন মতে যে জানৌক রাত্র দিন
দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ।

এঁর পরবর্তী কবি মুতালিবেরও (১৬৩৯ খ্রি.) ভয় :

আরবীতে সকলে না বুঝে ভাল মন্দ
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলুঁ প্রবন্ধ।
মুসলমানি শাস্ত্র কথা বাঙলা করিলুঁ
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলুঁ।
কিন্তু মাত্র ভরসা আছএ মনান্তরে
বুঝিয়া মুমীন দোয়া করিব আমারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুমীনের আশীর্বাদে পুণ্য হইবেক
অবশ্য গফুর আল্লা পাপ ক্ষমিবেক।

আমীর হামজা (১৬৮৪ খ্রি.) রচয়িতা আবদুন্ নবীরও সেই ভয় :

মুসলমানী কথা দেখি মনেহ ডরাই
রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই।
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভয়
দৃঢ়ভাবে রচিবারে ইচ্ছিল হৃদয়।

রাজ্জাক-নন্দন আবদুল হাকিমের [সতেরো শতক] মনে কিন্তু কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব তো নেই-ই, পরন্তু যারা এসব গোঁড়ামি দেখায়, তাদের প্রতি তাঁর বিরক্তি তীব্র ভাষায় ও অশ্লীল উক্তির মাধ্যমে করেছেন তিনি:

যেই দেশে যেই বাক্য কহে নরগণ
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।
মারফত ভেদে যার নাহিক গমন
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবেরগণ।
যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ না যায়।
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।

AMARBOI.COM

হিন্দুয়ানি মাতৃভাষার প্রতি এতখানি অনুরাগ সে-যুগের আর কোনো মুসলিম-কবির দেখা যায় না।

অতএব, সতেরো শতক অবধি মুসলমান-লেখকেরা শাস্ত্রকথা বাঙলায় লেখা বৈধ কি-না সে-বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। আমরা শাহ্ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ অনেক কবির উক্তিতেই এ দ্বিধার আভাস পেয়েছি। সুতরাং যাঁরা বাঙলায় শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁরা দ্বিধা ও পাপের ঝুঁকি নিয়েই করেছেন। এতে তাঁদের মনোবল, সাহস ও যুক্তিপ্রবণতার পরিচয় মেলে।

উন্নাসিক ব্রাহ্মণ্য অভিজাতদের কাছে বাঙলা ছিল 'ভাষা'। উন্নাসিক মুসলিমদের কাছে 'হিন্দুয়ানি ভাষা'। কারুর চোখে 'প্রাকৃত ভাষা' [দ্বিজ শ্রীধর ও রামচন্দ্র খান], কারুর মতে 'লোক ভাষা' [মাধবাচার্য ১৬ শতক], কেউ বলেন লৌকিক ভাষা [কবি শেখর ১৭ শতক], অধিকাংশ লেখক 'দেশী ভাষা' এবং কিছুসংখ্যক লেখক 'বঙ্গভাষা' বলে উল্লেখ করতেন। বহিরাঞ্চলে এ-ভাষার নাম ছিল গৌড়িয়া।

মধ্যযুগ হিন্দুয়ানি ভাষার প্রতি মুসলমানদের বিরূপতা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসপ্রসূত। কিন্তু উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সে বিরূপতাও রাজনৈতিক যুক্তিভিত্তিক হয়ে আরো প্রবল হবার প্রবণতা দেখায়।

তুর্কি ও মুঘলেরা এদেশে মুসলিম-শাসন দৃঢ়মূল করবার প্রয়োজনে বিদেশী ও দেশী মুসলিম-মনে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধ জিইয়ে রাখতে প্রয়াসী হন। ধর্মের উৎসভূমি আরব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং শাসক ও সংস্কৃতির উদ্ভবক্ষেত্র ইরান-সমরকন্দ-বুখারার প্রতি জনমনে শ্রদ্ধাবোধ ও মানস-আকর্ষণ সৃষ্টির ও লালনের উদ্দেশ্যে কাফের-বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে স্বাতন্ত্র্যবোধ জিইয়ে রাখার জন্যে শাসক গোষ্ঠীর একটি সচেতন প্রয়াস ছিল। আলাউল হক, তাঁর পুত্র নূর কুতবে আলম, জাহাঁগীর সিমনানী, মুজাদ্দিদ-ই আলফ্ সানী, শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ প্রভৃতির পত্রে এ মনোভাবের আভাস আছে। আর মুসলিম-রচিত ইতিহাসের ভাষায় আর ভঙ্গিতেও হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ এবং অবজ্ঞা প্রায় সর্বত্র পরিস্ফুট। অনুকূল পরিবেশে এই বহির্মুখী মানসিকতা মুসলিম-মনে ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে। ইরানে সাফাবী বংশীয় রাজত্বের অবসানে কিছুসংখ্যক বাস্তুত্যাগী ইরানি নাকি বাঙলায়ও বসবাস করতে এসেছিল। সম্ভবত তাদের সাহচর্য আভিজাত্যলোভী দেশী মুসলমানদের বহির্মুখী মানসিকতাকে আরো প্রবল করেছিল। ফারসি ভাষার বাস্তব গুরুত্বে ও ইরানি সংস্কৃতির মর্যাদায় প্রলুব্ধ বাঙালি তা গ্রহণে-বরণে (উনিশ শতকের বাঙালির ইংরেজি ও বিলেতি সংস্কৃতি গ্রহণের মতোই) আগ্রহ দেখাবে—এ-ই ছিল স্বাভাবিক।

এমনিতেই আভিজাত্যলোভে শিক্ষিত দেশী মুসলমানরা চিরকাল নিজেদের বিদেশাগত মুসলমানের বংশধর বলে পরিচয় দিয়ে আসছে। ফজলে রব্বী খান বাহাদুর তাঁর 'হকিকতে মুসলমানে বাঙ্গালা' (অনুবাদ : The Origin of the Musalmans of Bengal. 1895 A.D) গ্রন্থে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাঙালি মুসলমানেরা প্রায় সবাই বহিরাগত। আঠারো শতকে কোম্পানি শাসন প্রবর্তিত হলেও নবাবী আমলের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া অনেককাল বিলীন হয়নি। ফারসি ছিল ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি দরবারি ভাষা। কাজেই ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত সমাজ তখনো মধ্যযুগীয় আমিরি স্বপ্নে বিভোর, যদিও তাঁদের অজ্ঞাতেই তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। যখন দুর্ভাগ্যের দুর্দিন সত্যই তাদের সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল, তখনো হৃতসর্বস্ব মুসলমান উত্তর-ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল জ্ঞাতির ঐশ্বর্যগর্বে নিজের দীনতা ভুলবার নিষ্ফল আশায়। তখন আরবি নয়, এমনকি ফারসিও তত নয়, উর্দুপ্রীতিই তাদের মানসিক সান্ত্বনার অবলম্বন হল। 'উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গলা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।" [১৯২৭ সন, *হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিত*, ভূমিকা। মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ। ইনি নিজে ছিলেন বাঙলা লেখক ও সাংবাদিক।] তাই নওয়াব আবদুল লতিফের (১৯২৬-৯৪) মুখে শুনতে পাই : 'বাঙলার মুসলিম ছোটলোকদের ভাষা বাঙলা। আর অভিজাতদের ভাষা উর্দু'।

বাঙলার প্রতি মুসলমানদের মনোভাব কত বিচিত্র ছিল তার দু' একটি নমুনা দিচ্ছি : "A Muhammadan Gentleman about 1215 B.S. (1880 A.D.) enjoined in his deathbed that his only son should not learn Bengali, al it would make him effiminate. ... Muhammadan gentry of Bengal too wrotein Persian and spoke in Hindustani."
(JASB 1925 PP 192-93: A Bengali Book written in persian Script; Khan Saheb Abdul Wali)

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের পূর্ব উদ্ধৃতি উক্তিও স্মর্তব্য।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'আমার জীবনী' (১৩১৫ সন) গ্রন্থে লিখেছেন : 'মুন্সী সাহেব (তাঁর শিক্ষক) বাঙ্গালার অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। আমার পূজনীয় পিতা বাঙ্গালার একটি অক্ষরও লিখিতে পারিতেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর মশাররফ হোসেনের 'গৌরাই ব্রীজ বা গৌরীসেতু' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র (?) যে মন্তব্য করেছিলেন তাতেও মুসলিম সমাজমনের পরিচয় পাই : "যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত বর্গ থাকিবে যে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে (হিন্দু-মুসলমান) ঐক্য জন্মিবে না।"

[হিন্দু-মুসলমান ঐক্য তখনো ছিল না—শাসক-শাসিতসুলভ অবজ্ঞা-বিদ্বেষের জেরই বিদ্যমান ছিল।]

'বাঙ্গালা ভাষা হিন্দুগণের ভাষা।' (নবনূর : ভাদ্র ১৩১০ সন : মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার— লেখক—কেন চিৎমর্মাহতের— হিতকামিনা— আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।)

"আমি জাতিতে মোসলমান,- বঙ্গভাষা আমার জাতীয় ভাষা নহে।" [হিন্দু-মুসলমান (ঢাকা ১৮৮৮ সন) গ্রন্থলেখক শেখ আবদুস সোবহান। ইনি 'ইসলাম সুহৃদ' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।]

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ, তাঁর পুত্র শাহ্ আবদুল কাদির ও ওহাবী (মুহাম্মদী) আন্দোলনের প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর আন্দোলনের বাহন ছিল উর্দু। সে-সূত্রেও ইসলামি সাহিত্যের আধাররূপে উর্দু ধর্ম ও জাতি-প্রাণ মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ কারণে শেখ আবদুর রহিম, নওশের আলী খান ইউসুফজাই, মৌলানা আকরম খান প্রমুখ অনেক বাঙলা লেখকও উর্দুর প্রয়োজনীয়তা (পাকিস্তান পূর্বযুগেও) অনুভব করতেন। শেখ আবদুর রহিম বলেছেন :" বঙ্গীয় মুসলানদিগের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা না করিলে চলিতে পারে না— ধর্মভাষা আরবী, তৎসহ ফারসী এবং উর্দু এই দুইটি, আর রাজভাষা ইংরেজি তৎসহ মাতৃভাষা বঙ্গালা।" (৮ই পৌষ ১৩০৬ সন—মিহির ও সুধাকর)।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খান বলেছিলেন : 'উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার। (তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মেলন : অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ)

সাধারণভাবে বলতে গেলে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বাবধি (১৯২০ খ্রি.) একশ্রেণীর বাঙালী মুসলমান উর্দু-বাঙলার দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এঁদের মধ্যে মাদ্রাসা-শিক্ষিত এবং জমিদার-অভিজাতরাই ছিলেন বেশি। বাঙালী মুসলমানের অশিক্ষার সুযোগ উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশক অবধি স্ব-আরোপিত (Self-assumed) অবাধ নেতৃত্ব পেয়েছিলেন নবাব আবদুল লতিফ, আমির হোসেন (বিহারী), সৈয়দ আমির আলী, নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নবাব আলী প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমের উর্দুভাষী বংশধরগণ। তাঁরাই বাঙালী মুসলমানের মুখপাত্র হিসেবে উর্দুকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষারূপে বিদ্যালয়ে চালাবার স্বপ্ন দেখতেন। পাকিস্তান-উত্তর যুগে তাঁদেরই বংশধর কিংবা জ্ঞাতিত্ব লোভীরাই উর্দুকে বাঙালীর ওপর চাপিয়ে দেবার প্রয়াসী ছিলেন, আজো একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক ও সাহিত্যিক বাঙলায় আরবি-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ দ্বারা স্বাদ পাবার প্রয়াসী।

অতএব, গোড়া থেকেই বাঙলা ভাষার অনুশীলনে মুসলমানরা বিবিধ কারণে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। আজো সে-দ্বিধা থেকে তাদের অনেকেই মুক্ত নয়। এভাবে বাঙলা মুসলিম গুণী-জ্ঞানীর আন্তরিক পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত ছিল। তার ফলে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলিম অবদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতখানি থাকা বাঞ্ছনীয় ও স্বাভাবিক ছিল, তা মেলেনি। সৈয়দ সুলতান প্রমুখ কবিরা দ্বিধাগ্রস্ত হলেও বহু যুক্তি দিয়ে তাঁরা একদিকে নিজেদের বাঙলা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, অপরদিকে বিরূপ সমালোচনা প্রতিহত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ

বাঁচার তাগিদই মানুষের সব কর্মপ্রয়াসের ও আচরণের ভিত্তি ও উৎস। এর থেকেই জন্মে প্রতিবেশ-পরিবেষ্টনীর—জীব-উদ্ভিদের সঙ্গে সখ্য ও শত্রুতা। আগাছার জঙ্গল কাটতে হয় আর সযত্নে রাখতে হয় খাদ্য-ফলের গাছ। জীবনের নিরাপত্তা ও জীবিকার সহায় কুকুর পায় লালন আর প্রাণবিনাশী সাপ-সিংহ পায় তাড়ন। মানুষের স্বশ্রেণীর মধ্যেও সখ্য ও শত্রুতা ঐ একই কারণে গড়ে ওঠে। সমস্বার্থে জন্মে গড়ে ওঠে ঐক্যমত সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের সদিচ্ছা আর অসমস্বার্থে বিদ্বেষবিষ, বাধে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত।

একদিন এই সমস্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল যৌথ প্রয়াসের—গড়ে উঠেছিল গোত্রীয় সংহতি। আরো পরে জীবিকা-সামগ্রীর অপ্রতুলতা মানুষকে প্রবর্তনা দিয়েছিল বিভিন্ন গোত্রের সহাবস্থানে ও সহযোগিতায়। এ-স্তরে মিলনের সেতু হয়েছিল স্রষ্টার সার্বভৌমত্বের অঙ্গীকার এবং ভিত্তি হয়েছিল স্বীকৃত নীতি। এই অঙ্গীকারের ও নীতির রকমফের ক্রমে গড়ে তোলে বহু প্রতিদ্বন্দ্বী মত ও পথ। গোড়ার দিকে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সার্বিক সংহতি লক্ষ্যে যার উদ্ভাবন, তা-ই এভাবে খণ্ড ও ক্ষুদ্র সংহতির আধাররূপে দলীয় ও উপদলীয় নিত্য কোন্দলের কারণ হয়ে দেখা দিল।

বলেছি, সম ও সহস্বার্থেই গড়ে ওঠে দল। 'প্রবলের উদ্‌বর্তন' নীতিভিত্তিক সমাজে সম ও সহস্বার্থবোধ স্থায়ী হতে পারে না। আত্মশক্তিসচেতন ও আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কাজেই তৈরি হয় নতুন নতুন দল। মনের, মতের ও স্বার্থের ঐক্যই দল গঠনের ভিত্তি। আবার স্বার্থবোধই মনের ও মতের ঐক্য ও অনৈক্যের স্রষ্টা। অতএব স্বার্থের প্রেরণাবশেই সখ্য ও সংহতি কিংবা বৈর ও স্বাতন্ত্র্য জিইয়ে রাখার অঙ্গীকারেই দলীয় সংহতির স্থিতি। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বী বা ভিন্ন দলগুলোকে পর, সন্দেহভাজন ও শত্রু না ভাবলে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সুতরাং অন্যদের প্রতি অবজ্ঞা, ঈর্ষা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পোষণ করেই স্বদলের প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা অটল রাখতে হয়।

সব দলই এক রকম। শাস্ত্রীয় দল তথা ধর্ম-সম্প্রদায় ঐহিক-পারত্রিক জীবন সম্পৃক্ত বলে ওতে আনুগত্য ও নিষ্ঠা বেশি ও চিরন্তন আর পার্থিব স্বার্থসংশ্লিষ্ট দল ত্যাগে কিংবা ভঙ্গে পাপভীতি নেই বলে তা ঘন ঘন প্রয়োজনমত ভাঙা, গড়া ও ছাড়া চলে। তাই ধর্মীয় দলের পারস্পরিক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও মারাত্মক। দল মাত্রেরই পূর্বশর্ত ও জন্মশর্ত অন্য দলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-কোন্দল। ফলে ধার্মিক মানুষের সেক্যুলার হওয়ার আগ্রহ সোনার পাথর বাটি বানানোর মতই অবাস্তব ও অসম্ভব। কেননা স্বধর্মে নিষ্ঠা ও আনুগত্যের মৌল শর্ত ও বাহ্য লক্ষণই হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভবে ও আচরণে পরধর্মে অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন। তাই একজন ধার্মিক বা আস্তিক বড়জোর পরমতসহিষ্ণু হতে পারে, কিন্তু পরশাস্ত্রে কখনো শ্রদ্ধা রাখতে পারে না। পুরুষানুক্রমিক শাস্ত্রশাসন ও ধর্মবোধ আশৈশবের সংস্কাররূপে মনুষ্যমনে অবিমোচ্য হয়ে স্থায়ী হয়। সাধারণ মানুষ পোষমানা প্রাণীর মতো শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের নিগড়ে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত ও স্বস্থ হয়। এই শাস্ত্র মেনেই ইহ-পরকালে প্রসারিত জীবনে সে থাকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত । এই শাস্ত্র তার ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণ নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এর বাইরে কিছু ভাবা বা করা সে পাপ বলেই জানে। তাই বিনাপ্রশ্নে সে শাস্ত্র মানে। এমন মানুষ বিধর্মী-বিদ্বেষী না হয়ে পারে না। বিধর্মে অনাস্থা ও বিধর্মী-বিদ্বেষ স্বধর্মনিষ্ঠার ও আদর্শ শাস্ত্রীয় জীবনের লক্ষণ। হিন্দুতে মিসকিন খাইয়ে, মোল্লাকে দক্ষিণা দিয়ে পুণ্যার্জনের যেমনি আশা করতে পারে না, তেমনি পারে না মুসলমানও কাঙাল-ভোজন করিয়ে, ফিৎরা বা যাকাত কাফেরকে দিয়ে। এইজন্যেই ধার্মিকেরা সাধারণত গোঁড়া অনুদার এবং বিবেচনাবোধ ও বিবেকবুদ্ধিহীন।

শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে নয়, দেশ-জাত-বর্ণ ও শ্রেণীর ক্ষেত্রেও দলীয় দ্বন্দ্ব-কোন্দল কম হয়নি বা হয় না। একালে আমরা ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বিধর্মী-বিদ্বেষ তো বটেই, সে-সঙ্গে জাত-বর্ণ-শ্রেণী বিদ্বেষও প্রবল দেখছি। আফ্রিকায় দেখছি, আদিম গোত্র-দ্বেষণা ও বর্ণভেদ; আমেরিকায়ও রয়েছে বর্ণভেদ; অন্যান্য দেশেও ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র-চেতনা আজো অবিলুপ্ত। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' ঐ জাতীয় নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ শূদ্র ইত্যাদি প্রাচীন বর্ণমূলক জাতি; কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায়মূলক জাতি। কিন্তু 'হিন্দু' জাতি ছিল না। ... হিন্দু ধর্মও ছিল না । ছিল শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর বা গাণপত্য সম্প্রদায়। (*বাংলা সাহিত্য কথা, মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ১৯)।* এ স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও দেশজাত বর্ণধর্ম ও শ্রেণী-দ্বেষণার মূলে জীবিকা-সম্পৃক্ত অসূয়া বিরোধ ও প্রতিযোগিতাই কাজ করে। এ-যুগের ভাষায় এ দ্বন্দ্ব-দ্বেষণার কারণ মূলত আর্থিক। কেননা আমরা দেখতে পাই যেখানে ভিন্ন গোত্রের বর্ণের জাতের শ্রেণীর বা ধর্মের লোক নগণ্য, যেখানে ভিন্ন গোত্রের বর্ণের জাতের শ্রেণীর বা ধর্মের লোক নগণ্যসংখ্যক; সেখানে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মানুষ নিষ্ক্রিয়বিদ্বেষী, অর্থাৎ কেবল অবজ্ঞাপরায়ণ ও উদাসীন। যেখানে বিভিন্ন গোত্রের, ধর্মের ও বর্ণের মানুষের সংখ্যা নগণ্য নয় বরং সম্পদ সম্ভোগে ও অর্থোপার্জনে একে অপরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী, সেখানেই জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র ও শ্রেণীবিদ্বেষ সক্রিয় এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। এ বিদ্বেষ বারোমাস সক্রিয় থাকলে সহাবস্থান সম্ভব হত না। কিন্তু নিষ্ক্রিয়াবস্থায়ও অবচেতন মনে ভিন্ন দলের ধর্মের গোত্রের বর্ণের জাতের ও দেশের মানুষের প্রতি অবচেতন মনে একটা অনাত্মীয় ভাব জেগে থাকে—একটা ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া থাকে, কিছুতেই সে-বাধা অতিক্রম করা যায় না। কাজেই আস্তিক মানুষের বিধর্মীবিদ্বেষ, সাধারণ মানুষের দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-দ্বেষণা এতই স্বাভাবিক ব্যাপার যে, এ নিয়ে কোনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র বা শাসককে দায়ী করে নিন্দা করা অবিবেচকের আচরণ মাত্র। বিদ্বানদের এ অবিবেচনাও মানুষের অনেক দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ হয়েছে।

তবু ব্যক্তি সম্পর্কে মানুষ কখনো দেশে-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্রে ভেদ-বাধা মানেনি। চিরকাল ব্যক্তিগত জীবনে দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম অস্বীকার করে মানুষ মানুষকে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের বাঁধনে বেঁধেছে। আত্মীয় বলে মেনেছে। জীবনের সহায় সহচর বলে জেনেছে। আমরা রাজনীতি ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই বড় করে দেখি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও দেখাই। গরজে পড়ে গোঁজামিল দিতে চাই, তাই ফাঁকির ফাঁক থেকেই যায়। এর ফলে ইতিহাস হয় বিকৃত, রাজনীতিও হয় না অভীষ্ট ফলপ্রসূ।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলায় আমরা হিন্দু-বৌদ্ধে, শৈব-শক্তি-বৈষ্ণবে, বাঙালি-অবাঙালিতে ও বিদেশী-বিজাতী-বিভাষী-বিধর্মী তুর্কি-মুঘল শাসকের প্রতি শাসিতজনের এমনকি আঞ্চলিক অবজ্ঞা-বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও সংঘর্ষ-সংঘাতের সংবাদ নানা সূত্রে পাই। তার মধ্যে সাহিত্যই প্রধান। এতে বিভিন্ন জাত-বর্ণ-ধর্মের লোকের মধ্যেকার ব্যক্তিগত প্রেম-প্রীতি স্নেহ-সখ্য, শ্রদ্ধা-স্বার্থের কথাও কিছু কিছু মেলে বটে, কিন্তু তা কখনো শাস্ত্র-সমাজ সংস্কৃতি ও সরকারকে প্রভাবিত করেনি। ঐ দল, স্বার্থ ও মতগত অনাত্মীয় ভাবটাই সমাজ-সংস্কৃতি-সম্পদ ও সরকারের ক্ষেত্রে নিয়ামকের কাজ করেছে। যেখানে আর্থিক স্বার্থ নেই, সেখানে পর-দ্বেষণা, নিন্দা-অবজ্ঞা-উপহাস ঔদাসীন্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে—যেমন অচ্যুতদের প্রতি বর্ণহিন্দুসমাজের কিংবা চর্যাকারের বা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ প্রভৃতি বাঙালির (মাঝিমাল্লার) প্রতি উপহাস। [*কান্দেরে বাঙাল ভাই বাফোই বাফোই*—মুকুন্দরাম। *মাথায় হাত দিয়া কান্দে যতেক বাঙাল*—ক্ষেমানন্দ। বাঙালীরে দেখে যেন ভেড়া— রামপ্রসাদ।]

বৌদ্ধধর্মের আগে রাঢ়ে-বরেন্দ্রে জৈনধর্ম প্রচারিত হয়। যদিও জৈন-বৌদ্ধ মতে ও চর্যায় সাদৃশ্য অনেক, পার্থক্য সামান্য। তবু বৌদ্ধ প্রসারে জৈনমত বিলুপ্ত হয়। জৈন-বৌদ্ধে বিরোধ সংঘর্ষ হয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তার রূপ স্বরূপ আজ আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট নয়। দিব্যাবদানসূত্রে জানা যায়, অশোক পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে আঠারো হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করেছিলেন। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ লোকপ্রসিদ্ধ। শশাঙ্কের একটি আদেশ ছিল এইরূপ :

আ-সেতোর আতুষারাদ্রের বৌদ্ধানাং বৃদ্ধাবালকান
যো ন হন্তি স হন্তব্যোভৃত্যান্ ইত্যশিষণ নৃপঃ।

—সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালক সহ যে (ভৃত্য) হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে—রাজভৃত্যদের প্রতি রাজার এই আদেশ।

'শঙ্করবিজয়' গ্রন্থে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজারা "দুষ্ট মতাবলম্বিনঃ বৌদ্ধান্ জৈনান্ অসংখ্যাতান্ রাজমুখ্যান্ —অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত্য তেষাং শীর্ষাণি পরশুভিশ্ছত্ত্বা বহুষু উদুখলেষু নিক্ষিপ্য কটভ্রমণৈশ্চূর্ণীকৃত্য চৈবং দুষ্টমতধ্বংসমাচরণ নির্ভয়ো বর্ত্ততে।"

—অসংখ্য দুষ্ট মতাবলম্বী বৌদ্ধ ও জৈন রাজমুখ্যদের অনেক বিদ্যা প্রসঙ্গে নির্জিত করে তাদের মাথা কুঠার দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উদুখলে ফেলে মুষলাঘাতে চূর্ণ করে দুষ্ট মত ধ্বংস করে নির্ভয়ে থাকতেন।

সেনরাজদের উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধবিদ্বেষের আভাস দেয়। আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্পে ও সরহের দোহায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজের নিন্দা প্রকট। আর্যদেবের 'চিত্তশোধন প্রকরণে' ব্রাহ্মণ্যবাদীর প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। সাধনামালা, বজ্রসূচিতত্ত্বকোষ প্রভৃতিতে এ বিদ্বেষ মেলে। এমনকি শূন্যপুরাণেও বেদশাস্ত্রের ঠাঁই শ্রীনিরঞ্জনের পদপ্রান্তে এবং ব্রাহ্মণ্য সব দেবতাই ধর্ম নিরঞ্জনের আনুগত্য স্বীকার করে। গোরক্ষনাথ ও লাউসেনের কাছে স্বয়ং দুর্গাও হার মেনেছেন (তুল: মনসামঙ্গল হাসান হোসেন পালা!)

সাত শতকের প্রথমার্ধে শশাঙ্ক বৌদ্ধপীড়নের জন্যে নিন্দা পেয়েছেন পর্যটক হিউ-এন-সাঙ ও হর্ষচরিত-প্রণেতা বাণভট্টের। আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প নামে বৌদ্ধগ্রন্থেও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৌদ্ধপীড়ন প্রবণতার কথা রয়েছে। বৌদ্ধপীড়নের শেষ উল্লেখ মেলে 'নিরঞ্জনের রুষ্ম' নামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদবন্ধে। এতে বিজিত নিপীড়িত সংখ্যালঘু বৌদ্ধেরা তুর্কিবিজয়কে সদ্ধর্মীর মুক্তির সহায় ও ভগবানের আশীর্বাদ বলে জেনেছে। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের কিছু বৌদ্ধ হয়তো দেশত্যাগ করে স্বধর্ম রক্ষা করেছিলেন। রামচন্দ্র কবিভারতী বৌদ্ধমত প্রকাশ্যে গ্রহণ করায় তাঁকে দেশছাড়া হতে হয়েছিল। নিম্নবিত্তের ও নিম্নবর্ণের বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য হামলা থেকে স্বধর্ম রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে আত্মবিলয় ঘটিয়ে প্রচ্ছন্নভাবে স্বর্ধম ও আচার রক্ষা করেছে—নাথযোগী নামে পরিচিত তাঁতিরা বৈষ্ণব-সহজিয়ারা, বাউলরা ও শৈবনাথপন্থীরূপে বজ্রসহজানী যোগী-তান্ত্রিকেরা এবং ধর্মঠাকুরের পূজারীরূপে রাঢ়ের ডোম চাঁড়াল বাগদীরা। মতে আচারে তারা বিকৃত বৌদ্ধ হলেও আজ সামাজিক পরিচয়ে তারা হিন্দু। এবং অনেক বাউল আজ মুসলমানও।

বিদেশী-বিজাতি-বিভাষী-বিধর্মী তুর্কি-মুঘল শাসনে এবং ইসলামের প্রসারে শাসিত হিন্দুর শাসন-বিদ্বেষ স্বাভাবিক কারণেই প্রবল হয়েছিল। তাছাড়া যুদ্ধে মন্দিরাদি ভাঙার ফলে এবং পৌত্তলিকতার প্রতি মুসলিম তুর্কি-মুঘলের পরিব্যাপ্ত অবজ্ঞা-উপহাস হিন্দুমনে অপমানের জ্বালা ও বিদ্বেষ-বিষ তীব্র করেছিল নিশ্চয়ই। তাই হিন্দু-অধ্যুষিত রাজ্যে হিন্দুরাজ পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ম্লেচ্ছাস্পর্শদোষ থেকে বাহ্যত দূরে থেকেও মানসপীড়ার বশে সক্ষোভে মুসলিমের হিন্দুপীড়নের একটা আদর্শায়িত কাল্পনিক আলেখ্য না-এঁকে পারেননি:

কতহুঁ তুরুক বরকর। বাট জাইতে বেকার ধরে।
ধরি আনএ বাঁভন বড়ুআ। মথাঁ চড়াব এ গাইক চুড়ুআ।
ফোট-চাট জনউ তোড়। উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ। দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।
গোরি গোমঠ জুরালি মহী। পদরুহ দেবাক ধাম মহী।
হিন্দু বোলি দূরহি নিকার। ছোটে তুরুকা ভড়কী মার। (কীর্তিলতা)

কিন্তু এই বিদ্যাপতিই অন্যত্র বলেছেন :

হিন্দু তুরুকে মিলন বাস। একক ধম্মে অওকো উপহাস।
কতহুঁ মিলিমিশ। কতহুঁ ছেদ। (কীর্তিলতা)

—এটিই যথার্থ ভাষণ। এ-সূত্রে পরবর্তীকালের ইংরেজদের নেটিভ-অবজ্ঞা স্মর্তব্য। বিদ্যাপতির চিত্রে পীড়নপ্রবণতার চেয়ে তুর্কিদের মশকরাও পরিহাসপ্রিয়তাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। বিপ্রদাস পিপিলাইও বলেন:

(তুর্কিদের) কেহ বা জুলুম করে কেহ বা গুণা শিরে ধরে
রুজু করি করএ নছাব।
আর ধার্মিকরা ইসলামে দীক্ষাও দেয়
জতেক সৈয়দ মোল্লা জপএ ত বিসমিল্লা
সদামুখে কলিমা কেতাব
হিন্দুত কলিমা ছিল মুসলমানি শিখাইল
যথা বৈসে জত মুসলমান।

এ বর্ণনা যে সত্যসন্ধ হিন্দু-কবির নিরপেক্ষ দৃষ্টিপ্রসূত তাতে সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক বিজাতি-বিধর্মী-বিদ্বেষবশে কবি ভবানীদাসও ভবিষ্যৎবাণীর আবরণে কল্পচিত্রই দিয়েছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ড যবন রাজা হবে ক্ষিতিপতি
ধর্মকর্ম লোকের হিংসিবে নিতিনিতি।
প্রয়াগ বারানসী আদি যত পুণ্যস্থান
সকল স্থানের তারা করিবে অপমান।
বিড়ম্বনে হরিকার্য করিতে না দিব
বলে ধরি আনি তার জাতকুল নিব।

বিজয়গুপ্ত যদিও তাঁর স্বগ্রাম ফুলশ্রীর পরিচয় প্রসঙ্গে গাঁয়ের সুখে গর্বিত ও সুলতান হোসেন শাহর (জালালউদ্দীন ও রফে হোসেন শাহ ১৪৮১-৮৫ খ্রি) তারিফে মুখর, যেমন—

সুলতান হোসেন শাহা নৃপতিতিলক
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি,
নিজ বাহু বলে রাজা শাসিল পৃথিবী
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিত।

তবু সাধারণভাবে বিজাতি-দ্বেষণার ও বিধর্ম-অসহিষ্ণুতার একটি কল্পচিত্র দিয়েছেন— কাজির শ্যালক মুঘী হালদার ও পেয়াদা দাপটে প্রবল ও পীড়নে পটু :

১. *তার ভয়ে হিন্দুসব পালায় তরাসে*
যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত
হতে গলে বান্ধি নেয় কাজীর সাক্ষাত।
যে যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তাঁর স্কন্ধে
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে।
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে
কার পৈতা ছিঁড়ে ফেলে থুথু দেয় মুখে।
বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্রকিল
পাথরের প্রমাণ যেন ঝরে পড়ে শিল।
পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা
চোপড়-চাপড় মারে দেয় ঘাড়কাতা।

২. পৌত্তলিকতাদ্বেষী 'মোল্লা' খোদা খোদা বুলি যায় (মনসার) ঘট ভাঙিবার। হিন্দুরা ছাড়বার পাত্র নয়; বেদম মার দিয়ে ছাড়ে। শুনে কাজীও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে :

হারামজাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান।
গোটে গোটে ধরিব গিয়া যথেক ছেমরা
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।
ওস্তাদ মোল্লা মোর অপমান হয়
তাহারে এমন করে প্রাণে নাহি ভয়। (বিজয়গুপ্ত)

এ হচ্ছে বিধর্মীদ্বেষী অসহিষ্ণু মুসলমানের কল্পচিত্র। আসলে বোধহয় মনসামাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে দেবতাদ্বেষী মুসলমানের প্রথমে অবিশ্বাস অবজ্ঞায় ও পরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত দান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্যেই দ্বন্দ্ব-মিলনের এ কল্পকাহিনী উদ্ভাবিত। হাসান-হোসেন পালা নির্মাণের মূলে এ উদ্দেশ্যই যে নিহিত তাতে সন্দেহ নেই, তাই সুবুদ্ধিজাত সহিষ্ণুতার কথাও পাই :

তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান
সে বলে উচিত নহে রাখো হিন্দুয়ান
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমানে
যার তার কর্ম সেই করে ধর্ম-জ্ঞানে।
সকলের কুলাচার সৃজিল গোঁসাই
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই। (দ্বিজবংশীদাস)

গৌড়ে হিন্দুমন্দির ভাঙার অপবাদ নেই সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্‌র বা অন্য কোনো সুলতানের। উড়িষ্যায় অভিযানকালে অর্থাৎ যুদ্ধকালে সেখানকার ধনাগার স্বরূপ কিংবা শত্রুর শিবির-স্বরূপ মন্দির ভেঙেছিলেন হোসেন শাহ :

যে হুসেন শাহ্ সর্ব উড়িয়ার দেশে
দেব মূর্তি ভাঙিলেক দেউল বিশেষে (চৈতন্য ভাগবত)

লক্ষণীয় যে, তুর্কি সুলতান ফৌজদার কাজি প্রভৃতি শাসক-প্রশাসকের হিন্দুপীড়নের কথাই সর্বত্র বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম প্রতিবেশীর হাতে পীড়নপ্রাপ্তির কথা নেই। তার কারণ দুটো : এক, তখন গাঁয়ে-গঞ্জে দীক্ষিত বা উপনিবিষ্ট মুসলমানের সংখ্যা ছিল নগণ্য। দুই, সার্বভৌম ক্ষমতা তুর্কি-মুঘলের হাতে থাকলেও হিন্দু-সামন্তরাই শাসন করত দেশ। রাজস্বও আদায় করত হিন্দুকর্মচারীরাই। কাজেই জনগণ ছিল প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর শাসনে- পোষণে। তাই সাধারণ মুসলিমের পক্ষে হিন্দুপীড়ন সম্ভব ছিল না।

আবার সর্বত্র ব্রাহ্মণ-লাঞ্ছনার কথাই রয়েছে বর্ণিত। এ নির্যাতন কেবল যেন ব্রাহ্মণের উপরই হত। জয়ানন্দের বর্ণনায় পাই :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি-প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে
ধনপ্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে।
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কান্ধে
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী।
পিরল্যা গ্রামেত বৈসে যতেক যবন
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে
গৌড়েশ্বর বিদ্যামানে ছিল মিথ্যা বাদ
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিল প্রমাদ।
গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হৈব হেন আছে
নিশ্চিন্তে না থাকিও প্রমাদ হৈব পাছে।
অতএব *নদীয়া উচ্ছন্ন কর রাজা আজ্ঞা দিল।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এজন্যেই কি 'ব্রাহ্মণে যবনে বাদ' এবং কেবল ব্রাহ্মণ-নির্যাতন! আমাদের মনে হয়, অন্য বর্ণের ও বিত্তের লোক ইসলামে সহজে দীক্ষিত হত, তাদের সঙ্গে প্রচারকরাও মিশনারিসুলভ সদ্ভাব রক্ষা করে চলত। বিপ্রদাসের উক্তিতে : 'হিন্দুত কালিমা ছিল, মুসলমানি শিখাইল' এবং দীক্ষিত জোলা মুসলমানদের প্রতি তাঁর সক্ষোভ পরিহাসে আমাদের অনুমানের সমর্থন রয়েছে। কাজেই সমাজপতি শাস্ত্রী ব্রাহ্মণই হিন্দুর সমাজ ও আচার রক্ষার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছিলেন। এজন্যেই ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। সুতরাং ব্রাহ্মণবিদ্বেষ বা ব্রাহ্মণ-নির্যাতনকে ঢালাওভাবে বিধর্মীপীড়ন বলে চালিয়ে দেয়া যায় না। যেমন ইংরেজ-বিদ্বেষ ও পাদরি-দ্বেষণা সমার্থক নয়। হিন্দুদের পাদরি-বিদ্বেষ থাকলেও ব্রিটিশ-দ্বেষণা ছিল না উনিশ শতকে। এখানে ডক্টর শহীদুল্লাহর উক্তি পুনঃস্মর্তব্য : 'হিন্দু' জাতি ছিল না? হিন্দু ধর্মও ছিল না। কাজেই হিন্দুমাত্রেরই উপর বিদ্বেষপ্রসূত অত্যাচারও হতে পারত না। তাছাড়া তখন প্রত্যক্ষভাবে প্রজাকে শাসন-পোষণ ও শোষণ-পীড়নের নির্দ্বন্দ্ব অধিকার ছিল স্থানীয় হিন্দু-সামন্তদেরই।

আবার ঐ সংখ্যাগুরু হিন্দু বা ব্রাহ্মণরা-যে শাসক তুর্কি বা যবনদের খুব ভয় করে চলত তার প্রমাণও দুর্লভ। বিপ্রদাস ও বিজয়গুপ্ত যেমন হিন্দুর প্রতিশোধমূলক মুসলিম- দলনচিত্র সগর্বে বর্ণনা করেছেন, তেমনি বৃন্দাবনদাস জয়ানন্দ প্রমুখ কবিগণও সদম্ভে মুসলিম দলনের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

১. গদাধর বলে আরে কাজী বেটা কোথা
বাটে 'কৃষ্ণ' বোলে নহে ছিঁড়ো এই মাথা *(বৃন্দাবনদাস)*

২. নবদ্বীপ সীমাএ যবন যদি দেখ
আপন ইচ্ছাএ মা প্রাণে পাছে রাখ। *(জয়ানন্দ)*

AMARBOI.COM

এগুলো মূলত জাত্যাভিমান ও তজ্জাত জাতিবৈরজ্ঞাপক অতিশয়োক্তি, তার প্রমাণ তুর্কি-মুঘল আমলেই শাসিত প্রজা নির্ভয়ে গ্রন্থে শাসকের পীড়নের কথা লিখেছেন, শাসকের ধর্মের চাইতে শাসিতের ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করেছেন, শাসকগোষ্ঠী থেকে শাসিতের দেবতার অস্তিত্ব ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন—অন্নদামঙ্গল অবধি অনেক কাব্যেই এসব চিত্র মেলে—যা কোন নির্যাতনকারী শাসকই সহ্য করে না। এমনকি গণতন্ত্রের যুগেও নয়। তাছাড়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ প্রমুখ বহু সুলতানের তারিফে সমকালীন বহু কবি মুখর। এ যেন এ-যুগের বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদপত্রসুলভ দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক, তাতে যেন পরিহাস রসিকতার ভাবও রয়েছে। তাই সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও ভূতের উপদ্রব সহ্য করতে হয়।

আবার সতেরো-আঠারো উনিশ শতকে কাল্পনিক পীর-পাঁচালীর মাধ্যমে মুসলিমদেরও তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সমান উৎসাহী দেখতে পাই। পীর নারায়ণ 'সত্য' তাঁর চেলা দক্ষিণ রায়, বড় খাঁ গাজী, গাজী কালু এবং ইসমাইল গাজী, জাফর গাজী, মোবারক গাজী, সফী গাজী, মাণিক পীর, মছলন্দর পীর, প্রভৃতির কাহিনীতে হিন্দু-মুসলিমের ধর্মমত ও সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব ও পরিণামে আপস মিলনের চিত্রই বিধৃত। বিজয়গুপ্ত বিপ্রদাস পিপিলাই থেকে এ-ধারার শুরু এবং কৃষ্ণরাম ভারতচন্দ্র গরীবুল্লাহ্ প্রমুখ হয়ে মুন্সী আবদুর রহিমে অবসান। সৈয়দ সুলতান, জায়েনউদ্দীন, শা বারিদ খান, গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা প্রভৃতি কবি রসুল, হামজা, আলী, হানিফা প্রভৃতি ইসলামের উন্মেষ-যুগের দিগ্বিজয় বর্ণনাসূত্রে পরাজিত ব্রাহ্মণ রাজা ও রাজকন্যাদের সপ্রজা ইসলাম-বরণে আহবান জানিয়েছেন, অন্যথায় হত্যার হুমকি দিয়েছেন। সর্বত্র কেবল ব্রাহ্মণই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য এবং কাফের নয়—কুফুরিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(পৌত্তলিকতাই) তাঁদের তীব্র ঘৃণার বিষয়। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও পৌত্তলিকতার অপকর্ষ দেখানোই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুর্কি-মুঘল শাসনকালে মুসলিমরা ইংরেজ আমলের মতো হিন্দুদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেনি, তাই হিন্দুবিদ্বেষ তাদের রচনায় মিলে না।

শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যেখানে বিদেশী-বিভাষী, বিধর্মী-বিজাতির সেখানে সহাবস্থানের গরজে ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতাভিত্তিক একটা আপস-রফা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। নইলে শাসিতজনদের কিংবা সংখ্যালঘুর জীবন-জীবিকার ক্ষেত্র নিরাপদ হয় না। মধ্যযুগে সেই আপস প্রয়াস উপরোক্ত ধারায় আবর্তিত হয়েছে।

মা যখন মারে তখন তা বিনা অনুযোগে সহ্য করাই নিয়ম। কিন্তু সঙ্গত কারণে মেরেও সৎমা নিন্দা থেকে রেহাই পায় না। প্রবলমাত্রই যে কমবেশি পরপীড়ক, শাসক-মাত্রই যে সাধারণভাবে শোষক ও পীড়ক, দুরাত্মা প্রবলের ও শাসক-প্রশাসকের-যে কোনো দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নেই, ওরা আলাদা শ্রেণী—শাসক প্রশাসক বিজাতি-বিধর্মী হলে শাসিত-শোষিত-পীড়িত মানুষ এ-তত্ত্ব মনে রাখে না। মনে ভাবে বুঝি বিজাতি বিধর্মী-বিদেশী-বিভাষী বলেই প্রজাপীড়ন করছে। গোঁয়ার, লোভী, পরস্বাপহারী, মূর্খ-ধার্মিক প্রভৃতি যে সুযোগ-সুবিধেমতো ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুপীড়নে উৎসুক ছিল, তার সত্যতা আজকের দিনের উচ্চশিক্ষিত মানুষের প্রবণতা থেকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তবু শাসকের স্বধর্মীর সংখ্যাল্পতার দরুনই তা সেকালে কখনো ত্রাসকর হয়ে উঠতে পারেনি। আধুনিক বিদ্বানেরাও তা স্বীকার করেন :

> মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দু-ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি।
>
> *[১৮৭২সনের আদমশুমারি রিপোর্ট]*

> মুসলিম শাসনকালে "শাসনতন্ত্র, সামরিক দায়িত্ব, সংস্কৃতি চর্চা—কোনো বিষয়েই হিন্দুর উন্নতি ব্যাহত হয়নি, বরং মুসলমান শাসনকর্তাদের প্রচুর পোষকতা ছিল।" *['বাঙালী' পৃ ৭৯-৮০, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ]*

> "পাঠান যুগে দেশ শাসনে-যে বাঙালি হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেন শাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালি হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পাঠান আমলে রাজ্য-শাসন, বিশেষত রাজস্ব ব্যাপারে একটা হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল।" [অসিত বন্দ্যো: বা সা ইতিবৃত্ত ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫]
>
> স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থায় শুধু মুসলমান নয়, হিন্দুরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময় মুসলমান কর্মচারীদের উপরে ওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারী এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন।
>
> [সুখময় মুখো বা: ই: দু'শ বছর পৃ. ৪৬৩]
>
> পাঠান শাসনকালে বাঙালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। ... (১৫-১৬ শতকে)-এই শতাব্দীতে বাঙালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনো হয় নাই। *[বাঙ্গালা ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র]*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙালিরাই বাঙ্গালা শাসন করিতেন। ..... ইহারা (হিন্দু রাজাগণ-সামন্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, দণ্ড বিধান করিতেন এবং সর্বপ্রকার রাজ্য শাসন করিতেন।
>
> [বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা: বঙ্কিমচন্দ্র]
>
> "মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে হিন্দু সবিশেষ সহায়তা করিতেছে। *[সুকুমার সেন ১ খণ্ড পূর্বার্ধ পৃ. ৮৮]*

অতএব মুসলমানেরা তুর্কি-মুঘল যুগে বিধর্মী নির্যাতনের সুযোগ ক্বচিৎ কখনো পেয়েছে মাত্র। উল্লেখ্য যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বর্ণিত রামচন্দ্র খান হিন্দু হিসেবে নন, বাকি রাজস্বের জন্যেই বিদ্রোহী হয়েছিলেন। আবার রূপ-সনাতনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চন্দ্রদ্বীপের প্রশাসক ছিলেন পরপীড়ক এবং অর্থ আত্মসাৎ করে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করেছিলেন বলে চৈতন্যচরিতে হোসেন শাহর জবানিতে পরিব্যক্ত: 'তোমার বড়ভাই করে দস্যু ব্যবহার/জীব বহু মারিয়া বাকলা কৈল খাস।'

আবার ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-মুসলিমের পরিচিতি প্রতিবেশীসুলভ প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-সখ্য ও শ্রদ্ধা-স্বার্থের সম্পর্কও গভীর এবং অবিচ্ছেদ্যভাবে গড়ে উঠত। আগেই বলেছি ব্যক্তি সম্পর্কেও প্রায় কোনো মানুষই দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম-গোত্র-বৈর দ্বারা পরিচালিত হয় না। আর-এক ক্ষেত্রেও মানুষ কোনো স্বাতন্ত্র্য অসূয়া-অহঙ্কার অবজ্ঞা মনে ঠাঁই দেয় না— সে হচ্ছে দৈব-ভয়, ব্যাধি, স্বার্থ ও লিপ্সার ক্ষেত্র।

এখানে আপাত নিরাপত্তা-নিরাময় ও প্রাপ্তিলোভ মানুষকে সর্বসংস্কারের বাধা অতিক্রমণে প্রবর্তনা দেয়। এসব ক্ষেত্রে মিলনমুখী চিত্র অনেক মেলে। যেমন:

১. গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্তী হয় মোর চাচা
দেহ-সম্বন্ধ হইতে হয় গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা।
নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় তোমার নানা
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা। *(চৈতন্যচরিতামৃত)*

২. শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন
প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন। *(চৈতন্য ভাগবত)*

তর্কে পরাজিত চৈতন্য-মাহাত্ম্য মুগ্ধ কাজীও চৈতন্যের পায়ে ধরে বলে—

৩. এই কৃপা কর যে তোমাতে রহে ভক্তি। *(চৈতন্য ভাগবত)*
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ।

৪. হিন্দুকুলে কেহ যদি হইয়া ব্রাহ্মণ
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন
হিন্দুরা কি করে তারে তার যেই কর্ম
আপনে যে মৈল তারে মারিয়া কি ধর্ম। *(চৈতন্য ভাগবত)*

যবন হরিদাসকে মুলকের পতি বলেছেন :

৫. কত ভাগ্যে দেখ তুমি হৈয়াছ যবন
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন।
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত
তাহা তুমি ছাড় হই মহাবংশ জাত। *(চৈতন্য ভাগবত)*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. জাজপুরের দেহারা বন্দির একমন
যেইখানে অবতার হৈল যবন। *(ধর্মমঙ্গল)*

৭.। বন্দিব ঠাকুর জগন্নাথ— *(চৌধুরীর লড়াই)*

৮. বন্দো পীর ইসমালি গড় মান্দারণে
দারাবেগ ফকির বন্দিব নিগাঞে
জোড়হাতে বন্দির পাঁড়ুয়ার সূফী খাঞে। *(ধর্মমঙ্গল—সীতারাম দাস)*

৯. যবনেহ যার (রামের) কীর্তি শ্রদ্ধা করি শুনে
ভজ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে। *(চৈতন্য ভাগবত)*

১০. বিজয়গুপ্তের নায়ক চাঁদসদাগর লক্ষ্মীন্দরের বাসরে কোরআন পাঠেরও ব্যবস্থা রাখে। শেখ শুভোদয়ায় জলালের এবং পাঁচালীতে সত্য-মাণিক-পীরদের যেমন মাহাত্ম্যকীর্তন রয়েছে, জাফর খানেরও তেমনি গঙ্গাস্তোত্র আছে।

১১. ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারশ্য পড়িবে
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধরিবে। (চৈতন্যমঙ্গল)

আবার গুণরাজ খান, মালাধর বসু, বিদ্যাপতি, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, কবিচন্দ্র মিশ্র (গৌরীমঙ্গল, ১৪৯৭-৯৮ খ্রি.) রূপরাম, মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, কৃত্তিবাস, দ্বিজশ্রীধর কবিরাজ, রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, যশোরাজ খান, মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম, গদাধর দাস, কৃষ্ণরাম দাস, মহাদেব আচার্য সিংহ (সুখময়, পৃ. ২৮৪) প্রমুখ কবিগণ প্রতিপোষণ পেয়ে বা না-পেয়েও রুকনউদ্দীন বারবকশাহ, শামছুদ্দীন ইউসুফ শাহ, জালালউদ্দীন ফতেহ হোসেন শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, নাসিরউদ্দিন নুসরৎ শাহ, আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান, আকবর, শাহজাহান, সুজা, মুসা খাঁ, আওরঙ্গজীব প্রমুখ শাসক-প্রশাসকের অকারণ-সকারণ স্তুতি গেয়েছেন। সন্ত-সন্ন্যাসী ফকির ওঝার ক্ষেত্রে বিষয়ী মানুষ কখনো পার্থক্য স্বীকার করেনি। এসব হচ্ছে পূর্বোক্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা। কিন্তু কারণে-অকারণে সুপ্ত জাতি বর্ণ-গোত্র-ধর্ম-বৈর আস্তিক ও দলভুক্ত মানুষের মনে যে-কোনো প্রাসঙ্গিক কারণে জেগে ওঠেই এবং প্রয়োজনস্থলে প্রকাশও পায়। এবং এ দিয়ে ইতিহাসের ধারাও আংশিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বকালেও আমরা তা দেখতে পাই।

এর পরে গৌড়ীয় নববৈষ্ণব মতের উদ্ভবকালেও আমরা বৈষ্ণবা-শক্তি-শৈবের দ্বন্দ্ব-কোন্দল দেখেছি, যেমন উনিশ শতকে দেখেছি খ্রিস্টান-ব্রাহ্ম-সনাতনীদের এবং মজহাবি-ওয়াহাবি-ফারায়েজিদের দ্বন্দ্ব-কোন্দল।

সনাতন লোকধর্মের প্রতি নবদীক্ষিত বৈষ্ণবদের সীমাহীন অবজ্ঞা। তারা বলে :

১. ধর্ম কর্ম লোক সবে এই মাত্র জানে
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরী পূজে কোন্ জন
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধন।
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগিপাল, ভোগিপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিবারে সব লোক আনন্দিত। *(চৈ. ভাগবত)*

উত্তরবঙ্গেও তখন :

২. উত্তর দেশের লোক অনেক প্রকার
শৈব শক্তি কর্মী যোগী বিভিন্ন আচার।
মদ্য মাংস মৎস্য মার্গ মলেতে সাধন
কামিক্ষার ব্রত মহীপালের জাগরণ।
যোগিপাল ভোগিপালের যাত্রা মহোচ্ছব
ভোটকম্বল চট পরিধান সব।
(নিত্যানন্দের বংশবিস্তার, সুকুমার সেন পৃ. ৩৩০)

৩. ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ
ডাকাচুরি পরগৃহ দাহে সর্বক্ষণ।
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল। (চৈ. ভা.)

৪. মহাপাপী ব্রাহ্মণ যে আছে দুই ভাই
নবদ্বীপের ঠাকুর যে জগাই মাধাই। *(লোচনদাস)*

৫. ধিক জাউঁ আমার নদীয়ার ঠাকুরাল
গুপ্তহত্যা ব্রহ্মহত্যায় এ দেহ আমার। (ঐ)

AMARBOI.COM

সনাতনীরাও বলে (হরি সংকীর্তন শুনে)

৬. শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে হইল প্রমাদ
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ। (চৈ. ভাগবত)
এ বামনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ ...
কেহো বোলে যদি ধানে কিছু মূল্য চড়ে
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে। (চৈ. ভা.)

৭. এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে
কেহো বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া
সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া।.....
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে
নানাবিধ দ্রব্য আসে তা সভার সনে।
ভক্ষ্য-ভোজ্য গন্ধমাল্য বিবিধ বসন
খাইয়া তা সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ। (চৈ. ভা.)

বৃন্দাবনদাস অবৈষ্ণব উত্তেজনা ও ক্রোধবশে তাই এ-পাষণ্ডদের সম্বন্ধে বারবার বলেছেন: এত পরিহারেরও যে পাপী নিন্দা করে/তবে লাথি মারো তার মাথার ওপরে! (চৈ. ভা.)

কবিগণ রাজবন্দনা করেও আবার সেই রাজার অত্যাচার-পীড়নের কথা বলেছেন। যেমন ব্রাহ্মণবিদ্বেষী, প্রতিমা-বিনাশক হোসেন শাহ্ কেবল যে প্রশংশিত হয়েছেন, তা নয়, চৈতন্যদেবের ঐশ্বর্যের স্বীকৃতি দিচ্ছেন— 'এসব মানুষি নহে গোসাঞি চরিত্র' [*চূড়ামণিদাস-*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরাঙ্গবিজয়]; সেই তো গোসাঞি উহা জানিহ নিশ্চয়'। *(চৈতন্য-চরিতামৃত)*। আবার বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবের পারস্পরিক নিন্দাবাদও ঐ একই সাধারণ দল-চেতনা বা ভিন্ন দল দ্বেষণার প্রকাশ মাত্র।

তাই বলেছি, এইসব দেশ-জাত-বর্ণ-গোত্র দ্বেষণা একটা সাধারণ মানবিক বৃত্তিরই প্রকাশ—এর মধ্যে বাস্তব তথ্য বা ঘটনা খোঁজা নিরর্থক। এসব অভিব্যক্তি কেবল এ-যুগে বিরোধীদলের ভূমিকা ও বক্তব্যই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার গাঁয়ের নিরক্ষর নিঃস্ব, নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের লোকেরা এ স্বাতন্ত্র্য ও সচেতনতা রক্ষা করা বা এর অনুশীলন করার গরজ কখনো অনুভব করেনি। জীবিকাগত আর্থিক জীবনে চিরদুস্থ এসব মানুষ নিয়ম ও নিয়তির শিকাররূপে আশ্বাস ও প্রবোধের অবলম্বন খুঁজেছে প্রায় অবচেতন মনে। তাই দুর্বোধ্য জটিল শাস্ত্রে আশ্বস্ত হতে না পেরে তারা সহজ ও সরল পথের সন্ধান করেছে ঐহিক পারত্রিক জীবনের স্বস্তি বাঞ্ছায়—এভাবে লোক-প্রয়োজনে লোক-মনীষা থেকে উদ্ভূত হয়েছে লোকধর্ম-পীর-নারায়ণ সত্যের স্বীকৃতিতে কিংবা বিভিন্ন গুরুনামী বাউলসাধনায় নিরক্ষর গ্রামীণ হিন্দু ও মুসলিম অভিন্ন মিলন-ময়দান রচনা করে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করেছে—কেবল উচ্চবিত্তের, উচ্চবর্ণের ও শিক্ষার সুখী ও সম্পদশালী সুস্থ মানুষই শাস্ত্র-সংস্কৃতি-সমাজের নামে বিভেদ-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখার মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যগৌরব ও স্বাধর্ম্যগর্ব অনুভব করে আনন্দিত কিংবা জিগীষু হতে চেয়েছে। এ হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত-সম্পদ চেতনার অবশ্যম্ভাবী প্রসূন। এর থেকে আস্তিক ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় মানুষের নিষ্কৃতি নেই। অথচ এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, ব্যবহারিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে অন্তত মুসলিমের ঘরোয়া জীবনে নাপিত-ধোপা-বারুই-বৈদ্য-গোচিকিৎসকরা, বাদ্যকর-চাষী-মাঝি-তাঁতি-মুচি প্রভৃতি নানা পেশার লোকের সঙ্গে সে যুগে বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক রাখতেই হতো। তাহলে সাহিত্যে ইতিহাসে বিধৃত বিরোধের স্বরূপটা কী! আসলে মন ও মত বাঁচিয়ে গাঁয়ে-গঞ্জে আজকের মতোই সমস্বার্থে সহিষ্ণুতা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান মাঠে-ঘাটে-হাটে ব্যবহারিক ও বৈষয়িক জীবনে সহযোগিতা ও সদ্ভাব রেখে সহাবস্থান করত।

নীতিশাস্ত্র গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির্ রূপ

ক. সত্যকলি বিবাদসম্বাদ

মুহম্মদ খান বিরচিত (১৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে)

কবি মুহম্মদ খানের দু'খানি কাব্য সংগৃহীত হয়েছে। আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। একটি মৌলিক রূপককাব্য 'সত্যকলি বিবাদ-সম্বাদ'। অপরটি কারবালার যুদ্ধবৃত্তান্ত 'মক্তুল হোসেন'। এটি ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত। মুহম্মদ খান এ কাব্যে তাঁর বিস্তৃত বংশ-পরিচয় দিয়েছেন। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত শাসককুলে তাঁর জন্ম। মাহি আসোয়ার-হাতিম-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিদ্দিক-রাস্তিখান-মিনাখান-গাভুরখান-হামজাখান-নসরৎ খান-জলালখান-মুবারিজখান -মুহম্মদ খান। মুহম্মদ খান 'নবীবংশ' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য ছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ মুদ্রিত 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদ'-এর ভূমিকায় লভ্য।

জীবনের সার্বিক 'চর্যানীতি' সম্বলিত বলে কালানুক্রম লঙ্ঘনে এই গ্রন্থের পরিচিতি সর্বাগ্রে সন্নিবেশিত হল।

মধ্যযুগে নৈতিক জীবন চেতনার রূপ

এখনকার দিনে সমাজ, সংস্কৃতি, সুরুচি, রাষ্ট্র, যুক্তি, বিবেক, বুদ্ধি এবং মানবিকতা, সুনাগরিকতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির দোহাই দিয়ে মানুষের নীতিবোধ জাগিয়ে দেয়া হয়, নিয়ন্ত্রিত করতে হয় নৈতিক চরিত্র।

সে-যুগে মানুষের জীবন ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই মানুষের নৈতিক চেতনার উৎসও ছিল ধর্মবিধি। ফলে নৈতিক জীবনবোধ জাগানোর লক্ষ্যে রচিত শাস্ত্রনিরপেক্ষ সাহিত্যিক রচনা ছিল বিরল প্রয়াসে সীমিত। অবশ্য ডাক-খনার আপ্তবাক্য, চাণক্যশ্লোক ও প্রবচনাদির মতো বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকথা ছিল গুরুত্বে ও প্রভাবে ধর্মশাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এগুলোও ছিল ধর্মশাস্ত্রের মতো অদৃশ্য অপার্থিব বিশ্বাস-সংস্কার প্রলেপে আবৃত।

'সত্যকলি বিবাদসম্বাদও ধর্মবোধপ্রসূত। ধার্মিকের চিত্ত থেকেই এ উৎসারিত। তাই বলে এ নীতিকথাকে শাস্ত্রকথার সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা উচিত হবে না। কেননা এ সম্পর্ক দূরান্বিত। অনেকটা বঙ্গোপসাগরে গঙ্গাজল প্রত্যক্ষ করার মতো।

এ গ্রন্থে কাল-প্রতীক সত্য ও কলির রাজকীয় আবহে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ও দোষ-গুণের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এ ধরনের গ্রন্থ বিরল। আজকাল বিদ্যা-সুন্দর, নল-দময়ন্তী, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি উপাখ্যানকেও কেউ কেউ রূপক রচনারূপে গ্রহণ করেন। সেগুলো যদি বা রূপক আখ্যায়িকা হয়, তাহলেও প্রতিপাদ্য পাই একটিমাত্র তত্ত্ব। আর 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' রয়েছে সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব—ঘরোয়া, বৈষয়িক, নৈতিক প্রভৃতি জীবনের সর্বদিকের ব্যবহারবিধি। কবি বলেন :

ক. *উপদেশ পঞ্চালিকা করিব রচন*
সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ বিবরণ।

খ. *বাক্য উপদেশ হেতু বহুল যতনে*
তেকারণে বিরচিলুঁ ভাবি নিজ মনে।

গ. *সত্যকলি আচরণে প্রসঙ্গের ছলে ভনে*
কৌতুকে করিল বিরচণ।

'সত্যকলি বিবাদ সম্বাদ' কাব্য রচিত হয়:

দশশত বাণ শত বাণ দশ 'দধি
রাত্রি হইয়া গেল পঞ্চালিকা অবধি।

এর থেকে ১০০০+৫০০+৫০+৭ = ১৫৫৭ শকাব্দ বা ১৬৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দ মেলে। এ কাব্যের রচক কবি মুহম্মদ খান। এঁর রচিত 'মুক্তুল হোসেন' প্রখ্যাত কাব্য।

এ কাব্যে সত্য ও কলির রূপকে ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা ও পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও পরিণাম একটি সরস উপাখ্যানের মাধ্যমে বিবৃত। তত্ত্বকথা পাছে একঘেয়ে হয়ে পড়ে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবেচনায় চারটি আখ্যানও সমন্বিত হয়েছে। একটি নামান্তরে বেতালপঞ্চবিংশতির চৌদ্দ-সংখ্যক উপাখ্যান, একটি চন্দ্রদর্প-ইন্দুমতী আখ্যায়িকা, একটি সূর্যবীর্য-চন্দ্ররেখা নামের রূপকথা এবং অপরটি কিস্মিক রাজার কাহিনী।

কবি দোষ-গুণের প্রতীকী চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সেগুলো নিতান্ত জড়-প্রতীক নয়, কবির অঙ্কনৈপুণ্যে সবকয়টিই সজীব মানুষ হয়ে উঠেছে।

পাত্রপাত্রীর নামগুলো যেমনি গুণজ্ঞাপক তেমনি সুন্দর: কলীন্দ্র দুঃশীলা, পাপসেন, ভীতসেন, কপটকেতু, দোষণ, মিথ্যাসেতু, কৃপণ, ভোগী, নারদ, মিত্রকণ্ঠ, সত্যকেতু, সত্যবতী, বীর্যশালী, ধর্মকেতু, সুখ, সুদাতা যোগী প্রভৃতি। সত্যের ধ্বজা সূর্য, কলির পতাকা চন্দ্র। এ দুটোও গভীর তাৎপর্যে সুন্দর। সূর্য অগ্নিময়-সত্যে দাহ আছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ ও রমণীয়—পাপ আপাতমধুর।

সত্যকেতু ধ্বজ শোভা করে দিবাকর
কলিধ্বজে শোভে চন্দ্র অধিক সুন্দর।

পাপও যে পুণ্যকে ছাপিয়ে ওঠে, মিথ্যাও যে সত্যের উপর জয়ী হয় এবং সত্যের ও পুণ্যের পথ-যে দুস্তর ও দুঃখাকীর্ণ তা কবি নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। এতে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কবির গভীরতর জ্ঞান ও উপলব্ধির পরিচয় মেলে।

কবির ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়গুলো আপ্তবাক্যের কিংবা প্রবচনের মতো প্রজ্ঞার সম্পদ। এর অনেকগুলোই লোকপ্রচলিত ও লোকশ্রুত।

AMARBOI.COM

কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি :

১. বিষেত হরএ বিষ।
২. শরীরে না সহে হীন পরাভব দুখ।
৩. দুষ্ট বধে মহাধর্ম দেখহ বিচারি।
৪. যে হোক সে হোক যুদ্ধ উপেক্ষা না কর।
বীর্য স্মরি ধনু ধরি ক্ষেত্রি ধর্ম স্মর।
৫. যুদ্ধ শ্রদ্ধা কদাপি না করে মহাজন।
৬. আগে সন্ধি করিঅ না হৈলে কর রণ।
যদি যুদ্ধ করিবা করিঅ প্রাণপণ।
৭. শ্বেতবাসে কাজর লাগিল কালি ধরে।
৮. দুষ্ট সভা মাঝারে না শোভে সন্ন্যাসীরে।
৯. দুষ্ট মধ্যে না শোভএ শ্রেষ্ঠ জন।
১০. দুগ্ধে সিদ্ধে মল কভু না তেজে অঙ্গার।
১১. কূপমাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন।
১২. রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
১৩. দুষ্টে নষ্ট না করএ উত্তম জনেরে।
১৪. না হএ তপস্বী যোগ্য পাট সিংহাসন।
১৫. গোময় লেপনে কি চন্দন গন্ধ হরে!
১৬. নারী নাহি নৃপতির শূন্য বাসাঘর
দীপহীন গৃহ যেন না দেখি সুন্দর।
১৭. অতিরূপবতী যেন বিচিত্র সাপিনী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮. ক্ষেমা সে পরমধন ধার্মিকের জান।
১৯. নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যের জঞ্জাল।
২০. নারী হই লজ্জাহীন হএ যেই জন
দৃষ্টি না থাকিলে যেন না শোভে দর্পণ।
২১. প্রীতিবাক্য না থাকএ যাহার বচন
মধু হীন ফল যেন না রুচএ মন।
২২. শাস্ত্রকর্ম জানি যেবা ধর্ম না আচারে
ফলবন্ত বৃক্ষ যেন ফল নাহি ধরে।
২৩. বুদ্ধি এ শশক মারে কেশরী দুরন্ত।
২৪. ধনবন্ত হই দাতা নহে যেই জন
জলহীন নদী যেন নাহি প্রয়োজন।
২৫. পুরুষ না হয় যদি সত্যবন্ত ধীর
চক্ষু না থাকিলে যেন না শোভে শরীর।
ঘর শূন্য যার ঘরে নাহিক জননী
দেশ শূন্য নিরানন্দ বা হএ যেই পুনি।
২৫. সহজে হৃদয় শূন্য বিদ্যা নাহি যার
সর্বশূন্য দরিদ্রতা মহাদুঃখ তোর।
২৬. মহাকবি পণ্ডিত নির্ধনী পাএ দুখ
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক।
২৭. ধন হন্তে শত্রু হএ সবে হিংসে নীতি
বিদ্যাবন্ত লোককে সকলে রাখে প্রীতি।
২৮. বহু ভার্যা যাহার সে চিন্তে অহোরাত।
২৯. বহু বাক্যে মুখদোষে চিন্তা পাএ জান।
৩০. বৃক্ষ যেন না শোভে না হৈলে ফল ফুল।
৩১. আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব।
৩২. যুদ্ধেত বিমুখ হৈলে নরকে বসতি (তুল : কোরআন)
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন।
৩৩. প্রাণান্তেহ নিজ কুলধর্ম না বর্জিব।
৩৪. সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম।
৩৫. কুলকর্ম ধর্ম কভো না তেজে উত্তম।
৩৬. মৃত্যুকালে ঔষধে নাহিক প্রয়োজন।
৩৭. চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতরে।
৩৮. মথিলে সে দুগ্ধে ঘৃত পাউন্ত গোয়াল
চেষ্টিলে সে কার্যসিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল।
৩৯. চোরেতে না রুচে যেন ধর্মের বাখান।
৪০. শত ধোপে না তেজএ অঙ্গার মলিন।
৪১. যদিবা অমৃত তাত সিঞ্চে দেবগণ
তথাপি নিমের বৃক্ষ তিক্ত নাহি ছাড়ে।
৪২. দোচারিণী পত্নী তোর নিষ্ফল জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩. লবণ ভূষিত যেন পুষ্প বৃক্ষ মরে।
৪৪. কথ অকুলীন হোন্তে কুলীন জন্মএ
সুগন্ধি কস্তুরী দেখা মৃগে উপজএ।
৪৫. অশুদ্ধ সুবর্ণ যেন দহে নাহি সহে।
৪৬. বহু সৈন্য সাজিলে হারএ আখণ্ডল
বহু পিপীলিকা নাগ পারে ধরিবার।
৪৭. কাল গেলে বৃক্ষ তবে ফল কোথা ধরে।
৪৮. কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।
৪৯. আম্রে কীট কীটে মধুর উৎপত্তি
দোষেগুণে আছএ ভরিয়া দেখ ক্ষিতি।
৫০. চন্দনে বৈসএ নাগ নাগে বৈসে মণি
মৃগমদ শুনিতে শুঁকিতে ধন্ধ পুনি।
৫১. শুক উলুকের চঞ্চু একাকৃতি পুনি
কেহ পাড়ে ভ্রূকুটি কাহার মধুবাণী।
৫২. কৃপণে পাইবে লজ্জা দাতার সাক্ষাৎ।
৫৩. মহাজন কর্ম নহে আপনা বাখান।
৫৪. অমৃতের কুম্ভ সব নাগে ভরিয়াছে
তাক পিতে কাক যেন ধাই যাএ কাছে।
৫৫. কোথাত অমৃত ফল কপির আহার।
৫৬. বিরহ সমুদ্র জান তারি নাহি অন্ত।
৫৭. আপনা শোণিত পান করে বিরহিণী।
৫৮. যাহার মরমে বাণ মারিলে অনঙ্গ
ধ্যান-জ্ঞান তপজপ সবকাজ ভঙ্গ।
৫৯. যাহার বিরহ নাহি পাষাণ হৃদয়
বিরহ পরম ধন পরম সংশয়।
৬০. দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন।
৬১. কণ্টকে যেন কণ্টক খসএ হেন জান।
৬২. কাকের চরিত্র ভাল কাকে সে বুঝএ
কাকের চরিত্র শুকে না বুঝএ নিশ্চএ।
৬৩. দুষ্টজন চরিত্র বুঝএ দুষ্টজন।
৬৪. পাপজনে ধর্মের নাহিক উপরোধ।
৬৫. গোবরুয়া কীটে যেন নিন্দিল ভ্রমর
কেহ পদ্ম'পরে কেহ গোময় উপর।
৬৬. শৃগালে সিংহ মারে এ দুঃখ কি প্রাণ ধরে।
দৈবকালে বিপর্যয় হৈলে।
৬৭. দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বুলি কোন্ গুণে
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে।
(Give every body the ear but few thy voice)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৮. জলেতে উঠিলে বিন্দু অবশ্য মজিব।
৬৯. শ্বেতবাস কজ্জল বাঝিলে কালা ধরে।
৭০. দুষ্ট সঙ্গে থাকিলে দুষ্টতা মন পুরে।
৭১. বল হৈলে শূকরে লেঠএ ধরাহর।
৭২. কোথাত অমৃত্ব ফল বানরের ভোগ।

সমাজ ও সংস্কৃতি

হিন্দুপুরাণ কথা ভিত্তি করে রচিত এ কাব্য। তাই এতে হিন্দুসমাজ সংস্কার ও সংস্কৃতির পরিচয় যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে হিন্দুপুরাণের আবহ।

সেকালে মান্য অতিথিকে 'পাদ্য অর্ঘ্য ও বসিতে আসন' দিয়ে অভ্যর্থনা করা হত। যজ্ঞ ও দানের গুরুত্বও কম ছিল না— 'বহু যজ্ঞ করিল বহুদান,' 'ধ্যানজ্ঞান তপজল', ছিল 'তপস্বীর কর্ম'।

ব্রাহ্মণের ধর্ম, মিত্রভাব সর্বপ্রতি/দেবযোগ্য ধ্যান-জ্ঞান অভ্যাসিব নিতি। যোগী-সন্ন্যাসীর ভেক ছিল ঝুলি, কাঁথা, অস্থি, খড়্গ ও পাদুকা। ভোজ্য ছিল হরীতকী-আমলকী প্রভৃতি ফলমূল।

কুলনারীদের মধ্যে নাচ-গান-বাজনার বহুল প্রচলন ছিল :

কেহো নানা যন্ত্র বাহে কেহো গাহে গীত
কেহো হাসে খেলে কেহো নাচে আনন্দিত।

তুক-তাক দারু-টোনা ও মন্ত্র-উচাটনে মানুষের বিশ্বাস ছিল গভীর, ভরসা ছিল অপরিমেয়। 'বিস্তর কুমন্ত্র টোনা সে রাজ্যে বিশেষ'। মন্ত্রবলে দর্পণের নারী সৃজিয়াছে। মন্ত্র বলে প্রাণ সঞ্চারিত হতে পারত এক দেহ থেকে অন্য দেহে। এবং ইচ্ছামতো কীট, মাছি, পশু, পক্ষী কিংবা মানুষের ছদ্মবেশ গ্রহণে ছিল না কোনো বাধা। 'শিখিল বহুল বিদ্যা মন্ত্র বহুতর।' 'মক্ষিকা হইতে পারি মন্ত্রের প্রভাবে।' 'পরঘট সঞ্চারিত আন্ধি মন্ত্রজানি।'

খেচরসিদ্ধি : মন্ত্রবলে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সর্বত্র থাকত অবাধ গতি। যুদ্ধে অস্ত্র ছোড়ার সময়েও মন্ত্রযোগে অস্ত্রের সন্ধান হত অমোঘ। 'নানা মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া এড়ে অস্ত্রবাণ।' ভূত-প্রেতের প্রভাবেও লোকের বিশ্বাস ছিল অবিচলিত।

ভূত-প্রেত, দেও-দানা ছাড়াবার ব্যবস্থাও ছিল বিচিত্র ও বিবিধ। তাবিজ, কবচ, মন্ত্র, স্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠান ছিল জনগণের নির্ভর ও ভরসা এবং নানা ঘরোয়া, নৈতিক এবং সামাজিক কুসংস্কারও নিয়ন্ত্রণ করত মানুষের ভাব ও আচরণ। যথা :

গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে :

শ্রাবণে নির্মিলে ঘর রোগ-শোক নিরন্তর
সে ঘরেতে বেঢ়এ আপদ
ভাদ্রে গৃহ নির্মে যবে গায়ে রোগ হএ তবে
আশ্বিনেত দ্বন্দ্ব বাঝে নিতি। ইত্যাদি

স্নান : সোমে-গুরু ধন বাঢ়ে মঙ্গলে যে স্নান করে
আউ টুটি চিন্তা উপজএ
বুধেত ঐশ্চর্য বাঢ়ে ধনী হএ গুরুবারে
শুক্রবারে স্নান করে লোক। ইত্যাদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগ : বৃক্ষতলে দিগম্বর হই থাকে যেই নর
রবিবারে রোগ উপজএ।
লোক-দৃষ্টি হএ জান কিবা ভূত অধিষ্ঠান
অজা হংস তাতে দান হএ
কৃষ্ণ কুক্কুটী দিব দানে বিঘ্ন খণ্ডাইব
ভূতদৃষ্টি হএ জান অজা বৃষ দিব দান
পুরাণ ভাণ্ডার সমতুল। ইত্যাদি

বস্ত্র : নববস্ত্র শুক্রবারে পিন্ধিলে উত্তম বারে
চিন্তা হোন্তে পরিত্রাণ মনে
নববস্ত্র ফাড়ি যবে এহি রবিবারে তবে
ফাড়িব শাস্ত্রের পরমাণে। ইত্যাদি

শুভকর্ম : শনিএ মৃগয়া হএ রবিএ গৃহ নির্মএ
বৃক্ষ যদি রোপে ফলে অতি।
শনি পরবাস যাএ বণিজেত লভ্য পাএ
মঙ্গলে সংগ্রাম ভাল অতি
শুক্রেত বিবাহ কাজ অতি ভাল শাস্ত্র মাঝ
পুণ্যকর্ম শুক্রতে করিব।

দেও-তাড়ন : মেষরাশি দেওধাম 'মহাদেও' যার নাম
পন্থে পাই মনুষ্য ধরএ
মুখে না নিঃসরে বাণী চক্ষু হোন্তে পড়ে পানি
উন্মত্ত বচন কহএ।
তাঁহার ঔষধ পুনি মউরের পুচ্ছ আনি
ধরিব শিরে তালপত্র সম
অশ্বের কপাল লোম সেহ আনি দিব ধূম
ধূমে ধাইবেক ভূতাধম।
বৃষে 'বুধ' পাপাশএ নদী তীরে নিবাসএ
কূপ পুষ্করণী তীরে থাকে।
দন্ত জিহবা কালা হএ তনু কম্পে স্থির নহে
দন্তে দন্তে করি কড়াকড়ি। ইত্যাদি

এমনি করে বিভিন্ন দেও-এর আসর ও তার প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে।

রাজনীতি :

১. চতুর্থে ভূমিক চাষা রাজ্যের জীবন
চাষাকে আপনে রাজা পালন করিব
ধার্মিক রাজার চাষা যুদ্ধে সৈন্য হএ
বল কৈলে যুদ্ধকালে সৈন্য না যুঝএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. বিক্রম করএ জন প্রসাদে তুষিব।
৩. যুদ্ধ করি ধন পাই লেলাইব কাড়ি।
বিবর্তিয়া দিব ধন মনে কৃপা করি।
৪. যার যেই যোগ্য কর্ম বুদ্ধি নিয়োজিব
কার্য কৈলে তাহাকে যে প্রাসাদে তুষিব।
৫. দরিদ্রতা হোন্তে নত হৈব পাত্রগণ
বিস্তর না দিব ধন আলস্য হইব
ধন লোভে ঈশ্বরের কার্য না করিব।
৬. দুই কর্ম করি রাজা রাখিবেক দেশ।
ভালে ভাল মন্দে মন্দ হএ সবিশেষ।
দুই কর্মে একজন না দি কদাচন
এক হস্তে না শোভএ দুই শরাসন।
এক কর্ম দুইএ দিলে নিতি দ্বন্দ্ব হএ
এক খাপে দুই খড়্গ যেন না শোভএ।
৭. সত্যবাদী দেখি চর রাখিব রাজন
চরকে যে পুত্রতুল্য করিব পালন।
চর সে রাজার চক্ষু সব বার্তা কহে
চর বিনে নৃপ ভালমন্দ না শুনএ।
৮. শুদ্ধপাত্র মধ্যে এক হএ দুর্মতি
তাহাক বধিলে সব হয়ন্তি সুমতি।
কিন্তু মহাপাত্রে যদি রাজা দোষী ভাবে
বন্দী করি রাখে তারে না বধি জীবন
তাহাকে বধিলে বল পাএ শত্রুগণ।
৯. দুষ্টজন হিংসা হোন্তে প্রজাক পালিব
গোধন সদৃশ প্রজা নিশ্চএ জানিব।
রক্ষক সদৃশ প্রাএ নৃপতি ঈশ্বর
সিংহ-ব্যাঘ্র সম জান দুর্জন বর্বর।
সেই সে দুর্জন মূঢ় পড়ি নিদ্রা যাএ
গোঠে বসি শার্দূলে গোধন ধরি খাএ।
১০. বিনি দ্বন্দ্বে কোনে বা রাখিছে রাজনীতি
দ্বন্দ্ব হোন্তে শত্রুনাশ মিত্রের উজ্জ্বল
দ্বন্দ্ব করি নৃপতি শাসিব মহীতল।
দ্বন্দ্বকালে দ্বন্দ্ব করি ক্ষেমা সর্বকাল
নিতি দ্বন্দ্ব কৈলে রাজা রাজ্যেত জঞ্জাল।
প্রীতি করি নৃপতি সবে রাখিব মন
পুত্র বা পাত্র বা ভার্যা কিবা ভৃত্যগণ।
দান ধর্মে রাখিবা আপনা যশকৃতি
সামদণ্ডে শাসিব সকল বসুমতী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্ত্রী পাত্র ও কায়স্থের ব্যবহার নীতি।
নৃপতির রোষ তুষ্ট হএ যেই কর্মে
সে সকল বুঝিয়া লেখিয়া থুইব মর্মে।
যে যে কর্মে সন্তোষ সে করিব নিশ্চএ
যদি আপনার মনে ভাল না লাগএ।
নৃপ সঙ্গে হট যদি কোথাত পড়এ
নৃপতির কথা সত্য কহিব নিশ্চএ।
যে কহে নৃপতি সেই কহিবেক পুনি
দিবসকে জান রাজা বোলএ রজনী।
যদি কহে দিনে রাজা হৈব রজনী
পাত্রে কহিলেক সেই তত্ত্ব হেন জানি।
বলিব উগিছে চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ
এইমতে রাখিবেক নৃপতির মন।
নৃপতির কথা না কহিব কার স্থান
গোপ্তব্যক্ত করিলে হারাএ নিজ প্রাণ।
যদ্যপি কহিতে পারে বহু না কহিব
মুখ দোষে দুঃখ পাএ নিশ্চএ জানিব।
নৃপতির প্রীতি দেখি না হৈব ভোর
নৃপতির আপনা করি যে না করে ভএ
অতি শীঘ্রে অগ্নি যেন ধরি কোলে লএ।
রাজার চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে
ক্ষেণে দোষে হাসে ক্ষেণে স্তুতি কৈলে মারে।
নৃপতি করিলে শাস্তি না কহিব কা'ক
যার বুদ্ধি থাকে কভো না চটাএ রাজাক।

প্রজার দায়িত্ব কর্তব্য ও আনুগত্য :

প্রাণপণ করিবেক নৃপতি কারণ
প্রাণ ভএ কভো ভঙ্গ না করিব রণ।
চরমুখে শত্রুবার্তা লৈব নিরন্তর
নৃপতিক জানাইব সে সব উত্তর।
নৃপতি কহিতে কথা না হৈব বিমন
পাত্রগণ সঙ্গে যুক্তি করিতে নৃপতি
আগে না কহিব বুঝি সভার প্রকৃতি।

সৈন্য :

নৃপ হোন্তে সৈন্য যদি মন দুঃখ পাএ
বামবুদ্ধি হএ সব, রাত্রি তম প্রাএ।
সৈন্য করে রাজ্য রক্ষা ধনে রাখে সৈন্য
ধনে সৈন্য সর্বধন রাখে অন্যে অন্য।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সতর্কতা :

যেই বস্তু উপরে রাজার যাএ মন
সে বস্তু আপনে না রাখিব কদাচন।
ইঙ্গিতেহি ধন প্রাণ নৃপ আগে দিব
কাক যদি নৃপতির কোপ থাকে মন
নহে অপবাদী হই থাকে সেই জন।
তান সঙ্গে হাসি-রসি কথা না কহিব
না বসিব পাশে, তাকে নাহি প্রশংসিব।
নিজ কার্য হেতু রাজ কার্য না এড়িব
যে কার্য দিয়া থাকে প্রাণান্ত করিব।

কবির উর্ধ্বতন কয়েক পুরুষ চট্টগ্রামের সেনানী শাসক (উজির) ছিলেন। তাঁর পিতৃব্যও ছিলেন উজির। কাজেই শাসক ও শাসিতের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তাঁর সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অভিব্যক্তি পেয়েছে উদ্ধৃতাংশে, মনিব-মজুর কিংবা দফতরের হুজুর ও তাঁবেদার চাকুরের জন্যে এ নীতি আজো ফলপ্রসূ।

বিবিধ বিষয়ে নানা হিতকথাও কাব্যের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। [উত্তম ও অধম]

অহঙ্কার :

সিংহ মারি অহঙ্কার উত্তমে না করে
অধমে শূকর মারি সিংহনাদ ছাড়ে।
কোকিলে না করে গর্ব চ্যূতাঙ্কুর পাই
ভেককুল গর্বএ কর্দম জল খাই।
গর্ব যেই করে তার অবশ্য লাঘব
অহঙ্কার করে লোকে পাএ পরাভব।

নম্রতা :

নম্রভাবে পুরুষের শাস্ত্রেত বাখানি
নম্র হএ ডালবৃক্ষ ফল ধরে পুনি।
নিষ্ফল শিমুল বৃক্ষ ছুঁইল আকাশ
অহঙ্কার গর্ব কৈলে অবশ্য বিনাশ।
নম্রভাবে শত্রুমনে কৃপা উপজএ
অহঙ্কার মিত্রি সব শত্রুতুল্য হএ।

সেনানীবিহীন সৈন্য :

মৃগ যেন ধাএ পাই সিংহের আতঙ্ক
নৃপতির ভঙ্গে সৈন্য ধাএ চারি পাশ
কাণ্ডারী বিহনে নৌকা যাএ আন পাশ।

স্বামী :

(নারীর) স্বামী হোন্তে নাহি গুণজন
দুষ্টস্বামী অশ্বত্থের বৃক্ষপ্রাএ
ছায়ামাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ।

ধন ও জীবিকা :

বটেকে খাইলে ফুরাএ ভাণ্ডার
বটেকে অর্জিলে হএ পর্বত আকার।
বর্ণিজ করিতে যদি নারে কদাচন।
সুঝতে করিব কৃষি অর্জিবেক ধন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরোপকার : লোকহিত করিবেক মেঘের তুলনা
সর্বস্থানে জল যেন বরিখএ ঘান।
উত্তম অধম প্রতি করিবেক হিত
সূর্যের কিরণ যেন লাগে পৃথিবীত।

ষটঅগ্নি : ষটঅগ্নি সংসারেতে শুন অগ্নি কহি
এক অগ্নি নরকে পাতকী যাএ দহি।
সেই প্রভু করতার কৃপার সাগর
কৃপা কৈলে নিবাএ অগ্নি খরতর।
আর অগ্নি সংসারেতে দহে বৃক্ষগণ
জীবনে সে লৈতে পারি তাহার জীবন।
আর অগ্নি উদরেতে শরীর জ্বালএ
অন্ন পাইলে শান্ত হএ সে অগ্নি নিশ্চএ।
আর অগ্নি দহে বিরহের বিরহিণী।
প্রথম সঙ্গমে অগ্নি নিবাএ আপনি।
আর অগ্নি চিন্তার চিন্তিত দহে মন
মনোরথ সিদ্ধি হৈলে পাএ নিবারণ।
আর ক্রোধানল হোন্তে ধর্মে পাএ নাশ
ক্ষেমা হোন্তে নিবি যাএ সে পাপ হুতাশ।

ধন-মাহাত্ম্য : ধনহীন দাতার বিপদে মনদুখ
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোকে জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
সভা মধ্যে নির্ধনীর বিষণ্ন বদন
জলহীন ঘট যেন না করে শোভন।
ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নারী
মধুহীন ফল যেন না লএ শুক শারী।

তিনকার্য : তিনকার্যে মনুষ্যের সঙ্কট পড়এ
বহুভোগ বহু নিদ্রা যে বহুক হএ।
বহুকথা কহিতে অবশ্য মিথ্যা কহে
[তুল : সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর]
তিল এক ধর্মপন্থে মিথ্যা নাহি সহে।
সত্যবাক্যে স্বর্গবাস মিথ্যাএ নরক
মিথ্যা যেন ফোঁটা, সত্য চন্দন তিলক।

চারকর্ম : চারি কর্ম মনুষ্যে করিব ধর্ম ছাড়ি
সত্য ছাড়ি ছিদ্র পাই মারিবেক বৈরী।
মিথ্যা কহি প্রাণ রক্ষা করিব নিশ্চএ
অভক্ষ্য ভক্ষিব যদি রোগ নাশ হএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্কটে পলাই যদি প্রাণ রক্ষা পাএ
লজ্জা ছাড়ি প্রাণ রক্ষা করি সর্বথাএ।
আত্মরক্ষা মহাধর্ম নিশ্চএ জানিব।

কুলধর্ম ও কুলাচার :

যুদ্ধেতে বিমুখ হৈলে নরকে বসতি
যুদ্ধে মৈলে কীর্তি রহে স্বর্গেত গমন,
ক্ষত্রিকুলে জন্মিয়া যে প্রাণের কাতর
নিষ্ফল জীবন তার সংসার ভিতর।
নিজকুলধর্ম ছাড়ে যেই দুরাচার
গন্ধহীন পুষ্প যেন নাহি প্রতিকার।
এথেক জানিয়া লোকে কীর্তি সে আচরিব
প্রাণান্তেহ নিজ কুলধর্ম না বর্জিব।
সর্প কি তেজএ মণি সিংহ কি বিক্রম
কুল-কর্ম-ধর্ম কভো না তেজেঁ উত্তম।

চেষ্টা :

চেষ্টা না কৈলে লোক নিবন্ধ বহুতর
নিজ দোষে কাপুরুষ হএ অথান্তর।
চেষ্টা কৈলে অক লোকে নিন্দএ অনেক
চিন্তিলে না হএ কার্য দৈব পরিপাক।
মথিলে সে দুগ্ধে ঘৃত পাওন্ত গোয়াল
চেষ্টিলে সে কার্য সিদ্ধি ঘুচএ জঞ্জাল।

চারবস্তু :

চারি বস্তু বিষম কহিএ শুন তোক
গুরুগৃহ দূরে হৈলে শিষ্যের বিপাক।
বিশেষ অর্জিলে ভোগ বিষ সমতুল
যার গোষ্ঠী দরিদ্র সে নিশ্চিত আকুল,
তাহাত বিষম জান বৃদ্ধের তরুণী।

চারশত্রু :

চারি শত্রু ঘরে রাখি থাকে যেইজন
অবশ্য দুর্গতি তার বিকৃত মরণ।
দুষ্ট দোচারিণী নারী মিত্র যার শঠ
উত্তরদায়ক ভৃত্য পায়এ সঙ্কট
সর্প যেবা ঘরে রাখি নিঃশঙ্ক মন
এই চারি শত্রু হোন্তে সংশয় জীবন।

যোগতত্ত্ব ও যৌগিক চিকিৎসা :

যোগী পুস্তকেত চাহি ঔষধের বড়ি
ত্রিপিনী তিহরী মধ্যে যোগী ধন্বন্তরী।
গুরুভক্তি করি শিবশক্তি এক লৈল
উর্ধ্বানলে বাউ ভক্ষি তাত ফুক দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলিল প্রসন্ন দিগন্তর
ধ্যান বলে জ্ঞান অগ্নি জ্বলিল সত্বর।
যেন জুতি প্রকাশিত তম পাইল ক্ষএ
স্বর্গমর্ত্য পাতালে উঠিল জএ জএ।

নির্ধন হওয়ার কারণ :

আর এক কথা প্রতি কহি শুন পুনি
আপনার দোষে লোক হয় নির্ধনী।
পরদার করে যেবা মিছা কথা কহে
শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া যেবা স্নান না করএ।
বাপমাও গুরুক অসন্তোষ করে
অবজ্ঞাএ নাম ধরে ডাকে উচ্চস্বরে।
বাপের ভগিনী কিবা মায়ের ভগিনী
যথ গুরুজনকে যে দুঃখ দিতে পুনি।
আপনার সন্ততিরে নিত্য গালি পাড়ে
অভ্যাগত আইলে যেবা মন দুঃখ করে।
মিথ্যা দিব্য ধরে যেবা না করিয়া ভএ
প্রভাতে সন্ধ্যায় যেবা নিদ্রা সে যাএ।
স্বামী হোন্তে চুরি করি যে ধন সঞ্চএ
সেই নারী থাকিলে সে নির্ধনী হএ।
পুত্র বোল না ধরএ পড়শী দুর্জন
আপনে আলস্য প্রীতি করে সর্বক্ষণ।
ভৃত্যগণ বিমতি মনেত নাহি প্রীতি
এ সকল চরিত্রে নির্ধনী হএ অতি।
পিন্দন বসনে হস্ত মুখ যে পোছএ
পড়িয়া থাকএ অন্ন যেবা না তোলএ।
যথা মুখ ধোএ, তথা প্রস্রাব যে করে
ভূমিতে ঘসিয়া হস্ত পাখালে যে নরে।
ভিক্ষুকের তণ্ডুল কিনিয়া যেবা খাএ
ফুক দিয়া প্রদীপ যে জনে নিবাএ।
কাটারি এড়ি দন্তে যেবা নখ কাটে নিতি
থিয়াই আঁচড়ে চুল যেবা ক্ষুদ্র মতি।
ভাঙ্গা ফণী দিয়া যেবা কেশ আচারএ
এথেক প্রকারে জান নির্ধনী হএ।

দরিদ্রতা :

দারিদ্র্যেত ব্যবসা না রহে সর্বথাএ
বাপমাও না সন্তোষে স্বামী কৃপা ছাড়ে
পুত্রে না করএ কৃপা জ্ঞাতি না আদরে।
ঈশ্বরে না করে দয়া ভীত ছাড়ে ভএ
নির্ধনী পড়শী দেখি সকলে হিংসএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিন্তামুক্তি :
ভোগী বোলে ভাগ্যবন্ত থাকে যার ঘর
শত্রু ভয় না থাকে অরুগী হএ অঙ্গ
এ তিন প্রকারে চিন্ত না থাকিবে সঙ্গ।

দুশ্চিন্তা :
যার বহু ধার হএ চিন্তা বাড়ে অতি
আপনা শোণিত পান করে প্রতিনিতি।
যার অল্প অর্জন বহুল হএ পোষ
নিরন্তর চিন্তা পাএ মন অসন্তোষ।

আয়ু-বৃদ্ধির কারণ :
ভোগী বোলে শুনিলে সুশব্দ নিরন্তরে
চন্দ্রমুখী প্রিয়া মুখ যে নিতি দেখএ
ধন প্রাণ লাগি যার না থাকএ ভএ।
মনোবাঞ্ছা পুরে নিতি ঘুচএ জঞ্জাল
এ চারি প্রকারে আউ বাড়ে সর্বকাল।

আয়ু-হ্রাসের কারণ :
ভোগী বোলে দীর্ঘ রুগী হএ যেইজন।
বৃদ্ধকালে নির্ধনী পরের করে আশ
থাকিতে টুটিব আউ হইয়া নৈরাশ।
অবিরত মিথ্যা-অঙ্গ দেখে যেইজন
নিরন্তর শত্রু ভএ থাকে তার মন।
নারীগণ নাডি-হেঁটে যেজন দেখএ
এ পঞ্চ প্রকারে আউ টুটুএ নিশ্চএ।

চার অভাগা :
হীনজন অপমান শরীরে না সহে
হীন সেবা হোন্তে ভাল যদি মৃত্যু হএ।
স্বামী সোহাগহীনা নারী বিফল জীবন
যার নারী অসতী সে জিএ অকারণ।
যে জনে ধনীর ঘরে মাগে নিরন্তর
ভুঞ্জএ নরক দুঃখ সংসার ভিতর।
এ চারিজনের পুনি মরণ সে ভাল
মৈলে সে ঘুচএ দুঃখ পাতকী জঞ্জাল।

বল-বৃদ্ধির কারণ :
ভোগী বোলে ঘৃত মাংস করিলে ভোজন
সুগন্ধি আমোদ গন্ধ পাইলে অনুক্ষণ
অনুদিন স্নান নব বসন পরিলে
গাএ বল বাড়ে অর্থ গঠিত থাকিলে।

শক্তি-হ্রাসের কারণ :
ভোগী বোলে বহুতর চিন্তা থাকে যার
বল টুটে যে অমূল্য খায়ন্ত বিশেষ
বহু নারী সম্ভোগে বহুল হএ শেষ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণের নিয়ম :

ভোগী বোলে প্রতিপদে অষ্টমী দশমী
অমাবস্যা পূর্ণিমাত নারীক না রমি।
প্রভাত সমএ যদি সম্ভোগ করএ
সেই ক্ষণে জন্মে পুত্র কাল ঘোর হএ।
লেঙ্গটা হইয়া যেই কর এ রমণ
ভূত-দৃষ্ট হএ সেই শাস্ত্রের বচন।
রোগবিকার ঘোরে করিলে শৃঙ্গার,
উন্মত্ত পুত্র হএ চঞ্চল বেভার।
বুধ রবি রাত্র দিনে যে জনে রমএ
তাত পুত্র জন্মিলে অধর্মী পাপী হএ।
সোম শনি গুরুবারে যে জনে রমএ
সত্যবাদী ধর্মিক মঙ্গল উপজএ।
সোম শুক্র গুরু রাত্রি রমিবেক নারী
জন্মিবে চিরাউ পুত্র শুদ্ধ ধর্মচারী।
প্রথম প্রহর মন্দ, দ্বিতীয় মধ্যম
তৃতীয় প্রহর রাত্রি রমিলে উত্তম।
অধিক উত্তম জান চতুর্থ প্রহরে
সন্ধ্যাকালে কদাপিহ না রমিব নরে।
এককালে পতি-পত্নী বিন্দুপাত হৈলে
নপুংসক পুত্র হএ সেক্ষণে জন্মিলে।

পুত্র ও কন্যা জন্মের রহস্য :

এক, তিন, পঞ্চ, সপ্তে, নয়, একাদশে
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে।
পুত্র উপজএ যদি হএ গর্ভবতী
যে যে দিনে কন্যা হএ শুন নরপতি।
দুই চারি ছয় অষ্ট দশম দ্বাদশে
ঋতু আপেক্ষএ যদি এসব দিবসে।
গর্ভবতী হএ যদি কন্যা উপজএ
কহিলুঁ কন্দর্প কথা শুন মহাশএ।
শুক্র সোম শনি গুরু দক্ষিণে পবন
এদিনে স্রবিলে ঋতু জন্মএ নন্দন।
রবি ভোর বুধ বামে শ্বাস বাউ বহে
তাত ঋতু আপেক্ষিলে কন্যা উপজএ।

গর্ভবতীর আচরণীয় :

ভোগী বোলে গর্ভবতী হইলে সুন্দরী
ক্ষুধাতুর উপবাস না থাকিব নারী।
আমলকী ফল গর্ভবতী না খাইব
আমলকী কাষ্ঠ অগ্নি ঘরে না জ্বালিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অম্ল লবণ আনি না খাইব সুন্দরী
বহু রৌদ্রে বসি না থাকিব হেলা করি।
শীত বলি অগ্নি জ্বালি ধিক না বসিব
উঞ্চ নীচ পন্থ দেখি বুঝিয়া হাঁটিব
অশ্বে গজে না চড়িব না চাহিব কাক
কোপ করি মন দুঃখে না দিবেক বাক্।
না চাহিব গর্ভবতী কূপ অভ্যন্তরে।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা :
ভোগী বোলে কপি যেন ঝুনা নারিকেলে
খাইতে না পারে জল নাচে কৌতূহলে।

তরুণের বৃদ্ধ ভার্যা : ভোগী বোলে শুক সঙ্গে যেহেন উলুক
অবশ্য পেচক হস্তে প্রাণ দিব শুক।

দম্পতি : পতি সঙ্গে সতীর কলহ চিরদিন
না রহএ জলে জল নহে যেন ভিন।
চিরদিন না রহে মিত্রের কোপ মন
কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন।
কিন্তু, দুষ্টনারী প্রীতি নাহি রহে চিরকাল
অবশ্য কলহ বাঝে ঠেকএ জঞ্জাল।

আত্মজ্ঞানী : মুনি বোলে যে জনে করে পর উপকার
আত্মপ্রাণ পরপ্রাণ সমতুল যার।
যে জনে আত্মা চিনে সত্যবতী জান
দুঃখ সুখ সমতুল যার হএ জ্ঞান।

দুষ্টমিত্র : দেবী বোলে দুষ্টমিত্র সমস্যা কেমত
মুনি বোলে ষটাঙ্গুলি হস্তেত যেমত।
কাটিয়া ফেলিলে গাএ না লাগে বেদনা
রাখিলে সংসার মাঝে অযশ ঘোষণা।
দেবী বোলে দুষ্টমিত্র সমস্যা কি বোলে
মুনি বোলে অক্ষি যেন লৈতে চাহে খুলে।

দুষ্ট স্বামী : দুষ্ট স্বামী অশ্বথের বৃক্ষ প্রাএ
ছায়া মাত্র থাকে ফল খাইতে না পাএ।

মিত্রতা বৃদ্ধি : মুনি বোলে দোষ দেখি যেজন ঢাকএ
সেই দুই জনের মাঝে মিত্রতা বাড়এ।
দেবী বোলে কোন কর্মে সব মিত্র হএ
মুনি বোলে যেই জনে মিছা না কহএ।

পুণ্যপেশা : মুনি বোলে ক্ষেতি চাষ করিব সদাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপ-পেশা : মুনি বোলে পাপ হএ মদ্য বেচি খাইলে।

অমানুষ : সত্যবতী বোলে অমনুষ্য কোন্ হএ
মুনি বোলে লোভী হই বহুল ভক্ষএ।

অতিথি সৎকার : নানা ভোগ ভুঞ্জাইব করি পরিহার
বাঢ়াই দিবেক সে যাইতে আরবার।
অভ্যাগত যাচক পণ্ডিত গুণিগণ
যার দ্বারে আছে পাএ করে যেইজন।
এই সকল যার দ্বারে সেই ভাগ্যবন্ত
তাক মনে দুঃখ দিলে লক্ষ্মীএ ছাড়ন্ত।

বিড়ম্বিত সত্য : দেবী বোলে সত্যকথা কোথা মিথ্যা হএ
মুনি বোলে বৃদ্ধকালে যৌবনের কথা
দুঃখেত সম্পদ কথা নাহিক সর্বথা।
মিথ্যা কথা কহিলেহ মিথ্যা বোলে লোক
সত্য কথা কহিতে মনেত বাড়ে দুঃখ।

যোগ সিদ্ধি : দেবী বোলে যোগপন্থ কোন্ কর্মে পাই।
মুনি বোলে পঞ্চবৈরী যে পারে জিনিতে
মায়া মোহ লোভ কাম কোপ নিবারিতে।

বুদ্ধিমান : দেবী বোলে বুদ্ধিমন্ত বুলি কোন গুণে
মুনি বোলে যেবা অল্প কহে বহু শুনে।

চার অপাত্র : দেবী বোলে যুক্তি কা'ত রাখিব লুকাই
মুনি বোলে না কহিঅ চারিজন ঠাঁই।
দুষ্ট নারী বালক কিঙ্কর শত্রু স্থান
যুক্তি না কহিবে ভাঙ্গি যদি থাকে জ্ঞান।

বৈদ্যের কর্তব্য : ত্রিতিয়া বোলন্ত বৈদ্য ধর্মিক ভজিব
ধর্মিকের হস্তেত বিষ অমৃত হইব।
না বুলিব মুঞি রোগ করি দিব ভাল
না হইলে পাএ লাজ সে পাপ বিশাল
আগে নিরঞ্জন বুলি কহিব বচন
শেষে ভক্তি করিয়া চাহিব রুগীগণ।
নির্ধনী দেখিয়া কভো নাহি উপেক্ষিব
পুণ্য ফলে সেই ধন নিরঞ্জনে দিব।
রুগী করি ঘৃণাক্ষরে না করিব মনে
জানিব সভাকে দিতে পারে নিরঞ্জনে।
রুগীস্থানে ঔষধের নাম গ্রাম কৈলে
দেরীতে খণ্ডএ রোগ ধন্বন্তরী হৈলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদর্শ পরিবার :

লোভ করি নৃপধন না করিব উন
স্থির বুদ্ধি হই বজাইব সর্বগুণ।
লোক সব অপকার কভো না করিব
কিন্তু মাত্র বহু-ঝিক বুদ্ধি না লইব।
নিজ বুদ্ধি হৈলে যেন কান্তের সংবাদ
পাপ না করিব, পাএ না হৈব মুগধ।

সঙ্কটে তিন কুলাচার :

সঙ্কট কার্যের তিন কুলাচার রহে
লোক সব অপহিংসা কভো না যুয়াএ।
আপনে অর্জিব যে সে করিব না ভোগ
বিনি বুদ্ধি কি করিব তিন সমযোগ।
কতুকে না হএ কার্য না হৈলে চতুর
পাখহীন পক্ষী যেন বলহীন চোর।

পাপ ও পাপীর পরিণাম :

প্রথমে যে সাধু সব মিথ্যা কহে নিতি
উলটে ঠকাই পাপী হরে পর বিত্তি।
দ্বিতীএত বাপহীন বালকের বিত্তি
যেবা বলে হরে তার শুন যেন গতি।
তৃতীএত পড়শীক বল করি থাকে
নরকেত হস্তপদ ছেদিবেক তাকে।
চতুর্থেত ধর্মবন্ত জন'ক যে নরে
সম্ভাষে নারকী কিবা উপহাস করে।
পঞ্চমেত যে সকল নিজ কুলাচার
শাস্ত্রনীতি না সেবএ প্রভু করতার।
ষষ্ঠমেত স্থাব্যধন যে করে ভক্ষণ
পিষ্ঠে জিহ্বা নিকালিব করিব যাতন।
সপ্তমেত যে সকলে করে পরদার
দূতসবে প্রহারিব অগ্নির মাঝার।
অষ্টমেত আরে করি যে পাপিষ্ঠ নারী
লোক ভএ গর্ভপাত করে অনাচারি।
নবমেত যে সকলে করে মধু পান
মধুমত্ত হই কিবা তেজিব পরাণ।
দশমেত ধন খাই যে পাপিষ্ঠ ছার
একহেতু অন্যের করএ অপকার।
একাদশে যে সকলে পরচর্চা করে
কপি রূপে রহিবেক নরক অন্তরে।
দ্বাদশে যে পাপ করে লোক অপকার
ধর্মভীত করি লোকে করিল প্রচার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ত্রয়োদশে লভ্যধন খাএ যেই জন
দহিব নরক অগ্নি সেই সকল জন।
চতুর্দশ শাস্ত্র পড়ি যেবা পাসরএ
নরকেত অন্ধ হই রহিব নিশ্চএ।
পঞ্চদশে যে সকলে ন্যায় বুঝি নিতি
ধন খাই অন্যায় করিল পাপমতি।
ষষ্ঠদশে মিছা সাক্ষী দিল যেইজন
উৰ্দ্ধ কণ্ঠে হাঁটিবেক গর্ব করি মন।
অষ্টদশে গৃহ কর্মহেতু যেইজন
সময়েত না করএ প্রভুক সেবন।
নবদশে যে আহুকে করে পাপকর্ম
সভাকে আদেশ করে করিবারে ধর্ম।
বিংশভাগ যে সকলে শুনে একমন
শৃঙ্গার করিয়া স্নান যেবা না করএ
কুম্ভ পাক নরকেত সে সব পচএ।
অপবিত্রে জপতপ যজ্ঞ অকারণ
অপবিত্রে পুণ্য করি নরকে গমন।
পুরুষের সঙ্গে যদি পুরুষে রমএ
অঘোর নরকে জান সে পাপী পড়এ।
নরকে পড়িব গুরু নিন্দে যেইজন
মাও বাপ হিংসে যেবা নাম ধরি ডাকে
সে সকল পড়িব নরক কুম্ভপাকে।
রজস্বলা হই নারী গঞ্জিল সমএ
স্নান না করিয়া যদি শৃঙ্গার করএ।
সে নারী-পুরুষ কিবা নরকে গমন। ইত্যাদি

চার পুণ্যবান : যে করে সন্তোষ নিতি ভিন্নজন মন
নিজ মনে যে কহে না কহে বিপরীত
সভাথু আপনে হীন জানিব নিশ্চিত।
গুরু উপদেশ ধরে করি প্রাণ পণ
মহা পুণ্যবন্ত জান এই চারিজন।

চার স্বর্গবাসী : ধার্মিক নৃপতি আর নির্লোভ তপস্বী
সত্যবন্ত পুরুষ যুবক সতী নারী
স্বর্গবাসী চারিজন দেখহ বিচারী।

রোগ প্রতিরোধক পাঁচটি ব্যবস্থা :
সত্যবোলে পঞ্চ কর্মে রোগ নাশ হএ
কিছু ক্ষুধা রাখি অন্ন যে জনে ভক্ষএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহু মিষ্ট না খাইব তিক্ত যে ভক্ষিব
চক্ষুতে দিবেক জল কর্ণে তৈল দিব।
প্রভাতে লবণ দিয়া মাজিব দশন
বহু উপকার জান শাস্ত্রের বচন।
ধনবন্ত হএ সুখে সুগন্ধি নিঃসরে
আর জান দশনের যথরোগ হরে।
দশন পবিত্র হৈলে শির-ব্যথা যাএ
মাজিলে দশন উপকার সর্বথাএ।

পাঁচটি ভালো কর্ম : ত্রিতিয়া বোলন্ত জান পঞ্চকর্ম ভাল
প্রতি ঋতু ফিরিলে যে করএ পাখাল।
প্রথমে গলের মাঝে অঙ্গুলি সঞ্চারি
উগলে অভ্যাস করি উপদেশ ধরি।
অর্ধপ্রহর হইলে যে করে ভোজন
বিস্তর অম্বল জল করে উপেক্ষণ।

পাঁচ প্রকার নিদ্রা : দ্বাপরে বোলন্ত নিদ্রা যাএ বুদ্ধি হরে তার
প্রহরেকে নিদ্রা গেলে নিরোগী হয়ন্ত
মধ্যাহ্নে নিদ্রা ধনবন্ত ভাগ্যবন্ত।
আড়াই প্রহরে নিদ্রা যাএ যেইজন
উন্মত্ত বেশ হএ শাস্ত্রের বচন।
সন্ধ্যাকালে নিদ্রা গেলে দোষ অতিশএ
চঞ্চল চরিত্র জান সেই জন হএ।
দিবসের নিদ্রা এই পঞ্চ পরকার
সহজে রাত্রির নিদ্রা জগতে প্রচার।
বহু নিদ্রা যাএ জন পশুর আকৃতি
বহু উজাগরে রোগ উপজএ তথি।

কলিকালের লক্ষণ :

যোগী বোলে শুন দেবী কহি ইতিহাস
কলি শেষে হইব জান প্রলয় প্রকাশ।
প্রলয়ের আগে হৈব কাল বিপরীত
পণ্ডিত হৈব মূর্খ মূর্খ সে পণ্ডিত।
হীন অকুলীন হৈবে রাজ্যের ঈশ্বর
কুলীন উত্তম হৈব জানহ কিঙ্কর।
যার পিতামহ জান বাস নাহি করে
করিব উত্তম গৃহে সে সকল নরে।
কুলীনে পাইবে তার আঙ্গিনাতে ঠাঁই
সাধু জনে দুর্জনকে সেবিবেক যাই।
লম্পট আছিল যেবা রাখিব গোধন
পিন্ধিব বিবিধ বস্ত্র নানা আভরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক মধ্যে শ্রেষ্ঠ হৈব ধনবন্ত ভোগী
রাজা হৈব ধনহীন কাঙাল হীন যোগী।
তপস্বীর ক্ষেমা যাইব উত্তমের বুদ্ধি।
শাস্ত্র জানি কেহ না করিব ধর্ম সুদ্ধি
শাস্ত্র শিখিবেক লোকে অর্জিবারে ধন
সে হইবে পণ্ডিত যার উত্তম বসন।
বৃদ্ধ হৈব নির্লজ্জ বালকে না মানিব
গুরুজন বলি কেহ মান্য না করিব।
সাধু সব কপটে হরিব পর বিত্তি
ধনদান না করিব না অর্জিব কীর্তি।
লজ্জাহীন হৈব সংসারের নারীগণ
দাসীর উদরে হৈব ঈশ্বর নন্দন।
বিবাহিতা নারী-প্রেম পুরুষে-এড়িয়া
দাসীত হৈব মগ্ন মর্যাদা ছাড়িয়া।
এক পুরুষেরে বহু নারীএ মাগিব
মোকে পরিণয় কর তাহাকে বলিব।
লভ্যধন খাইব করিব সুরাপান
পরপ্রাণ বধিবেক না থাকিব জ্ঞান।
মিথ্যাদোষ ধরি দ্বন্দ্ব হৈব পরস্পর
সত্যবাদী মিথ্যা হৈব সভার ভিতর।
সত্যবাদী হৈব যে কহে মিথ্যা কথা
ইষ্টবান্ধবের স্নেহ না থাকিব ব্যথা।
পণ্ডিত দেখিয়া লোক হইব অন্তর
শাস্ত্রকথা না শুনিব পাপের অন্তর।
পণ্ডিতেহ সভাকে না দিব উপদেশ
আপনে অধর্ম কর্ম করিবা বিশেষ।
বড় ঘর বড় বাড়ী করিব সকলে
না স্মরিব মৃত্যু হইলে যাইব মহীতলে।
অধার্মিক হৈব লোক পাপে মগ্ন হৈয়া
প্রভু স্থানে অপরাধ না লৈব মাগিয়া।
সংসারের মায়া মোহে মুগ্ধ হৈব লোক
না চিন্তিব কেমন পাইব পরলোক।
রাজা হৈব সিংহ ব্যাঘ্র হৈব পাত্রগণ
শৃগাল সদৃশ হৈব পাপিষ্ঠ দুর্জন।
অজার সদৃশ হৈব সত্যবন্ত লোক
সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল দেখিয়া পাইব শোক।
কলিকালে হইবেক এথ বিবরণ
দুগ্ধ হীন হৈব গাভী, বৃক্ষ ফল হীন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শস্য না ফলিব ফলে না থাকিব স্বাদ
নিদাঘে বরিষা হৈব বড় পরমাদ
বিনিরোগ মরিবে সংসারের লোক
দুর্ভিক্ষ দুর্দিন হৈব বাড়িবেক শোক।

বোঝা যাচ্ছে, সতেরো শতকেও আজকের মতো কলি বিদ্যমান ছিল, কেননা কবি ভবিষ্যৎ বাণীর ভান করে তাঁর কালের মানুষ ও সমাজের চিত্রই দিয়েছেন।

হিন্দুপুরাণের অনবরত ও অজস্র প্রয়োগে সত্যকলির কাহিনীর পরিবেশ সর্বত্র অক্ষুণ্ন রয়েছে। দেদার প্রয়োগ কোথাও বিসদৃশ হয়নি, বরং সুব্যবহারের লাবণ্যে সুষমা বেড়েছে। যথা

১. তারাক হরিল যেন চান্দ।
২. যে নাগের বিষঘাতে পরীক্ষিৎ হৈল পাত।
৩. বলিরাজা দাতা হৈল তোহ্মার প্রসাদে
হিরণ্য কশিপু মৈল তোহ্মার বিবাদে।
৪. বহুবহু নষ্ট যোধ কৌরব পাণ্ডব
৫. বিবাদে পাণ্ডব কুরু গ্রাসিলেক কাল।
৬. রাহু যে নাশিতে আছে রবির কিরণ।
৭. রাহু গ্রাসি দিবাকর উদরে নিঃসরে।
৮. সাহসেত ভজে লক্ষ্মী জানহ নিশ্চিতে।
৯. হরগৌরী পূজে নিরন্তর বরমাগে পূজিয়া শঙ্কর।
১০. এথ চিন্তি গঙ্গাদেবী করি আরাধন।
১১. হেন রূপ দেখি ইন্দ্র গুরু দার হরে।
১২. যাকে দেখি হরি-বিষধর (শিব) ধ্যান ছাড়ে।
১৩. কিবা বিধি কলানিধি হরিহর আদি
১৪. রাহু যেন চান্দ চাহে করিতে গরাস
১৫. যাহার মরমে হানে কাম পঞ্চবাণ
রাজা-প্রজা যোগী-ভোগী তার হরে জ্ঞান।
এই চান্দ মুখ হৈল সমুদ্র মথনে
ভাল চান্দ শিবশিরে রাখিল যতনে।
এই মুখ সুধা পিয়া জীএ সুরপতি
এই কুচ যুগ হোন্তে মদন নৃপতি।
এই ভুরু ধনু ধরি রঘুর নন্দন
বুঝিএ বধিল রাম রাজা দশানন
কিবা এই ধনু ধরি ভৃগপতি বীর
কাটিল কার্তিক বীর্য অর্জুনের শির
এহি সে গাণ্ডীব ধরি ধীর ধনঞ্জয়
ভীষ্ম আদি কৌরব করিল পরাজয়।
তারাবতী কোলে ক্ষুদ্র যোগী কহি শুন
এ ধনু না ধরে রাম না ধরে অর্জুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেই ধনুর্বাণে মোহ হৈল ত্রিপুরারি
সে বাণে মরমী যোগী কড়ার ভিখারী।
১৬. বামন মৈল যেমন ব্রাহ্মণী কারণ।
১৭. বাসুকী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর।
১৮. অনন্ত বাসুকী যেন পাতালেত পশে।
১৯. শকুনি জিনিল পাশা কপট কারণ
২০. পাণ্ডবে কপট করি কৌরব সংহারে
২১. কপটে ব্রাহ্মণ দেখ বলিক ছলিল।
২২. কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরে পাইল অপবাদ
২৩. মোহোর প্রসাদে বলি ইন্দ্রপদ পাইল।
২৪. মোহের প্রাণেশ্বর শ্যাম নবজলধর
২৫. হরিচন্দ্র সমজ্ঞান রঘুর সদৃশ মান
গাণ্ডিবে অর্জুন সম যোধ।
সর্বসিদ্ধি কল্পতরু জ্ঞানে শুক্র-জ্ঞানে গুরু
সংগ্রামে বিজয় সম রাম।
২৬. সমুদ্র মথনে যেন অমৃত উঠিল।
২৭. গোবিন্দ নিমিত্তে যেন পাণ্ডব-উদ্ধার।
২৮. দীক্ষাগুরু কল্পতরু জ্ঞানে ত্রিপুরারি
২৯. কথ শাস্ত্রে চন্দ্র সূর্য পূজে মা জানিয়া
৩০. শুক্র সম জান মানে দুর্যোধন
বুদ্ধিএ শকুনি তুল।
৩১. নতু শক্র শাপে ভ্রষ্ট হই বিদ্যাধর
৩২. হরে গৌরীদান করে প্রতিজ্ঞা কারণে
৩৩. রম্ভাভাবে দেখ মধুকৈটভ বিনাশ
৩৪. গৌরী হেতু মহেশ সর্বাংশে হএ নাশ
৩৫. ইন্দ্র-চন্দ্রে লজ্জা পাএ নারীর কারণ
৩৬. কিবা রতি সীতা সতী হরে যে গৌরী
৩৭. চন্দ্রেত কলঙ্ক দেখ তারার কারণ
৩৮. কালী ধরে মুণ্ডমালা ইন্দ্র পাএ লাজ
৩৯. সহস্রলোচন বন্দী হৈল সেই কাজ
৪০. মাধবে গোপিনী পরে করে কুন্তীসতী
৪১. সতী দ্রৌপদী এ বরে পাণ্ডু পঞ্চপতি
৪২. রাবণে হরিল সীতা রামক সমিত।
৪৩. ভৃগুপতি মাতৃবধে লোক অবহিত।
৪৪. মহারাজা নলকে ভ্রমাইল বনে বন
দময়ন্তী হারাইল মোহোর কারণ।
৪৫. রাম হোন্তে লক্ষ্মণকে করিনু বিমন
৪৬. যেহেন রাধে-হরি কিবা হর গৌরি কিবা নলদময়ন্তী।
৪৭. কিবা গঙ্গা সঙ্গে কেলি কৈল ত্রিলোচন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতিরও দেদার প্রয়োগ দেখি :

১. নয়ান কটাক্ষ হেরি পরচিত্ত আনে হরি
তারাক হরিল যেন চান্দ।
২. বিক্রমে কেশরী তুহ্মি জ্বলন্ত হুতাশ
৩. মেঘে যেন বরিখএ ঘনজল কণা
তোহ্মার দানের জান তেহেন তুলনা।
৪. শৃগালের ভএ কথা সিংহের বিমুখ
৫. কূপমাঝে পদ্ম যেন না করে শোভন
৬. তৃণরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ
৭. ক্ষুদ্র পশু ধরে যেন কেশরী প্রচণ্ড
৮. তোর মুখ বলি সখী চান্দের তুলনা
৯. কিন্তু কেহ চান্দ ধরে মৃগাঙ্ক লাঞ্ছনা
১০. উচ্চ সঙ্গে নীচ যদি প্রেম আশা করে
সূর প্রেমে কমল জলেত যেন মরে।
১১. যেন কপি লম্ফ দিল ধরিবার ভাণু
আপনে পড়িয়া তার ভাঙ্গি গেল জানু।
১২. রাতুল অধরে রাজা করন্ত মধুপান
১৩. শ্যাম অঙ্গে গৌর দেহ মেঘেত বিজলি।
১৪. শোণিতের স্রোত বহে মাংস হৈল পঙ্ক
১৫. শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষএ ধার
১৬. বিরহ সমুদ্র জান তার নাহি অন্ত
১৭. যেহেন গোময় কীট গোময়কে বলে মিঠ
ভ্রমর কুসুম গন্ধে মোহে।
১৮. চৈতন্য পাইয়া ধাএ আউদল কেশে চাএ
সভামধ্যে আইল দেবী উন্নত বেশ।
(তুল : চিত্রাঙ্গদা মেঘনাদবধকাব্য)
১৯. সুমেরু ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথাত।
২০. হেমন্ত কালেত যেন না শোভে নিদাঘ
ফাগুনে হেমন্ত হৈলে ঠেকএ বিপাক।
২১. সমুদ্রেত ঢেউ যেন না থাকএ চিন
২২. আকাশেত ধূম্র যেন হই যাএ লীন
২৩. প্রদীপে পতঙ্গ যেন বিরহে দহএ
২৪. চান্দের উদএ যেন সমুদ্র উথল
২৫. দর্পণের মল যেন ঘুচএ অঞ্জনে।
২৬. পদ্মাকূল বাউ যেন উলটে তরঙ্গ
(অবিকল এই চরণটি জায়েনুদ্দীনের রসুলবিজয়েও মেলে)
২৭. কলীন্দ্রের বাণ চলে বিজলি ছটক
২৮. জলরাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯. জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
৩০. সমুদ্রের জল যেন পর্বতেত লাগে
৩১. কোপে কলি মূর্তিমন্ত গজ।
৩২. যেহেন সাচন পক্ষী নর হস্তে মাংস দেখি
না চিন্তএ দিতে চাহে ঝম্প।
৩৩. কণ্টকে কণ্টক খসে পাপে ধর্ম না প্রকাশে
কপটে সে ধরা যাএ চোর।
৩৪. ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপ অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল।
৩৫. শিশু মৃগ ধাএ যেন সিংহের তরাসে
৩৬. কদাপি না তেজে যেন সুগন্ধি চন্দন।
৩৭. ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মত্তকরী।

এছাড়াও রূপ, সম্ভোগ ও যুদ্ধ বর্ণনায় কবির দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করে। রূপ বর্ণনার কিছু নমুনা :

তান সুতা ইন্দুমতী কামরতি সমা
বিচিত্র সৃজিল হেন কনক প্রতিমা।
মুখ দেখি লাজ পাই রহিলেক শশী
কেশ দেখি চামরী বনেত গেল পশি।
লুক দিল খঞ্জন চঞ্চল দেখি আঁখি
কাঞ্চন অগ্নিত দহে তনু কান্তি দেখি।
বান্ধুলি নিন্দিত কৈল রাতুল অধর
দশন দেখিয়া মুক্তা মজিল সাগর।
অমৃত সদৃশ বাণী মৃদু মৃদু হাসে
মুচুকিত হাসি যেন বিজুলি প্রকাশে।
ভুরু ধনু কটাক্ষ বিশিখ মারে শরি
এই বাণে তেজে ধ্যান দেবে ত্রিপুরারি।
শ্রবণ দেখিয়া বনে রহিল গৃধিনী
নাসা দেখি ঝরি গেল তিল কুসুম্বিনী।
কুচ কুম্ভ দেখি পদ্ম মজি গেল জলে
বড় ভাগ্যে হেন নিধি মিলে করতলে।
ক্ষীণ মাঝ যুগউরু ত্রিলোক মোহনী
কিবা রূপ বাখানিক সহজে পদ্মিনী।

কেবল মুখের লাবণ্য বর্ণিত হয়েছে অঢেল উপমায় অন্যত্র। পুরাণের প্রয়োগ অংশে ১৫ সংখ্যক উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

সৌন্দর্যের কবি কল্পিত মৌলিক বর্ণনাও রয়েছে। এখানে সুন্দরীর প্রসাধন ও সজ্জার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে :

অর্ধচন্দ্র ললাট সিন্দূর যেন সুর
অপরূপ বিশেষক যেন রাহু কর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেঢ়িয়া কানড় খোপা কুন্তল রচিত
মেঘে ঝাপি তারাগণ রহে বিপরীত।
খোপা বেঢ়ি মুক্তাদাম ঝিলি-মিলি করে
তমসী রজনী মেহু বিজুলি সঞ্চারে।
অপরূপ ভুরু ফণী ধরিল গরুড়
গজমুক্তা শোভে নাসা খগচঞ্চু তুল।
মুখ দীপ নয়ন খঞ্জন ভুরু ফণী
দেখি শুভদিন হেন মানে নৃপমণি।
বান্ধুলি অধর পরে মুকুতা দশন
তাত অপরূপ ঝরে অমিয়া বচন।
অনেক তিলেক গণ্ডে শোভে পয়বলি
চন্দ্রে ভেল কলঙ্ক কমলে শোভে অলি।
অপরূপ কম্বুকণ্ঠে শোভে মুক্তা হার
সুরুচির অলিবীর রহে গঙ্গা ধার।
সুবলিত বাহুলতা রক্ত করতল
অপরূপ মৃণালেত এ থল কমল।
অপরূপ থল-কমলেত পঞ্চবাণ
কাম পঞ্চবাণে জিনে অঙ্গুলির ঠাম।
অত অপরূপ বড় চান্দ পাঁতি পাঁতি!
সলজ্জিত প্রবাল দেখিয়া নখ জুতি।
হেমলতা সমতল কুচগিরি ধরে
অপরূপ ক্ষীণ মাঝা ভারে ভাঙ্গি পড়ে।
নাসা বলি সর্বজন মনে ভাএ ভএ
নাভি সরোবর বলি অনঙ্গ এড়ি ধাএ।
ধাইতে না পারে ভএ গিরি মাঝে গড়ে
বিষ ভএ খগপতি নাগ নাহি ধরে।
নিঃসর নিগুম্ভ বাম সিংহাসন চারু
বিপরীত সে রাম কদলী উরু চারু।
অঙ্গুলি চরণ ফণী চম্পক কমল
হেম-কান্তি দেহ মৃগ মদ পরিমল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে করেত কঙ্কন
পরিধানে পাটাম্বর নানা আভরণ।
নূপুর চরণে বাজে সে গজ-গামিনী
মৃদু মধু ভাষে কন্যা ছটকে দামিনী।
ভুরু ধনু অঞ্জনে রঞ্জিত চাপগণ
হানএ কটাক্ষ বাণ হাসি পুন পুন। .....
রূপ দেখি কামনা দগধে যাক
মরণেই তার মাংস না খাইব কাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভোগ-চিত্র : প্রথম শৃঙ্গার বালা লাজে ভএ রঙ্গে
কাঁপি কাঁপি উঠে বালা নম্র করি শির
কন্দর্পের দর্পে কম্পে চন্দ্রদর্প বীর।....
রাতুল অধরে রাজা করে মধু পান
বিষ গেল আনন্দিশ রহিল পরাণ।
নয়নে বয়নে চুম্বে চাপিয়া অধরে
ইন্দু আর বিন্দু মধু পিবএ ভ্রমরে।
গাঢ় আলিঙ্গন হৃদে হৃদে জড়ি কেলি
শ্যাম অঙ্গে গৌরদেহ মেঘেত বিজলি।
ঘন পীন কুচকুম্ভ জড়ি দিল হাত
পুলকিত দেহ চমকিত নরনাথ।
লোহিত বরণ কুচ সঘন মথনে
জয়পত্র রেখাদিল নখের লিখনে।
উরু উরু জড়ি করে ধরি কণ্ঠদেশ
সমঘ তাড়ন তরী যখন বিশেষ।
কাম সিন্ধু মাঝে পড়ি না রহিল জ্ঞান
উল্লাসি কুসুম ধনু হাসে পঞ্চবাণ।
নবীন শৃঙ্গারে বালা কম্পে থর থর
বিষম সংগ্রাম দেখি হাসে পঞ্চশর।

এমনি বর্ণনা গ্রন্থের অন্যত্রও মেলে। চন্দ্ররেখা সূর্যবীর্যের বিহার স্মর্তব্য।

যুদ্ধবর্ণনও সুন্দর। কবি নিজে উজির-সেনানী বংশীয় ছিলেন। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহ তাঁর কাছে কাল্পনিক ঘটনা নয়। সেজন্যেই সম্ভবত তাঁর হাতে যুদ্ধক্ষেত্রের সজীব চিত্র পাচ্ছি :

যুদ্ধ যাত্রা : বত্তিশবিধান দুন্দুভি নিশান
বীর-জয়-ঢোল বাজে
রথ সারি সারি চলে আগুসারি
উপরে কনক ধ্বজ
অলেখা তুরঙ্গ চলে মনোরঙ্গ
কোটি কোটি চলে গজ
চলে পায়দল ভূমি টলমল
ঘনসিংহনাদ ছাড়ে
ঢাকি ব্যোমপুর আচ্ছাদিল সুর
পদধূলি অন্ধকার
গজের গর্জন তুরঙ্গ হর্ষন
রথ নির্ঘোষ সার।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ : মুখামুখি দুই সৈন্য বাঝিল সমর
বাসুকী বাসবে যেন যুদ্ধ ঘোরতর।
রথে রথে ঠেলাঠেলি রথ ভাঙ্গি গড়ে
গজে গজে বিমর্দন অস্ত্র মারিবারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারাচ নালিকা গদা ভূষণ্ডি উম্বর
শূল শেল মুষল মুদগর কুন্তশর।
আশি পাশ অঙ্কুশ ত্রিকচ ভিন্দিপাল
সূচিমুখ, শিলামুখ চক্র করবাল।
ঝাড়ে ঝাড়ে বিশিষ্ট গগন ভরি পড়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী যেন গগনেত উড়ে।
মহা মহা রথী পড়ে পৃথিবীর সার
মহামত্ত গজ পড়ে পর্বত আকার।
অশ্ববার সৈন্য পড়ে শুনি ধরমরি
ভাঙ্গিল কদলীবন যেন মত্তকরী।
অলেখা পদাতি পড়ে শুনি হাহাকার
গগনে কবন্ধ নাচে, দেখি চমৎকার।
শোণিতের স্রোত বহে মাংসে হৈল পঙ্ক
শুনিতে হরিষ তনু শিবা গৃধ কঙ্ক।

এমনি যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটিই রয়েছে। এখানে বাণযুদ্ধের কিছু অংশ তুলে ধরছি। যুদ্ধের রূপকে সত্য-কলির পাপ-পুণ্যের ও ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতই এখানে বর্ণিত।

সুযোগ্য সারথি বিন্ধি দিব্যবাণ এড়ে সন্ধি
সত্যধর্ম 'পরে বজ্রঘাত।
সহিয়া সে ঘাও পুনি কোপে সত্য গুণমণি
সান্ধি এড়ে উগ্রশিখা বাণ।
চৈতন্য পাইল যবে ধনু ধরি উঠে তবে
ক্ষুরবাণে কাটিল কোদণ্ড...
কোপে এড়ে ভল্লবাণ কাটি পাড়ে শিরস্ত্রাণ
দিব্যবাণে বিন্ধিল সারথি ...
সারথি চৈতন্য পাইল পুনি বাহু বাঢ়াই আইল
কোপে সান্ধি এড়ে ভিন্দিবাণ।
সত্যকেতু সৈন্য দহে দেবগণ কম্পে ভএ
প্রজ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশ
চিন্তে সত্য ধনুর্ধর সান্ধিল আবরি শর
মেঘচয় এড়িল আকাশ।
আবর্ত সমর্থ দোন প্রখর আদি মেঘ সম
মুষলধারাএ ক্ষেপে জল
ঘন ঘন বজ্রঘাত কলি সৈন্য হৈল পাত
নিবাইল দারুণ আনল।
নিজ মনে আবকলি বাউ বাণ এড়িল কলি
মেঘচর কৈল খান খান
সত্যকেতু এড়ে গিরি কলি-ইন্দ্র অস্ত্র জড়ি
পর্বত কাটিল তুরমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলি এড়ে তম-শর   অন্ধকার দিগন্তর
কার কেহ নাহি পরিচএ
সত্যকেতু এড়ে শর   অন্ধকার হৈল দূর
কলিএ এড়িল নাগ-বাণ
ফণীগণে ফণাধরি   রহে সত্যকেতু বেড়ি
সত্যকেতু বিষে কম্পমান।
গুরু অস্ত্র সান্ধি এড়ে   নাগ সৈন্য কাটি পাড়ে
কলিএ এড়িল উল্কামুখ।
তবে সত্য ধনুর্ধরে   ক্ষেমাবাণ সান্ধি এড়ে
ক্ষেমা হোন্তে মেঘ উপজিল
ক্ষেমা মেঘে বৃষ্টি কৈল কোপে অগ্নি নিবারিল
চঞ্চলাস্ত্র কলিএ এড়িল।
পূণ্য সূর্য এড়ে সত্য   দীপ্ত কৈল স্বর্গ মর্ত্য
পাপ হোন্তে পাইল উদ্ধার
এড়িল কৃপণে বাণ   নাগ হৈল বিদ্যমান ..
সত্যদাতা অস্ত্র এড়ে   হর্যক্ষ আইল পরে
গরুড়ে এড়িল ফণী   কৃপণের বুদ্ধিহানি
দাতার সমুখে পাইল লাজ।

এভাবে ইন্দ্রবাণ, ভৈরবশর, সপ্তশাল বাণ, সূচিমুখ বাণ, শার্দুলবাণ প্রভৃতি বাণ পরস্পরের প্রতি 'মন্ত্রে তন্ত্রে হুঙ্কারি এড়িলা'। অন্যান্য অস্ত্রের নাম :

অর্ধচন্দ্র ক্ষুরবল্ল, নারাচ, নালিকা
শক্তি, শূল, মুষল, মুদগর কুম্ভপাল
ভূষণ্ডি, তুম্বুর চন্দ্র ভ্রমএ আকাশ।

রণবাদ্য : ঢাক ঢোল কাড়া শিঙ্গা নানা বাদ্য ধ্বনি।

খাদ্যবস্তু : মদ্য-মাংস দধি-দুগ্ধ নানা উপহার
ঘৃত মধু শর্করা বিবিধ ফলহার।
আম্র কণ্টকারী (?) মধু ছোলঙ্গ শ্রীফল
বদরিকা দাড়িম্ব যে গুয়া নারিকেল।
মত্তমান কদলিকা লাউ মিষ্ট নাড়ু
যথ বৃক্ষ ফল আদি দেখিতে সুচারু। ....
ঘৃত-মাংস এক করি আনন্দে গরাসে ....
দধি দুগ্ধ মধু-মিষ্ট করিয়া ভক্ষণ ...
মত্তমান কদলিকা আম্র মিষ্ট-পাই
ভোগী বোলে স্বর্গভোগ মিলাইল গোঁসাই।
চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চারি পরকার
ভোগ করি করে ভোগী নানা ফলাহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগ করি কর্পূর তাম্বুল দিল মুখ
ভোগী বোলে এহাত সংসারে নাহি সুখ।

ফুলের মধ্যে শিরীষ, চম্পা, নাগেশ্বর, পদ্ম, বান্ধুলি, জাতী, যূথী, মালতী প্রভৃতি নাম পাই।

রাজ-রাজড়ার পোষাক : কিরীট কুণ্ডল হার বিচিত্র বসন।

প্রসাধন ও প্রসাধনসামগ্রী :

সেকালে সুন্দরীরা কানড় ছাঁদের কবরী বাঁধত, কবরীতে মুক্তা, ফুল জাদ প্রভৃতি জড়িয়ে দিত। চোখে দিত অঞ্জন,-কাজল কিংবা সুর্মা। কপালে সিন্দূর আর কপালে চন্দন তিলক। এছাড়া মৃগমদ কুঙ্কুম ছিল প্রসাধনের অপরিহার্য অঙ্গ।

কর্ম ও অদৃষ্টবাদে আস্থাও ছিল মন জুড়ে :

ক. দৈবের নিবন্ধ জান না যাএ খণ্ডন
খ. মোর খণ্ড ব্রতের কারণ
তাত পড়ে পথ অখান্তর।

রাজসভায় : বেদ পড়ে পুরোহিত ভাটে স্তুতি গাহে।

যুদ্ধের প্রাক্কালে : বৈতালিক স্তুতি পাঠ আগে করি
মিত্রকণ্ঠ বেদ পড়ে
লইয়া ধূপ দীপ হইয়া সমীপ
আগুদিল সত্যবতী।

সেকালেও কন্যা : বাপ মাও প্রণামিয়া ইন্দুমতী বালি
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল স্বামী কাছে চলি
এবং রথে চড়ি নিজদেশে চলিলা তুরিত
শ্বশুর বাড়িতেও 'শ্বশুর-শাশুড়ী দুই করিলা প্রণাম'।

সে-যুগে সিংহাসনও ছিল প্রশস্ত তক্তপোষের মতো। তাই 'শুতিলেক রত্নসিংহাসনের উপর'। পাগল কিংবা যোগী যোগিনী হয়ে নারী বা পুরুষ 'আউদল কেশ ভ্রমে নগরে নগর।' একটি চিত্র : শোকাকুলা :

মুকুলিত কেশভার ছিণ্ডিল গলার হার
করঘাতে হৃদএ হৈল সূর
সিন্দূর লুকিত হৈল কেশে মুখ আচ্ছাদিল
রাহু গ্রাসিলেক চন্দ্রসূর।

রূপবতীর রেখাচিত্র :

তোর লাস রভসের কেবা দিব সীমা
বিবিধ সৃজিল তোকে রূপের প্রতিমা।
দেখি রবি-রথ রহে মুনি-মন ভোলে
লীলাএ মোহিব সত্য মৃদু মধু বোলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. নীতিশাস্ত্র বার্তা
মুজাম্মিল বিরচিত

মুজাম্মিল সম্ভবত ষোলো শতকের কবি। তাঁর নীতিশাস্ত্রবার্তা বা 'সায়াৎনামা' মূলত লৌকিক ও স্থানিক সংস্কার ভিত্তিক। এজন্যই এ গ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক।

মানুষ স্বভাবতই পৌত্তলিক। সে শক্তির পূজারী। দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা আর দানব থেকে ভয় তার মজ্জাগত। তাই অরি ও মিত্রশক্তিকে সে পূজা না করে পারেনি। আপাতদৃষ্টিতে নিরবয়ব মনে হলেও বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবনযাত্রার প্রমূর্ত অবলম্বন। দুর্বলচিত্তের এই বিশ্বাসপ্রবণতা নিহিত রয়েছে জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তাকামী আত্মবিশ্বাসহীন অসহায় মানুষের জৈব বৃত্তি-প্রবৃত্তির গভীরে। কেননা ভোগ ও আরামের অভাববোধই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জাগায়। অজ্ঞ অসহায় মানুষ যা চায়, তা পায় না; পাবার পথে আশা পূর্তির পথে হাজারো বাধা। অথচ হতবাঞ্ছার বেদনাও তার অসহ্য। তাই বাঞ্ছাসিদ্ধির জন্যে সে বহিঃশক্তির সহায়তা বা আনুকূল্যকামী। বাঞ্ছা সিদ্ধির এ কামনা থেকেই জাদু ও টোটেম বিশ্বাসের উৎপত্তি। প্রবৃত্তিজাত ও প্রায়-অবচেতন প্রবণতা প্রসূত জৈব-ধর্মের প্রয়োজনানুগ আচার-আচরণ তথা অভিব্যক্তিই Paganism. যৌক্তিক চেতনার উন্মেষপূর্ব অবস্থার জীবন তাই অন্ধবিশ্বাস সংস্কার নির্ভর।

কিন্তু দুর্বল মানুষের এই বিশ্বাস-সংস্কার নির্ভরতা আজো ঘোচেনি; ঘুচবেও না কোনোদিন, কেননা মানুষের আত্মরতি ও ভোগেচ্ছা এতই প্রবল যে সে তার প্রবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির প্রভাবমুক্ত হবার মতো যুক্তির নির্দেশ গ্রহণে অসমর্থ। তাই সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু বৃত্তি-প্রবৃত্তির অনুকূল না হলে কিছুই জীবনে গ্রহণ করে না।

অতএব বিশ্বাস-সংস্কারই তার জীবনের অবলম্বন, তার পাথেয়, তার মানসজীবনের নিয়ন্তা। এই বিশ্বাস-সংস্কারই যখন মানবমনীষার প্রয়োগে, যুক্তির নিরিখে সকারণ ও কল্যাণকর হলে বিবেচিত হয়, তখনি আচার-বিশ্বাস পরিচিত হয় ধর্মশাস্ত্র নামে। কাজেই Paganism ও Religion -এর Differentia হচ্ছে Reasoning যার উৎস Rationalism. যেহেতু বিনাশর্তে বিশ্বাসের অঙ্গীকারেই ধর্মের উদ্ভব, সেহেতু যুক্তির বাহ্য প্রলেপে জাদু ও টোটেম বিশ্বাসপ্রসূত আচার-আচরণই দেশকালের পটে জীবনের প্রয়োজনানুগ রূপান্তর লাভ করে মাত্র এবং তাই অবিচ্ছেদ্য সংস্কাররূপে মানুষের মর্মমূল থেকে উৎসারিত হয়।

কালিক ব্যবধানে অনেক ক্ষেত্রে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে, এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন আর জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। এগিয়ে যাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তনে তথা সমাজ-বিবর্তনে আদিম সংস্কারও পরিবর্তিত পরিবেশে নানা তাত্ত্বিক চিন্তার অনুপ্রবেশ কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। ধর্ম এবং জীবনের ক্ষেত্রে এ অবস্থা আজো পৃথিবীর সর্বত্রই লক্ষণীয়।

আমাদের দেশের ব্রতকথায়, রূপকথায়, উপকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে, ডাক ও খনার আপ্তবাক্যে এমনি বিশ্বাস-সংস্কারের আবেষ্টনীতে সীমিত ভীরু জীবনের সজীব চিত্র মেলে। মানুষের মানস ও সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস নির্মাণে তাই Folk lore-এর গুরুত্ব অপরিমেয়।

বলেছি, মানুষের আদিম বিশ্বাস-সংস্কার মরেনি, কেবল এগিয়ে আসা মানবমনীষার সঙ্গে সংগতি রেখে রূপান্তরিত বিবর্তিত সূক্ষ্মায়িত ও তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত হয়েছে মাত্র। তাই বিজ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দর্শনের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও মানুষের জীবনের অকপট ও নিবিড় অভিব্যক্তিতে তার প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তাই আমরা শাস্ত্রকথায় নীতিবাক্যে লোকাচারে ও প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং উচ্চ-তুচ্ছ সব ব্যাপারেই এর প্রভাব লক্ষ্য করি। শিক্ষা-সংস্কৃতি কিংবা বিজ্ঞান-দর্শন জানা লোকও ব্যক্তিজীবনে গরজের ও বিপদের দুর্বল মুহূর্তে এ সংস্কারের প্রভাবেই চালিত হয়, হাঁচি-কাশি ও টিকটিকি মানুষের জীবন ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

ফলে আমরা শাস্ত্রে-সমাজে যেমন, সাহিত্যেও তেমনি এ বিশ্বাস-সংস্কারের গুরুত্ব অনুভব করি।

আলাওলের 'তোহফা'য়, মুহম্মদ খানের 'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে', সেরবাজের 'মালিকার সওয়াল' বা 'ফখরনামা'য়, শেখ সাদীর 'গদা মালিকার পুথি'তে, এমনকি যোগশাস্ত্রীয় আলোচনায়ও এ বিশ্বাস-সংস্কারে আত্যন্তিক গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে দেখতে পাই। একালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়' এমনি জাদু ও টোটেম স্তরের জীবনবোধের আশ্চর্য সজীব চিত্র অঙ্কন করেছেন।

বৌদ্ধমন্ত্রযান এবং কালচক্রযানের উদ্ভবের মূলেও আদি জাদু ও টোটেম বিশ্বাসই রয়েছে। বলা চলে এ বিশ্বাসই ঐ যুগে ধর্মমতের রূপ নিয়েছিল। দারু-টোনা, তুক-তাক, তাবিজ-কবজ, বাণ-উচাটন, গ্রহ-নক্ষত্রের দৃষ্টি খণ্ডন প্রভৃতি ঐ আদিবিশ্বাসেরই উন্নততর প্রয়োগপ্রণালী। এসবের দ্বারা অপদেবতার ও জিনের কুদৃষ্টি, গ্রহের প্রভাবজাত রোগ ও দুর্ভাগ্য এবং আরো নানা রোগের চিকিৎসা হত।

মুজাম্মিল বর্ণিত বিষয়গুলোর অনুরূপ বিষয়ের সন্ধান অন্যত্রও মেলে, যেমন 'তোহফা'য় নিদ্রা বসন, চাঁদ প্রভৃতির আলোচনা পাই। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

ক. না লেপিও ঘর বেড়া গো-লাদ মিশ্রিত
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত।

খ. পতিপত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে যাএ।

গ. জ্ঞানচিত্তে নিদ্রা যাও মনে ভাবি সার
যে কর সে কর—মিত্র বাড়ে এইবার।

'সত্যকলি বিবাদসম্বাদে' মুহম্মদ খান 'গার্হস্থ্যবিধি' আলোচনা প্রসঙ্গে নীতিশাস্ত্রবার্তার বিষয়গুলোই মুখ্যত বর্ণনা করেছেন। গৃহনির্মাণ, স্নান, রোগ, বসন, দেও-তাড়ান ও বিধির কর্ম—আলেচিত হয়েছে এ গ্রন্থে।

আবদুল গনির ফালনামায় (ভাগ্য ও রাশি গণনার শাস্ত্র) আছে :

বুধবার রাত্রে যদি অঙ্গে তাপ হএ
আন সঙ্গে সেই দক্ষিণে গিয়াছএ।
গোছল করিছে কিবা জলের কিনারে
নতু বসন পরিলেক নহে অজু করে।
নতু সেই বস্ত্র পবনে উড়াইছে
'রক্তখানি' নামে দেও নজর করিছে। ...
কলিজা দহএ অতি পেট ফুলে আর
বহু কাঁসিবেক অঙ্গে দরদ অপার। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিকার— বাঘের আরূপ এক অজার আরূপ
মনুষ্য আরূপ এক মরার আরূপ।
এই চারি প্রদীপ আর লাল সপ্ত ফুল
হলদীর 'বানা' এক ঘটিকায় চাউল।
এসব একত্র করি উত্তরে ফেলিব
পঞ্চদিনে মাত্র রুদ্র দিনে ভাল হৈব।

সেরাজ চৌধুরীর 'ফকরনামা' বা 'মালিকের সওয়ালে' পাই :

ডান আঁখি পুতলি যার কাঁপে একবার
নিশ্চয় জানিও সর্পে ডংসিব তাহার।
দক্ষিণের পিষ্ঠ পাশে যাহার নাচএ
রোগ ত্যাগি দুঃখ অতি আসিয়া মিলএ।
বাম পিষ্ঠ কাঁপে যদি তার নারী স্থানে
কন্যাপুত্র তার জন্মে তে কারণে।

'যোগ কলন্দর' গ্রন্থেও জন্ম মৃত্যুর লক্ষণ এবং দিনক্ষণের দোষগুণ বর্ণিত রয়েছে।

মুজাম্মিলের নীতিশাস্ত্রবার্তায় : গৃহনির্মাণ, খঞ্জনবাখান, স্নানবাখান, নববস্ত্র, নিদ্রা, স্বপ্নবাখান, হাজামত বাখান, নহস, চাঁদ, নারীপদ্ম (রজঃস্বলা), ভূমিকম্প, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

কবি এসব হাদিস 'দেখিয়া' আরবি ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন :

আরবী ভাষে লোকেঁ না বুঝে কারণ
দেশীভাষে কৈলুঁ তবে পয়ার বচন।
যে বলে বলৌক লোকেঁ করিলুঁ লিখন।
নিজ দেশ 'বুলি' ভনিলুঁ পাঞ্চালী
লেখিলুঁ হিন্দুয়ান অক্ষরে। (বাঙলায়)

এখানে বিষয়বস্তুর আভাস দানের জন্য কিছু উদ্ধৃত হল :

গৃহ নির্মাণ :

ক. শ্রাবণ মসেত যদি কেহো বান্ধে ঘর
সেই দোষে মরিবেক গৃহের ঈশ্বর।
মাধবী মাসেত নব মন্দির বান্ধিব
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী সব তাহার বাড়িব।

খ. আদিত্য বারে যদি সে গৃহ নির্মএ
অনলে দহিব কিবা ঝড়েত ভাঙ্গএ।
সোমবারে গৃহ যদি বান্ধে কোন নর
সুত না জন্মিব সুতা, জান্মিব সে ঘর।

খঞ্জনবাখান : পশ্চিম দিকেত যদি দেখএ খঞ্জন
সেই জনে সেই ফলে পাইবেক ধন।
পূর্ব দিকে কেহো যদি সে পক্ষী দেখএ
রহস্য কৌতুকে সেই বৎসর গোঞাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ দিকেত যদি দেখএ খঞ্জন
রোগ-শোক বাড়ে যেন দৈব নিয়োজন।

স্নানবাখান : যুক্ত হএ সোমবারে স্নান করিবারে
আয়ু লাভ হইবেক নিশ্চএ তাহারে।
মঙ্গলে যদি কেহো অঙ্গ পাখালএ
সেই ফলে অল্প দিনে মরিব নিশ্চএ।

নববস্ত্র : রবিবারে কেহো যদি ফাড়এ বসন
মনোদুঃখে কভু তার না যাএ খণ্ডন।

নিদ্রা :

ক. মধ্যাহ্ন দিনে যদি কেহো নিদ্রা যাএ
ধন ধান্য সেজনের বাড়িব নিশ্চএ।

খ. যে প্রভাতে নিদ্রা যাএ 'চাস্ত' সমএ
ভিক্ষুক দরিদ্র সেই হইব নিশ্চএ।
অষ্ট দণ্ড বেলি যদি হইল উদএ
ফারসী ভাসে তারে 'চাস্ত' বোলএ।

স্বপ্নবাখান : চন্দ্রের প্রথম আর দ্বিতীএ তৃতীএ
এই তিন দিনে স্বপ্ন যদি সে দেখএ
এই সব দিনের স্বপ্ন উলটা নিশ্চএ।

হাজামত : সোম বুধ বৃহস্পতি আর জুমাবার
আর একদিন জান ভাল শনিবার।
করাইলে হাজামত এ পঞ্চ দিবসে
পুণ্য বাড়ে রোগ হরে দুঃখ সব নাশে।

নহস : (অশুভ) যে সকল দিনে হএ নহস আকবর
সে দিনেতে কার্য কর্ম কভু নাহি কর।
প্রতি চান্দে দুই দিন নহস আকবর
একে একে কহি শুন তাহার খবর।
মহরমে চতুর্থেত আর একাদশে
সফরেত প্রথমেত বিংশতি দিবসে। ...

চাঁদ : মহরম চান্দ দেখি তৃণ নিরক্ষিব
সফরেত শশী দেখি দর্পণ হেরিব।
রবিউল আওয়াল চান্দে হেরে স্রোতজল
রবিউল আখের চান্দে হেরিব ছাগল।

নারীপদ্ম (রজঃস্বলা : প্রথম)

বৈশখ মাসেত যদি হএ ঋতুবতী
পতিপত্নী স্নেহপ্রীতি বাড়ে প্রতি নিতি। ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রাবণেত পদ্ম যদি হএ প্রকাশিত
কথদিন নারী চিত্ত হৈব বিষাদিত।
ভাদ্রমাসে যদি বিকাশে নলিনী
অনুদিন অঙ্গে ব্যথা হএ সেই ধনি।
আশ্বিনেত হএ যদি স্বামী মরে আগে
কথদিন রহি থাকে বিরহের দুঃখে।

ভূমিকম্প : বসুমতী কম্পে যদি রবিউল আখেরে
নানাবিধ ব্যাধি দুঃখ নিতি মনুষ্যের মিলে।....
ভূমিকম্প হএ যদি জমাদিউল আওয়ালে
দুর্ভিক্ষ হইব বহু সংসার ভিতরে।

চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ : যদি রাহু ইন্দু গ্রাসে জমাদিউল আওয়ালে
ক্ষেতিতে ফলিব বহু শস্য সেই ফলে।
রবিউল আউলে সূর্য হইলে গ্রহণ
ধনী সব হইবেক ভিক্ষুক সমান।

জাদু-টোটেম জ্যোতিষ প্রভৃতির প্রভাবিত প্রাত্যহিক জীবনের অনুশাসনাবলির কিছু কিছু নমুনা দেয়া হল। 'গ্রহণ-রহস্য জানা সত্ত্বেও রাহু ও গ্রহণের পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীয় তাৎপর্যে শিক্ষিত লোকেরও শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমেনি। কুম্ভমেলা ও স্নানযাত্রা তার প্রমাণ।

আসলে যেখানে অজ্ঞতা সেখানেই দুর্বলতা এবং সেখানেই কল্পনার প্রশ্রয়। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মনুষ্যসমাজে বিজ্ঞান বুদ্ধি তথা যুক্তিবাদের প্রসার হচ্ছে। তবু আজো যেখানে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার ঘোর কাটেনি (ক্ষেত্রবিশেষে কাটলেও চিত্তদৌর্বল্য যুক্তিকে ছাপিয়ে ওঠে) সেখানে পুরোনো কাল্পনিক বিশ্বাস-সংস্কারই মানবমনের ওপর রাজত্ব করছে। আলোচ্য গ্রন্থেও দুর্বল মানুষের স্বাভাবিক অদৃষ্টবাদ নিয়তি-নির্ভরতা প্রাকৃতিক শক্তির সামনে অসহায়তা এবং জীবনে বিপন্মুক্তির উপায় সন্ধানে আকুলতার আভাস রয়েছে।

এসব বিশ্বাস-সংস্কারের জন্ম একদিনে হয়নি, একজনের দ্বারাও হয়নি। এগুলো বহুযুগের, বহু লোকের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার ফল। এগুলো প্রাচীন বটে, কিন্তু সুপ্রমাণিত নয়। কেননা এসবের ভিত্তি হচ্ছে একান্তভাবেই কাকতলীয় যুক্তি ও তথ্য। তবু বাহ্যত না হোক, মানুষের মনোজগতে এসব ভুয়ো বুলিও ফলপ্রসূ হয়েছে, কল্যাণ এনেছে। কেননা এসব বিশ্বাস-সংস্কারপুষ্ট মন চিরকাল দুঃখে সান্ত্বনা, বিপদে ধৈর্য, লাঞ্ছনায় ধৈর্য, বিপর্যয়ে বল, বেদনায় সহ্যশক্তি, ব্যর্থতায় অধ্যবসায় এবং নৈরাশ্যে আশার আলোক পেয়েছে এ ধরনের বিশ্বাস থেকেই।

কাজেই যুগ-যুগান্তর ধরে এসব ছিল ব্যর্থ বঞ্চিত বিপর্যস্ত, দুর্বল, নিরুপায় ও অজ্ঞ মানুষের মনের অবলম্বন ও জীবনের নিয়ন্তা। তাই দুনিয়ার সর্বত্রই বিশ্বাস ও সংস্কারের প্রভাব এত প্রবল। এদিক দিয়ে আমাদের তথা মানুষের পুরোনো সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলোর মূল্য কম নয়।

এসব সংস্কারে সত্যের, তথ্যের আর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সম্পর্কও যে নেই, তা নয়। যেমন আষাঢ় মাসে—

মনুষ্য থাকিত যদি নিরমিল ঘর
সেই ঘরেত মশক হইব বহুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলাদেশের পল্লী অঞ্চলে বর্ষাকালে এমনিতেই মশার উপদ্রব বাড়ে। তার উপর নতুন ঘরে স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় মশা যে আসর জমাবে, তা তো জানা কথাই।

আর একটা দৃষ্টান্ত :

রাত্রি অন্ন খাই দুই বিশ কাঞ্চিক দিব
খর্ব খর্ব কাঞ্চিক দিব হাঁটিব সত্বর।

তুলনীয় : অভঃবৎ ংঁঢ়বৎ ধিষশ ধ সরষব

মুজাম্মিল যদিও বলেছেন, আরবি হাদিসগ্রন্থই তিনি অনুবাদ করেছেন, তবু তিনিও যে মুফ্‌তির আসনে বসে নিজেই বহু ফতোয়া হেঁকেছেন; তার প্রমাণ রচনার সর্বত্রই মিলবে। আসলে কবি বাঙলাদেশের মুসলমানের আচারিক জীবনশাস্ত্রই রচনা করেছেন।

গ. শরীয়তনামা (১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দ)

নসরুল্লাহ খন্দকার বিরচিত

আঠারো শতকের কবি নসরুল্লাহ্‌ খোন্দকার (আনু. ১৭০০-৭৫ খ্রিস্টাব্দ) চারখানি গ্রন্থের প্রণেতা —ক. জঙ্গনামা, খ. মুসার সওয়াল, গ. হেদায়তুল ইসলাম ও ঘ. শরীয়তনামা। নামেই প্রকাশ যে, গ্রন্থগুলো শাস্ত্র ও তত্ত্বসম্পৃক্ত। নসরুল্লাহ্‌র বংশ পরিচয়ও মিলেছে : হামিদুদ্দীন-বোরহানউদ্দীন ইব্রাহিম-সুজাউদ্দিন-শেখরাজা ওর্ফে বাবু খান-কাজী ইসহাক-শরীফ মনসুর খোন্দকার-নসরুল্লাহ খোন্দকার। এঁরা যথাক্রমে উজির, লস্কর উজির, ঘোড়সওয়ার, যোদ্ধা, দরবেশ, শাস্ত্রী ও শিক্ষক (খোন্দকার) ছিলেন। কবির 'জঙ্গনামা' আজো সংগৃহীত হয়নি। শরীয়তনামার রচনাকাল রয়েছে :

পুস্তক আদায় সন লিখিত গুণিয়া
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।....
চতুর্বিংশ অগ্রাণের জোহর সময়
বিংশগ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয়।
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার
সে দিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার।

অতএব চন্দ্র-১, ঋতু-৬, সিন্ধু-৭, গগন-১ বা ৭ (মুসলিম মতে) ধরলে ১৬৭১ বা ১৬৭৭ শকাব্দ (এবং অঙ্কস্য বামাগতি ধরলে ১৭৬১ শকাব্দ) মেলে, এতে যথাক্রমে ১৬৪৯ বা ১৬৫৫ (অথবা ১৭৩৯) খ্রিস্টাব্দ হয়। অবশ্য অন্য নানা প্রমাণে ডক্টর আব্দুল করিম নিরূপিত ১৬৪৯ বা ১৬৫৫ খ্রিস্টাব্দই রচনাকাল বলে নিঃসংশয় গ্রহণ করা চলে (পাণ্ডুলিপি ৪র্থ খণ্ড ১৩৮১ সন)। গ্রন্থ সমাপ্তির তারিখ ছিল ১৪ অগ্রহায়ণ, ২৯ রমজান রোববার। সে-বছর রোজা ২৯টিই হয়েছিল। ঈদ হয়েছিল সোমবার।

শরীয়তনামায় কবি সমকালীন চট্টগ্রামের মুসলিম সমাজে ও শাস্ত্রীয় আচারে যেসব হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-সংস্কার প্রবেশ করেছিল, সেসব বর্জনে প্রবর্তনা দেবার জন্যেই সেসবের নিন্দা করে ও অশাস্ত্রীয়তা দেখিয়ে এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এতে তাই আমরা কবির সমকালে চালু ইসলাম-বহির্ভূত অনেক বিশ্বাস-সংস্কার আচার-পার্বণের সন্ধান পাচ্ছি। এগুলো নতুনভাবে গৃহীত হয়নি, দেশী দীক্ষিত মুসলিমের ঐতিহ্যসূত্রে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সংস্কারই শাস্ত্রীয় আবরণে মনে-মর্মে ঘরে-সংসারে রয়ে গিয়েছিল, তাই এগুলো সুপ্রাচীন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। কবি হিন্দুয়ানি রীতি না বলে প্রায়ই মঘদের রীতি বলেছেন। তার মুখ্য কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোধহয় কবির নিবাস ছিল শঙ্খ (সাঙ্গু) নদের দক্ষিণ তীরে। শঙ্খনদের দক্ষিণ থেকে টেকনাফ অবধি দক্ষিণ চট্টগ্রাম তখনো (১৭৫৬ সন অবধি) আরাকান বা রোসাঙ্গ রাজ্যভুক্ত ছিল। মঘ বা মগ (মগধবাসী) অর্থে স্থানীয় ও আরাকান বর্মী বৌদ্ধকে বোঝায়।

কন্যা বা বধূ প্রথম রজস্বলা হলে বাজনা বাজিয়ে এবং সহেলা ও নৃত্যাদির অনুষ্ঠান করে উৎসব করা হত। প্রথম রজস্বলা হওয়াকে তথা সাবালেগা হওয়াকে 'পুষ্পদেখা' বলা হত। রজস্বলা নারীকে মুসলিম-ঘরেও অপবিত্র মনে করা হত।

রজস্বলা নারীকে ছুঁইলে অন্যদের স্নান করতে হত। ঘরদোরও অপবিত্র মনে করা হত। হিন্দুদের মতো উপোস করিয়ে নাপিত দিয়ে নখ কাটিয়ে পরিধেয় বস্ত্র ধোপার বাড়ি পাঠিয়ে পাঁচ বা সাতদিন পরে আবার শুদ্ধ করে নেয়া হত। হিন্দুদের মতো গোবরজলে ঘরও লেপন করা হত। এমনি প্রসূতি ও আঁতুরঘরও অপবিত্র বলে ধারণা ছিল তাদের এবং উপরোক্ত নিয়মে শুদ্ধির ব্যবস্থা ছিল।

সেকালে মুসলিম-ঘরেও নারীপর্দা বিশেষ মানা হত না। মাথায় ধান-দূর্বা-ঘট-আমপাতা সমেত ডালা নিয়ে বউ-ঝিরা শিরণির জন্য ভিক্ষা মেগে গাঁয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরত।

শব যেখানে স্নাত হত, সেস্থান চল্লিশদিন বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা, উপরে চাঁদোয়া টাঙিয়ে দেয়া প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় আচারও ছিল। সদ্য মৃতের ঘর অপবিত্র বলে মনে করা হত এবং মৃতের পরিবার-পরিজন তিক্ত ব্যঞ্জনে (গিমা-নিম প্রভৃতি) অন্নগ্রহণ করত, উদ্দেশ্য যমের পুনরাগমনে বাধাদান। মৃত্যুর তৃতীয় দিনে নাপিত ডেকে মৃতের পরিবারের পুরুষের খেউর (চুল দাড়ি কর্তন) করাত আর নারীরা কাটাত নখ শুদ্ধ হওয়ার উদ্দেশ্যে। কবরে খিলানস্বরূপ বাঁশ পাতার সময় বাঁশের হয় আগার অথবা গোড়ার গুঁড়িই দিতে হত, আগাগোড়ার খণ্ডের যথেচ্ছ মিশ্রণ হলে মৃতের পরিবার উচ্ছন্ন যাবে এমন সংস্কার প্রবল ছিল।

সদ্যজাত শিশুর কল্যাণে 'নিমরিয়া পীর'-এর উদ্দেশে ঘরে গোপনে মানত-করা মোরগ জবেহ করে ফাতেহা দিত। এ পীর ষষ্ঠীদেবতার মতোই শিশুর অরিদেবতা। শিশুর মৃত্যু না-ঘটাবার জন্যেই নিমরিয়া পীরের সেবা।

সেকালে মুসলমানরা আত্মকল্যাণে সূর্যমুখীকলার নৈবেদ্য দিয়ে ব্রাহ্মণের দ্বারা 'পুষা' (পুষ্কর) দেবতার পূজা করাত। কারণ 'পূজা কৈলে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণে'। মুসলমানরা মহালক্ষ্মীর নামে হাঁস বলি দিয়ে রক্ত ধানের গোলায় ছিটিয়ে দিত। আবার 'কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস'-এটি সম্ভবত ডোমদের থেকে পাওয়া সংস্কার। 'কদলী-তণ্ডুল-আটা-কাঁচা দুধ আনি' অপক্ব শিরনি তৈরি করে ফাতেহা দিত এবং এ শিরনি ভক্ষণকালে গলায় 'তৃণ' বাঁধত। তাদের মধ্যে বৌদ্ধ-আচারও ছিল—'

অন্যজাতি হস্তে যত্নে পূজা করাওন্ত।
মঘিনীরে (বৌদ্ধ নারীকে) ছাগল দেওন্ত কিবা জানি
জাগারাণ(?) দেওন্ত অন্য জাতি হস্তে আনি।

কোনো বালিকা যদি অন্যের বাড়িতে প্রথম রজস্বলা হত, তাহলে সেবাড়ি অপবিত্র হল বলে গণ্য হত এবং গোময় দিয়ে ঘর শুদ্ধ করতে হত। কবির মতে 'এহেন অকর্ম সব মগধ (মঘের-আরাকানি বৌদ্ধের) সবার।' আবার কেউ যখন 'পুষ্পকরণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওন্ত' তখনো 'বিষুর ভিতরে অকূপ করন্ত।' এবং 'যুগল বছরে' (Even) পুকুর খনন করালে 'বহুদোষ' বলে মনে করা হত। বিষুব-সংক্রান্তির দিনে মুসলমানরাও গরু-ছাগলের শিঙে গলায় ফুলের মালা দিত; কেউ কেউ অঙ্গে হলুদ ও চন্দন মাখত। গোয়ালের উচ্ছিষ্ট খড় দিয়ে আগুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বালাত এবং স্নান করে তিতা ভক্ষণ করত। এ সবই ছিল মঘদের (আরাকানি বৌদ্ধদের) শাস্ত্র। বিয়ের সময়ে ঢোল-বাজনার ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। মেয়েরা বরকে গায়ে হলুদ দিয়ে পাঁচ পুকুরের পানি দিয়ে পাঁচ হাতে বরস্নান করাত। বরের মাথায় 'মঘ'দের মতো 'কুসুমের বন' নামের শোলার টুপি পরাত। আর ধূপ ধান্য পিঠা কলা ও শিলাপূর্ণ বরণডালা বর-কনের সামনে রাখা হত। নাপিত বরের চুলদাড়ি কামাত, কনেরও নখ কেটে দিত। নারীরা উৎসবে পার্বণে নৃত্যবাদ্য সহযোগে উচ্চস্বরে সহেলা গাইত। বিয়ের সময়ে **মারোয়া** বাঁধত, **জলুয়া** দিত, **গেরোয়া** খেলত এবং 'পাশা' খেলারও ব্যবস্থা থাকত।

মারোয়া,হচ্ছে সজ্জিত মঞ্চ। বরের (এবং কনেরও) বসবার স্থল। চারদিকে সাতনাল সুতো দিয়ে ঘিরে দেয়া হত। চ্যুতপত্র ও জলপূর্ণ মঙ্গল-কলস ও কদলীবৃক্ষও থাকত চারদিকে। চারপাশে ঘুরে ঘুরে গান গাইত ছেলেমেয়েরা এমনকি বয়স্করাও।

গেরোয়া—ফুলের স্তবক কিংবা বলের মতো গোলাকার পিণ্ড ছোঁড়াছুঁড়ি ও লোফালুফি খেলাকে বলে গেরোয়া খেলা। বর-কনেকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুদিক থেকে দুই দল এ খেলা খেলত। নারী-পুরুষ নিঃসংকোচে একত্রে খেলত এ খেলা এবং বর-কনেও যোগ দিত। বৈষ্ণব পদেও এ-খেলার উল্লেখ রয়েছে : ফুলের স্তবক (?) সঘনে লোফএ .... ইত্যাদি।

জলুয়া—বর-কনের চারিচোখের মিলন (রুসুমত) অনুষ্ঠানই জলুয়া। এতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বর-কনে দেখার ছলে একত্রে মিলিত হত এবং এ-সময়ে হোলির মতো নারী-পুরুষের অবাধ রঙ্গ-রসিকতা চলত। রঙ পানি এবং কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এর অঙ্গ।

দীক্ষিত দেশী মুসলিমদের মধ্যে পূর্বসংস্কারবশে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল :

১ কেহ বলে তেলি কিবা হাজামের ঘরে
কিবা মৎস্য বেচে, কিবা যেবা মৎস্য মারে।
সে সবের ঘরে বোলে খাইতে না পারে।

২ কত কত মৌলনায় ফতোয় দেওন্ত
ধীবরের ঘরে খাইতে নিষেধ করন্ত।

সেকালে গাঁয়েগঞ্জেও 'শরাবী সিফতী ভাঙী বেনামাজী' দুর্লভ ছিল না। সেকালে মহররম মাসে শিয়াদের মতোই তাজিয়াদি নির্মাণ করে আশুরা উথাপন করা হত :

কত কত মৌলনায় আশুরার দিনে
হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যতনে।
পড়শী সবারে আনি পূজা করাওন্ত
নাচি গাহি তিরি (স্ত্রী) সকলেরে শুনাওন্ত।

এখানে হাসান-হোসেনের প্রতীকী কবরপূজার কথা কবর সালাম করার ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়।

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, স্ত্রীসঙ্গবঞ্চিত সৈনিকরা সুযোগ পেলেই নারীধর্ষণ করত কিংবা অন্য অবৈধ উপায়ে রতিচর্চা করত। তাদের স্বপক্ষে যুক্তি এই :

আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি
নিজ গৃহে নারী ছাড়ি হই দেশান্তরী।
আপনার নারী রাখিবার শক্তি নাই
তেকারণে রতি ভুঞ্জি যার নারী পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেকালে চাষীরা হাল-পালন, ব্রত উদ্‌যাপন করত। দেশী সংস্কারবশে তারা বিশ্বাস করত যে. আষাঢ়ের প্রথমদিনে সৃষ্টিসম্ভবা বসুমতী রজস্বলা হয়। এজন্যে আষাঢ়ের প্রথম সাতদিন জমিতে 'হল' কর্ষণ করতে নেই অর্থাৎ বসুমতীকে রজস্বলা নারীর মতোই মনে করা হত। চাষীরা জাদুপ্রতীক ডিম কিংবা জামগাছের ডাল জমির কেন্দ্রস্থলে পুঁতে প্রথম চাষ শুরু করত। হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কারবশে মুসলমানরা শব-ই-বরাতের সন্ধ্যায় পূর্বপুরুষের নামে গোস্ত-রুটি-ভাত ফাতেহা করাত—আজো করায়। এক-এক নামে এক-একজোড়া রুটি মৃৎপাত্রে রাখত কিংবা এক-এক 'জড়া' (গ্রাস) ভাত আলাদা কলাপাতায় রেখে উৎসর্গ করা হত :

নামে নামে শতে শতে ফাতেহা দেওন্ত—
পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ।

দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের মুসলমানদের স্ত্রী-কন্যারা স্ব-স্ব বৃত্তি অনুসারে কাঠ কাটত, মাছ ধরত এবং বাজারে বিক্রয় করত।

তামাকু সেবনকালে মঘ-মুসলিম জাতিভেদ মানত না; তারা একই হুঁক্কায় বা টেমিতে ধূমপান করত। কবির এতে অবশ্য ঘোর আপত্তি। অন্তত 'মসজিদে হুক্কাবাজি কভু না করিও।'

বিষুব-সংক্রান্তির দিনে কিংবা বিবাহোৎসবে মুসলিম নারী-পুরুষ এ-যুগের মতো পরনারী-পরপুরুষের সঙ্গে নিঃসংকোচে মেলামেশা করত, এমনকি ক্রীড়ায়ও যোগ দিত। এটিও নিশ্চিতই একালের য়ুরোপীয় প্রভাবের মতো সেকালের মঘ-প্রভাবজাত। প্রাচীন মদনোৎসব বা হোলিও স্মর্তব্য :

আপনার তিরি (স্ত্রী) কন্যা সভাত পাঠাওন্ত
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত।
বিষুর দিবসে কিবা বিবাহের কালে
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কুতুহলে।
সিফত ভক্ষন্ত কিবা হরিষ অন্তর
নারী বা পুরুষ সবই হই একত্তর।
সিফত খাইয়া অতি যেন মত্তকরী
উন্মত্ত হএ কিবা পুরুষ কি নারী।
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগধ (মঘ) ধরণ।
হাসন্ত গাহন্ত নটী-নাটকের গণ।
পুরুষ নারীর, নারী পুরুষের সঙ্গে
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে।
একঢোলে বাজাওন্ত সিফত ভক্ষন্ত
আর পুনি তিরিগণে সহেলা গাহন্ত।
বেনামাজী শরাবী সিফতী মত্ত ভাঙী
এ সবের ঘরে না খাইবা কিবা ঢঙ্গী।

মুসলিম ঘরে হিন্দু-পুরোহিতের প্রভাবও ছিল :

যে কিছু কহএ সে গন্ধর্ব পুরোহিত
মূরখ সকলে মানি লও এক চিত।
গন্ধর্ব সকলে জল হিন্দুনি পিওন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন সংস্কার ছিল যে আউশ ধান কিংবা চাউল (তথা রুটি কিংবা ভাত)

ফাতেহাতে না লাগএ না পারে দিবার।

কবি একে কুসংস্কার বলেই জানেন, তাঁর মতে :

যেই খাইতে পারে সে ফাতেহা দিতে পারে
আউশ কিবা সাইল ভাত কি বিচারে।

দেশী দীক্ষিত মুসলমানরা এসব আচার-সংস্কার সাতশ বছর ধরে মেনেছে। বিদ্বানেরা একেই 'লৌকিক বা স্থানিক ইসলাম' নামে অভিহিত করেন। গত শতকের ওহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের ফলেই উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া এসব বিশ্বাস ও আচার সংস্কার মুসলমানরা ঘরোয়া ও সামাজিক জীবনে পরিহার করতে চলতে প্রয়াস পায়।

এবার কবির ভাষায় কবি-নিন্দিত আচার-পার্বণগুলোর পরিচয় তুলে ধরছি :

ঘর লেপনে গোময় :

গোবরে লেপন্ত ঘর কাফের আকার।
গোবর নাপাক জান শাস্ত্র মাঝার ॥
গোবরে লেপিলে ঘর শাস্ত্রে বহু দোষ।
অসন্তোষ রসুল ইবলিস পরিতোষ ॥
ইবলিসের মসজিদ জান সেই ঘর।
গোবর বিষ্ঠাতুন ধিক নহে পবিত্তর ॥
গো-মল মনিষ্যের বিষ্ঠার সমান।
এথেক না লিপ ঘর যেবা মুসলমান ॥

কুমারীর প্রথম ঋতুকালে :

কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
কতসন্ধ্যা উপাস রাখএ তিরি কুলে ॥
কুমারীকে কেহ যদি ছোঁয় পুষ্পকালে।
সিনান করিতে দুষ্ট সকলেরে বলে ॥
পঞ্চ কিবা সপ্ত দিনে লই খেলাওন্ত।
ধোপা নাপিতেরে আনি শুদ্ধ করাওন্ত ॥
শুদ্ধ করাই নিয়া জলে করে সিনান।
সহেলা গাওন্ত অনাদীনের ধরান ॥
ঢোল বাজাই যুবক সবারে জানাওন্ত।
আমার কুমারী বধূ পুষ্প দেখিছন্ত।

রজস্বলা ও প্রসুতির অপবিত্রতা :

রজঃস্বলা হৈলে নারী গৃহের অন্তরে।
অপবিত্র হয় বলে সবানের ঘরে ॥
এসব বচন নাহি শাস্ত্র মাঝার।
নিশ্চয় জানিও এহি হিন্দুর আচার ॥
গর্ভবতী নারী যদি শিশু প্রসবন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদীনী নাপিতা আনি নউখ খুটাওন্ত ॥
অনাদীনি ছুঁইলে নারী কুল পবিত্তর।
এ মসলা তিরী কুল কিতাব অন্তর ॥
ইমাম আজমের কওলেতে হেন নাই ।
শুদ্ধ করিতে যত মুসলমান ঠাঁই ॥
মাত্র হপ্ত দিন যত হইল তাহার।
ভালমন্দ দিন তাকে না কর বিচার ॥
শিশুর মুণ্ডের কেশ দূর করাইবা।

স্ত্রী-আচার : সংস্কার ও নারী পর্দা :

কত কত তিরী গণে ডালা শিরে দিয়া।
ইবলিসের পূজা জানি ধান্য তথা দিয়া ॥
সূতা তলে ঘট রাখি শিরেত লওন্ত।
নানা মতে বাস পিন্দি দেখিতে মহন্ত ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে গোধন সদৃশ একান্তরে।
হাসিরসে শিরনি সালাহ দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ॥
কেমন পুরুষ এ সকল নারী করে।
পশুর আকার ভিন্ন দুয়ারে দুয়ারে ফিরে ॥
তিরী নাম ধরি কৈল্যে পুরুষের কর্ম।
শাস্ত্রে বলএ তারে পাপিষ্ঠ অধর্ম ॥
মহাজনে সে নারীরে করএ বর্জিত।
তার হস্তে ভক্ষ্য ন খাওন্ত কদাচিত ॥
নারীর উচিত রহিবার গুপ্তস্থান।

পর্দা :

ভিন্ন পুরুষেরে মুখ যে নারী দেখাইল।
আপনার সোয়ামীর দাড়িতে অগ্নি দিল ॥
নারীর বচন যদি শুনে ভিন্ন জনে।
আপনার সোয়ামীর মাথা মুড়াইল শানে ॥
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ দেখাইলে নারী
নরকের হুতাশনে যাইবেক পুড়ি ॥
মৃত্যুকালে মৃতের হইলে মিত্রজন।
মৃতের কারণে কভু না কর ক্রন্দন ॥
কত মুরখের কুলে উঠে দুষ্ট নারী।
উচ্চস্বরে কান্দে সবে মওতারে ধরি ॥

বিলাপ হারাম :

মৃত কাছে বসি কভু না কর কান্দন ।
বিনাই কান্দিলে হয় মৃতের লাঞ্ছন ॥
শির বাস ন ফেলিবা না কুটিবা হিয়া ।
নিজ মুখ ন দেখাইবা সভা মেলে গিয়া ॥
রাজা বুলি ন কান্দিবা প্রভু ন বুলিবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাণের ঈশ্বর বুলি কভু ন কান্দিবা ॥
এহেন কান্দন মৃত 'পরে দুঃখ ভার।

শব-স্নান : মৃতরে গোসল দিতে গোসলের স্থান।
অতি যত্নে ধরিয়া যে করাইবা সেনান ॥
চাপি ন ধরিয়া ধরিবা মুষ্ট ভিড়ি।
শীতল তাতল জলে ধুইবা যত্ন করি ॥
ধীরে ধীরে ধোলাইবা ন ঘস দিয়া ভার।
শরীর জর্জ্জর রহিয়াছে মওতার ॥
বদরীর পত্র দিবা জলের উপর।
তাতল করিও জল অগ্নির অন্তর ॥

শবের প্রসাধন ও কাফন :
সুগন্ধি চন্দন শিরে দাড়িতে যত্তন ॥
সজিদার ঠামে ঠামে কাফুর লাগাইবা।
ন থাকিলে কাফুর সুগন্ধি তথা দিবা ॥
কাকইন ফিরাইবা মাথাত দাড়িত।
কিবা কেশ ন কাটিবা কদাচিত ॥
পারিলে কাফন দিবা ন পারিলে নাই।

কাফন : ইজার চাদর আর তৃতীয়ে পিরান।
এই তিন বাস দিবা পুরুষ কাফন ॥
শির পদ ইজারে চাদরে যেন ঘোরে।
পিরান গ্রীবাথুন যেন অঙ্গ মাঝে পড়ে ॥
কাফন পরাইতে বাম পাশ দিয়া নিবা।
পুনি ডান পাশে বাম আনিয়া ঘুরিবা ॥
কাফন বান্ধিবা যদি বাতাসে উড়ায়।
বায়ু ভয় না হৈলে বান্ধিতে ন জুরায় ॥
তিন বাস দিতে যদি ন পারে কাফন।
ইজার চাদর দিবা শাস্ত্র বচন।
ইজার চাদর দিতে যদি ন পারএ।
পুরান কি নবীন দিবেক যে পারএ ॥
পঞ্চবাস তিরীর ইজার পিরান।
চাদর ঘোমটি সিনাবন্দ ই কাফন ॥
ইজার চাদর পিরান তিন বাস।
পুরুষ সদৃশ দিবা করিছি প্রকাশ ॥
বুকবন্দ বুক লই জানু যেন পায়।
তাত্তুন অধিক ন দিবেক জান সর্বথায় ॥
দিতে যদি না পারএ সম্পূর্ণ কাফন।
ইজার চাদর দিব ঘোমটির সন ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাফন : প্রথমে পিরান পরাইবা মওতারে।
কেশ দুই ভিতে রাখ পিরান উপরে ॥
ঘোমটি পরাই তবে ইজার চাদ্দর।
সিনা-বন্ধ পরাইবা তাহার উপর ॥
কাফন ন দিতে আগে সুগন্ধি ছিটিবা।

কবরস্থ করার সময়ে :
যেবা এক মুঠি মাটি লই হস্ত পরে।
কোরান আয়াত পড়ি ঢালে গোরান্তরে ॥
সেই এক মুঠিতে আছএ রেণু যত।
প্রভু নিরঞ্জনে তারে পুণ্য দিব তত ॥
সেই মাটি প্রসাদে মৃত এ পুণ্য পায়।
গোরের অন্তরে অতি আনন্দে রহয় ॥

মৃতের স্নানের স্থান : গোসলের স্থানে যদি বেড়াদি থাকএ।
ভাণ্ড ভরি জল রাখি চাঁদোয়া টাঙএ ॥
মূঢ় সকলে তাকে লহদ বুলএ।
লহদ ন হএ সেই ন জানি কহএ ॥
তাহাকে দেখিয়া রুহ হইব বেজার।
শাস্ত্রে ন কহিল যেই কর্ম করিবার।
কি সুখে করন্ত হেন মুরুখ আকার ॥
গোরের পশ্চিমে খুদি রাখে মতারে।
আরবের ভাষে বুলে লহদ তাহারে ॥

মৃতের আত্মা : আপনার ঘরে চলি আসিব তখন ॥
কেমন করন্ত দান ফাতেহা দরূদ।
কোরান পড়ন্ত কিবা অল্প কি বহুত ॥
উজ্জ্বল করন্ত ঘর নতু আঁধিয়ার।
পুণ্য কর্ম দেখি দোয়া করে অনিবার ॥
যদি দান দক্ষিণা না দেখে কদাচন।
রুহ অসন্তোষ অতি মৃতের লাঞ্ছন ॥
এই মতে নবদিন আর পক্ষ মাস।
রুহ আসি ঘিরে আর চল্লিশ দিবস ॥
তেকারণে চল্লিশ দিনে ফাতেহা করাএ।
একদিন ন রাখিবার বিনি ফাতেহাএ ॥

মৃতের আত্মীয় পরিজনের তিতা ভক্ষণ :
এহেন মরারে কেনে অশুদ্ধ বোলন্ত।
তার ঘরে কেহ বলে তিতা বা দেয়ন্ত ॥
তিতা অন্ন খাইলে বুলে কেহ ন মরিব।
তিতা বলে মৃত্যু বোলে কাছে না আসিব ॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত ঘরে তিতা অন্ন দিতে অনুচিত।
মধু মিঠা ঘৃত লনী খাইতে উচিত ॥
শোকে দুঃখে চিন্তা ক্লেশে তিতা হইছে প্রাণ।
তাতে আরো তিতা আনি দেওন্ত বিদ্যমান ॥
শুনিয়াছি কাফের মুখে কেহ যদি মরে।
তাহারে দহিয়া যদি ফিরি আইসে ঘরে ॥
তিতা ভক্ষি লোহা দেওন্ত ভাণ্ডে করি সেনান।
যুগ পদতলে যত্নে রাখন্ত পাষাণ ॥
সে সবের দেখাদেখি মুসলমানগণ।
তিতা অন্ন ভক্ষ্য করে কিসের কারণ ॥

কুফরি আচার (নাপিত ও ক্ষেউর) :

তৃতীয় দিবস যদি হইল মরার
নাপিত আনিয়া বোলে খেউর করিবার ॥
আপনে করিয়া খেউর ইষ্ট ঘরে ঘরে।
খেউর হেতু যত্নে পাঠাওন্ত নাপিতারে ॥
ইষ্ট কুটুম্বের ঘরে নাপিত না দিলে।
অতি অসন্তোষ হয়ে সবে তারে বুলে ॥
মরা বিয়ালা সেউখ কাটানোর ইষ্ট গেল।
তেকাজে আমার ঘরে নাপিত না দিল ॥
কুটুম্ব হইত যদি নাপিত পাঠাইত।
কেন মুখে যাই তার ঘরে অন্ন খাইত ॥
শাস্ত্রে নাহি খেউর করাইতে মৃত্যু ঘরে।
প্রতি ঘরে ঘরে পাঠাইতে নাপিতারে।
তবে সে হিন্দুর মুখে শুনিয়া প্রকার।
মরা বিয়ালা কুটুম্বের যতেক বিচার ॥
ইষ্টজন মরে কিবা শিশু প্রসবএ।
রান্ধনের ভাণ্ড সব নিকালি ফেলায় ॥
নিরামিষ খাএ কর্ম করন্ত যাবৎ।
মৃত কর্ম করিত করাই হাজামত ॥

কবরের খিলানে বাঁশের প্রয়োগ :

কেহ বলে মওতার খাট বাঁধাইতে।
বাঁশ কিবা গাছ নারে আগা গুঁড়ি দিতে ॥
একমুখী দিলে আর কেহ ন মরিব।
আগা গুঁড়ি দিলে বোলে সকল মরিব ॥

ঘোমটা :

যে সব নারীর শিরে ন দেখিএ বাস।
এক এক নারীর মুখ যেন রবি হাস ॥
কেবল অবোলা যেন অতি রূপ ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকের হৃদে বাণ হানে আঁখি ঠারে ॥
সুরঙ্গ সুরূপ যেন চটকে দামিনী।
মাত্র শিরে বাস ভিনে কাক বাসা খানি ॥
বিনি বাসে শির যেবা রাখে অনুচিত।
মগধ ধরান সেই জানিও কুৎসিত ॥
নারীর যে সর্ব অঙ্গ মহা গুপ্তস্থান।
মাত্র কর পদ যুগে আর সে বয়ান ॥

সূতিকা-উত্তর আচার :

বালক জন্মিলে এক কুক্কুট রাখএ।
নিমুরিয়া পীর নামে ফাতেহা করাএ ॥
সেই কুক্কুটের মাংস রান্ধে একমতে।
গৃহের বাহিরে বলে নারে নিকালিতে ॥
নানান প্রকারে বলে ন পারে রান্ধিতে।
অভ্যাগত ভিক্ষুকেরে না পারএ দিতে ॥
যাহারে ভক্ষায় ভক্ষাওন্ত গৃহান্তরে।
ন জানি কহিল তারে কেমন বর্বরে ॥
সেই মতে নিমন্ত্রণ করে নিরন্তর।
তেমতে কবিরা তাকে বিচার ন কর ॥
নানা মতে রান্ধি পড়শীরে ভক্ষাইবা।
ভিক্ষুকেরে ভক্ষাইলে গৃহে নিতে দিবা ॥
এই মতে ভক্ষাইলে বহু পুণ্য পায়।
শিশুর খণ্ডিয়া বিঘ্ন আয়ু বাড়ি যায় ॥

হিন্দুয়ানি : মোহর সাক্ষাতে আসি বলে হাসি হাসি।
সূর্য কদলীর কথা কহন্ত প্রকাশি ॥
ফাতেহা করাইমু অন্য জাতিরে কি দিব।
বুলিলা ফাতেহা করি আপনে খাইবা ॥
তা শুনি কুপিত হই দিল পদুত্তর ॥
মুসলমানে খাইতে মানা শাস্ত্র অন্তর ॥
বাহ্মণেরে নিয়া দিব পূজার কারণ।
পূজা কৈল্যে মনোরথ সিদ্ধি ততক্ষণ।
পূজার শুনিয়া নাম হইলাম কোপ মন।
বুলিলাম কহ কেনে কুফরি বচন ॥
বোলে আমি ন কহি কহে মওলানায়।
পূজা কর্মে ব্রাহ্মণেরে দিই আমরায় ॥
আমি কিবা মোহন্ত মোহন্ত সবে করে।
সেই মুমিনে খায় জিহবা ফুলি মরে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপক্ব শিরনি :

কত মুসলমানের কহি মুসলমানী
কদলী তণ্ডুল আটা কাচা দুগ্ধ আনি ॥
এসব একত্র করি ফাতেহা করন্ত।
সহরিষে লোক সবে তাহাকে খাওন্ত ॥
যাহারে রান্ধিয়া ভক্ষ্য রান্ধিতে উচিত ।
বিনি সিদ্ধে ফাতেহা ভক্ষণ অনুচিত ॥
আর এক কুআচার কর্ম অনাধর্ম।
মুসলমান কর্ম নহে করিতে সে কর্ম ॥
ফাতেহা করিতে শিরনী কতকত মূরখে।
তৃণ এক গলে বান্ধে বহুল কতুকে ॥
তৃণ যেবা গলে বান্ধে তার এই গুণ।
মুমিন সকলে তারে বোলে মালাউন ॥
এই কর্ম পরিহরি সদায় রহিও।
সেই সবের দেখা দেখি কভু না করিও ॥

মহালক্ষ্মীব্রত :

আর এক পাপ কর্ম কেহ কেহ করে।
মহালক্ষ্মী হাঁস রক্ত দেওন্ত গোলা ঘরে ॥
লক্ষ্মী অপবিত্তর ধান্য করে একান্তর।
মহালক্ষ্মী অলক্ষ্মী হাঁস রক্ত অপবিত্তর ॥
এতেক বেবুঝ লোক আছএ সংসারে।
কেবল হারাম দেওন্ত হালাল উপরে ॥
মহালক্ষ্মী কারে বোলে আমি নাহি চিনি।
হইলে হইব মহালক্ষ্মী ইব্লিস ঘরণী ॥
তার সুতাসুত সবে করে এই কর্ম
মাতৃকর্ম কইল্যে সে সবের মহাধর্ম ॥
আমার শাস্ত্রে ঐ কর্ম মহাপাপ।
কেহ কেহ শূকর চণ্ডীরে দেওন্ত হাঁস।
আলীম সভাতে তারে বহু উপহাস ॥
আর বহু মোহন্ত জনের তিরী কূলে।
নটীর সদৃশ নটী বেটী বিভা কালে ॥
সে সবের সোয়ামী সব ভূত কিবা পশু।
নিজ-নারী খেলিতে দেওন্ত আইলে বিষু ॥

মুসলিমের পূজা :

আর কত মুসলমান অকর্ম করন্ত।
অন্য জাতি হস্তে যত্নে পূজা করাওন্ত ॥
মঘিনীরে ছাগল দেওন্ত কিবা জানি।
জাগারণ দেওন্ত অন্য জাতি হস্তে আনি ॥
এই সকল শাস্ত্রমতে বহুল পাপ হয়।
নরকে পড়িয়া আর্ত্তি পাইবা দুঃখময় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম ঋতুস্রাব : আর নববধূ কিবা কাহার কুমারী
কুসুম্ব দেখএ যদি পড়শীর বাড়ি।
গৃহ নষ্ট হইল বলে গৃহের ঈশ্বরী।
তাহার হেতু মোহর সম্পদ নিব হরি ॥
গোধনের রজ ফেক সক সেই জল।
আনি দিলে গৃহ হইব পবিত্র নির্মল ॥
ফুল ন হইল কুল জাতি হৈল কাল।
সুগন্ধিত গন্ধ অল্প গন্ধের বিশাল ॥
এহেন অকর্ম সব মগধ সবার।
তাহার জনম যার এই কর্ম তার ॥

পুকুর খনন : আর বহু অবুঝ বেবুঝ কথা ধরি।
করন্ত বেবুঝ কর্ম বুঝ পরিহরি ॥
পুষ্করিণী খোদায় কিবা জাঙ্গাল দেওন্ত।
বিষুর ভিতরে কেনে অকূপ করন্ত ॥
সম্পূর্ণ খোদান যেবা কিবা নহি হএ।
তথাপি যে সকল পহির [পুকুর] এড়এ ॥
যুগল বছর হইলে বলে বহু দোষ।
সে সবের জ্ঞাতি সব নহে পরিতোষ ॥
আর পুষ্করিণীর মাঝে খুইল ন ধরিল।
অমোঘ ঘোষন্ত বলে কি পহির দিল ॥

বিষু-স্নান : আর এক অপকর্ম হিন্দুর ধরান।
বিষুর দিনেতে লোকে গোসল করণ ॥
বৃষের অজার শিরে-গলে দেওন্ত ফুল।
পশুর সমান কর্ম করন্ত বহুল ॥
কেহ কেহ হলদি চন্দন লাগাওন্ত।
বিন্দু বিন্দু নানামতে অঙ্গেতে দেওন্ত ॥
এ সকল কর্ম জান কুৎসিত আকার।
বহু পুণ্য মঘদের শাস্ত্রের মাঝার ॥
গৃহের গোবর সব একত্র করিয়া।
বিষুর প্রভাতে অগ্নি দেওন্ত জ্বালিয়া ॥
সেনান করি তিতা ভক্ষি খেলাওন্ত রঙ্গে।

বিবাহে বাজনা : কেহ যদি বিবাহ করিতে কইল্যা মন।
শরীয়ত কর্ম হানি অকর্ম করণ ॥
প্রথমে আনিয়া ঢুলী ঢোল বাজাওন্ত।
আকাশ পাতাল আদি সব কাঁপাওন্ত।
শাস্ত্র মানা পেল [ঢোল] বাহি বিবাহ করিতে।
তোমা হেন মওলানায় কিসকে বাজায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সবে পারন্ত কেনে নারি আমারায় ॥
দামাদকে গোসল করায় তিরীগণে।
হলুদ দেওন্ত কেনে মূরখের বচনে ॥
হলদি অঙ্গেত দিলে শাস্ত্রের বাহু দোষ।
অসন্তোষ রসুল ইবলিস পরিতোষ।

বরণডালা : মঘদের কর্ম নাহি শাস্ত্রের অন্তরে ॥
নিমিষ্ঠা শোলার নির্মে মাত্র এক বন।
অধিক নিকুঞ্জ বন যেহেন কানন ॥
কুসুম্ব বলিয়া তারে শিরেত দেওন্ত।
সুগন্ধি সৌরভ পুষ্প তাকে ন নেওন্ত ॥
আর এক ডালা ভরি ভূত পূজা খানি।
ধূপ ধান্য পিঠা কলা শিলা ভরি আনি ॥
দামাদ কন্যার আগে আনিয়া রাখন্ত ॥
যুগ করে ধূপ দিয়া অধিক পূজন্ত ॥
শাস্ত্রে বোলে পূজা কর্ম কাফের সবার।

সহেলা : চতুর্দিগে বেড়ি থন্ত কামিনীর গণ
উচ্চস্বরে সহেলা গাওন্ত রঙ্গ মন ॥
কেহ কেহ মহা ঠারে মুখ কুটি হাসন্ত।
ভিন্ন পুরুষেরে মুখ নিজে দেখাওন্ত ॥
নটীগণ হন্তে শ্রেষ্ঠ সে সবের গীত।
ভিন্ন পুরুষের মন হয় উচলিত ॥
নটী যদি করিবারে চাহে নিজ নারী।
সে সবেরে মেলাতে পাঠাও যত্ন করি ॥
তিরী লোকে সহেলা গাহিলে বহু পাপ।
অঘোর নরকে পড়ি পাইব সন্তাপ ॥

মারওয়া : আর পত্র ধার বহু কাঁচা বাঁশ আনি।
মারওয়া নির্মান্ত ইবলিসের বাসা খানি ॥
চতুর্দিগে সপ্ত নাল সুতায় বেড়িয়া।
ঠামে ঠামে মুছহি বহু দেওন্ত ঢুলাইয়া।
মারওয়ার বার্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার।
মুসলমান কর্ম নহে কাফের সবার ॥
বাঙ্গালে বাঙ্গালা বান্ধিবারে নাপারন্ত।
ইবলিস কারণে বাসা নির্মিতে জানন্ত ॥
সত্বর করি কলসী ভরিয়া আনি জল।
অতি মান্য করি রাখে মারওয়ার তল ॥
চারি পাশে ভ্রমি ভ্রমি গাহন্ত সুস্বরে।
কলসী মানাই শুনাওন্ত ইবলিসরে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘট জলে দামাদকে সেনান করাইবার ॥
যদি সে কন্যার ঘরে শাহা চলি যায়।
মুণ্ডকেশ কাটাইয়া আঙ্গুল খুটায় ॥
কি সুখে খুটাও নখ চুল ন বাড়িলে।
নিজ মনে ভাবি চাহ্ তোমরা সকলে ॥

গেরুয়া : আর যত নবীন যৌবন তিরীগণ।
সমান বয়সী কত যুবকের মন ॥
কুমার কুমারী দুহ মুখামুখী করি।
গেরওয়া ধরন্ত দোহানকে উয়া দাঁড় করি ॥
উচ্চস্বরে মহাঠারে গেরওয়া ধরন্ত
অন্যে অন্যে দুহু বুলে কতুকে হেরন্ত ॥

জলুয়া : জলুয়ার ছলে ভিন্ন নারীর বদন।
হাসি হাসি রতিভাবে করে নিরীক্ষণ
ভিন্ন পুরুষের মুখ দেখি নারীগণ।
এক লক্ষে পাইল যেন স্বর্গের দরশন ॥
মুখ কুট হাসিয়া চক্ষু ভাঙ্গা বাঁশ ভুলি।
মনপুরী হরে নিতি রতি রসে ভুলি ॥
এই কর্ম তোমরা সবের ভালা লাগে।
দধি থাল রাখ নিয়া বিড়ালের আগে ॥
আর দুহানরে একত্র নারীকুলে।
স্নান করান্ত কেনে কলসীর জলে ॥
কলসীর বার্তা নাহি শাস্ত্রের মাঝার ॥

পাশা : আর দোহানরে মুখামুখী বৈসাইয়া।
পাশা খেলাওন্ত কুপুরুষ যুক্তি দিয়া ॥
ভিন্ন নারী পুরুষ হৈয়া একান্তর।
খেলা ছলে হাস লাস করন্ত বিস্তর ॥
ভিন্ন পুরুষের ভয় না রাখন্ত মনে।
পুরুষেহ ভিন্ন নারী হেন নাহি জানে ॥

মওলানার পোশাক ও চরিত্র :

শিরে বান্ধি মহা পাগ জুব্বা রাখি পৃষ্ঠ ভাগ
পরি মহা শ্বেত পিরহান ॥
হস্তে 'আসা' দণ্ড ভারি অধিক দীঘল দাড়ি
দেখিতে ফেরেশতা সমতুল।
নমাজ ন পড়ে ঘরে লোকের সম্মুখে করে
ধীরে ধীরে দীর্ঘল বহুল ॥
ঘরে ঘরে নিতি ফিরে লোকেরে মুরিদ করে
আপে যেন তেহেন লোকের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিঞ্চিত পাইয়া ধন ন বিচারি কত জন
খেলাফত দেওন্ত সত্বরে ॥
দক্ষিণার বাত্রা পাইলে মাংস যেন রাখে চিলে
ছুপ মারে আপনা পাসরী।
পাগল সদৃশ হএ খাওন্ত সত্বরে ধাই
উর্দ্ধ শোয়াসে যেন মত্তকরী ॥
কত কত মওলানায় শাস্ত্র নাহি জানে।
আচাউক জানিবা শাস্ত্র বাণী নাহি শুনে।
সে সব মওলানা জান ইবলিসের চর।
অবিরত তার মুখে নারদ উত্তর ॥

বেনামাজী দরবেশ : কত কত দরবেশ যে ফকিরের জন।
নমাজ করিলে বোলে কোন প্রয়োজন ॥
কেমন ফকির সেই রসুল উম্মত।
কেমন খলিফা তারে দিল খেলাফত ॥

অস্পৃশ্যতা : কত কত মওলানায় ফতোয়া দেওন্ত।
ধীবরের ঘরে খাইতে নিষেধ করন্ত ॥
কি বুঝি কহন্ত তেঁহ অসখ্য কথন।
হালালরে হারাম বোলন্ত কি কারণ ॥
ব্যক্তিরে ন দোষে শাস্ত্র তুমি দোষ কন।
মুসলমান যদি হয় নিশঙ্কায় খাইও।
নমাজ না করে যদি মুখ ন চাহিও
আরো বোলে শাস্ত্রে মাঝে মৎস্য বেচিবার ॥
যেবা বেচে তার ঘরে নারে খাইবার ॥
কেমন বর্বরে কহে শাস্ত্র ন জানিয়া।
শাস্ত্র ন শিখএ কেনে আলিমেত গিয়া ॥
শারাবী সিফতী ভাঙ্গী বেনমাজী ঘরে।
সে সব মাওলানা খায় কিসের কারণে ॥
যারা শাস্ত্র মানা করে তার ঘরে খায়।
নিষেধ ন করে যারে তথা নাহি যায় ॥

মহররমের তাজিয়া :

কত কত মাওলানায় আশুরার দিনে ।
হাসান হোসেন মূর্তি নির্মান্ত যত্তনে ॥
পড়শী সবারে আনি পূজা করাওন্ত
নাচি গাহি তিরী সকলেরে শুনাওন্ত
আপনে করিয়া পাপ পররে করায়।
লোকরে ভুলায় যেন ইবলিসের প্রায় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিকের রতিচর্চা :

আমরা সকল নিতি দেশে দেশে ফিরি।
নিজ গৃহ নারী ছাড়ি হই দেশান্তরী ॥
আপনা নারী রাখিবারে শক্তি নাই।
তেকারণে রতি ভুঞ্জি যার নারী পাই ॥
হেন যদি না করি কেমতে রহিব।
লাজহেতু আপনার কাজ নষ্ট হইব ॥
তিরী দেখি পুরুষে কি রহিবারে পারে।
অবশ্য উনায় ঘৃত অগ্নির যে আড়ে ॥

হালচাষ সংস্কার :

কত কত মওলানাতে কেহ যদি পুছে।
হাল পালনের কথা বোলে শাস্ত্রে আছে ॥
আষাঢ়ের সপ্ত দিনে রজঃ পৃথিম্বিরে।
উদরতুন ভগস্থলী নিকালে বাহিরে ॥
তেকারণে সপ্ত দিনে হাল ন জুড়িব।
হালজুড়ে যে সকল নরকে পড়িব।
রজস্বলা হইলে নারী পারে নি রমিতে।
রজস্বলা কালে ভূমি চষিব কেমতে ॥
এই মতে কহি যত পাপিষ্ঠ সকলে।
অজ্ঞান সবারে হাল পালাইতে বোলে ॥
হাল পালনের পিঠা এ লবণ ন দিব।
ক্ষেতি মধ্যে নিয়া এ বলে ফাতেহা করিব ॥
এহেন অসখ্য বাণী কিসকে কহন্ত।
আপনে ন জান যদি কি বুঝি বোলন্ত ॥
শাস্ত্র মধ্যে নাহি হাল পালনের বাত।
হাল পালাইতে তাত কিছু নাহি ফল।
হিন্দু সব দেখা দেখি পালন্ত সকল ॥
কত কত মুসলমানে হাল লামাইতে।
ডিম্ব এক মধ্যে রাখি চষে চারি ভিতে ॥
কেহ কেহ জামডাল কুপি মধ্যভাগে।
চারি পাশে হাল জোড়ে যেন চক্র লাগে ॥
কিসকে করন্ত হেন মূরখের আকার।
ভাল দিন বুঝি যুক্ত হাল লামাইবার ॥
যে দিন লামান্ত হাল কিবা জালা ফেলে।
কিবা গুছি লয় কিবা ধান্য আগা লইলে ॥
কেহ দ্রব্য খুঁজিলে সেদিন ন দেওন্ত।

ফাতেহা :

পীর সব শিরনী করে অধিক যত্তন ॥
সেনান করি পবিত্র বসন সব পরে।
গোবর লিপিয়া ঘর অপবিত্র করে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাতেহা করাইতে নেওন্ত বাহির ভবন।
ফাতেহা করন্ত জল ছিঁটিয়া যত্তন ॥
নমাজ করিতে পারে গৃহের অন্তরে।
ফাতেহা করিতে বোলে তথা নাহি পারে ॥
ফাতেহা করিতে নারে নমাজের ঘর।
রান্ধিতে পারএ যথা লেপিছে গোবর ॥

ফাতেহা পদ্ধতি :

মৃত্তিকার কুজা এক সম্মুখে রাখিব।
এক নামে এক জোড় রুটি তুলি দিব ॥
বুলিব ফাতেহা কর মৌলানা সত্বর।
ফাতেহা করিলে রাখে মৌলানা গোচর ॥
আর এক জোড় তুলি দিবেক তখন।
ফলনার নামে দিতে বুলিব সঘন ॥
এই মতে শতে শতে ফাতেহা করএ।
মৌলনার মুখ জল সব শুকাই যাএ।
আর কেহ অন্ন যদি ফাতেহা করান।
এক পত্র বিছাইব পবিত্র স্থান ॥
অল্প অল্প ঠাঁই ঠাঁই অন্ন রাখি তাত।
পূজা যেন রাখি থাকে বুতের সাক্ষাৎ ॥
নামে নামে শতে শতে ফাতেহা দেওন্ত।
কত কত সজ্জন ভাজন মহাজনে।
কাষ্ঠ হেতু নিজ নারী পাঠাওন্ত বনে ॥
পুরুষের কর্ম কিবা মৎস্য মারিবারে।
শাস্ত্রে কহিয়াছে তিরী গুপ্তে রাখিতে।
ন কহিল কাষ্ঠ মৎস্য হেতু পাঠাইতে ॥

ধূমপান :

মসজিদে হুক্কাবাজি কভু না করিও।
যেবা পিয়ে তারে তুমি নিষেধি রাখিও ॥
কেহ কেহ পীর কর্ম একিন করন্ত।
বেনমাজী সব আনি শিরনী রাঁধাওন্ত ॥
যার ঘর শুদ্ধ হইছে তাকে ন ডাকন্ত ॥

জাতিভেদে ধূমপান :

একহি হুক্কাতে কিবা একহি টেমিতে
মগধের সঙ্গতি লইছু ধূম পিতে ॥
এক নলে হুক্কাবাজি আনন্দে করন্ত।
নিজ জাতির সম অন্য জাতিরে জানন্ত ॥
মগধ সঙ্গতি যদি ধূম্র পিতে পারে।
কিসকে ভক্ষণ নাহি পারে ভক্ষিবারে ॥
সে সবের কন্যা কেনে বিভা ন করন্ত।
আপনা দুহিতা সে সবে ন দেওন্ত ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৈরাকারে যাহার উপরে অসন্তোষ।
তুমি কেনে তার পরে হও যে সন্তোষ ॥
আপনার তিরী কন্যা সভাত পাঠাওন্ত।
ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে খেলিতে দেওন্ত ॥
বিষুর দিবসে কিবা বিবাহের কালে।
জ্ঞাতিগণ ডাকিয়া আনন্দ কুতূহলে ॥
ছিফত ভক্ষন্ত কিবা হরিষ অন্তর।
নারী বা পুরুষ সব হই একত্তর ॥
ছিফত খাইয়া অতি যেন মত্তকরী।
উন্মত্ত হএ কিবা পুরুষ কি নারী ॥
হলদি ক্ষেপন্ত যেন মগধ ধরনে।
হাসন গাহন্ত নটী নাটকের গণ ॥
পুরুষ নারীর নারী পুরুষের সঙ্গে।
শঙ্কা পরিহরি সবে খেলে মনোরঙ্গে ॥
এক ঢোল বাজাওন্ত ছিফত ভক্ষন্ত।
আর পুনি তিরীগণে সাহেলা গাহন্ত ॥
এহেন নিলজ্জা পাপী সংসারেত নাই।
নিশ্চয় জানিও তারে ইবলিসের ভাই ॥
বেনমাজী শরাবী ছিফত্রী মত্ত ভাঙ্গী।
এ সবের ঘরে ন খাইবা কিবা ঢঙ্গী ॥

AMARBOI.COM

হিন্দু পুরোহিতের প্রভাব :

যে কিছু কহএ সে গন্ধর্ব পুরোহিত ॥
মূরখের সকলে মানি লয় এক চিত ॥
পণ্ডিত সবের বাক্য কভু ন ধরন্ত।
গন্ধর্ব সকলে জল হিন্দুনী পিওন্ত ॥

তামাক : কেহ ধুম্রবাজী করে ধুম্র ছোড়ে তার পরে
একে এড়ে আর জনে লয় ॥

আউশ ধান্য : যত আউশ ধান্য আছে সংসার মাঝার।
ফাতেহাতে ন লাগএ ন পারে দিবার ॥
অন্ন কিবা রুটি দিতে কদাপি ন পারে।
কেমন বর্বরে ফতোয়াবাজী করে ॥
যেই খাইতে পারে সে ফাতেহা দিতে পারে।
আউশ কিবা নতু শাইল তাত কি বিচার ॥

অস্পৃশ্যতা : তেলি জেলে

কেহ বোলে তেলি কিবা হাজামের ঘরে।
কিবা মৎস্য বেচে কিবা যেবা মৎস্য মারে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে সবের ঘরে বোলে খাইতে ন পারে।
কেমন আলিমে এ ফতোয়াবাজি করে।

গ্রন্থরচনা কাল :
পুস্তক আদায় সমএ লওত শুনিয়া ॥
চন্দ্র ঋতু সিন্ধু পাশে গগনের বাস।
সমুদ্র দিবস আদি হইল ছয় মাস ॥
পুস্তক গ্রথন দুঃখ কহন ন যাএ।
মাত্র জানে যেই নারী বালক প্রসবএ ॥
যত দুঃখ পাইলুম আমি মূরখের কারণ।
অবশ্য দুঃখের ফল দিব নিরঞ্জন ॥
কাহারে নৈরাশ না করএ নিরঞ্জন।
সন তারিখ লেখিবারে, শ্রদ্ধা বাড়ি গেল ॥
চতুর্বিংশ অগ্রাণের জোহর সময়।
বিংশ গ্রহ রমজানের চান্দের নির্ণয় ॥
আছিল ঈদের দিন রোজ সোমবার।
সেদিন হইল লেখা সমাপ্ত সুসার ॥

AMARBOI.COM

ঘ. তোহফা (১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে রচিত)

আলাওল বিরচিত

আলাওল মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবিদের একজন। মূলত অনুবাদক হলেও তাঁর পাণ্ডিত্য-কবিত্ব তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। তাঁর অনূদিত কাব্যগুলো : পদ্মাবতী (১৬৫১ খ্রি.), সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামাল (১৬৫৮-৬৯), তোহফা (১৬৬৪), সপ্তপয়কর (১৬৬৮), সিকান্দরনামা (১৬৭৩); রাগতালনামা ও পদাবলী এবং কাজী দৌলতের কাব্যের সমাপ্তি অংশ।

১। বিদ্যা ও আত্মনির্ভরশীলতা সম্বন্ধে :

নানা বিদ্যা পঠ, শিখ, কর দুঃখে কাজ।
লজ্জা না করিও তাহে মাগিলে সে লাজ।
বিদ্যাগুণ না জানিলে ভ্রমে দ্বারে দ্বারে।
গর্দভ বলদসম যে আলস্য করে ॥ ...
পৃষ্ঠেমুণ্ডে আনিব পর্বত কাষ্ঠ শিলা।
পরগৃহ অন্ন হোতে শতগুণে ভালা ॥
শাক অন্ন রুক্ষ শুষ্ক যেই মিলে খাও।
স্বাদ হেতু নৃপতির গৃহেতে না যাও ॥
মনেত করিয়া আশা কতক্ষণে খাও।
পরগৃহে না থাকিব কুকুরের প্রায়।
পর-গ্রাসে আশা ভাবি না থাকিব মনে।
কুকুর সমান তারে দেখে সর্বজনে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২। সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে :

সুস্বর ঈশ্বর দান কড়হি পদার্থ।
শ্রুতি মাত্র মনেত উপজে পরমার্থ ॥
হাদিসে খবর দিছে রসুল ঈশ্বর।
রুমি সবে নিজ কণ্ঠ করহ সুস্বর ॥
মধুর সুস্বর জান প্রাণের আহার।
মহৎ চরিত্র সত্যভাব জন্মে যার ॥
ভাব উপজিলে মন উর্ধ্বগতি হএ।
না মরে জলের হেটে অগ্নি না দহএ ॥
সারে প্রবেশিব মন অসার তেজিয়া।
অশ্রু স্রবে শ্বাস রোখে না দিব ছাড়িয়া ॥
এমত হইলে তারে বোলে শুদ্ধভাব।
কপটে নাচিলে হানি, বিন্দু নাহি লাভ ॥
গাহিতে শুনিতে কামভাব না ভাবিব।
প্রভু ভাবে মগ্ন মন হইয়া শুনিব ॥
একরীত হোতে চিত্ত হএ আন রীত।
রহিতে পারিলে না নাচিব কদাচিত ॥
আপনা বিস্মৃত হৈলে দৈবে সে নাচিব।
নহে অশ্রুপাতে প্রভু স্মরণে রহিব ॥
যন্ত্রকুল হারাম হইলে এই রীত।
তবল বাহিতে মাত্র গাজীর উচিত ॥
তাম্ব ঢোল নিঃস্বার্থে বাহন নিষেধ।
বিবাহ উৎসবে মাত্র বাহন সন্তোষ ॥

৩। আদব-লেহাজ সম্বন্ধে :

মজলিসে গেলে মৌন হইয়া বসিবে।
বিনা জিজ্ঞাসনে কোন কথা না কহিবে ॥
পুছিলে উত্তর দিব আদব প্রমাণে।
নহে পুনি শুনিয়া থাকিব সাবধানে ॥
না ঝুরিব, না বসিব হেলি পদ মেলি।
অঙ্গে নখ না লাগাবে হেট বস্ত্র তুলি ॥

৪। বিয়ে সম্বন্ধে :

[যে নারী]

অতি স্থূল, পুষ্টকায়া, অধিক দুর্বল।
কর পদে লোমাবলী থাকে যে সকল ॥
না ঢাকএ মস্তক সাক্ষাতে দেএ গালি।
অন্ধকার রাখে গৃহ প্রদীপ না জ্বালি ॥
কেলি-রস হেতু যদি ডাকে প্রিয়ভাষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিয়া পীড়ার ছল নিকটে না আসে।
[তার চেয়ে]
আপনা হরিষ যদি চাহ চিরকাল।
কিনিয়া সুন্দরদাসী গোঙাইলে ভাল ॥
দাসী ভাবে মনে করে ঈশ্বরের কর্ম।
সদা ত্রাস যুক্ত থাকে, বুঝে কার্যমর্ম ॥

৫। দাসী সম্ভোগ সম্বন্ধে :
যদি দাসী কিনি গৃহে আনে কোন জন।
তৎমাত্র না কর চুম্বন আলিঙ্গন ॥
উদর পবিত্র আছে বুঝিয়া মরম।
তার সঙ্গে কেলিরস কর নিভরম ॥
বেচিলে বেচিবে দাসী পবিত্র উদরে।
মাসাধিক যায় সে চরিত্র বুঝিবারে ॥

৬। ভিখিরীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ইদানীং কোরআন হাদীসের বাণীসম্বলিত বহু কবিতা রচিত হয়েছে। আলাউলের এ অংশ ওসব কবিতার পাশে হীনপ্রভ হবে না :
কৃপাভাবে ভিক্ষুক করিলে এক দৃষ্টি।
তোমা 'পরে ঈশ্বরে করিব কৃপা বৃষ্টি ॥
নিজ অঙ্গে দুঃখ সহে পরদুঃখ লাগি।
তার সম কেহ নহে প্রভু কৃপা ভাগী ॥
দ্বারে আসি ভিক্ষুকে মাগিলে এক রুটি।
না দিয়ে ফিরাএ যদি নষ্ট পরিপাটি ॥
ঈশ্বরে বোলএ, 'আমি গেলুঁ তোর দ্বারে।
এক গ্রাস ভক্ষ্য তুমি না দিলে আমারে' ॥
দ্বার হতে কেহ যদি মাঙুয়া খেদাএ।
'মোকে খেদাইল'—হেন বোলএ খোদাএ ॥
গ্রাস এক না দিয়া খেদাএ ভিক্ষুক।
সহস্র বৎসর দোজখেত পাইব দুঃখ ॥

৭। লৌকিক-সংস্কার সম্বন্ধে :
১ না লেপিও ঘর বেড়া গোলাদ মিশ্রিত।
ফেরেস্তা না আসে কাছে জানিহ নিশ্চিত ॥
২ পতি পত্নী অনুক্ষণ কলহ করিলে ঘন
গৃহ হতে লক্ষ্মী দূরে ৸এ।

৮। যাত্রার তিথি :
কিবা শনিবারে নিঃসরিব গৃহ হোন্তে।
তুরিতে আসিব ফিরি নিষ্কণ্টক পন্থে ॥
কর্কটে থাকিতে চন্দ্র যাত্রা না করিব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদিকে উল্টাবার বুঝিয়া চলিব ॥
না যাইব আদিত্য, শুক্রে পশ্চিমের ভিতে।
সোম শনি পূর্বে না যাইব কদাচিতে ॥
গুরুবারে দক্ষিণেত নাহিক কুশল।
উত্তরে মঙ্গল বুধ বড় অমঙ্গল ॥
রহিতে না পার যদি যাইবে অবশ্য।
মন দিয়া শুন তার ঔষধ রহস্য ॥
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই
গুরুবারে দক্ষিণে চলিব গুড় খাই ॥
উত্তরে মঙ্গলে যে ধনিয়া মুখে দিব।
দর্পণ হেরিয়া সোমে পূর্বেতে চলিব ॥
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিয়া মুখে
বাহাঙ্গ ভক্ষিয়া শনি পূর্বে চল সুখে ॥
দধি ভক্ষি উত্তরে চলিঅ বুধবারে।
কোন বিঘ্ন না হইবে কহিলু সাদরে ॥

৯। আযান মহিমা :

উচ্চস্বরে বাঙ্গ দিলে শীঘ্র পন্থ পাএ ॥
আযানের কথেক মহিমা গুণধরে।
ভূত দেও বহুল সঙ্কট ধাএ দূরে ॥
বাঙ্গ নামাযের গুণ মহিমা অপার।
উজ্জ্বল যাহার জোতে সকল সংসার ॥

AMARBOI.COM

১০। বধূ বরণ :

ত্রয়োদশ বাবে শুন সুধীরেক।
যেন মতে নিজ নারী গৃহে আনিবেক ॥
পিতৃগৃহ হন্তে নারী গৃহেত আনিব।
প্রথমে তাহার দুইপদ পাখালিব ॥
তবে সেই রমণীর পাখালনা পানি।
চারি কোণে বাসগৃহে ছিটিবেক আনি ॥
প্রভাতে শক্তি অনুরূপ করি মেহমানি ॥
উত্তম লোকেরে ভাল ভুঞ্জাইব আনি ॥

১১। রমণ বিধি :

রাত কালে প্রথমে আল্লার নাম লৈব।
দেও-পরী রক্ষাহেতু 'আউজ' পড়িব ॥
মনে না করিঅ পরনারী কামভাব।
যদি গর্ভ হএ তবে হএ অন্যলাভ ॥
ফলবন্ত বৃক্ষতলে, না করিঅ রতি।
অপত্য জন্মিলে হএ জালিম দুর্মতি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিনি ওযু না করিঅ কভু রতিরণ।
পুত্র-কন্যা হইব কৃপণ অভাজন ॥
চন্দ্র-তারা হেটে যদি করএ সঙ্গম।
অপত্য জন্মিলে হএ কুরূপ অধম ॥
মোহন্ত করিতে কেলি উদ্যান জমাএ।
সেই লাগি উপরেত চান্দোয়া টাঙ্গাএ ॥
সঙ্গমকালেত কথা কহন অশুভ।
অপত্য জন্মিলে হএ সেই দোষে বোব ॥
যদি সে ভ্রমে লোভে রসে কহে কথা।
খলনের কালে কথা না কত সর্বথা ॥
রতির সমএ যোনি-দ্বার না হেরিব।
বালক আমূল কিবা নির্লজ্জ হইব ॥
সূর্যোদয়ে সঙ্গম করিতে না জুয়াএ।
উপস্থিত নানা ব্যাধি হএ তার গাএ ॥
প্রথম রজনী রতি নাহি ধিক সুখ।
নিশি শেষে রতিরস বড়হি কৌতুক।
চন্দ্রের প্রথম, মধ্য কিবা শেষ কাল।
রতি কর্মে ব্যাধি জন্মে নহে সেই ভাল ॥
রতি সাঙ্গে শীঘ্র ভিন্ন হৈঅ নারী হোতে।
তপ্তজলে অঙ্গ পাখালিবা ভাল মতে ॥
শির-পীড়া জ্বর হন্তে পাইবা কল্যাণ।
কোন কর্ম না করিবা বিনু রতি-স্নান ॥
যুবা নারী সঙ্গে সুখে ভুঞ্জ রতি-রঙ্গ।
সুখহীন শক্তিহীন বৃদ্ধরামা সঙ্গ॥
ঘন ঘন পশু প্রায় না করিঅ রতি।
আয়ু বল ক্ষীণ হএ নয়ানের জুতি ॥
দাগা দিলে শ'তানে করিঅ আগে স্নান।
তবে সে রমণী সঙ্গে সঙ্গম কল্যাণ ॥

১২। খাদ্য গ্রহণ :

চতুর্দশ বাবে শুন মনের হরিষে।
ভক্ষ্য বস্তু যেমত ভক্ষিব সুপুরুষে ॥
নিশি দিশি এক সন্ধ্যা ভক্ষণ উচিত।
শরীর সুসার থাকে করে অতি হিত ॥
ক্ষুধা ভক্ষ্যে স্বাদ গুণে যেই দ্রব্য খাএ।
আকণ্ঠ ভোজনে অসুখ জন্মে গাএ ॥
আপনা সম্মুখে যেই পাএ সেই খাইব।
কদাচিৎ আন আগে হস্ত না ক্ষেপিব ॥
ছোট গ্রাসে ভক্ষিবেক বহুল চর্বণে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে পাছে দুই হস্ত ধুইব সাবধানে ॥
প্রতি গ্রাস মুখে দিতে বিচমিল্লা পড়িব।
পরম সমাদরে অন্ন ভক্তিএ খাইব ॥
খাট 'পরে না খাইব অঙ্গ হেলাইয়া।
যে কিছু সমুখে পড়ে খাইব তুলিয়া ॥
আরম্ভে নিমক শেষে মিষ্ট দ্রব্য খাএ।
যে খাএ সে জীর্ণ হএ ব্যাধি যে পলাএ ॥
নিমন্ত্রণ লইলে ঘরে কিছু না খাইব।
কার অন্ন না দূষিব যেই পাএ খাইব ॥
না বুলিব তিক্ত কটু তাহাতে আস্বাদ
সোকরেত সুখ প্রভু নিকটে প্রসাদ ॥
অতিথ আইলে করি বহুল আদর।
যে থাকে তরল ভক্ষ্য করিব গোচর ॥
আপনে অতিথ হই পরগৃহে গেলে ॥
যথা স্থল পাও তথা বৈস কুতূহলে ॥
কোন বস্তু না মাগিব গৃহপতি স্থানে।
যেই পাএ যথোচিত খাএ হৃষ্টমনে ॥
যদি কেহ আসি নিমন্ত্রণ সংবাদএ ।
এইসব স্থানে না যাইব সদাশএ ॥
যদি জান তথা গেলে কলহ বিবাদ।
ক্ষেমা সে মাগিবা গেলে পাইবা বিষাদ ॥
সন্দেহ থাকিলে মনে না খাইবা তথা।
মৃত্যু-অন্ন ঢোল বাদ্যযন্ত্র বাজে যথা ॥
ভণ্ড বাক্য কহে কিবা নিন্দাচর্চা করে।
কিবা সুরা পান তথা করে খল নরে ॥
সৎকর্ম না হএ কপট নিমন্ত্রণ।
আদর করএ মাত্র দেখি ধনীজন ॥
নিধনীরে হেলা ফকিরেরে মন্দ বোলে।
শুন সাধু কদাপি না যাইবা সেই মেলে ॥

১৩। বস্ত্র পরিধান :

যষ্ঠদশ বাবে শুন সাধু সুচরিত।
যে মতে বসন পরিব শাস্ত্র রীত ॥
অতি ঢিল না পরিব কিবা অতি টান।
চিরদিন থাকে হেন পরিব সমান ॥
কীট সূতা তানা হৈলে না পিন্দিব তারে।
পাগ বাজুর হস্তে খাট পরিব ইজার ॥
সর্ববস্ত্র হন্তে পিন্দ ইজার মলিন।
তবে তার ধিক শোভা হইব প্রবীণ ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধবল বসন পরিবেক অনুক্ষণ।
পীত রক্ত কুসুম্বিত না পর সুজন ॥
চর্ম পাট বাজু যদি যুবা জনে পরে ।
বহুক্ষণ না রাখিব গাএর উপরে ॥
পাট বস্ত্র চমেত সেজদা না জুয়াএ।
তুলাবাসে সেজদাএ বহু পুণ্য পাএ ॥
সপ্তগজ নিয়মিত বান্ধিব দস্তার।
বান্ধিব পাতল বস্ত্র দেখিয়া ওসার ॥
পিঠভাগে 'শামলা' রাখিব অনুমানি।
শামলা বিহীনের পাগ জানিঅ শয়তানি ॥
বহুদিন থাকে বস্ত্র রাখিলে পবিত্র।
শাস্ত্র অনুরূপ বাস সুজন চরিত্র ॥
কোশা মৌজা পরিলে জরদ অতি ভালা।
চৌস্ত দেখে সুজনে যদি সে পরে কালা ॥
মোজা কৌশা পরিব দক্ষিণ পদে আগে।
নিকালিব পদ তার উল্টা সঞ্জোগে ॥
বসিয়া ইজার পিন্দ আগে বাম পদ।
দণ্ডাই বান্ধিলে পাগ খণ্ডিব আপদ ॥
ধুইতে নবীন বস্ত্র জল লই কর।
দশ বার পড়িবেক ছুরত 'কদর' ॥
ফুকি ফুকি সেই বস্ত্র জল বসনে ছিটিব।
সেই বস্ত্র পরিলে পুণ্য দোষ না রহিব ॥
লোহা তাম্র রাঙ সীসা পিত্তল কাঞ্চন।
এ সব অঙ্গুরী না পরিব বুধজন ॥
ইচ্ছা সুখে ছাপাঙ্গুরী সাধু না পরিব ॥
হাকিম হইলে ছাপ রজতে গঠিব ॥
হেমরত্ন অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
যুবতী নারীকে মাত্র শোভএ ভূষণ ॥
পৌরুষ কেবল পুরুষ অলঙ্কার।
বিশেষত দান ধর্ম পর উপকার ॥
অলঙ্কার পুরুষে পরিলে সে হারাম।
বিদ্যাগুণ অলঙ্কার প্রতিষ্ঠা সুনাম ॥

১৪। শয়ান :

একসর না সুতিব গৃহের মাঝার।
ভক্ষ্য শেষে দিনে শুতে, খণ্ডে দুঃখ জাল ॥
রাত্রির ভোজন করি ত্বরিতে শুনাতে ॥
শরীরে নানান ব্যাধি জন্ম হএ তাতে ॥
নিশিতে ভোজন শেষে হাঁটিব বিস্তর ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথেক বিলম্ব হাটে গুণ বহুতর ॥
ভূমি শয্যা শয়ন করিলে নহে ভাল ॥

স্বপ্ন : স্বপ্ন দেখি পরীক্ষিঅ পণ্ডিতের স্থানে।
না কহিঅ শিশু, শত্রু, নারী হীনজ্ঞানে ॥
মন্দ স্বপ্ন পরীক্ষিয়া ভাল কৈলে হিত।
ভালরে বুলিলে মন্দ ফলএ কৃচিৎ ॥

১৫। দাস ও পড়শী :
যদি দাস কিন ভ্রাতৃসমান দেখিবা।
সম ভক্ষ্য দিবা যোগ্য বস্ত্র পরাইবা ॥
অপরাধ করিলে ক্ষেমিবা ধর্ম মানি।
পাত্র ভাঙ্গে গালি না দি' আর দেও কিনি ॥
মনে দুঃখ পাএ হেন কার্যেত না দিবা।
রোযাদার হৈলে যোগ্যকাজে নিয়োজিবা ॥
পড়শীরে মনদুঃখ কদাপি না দিবা।
দয়া করি যথ পার সহায় হইবা ॥

১৬। পিষুন :
পিযুনী সকলে কভু ভালাই নাহি পাএ।
আনলেত তৃণ যেন সব পুণ্য খাএ ॥
তেজ ঝাটে গর্ব 'কেনা' [প্রতিহিংসা] হও শুদ্ধ মতি।
'কেনার' নরক বিনু আর নাহি গতি।
যদি তুমি লোক আগে কার দোষ কও।
শত দোষ আপনা আঞ্চলে বান্ধি লও ॥
কঠিনতা মক্কর চক্কর তেজ ঝাটে।
শীঘ্র ঘটে তার ফল আপনা নিকটে ॥
গর্ব না করিঅ সকলেরে জান বড়।
গরবে গরল ধিক মন্দ জান দড় ॥
দেখিলে শিশু বা বৃদ্ধ করিঅ আদর।
শিশু পাপহীন বৃদ্ধে পুণ্য বহুতর ॥
মুমীনে গরব 'কেনা' মনে না রাখিব।
চিত্তের পিষুন ধুই নিশিতে শুতিব ॥
থাউক মনুষ্য, বৃক্ষ দেখিলে উত্তম।
করিব সালাম তারে হইয়া নরম ॥

১৭। জুয়া :
কিন্তু মাত্র হালাল জানিঅ তিন রীত ॥
একে বন্দিআল হএ মাগিয়া না পাএ।
আপনারে ক্ষুদ্র হেন জানিয়া খেলাএ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে করি রক্ষক যদি সে খেলা খেলে।
প্রাণরক্ষা পাএ খেলা জিনি ধন পাইলে ॥
দ্বিতীয় যাহার পরিবারে উপাবাস।
কোন হেতু ভক্ষণের নাহি তার আশ ॥
খেলা খেলি জিনি যদি ধন কিছু পাএ।
তার পরিবারের জীবন রক্ষা হঁএ।
তৃতীয় জালিমে যদি দণ্ডন করএ।
না দিলে তাড়না পাএ বন্ধন পড়এ ॥
সর্বস্ব হরিল কিছু নাইক উপাএ।
খেলা জিনি ধনে যদি বন্ধন এড়াএ ॥
এই তিন জনের হালাল খেলা-বাদ।
অন্যবাদ করিলে পশ্চাতে পরমাদ ॥

১৮। দিনের শুভাশুভ :

শনিবারে বনপন্থে করিব আখেট।
সেদিনে শিকার সঙ্গে হএ বহু ভেট ॥
রবিবারে গৃহসজ্জা কৃষির ব্যগোয়ান।
আরম্ভএ কূপ পুষ্করণী অকল্যাণ ॥
গৃহ তেজি দূর গ্রামে কার্যহেতু যাএ।
সোমবারে অতি ভাল সিদ্ধি ফল পাএ ॥
মঙ্গলে খেউরের কর্ম করে অমঙ্গল।
যেন শরীরের রক্ত পড়এ সকল ॥
বুধেত গোসল করে ব্যাধির ঔষধি।
রাজপাএ ভেটিবারে গুরুবারে সিদ্ধি ॥
শুক্রবারে স্নান করে ভুঞ্জি সুখ রতি।
পাএ বহু পুণ্য হএ উত্তম সন্ততি ॥
শনি মঙ্গলেত বস্ত্র পরে কিবা ফাড়ে।
নানা ব্যাধি সঙ্কট আসিয়া শীঘ্র ধরে ॥
তিন, অষ্ট, তের, অষ্টাদশ বিংশতিন।
অষ্টবিংশ, মাসে অমঙ্গল ছয়দিন।
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি হস্তে গণিয়া আসিব ॥

১৯। ৪০ প্রকারের সুখ :

একুণে চল্লিশ বারে শুন সাধু সত্যভাবে
চল্লিশ অবধি সুখরতি।
করিলে এসব কাম লক্ষ্মী নাই সেই ঠাম
তেহি না করিবা কদাচিত ॥
চল্লিশ ভিতরে বিভা সাধুলোকে না করিবা
করিলে মগজে ঘুণ ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষসার-গুণ-রাত, চল্লিশেত সুপূর্ণিত
অপূর্ণ বীর্যের ফল মরে ॥
গোসল হাজত যবে, কিছু না ভক্ষিব তবে
তৃষ্ণা হৈলে খাইবেক জল।
ভগ্ন ঘট না রাখিব শূন্য ঘরে না শুতিব
বিনি বস্ত্রে না কর গোসল ॥
গৃহে যথ ভাণ্ড থাকে, না রাখি না রাখ তাকে
নারীর নাম ধরি না বোলাএ।
অন্যে অন্যে পতি নারী, কিবা পুত্র সুকুমারী
মা-বাপের নাম না ধরএ।
আদর বিহীনে জান, না ডাকিব কদাচন
পুত্র কন্যা কভু না শাপিব।
ভগ্ন রুটি ভিক্ষা দিব, পাইলে ভিক্ষুক সব
কভু তাহা কিনি না খাইব ॥
ইজার না পিন্দ উঠা পাগড়ী না বান্ধ বৈঠা
অযোগ্য গোপন ব্যক্ত করে।
দাণ্ডাই আউল কেশ সিতা না করিব পাশে।
ভাঙ্গা ফণী না রাখিব ঘরে ॥
কঠিস্থল অধদেশ লজ্জাস্থানে যেই কেশ
চল্লিশ দিনে তু না রাখিব।
না হাঁটিব বৃদ্ধ আগে, না বসিব উর্ধ্বভাগে
সর্বকাষ্ঠে দন্ত না ঘষিব।
রসুন পিঁয়াজ ছাল পুড়িলে সে নহে ভাল
না রাখ মাটি জাল ঘরে।
যদি সে উকুন পাও জীববন্ত না ফেলাও
নামাযে আলস্য-সুখ হরে ॥
মিছাবাক্য প্রতিনিত না অভ্যাস কদাচিত
লজ্জাস্থলে দৃষ্টি না করিব।
দাউনে না মুছ মুখ আসিয়া ঘটিব দুঃখ
পিন্ধিরা বসন না সেলাইব ॥
ফযর গুজার যবে মসজিদ হন্তে তবে
শীঘ্রগতি বাহির না হৈঅ।
বিনি সূর্যোদয় হৈলে না সুতিঅ প্রাতঃকালে
ছিঁড়ি দন্তে নখ না কাটিঅ ॥
ফল-বিচি দণ্ডে ভাঙ্গি না খাও কৌতুক লাগি
দিব্য না করিও সত্য হইলে।
পরিবার ভক্ষ্য কষ্ট কৈলে হত লক্ষ্মী ভ্রষ্ট
ভক্ষেৎ কিবা হন্তে দুঃখ দিলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাতি-নারী অনুক্ষণ কলহ করিলে ক্ষণ
গৃহ হন্তে লক্ষ্মী দূরে যাএ।
কহিলুঁ চল্লিশ কথা যে হেন রতন গাঁথা
একচিত্তে রাখিবা হৃদএ।

২০। গর্ভপাত ও সঙ্গম :
গর্ভপাত রমণীর পারে করিবার।
যাবতে না হই থাকে জীবন সঞ্চার ॥
কিতাবে কহিছে জান দোষ নাহি তাএ।
কিন্তু যদি রাখএ অধিক পুণ্য হএ ॥
রেমন সমএ কিবা অন্দরে বাহিরে।
নারী আজ্ঞা বিনু রূপে যাইতে না পারে ॥
নিজ নারী হএ, কিবা দাসী পরাঙ্গনা।
না লই নারীর আজ্ঞা যাইবারে মানা।
যদি দাসী সঙ্গম ঈশ্বর ইচ্ছা হএ।
কিতাবের কথা মিছা না জান নিশ্চএ।

ঙ. *বাঙলার সূফী সাহিত্য [১৯৬৯ সনে প্রকাশিত]*
সূফীতত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্যকারের রচনা সংকলন (১৬-১৮ শতক)

AMARBOI.COM

ভারতে তথা বাঙলায় সূফী মতবাদের বিভিন্ন শাখা ভারতীয় সাংখ্য-যোগতন্ত্রের প্রভাবে স্থানিক ও লৌকিক রূপ লাভ করেছিল। অধিকাংশ সূফী ছিলেন অদ্বৈতবাদী এবং দেহতত্ত্বরসিক। তাই তাঁরা ছিলেন যোগ-সাধনাপ্রবণ। বৌদ্ধ চতুষ্পদ্মে ও হিন্দু ষড়পদ্মে এবং ত্রিনাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুমা বা গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীতে আস্থা রেখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণভিত্তিক দেহচর্যাই এ-পথে অধ্যাত্মসিদ্ধির উপায় বলে তাঁরা জানতেন।

ষোলো শতকের কবি সৈয়দ সুলতান সতেরো শতকের কবি শেখচাঁদ, হাজী মুহম্মদ, মীর মুহম্মদ সূফী, শেখ জাহিদ ও আঠারো শতকের কবি শেখ মনসুর, আলিরজা প্রমুখ সূফী তত্ত্ববিদ কবিদের বক্তব্য-মূল এখানে বিধৃত হয়েছে। এঁদের বইগুলোর নাম জ্ঞানপ্রদীপ, হরগৌরীসম্বাদ, তালিবনামা, অজ্ঞাতকবির যোগকলন্দর, নূরজামাল, নূরনামা, সির্নামা, আগম ও আদ্যপরিচয়।

ভারতে বিভিন্ন সূফীমতের উপর স্থানিক প্রভাবে পড়েছে প্রচুর। নকশবন্দিয়া মতবাদে ও সাধনতত্ত্বে ভারতীয় দেহতত্ত্ব ও যোগের প্রভাব পড়েছে সবচেয়ে বেশি। তারাও স্বীকার করে কুণ্ডলিনী শক্তি। ষড়কেন্দ্রী দেহে ষড়রঙের আলো সন্ধান করা এবং সেই ষড়বর্ণের জ্যোতিকে বর্ণহীন জ্যোতিতে পরিণত করাই সাধনার লক্ষ্য। এটি শিবশক্তি মিলনজাত আনন্দের কিংবা বৌদ্ধ সহজানন্দের আদলে পরিকল্পিত।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বাঙলা-পাক-ভারতে ক. চিশতিয়া, খ. কাদেরিয়া গ. সোহরওয়ার্দীয়া ও ঘ. নকশবন্দিয়া—এ চারটি মতবাদই প্রধান। অন্যান্যগুলো এ চারটির উপমত মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতরাং শাত্তারিয়া, মদারিয়া, কলন্দরিয়া প্রভৃতি প্রত্যেকটি উক্ত চারটির যে-কোনো-একটির উপমত।

১. অদ্বৈতবাদ. ২. সর্বেশ্বরবাদ, ৩. দেহতত্ত্ব (কুণ্ডলিনী শক্তি), ৪. বৈরাগ্য, ৫. ফানাতত্ত্ব, ৬. সেবাধর্ম ও মানবপ্রীতি, ৭. গুরু বা পীরবাদ, ৮. পরব্রহ্ম ও মায়াবাদ, ৯. ইনসানুল কামেল তথা সিদ্ধ পুরুষবাদ, ১০. স্রষ্টার লীলাময়তা প্রভৃতি ধারণার বীজ বা প্রকাশ ছিল আরব, ইরানের সূফীতত্ত্বে।

ভারতের মাটিতে অনুকূল আবহে এসব প্রবল হতে থাকে সূফীতত্ত্বে। এখানে সূফীমতে স্থানিক প্রভাব লক্ষণীয়। ইসলাম ও সূফীমতের প্রভাবে ভারতও দেখা দেয় চিন্তাবিপ্লব। আমরা এদেশে ইসলামি প্রভাবের দু-চারটে নমুনা দিয়ে পরে দেশী প্রভাবের পরিচয় নেব মুসলিম জীবনে ও চিন্তায়।

"ভারতে একেশ্বরবাদ, ভক্তিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম ও শৈবধর্মের জন্ম হল দ্রাবিড় দেশে নবীন ইসলাম ধর্মের সঙ্গে নব্য হিন্দুধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই! দক্ষিণ-ভারতে এই নতুন ধর্মসমন্বয় ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। ... ইসলামের এক দেবতা ও এক ধর্মের বিপুল বন্যার মুখে দাঁড়িয়ে শঙ্কর আপসহীন অদ্বৈতবাদ প্রচার করেছেন। ...শঙ্করাচার্যের আপসহীন অদ্বৈতবাদ মনে হয় যেন নবীন আরবী ইসলামের একেশ্বরবাদের ভারতীয় রূপ। বেদ উপনিষদ তার উৎস হলেও ইসলামের প্রভাবেই যে সেই উৎস সন্ধানের প্রেরণা এসেছে এবং 'অদ্বৈতবাদের' পুনরুজ্জীবন সম্ভবপর হয়েছে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। শঙ্করাচার্যের পর রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধবাচার্য ও নিম্বার্কাচার্যের দর্শনের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে দেখা যায় ...। ইসলামের আত্মনিবেদন, ইসলামের প্রেম, ইসলামের সমান বিচার ও সাম্যের বাণী, ইসলামের গণতন্ত্রের আদর্শ মুসলমান সাধকরা সহজভাষায় সোজাসুজি যখন এদেশে প্রচার করেছেন, রামানুজ ও নিম্বার্ক তখন শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানের স্তর থেকে শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতির স্তরে নেমে এলেন"। *[বিনয় ঘোষ]*। এই মতই ব্যক্ত হয়েছে তারাচাঁদের *Influence of Islam on Indian Culture* গ্রন্থেও।

উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও বলেন : "একেশ্বরবাদ ভারতেও ছিল, বাহির হইতেও আসিয়াছিল—উভয়ে মিলিয়া দশম-একাদশ শতাব্দীতে একটা পরিপুষ্ট আকারে দেখা দেয়। ...তাহাদের (মুসলমানদের) একেশ্বরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের একেশ্বরবাদ বিশেষত বৈষ্ণব একেশ্বরবাদ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে নাই এমন কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচবোধ হইতেছে।" উত্তর-ভারতেও সন্ত ধর্মের উদ্ভব হয় মুসলিম প্রভাবে। রামানন্দ, কবির, নানক, দাদু, একলব্য রামদাস প্রমুখ কমবেশী মরমীয়াবাদই প্রচার করেছেন।

ভারতে এসে এদেশী ধর্ম, আচার ও দর্শনের প্রভাবে পড়েছিল মুসলমানরা। রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণের রূপকে বান্দা-আল্লাহর তথা ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক, ভক্তি, প্রেম, বিরহবোধ কিংবা মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন মধ্য-উত্তর ভারতীয় মুসলমানরা। কবির, এয়ারী, রজব, দরিয়া, কায়েম প্রমুখের গান তার প্রমাণ। বাঙলাদেশেও চৈতন্যোত্তর যুগে মুসলমানরা অধ্যাত্মপ্রেম বা হৃদয়াকূতি প্রকাশ করেছেন রাধাকৃষ্ণ প্রতীকের মাধ্যমে। সৈয়দ মর্তুজার ফারসি গজলে রাধা—কৃষ্ণ নেই, আবার নূর-কুতুবে-আলমের বাঙলা পদ্যে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের রূপক—এতেই বোঝা যায়, অধ্যাত্মজিজ্ঞাসায় দেশী ভাষানুগ রূপক অবহেলা করেননি তাঁরা। দেশজ মুসলমানেরা পূর্ব-সংস্কারবশে, চৈতন্যোত্তর যুগে রেওয়াজের প্রভাবে এবং ভাবসাদৃশ্যবশত সূফীতত্ত্বের রূপক হিসেবে রাধা-কৃষ্ণ প্রতীক মুসলিম মরমীয়ারা গ্রহণ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূফীমতের আংশিক সাদৃশ্য রয়েছে রাধা-কৃষ্ণ লীলায়। তাই একেশ্বরবাদী ও অবতারবাদে আস্থাহীন মুসলমান কবিগণের কল্পনায় সাধারণত রাস, মৈথুন, বস্ত্রহরণ, দান, সম্ভোগ, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি প্রশ্রয় পায়নি।

কেবল রূপানুরাগ, অনুরাগ, বংশী, অভিসার, মিলন, বিরহ প্রভৃতিকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্পর্কসূচক ও ব্যঞ্জক বলে। তাঁদের রচনায় অনুরাগ, বিরহবোধ এবং জীবন-জিজ্ঞাসাই (আত্মবোধন) বিশেষরূপে প্রকট।

সৃষ্টিলীলা দেখে স্রষ্টার কথা মনে পড়ে—এটিই রূপ। এ সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবোধ জন্মে—এটিই অনুরাগ এবং তাঁর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগে—এটিই বংশী, আর সাধনার আদিস্তরে পাওয়া-না-পাওয়ার সংশয়বোধ থাকে—তারই প্রতীক নৌকা। এর পরে ভাবপ্রবণ মনে উপ্ত হয় আত্মসমর্পণব্যঞ্জক সাধনার আকাঙ্ক্ষা—এটিই অভিসার। এর পর সাধনায় এগিয়ে গেলে আসে অধ্যাত্মস্বস্তি-তা-ই মিলন। এরও পরে জাগে পরম আকাঙ্ক্ষা-একাত্ম হওয়ার বাঞ্ছা—এর নাম বাকাবিল্লাহ, এ-ই বিরহ।

বাঙলা-পাক-ভারতে সাধারণত ইসলাম প্রচার করেন সূফী দরবেশরাই। অধিকাংশ মুসলমান এদেশী জনগণেরই বংশধর। পূর্বপুরুষের ধর্ম, দর্শন ও সংস্কার মুছে ফেলাও পুরোপুরি সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। সূফীসাধকের কাছে দীক্ষিত মুসলমানেরা শরিয়তের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়নি অশিক্ষার দরুন। কাজেই সূফীতত্ত্বের সঙ্গে যেখানেই সাদৃশ্য সামঞ্জস্য দেখা গেছে, সেখানেই অংশগ্রহণ করেছে মুসলমানেরা। বৌদ্ধ নাথপন্থ, সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনা, শাক্ততন্ত্র, যোগ প্রভৃতি এভাবে করেছে তাদের আকৃষ্ট। এরূপে তারা খাড়া করেছে মিশ্র দর্শন। ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, "পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার এবং কেরামতীর ফলে, মুখ্যত ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙালী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাঙ্গালাদেশে ইসলামের সূফীমত বেশি প্রসার লাভ করে সূফীমতের ইসলামের সহিত সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।" সূফীরা গুরুবাদী। শেখ, পীর কিংবা মুর্শীদই তাঁদের পথপ্রদর্শক। এতে বৌদ্ধমতবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। ফানা ও বাকাবাদী হোসেন বিন মনসুর হল্লাজ, বায়জিদ বিস্তামী কিংবা ইব্রাহিম আদহাম প্রভৃতি সূফীদের কেউ ছিলেন জোরাস্ট্রিয়ানের, কেউ জিনদিকের, কেউবা বৌদ্ধের বংশধর এবং জাতিতে ইরানি। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজা চালু হয় এভাবেই। হিন্দুর গুরুবাদও বৌদ্ধপ্রভাবিত।

ভারতে এসেই ভারতীয় যোগ, দেহতত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাবে পড়েছিলেন ইরানি সূফীরা। সূফী সাধনার সঙ্গে যোগ ও দেহতত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেই তাঁরা শুরু করেন নতুন সূফী চর্যা। পাক-ভারতের মুসলিমের অধ্যাত্ম রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব প্রভৃতিই রচনা করেছে বাঙালী মুসলমানের অধ্যাত্ম তথা মরমীয়া সাধনার ভিত্তি।

মুসলমানদের বিশ্বাস, হযরত মুহম্মদ হযরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। হাসান, হোসেন, খাজা কামিল বিন জয়দ ও হাসান বসোরী আলী থেকে প্রাপ্ত হন সে জ্ঞান। এই কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলে হাসান বসোরী (খৃ. ৭২৮), রাবিয়া (মৃত ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহাম (মৃ. ৭৭৭) আর হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দাউদ তাই (মৃ. ৭৮১), মারুফ কার্কী (মৃ. ৮১৫) প্রমুখই সূফীমতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সূফী জুননুন মিসরী (খৃ. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ। আমরা তার (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি।' *[কোরআন]* এইপ্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত এগিয়ে যায় বিশ্বব্রহ্ম বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে। যিকর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরআনের অপর এক আয়াতে : 'অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র।' সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্যলীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা ইরফান কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সূফীদের করেছে বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহউস্ত' (সবই আল্লাহ) বা বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম-বাদ। এ-ই হল 'তোহিদ-ই-ওজুদী তথা আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজমান'—এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপনের ভিত্তি।

বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরসানী (মৃ. ১০৪৯ খ্রি.) প্রমুখ যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। শরিয়তপন্থ বিরোধী এসব সূফীদের অনেককেই প্রাণ হারাতে হয় নতুন মত পোষণ ও প্রচারের জন্যে। মনসুর হাল্লাজ, শিহাবুদ্দিন সোহরওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ শহীদ হন এভাবেই।

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, 'ভারতে সূফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সূফী মতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ হইতে থাকে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্টছাপ দেখিতে পাই। তাঁর মতে ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদ, ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্য এবং আল-বিরুনী অনূদিত পাতঞ্জল যোগ আর কপিল সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ। বায়জিদ বিস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু বু আলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়।'

তিনি আরো বলেন, '(বাঙলা) দেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগসাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গেই সূফী মতবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে এবং সূফী মতবাদ ও সাধনাপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। চিশতীয়াহ্ ও সুহরবর্দীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; ভারতে আগমনের পর এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল।'

ভারতীয় যোগচর্যাভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়, নামত। কেননা আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই সীমিত রইল এর ইসলামি রূপায়ণ। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দীয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল এঁদের ষড় লতিফা বা আলোককেন্দ্র। এঁদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা ও দেহস্থ আলোর উর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর হয়ে ওঠে আলোকময়—এ হচ্ছে এক আলোকময় অদ্বয়সত্তা। এর সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় 'সামরস্য'-জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধি-চিত্তাবস্থার।

ভারতিক প্রভাবে, যোগীর ন্যায় প্রাণায়াম ও জপের রূপ মিল সূফীর যিকর। বহির্ভারতিক বৌদ্ধপ্রভাবে ইরানে সমরখন্দে, বোখারায়, বলখে এ ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দুপ্রভাবে বৌদ্ধগুরুবাদও (যোগতান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতিবশে) অপরিহার্য হয়ে উঠল সূফীসাধনায়। সূফীমাত্রই তাই পীর-মুর্শীদনির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনার ও সিদ্ধির একমাত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথ। এটিই কবর পূজারও [দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর 'স্তূপ' পূজারই মতো হয়ে উঠল] রূপ পেল পরিণামে। আল্লাহ্‌র নামের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন সূফীরা। গুরুতে হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য যোগ্য হয় আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সাধনার। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানাফিশশেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ্'। প্রথমটি রাবিতা (গুরু-সংযোগ), দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 'মুরাকিবাহ' গৃহীত হয়েছে যৌগিক পদ্ধতি। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পীরের খানকা বা আখড়ায় সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দ'ারা (আল্লাহ্‌র নাম কীর্তনের আসর), হাল (মূর্ছা), সাকী, ইশক প্রভৃতি চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে খাজা মঈনউদ্দীন চিশতির আমল থেকেই। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও গৃহীত হয় এই রীতি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় রয়েছে এরই অনুসৃতি।

বৌদ্ধতন্ত্র ভিত্তি করেই হিন্দুতন্ত্রের উদ্ভব। আবার হিন্দু-বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাবে বাঙালী সূফীরা দুই কূল রক্ষার প্রয়াসে দেহতত্ত্ব ও সাধনচর্যার অসমন্বিত মিলন ঘটিয়েছেন। ফলে মোকাম, মঞ্জিল, হাল, সূফীতত্ত্ব প্রভৃতি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁদের চিন্তায়। বাঙলাদেশের বাইরে কলন্দর ও কবীরই প্রথম সমন্বয়কারী। তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যের হাতে বাঙলায়ও বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবিত অধ্যাত্মসাধনা শুরু হয়। এ প্রভাবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ক. বৌদ্ধ চর্তুকায়ের আদলে তন লতিফু, তন কসিফু, তন ফানি এবং তন বকাউ কল্পিত।

খ. আবার চার 'দীল'ও পরিকল্পিত হয়েছে : দীল আম্বরী (বক্ষের দক্ষিণাংশে), দীল সনুবরী (বক্ষের বামাংশে) দীল মুজাওয়ারী (মস্তকে), দীল নিলুফারী (উদর ও উরুর সন্ধিস্থলে)। এটিও বৌদ্ধ চারি তত্ত্বের আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বের অনুকৃতি।

আবার হারিস, মারিস, মুকিম ও মুসাফির—এই চার রুহও হয়েছে কল্পিত। (*তালিবনামা*)

গ. হিন্দুর ষটচক্র এবং ষড়পদ্মও স্বীকৃত। বিশেষ করে মূলাধার মণিপুর, অনাহত ও আজ্ঞাচক্রের বহুল প্রয়োগ সর্বত্র সুলভ।

ঘ. কুণ্ডলিনী ও পরশিব শক্তিকে এঁরা অভিহিত করেছেন জ্যোতি (লতিফা) নামে।

ঙ. আবার ষড়পদ্মের আদলে বড় 'লতিফা'ও কল্পনা করা হয়েছে : কলব (হৃদয়, রুহ, আত্মা), সির্ (গুপ্তহৃদয়), খাগি (গুপ্তআত্মা), কসফ (বিবেকী আত্মা) ও নফস (দুস্প্রবৃত্তি)। এগুলো বিশেষ করে নকশবন্দীয়া খান্দানের পরিকল্পিত।

রুহও চার প্রকার—ক. নাতকি, খ. সামি, গ. জিসিম ও ঘ. নাসি। (সির্নামা)

চ. ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা) ও সুষুম্না (সরস্বতী) নাড়ি এবং প্রাণ-অপান-বায়ুর (দমের) নিয়ন্ত্রণ ও উল্টাসাধনা এদের লক্ষ্য।

ছ. চক্রের অধিষ্ঠাত্রী বৌদ্ধদেবতা লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, তারার মতো কিংবা হিন্দুতন্ত্রের চক্রদেবতা ব্রহ্মা-ডাকিনী, মহাবিষ্ণু-রাকিনী, রুদ্র-লাকিনী, ঈশ-কাকিনী প্রভৃতির মতো চতুর্দ্বারের জন্যে জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল ও আজরাইল—এই চার ফিরিস্তা প্রহরীরূপে কল্পিত।

জ. হিন্দুর মন্ত্রতন্ত্র, সঙ্গীতাদি প্রায় সব শাস্ত্র ও তত্ত্ব যেমন শিবপ্রোক্ত বলে বর্ণিত, তেমনি মুসলমানদের কাছে রসুলের পরেই আলির স্থান এবং সব ইসলামি গুহ্যতত্ত্বই আলিপ্রোক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ. শরিয়ত-নাসুত, তরিকত-মলকুত, হকিকত-জবরুত, মারফত-লাহুত ও হাহুত প্রভৃতি নাম রক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু তত্ত্ব ও তাৎপর্যের পরিবর্তন ঘটেছে।

ঞ. অদ্বৈততত্ত্ব তথা সর্বেশ্বরবাদ সর্বত্রই স্বীকৃত। এবং বাকাবিল্লাহ্ লক্ষ্যে সাধনাও দুর্লক্ষ্য নয়। 'হমহ্উস্ত' (সবই আল্লাহ) বিশ্বাসে এবং হাহুত (পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম অবস্থা) লক্ষ্যে সাধনায় বৌদ্ধনির্বাণবাদ এবং বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রত্যক্ষ অনুকৃতি লক্ষণীয়।

ট. আসন, ন্যাস, প্রাণায়াম, জপ প্রভৃতিও হয়েছে সূফীদের যিকরের অপরিহার্য অঙ্গ। রেচক, পূরক ও কুম্ভক সূফীদের দম নিয়ন্ত্রণ চর্যার অঙ্গ।

ঠ. 'পীরবাদ' চালু হয়েছিল বৌদ্ধ গুরুবাদের প্রভাবেই। বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে সূফী সাধনায় পীরের উপর অপরিমেয় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধ্যাত্মসাধনা মাত্রই গুরুনির্ভর। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ।

ড. প্রবর্তক, সাধক ও সিদ্ধির অনুকরণেই সম্ভবত রাবিতা (গুরু-সংযোগ), মুরাকিবাহ্ (আল্লাহ্র ধ্যান) তথা 'ফানাফিশশেখ' ও 'ফানাফিল্লাহ' পরিকল্পিত।

ঢ. আল্লাহ্কে বৌদ্ধ 'শূন্য'-এর সঙ্গে অভিন্ন করেও ভেবেছেন কোনো কোনো সূফী সম্প্রদায় :

দেখিতে না পারি যারে তারে বলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যাথাতে পরম হংস তথা যোগধ্যান। [জ্ঞানপ্রদীপ]

ণ. পরকীয়া প্রেমসাধনা তথা বামাচারী যোগসাধনাও কারো কারো স্বীকৃতি পেয়েছে :

স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়ার সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস। *[জ্ঞান সাগর]*

ত. ঘর্ম থেকেই যে সৃষ্টি পত্তন তা সব বাঙালী সূফীই মেনে নিয়েছেন।

তুর্কি বিজয়ের পরে ভারতিক সূফীমতেরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে ওঠে এই যোগ। ফলে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সমাজে যোগ সামান্য আচারিক পার্থক্য নিয়ে সমভাবে গুরুত্ব পেতে থাকে। এক কথায় অধ্যাত্মসাধনার তথা মরমীয়াবাদের ভিত্তিই হল যোগপদ্ধতি। বৌদ্ধ সিদ্ধা, সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া, নাথপন্থী, হিন্দু শৈব, শাক্ত, মুসলিম সূফী ও হিন্দু-মুসলিম বাউলদের মধ্যে আজো তা অবিচল। বাঙলা চর্যাপদে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, নাথ-গীতিকায়, গোর্খ সংহিতায়, যোগীকাচে, চৈতন্যচরিতে, মাধব ও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, সহদেব ও লক্ষ্মণের অনিল পুরাণে, বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, গোবিন্দদাসের কালিকা মঙ্গলে, দ্বিজ শত্রুঘ্নের স্বরূপ বর্ণনে, আর যোগচিন্তামণি, বাউল গান প্রভৃতি গ্রন্থে ও রচনায় যোগ আর যোগীর কথা পাই।

মুসলমান লেখকদের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লাহ, সৈয়দ সুলতান, হাজী মুহম্মদ, আলাউল, শেখ জাহিদ, শেখ জেবু, আবদুল হাকিম, শেখ চাঁদ, যোগ কলন্দরের অজ্ঞাত লেখক, আলিরজা, শুকুর মাহমুদ রমজানআলী, রহিমুদ্দিন মুনশী প্রভৃতিকে যোগপদ্ধতির মহিমা কীর্তনে মুখর দেখি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ অবধি আমরা প্রায় বিশটি সূফীশাস্ত্র গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। যথা ফয়জুল্লাহ্‌র ‘গোরক্ষ বিজয়’, অজ্ঞাতনাম লেখকের ‘যোগকলন্দর’, মীর সৈয়দ সুলতানের ‘জ্ঞানপ্রদীপ’, ‘জ্ঞান চৌতিশা’, হাজী মুহম্মদের ‘নূরজামাল’, মীর মুহম্মদ সফীর ‘নূরনামা,’ শেখ চান্দের ‘হরগৌরীসম্বাদ’ ও ‘তালিবনামা’, আব্দুল হাকিমের ‘চারি মোকাম ভেদ’ ও ‘সিহাবুদ্দীন পীরনামা’, আলি রজার ‘আগমজ্ঞানসাগর’, বালক ফকিরের ‘জ্ঞান চৌতিশা’, নেয়াজের ‘যোগকলন্দর’, মোহসেন আলির ‘মোকাম-মঞ্জিলের কথা’, শেখ মনসুরের ‘সির্নামা’, শেখ জাহিদের ‘আদ্যপরিচয়’. শেখ জেবুর ‘আগম’, রমজান আলির ‘আদ্যব্যক্ত’, রহিমুল্লাহর ‘তনতেলাওত’ ও সিহাজুল্লার ‘যুগীকাচ’।

শূন্যতত্ত্ব :

দেখিতে না পারি যারে তারে বুলি শূন্য
তাহারে চিন্তিলে দেখি পুরুষ হএ ধন্য। ইত্যাদি

এর সঙ্গে শেখ চান্দের তালিবনামা, আলিরজার জ্ঞানসাগর ও ফয়জুল্লাহ্‌র গোরক্ষ বিজয়ের শূন্যতত্ত্ব তুলনীয়।

দেহের প্রতীকী পরিচয় :

শরীরের মধ্যে জান চারি চন্দ্র হএ
আদি নিজ গরল উন্মত নিশ্চএ।
শরীরের মধ্যেত অপূর্ব তিন পুরী
শ্রীহাট, কামরূপ আর কনক পুরী।
হৃদেত কনকপুরী গ্রীবাএ যে বৈসে
কামরূপ গর্ভে ভালুত শ্রীহাট প্রকাশে।
অর্জুদের চক্রের মধ্যে ঋতুর উদএ
স্বাধিষ্ঠান চক্রের মধ্যে বাবিত নিশ্চএ।
অনাহত চক্রেত শরৎ বৈসএ
বিশুদ্ধ চক্রেত সে শিরি প্রকাশএ।
মণিপুর চক্রেত হেমন্ত ঋত বৈসে
আজ্ঞা চক্রেত জান বসন্ত প্রকাশে।

যোগতত্ত্ব :

সহজে শরীর মধ্যে আঙ্গুল চৌরাশী।
চৌরাশী আঙ্গুল হেন সর্বলোকে ঘোষি। ...
[স্ব স্ব আঙুলের মাপে দেহ ৮৪ আঙুল পরিমিত]
উরু হোন্তে শ্রীহাট হএ অষ্টম আঙ্গুল
চক্ষু হোন্তে ভুরু মধ্য অর্ধ আঙ্গুল
এহি স্থানে জানিও যোগের আদি মূল।
নাভি স্থানের অগ্নি যদি সকল হেতু হএ
তালু মূলে দিবা রাত্রি নীর বিন্দু বহে।
তালুমূলে ধেয়াইব পূর্ণসম ইন্দু
নাসিকাত্ত ধেয়াইব দেখিয়া প্রাণ বন্ধু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুদ্রা : এখানে কহিব শুন মুদ্রা বিবরণ
প্রথমে কহিএ শুন মুদ্রা খেচরী
সর্বসিদ্ধি হএ যে রোগ পরিহরি।
সাপে খাইলে তবে সে নাহি বাহে
নিদ্রাতে না টলে বিন্দু কামিনী পাশএ।
তালুমূলে সুষুম্নার পদ্মের সন্ধান
জিহ্বা তুলি দিব সেই বন্ধের স্থান।
তুলি দিলে জিহ্বাএ অমৃত লাজ পাএ
সে অমৃত পাকে যে অজর হএ কাএ।
মহামুদ্রা : প্রথমে বুক' পরে চিবুক পড়িব
গুহ্যদ্বারে বামপদে দড় করি দিব।
দক্ষিণ পাও তুলি দুই হাতেত ধরিব
পিঙ্গলাএ পুরি বাউ কোষেত ভরিব।
যথাশক্তি কুম্ভকেত পিঙ্গলে রেচিব
কুম্ভকে পিঙ্গলাএ সমান করিব।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা যদি সমন্বয় হএ
তবে সেই মুদ্রা যেন এড়িতে জুয়াএ।
ঘটে ঘটে ব্যাপিত আছএ নৈরাকার।....
জলকুণ্ড কুম্ভজল একহি মিলন।...
নির্মল উঝল সেই শুদ্ধ সুধাকর
নিশ্চয় সে রূপ বৈসে সভার অন্তর।
ঢেউ জল জল ঢেউ নহে ভিন্নকার
তেলএ বাবিত যেন বৈসে হতাশন
তনু মধ্যে তেনমতে আছে নিরঞ্জন।
তনু মধ্যে সহস্রদলেত বৈসে নিত
তার দীপ্তি পড়এ যে শরীর বিদিত।
থাবর জঙ্গম যথ বৈসে সর্বঠাম
থির হই রহিয়াছে ভিন্ন মাত্র নাম।
দিশি নিশি রবি শশী নাহি স্থান স্থিত....
দিশিনিশি আপেত আপনা লক্ষণ
পাইয়া পরম প্রিয়া প্রভু নিরঞ্জন
প্রেম রসে মগ্ন হই করে নিরীক্ষণ।
হরগৌরিসম্বাদ ও তালিবনামা স্মরণীয়।
বিন্দু বিন্দু নাদ বিন্দু নহে ভিন্না ভিন।

শুক্রই ব্রহ্ম কৃষ্ণ, হেবজ্র প্রভৃতি তন্ত্রের প্রতিধ্বনি রয়েছে এই চরণে।

গুরু : ভজহ গুরুর পদ বুঝি আপনার
ভ্রম ভাঙ্গি যেই কহে সেই গুরু সার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদ্বৈতসিদ্ধি : মিলাও জীবেতে জীব তেজি আপনার।
জগত জীবন ব্রহ্মা মহাশিব কর
যত্ন করি রহিয়াছে সবার অন্তর।
রবির কিরণ কিবা কহিবারে নারি
রবি হোন্তে ভিন্ন তানে বুলিতে না পারি।
লখন অলখ লখ লই তার নাম
লীন হই সর্ঘত্রে আছএ সর্বঠাম।
বাউত করহ নর আয়ুর উদ্দেশ।

সহস্রার : সহস্রদলে গুরু শতদলে শিষ
ষট চক্র ভেদিয়া তাতে করহ উদ্দেশ।
সহস্র দলত রঙ্গি দেখি সর্বময়।
সূর্যের দৃষ্টেত যেন চন্দ্রের উদয়।

গুরুসাধন : শ্রুতি নাসা দিঠে জান শিষ্য হেরে তিন
শক্তি বিন্দু ইচ্ছা কার্য গুরুর অধীন।

বায়ু : সম্পূর্ণ আছএ বাবি নাভিকুণ্ড পাইয়া
সরএ নাসিকা নালে সরএ দখিয়া।

শিব-শক্তি শিবশক্তি দোহ এক ভিন্ন মাত্র নাম
শিব ধরিতে শক্তির লিঙ্গেত বিশ্রাম।

ক্ষেমা (সংযম) ক্ষেমা হোন্তে ধিক জান নাহি পৃথিবীত
ক্ষেমা তপ জপ হৈলে আত্ম হিতহিত।

জীবে ব্রহ্ম হীনজন দেখিয়া না কর হীন জ্ঞান
হীনেত আছএ জান পুরুষপুরাণ।

এই তত্ত্ব, এই আচার, এহেন ধর্মই বাঙলার প্রাচীনতম ধর্ম, আচার ও দর্শন। আমাদের বাউলেরা বাঙলার এই প্রাচীনতম তন্ত্রধর্মেরই ধারক এবং বাহক।

শুক্র রহস্য চন্দ্র-সূর্য কামবিন্দু শরীর মাঝার
অনাহত পুরুষ পরাণপুরে বাস।

শূন্যতত্ত্ব : অষ্টকলে তালি দিয়া রহত আনন্দে।
অনাহত শব্দ উঠে অষ্ট কলে সাজে
অষ্টগণ করি মুখ্য মধ্যে মধ্যে বাজে।
শূন্যময় করতার শূন্যে বান্ধা ঘর
শূন্যে উঠে শব্দ মিশে শূন্যের ভিতর।
শূন্যে আয়ু শূন্যে বায়ু শূন্যে মোর মন।
আকল ফিকির আর শূন্যের ত্রিভুবন।
শূন্যে দম শূন্যে খোম শূন্যে মোর বান্দা
শূন্যে জীউ শূন্যে পিউ শূন্যে সব জিন্দা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[কবি বলেন. সাধনার দ্বারা "কায় সিদ্ধি হৈলে তবে তরিব যে ভবে।"]

শূন্যতত্ত্ব : সংসারে ফকির শূন্য শূন্যরূপে শূন্য নাম
শূন্য হন্তে ফকিরের সিদ্ধি সর্বকাম।
নাম শূন্য কাম শূন্য শূন্যে যার স্থিতি
যে শূন্যের সঙ্গে করে ফকির পিরীতি।
শূন্যেত পরম হংস শূন্যে ব্রহ্মজ্ঞান
যথাতে পরম হংস তথা যোগ ধ্যান।
যে জানে হংসের তত্ত্ব সেই সার যোগী
সেই সব শুদ্ধ যোগী হএ শূন্য ভোগী।
সিদ্ধা এক শূন্য এই সে যুগল
যে সবে এই তত্ত্ব পালে সে তনু নির্মল। *[আলিরজা]*

উল্টা সাধনা : পিরীতি উলটা রীতি না বুঝে চতুরে
যে না চিনে উল্টা সে ন জীয়ে সংসারে। [ঐ]
সমুখ বিমুখ হএ বিমুখ সমুখ
পালটা নিয়মে সব জগতে সংযোগ।

কবির মতে : 'প্রভুর গোপনতন্ত্র আছিল গোপনে
সেই রত্ন মোহাম্মদ জানাএ আলি স্থানে।
সে রত্ন প্রভাবে হৈল যোগীগণ সব

এবং, শূন্য সূক্ষ্ম তনু হএ রূপ শূন্যাকার
রূপের সাগরে সিদ্ধি যথ বনিজার।
শূন্য সিন্ধু হন্তে ব্যক্ত রূপের সাগর

দেহে আছে, ষট পদ্ম ষষ্ঠ চক্র ষষ্ঠ ঋত গতি
যথা চক্র তথা পদ্ম ঋতুর বসতি।
মণি ব্রহ্মা মূলাধার চক্র অনাহত
আজ্ঞা স্বাধিষ্ঠান এই চক্র ধূলি ঋত।
শ্রীগোলার হাটে তথা সত্যানন্দ রাজার
পরম সুন্দরী রামা নিত্য দেয় পশার।
সর্বভূত হতে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন।
নিরঞ্জন নর নহে নর সমতুল
প্রভু হন্তে বিচ্ছেদ না হএ নর-কুল।

কেবল, কায়া সঙ্গে জীবাত্তমা সতত মিশ্রিত
পরমাত্তমা মন সঙ্গে থাকে প্রতিনিত।

আর, কায়া হএ কামিনী পুরুষ হএ মন
মন হএ রমণী পুরুষ নিরঞ্জন
অনাহত শব্দ কহে যে ধ্বনির নাম
সে ধ্বনির তত্ত্ব হন্তে সিদ্ধি মনস্কাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে হুঙ্কার মূলেত পরম তত্ত্বসার
তার পরে যোগসিদ্ধি পন্থ নাহি আর।

সাধনতত্ত্ব :শব্দ স্থির হএ যদি স্থির হএ মন
মন স্থির হন্তে অতি স্থির হএ তন।
তন স্থির হন্তে হএ কায়ার সাধন।

পরকীয়াসাধন : স্বকীয়ার সঙ্গে নহে অতি প্রেমরস
পরকীয়া সঙ্গে যোগ্য প্রেমের মানস।

যোগই হচ্ছে একমাত্র সাধন ও সিদ্ধি পন্থ। তাই—
যোগ বিনু পুণ্য বলে স্বর্গ যদি পাএ।
দেখা না করিব তার সঙ্গে বিধাতাএ।

আর, লাহুত মোকাম কিছু পাইলেক যবে
বাক্যসিদ্ধি কেরামত হএ তার তবে।

দ্বৈত-অদ্বৈত তত্ত্ব : জাত সিফত ছিল গোপত ভাণ্ডার
জাত হোন্তে সিফত হইল পরচার।
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন হইল জাহির।
জাত সিফতে সেই নূর অনুপাম
নূর মোহাম্মদ তান রাখিলেক নাম।
আপনার দোস্ত হেন তাহারে বুলিলা
সেই নূর হোন্তে আল্লা সকল সৃজিলা।
এক হোন্তে হৈল দুই দুই হোন্তে সকল

মূলত সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন :
বীজ হোন্তে বৃক্ষ যেন বৃক্ষ হোন্তে ফল।
ফল বৃক্ষ বীজ—এই তিন নাম হএ
একে হএ তিন জান তিনে এক হএ
বীজ বৃক্ষ ফল হোন্তে কেহো ভিন্ন নহে।

কিন্তু, তথাপি ফলেরে বৃক্ষ কহন না যাএ।
তেন মত জানিঅ যে আল্লা আর বান্দা
আল্লা হোন্তে বান্দা সব হইয়াছে পয়দা।
ফল আর বৃক্ষ যেন দুই এক কায়
তেন রূপে জানিঅ যে বান্দা আর খোদায়।
দরিয়ার পানি যেন গৌরসে উথলে
গৌরসে দরিয়া কেহ কভু নাহি বোলে।
সিন্ধু ঢেউ সিন্ধু হোন্তে কেহ ভিন্ন নহে
সেই সিন্ধু উথলিলে গৌর নাম হএ।
তেনরূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
আল্লা হোন্তে বান্দা সব কেহ ভিন্ন নহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বান্দা হীন নামমাত্র আপনে সকল
গৌর হেন নামমাত্র হওএ সর্ব জল।

কাজেই, তুহ্মি আহ্মি নামমাত্র সকল সেই সে
নানারূপে করে কেলি নানান যে বেশে।
ব্যক্ত অব্যক্ত আপে ব্যাপিত সর্বঠাম
বাসনা করিয়া মাত্র রাখিয়াছে নাম।

এবং, জলস্থল অন্তরীক্ষে যথ চলাচল
আপনে করন্তি খেলা সৃজিয়া সকল।
পুষ্পের মধ্যেত গন্ধ গন্ধেত স্বরূপ
বেকত গোপত বেশ গোপত স্বরূপ।

যদি 'আল্লা হোন্তে বান্দা জান কভু ভিন্ন নহে' তবে কেন 'বান্দার পীড়নে সে আল্লারে না পীড়এ।' —এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেন :

ঢেউ আর সাগর একই পানি হএ

কিন্তু, ঢেউ মৈলে কভু সাগর না মরএ।
তেনমত জানিঅ বান্দা আর খোদাএ।

কিংবা, গাছ আর ফল যেন হএ এক কায়
তথাপি ফলের দুঃখে গাছ দুঃখী নহে।
তেন রূপে জানিঅ বান্দা আর খোদাএ
বান্দার দুঃখেত কভু খোদা দুঃখী নহে।
বান্দার আজারে কভু খোদা না পীড়এ
বান্দার মরণে কভু খোদা না মরএ।

খোদা আর বান্দা অভিন্ন হয়েও ভিন্ন।

তাই, আছিল আছিব সে যে আছে সর্বক্ষণ
জন্ম মৃত্যু নাহি তান আওনা গমন।

চ. সঙ্গীতশাস্ত্র

মধ্যযুগের রাগ-তালনামা (মৎ-সম্পাদিত ও প্রকাশিত)
বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রকারের রচনার সংকলন গ্রন্থ (১৭-১৯ শতক)

মধ্যযুগে রাজা-বাদশাহ, সুলতান-সুবাদার, শাসক-সামন্তের প্রতিপোষণে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে সঙ্গীতে প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু বাঙলায় দেশী রাজা-বাদশাহর কতকটা অভাবে এবং বিশেষ করে সংস্কৃতি, ঐশ্বর্য ও শাসনকেন্দ্র উত্তর-ভারতের প্রবল প্রভাবে দেশী-সঙ্গীতের কদর করবার লোক ছিল না এদেশে। তাই বাঙলাদেশে দেশীসঙ্গীত ছিল অবহেলিত। তবু অগণিত গণমানব একেবারেই বঞ্চিত ছিল না। দেশী ভাষায় গান বেঁধে সুর আরোপ করে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সাধনা করেছিল তারা। তারই সাক্ষ্য রেখে গেছেন দেশী সঙ্গীতবিদরা তাঁদের রচিত রাগ-তাল ও গানের মাধ্যমে। ষোলো-সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে ফয়জুল্লাহ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলাওল, দানিশকাজী, আলিরজা, বখশ আলি, তাহির মাহমুদ, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, চম্পাগাজী, চামারু, সাগর আলি, মুজাফফর, দ্বিজ রঘুনাথ, দ্বিজ রামতনু, দ্বিজ ভবানন্দ প্রমুখ অনেকেই রাগ-তালের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে গেছেন৭।

মধ্যযুগের রাগ-তালনামা

মধ্যযুগে গোটা পাক-ভারতব্যাপী যখন সঙ্গীতচর্চার বান ডেকেছে তখন বাঙলার অবস্থা কী? বাঙলাদেশের কোনো অবদানের কথা তো শুনতে পাইনে। একমাত্র 'লালাবাঙালী' ছাড়া কোনো বাঙালীর নামও মেলে না। এর নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। আমাদের অনুমিত কারণগুলো এই :

এক. ফারসির পরেই উত্তর-ভারতীয় ভাষাই দরবারি মর্যাদা ও Lingua Franca হবার সুযোগ পেয়েছে। সে জন্যে সে-ভাষাতেই সঙ্গীতকলার অনুশীলন হয়েছে। সে-ভাষায় অনধিকারী প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাঙালীর পক্ষে যানবাহন বিরল সে-যুগে নতুন সঙ্গীতকলা আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি।

দুই. উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে সঙ্গীতের অনুশীলন ও উৎকর্ষের মূলে রয়েছে বিভিন্ন দরবারের প্রতি-পোষণ, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাঙলাদেশে বাঙালী বাদশাহ্ ছিল না কখনো, কাজেই বাঙলা-ভাষায় সঙ্গীতসাধনার অনুকূল পরিবেশ কখনো গৌড়-সুলতানের দরবারে সৃষ্ট হয়নি এবং সামন্তদের অধিকাংশও ছিল অবাঙালি।

তিন. বাঙলা ভাষা লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হিসেবে বিকশিত হবার মুখেই বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন শুরু হয়। ফলে তাঁদের সাধন ভজন ও কীর্তনের জন্যে বিশেষ ধরনের গান রচিত হতে থাকে। সে স্রোতে অবৈষ্ণবরও গা ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়। নইলে গানের দেশ বাঙলায় কালোয়াত জন্মাবে না কেন! তবু সে-দেশের লোকের ঘটে ঘটে সতেজ প্রাণ এবং গোলায় গোলায় ধান না থাকলেও গলায় গলায় গান রয়েছে; যে-দেশে সহজিয়া, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, ঝুমুর প্রভৃতি সঙ্গীতের প্লাবন বয়ে গেছে, সে-দেশে কেন যে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, বড় বড় কালোয়াত, সঙ্গীতশাস্ত্রকার এবং রাগ, তাল ও বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবকের আবির্ভাব ঘটেনি, তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়।

তাই বলে বাঙালী সঙ্গীতবিমুখ ছিল না। দেশী-বাদশাহ্-বিহীন ও সামন্তবিরল হয়েও তারা সাধ্যমতো এক্ষেত্রে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। বাঙলার হিন্দুগণ সংস্কৃতে সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছেন, বাঙলায়ও কিছু কিছু করেছেন। মুসলমানেরা এ-বিষয়ে সংস্কৃতে ও ফারসিতে কোনো গ্রন্থ রচনা করেছিলেন কি না, সে সন্ধান কেউ করেননি। কিন্তু তাঁরা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুসরণে বাঙলায় বহু রাগ-তালের গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে মধ্যযুগে যে নতুন জিজ্ঞাসা, ঔৎসুক্য ও রস-তৃষ্ণা উত্তর-ভারতে সুরের অন্বেষায় রসিকগণকে আকুল ও একাগ্র-সাধনায় নিমগ্ন করে ছিল, সে রেনেসাঁস বাঙালীর হৃদয়কে উদ্বেল করেনি। বাঙালীর প্রাণের ঐশ্বর্য তখন বৈষ্ণব ও সূফী আন্দোলনের মাধ্যমে ভাগবত উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি সাধনে তৎপর ছিল এবং সেভাবেই ব্যয় হয়েছে। এছাড়া উপায়ও ছিল না। পার্থিব সম্পদে বঞ্চিত হয়ে, অপার্থিব ধনে ধনী হওয়ার মানসপ্রয়াস না করলে চলত না, জীবনে তো একটা অবলম্বন চাই। কাজেই আমাদের সংগীতকলা নতুনের স্পর্শ বিশেষ পায়নি, প্রায় গতানুগতিক ধারাতেই চলছিল। তারই প্রমাণ রয়েছে রাগ-তালের নানা গ্রন্থে। তবু সূর্য উদয় হলে যেমন তার রশ্মি ছিদ্রপথেও প্রবেশ করে, তেমনি আমাদের সঙ্গীতকলায়ও সৃষ্টির অঙ্কুর মাঝে-মধ্যে দেখা গেছে। তার প্রমাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাচ্ছি কিছু কিছু মিশ্র রাগরাগিণীতে, যা ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীর অতিরিক্ত, যেমন: ধানসী-বেগরা, ধানসী-দীপিকা, ধানসী-কেদার, ধানসী-দ্রৌপদী, তিবরিয়া–ধানসী, দিগর-ধানসী, ধানসী-বেরুণী, মালসী বেরুণী, দিগর-মালসী, দিগর-রামসিয়া, দিগর-আশাবরী, বেরুণী-সিন্দুরা, গৌড়সিন্দুরা, দিগর-গৌড়সিন্দুরা, করুণা ভাটিয়াল, নাগোধা-ভাটিয়াল, আকুমারী-ভাটিয়াল, রাগজালালী, দেওগিরি রাগ, কল্যাণ-জালালী, তুড়ি গুঞ্জরী-কেদার, কামোদ ভাটিয়াল, পরছ কামোদ, রাগ পরছ, কহু-কৃপালি, পঞ্চম সিন্দুরা, তুড়িপরছ, তুড়ি কেদার, তুড়ি গুঞ্জরী কেদার, তুড়ি-গোড়ী আসোয়ারী, রাগ সারাঈ, সুহি সারাঈ, সুহি সিন্দুরা, সুহি বেলোয়ার, বেউরপূরী ভাটিয়াল, ভাক্কা কামড়া, ভাটিয়াল বৈরাগী, নট-গান্ধার, শ্রীগান্ধার, গান্ধার পঞ্চম ইত্যাদি আরো কয়েকটি।

সূফী সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে সংগীতকলার চর্চা প্রতিষ্ঠা পায়, আর সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রই তাঁদের আদর্শ ছিল। সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রে সংগীতের পৌরাণিক উদ্ভব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। সংগীতও শিবপ্রোক্ত। তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মা-নারদ-ইন্দ্রসভা, সঞ্জাপাখি, বানর প্রভৃতি হয়ে মর্ত্য-মানুষের কাছে এসেছে নারদ, ব্যাস, কর্ণ, মতঙ্গ, সোমেশ্বর, কল্লিনাথ, ভরত, দণ্ডিল প্রমুখ ঋষি-রসিকের আগ্রহে ও অনুশীলনে। এঁদেরকে জড়িয়ে সঙ্গীতকলার উদ্ভব সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী গড়ে উঠেছে। মুসলমান সংগীততাত্ত্বিকবর্গ এই কথা-অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন তো বটেই, তাতে আবার জাত্যাভিমানের অপবুদ্ধি বশে সঙ্গীতকলার ইসলামি উদ্ভব কল্পনা করতে যেয়ে এক হাস্যকর খিচুড়ি-তত্ত্ব সৃষ্টি করেছেন। যেমন আলিরজা বলেন :

(শঙ্কর) গোপ্ত ব্যক্ত মহামন্ত্র রসুলের হোতে।
চারিবেদ চৌদ্দ শাস্ত্র করিলা জগতে॥
বহু বহুকাল সেই আছিল গোপেত।
ভাবিনী ভাবক হই শঙ্কর সাক্ষাতে॥

তারপর, শঙ্কর প্রণমি নবী মর্ত্যেতে আসিল।
বেকত সকল কথা সভাব কহিল॥

কিন্তু একদিন আলীর অনুরোধে নবী গুপ্ততত্ত্ব ও মন্ত্র আলীকে না দিয়ে পারলেন না। আলী সে মহামন্ত্রের তেজ সহ্য করতে না-পেরে নবীর পরামর্শে গভীর অরণ্যে মন্ত্র রেখে এলেন।

এদিকে, মন্ত্র শুনি কম্পি গিরি বহে জলধার।
মহাজলাকার হৈল জঙ্গল ভিতরে
সে জল খাইল যথ বনের বানরে।
জলপানে হনুমানে মহামত্ত হইয়া
লক্ষিবারে লাগিলেন্ত বৃক্ষেত উঠিয়া।
লাফাইতে বৃক্ষাঘাতে যথ হনুমান
উদর ছিঁড়িয়া কথ তেজিল পরাণ।

কিন্তু 'গাছে গাছে বানরের 'রগ' (শিরা, নাড়ী) সব রহে টানা দিয়া এবং যখন বসন্ত ঋতু এল, আর–

সে রগে লাগিল যদি মলয়া বাও
কহিতে লাগিল তাল যন্ত্র রাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসন্ত সমীর সেই রগেতে লাগিল
ঋতু রাগ তাল নানা যন্ত্র নিঃসরিল।
দগর, নাগর (নাকাড়া) ঢোল কথ বাদ্যধ্বনি
রবাব, দোতারা, বংশী, সানাই বেণুনি।
ভেত্তর কন্নাল যথ রস বাদ্য রঙ্গ
পিনাক ডম্বুর বেনু কর্তাল মৃদঙ্গ।
নহবত ঝাঞ্ঝরি বাদ্য যথেক সংসারে
ব্যক্ত কৈল হনুমান হোন্তে করতারে।
রাগতাল গোপেত আছিল হরপাশ।
হনুমান হোন্তে হৈল সংসারে প্রকাশ।

তারপর, আর দিন নবী কহে মর্তুজার ঠাঁই
মন্ত্র যথা ছাড়ি দিছ দেখ তুমি যাই।
নবীর আদেশে আলি যেই বনে গেল
ঋত রাগ যন্ত্র তথা বাজিতে দেখিল।
নানা রাগ যন্ত্র দেখি মহানন্দ আলি
সকল শিখিল শাহা হৃদয়ে আকলি।
সারিন্দা করিল মৃত কপি অঙ্গ আনি
বানরের চর্মে দিল সারিন্দার ছানি।
বানরের রস দিয়া রবাব সাজায়—
সারিন্দার মন্ত্র শাহা প্রথমে শিখিল
পাছে রাগ তাল সব অভ্যাস করিল।

বিধৃত অংশে দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ্ই শঙ্কর বা শিব। তিনি হযরত মুহম্মদকে বেদাদি চতুর্দশ গুপ্তব্যক্ত শাস্ত্রে ও মন্ত্রে জ্ঞান দান করেন। হযরত আলী এ জ্ঞানের উত্তরাধিকার পান এবং তাঁর অক্ষমতায় ও হনুমানের আত্মদানে রাগতাল বসন্ত সমীর সহযোগে পৃথিবীতে প্রচারিত হয়। এবং নরমধ্যে আলীই আবার আদি সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত-যে ভাগবত উৎকণ্ঠার তথা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসা নিবৃত্তির ও সাধনার বাহন তাও আলিরজা স্পষ্ট করেই বলেছেন—

আলি হোন্তে সে সকল সন্ন্যাসী ফকিরে
শিখিল সকল যন্ত্র রহিল সংসারে।
ভাবের বিরহে সব শান্ত হৈতে মন
রাগতাল কৈল প্রভু সংসারে সৃজন।
গীততন্ত্র শুনি মহামুনি ভ্রম যাএ
সর্ব দুঃখে দূর হয় গীত যন্ত্র রাএ।
গীতযন্ত্র মহাযন্ত্র বৈরাগীর কাম
রাগযন্ত্র মহাযন্ত্র প্রভুর নিজ নাম।
জীববন্ত যথ আছে ভুবন ভিতর
সর্বধর্মে সর্বঘটে গীতের সুস্বর।
ঘটে গোপ্ত যন্ত্রগীত যোগিগণে বুঝে
তেকারণে সর্ব জীবে সে সবারে পূজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গীতযন্ত্র সুস্বর বাজায় যে সকলে
মহারসে ভুলি প্রভু থাকে তার মেলে।
শুদ্ধভাবে ডুবি নৃত্য করে যেই জনে
গীত রসে মজি প্রভু থাকে তার সনে।

অপর একজনও বলেন—

কহে হীন দানিশ কাজী ভাবি চাহ সার
রাগযন্ত্র নাদ সব ঘটে আপনার।
অষ্টাঙ্গ তনমধ্যে আছএ যে মিলি
তনান্তরে মন-বেশি করে নানা কেলি।
মোকামে মোকামে তার আছএ যে স্থিতি
ছয় ঋত তার সঙ্গে চলে প্রতিনিতি।
রাগ-ঋত অন্ত যদি পারে চিনিবার।
জীবন মরণ ভেদ পারে কহিবার।
কিবা রঙ্গ কিবা রাগ কিবা তার রূপ
ধ্যানেতে বসিয়া দেখ ঘটে সর্বরূপ।

মুসলিম সমাজে সঙ্গীতচর্চা যে সূফী প্রভাবেরই ফল, আমাদের সে-অনুমান উক্ত চরণ কয়টির দ্বারা প্রমাণসিদ্ধ হল।

রাগের বই 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', তাল সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম 'তালনামা' বা 'তালমালা' এবং রাগ ও তালের মিশ্রগ্রন্থের নাম 'রাগতালনামা' বা 'মালা'। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে ১৯খানি 'রাগনামা' বা 'রাগমালা', ১৩ খানি 'রাগতালনামা' রয়েছে। এগুলো ছাড়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কাছে ও 'বাঙলা একাডেমীতে কয়েকখানি রাগ ও তালের পুঁথি রয়েছে। এসব গ্রন্থের রচয়িতা চট্টগ্রামবাসী হিন্দু ও মুসলমান। মধ্যযুগে চট্টগ্রামে সঙ্গীতের বিশেষ অনুশীলন হয়েছিল এবং বহু মুসলমান সংগীতচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। এসব মুসলমান সাধারণ্যে 'পণ্ডিত' নামে পরিচিত হতেন, তাঁরাই দেশের স্ব স্ব মণ্ডলীতে সঙ্গীতবিদ্যা শেখাতেন। চট্টগ্রামে নমঃশূদ্র শ্রেণীর হাড়ি ও ডোমেরাই সাধারণত বাদ্যকরের পেশা নিয়ে থাকে। উক্ত 'পণ্ডিত' আখ্যাধারী মুসলমান সঙ্গীতবিশারদেরাই এসব হাড়ি-ডোমদেরকে গান-বাজনা শেখাতেন। চট্টগ্রামে এরূপ বহু পণ্ডিতের নাম আজো লোপ পায়নি। চম্পাগাজী পণ্ডিত, কমর আলী পণ্ডিত, জীবন পণ্ডিত, বখশআলী পণ্ডিত, ওয়ারিশ পণ্ডিত, পরাণ পণ্ডিত, ফাজিল নাসির মুহম্মদ পণ্ডিত প্রমুখ আজো লোকস্মৃতিতে বিদ্যমান রয়েছেন, এঁদের কেউ কেউ সংগীতগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

রাগতালনামাগুলো প্রায়ই সংকলন গ্রন্থ। এক-এক রাগরাগিণীর দৃষ্টান্তস্বরূপ যেসব পদ উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলো নানা জনের রচনা তো বটেই, আবার রাগরাগিণীর ধ্যান, ভাষা ও নানা বিশেষজ্ঞের রচনা থেকে উৎকলিত। তবে ফাজিল নাসির মুহম্মদের 'রাগমালা' এবং আলিরজার 'ধ্যানমালা' এসবের ব্যতিক্রম। এঁরা ধ্যানের ভাষ্য রচনায় আর কারো সাহায্য নেননি, তবে দৃষ্টান্তছলে পদ বা গান উদ্ধৃত করেছেন নানা কবির।

রাগমালাগুলোতে প্রত্যেকে রাগরাগিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকে ধ্যান ও পরে বাঙলা পয়ারে তার তর্জমা ও ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন্ সংস্কৃত সংগীতগ্রন্থটি আদর্শরূপে চালু ছিল, তা জানবার উপায় নেই। তাই আমাদের রাগমালাগুলোর ধ্যান 'সঙ্গীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রত্নাকর', 'সঙ্গীতপারিজাত' প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতিক গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ খুব কমই মুদ্রিত হয়েছে। যে-কয়টি মুদ্রিত হয়েছে, তাদেরও সব কয়টি এখানে পাওয়া গেল না। স্বভাবত সবাই সঙ্গীতপ্রিয় হলেও সঙ্গীতশাস্ত্রপ্রিয় লোক 'লাখে না মিলএ এক।' তাই বড় বড় গ্রন্থাগারেও সঙ্গীতশাস্ত্রগ্রন্থ দুর্লভ। এ কারণে এদিককার পরিচয় অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তালের ধ্যান এবং তাল নির্দেশও আছে।

আজ অবধি আবিষ্কৃত রাগমালাগুলোতে যে-কয়জন সঙ্গীতশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া গেছে, তাঁরা হচ্ছেন : ষোলো শতকের মীর ফয়জুল্লাহ, সতেরো শতকের আলাওল, আঠারো শতকের ফাজিল নাসির মুহম্মদ, কাজী দানিশ, আলিরজা, চম্পাগাজী, বখশ আলী মুজফফর, তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ, পঞ্চানন, ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রামতনু, রামগোপাল, মুহম্মদ পরাণ, চামারু [ইনি সৈয়দ সুলতানের নবী বংশের এবং ফাজিল নাসিরের রাগমালার লিপিকার], গুল মুহম্মদ খলিফা এবং আকবর শাহ পণ্ডিত। এবং সম্ভবত উনিশ শতকের দেবান আলি, সন্তু খাঁ, মুহম্মদ আজিম, জীবন আলি, মুহম্মদ নকী, সাগর আলী, আমজাদ কাজী, মুহম্মদ শাহ্ ফকির এবং বিশ শতকে আবদুল ওহাব সংগীতশাস্ত্র সংকলন করেন। তাঁর ছাপাগ্রন্থের নাম 'সৃষ্টি পত্তন রাগনামা শত ময়না' [সৃষ্টিপত্তন রাগনামা সতীময়না]। এতে সতীময়না ও রত্নামালিনীর উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্বলিত 'বারোমাসী' নানা রাগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হয়েছে। গ্রন্থের উক্তরূপে নামকরণ সেজন্যেই।

AMARBOI.COM

প্রণয়োপাখ্যানাদি অন্যান্য গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ [১৬ শতক]

ক. ইউসুফ-জোলেখা

শাহ মুহম্মদ সগীর বা সগিরী (১৩৯১-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ)

কোনো দেশ-কালের প্রেক্ষিতে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা অতিবড় জ্ঞানী-মনীষীর পক্ষেও হয়তো সম্ভব নয়। দেশে-কালে, বিশ্বাসে-সংস্কারে, আচারে-আচরণে সামাজিক মানুষ বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বহুমুখী মানস-শিকড় দিয়ে মানুষ আহরণ করে জীবনরস। তার মন-মননের পরতে পরতে রয়েছে হাজারো বছরের সঞ্চিত নানা সম্পদ। কখন কোন্ বিশ্বাস-সংস্কার, আদর্শ বা অভিপ্রায়ের প্রেরণায় মানুষের কোন্ ভাব, চিন্তা বা কর্ম অভিব্যক্তি পাচ্ছে, তা সহসা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য। তাছাড়া সমকালের সব পরিবেশ, ঘটনা, আচার সব মানুষের মনে ছায়াপাত করে না। তাই জীবনের সর্বতোমুখী চেতনা কোনো এক মানুষের চিন্তায়, কর্মে কিংবা আচরণে ধরা দেয় না।

এ-যুগেও পরিবেশ ও জীবন সম্পর্কে সচেতন মহৎশিল্পী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ্ কিংবা রাজনীতিকের রচনায় সমকালীন জীবনের ও ঘটনার সব খবর মেলে না। মনের প্রবণতানুসারে তুচ্ছ ঘটনাও কারো গুরুত্ব পায়, আবার গুরুতর বিষয়ও পায় অবহেলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাছাড়া দৃষ্টি আর বোধেও রয়েছে মাত্রাভেদ। জগৎ ও জীবনকে সর্বজনীন দৃষ্টি ও বোধ দিয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুভব করতেও পারে না কেউ। বিদ্যা-বুদ্ধি, বোধি-প্রজ্ঞা, বিশ্বাস-সংস্কার-আদর্শ নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা কিছুর প্রভাবে মানুষের দৃষ্টি ও বোধ নিয়ন্ত্রিত। কেউ অনপেক্ষ নয়, সবারই তাই রয়েছে রঙিন চশমা এবং আপেক্ষিক বোধ ও বিচারপদ্ধতি। মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ-সংস্কৃতির যা-কিছু চিত্র মেলে সবটাই আদর্শায়িত। রাজপুত্র-রাজকন্যার রূপকথাভিত্তিক কাব্যে নিম্নমধ্যবিত্ত কবি-কল্পনার সাহায্যেই রাজৈশ্বর্য ও রাজকীয় উৎসব-পার্বণ-অনুষ্ঠানাদি বর্ণনা করেছেন। তাই এসব রচনায় সর্বস্তরের মানুষের জীবন-জীবিকার বাস্তবচিত্র মেলে না। তবু যেহেতু বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা লোকশ্রুত জ্ঞান সম্বল করেই কবি কল্পনায় ত্রিভুবনে বিচরণ করেন, সেহেতু ফাঁকে-ফোকরে বাস্তবের আদল থেকেই যায়। যেমন মণিমাণিক্য হীরা জহরতের না হোক, কবি স্বচক্ষে সোনা রুপা পিতলের অলঙ্কার দেখেন, সোনার পালঙ্ক না হোক কাঠের তক্তপোষ তাঁর অদেখা থাকে না। রাজভোগ চোখে না দেখলেও উচ্চ-চিত্তের মহাভোগওথ অজানা াকে না।

শাহ মুহম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যপ্রণেতা। তাঁর কাব্যের উপক্রমে একটি রাজপ্রশস্তি মেলে :

> তৃতীয়এ প্রণাম করোঁ রাজ্যক ঈশ্বর
> বাঘে ছাগে পানি খাএ নিভয় নিডর।
> রাজ রাজেশ্বর মধ্যে ধার্মিক পণ্ডিত
> দেব অবতার নৃপ ধার্মিক বিদিত।
> মনুষ্যের মধ্যে যেহ্ন ধর্ম অবতার
> মহানরপতি গ্যেছ পৃথিম্বির সার।
> 'ঠাঁই ঠাঁই ইচ্ছে রাজা আপনা বিজয়
> পুত্র শিষ্য হন্তে তিঁহ মাগে পরাজয়।'
> মহাজন বাক্য ইহ পূরণ করিয়া
> লইলেন্ত রাজ্যপাট বঙ্গাল-গৌড়িয়া।
> রমণীবল্লভ নৃপ রসে অনুপমা
> কনে বা কহিতে পারে সে-গুণমহিমা।

এই অংশের তাৎপর্য অনুধাবন করে বিদ্বানেরা শাহ মুহম্মদ সগীরকে (সগিরী?) সুলতান সিকান্দর শাহর পিতৃদ্রোহীপুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহর (১৩৯১-১৪১০) কর্মচারী ও সমসাময়িক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। তার কাব্যে আল্লাহ বা স্রষ্টা অর্থে ধর্ম বহুল ব্যবহৃত হয়েছে, এও প্রাচীনতার তথা বৌদ্ধপ্রভাবের নিশ্চিত নিদর্শন। কাব্যখানির আবিষ্কর্তা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

বন্দনা : ১ করিম সত্তার পরবাদিগর দেবতা মনুষ্যরূপ সৃজিলা জগত আপনার
আপনার ইচ্ছাহে যেই করে ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান মহাধ্যান তদন্তরে যথ।

অন্যত্র : ব্রহ্ম/নিরঞ্জন/ঈশ্বর/ধর্ম/পুরুষ পুরাণ ব্যবহৃত।

২ দেবধর্ম আরাধি বহুল পুণ্য ফলে।
৩ ধর্মরূপ বিদিত স্বরূপ নর হৈল।
৪ ধর্মকে স্মরিয়া কন্যা হৈলা দণ্ডবৎ
৫ কুম্ভ 'পরে বলিলেন্ত ধর্ম অনুমতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬ ধর্ম উদ্দেশিয়া সাক্ষী করি চারিদিক
ধর্ম আজ্ঞা হৈলা তুহ্মি রাজ্য অধিকারী
৭ ধর্মপদ স্মরি করে সত্বরে গমন
৮ ধর্ম আজ্ঞা তোহ্মার পূরিব মনস্কাম।
৯ ধর্মপদে·ইউসুপ মাগন্ত যেহি বর
ততক্ষণে সেহি বর পাইলা সত্বর।
১০ মনে মনে ধর্ম আরাধন
১১ ধর্ম আরাধিয়া করে ঘরের আরম্ভ।
১২ বিনয় ভকতি করোঁ ধর্মরাজ পাএ।
১৩ তোহ্মাপুত্র কর্মে যে লিখিছে ধর্মে
১৪ ধর্ম ভাবি রহ মন।
১৫ ধর্ম নাম লই কিরা করিল শপথ।
১৬ ধর্মের প্রসাদ আছে পূরিলেক আশ।
১৭ জালিয়ার বোলে স্মরি ধর্ম নিরঞ্জন।
১৮ কহিলেন দেবধর্মপদে আরাধন
ধর্ম স্মরি ইউসুফে মাগিলা একবর।

AMARBOI.COM

সূফীতত্ত্ব : নিরঞ্জন মকারেত প্রেমে সে সৃজিলা
এহি লক্ষ্যে যথ জীব সৃজন করিলা।

মাতাপিতা : দ্বিতীয় প্রণাম করোঁ মা ও বাপ পাএ।
যা'ন দয়া হন্তে জন্ম হৈল বসুধাএ।
পিপিড়ার ভয়ে মাও না থুইলা মাটিত
কোল দিলা বুক দিয়া জগতে বিদিত।...
ন খাই খাওয়াএ পিতা ন পরি পরাএ

ওস্তাদ : ওস্তাদে প্রণাম করোঁ পিতা হন্তে বাড়
দ্বিতীয় জনম দিলা তিহঁ সে আহ্মার।

বাঙলা রচনায় পাপ ও ভীতি :
ন লেখে কিতাব কথা মনে ভয় পাএ
দূষির সকল তাক হই ন জুয়াএ।
গুনিয়া দেখিলুঁ আহ্মি ইহ ভয় মিছা
ন হয় ভাষায় কিছু হয় কথা সাচা।

উপমা : ইন্দ্র, বৃহস্পতি, কামদেব, বলি, কর্ণ, অপ্সরী, মদন, মুনি, পদ্ম, ডমরু, রামকদলী, শরৎচন্দ্র, সফরী, চাতক, দাদুরী ইত্যাদি।

আসবার : পালঙ্ক, কনক জড়িত পাট, কটোরা, সন্দুক, উয়ারী, উচ্চরন্ত টঙ্গী, মন্দির (গৃহ), থালাবাটি ইত্যাদি।
: টোন হতে অলক্ষিতে ছুটে যেন বাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি : তাম্বুল যোগাএ কেহো, বিচিত্র চামরে
: কেহো নৃত্য করে, কেহো বাহে কপিনাস

বসন : বহুল বিবিধ বাস/নাটি পাট শাড়ীলাস/চারিদিক অঙ্গ সুরচিত/অলঙ্কার :হীরার হার, শ্রবণে রতনমণি, অঙ্গুরী, চিত্রিত বসন, জরোয়া নথ (মুক্তা ও কনকনির্মিত), তাড়, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, নেউর (নূপুর), বলয়া, সিন্দূর, মেহেন্দী, নেতপাট শয্যা, চন্দন, কুঙ্কুম, আগর, রত্নাভরণ।

: পাট পাটাম্বর নেত কনকমণ্ডিত।

আদি মানবসমাজ পৌত্তলিক :

: কেহ বোলে এহি (ইউসুফ) ব্রহ্মারূপ প্রজাপতি
তান পূজা কৈলে হৈব মুক্তি পদ গতি।

দাসী : সহস্রেক দাসী দিব চন্দ্রমুখ অভিনব
মণিমুক্তা অলঙ্কার পুর।

[দাসী কেবল কাজের জন্যে নয়—কামচর্চার জন্যেও]

তৈজসপত্র যৌতুক :

কনকের বাটাবাটি বহু ভাণ্ড ঘট ঘটি
সুবিচিত্র ঝাড়ু, গাড়ু বর্গ
রতন প্রদীপ জ্যোতি সহস্র নক্ষত্র জিতি
যেহেন উঝল মণি স্বর্গ।
ভাণ্ডারের ধন ভরি রতন কাঞ্চন পুরি
মণিময় আভরণ সাজ
মাণিক্য প্রবাল মোতি হীরামণি নানা ভাতি
মূল্য নাহি ভুবনের মাঝ।

রথসজ্জা-কন্যা যাত্রা :

দশ সহস্র রথ সজ্জা তাহার উপরে ধ্বজ
রথ 'পরে বিচিত্র মন্দির
পুরি মাঝে অন্তসপট সুবর্ণ নির্মাণ ঘট
দ্বারে দ্বারে বসন প্রাচীর। (পর্দা)

আজিজ মিশির :

: কনক অম্বারী পরে চড়ি রঙময়/সুবর্ণমণ্ডিত ছত্র শিরের উপর।
: চারিদিক চামর দোলায় চমকিত।

বাদ্য : ১ দুন্দুভির শব্দে পূরিল দিগন্তর
ঢাক ঢোল দণ্ডি কাসি বাজত সুস্বর।
২ সানাই বিগুল বাজে বাঁশি করতাল।
৩ কবিলাস বিপঞ্চিক মন্দিরা মৃদঙ্গ তবলা বাজে দুন্দুভি-নিশান।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে বিবিধ বিশাল বিধান।

শিবির :

১ তাম্বু তাঙ্গি আজিজ রহিলা সেই স্থান
নৃত্যগীত বাদ্য বাজে বিবিধ বিধান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ নৃত্যগীত আনন্দে নাচএ নৃত্য করে।
৩ এ ঝাম ঝাঝঁরি ধ্বনি বাজে ঋণ কারে।
৪ নাচএ গাবএ ছন্দ মেলা।

পারিতোষিক [আজিজ মিশর] :
সভান প্রসাদ দিলা পিরীতি বচনে।

সমাজনীতি : তুহ্মি অকুমারী বালা জগতবিদিত
বিবাহ সম্বন্ধ আগে (স্বামী) দেখা অনুচিত।

বরের বাহন : চলিলেন আজিজ চৌদোলে আরোহণ।
ধ্বজ ছত্র পতাকা চলিল সারি সারি।

জোলেখার বিয়েতে আনুষ্ঠানিক আচার :
ব্রাহ্মণে পড়এ বেদ মন্ত্র উপচারি
কবিত্ব পড়এ ভাই পিঙ্গল বিচারি।
বহু গুণীগণ সঙ্গে রঙ্গ অভিলাষ
বিবাহ আনন্দ রঙ্গ মনেতে উল্লাস।

জন্মান্তর, অদৃষ্ট, নিয়তি :
১ তোর কর্মে লেখা আছে এ থেকে নিবন্ধ।
২ কর্মফল লিখিত তোহ্মার হেন জান।
৩ না জানোঁ কি আছে মোর কর্মেত লিখিত।
৪ বিধির নিবন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে।
৫ দৈবের নিবন্ধ আছে কর্মের লিখিত।
৬ মোর শুভদশা আছে কর্মের লিখন।

অভ্যর্থনা পদ্ধতি :১ আজিজের অন্তঃপুরে যথ নারীগণ
বাড়িয়া নিবারে আইল হরষিত মন।
ঘট-দীপ লৈয়া লোক হৈলা আগুয়ান
যুবক-যুবতী সবে ধরিল যোগান।
দোহান উপরে কৈলা পুষ্প বরিষণ
গুলাল চামেলী চম্পা সুবর্ণ গঠন।
রতন মণ্ডিত মালা কুসুম নির্মাণ
আজিজ জলিখা গলে করিল সন্ধান।

২ নারীরা কেহ সিঞ্চে নানা পুষ্প সুবাসিত গন্ধ
কার হাতে দূর্বাধান্য নানান প্রবন্ধ।
নৃত্যগীত আনন্দিত স্তুতি পড়ে ভাট।

ফুল ও ফল : আম, জাম নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গুলাল,
চম্পা, যুথী চামেলী গুলাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালক ইউসুফের সজ্জা :
মাথেত পাগড়ী দিলা অঙ্গেতে ভূষণ (তুল : কৃষ্ণ)

অবতার : মনুষ্যমূরতি এহি দৈব অবতার।

রাহাজানি : পন্থে বাটোয়ার সব আছে দুষ্টজন।

মুদ্রা : ১ তামার ঢেপুয়া লহ এই মূল্য তার (ইউসুফের)
২ বহুল সুবর্ণ মণি রতন প্রবাল
হীরা নীলা মাণিক্য মুকতা কসা লাল।
রত্ন মুকুতা প্রবাল হীরা চুনি মণি ধন।

বৈরাগী বেশ : মণ্ডন করিলা শয্যা তবল বিরলে
পাটাম্বর তেজি মৃগ-চর্ম পরিধান
পালঙ্ক ছাড়িয়া ভূমি করিল শয়ান।
ঘৃত মধু এড়িয়া বনের শাক ভক্ষ্য
নীলগঙ্গা তীরের ঘোফের মধ্যে বাস
সর্বক্ষণ সমাধি করএ মন উদাস।

দেবপূজা : যেন ইষ্ট দেবতা পূজএ নিতি নিতি।

নীতিশাস্ত্র : মহাদেবী যেন গুরু পত্নীর সমান
রাজপত্নী মাতৃতুল্য মোর অনুমান।

পক্ষী : কৈতর খঞ্জন পিক শুক-শারী শিখী
চকোয়া চাতক বর্ণ রাজহংস পাখী।

পান সুপারি : কাহাক খাওয়ায় কেহো কর্পূর তাম্বুল।

মিষ্ট খাদ্য : কনক কটোরা ভরি মধুমিষ্ট সুখে
জলিখা তুলিয়া দেন্ত ইসুফক মুখে।
ঘৃত মধু শর্করা বহুল দুগ্ধ দধি
সুধারসে পূরিত সন্দেশ নানা বিধি।

খোপা : বন্ধএ কানড়ী খোপা লাস।

সজ্জা ও প্রসাধন : শীষেত সিন্দূর, শ্রবণে গুম্ফিত মোতি রতন কুণ্ডল,
গীমাগত হীরাহার, বিরাজিত গজমোতি পাঁতি
কুস্তুরী কুঙ্কুম বিন্দু, কপালে তিলক চন্দ,
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ, কেশর, সুগন্দি সঙ্গ।
কাঁচুলি মণ্ডিত হার, করেত কঙ্কণবর,
কনক মাণিক্য জ্যোতি সার।
বাহু দণ্ডে তাড় তারি, চুনিমণি বিচিত্র নির্মাণ
অঙ্গুরী মানিক্য জুড়ি দশাঙ্গুলে ভরিপুরি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কটিত কিঙ্কিনী বাজে,
চরণে নূপুর বাজে, রঙ্গ বিচিত্র বাস
আগর চন্দর ফাগু সুবাসিত রঙ্গে।

নারী ও পুরুষ : অগ্নি ও তূলা, ঘৃত ও বহ্নি সদৃশ।
লোহা ও অসি, জতু ও অগ্নি (লোহা যেন অগ্নি পাই জতুক আকৃতি)

ঢুলনী : তার একশিশু তিন মাসের সুন্দর
শয়ন করিয়া ছিল ঢুলনী উপর।

শয্যা : ইসুফক দিলা যথ খাট, পাট পাটি
তুলি গাদি বসন ভূষণ বাটাবাটি।

যোগিক সাধনা—ইসুফ :

১ আপনার জ্ঞান ধ্যান সমাধি সংযোগ
সর্বক্ষণ এহি চিন্তা অল্প উপভোগ
জ্ঞান ধ্যান বিনু তান আন নাহি মতি
ধর্ম কর্ম বেদ মন্ত্র পরমার্থ গতি।

২ সর্বলোকে বলে এহি দেব অবতার
মহাসাধু সিদ্ধরূপ প্রকৃতি তাহার।

ছড়িদার : এ যুগের অগ্রগামী Surgeant
আজিজ মিসির যদি আরোহণ গতি।
দুই পাশে ছড়িদার চলে রঙ্গমতি।

হিন্দুয়ানী দাম্পত্য ধারণা :

শুন হে ইসুফ তুহ্মি হঅত তৎপর
জলিখা তোহ্মাক পত্নী জন্ম-জন্মান্তর।

পুতুল নাচ : পোতলা, নাচায় যেহ্ন সূতের সাতার
বাদিয়া আলোপে যেহ্ন সূত রাখি কর।

বাদ্যযন্ত্র : ১ বিয়াল্লিশ বাদ্যের ধ্বনি বাজে সুললিতে...

২ যথবাদ্য ভাণ্ড আছে সর্বরাজ্য দেশ
পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে পূরিয়া বিশেষ।
ঢাক ঢোল দণ্ডী কাঁসী দুন্দুভি নিশান
মন্দিরা মাদল ভাল তবল বিষাণ।
দোসরি মোহরি বাজে মৃদঙ্গ বহুল
শঙ্খনাদ শিঙ্গা ভেরী বাজএ তম্বুল।
জয়তুর স্বরমণ্ডল যন্ত্রতন্ত্র পূর
নৃত্যগীতে নৃত্যক নাচএ সেইপুর।
ঝনঝনি ঝাঁঝরি ঝুমুরি ঝনাকার
বাঁশী কাঁসী চোরাশী বাজন অনিবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানাই বিগুল বাজে ভেউর কর্ণাল
করতাল মন্দিরা বাজএ সুমঙ্গল।
বিপঞ্চী পিনাক বাজে অতি মৃদুস্বর
কপিলাস রুদ্র বাজএ নিরন্তর।

অলঙ্কার : কাঞ্চন দোছড়ি মল

বাহন : শিবিকা চৌদোল আরোহণ

বাদ্য ও বিবাহমঙ্গল :

দুই রাজ বাদ্যবাজে জয় শঙ্খধ্বনি
বিবাহ মঙ্গল গাহে দেবের রমণী।

উৎসবে মঙ্গলগান :

১ সুরচিত মঙ্গলা গাহেন্ত
২ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া মঙ্গল গীত গাহে
৩ এহিমতে মন্দুলা করিলা মহোচ্ছব।
৪ সুরূপী সুন্দরীগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ঘন
যেহ্ন মোতি ভূমি বিস্তারিত।

বাসরে : পুষ্পক পালঙ্গী' পরে দুহু প্রেম রস ভরে
সুখ শয্যা বাস নিরন্তর।

টঙ্গী : রচিলেন্ত এক টঙ্গী অন্তঃপুর থান
উষ্ণ দেবপুরী সম স্ফটিক নির্মাণ।
চন্দন আগর পাট শয্যা সুবলিত
স্তম্ভে স্তম্ভে রজত কাঞ্চন সুরচিত
চিত্রকারী বিচিত্র অক্ষর চমকিত
কাঞ্চনে রচিত বর জ্যোতি প্রদীপিত।
মধ্যে মধ্যে পাটাম্বর গুপ্ত ওড় আড়
অতি মনোরম ভাতি মুকুতা সঞ্চার।
তার মাঝে মাণিক্য প্রবাল তারা জ্যোতি
দেবের বৈকুণ্ঠ কিবা অপরূপ ভাতি।

অন্য টঙ্গী— একঘর আজিজে নির্মিছে মনোহর।
মণিরত্ন কাঞ্চন মন্দির পূর সাজ
বেড়া প্রতি কনক বিচিত্র চিত্র সার।
রক্তবর্ণ পাষাণ পূরিত বররাজ।

গর্ভকাল : দশমাস দশদিনে পুত্র উতপতি।

দুর্ভিক্ষে মানুষ বেচাকেনা :

ভক্ষ্য দিয়া আম্মা পুত্র-পরিজন
দাস-দাসী করিয়া রাখহ প্রাণ-ধন।
মিশ্রির সকল লোক হৈল দাস-দাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজদর্শনের কায়দা :

নবী বোলে দ্বারে ত রহিবা আগুয়ান
অন্তঃপুরে প্রবেশিকা আজ্ঞা পরমাণ।
নৃপতির মুখ দেখি করিবা প্রণাম
সচকিত ন হেরিবা নতু ডানবাম।
আশীর্বাদ করিয়া রহিবা ধৈর্যমান
আজ্ঞা হৈলে বসিবা আজিজ বিদ্যমান।
পুছিলে সে কহিবা বচন রত্নবান
বিস্তারিত ন কহিবা অল্প সমাধান।
ন বৈসে বিমুখ হৈয়া নৃপতি গোচর
সময় বুঝিয়া যাইবা নিজ বাসা ঘর।
নৃপতিক প্রকৃতি বচন তত্ত্ব জানি
কার সঙ্গে ন কহিবা বেকত কাহিনী।

আসন : বিচিত্র বসন আনি বিছাইলা সত্বর।
রাজ আজ্ঞাএ বসিলেন্ত দশ সহোদর।

আপ্যায়ন : ভৃঙ্গারের জল কোহ্ন সেবকে যোগাএ
চামর সমীর কেহো করে তান গাএ।
সুবর্ণের বাটা ভরি কর্পূর তাম্বুল
সুগন্ধি চন্দন আদি নানা বর্ণ ফুল।

সৈন্য : ক্ষেত্রী সব অস্ত্রধারী কবচ ভূষিত
ধনুর্বাণ খর্গ চর্ম সন্ধান পূরিত।...
দশ সহস্র ছড়িদার সচেতন রাজে ...
মণিময় কৃপাণ করেত সুশোভিত
চৌদ্দ অক্ষোহিণী সৈন্য করহ সাজন।

পিতা : বাপবাক্য যেহ্ন মহাবেদ।
পিতৃপদ সেবা কৈলে স্বর্গলোক গতি।

বেশ্যা নর্তকী : যত নৃত্য বেশ্যা আছে সুরূপ সুঠান
সুললিত নৃত্যগীত কর সাবধান।

মুসলিম মানস— আল্লার বাণী :

কাফের সকল মারি করহ অধীন।
মহামন্ত্র কলিমা ন কহে যেই জন
তাহার উপরে কর অস্ত্র বরিষণ।
কাফের মথিতে চলে মিশ্র অধিকারী।

নারীর অতিথি ও গুরুজন বরণ :

কার হাতে দূর্বাধান নানা পুষ্প পাতা ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানা দ্রব্য সঙ্গে করি মঙ্গল বিধান ...
সর্বতনু বসনে ঢাকিয়া আঁখিমুখ।
(ভৃঙ্গারের জলে)
বাপ পদ আপনে পাখালে নৃপমণি
জলিখা মস্তক কেশে উপস্কার কৈলা।

যোদ্ধৃবেশে রাজা : সুসজ্জ করহ সৈন্য যথ অশ্ববর
সুবর্ণ কৃমিজি জিন চড়াঅ পাখর।
বিশুদ্ধ সুবর্ণ মণি বিরচিত রথ...
বিচিত্র কনক মণিক কনক শোভিত।

মঙ্গলাচরণ : ভট্ট সবে স্তুতি পঠে জুড়ি দুই কর
স্বামী বরদাতা শিব
তবে কন্যা মহেশ পূজিয়া ততক্ষণ
ইবন আমিনের ভাবীপত্নী বিধুপ্রভা
অতিথি আইল জানি করিলা গমন।...

দৈববাণী : এহিস্থানে তোল টঙ্গী ঘর সুরুচির
তার মধ্যে থাকি শিব পূজহ ভকতি
তবে সে পাইবা জান তুম্মি নিজপতি।

কদমবুচি : চরণ বন্দিল তান শির পরে ধরি

বিধূপ্রভার স্বয়ংবর—কনে সাজ :
চিকুর কুচিত বেণী সিঁথিপাঁতি শোভা
অর্ধচন্দ্র আকৃতি মোহন তুল খোপা।
তিলক ভূষণ পত্রাবলী চারু সাজ
নক্ষত্র নিকর যেহ্ন শোভে দ্বিজরাজ।
তিলফুল জিনি নাসা মুকুতা মণ্ডিত।

খ. সৈয়দ সুলতান

নবীবংশ (১৫৮২-৮৪ খ্রি: মৎ-সম্পাদিত)

সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। আঠারো শতক অবধি চট্টগ্রামের কবিগণ তাঁকে বাল্মীকি ব্যাসের মতোই কবিগুরু বলে মানতেন। ষোলো শতকের চট্টগ্রামের মুসলিমসমাজ সৈয়দ সুলতান প্রভাবিত। তাই এ দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন।

বৈদিক যুগ থেকেই সুপ্রাচীন অনার্য সাংখ্য-যোগ তত্ত্ব ভারতিক ধর্মচিন্তায় ও অধ্যাত্মসাধনায় প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং বৌদ্ধ যোগতান্ত্রিক প্রভাবে হিন্দু শাক্ত-শৈব তন্ত্রমত গড়ে উঠেছে এবং পরবর্তীকালে মুসলমানরাও এ যোগ-তন্ত্র এড়াতে পারেনি। পনেরো শতক অবধি যে-তত্ত্ব আচরণের মধ্যে ছিল, তাই ষোলো শতক থেকে লিপিবদ্ধ হতে থাকে। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ-যোগীর কথা কেবল চর্যাগীতিতে নয়; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চৈতন্যচরিত, মঙ্গলকাব্য ও প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতিতেও যোগীর সন্ধান পাই। সমাজের সর্বক্ষেত্রে যোগী-সন্ন্যাসী-পীর-ফকিরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণই ছিল। কুতুবউদ্দীন আইবেক থেকে মীরজাফর অবধি দিল্লি ও বাঙলার সুলতানদের অনেকেরই জীবন পীর-ফকিরের পরামর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলোতে সন্ন্যাসীর ভূমিকা প্রায় অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ওহাবি ফরাইজি প্রভাবের পরেও আজকের দিনে শরিয়তি-মুসলমান পীর ও মারফতের মোহ ত্যাগ করতে পারেনি।

ষোলো শতকে বৈষ্ণব মতের উদ্ভবে যে ভাব-বিপ্লব দেখা দিল, তার প্রভাব গণমনের সংকীর্ণ ও ক্রূর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দূর করেছিল। উদার মানবিকবোধে বাঙালীর চিত্তের প্রসার এবং রুচির বিকাশ ঘটেছিল চৈতনোত্তর যুগের মঙ্গলকাব্যগুলোতে ও অসূয়া-মুক্ত আবহ সৃষ্টি করা তাই হয়েছিল সম্ভব। এসময় নিশ্চিতই রাধা-কৃষ্ণ লীলামহিমা বাঙালীর চিত্তহরণ করে। নরে নারায়ণ দর্শন কিংবা জীবে ব্রহ্মের স্থিতি অনুভব করা যুগের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সমাজে-ধর্মে ও রাষ্ট্রশাসনে আকবরের উদার নীতি এই বোধ আরো উজ্জীবিত করেছিল। তাই ষোলো শতক বাঙালী জীবনে ছোটখাটো রেনেসাঁসের যুগ।

এই শতক অনিবার্য কারণে বাঙলা সাহিত্যেরও সোনার যুগ। পনেরো শতকের বাঙলা রচনা বিচ্ছিন্ন ও বিরল প্রয়াসে সীমিত। কিন্তু ষোলো শতকের নব-বৈষ্ণবীয় উচ্ছল ভাববন্যায় বাঙালী হৃদয় প্লাবিত হয়ে ভাষা-সাহিত্যের আঙিনায়ও উপচে পড়েছিল। কবির সংখ্যাধিক্যে, সৃজনপটুতায়, রচনার প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে এ শতক গোটা মধ্যযুগের মধ্যমণি। ভাবে ভাষায় এবং রূপ ও চিত্রকল্পের স্বতোৎসারে এ শতকের সাহিত্য অনন্য। কিন্তু এ রেনেসাঁস একান্তই বৈষ্ণবের। এ প্রাণপ্রাচুর্য চৈতন্যদেবেরই দান। তাই অবৈষ্ণবরা এই বিপ্লব-বন্যায় বিমূঢ় ও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ষোলো শতকে অবৈষ্ণবের রচনা বিরল। এই বন্যায় প্রথম তোড় মন্দা হবার মুখে ষোলো শতকের শেষপাদে অবৈষ্ণবেরা সম্বিৎ ফিরে পেতে থাকে। কিন্তু তখন তাদেরও অজ্ঞাতে তাদের চিত্ত চৈতন্যদেবের প্রেমবাদে সমর্পিত। যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধদের যারা ইসলাম ও ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রচ্ছায় নিজেদের ধর্মমত প্রচ্ছন্ন রেখেছিল তারাও চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভদ্রর দোহাই দিয়ে রাধা-কৃষ্ণ লীলাবাদকে সম্বল করে নিল। এরাই নতুন বৈষ্ণব সহজিয়া। শাক্তসমাজে শক্তির বাৎসল্য ও করুণাময়ী রূপের প্রাধান্য, শৈবসম্প্রদায়ে 'ভোলানাথ' শিবের জনপ্রিয়তা, তান্ত্রিক কাঠিন্যে প্রীতিরসের প্রবণতা প্রভৃতি বৈষ্ণব প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল।

ষোলো শতকে চৈতন্যোত্তর কালে তথা ষোলো শতকের শেষপাদে আমরা নিশ্চিতরূপে দুইজন হিন্দুকবির সাক্ষাৎ পাই। দুইজনই রচনা করেছেন চণ্ডীমঙ্গল এবং উভয়েই চৈতন্য-চরণে আত্মনিবেদন করেছেন। দ্বিজ মাধব (বা মাধবাচার্য) তাঁর গঙ্গামঙ্গলের এক ভণিতায় বলেছেন :

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল
দ্বিজমাধবে কহে গঙ্গা মঙ্গল।

আর মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে চৈতন্য বন্দনা তো রয়েইছে।

পনেরো শতকের হিন্দুকবি বড়ু চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই আর ষোলো শতকের প্রথমপাদের কবি হচ্ছেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরদাস, শ্রীকরনন্দী, দ্বিজ শ্রীধর। এঁদের মধ্যে পাঁচজন সুলতান বা সামন্ত প্রতিপোষণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। অতএব এঁদের সাহিত্যিক প্রয়াস নতুন-গড়ে-ওঠা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রথম দান।

নতুন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দ্বিতীয় দান বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রয়াস, এবং হিন্দুমনে নতুন জীবন স্বপ্নের উদ্ভাস [গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজ্য হৈব হেন আছে :]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর তৃতীয় দান উত্তরভারতিক সন্তধর্মের অনুসরণে, সুফিপ্রভাবে দক্ষিণভারতিক অদ্বৈততত্ত্ব ও ভক্তিবাদের ভিত্তিতে নব অচিন্ত্যদ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব ও প্রেমবাদের উদ্ভব। চৈতণ্যের ব্যক্তিক মনীষায় এই নব অধ্যাত্মবাদ প্রচারিত হলেও, এ কোনো আকস্মিক অকারণ ঘটনা নয়। জন্মসূত্রে বিন্যস্ত সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের জীবন নিয়তির অমোঘ বিধানের মতো পৈতৃক পেশার নিগড়ের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত। ফলে পুরুষানুক্রমিক পীড়ন, দারিদ্র্য, তাচ্ছিল্য ও অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোনো উপায় ছিল না তাদের। এতে দেহ-মন ও আত্মার ওপর যে-জুলুম হত, নতুন কোনো আশার বা আদর্শের আলোর অনুপস্থিতির দরুন তা সহ্য করতেও তারা অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মুসলিম বিজয়ের ফলে তারা চোখের সামনে দেখল আজ যে ক্রীতদাস—বুদ্ধি, সামর্থ্য ও নৈপুণ্য বলে, কাল সে বাদশাহী তখ্‌ত অলঙ্কৃত করছে। দিল্লি ও গৌড়ে এই আজব কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। দেখতে পাচ্ছে সামান্যের মধ্যে রূপকথার নায়ককে। মানুষের আত্মপ্রসারের এই অনিঃশেষ ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে তারা ব্রাহ্মণ্যসমাজের বাঁধন ছিঁড়বার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল, মানুষ অবিশেষের জীবনের বিরাট সম্ভাবনার সন্ধান যখন একবার পেল, তখন তাদের ধরে রাখা দুষ্কর হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যসমাজ যতই বাঁধন শক্ত করতে চাইল ছিঁড়বার আশঙ্কা ততই বাড়ল। কিন্তু পাখি যখন নবদিগন্তের সন্ধান পেয়েছে, সে উড়বার চেষ্টা করবেই।

ব্রাহ্মণ্যবাদীর এ প্রয়াস যখন ব্যর্থ হল, তখনি চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে স্মৃতি ও শর্মাদ্রোহী সমাজগঠন আন্দোলন হল শুরু। এবং এ উদ্দেশ্য মোটামুটি সিদ্ধ হয়েছে। কেননা অন্যথায় যারা ইসলাম গ্রহণ করত, মুখ্যত তারাই বৈষ্ণব হল, যেমন সমাজে পতিত হওয়ার পর খ্রিস্টধর্ম বরণ করা ছাড়া যাদের অন্য উপায় রইল না, তারাই ব্রাহ্মমত সৃষ্টি করে নতুনে পুরানে সন্ধি ঘটিয়ে স্বধর্মের প্রচ্ছায় আত্মরক্ষা করল।[১]

বৈষ্ণবসাধন পদ্ধতিতে ও সামাজিক আচার-আচরণে ইসলামি রীতিনীতির হুবহু অনুকৃতি রয়েছে অনেক। তবু মানুষের চারিত্রিক স্খলনপতনকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, আর পতিতাত্মার জন্যে করুণাবোধ করা—বৈষ্ণবীয় উদারতার সুন্দরতম প্রকাশ।

অতএব, মুসলিম-সংস্কৃতির মোকাবেলায় দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে যা ঘটেছে, ষোলো-শতকে বাঙলায়ও একই ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক কারণে তা-ই ঘটেছে। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের সূচনা আগেই হয়েছিল, চৈতন্যদেবের মনীষা ও ব্যক্তিত্ব তাকে পূর্ণাবয়ব দিল। নতুন পরিবেশের প্রেক্ষিতে পুরোনো জীবনবোধ পরিবর্তনের যে বাস্তব ও মানস-প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল, তা এই উপায়ে সিদ্ধ হল। সবাই অবশ্য বৈষ্ণব হয়নি। কিন্তু এ সত্য অনস্বীকার্য যে, কেউই আর স্বধর্মে ও স্বমতে সুস্থির থাকতে পারেনি; অবচেতনভাবে বৈষ্ণবীয় উদার মানবিকতার প্রভাবে পড়েছে। তারা স্বস্থ থাকতে পারল না বটে, তাবে সুস্থ মানব-আবহ পেল। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজ সে উদারতা অবৈষ্ণবের মতো কাজে লাগতে পারেনি; যেমন শিখেরা পারেনি নানকের মত সমন্বয়ী উদার আদর্শকে ধরে রাখতে। তারা সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় উৎকণ্ঠ ও উগ্র হয়ে ওঠে। এবং এ উদ্দেশে তারা সংকীর্ণতাকেই সম্বল করে। আত্মরতি সর্বাবস্থায় পরপ্রীতির পরিপন্থী। কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও তা সত্য। শিখদের মতো বৈষ্ণবেরাও উদার দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে নবগঠিত সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণবিধি প্রণয়নে ও তাদের ধর্মতত্ত্বে আভিজাত্য আরোপ প্রচেষ্টায় সময়ের, শক্তির ও মনীষার অপব্যয় করতে

১ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ—ডক্টর সুশীল কুমার গুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। দৃষ্টি এমনি সংকীর্ণ লক্ষ্যে নিবদ্ধ হওয়ায় তারা নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির শিকার হয়ে রইল।[২] চৈতন্য ও তাঁর পারিষদের জীবনীগ্রন্থগুলো তাঁদের সংকীর্ণতার সাক্ষ্য বহন করছে। যেমন—বৃন্দাবন দাস অবৈষ্ণব হিন্দুকে 'পাষণ্ডী' বলেই জানতেন, বৈষ্ণবসুলভ বিনয় কিংবা সহিষ্ণুতাও তাঁর ছিল না। মনের মধ্যে তিনি সবসময় পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ ও দ্বেষপ্রসূত উত্তেজনা বহন করতেন। তাই একটি গালি তিনি ধূয়ার মতো আবৃত্তি করেছেন ঃ

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।

ফলে বিচ্ছিন্নতার ও স্বাতন্ত্র্যের আর-একটি প্রাচীর উঠল—মিলন-ময়দানের পরিসর আর-একটু সংকীর্ণ হল মাত্র। বৈষ্ণবেরা এভাবে যখন বাস্তবজীবন ও প্রয়োজনকে আড়াল করে পারলৌকিক জীবন-স্বপ্নে অভিভূত, এবং দৃষ্টি মাটি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আকাশে নিবদ্ধ করেছে, তেমনি সময়ে সৈয়দ সুলতানের আবির্ভাব।

সৈয়দ সুলতানের মনীষার বৈশিষ্ট্য এই যে,তিনি এ-প্রভাবে অভিভূত তথা লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এই প্রভাব স্বীকার করেও তিনি ইসলামি জীবন কামনা করেছেন। সূফিমতের অনুকূল ছিল বলে তিনি রাধা-কৃষ্ণ রূপকব্যবহারে দ্বিধা করেননি। অদ্বৈতসিদ্ধির লক্ষ্যে যোগপদ্ধতিকে সম্বল করে ইসলামের নৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার অনুসরণে জীবনচর্যা গ্রহণ করে তিনি ইসলামকে একটি বিবর্তিত স্থানিক রূপ দান করেছিলেন। পারিবেশিক প্রভাবেই দেশ-কালের সঙ্গে বিদেশাগত ধর্মের এমনি সামঞ্জস্য কল্পনাও যুগন্ধর ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

এবার যোগ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানধারণার পরিচয় নেয়া যাক। নবীবংশে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা—জানাইলা জ্ঞান।
কুমারীক যোগশাস্ত্র জানাই নৃপতি
কঠিন হৃদয় হেন মোমের আকৃতি।

আদি মানব আদমের তথা মানুষের দেহ-পরিচয় :

অধঃ রেত শিবশক্তি লিঙ্গেতে রহিল
নাভিদেশে পঞ্চবারি একত্র হইল।
দশমীর দ্বার থুইলা দশমীর পাট
চৌকি প্রহরী সব থুইলা ঘাট ঘাট।
অনাহত পঞ্চস্বরে বাজিবার তরে
লুকাই রাখিল তারে গহীন অন্তরে।
তিনশত ষাট শিরা দিলেন্ত টানাই
নাভিকুণ্ড দেশেত মিলিল সবাই(।)
সুষুম্নার মধ্যেত রহিল বড় থানা
হইবারে যত কিছু আওনাগমনা।
ইচ্ছা সুখে শিব-শক্তি জীবাত্মা দিলা।

---

২ *Bengal under Akbar &Jahangir* PP/P 118-19 T.K. Roy Chowdhury

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগী শিব : কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।
ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মুণ্ডের জটা ধরে
সর্পসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপরে।
বৃষ 'পরে আরোহণ ভস্ম দিলা অঙ্গে
প্রতিগৃহে ভিক্ষা নিত্য করিলেন্ত রঙ্গে।
দুই পাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা
কায়মনে সদায় করিলা পরিচর্যা

সমাজে যে যোগী-যোগিণীর প্রভাব ছিল তার প্রমাণ দুঃখিনী নারী বলেছে : (কাবিলের মৃত্যুতে)

ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি
একহাতে পাত্র আর করে দণ্ড বাড়ি।
অঙ্গেত লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।

অন্যত্র : সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

AMARBOI.COM

আমিষভোজনের কুফল :

খাইতে পশুর মাংস দেহ হএ জান ধ্বংস
অবোধে আত্মা পায় জয়।
দেহমধ্যে পঞ্চভূত আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

দেহতত্ত্ব : দেখন শুনন বাক্য জানন অপার
প্রভুর এ সব জান শরীর তোহ্মার।
সপ্তমআকাশ সপ্তপৃথিবীর মণ্ডল
একে একে আছে সব শরীরে সফল।
শিবশক্তি মূলাধার ধরে নাভিদেশ
সহস্রদলেত তোর করতার বেশ।
অনাহত দুমদমি বাজএ নিরন্তর
কনক মৃণাল পুষ্প তাত মনুহর।
ভালমতে শতদলে হৈছে প্রকাশ
নানা পুষ্প বিকাশ হৈছে চারিপাশ।
মধুপ ভ্রমরা তথা পাই দিব্যস্থান
কৌতুকে সদায় তারা করে মধুপান।

অদ্বৈত তত্ত্ব :

১. আদমের বাক্য শুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার মোর নহে ভিন এক অংশ পরিচিন
পিরীতি বড়হি মোর তার।

২. জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।
৩. জীবরূপ ধরি প্রভু বৈসে সর্বঠাম
সুচারু সুরূপ প্রভু ধরিছে উপাম।
ফটিকের অন্তরে যেন সুবর্ণের লত
কনক পত্রিকা পুষ্প বাহিরে বেকত।
আপনাকে আপনি চিনিতে পার যবে
প্রভু সনে তোহ্মার দর্শন হৈব তবে।
সর্বঘটে ব্যাপিত আছএ নিরঞ্জন
আপনার ঘটেত পাইবা দরশন।
আপনারে আপে যদি পার চিনিবার
নিশ্চয় দেখিবা তুহ্মি প্রভু করতার।
সর্বথায় পাইবা তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন।
৫. আহাদ আহমদ মহাসুর ভিন
এই মহাসুর মধ্যে ত্রিভুবন চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহাসুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।
আহাদ আহমদ পাইল দরশন
হইয়া ভাবক রূপ কৈলা নিরীক্ষণ।
আহমদরূপে, আপনা দেখা পাই
সাধক হইয়া রূপ রহিল ধেয়াই।
প্রীতিরসে মগ্ন হৈয়া প্রভু নৈরাকার
নুর মোহাম্মদক লাগিলা দর্শিবার।

(তুল : রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণ হয় চমৎকার, আস্বাদিতে সাধ ওঠে মনে)

আল্লাহর উক্তি :

আপনা অংশে আহ্মি সৃজিছি তোহ্মারে
তুহ্মি আহ্মি একত্রে আছিল অনুদিন
আহ্মা হোন্তে কথদিন হইয়াছে ভিন।

মুহম্মদের উক্তি :

১. কিবা এথা কিবা তথা তুমি সর্বময়
সভানের স্থানে তুহ্মি নাই তোহ্মার স্থান।
সভান ব্যাপিত হই আপনে রহিছ
মহিমার লাগি আর্শ কুর্সী সৃজিয়াছ।
২. প্রভুর পরমতত্ত্ব শুনি খদিজায়
সংসার অসার জানি মানে সর্বথায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

হিন্দুপুরাণের ও হিন্দুসমাজের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল গভীর। তিনি এ পরিচয় কাজে লাগিয়েছেন। ইসলাম যে আল্লাহর মনোনীত শেষধর্ম এবং মুহম্মদ-যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী, আর তাঁর আবির্ভাবের ফলে পূর্বেকার নবীগণ প্রচারিত শিক্ষা ও আচার-আচরণ-যে বাতেল হয়ে গেল; ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা-ই প্রমাণ করবার জন্যে তিনি হিন্দুর প্রধান দেবতা, অবতার ও ধর্মগ্রন্থে শয়তানের কারসাজিতে কী দোষ স্পর্শ করেছে তার বানানো কাহিনী বিবৃত করেছেন। সৈয়দ সুলতানের অনুসরণে পৃথিবীর বাসেন্দা পরম্পরার বিবরণ দেয়া হল :

প্রথমে দেও-দৈত্য তথা অসুরেরা সৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর অধিকার পেল। কিন্তু তাদের অনাচারে পৃথিবী পাপে ভার সইতে না-পেরে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাল, তখন :

ক্ষিতির যে নিবেদন শুনি প্রভু নিরঞ্জন
আদেশ করিলা সুর
তেজ সুর এ আকাশ চলি যাও ক্ষিতিপাশ
অসুরকে করিতে নিধন।

তারপর সুরাসরে ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হল। কালনেমি, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ প্রভৃতির পর দৈত্যেরা দেবতাদের হাতে পরাজিত হয়ে পালাল। সুরেরাও ক্রমে অনাচারী হয়ে পাপকর্মে লিপ্ত হয়। ফলে তাদেরও আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। অবশ্য তাদের মধ্যে :

পুণ্যের প্রভাবে রহিলেক কথজন
ক্ষিতিত আলোপি হই সদায় ভ্রমণ।

এর পরে ফিরিস্তারা নররূপ ধরে পৃথিবীতে বাস করতে লাগল। তারা —

চারি মহাজন স্থানে পাইল চারিবেদ।
সামবেদ ব্রহ্মাত পাঠাইলা নৈরাকার
তবে যদি বিষ্ণুর হৈল উৎপন
যজুর্বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন।
তৃতীয় মহেশ যদি সৃজন হইল
ঋক্‌বেদ তান স্থানে পাঠাইলা দিল।
চতুর্থে যদি সে হরি হইলা সৃজন
অথর্ব বেদ তাহানে পাঠাইলা নিরঞ্জন
এ চারি বেদেত সাক্ষ্য দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মোহাম্মদ ব্যক্ত হইবার।

[স্পষ্টত ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর কবি এই নামক্রম মেনেছেন এবং বিষ্ণু ও হরির (কৃষ্ণ) পৃথক ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেছেন।]

শিব পরমযোগী। তিনি —

কথকাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান মুণ্ডে জটা ধরে
সর্পসনে মুণ্ডমালা কণ্ঠের উপরে।
বৃষ'পরে আরোহণ ভস্ম দিল অঙ্গে
প্রতিগ্রহে ভিক্ষা নিত্য করিলেন্ত রঙ্গে।
দুইপাশে আছিলেক তান দুই ভার্যা
কায়মনে সদায় করিলা পরিচর্যা।

এহেন যোগীশিব সুরাপান করে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে—

দুহিতারে পত্নীরে দেখিয়া একাকার
বিচলিত হৈল মনে করিতে শৃঙ্গার।

কাজেই তিনি ব্রতভ্রষ্ট হলেন। তাঁকে দিয়ে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ হল না।

তারপর এলেন সোম। তিনিও গুরুপত্নীর সঙ্গে শৃঙ্গার করে দেহে সহস্র ভগচিহ্ন লাভ করলেন। এসব অনাচার ও পাপের ফলে পৃথিবীতে জল প্লাবন হল। (তুল : নবী নুহ্‌র সময়কার প্লাবন) নুহ্‌র মতো ধার্মিক মুনি নৌকা তৈরি করিয়ে তাতে আশ্রয় নিলেন, এভাবে সৃষ্টির পবিত্রাংশ রক্ষা পেল। তারপর কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বিষ্ণু প্রভৃতি অবতারের আবির্ভাব ঘটে। এসঙ্গে হিরণ্যকশিপু ও বলিরাজ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

অবশেষে হরি আবির্ভূত হলেন।

সে হরির সনে রহি ইব্লিস দুর্বার
ধরিয়া আছিল পাপী মুনির আকার।
ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

ফলে হরি কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং ব্রত ভুলে নারীসম্ভোগে কাল কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ্ রুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন ফিরিস্তাকে—

রাখ নিয়া বেদশাস্ত্র জলের মাঝার।

কিন্তু ইব্লিস দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত হয়ে কপিকে দিয়ে জল থেকে 'বেদ' উদ্ধার করাল এবং 'আপনা আচার যথ তাহাত লেখিল।'

এভাবে, পাপিষ্ট ইব্লিসে যদি বেদ পরশিল
নিরঞ্জনে বেদ হোন্তে তেজ হরি নিল।

ইতিপূর্বে বেদমন্ত্রের এমনি মাহাত্ম্য ছিল যে—

একালে কাটিয়া বৃষ খাইত ব্রাহ্মণে
বেদমন্ত্র পড়ি পুনি জিয়াইত তখনে।

এমনি করে ঐশ শাস্ত্র 'চর্তুবেদ' বাতেল হয়ে গেল। কাজেই এখন ভারতীয়দেরও সত্যধর্ম হবে ইসলাম। বিশেষ করে—

এ চারি বেদেত সাক্ষী দিছে করতার
অবশ্য অবশ্য মুহম্মদ ব্যক্ত হইবার।

এদেশে কবি এমনিভাবে শেষনবীর আবির্ভাব ও ইসলামের অপরিহার্যতা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কবি দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের উপযোগ এবং এদেশের জনগণের ইসলাম বরণের যৌক্তিকতা উপরোক্ত কাহিনী ও যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। লক্ষণীয়, আরবের ইসলাম-যে ভারতের সত্যভ্রষ্ট জনগণের জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে এমনি একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা দেবার চেষ্টাও আছে। পক্ষান্তরে বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই, দ্বিজমাধব, মুকুন্দরাম প্রভৃতি হিন্দুকবিগণ দেশের অধিবাসী মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেই উভয় জাতির সহাবস্থান কামনায় পারস্পরিক মত-সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে মিলনসেতু রচনার প্রয়াসী ছিলেন। তাই কালকেতুর গুজরাট রাজ্যের পশ্চিমাংশে মুসলিমপ্রজা উপনিবিষ্ট হয়েছে। তারা সাধারণভাবে সৎস্বভাব, শান্তিপ্রিয় ও স্বধর্মনিষ্ঠ। হোসেনহাটির কাজী যদিও হিন্দুবিদ্বেষী, সাধারণ-মুসলমান কিন্তু হিন্দুপীড়নে উৎসুক নয়। কাজী অবশ্য এ বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার বিষময় পরিণাম শেষে উপলব্ধি করেছে।

মুঘলবিজয়ের পর দেশে অর্ধশতাব্দী অবধি (১৫৭৫-১৬২৫)আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না, স্থানীয় ভুঁইয়াদের আনুগত্য লাভ করবার জন্যে মুঘলদের অনবরত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারপরে সতেরো শতকে মঘ-পর্তুগিজ দস্যুর উপদ্রবে বাঙলার সমুদ্রোপকূলাঞ্চল এবং নদীতীরস্থ গ্রাম উচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১] আঠারো শতকে শুরু হয়েছিল বর্গীয় উপদ্রব অভ্যন্তরীণ শাসন-শৈথিল্য এবং পীড়ন।[২] সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর যখন এমনি হামলা চলছিল, তখনো চৈতন্যের ও আকবরের উদার মান-বিকবোধ হিন্দু-মুসলমানকে দুর্দিনের দুর্যোগে একই মিলন ময়দানে জড়ো করেছে। সেদিনের অসহায় অজ্ঞ মানুষ জীবনের মমতায় জীবন ও জীবিকা নিরাপত্তার জন্যে নতুন দেবতার আশ্রয় খুঁজেছে। এভাবে মুখ্যত সত্যপীর তথা সত্যনারায়ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নতুন স্থানিক উপদেবতা গোষ্ঠী যাদের প্রতি আনুগত্যে নিরাপত্তার সন্ধান করেছে গণমানব। সুখের দিনে মানুষ স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদালোভী হয় দ্বন্দ্বে বিবাদে উৎসাহ বোধ করে আর দুঃখের অভিঘাতে দুঃখীমানুষ বেঁচে থাকার অবচেতন-প্রেরণায় অগণিত সামাজিক ও আচারিক বাধার প্রাচীর অতিক্রম করে মিলিত হবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। সেই আগ্রহের চিত্র পাই সত্যনারায়ণ পুথিতে, রায়মঙ্গলে, কালুগাজী চম্পাবতীর কেচ্ছায় ও জয়দ্দিনের গাজীনামায়। অতএব, ষোলোশতকে দুঃখীগণমনে যে-শুভবুদ্ধির সূচনা তাই প্রশাসনিক অব্যবস্থায় ও আর্থনীতিক অনিশ্চয়তায় গভীর, ব্যাপক ও দৃঢ়মূল হতে থাকে। আচারিকবিভেদের প্রাচীর ভেঙে স্বাতন্ত্র্যের বাঁধ লোপ করে নতুন লৌকিক দেবতার মন্দির চত্বরে একে অপরের প্রতি প্রীতি রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন পুরোহিত আর মোল্লায় বিরোধ ছিল না, কাফেরে যবনে ভেদ ঘুচে গিয়েছিল সত্যপীরের সিন্নি চণ্ডালে ব্রাহ্মণে যবনে পাশাপাশি বসে খেলো আর হাত মুছল মাথায়। ছোঁয়াছুঁইর অনাচারের কথা আর কারো মনে জাগল না।

সৈয়দ সুলতানের দৃষ্টিতে হিন্দুসমাজ :

যোগীরা পদ্মাসনে বসে যোগসাধনা করত। তারা বায়ু ভক্ষণ করেই দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করতে পারত।

কথা কাল পদ্মাসনে সাধিলেক যোগ
বায়ু ভক্ষি রহিলা তেজিয়া উপভোগ।

যোগীরা কানে কড়ি পরত, অঙ্গে ভস্ম মাখত, একহাতে ভিক্ষাপাত্র তথা করোটি ও অপর হাতে লাঠি ধরত এবং দেশ পর্যটন করে বেড়াত। আর সিদ্ধারা থাকত অনাহারে।

---

১ Hist. of Bengal

২ মহারাষ্ট্রপুরাণ, Times of Ali Vardi

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরিমু যোগিনীবেশ কর্ণে নিমু কড়ি
একহাতে পাত্র আর করে দণ্ডবাড়ি।
অঙ্গে লিপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ।
সিদ্ধা সম অনাহারে থাকি প্রতিদিন।

দৈবজ্ঞরা পাঁজি দেখে অঙ্ক কষে ভাগ্য গণনা করত :

পাঁজিমেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক।
শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

দেবতার পূজা ও বলিদান :

লক্ষ লক্ষ অজ আনি সমুখে রাখএ
তুহ্মি ব্রহ্মা তুহ্মি বিষ্ণু মূর্তিরে বোলএ।

এয়োরা শীষে সিন্দূর পরে :

শিষের সিন্দূর মুছি কৈলা দূর।

বৌদ্ধ অহিংসবাদ তখনো যোগীদের মধ্যে প্রবল। তাই আমিষ খাদ্যের কুফলের সংস্কারও অবিলুপ্ত :

আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন
না করিব এসব অধর্ম
খাইতে পশুর মাংস দেহ হএ জ্ঞান ধ্বংস
অবোধ আত্তমা পায় জএ
দেহমধ্যে পঞ্চভূল আছএ যক্ষের তুল
বলবীর্য তাহার বাড়এ।

সূর্যপূজারী সৌর-সম্প্রদায় তখনো লোপ পায়নি :

অনুদিন দিবাকর পূজে নরগণ।
উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।

নিম্নবর্ণের লোকের হীনমন্যতা :

নারী বোলে আহ্মি হই ধীবরের জাতি
আহ্মাতু অধিক হীন নাহি কোনো জাতি।

ব্রাহ্মণের উপবীত ধারণ অনুষ্ঠান :

প্রথমে ললাটে তোর মূরতি লেখিমু
দ্বিতীএ তোমার কান্ধে পৈতা চড়াইমু।
তৃতীএ যথেক আছে আচার আমার
একে একে করাইমু সেসব আচার।
চতুর্থে করাইমু তোরে স্থান তপন
পঞ্চমে করিমু তোরে অনল দাহন।
পরলোকে তবে যে তোহোর ভালগতি।

এদেশের মুসলমানেরা কাফের বলতে আরবের ও এদেশের কাফেরকে অভিন্ন জেনেছে। তাই কবিগণ নবীদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাফেরদেরকে এদেশী হিন্দুর আদলে এঁকেছেন। কাফেরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে-চিত্র পাই তাঁদের বর্ণনায় তা আমাদের হিন্দুসমাজেরই ছবি। এর কিছুটা চৌদ্দশ' বছর আগেকার পৌত্তলিক আরব সম্বন্ধে ধারণার অভাবপ্রসূত আর কিছুটা নতুন পরিবেশে হিন্দু-পৌত্তলিকতার মোকাবেলায় ইসলামের মাহাত্ম্যপ্রচারের সচেতন অভিপ্রায়জাত। 'মূরতি পূজিতে নিষেধিবারে কারণ পৃথিম্বিত নবী সকলের হৈল সৃজন।' ফলে সৃষ্টি পত্তন আদম সৃষ্টি থেকে শুরু করে শেষনবী মুহম্মদের ওফাত অবধি বর্ণিত ঘটনায় দেশী কাফেরের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও বিশ্বাস-সংস্কার সর্বত্র বিম্বিত হয়েছে। ফলে ভারতিক ঐতিহ্য দুইভাবে ব্যবহৃত হয়েছে—একটি মুসলিম সংস্কারের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে, অপরটি পরিহার্য কুফরী বলে নিন্দিত হয়েছে। এভাবে আমরা আরবীয় আবহের বিনাশে একটি অকৃত্রিম ভারতীয় পরিবেশ পাই।

এতে শাসকজাতিসুলভ প্রাণময়তা, জিজ্ঞসা ও অসূয়াহীনতাও কিছুটা মুসলিম মনে ছিল বলে মনে করি। পক্ষান্তরে শাসিত হিন্দুমনের বিরূপতা মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ রেখেছিল বলেই মনে হয়। নইলে মুসলমানেরা সংস্কৃত সাহিত্যে ও হিন্দুপুরাণে যতখানি জ্ঞান লাভ করেছিল, ফারসিভাষার মাধ্যমে হিন্দুর মুসলমানি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ আরো বেশী হয়েছিল, কিন্তু বাঙলাদেশে হিন্দুরা মুসলমানের আচার-আচরণ শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে বুঝতে যে চেয়েছেন, তার প্রমাণ বিরল। অপরদিকে মুসলমানেরা ভাষার ও রূপপ্রতীকে হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুঐতিহ্যর বহুলব্যবহার করেছে।

এর অন্যতর কারণ হয়তো এই যে, অশিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান বাঙালী অবিশেষের জন্যে বাঙলা সাহিত্য রচনা করতে যেয়ে মুসলমান লেখক ভারতের Clssic ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতকে হিন্দুদের মতোই আদর্শ ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

জনসাধারণের অপরিচিত আরবি-ফারসি শব্দ, অলঙ্কার ও প্রতীকের আশ্রয় নেননি। যাদের জন্যে লেখা, তাদের অজ্ঞাত অলঙ্কার ও প্রতীক প্রয়োগে রচনা ব্যর্থ হত। খ্রিস্টান য়ুরোপ যে গরজে ও যে মনোভাব নিয়ে সাহিত্যে Pagan Greek ও Latin উপাদান গ্রহণ করেছে, মুসলমান-লেখকেরা অনুরূপ কারণে অতিপরিচিত সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উপাদান নিয়ে বাঙলায় সাহিত্যসৌধ গড়ে তুলেছেন। অতএব, একে হিন্দুয়ানি প্রভাব বলা অসমীচীন। এ হিন্দুসংস্কৃতির প্রভাব নয়—দেশী উপাদান গ্রহণ।

সৈয়দ সুলতান বিষয় ও উদ্দেশ্যানুগ প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুপুরাণের কাহিনী ও রূপকল্পের বহুল ব্যবহার করেছেন।

আদম সৃষ্টির পূর্বাবস্থা বর্ণনায় কবি হিন্দুপুরাণকে অবলম্বন করেছেন। অবশ্য তাঁর অজ্ঞতা ও আনাড়িপনার ছাপও সর্বত্র দৃশ্যমান। আগেকার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-হরি-সোম প্রমুখ নবীরা কীভাবে ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে আল্লাহ-নির্দেশিত ব্রতভ্রষ্ট হয়েছেন এবং তাঁদের নবুয়ত ব্যর্থ হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষনবী মুহম্মদের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা এবং আপামরের ইসলাম বরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেছেন।

রূপপ্রতীকে হিন্দুপুরাণের ও রামায়ণ-মহাভারতের এবং ভারতিক উপমাদি ব্যবহার :

১. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি।

২. কস্তুরীচন্দন অঙ্গে করহ লেপন।
চন্দ্রিমার জোত মো-ত লাগে হুতাশন।

৩. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে।

৪. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।
৬. গাভীর গোবরে যথা করএ লেপন।
৭. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।
৮. পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষ দানবে নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।
৯. গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।
১৯. ঈষৎ হাসিয়া কহে চাণক্য বচন।
১১. পাতালেত গিয়া দিমু লুক।
১২. দ্বিতীয় আকাশ প্রভু সৃজিলা হীরার
বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাঝার।
১৩. কালনেমি আদি যথ অসুর দুর্বার
শুম্ভ নিশুম্ভ আর মুণ্ড দুরাচার।
১৪. পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

নবীবংশে সমাজ ও সংস্কার

চট্টগ্রামে সৈয়দ সুলতানের মানস যে -পরিবেশে লালিত হয়, তা এই :

ক. রাজনীতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরাকান, গৌড় ও ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় তো ছিলই, তাছাড়া ছিল পর্তুগিজ শাসন ও পীড়নের অভিজ্ঞতা।

খ. ধর্মের ক্ষেত্রে শৈব-শাক্ত-তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, থেরবাদী-তান্ত্রিক বৌদ্ধমত, যোগ প্রভাবিত মারফৎ-প্রবণ ইসলাম, প্রচারশীল গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মই ছিল উল্লেখ্য। তখন হিন্দু ও মুসলিমের সংখ্যাই ছিল বেশি, বৌদ্ধের সংখ্যা স্বল্প এবং খ্রি.স্টান ও বৈষ্ণব তখনো নগণ্য। কিন্তু তাদের মতবাদ ছিল প্রভাবশীল ও প্রসারমুখী।

গ. চট্টগ্রাম বন্দর আজকের মতোই ছিল নানাদেশী বহুমানবের মিলন ময়দান। পর্তুগিজদের উৎসাহে তখন চট্টগ্রাম নতুনতর ভাব, চিন্তা ও পণ্যের প্রবেশদ্বার। ভূয়োদর্শনজাত উদারতা, বিচিত্র মানুষ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারণাপ্রসূত পরমতসহিষ্ণুতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ দূরদৃষ্টি, নাগরিক সৌজন্য প্রভৃতি তাদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে লাবণ্যমণ্ডিত করেছিল, প্রসারিত করেছিল তাদের মনের দিগন্ত। বিশেষ করে তখন মুসলিম সমাজে শুরু হয়েছে শাস্ত প্রবর্তনার যুগ। শরিয়তি ইসলামকে জানবার বুঝবার আগ্রহ জেগেছে মুসলিমসমাজে এবং চৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমবাদের প্রভাবে হিন্দু সমাজে জেগেছে 'নরে-নারায়ণ' এবং 'জীবে ব্রহ্ম' প্রত্যক্ষ করার ঔৎসুক্য। চৈতন্য মতের প্রভাব নানা কারণে সর্বাত্মক হয়েছিল। এতে মানুষ ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা অকস্মাৎ বহুগুণে বেড়ে গেল। মানুষ হৃদয়বান হবার উৎসাহ পেল; দীক্ষা পেল মানুষের ক্রটি ও পতনকে এক সহিষ্ণু ও ক্ষমাসুন্দর সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার।

আগেই বলেছি, বাঙলার প্রতিবেশে লালিত কবি সৈয়দ সুলতান সুদূর আরবের আবহ নির্মাণে ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্য হিন্দুপুরাণ, দেশজ আচার-সংস্কার এবং এদেশের সামাজিক, নৈতিক ও পার্বণিক জীবনের আলেখ্যই আরবী জীবনের বিনামে চিত্রিত হয়েছে।

ক. তাই আদম-হাওয়া বাঙালী গৃহস্থ ও গৃহিণীর মতোই সংসার করেন। আদমের চাষাবাদের জন্যে ফিরিস্তা–

বৃষ সঙ্গে লাঙ্গল যুয়াল আনি দিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈষ কুঁটি লাঙ্গল যে তাতে শোভে ফাল।
সাপটা আনি জিব্রাইলে দিলেন্ত ততকাল
এক গাভী আনি দিল দুগ্ধ খাইবার।
কেহ নে বৃষ গাভী, কেহ নে তণ্ডুল

এই চরণগুলো শিবায়ণের শিবের কৃষিকর্মের উদ্যোগের চিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। হাওয়া বিবিও 'সন্দেশ সিদ্ধ করিতে লাগিল' এবং 'সিদ্ধ হৈল সন্দেশ দেখিয়া অনুপাম' স্বামী-স্ত্রী দুজন পরমতৃপ্তির সাথে আহার করলেন। এ যেন হর-পার্বতীর সংসার! আদম-হাওয়ার প্রেমও গভীর। এ যেন নাটকের নায়িকা। আদম হাওয়াকে বলছেন :

তোমার দরশনে মোর নয়ন চকোর
রহিছে অমিয়া আশে হই মতি ভোর।

হাওয়াও তখন : বঙ্ক নয়ানে হেরি ঈষৎ হাসিল
ভুরুযুগ কটাক্ষে শর সান্ধি মারিল।
হাওয়ায় আদম মন-পক্ষী কৈলা বন্দী।

খ. সৈয়দ সুলতানের সমকালে ইসলাম ছিল মারফত-ঘেঁষা। জ্ঞানপ্রদীপ প্রসঙ্গে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। এই মারফত-তত্ত্ব একান্তভাবে ইসলামি ছিল না। এর ভিত্তি ছিল যোগ ও দেহতত্ত্ব। তাই 'রসুলে আরব সব করি মুসলমান/যোগপন্থা জানাইলা জানাইয়া জ্ঞান।'

কিংবা ওমর বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

হিন্দুর মধ্যে দেখি সূর্যপূজা, বলিপ্রথা এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা প্রভৃতি। এটি নিশ্চিতই গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবের সাক্ষ্য।

সৈয়দ সুলতান এই নবমতের প্রচার ও প্রসার স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন হোলিউৎসব, শুনেছেন কীর্তন। তাই গোপী-কৃষ্ণ প্রণয়লীলার এমন জীবন্ত ও মনোরম বর্ণনা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

গ. সমাজে মৃতের কল্যাণে দান-খয়রাত ও শ্রাদ্ধ-জেয়াফত প্রভৃতির রেওয়াজ ছিল:

পাপের কারণে দান ধর্ম বহু পুণ্য কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিল।

ঘ. ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষীর প্রভাব রাজদরবার থেকে কুটির অবধি সর্বত্রই সমান ছিল :

পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

ঙ. মুসলিম সমাজেও পণ ও যৌতুক দানের প্রথা ছিল। ফতেমার বিয়েতেও রসুল যৌতুক দিলেন। মুসানবীও বিয়ে করে যৌতুক পেলেন। মুসাকে :

শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।

চ. শুভকর্মে তিথি-নক্ষত্র ক্ষণ লগ্ন মানা হত :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভানের বিদ্যামান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

ছ. পর্দাপ্রথায় শৈথিল্য ছিল না। পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলাও ছিল নিষিদ্ধ।
মুসাএ বুলিলা তুহ্মি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ন নারী দেখিবারে উচিত না আছে।

জ. মুসলিম সমাজে কদমবুসিও চালু ছিল :
পাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।

ঝ. পিতৃভক্তির মহিমাও ছিল পরশুরামের কালের মতো
জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়াএ

ঞ. আতিথেয়তাকে ধর্মাচরণের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হত :
কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জাএ
এহ লোকে পরলোকে অতি দুঃখ পাত্র।

ট. মূর্তিপূজা, পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, গুরুনিন্দা এবং কোনো লোককে ছলে দাসে পরিণত করা ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে বিবেচিত হত :
প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ।
ভিন্নজন প্রকারে যদি যে করে দাস
আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস।
–এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।
গুরুনিন্দা করে যেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।

ঠ. মানুষ সাধারণভাবে দৈবনির্ভর কুসংস্কারপ্রবণ দারু-টোনা আর তুক-তাক ও ঝাড়-ফুঁকে এবং অশুভ লক্ষণে বিশ্বাসী ছিল। সে-বিশ্বাস আজো অম্লান :
১. দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন।
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

— এসব অশুভ লক্ষণ।
২. বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।
৩. ফিরিস্তা সকলে তন্ত্রমন্ত্র শিখাইলা।

ড. সেকালে গুরুগৃহে থেকে লেখাপড়া করতে হত, বারোয়ারি টোল-মাদ্রাসা ছিল বিরল। তাই সাধারণত একক গুরু-উস্তাদের কাছে লেখাপড়া করতে হত। নবী ইদ্রিসকে তাই তাঁর মা 'পড়িবারে উপাধ্যায় হাতে সমর্পিলা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারীশিক্ষাও ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের কোরআন পাঠ করার মতো শিক্ষাদানে মুসলমান সমাজে উৎসাহের অভাব ছিল না কোনোদিন। উদার পিতামাতার কন্যা উচ্চশিক্ষাও পেত। রসুলচরিতে এক নারীর সম্বন্ধে শুনি : 'সে নারী পণ্ডিত ছিল যথ মর্ম বুঝি পাইল।'

ঢ. মুসলমান সমাজেও কৌলীন্য-চেতনা ছিল। তবে তা কেবল জন্মসূত্রে লব্ধ নয়, কর্মগৌরবে লভ্য। শিক্ষায় ধন, ধনে কৌলীন্য। অতএব, আজকের মতোই মুসলমান সমাজে (এবং হিন্দু সমাজেও) কাঞ্চনকৌলীন্যের মর্যাদা সর্বোচ্চে :

ধন হোন্তে অকুলীন হয়ন্ত কুলীন
বিনি ধনে হএ যথ কুলীন মলিন।
ধন হোন্তে যথ কার্য পারে করিবার।

তুলনীয় :

অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
অকুলীনে ঘোড়ায় চড়িব কুলীনে ধরিব জীন।

কবির মুহম্মদ খানের 'সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ' গ্রন্থে পাই :

ধনহীন দাতার বিপদে মনে দুখ
ধনবন্ত কৃপণে ভুঞ্জএ নানা সুখ।
নির্ধনী হইলে লোক জ্ঞাতি না আদরে
ফলহীন বৃক্ষে যেন পক্ষী নাহি পড়ে।
ধনহীন স্বামীপ্রতি প্রেম ছাড়ে নারী
মধুহীন ফুল যেন না লএ শুক-শারী।
ধনবন্ত মূর্খক পূজএ সর্বলোক
ধন হোন্তে মান্যজন যদ্যপি বর্বর।

(সত্য ও কলির তর্ক)

হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও কোনো কোনো বৃত্তিবেসাত ঘৃণ্য ছিল। যেমন:

নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
আমাতু অধিক হীন নাহি কোনো জাতি।

কথায় কথায় লোকে বংশগৌরবের গর্বও প্রকাশ করত :

ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আমি দুইভাই।

ণ. বিবাহোৎসবে মারুয়া বাঁধত, জলুয়া দিত আর গন্ত ফেরাত এবং সহেলা গাইত। তেলোয়াই দিত এবং 'যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিত লেপন।' মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা, আঙুর, খোর্মা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট আহার্য বলে গণ্য হত। সাবান ছিল না বটে, কিন্তু স্নান কালে—

অগুরু, চন্দন, আতর, কাফুর, কেশর
লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর।
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।

আর স্নানান্তে 'আবার যথেক সুগন্ধা আছে অঙ্গেত লিপিত' এবং 'সুর্মা-কাজল দোহ নয়ানেত দিত'। এছাড়া, বাজি পোড়াত, নাচগান চলত, নানা বাজনা বাজত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব ছাড়াও নারীর আভরণ, যুদ্ধাস্ত্র, ফুল, বাজি, প্রসাধনসামগ্রী, শাড়ী, কাঞ্চুলি প্রভৃতির কথাও স্থানে স্থানে রয়েছে।

আর যেসব উল্লেখ্য বিষয় রয়েছে তার কিছু কিছু এখানে উদ্ধৃত হল :

নারীর আব্রু :

মুছাএ বুলিলা তুমি হাঁট মোর পাছে
ভিন্ননারী দেখিবারে উচিত না আছে।

কন্যা সম্প্রদান :

ক. শুভক্ষণে বৃদ্ধ নবী কন্যা কৈলা দান
বস্ত্র-অলঙ্কার দিলা বিবিধ বিধান।

খ. সভানের আগে যে পড়এ কোরান
বিভা দিবা ফাতেমারে সেই বীর স্থান।
তবে সভানের মধ্যে কোলাহল ভাঙ্গিব
যে আগে কোরান পড়ে সে জনে পাইব।

শুভলগ্ন : সভানের বিদ্যমান দুহিতা করিলা দান
লগন পাইয়া শুভক্ষণ।

বিবাহোৎসবে :

ঘ. সখীসবে কুমার কুমারী পাটে তুলি
জলুয়া দিলেন্ত দিয়া করি হুড়াহুড়ি।

দৈবজ্ঞ, অদৃষ্ট : পাঞ্জি মেলি দৈবজ্ঞে চাহিএ একে এক
শুনিয়া বিপ্রের কথা চমকি উঠিলা।
...শুনি দ্বিজে অঙ্ক দিয়া চাহে।

লোকাচার : ক. কুকুরের লোম যথা পড়িয়া থাকএ
সেই স্থানে ফিরিস্তা সকল না মিলএ
গাভীর গোবর যথা করএ লেপন
সেইস্থানে ফিরিস্তার নাহিক গমন।
বসন না থাকে যদি মুণ্ডের উপর
না হএ ফিরিস্তা সেই সভান গোচর।

খ. করপদ হোন্তে নখ কাটিতে উচিত
দেখিতে দীর্ঘল নখ লাগএ কুৎসিত।

ফাতেহাখানি, শ্রাদ্ধ :

বাপের কারণে দান ধর্ম বহু কৈলা
দরিদ্র দুঃখিত মন তুষিতে লাগিলা।

স্বোপার্জিত ধন :

ক. আপনার দুঃখের অর্জন দ্রব্য যেবা খাএ
এহলোক পরলোকে সুখপদ পাত্র।
শুদ্ধদ্রব্য খাইলে তার হএ বাক্য সিদ্ধি
প্রভৃত যে-কিছু মাগে পায় নিরবধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. যাহার আছএ জ্ঞান না মাগএ প্রভু স্থান
যে দিবেক দেউক আপনে।

লৌকিক বিশ্বাস :

ক. সর্পের উদরে আজাজিল প্রবেশ করেছিল
একারণে সর্পে গরল উপজিল।

খ. নিশি দিশি প্রহরে দূতবরে
কুক্কুটের মুণ্ডে সেই দণ্ডবাড়ি মারে।
দণ্ডাঘাতে সেই কুক্কুটে রোল কৈল যবে
পৃথিবীক কুক্কুর সবে রোল করে তবে।

গ. দিবসেতে উল্কা পড়এ ঘন ঘন
বিনি মেঘে আকাশেতে করএ গর্জন
গৃধিনী পেচক আর শকুনী শৃগাল
আসিতে সমুখে অতি দেখিল বিশাল।

কদমবুসি : বাপের সোদর জ্যেষ্ঠ কাজিবে দেখিয়া
বসিতে আসন দিলা চরণ বন্দিয়া।

ক. নৈতিক :

আতিথেয়তা : কেহ যদি অতিথিরে অন্ন না ভুঞ্জায়
এহলোকে পরলোকে অতি দুঃখ পায়।

খ. মুমীনের কর্তব্য : অন্নবস্ত্রদান কর দেখিয়া দুখিত
মিছা বাক্য বহুল না বোল কদাচিত।
মিছাসাক্ষী না কহিবা না বুলিবা মন্দ
খেমহ মনের ক্রোধ খেমিবারে দণ্ড।
পরধন পরনারী না করিবা চুরি
মান্যজন সন্তোষিবা মনে মান্য করি।

গ. একাগ্রচিত্ততা : নয়ন চঞ্চল চিত্ত দশদিকে ফিরে
প্রভুর ভাবেত মন রহিতে না পারে।

ঘ. পিতৃভক্তি : জনকের বোলে পুত্র মরণ জুয়াএ।

ঙ. স্মৃতিপূজা : স্মৃতিপূজা ভাল নহে হেন।

চ. আপনেহ আপনা মহিমা না কহিও
আন হোন্তে আপনাক অধিক না জানিও।
প্রচারিলা যদি সে মহিমা আপনার
সর্বথাএ টুটিব মহিমা আপনার।

জাদু ও টোনা : বুলিল তোমার আঁখি বান্ধিল টোনায়
টোনা করি মুহম্মদ কৈল অন্ধঘোর।

এতিমের প্রতি : রসুলে শিশুর বাপ নাহি হেন জানি
সজল নয়ানে বোলাইলা পুনি পুনি।

AMARBOI.COM

বংশগৌরব ও বর্ণ-বিদ্বেষ :

ক. নারী বোলে আমি হই ধীবরের জাতি
আমাতু অধিক হীন নাহি কোনো জাতি।
দেখিলা ধীবর সব পাতিয়াছে জাল
বাঝিয়াছে জালে মৎস্য অধিক বিশাল।

খ. ধীবরে শুনিলা যদি দুহিতার বোল
গালি দিয়া গঞ্জিবারে লাগিলা বহুল।
তাহাকে না চিনি তোকে দিমু কি কারণ
পুনি না কহিও মো'ত এমত বচন।
জাতিকুল না জানিয়া বিহা দিলে তোরে
শুনি জ্ঞাতিগণ সবে ভশ্চিবেক মোরে।

গ. ক্ষেত্রি বংশে জন্ম হই আহ্মি দুই ভাই
সুচরিতা ভগ্নিক রাখিমু কার ঠাঁই।

হিন্দুয়ানি সংস্কারের প্রভাব :

ক. ওমরে বহুত দেশ কৈলা মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

খ. রসুলে আরব সব করি মুসলমান
যোগপন্থ জানাইলা জানাইলা জ্ঞান।

গ. দ্বিতীয় আকাশ হীরার এবং বৃহস্পতি সুরগুরু তাহার মাঝার।
রজতের এবং দৈত্যগুরু শুক্র তাহার মাঝার।

মৃত্যুর লক্ষণ : অধঃরেত শিবশক্তি লিঙ্গেত রহিল।–
ইচ্ছাসুখে শিবশক্তি জীবাত্মা দিলা।

যোগিনী :

১. ধরিনু যোগিনী বেশ কর্ণে নিমু কড়ি
একহাতে পাত্র আর করে দণ্ডবাড়ি।
অঙ্গেত লেপিমু ভস্ম ফিরি সর্বদেশ
কোথা গেলে লাগ পাইমু করিমু উদ্দেশ।

২. সিদ্ধাসম অনাহারে থাকে প্রতিদিন।

উপমা-উৎপ্রেক্ষায় :

১. রাহুর কোলেত যেন চন্দ্রের বসতি।

২. পূর্বে রাম-রাবণের যথ অস্ত্র ছিল
একে একে সকল ইব্লিসে আনি দিল।

৩. যেন হনুমান ছিল শ্রীরামের বলে

৪. ইব্লিস নারদ পাপী হরির সহিত।

সৃষ্টিপত্তন: আহাদ ও আহমদের পারস্পরিক দৃষ্টিরসে – ঘর্ম থেকে মন্ত্র, তা থেকে সাতাইশ ব্রহ্মাণ্ড তারপর জীবাত্মা পরমাত্মা ও অনল বর্ণের জল সৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্ধর্ব :

১. নবীর মহিমা শুনি গন্ধর্বের পতি
গন্ধর্ব সকলে মিলি আনিল ইমান।
২. পশুপক্ষী সুরাসুরে যক্ষ দানব নরে
তান আজ্ঞা মানিব সকলে।

সিন্দুর: শিষের সিন্দুর মুছি কৈলা দূর।
ললাটে তিলক করি (সিন্দূর পরত)

সূর্যপূজা : উদয় হৈলে ভানু পুলকিত হএ তনু
দিবাকর সবে প্রণামএ।
অনুদিন দিবাকর পূজি নরগণ।

ইসলামি সংস্কার :

সূফীতত্ত্ব :

ক. আদমের বাক্যশুনি নিরঞ্জনে কহে পুনি
সেই তত্ত্ব ত্রিভুবন সার
তার মোর নহে ভিন এক অংশে পরাচিন
পিরীতি বড়হি মোর তার।
খ. তুহ্মি প্রভু নিরঞ্জন সংসারের সার
শত্রুমিত্র ভেদ নাহি নিকটে তোমার।
.....সে যে প্রভু নৈরাকার ত্রিভুবন নাথ
ভালমন্দ সমসরি তাহান সাক্ষাত।
[ত্রিগুণাতীত শিবের ধারণা স্মর্তব্য।]

গ. খদিজা : ইচ্ছিলা যথাতু আইলা তথা চলি যাইতে
সাগরের বিন্দু যাই সাগরে মিলাইতে।

ঘ. আল্লাহর উক্তি : আপনার অংশে আমি সৃজিছি তোমারে
তুমি আমি একত্রে আছিল অনুদিন।
সভানের স্থানে তুমি নাই তোমার স্থান
সভানে ব্যাপিত হই আপনে রহিছ।
ঙ. মুহম্মদ আল্লাতে লীন ছিলেন ;
পুষ্পেত আছিল গন্ধ ছাপাইয়া

জীবন : জলমধ্যে বিম্ব যেন ভাসে কতক্ষণ
পশ্চাতে জলের বিম্ব জলেত মিশন।

শবদাহ : যদিবা পূর্বের শাস্ত্রে আছিল লিখন
মৃত্যুকালে আনলেত করিতে দাহন।
আনলের সৃজন আছিল সেইকালে
তেকারণে আজ্ঞা দিলা দহিতে আনলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একালের নর সব মাটির সৃজন
মৃত্যু হইলে মাটিতে গাড়িব সর্বজন।

ধার্মিকজীবন :

নূহ্-নবীর বাণী :

ক. সর্বথায় না রহুক মূরতি সেবিয়া
পরধন পরনারী না করুক চুরি
সুরা পান না করুক না করুক দারি
মিছাবাক্য না কহৌ ধর্মে দেউক মন
পরহিংসা পরমন্দ তেজ সর্বক্ষণ।
পবিত্র রহৌক অতি সিনান আচার।

খ. রসুলের বাণী : পত্রেত আছিল লেখা নমাজ করিতে
মূর্তিসব না সেবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে।
আর লেখে পৈতা ছিঁড়ি ফেলিতে ব্রাহ্মণ
আল্লার সেবাতে মন দেউক যত্তন।
কলিমা কহুক লই রসুলের নাম
পরনিন্দা পরহিংসা তেজিয়া অকাম।
মালের যাকাত দিব রোজা একমাস
মুসলমানি দীনসবে করিতে প্রকাশ।

শহীদ : যে সকল নরগণ রণে কাটা গেছে
সে সকল মরা নহে জীবন্ত আছে।

ক্ষমার অযোগ্য পাপ :

মাত্র প্রভু চারিপাপ ক্ষেমিতে না হএ
প্রথমে মূরতি যদি গঠিয়া থাকএ
বাপের মায়ের মন যদি না তোষএ।
ভিন্নজন প্রকারে যদি সে করে দাস
আপনা গুরুকে যদি করে উপহাস।
—এই চারি পাপ জান প্রভু না ক্ষেমিব।

যমের ভূমিকা: মুঞি সে জানিও সব করিব সংহার
যুবতীর কোল হোন্তে লই যাইমু ভাতার।
বাপ হোন্তে পুত্র নিমু, পুত্র হোন্তে বাপ
যুবতীক হরি পুরুষক দিমু তাপ।
সহোদর হোন্তে নিমু সহোদরগণ
মিত্র হোন্তে মিত্র নিয়া করি অদর্শন।

জীবন বৃক্ষ : বৃক্ষ এক সৃজিয়াছে আকাশ উপর
সংসারেত জন্ম হয় যত জীবগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই বৃক্ষেতে জন্ম হয় এথেক পল্লব
সে পত্রের লেখা আছে যথ জীবগণ
কথক্ষণে কথদিনে হইব নিধন।

আরবী রীতি :

ক. দোষ খণ্ডাইতে যদি নারী ডালি পাইলা
রসূলে নারীর নাম হাজারা রাখিলা।
যে সকলে দোষ খণ্ডাইতে ডালি হএ
আরব সকলে তারে হাজারা বোলএ।

খ. সাগরে ভাসিয়া যাইতে যেবা পাএ যারে
আরবের লোকে মুসা করি ডাকে তারে।

রণনীতি : ভাল দ্রব্য দেখি রণে না করিবা মন
যেরূপে ভেদিবা ব্যূহ করিবা যত্তন।

বীরব্রত : কাফির সবেরে দেখি মনে পাই ভএ
রণেতে প্রবেশ তুহ্মি যদি না করএ।
এলাহির কৃপা তবে না হএ বিশেষ
সে সকল নরকেত করিব প্রবেশ।

রাজব্রত : অকর্ম করিলে শাস্তি দিবারে কারণ
ভালরূপে নরগণ করিতে পালন।
মহাজন সকলেরে করিতে গৌরব
দুর্জন অশিষ্ট হৈলে করিতে লাঘব।
নৃপতিএ যদি ভাল মন্দ না বিচারে
সেদেশেত উচিত না হএ রহিবারে।

হযরত মুহম্মদ মহিমা :

ক. মুহম্মদ নামে তান প্রধান রসুল
পৃথিবীতে কেহ নাহি তান সমতুল।
তান প্রীতিরসে ভুলি প্রভু নিরঞ্জন
সৃজন করিলা প্রভু এতিন ভুবন।

খ. আহাদ আহমদ মহানুর ভিন
এই মহানুর মধ্যে ত্রিভুবন চিন।
আহমদ হোন্তে নুর কৈলা মহানুর
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।

গ. যে দেখিল নুর মোহাম্মদের বদন
জগতেত আউলিয়া হৈল সেইজন।
যে দেখিল মুনি মোহাম্মদের লোচন
জগতেত পণ্ডিত হৈল সেই জন।
পিষ্ঠভাগে নুরের দেখিল যেই সবে
কাফির হইয়া সেই জন্মিলেক তবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারকীর তালিকা : ক. আল্লার সমান হেন আছে জানে।
খ. রসুল সবেরে যদি কেহ মিছা কহে।
গ. প্রলয় না হৈব বুলি যে-সকলে বোলে।
ঘ. হিসাব (হাসর) না হৈব বুলি যে সকলে বোলে
ঙ. যেখানের মাটি হোন্তে হইছে সৃজন
সেখানেত যদি বোলে না হৈব নিধন।
চ. নমাজ না পড়ে যেবা রোজা না রাখএ
ছ. কলিমা পড়ে যেবা না করে জাকাত
যাইতে পারিলে যদি না যায় মক্কাত।
জ. যে সকলে সুরা পান করিতে আছএ
ঝ. রজঃস্বলা নারী যদি করএ বেভার
ঞ. মাতাপিতা গুরু না মানে যেই জন
ট. পরনিন্দা পরচর্চা পর অকাম কহএ যদি,
ঠ. মনুষ্যের অকর্ম প্রচারে যেইজন
ড. ফকির দরবেশ আগে করিলে বড়াই
ঢ. আলেমে নয়ানে দেখি মান্য না করিলে
ণ. রতিভুঞ্জি যে সকলে না করে গোসল
ত. পরনারী দেখিয়া লোভে দৃষ্টি করে
থ. ইষ্টমিত্র ভাই বন্ধু না করিলে দয়া
দ. সাচা সাক্ষী না দি' যদি মিছা সাক্ষী দিল
ধ. নৃপতির আগে কিবা পাত্রগণ স্থান
যাই যদি 'না ডরাই' কহে কোনো জন।
ন. পরের সম্পদ দেখি যে করে পিশুণ
প. ভিক্ষা করিবারে যদি আইল দুয়ারে
গালি দিয়া কহে যদি বোলে মারিবারে।
ফ. কেহ যদি কার ধন বল করি লয়
ব. দুই জন মধ্যে যদি ভেজায় কোন্দল
ভ. পিতাহীন শিশুর কাড়িয়া খাইছে ধন
ম. যে সকলে বাড়াধন তঙ্কা লাগাই খাইছে
য. অনুদিন পতিসনে করিয়াছে দ্বন্দ্ব
র. আন কার্যে যদি দিয়া থাকে গুপ্ত কড়ি (ঘুষ)। ইত্যাদি।

ফুলের নাম : মাধবী মালতী লতা চম্পা নাগেশ্বর
জাতী যুথি লবঙ্গ কেতকী বহুতর।
বকভূমি কেশজ যে টগর ভূরাজ।

নারী সম্বন্ধে : ১. পতি যে নারীর গতি পতি যে ভূষণ
পতি যে কণ্ঠের হার পতি যে জীবন।
পতি বিনে অলঙ্কারে কিবা আছে কাজ
না শোভে বিধবা নারী রমনী সমাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. বেলন পাটের খোপা :
বেলন পাটের খোপা শোভএ উপাম।
৩. ত্রিয়াজাতি বড় শক্তি নানা উপদেশ ভক্তি
দম্পতির মধ্যে যে উত্তম।

অনুশোচনা মাহাত্ম্য :

আঁখির পড়িত জল অনুশোচ করি
আপনা মানিয়া মন্দ ধর্ম অনুসারি
নয়নের জলে পাখালিয়া যাইত পাপ
মন দুঃখে দূর হইত মনের সন্তাপ।

গুরুনিন্দা : তেকারণে গুরুনিন্দা করে যেই সকল
হতবংশ কন্ধনাশ হইব নিষ্ফল।

জ্ঞান : ১. পৃথিবীতে জ্ঞান হোন্তে ভাল নাহি আর
নিরঞ্জন সহিতে দর্শন হয় তার।
জ্ঞান যদি পাইল না লজ্ঘে তারে পাপে
যথেক অকর্ম দূরে যাএ জ্ঞান তাপে।
২. জ্ঞানের কারণে নহে পাপেত প্রবেশ।

মানবিক বৃত্তির সুকোমল প্রকাশ :

ক. মাতৃস্নেহ : জননী পুত্রেরে ধরি শিরে দুই করে
রাখিছিলা কতক্ষণ শিরের উপরে।

খ. করুণা ও মুক্তিপণ : এ সবে (যুদ্ধবন্দী) আপনা প্রাণ ধনে লউক কিনি
প্রাণ রক্ষা করহ না কাট আর পুনি।

গ. খদিজাগুণ : পূর্বে বিবি খদিজাএ করের কঙ্কন
দুহিতাক দিয়া ছিল জড়িত রত্তন।
স্বামী উদ্ধারিতে সেই কঙ্কন পাঠাইলা
সে কঙ্কন রসুলে খদিজার হেন চিনিলা।
রুদিতে লাগিলা নবী খদিজাগুণ স্মরি
দুহিতার পতির নাম বহুল বিসারি।
মনে সেই স্নেহ ভাবি করিলা কান্দন
দুহিতার ফিরাইয়া দিলা সেই কঙ্কন।

ঘ. খদিজার মৃত্যুতে রসুল :

কঠিন পাষাণ দেহ না যায় বিদার
তাহান বিচ্ছেদ আক্ষি নারি সহিবার।
দোহান যদি একত্রে মরিয়া যাইত
তবে কার শোক কার মনে না লাগিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঙ. রসুলের বাৎসল্য (ফাতেমার প্রতি) :

মোহোর যে প্রাণের প্রাণ তুমি বিনে নাহি আন
তুমি মোর আঁখির পুতলি
মোর চিত্ত বৃক্ষফল তুমি গন্ধ সুশীতল
হৃদয় লতার তুমি কলি।

চ. ইটের গোহারী :

(রসুল) মোরে দহি খণ্ডাইল বেদনা আপনার
না চিন্তিলা নিজমনে বেদনা আমার।
আপনার শরীর কিবা আনের শরীর
একদেহ হেন আনিতে উচিত নবীর।

ছ. জ্ঞাতিপ্রীতি : এক মোর জ্ঞাতিগণ আর ইষ্ট জন
কার্য নাই এ সকল করিতে নিধন।
নারী সব বিধবা হইয়া গালি দিব
মোর প্রতি জ্ঞাতি সব অযশ ঘোষিব।

জন্মভূমি : জন্মভূমি পুণ্যদেশ দেখিবারে শ্রধা বেশ
স্মরণে হৃদয় ফাটি যায়।

প্রাণের মর্যাদা : আপনার জীব যেন পরেরে জানিবা তেন।

দেশের ঝড়বৃষ্টির রূপ :

ঝড়বৃষ্টি হৈল অতি অন্ধকার হৈল রাতি
বিজুলি চমকে ঘন ঘন
কাকে কেহ না দেখএ আত্মপর পরিচয়
না পাওন্ত আরবের গণ
অশ্বউট সারি সারি রহিল ভূমিত পড়ি
কোন দিকে যাইতে নারিলা
যত তাম্বু সামিয়ানা ধ্বজছত্র যথ বানা
বাতাসে উড়াই যথ নিলা
আপনার হাত পাও না দেখে আপনা গাও
না দেখে আপনে আপনারে
বরিষএ অনিবার নিশি হৈল অন্ধকার
কেহ কারে চিনিবারে নারে।

যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ : রথ, হস্তী, অশ্ব, বাণ, শেল, গদা, ভিন্দিপাল, গুর্জ, নারাচ, নালিকা, সিফর, মুগ্দর, অগ্নিবাণ, সম্মোহন বাণ, চন্দ্রবাণ, বজ্রবাণ, বিষবাণ, খঞ্জর ইত্যাদি।

অলঙ্কার : সোনার অঙ্গুষ্ঠ আনি শ্রবণে পরাইলা
ফুলিফুটি পিন্ধুর পরিল শ্রবণে।

কঙ্কন, অম্বর, (কটির চন্দ্রহার), নূপুর, কিঙ্কিণী, মুক্তাহার, কুণ্ডল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোশাক : কাবাই, বেলন পাটের শাড়ি, ঘাঘরা, কাঞ্চুলি।
প্রসাধন সামগ্রী : অগুরু, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, সিন্দূর।
হিন্দুর পার্বণিক পূজাচিত্র : (রাজা দানিয়ালের প্রাসাদে) :

১. সভান সহিতে রাজা মূরতি পূজএ
আনন্দ উৎসব সবে বহুল করএ।
পুষ্ট অজা আনিয়া দেয়ন্ত বলিদান
কাসঁ করতাল বাহে করি সুরা পান।
কেহ সভা মধ্যে নারী করএ শৃঙ্গার
লাজ ভয় এক নাহি পশুব্যবহার।
পশু মেলে পশু যেন শৃঙ্গার করএ
তেহেন শৃঙ্গার করে মনুষ্য মেলএ।
শঙ্খবাদ্য নানা যন্ত্র বাহে লাসবেশে
কাক মনে ভয় নাহি মনের উল্লাসে।

২. সিনান করিয়া তবে যত পাপিগণ
যন্ত্রসব আনিয়া যে করন্ত নাচন।
পুষ্ট অজা আনিয়া যে দেয়ন্ত বলিদান
নাচন্ত গাহন্ত সবে সভা বিদ্যমান।
লক্ষ লক্ষ অজা আনি সম্মুখে রাখএ
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু মূর্তিরে বোলএ।

মিশর ও শামের মধ্যবর্তী হামসা রাজ্যের নৃপতির দুর্নীতি :

১. বস্তুজাত লই তথা (হামসা) গেলে সাধুগণ
অবিচারে 'দান' লয় লুটে সর্বধন।
বলে ছলে ঘাটিয়াল পাপী দুরাচার
বহু 'দান' সাধে আজ্ঞা পাই নৃপতির।
লয় যথ ধন দেখে সাধুরে না দিয়া
ভাল দ্রব্য যথ পাএ লই যাএ লুটিয়া।

২. আর এক কর্ম করএ দুরাচারে
নারী যদি সঙ্গে আনে সাধু সদাগরে।
সুচরিতা নারী পাইলে লই যাএ কাড়িয়া।...
নিষ্ঠা আছে প্রথমে বিবাহ কৈলে নারী
নৃপতি শৃঙ্গার করে সে নারীক ধরি।

সায়রার (সারা) স্বয়ম্বর-সভা :

রাজাসব পরি আইল উত্তম বসন
নানা অলঙ্কার যথ করিয়া ভূষণ।
অশ্ব আরোহণ করি, গজ স্কান্ধে চড়ি
আইল গন্ধর্ব যথ তেজি সুরপরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজাসব বসিতে আসন আনি দিলা
একে একে সিংহাসনে সকল বসিলা
চতুসম মৃগমদ ভৃঙ্গারের জল
কস্তুরী কাফুর যথ সুগন্ধি সকল।
নৃপতি আপনা করে সহরিষ মন
রাজা সকলের গাএ করিয়া লেপন।
সুবাসিত কর্পূর তাম্বুল আগে দিয়া
সভানের সমুখে রহিল দাণ্ডাইয়া।
মোহোর নন্দিনী ইচ্ছাবর মাগে নিত
বিবাহ বসিতে চাহে সুবর সহিত।

কন্যাবিদায় ও যৌতুক : জনকজননী দুই কান্দিলা অপার

একই দুহিতা ছিল না ছিল আর।
আজ্ঞা দিলা পতির সহিত যাইবার

(সায়েরা - বহুল যৌতুক আনি লাগিলা দিবার।

ইব্রাহিম দাসদাসী অশ্বউট বস্ত্র অলঙ্কার

দম্পতি) দিলেক বহুল আনি কুমারী নিবার।

(ইব্রাহিম) রসুলক সম্বোধিয়া বুলিলা নৃপতি
মোহোর দুহিতা যাএ তোমার সংহতি।
ভালরূপে গৌরব করিবা তুমি তানে
বিরস না জন্মে হেন কুমারীর মনে।

[তুল : কুলীনের পো তুমি কি বলিব আমি

হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও, পেট পুরে ভাত *[শিবায়ণ, মধুমালতী, সিকান্দর-নামা]*

আবদুল্লাহ্‌র রূপ :

মুণ্ড অতি সুগঠন চিকুর নিন্দিয়া ঘন
কস্তুরী জিনিয়া আমোদিত।
ললাটের পাট অতি ঝলকে নির্মল জুতি
ঘর্ম বিন্দু মুকুতা গুথিত।
জিনি ধনুর্গুণ বাণ লোচন সুকামান
মৃগাক্ষ খঞ্জন গঞ্জন
নাসা তিল ফুল জিনি যেন গরুড় ফণী
সুগন্ধি নিশ্বাস বহে ঘন।
সুন্দর শরীর অতি গঠন সুবেশ ভাতি
মুখপদ্ম জিনিয়া প্রকাশ
অধর সুরঙ্গ অতি দশন মুকুতা পাঁতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাস অতি সুধা রস ধার
সে মুখের 'পর জ্যোতি ঝলএ সঘন অতি
দিবাকর কিরণ প্রকার।
অঙ্গের সুগন্ধি পাই টপদগণে ধাই
উড়ি পড়ে জানিয়া উদ্যান
পুষ্প হেন অনুমানি মকরন্দ হেন জানি
শ্রম জলে করে গিয়া পান।

মুসলিম বিবাহোৎসব (ফাতেমার বিবাহ) :

নারী সব আপনার ডাকিয়া রসুলে
সভানেরে আদেশ করিলা কুতূহলে।
তুহ্মি সবে বিবি ফাতেমাক বিভা দিতে
উপহার দ্রব্য আনি রাখ সমাহিতে।
রসুলের মুখে শুনি উৎসবের কথা
যথেক মহিষীগণ হইলা উল্লাসিতা।
মাবিয়া কিব্রিক ডাকি রসুলে কহিলা
সুগন্ধি সকল সজ্জা করিতে বুলিলা।

স্নানের উপকরণ : আগর চন্দন আতর কাফুর কেশর
লোবান সিঞ্চন্ত আর আবীর আম্বর।
যথেক যুবতী মিলি আনি ফাতেমারে
লাগিলেন্ত অঙ্গেতে সুগন্ধি লেপিবারে।
যথ বিবিগণে মিলি গোসল করাইলা
শুকুল বসন সব অঙ্গেতে পরাইলা
যথ আভরণ আছে পৈরাই সকল
আকাশেত শশী যেন উদিত নির্মল।
যথেক সুগন্ধি আছে অঙ্গেত লিপিলা
সুর্মা কাজল দোহ নয়ানেতে দিলা।
শিশি 'পরে রাখিলেন্ত আবীরের রেণু...

ভোজ : ভালরূপে করিলা বিভার মেজোয়ানি
উপহার দ্রব্য যথ খাইতে দিলা আনি।

নারী মজলিস : বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ
নারীমেলে বসিলেন্ত যথ নারীগণ।

আপ্যায়ন : অন্ন এই সবেরে করাই ভোজন
যথেক সুগন্ধি অঙ্গে করিলা লেপন।
মধু ঘৃত দধি শর্করা যথেক আনিয়া
যুবতী সকলে খাইবারে দিলেক আনিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার ফল যথ দিল খাইবার
আঙ্গুর খোরমা আদি বিবিধ প্রকার।

সহেলা : ফাতেমাকে বিভা দিতে আসিয়া সকল

বিবাহমঙ্গল : 'সহেলা' গাহন্ত সবে বিবাহ মঙ্গল।
আইসরে আইসরে গাই
ফাতেমার বিবাহ মঙ্গল।
যে সকলে বিভা করে ফাতেমা বিবির বরে
জন্ম জন্ম রহুক কুশল।
যথ কুলবতী নারী বস্ত্র অলঙ্কার পরি
দেখ আসি ফাতেমার বিহা
ফাতেমার বিভা দেখি সব মাগ হৈয়া সুখী
পতি সনে হইতে স্নেহা।

বিবাহরে আসর সজ্জা :
যথেক আরবগণ হই হরষিত মন
বান্ধিল আমাল (আলাম)?
চারিদিকে মারোয়ার অন্তস্পট শোভাকার
চতুর্দিক শোভে ঝলমল
কির্মিজের তাম্বু অতি চমকে বিজুলি জড়িত
স্থানে স্থানে টানাই রাখিলা
মুকুতা প্রবাল জ্বলে চৌদিকে চামর দোলে
যথ আর চান্দোয়া টানাইলা।

বাদ্য : চর্তুসমে ভরি অঙ্গ করন্ত বিবিধ রঙ্গ
কবিলাস রবাব বাজাএ
ঢাক ঢোল দারি কাঁসি মৃদঙ্গ দোতারা (দোছড়ি) বাঁশি
বাজায়ন্ত ভেউল কন্নাল
দুন্দুভির শব্দ অতি মোহরি (ডম্বুর) ঝাঁঝরি তথি
দফ-ভঙ্গ শুনি লাগে ভাল
উন্মত্ত যৌবন নারী নানা বর্ণ বস্ত্র পরি
আনন্দে সহেলা সবে গাএ।

মারোয়া : সেই মারোয়ার তলে সুগন্ধি দেউটি জ্বলে
বহুল ফানুস জ্বলে নিত [লোবান সিঞ্চন্তি সবে নিত]
মোজামির সারি সারি জ্বলেন্ত চৌদিক ভরি
নিমাসন (?) সুগন্ধি পুরিত

ফাগুয়া : আবীর আম্বর আনি মিলি যথ নারীগুণী
কৌতুকে লইয়া মুঠি ভরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ কার অঙ্গে গিয়া মনেতে হরিষ হৈয়া
অঙ্গেত লেপন্ত মায়া ধরি।
হাস লাস সবে করি কস্তুরী চন্দন পুরি
উল্লসিত সব নারীগণ।

তেলোয়াই : বিবি ফাতেমার অঙ্গে আনন্দ কৌতুক রঙ্গে
মহাসুখে তেলোয়াই চড়ায়ন্ত।

ক'নে স্নান : এয়ো সই মিলি করি অতি হুলাহুলি
ফাতেমার অঙ্গে সুগন্ধি লিপিল
সাতদিন সাতরাতে তেলোয়াই করন্ত নিতি
জুমাবারে করাইলা গোসল,
সুগন্ধি পূরিত তনু শিরে আবীরের রেণু
পৈরাইল বসন উঝল (অমূল)।

বরের গস্ত ফিরানো : যথেক আরবে মিলি শাহ্ মর্দ আলি
গস্ত ফিরাই আনাইল।
পরাই শুকুল বাস মোজাম্মির জ্বলে চারিপাশ
চারিদিকে দিউ জ্বালিয়া

বাজি : হাউই ছোড়ন্ত নিত মহাতাপ প্রজ্বলিত
নিশি হৈল দিবস আকার।
আগর চন্দন পরি বসাইল আমোদ করি
চলিলেন্ত অতি শোভাকার

নাটগীতি : নাটুয়ায় করে নাট রহি রহি বাট বাট
যন্ত্রসব বাজে চারি ভিত
নানা শব্দে বাদ্য বাজে ভেউল কল্লাল সাজে
শুনি সর্বজন উল্লসিত।

তক্‌বির : সর্বলোকে অবিশ্রাম লয়ন্ত আল্লার নাম
তকবির বোলন্ত অবিশ্রাম।

বিয়ের খোৎবা : দুই পক্ষ একত্তর ঠেলাঠেলি বহুতর
লাগিলেন্ত খোত্‌বা পড়াইবার
রসুলে আপনা মুখে নিকাহ্ পড়াইলা সুখে
চারি শর্ত করাইলা কবুল

জলুয়া [বর-কনের সাক্ষাৎ] :
তক্তেত দোহান তুলি সভান জুলুয়া বুলি
আশীর্বাদ করিলা বহুল
দামাদ কনিয়া দেখি অন্যে অন্যে হৈলা সুখী
দেখে অতি জন্মিল পিরীত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রণবাদ্য ও ধ্বজছত্র : ধ্বজ ছত্র পতাকা নানান বাদ্য বাজে
ভেউল কন্নাল শিঙ্গা নানা শব্দে সাজে।
দুমদুমির শব্দে মেদিনী টলমল
প্রলয় হৈল হেন জানিল সকল।

শিক্ষা (ইদ্রিসকে) : পড়িবারে উপাধ্যায় হাতে সমর্পিলা
নিরঞ্জনে ফিরিস্তা পাঠাই প্রতিনিত
শিশুকে পড়াই কৈলা জ্ঞানে সুপণ্ডিত।
পণ্ডিত হৈল যদি বড়ই অপার
ইদ্রিস করিয়া নাম থুইল তাহার।

বিবি হাওয়ার বারমাসিতেও বাঙলাদেশ ও বাঙালী নারীকে পাই :

জ্যৈষ্ঠ অশিষ্ট ভেল তাপিত তপন
কস্তুরী কুঙ্কুম অঙ্গে লাগে হুতাশন।
দক্ষিণ সমীর মোর শমন সমান
অনল হইয়া নিতি দগধে পরাণ।
আষাঢ়ে সংসার ভরি জলে ব্যাপিত
পিউ পিউ পক্ষী নাদ অতি সুললিত।
আহ্মার চাতক পিয়া রৈল দেশান্তর
জলদ হইয়া আহ্মি আছি একসর।
শ্রাবণ সঘন বরিখএ জল ধারে
গিরি 'পরে শিখী সবে সুখে নাদ করে।
মুঞি পাপী শিখিনীর জল নিল হরি
সন্তাপে সাগর মধ্যে রহি একসরী।
ভাদর মাসেত অতি বরিখে গম্ভীর
ঘোর অন্ধকার নিশি শূন্য এ মন্দির।
কীট সব কোলাহল শুনি মনে ভীত
একসর শয়নে কম্পিত চিত নিত।...

(আশ্বিনে) কস্তুরী চন্দন অঙ্গে করহুঁ লেপন
চন্দ্রিমার জোত মো'ত লাগে হুতাশন।
ইত্যাদি

গ. মনোহর মধুমালতী [মৎ-সম্পাদিত]

মুহম্মদ কবীর বিরচিত (পনেরো-ষোলো শতক)

আমাদের সাহিত্যে মনোহর-মধুমালতীই সম্ভবত রূপকথাভিত্তিক প্রথম প্রণয়োপাখ্যান। এটিও ফারসি বা হিন্দি থেকে অনূদিত কাব্য। কবি মুহম্মদ কবীর তাঁর কাব্যে রচনার সাল উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুটো পাণ্ডুলিপিতে প্রাপ্ত দুটো পাঠে মিল নেই। একটাতে আছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ত অন্তে অন্ত রয় সিন্ধু তার পাছ
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরার পাঁচ।

অপরটাতে রয়েছে : অঙ্গ সঙ্গে রঙ্গরস বিন্দু তার কাছ
পঞ্চালী ভনিতে গেল হিজরীর পাঁচ।

বিদ্বানেরা আনুমানিক বিশুদ্ধ পাঠ নির্মাণ করেছেন নিম্নরূপে

১. অন্ত সঙ্গে অঙ্গ রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ
২. অঙ্গ অন্তে অন্ত রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।
৩. অঙ্গ সঙ্গে অঙ্গ রয় সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।
৪. অন্ত সঙ্গে রয় রস সিন্ধু (বা বিন্দু) তার পাছ।

এর থেকে যথাক্রমে ১৫৭৯ বা ১৫৭২, ১৪৯২ বা ১৪৮৫, ১৪৮৩ বা ১৪৭৬, এবং ১৫৮৯ বা ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ মেলে। অতএব কাব্যটি যে ষোলো শতকের পরের রচনা নয়, তা' নানা প্রমাণে ও অনুমানে বিশ্বাস করতে হয়।

মুসলমান কবি যেমন 'বাণী' স্মরণ করে লেখনী ধারণ করেছেন, তেমনি হিন্দুরাজাও মুসলমান ওলি দিয়ে নবজাতকের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করাচ্ছেন এবং ভাগ্য গণনা করাচ্ছেন :

ওলিগণে গুণিতে মাগিতে লাগিল।
ভাল মন্দ কুমারের সকল গুণিল।

শুধু তা-ই নয়, এখন থেকে ভূত-পেত্নী নয়, পরীও হিন্দু নায়ক-নায়িকার প্রণয়-সহায়। হিন্দুরাজা অভিষেক উৎসবে মুসলিম পোশাকে ভূষিত হয়েছেন :

মণিকলা পাগ শিরে থোপা থোপা মুক্তা ঝরে–
সুবর্ণ কাবাই দেহ 'পরে।

দরবারের পরিবেশটাও মুসলিম প্রভাবিত। তাই অভিষেক-অন্তে :

রাজা উজিরেহ করিলা সালাম।

সেকালে রাজবাড়িতেও 'মঙ্গল' গান হত। তাতে —

রাজ্যে যথ লোক ছিল 'মঙ্গলা' শুনিয়া আইল
নাট গীত বাদ্যের কল্লোলে।

এতে থাকত : মন্দিরা মৃদঙ্গ কাড়া শিঙ্গা ঢাক দোতারা
শঙ্খ সানাঞি কর্ণাল ফুকরে।
মধু বেলি চঙ্ক বাঁশি নানা বাদ্য রাশি-রাশি
যথ বাদ্য বাজে জোরে জোরে॥

এমন 'মঙ্গল' গানেও নর্তকীর নাচ ছিল :

নর্তকীর দেখি সাজ মোহ যায় দেবরাজ
নাচে যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।

শুধু তাই নয়, অন্য লোকরাও —

কেহো নাচে কেহো গাএ কেহো হাসি, যন্ত্র বাএ
রস রঙ্গ কৌতুক অপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে যুগে চিত্রল ছাঁদের কুণ্ডল, সপ্তছড়ি মুক্তার হার, বিচিত্র কাঞ্চুলি, হেমরি শাড়ি, নূপুর, কঙ্কন, বাজু প্রভৃতি রাজ-অন্তঃপুরিকাদের অঙ্গাভরণ ছিল। রাজকন্যারও সতীত্ববোধ ও সমাজচেতনা শিথিল ছিল না :

শুনি লোকে দিব লজ্জা হৈলুঁ কলঙ্কিণী ॥
কি মুখে বসিমু মুঞি নারীর সভাত।

ডাকিনী-যোগিনী প্রভাবজ তুক-তাক-টোনায় বিশ্বাস তখনও প্রবল ছিল। মালতীকে তার মা রূপমঞ্জরী নিজেই মন্ত্র পড়ে 'পাখী' করে দিলেন।
নদীমাতৃক এদেশের নৌকার বর্ণনা যথার্থই হয়েছে :

নব ইন্দু ছন্দ জিনি নৌকার গঠন।
আগে পাছে গাছুল দোলএ ঘন ঘন ॥
রজতের বৈঠা সব হের কেরুয়াল।
চলিতে চঞ্চল অতি না ছোঁএ কিলাল ॥

তবু 'নদী পার হৈতে সবে জপে প্রভুনাম।'

মনোহর-মধুমালতী বিয়ের আগে মিলিত হচ্ছে। মিলনটা গান্ধর্বরীতি সম্মত :

তোহ্মা সনে আদ্যে আহ্মি দঢ়াই করিছি।
সেই ধর্ম বাক্য আমি মনেত রাখিছি ॥
অন্যে অন্যে দোহানের ধর্মাধর্ম ভেল।
তবে সে লজ্জার বাস দোহান দূরে গেল ॥

AMARBOI.COM

ঘ. লায়লী মজনু [মৎ-সম্পাদিত]
দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত

দৌলত উজির বাহরাম খানের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। সম্পাদিত লায়লী মজনুর ভূমিকায় আমরা নানা তথ্যের প্রমাণে ও অনুমানে তাঁকে ষোলো শতকের কবি বলে স্বীকার করেছি। তাঁর এ কাব্যের আনুমানিক রচনাকাল ১৫৪৫-৫৩ খ্রিস্টাব্দ। কবির আর একটি রচনার নাম 'ইমামবিজয়' —এটি কারবালা যুদ্ধবিষয়ক। অধ্যাপক আলী আহমদের সম্পাদনায় প্রাক্তন 'বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড' থেকে প্রকাশিত। লায়লী মজনু কাব্যেরও আদি আবিষ্কারক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ।

ইমামবিজয় [আলী আহমদ সম্পাদিত]

যুদ্ধবিদ্যা :
মল্লযুদ্ধ গদাযুদ্ধ অনেক শিখাইল
গুরুজ বহুমণি ফিরাইতে লাগিল।
পঞ্চশর দশশর আর সপ্তশর
একে একে শিখিলেন্ত কৌতুক অন্তর।
অগ্নিবাণ বৃষ্টিবাণ শিখাইল বহুত
চন্দ্রবাণ সূর্যবাণ দেখিতে অদ্ভুত।
সর্পবাণ ক্ষুরবাণ শিখিলা নিশ্চিত
নেজাবাজি বাণ শিখিলেন্ত প্রতিনিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খড়্গ বর্ম বিদ্যা পুনি শিখিলেন্ত অতি
অশ্ব আরোহণ শিখিলেন্ত মহামতি।

যুদ্ধ : অসুরের রণ কিবা সুরের সংগ্রাম
রাক্ষসের যুদ্ধ কিবা নাহিক উপাম।...
পুত্রক ছাড়িয়া বাপ ধাএ প্রাণ লৈয়া
বাপ তেজি পুত্র ধাএ না চাহে ফিরিয়া।...
রথরথী যত ইতি অনেক বিস্তর
অদ্ভুত সৈন্যসব অপরূপ বেশ।
সায়ী সারি মত্ত গজ অধিক বিশেষ।

মুসলিম নারীর অলঙ্কার ও বিলাপ :
আউল মাথার কেশ বাউর মলিন বেশ
সঘনে হানএ নিজ হিয়া
তেজিল কণ্ঠের হার খসাইল অলঙ্কার
মুছিলেক শিরের সিন্দুর
ভাঙ্গিল হস্তের চুড়ি অঙ্গুরী ফেলিল গুড়ি
বেশর করিল পুনি দূর।
কান্দএ দীঘল রাএ প্রাণ বিদারিয়া যাএ
হা হা মোর প্রাণের সাঙ্গাত।

পুন : আউল চিকুর অতি বাউল চরিত
গোসল করাইল শির গোলাপের জলে।

গোলাপজল : চন্দনের ব্যবহার
চন্দনে লেপন করি রাখিলেন্ত থালে।

কূটনীতি : দুষ্ট সনে বিবাদের নাহি কোনো ফল
কাল অনুরূপ কর্ম করিবা সকল।

লায়লী মজনু
(সমাজ ও সংস্কৃতি)

কবি লায়লী মজনুকে ইসলামপূর্ব যুগের আরব বলে কল্পনা করেছেন না। তাই পুত্র কামনায় কএসের পিতা 'নিরঞ্জন নামজপে জানিয়া সাফল' আর 'ধর্মপদ ভাবএ সারতত্ত্ব জ্ঞানে।' 'অধিক ধেয়াইয়া ধর্ম আরাধিয়া পাইলুঁ গুণের ধাম।' তিনি জানেন পুত্র দিয়ে 'সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম' হয়।

অদৃষ্ট, কর্মফল : মুঞি অতি শুভকর্মা সাফল্য জনম।
জনমে জনমে দেবধর্ম আরাধিলুঁ
যে সব পুণ্যের ফলে তোহ্মাকে পাইলুঁ
প্রসন্ন হৈল মোর দেব পরমার্থে।
অশেষ করিয়া দেবধর্ম আরাধন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুহ্মি পুত্র পাইয়াছি অমূল্য রতন।
বিশেষ কর্মের দোষে পুনি হারাইলুঁ।
নির্বন্ধ খণ্ডাইতে পারে শকতি কাহার।
কর্মের লিখন দুঃখ খণ্ডান না যাএ।
কর্মে যে ব্যাধি তা নহে ঔষধে দমন
বিঘট কর্মের দোষ না যাএ খণ্ডন।
তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণ নিধি গুরু।

প্রভৃতিতে জন্মান্তরবাদ ও অদৃষ্টবাদ তো রয়েইছে, তাছাড়া বৌদ্ধ-প্রভাবজ 'আল্লাহ' অর্থে ধর্ম, পুন্নাম নরকতন্ত্রের ছায়া এবং 'দেবধর্ম' আরাধনার কথা পাই।

কবি মরুভূমি আরবের কাহিনী বর্ণন করেছেন। কিন্তু আরবের মরু প্রান্তর বা মরূদ্যানের সন্ধান মেলে না কাব্যে। কেবল একবার শিবিরের কথা (লায়লী 'শিবিরেত গমন করিলা মনোরঙ্গে', একবার প্রদক্ষিণ করে গুরু ও মান্যজনকে সম্মান করার কথা (সপ্তবার প্রদক্ষিণ কৈলা উজপিত), এবং যৌতুকস্বরূপ উট দান ও উটের পিঠে চৌদোলে বসে লায়লীর শাম-দেশে গমন—এটুকুই এ কাব্যে আরবি আবহ। আর সব দেশী। তাই নজদ বনেও এদেশী বুনো পশুপাখিকেই দেখি। হিন্দুপুরাণের প্রতুল ব্যবহারে, ঘরোয়া জীবনচিত্রে, প্রাকৃতিক পরিবেশর চনায় কিংবা রীতিনীতি ও আচার সংস্কারের আলেখ্যে কবি তাঁর চোখে-দেখা প্রতিবেশ ও ঐতিহ্যসূত্রে পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার এবং শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকেই স্বীকার করেছেন। ফলে এ কাব্যে আমরা আরবি বিনামে বাঙলাদেশ ও বাঙালি জীবনেরই ছবি পাই।

বিদ্যা ও বিদ্যালয় : পাঠশালায় ছেলেমেয়েরা 'গুরুর চরণ ভজি, কুতুহলে চিত্ত মজি, শাস্ত্রপাঠ পড়ন্ত সদাএ।'

AMARBOI.COM

সেকালেও বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর ছিল :

ভাগ্যবন্ত পুরুষের বিদ্যা অলঙ্কার
বিদ্যা সে গলার হার বিদ্যা সে শৃঙ্গার।
পুরুষ সুন্দর অতি রূপে অনুপাম
গুণ না থাকিলে তার রূপে কিবা কাম।
পুরুষ বাখানি যদি হএ গুণধাম

কিন্তু নারীশিক্ষায় তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ ছিল না। পতিব্রতা হতে পারলেই ওদের জীবন সার্থক :

যুবতী রাখানি যদি পতিব্রতা নাম।

নাচ-গান-বাজনা ও চিত্র : রণবাদ্য ছাড়াও ঘরোয়া উৎসবে-পার্বণে নাচ, গান বাজনা ও কথকতার ব্যবস্থা থাকত। উজির হামিদ খাঁনের দান-ধ্যানের কথা নর্তক ও গায়েনের মুখেই দেশময় প্রচার হয়েছিল।

নটক গাইন গণে সত্য যথ কৃতি ভণে
প্রকাশ হইল সর্বদেশ।

লায়লী বিয়ের সময় 'বিবিধ প্রকার বাদ্য অনেক বাজন'-এর ব্যবস্থা হয়েছিল :

উচ্চ রব দাম সব গর্জিত আকাশ
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানাই বিগুল বাজে ভেউর কনাল
অনেক মধুর বাদ্য বাজাএ বিশাল।

কএসের শৈশবে তার জন্যে আমিরের বাড়িতে নর্তকী-গায়ক ও বাদ্যযন্ত্রাদির সুব্যবস্থা হয়েছিল :

নৃত্যগীতি নানা রঙ্গ কুতূহল
নৃত্য দেখিবারে দিলা নটক সুন্দর
নৃত্য গীত নটরঙ্গ যন্ত্র যথ ইতি।

আর নানাচিত্রও ছিল : পটেত বিচিত্ররূপ দিলেন্ত লিখিয়া।

মেয়েদের মধ্যেও নাচগান চালু ছিল : লায়লীর বিয়ের সময় লায়লীর সখীদের 'কেহ করে নৃত্য, কেহ গাএ গীত, কেহ বসি রঙ্গ চাএ।'

নারী সম্বন্ধে ধারণা ও সমাজে নারীর স্থান : মেয়েরাও প্রাথামিক শিক্ষা হয়তো পেত, কিন্তু তাদের উচ্চশিক্ষা দেবার উৎসাহ বোধহয় অভিভাবকের ছিল না। সতী সাধ্বী ও পতিব্রতা হওয়া ছিল নারীজীবনের আদর্শ।

কোনো পুরুষের প্রতি আসক্তা হওয়া ছিল তাদের অপরাধ। তাই লায়লীর মায়ের মুখে শুনি :

শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত
ভাবিনী হইতে তোর না হএ উচিত।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।

মেয়ের মতিগতি দেখে সন্দেহ জাগলে এ যুগের মা'রা যেমন করেন, লায়লীর মাও কএসের সঙ্গে মেয়ের 'ভাব'-এর কথা শুনে সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করলেন :

আজি হোন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশাল
কুলের মহিমা নিজ রাখহ আপনা।
লুকাইলা লেখনী ভাঙ্গিলা মস্যাধারে
প্রভু পাশে পত্র যেন লিখিতে না পারে।
ঘরের বাহির হৈলে জানিতে কারণ
প্রখর নূপুর দিলা কন্যার চরণ।

তাছাড়া, কন্যার সখীদেরও বললেন সতর্ক নজর রাখবার জন্যে। নারী-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও পুরুষের চেয়ে নারীর হীনতা সম্বন্ধেও তারা ছিল সুনিশ্চিত :

সুরপতি না বুঝএ বামা জাতি মর্ম
বামকর হস্তে কেবা করে দান ধর্ম
(তুল : স্ত্রীয়াশ্চরিতম্ দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা)

নারীর মধ্যে আঙ্গিক লক্ষণে পদ্মিনী জাতীয়া নারীই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হত। সতী নারী সতীত্ব রক্ষার জন্যে পুরুষকে লাঞ্ছিত করলে কিন্তু বাহ্‌বা পেত। মজনুগত-প্রাণ লায়লী বাসরে 'ক্রুদ্ধ হৈয়া আনল সমসর' স্বামীকে 'চরণ প্রহার দিয়া করিলা অন্তর।'

তাম্বুল মেয়েমহলে বেশি প্রিয় ছিল :

'কর্পূর তাম্বুল/পরিমল ফুল/ বিলাসএ যথনারী'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতা পিতার মর্যাদা সম্পর্কে হিন্দু ও মুসলিম ধারণার মিশ্রণ ঘটেছে :

জনক জননী দোঁহা মহিমা সাগর
স্বর্গ হন্তে দুর্লভ ভূমিত গুরুতর।
অতি পূজ্যতম যেন পরমার্থ দেবা
সর্বকার্য উপাধিক মাতাপিতা সেবা।
তোহ্মা আজ্ঞা লঙ্ঘিলে জন্মাএ মহাপাপ
ইহলোকে পরলোকে বিষয় সন্তাপ।
দেববাণী সমান জানিলুঁ তত্ত্বসার।

হিন্দুদের 'পিতার্স্বগ'-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি মেলে নিচের চরণগুলোতে :
মজনু পিতাকে বলছে, :

তুহ্মি সে মোহর গতি মনের আরতি
এহলোকে পরলোকে পরম সারথি।
লোম প্রতি শতমুখ যদি হএ মোর
কহিতে তোহ্মার গুণ নাহি অন্ত ওর।

লায়লীও মাকে বলছে :

লক্ষ অব্দ যদ্যপি তোহ্মার সেবা করি
তোহ্মাগুণ পরিশোধ করিতে না পারি।

বিবাহানুষ্ঠান : বিবাহে বর ও কনে পণ ছিল। বর বা কনে—যে পক্ষ কুলেশীলে শ্রেষ্ঠ, সেপক্ষই পণ গ্রহণ করত। তাই কএসের পিতা আমীর লায়লীর পিতা মালিককে কনে পণ সাধছেন। বিত্তবানদের যৌতুকে জমিজমি, দাসদাসী, ঘোড়া-হাতি উটাদিও থাকত, মধ্যবিত্ত ও গরিবেরা সাধ্যম তো নগদমুদ্রা, অলঙ্কার ও দ্রব্যাদি দিত। এখানে বিত্তশালীর যৌতুকের নমুনা রয়েছে। কএসের পিতা লায়লীর পিতাকে কনে পণ দেবার প্রস্তাব করলেন :

বহুমূল্য ধন দিমু রজত কাঞ্চন
প্রদীপ সমান দাস রুমী একশত
শতেক হাবসী দিমু যেন প্রতিপদ।
দুইশত উট দিমু শতেক তুরঙ্গ
পঞ্চশত বৃষ দিমু পঞ্চাশ মাতঙ্গ।

শুভকাজে ও বিয়ের সময় তিথিলগ্ন মানা হত। 'শুভক্ষণে লগন করিয়া কুতুহলে' লায়লীর বিয়ের ব্যবস্থা হল।

বিবাহানুষ্ঠানে সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মিত হত, তার নাম মারোয়া। বর-কনের প্রথম মিলনে দুপক্ষের সখী, বন্ধু ও আত্মীয়ের উপস্থিতিতে নানা রঙ্গরসের যে ব্যবস্থা থাকত তার নাম জুলুয়া। এ সময়ে বর কনের মধ্যে পাশাদি ক্রীড়ারও ব্যবস্থা হত, এর নাম 'গেরুয়া খেলা' এবং বর-কনের অন্য বাড়িতে অভ্যর্থনাও হত তার নাম 'গস্তফিরানো'।

এখানে কেবল মারোয়ার কথা আছে :

মারোয়া সাজন হৈল বিচিত্র সুঘট
স্থাপিলা রসাল পত্র সুবর্ণের ঘট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ সঙ্গে থাকে 'অনেক মধুর বাদ্য।' এবং

অবলা সুন্দরীগণ সুবেশ উত্তম
কৌতুকে করএ নাট অতি মনোরম।

বিয়ের মজলিশে সমাজপতিরা ও শাস্ত্রজ্ঞরা :

বিচার করএ শাস্ত্র পণ্ডিত সকলে।

বিয়ের পয়গাম পাঠাবার সময় কিংবা কথা পাকা করবার সময় এবং বরানুগমনের সময় নানারকম নাস্তা নেয়া হত। মজনুর পিতা পয়গাম নিয়ে গিয়েছিলেন ইষ্টমিত্রগণ সঙ্গে। এবং ইবন সালাম বরানুগমন করেছিলেন—

ষোল রস সঙ্গে করি রঙ্গ কুতূহলে।

কন্যাসজ্জার সময়ও রঙ্গরস হয়। লায়লীকে জোর করে বিয়ে দেয়া হচ্ছিল বলে তা জমে ওঠেনি। তবু সবাই,

কুমারীক চারিদিকে করিলা মাতলি
কেহ কেহ সহেলা গায়ন্ত মনোরঙ্গে
উপটন দিয়া কেহ কুমারীর সঙ্গে
কেহ কেহ দুষ্টরঙ্গে দিলেক ভুলাই
কেহ কেহ বলে ছলে দেয়ন্ত গোছাই
যতনে পৈরাএ কেহ সুরঙ্গ অম্বর
রত্ন আভরণ কেহ কন্যাকে পৈরাএ।

আগেই বলেছি কুলনারীরাও নাচ-গান করত। চট্টগ্রামে মেয়েলী গানের নাম সহেলা।

বাসরে—

রচিল কুসুম শয্যা দেখিতে আনন্দ
সখীগণে তথা নিয়া কন্যাক রাখিলা।

অলঙ্কার ও পোশাক :

নারীরা শীথে সিন্দূর ও কপালে চন্দন তিলক পরত। নখে-মাখত মেহেদি রঙ। মণিখচিত বেশর, মুক্তামাণিক খচিত সপ্তছড়ি হার, কনক কিঙ্কিণী, রত্নখচিত বাজুবন্দ, কঙ্কন, রত্ন অঙ্গুরী, চরণে নূপুর, এবং আরো বিবিধ ধাতব ও রত্নের আভরণ থাকত। বিচিত্র অম্বর (শাড়ি) প্রভৃতি দিয়ে মোহন 'দোলরী সাজ'ও করত তারা। বেণী হত রত্নখচিত বা পুষ্পমণ্ডিত। প্রসাধনসামগ্রী ছিল অঞ্জন, কাজল ও সুর্মা, তাম্বুল রাগ, সিন্দুর, চন্দন মেহেদি ও কুমকুম কস্তুরী প্রভৃতি।

পুরুষের পোশাকের বর্ণনা নেই। তবে প্রসঙ্গত জানা যায় :

অঙ্গেত বসন নাহি শিরে নাহি পাগ
পদ হস্তে পাদুকা করিলা পরিত্যাগ।

মেলা-মজলিশে, উৎসবে-পার্বণে, হাটে, আদালতে কিংবা আত্মীয়বাড়ি যাবার সময় সেকালের মধ্যবিত্তশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকেরাও ছাতা, লাঠি ও পাগড়ি-পোশাকও সজ্জার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করত। পাদুকা অবশ্য সবার থাকত না। সম্ভ্রান্ত লোকের পোশাকের মধ্যে জরির-কাজ-করা আলখাল্লা ও জুতো থাকত।

ভিখিরির ভেক : ভিখিরিরা 'গলে কন্থা খর্পর লই হাতে' ভিক্ষায় বের হত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্র ও পুত্রস্নেহ :

পিতৃপ্রধান সমাজের নিয়মানুসারে সমাজে মেয়ের চেয়ে ছেলের মূল্য মর্যাদা বেশি ছিল। মুখাগ্নি, শ্রাদ্ধ, পিণ্ডদান প্রভৃতি পুত্রের দ্বারাই সম্ভব। হিন্দুর এ-ধারণারও মুসলিম-মনে প্রভাব ছিল। তাই পুত্র দিয়ে 'সংসারের সুখ আর পরলোক কর্ম', এ ধারণা দৃঢ়মূল ছিল সমাজে। এজন্যে কন্যার চেয়ে পুত্রের প্রতিই মা-বাপের স্নেহ বেশি। তাই–

রেণু এক পুত্র অঙ্গে যদি সে লাগএ
গিরি ভাঙ্গি পড়ে যেন জনক মাথাএ।
তনয় চরণে যদি কণ্টক পশিল
জননী মরমে যেন শেল প্রবেশিল।
চন্দ্র বিনে গগন, প্রদীপ বিনে ঘর
পুত্র বিনে জগত লাগএ ঘোরতর।

এবং— কুলের নন্দন হৈলে গুণের আগল
পদ্মবনে বিকশিল যে হেন কমল।
শরীরে অঞ্জনী যেন পুত্র কুপণ্ডিত
তেজিতে লাগএ দুঃখ রাখিতে কুৎসিত।

তাই— সদাএ অনেক শ্রধা জনক মনএ
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ হৈতে তনএ।

AMARBOI.COM

যোগ ও সাংখ্য আসলে অভিন্ন। যোগ হচ্ছে সাধনপদ্ধতি আর সাংখ্য হচ্ছে সাধন মত বা দর্শন। এটি এদেশের আদিম ধর্মশাস্ত্র ও অধ্যাত্মদর্শন। ইহুদী-মানী-বৌদ্ধ এবং ঔপনিষদিক অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল জরথুস্ত্র শিষ্য ইরানি ও মধ্যএশিয়ার জনমনে। ইসলাম যখন ইরানে ও মধ্যএশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, পূর্বসংস্কারবশে সেখানকার জনগণ অদ্বৈতদর্শনে আস্থা রেখে ভক্তি বা প্রেমবাদে আকৃষ্ট হয়। পথ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এর সাধারণ নাম 'সুফিবাদ'। এ সাধনা দেহতত্ত্বে গুরুত্ব দেয়। যে-দেহাধারে চৈতন্যের স্থিতি, তাকে অস্বীকার করা সহজে সম্ভব নয়। যোগের মাধ্যমেই দেহ আয়ত্ত করার সাধনা চলে। গুরুবাদও বৌদ্ধ-প্রভাবজ। পাক-ভারতে তথা বাঙলাদেশে মুখ্যত সুফিসাধকরাই ইসলাম প্রচার করেন। যোগে তাদেরও স্বাভাবিক প্রশ্রয় ছিল। নিজেদের পূর্বসংস্কারের সঙ্গে মিল দেখে তারা হয়তো ইসলামের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। 'মারেফত' নামে এই যৌগিক দেহ সাধনভিত্তিক পীরবাদী ইসলামের প্রাবল্য ছিল এদেশে ষোলো শতক অবধি। আদিসৃষ্টি মুহম্মদ আল্লারই অংশ এবং আল্লাহ্‌র প্রেমজ সৃষ্টি, আর তাঁর খাতিরেই নিখিল জগতের যাবতীয় সব সৃষ্ট—এ মত সুফিবাদের সহজাত। ষোলো শতকের কবি যুগপ্রভাবে যোগ ও যোগীর (তথা সুফিবাদের) কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন।

হামদ অংশে নিরাকার আল্লাহ্‌র ইসলামি ধারণা সুব্যক্ত। কিন্তু 'নাত' অংশে সুফিমতের প্রেমজ সৃষ্টিতত্ত্বই অবলম্বিত। তাই কবি বলেন :

আকাশ পাতাল মর্ত্য এ তিন ভুবন
যার প্রেম রস হন্তে হইছে সৃজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা— ভাবেত (প্রেমে) জনম হৈছে এ তিন ভুবন
ভাব বিনে প্রেম নাহি প্রেম বিনে রস।
ভাব অনুরূপ সিদ্ধি পূরএ মানস।

গুরুবাদও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে এ তত্ত্ব ভিত্তি করেই :

সদগুরু প্রসাদে পরম গুণ শিক্ষা
মহামন্ত্র পাইয়া হইলা প্রেমে দীক্ষা।

যোগে বিশ্বাসী কবি দেহতত্ত্ব বর্ণনায়ও মুখর :

মৃত্তিকা সকল হোন্তে অতি মনুভব
যা হোন্তে সৃজন হৈল মানব দুর্লভ।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে ত্রিপিনীর ঘাট
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে শ্রীগোলার হাট।
মৃত্তিকার ঘট মধ্যে সরোবর রাজ
শতদল কমল ভাসএ তার মাঝ।
মৃত্তিকার কুণ্ডত বৈসএ হংসবর
নীর শুকাইলে উড়ে শূন্যের উপর।
মৃত্তিকার পাঞ্জরে সার্দুল পক্ষী থাকে
মহাযাত্রা পাইলে উড়এ তিনলোকে।

সূফী দরবেশের সান্নিধ্যের ফলেই ইসলামে দীক্ষিত বলে এবং পূর্ব-সংস্কারবশে যোগী-সন্ন্যাসী ও সূফী-দরবেশের ঐশ্বর্য বা কেরামতিতে অটল আস্থা ছিল। তাই -এ কাব্যে অমুসলমানের কাহিনী বলে মুনিযোগীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি এবং মজনুকেও যোগসাধনায় রত দেখি।

বনবাসী যোগীরা সিদ্ধপুরুষ :

জ্ঞানবন্ত কলেরব ভুবন বিখ্যাত
ভূত ভবিষ্যৎ আদি তাহান সাক্ষাত।
ক্ষেণেক গৌরব-দৃষ্টি যাহাকে হেরএ
জনম অবধি দুঃখ তাহান হরএ।
অশেষ মহিমা তান কহন না যাএ
কল্পতরু সমতুল মানস পুরাএ।
তাহান কারণ গতি অভয়া প্রসাদ
অখণ্ড প্রতাপে তান খণ্ডএ প্রমাদ।

মজনুও যোগীকে বলে —

তুহ্মি দেব ধর্মশীল গুণনিধি গুরু
সর্বদুঃখ নিবারণ যেন কল্পতরু।
তুহ্মি সিদ্ধ কলেবর জ্ঞানের গরিমা।

মজনু — তপোবনে তাপসী জপএ প্রভু নাম।
মায়াজাল কাটিল বর্জিল ক্রোধ কাম।
মহাভক্ত মহৎ ভাবক মহাযোগী
পরমজ্ঞানের নিধি প্রেমরস ভোগী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়ান চকোর রোজা ভঙ্গ না করএ
যাবতে বদন ইন্দু উদিত না হএ।
অহর্নিশি অবিরত দুই ভুরু মাঝ
মনোরম মসজিদে করএ নামাজ।
অজপা জপএ নিত্য নিঃশব্দ নীরব
ভব মধ্যে অভব ভাবেত মনোভব।
পরম সমাধিবর দেখিয়া মদন
পূর্বের দহন ভএ লইলা শরণ।
ধুইলা নয়ান পাপ নয়ানের জলে
দহিল মনের তাপ মনের আনলে।
দশদিশ মুদিলেন্ত না রাখিলা বাট
পঞ্চশব্দ বাজএ নটকে করে নাট।
মনস্তাপ তপনে তাপিত কলেবর
অনুশোচ জলধরে করএ রোদন
হাহাকার ধূম্র হন্তে হৈল খোয়াকার
পঞ্চবৈরী বিনাশিয়া এক মন কাএ
পরম সমাধি হৈয়া রহিল তথাএ
শয়ন ভোজন সুখ সকল হারাই
লায়লীর রূপ মনে রহিল ধেয়াই।
নয়ান শ্রবণ সুখ মুদিয়া সদাএ
নিঃশ্বাস ধরিয়া রূপ মনেত ধেয়াএ।
চিবুক কণ্ঠেত দিয়া যোগাসনে বসি
লায়লীর রূপ নিরীক্ষএ অহর্নিশি।
দোলন বোলন নাহি নীরস নয়ন
উরু ভেদি তরু হৈল নাহিক চেতন।
শরীর নগরে তান লাগিল ফাটক
কামক্রোধ প্রবেশিতে হইল আটক।
পরম ঈশ্বরভাবে পাগল হইল
অমৃত মথনে যেন বিষ উপজিল,
সংসারের মায়ামোহ অকারণ জানি
প্রেমরস ডোর দিয়া বান্ধিলা পরানি।

কবির পূর্বপুরুষ হামিদ খানকে কবি এই যোগী সুফি সিদ্ধ পুরুষরূপে কল্পনা করেছেন। তাই সুফির মতোই তাঁর সেবাধর্ম :

অন্নশালা স্থানে স্থান মসজিদ সুনির্মাণ
পুষ্করণী দিলেক ঠাঁই ঠাঁই
অনুদিন মহামতি পিপীলিকা মক্ষী প্রতি
সর্করাদি দিলেন্ত খাইবার
কাক পিক পক্ষী আদি শিবা সেজা চতুষ্পদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগাইলা সভান আহার
বাতুল আতুর যথ পালিলন্ত অবিরত
দানধর্ম করিলা বিশেষ।

আবার যোগীর মতোই তার সিদ্ধি। সুলতান হোসেন শাহ তাঁকে বাঘের মুখে, সাগরে, হাতির পায়ে, জতুগৃহে আগুনে, খড়্গ ও শর হেনে, গরল খাইয়ে সাতবার এই সাতরকমে পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। এমনি পরীক্ষায় পীর গাজীও উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন (গাজী কালু চম্পাবতী কাব্য)।

কবি বাহরাম খানও সূফীভক্ত ছিলেন। তাই প্রেম সম্বন্ধে উচ্চ ও পবিত্র ধারণা পোষণ করতেন তিনি। লায়লী-মজনুর প্রসাদ কামনা করেছেন তিনি এই বলে :

ধর্মবন্ত পুরুষ কামিনী সত্যবতী
দোহান প্রসাদে মোর হোক শুভগতি।

লায়লীর মৃত্যুর পর লায়লীর মাতা মজনুকে বলছেন :

তোর লাগি জন্মিছিল জগত মাঝার
তোর লাগি নিধন হৈল পুনর্বার।

গৃহ :

সাধারণের কুটিরের বর্ণনা এ-কাব্যে নেই। তবে পাঠশালার চৌআড়ি মালিক সুমতির পুরীর কিছু পরিচয় মেলে।

লায়লী মজনুর পাঠশালা ছিল—

চৌআড়ি মন্দির অতি বিবিধ শোভন
ফটিকের স্তম্ভ সব হিঙ্গুলি চন্দন।
চারিদিক উদ্যানসমূহ কুসুমিত
জাতী যুথী মালতী লবঙ্গ আমোদিত।
বিকশিত নাগেশ্বর চম্পক বকুল
মধু পিয়া মাতাল ভ্রমএ অলিকুল।
শারীশুক কোকিল রবএ সুললিত
ফলভাবে বৃক্ষ সব লুলিত লম্বিত।

আবার,

মালিকের পুরী কনক চৌআড়ি
রাজধানী সমসর
বিবিধ মন্দির বিচিত্র প্রাচীর
অপরূপ মনোহর।
চৌদিকে পুষ্পিত অতি সুললিত
জাতী যুথী বিকশিত
মঞ্জরী মুঞ্জর ভ্রমর গুঞ্জর
পিকরব সুললিত।

মালিকের বাড়িতে দ্বারী ছিল এবং অট্টালিকায় ছিল গবাক্ষ।
এ ছাড়া সে-যুগের নানা ছোটখাটো রীতিনীতির সংবাদও মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষৌরকর্ম : করপদ নখ তার শিরের কুণ্ডল
খেউর করিয়া অঙ্গ করিলা নির্মল।
খেউর করাই অঙ্গ মর্দন করিলা
স্নান করাই ভাল বস্ত্র পরাইলা।

দান সদকার গুরুত্ব আজকের মতোই ছিল। আপদ বালাই 'নিছনি'র প্রথাও ছিল।

১. রত্ন দান করএ মাগএ পুত্রদান
২. করিলা সহস্র ধনে শির বলি হার
যথেক ভাণ্ডার ছিল করিলেক দান।

শপথে : চাঁদ সূর্যের দোহাই :

রবি শশী সাক্ষী আছে আর করতার
যাবত জীবন প্রেম না করিমু ভঙ্গ
প্রেমের অনলে তনু করিমু পতঙ্গ।

দেশে বাউল-বৈরাগীর আধিক্য ছিল। তাই বাউল ছিল সহজ উপমার বিষয় :

১. আউল করএ কেশ বাউলের বেশ
২. বিকশিত তনু মাতা মুকলিত কেশ।
পরিধান পিতাম্বর যোগিনীর বেশ।

মৃতের সৎকার (লায়লীর শব) :

অবশেষে মাতাবরে গোলাবের জলে
কন্যাকে গোসল দিল বিরল সুস্থালে।
নির্মল অম্বর দিয়া করিল কাফন
চর্চিত করিলা অঙ্গ কুঙ্কুম চন্দন।
শাস্ত্রের বিধান মতে দাফন করিয়া
পাষাণে বান্ধিয়া গোর করিলা নির্মাণ।

এখানে অমুসলমান লায়লীর দাফন কবির অনবধানতায় ইসলামি নিয়মে সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতিবেশী সম্পর্কে ধারণা :

কবি হয়তো পড়শী থেকে প্রীতি পাননি অথবা ভুয়োদর্শন লব্ধ জ্ঞান থেকেই মজনুর মুখে বিবৃত করিয়েছেন প্রতিবেশীর নিন্দা :

দেশ হোন্তে অরণ্য সহস্যগুণে ভাল
গৃহবাস সুখরঙ্গ সহজে জঞ্জাল।
কঠিন কপট মন মনুষ্য নিশ্চএ
নদিয়া দারুণ নতি নিঠুর হৃদএ।
ধর্মনাশা অপকারী অসত্য বচন
পরমন্দ চিন্তএ হরএ পর ধন।
মাতাপিতা গুরুজনে নাহিক ভকতি
ভাইর সহিতে বন্ধুর নাহিক আদর
সুখেত মধুর বাণী কপট অন্তর।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যমানে ভাল কহে অবিদিতে মন্দ
ইষ্ট সনে পরিবাদ মিত্র সনে দ্বন্দ্ব।
কার সঙ্গে কাহার নাহিক উপরোধ
অন্যে অন্যে সভানের বিবাদ বিরোধ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহঙ্কার মত্র
সাফল্য জনম লভি বিফলে বঞ্চএ।

ধার্মিক কবির সরল বিশ্বাস :

না চিন্তিও পরমন্দ তুক্মি কদাচিত
তবে সে তোক্মার মন্দ না হৈব নিশ্চিত।

আর পাই হিন্দুপুরাণের অবাধ ও অজস্র ব্যবহার। মদন, রতি, হরি, হর, রাবণ, অহল্যা, দ্রৌপদী, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, রোহিণী, কুবের, বৈকুণ্ঠ, কল্পতরু, চিন্তামণি, অমৃত প্রভৃতি উপমা উৎপ্রেক্ষার অবলম্বন হয়েছে।

সমাজে কদমবুসির রেওয়াজ ছিল। ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম বিরল ছিল না, মজনু—'দণ্ডবৎ হৈলা তবে মুনির সাক্ষাত'।

কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য

দৌলত উজির বাহরাম খান কবি-পণ্ডিত। এ ধারণার সাক্ষ্য ছড়িয়ে রয়েছে সারা কাব্যে।

স্বল্প কথায় চিত্রাঙ্কন তাঁর অন্যতম দক্ষতা :

১. বিকলিত তনু মাতা সুকেশিত কেশ
পরিধান পীতাম্বর যোগিনীর বেশ।
২. আগে ধাএ কত্রস বালকগণ পাছে
মাবিয়া ফিরাব তারে যার যেই ইচ্ছে।

AMARBOI.COM

ঙ. *গোরক্ষ বিজয়*

শেখ ফয়জুল্লাহ বিরচিত (ষোলো শতক)

শেখ ফয়জুল্লাহর 'গোরক্ষবিজয়' আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে। বহুকাল পরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সত্যপীর পাঁচালীর এক পুঁথিতে নিম্নলিখিত অংশটুকু পান :

গোর্খবিজএ আদ্যে মুনিসিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত।
খোঁটাদুরের পীর ইসমাইল গাজী
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন।
মুনি রস বেদ শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ কহি মন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব মুনি–৭, রস-৬/৯, বেদ-৪, শশী–১ ধরলে রচনাকাল ১৪৬৭ বা ১৪৯৭ শকাব্দ তথা ১৫৪৫ বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দ মেলে। এটি সত্যপীর পাঁচালীর রচনার সন। তাহলে 'গোরক্ষবিজয়' ও 'গাজীবিজয়' রচনার আনুমানিককাল আরো দশবছর আগে। সুতরাং শেখ ফয়জুল্লাহ নিশ্চিতই ষোলো শতকের কবি। শেখ ফয়জুল্লাহ তাত্ত্বিক কবি। গোরক্ষবিজয়ে যোগ ও দেহতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়েছে, অপ্রাপ্ত গাজীবিজয়ে পীর গাজীর মারফততত্ত্ব এবং 'সত্যপীরে' পীরমাহাত্ম্য ও কেরামতি পরিব্যক্ত বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। গোরক্ষবিজয় বৌদ্ধ, গাজীবিজয় ইসলামি এবং সত্যপীর লৌকিক বিশ্বাসভিত্তিক।

যোগীবেশ : শিবের উত্তম জটা শ্রবণেতে কড়ি।...
ভাঙ্গ ধুতরা খায় শিব।
সিদ্ধির ঝুলি সিদ্ধের কাঁথা তাঁহার গলাত।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া
মুণ্ডে আর হাতে তুমি কেহ্নে পৈর মালা
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম ঝুলি ছালা।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রহিল এড়াই।
ছাই, কাঁথা, ঝুলিকেণড়িহাতে নড়ি হাতে
লাঠি লৈল আর পানাই ছিল পায়ে।

ষোলশত নারীর ঐতিহ্য : কৃষ্ণের গোপী, কদলরাজ্যে মীননাথ, পদ্মাবতী ১৬০০ রাজপুত।

হাড়ি (Sweeper) : হাতে ঝাড়ু লহ তুমি কান্ধেত কোদাল।

ব্যভিচার : সৎমাএ ভজিব তুহ্মি দেখিয়া যোয়ান।

কেশ শোভা :

শিরেত লম্বিত কেশ
কবরী বান্ধিল ঠমকে।
পরিধান পুষ্পমালা কবরী শোভিছে ভালা
যেন দেখি বিজুলি চমকে।

অলঙ্কার : (বুকে) দোলে রত্নহার, কটিতে কিঙ্কিণী, চরণে

রাজাকে : নবদণ্ড ধরৌক মাথাএ, চামরে করৌক রায়।
আসন নামাইয়া বসে বকুলের তল

বকুলবৃক্ষ : গোর্খনাথ বসি আছে বকুলের তলে।
বিজয়ানগর ছাড়ি বকুলেত আইল
বকুলের তলে নাথ আসন করিল।

রাঢ় অঞ্চলে নরখাদক মানুষ ছিল :

তবে যতিনাথ (গোর্খ) রাঢা দেশে চলি গেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাক্ষাতে দেখিয়া দেবী (গৌরীকে) বহুল গঞ্জিলা
কোন্ কার্য কর তুমি রাক্ষস আচার
দেবতা হৈয়া কর মনুষ্য আহার।

দেবীর পূজা : তবে সতী যতিনাথে নিভৃতে কহিল

প্রচার : বৎসরেত একবার পূজিতে বলিল।
সেই সে গোর্খে তবে নিবন্ধ করিল
কালী বলি এক মূর্তি রাঢাতে রাখিল।

ব্রাহ্মণের বেশ : গলে তিন গুণ দিল কপালেতে ফোঁটা
মাথাতে আলগা ছাতি লগে লইল লোটা।

কদলীরাজ্যের ঐশ্বর্য :

অগুরু চন্দন গন্ধ সর্ব স্থানে পাএ
চারি কড়া কড়ি বিকায়ে চন্দনের তোলা
কদলীর প্রজাএ পৈরে পাটের পাছড়া
প্রতি ঘরে চালে দেখি সোনার কুমড়া।
কার পুষ্করণীর জল কেহ নাহি খাএ
মণি মাণিক্য তারা রৌদ্রেত শুকাএ।
প্রতি ঘরে শয্যা দেখে নেতের পালঙ্গ
সোনার কলসে সর্বলোকে খায় পানি।

কদলী নগরের নারীর : বক্ষেতে নাহিক বস্ত্র রত্নহার দোলে

পুকুরে ও পুকুর পাড়ে :

হংস চক্রবাকে তাতে পঙ্কজ উৎপল
তারি পাড়ে নানা তরু পরম সুন্দর
আম কাঁঠাল আর গুয়া নারিকেল।
তাল খাজুর আর নানা বর্ণ ফুল।

শাস্তিপদ্ধতি : শূলে, শালে বিদ্ধ করা, কেটে ফেলা, পেষণ, পুড়িয়ে মারা।

বাস ও খাদ্য : মণ্ডপেত দিমু বাস,
খাবারী (খোরা) ভরিয়া দিমু ভাত
নিতি নিরমিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই।

গৃহী যোগী-যোগিনী :

কাপড় বোনা ও বিক্রি সূতি তুমি যে বুনিবা ধূতি
হাটে নিলে বেচিলে হবে কড়ি।

সমাজে মদ : যখনে সমাজে যাইবা মদ্য ঘটি মান্য পাইবা
কথা কইবা দুই হাতে নাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার : সুবর্ণ কাছাটি (নর্তকীর জন্য) দিতে সোনার মন্দিরা
মৃদঙ্গ কর্তাল দিতে সুবর্ণ চতোরা।

নর্তকীর সাজ ও অলঙ্কার :

গলাতে দিলেন নাথ সাতছড়ি হার
করেতে কঙ্কণ দিল অতি শোভাকার।
কপালে তিলক দিল নয়ানে কাজল
কর্ণেতে দিল নাথ সুবর্ণ কুণ্ডল।
পায়েতে নূপুর দিল কনক উঝটি–
গায়েতে কাঞ্চলি দিল, কোমরে কাছটি।

যোগীর সাধ্য : আদিচন্দ্র নিজচন্দ্র উনমত গরল চন্দ্র
এই চারি শরীর ব্যাসন।
আদিচন্দ্র করি স্থিত নিজচন্দ্র সহিত
উনমত করিয়া সন্ধান
তিনচন্দ্র সম্বরিয়া আপনাকে ভার দিয়া
গরল চন্দ্র সব করে পান।
চারি চন্দ্র সম্বরিয়া ভবসিন্ধু তর গিয়া
তবে সে সকল রক্ষা পায়।

যোগী শবের গোর দেয়া হয় :

আমি মৈলে তুমি মোরে দিও আসি মাটি।

বিভিন্ন দিনে দেহতত্ত্ব :

শুক্রবারে বহে বারি সুষুম্না জান
গঙ্গা যমুনা দুই ধরত উজান।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই সুমেরুর চূড়া
মধ্য কমল মধ্যে বন্দী হয়ে চোরা।
শনিবারে বহে বায়ু শূন্যে মহাস্থিতি
পূর্বেতে উদএ ভানু পশ্চিমে জ্বলে বাতি।
নিবিতে না দিও বাতি জ্বাল ঘন ঘন
আজুকা ছাপাইয়া রাখ অমূল্য রতন।
রবিবারে বহে বায়ু লইয়া আদ্যমূল
অগ্নিএ পানিএ গুরু রাখ সমতুল।
অগ্নিএ পানিএ যদি না রাখ গাভুরালি (যৌবন)
নিবি যাইব অগ্নিসব রহিয়া যাইব ছালি।
সোমবারে বহে বায়ু সহজ সঙ্গীত
শ্রীগোলা নগরে বাদ্য বাজে সুললিত।
ঝমকে ঝমকে বাদ্য বাজে নানা ধ্বনি
ইন্দ্রের ভুবনে যেন নাচএ নাচনী।
মঙ্গলবারে বহে বায়ু জুড়িয়া মঙ্গলা
খেমাইরে অঙ্কুশ দেয় মনারে পাগলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গগনেতে মত্তহস্তী ছুটে নিরন্তর
ছান্ধিয়া বান্ধিয়া রাখ মন্দির ভিতর।
বুধবারে বহে বায়ু বুঝ আপে আপ
ফিরিয়া খেলাও গুরু দুই মুখ সাপ।
চাপিয়া গর্জিয়া উঠে বিষম নাগিনী।
গুরু মুখে চিনি লহ সরুয়া শঙ্খিনী।
বৃহস্পতিবারে বহে বায়ু বিরলে দিয়া চিত
গগন মণ্ডলে শুয়া ডাকে বিপরীত।
শুয়া গুটি নহে গুরু জীবন প্রাণধন
সাতবার ভ্রমিয়াছে এই তিন ভুবন।
বুঝ বুঝ ওহে গুরু বাউর বিজয়া
আপ্তমা পরিচয় করি রাখ নিজ কায়া।
অধঃরেত উর্ধ্বে তালি দেও গুরু মোছন্দর
আপ্তমা ত্রিচল কর শরীর ভিতর।
বারে-বাউরে প্রবোধ দিয়া বায়ু কর বন্দী
মূল কমল মধ্যে বায়ুর বুঝ সন্ধি।
মেরুমূলে রহি চন্দ্র না টুটির কলা
বেঙ্কা নালে সাধ গুরু না করিহ হেলা।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই বশ কর ভালা
মেরু মূলে রহিয়া চন্দ্র নাচিব গোপালা।
বুঝ বুঝ গুরু জ্ঞানতত্ত্ব বুঝ সন্ধি
রবি শশী চলি যাএ তারে কর বন্দী।
মন হএ পবন পবন হএ সাঞি
হেন তত্ত্ব কহিয়াছে আপনে গোসাঞি।
মন পবন সহিত এক করি জোড়
ক্রমে ক্রমে টানি আনে মনের ভাণ্ডার।
চাপ তিন তিহরী উড়িয়া থাউক ধূয়া
আনল জ্বালহ গুরু স্থির রাখ কায়া।
ত্রিবেণী করহ স্থির কর্ণে দেও তালি
উপরেত চন্দ্র রাখি কর ঠাকুরালি।
ডাইনেতে রাখিঅ অগ্নি আগে তারে জ্বালি
কোন কালে না টুটিব তোমার গাভুরালি।
স্থাপন করহ মন আমানেত বসি
আদিত্যবারেত পালিঅ তিথি একাদশী।
অধঃ উর্ধ্বে গুরুদেব তুলি ধর কাম
শরীর সুন্দর হৈব চিকন হইব চাম।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাম ক্রোধ লোভ মোহ এ সকল বৈরী
তাহারে রাখিঅ গুরু স্বতন্তর করি।
পবন আমল করি তারে কর সন্ধি।
রবি শশী আইসে চলি তারে কর বন্দী
পবন আমল তুমি যদি সে করিলা।
ব্যক্ত অব্যক্তের পন্থ সব উদ্ধারিলা।
মহা জ্ঞান পাইয়া মীর দূর কৈল মায়া।

যোগীর অন্ন : সুধা অন্ন তাহাতে আনুনি কচুর শাগ।

গুরুবাদ : অসার সংসার মধ্যে গুরুমাত্র সার।

যোগীর গান

জন্মরহস্য : একদিনের হইলে বিন্দু নিহারে সে চলে
দুই দিনের হলে বিন্দু রক্ত সঙ্গে মিলে।
তিন দিনের হলে বিন্দু ফেনার আকার
চারদিনের হলে হয় দেহের সঞ্চার।
পঞ্চদিনের হলে হয় কাজলের প্রায়
ছয় দিনে রঙ ধরে শুনহে তাহায়।
সপ্ত দিনের হলে বিন্দু শরীরের মোহারা
অষ্ট দিনের হলে হয় হাড়ে মাংসে জোড়া।
প্রথম মাসের সময় জানে বা না জানে
দুই মাসের সময় লোকাচারে শুনে।
দিতমাসের সময়েত রক্ত দলা দলা
চারমাসের কালে হয় হাড়ে মাসে জোড়া।
পঞ্চমাসের সময়েত পঞ্চফুল ফোটে
ছয়মাসের সময়েত এযুগ পালটে।
সাতমাসের সময়েতে সাতেশ্বরী খায়
অষ্টমাসেতে মন পবনে চিয়ায়।
নয়মাসে সময়েতে নবঘন স্থিতি
দশমাসে দশদিনে পিণ্ডারুণ গতি।
সোমে স্থিতি মঙ্গলে নাভি বুধে গঠন বুক
বৃহস্পতিবারে গঠেন পৃষ্ঠ আর মুখ।
শুক্রবারে গঠিয়াছেন সুখের দুটি আঁখি
ফুল ফল নানা চন্দ্র যাহে নয়নে দেখি।
শনিবারে গঠিয়াছে শুনিতে দুই কান
যা দিয়া গুরুর বচন শুনি অষ্টক্ষণ।
রবিবারে গঠিয়াছে যোগের যোগমাথা।
স্থাপিত করিয়া জীবন বসায়েছে তথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহমনের উপাদান

যোগীর গান : মায়ের চার চিজের কথা শুন মন দিয়া
গোস্ত-পোস্ত-লোহ-লোম চার চিজে দুনিয়া।
বাপের চার চিজের কথা শুন দিয়া মন
হাড়-রগ-মণি-মগজ চার চিজে পত্তন।
নিরঞ্জনের চিজের কথা শুন বুদ্ধিমান
হাত-পা-নাক-মুখ-চক্ষু আর কান।
বাপের চার মায়ের চার নিরঞ্জনের দশ
এই আঠার মোকামে ধনি খেলছে মহারস।

ঋতু ও রমণ

যোগীর গান : মাসে মাসে ঋতুবতী শাস্ত্রের বচন
তাহে কুলক্ষণ যদি না করে রমণ।
রবিবার অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী
প্রতিপদে পূর্ণিমায় না করিবে রমি।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার
যুবা কালে দরিদ্রতা ঘিরে আসে তার।

সঙ্গমরীতি : মাসে এক বৎসরে বার (সুজনের গুরু)
ইহার মধ্যে বাছাধন যত কমাইতে পার।

ক্ষেত্র ও বীজ : নারী পুরুষ জন্মরহস্য :
ঋতু হইল ফুল গাছ বিন্দু হইল বীচি
রমণী হইল জমি তার ঋতু হইল গাছি।
আত্মাই পরমহংস তা শূন্যরূপীও —অজপা—পরমাত্মা
হংসী—অজপা আদ্যাপন্তী।

চ. বিদ্যাসুন্দর/ রসুল বিজয়/ হানিফার দিগ্বিজয় [মৎ সম্পাদিত]
শা'বারিদ খান (ষোলো শতক ১৫৩০–৫০খ্রিস্টাব্দ)

শাহবারিদ খান তিনখানি গ্রন্থের রচয়িতা। এখানে উক্ত তিনখানি গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতি রয়েছে। এর ভাষা সংস্কৃত বহুল।

নিমন্ত্রণ রীতি : সুগন্ধি তাম্বুল বাটি ঘরে ঘর
বোলাইলা সবরাজ।
মজলিশে : সব মহাজনে বৈসে রঙ্গ মন
নর্তকে নৃত্য করে।
তথি বেয়াল্লিশ বাজা বাজএ ঘনে ঘন
সব হুলস্থুল অতি।
রাজ অন্তঃপুর শব্দ আনন্দ উল্লোড়
পড়এ বিবিধ ভাতি ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ্যানারীগণ নাচে ঘনে ঘন
মহাশব্দ রাজপুরে।

কন্যাস্নান : দিয়ামে জোয়ানি বান্ধিয়া আলাম
শুভক্ষণ জুমাবারে॥
কস্তুরী চন্দন করে বিলেপন
হরিষে কুমারী অঙ্গে।
সব সুনাগরী সুখ রব করি
তেলোয়াই দেহি রঙ্গে॥
এ দূর্বা হলদি আনি সীমন্তিনী
সবে মিলি দেয়ন্ত আগ॥

তেলোয়াই : উৎপল সঙ্গে অঙ্গ বিমলএ
সুখ মুখে অনুরাগ॥
সপ্তদিন রাতি তেলোয়াই নিতি নিতি
নারী সবে দিলা রঙ্গে।
সুবাসিত জলে করাইল গোসল
ভূষণ ভূষে কর্ণে অঙ্গে॥

কন্যার রূপ : কুটিল কুন্তল করিএ উচ্চার
কবরী কানড় ছন্দে।
শুক্ল কুসুম প্রসৃতি কুচ বিরাজিত
কুঞ্জ ভ্রমর মকরন্দে॥
শিষেত সিন্দূর সুর বিকিরিত
শোভিত সিন্দূর ভালে।
যেহেন মেদুর অরুণ অঙ্কুর
বিচিত্র তারক মেলে॥
অলকা দুলিত দ্বিরেফ ভুলিত
জানি অরবিন্দ ভুলে।
বদন সুন্দর পূর্ণ শশোধর
কিবা সরসিজ রঙ্গে।
কুমুদ নয়ান মাঝে তিল ফুল
বান্ধুলি অধর সঙ্গে॥

রসুলকে যুদ্ধের প্রবর্তনা দিয়েছে ইসলাম প্রচার বাঞ্ছা। কাজেই এ এক প্রকার জেহাদ। তাই —

রসুল বিজয় : যে পড়ে যে শুনে পাপ বিনাশ।
পুণ্যফলে হও বিহিস্তে বাস॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রের নামও সুন্দর :

পরশু, তোমর, শেল, শূল, ভয়ঙ্কর।
পট্টিস, খঞ্জর, শক্তি, মুষল, মুদগর॥
নারাচ, নালিকা, শঙ্খ, গদা, ভিন্দিপাল।

যোগিনী : যোগিনী হইমু সংসারে ফিরিমু
যথা তোমার লাগ পাই।

বিষ্ণুতৈল : বিষ্ণু তৈল পানি সবে দিল আনি
করাইলা তখন চৈতন্য।
সব সখী পাত্র হাতে বিষ্ণুতৈল ঢালে মাথে
আগর চন্দন লেপে গাএ।

সঙ-সজ্জা : আমীরক প্রণমিয়া উমর চলিল।
জুব্বা এক তুলি নিজ অঙ্গে চড়াইল॥
নব মণিকলা বীর মুণ্ডে তুলি দিলা।
শৃগালের লেজ্জা কলা উপরে বান্ধিলা॥
ভালা এক ঢোল আনি গলে তুলি দিল।
একটি বন্দুক বাম হস্তেত ধরিল॥
মোহাম্মদী জুমিক কোমরে কাছি লৈল।
তাহার ভিতরে পাথরের গুলি থুইল॥
অর্ধমণি একমণী পাথরের গুলি।
জুমিক ভিতরে বীর লইলেক তুলি॥

ছ. রসুলবিজয় [মৎ সম্পাদিত]

জায়েনউদ্দিন বিরচিত

(১৪৭৪ খ্রিস্টাব্দে কিংবা সতেরো শতকে রচিত)

'রসুলবিজয়' আরবী 'মাগাজী' জাতীয় যুদ্ধকাব্য। ইসলামের প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছায় রসুল মুহম্মদের দিগ্বিজয়ই এ কাব্যে বর্ণিত বিষয়। এখানে ইরাকরাজ জয়কুমের সঙ্গে রসুলের লড়াই বর্ণিত। জায়েনউদ্দিন 'রাজরত্ন রাজেশ্বর' এক ইউসুফ খানের আগ্রহে রসুলবিজয়' রচনা করেছিলেন। ইনি যদি শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৬-৮১) হন তাহলে তাঁর সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পূর্বে (১৪৭৪-৭৬) এ কাব্য রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কবির পীর ছিলেন শাহ মুহম্মদ খান। ইনি যদি 'মক্তুল হোসেন' কাব্যের রচয়িতা মুহম্মদ খান হন তাহলে কবি জায়েনউদ্দিন সতেরো শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। ইউসুফ খান যদি কররানী বংশীয় হন তাহলে জায়েনউদ্দিন হবেন ষোলো শতকের তৃতীয় পাদের কবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিবৈর : এই কথা শুনি নবী কহিতে লাগিলা
অনল বরণ হই গর্জিয়া উঠিলা।
কোটলা তুড়িয়া আলী করিব বাদশাই
অন্দরেত যাই আলী জব করিব গাই।
অন্দরেত যাই আলী জব করিব গরু
সেই শের থোন দিমু তোমার রাজার জরু।
কলিমা পড়াইয়া সব ভজাইমু জিগির
বলিহীন শাস্ত্র পূজা না রাখিমু ফিকির।

দেশী উপমাদির ব্যবহার :

ক. কুম্ভকর্ণ দৈত্যমূর্তি ভয়ঙ্কর।
খ. কি রাম যুদ্ধ কিবা পাণ্ডবের রণ
গ. যদ্যপি থাকিত ভীম এ যুদ্ধ মাঝার
গদা তুলিল দেখি ধাইত সত্বর।
কিবা কৃপাচার্য যে বিরাট অভিমন্যু
সে সব এ যুদ্ধ দেখি পলাইত অরণ্য
ঘ. গরুড় সদৃশ শর বিদ্যুৎ সঞ্চার।
ঙ. ব্রহ্মসম তেজবন্ত মৃগেন্দ্র সমান।

একটি যুদ্ধের দৃশ্য : পদাতিক পদধূলি ঢাকিল আকাশ
দিশে অন্ধকার, নাহি রবির প্রকাশ।
গজে গজে যুদ্ধ হইল দন্ত পেশাপেশি
অশ্বে অশ্বে যুদ্ধ হৈল মেশামেশি।
ধানুকি ধানুকি যুদ্ধ অস্ত্র বরিষণ
বরিষার মেঘে যেন বরিষে সঘন।
অস্ত্র জালে ভরি গেল গগন মণ্ডল
বীরের গর্জনে ভূমি করে টলমল।
গদাগদা ঘরিষণে উল্কা পড়ে খসি
দীপ্তিমান হই গেল অন্ধকার নিশি।
খড়্গ খড়্গ যুদ্ধে করে উঠে খরখরি
ভিন্ সূর্য হই যেন চমকে বিজুরি।
অন্যে অন্যে মল্ল করে হই জড়াজড়ি
বাঝিল তুমুল যুদ্ধে ভূমিতলে গড়ি।

মুসলমানেরা কাফেরদের বুঝাচ্ছে :

কৃপার সাগর নবী আসিছে নিকট
ঝাটে করি ভেট আসি তাহার নিকট।
তাহান কলিমা কহএ মন্ত্র জপএ
কোটি জন্মের পাপ সেই ক্ষণে ক্ষএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিবা চারি বেদ মধ্যে শাস্ত্র সব জান
কলিমা বাখান জান আছে তান স্থান।
বিলম্ব করহ কেনে কাফিরের গণ
অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ।

'অবিলম্বে তোষ যাই নবীর চরণ'— এ কথা বলবার সুযোগ করে নেবার জন্যেই দিগ্বিজয়।

প্রণয়োপাখ্যানাদি গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতি (১৭ শতক)

ক. সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী

কাজী দৌলত বিরচিত (১৬৩৫-৩৮খ্রিস্টাব্দ)

কাজী দৌলত আরাকান রাজ্যের রাজধানী রোসাঙ্গের অমাত্য আশ্রিত প্রথম কবি। কবি মিয়াসাধনের আউধী কাব্য 'মৈনাসৎ'-এর স্বাধীন অনুবাদমূলক কাব্য এই সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী। কবি কাজী দৌলতের আকস্মিক মৃত্যুতে এ-কাব্য অসমাপ্ত থেকে যায়। পরে কবি আলাউল একটি উপ-কাহিনী সংযোজন করে একাব্যে সম্পূর্ণতা দান করেন। কাজী দৌলত রোসাঙ্গের লস্কর উজির (সৈন্য বা সমরমন্ত্রী) আশরাফ খানের আগ্রহে উক্ত কাব্যরচনায় ব্রতী হন। এই সময় চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল, সে-সূত্রেই রাজধানী রোসাঙ্গে বাঙালি নাগরিক ও উজির-চাকুরে-সদাগর প্রভৃতি থাকতেন।

বন্দনা :
বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন
সব তেজি খোদা এক জানিও নিশ্চিত
তার সম বেদমন্ত্র নাহি পৃথিবীত।

মুহম্মদের নুর ভুবন সৃষ্ট :
মহম্মদ আল্লার রসুল সখাবর
যার নুরে ত্রিভুবন করিছে প্রসর।

মুহম্মদের সিফত : দ্বৈতবাদ :
আহাদ আছিল এক মিম হন্তে পরতেক
যে মিমেতে জগত মোহন

দস্যু-তস্কর : ঠগ তামন ঢেঙ্গ ডাকাইত সঙ্গতি।

উপমা : ঠাকুর, বেদমন্ত্র, সপ্তদ্বীপ, বিশ্বকর্মা, রতি, শঙ্কর, মদন, মুরারি, অম্বিকা, হরগৌরী, দ্রৌপদী, পাণ্ডব, কালী, দশানন, কীচক।

রাজার আদর্শ : পুত্রের সমান করে প্রজার পালন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোসাঙ্গের মুসলমান : আশরফ খান :

হানাফী মোজাব ধরে চিস্তি খান্দান
ইমাম রতন পালে প্রাণের ভিতর।
লোক উপকার করে নাহি আপ্তপর
পীর গুরু অভ্যাগত পুজন্ত তৎ পুর।
মসজিদ পুষ্করণী দিলা বহুল বিধান
সৈয়দ কাজী শেখ মোল্লা আলিম ফকির
পূজেন্ত সে সবে যেন আপনা শরীর।
সৈয়দ শেখ আদি মুঘল-পাঠান

নৌকা :

নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে
নব শশীগণ যেন জলে নামি ভাসে।
দশদিন পন্থ নৌকা একদিনে যায়।
সুবর্ণের হংস যেন লহরী খেলায়।
রজতের বৈঠা সব শোভন নৌকার
জল সিঞ্চে স্বর্ণ পাখী পক্ষ যে রূপার।
দীপ্তিমন্ত নৌকা যেন বিজলী সঞ্চারে
মরকত স্তম্ভ সব রজতের ছা'নী
নবরঙ্গ খোপা যেন মুকুতা খেচনী।
আগে পাছে চামর দোলায় ঘন ঘন
বিবিধ পতাকা উড়ে নৌকার শোভন।
স্বর্ণ শিখি পেখমে বিচিত্র পাছা নৌকা
সুরচিত উঞ্চ অগ্র যেন দেখি শিখা।
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় নৌকার গঠন
পবন গমন নৌকা সমুদ্র বাহন।

বাদ্য : গীতনৃত্য :

দুন্দুভি ভেউর ঢোল মেঘের গর্জন।
মৃদঙ্গ, তবলা, পিনাক আদি বেণু বীণা।
করতাল মৃদঙ্গ রবাব বংশী নাদ
উপাসাঙ্গ মৃদঙ্গের করকা সংবাদ।
শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ অনেক বাদ্য বাজে
মেঘের গর্জন যেন দুমদুমির রোল।

সরোবর :

স্থানে স্থানে সরোবর সুনির্মল জল
জলে শোভে বিকশিত সুরঙ্গ কমল।
হংস হংসী ক্রীড়া করে পদ্ম পত্র তলে।

হিন্দুসমাজ :

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর।

নর মহিমা :

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান।
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল।

বিদ্যা : আশরাফ খান :

নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানারস চয়
পড়িলা শুনিলা নিত্য সানন্দ হৃদয়।
আরবী ফারসী নানা তত্ত্ব উপদেশ
বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ।
গুজরাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর
সহজে মহন্ত সভা আনন্দ সায়র।

পুষ্প : কুন্দ, মালতী, কিংশুক, প্রভৃতি।

যোগী :

কোথা হন্তে এক যুগী মিলিল আসিয়া
না নড়ে না চলে যুগী যেহেন স্থাবর।
জটাধারী ব্যাঘ্রচর্ম বিভূতি ভূষণ
কণ্ঠে রুদ্র মালা মূর্তি যেন ত্রিনয়ন।
জ্বলন্ত প্রদীপ দীপ্ত দিব্য কলেবর
যোগানলে দহিছে সকল অভ্যন্তর।

তাম্বুল :

অন্ন ভুঞ্জি রাজা সব আনন্দিত মন
কর্পূর তাম্বুল সব করয় ভক্ষণ
কর্পূর বাসিত পান করিয়া সম্ভোগ
কোন সখী কুমারক করায়ন্ত ভোগ।

প্রসাধন :

সুবর্ণ বাটাতে করি অগুরু চন্দন
কুমারে অঙ্গে কেহ করেন্ত লেপন।
....কাজলে উজ্জ্বল কর কমল নয়ন
নবঘন জ্যুতি কেশ কুসুমে জড়িয়া
কর্ণপুটে রত্নময় পৈর অলঙ্কার
কস্তুরী তিলক মুখে মৃগাঙ্ক সে চান্দে
কাঞ্চন কটোরা কুচ চর্চিয়া চন্দনে
নেপুর কিঙ্কিণী হার কেরুর কঙ্কণ।

প্রাসাদ-টঙ্গী :

অপূর্ব সুন্দর গৃহ করিল নির্মাণ
বিশ্বকর্মা গঠ প্রায় সুরপতি স্থান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটিকের স্তম্ভ সব শোভে মনোহর
নানা বর্ণ আচ্ছাদিল নেত পাটাম্বর।
মরকত পরিপূর্ণ বিরচিত বেড়া
নৈশ আকাশে যেন নক্ষত্র পরম্পরা
ব্যাল্লিশ দুয়ার কৈল্যা গৃহ চতুঃপার্শ্বে
অঙ্গ শীতলিত যেন মলয়া বাতাসে।

মন্ত্রশক্তি-দারু-টোনা-তুক-তাক :
যদি হয় সিদ্ধা বিদ্যাধর সুরাসুর
মহামন্ত্র আহুতিম আকর্ষণ বলে
সুরাসুর গন্ধর্ব আনিমু ক্ষিতিতলে।
গন্ধর্ব কি নিশাচর কিন্নর যক্ষ ভূত
ঘণ্টা মধ্যে বান্ধি দিমু দেখিবা অদ্ভুত।

ঘুম মোহিনী :
প্রবেশিলা রাজগৃহে মন্ত্রের প্রভাবে
নিদ্রাসূত্রে বন্দী হৈয়া ছিল লোক সবে।

নিমন্ত্রণ পদ্ধতি : যথ ইতি রাজ্য বৈসে মোহরা নগরে
বাতিল তাম্বুল দিয়া প্রতি ঘরে ঘরে।

মূর্ছা বা বায়ু রোগের ঔষধ
বিষ্ণু নারায়ণ তৈল।

দানসামগ্রী : হস্তী ঘোড়া নবরত্ন দান করে বস্ত্র অন্ন
দুঃখিতের খণ্ডাও দুঃখ ভার।

যোগী-বাউল-অভিন্ন : বাউলে কহিল যদি রহস্য সকল।

চীনাপণ্য : চীন দেশী ধবজবস্ত্র সুবর্ণের সূত

চান্দোয়া : তারি খাট পরে চারি চান্দোয়া অদ্ভুত
মকুতা প্রবাল বুনি চান্দোয়ার থোপে
সুবিচিত্র পাটাম্বরে নিশাকর শোভে।

রাজপুরুষের বেশ : হাতে খড়গ শোভে নেত ধড়া পরিধান
বীর মূর্তি অকাতর মাতঙ্গ সমান।
কপালে দোলায় মণি কুণ্ডল শ্রবণে
চন্দনে চর্চিত তনু প্রসন্ন বদনে।

যুদ্ধাস্ত্র : রথ, শর, ব্রহ্মাস্ত্র, ইত্যাদি।

যোগী : মহাতেজময় কান্তি কলেবর জ্বলে
নক্ষত্র প্রকাশে যেন শ্রবণ কুণ্ডলে
যোগীর কর্ণেতে শঙ্খ পূরএ সুস্বরে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতাপিতা ও গুরুর সম্মান :

গুরু হিতোপদেশ না করিও হেলা
গুরু বচন কুলিশ হেন জান
মাতৃপিতৃ আজ্ঞা হৈলে সর্বত্রে কল্যাণ।
যে জন না লয় মাতৃ পিতৃ অনুমতি
অবশ্য তাহার ফল লভএ দুর্গতি।

দেবধর্ম :

নিজ রাজ্যে ময়নাবর্তী দেবধর্ম পূজে নিতি
স্বামীবর মাগে সর্বকাল
তথাতে নির্জনে নারী আরাধে শঙ্কর গৌরী
সর্বহিতে স্বামীর কল্যাণ।

মাটি—দেহতত্ত্ব :

মাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ আত্মমায়া
মহামায়া মাটি 'পরে বিধাতার দৃষ্টি।
পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর
মাটি ভঙ্গে হংস রাজ গতি শূন্যান্তর।
মাটি হস্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল
ছোট বড় রঙ্গ যথা মাটিতে সকল।
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া
মাটি শূন্য, স্থিতি মাটি, মাটিযুক্ত কায়া।

AMARBOI.COM

খ. চন্দ্রাবতী [মৎ-সম্পাদিত]

মাগন ঠাকুর বিরচিত (১৬৫২-৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত)

কোরেশী মাগন ঠাকুর রোসাঙ্গে আরাকান রাজের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি কবি আলাওলের প্রতিপোষকও ছিলেন। তাঁরই আগ্রহে আলাওল 'পদ্মাবতী' অনুবাদ করেন এবং কাজী দৌলতের অসমাপ্ত কাব্য 'সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী' কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন। মাগন ঠাকুর আরাকানরাজ নরপতিগী, সদউ মঙদার ও চন্দ্র সুধর্মার (১৬৩৮-৮০খ্রি.) মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রকাশ মাগন ঠাকুরের বংশধরেরা চট্টগ্রামের রাউজান থানার ফতেনগর-নোজিশপুর গাঁয়ে আজো বিদ্যমান। মাগন ঠাকুর দেশী রূপকথাকেই কাব্যের অবলম্বন করেছেন। কাজেই সেদিক দিয়ে এ কাব্য মধ্যযুগে দুর্লভ মৌলিক কাব্য।

সমাজ প্রতিবেশ

বলেছি, 'চন্দ্রাবতী' দেশ-প্রচলিত প্রাচীন রূপকথাভিত্তিক মৌলিক রচনা। তাই এ কাব্যে হিন্দুসমাজের আবহই দৃশ্যমান।

ক. তাই চন্দ্রাবতী পতিকামনায় 'আরাধএ দেব ত্রিলোচন।' এবং 'স্বয়ম্বরা' হওয়াই রীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. তার সখী চিত্রাবতী কেবল-যে চিত্রশিল্পে নিপুণা তা নয়, ভোজবিদ্যায়ও পটু, আকাশেও ওড়ে সে। অন্যত্র 'শুন কন্যা তিলিচমাত শঙ্কর বাখান।'

গ. অশ্ববিরল দেশের রাজপুত্র চলে গজারোহণে।

ঘ. এখানকার গিরি-সিন্ধু-কান্তারে থাকে নাগ, রাক্ষস, দানব ও যক্ষ। পরী ও দৈত্যকন্যার বদলে পাই গন্ধর্ব ও রাক্ষসকন্যা।

ঙ. এখানকার গাছে গাছে মেলে জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, গৃধ-গৃধিনী।

চ. বৌদ্ধ তন্ত্র-মন্ত্র ও ডাকিনী-যোগিনীর দেশে অসাধ্য সাধন করে মন্ত্রপূত ধনুর্বাণ ও মুনিমন্ত্র। অর্ধচন্দ্রবাণ, গরুড় বাণ, বিষ্ণু-চন্দ্রবাণ, গাণ্ডীব প্রভৃতিই হচ্ছে ব্রহ্মাস্ত্র।

ছ. পর্তুগিজ প্রভাবকালে রচিত উপাখ্যানে আমরা দেশী নৌকার নাম পাইনে; পাই জালিয়া, গোরাব প্রভৃতি পর্তুগিজ ডিঙ্গার নাম।

জ. এখানে রাজা সত্যবাদী, আর ধার্মিকের আদর্শ ব্যাস ও যুধিষ্ঠির। 'ধর্মবাদী জিতি নিত্য ব্যাস যুধিষ্ঠির'।

ঝ. নায়ক-নায়িকাও মঙ্গল-কাব্যের শাপভ্রষ্ট দেব সন্তান, বীরভান চন্দ্রাবতী 'শিব বরে দুইজন মর্ত্যেত আসিছে', এবং নায়কের যখন সঙ্কট দেখা দেয় তখন ইষ্ট দেবতা মর্ত্যে আবির্ভূত হয়ে করেন ত্রাণের ব্যবস্থা :

'শিব বোলে শুনহ কুমার বীরভান—
ধনুত জুড়িয়া মার বিষ্ণু চক্রবাণ।'
এই বুলিয়া চক্র সঙ্গে মন্ত্র শিখাইল
তারপর 'অলক্ষিতে শিবদুর্গা অন্তর্ধান হৈল।'

চারবেদ ও চৌদ্দশাস্ত্রেই সমাজের নিয়ামক।

নৃত্য-গীত উৎসব :

নটী সবে নাট করে প্রতি ঘরে ঘরে
গাইন সবে গীত গাহে চাতরে চাতরে।
এহিমতে সপ্তদিন নিশি দিশি ভরি
বাদ্যধ্বনি আছিল আনন্দ মণিপুরী।

পৌরুষ-গর্ব : আও মালিনী, নারী বধ না পারি করিতে।

সংস্কৃতি : প্রণাম করিলা ক্ষেত্রি ধর্ম অনুসারে।

একটি রেখাচিত্র : মুকুতা দেখি অস্তে ব্যস্তে মালিনী উঠিয়া
বসন-অঞ্চলে বান্ধে পুলকিত হৈয়া।

কবির রেখা চিত্রাঙ্কন পটুতার নমুনাও দেশ প্রচলিত।

খাদ্য : ক. মিষ্টি অন্ন ভোজন করাএ দ্বিজবর।
খ. ভাল ভাল মৎস্য কিনি শীঘ্রগতি দেও আনি
আজুকা রান্ধনে কিছু নাই।

হিন্দু বীর : মাথে জটা দিব্য ফোঁটা কটিতে কৃপাণ
হস্তেত গাণ্ডীব দেব ইন্দ্রের সমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চবিত্তের বেশভূষা : গায়েত কবচ গলে মাণিক্যের হার
শিরে ফোঁটকা দিল অতি শোভাকার।
কোমরে পেটিকা গজ মুক্তার ঝরকা
কর্ণেত কুণ্ডল যেন চান্দে দিল দেখা।
হস্তেত বলয়া শোভে অতি মনুহর
সুবর্ণের মোটক মুকুট শিরে চড়াইল
শয্যা বিছাইয়া বৈসে রাজার কুমার
চতুর্দোলে চড়াইল যথ রাজাগণ।

যোগী বেশ : হস্তে কাষ্ঠ মালা গলে শুধুরী বান্ধিয়া
কর্ণেত বৈরাগী মুদ্রা মুখে ভস্ম দিয়া।
হস্তে কমণ্ডুলি চক্র সাথে কৃত্তি কেশ।

ঝড়ঝঞ্ঝাবহুল এদেশেরই একটি সামুদ্রিক ঝড়ের চিত্র :
দৈবগতি অলক্ষিতে তুফান হইল
লবণ সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ উঠিল।
এক ঘোর নিশি আর হইল তুফান
আর সমুদ্রের জন্তু উঠে তুরমান।
কথ নাও উড়াইয়া নিল যথা তথা
কাঁড়া পাড়া ছিঁড়িয়া নাএর ছিঁড়ে দড়ি
ভাঙ্গিয়া কাঁড়ার নাও করে গড়াগড়ি।
অধিক উঞ্চল হৈল তুফানের বাও
দিগ দিগন্তরে নাহি দেখে আশ পাশ।

AMARBOI.COM

তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালি : সে-যুগে বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের পরীক্ষা হত তত্ত্বকথা ও হেঁয়ালির মাধ্যমেই। এখানে কবির পাণ্ডিত্যপ্রীতিও হয়েছে প্রকটিত। রাক্ষসের প্রশ্ন ও পাত্রপুত্র সুতের উত্তর:

১. কেবা তুহ্মি বসি আছ কার তুহ্মি বশ?
—যোগরস, মৃত্তিকাত বসি আছি পবনের বশ।
২. পৃথিবী সৃজিয়া আছে কথেক আকৃতি?
—সৃজিয়াছে ক্ষিতি আর সুমেরু সাগর।
৩. কোনো রঙ্গ পৃথিবীতে আছএ বহুত?
—উচ্চ নীচ যথ দেখ সবুজ বরণ
তৃণলতা বৃক্ষ যথ ভরি আছে ক্ষিতি
নিরক্ষি দেখহ যথ সবুজ আকৃতি।
৪. সঙ্গতি তোহ্মার বোল কেবা আছে মিত?
—সঙ্গে মোর মিত্র আছে বিদ্যাগুণধর।
৫. চন্দ্র সূর্য হোন্তে বড় কার আছে জুতি?
—আঁখি হোন্তে পৃথিবীত জুতি আছে কার!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬. বচন কহিতে তুহ্মি কোথাত উৎপন?
—জীবেন্দ্র উৎপতি বাক্য সঞ্চারে জিহ্বাত
৭. পৃথিবী পশ্চিম পূর্ব কথ দিন পন্থ?
—সূর্য হোন্তে দিনের প্রমাণ
একদিনে পূর্ব হোন্তে পশ্চিমে পয়াণ।
৮. পবনে-থু কেবা চলে অতি শীঘ্রতর?
—পৃথিবীত মন হোন্তে শীঘ্রগতি কার!
৯. পৃথিবী রহিয়া আছে কিসের উপর?
—ত্রিগুণ আপনার তন
ভর করি রহিয়াছে উপরে পবন।
১০. পৃথিম্বীত কোন্ রঙ্গ সৃজিয়াছে জুতি?
—যথ জোত সৃজিয়াছে ধবল বরণী।
১১. ভূমি কম্পমান হএ কিসের কারণ?
—এ তিন ভুবন আর সুমেরু সাগর
ভার নহে সে বৃষের শিঙের উপর।
তবে কিন্তু ভার হএ পাপের কারণ।
বসিতে চাহএ বৃষে এড়ি ত্রিভুবন।
১২. চারবেদ চৌদ্দশাস্ত্র পড়ে কি কারণ?
—শাস্ত্র পড়ে হিত বিপরীত বুঝিবার।

AMARBOI.COM

গ. পদ্মাবতী

আলাওল বিরচিত (১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে)

আলাউল পরিচিতি পূর্বে 'তোহফা' প্রসঙ্গে দেয়া হয়েছে।

ব্রহ্মাণ্ড : সৃজিলেক সপ্ত মহী ও সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড
চতুর্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড।

নৌকা (পর্তুগিজ প্রভাব):

নানা বর্ণ নৌকা সাজে নাহি সম ক্ষিতি মাঝে
গণিয়া অগণন ডিঙ্গা রঙ্গে
সুলুপ নানান ভাতি মচুয়া গোরাব পাঁতি
জালিয়া নায়রী নানারঙ্গে
কাষদা আহুতি ভাল ফেরাঙ্গির বস্ত্র বিশাল
সাতাইশ পাঠলা সংসার

বিভিন্ন বিদেশী : নানান দেশে নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল
আরবী মিশরী শামী তুরকী হাবশী রুমী
খোরাসানী উজবেক সকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাহোরী মূলতানী সিন্ধি কাশ্মিরী দক্ষিণী হিন্দি
কামরূপী আর বঙ্গদেশী
অওপিহ খুতঞ্জারী কান্নাই মলয়াবরী
অচি-কুচি কর্ণাটকবাসী
বহু শেখ সৈয়দ জাদা মোগল পাঠান যোধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি
আভাই বর্‌মা শ্যাম ত্রিপুরা কুকীর নাম
কতেক কহিব ভাতি ভাতি।
আরমানি ওলন্দাজ দিনেমার ইংরাজ
কাস্টিলান আর ফ্রানসিস
হিসপানী আলমানী চোলদার নসরানী
নানা জাতি আর পর্তুগিজ।

বিদ্যা ও পাঠ্যশাস্ত্র : আরবী ফারসী আর মগী হিন্দুয়ানী
নানাগুণে পারগ সংগীত জ্ঞাতাগুণী।
কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা ষষ্ঠম নাটিকা
শিল্পগুণ মহৌষধ নানাবিধ শিক্ষা।
কাব্যশাস্ত্র ছন্দমূল পুস্তক পিঙ্গল
পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহাগণ মূল
তাহাতে মগণ আছে বুঝে কবি কুল
পড়ে ব্যাকরণ আদি ত্রিবেদ পুরাণ
জ্ঞানী সব কাব্যরস সতত বাখান
আমার পিঙ্গল গীতা নাটিকা আগম।

হার্মাদ দৌরাত্ম্য : কার্যহেতু যাইতে বিধির ঘটন
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত
রণক্ষতে শুভযোগে আইলুঁ এথাত।

অমাত্য সভায় নাচগান :
গুণিগণ থাকেন্ত তাহার সভা ভরি
গীত নাট যন্ত্র তন্ত্র রঙ্গ ঢঙ্গ করি।
কেহ গায় কেহ বায়, কেহ খেলে খেলা
সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা।

সৈন্যদল : কটক ছাপ্পান্ন কোটি বহু সেনাপতি
সপ্তদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি।
সিংহল দ্বীপের সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ
অশ্বগজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃক্ষ ও ফল : ফলভারে নম্র অতি আম কাঁঠাল
বড়হর খিরিনী খাজুর অতি ভাল।
গুয়া নারিকেল তাল ডালিম্ব ছোলঙ্গ
নারঙ্গ কমলা শ্যামতারা কাউরঙ্গ।
জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম
বরই শ্রীফল সদাফল কলা জাম।
এতিচিরি উরিআম করঞ্জা তেঁতই
আখরোট ছোহরা লবঙ্গ জলপাই
ছেব বিহি খোরমা সুরস নানা ছন্দ
মধু জিনি মিষ্ট সব, পুষ্প জিনি গন্ধ।

জলাশয় : দীঘি, পুষ্করিণী কূপ হেরি শোভাকার

পাখি : হংস, চক্রবাক, কুরবয়, সারস, শালিক, শারী, শুক, জলকাক, করশুক, বক, শ্বেতশুক।

ফুল : মরুবক, মালতী, লবঙ্গ, গোলাপ, চম্পা, যুথী, কেতকী, কেশর, বেলফুল, রঙ্গন, কাঞ্চন। মাধবী, বকুল, কুব্জা, রূপমঞ্জরী, বাসক, করুবক, আবস্তক, কালা।

বৈরাগী সাধক শ্রেণী :
যোগী যতি সন্ন্যাসী করএ তপজপ
কেহ ব্রহ্মচারী কেহ ঋষি অবধূত
নামজপী ঋষীশ্বর পৈত্রুণ বিভূত।
কেহ হরি কেহ নাথ কেহ দিগম্বর
কেহ তো গোর্খের ভেশ কেহ মহেশ্বর।
...স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ।

মণি—পণ্যদ্রব্য : হীরা মণি মাণিক্য মুকতা গজমণি
পুষ্পবাগ বিদ্রুম গোমেদ নানা ভাতি
আমোদ অগুরু মেদ মৃগমদ বেনা
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা।
ফুলেল গোলাব চুয়া চন্দন আগর
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর।

নারীবিক্রেতা : সুন্দর পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার।

নারীর পরিচ্ছেদ : প্রতি অঙ্গে শোভিত নানা অলঙ্কার।
শিরেত কুসুম্বী চীর মুখেত তাম্বুল
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাটের বর্ণনা :	স্থানে স্থানে পণ্ডিত পড়এ শাস্ত্র বেদ স্থানে স্থানে সুপ্রসঙ্গ কহএ কৌতুকে কোন স্থানে নৃত্যকলা দেখাএ নাটুকে। কোন স্থানে ইন্দ্রজালে দেখাএ কুহক মিথ্যা বাক্য সত্যকরে দেখাইয়া ঠক। সেই সত্য চটকে তোষএ যেই নরে গাঁষ্ঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে।
রাজপ্রাসাদে :	ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারএ ঘড়ি দণ্ডে দিন ক্ষণ সকলি বুঝাএ।
অট্টালিকা :	ঘরে ঘরে সকলের সুবর্ণ চৌয়াড়ি।
খেলা :	বসিয়া কুমার সবে খেলে পাশাসারি দায় বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশ।
হিন্দুরাজসভা :	'গড় পরে চারি গড় নৃপতি নিবাস সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আবাস। চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ তার মাঝে স্থাপিছে রতন সিংহাসন। কেহ কেহ স্তাবক সহিতে পড়ে বেদ কেহ সুপ্রসঙ্গে কেহ কেহ পুরাণের ভেদ। নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত কেহ কেহ নানা যন্ত্র বায় সুললিত। চন্দন কুসুম্ব চুয়া কস্তুরী কর্পূর। আমোদ সৌরভ শোভা দেশ ভরিপূর। সুরূপ সুরব আর সুগন্ধি পূরিত দেখিতে শুনিতে সুর মনে আনন্দিত।
প্রাসাদ :	কর্পূর রতন ঘর সুবর্ণ ইটাল হীরমণি রতন জড়িত অতি ভাল। নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে এক মূর্তি দেখিতে নানা ভাতি ধরে। দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপগৃহ শোভা চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা। সপ্ত খণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকণ্ঠ দোসর ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাট আছয়ে বিস্তর।
হস্তী :	রাজদ্বারে হস্তীসব বান্ধিছে অপার, শ্বেত শ্যাম রক্তবর্ণ ধরে মেঘবর্ণ মদমত্ত গন্ধধারী বিলোলিত কর্ণ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতেখড়ি

স্ত্রী শিক্ষা :

পঞ্চম বৎসর যদি হৈলা রাজবালা
পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা।
মহান পণ্ডিত হৈল কন্যা গুণবান।

বিয়ের বয়স (পদ্মাবতীর) :

সম্পূর্ণ হইল যদি দ্বাদশ বৎসর।
হইল সংযোগ যোগ্য ভাবে নৃপবর।

অদৃষ্ট নিয়তি :

ললাট লিখন দুঃখ না যাএ খণ্ডন।

বস্ত্র-শাড়ি :

বসন ভূষণ সব বর্ণিতে না পারি
ক্ষেণে পাট নেতশাড়ী, ক্ষেণে জরতারি।
ক্ষেণে শাখা রম্ভাপতি, ক্ষেণে গঙ্গাজল
ক্ষেণে কিরমিজি পৈরে, ক্ষেণে মলমল
ক্ষেণে কৃষ্ণ, ক্ষেণে রক্ত শ্বেত পীত বাস
ক্ষেণে মুজাম্বর, ক্ষেণে নেলদম তাস।
নানা দেশী নানা বস্ত্র নানা রঙ্গ পৈরে
তিলে তিলে নানা ভাতি নানা বর্ণ ধরে।

AMARBOI.COM

প্রেমে বিরহীর দশ দশা :

দশমী দশার এবে শুনহ ব্যবস্থা
কাম হইতে ভাবকের যে দশ অবস্থা।
অভিলাষ প্রথমে, দ্বিতীয় চিন্তা হয়
তৃতীয় স্মরণ, গুণ কীর্তি চতুর্থয়।
পঞ্চমে উদ্বিগ্ন হয়, ষষ্টমে বিলাপ
সপ্তমেতে উন্মাদ, অষ্টমেতে ব্যাধি তাপ।
নবমেত দুর্দশা, দশমে মৃতবৎ
বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত।

চিকিৎসক :

ওঝা বৈদ্য গারুড়ী আইল বহু গুণী
কেহ নাড়ী চাহে কেহ নাসিকা পবন
কেহ ঘরিষয় হস্তে যুগল চরণ।
পরীক্ষিত নাড়ীকা চাহিল গুণিগণে
নির্মল চন্দ্র-সূর্য আপনা ভবনে।
সঞ্চার নাহিক কিছু কফ বাত পিত
কোনো রোগ নহে এই বিরহ বিকার।

যোগসাধনা :

গুরু শুকে আসাতে কহিত যোগ কর্ম
এক যোগে ভাব ভক্তি আর যোগে ধর্ম।
কর্মযোগ হৈলে পুনি কায়া সিদ্ধি হয়
ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্ছিত পুরয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মযোগে অনাহারে বসি চিরকাল
সাধিলে সে সিদ্ধি হয় ছাড়এ জঞ্জাল।

গুরু : গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদে অগ্নিকণা
প্রজ্বলিত করে সেই শিষ্য মহাজনা।
পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরএ কান্তার
নিজ বলে বাহিলে সাগর হয় পার।

যোগী ও যোগ সাধনা :

রাজ্যপাট তেজিয়া নৃপতি হৈল যোগী
করেত কিন্নরী লই বাজাএ বিয়োগী।
শিরে জটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর
কক্ষে শিঙ্গা ডম্বরু ত্রিশূল লৈয়া কর।
মেখলী ধান্ধারী রুদ্রাক্ষের জপমালা
কান্থা চক্র খাপর বসিতে মৃগছালা।
চকমক পাষাণ আর পদেত পাওরি
হস্তেতে দ্বাদশ লৈল বটুরা ধান্ধারী।
উড়িয়ান বন্ধ কটি, পৈরণ কৌপীন
অনাহত শব্দ মধ্যে মন কৈল লীন।
শূন্য পন্থে ধ্যান ধরিয়া স্থিরচক্ষে
শূন্য পুষ্পহার লক্ষ্যে করিল অলক্ষ্যে।
মন পরিচয় মন অমনেত দিয়া
পঞ্চভূত সিদ্ধি দশ বায়ু সম্বরিয়া।
চতুর্দশ ধারে করি ভক্তি সম্ভাষণ
ষড়দল স্বাধিস্থানে চালাইল মন।
অধারে বসান্ত বর্ণ সাধিষ্ঠা বলান্ত।
দশদল মণিপুরে আদ্য ডক্কা ফুকান্ত।
সেই মণিপুরীত সেবিয়া প্রজাপতি
অনাহত চক্রে কৈল বিষ্ণুর ভকতি।
দশদল মণিপুর ডক্কা ফুকেন্ত
দেখিলেন্ত সূর শশী বিশুদ্ধ চক্রেত।
তথাতে কুণ্ডলী দেবী আছে নিদ্রাগত।
সর্পরূপ ধরি রহে সুষুম্নার পথ
অধোমুখে চন্দ্র তথা অমিয়া বরিষে
উর্ধ্বমুখী হইয়া কুণ্ডলী সব চোষে।
দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব
এই সে কারণে মরে সংসারের জীব।
অকুঞ্চ কুবিতরা অগ্নি শম্ভু রসে বায়ু
জাগাইলে কুণ্ডলী সে চির পরমায়ু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ্ঞাচক্র দুই দলে করি নিরীক্ষণ
তথাতে উজ্জ্বল দুই নির্মল দর্পণ।
শতদল হেরিয়া সহস্র দলান্তর
সেবিল পরম শিব অতি মনোহর।
পূরক কুম্ভক রেচকতে করি মন
তিন সমরসে সাধিলেক প্রাণপণ।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ ত্রিদেবের শক্তি
আকারে উকারে মকারেত কৈল ভক্তি।
শঙ্খ শিঙ্গা ডম্বরু বাজায় ঘন সান।
শবাসনে বসিল পাতিয়া মৃগ ছালা।

যাত্রার শুভাশুভ : চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদিত
ধেনু বৎস সংযোগ দক্ষিণে উপস্থিত।
দধি লে দধি লে করি ডাকে গোয়ালিনী
পূর্ণ কুম্ভ দেখিলেন্ত সুভগা রমণী।
নাগশিরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন
বামেত শৃগাল ফিরি করে নিরীক্ষণ।
পুষ্পের পসার লই সম্মুখে মালিনী
শির 'পরে মঙ্গলএ সাচন শঙ্খিনী।

হিন্দুয়ানি উপমা :

তথা রত্নসেন রাজা নৃপসবে করে পূজা
সুরপতি জিনি রূপসীমা
রূপে জিনি পঞ্চবাণ বিদুর সদৃশ জ্ঞান
ধার্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির
দানে মানে কর্ণগুরু বুদ্ধি জিনি সুরগুরু
জম্বুদ্বীপে সেই এক বীর।
অল্প বয়সে রাজ্যপাল বিপক্ষ জনের কাল
ক্ষমাএ পৃথিবী সমসর
সাহসে বিক্রমাদিত সত্যে হরিশ্চন্দ্র জিত
মর্যাদায় সিন্ধু রত্নাকর।

জ্যোতিষ গণনা : পূর্বেত জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে
তোমার সংযোগ সেই বিধির ঘটনে।

উৎসবে : মনোরা ঝুনুর সবে গায়ন্ত সুন্দর।
পাঞ্চম সুস্বরে গায় সুন্দর রমণী
কেহ বীণাবাঁশী বাএ সুমধুর ধ্বনি।
মন্দিরা মৃদঙ্গ কেহ বাএ করতাল
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনি অতি ভাল।
নাচি নাচি মাত্র এক তিল যথা ধাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথাতে আবীর ধূলি অন্ধ সম হয়।
সুগন্ধি ফাগুর রেণু উঠিল আকাশ

পূজা :
সম্মুখে করিয়া মূর্তি পূজিতে বসিল
ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন পুষ্পমালা
নানাবিধ ফল যত সব অতি ভালা।

রত্নসেন ও শুক ছিল গোর্খশিষ্য :
উন্মত্ত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্ধ
সমতুল্য নহে মছন্দর গোপীচন্দ্র।
নিপতিত গোর্খশিষ্য প্রেমমদ দিয়া।

শিবের সজ্জা :
সত্ত্বর গমনে আইল দেব উমাপতি
শিরে গঙ্গাধারী জটা গলে অস্থিমালা
অঙ্গে ভস্ম পৃষ্ঠেতে পবিত্র ব্যাঘ্রছালা।
কণ্ঠে কালকূট ভালে চন্দ্রিমা সুচারু
কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেতে ডম্বরু
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হস্তেত ত্রিশূল
ওড়ের কলিকা জিনি নয়ন রাতুল।

শহীদ ও যুদ্ধ :
দুই মতে যুদ্ধ ভাল শুন নরপতি
জয় পাইলে কার্যসিদ্ধি মৈলে স্বর্গগতি।

টোটকা চিকিৎসা :
কোন সখী পাক তৈল শিরেত ঢালেন্ত
কেহ কেহ হস্তপদে তৈল ঘষি দেন্ত।
কেহ আনি অঙ্গে ছিটে শীতল চন্দন
বিচনী লইয়া কেহ দেলায় পবন।
কোন সখী শীঘ্র জল আনি দেন্ত মুখে
নাসা অগ্রে হস্ত দিয়া কেহ শ্বাস দেখে।
সিংহ তৈল গজধারা চাম্পা ভৃঙ্গ তৈল
বাল্য তৈল কচিস্পষ্টা বেলাখেলা তৈল।
পদরি গুধরা মাজা মার্জনা যে তৈল
নানা জাতি তৈল দিল শান্ত না হইল।

অশ্বচালন বিদ্যা [চৌগান] :
নৃপতির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে
চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে।
প্রথমে দোগাম চালি শাহা আগে গাম
এড়িয়া এড়িয়া রফা রহি অনুপাম।
বোহা আর সপ্ত চালি চালাই সকল
না লড়ে অঙ্গের মক্ষি উদরের জল।
পুনি চালাইয়া তবে দোলক কুণ্ডলী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধূলি মাঝে অশ্ব গেল মেঘেতে বিজলী।
দক্ষিণে ফেরায় ক্ষেণে ক্ষেণে বাম পাক
অলক্ষিতে গতি যেন কুম্ভকার চাক।
যখনে দক্ষিণ বামে পাক উল্টাএ
আগে পাছে তখনে কিঞ্চিত চিন পাএ।
তবে বাগ খেঁচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ
অযোগ্য না মারে লম্ফ সিংহগতি রীত।
ক্ষেণে শত হস্ত পরে ক্ষেণেক পঞ্চাশ
ক্ষেণে ক্ষিতি ছোঁয়া ক্ষেণে শূন্য পরকাশ।
ভূমিপদ রূপি দুই হস্ত উর্ধ্ব কৈল
চতুর্মুখে পাক লৈল লাটিম আকার
চিনিতে না পারে কেহ অশ্ব আসোয়ার। ইত্যাদি

দক্ষিণদেশী নর্তকীর নৈপুণ্য :

দক্ষিণা নর্তকী যেন ত্রিপদ দেখায়
আগে পিছে চতুর্দিকে চিনন না যায়।

চৌগান খেলা :

চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহণ
দুই দিকে চারি খুঁটি আনিয়া গাড়িল
মধ্য ভাগে আরোপিয়া গেরুয়া ফেলিল।
মিশামিশি হই সবে লাগিল খেলিতে
সকলে চাহেন্ত নিতে আপনার ভিতে।
সিংহলের অশ্ববার গুলি নিতে চায়
চৌগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পলটায়।
গেরুয়া বেড়িয়া শব্দ উঠে ঠনাঠনি
দূরে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি
ঈষৎ হাসিয়া রাজা আসিয়া তুরিত
গেরুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত।

বিদ্যার বিচার :

শাস্ত্র ছন্দ পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান
একে একে রত্নসেন করিল বাখান।
সঙ্গীত পুরাণ বেদ-তর্ক অলঙ্কার
নানাবিধ কাব্যরস আগম বিচার।
নিজকাব্য যতেক করিল নানাছন্দ।
শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্ধ।
সবে বলে তান কণ্ঠে ভারতী নিবাস
কিবা বররুচি ভবভূতি কালিদাস।
কবি বেদজ্ঞ মহাগুণী প্রাণে অকাতর
সুড়ঙ্গের পন্থে কিবা আইল সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবশেষে করিলেক সঙ্গীত বিচার
পুস্তকের আদ্যভাব রসের প্রকার।
পিঙ্গল চৌষট্টি ছন্দ অষ্ট মহাগণ
অষ্টনায়িকার ভেদ শব্দের লক্ষণ।
মগণ যগণ আর রগণ সগণ
টগণ জগণ অন্তে তগণ নগণ
এই অষ্ট মহাগণ দেখহ বিদিত
বিরচিয়া কহি তবে গণের চরিত।

'গণ'-পরিচয় :

লঘু গুরু জানিলে গণের ভেদ পায়
তেকারণে লঘু গুরু জানিতে জুয়ায়।
হ্রস্বাকার ঋ৯কার অক্ষর মুকল
এই তিন লঘু আর গুরু যে সকল।
কবিত্বের পদের প্রথম তিনাক্ষর
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরু নর।
তিন গুরু হৈলে তারে বলিয়ে মগন
নিধি স্থির বন্ধুপ্রাপ্তি হয় ততিক্ষণ।
আদ্যলঘু দুই গুরু হয় অন্তে যাঁর
তাহারে যগণ বলি বুঝিয়া বিচার।
মধ্যে লঘু দুই দিকে দুই গুরু হয়।
সেই সে রগণ হয় জানিঅ নিশ্চয়।
দুই গণ গুণ কহি মনে করি কল্প
যগণে সাহস বহু রমণ আয়ু অল্প।
অন্তে গুরু আদ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার
সুনিশ্চিতে জানিঅ সগণ নাম তার।
দুই দিকে গুরু একাক্ষর লঘু হেটে
তাহারে তগণ বলি জানিঅ প্রকটে।
সগণে পড়িলে মাত্র করঅ উদাস
তগণেতে শূন্য ফল জানিঅ নির্যাস।
মধ্যে গুরু দুই দিকে দুই লঘু পায়
তাহারে জগণ বলি উৎপাত করয়।
অন্তে মধ্যে লঘু যার গুরু আদ্যক্ষর
ভগণ মঙ্গল ফল দেন্ত বহুতর।
তিন লঘু নগণ সম্পদ বৃদ্ধি বুদ্ধি
রণ সিদ্ধি আপদ-তরণ কার্য-সিদ্ধি।

অষ্টনায়িকা :

অষ্ট নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া
যেমত লক্ষণ তার শুন মন দিয়া।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদ্যে নারী খণ্ডিতা দ্বিতীয়া অভিসারী
তৃতীয়া বাসক সজ্জা বিপ্রলব্ধা চারি।
পঞ্চমে উৎকণ্ঠিতা কলহান্তরী ষষ্ঠামে
স্বয়ংদূতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে।
স্বাধীন ভর্তৃকার অষ্টমে লৈল নাম।

পঞ্চশব্দ : বাদ্য-রহস্য :

অবধান কর পঞ্চশব্দের চরিত
আদ্য 'তত' 'বিতত' দুইয়ে পরিমাণ
তৃতীয় 'সুষির' চারি 'ঘন' হেন জান।
পঞ্চম অনাহত লৈয়া পঞ্চ শব্দ নাম
কারে কোন শব্দ বলে শুন অনুপাম।
কপি নাম আদি যত তালের বাজন
তাহারে বলিএ তত শুন মহাজন।
মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে
সেই সে 'বিতত' জান শব্দ মনোহরে।
উপাঙ্গ মুরচঙ্গ আদি শব্দ যত বায়
তাহাকে সুষির হেন বলে সর্বথায়।
নাকাড়া দুন্দুভি আদি বাদ্য যত চর্ম
'ঘন' হেন নাম ধরে বুঝ তার মর্ম।
মুখ হস্তে উচ্চারিত হয় যত শব্দ
নিশ্চয় তাহার নাম জানিও 'অনাহত'।
এই মতে কহএ সঙ্গীত দামোদরে
সঙ্গীত দর্পণ মত শুন কহি তারে
তত বিতত ঘন সুষির মিশ্রিত
চারি শব্দে একশব্দ অতি সুললিত।
এই পঞ্চশব্দ কহে সঙ্গীত দর্পণে।

বিবাহোৎসব ও নিমন্ত্রণ রীতি :

শুভক্ষণ শুভলগ্ন করিয়া বিচার
রচিল বিভার কার্য মঙ্গল আচার।
কর্পূর সংযোগে পান দিয়া ঘরে ঘর
পঞ্চশব্দে বাজনা বাজায় মনোহর।
ছাইলেক হাট ঘাট স্বর্ণ পাটাম্বরে
পূর্ণঘট কদলী স্থাপিল দ্বারে দ্বারে।
নৃত্য গীত আনন্দ বাজায় পুণ্যদেশ
নাচে বেশ্যা শত কবি মনোহর ভেশ!
আগর চন্দন ধূমে আকাশ ছাইল
আর গন্ধ চতুসমে ধরণী লিপিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশুভ বলে বিবাহ উৎসবে বিধবা বর্জন :

পাত্র পুরোহিত নারী ব্রাহ্মণী শূদ্রানী
সুকুলীন সধবা সুবেশ সুরমণী।
নৃপগৃহে আসি মহাদেবী অনুমতি।
আয়ো স্ত্রী সকলে সজ্জা কৈল রঙ্গমতি।
বেদী অবশেষে মিলি যুবতী সকলে
বর কন্যা স্নান করাইল কুতূহলে।
রাজনীতি বস্ত্র অলঙ্কার পরাইল।
সুন্দর সধবা নারী মঙ্গল বিধান করি
সতত করএ উতরোল।

হিন্দু বিবাহ :

সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে
স্বর্ণঘট প্রদীপ স্থাপিল সভামাঝে।
গণেশ আদি পঞ্চদেব পূজিয়া হরিকে
যণ্ড আর মার্কণ্ড পূজিল তার শেষে।
তবে গন্ধ অধিবাস কৈল শুভক্ষণে
ললাটে বিংশতি বর্ণ ছোঁয়াইল ব্রাহ্মণে।
মহীগন্ধ শিলা ধান্য দূর্বা পুষ্প ফল
দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দুর কাজল।
স্বস্তিক গোচনা সঙ্গে সিদ্ধান্ন কাঞ্চন
রৌপ্য তাম্র কাঁস্য আর নির্মল দর্পণ।
এ সকল প্রত্যেক কপালে প্রসারিয়া
প্রশস্তি বন্দনা কৈল সূর্পেত থুইয়া।
অখণ্ডন কদলী পত্র কাটারী দর্পণ
বরের কন্যার হস্তে কৈল সমর্পণ।
পাত্রমিত্র পুরোহিত ব্রাহ্মণ সজ্জনে
কর্পূর তাম্বুল মান্য দিল জনে জনে।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি
অতি মহোৎসব করি বঞ্চিলা রজনী।

হিন্দু বরসজ্জা :

রত্নসেন মহারাজ পরিয়া বিচিত্র সাজ
বস্ত্র অলঙ্কার ভার তনু
মস্তকে কিরীট শোভে দেখি সুরপতি লোভে
জলদ উপরে যেন ভানু।
রতন সেহেরা ভালে মুক্তা লো'র তাহে দোলে
তারকা বেষ্টিত শশধরে
রতন-কুণ্ডল কাণে তরুণ অরুণ জিনে
বালার্ক অরুণ নাম ধরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চন্দনে ললাট-ফোঁটা জিনিয়া চন্দ্রিমা ছটা,
কুণ্ডল অধর সুনয়ন
উচ্চ গ্রীবা গলায় রত্ন কণ্ঠমালা তায়
সঙ্গে রবি নক্ষত্র মণ্ডল
জড়াউ কমরে পাটা সুবর্ণ রত্নের ছটা
দেখিতে নিঃসরে আঁখিজল
রত্ন বাজুবন্দ বায় কুলবতী মোহ পায়
নব রত্নাঙ্গুরী করশাখে
জরকাশী পাদুকা পায় রত্নের কাবাই গায়।

বাদ্যযন্ত্র : পঞ্চশব্দে বাদ্য বাজে ভেউর কর্ণাল সাজে
শানাই বিগুল শিঙ্গা বাঁশী
উরুমর্দ মধুবাণী মৃদঙ্গ উপাঙ্গ ধ্বনি
আর গুয়া সুশি রাশি রাশি
মুদ্রাকসি করতাল আওয়াজ কর্ণাল ভাল
বিতত বাজএ বহুতর
মুরলী দুন্দুভি জোড়া বাজাএ পেগম কাঁড়া
ঢাক ঢোল ঘন মনোহর।
রবাব দোতারা বীণ কাপিলাস রুদ্রবীণ
সমগু বাজএ সুললিত
তাম্বুরা কিন্নরী বেলা বিপঞ্চি সুস্বরতালা
বাজে তত তাল রাগে গীত।
...তালে তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ।

বাজি : নানা বর্ণ বাজি পোড়ে অলেখা হাবই উড়ে
গাছ বাজি আর উঠে ঘন

নারীর অলঙ্কার : বেসর, রসনা, মুক্তাবেষ্টিত রতন, কুণ্ডল, সপ্তছড়িহার, অঙ্গদ, কঙ্কণ, রতনবলয়, রত্নঅঙ্গরী, কটিভূষণ, নূপুর।

হিন্দু কনে সজ্জা : কিঙ্কণী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁজর, নেপুর মধুর বাজে
গুথিলেক কেশ, কুসুম, সুবেশ, সিন্দূর চন্দন তিলে।
সঘন রতি, তারকাপাঁতি বান্ধুলী রত্ন বিরাজিত।
সিন্দূর ভালে মাগন বলে, সমান অধর জ্যোতি।
রসনা সুলাল বচন রসাল, বিরহবেদনা মোহিত।

বর-কনের শুভ দর্শন :
পুষ্পবৃষ্টি সম্বরিয়া গীম হস্তে মালা লৈয়া
কন্যা গলে দিলেক রাজন
গীম হস্তে পুষ্পমালা দুই করে লৈয়া বালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিগলে করিল স্থাপন।
ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি মুখ-পট দূর করি
বলে 'সম দৃষ্টি হের বালা।'

হিন্দুকন্যা সমর্পণ :

তখনে কন্যার বাপে পূর্ণঘট আনি
বর হস্ত' 'পরে তুলি কন্যা হস্তখানি
পঞ্চ হরীতকী লই এ পঞ্চ মাণিক
কুশ লই হস্তযুগ বান্ধিল খানিক।
কুশ তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে
কন্যা উৎসর্গিয়া দান দিল জামাতারে।
সজল নয়নে রাজা কন্যা সমর্পিল
বলে ক্ষমাশীল জ্ঞানী তুমি আপনে পণ্ডিত
কহিতে অনেক কথা কি কহিব তারে
স্বামী কৃপা হন্তে নারী দুই জগে তরে।,

কন্যা-বিদায় :

পঞ্চম প্রকারে হোম করিল ব্রাহ্মণ
জয়হোম লাজহোম করি তার পরে
সপ্তপদী গমন করিল কন্যা বরে।
দম্পতি দাণ্ডাই পুণ্য হোমে দিল যবে
ব্রাহ্মণের যজ্ঞের দক্ষিণা দিল তবে।
ঘরে নিয়া সুবেশা সধবা নারীগণ
স্ত্রীআচার করিলেক করিয়া বরণ।

ঘরজামাইর লজ্জা : রহিছ শ্বশুর গৃহে কতবড় লাজ।

যাত্রার শুভাশুভ :

শুক্র-রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন
গুরুবারে সিদ্ধি নহে গমন দক্ষিণ।
সোম শনি পূর্বেতে না যাএ কদাচন
উত্তর মঙ্গলে বুধে অশুভ লক্ষণ।

তবে,

অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান
তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান।
শুক্রেত পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই
বৃহস্পতি দক্ষিণেতে চলিব গুয়া খাই।
উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব
দর্পণ দেখিয়া সোমে পূর্বেত চলিব।
রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিয়া মুখে
বায়ু ভক্ষি শনিবারে পূর্বে চলো সুখে।
বুধবারে উত্তরে যাইয়া খাবে দধি
বিচারি কহিল সপ্তবারের ঔষধি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভৌতিক সংস্কার : • এবে চক্র যোগিনীর কথা শুন সার
ত্রিশ অষ্ট দিকে যোগী ফিরে বারে বার।
এক নব ষড়দশ চতুর্বিংশ দিন
পূরব দক্ষিণ দিকে যোগিনীর চিন।
অষ্টাদশ, সাত বিংশতিন একাদশে
সুনিশ্চিতে যোগিনী দক্ষিণ দিকে বসে।
দশ পঞ্চ বিংশ দুই সপ্তদশ দিনে
যোগিনী পশ্চিমে থাকে দক্ষিণের কোণে।
বায়ু বিংশ আর সাতাইশ চারি
যোগিনী পশ্চিমে থাকে বুঝিবা বিচারি।
বিংশতি দিবস আর ত্রয়োদশ বাণ
উত্তর-পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান।
পঞ্চদশ ত্রয়োবিংশ অষ্ট আর ত্রিশে
নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিকে সে।
চতুর্দশ বিংশ সপ্ত উনতিরিশেতে
যোগিনী পূর্বেতে থাকে জানিও নিশ্চিতে
ষষ্ঠ, অষ্ট, বিশ এক, বাইশ চলিতে
যোগিনীর সম্মুখে না যাও কদাচিতে।

যুদ্ধবাদ্য : বাজাএ দুন্দুভি পুনি তবল নিশান
বেউল কর্ণাল শব্দে ভূমি কম্পমান
ঢালি সবে ঢাল গায় বাড়ি মারে চারু
শতে শতে সানাই সুস্বরে বাজে মারু।

স্বামী : অতিথি স্বরূপ কন্যা থাকে পিতা ঘরে।
ত্রিভুবন মধ্যে জান স্বামী সে দুর্লভ
স্বামী সে সংসার-সুখ ধন্ধ আর সব।
স্বামী সে পরম গুরু সব এক চিতে
ভক্তি শক্তি স্বামী সঙ্গে বঞ্চিও পিরীতে।
...স্বামী বিনে নারীরে সেবকে না ডরায়।

কন্যা বিদায় মা-বাপের অসহায়তা :
অবলা দোষের ঘর সদা করে রোষ
ক্ষেমিবা আমারে চাহি কৈল্যে কোন দোষ।
কেহ নাহি নিকটে দোসর বাপ ভাই
মনে দুঃখ পাইলে কহিব কার ঠাঁই।
ক্ষুধাতুর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিব
মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিব।
সকল প্রকারে তারে পালন করিবা।
আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িবা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান-মাহাত্ম্য :

দান হন্তে বিঘ্ননাশ কীর্তি মহী 'পরে
অন্তকালে পাপ হরে স্বর্গ অনুসারে।
এক দিলে দশ পায় সেই পুণ্য ফলে
দাতাজন নির্ধনী না হয় কোন কালে।
দুঃখ খণ্ডি সুখ পায় দানের সম্ভবে
মূল নিষ্কণ্টকে রহে পুণ্য পায় লাভে।

ধন-মাহাত্ম্য :

ধন হন্তে যেই ইচ্ছা পারে করিবার
ধনহীন জনের জীবন অকারণ
কি কর্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন।
ধন হন্তে অকুলীন হয় কুলছত্র
সংসারে মহত্ত্ব রহে বিজয় সর্বত্র।
সঙ্কটতরণ ধন সেই সুখরস
মনিষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ।

নিয়তি :

করতায় যেই করে সেইমাত্র হয়
কর্ম অনুরূপে ভোগ সংসার বিষয়।
প্রবল যাহার কর্ম বিনি যত্নে পায়
ভাগ্যহীন যত জন পাইয়া হারায়।

AMARBOI.COM

সেনানী :

দোহাজারী তেহাজারী হাজারে হাজার
পঞ্চশত সপ্তশতি গণিতে অপার।

যক্ষ-উপাসক :

রাঘব ভকতি ভাবে নিত্য নিত্য যক্ষ সেবে
যক্ষ সিদ্ধি আছিল তাহার।

তুল :

মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে *(চৈতন্য ভাগবত)*

বিদ্যার্জনে দেশ ভ্রমণ :

সপ্তদ্বীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কারণ
তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন।
নানারূপ দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ
শাস্ত্রেই জানিনু কত ভালমন্দ লেশ।

পর্দা :

দান দিতে চিক ধারে আইল কলাবতী।

মুঘল পূর্বযুগে :

তুর্কী নামেই অভিহিত হত বিশেষ করে বিদেশাগত এবং সাধারণভাবে মুসলমান।
—বল গিয়া তুরুকরে না করে বিলম্ব।
—বিনি দোষে তুরুকে করিতে আইসে বল।
—যারে যেই ইচ্ছা হয় তুরুকে করিবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিন্দু-বিদ্বেষ : মুসলমান জাতি তোর মনেতে নাহি আশা
কদাচিত না করিব হিন্দুর ভরসা।
দীন মুহাম্মদী আছে মোর শিরে ছত্র
তাহার প্রসাদে হবে বিজয় সর্বত্র।

স্বাজাত্য : নৃপসব কল্পতরু আর হয় তাত
আমি সব অল্পপ্রাণ শীঘ্র যায় জাত।
আমি সব চাহি ক্ষেমিলে অপরাধ
হাস্যমুখে দেও শাহা তাম্বুল প্রসাদ।
শাহার লবণে মুখ নারি ফিরাইতে
কুল ক্রমে জাতি ধর্ম না পারি তেজিতে।
আজ্ঞা কর আমি চিতান্তর অনুসারি
রত্নসেন সঙ্গতি হইয়া সব মরি।
হাসিয়া দিল্লীর নৃপ সবে দিল পান
হয় বস্ত্রে দান কৈল বহুল সম্মান।
ধন্য ধন্য বলি বাখানিল পুনিপুনি
কুলের নিমিত্তে ইচ্ছে তেজিতে পরাণি।

সুলতানেরা মুসলমান সৈন্যদের অনুপ্রাণিত করত গাজী বা শহীদের সম্মানের লোভ দেখিয়ে :
হেনমত যুদ্ধ আসি মিলে পুণ্য ফলে
জিনিলে শাহার আগে প্রসাদ পাইবা
মরিলে কাফের যুদ্ধে শহীদ হইবা।
এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণ পণ
ক্ষুদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কতক্ষণ।

হিন্দুদেরও সেই আহ্বান :
রণে ভঙ্গ মৃত্যুধিক রহএ অখ্যাতি
যুদ্ধ করি মরিলে হয় স্বর্গগতি।

যুদ্ধাস্ত্র : গোলাগুলী শর যুদ্ধ করিয়া অপার।
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি পদাতি
নানা অস্ত্র প্রহারএ ক্রোধ করি অতি।
খর্গ চর্ম ছেল টাঙ্গি মুদগর বিশাল
তবল তাম্বুরাদি নারাচ ভিণ্ডিপাল।
গুরুজ প্রসার আর ঘাদুয়া ঝামর
দস্তাদস্তি কশাকশি যুদ্ধ বহুতর।
কার শিরে ভিণ্ডিপাল হানে কোন বীর।

বিদেশী যোদ্ধা : হাবসী ফিরিঙ্গী রুমি গোলন্দাজী যত
যাকে পায় তাকে মারে না চাহে মহত্ত্ব।

ধর্মশালা : পতিমুক্তি পাইতে মনেত ভাবি বালা
পদ্মাবতী রচিলেক এক ধর্মশালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদেশী পন্থিক যথেক যুগী জাতি
অন্ন জলে দান করে বিশেষ ভকতি।

টোনা : দেবতা মোহিতে পারি ইন্দ্রের যুবতী।
যেই কামরূপী ছিল চাম্পারি ললনা
জ্ঞাত মোহিনী তথোধিক মোর টোনা।
মন্ত্র হোতে বৃক্ষে চলে উলটয় নদী
পর্বত টলয় তিলে মন্ত্রের অবধি।
মন্ত্রবলে সর্প ধরি পেটারিতে রাখে।
সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবসে না দেখে।
মন্ত্রে ভুলাইতে পারি মহাজ্ঞানী প্রাণ।

সতীত্ব ও স্বামী : কণ্টক ফুটএ পদে গেলে আন বাটে
দুই নৃপ কদাপি না বৈসে এক পাটে।
স্বামীর পিরীতে ভাবে নিজ প্রাণ দিব
এ জন্মে না পাই যদি জন্মান্তরে পাব।
এক ছাড়ি দোসর ভাবিলে নহে সতী
সংসারে কলঙ্ক পরকালে অধগতি।

হিন্দুপুরাণে সতীত্ব : পঞ্চ স্বামী সেবী সতী হইল দ্রৌপদী
বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী।

নাবালিকার বিবাহ ও গমনা :
এবে গমনার কথা শুনহ বিদিত
রাজপুত কুলেত আছএ হেন রীত।
শিশুমতি কন্যারে যদি বিবাহ করে
যাবত দেখএ পুষ্প থাকে পিতৃঘরে।
নানা রঙে খেলি থাকে শৈশবের চিত
দৈব যোগে পদ্ম যদি হয় বিকশিত।
কতদিন ব্যাজে কন্যা স্নান করাইয়া
সকৌতুকে স্বামী গৃহে দেয় পাঠাইয়া।
তবে তার স্বামী সঙ্গে রতি রঙ্গ হএ
রাজপুত কুলে তারে গমনা বলএ।

ঘ. সিকান্দারনামা

আলাওল রচিত [মৎ-সম্পাদিত]

[১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে রচিত]

কবির জীবনবোধ ও ধর্মানুরাগ :
ছল বল হোন্তে হস্ত ধুইতে উচিত
ছলে বলে যেই করে সমস্ত কুৎসিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং
সাধুলোক সঙ্গে বুদ্ধি উজ্জ্বলতা পায়
কুসঙ্গে উপজে গর্ব বুদ্ধি পায় লোপ
না ভাবিয়া অনুচিত স্থানে করে কোপ।
উত্তমে হরিষে থাকে ভুঞ্জি ভুঞ্জ রীত
পরবিত্তি লোভ হোন্তে নিবারিয়া চিত।

বৃক্ষের রূপকে কবি আদর্শ জীবনের চিত্রও অঙ্কিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন :

অসার সংসার সুখ হোন্তে দুঃখ লভে
সেই ধন্য যাহার কীরিতি রহে ভবে।
ফলবন্ত হৌক মহাবৃক্ষ অনুপাম
যার ছায়াতলে পারি করিতে বিশ্রাম।
ক্ষেণে ছায়া হন্তে দেয় বৃক্ষপত্রে শোভা
ক্ষেণে ছায়া হোন্তে রক্ষা করে সূর্যপ্রভা।
ফলে ফুলে পল্লব বসন্ত পূর্ণকাল
হেন তরু সুচারু রহুক চিরকাল।
ফলছায়াযুক্ত বৃক্ষ হেলে সুশোভিত
পরশু লাগাইছে হেন অসাধু-চরিত।

সমাজেরও নানা রীতিনীতির আভাস আছে এখানে-ওখানে। সম্মানে বা স্বাস্থ্য কামনায় পান—

সুরা পিয়ো কয়মুচ নৃপরে স্মরিয়া।

রৌসনকর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আরস্তু যখন দারার মহলে গেলেন তাঁর—

চিকের অন্তরে আসি বসিলেক রানী।

এ হয়তো অগ্নিউপাসক দারা মহলের চিহ্ন নয়, পর্দানসীন মুসলিম সম্রাজ্ঞীর আলেখ্য।

তারপর শুভ দিন-ক্ষণ-লগ্ন দেখে বিয়ের তারিখ স্থির করা হল, তখন থেকে উদ্যোগ আয়োজন সাজসজ্জা হল শুরু :

নানাবর্ণ বানাকুল নাচিছে চামর
লক্ষ লক্ষ ঊর্ধ্ব কৈল নগরে নগর
স্বর্ণবর্ণ নানাবস্ত্র কৈল নবগিরি
সহস্রে সহস্রে টানাইলা শূন্য ভরি।
বিচিত্র কোমল শয্যা হেটে বিছাইল
নানা ভাতি সুবর্ণ কানাত টানাইল।
কৃত্রিম কুসুম্ব পূর্ণ কৈল হাটবাট
যথা তথা যন্ত্রবাদ্য রাগগীত নাট।
ভক্ষ্য শেষে সুগন্ধি ছিটাএ বহুতর
আগর চন্দন মিলি কস্তুরী আম্বর।
কুঙ্কুম জরদ চুয়া গোলাব ফুলেল
নানান সৌরভ নানা ভাতি মেল।
নানাবিধ পাকতৈল করিয়া মিশ্রিত
সুরঙ্গ কুসুম লগ্নে করে অঙ্গ হিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিরাজের পঙ্কে হৈল মেদনী পিছল
আবীর সুগন্ধি ধূলে শুকায় সকল।
নিশা কালে লক্ষ লক্ষ কন্দিল জ্বালিয়া
বৃক্ষ ডালে হাটে বাটে রাখএ টানিয়া—
পঞ্চশাখা ত্রিশাখা দেউটি লক্ষে লক্ষে
মহাতাপ দীপক ফানুস কেবা লেখে।
জলে স্থলে লক্ষে লক্ষে পোড়ে নানা বাজি
ভাতি ভাতি বহুরূপে আইল সাজি সাজি।

মারোয়া :
শুভক্ষণে মারোয়ার কদলী রোপিলা
রত্নময় চন্দ্রাতপ উর্ধ্বে আচ্ছাদিলা।
কন্যাকে মার্জনা করে যথ বরাঙ্গনা
শুভক্ষণে শাহা হস্তে বান্ধিল কঙ্কণা।
এহি মতে অষ্টম দিবস বহি গেল
শুভবিবাহের দিন উপস্থিত ভেল।

বরের সাজ :
শিরে রত্নময় তাজ   জ্যোতিমন্ত গ্রহরাজ
কেশ-রাহু করিছে গরাস
সুবর্ণ সোহরা মাথে   মুকুতা হাতে ভাতে
অপূর্ব তারক সুরপাশ।
বাদলা কাবাই গাজে   নয়ানে ধরএ জোতে
জড়াই কোমরে পাটা সোহে
নানাপুষ্প গুঞ্জমাল   ঝলমল করে ডাল
হেরি কুলবধূ মন মোহে।
সুবর্ণ পাছড়া গায়   মুক্তাদাম ঝলকএ
হেটে শোভে জর্কাসি তুমান।

জুলুয়া :
জুলুয়ার ক্ষণ যদি হইল নিকটে
কন্যাকে সাজাই আনি বসাইল পাটে।
মধ্যভাগে দিব্য অন্তস্পটে আচ্ছাদিল।...
শাহারে আনিয়া বসাইলা আনভিতে
আনন্দে জুলুয়া দিলা শাস্ত্রবিধি রীতে।
পাঠ তুলি হাদিয়া অঙ্গুরী করে দিলা
পরশে দোহার অঙ্গ পুলকিত হৈলা।
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিয়া সত্বর
শাহার কোলেত আনি দিলা কন্যাবর।

মা কন্যাকে শেষ উপদেশ দিলেন :
পতি বিনে সতীর নাহিক গুরুজন
দোহ জগে সুখ মুক্তি যেই সেবে স্বামী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কদাপিহ রিষ গর্ব মনে না রাখিবা
প্রেম ভক্তি সেবামাত্র আচরি রহিবা।

মা বরের হাতে কন্যা সমর্পণ করতে গিয়ে অনুরোধ জানাচ্ছেন :

কায়ানী বংশেতে মাত্র আছে এহি কন্যা
তোহ্মাতে সপিলুঁ বাপু আজি হৈল ধন্যা।
পিতৃহীন এতিমেরে দয়ায় পালিবা
দোষ কৈলে দারা মুখ চাহিয়া ক্ষেমিবা।
স্ত্রীজাতি হীনমতি রোষ রিষ ঘর
আপে মহা বিজ্ঞ তুহ্মি শাহা সিকান্দর।
তোহ্মা হস্তে সমর্পিলুঁ মোর পতিপ্রাণ
তুহ্মি জান প্রভু জানে কি বলিব আন।

এ যেন কোনো সাধারণ ঘরের শঙ্কাতুর মনের উক্তি। এক বাঙালি কবির রচনায়ও এমনি কথা পাই। শ্বশুর কনে সমর্পণ করবার সময় জামাতাকে বলেছেন :

কুলীনের পো তুহ্মি কি বলিব আহ্মি
হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট পুরে ভাত। ইত্যাদি।

বিবিধ :

সতের শতকে নৌবিদ্যায়, নৌবহরে, নৌযুদ্ধে ও জলদস্যুতায় আরাকানীদের জুড়ি ছিল না এদেশে। আরাকানীদের এই গর্বিত দাপট আলাউলের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাই তিনি সযত্নে আরাকানরাজ্যের শক্তিপ্রতীক নৌবহরের বর্ণনা দিয়েছেন :

অসংখ্যাত নৌকাপাঁতি নানা জাতি নানা জ্ঞাতি
সুচিত্র বিচিত্র বাহএ।
জরিশ পাঠ-নেত লাঠিত চামর যুত
সমুদ্রপূর্ণিত নৌকামাত্র।।
আচ্ছাদন দিব্যবস্ত্রে অগ্নি আদি নানা অস্ত্রে
সম্পূর্ণ সুরূপ ভয়ঙ্কর।

আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার অভিষেক উৎসবে পৌরোহিত্য করেছেন মুসলমান মহামন্ত্রী নবরাজ মজলিস। রাজা শপথ গ্রহণ করেছেন তাঁর কাছ থেকেই। সে শপথও আবার ধর্মনিরপেক্ষ উদার মানবিক :

মজলিস পরি দিব্য বস্ত্র আভরণ
সম্মুখে দাণ্ডাই আগে দঢ়াএ বচন।
পুত্রবৎ প্রজারে পালিবা নিরন্তর
না করিবা ছলবল লোকের উপর।
শাস্ত্রনীতি রাজকার্যে হৈবা ন্যায়বন্ত
নির্বলীরে বল না করৌক বলবন্ত।
দয়াল চরিত্র হৈবা সত্য ধর্মবন্ত
সুজনেরে সন্তোষিবা নাশিবা দুরন্ত।
ক্ষেমাধর্ম আচরিবা চঞ্চল না হৈবা।
পূর্ব অপরাধে কার মন্দ না করিবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর নানা বিধি প্রকাশন্ত রাজনীতি
সত্য করিয়া যদি দঢ়াইল নৃপতি।

তারপর : প্রথমে মজলিসে তবে সালাম করএ
শেষে মাতৃকুল আদি সবে প্রণামএ।

এ নিশ্চিতই মুসলিম সংস্কৃতির গাঢ় প্রভাবের ফল। এ প্রভাব বিশেষভাবে শুরু হয় ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

ঙ. সয়ফুল মুলুক-বদিউজ্জামাল

দোনাগাজী বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

দোনাগাজী সতের শতকের কবি। তাঁর নিবাস ছিল চাঁদপুর মহকুমার 'দোল্লাই' গ্রামে। তাঁর পুরো নাম দোনাগাজী চৌধুরী।

প্রেমতত্ত্ব :

বাঙলাদেশে খাঁটি শরিয়তি ইসলাম কখনো অনুসৃত হয়নি। সূফীমতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বাঙালী মুসলমানদের ধর্ম। তাই সর্বেশ্বরবাদ বা অদ্বৈতবাদের প্রভাব ছিল মুসলমানদের মজ্জায়। মধ্যযুগের সব কবির স্তুতি অংশে তাই আল্লাহ্ ও রসুল অভিন্নসত্তার জাহেরিরূপ বলে পরিকীর্তিত। তাছাড়া সৃষ্টিপ্রেরণার মূলে রয়েছে প্রেম। আল্লাহ্র প্রেমানুভূতিই জগৎ সৃষ্টির উৎস:

আদ্য প্রভু সৃজিয়াছে প্রেমে ত্রিভুবন....
সৃষ্টি সৃজিয়াছে প্রভু প্রেম অনুভবি
প্রেমভাবে সৃজিয়াছে মোহাম্মদ নবী।
তাই, প্রেম সে পরমতত্ত্ব জানিঅ নিশ্চএ
আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ।
প্রেম সে পরম তত্ত্ব, প্রেম সে উত্তম
প্রেম সে মজাএ মন প্রেমে সে জনম।
জগত জনম জান প্রেম অবতার।...

'আদ্যপ্রভু' কথাটিতে বৌদ্ধ 'আদিনাথ' তত্ত্বের প্রভাব ও ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

শিক্ষা

পাঁচ বছর বয়সেই শুরু হত বালক-বালিকা বিদ্যাচর্চা। রাজকুমার ও মন্ত্রীপুত্রকে :

পঞ্চম বরিখে শাস্ত্র পড়িবারে দিল।

সেকালের পাঠ্যতালিকার তথা পাঠ্যসূচিরও উল্লেখ রয়েছে :

শিখিয়া আপনা শাস্ত্র [শাস্ত্রবিদ্যা] শিশু
কাব্যশাস্ত্র রতিশাস্ত্র শিখিল পুরাণ
সিদ্ধিশাস্ত্র [যোগ] আগম জ্যোতিষ আর যথ
শিখিল যথেক শাস্ত্র কি কহিব কথ।

সে-যুগে সাধারণ ঘরেও নারীশিক্ষা দুর্লভ ছিল না, যোষীকন্যা ও বেনে-বউ কেবল শিক্ষিতা নয়, বুদ্ধি ও চাতুর্যে পুরুষের বাড়া। যোষীকন্যা ছিল :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবীন যৌবনী কন্যা প্রসঙ্গে বিদুষী...
যুক্তি অনুযুক্তা যুক্ত উক্তি অতিরক্তা
বিলাসী সঙ্গীত ভাষী কাব্য পরিভক্তা।
চাতুর্যে মাধুর্যে অতি বাচে অগ্রগণ্য।...

আর বেনে-বউয়ের পরিচয় এরূপ :

আছিল পণ্ডিত সেই বণিক বনিতা।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত প্রচুর
পারগ সর্বজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিত চতুর।

নারীর স্থান :

পুরুষপ্রধান সমাজে নারী ছিল পরান্নজীবী ও অসহায়। সারাজীবনে তার কোনো স্বাধীন সত্তা ছিল না। কন্যারূপে পিতার, জায়ারূপে স্বামীর এবং মাতারূপে পুত্রের অভিভাবকতায় কাটত তার জীবন। তার বাপের বাড়ি ছিল, শ্বশুরবাড়ি ছিল, কিন্তু নিজের বাড়ি ছিল না কখনো। তবু পরকে আপন করার, অনাত্মীয় নিয়ে ঘর করার, নতুন জায়গায় ঘর বাঁধার মতো মনের জোর ও স্বভাবের ঐশ্বর্য রয়েছে তার। সে জানে 'পিতৃগৃহে কন্যা জন্ম অন্যের কারণে।' সেজন্যেই হয়তো নতুনকে বরণ করার মানসিক প্রস্তুতি থাকে তার। তাই পুরুষের চোখে সে 'মহামায়া বামাজাতি মায়ার গঠন।' তবু অনাদর-অবহেলা ও পীড়নের ভয় থেকে যায় তার মনে। তাই সে স্বামী বা প্রেমিককে বলে :

সত্য তুহ্মি আহ্মা আগে কর মহামতি
আহ্মা ছাড়ি অন্যস্থানে না করিবা গতি।
তোহ্মার অধীন হৈলে না করিবা হেলা।...

AMARBOI.COM

শঙ্কাকাতর মাও কন্যা সমর্পণ কালে জামাতাকে বলে পাঠায় :

কহিও বুঝাইয়া মোর এহি নিবেদন
পালিতে অবলা বালা করিয়া যতন।
ক্ষেমিতে সদয় মনে তার যত দোষ
ধর্মেত পাইবা পুণ্য মোর পরিতোষ।

যোগ ও যোগীর প্রভাব :

সাংখ্য ও যোগ অতি প্রাচীন অনার্য জীবনতত্ত্ব। ব্রাহ্মণ্যযুগে এ দুটো সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বে উন্নীত হয়। এই তত্ত্বদুটোর প্রভাবে হিন্দুযুগে বাঙলার বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের যোগতান্ত্রিক বিকৃতি ঘটে। যোগীতান্ত্রিকের সংখ্যা ও প্রভাব বেড়ে যায় এদেশে। বাঙালি মুসলমানের সুফিসাধনায়ও যোগের তথা দেহতত্ত্ব ও দেহসাধনের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। হিন্দুসমাজে একসময় বিবাগী মাত্রেই ছিল যোগী তাই হাটে-বাটে ও ঘরে-ঘাটে সর্বত্রই দেখা যেত যোগী। এজন্যেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে বঙ্কিম-সাহিত্য অবধি সব গ্রন্থেই পাই যোগীর উল্লেখ। দোনাগাজীও প্রসঙ্গত উপমা দিয়েছেন যোগীর :

ক. কিবা যোগীবেশে ভ্রমি সকল সংসার।
খ. যোগ-কন্থী লইয়া ভ্রমিব দেশে দেশে
বৃক্ষতলে নদীকূলে ব্রহ্মচারী বেশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ. যোগীবেশে যোগিয়া বসন বিবর্জিত।
ভোজন শয়ন রতি বচন বর্জিত।
ঘ. যোগিয়া বসন ভূষণ তোক্ষার।

গৃহ, তৈজস, আসবাবপত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার

রাজা-বাদশার কাহিনীতে গরিবের কুটির, মধ্যবিত্তের ভবন ও ধনীর অট্টালিকার কথা মেলে না। এখানে রাজার টঙ্গী তথা প্রাসাদের ও তার আনুষঙ্গিক যোগ্য বস্তুসামগ্রীর বর্ণনা পাই। আর সেগুলো :

কাঞ্চনের গৃহ সব রত্তনের খাম
হীরামণি মাণিক্য লাগিছে ঠামে ঠাম।...
তাহাতে সুন্দর টঙ্গী রত্তন নির্মাণ।
রজতের কোঠা করিয়াছে চারিভিতে।

তৈজসপত্রও তাই মাটির হাড়া সরা নয় :

১ সুবর্ণের পাতিল সরা সুবর্ণের চুলা
সুবর্ণের কটোরা ঝারি সুবর্ণের থালা।
২ সুবর্ণের রত্নমণি রত্তনের থালা
রজত কাঞ্চন মণি খোড়া বাটি ভালা।

আসবাবপত্র : খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।

দোলনা : কাঞ্চনের ঢুলনি এক রতনে জড়িয়া
তাহাতে রাখিছে কন্যা বসনে বেড়িয়াঁ।

বস্ত্র : সুবর্ণে জড়িত চিত্র পট্ট বস্ত্র আর।
জরির ঝরোকা জড়ি বিচিত্র পাটের শাড়ী।
কাতিকশি জরকশি শাড়ী পাটাম্বর।
পাগড়ী পটকা আর নিমা পায়জামা।

অলঙ্কার : ১ কর্ণবালি বনিতার দুই পাশে সাজে
ঢুলনি খেলায় কিবা মদন সমাজে।
ভুজ সুশোভন তার বলয়া সুবলিত
রত্তন আমারী এক জড়িত মণিহারা
চারিভিতে মুকুতা মাণিক্য দিয়া জোড়া।
অন্সরা ধ্বনি করে কিঙ্কিণী নেপুর
২ অঙ্গদ বলয়া বাহু কঙ্কণ চরণ
অঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভএ মণিমএ।
৩ কানে বালি কর্ণফুল লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলিপাত দোলে
মুক্তা মণি চুণী জড়া অরুণ প্রভৃতি তারা...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কপালে অলক টীকে বেশর বিরাজে নাকে... ।
তেল'রী [ত্রিলহরী] হাঁসুলি হার সিঁথিপাত শোভাকার
তাড় বাজুবন্ধ করে অঙ্গদ বলয় ধরে
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার
হীরা মণি হেমে জড়ি মদন মিশাই পড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়
কনিষ্ঠ কানি অঙ্গুলে শ্রীঅঙ্গুরী শোভে ভালে
কটিতে কিঙ্কিণী ধ্বনি চরণে নেপুর শুনি
তোড়ল খারুয়া পাএ নখ মাখি আলতাএ
উঝটি বিঝটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া রয় চরণে শরণ লএ ।

কাজল সিন্দূর ও মেহদী, চন্দন

প্রসাধন সামগ্রী : ১ মেন্দি মাখা নখে যেন অরুণ শোভএ ।
মুছিল কাজল রেখা সিন্দূরের ফোঁটা
ঠামে ঠামে লাগিছে অরুণ ঘনঘটা ।
২ কর্পূর তাম্বুল পুষ্প ছিল বিদ্যমান
কুঙ্কুম কস্তুরী আর চন্দন আগর
গোলাব আতর আর কাফুর কেশর ।
আর যথ সুগন্ধি সকল রাজনীতি
আপনে কুমার অঙ্গে লাগায় নৃপতি ।
৩ ললাটে সিন্দূর বিন্দু অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে
জলদ কাজল রেখা ভূরু ইন্দ্রধনু রেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে ।

বরের পোশাক : কৌতুকে কুমার সাজাইল পুরীমাঝ
বিচিত্র জরির বোঁটা হরিষ বসন
নানা পুষ্পে যেহেন পুষ্পিত পুষ্পবন ।
মণি-মুতি জড়িত সুচারু কাবাই উত্তম
মণিরত্ন ঝলমল দীপ্তি মনোরম ।
গুয়া সুরুয়াল ভাল মলমল খাস
ত্রিভুবনে যথা চিত্র যথেক চিত্রবাস ।
পাগড়ী পেটিকা আর নিমা পায়জামা
সুবর্ণ ওড়নী সনে তাতে মনোরমা ।
পুরুষের বিহিত যথেক অলঙ্কার
পরিধান করাইল সাজাই কুমার ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দান, যৌতুক ও উপহার সামগ্রী

উপহার : ১ ভক্ষ্য ভোজ্য আসন বসন নানাবিধ
ভূষণ বাহন দিত নানা মূল্য নিধি।
২ রজত কাঞ্চন দান দিলা বহুতর
রত্ন দিয়া তুষি আদেশিলা শীঘ্রগতি।
৩ রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি লৈল অলঙ্কার।
সহস্রেক হস্তী ভরি বস্ত্র আভরণ
হীরা মণি মাণিক্য অমূল্য মূলধন।
উট বাজি গজ ধেনু রাজ ব্যবহার
খাট পাট পালঙ্ক খাইতে উপহার।
তুরুকী এরাকী ছিল মিসির ফারসী
রুমী খোরাসানী তবে আর যথ দাসী।

উপঢৌকন হস্তী ঘোড়া রত্নমণি রজত কাঞ্চন
শতেক তঙ্কার ছিল বহুল বসন।

যৌতুক মাতঙ্গ তুরঙ্গ উষ্ট্র বৃষ ধেনুগণ
মুকুতা প্রবাল মণি মাণিক্য রতন।
বসন ভূষণ বহু বস্ত্র অলঙ্কার
দাস দাসী বহুল কহিব কথ আর।
সপ্তশত হস্তী ভরি মাণিক্য রতন
পঞ্চশত উট ভরি আর যথ ধন।

বাদ্যযন্ত্র : ১ ঢোল ধামা পিনাক সারিন্দা পাখোয়াজ।
২ পরা ভেরী মৃদঙ্গ ঝাঁঝরা করতাল
দোহরি মোহরি দব ভেউর কর্ণাল।
সারিন্দা রবাব বেণু বীণা সিঙ্গা বাঁশী
ঢাক ঢোল কাড়া কবিলাস অভিলাষী।
কন্দিরা মন্দিরা ধারা ডম্বুর পিনাক
তাম্বুরা জঙ্গলা বাজে শঙ্খ শিঙ্গা ঢাক।
৩ দুমদুমি নাকাড়া, দমা নানান বাজন
পাখোয়াজ সারিন্দা পিনাক কবিলাস
মঞ্জিলের বোলে সবে হইল উল্লাস।
শিঙ্গা বেণু বাঁশী আর সানাই কন্নাল
ডম্বুর তাম্বুরা আর ঝাঞ্জর করতাল।
বীণা দোনা শঙ্খ বাঙ্গি দোহরি মোহরি
ভূযঙ্গ মৃদঙ্গ কাঁস তবল ভাঙ্গরি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুদ্ধবিদ্যা ও যুদ্ধাস্ত্র

যুদ্ধবিদ্যা :

সর্বশাস্ত্রে কুমার হইল বিচক্ষণ
সর্ব অস্ত্র শিখিল লইল, শরাসন।
গদাযুদ্ধে গদাধর হইল দুর্জয়
দ্বন্দ্বমল্ল সমবেত হইল নির্ভয়।
খর্গযুদ্ধে মহাযোদ্ধা হৈল রাজসুত
অস্ত্রেশস্ত্রে বিশারদ হইল অদ্ভুত।

যুদ্ধাস্ত্র : শল্য, শূল, গদা, মুষল, মুদগর, নারাচ, নালিকা, অসি, খঞ্জর, বিভিন্ন ধনুর্বাণ, –অগ্নিবাণ, বরুণবাণ, সিংহবাণ, গজবাণ, অর্ধচন্দ্রবাণ, মেঘবাণ ইত্যাদি।

যুদ্ধোপকরণ : অশ্ব, গজ, রথ ও বাদ্য।

আচার-সংস্কার-রীতিনীতি

ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণ এবং সামাজিক রীতিনীতি উৎসব-পার্বণ থেকে মানুষের জীবন-যাত্রার একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এসব সামাজিক মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের মানের পরিমাপকও।

AMARBOI.COM

সংস্কৃতি :

নাটগীতি কাব্যকলা নিত্য ঘরে ঘরে
কাব্যশাস্ত্র কৌতুকে বঞ্চএ রাত্রদিন।

আদর্শ সুখের জীবন :

নাটগীতি প্রতিনিতি নিত্য কাব্যরস
কামকলা প্রতিনিত কেলির্কলা রস
নানা শাস্ত্র শিক্ষা সব শাস্ত্র অবধান
রতিশাস্ত্র রতিপতি রতি বিদ্যমান।
রমণী বাঞ্ছিত চিত্ত কামোদ আমোদ।

প্রণাম : কদমবুসি ষাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রভৃতি বহুল প্রচলিত ছিল।

ক. পুনি পুনি ভূমিগতে করে দণ্ডবৎ।
খ. নামাজের অবশেষ হই দণ্ডবৎ।
গ. যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।
ঘ. ভক্তিভাবে চরণ বন্দিল ততক্ষণ
ঙ. ভক্তিভাবে কুমার করিয়া দণ্ডবৎ
পাদুকা চুম্বিল তান হৈয়া ভূমিগৎ

মারোয়া নির্মাণ :

করি 'দধি মঙ্গল' সুগন্ধি মাখি গাএ
সুবর্ণ শিরোপা মাথে সোয়ার চড়াএ।
সীতাপতি কদলী আনিয়া শুভক্ষণে
করিল আলাম খাড়া আনন্দিত মনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারোয়া লেপিতে দিল যথ সোহাগিনী
করিল বিচিত্র সব পরীর রচনী।
ভরিল সুবর্ণ ঘট নৃপতি সকল
তৈল চড়াইল অঙ্গে মন কুতূহল।

আশীর্বাদ : কপালে চুম্বিয়া রাজা কৈল আশীর্বাদ।

তিথিলগ্ন :

১ মাহেন্দ্র সময় করি রাজার দুহিতা
যাত্রা কৈল প্রণাম করিয়া পিতামাতা।

২ শুভ লগ্ন নিয়া
দেব আরাধিয়া
গজ পৃষ্ঠে তুলি দিল।

৩ ইষ্টদেব স্মরি সবে নৌকা আরোহিয়া।

নীতিবোধ : পরদার ডরে রতি সিদ্ধি না হইল।

নজুম গণক-জ্যোতিষী :

১ রাজ্যের সর্বজ্ঞ ডাকি আনহ সাক্ষাৎ
সন্ততি আছে বা নাই দিবেক গণিয়া।

২ এথাএ দুইপাত্র যথা যোগী-বৈদ্য আনি
রাজার জনম পত্র চাহিলেক গণি।

৩ দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভাল মন্দ মোর আগে কহিবা তাহার।

সংস্কার :

১ মোর যথ ধনজন রাজ্য অধিকার
নিছনি এই সকল হউক তাহার।

২ শুভকার্য মাঝ কান্দি নাহি কাজ

৩ রাজকন্যা দরশি নিছনি করিবার
মাণিক্য মুকুতা জরি লৈল অলঙ্কার।

৪ এসব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।
অপদেব দৃষ্টি নহে নৃপতি নন্দন।

৫ দেবতা লক্ষিল কিবা গন্ধর্ব কিন্নরী
অপদেব দৃষ্টি কিবা পরী অপ্সরী।

অদৃষ্টবাদ ও জন্মান্তরের কর্মফল :

আছএ তোক্ষার কর্মে পুত্র বিচক্ষণ।

দরবারি সৌজন্য :

১ পত্র এক লিখি দূত পাঠাইয়া দিল
উপহার অমূল্য বহুল ধন দিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ মিসিরের রাজার দূত আনি বিদ্যমান
বহু ধন দিয়া তারে করিল সম্মান।
৩ গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া চলে নরপতি
দুই হস্তে চতুর্ভিতে ছিটে গজ মোতি
লক্ষ লক্ষ ভরী সোনা নৃপতি নিছিয়া
যাচক উদ্দেশি ফেলে দূরেত ক্ষেপিয়া।

রাজকীয় নিশান : ধ্বজ ছত্র বৈরাগ নিশান রাজনীতি।

ক্রীড়া

নারিকেল খেলা : তুহ্মি মূর্খ অচতুর প্রেমে নাহি কাজ
নারিকেল খেল গিয়া গোঁয়ার সমাজ।

অন্যান্য খেলা : শতরঞ্চ চৌঅর পাশা সারি সারি
দিবস গোঞাএ নানা রঙ্গ রস করি।

জলুয়া-গেরুয়া : জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আক্ষি
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অক্ষরী।

বেশ্যাবৃত্তি

সেকালে বেশ্যাবৃত্তি এমন নিন্দনীয় ছিল না, তাই বেশ্যারাও ছিল না ঘৃণ্য। বস্তুত বেশ্যারাই ছিল নৃত্য ও সঙ্গীতশিল্পী এবং অভিনেত্রী। বেশ্যা পোষণ ছিল আভিজাত্যের ও বিত্তবানতার লক্ষণ। সে জন্যেই গৌরব-গর্ব ও মর্যাদার অবলম্বন ছিল বেশ্যা-পোষণ। রাজকীয় দরবারি উৎসবেও তাই দেখতে পাই :

বেশ্যা সবে নৃত্য-করে অতি সুললিত
রাজবেশ্যা নৃত্য করে অপরা বর্জিত।

এবং রাজকুমারের বিদেশ যাত্রার সময়েও সঙ্গে নিয়েছিল বেশ্যা :

আলিম পণ্ডিত আর জ্যোতিষ গণক
নানা যন্ত্র রাজবেশ্যা গাহন নর্তক।

ধর্মাচার : উৎসব : পার্বণ

দেবদ্বিজ আরাধি করএ দানধর্ম
কায়মনে পুত্র আশে করে এহি কর্ম।

ষষ্ঠি-পর্ব : হইল ষষ্টম রাত্রি জনম অবধি
নাটগীত আনন্দ পূরিল রাজপুরী
বাজএ উৎসব বাদ্য সর্বরাজ্য ভরি
রতন কাঞ্চন দান দিয়া মহারাজ
দৈবজ্ঞ সর্বজ্ঞ যথ আনিলা তুরিত
বুলিলা শিশুর কর্ম করিয়া বিচার
ভালমন্দ যোর আগে কহিবা তাহার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যজ্ঞ-পূজা : জ্ঞাতি অন্ন ভুঞ্জাইল দেব আচরণ
নানা দেব আবাহন কৈল আরাধন।
আগর চন্দন কাষ্ঠ আনল জ্বালিয়া
অবুর্দে অবুর্দে ঘৃত দিলেক ঢালিয়া।

অতিথি সৎকার : লেখিল অতিথ পূজা সর্বশাস্ত্রে ধর্ম।
কথাত গৃহস্থ সেবা করএ অতিথ।...

আচার (বর-কনে): কুমার মুণ্ডের জল কুমারীর শিরে
কৌতুকে ঢালিল সবে নীতি অনুসারে।

গ্রহশান্তি : গ্রহ শান্ত কর দান দিয়া বহুধন।
সর্বশাস্ত্রে শুনিয়াছি এমন বিহিত

দান : দানে বিঘ্ন দূর হএ কহিছে পণ্ডিত।

আতস-বাজি-পোড়ানো উৎসব : বাজীর নাম :

ভূমিচাম্পা সীতাহার বেঙ্গা মেড়া গজ আর
কাশ্মীর চাদর সারি সারি
অপরাজিত রাধাচক্রা রাক্ষস দানব বক্র
রাজসব যক্ত ফুলছরি
চতুর্ভুজ শাহভুজ কন্দিল নিন্দিল সূর্য
রোশন-মন্দির শাহজাল
হাউই রোসনতারা লক্ষ লক্ষ গোড়াহারা
সভামণ্ডলে শোভে ভাল।

অপদেবদৃষ্টি, দারু-টোনা ও চিকিৎসা

১ এ সব প্রকৃতি সব অপদেব কাজ
শীঘ্র আন যথ ওঝা আছে রাজ্য মাঝ।
২ নাড়ী পরীক্ষিতে সবে আরম্ভ করিল
ষট নাড়ী স্থান করি নাড়ী বিচারিল।

টোটকা ঔষধ : সব্য লভ্য বটিকা নাসার অধেঃ রাখি
ঘন ঘন ছিটও সুগন্ধি গন্ধ মাখি।

টোনা : কেহ বোলে টোনা কৈল বুঝি এই দুষ্ট
কেহ বোলে মন্ত্র পড়ি করিলেক নষ্ট।

৫ চিকিৎসা : কোনজন ধন্ধ হই ধরএ ধরণী
কেহ শিরে তৈল দিয়া কেহ দেয় পানি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাগ ও কর্দম রঙ্গ

উৎসবের সময়ে আনন্দের আবেগ প্রকাশ করার জন্যে রঙখেলা তথা ফাগু খেলার রীতি সুপ্রাচীন। ফাগ বা রঙের অভাবে কাদা ছোড়াছুড়ির প্রথা প্রাচীনতর। গ্রামাঞ্চলে কাদা মাখামাখি খেলা আজো বিরল নয়। হোলি তো আছেই।

১ পঙ্কজল আনি কেহ পঙ্ক লৈয়া হাতে
পঙ্ক মেলি মারে সব পঙ্কজ সভাতে।
২ সোহাগ কেশর চুয়া আগর আতর
একে রঙ্গে মেলি মারে আরের উপর।
৩ গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ মেলিয়া মারি
কেহ কার বসন তিতাএ।
৪ আবীর চন্দন চুয়া কস্তুরী আনিয়া
কেলি করে একে আনে অঙ্গেত মেলিয়া।

মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার

মুসলিম কবিগণ দেশীয় ও ধর্মীয় ঐতিহ্যে সমভাবে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কোনো অসুস্থ মন বা বিকৃত বুদ্ধি তাঁদের বিচলিত করেনি।

দেশান্তরে উদ্ভূত ধর্মের সবকিছু জানার বড় অন্তরায় ছিল ভাষা। তাই ধর্মীয় ঐতিহ্যে তাদের সহজ অধিকার ছিল না। মুঘল আমলে ফারসির বহুল চর্চার ফলে এবং এদেশের উচ্চবিত্তের ও পদের ইরানি লোকের বহুলতার দরুন ইরানি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রভাব হয় ব্যাপক ও গভীর। আর ধর্মীয় ঐক্যের সুবাদে দরবারি ভাষার প্রতি প্রীতিবশে এদেশী মুসলমানেরাও ইরানি ও ইরানি ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপন করে নেয়। এদিকে স্বাভাবিক কারণেই এদেশের মাটির সন্তান এদেশের মাটি ও পরিবেশের ঋণ অস্বীকার করেনি। তাই দেশজ উপকরণই মুসলমানের রচনায় বেশি। তার সঙ্গে মিশেছে ইরানি ঐতিহ্য। মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্ম দেশ-ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। ইসলামপূর্ব যুগে এদেশের মানুষের ধর্ম ছিল বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ। তাই দেশী ঐতিহ্য বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যজীবন উদ্ভূত।

প্রতিবেশী বিধর্মীর প্রতি বিদ্বেষবশে এ-যুগে দেশী ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার দুর্বুদ্ধি জেগেছে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর মনে। কিন্তু যেহেতু জীবনই ভাষার জন্মদাতা, আবার ভাষার মাধ্যমেই জীবন অভিব্যক্তি পায় এবং আমাদের ভাষাটি দেশজ তথা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মানসপ্রসূত; সেহেতু এ ভাষা ত্যাগ না করলে এদেশী ঐতিহ্য পরিহার করার অপচেষ্টা বিড়ম্বিত হবেই। দেশী ঐতিহ্যের ও প্রতিবেশী বিধর্মীর ধর্মীয় ঐতিহ্যের আকস্মিক অভিন্নতায় গুরুত্ব না-দেয়াই সুস্থবুদ্ধির পরিচায়ক। ঐতিহ্যের ব্যবহার কবির বিদ্যাবত্তার সাক্ষ্য :

১ ইসুফ না হৈল তার রূপের সমান
কূপেত লুকাইল গিয়া পাই অপমান।
কিবা রূপ তাহার দেখিতে করি আশ
ইসুফ মিসিরে আসি হইছিল দাস।
২ বিরাজে অমৃত কূপ অধরের তলে
সহস্র ইসুফ পড়ি ভাসে তার জলে।
৩ ফতেমা আলির যেন ছিল রস রঙ্গ
রসুল বঞ্চিল যেন আয়েশার সঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইব্রাহিম সায়েরা যেমন রসকলা
তেমন বঞ্চৌক রসে এহি বড় ভালা।

৪ ইসমাইল 'বলি'তে পলটি দিলা মেষ
সশরীরে ইদ্রিসকে নিলা স্বর্গ দেশ।
চতুর্থ আকাশ''পরে আপেক্ষিলা ইসা
অলিদ দুর্বৃত্ত হাতে পোষাইলা মুসা।
বিকলের কল তুহ্মি অকূলের কূল
ইব্রাহিম দাহ কৈলা শীতল বহুল।
খিজিরক জীবদান দিলা বারেবার
সাগরেত দিয়া ভাটা মুসা কৈলা পার।
বিষম তরঙ্গে কৈলা নূহর নিস্তার।
হেনমতে কর প্রভু মোর প্রতিকার
কূপ হোন্তে ইসুফে বৈসাইলা আসনে
দাসত্ব হরিয়া রাজা কৈলা কৃপা মনে।
আয়ুবের উপশম কৈলা মহারোগ
দারা পুত্র হৈল দিলা সম্পদ বিভোগ।
ইউনুসকে উদ্ধারিলা মৎস্যোদর হতে
মোরে অনুকূল প্রভু কর তেন মতে।

৫ জরথুস্ত্র শূন্য কাগজে রাখিয়া
রবির তনয় শুনি আছএ লিখিয়া।

হিন্দু পুরাণের ব্যবহার :

১ বলি কর্ণে এমত না কৈলা কদাচন।
ধনঞ্জয় শরাঘাতে ধন প্রাণ দিল।

২ কল্পতরু তোহ্মার ধরুক সিদ্ধিফল।
হরএ মুনির মন করএ উদাস
যোগনষ্ট করএ তপস্যা করে নাশ।
কশ্যপ তনয় দোলে করি সূতমূল
ভুরু মদনের চাপ না ছাড়এ গুণ
পদতলে পদ্মরেখা লক্ষ্মীর লক্ষণ।
নর দেব গন্ধর্ব থাকএ রূপ হেরি।

৩ বাসুকী বাসরে কিংবা ভুজঙ্গিনী যাএ।

৪ কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধ যেমত আছিল।

৫ রামরাবণের যেন আছিল সমর

৬ পূর্বে যেন যুদ্ধ কৈল সুরাসুরগণ।

৭ কুম্ভকর্ণের দশগুণ শরীর তাহার।

৮ সীতা হেন একাকিনী কেন বনবাস।

৯ ইন্দ্র যম বরুণ কুবের মহেশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবিধ

১. রাজা-বাদশারা বিয়ে করতেন কনে নিজের বাড়ি এনে। তাই মিশররাজের বিয়ে হল তাঁর দেশেই। ইয়মনরাজ তাই বলেন :'কন্যা লই মিসির নগরে কর গতি।'

২ প্রত্যুৎগমনে অভ্যর্থনা :

রাজকন্যা আগুবাড়ি আনিতে কারণ
চলৌক দেশের লোক আছে যত জন।

বিবাহোৎসবে বাদ্য :

বাদ্যভাণ্ড আনন্দ উচ্ছব নাটগীত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ মন রঙ্গে...
আকাশ পাতাল ব্যাপি হৈল বাদ্যধ্বনি।

কয়েদির জীবন :

বুলিল নিশএ তারে হাতে দিব দড়ি
দিবসে কুটিব আটা কুটিব লাকড়ি।
অল্প যদি করে কর্ম মারিবা বিস্তর
মারিতে মারিতে যেন যাএ যমঘর।

সুশাসন : বটের তস্কর যেন খাণ্ডের নাহি ভএ
কদাঞ্চিত আপদ স্বপনে না দেখএ।

শপথ : ১ আল্লার মাথাএ তুহ্মি জুড়ি দুই হাত।
শপথ করিয়া যাও আল্লার সাক্ষাত।
২ ধর্মসাক্ষী ছলে যদি কহিএ বচন

খাদ্য : অন্নজল দধি দিল উপহার
ফলমূল শর্করা লাগিল খাইবার।

তত্ত্বকথা : চিত্তের নয়ানে জান দেখে যেইজন
সেই সে পরম তত্ত্ব গুরুর বচন।

বাক্ মাহাত্ম্য : কহিতে লাগিল কন্যা শুন যুবরাজ
বচন সমান ধন নাহি তনু মাঝ।
তরুলতা পশুপক্ষী জীব সবে ধরে
মনুষ্য জীবনে সুখ বচনের তরে।
বৃষের জিহ্বাএ যদি বচন বসিত
মনুষ্য অন্যায় করি কেমনে চষিত।
না খায় কাহার অন্ন না পিন্দে বসন।
বাপ মাএ না বেচিল ধনের কারণ।
তরুলতা তৃণের থাকিত যদি বাক
কি মতে মনুষ্য সবে কাটিত তাহাক।
বচন কহিতে যদি থাকিত ভারতী
কেমতে খাইত নরে পশুপক্ষী জাতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমতে ধরিত মনে হীন জলচর।
তখনে যাইত ধাই নৃপতি গোচর।
মনুষ্য জিহ্বাএ যদি না হৈত বচন।
কেমনে হইত উক্তিমুক্তি বিরচন।
পণ্ডিতে কেমতে শাস্ত্র করিত প্রকট
কেমতে শিষ্যকে গুরু দেখাইত বাট।
জাতিকুল কেমতে হইত ভেদভিন...
না করিত কর্ম ক্রিয়া না অর্জিত শস্য
রাজা প্রজা না থকিত না হৈত রাজস্ব।
না হৈত ন্যায়-অন্যায় না হৈত ভেদাভেদ...
পশুবৎ হৈত সব জ্ঞান পরিচ্ছেদ।
কুম্ভকার কারুকর্ম যদি না থাকিত
অবচনে কৃষি ক্ষেতি কেবা শিখাইত।
রজক নাপিত তন্ত্রী সব না থাকিত
যাবন্ত ব্যবসা ভাব কিছু না হইত।
না থাকিত গুণ জ্ঞানহীন হিত অবহিত
পশুবৎ হইত লোক সর্ব বিবর্জিত।
বচন প্রভাবে হএ যাবন্ত বিচার
অন্ধকার ঘটে প্রাণ ধন্দকার রূপে
দীপ্তিময় করিয়াছে বচনের দীপে।
সে বচন পরিষ্কার যে কহিতে জানে
জ্ঞানবন্ত হেন তারে লোক সব মানে।

বিদ্যাপরীক্ষা

সেকালে মৌখিক প্রশ্নে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যার পরীক্ষা হত। ভৌগোলিক, ধর্মীয়, তাত্ত্বিক, সামাজিক, নৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্ন করা হত। সে-প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রেই হেঁয়ালির রূপ পেত। বিয়ের পাত্রকেও পরীক্ষা করা হত এভাবেই। এখানে সয়ফুল মুলুকের জ্ঞানবুদ্ধি পরীক্ষা করছে দানবরাজ :

প্রশ্ন : বোল দেখি কোন্ বস্তু নিকটে সবার?
উত্তর : মৃত্যু অতি নিকটে উত্তর দিল তার।
প্র. পুনি বোলে কোন্ বস্তু বোলহ্ মঙ্গল?
উ. কুমার উত্তর দিল, শরীরের কুশল।
প্র. সজীবে বহুল কিবা মৃত অতিশয়?
উ. কুমার বলিল মৃত, জানিঅ নিশ্চয়।
প্র. নারী কি পুরুষ 'ধিক সংসারের মাঝে?
উ. নারী'ধিক উত্তর দিলেক রাজকুমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহেলা জলুয়া ও গেরুয়া খেলা :

গাহএ রসের গীত যথ সোহাগিনী
রঙ্গের ধামালী সহেলা নাচনি
জলুয়া খেলে গেরুয়া মেলে মনোহর আঁখি
অপরূপ রূপ চাহি নাচে সব সখী।
নতুন যৌবন সব নব নববালি
করতালি দিয়া নাচে হেলায় কাঁখালি।
ঠমকে নাচে ঠমকে গাএ ঠমকে বাড়াএ পাএ
ঠমকে হালিয়া পড়ি ঠমক করি গাএ।
রূপ চাহি গীত গাএ মধুর মধুর
পান খাইয়া উল্কা দিয়া লাগাএ সিন্দূর।
অমিয়া কৌতুক করি মিলি যথা আও (এয়ো)
সব সোহাগিনী মিলি জলুয়া খেলাও।...

অন্যান্য আচার

নিলেক আলাম (ছত্র-মারোয়া) তলে যুবক-যুবতী
নির্বহিল কুলাচার সম্প্রদান নীতি।
গেরুয়া জলুয়া আর খেলিল অঙ্গুরী
তারপর– বিরল মন্দিরে লৈয়া গেল নব নারী।

। ক'নে সাজ।
। সহেলা।
ছন্দ : ত্রিপদী।

অন্তস্পুর নারীগণ বার্তা পাই শুভক্ষণ
মঙ্গল করিল সুরচন
ঘৃতের দিউটি হাতে সুবর্ণ কলসী মাথে
নবীন রূপসী রামাগণ
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ গীত গায় বসে
কেহ হাতে তালি মারে রঙ্গে
কার হাতে জল ঘটি কার অঙ্গে মারে ছিটি
কেহ ঠমকএ রঙ্গ ভঙ্গে
কেহ পান গুয়া খাএ আনন্দে ধামালি গাএ
কৌতুকে খেলএ নানা কেলি
আড়েতে লুকাই পাশে কেহ কাকে পরিহাসে
ফেলাএ কাহার অঙ্গে ঠেলি।
আগর চন্দন চুয়া কর্পূর তাম্বুল গুয়া
কেহ কাকে হরিষে যোগাএ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাবের কেশর ঝারি সোহাগ মেলিয়া মারি
কেহ কার বান তিতাএ
কেহ রঙ্গে জড়াজড়ি কেহ করে হুড়াহুড়ি
কেহ কাকে ফেলাএ ঠেলিয়া
কেহ ব্যগ্রগতি মতি অঙ্গ করে নানা ভাতি
রসরঙ্গে কৌতুকে ভুলিয়া।
কৌতুকে যতেক পরী সুবর্ণ কলসী ভরি
চলি যাএ লই অন্তস্পুরে
রাজকন্যা কোলে করি আনন্দে যতেক নারী
বাহির করিল ধীরে ধীরে।
সুবর্ণের পাটে রাখি অঙ্গেতে সুগন্ধি মাখি
আনন্দে গাহেন্ত সব গীত
কেহ করি পরিহাস খসাএ পিন্ধনবাস
কেহ নাচে হৈয়া আনন্দিত।
কেহ বোলে রূপ দেখি লক্ষিতে না পারে আঁখি
মোহিয়া পড়িল অচেতন
রবিশশী জিনি জুতি হেরিতে হরএ মতি
নিরক্ষিতে হরএ নয়ান।
যার রূপে মোহে নারী যেসব জাতিএ পরী
কি সহিব মানব পুরুষে
ইন্দ্র আদি দেব লোকে আরাধিল দেখি যাকে
সেজন ভজিল নর-রসে।
কিমত তপস্যা তার এমত ঘটএ যার
কি জানি করিল আরাধন

ক'নে স্নান : যত সোহাগিনী করিয়া নানা কেলি
রাজসুতা করাইল স্নান।
কেহ লএ কেশ পানি কেহ বস্ত্র দেয় আনি
কেহ টানি নেয় বাজু ফিতা
কেহ ধরে বাহুলতা কেহ দেয় জানু হাতা
আনিয়া বসায় রাজসুতা।
মেন্দী দিয়া হাতে-পাএ সুগন্ধি মাখিয়া গাএ
পবিত্র বসনে মুছি অঙ্গ
যৌবন-যমুনা জলে লাবণ্য তরণী হেলে
বহি গেল আকুল তরঙ্গ।
কোনো কোনো সুবদনী বস্ত্র অলঙ্কার আনি
পৈরাএ আনন্দ কুতূহলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেহ বান্ধে কেশ ভার   কেহ করে লই হার
আনন্দে তুলিয়া দেয় গলে।
ললাটে সিন্দূর বিন্দু   অরুণ সহিতে ইন্দু
চন্দনের ফোঁটা তার কাছে।

অলঙ্কার :
জলদ কাজল রেখা   ভুরু ইন্দ্রধনু রেখা
সমযুক্ত বিরাজিয়া আছে।
কানে বালি কর্ণফুল   লোলক শ্রবণ মূল
সুবর্ণ পিপলি পাত দোলে
মুক্তামণি চুনীজড়া   অরুণ প্রভৃতি তারা
মুখ-শশী মুখে লইছে কোলে।
কপালে অলক টিকে   বেশর বিরাজে নাকে
সারিসারি উড়ি পড়ে তারা
তেল'রী হাঁসুলি হার   সিঁথিপাত শোভাকার
মণিমুক্তা জিনি মনোহরা।
তাড় বাজুবন্ধ করে   অঙ্গদ বলয়া ধরে
পৈঁচি কঙ্কণ শোভাকার
হীরামণি হেমে জড়ি   মদন মিশাএ গড়ি
দিয়াছে বাহুটি বাহুতাড়।
কনিষ্ঠ কাণি আঙ্গুলে   শ্রীঅঙ্গুরী শোভে ভালে
কাঞ্চন অঙ্গুরী তবে ধরে
অঙ্গুলে নখের সারি   ঝর্ঝর অঙ্গুরী ধারী
বিদ্যুৎ দর্পণ শোভা করে।
কটিতে কিঙ্কিণী ধ্বনি   চরণে নেপুর শুনি
রুনুঝুনু বাজে সুললিত
মোর মনে হেনএ   লএ আনন্দমএ.
আনন্দে গাহএ রসগীত।
তোড়ল খারুয়া পাএ   নখে মাখিয়া আলতাএ
উঝটি বিঝটি পদাঙ্গুলে
মেলিয়া নালুয়া চয়   চরণে শরণ লয়
রঙ্গেত মজিয়া অতি ভালে।
আর যত অলঙ্কার   কে জানে নির্ণয় তার
রাজনীতি দেবের ভূষণ।
জরির ঝরোকা জড়ি   বিচিত্র পাটের শাড়ি
উল্লাসে করএ পরিধান।
করিয়া কন্যার সাজ   শীতল মন্দির মাঝ
হরিষে রাখে সবে নিয়া
কৌতুকে সকলে মিলি   স্নান করাইতে বুলি
চলিল কুমার উদ্দেশিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. লালমতি সয়ফুল মুলুক

আব্দুল হাকিম বিরচিত

সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম বহুগ্রন্থ প্রণেতা এবং মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় কবি। নোয়াখালীর সুধারামে তাঁর নিবাস বলে লোকশ্রুতি রয়েছে। ইউসুফ জোলেখা, লালমতি সয়ফুল মুলুক, শাহাবুদ্দিন নামা, নুরনামা প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা। 'যেসব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী' প্রভৃতি তাঁরই রচনা।

দানমাহাত্ম্য :
দানধর্মে অবশ্য পুরএ মনস্কাম।
বহুধন দান শাহা করি পৃথিবীত
পুত্রহেতু প্রভু আগে মাগহ বাঞ্ছিত।

শাস্ত্র :
তোমা আগে চতুর্দশ শাস্ত্র চারিবেদ
গোপনে আছএ যত ইতি ভেদাভেদ।

দানের পাত্র :
ভিক্ষুক ভ্রমিক যথ রাজ্যের ভিখারী
মাতাপিতাহীন শিশু পতিহীন নারী।
পুত্রহীন বিধবা যতেক নারীগণ
দরিদ্র দুঃখিত ইষ্টমিত্র হীনবল।
আলেম ওলেমা যত দর্বেশ বৈরাগী
পুত্র পরিজন যেবা পাকে ভিক্ষা মাগি
অন্নবস্ত্রে হীন যেবা হএ দেশান্তরী।

ভাগ্য গণনা ও কোষ্ঠী :
আদেশিলা আনিবারে নজ্জুম পণ্ডিত।
পরম যতনে দেখ শাস্ত্র জকি তাতে।
কোন রাশি হয় দেখ নক্ষত্র কাহাতে।
রাশি কাম গণি যেই বাণে ফলাফল
ভালমন্দ আয়ু যশ সফল কুশল।
বংশের প্রদীপ কিবা কুলের ধিক্কার
কহিবা রাশির মর্ম যেই ব্যবহার।

আচার : নিছনি :
বহুধন দান কৈল কুমার নিছনি।
কুমারের অঙ্গে ঘষে কস্তুরী চন্দন
অষ্ট অঙ্গ পরিষ্কার ঝলকে রতন।
কুমারের অঙ্গের বদলে রত্ন ধন
অষ্টগুণ দান কৈল অতি রঙ্গ মন।

নিয়তি-মৃত্যু :
যাহার নিবন্ধে যেবা আছএ লিখন।
ললাট লিখন ঘটে পূরিলে শমন
ঘরে কিবা বাহিরে হয় অবশ্য মরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে আয়ু যশ রৈতে কদাচন
যদি সে সমুদ্রে পড়ে না হয় মরণ।

নৈতিকচেতনা : বাপ পিতামহ সবে সেবক তোমার
না যাব তোমাকে ছাড়ি অরণ্য মাঝার
খাইলে আমাকে ব্যাঘ্র ধরি খাউক আগে
একসর তোমা ছাড়ি যাইতে স্নেহ লাগে।
ইহাতু অধিক পাপ নাহি পৃথিবীতে
ঈশ্বরে সঙ্কটে ফেলি চিন্তে নিজ হিতে।

পুত্র : বহু দান ধ্যানে পুত্র পাইনু তোমারে।

বাহন : চতুর্দোলে তুলিয়া কুমারে আন হেথা।
গজের আম্বারি 'পরে হই আরোহণ।
গজের আম্বারী মাঝ, চলি যাএ যুবরাজ
নৃপতি চলিল চতুর্দোলে।
ডুলি আরোহণে চলে কোন নারীগণ।

বাদ্য : আদেশিলা নৃপতি উৎসব মঙ্গল
বাজায় নানান বাদ্য পরম উৎসব
ঢাক ঢোল কাড়া দামা পঞ্চশব্দের রব।
সানাই বিগুল ধবনি কাস-করতাল
বিগুল কর্ণাল বাজে উৎসব বিশাল।
মৃদঙ্গ বাদল আর কবিলাস চঙ্গ
ঝাঞ্জনের রুনুঝুনু মনি মনোরঙ্গ।

AMARBOI.COM

যুদ্ধ যাত্রায়

রাজবেশ্যা : চলিলেক সারি সারি
যত রাজবেশ্যা নারী
নৃত্যগীতি অতি মনোহর।
নানা বাদ্য বাজে ঘন
নাচএ নর্তকীগণ
সৈন্য চলে হরিষ অন্তর।

স্নানের উপকরণ : সজ্জা কৈল নানাবিধ অগুরু চন্দন
কস্তুরী কুঙ্কুম আদি সুগন্ধি সকল
সাক্ষাতে রাখিল দিব্য ভৃঙ্গারের জল।
হাতেতে ফুলেল তৈল লইয়া জননী
স্নান করাইতে চাহে আপনা নন্দিনী।

নৈতিক চেতনা : বাম পাশে খড়্গ রাখি শাহার নন্দন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কন্যাও নিজের একই পালঙ্ক মাঝে করিল শয়ন।
পরনারী পরশনে তাতে পাপ অতি
আয়ু যশ বিনাশএ হয় অধোগতি।
আছুক শৃঙ্গার ভিন্ন নারীর সংহতি
ছুঁইলে হরএ আয়ু নরকেতে গতি।

পর্দাপ্রথা : না দেখে যাহার রূপ সূর নিশাপতি
সামান্য মনুষ্য দেখে কন্যার দুর্গতি।
...ঘর হতে বধূ মোর না যায় বাহির
চন্দ্র সূর্য ন দেখএ বধূর শরীর।
ভিন্ন জন সনে কভু না দেয় দরশন
অপরের সনে কভু না কহে বচন।

পতিব্রতা : সংসারে সম্পদ নাই পতি সমসর
ক্ষুধাপতি অন্নপতি তৃষ্ণাকুলে জল
আপদে সম্পদে পতি সঙ্কটে কুশল।
শয়নের শয্যাপতি জাড়ের ওড়ন।
পতি সে নারীর অঙ্গে পুরুষ আভরণ।

ফারসি ও হিন্দিকাব্যের প্রভাব :
জিনিল চন্দ্রাণী ময়না লোরের বণিতা।
জিনিল হোসেনবানু বাহরামের নারী
ছবজাবাগে পরীজাত নৃপতি কুমারী।
নৌসদের প্রাণ ধনী মুখ পূর্ণ শশী
যোড়শ কদলী জিনি মোচন্দর ধনী।
জিনিলেক ভানুমতী বিক্রমাদিত্য ধনী
জিনিলেক চিত্রলেখা কন্যা মধুমতী।

হিন্দুপুরাণ : শারদ কৃত্তিকা রমা দুহোঁ সমসর
রাধিকা সহিতে রঙ্গ করে যেন কানু
অনিরুদ্ধ সঙ্গে যেন উদার বিহার
ময়নামতী সঙ্গেত যেন লোরেন্দ্র কুমার
...ক্ষণে বলে যক্ষ সঙ্গে আইল পুরন্দর
দেব কি গন্ধর্ব তুমি কিবা বিদ্যাধর।
...কাম দৃষ্টে হরি সীতা লঙ্কার রাবণ
সবংশে বিনাশ হৈল পাপের কারণ।

সতীত্ব : অসতী না করে মোরে ত্রিজগদীশ্বর।
স্থাপিলাম তোমা (আল্লার) করে মোর এই অঙ্গ
না হোক লণ্ডর হস্তে সত্য মোর ভঙ্গ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বস্ত্রঅলঙ্কার ! সে সবেরে পরাইল পাট পাটাম্বর
অষ্ঠ অঙ্গে কৈল হেম রজতে জড়িত।

অতিথি নিবাস-পান্থশালা :
অন্নশালা পাকশালা রচহ মণ্ডপ
আসিয়া রহিবে যত দেশান্তরী সব।
একশত কুম্ভ আর একশত ঝারি।
অন্ন ভুঞ্জিবারে জল করিবারে পান
বিদেশী ভ্রমিক সবে আসি এই স্থান।

মানৎ : নিজহস্তে ভরি কুম্ভ রাখে সারি সারি
শতেক কলসী মুখে রাখে শত ঝারি।
তৃষ্ণাকুল গণে জল করিবারে পান
এই পুণ্যে পুরিবারে মানস কল্যাণ।
সেই স্থানে শীঘ্রে আসি মিলিবারে পতি
প্রভুপদে মাগে এই মনের আরতি।

বৃক্ষনাম : ভাঙ্গএ সালের তরু গজালির গণ।

নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য :
যে সকল বলহীন অনাথ ভুবন
তাহার অন্যায় যদি করে দুষ্ট জন।
সাহায্য না হয় যদি দেখি বিদ্যমান
মহাপাপ হয় তার শাস্ত্রের বিধান।
...উপকারী জনের না কৈলে উপকার
ভুবনে বিফল ছার জীবন তাহার।

ফল : সেই বৃন্দাবন মাঝে নানা ফল অনুপাম
আঞ্জির আঙুর সেব কিশমিশ বাদাম।
অমৃত খোরমা ইক্ষু পেপিতা কমলা
আনার আখরোট খিরণী চম্পাকলা।
গোলাব জামুন আর আনারস ফল
শ্রীফল, খরমুজা আতা নারিকেল।

এবং শ্যামতারা, শরিফা, গুয়া, আম, কামরাঙ্গা, পাবিয়া, বড়ল, কদলী, কনক, সাকরকন্দ, তোরঞ্জ।

ফুল : নানা পুষ্প দেখিতে সুন্দর
জুঁই জাতী চাম্পা নাগেশ্বর
গোলতারা দাউদী সেওতী
শতবর্গ লবঙ্গ মালতী
গুলে লালা নাম চম্পা বেলী
গন্ধরাজ জুঁই সন্ধ্যা মালি
ওড়দানা কস্তুরী গোলাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরূপ পুষ্প মাহাত্তাব
নাগেশ কুসুম্বর কুল
রায়হান শিরিশ চম্বুল
পারিজাত কদম্ব কেতকী
সবুজ আকন্দ সূর্যমুখী
আব্যাস ফেরঙ্ক পুষ্প লবঙ্গ
দেখি অতি পুলকিত অঙ্গ
মালঞ্চ খরুচ মকমল
দেখিতে পরম কুতূহল
জাহাঙ্গি হাজারা বস্থল
গোল মিন্দী কদম্ব রসুল
অপরাজিতা জবা ও শিঙ্গাহার
বঙ্গ বালি মঞ্জিট কচনার
নীলকণ্ঠ মাধুরী গোলছুরি
কুরবি ডালিম্ব দোপহরি
অপরূপ কনক মঞ্জরী
পরম শোভিত মুক্তাছরি
ফলাগামী সৃত মনোহরা
অপরূপ কুসম্ব জাফরা
অংশুক কিংশুক মনোহর
ভূমিচম্পা চন্দ্রকেতু আর
পলাশ রঙ্গিমা শোভাকার।

রাজনীতি : বিদেশী ভীতি :
নৃপতির নিষেধ এথা বিদেশীর বাসা।

পুষ্পে-লিখন : কুমারে গাঁথএ পুষ্পতা অদ্ভুত লক্ষণ
বিনা ডোরে গাঁথে হার নৃপতি নন্দন।
মালিনী গাঁথএ পুষ্প একই প্রকার
সহস্রেক বর্ণে পুষ্প গাঁথএ কুমার।
পুষ্পের আখরে পত্র লেখে যুবরাজ

পক্ষী সম্বন্ধে জ্ঞান : বসন্ত সময় বিনা কোকিল তাপিত
তোমা বিনা তেহেন উদাস মোর চিত।
নিদাঘ গঞ্জিতে কোড়া যেন মনস্তাপ
তোমা বিনা মর্মে মোর তেহেন সন্তাপ।
শরৎ সময় বিনা যেন হুমাপক্ষী
তোমা অদর্শনে আমি তেন মনদুঃখী।
শিশিরের রীত বিনা যেহেন ডাহুক
তোমা বিনা তেহেন বিদরে মোর বুক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমন্ত সময় বিনা যেহেন তিতির
তোমা বিনা তেন মর্ম দহে নিরন্তর।

দারু-টোনা : কুমারের পত্র নহে টোনা মন্ত্রবাণী
যারা মধু মন্ত্র হরে কুমারীর প্রাণি।
ডাকিনী যোগিনী জ্ঞান মনেতে তোমার।

নারীর আভরণ ও পোশাক :
কবরী বান্ধিল শিরে অপরূপ
নানা পুষ্প বিরাজিত অতি মনোহর
নাসিকাতে গজমোতি শোভএ বেশর।
কর্ণে শোভে দুলমণি করেত কঙ্কণ
বাহু যুগে বাজুবন্ধ ভুবন মোহন।
কটিতে কিঙ্কিণী শোভা মদন ঝঙ্কার
চরণে নূপুর শোভে অতি মনোহর।
পরিধানে দিব্যবস্ত্র যেন পাটাম্বর
ললাটে সিন্দূর বিন্দু নয়নে অঞ্জন
হৃদেতে বান্ধিল যুগ সুবর্ণ চামিক
কাঁচুলি তুলিয়া দিল হৃদের উপর।

নারীর বিদ্যাচর্চা : নানা পাঠে রাজবালা অতীব পণ্ডিত।
সংস্কৃত ভাষে যত শাস্ত্রের বিধান
কুমারী কহেন্ত বাক্য শাস্ত্রবিবরণ।

বিদ্যার মাহাত্ম্য : শাস্ত্রেত পণ্ডিত যেবা জাতিকুলহীন
সভামধ্যে সে সবের প্রশংসা প্রধান।
কুলশীল জাতি যেবা মূর্খ মূঢ়জন
সে সকল নর হতে উত্তম গোধন।

স্বামী শাসন : এবাক্য শুনিলে পতি রাখে কিবা কাটে
না জানি নির্বন্ধ মোর কি আছে ললাটে।

কাব্যিক ঐতিহ্য : ১ ইউসুফ রূপেতে মজি জোলেখা যুবতী
বর্জিল আজিজ মন্ত্রী বিবাহিতা পতি।
২ যেহেন চন্দ্রানী বিভা করিল বামনে
কাপুরুষ ছিল যেন দুর্জয় বামন
চন্দ্রানী লভিল যেন লোরেন্দ্র নৃপতি।

নীতি : যদি সে অযোগ্য হস্তে ঘটএ রতন
অযোগ্য জনের বৃথা রত্ন প্রতি আশ
যাহারে শোভয় রত্ন যায় তার পাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞান : যতেক চরিত্র তোমা পদ্মিনী কন্যার
যদ্যপি পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদয়
তথাপি পদ্মিনী কন্যা অসতী না হয়।

পতি-মাহাত্ম্য : পতিব্রত্য :
দেবের ঈশ্বর কিবা হএ নরেশ্বর
না লয় সতীর মনে পতি সমসর।
অন্ধ বা রোগীত কিবা ভিক্ষুক ভিখারী
না ছাড়ে আপন পতি যেবা সতী নারী।

রাজকীয় আড়ম্বর : যাহার সঙ্গতি চলে চতুরঙ্গ দল
ঘোটকের পদ ভরে মহী টলমল।
কোটি কোটি অশ্ব চলে লক্ষ লক্ষ গজ
নব দণ্ড ছত্র শতে শতে চলে উড়ে ধ্বজ।
যার সঙ্গে বাদ্য বাজে সমুদ্র হিল্লোল
হাজারে হাজারে ডঙ্কা কাড়া ঢাকঢোল
লক্ষ লক্ষ রণ শিঙ্গা ভেউর কর্ণাল
শতে শতে উষ্ট্র যায় সঙ্গতি রাজার।

সম্মানার্থ প্রদক্ষিণ প্রণাম :
গলেতে বসন বান্ধি মহারাজ সুতা
দণ্ডবতে চন্দ্রমুখী কুমার চরণে
সহস্র প্রণাম কৈল আনন্দিত মনে।
কুমার অগ্রেত রামা পরম ভক্তে
প্রদক্ষিণ কৈল সহস্রেক দণ্ডবতে।

বরের গুণ পরীক্ষা : আছএ পরীক্ষা ছয় অতি বিলক্ষণ
দ্বারে এক মহাকাষ্ঠ পর্বত আকার
রাখিয়াছে সহস্রেক মনের কুঠার
প্রতিজ্ঞা যে করিয়াছে জনক আমার।
এক কোপে সেই কাষ্ঠে ফাড়ে যেই কুমার
রাখিয়াছে আর শস্য সহস্রেক মণ
ছিণ্ডিবেক শস্য সব জুড়িয়া ভুবন।
একত্র করিবে যেই নৃপতি নন্দন
মাপাই দিবারে যদি পারে সেইজন।
সহস্র মণের অন্ন করিবে রন্ধন
একসর সেই অন্য করিবে ভোজন।
মহা এক অন্ন আছে উন্মত্ত লক্ষণ
নিকটে মনুষ্য, গেলে ভৈক্ষে ততক্ষণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে অশ্ব বান্ধিয়া নিজ হস্তে আপনার
আরোহিতে পারে যেই নৃপতি কুমার।
সঙ্কট না গুণি আরোহিয়া তুরঙ্গমে
দাপট করএ যেবা বিজলীর সমে।
গাভী এক রাখিয়াছে পর্বত আকার
নিঃসরে যথেক দুগ্ধ সংখ্যা নাহি তার।
আছুক দোহন দুগ্ধ সে গাভী সাক্ষাৎ
হেন শক্তি নাহি কার উকরে দিতে হাত
যদি সে প্রবৃত্ত হয় গাভী দুহিবার
শুকন না যায় দুগ্ধ বহে অনিবার।
সুরভী দুহিয়া দুগ্ধ বিদিতে রাজার
খাইবারে পারে যেই নৃপতি কুমার।
আর বাক্য কহি প্রভু অধিক বিরূপ
সহস্র গজের দীর্ঘ আছে এক কূপ
অঘাত সহস্র গজ কূপ বিচক্ষণ
এহি কূপ ভরি যেবা দিতে পারে ধন।
এহি ছয় কর্ম যেবা করিবারে পারে
সেই বর স্থানে মোর বিবাহ দিবারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে নৃপ গুণবান।

গন্ধর্ব বিবাহ :
করহ গন্ধর্ব বিভা হরিষ অন্তর
গোপত প্রকারে মোকে লও প্রাণেশ্বর।
পরিয়া আপনা কোস পদে আপনার
এহাতে কলঙ্ক কেবা ঘোষিবে তোমার।

নীতি :
গুপ্তকর্ম কুলক্ষণ অধৈর্য বিধর্ম।
সাহস ছাড়িলে হয় পুরুষ বিধর্ম।
ধৈর্য পরিহরি কর্ম কৈলে ধর্মনাশ।

খোয়াজ খিজির :
সেকান্দর ইলিয়াস আমি (খোয়াজ) তিন ভাই
আমা তিন জন মাঝে ভিন্ন ভেদ নাই।
খোয়াজ খিজির পীর আইল শীঘ্রগতি।
সয়াল সংসার মাঝে যথা তথা যাই
মনে আশা তোমা পদ (খোয়াজের) আরাধিলে পাই
খোয়াজ ভরসা ভরে ত্বরিতে আপদ।
প্রভু সখা পয়গাম্বর তুমি পৃথিম্বীত।

হিন্দুপুরাণ :
হরধনু, রঘুপতি, গরুড় খাণ্ডববন, ধনঞ্জয়,
দেওপরী যক্ষ যত গন্ধর্ব দানব বিদ্যাধর,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশাচর, ইলিয়াস আদেশএ গঙ্গাভাগিরথী।
কিচক, রাবণ, রাম, ভীম, মহিষাসুর, বালি

অনূঢ়া যুবতী : যৌবন উন্মত্ত রীত বিবাহ হুতাশ
না চাহে প্রতিষ্ঠা নাহি গণে জাতিনাশ।
আত্ম প্রায় কিবা নাহি জানে বাপ মায়
কন্যা রাখিবারে যুক্ত নহে কদাচন।

নীতিকথা : যার সনে বলে নাহি জিনি কদাচিত
বৈরীভাব তার সঙ্গে না হয় উচিত।

মাংসের ব্যঞ্জন : উট-গাভী মৈষ মেড়া দুম্বা অজা খাসি
অন্নে সহিত মাংস রান্ধ রাশি রাশি।
গউজ গয়াল ষণ্ডা মৃগ কবুতর
খরগোস রাজহংস কুক্কুট কৈতর
দধি দুগ্ধ ঘৃত ননী নানা উপহার।

কুদৃষ্টি নজর : কুমার বুলিল অন্ত হন্ত সৈন্যগণ
না করিব তোমাদের সাক্ষাতে ভোজন।
তোমার দৃষ্টে অন্ন করিলে আহার
এহাতে উদর ভঙ্গ হইবে আমার।

নৃপযাত্রা : সসৈন্য চলিল নৃপ দেখিবার ধন
চলিলেক পাত্র মিত্র সৈন্য সেনাপতি
চতুরঙ্গ দল চলে সকৌতুক মতি।
সহস্রে সহস্রে চলে গজ পাটোয়ার
অনন্ত পদাতি কোটি কোটি অশ্ববার।
শতে শতে ঢাক ঢোল বাজায় তবল
সারি সারি দমা বাজে শুনি কৌতূহল।
ঘন পড়এ কাড়া শব্দ ভয়ঙ্কর
বাঁশরি মুররী বাজে মৃদঙ্গ ঝাঁঝর।
শিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল বহুতর
সানাই বিগুল মধু শুনিতে সুস্বর।
নানা শব্দে বাদ্য ধ্বনি কাম করতাল।

রাজ-টঙ্গী : উদ্যানে নির্মাএ পুরী দিব্য মনোহর
নীলা কাঁসা জমরুদ আকিক প্রবাল
হীরা ও এয়াকুতে পুরী নির্মায় বিশাল।
সুবর্ণের চাল বেড়া দেখি অনুপম
হীরামণি মাণিক্য দেখিএ ঠামেঠাম
অধিক প্রচণ্ড জ্যোতি করে ঝলমল
হীরা চুনী পান্না ইয়াকুত আর লাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ফটিকের স্তম্ভ ঘর মুকুতায় জড়িত
রতনের ঝরোকা সব দোলে চারিপাশে
অতি দীপ্তমান পুরী অন্ধকার নাশে।
রজত প্রাচীর শোভে কনক কাঙ্গুরা
জড়িত শোভয় চুনী মনোহর হীরা
ঝলকয় পুরী যেন হীরার দর্পণ

উৎসব, নর্তকী : নাচএ নর্তকীসব হাজারে হাজার
বাজএ চৌরাশীবাদ্য উঠে নানা ধ্বনি।

রাজার পরেই বণিকের মর্যাদা :
কন্যা দানে সম্ভাষিত শাহার কুমার
সাধুর রমণীগণ আছে যত ইতি
আমন্ত্রিয়া পুরী মাঝে আন শীঘ্রগতি।
অন্তঃপুরে উৎসবের যে হয় উচিত
নারীগণ লই কর্ম করহ তুরিত।

বাদ্যযন্ত্র : কাড়া ডামা ঢোল ঢেক দ্বারে বাজে লাখে লাখ
শিঙ্গা শঙ্খ ভেউর কর্ণাল
মৃদঙ্গ করতাল কাঁস বীণা বেণু কবিলাস
সহস্র যন্ত্রেত বাজে তাল
দোতারা রবাব বেণু শুনি পুলকিত তনু
সানাই বিগুল সুললিত।
সারঙ্গী ডম্বরু চঙ্গ শুনি অতি মনোরঙ্গ
সহস্র গায়ক গায় গীত
শতে শতে কান্ধে বেণু ঝাঁঝরের রুনঝুনু
দোসরী মোহরী বহুতর।

গীতনৃত্য-উৎসব : যতেক নাটুয়াগণে রঙ্গ করে জনে জনে
নানান কৌতুক মনোহর
শতে শতে তাফানারী যেন স্বর্গবিদ্যাধরী
নৃত্যগীত প্রতিস্থানে স্থান।

উৎসবের আচার : মারোয়া, আলাম :
সুবর্ণ কটোরা ভরি চন্দন ছিটায় চারিপাশ
আবীরে ভরিয়া বাটি নৃত্য করে ছিটা ছিটি
নারীগণে করে হাস্যলাস
মারোয়ার চারিধার অতিশয় শোভাকার
অপরূপ করিল আলাম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয় জোকার করি   সুবর্ণের ঘট ভরি
  নানা সাজ কৈল অনুপাম।
অতি মন কৌতূহলে   রাখিল মারোয়া তলে
  এ ঘট প্রদীপ মনোহর
সাধুর রমণীগণে   মহা আনন্দিত মনে
  নাচেন্ত গায়েন্ত নিরন্তর।

গায়ে হলুদ : লালবানু পাটে তুলি   সকলেতে হলুস্থুলি
  নারীগণ হলদী দিল গায়
দিব্য দিব্য নারীগণে   পরম আনন্দ মনে
  গায় তৈল হরিদ্রা চড়ায়
কেহ মন কুতূহলে   হস্তপদ অঙ্গ মলে
  কেহ ঢালে ভৃঙ্গারের জল
কোন কোন সাধু বালা   হস্তেতে বরণডালা
  আগে কন্যা মন কুতূহল

স্নান : এহি মতে নারীগণে   অতি সে আনন্দিত মনে
  স্নান করাইল লালমতি।

কনেসজ্জা : বহুমূল্য গজমোতি   বসন অঞ্চলে গুঁথি
  কনকী নারী শোভে অতি
অতি দিব্য মনোহর   পরাইল পিতাম্বর
  সিঁথাপাটি শিরেতে শোভএ
ঝারা ত্রিলোকের মূল   নাচয় জাদের ফুল
  মদন মোহন জ্যোতির্ময়।
বেসর নাসিকা মাঝ   ভুবন মোহন সাজ
  দেখিতে পরম শোভাকার
শ্রবণেত পিনুতারা   অতিশয় মনোহরা
  গলে শোভে নবলক্ষ হার
কেয়ূর কঙ্কণ করে   দেখি মুনি মন হরে
  ত্রিলোক মোহিনী রাজসুতা
আভরণ শোভে অঙ্গ   দেখি মুনি তপ ভঙ্গ
  অঙ্গে জড়ি কনক মুকুতা
আঙ্গুলে অঙ্গুরী শোভে   ব্রহ্মাআদি দেব লোভে
  বাহুতে কনক বাজুবন্ধ
দেখি নানা আভরণ   যতেক রমণীগণ
  কন্যা হেরে পরম আনন্দ
চরণ চম্পক মাঝ   শোভে অপরূপ সাজ
  নেপুর মোহন বাদ্য ধ্বনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরস্নান : কস্তুরী কুঙ্কুম আদি অগুরু চন্দন
নানা দ্রব্য লেপি অঙ্গে করি আরম্ভণ
স্নান দান করাইল শাহার নন্দন।

বরসজ্জা : সুবর্ণ সেহরা মাথে শোভিত বিশাল
পায়েতে পিন্ধিলা বহু মূল্য সরুয়াল।
জরকাসি কাবাই গায় অতি মনোহর
কোমরে কোমরবন্ধ কনক অম্বর।
বহুমূল্য অপরূপ দিব্য চারু চীর
দেবাচিনী রুমীবস্ত্র পূর্ণিয়া হরির।
কণ্ঠেত শোভএ অতি দিব্য পুষ্পমালা
অঙ্গেতে শোভএ নবলক্ষের দোশালা।
সুবর্ণ সেহরা শোভে আমামা উপর
হিন্দী রুমী সামী চীনী নসরানী বসন।
নানা বস্ত্র পরিধান অতি লাসময় রূপ।

বরযাত্রা : নানা বাদ্য নিরন্তর নৃত্য করে নাটুয়া সুন্দর
স্থানে স্থানে তাফাগণে নাচএ আনন্দ মনে
নানান কৌতুক মনোহর
...যুবরাজ মহামতি, চড়ে গজ আম্বারীর মাঝ
পাত্রমিত্র কুতূহলে জোগান ধরিয়া চলে
চতুর্দোলে প্রতি জনে জনে
নিশিথে চলিল বরে বাজি উড়ে থরে থরে
রজনী দিবস সমসর।

ফুল : কাশফুল, গন্ধরাজ, বেল মন্দিরা, নারঙ্গী ভূমিচম্পা, বেঙ্কা, [বৃক্ষরাজি সীতাহার] ইত্যাদি অনেক অদ্ভুত নামের ফুল।

বাজির নাম : মাহতাবি, জলহংস, পানিকাক, কন্দিল, পোলবন্দী, শুশুক, কুম্ভীর, দীপক, হাউই, ডেড়াট্রুম ইত্যাদি।

বর-কনের মিলন : অন্তঃপুর মাঝ প্রবেশিলা যুবরাজ
মিলিলেক কন্যার সঙ্গতি
অতি মন কুতূহলে সুবর্ণ মারোয়া তলে
দাঁড়ায় কুমার লালমতী।

জুলুয়া গেরুয়াখেলা : পাত্রের রমণীগণে অধিক আনন্দ মনে
জুলুয়া গায়েন্ত মনরঙ্গে
অতি মহামনসুখে সয়ফুলমুলুকে
গেরুয়া খেলএ কন্যা সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাস্তা ও খাদ্য : ফালুদা মিসরিক কন্দল বাণি শক্কর
প্রভৃতি এসব দ্রব্য মিষ্ট মনোহর।

কর্পূর তাম্বুল : কর্পূর তাম্বুল খায় অতি মনরঙ্গে।

গুরুজন : তৃতীয় জনক শাস্ত্রে আছএ লিখন
পিতা গুরু শ্বশুর যে এহি তিনজন।

নীতিকথা : সেবিতে বড়র পদ যদি মুণ্ড ক্ষয়
তথাপিহ সেবিবারে অতি যুক্ত হয়।
বড়র উচ্ছিষ্ট যুক্ত করিতে ভক্ষণ
নাহিক নিকৃষ্ট কান্ধে হৈতে আরোহণ।

সমাজে নারী : নারীর অঙ্গ পুরুষের বিহারের স্থল
পুরুষ ভ্রমর হয় নারী সে কমল।
অলিহীন পুষ্প আমি বিরহে তাপিত।

শিকারযোগ্য পশুপক্ষী :
ব্যাঘ্র, মহিষ, গণ্ডার, পউজ, কুঙ্গর শিয়া গোস,
খরগোস, গোরঘার, বিহঙ্গম, রাজহংস, ময়ূর
ছবাস, কোলঙ্গ, গগন ভেড়, ঘৌঙ্গল, খগেশা
খয়রাল, গলগট পতকা, আঞন, মোগরী
ছবারী, কোড়া, ডাহুক, হাঙ্গর।

পত্নীর দায়িত্ব : চঞ্চল দুর্বাদী নারী পুরুষের বিষ।
যে নারী রাখিতে নারে পতি কৌতূহলে
সে নারী দহিবে প্রভু নরক অনলে।
... নিজনারী মুখ হেরি যদি হাসে পতি
না হাসিলে শাস্ত্রে সেই নারী অধঃগতি।
পতির দেখিল যদি মুখ বিকশিত
যে না করে নিজ বদন হসিত।
পরকালে নরকেতে অগ্নির দহন।
পতির বিরস মুখ দেখিয়া নয়নে
না জন্মে অধিক শোক যে নারীর মনে।
পরকালে অনুদিন নরক গহ্বরে
ডুবিয়া রহিবে নারী অনল উদরে।

বরকে যৌতুকদান : ঘোড়া, হাতী, মণি, মুক্তা, উট, গাভী, মহিষ, দাসদাসী, রজত, কাঞ্চন, নৌকা, রথ, [এসঙ্গে পথের জন্য বহনযোগ্য] পালঙ্ক, চলনঘর, সুবর্ণ টুঙ্গী, বসন, অলঙ্কার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিকথা : লোভেতে কালের বাসা জ্ঞান তত্ত্বসার।
পরধন পরনারী হরে যেই ছার
শাস্ত্রেতে প্রভুর শত্রু সেই দুরাচার।

যুদ্ধাস্ত্র : খড়্গ, শিলা, গদা, গুর্জ।

কুটনী দূতী : দূতী হই যদি নিজ ধর্ম কর নাশ
হারাইবে দোহ কুল হইবে নিরাশ।
পৃথিবীতে দূতীনারী বড় অপরাধী
পর-ধর্ম নাশে আপে হই মিথ্যাবাদী।
বচনে চতুর দূতী জিনিয়া-পণ্ডিত
না রুচে দূতীর বাক্য সতীর বিদিত।

সতীত্বের বর্ম : যোদ্ধাগণ প্রতি যেন দিব্য তনুত্রাণ,
সতীনারী প্রতি তেন ক্ষমা ধৈর্য জ্ঞান।
নারীগণ প্রতি পতিসেবা পুণ্য অতি
স্বামী বিনা নারী প্রতি আর নাই গতি।

সপত্নীবিদ্বেষ : সতিনী সহিতে বাদ নহে কদাচিত
নিজ পতি মর্মে সেহ হাসে প্রতিনিত।
...সে সকল নারী সত্য ইব্লিসের দাসী।

তিথি-নক্ষত্র : মাহেন্দ্র ক্ষণেতে তোমা জন্ম ক্ষিতি মাঝ।

বিনয় শিষ্টাচার : কুমারকে পুনি পুনি প্রণমিয়া নৃপমণি
কহে গলে বান্ধিয়া বসন।
যুগল করিয়া কর নিবেদএ নৃপবর
সয়ফুল মুলুক চরণে।
... গলেত বসন বান্ধি কুমার সুমতি
পিতা পদে পড়ি কহে মধুর ভারতী।

বধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ির মর্যাদা :
সহস্র দুহিতা নহে বধূর সমান
পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল
বধূমূলে নিজ গৃহ প্রচণ্ড উজ্জ্বল।
বৃদ্ধকালে পুত্রবধূ করএ পালন
মৃত্যু হৈলে পুত্রবধূ পরম যতনে
গুরু কৃত্য করে কায়-চিত্ত-মনে।
...দুধেত শর্করা যেন পুত্র সঙ্গে বধূ
উপজিলে পৌত্র যেন তাতে পড়ে মধু।

শাশুড়ি : পতি সে নারীর দেব ধর্ম যত ইতি
পতি বিনা নারী প্রতি অন্য নাহি গতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশুড়ী বিমুখে পতি সম্ভাষে অকাজ
মক্কাঘর পৃষ্ঠে রাখি যেহেন নামাজ।
যতেক সেবএ পতি কায় চিত্ত মনে
শাশুড়ী সেবিতে যুক্ত তার চতুর্গুণে।

স্ত্রীআচার : গর্ভকালে :

একই দিবসে দুই আচরিল স্নান
দণ্ড দিন পক্ষ মাসে ক্রমে ক্রমে হয়
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাস
মহাদান কৈল শাহা পুণ্যের আরতি
ষষ্ঠমাসে দান কৈল মনের বাঞ্ছাতে
সপ্তমাসে সপ্তফল করাইল ভোজন
অষ্টমাসে অষ্ট অঙ্গে লেপিল চন্দন।
নবম মাসেতে রাজা নিয়োজিল ধাই
দশমাস দশদিন হইল পূরণ
শুভ লগ্নে জুমাবারে শিশু প্রসবন।

নবজাতক : সুবর্ণ ক্ষুরেত ধাই নাভি ছেদ কৈল
ক্ষৌর কর্ম ছেদ কর্ম সর্ব নির্বাহিল।

নামকরণ : এহিমতে পঞ্চদিন যদি নির্বাহিল।
কোরান পুরাণ দেখি নাম বিচারিল।
গণক ব্রাহ্মণ আদি সৌভাগ্য সকল
দোহান নক্ষত্র পাইল অধিক নির্মল।
...আলেম সকলে মিলিল চাহিল কোরান
একে দুয়ে তিন বারে পাইল জিন আয়ান।
জেবলমুলুক থুইল ছাওয়ালের নাম।
তিনবার চাহিল ফলে মসহাফ খুলিয়া
পাইলেক তিন হরফ শুন মন দিয়া।
কাফ, মিম, লাম এই তিন হর্ফ সার
কামিল মুলুক নাম রাখিল কুমার।

যোষীগণ ভাগ্য গণনা করল :

এত শুনি সকৌতুকে তুষি যোষীগণে
ষষ্ঠী দিনে নামমাত্র যদি নির্বাহিল
সহরিষে মহারাজ বহু দান কৈল।
বিংশ এক দিন হবে জুমাহ বাসর
উৎসবের হৈল লগ্ন শুন নরেশ্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জলচর মৎস : মকর কুম্ভীরে গিয়া চোট ভরি খাও
কাতলা রোহিত বোয়াল জলচরগণ
বাটা, মিরগা আদি যত না যায় গণন।

দেওপরীরাজ্য– গোলেস্তাঁএরাম, কোহকাফ, রোকাম, শার্কিস্থান।

রূপকথার ব্যক্তিনাম–সয়ফুল মুলুক, শাহপরী, বদিউজ্জামান, মেহের জামাল লালমতি, রোকবানু, জেবলমুলুক, কামিলমুলুক, সামারোখ, রৌশন জামাল, মিশরী জামাল, শাহবাল, সবজাপরী, লালপরী, আসমাপরী, শ্যাহরুখ, এমরান, শাহ্-সুফিয়ান, চন্দ্রভান, কয়রাপরী।

শহর : একঅব্দ নবমাস নগরের চাক
স্থানে স্থানে সরোবর উষ্ণ মরূদ্যান
বড় বড় নদীনালা বড় বড় পোল
বড় বড় বৃক্ষ রহে বড় বড় ঘর
পাকা ইমারত শিলা বজ্র সমসর।

রাজবাড়ি : বড় বড় গৃহসব নাণিক্য গঠন
মুকুতার স্তম্ভ সব মাণিক্যের চাল
মনোহর দিব্য টাঙ্গি অধিক উজ্জ্বল
মাণিক্য দেউটি জ্বলে করে ঝলমল
সমস্ত নগর হয় একই বরণ।

AMARBOI.COM

ময়দানবের মত লোকমান :
লোকমান গঠিয়াছে নানা রঙ্গারঙ্গী
মুকুতা প্রবাল হীরা উজ্জ্বল প্রাচীর।

ছ. জেবলমুলুক-শামারোখ
সৈয়দ মুহম্মদ আকবর বিরচিত (খ্রিস্টাব্দ ১৬৭৩)

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবরের সম্ভবত কুমিল্লা জেলায় জন্ম। মাত্র ষোলো বছর বয়সে কবি এ কাব্য রচনা করে অনন্যতা প্রদর্শন করেছেন। 'কলাঅব্দ বয়সেত রচিল কাহিনী।' রচনা (১৬৭৩ সনে রচিত) কালও আবৃজদে উল্লেখ করা হয়েছে : 'লিখন সমাপ্ত হইল কাকে ডিম্ব দিল আরবা অনাছের (আরবতুউনাস্বীর) মধ্যে ভাস্কর ভাসিল' এ থেকে ১০৪৮ হি: তথা ১৬৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দ মেলে।
অলঙ্কারের বর্ণনা : (কনে সজ্জা)

সুবর্ণশোভিত চম্পাফুল।
শোভিছে কর্ণের পাঁতি, পুষ্পথোপা নানাজাতি,
কনকের ঝরকা বহুল॥
কর্ণে শোভে কর্ণফুল, হাতে শোভে ছাকি বৈলা,
তার, বাহু, বেশর শোভন॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সির খাড়ুয়া পাএ অগুরু চন্দন গাএ,
ভ্রমর গুঞ্জরে চারি ধার।
কোমরে কিঙ্কিণী বান্ধা, হৃদয়ে মাণিক্য ছান্ধা
গলে শোভে গজমোতি হার॥
যথেক নৃপতি বালা, সাজায়েন্ত রতিকলা,
গলে শোভে মণিরত্ন হার।
সুবর্ণের নত নাকে, মণি রত্ন শোভে চাকে,
নানা পুষ্প শোভএ অপার॥
কেশেত পাটের খোপা, গজ মুক্তা থোপা থোপা,
নানা মতে কেশ বিলাসন।
কটিতে কিঙ্কিণী দোলে পাএত পাঞ্জব বোলে.
চলনেতে করে ঝুন্ ঝুন্।।

নারীর নাচ-গান জলসা :

আইস সোহাগিনী সই, মন রঙ্গে গীত গাই,
সেহেরা শোভিত শিরে লাল।
ঝলকে বাদলা তার, ঠামে ঠামে মুক্তাহার,
হৃদএ কাঁচুলী ঝলমল।
কুচ মধ্যে শোভে পাট্টা, ঝলকে বিজলী ছটা
কোর্‌তা কাবাই অঙ্গে, বুটা শোভে নানা রঙ্গে,
আতর গোলাপ চন্দন।
কন্যাকে পরাই সাড়ী, মুকুতা কাঞ্চন জড়ি
চূড়া বান্ধে জাদের থোপন॥
পিন্দাই ভূষণ বেশ, তুলিয়া বান্ধিল কেশ,
যেন চূড়া বান্ধিল কানাই
কি কব চূড়ার সাজ, দিয়া পুষ্প গন্ধরাজ,
জার গন্ধে গুঞ্জরে ভ্রমাই॥

বাদ্যযন্ত্র :

সুর ডঙ্কা বাজে স্তব্ধ হইল চারিভিত।
সুস্বরেত ভূমিকম্প হৈল আচম্বিত॥
দোতারা, সেতারা বাজে মৃদঙ্গ, কাঁসর।
রামশিঙ্গা, নহবত বাজে হাজারে হাজার॥
ঢাল, ঢোল, কাড়া, শিঙ্গা, কাংস, করতাল।
দোসরি মোহরি বাজে ভেউর কর্ণাল॥

জ. জেবল মুলুক-শামারোখ

রফিউদ্দীন বিরচিত

ইনি কুমিল্লা জেলার কবি। সম্ভবত সতেরো শতকেই তাঁর আবির্ভাব ঘটে। ঐ জেলার সৈয়দ মুহম্মদ আকবরও একই বিষয়ে উপাখ্যান রচনা করেছেন। রফিউদ্দিনের জন্ম নারানএা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম আশরফ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর-বরণ : সাজে জত সোহাগিনি, বরিতে কুমারমণি
পরিধানে নানা অলঙ্কার।
বসনে কুসুম রঙ্গ, সুগন্ধি চন্দন সঙ্গ,
হেলি টলি করন্ত বিহার।।
সমুখে প্রদীপ থুইয়া, ধান্য দূর্বা সাজাইয়া
বরিলেন্ত চামরি রাজন।

মারোয়া : কুমারী বরিতে আনি, আগে দিল সোহাগিনী,
মারোয়ার পাশেত আনিয়া।
ঘৃতের দিঅটি ধরি জতেক জুবতী নারী
ধান্য দূর্বা দিল তুষ্ট হৈআ॥
চারিগাছ্ রাম কলা, পূণ্য ঘট বসাইলা,
রাজা রতি তাতে বসাইল।
সহলা মঙ্গল বলি, ঘোমটা বসন ভুলি,
চন্দ্র সম মুখ দেখাইল॥
গাড়ুআ লইআ হাতে, মারেন্ত দোহান মাথে
আনন্দেত পুলকিত মন।
সখিগণ দূর্বা দিআ, রবি-শশী মিলাইআ
অন্তর হৈল সখীগণ॥

অভ্যর্থনা : বরণ : ঘরে দ্বারে আইসে জদি চামরি ঈশ্বর।
ধান্য দূর্বা ঘট দিআ নিল অন্তপুর॥

যাত্রার শুভ-নিদর্শন :
এরাকি তুরুকি নানা আর কত তাজি।
গজ অশ্বে আরোহিলা চলিলেক সাজি॥
কুম্ভ দুই জল ভরি পন্থ দুই পাশে।
আম্র ডাল দিয়া তাতে রাখিছে হরিষে॥
সমুখে ধবল গাভী বাচ্চা দুধ খাএ।
দক্ষিণে ভুজঙ্গ চলে বামে শিবা ধাএ॥
দধির কলসী লইয়া গোপের রমণী।
হরষিতে মহারাজ শুভযাত্রা জানি॥

ভূত-দৃষ্টি : ভূত প্রেত দৃষ্টি নাই শিশুর উপর।
কেহ বোলে দেও দৃষ্টি কুমার উপর।
কেহ বোলে হাওয়া বাতাস লাগিল কুমারে॥

গণক জ্যোতিষ : সহস্র সহস্র জ্যোষী আসিয়া মিলিল।
শত জন বাছি রাখি সবে বিদাএ দিল॥
রজনী প্রভাতে জ্যোষী গণিতে লাগিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয় জয় বলি খড়ি ভূমিতে পাতিল॥
দৈবকে পাতিল খড়ি, আঁকিয়া মেদিনী জুড়ি,
লগ্ন পাইল প্রথম জুম্মাবার।

শপথ-অঙ্গীকার : এ বলিআ কুমার শামার হস্ত ধরি।
সত্য কৈল দুই জন ধর্ম সাক্ষী করি॥
সামারোখ হস্ত দিল কুমারের মাথে।
সামারোখ মাথা দিল কুমারের হাতে॥
যাহার কারণে তুমি আসিয়াছ এথা।
মোরে জদি হও বাম খাও মোর মাথা॥
পদাতি হইল বীর পিতা প্রণামিতে।
দেখিআ চরণ ধরি পড়িল ভূমিতে॥

কদমবুসি, পদধূলি :
শ্বশুর শাশুড়ী দেখি কন্যা তিনজন।
মনোরঙ্গে ভক্তিভাবে বন্দিল চরণ॥

অন্নপ্রাশন : পঞ্চমাসে করাইল ক্ষীর অন্ন পান।

AMARBOI.COM

প্রণয়োপাখ্যানাদি অন্যান্য গ্রন্থে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ (১৮ শতক]

ক. গুলে বকাউলি

নওয়াজিস বিরচিত (১৮ শতক)

ইনিও আঠারো শতকের কবি। নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অর্ন্তগত 'সুখছড়ি' গাঁয়ে তাঁর। 'গুলে বকাউলি' ছাড়াও 'জোরওয়ার সিংহ প্রশস্তি', গীতাবলী, 'পাঠান প্রশংসা' প্রভৃতি রচনা রয়েছে।

শুভাশুভ : পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাত।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে গুর্ণিত॥
এই পঞ্চতিথি মধ্যে এমত বোলয়।
কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয়॥
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইব।
যাত্রা কৈল্যে সেই সমে সিদ্ধি না হইব॥

ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর।
ধেনু বৎস পয়ঃ পিয় বৃষ গজ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উড়য়॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ-নৃপ গণকাদি সম্মুখে শোভন॥
সদ্য মাংস দধি সুধা শুক ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত।

জন্মভূমির মাহাত্ম্য সম্পর্কে :

উত্তম জানিবা নিজ জন্মভূমি দেশ।
স্বজাতির মাঝে গতি হরিষ বিশেষ॥

মন্ত্রের মাহাত্ম্য :

শুদ্ধমন্ত্র হইলে সর্বত্রে হয় কার্য।
শুদ্ধ পাত্র হইলে রাজা রাখে নিজ রাজ্য।
মন্ত্র এক পরতেক পাপ লভ্য হয়।
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয়।
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিয় এতিন মন্ত্র সংসার মাঝার॥
হেন মন্ত্রশুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া।

—নওয়াজীস খান

এথেক ভাবিয়া মনে তাবিজ বানাইল।
তাবিজে ভরিয়া কুমার গলেত রাখিল॥
নিশিথে নিকালি কুমার কেলি রস করি।
দিবসেত রাখে কুমার তাবিজেত ভরি॥
এ বলিয়া কুমারীএ তাবিজ লিখিয়া।
কুমারের গলে তাবিজ দিলেক বান্ধিয়া॥
সেই গুণে কুমার এক কুমারী যে হইল॥
সুবর্ণের পিঞ্জরা ভরি টাঙ্গিয়া রাখিল॥

—মুহম্মদ আলী

তবে কন্যা ভাবে মনে বুদ্ধি বিমষিয়া।
তিলিসমাত মন্ত্র এক পত্রেত লিখিয়া॥
লেপটিয়া পাত্র গণে বান্ধিল তখন
শুক বর্ণ হইল পাত্র মন্ত্রের কারণ॥
হেন মন্ত্রশুদ্ধি করি গন্ধর্ব হইয়া।
রাখিলেক পাত্র শুক পিঞ্জরে টাঙ্গিয়া॥
দিবসে মন্ত্রভাবে শুক বর্ণ হয়।
রাত্রেত মনুষ্য হই হরিষে ভুঞ্জয়।

— নওয়াজীস খান

মহাগুণী পরী এক কবচ লিখিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বহরমে গলে দিয়া শুক বানাইল॥
সুবর্ণ পিঁজরার মাঝে সে শুক বঞ্চএ।
কখন কখন আনি হৃদেতে রাখএ॥
এইমতে দিবা মধ্যে বানাইয়া শুক।
রাত্রি হৈলে নানা কেলি ভুঞ্জএ কৌতুক।

—মুহম্মদ মুকীম

আজি সত্য হৈল যেই গণকে কহিল।
জ্যোতিষ গণন বাক্য হাতে হাতে হৈল॥

পাথেয় : সপ্ত শত বহিএ কইল পূর্ণ ধনে।
গিরি সম একশত হস্তী লৈল সনে।
পঞ্চশত এরাকী লইল অশ্ববর
স্বর্ণ বস্ত্র দ্রব্য অস্ত্র লৈল বহুতর॥
সুবর্ণ মুকুতা লাল জড়িত রতন॥
কুণ্ডল খাওরি সূর্মা অলঙ্কার জ্যোতি।
মলমল মসলন্দ বস্ত্র লাল সাল।

আপ্যায়ন : কর্পূর, তাম্বুল দিয়া সন্তোষ করিল॥

প্রার্থনা ও মুসলিম পুরাণ :

আয় প্রভু মুই অনাথের কর পার।
জলেতে নূহরে যেন করিলা উদ্ধার॥
কূপ হন্তে ইছপেরে যেন নিস্তারিলা।
মীনোদর হোন্তে যে ইউনুচ তরাইছ।
মুছাকে করিলা আজ্ঞা সমুদ্রে ত্বরিতে।
ইসা প্রতি নিস্তারিলা মাতৃ গর্ভ হন্তে॥
আইউবকে ব্যাধি হন্তে কৈল্যা সুস্থদান।
ইব্রাহীম অগ্নি মধ্যে কৈল্যা পুষ্পোদ্যান
যেন মোহাম্মদ রসূলকে জানি মিত।
হ্রদ হন্তে উদ্ধারিলা সিদ্দিক সহিত॥
করজোড়ে নওয়াজিসে কহে প্রভু স্থান।
আদি অন্তে সেবকেরে করিবা কল্যাণ।

খাদ্য : ঘৃত সুধা শর্করাদি যথামৃত রীত।
আটা পিষ্ঠ তৈল মিষ্ট ফুল যদি পাই।
সকল একত্র করি ভোজনেত খাই॥

উপমা : খোয়াজ প্রদীপ যেন সমুদ্রে ভাসায়॥
বৈষ্ণব চরিত্র দেখি কহিতে লাগিল।
বোলে হেন রীত কেন হইল তোমার॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্যান রচনা :

নির্মিতে প্রাচীর উদ্যান বন মাতাইতে।
হেন কর বকাওলী উদ্যান স্বরূপ।
গোলাপ ঝরণা যেন আতরের কূপ॥
আনাইল বহুমূল্য লাল বদখ্সান।
এমনি আকীক মুক্তা মণি মরকত আর।
জবরজঙ্গ এয়াকুত জ্যোতি আনিবার।।
আর যত জ্যোতিমন্ত শিলা আনাইল।
সুবর্ণ মলম্বা হেতু পুঞ্জে পুঞ্জে থুইল।

জন্মোৎসব : দান :

আজি শুভদিন পুত্র হইছে তোমার।
আমি সব দারিদ্র্য খণ্ডাও একবার॥

সত্য :

সত্য শাস্ত্র শিখিবারে হেতু গুরু শিষ্য।
সত্য ঘটে না থাকিলে না বলি মনুষ্য॥

দেশাচার :

সে দেশে নিয়ম এই যিভা হয় যদি।
জামাতাকে রাখে কন্যা গর্ভের অবধি॥
নিজ দেশে যদি কন্যা হয় গর্ভবতী।
তবে যাইতে আজ্ঞা করে জামাতার প্রতি।

প্রেমতত্ত্ব :

প্রেমভাবে নর কিবা নিরঞ্জন বশ।
প্রেমহীন লোকের দোহানে অপযশ॥
প্রেমভাবে সংসার সৃজিল নিরঞ্জনে।
প্রেমেতে মহিমা পাইল অলি নবীগণে॥

খাদ্য :

মিশ্রি কন্দ ঘৃত দুগ্ধ সুধা শর্করা দধি।

মারোয়া :

মণি মুক্তা সারি সারি গ্রন্থি চারিভিত।
অগণিত সামিয়ানা অষ্টদশ স্থান।
জড়িত পূর্ণিত জ্যোতি সবিতা সমান॥
আবলুসের স্তম্ভ স্বর্ণ বস্ত্রের শুভিত।
রূপবতী পৃষ্ঠে যেন চিকুর লম্বিত।
খীমা সব জ্যোতিমন্ত জ্যোত শিলা হস্তে।

যুদ্ধযাত্রা :

ছত্রিশ বরণ লোক করিয়া সঙ্গাতি।
যুদ্ধমূলে সসৈন্যে চলিল নরপতি॥
শুদ্ধ বস্ত্র শুদ্ধ অস্ত্র ডান সৈন্যগণ।
বাম সৈন্য লৌহময় জড়িত পৈরণ॥

প্রখ্যাত প্রেমিক :

লাইলী পাইল জ্যোতি, মজনু আকুল গতি,
শিঁরি হন্তে ফরহাদ উদাস॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমনেত নৃপমন অতি প্রেম মোহিতন,
ভাবি চাহ এসব প্রকাশ॥

বণিক :
কহিলেক মোর পিতা মহা সাধু ছিল
বাণিজ্যেত চতুর্দিকে পৃথিবী ফিরিল।

হার্মাদ :
দৈবগতি বহিত্রেত হার্মাদ উঠিয়া।
লোক বধি ধন সব লৈ গেল লুটিয়া॥

বর-সজ্জা :
হরিরাদি কিনিকন, মসর্জর সুবসন,
সকলে সাজায় কুমাররে।
পৈরাইল অলঙ্কার, গলে মণিমুক্তাহার
স্বর্ণপুষ্প দিল শির 'পরে।
হস্তে নবরত্ন দিল, বাজুবন্ধ চড়াইল,
কোটি মণিমুক্তা সপ্ত লহর।
করাঙ্গুলে রত্নাঙ্গুরী দর্পণ হস্তেত করি,
স্বর্ণ পাংখা লইয়া গোচর।।

খাদ্যবস্তু :
মিস্ত্রী কন্দ দুগ্ধ ঘৃত, তণ্ডুল সঙ্গমিশ্রিত,
সুধারস সুগন্ধি পূর্ণ।
দধি দুগ্ধ শর্কে ঘৃত, মিশ্রি কন্দ সুধামৃত,
বাতাসা মণ্ডের বহুছন্দ।
নানারূপে পাকোয়ান, নানান মধুর নান।
প্রচারিতে আমোদ সুগন্ধ॥

দাম্পত্য :
স্বামীর দোসর প্রভু মান্য করে নারী।
পুরুষে জানিব স্ত্রী প্রেমের ঈশ্বরী॥
স্ত্রীকুল লজ্জাভাণ্ড জানিবা জগতে।
লজ্জা ভাণ্ডি জাত নষ্ট নহে যেন মতে॥

কন্যা-স্নান :
এ সকলে কন্যাকে আস্নান করাইল।
গোলাব আতর যে সুগন্ধি গায় দিল॥
কোলে তুই লই গেল সুবর্ণের ঘরে॥

কন্যা-সজ্জা :
কন্যাকে সাজায় বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া॥
প্রথমে কোড়াই কেশ দিয়া চতুর্সম।
বান্ধিল পাটের জাদে খোপা মনোরম॥
তাহাতে মুকুতা ছড়া করিল শোভন।
চন্দ্রিমা উদিত যেন বিদারিয়া ঘন॥
সিঁথিপাতি মধ্যেত সিন্দূর বিরাজিত।
যেন প্রকাশিত হৈল প্রভাত আদিত্য॥
রত্নের টিকলি বিন্দু ললাটেত শোভা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালাচন্দ্রে পাইল কিবা পূর্ণচন্দ্র প্রভা॥
রতনে মুকুতা জাল উপরে ঢাকিল।
যেহেন নক্ষত্র বৃষ্টি মেঘেত প্রকাশিল॥
কপালে তিলক দিল সনেত্র বরণ।
হরেত সুধঙ্গে গ্রহি যেন ত্রিলোচন॥
একস্থানে চন্দ্র তারা সবিতা সুরঙ্গে।
ব্যহবাঙ্কী কৈল্য কিবা বিদ্যুতের সঙ্গে॥
নাসিকায় বেশর দিল রত্ন শোভাকর।
হরি শিরচক্র যেন অরুণ প্রচার॥
যুগল শ্রবণে দিল রত্নের কুণ্ডল।
অলকা ফণীর মুখে মাণিক্য উজ্জ্বল।
বাহুমধ্যে চড়াইল রত্ন বাজুবন্ধ।
সুবর্ণের তার যুগ শোভিত সুছন্দ॥
করেত কঙ্কণ নবরত্নে শোভা করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী রত্ন অতি জ্যোতি ধরে॥
গলে শোভা করিল সুবর্ণ তে-লহরে।
কণ্ঠমালা গজমোতি মণি বহুতর।
কোমরে কিঙ্কিণী নবরত্নে সপ্তলহরী।
বাজরি শোভিত কটি চতুর দিগ ভরি॥
পায়েত ঘঙ্গুর দিল চলিতে বাজন।
সুবর্ণ মোকব দিল জড়িত রতন॥
আঙ্গুলে নালিকা সাজে সুবর্ণ গঠিত।
সর্বঅঙ্গ অলঙ্কার অধিক শোভিত॥
তাতে বহু মূল্য পাটাম্বর পরাইল।
কটি অলঙ্কার তুলি তার 'পরে দিল।
গলেত কাঞ্চুলি দিল সুবর্ণ জড়িত।
আকল ঘোঁঘট দিল শিরেত শোভিত॥
তাহাতে তোরণ শোভে অমূল্য বসন।
হরিতাদি মসবস্ত্র কিবা কিংকন॥
কিরমিজ বস্ত্র অতি মূল্য ধরে।
হরিষে কন্যারে পরাইল সআদরে॥
আজ্ঞা পাই মাওলানায় নিকাহা পরাইল।
শাদী মোবারক বলি সকলে ফুকিল॥

দশটি চরিত্রদোষ :

কৃপণতা উচ্চবাক্য উচ্চ অহঙ্কার।
নাবড়ানি প্রেম হানি কুবাদ বেভার।
আত্ম উচ্চ পর নীচ অপকারী মনে।
পরদ্রব্য দৃষ্টি করে সে সকল গণে।
এ দশ চরিত্র জন্ম অশুদ্ধের গতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর-কনের যাত্রালগ্ন :

তবে কন্যা লই যাত্রা করিতে কুমার।
শুভ যথ তিথি লগ্ন করিল সুসার।
যোগ আর চন্দ্রিমা নক্ষত্র শুভালয়
সকল বাহন তেজি সিংহের সময়।
নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা সঞ্চরিত
ক্ষিতি লগ্ন সমস্ত বুঝিয়া হিতাহিত।
বার বেলা তেজি শুভ পাইয়া সকল
যোগী নিজ কীর ক্ষেপ দিক সুমঙ্গল।

যাত্রার শুভাশুভ :

এবে কহিবারে বেলা বুঝ যেই মতে।
সেই ক্ষণে কদাপি না যাও কার্য গতে।
অর্কেত তপন দণ্ড পরে এক যাম।
বার বেলা বুঝিয়া না কর কোন কাম॥

সোমে চারি দণ্ড পরে চারি দণ্ড নষ্ট।
নেত্র প্রহরের পাছে চারি ঘড়ি কষ্ট॥

কুজে বিংশে দণ্ড পরে নষ্ট চারি ঘড়ি।
দিন সে চারি দণ্ডে কার্যে না নিঃসরি।
বুধে যাম পরে চারি দণ্ড মন্দ হয়।
যোগ যাম পরে চতুর্দণ্ড ভাল নয়॥

গুরু নেত্র প্রহরেত নষ্ট অষ্ট দণ্ড।
শুক্রে যাম পরে যাম কার্যেত পাষণ্ড॥
শনি আধে চারি মধ্যাহ্নেত চারি ঘড়ি।
দিন শেষে চারি দণ্ড কার্য পরিহরি।
বারবেলা বুঝিয়া চলিব বুধগণ।
এবে কহি নন্দা ভদ্রা আদি লগ্ন সার।
বুধজনে চলিব বুঝিয়া শুভ তার॥
প্রদীপ ষষ্ঠএ একাদশী নন্দা নাম।
অর্ক বাম পায় যদি না করিব কাম॥
দ্বিতীয় দ্বাদশী সপ্ত ভদ্রা বলি যারে
কভু কর্ম না করি সোম শুক্রবারে॥
ত্রিতিয়া ত্রয়োদশী আট তিথি জয়া যার।
শুভ কার্য না কর পাইলে বুধবার॥
চতুর্থী নবমী চতুর্দশী রিক্ত তিথি।
গুরুবারে কার্য হেতু না বান্ধিয়া মতি॥
পঞ্চমী দশমী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে।
শনিতে না কর কার্য তিথি সে পূর্ণতে॥
এই পক্ষ তিথি মধ্যে এমত বোলয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষি বিদ্যা আরম্ভিলে ফল সিদ্ধি নয়।
সে-সমে সঙ্গমে গর্ভ হইবেক পাত।
বাণিজ্যেতে মূলে নষ্ট হইব তাহাত॥
বিবাহ করিলে ভার্যা বিধবা হইবে।
যাত্রা কৈল্যে সেই সমে সিদ্ধি না পাইবে॥
যেমতে পাইব সিদ্ধি কহি শুন সার।
হয় কি না হয় তাকে করিয় বিচার॥
সোমে শুক্রে তিথি নন্দা কার্য কর ভাবি।
বুধে ভদ্রা শনি রিক্তা জয়া কুজা রবি॥
গুরু পূর্ণা তিথি যদি কার্যগতে হয়।
এ সবেত শুভ সিদ্ধি জানিঅ নিশ্চয়
বিচারিয়া পঞ্চ তিথি চলিব সুজনে।
জ্যোতিষ ডাকিয়া কহে নোয়াজিসে হীনে।
এবে কহি শুভ ক্ষেণ যোগী যেবা হয়।
কোন কোন দিবসেত পৌছে সম হয়॥
শুক্রে দু'প্রহর পরে অষ্ট ঘড়ি আছে।
সোম শনি অষ্ট ঘড়ি প্রহরেক পাছে।
গুরু রবি আড়াই প্রহর পরে অষ্ট।
আদ্যে বীর ঘড়ি পরে অষ্ট শ্রেষ্ঠ।
অষ্ট ঘড়ি মঙ্গলে চতুর্থ ঘড়ি পরে।
শুভক্ষণ সপ্তদিন কার্য অনুসারে॥
এবে কহি সপ্ত রাত্রি যেমন উচিত।
শুভক্ষণ হয় জান যেই মত রীত॥
ভৌমে শনি রাত্রি আদ্যে পাইলেক চারি।
রবি রাত্রি এ দুই প্রহরে অষ্ট ঘড়ি।
সোম শুক্র বুধ নিশি প্রহর পশ্চাতে।
বসু বসু ঘড়ি শুভ আছয় তাহাতে॥
গুরু রাত্রি দ্বাদশ ঘড়ির পরে আট।
এই শুভ হেরি সবে চলিবেক বাট॥
শুভক্ষণে রাত্রি দিন যোগের সমএ।
পূর্ব শাস্ত্র মতে হীন নোয়াজিসে গাএ॥

যোগিনী চাল :

এবে কহি শুন সবে যোগিনীর চাল।
যে বুঝিয়া বহে বাট হয় তার ভাল॥
চন্দ্র গ্রহ ষষ্ঠদশ চতুর্বিংশ দিনে।
যোগিনী নিবাস নিত্য বুঝ অগ্নিকোণে॥
নেত্র রুদ্র অষ্টদশ হয় বিংশ দিনে।
চন্দ্রের এথেক দিনে যোগিনী দক্ষিণে॥
যোগ দিগ পঞ্চবিংশ অহ সপ্তদশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগিনী নৈঋতে বইসে এথেক দিবসে॥
বেদ সূর্য উনবিংশ সপ্তবিংশ জান।
যোগিনী বৈসয় নিত্য পশ্চিমের স্থান॥
বাণ ত্রয়োদশ বিংশ এথেক দিবসে।
যোগিনী আপনে যাই বায় বৈও বৈসে॥
বসু পঞ্চদশ নেত্র বিংশ ত্রিশ দিনে।
উত্তরেত উত্তরএ যোগিনী আপনে॥
ঋত চন্দ্র বিংশ অষ্ট বিংশ দিন এথ।
যোগিনী আপনে গিয়া রহে ঈশানেত॥
সমুদ্র ভুবন যোগ বিংশ উনত্রিশে।
যোগিনী চন্দ্রের এথ দিনে পূর্বে বৈসে॥
কহে নোয়াজিসে হীনে যোগিনীর চাল।
সেই দিনে সেই দিগে বুঝি চলে ভাল।
পান্থ হস্থা নক্ষত্র পঞ্চাঙ্গ সিদ্ধি বর।
ডানে সর্প বামে শিবা যুবতী সোন্দর॥
ধেনু বৎস প্রসবিলে বৃষ গজ হয়।
পূর্ণ ঘট পুষ্পমালা পতাকা উদয়॥
দক্ষিণে উজ্জ্বল বর্ণ রজত কাঞ্চন।
দ্বিজ নৃপ গণকাদি সম্মুখে শোভন॥
মদ্য মাংস দধি সুধা সরু ধান্য ঘৃত।
যাত্রাকালে এসব দেখিলে আনন্দিত॥

গীত-বাদ্য-নাট : নিত্য সভা পূর্ণ করি সেই ইন্দ্ররাজ।
গীত নাট বাদ্য বাজএ সেই সভা মাঝ॥
মহারূপী কন্যাকুল নাটিকা সদায়।
অপরূপ নাট হেরি সভা মোহ পায়॥

হাস্যরস রাজরস বাদ্য বাজে নিত।
পতি শব্দ শুনি স্তব্ধ সুস্বর সুগীত॥
দোতারা সেতারা কাড়া কাস করতাল।
ঝাঞ্ঝরী মন্দিরা বাঁশী ভৈরব কর্ণাল॥
আর বহু বাদ্য আদি মৃদঙ্গের সান।

বাজাইতে লাগিল সম্পূর্ণ পঞ্চতাল।
নাচিতে কুমারী অঙ্গ লহরী বিশাল॥
সম্পূর্ণ করিল নাট শূন্যে করি কর।
উড়এ পতাকা যেন বিদ্যুৎ লহর॥

অলঙ্কার : চিকুর জলধ জিনি সিন্দূর তপন।
কস্তুরী সৌরভ তাহে করিছে মাজন॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেলন পাটের জাদ চিকুরে বান্ধিছে।
তাহাতে মুকুতা ছড়া খোঁপায় বেড়িছে॥
ভাল বালচন্দ্র 'পরে টিকলী শোভিত।
মেহেন্দী সঞ্জোগে নখে যেন চন্দ্র সুর।
তাহাতে নালিকা গোলক ঘুঙুর নূপুর॥
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে বাজএ সঘন।
তে-লহরী মণিমুক্তা তাহাতে শোভন॥
অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কার করে শোভাকার
হরিদ্রাদি বস্ত্রকুল পৈরে অনিবার।

জাতিগত আচার :

তবে কি উল্টা হয় জাতির সমাজ।
মুসলমান শূদ্র সঙ্গে হইবারে কাজ॥
বহু গিয়া এড়িয়াছে শাহী বসন।
উদাসী ফকির বস্ত্র লইছে এখন।
হেন সাজি কন্যা চক্ষে জগত মোহিত।
জলিখা চলিছে যেন ইছুপ বিদিত॥

মন্ত্র-গুণ :

শুদ্ধ মন্ত্র হইলে সর্বত্র হয় কার্য।
মন্ত্র এক পরতেক পাপলভ্য হয়।
গুরু মুখে মন্ত্র লক্ষ্যে ঈশ্বর দেখয়॥
মন্ত্রে স্বর্গ মন্ত্রে নর্ক মন্ত্রে কার্য সার।
জানিও এ তিন মন্ত্র সংসার মাঝার॥

সৌজন্য ও সুব্যবহার :

ভালমন্দ বিচার রাখএ যে সকল।
মিথ্যা বাদে লোক সঙ্গে না করে কন্দল॥
ছোট বড় সঙ্গে বাক্য মধুরে কহিব।
আপ্ত পর সব সঙ্গে আদর রাখিব।
কিবা মাতা কিবা পিতা গুরুলোকরে মানিব।
অহঙ্কার দুর্বচন কাকে না কহিব।
হীন লোক দেখি কভু না কর বড়াই।
তার সম মহাপাপ আদি অন্তে নাই॥
যে সকলে পুণ্য করে পাপ পরিহরি॥
সে সকল ধন্য ধন্য ত্রিভুবন ভরি॥
দানে দাতা ধন্য ধন্য সংসার পূরণ।
দান সম ধর্ম নাহি এ তিন ভুবন॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ. গদা-মালিকা সম্বাদ

শেখ সাদী বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের আমলে (১০৯২-১১২২ ত্রিপুরাব্দে বা ১৬৮২-১৭১২ খ্রিস্টাব্দে) কবি শেখ সাদী তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে যুবরাজ চম্পক রায়ের উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত শেখ সাদী চম্পক রায়ের কর্মচারীও ছিলেন। গ্রন্থে রচনাকালও রয়েছে।

পড়িয়া বুঝিয়া সব শাস্ত্রের উদ্দেশ
একাদশ বিংশ দুই পুস্তক বিশেষ।

১১২২ ত্রিপুরাব্দে বা ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচিত। এটিও অনুবাদমূলক বলে কবি দাবি করেন:

ফারসী বাঙ্গলা করি করিলুঁ রচন।

গ্রিক পণ্ডিতদেরও আগের কাল থেকেই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান আহরণের রীতি চালু রয়েছে। ফলে সেকালের গ্রন্থের গুরু-শিষ্যের কিংবা জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই ঐহিক ও পারত্রিক সবরকমের বিষয় ও শাস্ত্র আলোচিত হত। আঠারো শতক অবধি আমাদের বাঙলা ভাষায়ও উক্ত প্রাচীন রীতির অনুসরণে শাস্ত্রকথা ও তত্ত্বচিন্তা প্রশ্নোত্তরে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

মুসার সওয়াল, আবদুল্লাহ্‌র সওয়াল, মালিকার হাজার সওয়াল, গদা-মালিকা সম্বাদ, সিরাজ কুলুব, হরগৌরী সম্বাদ, তালিবনামা প্রভৃতি উক্ত রীতিতে লিখিত বাঙলা গ্রন্থ। এই বৈশিষ্ট্যে গুরুত্ব দিয়ে এগুলোকে 'সওয়াল সাহিত্য' নামে চিহ্নিত ও অভিহিত করা অসঙ্গত নয়।

একের অভিজ্ঞতাই অপরের কাছে জ্ঞান। কাজেই অভিজ্ঞতায় লভ্য জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার চিরকালই মন্থর। তাছাড়া অভিজ্ঞতার পৌনঃপুনিকতায় জন্মায় পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞান। সব ক্ষেত্রে তেমন পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতার সুযোগ ঘটে না। তাই আদিকালের মানুষের নানা বিষয়ক অনেক জ্ঞানই ছিল ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যোগ্যতা তখনো অর্জিত হয়নি। ফলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যত প্রশ্ন মনে জেগেছে, তার বুদ্ধি ও কল্পনাপ্রসূত উত্তর সন্ধান করেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। এমনি মনোময় ধারণাভিত্তিক শাস্ত্র, জ্ঞান, তত্ত্ব ও তথ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে মানুষের জীবনভাবনা ও জগৎচেতনা।

বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া অন্য প্রয়োজনের প্রতি সাধারণ মানুষ সাধারণত উদাসীন। তাই জ্ঞান, বিদ্যা ও ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষ পরবুদ্ধিজীবী ও পরচিন্তানুসারী। তাছাড়া, আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কার ঘরোয়া ও সামাজিক সমর্থনে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্তরে উন্নীত হয়ে ধর্মশাস্ত্রীয় বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এ কারণেই আজকের দিনেও মানুষ বিদ্যালব্ধ জ্ঞানকে অবহেলা করে এবং শাস্ত্রোক্ত সত্যকে বরণ করে নিশ্চিন্ত হয়। সুতরাং মানবসভ্যতার শৈশব-বাল্যের সেসব ধ্যানধারণা, জগৎচিন্তা ও জীবনভাবনা আজো পরচিন্তানুসারী উদাসীন মানুষের চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে।

জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যেসব রহস্য-জিজ্ঞাসা মানুষকে চিরকাল আকুল করেছে, সেগুলোর শাস্ত্রীয়, কাল্পনিক ও নীতিজ্ঞানপ্রসূত উত্তর দানের চেষ্টা আছে 'সওয়াল সাহিত্যে'। যেহেতু জগৎ ও জীবনের উৎস ও আধার হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ, সেহেতু জ্ঞানও আল্লাহ্-প্রোক্ত। রসুলের মাধ্যমে সে-জ্ঞান প্রচারিত-প্রচলিত হয় মর্ত্যে। তাই মুসলিম-জীবনে হযরত আদম থেকে হযরত মুহম্মদ অবধি নবী পরম্পরায় জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ আকিলের মুসানামা, নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের মুসার সওয়াল, আব্দুল করিম খোন্দকারের হাজার মসায়েল, রাজ্জাক-নন্দন আব্দুল হাকিমের সাহাবুদ্দীন নামা, শেখ চান্দের তালিব নামা, হর-গৌরী সম্বাদ ও শাহ্‌দৌলাপীর, মুহম্মদ খানের সত্য-কলিবিবাদ সম্বাদ, আলি রজার সিরাজকুলুব, এতিম আলমের আবদুল্লাহ্‌র হাজার সওয়াল, শেখ সাদীর গদামালিকা সম্বাদ, সেরবাজের মালিকার হাজার সওয়াল বা ফক্‌র নামা, সৈয়দ নূরুদ্দীনের মুসার সওয়াল, আদম ফকিরের জোহরার সওয়াল, মুহম্মদ খাতেরের সওয়াল ও জওয়াব প্রভৃতিতে মুখ্যত শাস্ত্রীয় জ্ঞানদানের চেষ্টা আছে। সে জ্ঞান কখনো শরিয়তি, কখনোবা মারফতি কিন্তু সবক্ষেত্রে তা ধর্মশাস্ত্রানুগ নয়, লৌকিক বিশ্বাস ও শ্রুতি-স্মৃতিভিত্তিক। লেখকদের অসম্পূর্ণ শিক্ষা, অধ্যাত্মতত্ত্বে আগ্রহ, পীর-নির্ভরতা ও দেশগত লৌকিক সংস্কারের প্রভাবই এ বিকৃতির মুখ্য কারণ। তাছাড়া মুমীনের কাছে কোরআন সব জ্ঞানের ও চিরন্তন তত্ত্বের উৎস ও আধার। এ বিশেষ তাৎপর্যেই হয়তো লেখকেরা সব বিষয়েই প্রায় নির্বিচারে কোরআনের, রসুলের ও আল্লাহ্‌র দোহাই ও বরাত দিয়েছেন। প্রায় ক্ষেত্রেই না-জেনে দিয়েছেন, জেনে দিয়েছেন কৃচিৎ। কাজেই তাঁদের পরিবেশিত সত্য ও শাস্ত্র, তথ্য ও তত্ত্ব তাঁদের অধ্যাত্মচিন্তা, তাঁদের লব্ধ জ্ঞান, তাঁদের অর্জিত ধারণাও তাঁদের কল্পনা ও জীবন-ভাবনার প্রসূন। সাধারণ সত্য কিংবা বাস্তব তথ্যের সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক পরোক্ষ কিংবা অনির্ণীত। শাস্ত্রকথার ফাঁকে ফাঁকে অন্য জ্ঞানদানের চেষ্টাও আছে। কিছু ভৌগোলিক, কিছু পৌরাণিক, কিছু প্রাকৃতিক জ্ঞানদানের আয়োজন যেমন রয়েছে; ধাঁধা, হেঁয়ালির ব্যবস্থাও তেমনি বিরল নয়। বিদ্যা ও বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য অথবা রহস্যচিন্তা উদ্রিক্ত করবার জন্যই হয়তো এগুলো দেয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে ধাঁধা, হেঁয়ালির উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য।

মধ্যযুগের এইসব গ্রন্থের লেখকরা লোক-শিক্ষকের ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। এ-দৃষ্টিতে এঁদের সওয়াল-সাহিত্যকে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' নামে চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। সেকালে কথকতার মাধ্যমে অথবা শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমেই নিরক্ষর মানুষ জগৎ ও জীবন, ধর্ম ও সমাজ, নীতি ও আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করত। আর এভাবে লব্ধ জ্ঞান-বুদ্ধির আলোকে মানুষ পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যত্নবান হত। সেদিক দিয়ে এ-সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিমেয়। কেননা এতে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ না-ঘটলেও, সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়েছে, একটি স্থূল নীতিবোধ ও ধর্মচেতনা মানুষের পতন-পথ রুদ্ধ রেখেছিল।

॥ ২ ॥

কবি শেখ সাদী রচিত 'গদা-মালিকা সম্বাদ'-ও সওয়াল সাহিত্য। অন্যান্য সওয়াল-সাহিত্যে মুসা ও আল্লাহ, আলি ও রসুল মুহম্মদ, হর ও গৌরী, আবদুল্লাহ্ ও রসুল, শিষ্য ও পীর প্রভৃতির কথোপকথনের মাধ্যমে গুরুতর বিষয় আলোচিত হয়েছে। পাঠকের ও শ্রোতার কৌতূহল জাগাবার উদ্দেশ্যে শেখ সাদী ও কবি সেরবাজ স্বয়ম্বর-কামী বিদুষী রাজ্ঞী বা রাজকন্যা কর্তৃক বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষেত্রে ভাবী বরের যোগ্যতা পরীক্ষাচ্ছলে প্রশ্নোত্তর পরিবেশন করেছেন। কবির উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। তার প্রমাণ কবি শেখ সাদীর ও কবি সেরবাজের গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আজো সুলভ। বোঝা যাচ্ছে রোমান্স-সন্ধানী পাঠক-শ্রোতা পরম আগ্রহে, উক্ত দুটো পুঁথি পড়েছেন ও শুনেছেন। রোমান্সের মোড়কে নীরস ধর্মকথা শুনানোর এই সদিচ্ছা একালের মিষ্টি ঔষধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে প্রশ্নোত্তরের কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। শাস্ত্রকথায় দলিল হিসেবে নিঃসঙ্কোচে কোরআনের আয়াতের দোহাই দেয়া হয়েছে, যদিও কোরআনে তা কৃচিৎ মিলবে। দেশ-দুনিয়ার নানা কথাও প্রশ্নোত্তরে বিধৃত। আর প্রহেলিকাও বিরল নয় :

প্রশ্ন : কোথা হন্তে আসিয়াছ কহ তুমি সার?
কোন্ স্থানে থাক তুমি কহ মোর ঠাঁই?

উত্তর : পিতার ঔরস আর মতৃগর্ভ হতে।
নানাস্থানে থাকি আমি স্থান স্থিতি নাই।

প্রশ্ন : কী খাও এবং কী পান কর?

উত্তর : খাই খাবেরের গম এবং 'গুলা পিই অবিরত'।

আল্লাহ্র উদ্ভব, রসুল সৃষ্টি ও জগৎ-পত্তনের দীর্ঘ বর্ণনার পরে–

প্রশ্ন : তবে পুছে কথা হন্তে স্বর্গ-নরক সৃজন?

উত্তর : আল্লাহ্র গজব দৃষ্টে দেজেখ হইছে
কোহ্তুরের দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।
অন্যত্র : (আল্লাহ্র গৌরব দৃষ্টে ভেহেস্ত নির্মিছে।)

প্রশ্ন : তবে পুছে রবি-শাশী কথা হতে জন্মিল?
বীর্যের উৎপত্তি বোল কিরূপে হইল?

উত্তর : প্রভুর ধ্যান হইতে তারা (রবি-শশী) উপজিল।
নুরের যে অঙ্গ হতে (বীর্য) ফকিরে কহিল।

তারপর, দিন-রজনী, সুমেরু-কুমেরু প্রভৃতির সৃষ্টি-তত্ত্ব বর্ণিত।

প্রশ্ন : আব আতস খাক বাত কিরূপে হইছে?

উত্তর : নুরের অঙ্গের ঘর্মে প্রভুএ সৃজিছে।

রিজিক ও দৌলত : পূর্বদিক হন্তে জান রিজিক আইসএ
পশ্চিমদিক হন্তে জান রিজিক আইসত্রে

দেহের হাড়ের ও রগের সংখ্যা :

গদা বোলে তিনশত ষাটখান জান।
তিনশত ষাট 'রগ' জানিও নিশ্চএ।

মালিকা এবার প্রহেলিকার আশ্রয়ে প্রশ্ন করল :

তবে আর এক কথা পুছে মালিকাএ
এক বৃক্ষের বার ডাল আছএ নিশ্চএ।
এক এক ডালে ধরে ত্রিশ ত্রিশ পাত
বেশ কম নাহি জান সমসর তাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে পত্রের এক পৃষ্ঠে সফেদ আকার
এক পৃষ্ঠে 'ছেহা' রঙ্গ শুন কহি সার।
এক এক পত্র মধ্যে পঞ্চ পঞ্চ ফুল।

উত্তর হচ্ছে : বৃক্ষ হল বৎসর, ডাল হল মাস,
পাতা হল দিন পাতার সাদা-কাল
রঙ হল দিবা-রাত্রি এবং পঞ্চ ফুল
হচ্ছে দিনের পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ।

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ নবী বাদশাহ্ও ছিলেন?

উত্তর : ইউসুফ, সোলেমান, জুলকর্ণ ও মুহম্মদ– এই চার জন।

প্রশ্ন : চিরজীবী কারা ?

উত্তর : ঈসা আর ইলিয়াস, আলি আজগর (ইদ্রিস)
খিজির পয়গাম্বর এই জান চার।

এঁদের মধ্যে ঈসা ও ইদ্রিস যথাক্রমে আকাশে ও স্বর্গে বাস করেন, এবং খিজির জলে এবং ইলিয়াস স্থলে বিচরণশীল।

পেচক দানা-পানি খায় না, তার কারণ : গন্দম ভক্ষণ করেই আদম স্বর্গভ্রষ্ট হন এবং নুহ্নবী প্লাবনে কষ্ট পেয়েছিলেন। পেচক 'আপনার রক্ত আপে ভক্ষিএ সদাএ' বেঁচে থাকে।

শরীরে বিভিন্ন রাশির সংস্থিতি সম্বন্ধেও 'কোরান আয়াত পড়ি ফকির কহিল।'— যেমন,

অজুদ আসমানে জান সিংহরাশি রএ
কন্যারাশি গর্দানেত ফকিরে বোলএ।
মেঘ জানুতে থাকে বৃষ পদমূলে
মিথুন পদ্ম মূলে রহে কহিল সকলে।

আবার শরীরে চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র, পবন প্রভৃতির অবস্থান তত্ত্বও বর্ণিত হয়েছে :

চন্দ্র উলিয়াছে জান দীলের অন্তর
নক্ষত্র রহিছে জান কলিজা উপর।
অরুণ উদিত জান কোমর মধ্যত
মগজ হন্তে উথলিয়া বসন্তের বায়
মানুষের নাভিমূলে রহন্ত সদায়।

অদ্বৈততত্ত্ব : আল্লাহ্ এই সৃষ্টিরূপে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; কাজেই—

শশীরূপ ধরি তবে করএ পসর।
রবিরূপে তাপ দিয়া চৌদিগে ব্যাপিত
শীতলরূপে রহিয়াছে জলের সহিত।
তেজরূপে রহিয়াছে অনল মাঝারে
শীতল সুগন্ধিরূপে পবন সঞ্চার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলিরূপ ধরি চরে পুষ্পের মাঝার
মোহাম্মদ নবী জান নিজ অবতার।
আকাশ পৃথিবী মধ্যে যথ শূন্যাকার
নানারূপে কেলি করে হৈয়া অবতার।

প্রশ্ন : হিন্দুয়ানী কিরূপে হৈল বহ শুনি?

উত্তর : পুরাণ-কোরান দুই শাস্ত্র যে সৃজিল
হিন্দু-মুসলমান দুই পরিচিহ্ন কৈল।
পূর্বে পুরাণ শাস্ত্র আছিলেক শুদ্ধ
অখনে ইব্লিসে পাইয়া করিছে অশুদ্ধ।

হিন্দুর উদ্ভব অনাদি থেকে। অনাদির সন্তান, পিশাচ, দেও, পরী প্রভৃতি এবং অনাদি মুখ-নিঃসৃত হচ্ছেন ব্রহ্মা। তাঁর চারিমুখ চতুর্ভুজ পরম সুন্দর ইব্লিসের খপ্পরে পড়ে হিন্দুরা নানা মিথ্যাচার বরণ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে।
শ'বে মে'রাজ কালে নবী মুহম্মদ আল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন,

আল্লাহ্‌র অবয়ব : পুরাণ পুরুষ অতি নবীন সুরত।
মনুষ্য শরীর নহে নাহি রূপ রেখা
নয়ান গোচরে নবী দেখিল প্রত্যেক।
দুইদিকে উত্তাল কুন্তল জলাকার
নির্লক্ষ্য নিরূপ অতি পরম সুন্দর।

প্রশ্ন : এ সপ্ত জমিন রৈছে কাহার উপর ?

উত্তর : মৎস্যের উপরে ক্ষিতি বহে মহাভার
জলমধ্যে সেই মৎস্য ভাসএ অপার।
মৎস্যের শিরের 'পরে গোশৃঙ্গ আকার
গোশৃঙ্গ উপরে রহে হুকুমে আল্লাহ্‌র।

গর্ভের শিশুর উদ্ভব ও দেহগঠনতত্ত্ব সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুমে মিকাইল ফিরিস্তা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। মিকাইল—

এক এক স্থানে তবে ধূম্র আকার
মণে মণে পানি মাপি দেয়ন্ত সবার।

তারপর, জলের গুরুজ ঝামা কান্ধেত করিয়া
সকল ফিরিস্তা মিলি ফিরএ ভ্রমিয়া
একেক গুরুজ মারে একেক যে স্থানে
সেই সে গুরুজ সব ঠাঠা বিজুলির
গুরুজের ঘাতে হএ সহস্রেক চির।
তবেত শাণিত হএ মেঘের সাজন
বরিখএ জলধারা করিয়া গর্জন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন : দুনিয়া পত্তন কাহাত, কাহাত নিমজ্জন ?

উত্তর : গদা কহে খোয়াজের হতে উৎপন
আখেরে খোয়াজের হাতে হৈব নিমজ্জন!

প্রশ্ন : সপ্ত আসমান হৈছে এ সপ্ত জমিন
কা হতে প্রচার হৈছে কহত সৃজন ?

উত্তর : গদা কহে মোহাম্মদ হতে সর্বকথা
প্রচার হৈছে আকাশ-ভুবনের কথা।

রুহ্ ও আত্মা পাঁচ প্রকার : হায়ওয়ানী, রহমানী, সোবহানী, সুলতানী ও হাবিলী।
উস্তাদ মাহাত্ম্য : উস্তাদ অন্ধের আক্ষি শুন নরগণ।

প্রশ্ন : আল্লাহ্র শের, নবীর শের বোলএ কাহারে ?

উত্তর : আল্লাহ্র শের জান আলিম-খলিফা,
রসুলের শের জান মোহাম্মদ হানিফা।

নামাজ-রোজা-এল্‌ম হচ্ছে যথাক্রমে স্তম্ভ, বেড়া ও চাল :
নামাজ দীনের 'ঠুনি' বোলএ ফকিরে।
রোজা দীনের টাটি জানিও নিশ্চএ
এলেম দীনের ছানি ফকিরে যে কএ।

AMARBOI.COM

প্রশ্ন : দুনিয়াতে মানুষ ছোট, ধনী-নির্ধন হয় কেন ? অল্পায়ুই বা হয় কেন?
উত্তর : আল্লাহ্ মানুষের রুহ বা আত্মা সৃষ্টি করে স্তূপাকার করে মজুদ রেখেছেন। সেগুলো 'তপজপ করে নিত্য' এবং 'অবিরতভাবে প্রভু একমন চিত্ত'। এবং এই তপস্যার পুণ্যানুসারেই অর্থাৎ—

যেবা যত তপ কৈল তার তত পদ
দুনিয়াত আসি পাএ এ সুখ সম্পদ।

আর : যে সকল বালক মরএ পৃথিম্বিত
সে সকল মনুষ্য নহে জানিও নিশ্চিত।

তারা ফিরিস্তা, এবং
দুনিয়া দেখিতে তারা আসিয়া থাকএ।
যতদিনের আউ-বাউ লৈয়া আইসএ
ততদিন বাদে পুনি মউত যে হএ।

কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তামাক সেবন :
গদা কহে যেই ক্ষণে কলির প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্ন হতে তামাকু জানিব বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ-বালকের রহিব জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিতে চলিতে লোকে পিব পথে পথে।
পিতায় তামাকু পিতে পুত্র্যেকরে আশ
তামাকুতু করিবেক ভুবন বিনাশ।

কবি আফজাল আলিও তাঁর 'নসিহত নামায়' তামাকের নিন্দা করেছেন এবং 'তেরোশ' হিজরি সনের অর্থাৎ আখেরি জামানার লক্ষণ বলে জেনেছেন। এছাড়া হুক্কাপুরাণ (সাহিত্য বিশারদ) এবং তামাকুপুরাণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও 'পুরাতনী'— নলিনীনাথ দাশগুপ্ত) গ্রন্থ রচিত হয়েছে দেখতে পাই।

কলিযুগের অন্যান্য লক্ষণ :

ক. লোকে মিছাকথা কইব দিনে চারিশত বার
বে-ইমান হৈব লোক সংসার মাঝার।
খ. নারী পুরুষের মধ্যে ভেদ না থাকিব
পুরুষে নারীর কথা ধরিয়া চলিব।
পুরুষের কথা কভু নারী না ধরিব।
গ. বাপে পুতে দ্বন্দ্ব করিব প্রতিদিন–
ঘ. সোয়ামীর সহিতে নারীর না রৈব পিরীত। ইত্যাদি–
ঙ. অকুলীন কুলীন হৈব কুলীন হৈব হীন
চোর উজ্জ্বল হৈব সাধু হৈব মলিন। ইত্যাদি।
চ. বিঘৎ-প্রমাণ জান নর সব হৈব।

কেয়ামতের সময় :

চল্লিশ দিবস জান আখেরের সমএ
বরিখিব মুঘলধারা জানিও নিশ্চএ।

তারপর হাসরে ভেহেস্তের হুরেরা এগিয়ে এসে পুণ্যবানদের অভ্যর্থনা করে নেবে, —

কেহ নানা যন্ত্রবাদ্য বাজাইব আনন্দে
মঙ্গল গাহিব কেহ মিলিব সানন্দে!

আলিমের মর্যাদা :

আলিম দেখিয়া যেবা সালাম না করএ
ভিহিস্ত না পাইব সে আখের সমএ।
আলিমের সনে যেবা করএ বড়াই
সত্য সত্য হইব তার দোজখেতে ঠাঁই।

নরক যন্ত্রণা, পাপীর শাস্তি ও ভিহিস্তের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্‌র হুকুম যে রদ হবে না—পরিবর্তন হবে না, তার প্রতীকী ইঙ্গিত হবে :

ততক্ষণে এক অজা আল্লা-আজ্ঞাএ আনি
সেইক্ষণে ফিরিস্তাএ করিবা কোরবানী।

গদা মালিকার বিয়ের সময় :

নানা বাদ্য ধ্বনি আছিল বাজিতে
মেঘের গর্জন সম ভয় লাগে চিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদ্যও বিচিত্র : ঢাক-ঢোল, নাকাড়া, দামামা, বিউগুল, সানাই, কন্নাল ভেউর, রামশিঙ্গা, ডম্বুর, ঝাঞ্ঝারী, মৃদঙ্গ, তাম্বুরা, মুরলী, কবিলাস, দোতারা, মোরচঙ্গ, মন্দিরা, সারিন্দা প্রভৃতি। এসঙ্গে—

চলিতে চলিতে কেহ গাএ নানা গীত
বাজিকর নাটুয়া যাএ সকলে মিলিয়া।

গজারোহণে গদা বিয়ে করতে গেল, মহা ধুমধামে মহোৎসব হল। যথারীতি মারোয়া তৈরি হল, জুলুয়া দেয়া হল এবং বর-কনে গেরোয়াও খেল্‌ল। মধুর দাম্পত্য এভাবেই হল শুরু।

গ. গোপীচাঁদের সন্ন্যাস

শুকুর মাহমুদ বিরচিত
১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে রচিত

কবি আবদুস শুকুর মাহমুদ রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে স্থিত 'সিন্দুর কুসুম' গাঁয়ের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শেখ আনোয়ার ফকির। কবি ১১১২ বঙ্গাব্দে তথা ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থ রচনা করেন। এ কাব্যে যোগতত্ত্বের সঙ্গে অনেক সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পার্বণিক আচার-আচরণের এবং রীতি-পদ্ধতির কথাও রয়েছে।

ষষ্ঠীপূজা ও কোষ্ঠী : ছএদিনে করাইল ছাইলার ষষ্ঠীর বার।
পণ্ডিত লেখিল কোষ্ঠী করিয়া বিচার॥
পণ্ডিত পাঠক যত মহন্ত গোসাঞি।
পুরাণ বিচারিয়া লেখে কোষ্ঠীর প্রমাঞি।

নামকরণ অনুষ্ঠান : ধন মাল গাভী দান অতি দান অন্ন।
একত্রিশ দিবসে করে বালকের নামকরণ॥
জ্ঞাতি কুটুম্ব যত আর পুরোহিত।
নিমন্ত্রণ করিল মুনি সকলের পুরিত॥

অন্নপ্রাশন : পঞ্চমাসের বালক হইল যখন
মানিকচন্দ্র করে পুত্রের অন্নপ্রাশন॥

বাল্যবিবাহ : যখন হইল বালক দ্বাদশ বৎসর।
বিবাহ করাতে চিন্তা করে রাজ্যেশ্বর॥

উত্তর বঙ্গে বিবাহে পাতিল ডুবানো অনুষ্ঠান :
শুভলগ্ন করিয়া পাতিল ডুবাইল॥
হরিদেব করিল এথা মঙ্গলাচরণ॥

বিয়ের বাজনা : ঢাক ঢোল বাজে আর ধাঙসা নাকাড়া।
দক্ষিণী জোড়খাই বাজে কাড়া টিকারা।
রণশিঙ্গা ভেউর বাজে হইয়া এক সঙ্গ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃকুল সহরে হইল বিভার বাদ্যের রঙ্গ॥
খোল মৃদঙ্গ বাজে নারদী মন্দিরা।
মোহন মুরারী বাজে সারিন্দা দোতারা॥
রবাব পিনাক বাজে মুচঙ্গ তম্বুরা।
বাঁশী মনোহর বাজে মোওয়ারি ঝুঞ্জুরা।

বিয়ের সজ্জা :
চারি দিকে চারি সারি কদলী রুপিল॥
আলিপন রেখ দিল দেখিতে শোভিত।
নৃত্য করে নর্তকী গাইনে গাএ গীত॥

বরস্নান :
সুগন্ধ চন্দন দিয়া স্নান করাইল॥
রাজবস্ত্র অলঙ্কার অঙ্গে পরাইল।
সুবর্ণ দোলাএ রাজাক তুলিয়া লইল॥

যৌতুক :
যৌতুকে করিল দান রজত কাঞ্চন॥
শ্বেত নেত বস্ত্র দিল আর জামা জোড়া।
চড়িয়া বেড়াইতে দিল তাজি নামে ঘোড়া॥
জল পথের দিল মান্য নৌকা জলকর।
যাহার উপরে আছে সুবর্ণের ঘর॥

গুরু আপ্যায়ন :
গলাএ বসন দিয়া চরণ বন্দিল॥
বসিতে আনিঞা দিল যোগের আসন।
ভিঙ্গারের পানি দিয়া ধোয়াল চরণ॥
চরণেতে জল দিয়া আসনে বসিল।
চরণ বন্দিয়া মুনি সাক্ষাতে বসিল।

যোগীর বেশ :
কপাটি পরিয়া সিদ্ধা কমর বান্ধিল।
রুদ্রাক্ষের মালা তবে গলাতে তুলি দিল॥
কপালে পরিল রক্ত চন্দনের ফোঁটা
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল গলে যোগ পাটা॥

বামাবর্জিত যৌগিক সাধনা :
স্ত্রী লইয়া [যেবা] করে সংসারে বসতি।
অমর হইতে পারে কিতার শকতি॥
রাজ্য করে গুপীচন্দ্র লইয়া চারি নারী।
কিমত প্রকারে তাহাকে জ্ঞান দিতে পারি॥
নারী পুরী ছাড়ি যদি হএ দেশান্তর।
সেবক করিয়া তখন করিব অমর॥
গলা ক্ষেতা পরাইব দ্বাদশ দিব হাতে।
মস্তক মুড়াইয়া দাঁড়াইবে রাজপথে॥
মুখেত ভস্ম মাখি যুগী হইয়া যাএ।
তখনি করিব সেবক কহিলাম নিশ্চএ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ বিনাশক রতি ও নারী :

হাটের নারী ঘাটের নারী নারী প্রতি ঘরে।
যত পুরুষ দেখ সবে নারীর বেরণ করে॥
সহস্র ফোঁটা রক্তে হএ রতি মহারস।
সে ধন ফুরাইলে পুরুষ হএ নারীর বশ॥
সিংহের আকার নারী ব্যাঘ্রের মত চাএ।
হাড় মাংস শরীরে থুইয়া মহারস টানি লএ॥
পুরুষ ধন লৈয়া নারী বেপার করে।
লোভেতে থাকি পুরুষ সব বেগার খাটি মরে॥

বর্ণ-বিদ্বেষ :

যেই মাত্র শুনিল গুপী হাড়িপার নাম।
কর্ণে হাত দিয়া রাজা বলে রাম রাম॥
হাড়িপার কথা শুনি কান্দিতে লাগিল।
মুখের তাম্বুল রাজা তখনে ফেলিল।
গুপীচন্দ্র বলে মাএ গেল জাতি কুল।
হাড়ির সেবক হব আর নাহি মূল॥
মালী তেলী আছে কত কায়স্থ কুমার।
বৈদ্য গোওয়াল আছে মাও নাপিত কামার॥
ব্রাহ্মণ সুজন আছে সবার প্রধান।
এসব থাকিতে আমি লবো হাড়ির জ্ঞান॥

যোগীর খাদ্য :

আতপ চাউলের অন্ন থালেতে ভরিনু।
বার বছরকার শুকুতা নিম তাতে মিশাইনু॥
সিদ্ধা মহন্ত যোগী পান নাহি খাএ।
পানের বদলে তারা হরীতকী চাবাএ॥

পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব :

এহিত সংসারের মধ্যে আছে যত লোক।
কোন পুরুষ হইয়াছে নারীর সেবক॥
জন্মিলে মরণ আছে সর্ব শাস্ত্রে কএ।
আমি হইব স্ত্রীর সেবক মরণের ভএ॥
তোমার পিতা বলে আমি প্রাণে যদি মরি।
তবুত স্ত্রীর সেবক হইতে নাহি পারি॥

দেহতত্ত্ব :

শুন বাছা গুপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইন শুদ্ধ হইলে নৌকা না লইবে পানি॥
খাকের খুঁটি নৌকার টাটী আবের গড়া।
পবনে গুণ টানে নৌকা আতসের মোড়া॥
অসারেরে সার করি কেন রহিলি ভুলি।
মরিলে খাইবে মাংস শকুন শৃগালী॥
কাক কাণ্ডারী নাএর শকুন ভাণ্ডারী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৃগালে বলেন আমি নাএর অধিকারী॥
দুইখানি চৌউর নাএর বৈঠা দুইখানি।
ভমরা সাক্ষাতে বৈসে আছে নৌকার দেয়ালি॥
পাঁচ পণ্ডিত লৈয়া মনুরাই বৈসে হৃদয়ে।
জ্ঞান সাধ ধ্যান কর পাইবা পরিচয়॥
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাএ অন্যঘাটে।
বাছিয়া লাগাও নৌকা নিরঞ্জনের ঘাটে॥

পাশাখেলা : চারি রানী খেলে পাশা হরষিত হৈয়া।

কেশবিন্যাস : চিরুনি লইয়া করে ধরিয়া মাথার 'পরে
চিরে কেশ করিয়া যতন।
গাঁথিলেক মাথার বেণী যেন হইল নাগের ফণী॥
মঞ্জুর বান্ধিলেক খোঁপা
তাতে কদম্ব ফুল আগর কস্তুরী তুল
জাদ দিল মাণিকের ঝাঁপা।

অলঙ্কার : বাহে তার 'পরে বাজুবন্ধ।
বাজু পরিল যাত তাহা আর কব কত
তাহাতে দিব্য পুষ্প মকরন্দ॥
নগরি পঁউছি সাজে শঙ্খ কঙ্কণ বাজে
অঙ্গুলে পরিল অঙ্গুরী
পরিল লক্ষের সাড়ী বসন্ত কুসুম বেড়ি।
যেন দেখি চন্দ্রের পুতলি
চুলটি উছটি যত বাঁক পাতা মল কত
পাএ পরে সুবর্ণ পাশলী॥

প্রসাধন সামগ্রী : আগর চন্দন চূয়া মুকতা কস্তুরী।
সুবেশ করিয়া [অঙ্গে] পরে চারি নারী॥
আতর গোলাপে অঙ্গ করিল ভূষিত।

অষ্ট অলঙ্কার : অষ্ট অলঙ্কার নহে যে পেটারী ভরিব।

ভণ্ডযোগী : তোমার বাপের যুগী সদাএ জাএ শুঁড়ি পাড়া।
মদ খায়া নিন পাড়ে শুঁড়ির দামড়া॥
মদ খায়া মত্ত হএ নাহি জানে জ্ঞান।
নাহি সেবে গুরুর পদ না [হি] করে ধ্যান॥

ছদ্মযোগী : স্ত্রী সঙ্গে করি যদি হইবে সন্ন্যাসী।
সর্বলোক কহিবে আমাক ভণ্ড তপস্বী॥
নারী সঙ্গে করি যে জন যুগী হয়া যাএ।
মাগুয়া যুগী করি তাকে সর্ব লোকে কএ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান-সুপারি : অখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান।

অন্ন ব্যঞ্জন : একভাত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধিল তুরিতে॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধে নানান প্রকার।

সিদ্ধিভক্ষণ : শূন্যরাজে আনিয়া সিদ্ধির ঝুলি দিল॥
সোওয়া মণ সিদ্ধির গুঁড়া লইল বাম হাতে।
সোওয়া মণ ধুতুরার বীচি মিশাইল তাতে॥
সোওয়া মণ কুচিলার বীচি একত্র করিয়া।
মুখেতে তুলিয়া দিল শিবের নাম নিয়া॥

যোগ সাধনায় দীক্ষা ও যোগীবেশ :
পুত্রকে যুগী করে এথা মঞেনামতী রাই।
নাপিত আনিএগ রাজা [র] মস্তক মোড়াইল
গলে ক্ষেতা দিয়া মুখে ভূষণ চড়াইল॥
বগলে বগলী দিল সিংহনাদ গলে
রক্ত চন্দনের ফোঁটা পরাইল কপালে॥
চকমকি পাথর দিল বটুয়া আধারী।
ঘোর মেখলি দিল বসের খাপুরী॥
গলেতে পরিতে দিল রুদ্রাক্ষের মালা।
কটিতে পরিতে দিল বাঘাম্বর ছালা॥
কঞ্চু চক্রি সন দিল দ্বাদশ দিল হাতে।
গুরু সেবিতে রাজা যাএ মাএর সাথে।
ঝুড়ির ভিতরে দিল কড়িকুশ বুড়ি।
বসের থলি পুরিয়া দিল সিদ্ধি খাওয়ার গুঁড়ি॥

নৃত্য : তাল ঝুনঝুনি খোল মৃদঙ্গ শুনি
করে কত কত কাল।
শতেক নাচনে নৃত্য সর্বজনে
পদের সাথে সাথে তাল॥
পাএর নেপুর ঝুমুর ঝুমুর
চলিতে সুনাদ শুনি।
গাএন গাহিনী ছত্রিশের রাগিণী
ছয়রাগ লইয়া পুরে॥

কড়ি ও নাড়ু : মুদির দোকানে ছিল কড়ি একুশ বুড়ি।
সিদ্ধির নকুল খাইল কামেশ্বরের বড়ি॥
কামেশ্বরের নাড়ু খাইয়া আনন্দিত হইল।

বেশ্যার সজ্জা : পাইয়া রাজাক বেশ্যা হরষিত মন।
নানান অলঙ্কারে বেশ্যা করিল আভরণ॥
রত্নের পেটারী বেশ্যা খসাইয়া আনিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথাতে যেহি সাজে বেশ্যা পরিতে লাগিল॥
হস্তে করি নিল বেশ্যা সুবর্ণের চিরুনি।
মস্তকের কেশ চিরি গাঁথিল বিয়ানী॥
গন্ধ পুষ্প তৈল বেশ্যা পরিল মাথাতে।
সুবর্ণের জাদ বেশ্যা পরিল খোঁপাতে॥
কাম সিন্দূরের ফোঁটা পরিল কপালে।
দিননাথ উদিত যেন প্রভাতের কালে॥
গৌর বরণ বেশ্যার দীপ্ত করে তনু।
কপালের সিন্দূর যেন প্রভাতের ভানু॥
জোড় ডোঙের মধ্যে পরে তিলকের ফোঁটা।
সিন্দুরিয়া মেঘে যেন বিজলীর ছটা॥
নঞানে কাজল পরে মেঘের মনে বাদ।
লক্ষের বেশর বেশ্যা পরিল নাসিকাত।
মন্ত্র পড়িয়া তৈল মাখিল বদনে।
আঁখির ঠমকে জ্ঞান হরে যুবক জনে॥
অধর শোভিত কর্ম কর্পূর তাম্বুলে।
দশন ভ্রমর যেন বসিল কমলে॥
পান খাইয়া বেশ্যা মদন মুরলী।
বুকের উপরে যেন চম্পকের কলি॥
চিকন মাঙ্গা দিঙ্গল কেশ বাএ হালে গাও।
পুরুষের মন হরে শুনি মুখে রাও॥
কপালের সেঁতিপাটি হীরায় জড়িত।
কিঞ্চিত হাসিতে যেন তারা বিকশিত॥
গলেতে পরিল বেশ্যা শ্বতেশ্বরী হার।
সুবর্ণের প্রদীপ যেন জ্বলে অন্ধকার।
বাহু মৃণাল যেন লক্ষ চাম্পার কলি।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহে পরে কলি॥
করেত কঙ্কণ যেন নিশানাথের শোভা।
হৃদএ কনক স্তন অতি মনলোভা॥
অপূর্ব কাঁচলী পরে বুকের উপরে।
দেখি দুই স্তন যুবকের মন হরে॥
কমরে পরিল বেশ্যা লক্ষ মূল্যের শাড়ী।
রসিক জনের মন বেশ্যা নেএ হরি॥
কর্ণেতে পরিল বেশ্যা হীরাধর কড়ি।
আঁখি ঠারে মুচকি মারি মন্মথএ কাড়ি।
বাঁকপাতা মল পাএ সুবর্ণের পাসলি।
যুবক পাইলে বেশ্যা মন করে চুরি॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গন্ধর্ব চন্দনে অঙ্গ করিল ভূষিত।
মধু লোভে অলি ধাএ দেখিলে কিঞ্চিত।

আসন ও আসর :

পাট বস্ত্র আনিয়া বেশ্যা রাজার তরে দিল॥
শীতল মন্দির ঘর হিঙ্গুলের রঙ্গ।
তাহাতে বিছায়া দিল সুবর্ণ পালঙ্গ॥
পালঙ্গ বিছায়া বেশ্যা না করে আলিস।
আশে পাশে গির্দা দিল শিয়রে বালিশ॥
সুবর্ণের বাটাতে দিল তাম্বুল ভরিয়া।
সুবাসিত জল থুইল ভিঙ্গার ভরিয়া॥
উপরে টানিয়া দিল ফুলের চান্দয়া।

দাসের কাজ ও খাদ্য :

পানি আনে কাষ্ঠ কাঠে গৃহে দেএ ছড়া।
ভক্ষণ করিতে পাএ একপোয়া চিড়া॥

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা : [তুল : চর্যাপদ]

বাসাতে ছাও নাহি সদাএ উড়ে পড়ে।
নগরেত মনুষ্য নাহি বসতি চালে চালে॥
পুকুরেতে পানি নাহি পাহাড় কেন চোবে।
অঞ্চলে দোকান দেএ খরিদ করে কালে॥
চূড়ায় নূপুর বাজে কাঁকালে বাঁশী বাএ।
মকর কুণ্ডল তিলক আজ্ঞাএ তার পাএ॥
ক্ষীরোদ মকর মণি কাছে কাছে দোলে।
এহি বড় অপূর্ব চন্দ্রেক রাহু গিলে॥
কি করিতে পারে শ্রীনগরের কোতয়ালে॥
মকসের পশর হইল শকুন রাখালে॥
ভরিল ইন্দুরে নাও বিড়াল কাণ্ডারী॥
শুতিয়া আছে ব্যঙ্গ ভুজঙ্গ প্রহরী॥

বলদ প্রসব হইল গাই হইল বাজা।
বাছুরেক দোহাএ তাহার দিন তিন সাঁজা॥
ছঞ্চার পানি ফুটি টুঞি করিয়া ধাএ।
শুয়া পক্ষি বসিয়া বিড়াল ধরিয়া খাএ॥

শৃগাল হইয়া সিংহের সঙ্গে যুঝে।
কোটিকের মধ্যে গুটিকে তাহা বুঝে।
তবুত কোন লোক না বুঝে সন্ধান।
ডুবিল সোনার নৌকা ভাসিয়া গেল জান॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. নসিয়ত নামা

আফজল আলি বিরচিত (আঠারো শতক) [মৎ-সম্পাদিত]

আফজল আলি চট্টগ্রামের সাতকানিয়া অঞ্চলের কবি। স্বধর্মীয় সমাজহিতৈষণার প্রেরণাবশে তিনি শাহ্ রুস্তম নামের এক দরবেশের তত্ত্বোপদেশ স্বপ্ন-দর্শনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য, সমকালীন শরিয়ত-বিরোধী লোকাচার ও লোকচরিত্রের নিন্দাই তাঁর এ-গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অসংকোচে কাল্পনিক শাস্ত্র ও স্বপ্ন তৈরি করেছেন। লোকহিত কিংবা সমাজ-সংস্কারের সদুদ্দেশ্যেও যে মানুষ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এ-গ্রন্থ তার এক বাস্তব দৃষ্টান্ত।

কলি যুগের মানুষ :

বার সদীতে জন্মিতের সদী পাইছে
যে সকল লোকে দৌ-আঁসলা হইয়াছে।
তের সদীতে জন্ম যে সকল হইব
খানে দজ্জালের নায়েব সে সকল হৈব।

গয়েবী ফকির :

গয়েবের ভেদ যত আল্লায় জানন্ত
আল্লার সদৃশ হই গয়েবী কহেন্ত।
গয়েবী ফকির যেবা তারিফ করএ
দোজখেত সে সকল তাড়িব নিশ্চএ।
কলিযুগে গয়েবী ফকির বহু হৈব
বাম পাশে ইব্লিসের পর্দা ফাড়া যাইব।

ভাগ্যগণনা [ফালানামা ও গণনা] :

কাহার যদি সে হইল ব্যারাম গাএ
আল্লা ছাড়ি খোন্দকার খলিফা কাছে যাএ।
ফালনামা চাহি বোলে 'আসর' হইছে
মঘিনী মোহিনী কিবা দেবতা পাইছে।
নতু বোলে পরীর আছর হইয়াছে
হেনমত কহি যদি ডালি তুলি দিছে।
কোরানে কাফের তারে বোলএ সর্বথা।

ডালি :

দেও পরী ডালি দিছে যথ মুসলমান
থাকিব দোজখে দুঃখ পাইব নানামত।

তামাক সেবনের নিন্দা :

তামাকুর পায়রবী করএ পঞ্চজন
তামাকু যে ক্ষেতি করে, যেবা মাখি দিছে
যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে।
আর যে সকল ভক্ষে এই পঞ্চজন
হিসাবেত 'ছেহা' বর্ণ হইব বদন।
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ
শ্বশুরে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভণ্ড ফকির : অ-চরিত্র দেখি বেশ এই জামানার
বহু বহু লোক ফকিরের বেশ লইয়া
রাজ্য রাজ্য ভ্রমিবেক ফকির বুলিয়া।
হস্তে বাঁকা ছড়ি লই গাল দিছে হেলি
শিরে কালা পাক খণ্ডি বগলে লএ তুলি
হস্তে ছড়ি গলে তজবী শিরে দীর্ঘ চুল
বেশ দেখিয়া যেন লাগে ফকির মকবুল।
রাত্রি হৈলে তবে এক বাড়ীত যাইব
ফকির জানিয়া লোকে তবে জাগা দিব।
নিশি ভাগ হৈল যদি সেই পাপমতি
যে গৃহীর ঘরে সিঁদ দিব শীঘ্রগতি।
তবে তার যথেক সম্পদ নিব হরি।

পরিহার্য পঞ্চজন : সরাবী যে ভাঙ্গি, জাঙ্গি, ঢঙ্গি, বেনামাজী
এই পঞ্চজন সঙ্গে প্রীতি না করিবা বুঝি।

AMARBOI.COM

ঙ. ফকির গরীবুল্লাহ

দোভাষী শায়ের

১৭৬০-৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি সোনাভান, জঙ্গ-নামা, ইউসুফ জোলেখা, সত্যপীর পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করেন। হুগলি জেলায় তাঁর জন্ম।

অলঙ্কার :

গলায় সোনার হার কাঙ্গনের শোভা তার
আগুপিছু শোভা করে ঝাপা।
হেন নথ নাক মাঝে গজমতি তাহে সাজে
ছেড়ে শোভা কনকের চাঁপা॥
কপালে মানিক পঠি গাঁথিয়া বান্ধেন চুটি
যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল 'পরে চন্দ্র যেন শোভা করে
বক্ষ বান্ধে সোনারূপার ডোড়া॥
পায়েতে নূপুর দিল অন্ধার উজার হল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি।

হেনকালে সহর হইতে আইল এক বুড়ী॥
জোলেখার আগে আইল হাসিয়া হাসিয়া।
পরিয়া পাটের শাড়ী পান গুয়া খাইয়া॥
তাড়বালা বাজুবন্দ হৃদয় কাচুলি।
হাতেতে কার চুড়ি পায়েত পাশলি॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাচ-গান :

জোলেখা হুকুম দিল করিতে লগন।
নাচগীত আনন্দিত বেহার ছামানা॥
আজিজ জোলেখা দোন হইল দেখা শুনা।
নাচগীত আনন্দিত বিহার ছামানা॥
নানা রঙ্গে নাচে দু'দলের মাঝ।
কামানে পলিতা দেয় বন্দুকের আওয়াজ॥
লস্করে লস্করে খেলে করিয়া পায়তারা।
দোতরা সারঙ্গী বাজে ঢোলক মন্দিরা॥
ময়ূরের কাছে নাচে ময়ূরী ঘুরিয়া॥
গায়েন যে গীত গায় ডুবকি বাজায়।
আজিজের হাতে দাই সঁপে জোলেখায়।

(ইউসুফ জোলেখা)

হোলি :

ডাড়ুয়া নাটুয়া লোক মেলুক আসিয়া।
জরদ গোলাপী রঙ পিচকারী করিয়া॥
দিবেক সবার গায় যে আসিবে হেথা।
এমাম করেন বেহা কেবা এই কথা॥

বিবাহোৎসব :

যাইয়া দেখিল বাদ্যি বাজে সাদীয়ানা।
ঠাঁই ঠাঁই নাব গীত পাকে খানাপিনা॥
বাইজীগণ নাচে, গীত গায় রাগে রাগে।
রঙের পিচকারী ছাড়ে গায়ে এসে লাগে॥
ভাড়ুয়া রোমজানি কত করে নানা বাজি।
পুছিতে কহিল এমামের সাদী আজি॥

(জঙ্গনামা)

অলঙ্কার :

১. সেই মর্দ দিবে মোরে অষ্ট অলঙ্কার॥
তারবালা বাজুবন্ধ গলায় হাসুলি।
সিঁতেপাটি চন্দ্রহার পায়েত পাসুলি॥
কানে কানবালা দিবে গলায় দিবে হার।
হাতে চুড়ি পৌছি আর পাজের সোনার॥

(সোনাভান)

২. দেলে বড় হয়ে খুশী তামাম ছেহেলি আসি
দেলে খায় করেন সেঙ্গার॥
নথ ও সেঙ্গারে সাদ কোঠনে সোনার চাঁদ
গলে দিল গজমতি হার
নাকেতে সোনার নথ মতির জড়িত কত
রত্নশনি করে ঝলমল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানেতে কনকপাতি   হীরালাল তার সাথি
ঝলমল গগন উজ্জ্বল॥
হাতেতে কাচের চুড়ি   বাওটি কামের বেড়ি
কাঙ্গনে কনক তার শোভে।
পিঠ পরে পিঠ ঝাপা   মাথার সোনার চাঁপা
মুনিমন ভুলে যায় শোভে॥

(ইউসুফ জেলেখা)

৩. গলায় সোনার হার   কাঙ্গনের শোভা তার
আগুপিছু শোভা করে ঝাপা।
হেন নাথ নাক মাঝে   গজমতি তাহে সাজে
ছেরে শোভা কনকের চাঁপা॥
কপালে মানিক পটি   গাঁথিয়া বান্দেন চুটি
যেন শোভা আকাশের তারা।
তিলক কপাল পরে   চান্দ যেন শোভা করে
বাদ বান্দে সোনা রূপার ডোরা॥
পায়েত নূপুর দিল   অন্ধার উজালা হইল
বেশ যেন জিনিয়া পুতলি।
ছিরি তার ওঠে ডাল   আন্ধারেতে হইল আলো
বিজলি সমান ঝিলিমিলি॥

(আমির হামজা)

৪. নয়নে কাজল দিয়া কপালে সিন্দূর।
জেলেখার বেশ যে চমকে চিকুর॥
তার ঝাপা ঝজুবন্দ হৃদয়ে কাঁচুলি
গলে গজমতি হার করে ঝিলিমিলি॥

(ইউসুফ জেলেখা)

বুড়ী বলে বাজারেতে   কড়িপয়সা নিয়া সাথে
যাব বাবা শোন মোছাফির॥
হানিফা কহেন বুড়ী   লিয়া যাও কত কড়ি
শুনে বলে কড়ি তিন পণ।

(সোনাভান)

অথবা
মুজুরি করিয়া আনে কড়ি তিন পণ।
পুছিবে কি হৈল কড়ি কি কব তখন॥

(সোনাভান)

তাহার ভিতরে বিবি আপনি যাইয়া।
ইউসুফ জেলেখা চিত্র করেন বসিয়া॥
হিঙ্গুলে হরিতাল দিল হাতেতে তুলিয়া।
একে একে চিত্র করে ভাবিয়া ভাবিয়া॥

(ইউসুফ জেলেখা)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সওয়া মণ আনে আটা সওয়া মণ চিনি
সওয়া মণ আনে দধি আর যে বিরণী॥
পাকা কলা আটা আদি তাহাতে ডালিয়া।
ভরিলে বাসন সব হালুয়া করিয়া॥
এক হাজার পান আর যে গুপারি।
আগর চন্দন চুয়া গোলাব কস্তুরি॥

(সত্যপীরের পুঁথি)

চ. বিবাহ মঙ্গল (গেরোয়া খেলা)

আইনুদ্দীন [মৎ-সম্পাদিত]

আদিম কৌম সমাজে মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্যের অবসানে গড়ে ওঠে পিতৃ বা বীজপ্রধান সমাজ। ক্ষেত্র ও বীজ প্রতীক অবশ্যই কৃষিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত। বিবাহরীতি প্রবর্তনের ফলেই যে ম্যাট্রিয়ার্কেল তথা মাতৃপ্রধান সমাজের বিলুপ্তি ঘটেছে এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। কেননা, বিবাহ এক বিশেষ সমাজচিন্তার প্রসূন। এই চিন্তার সহজে উন্মেষ হয়নি। এও এক বিশেষ মানবিক বোধ-বুদ্ধি ও রুচি-সংস্কৃতির অবদান।

জীব নির্বিশেষে না হোক, অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষুধা দ্বিবিধ : ঔদরিক ও মানসিক। ঔদরিক ক্ষুধা খাদ্যে নিবৃত্তি পায়, দেহের রক্ষণ ও পুষ্টির জন্যে তা প্রয়োজন। আর মানসিক ক্ষুধা রক্তের একপ্রকার চাহিদা মাত্র। এর নাম কাম। এটি সৃষ্টিসম্ভব, তাই অমোঘ।

আদিম মানুষ যতদিন প্রাণীবিশেষ ছিল, ততদিন কাম ছিল নির্ভেজাল দৈহিক। তার মানবিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ ঘটার সাথে সাথে তার চোখে রঙ ধরে— তার মধ্যে রূপতৃষ্ণা জাগে। এর পর কেবল বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হলেই তার চলে না, সাথে আকর্ষণীয় রূপ এবং যৌবনও চাই। শক্তিমান পুরুষ রূপসী ও যৌবনবতী ধর্ষণে হল প্রয়াসী। রূপ নিয়ে পুরুষে পুরুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামের এভাবেই হয় শুরু। তার অনেক পরে আসে জমি ও জেবর নিয়ে মারামারি হানাহানির পালা— তা অবশ্য জীবিকা-বিরল জনবহুল সভ্যসমাজের ব্যাপার।

এই প্রাণধ্বংসী দ্বন্দ্ব-কোন্দল-সংঘাত থেকে পারস্পরিক নিরাপত্তার অভিপ্রায়ে মানুষ-যে বিবাহ-রীতি চালু করেছে— নিঃসংশয়ে তেমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। তখনো প্রবর্তিত ধর্মের যুগ আসেনি। কাজেই এ হচ্ছে একপ্রকার সামাজিক চুক্তি যার নাম দেওয়া যায় Policy of non-interference। কারো সঙ্গে কেউ জুটে গেলে, সেই যুগলের জীবন নির্বিঘ্নে রাখা, তাদের উপর থেকে অন্যদের আকর্ষণ ও দাবি প্রত্যাহার করা এবং তাদের পারস্পরিক সম্ভোগে সামাজিক স্বীকৃতি দান প্রভৃতি সেই নিরাপত্তানীতির অন্তর্নিহিত শর্ত। কোন্দলে হনন এড়ানোর এই আশ্চর্য বুদ্ধি থেকেই সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ ও কল্যাণচিন্তার জন্ম।

সর্বপ্রাণবাদী জাদুবিশ্বাসী মানুষ সেদিনও নিশ্চয়ই কোনো অদৃশ্য শক্তির দোহাই মেনেছে, শপথ নিয়েছে কোনো শক্তির নাম উচ্চারণ করে এবং কোনো টেবোও হয়েছে সর্বজনমান্য। যেহেতু মানুষের কোনো বিশ্বাস সংস্কারের মৃত্যু নেই এবং যুক্তি-বুদ্ধি কোনো ভীরুতাকেই অতিক্রম করতে পারে না, সেহেতু পরবর্তীকালের প্রবর্তিত ধর্মের আশ্রয়ে, সৌন্দর্যপ্রিয় মনের প্রশ্রয়ে এবং বিকশিত সমাজের প্রচ্ছায় সেই আদিম মিলন লগ্নের নানা আকৃতি আজো রূপান্তরে ও সূক্ষ্মতায় বিবর্তিত তাৎপর্যে ও নতুন লাবণ্যে আমাদের সমাজে দৃশ্যমান হয়ে সংস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভ্যতর সমাজে স্বয়ম্বর প্রথা সেই আদিম-নীতির পরিস্রুত রূপায়ণ মাত্র। যতই দিন গেছে, স্থূল সম্ভোগ-বাঞ্ছা রুচি ও লজ্জার প্রলেপে ও পেলবতায় মধুর এবং উন্নততর জীবনবোধে ও সমাজসংস্থার ভিত হিসেবে মহৎ হয়ে উঠেছে। এই বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে আত্মীয়-সমাজ, গোত্রীয় চেতনা ও কৌম-জীবন। এই রক্তের বন্ধনে পবিত্রতা ও আনুগত্য আরোপিত হয়ে তা ঐহিক-পারত্রিক জীবনের অন্যতম নিয়ন্ত্রী শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়েছে। ফলে দাম্পত্যসুখ, বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য, ঘরোয়া দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারিবারিক বন্ধন, সন্তান উৎপাদন, ধর্মসাধনা, সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার প্রভৃতি নানা নীতি ও কৃতি সম্পৃক্ত হয়ে বিবাহপ্রথা আজকের জীবনযাত্রীর একান্ত অবলম্বন হয়ে উঠেছে।

জমি ও জরু চিরকালই বীরভোগ্য। বাহুবল, আত্মপ্রত্যয়, সাহস ও ভোগবাঞ্ছা যার আছে, সে-ই বীর। নারীরাও তেমন বীরেই হয় আকৃষ্ট। এককালে বীরেরা নারী হরণ করত, কায়িক শক্তি প্রয়োগেই প্রতিষ্ঠা করত নিজের অধিকার। তাই আজো বিয়েতে দোর আগলে বরকে বাধা দেয়ার রেওয়াজে সেই কৃতি ও স্মৃতি আচারিক মর্যাদায় রক্ষিত। উৎসব-পার্বণকালে মেলায় জীবনসাথী বেছে নেয়ার রেওয়াজ সুপ্রাচীন। সাধারণের স্বয়ম্বর সভা ঐ মেলাই। জলক্রীড়া, রাখীবন্ধন, মাল্যদান, পাণিগ্রহণ, হোলি প্রভৃতির মাধ্যমে যেমন পাত্র-পাত্রী নির্বাচিত হত, তেমনি অবিচ্ছেদ্যতার শপথ নেয়া হত— চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, ফুল, পশু, পাখি প্রভৃতি সাক্ষী রেখে। আবার রজ্জু কর্তন করে, মৃৎপাত্র ভেঙে, কিংবা গাঁঠছড়া বেঁধে এই বন্ধনের অমোঘতার ও স্থায়িত্বের প্রতীকী অনুষ্ঠানও সম্পন্ন করা হত। আবার দীর্ঘায়ু, স্থায়ী প্রীতি, প্রতুল খাদ্য, অমিত প্রজনন, অম্লান যৌবন, অবারিত বৃদ্ধি, বাঞ্ছাপূর্তি প্রভৃতির প্রতীক হয়েছে দূর্বা, ধান, মাছ, আমপাতা, কলাগাছ, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি। শুভকামনায় নিরাপত্তার প্রয়োজনে এবং আনন্দের আয়োজনে মানুষ প্রতীক ও অনুষ্ঠানের সংখ্যা অনেক অনেক বাড়িয়েছে।

বিবাহোৎসবে এ আগ্রহের মূল কারণ হয়তো মনস্তাত্ত্বিক। শৃঙ্গার রসে বঞ্চিত ও কৃতার্থ সবাই সমভাবে উৎসাহী। এ ক্ষেত্রে তৃপ্তি-অতৃপ্তি দু-ই সমভাবে বেদনামধুর এবং চিরনতুন ও সার্বক্ষণিক। তাই বিয়ে মাত্রই কেবল বর-কনের পক্ষে নয়, পরিচিত-পরিজন সবার পক্ষেই আনন্দের। সেজন্যে সম্পদগত সামর্থ্যানুসারে বিবাহোপলক্ষে আনন্দের আয়োজন বিবাহপ্রথারই সমকালীন। তারই ফলে বিবাহোৎসব আচার ও অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যে, বিভিন্নতায় ও বৈচিত্র্যে সামাজিক মহোৎসবের রূপ পেয়েছে। নাচ-গান-পান-ভোজন ছাড়াও এর আচারিক ও আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিপদ্ধতি ধর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে অপরিহার্য সামাজিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে উন্নীত হয়েছে। তাই বিবাহের পূর্বে ও পরে দীর্ঘদিন ধরে এ উৎসব চলত। আজকাল আবার নানা কারণে বিবাহোৎসব ঋজু ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে গেছে।

আলোচ্য 'পদবন্ধগুলোতে দুশো বছর আগেকার বিবাহোৎসবের একটি অনুষ্ঠানের বর্ণনা রয়েছে। মুসলিম ঘরেই তা জনপ্রিয় ছিল। শাহ্‌নজর কালে অর্থাৎ বর-কনের মিলন-লগ্নে এইসব ক্রীড়ার মাধ্যমে অপরিচয়ের শরম ও সঙ্কোচ পরিহার করা সহজ হত। সখা-সখী ও ঠাট্টার সম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের উপস্থিতি ও হাস্য-পরিহাসের মাধ্যমে বাসরের মধুমিলনের প্রস্তুতিপর্ব এভাবে হত অতিবাহিত।

বর-কনের শুভসাক্ষাতের জন্যে তৈরি হত সুসজ্জিত মঞ্চ। উপরে থাকত চাঁদোয়া। এই মঞ্চগৃহের নাম মারোয়া। আর ঐ শুভসাক্ষাৎ বা শাহ্‌নজরের নাম জুলুয়া। এই সময়ে বর কনেকে অভিনন্দিত করে যে-গান সমবেত কণ্ঠে গীত হত তার নাম জোলুয়া গীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর-কনে সখা-সখীর উপস্থিতিতে তখন পুষ্পস্তবক পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করে। গেরোয়া মানে ফুলের স্তবক। (তুল : ফুলের গেরোয়া সঘনে লুফএ– বৈষ্ণবপদ)। পুষ্প লোফালুফিতে অবশ্য হার-জিৎ ছিল, এ অনেকটা এ-যুগের 'ভলিবল' খেলার মতো। এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের রাস ও হোলির প্রভাবও ছিল। তারপর বর-কনে উভয়ে খেলত পাশা। তাতেও বরের যোগ্যতা যাচাইয়ের সুযোগ হত। তাছাড়া বর ঠকানো ধাঁধা-হেয়ালি এবং বরকে জব্দ করার নানা ফন্দি-ফিকিরের ব্যবস্থাও থাকত।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩ খ্রি.) তাঁর এক প্রবন্ধে আফসোস করে বলেছেন : "পূর্বকালে মুসলমানের বিবাহে বর-কন্যার মধ্যে পাশাখেলা ও গেরোয়া খেলা অনুষ্ঠিত হইত। ... এইসব অনুষ্ঠান বড় আমোদজনক ছিল। আমার ছোটকালে পাশাখেলা দেখিয়াছি মনে পড়ে কিন্তু গেরোয়া খেলা দেখি নাই। সেকালে এক একটা বিবাহে দীর্ঘদিন ধরিয়া কত রকমের কত আনন্দ-উৎসব হইত। অধুনা তাহা কল্পনার বস্তু হইয়াছে। —এখন এ দুইটি খেলার একটারও প্রচলন নাই। দৈত্যের (ইংরেজের) আগমনে অধুনা সকল রকম আনন্দ-উৎসব দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছে। কি সুখের দিন দৈত্যেরা আমাদের নষ্ট করিয়াছে। এ জীবনে টাকায় ছয় আড়ি (৯৬ সের) ধান্য ও তিন আড়ি (৪৮ সের) চাউল দেখিয়াছি আর আজ দেখিতেছি "টাকায় পাঁচসের ধান্য (মণ দশ টাকা) ও সোয়াসের চাউল।" ['কাফেলা'—কাজী নজমুল হক সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৩৫৮ সনে প্রকাশিত 'গেরোয়া খেলা' প্রবন্ধ।]

AMARBOI.COM

সংস্কার-প্রত্যয় উন্নীত হলে তা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানেও জাকাত, এবাদত, হজ, কোরানপাঠ, ইসলাম-প্রচার ও স্বর্গবাঞ্ছা প্রভৃতি মুসলিমের আবশ্যিক কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পদকার সহজ সাধনের পন্থা বাতলে দিয়েছেন— যেমন : চারবার সুরা 'ফাতেহা' পড়লেই জাকাত দানের পুণ্য, তিনবার সুরা 'কদর' আবৃত্তি করলে হজের পুণ্য, তিনবার সুরা 'এখলাস' আওড়ালে কোরানপাঠের ফল আর তিনবার কলেমা 'তমজিদ' পড়লে কাফেরকে ইসলামে দীক্ষিত করার সুকৃতি এবং তিনবার 'আস্তাগফের' আবৃত্তি করলে স্বর্গের অধিকার লাভ করা যায়। অতএব বর-কনে বাসরশয্যা গ্রহণের পূর্বে এসব সুরা-কলেমা পড়ে যাবে। এবং এই—

পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেত যাএ
পুত্র কন্যা যথ জন্মে তথ পাপ হএ।

মুসলিম দাম্পত্যের আদর্শ হচ্ছেন আলি ও ফাতেমা। তাই দম্পতিকে হিতাকাঙ্ক্ষীরা আশীর্বাদ করে :

আলি ফাতেমার যেহেন আছিল পিরীতি
তেন মতে রহি যাউক দোহান আকৃতি।"

নিকাহ্ মঙ্গল [বিবাহোৎসব]
[জুলুয়া, গেরোয়া ও পাশা]

। প্রস্তাবনা।

বিসমিল্লা নাম জান ত্রিভুবন সার
যাহার গৌরবে প্রভু সৃজিলা সংসার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথমে বন্দেগী করি সৃজন যাহার
মনিষ্য গন্ধর্ব আদি সৃজন তাহার।
সংসারে ব্যাপিত সে যে নৈরূপ নৈরেখ
অনন্ত মহিমা তান কেবা কহিবেক।
এনারী পুরুষ দোহ করিয়া সৃজন
নিজ অংশ রূপ দিয়া কৈলা সুলক্ষণ।
প্রভুর পরম সখা নবী মোহাম্মদ
যার হেতু ত্রিজগতে এ সুখ সম্পদ।
নিকাহ-বিভা রঙ্গে এ মহিমা যার
এহাতুন অধিক সুখ কিবা আছে আর।
আল্লার যে কৃপা স্থানে জান নারীগণ
তেকারণে পতির সনে করিতে মিলন।
তবে শুন মুসলমান শাস্ত্রের নিবেদন
শাস্ত্রনীতি করিলে সে পাপেতুন আমান।
একদিন পয়গম্বর আপনার ঘরে
আলি স্থানে দিলা বিভা বিবি ফাতেমারে।
পয়গম্বরে কহিছন্ত আলিত ব্যবস্থা
পঞ্চকর্ম করি যাইতে বিছানে সর্বথা।
পঞ্চকর্ম না করি যে বিছানেত যাএ
পুত্র কন্যা যথ জন্মে তথ পাপ হএ।
প্রথম করিবা দান সুবর্ণের তঙ্কা শত
দ্বিতীএ মক্কাত যাই কর এবাদত।
তৃতীএ সমাপ্ত করি পড়িবা কোরান
চতুর্থে জাহিল সব কর মুসলমান।
পঞ্চমে ভিহিস্ত রুজু হইবা সদাএ
এই মতে পঞ্চকর্ম করিবা আদায়।
তবে কহি শুন সবে কে করিতে পারে
উপদেশ কহিছন্ত যদি পারে করিবারে।
সুরত ফাতেহা যদি পড় বেদ'বার
সুবর্ণের শত তঙ্কা দান কৈলা সার।
হজ গুজারিতে যদি চাহ নিশ্চিত
তিনবার সূরা 'কদর' পড়িবা তুরিত।
কোরান খতম যদি চাহে পড়িবার
সুরত 'এখলাস' শাহা পড় নেত্র' বার।
যদি সে কাফির চাহ মুমীন করিবার
কলেমা 'তমজিদ' শাহা পড় নেত্র বার।
যদি সে ভিহিস্ত রুজু চাই হইবার।
ভাল মতে 'আস্তাগফের' পড় তিনবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পাছে বিছানেত করিবা গমন
প্রতি কাঞিএ বিসমিল্লা যে করিবা স্মরণ।
শোকরানা নামাজ পড়িবা দুই 'রাকাত'
কন্যার আঞ্চলের 'পরে প্রভুর সাক্ষাৎ।
তবে যদি যুবতী-পতি হৈল রঙ্গমতি
আউজু-বিসমিল্লা পড়ি ভুঞ্জিবা সুরতি।
প্রথমে চিবুক ধরি দুই উরু মাঝ
কোলে তুলি লৈলে কন্যা জান পুণ্যকাজ।

[গেরোয়া] জুলুয়া গান

এবে কহি শুন সবে রসিক সুজন
দামাদ কন্যার প্রতি জুলুয়া গাহন।
গেরোয়া খেলহ শাহা আনন্দিত হৈয়া
'শোকরানা' কহ শাহা এই কন্যা পাইয়া।

প্রথমে কনক পদ্মে গেরোয়া খেলাও
এর সম কৌতুকে শাহা গেরোয়া ফিরাও।

দ্বিতীয়এ গেরোয়া খেল রঙ্গিম বান্ধুলি
যুবতী ফিরাও পুনি নিজ কান্ত বুলি।

তৃতীএ গেরোয়া খেল মারুয়া গোলাল
যুবতী ফিরাএ পুনি যেন লাগে ভাল।
চতুর্থে গেরোয়া খেল কনকের জুতি
ফিরাইয়া খেল সতী পুরাউক আরতি।

পঞ্চমে গেরোয়া খেল চম্পা নাগরাজ
তুরিতে ফিরাও কন্যা করি ভাল সাজ।
ষষ্টমে গেরোয়া খেল মালতী নব যুথি
ফিরাইয়া খেল কন্যা লও নিজপতি।
সপ্তমে গেরোয়া খেল পুষ্প-বিরাজিত
শতবর্গ লঙ্গ আদি দাউদী সহিত?
পুষ্পের গেরোয়া শাহা দিলা কন্যার হাতে
হুর হৈল যেন কন্যা শাহার সাক্ষাতে।
অষ্টমে গেরোয়া খেল মন কুতূহলে
মণি মুক্তা রত্ন হার দেঅ কন্যার গলে।
এ শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যারে কর দান
লোকে যেন ধন্য ধন্য করুক বাখান।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেরোয়াল দূরে করি পতি পত্নী মিলিয়া
'সরবত' 'তাম্বুল' খাও পাটেত বসিয়া।
আলি-ফাতেমার যেন আছিল পিরীতি
তেনমত রহি যাউক দোহান আকৃতি।
চিরদিন নিরোগী হোক দোহজন
ধনে পুত্রে এ দোহান হোক প্রধান।
এ শাহা সুন্দরী প্রতি হৈতে অনুদিন
'খায়ের ফাতেহা' পড়ে কহে আইনদ্দিন।

আখের জুলুয়া
। পাশার রাগ।

জপ আল্লার নাম শেষ নবীবর
তার শেষে বন্দি যথ পীর পয়গাম্বর।
পুরুষ যুবতী যদি কেহ না জানএ
ফোরকান কিতাবে তারে হারাম লেখএ।
তৌরাত ইঞ্জিল আর জবুরত ফোরকান
এ চারি কিতাব মাঝে ফোরকান প্রধান।
আর পুণ্য জুমাহাবারে যে করে গোছল
গোরেত চেরাগ জ্বলে দেখএ সকল।

কলিমার হোন্তে দুঃখ পাইব তিনজন
একে একে কহি শুন তার বিবরণ।
প্রথমে পাইব দুঃখ জনক যাহার
তবে দুঃখ পাএ পুত্র স্বামী আপনার।

তক্তেত বসিয়া শাহা খেল পাশা শাইর
কেহ হারাএ কেহ পাএ সুবর্ণ কটোর।
কন্যাএ হারি দিলে অষ্ট অলঙ্কার
দামাদ হারিলে দিব ততেক বেভার।
প্রথমে পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল এক
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা দেখ পরতেক।
দ্বিতীএ পাশার ডাল পড়িয়া গেল ধুয়া
দামাদ কন্যাএ খেলে পাশা পিঞ্জরের শুয়া।
তৃতীএ পাশার ডাল শাহা পড়িয়া গেল তিন
দামান কন্যাএ খেলে পাশা শরীর মাত্র ভিন।
চতুর্থে পাশার ডাল পড়িয়া গেল চারি
দামাদ কন্যা খেলে পাশা করি সারি সারি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চমে পাশার ডাল পড়িয়া গেল পাঁচ
দামান কন্যাএ খেলে পাশা হস্তের ভাঙ্গিল কাচ।
ষষ্ঠমে পাশার ডাল পড়ি গেল ছয়
তুমিত নিলাজ বন্ধু মোর মনে লয়।
সপ্তমে পাশার ডাল পড়ি গেল সাত
তুমিত নিলাজ বন্ধু ঘন বাড়াও হাত।
অষ্টমে পাশার ডাল পড়ি গেল আট
পাটি বালিস পাইয়া শাহা আর মাগে ঘাট।
নবমে পাশার ডাল পড়ি গেল নয়
দামান কন্যাএ খেলে পাশা হস্ত করি লয়।

ঝড় পড়ে ফুটি ফুটি বিজলি পড়ে খরি
চল শাহা ঘরে যাই আল্লা নাম স্মরি।
দশমে পাশার ডাল পড়িয়া গেল দশ
দামান-কন্যাএ খেলে পাশা যেন লাগে খোশ।
'এয়াজদোহুম' পাশায় ডাল পড়ি গেল এয়াজদোহা
দামান-কন্যাএ খেলে পাশা জিনি গেল শাহা।

গেরোয়া খেলা

। বিসমিল্লাহের রহমানের রহিম ।

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন
দ্বিতীএ প্রণাম করি ফিরিস্তার গণ।
তৃতীএ প্রণাম করি রসুল আল্লার
নিমিষে সৃজিলা প্রভু সয়াল সংসার।
সৃজিয়া সয়াল প্রভু কৈলা আত্মপর
দ্বিজরাজ জিনিয়া বদন শাহার
পুষ্পের গেরোয়া মারে অমৃত সংসার।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
প্রথম গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

ফুলের যে মাঝে আছে ফুলের পঞ্চভাই
গেরোয়া খেলেরে শাহা চাঁদোয়া জামাই।
গলার গুন্থির হার পুষ্পপরিচয়
কৌতুকে মেলিয়া মারে পুষ্পপরিচয়।
তাহান পুষ্পের গেরোয়া পাইয়া তুলি লইল মাথে
ফিরাইয়া দেয় কন্যা দামাদের হাতে।
পুষ্পকে পাইয়া শাহা তুলি নৈল মাথে
ফিরাইয়া দেয় কন্যা দামাদের হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষ্পকে পাইয়া শাহা আপনার সুখ
সুগন্ধি কুসুম গেরোয়া দেখত কৌতুক।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
দ্বিতীএ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

যূথি জাতী মালতী যে করি সমতুল
কন্যাকে মেলিয়া মারে যত পুষ্পকুল।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
তৃতীএ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।
নবীন পুষ্পের বাএ অলি সুললিত
গেরোয়া খেলেরে শাহা লোকের বিদিত।
তপন ভরিয়া তুলে যত পুষ্পবর
পুষ্প উৎক্ষেপে শাহা শিরের উপর।
সন্তোষি জলুয়া যে করিয়া দিলুম সঙ্গে
ব্যাকুল কদম্ব মেলে কন্যা সর্ব অঙ্গে।
দামাদে গেরোয়া মারে সর্বলোকে দেখে
চতুর্থ গেরোয়া বুলি হিসাবেত লেখে।

বেল ফুল কদম্ব আর চম্পা নাগেশ্বর
দামাদে গেরোয়া খেলে দেখিতে সুন্দর।
চারি গাছ রাম কলা আমের হরতিত
ফিরাইয়া গেরোয়া খেলে পুরাউক আরতি।
শাহা দামাদ দামাদ বুলিরে তোম্মারে
গেরোয়া ভূষণ শাহা দেউরে কন্যারে।
গেরোয়া ভূষণ শাহা যদি কন্যা পাএ
অনুরূপ বেশ ধরি শাহার সঙ্গে যাএ।
শাহা দামাদ দামাদ বুলিরে তোমারে
হস্তের শ্রীঅঙ্গুরী দেউরে কন্যারে।
হস্তের শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যা পাএ
মাও বাপ ছাড়িয়া কন্যা শাহা সঙ্গে যাএ।

শাহ দামাদ শাহ দামাদ বুলিরে তোমারে
তোমার কণ্ঠের হার দেউরে কন্যারে।
তোমার শ্রীঅঙ্গুরী শাহা কন্যারে কর দান
লোকে যেন ধন্য ধন্য করএ বাখান।
তোমার শ্রীঅঙ্গুরী যদি কন্যাএ পাএ
মা বাপ ছাড়িয়া কন্যা শাহার সঙ্গে যাএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাত্রা : ছাড়িলাম মাতাপিতা আর সোদর ভাই
শাহার সমান দরদবন্দ্ সংসারেত নাই।

কাটাইলে কাটিয়া পানি সেরীত মাপিল
সেরীত মাপিয়া পানি ঘটেত ভরিল।
ঘটেত ভরিয়া পানি মারুয়া তলে রাখিল
বিসমিল্লাহ্ বলিয়া পানি শিরেত ঢালিল।
এহি দোন জনের জোড়া এমত সৃজন
প্রভুর সাক্ষাতে দোন করুক বরণ।
দামাদ কন্যা জান না হৈব ভিন
যাহাম ফাতেহা পড় কহে আইনদ্দিন।

ছ. তমিম গোলাল চতুর্ণ সিলাল (১৮ শতক)

মুহম্মদ রাজা বিরচিত

মুহম্মদ রাজার অপর কাব্যের নাম মিশরীজামাল। মুহম্মদ রাজা দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনীকাব্য রচয়িতা।

AMARBOI.COM

বাদ্যযন্ত্র : ঢাক, ঢোল, কাড়া যত কাঁসি, করতাল।
সানাই, বিগুল বাজে শুনিতে বিশাল॥
দোসরি বাঁসরি বাজে বাজাএ মোরচঙ্গ।
দোতারা সারিন্দা বাজে করি নানারঙ্গ॥
সারঙ্গ, মোহরি বাজে মুস্বর করি রাও।
যুবক যুবতী শুনি উল্লসিত গাও॥
বীণা, বেণু, মধুবাঁশি, বাজাএ তোগর।
বিরহিণী কিবা শক্তি রহিবারে ঘর॥
নানা পক্ষী সুর ধ্বনি করে নানা রব।
রাজকন্যা ছিল্লালের বিভার উৎসব॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনি সুললিত।
নাচএ নর্তকী সব গাহি সাদি গীত॥
মৃদঙ্গ, মন্দিরা বাজে বাজএ তম্বুরা।
খঞ্জরি, ঝাঞ্ঝারি বাজে বাজএ ডম্বুরা॥
রবাব, ভেউল বাজে বাজে কবিসাল॥

সজ্জা : কপালে সিন্দূর পরে দেবতা লক্ষণ
নিজ হস্তে নরপতি কুমার সাজাএ।
সুগন্ধি আতর জামা অঙ্গেতে পরাএ॥

মহাদেবী নুরবানু হরিষ অন্তরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাড়ির অঞ্চল ধরে শিরের উপরে॥
সুগন্ধি আতর আর গোলাপ চন্দন।
সখিগণ অঙ্গ 'পরে করন্ত লিপন।

আতসবাজি : ছাড়ি দিল পরী বাজী যেন উড়ে পরী
তিমিরে দিবস করি চলে সবে ঘিরি।

জ. সত্যপীর

ফয়জুল্লাহ বিরচিত (আনু: ১৮ শতক)

রাঢ় অঞ্চলের কবি সত্যপীর পাঁচালীকার ফৈজুল্লার গায়েনসুলভ এই বন্দনায় পীর নারায়ণ 'সত্য'-এর স্বীকৃতিতে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসক-শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে সহাবস্থান ও সহযোগিতার অঙ্গীকারে একটা আপসরফা হয়েছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে হিন্দু-মুসলিম রচিত প্রায় ৫৫/৬০ খানা 'সত্যপীর' পাঁচালীর অস্তিত্বই আমাদের এ ধারণা বদ্ধমূল করে। সাম্প্রদায়িক চেতনা বা জাতিবৈর প্রবল থাকলে এ-ধরনের বহু বন্দনা এবং পীর-নারায়ণ সত্যের মাহাত্ম্যকথা সমাজে সমাদৃত হত না।

AMARBOI.COM

। বন্দনা ।

কহেন ফৈজুল্লা কবিওলা পায়ে মতি
কেতাব দেখিয়া ফৈজুল্লা করিল সারি
মুসলমানে বল আল্লা, হিন্দু বল হরি।
সেলাম করিব আগে পীর নিরাঞ্জন
মহাম্মদ মস্তফা বন্দো আর পঞ্জাতন।
সের আলি ফাতেমা বন্দো একিদা করিয়া
হাচেন হোছেন পয়দা হৈল যাহার লাগিয়া।
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের নাম লব কত।
এবরাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে কোরবানি দিল দীনের কারণ।
কোরবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হৈতে নিকে-বিভা হইল দুনিয়া।
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পালোআন দুইজনে
এসমাইল গাজি বন্দো গড় মান্দারনে।
বন্দিব (বদর) জেন্দা পীর কামাএর কুনি
বড়-খান মুরিদ মিঞা করিল আপনি।
পাঁড়ুয়ার শফি-খাঁয়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দিব সত্য পীরের চরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পীর আছে যত
এক লাখ আশি হাজার পীরের নাম লব কত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্বল পীরিনী বন্দো বিবিগণ যত
বিবি ফাতেমার কদমে বন্দিব শত শত।
হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ।
নামেতে বন্দিয়া গাইব ধর্ম-নিরাঞ্জন
যার ধবল ঘাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস-বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসাঞিঃ
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসাঞিঃ
কামারহাটির পঞ্চাননে করি নিবেদন।
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী
সীতা ঠাকুরাণী বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিণী বন্দো শচী ঠাকুরাণী
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হএ এক চিত্তে
সত্যপীর সাহেব সভার করে হিত।...
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহ মন।
ভকত না একের তবে মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পীর আসরে বসিয়া।
ছাড় গাজি মক্কার স্থান আসরে দেহ মন
গাইল ফৈজল্যা কবি সত্য পদে মন।

AMARBOI.COM

ঝ. শমশের গাজীনামা

শেখ মনোহর বিরচিত (১৮ শতকের শেষপাদ)

ফেনী-ত্রিপুরা রওশনবাদ পরগণার রাজনৈতিক ইতিহাসমূলক কাব্য এটি। আঠারো শতকের বিদ্রোহী শমশের গাজীর কৃতি ও কীর্তি বর্ণিত রয়েছে এ কাব্যে।

শিক্ষাব্যবস্থা :

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরান পড়াএ সবে পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্তান হৈতে এক মৌলবী আনিল
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গলার বাণী।
ঢাকা হইতে মুন্‌শী আনি ফারসী পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।
দিনমধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি দুভাগে পড়িতে।
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজে প্রহর
পাঠের সময় করি দিল গাজীবর।

ঞ. তামাকু পুরাণ

সিত কর্মকার, শান্তিদাস ও রামপ্রসাদ বিরচিত [মৎ-সম্পাদিত]

রেওয়াজ ছিল না বলেই মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে খণ্ড-কবিতা দুর্লভ। আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-পরিহাসাত্মক ছড়া-বচন চালু থাকলেও ঐ ধরনের খণ্ড কবিতা সুদুর্লভ। তেমন এক বিরল রচনা আলোচ্য তামাকু-পুরাণ। রচনাটি পরিহাসাত্মক, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ-বাণও রয়েছে এতে। কিন্তু বাহ্যত একটা ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণ সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে। এমনি আর-একটি রচনা হচ্ছে আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ আবিষ্কৃত 'হুক্কা পুরাণ'। এবং অন্য একটি হচ্ছে নলিনীনাথ দাশগুপ্ত আবিষ্কৃত 'তামাকু মাহাত্ম্য'।

বিদ্রূপ আরো তীব্র হয়ে ওঠে যখন তামাকুর জন্মবৃত্তান্তে পৌরাণিক মর্যাদা ও মহিমা আরোপিত হয়। দেবগণের সমুদ্র মন্থনকালে রত্ন-আদি নানা বস্তুর সঙ্গে 'মহাবস্তু' তামাকুর বিচিও উত্থিত হল। স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু তা লুকিয়ে পৃথিবীর উপর ছিটিয়ে দিলেন। এমনি করে স্বর্গ-মর্ত্যের পরিসরে দেবানুগ্রহে মানবকল্যাণে তামাকু ও হুক্কার উদ্ভব। তাই পুরাণ নামটি সুপ্রযুক্ত ও সার্থক। সম্ভবত আদিতে শব্দটি 'তাম্বাকু' [তাম্রকুট?] ছিল। তাই 'তামাকু'-ই সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে। একালে আমরা বলি তামাক। Tobacco-ও 'ও'-কারান্ত।

এ পুরাণের প্রবক্তা মুনি শুক এবং শ্রোতা স্বয়ং রাজা পরীক্ষিৎ। অন্য পুরাণের মতো এ পুরাণও :

যেবা লেখে যেবা শুনে পঠে যেই জনে
বিশেষ পবিত্র হএ ইতিন ভুবনে।

কবি শান্তিদাসের কামনা— 'জন্মে জন্মে থাকে যেন তামাকুতে মতি।'

কেননা, ভারতে আসিয়া যেবা তামাকু না খাএ
প্রাণ গেলে (মরার পরে) সেই জন মহাদুঃখ পাএ।

আরো ভয়ের কথা, 'তামাক সেবন অভ্যাস না করে যে মরে' সে—

পশু হৈয়া জন্মে গিয়া শৃগালী উদরে
'হুক্কা হুক্কা' বলি ডাক ছাড়ে নিরন্তরে।

Mock heroic কবিতার মতো বলা চলে এটিও একটি Mock religious কবিতা। এখানেই এর অনন্যতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই

ভাঙ-চণ্ডু-চরস-গাঁজা-রস-ধেনো প্রভৃতি নানা নেশায় এদেশের মানুষ আবহমান কাল থেকে অভ্যস্ত হলেও, তা ছিল একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপভোগের বস্তু সেগুলো কখনো তেমন ঘৃণ্য বা নিন্দনীয় ছিল না। বরং দেবভোগ্য বলে অনুকরণীয় ছিল। একরকম সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল। কিন্তু তামাক তেমন নেশাকর নয়, মনও তেমন মাতিয়ে তোলে না, সম্বিৎ হারাবার তো আশঙ্কাই থাকে না। মধ্যযুগেই এই নতুন ঔষধির এদেশে আমদানি। সম্ভবত এও পর্তুগিজদের দান। শোনা যায়, রাজা-বাদশাহ্‌র মধ্যে সম্রাট জাহাঁগীরই প্রথম তামাক-সেবী। এতেই বোঝা যায়, তামাকে নেশা না থাকলেও আড়ম্বর ছিল, এ ছিল পুরোপুরিই বিলাস-ব্যসন প্রকাশের অন্যতম বাস্তব অবলম্বন। আভিজাত্য, ধন ও মানের বড়াই পদাধিকারের দর্প ও দাপট এবং মজলিশে সামাজিক আড়ম্বর প্রকাশের প্রতীকরূপে সুদীর্ঘ সুন্দর জরিজড়ানো নল ও কারুময় রৌপ্যখচিত সুগোল কলিকাযুক্ত দামী বৃহৎ ধাতব হুক্কায় ধূমপান বা সুগন্ধ তামাক সেবন একটি আনুষ্ঠানিক রীতির মর্যাদা পায়। ফলে অধিকারী-ভেদ স্বতোই স্বীকৃত হয়। তাই অন্যান্য নেশা-সেবনের ক্ষেত্রে আদব-কায়দার প্রশ্ন কখনো গুরুতর ছিল না বটে, কিন্তু তামাক সেবনের মতো নির্দোষ বিলাসের বেলায় সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিধিনিষেধ ও নিয়মনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা আবশ্যিক হয়ে উঠে। এতে গুরুজন, মান্যজনেরই একচেটিয়া সামাজিক ও মজলিশি অধিকার। সামন্তসমাজে মান্যজন মাত্রই প্রভুকল্প। আর যারা মানবে, তারা নিকটআত্মীয় হলেও দাসকল্প। তাই স্ত্রীও চরণাশ্রিতা, সন্তানও সেবক, খাদেম প্রণত, খাকসার। অশনে-বসনে-আসনে-বাহনে—জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে গুরু-মান্যজনের অগ্রাধিকার ও সিংহভাগ।

সস্তা, সহজলভ্য, সুসেব্য ও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কাবিহীন হওয়ায় তামাক সেবন শিগগিরই গণ-অভ্যাসে পরিণতি পেল। বলতে গেলে এমন দেশ-জাত-বর্ণ-ধর্ম নিরপেক্ষ গণসেব্য বস্তু বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। গণ-ব্যবহারের তামাক ও হুক্কা, দু-ই মূল্য ও মর্যাদা হারিয়ে সাধারণ ও সামান্য হয়ে ওঠে। তখন তালের গুড়-মাখা তামাক বাঁশ, মৃৎপাত্র ও নারিকেল খোল কিংবা কেবল কলিকা-আশ্রিত হয়ে গণদাবি মেটাতে থাকে। তবু কিন্তু গুরুজন মান্যজনের সামনে সেবনের নৈতিক বাধা অপসৃত হল না। আজকের বিড়ি-সিগার-সিগারেটের যুগেও সে-বাধা জগদ্দল হয়েই রয়েছে। আরো অনেক ব্যাপারের মতো তাৎপর্য হারিয়েও মধ্যযুগ এক্ষেত্রেও অনড় হয়ে অবিচল মহিমায় বিরাজ করছে। কাজেই সামাজিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তামাক সেবনের অধিকার-অনধিকার পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও পদাধিকার ভেদের পরিমাপক। বয়স, সম্পর্ক, যোগ্যতা ও পদবিভেদে এ অধিকারভেদ সর্বস্তরের মানুষের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। কথায় বলে 'মানলে পর্বতের চূড়া, না মানলে ভাঙা নায়ের গুঁড়া', কিংবা 'মানে তো উচ্চ, না মানে তো তুচ্ছ।' আমরা মানি বলেই তামাক সেবনও নীতি-সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ, শিষ্টাচারের মাপকাঠি এবং স্থান-কাল-পাত্রের আপেক্ষিকতা নির্ভর। ঘরে-সংসারে-সমাজে সর্বত্রই অশনে-বসনে-আসনে এই অধিকারভেদ আজো গুরুত্ব পায়।

তিন

হুক্কার উদ্ভবেও রয়েছে দেবলীলা ও দৈব দান।

হুক্কা বানাইতে ব্রহ্মা দিল কমণ্ডুল
শিবে দিল লিঙ্গ আর ধুতুরার ফুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতেই হল খোল-নৈচা-কলকে। তারপর জাহ্নবী হলেন জল, কৃষ্ণ দিলেন বাঁশি, বাসুকী স্বয়ং হলেন নল। আর 'রহিল নরিচা যেন ব্রহ্ম সমসর।' রূপ ও মূল্যভেদে হুক্কার নাম হল আলবোলা, ফর্সি, গুড়গুড়ি, ডাবা প্রভৃতি।

হুক্কা টানে টানে বাদ্যের মতো যে-ধ্বনি তোলে, তারও মহিমা-মাহাত্ম্য অশেষ। এক হুক্কার ধ্বনি হরিসংকীর্তন, দুটোর ধ্বনি গঙ্গাস্নানের পুণ্য বিলায়; এমনি করে হুক্কার সংখ্যা বৃদ্ধিতে কাশী-বারাণসী-গয়া-প্রয়াগ দর্শনের পুণ্য মেলে। ছয়ে মেলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য। আট হুক্কার ধ্বনিতে স্বর্গ আসে হাতে, আর 'নব হুক্কা হৈলে বিষ্ণু' প্রত্যক্ষ হন।

উৎসবে-পার্বণে-ভোজে সব উপকরণ থাকলেও 'তামাকু রহিত হৈলে কার্য না জুয়াএ।' তামাকুর প্রধান গুণ 'বারেক তামাকু খাইলে শ্রম শান্তি হএ।' ক্ষুধা-তৃষ্ণা-তাপের দুঃখও 'বারেক তামাকু খাইলে সকল পাসরে।' তামাকুর শ্রেষ্ঠ দান—সাম্যভাব। এত বড় সাম্য-সংস্থাপক আর কোনো বস্তু নেই। তামাকখোরের

শুচি অশুচি নাহি স্নান অস্নান
রাত্রি দিবা ভেদ নাহি, নাহি কুলজ্ঞান।
জগন্নাথ দ্বারে নাহি জাতির বিচার
একজনে আনএ শতেক জনের আহার।
হুক্কার জানিঅ ভাই সেই অভিপ্রায়
এক হুক্কার জলেত শতেক জনে খায়।

তামাক যে কেবল জাত-বর্ণ-ধর্মের ভেদ ঘুচায়, তা নয়, লজ্জা-সঙ্কোচ-শরম আর সংযমও ঘুচিয়ে দেয় :

তামাকু খাইতে লজ্জা নাহি কদাচিত।
বাপে খাএ তামাকু পুত্রে বলে দেও
একটান খাই আমি পাছে তুমি নেও।
বাপের হুক্কা পুত্রে নেয় ভাইর হুক্কা ভাই
তামাকুর লজ্জা জ্ঞান গুরু-শিষ্যে নাই।

এমন শরম-সংকোচ-সংযম-ভাঙা বলেই 'গোবিন্দ নাম ভুলানো' তামাকের উদ্ভবে 'এহি ভুবন পবিত্র' হয়েছে, হয়েছে ধন্য। আর 'তামাকু খাইয়া সুখী হইল সর্বলোক।'

চার

আঠারো শতকের চট্টগ্রামবাসী কবি আফজল আলি (আনু. ১৭৩৮-১৮১১ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর নসিয়তনামায় [মৎ-সম্পাদিত] গাঁজা-তামাকুর ধূমপানের পাপ ও তামাকুসেবীর পরিণাম বর্ণনা করেছেন। এটি সমাজপতি ও শাস্ত্রবিদের পাঁতি-ফতোয়া। নীতিশিক্ষামূলক গম্ভীর রচনা!

মুসলমান হিন্দু আর যত জাতি আর
সকলে করএ ভক্ষণ না করে বিচার।...
আমার আশেক বহু তামাকুত ছিল।
স্বপ্নের মাঝারে আমি বড় ভয় পাইল।
সংসারেত যে সকলে তামাকু পিয়এ
অন্তরে কালির বর্ণ হইয়া আছএ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তামাকুর পায়রবি করিয়া পঞ্চজন
মুচি হস্তে কতল করিব নিরঞ্জন।
তামাকু যে ক্ষেতি করে, যেবা মাখি দিছে,
যে জনে ভরিল হুক্কা, যেবা অগ্নি দিছে।
আর যে সকল ভক্ষে—এই পঞ্চজন
হিসাবেত 'ছেহা' বর্ণ হইব বদন।
হেনমত স্বপ্ন দেখি বড় ভয় পাইলুম
তেকারণে মুঞি পাপী তামাকু ছাড়িলুম।
আমল করিয়া বুঝ মুমীন সকলে
রঙ্গিলা ঘরেত ধূঁয়া নিত্য জ্বালাইলে।
কালির বরণ কিবা হএ কি না হএ
হেন জ্ঞানে ভাবি কেনে না চাহ মনএ।
কিবা ভাল কিবা মন্দ নাহি বিচারএ
এক নলে মুখ দিয়া সকলে ভক্ষএ।
শ্বশুরে জামাতা বন্ধু এক নলে খাএ
সেই নলে মাগ খাএ জান সর্বথাএ।
জ্ঞানবন্ত মুসলমান যে সকল হএ
তবে কেন হেন চিজ ভক্ষণ করএ।
তামাকু যে সবে পিএ কহুঁ 'ছেহা' তার
সে-দোষে না পাইব দেখ রসুল আল্লার।
এ সকল দেখিলাম খোয়াব মাঝার
কোরান হাদিসে চাহ করিয়া বিচার। (পৃ: ২১)
আর স্বপ্ন দেখিলেন্ত গাঁজা যে পিয়ন
সে সবের সর্ব অঙ্গ ইব্লিস বাহন।
সে সবের সঙ্গতি যে মেলা করিবার
নিষেধ করিছে নবী হাদিস মাঝার। (পৃ. ২২)

পাঁচ

আঠারো শতকের কবি শেখ সাদী তাঁর 'গদা-মালিকা' নামের 'তত্ত্ব জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে তামাক-সেবনকে কলিকালের লক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন :

গদাএ কহে যেইক্ষণে করিল প্রবেশ
তামাকু পিবারে লোকে করিব আবেশ।
অন্য হতে জানিব তামাকু বড় ধন
তামাকুতে বৃদ্ধ বালকের রহিব জীবন।
লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে
হাঁটিয়া যাইতে লোক পিব পথে পথে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতায় তামাকু পিতে পুত্র করে আশ
তামাকুথু করিবেক ভুবন বিনাশ।

তাছাড়া, খাইতে না ভরে পেট মিছা ফাঁক ফুক।
'লজ্জা হারাইব লোকে তামাকুর হতে।' এটাই সম্ভবত কলিকালের মুখ্য লক্ষণ।

ছয়

বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত ডক্টর পঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত 'পুঁথি পরিচয়'-এর ১ম খণ্ডের ৬৯ পৃষ্ঠায় 'গাঁজা ও তামাকু'র একটি গান সংকলিত হয়েছে। গানটির রচয়িতা দ্বিজ (ন্যাড়া) রামানন্দ। "পুথি সংখ্যা ১২৪। অখণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১। আকার ৯´´ × ৩´´। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফুর্ত রচনা কৌতুকরসের কবিতার ভালো ও পুরানো উদাহরণ বলিয়া রচনাটি সবিশেষ মূল্যবান।" পঞ্চানন মণ্ডল, পৃ. ৬৯।

তামাকু

মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই। ... ধুয়া
উঠি অতি নিশি ভোরে হুঁকাটি লইয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যে জখন শ্রদ্ধা করে
কুশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা
কোঁচর তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
দ্বিজ রামানন্দে ভনে স্থান দিয়া শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই।

বঞ্চিত-বিড়ম্বিত জীবনে, অভাব-বঞ্চনা-পীড়ন ক্লিষ্ট মনে তামাক-সেবনের মুহূর্তগুলো শান্তি-সুখের প্রলেপ বুলায়। আর স্বস্থ ও সুস্থ ধনী-মানীকে ধূমপান দেয় স্নিগ্ধ প্রশান্তি।

গাঁজা

মনের গৌরবেতে চিন্‌লি না রে অরে গাঁজাখোর।...ধুয়া।
গাঁজার পাতা জলে ভাসে দেখি ভাঙ্গি হাঁসে
আর এক ভাঙ্গি ওরেৎ জাহাদ এইল মোর।
ভাঙ্গা ঘরে সুএগ্রা থাকে গগনেতে তারা দেখে
আর এক ভাঙ্গি উঠ্যা বলে বালাখানা মোর।

রামানন্দ নাড়ায় বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর। [পৃ. ৬৯]

এই নিরুদ্দিষ্ট রসিকতা নেশার বস্তুর মধ্যে কেবল গাঁজা সম্পর্কেই মেলে। যদিও গাঁজা 'কারণ বারি'র মতোই পবিত্র ও সাধন-সহায়। কেননা গাঁজা মহাদেব-সেব্য। তামাকের অর্বাচীন উদ্ভব তাকে দেবভোগ্য হবার সৌভাগ্য ও সম্মান থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

শান্তিদাসের হুক্কাপুরাণ

"সমুদ্র মথনে যবে গেল দেবগণ' তখন 'পঞ্চম মথনে জন্মে তামাকুর বিচি।' এখানে কেবল গদাধর নন, তামাকুর বিচি 'দেবগণে হরিলেক যার যেই রুচি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে — তামাকু হইল দেখ পৃথিবীর সার
গাঁজা-ভাঙ-ধুতুরা তবে হইল অবতার।

এবং — নেশাখোর নেশা খাএ সবার বিদিত
তাহার যে নিন্দা করা হএ অনুচিত।

কেননা — নেশাখোরকে বাখানিছে আপনি শঙ্কর
তাহাকে যে নিন্দা করে কেবল বর্বর।

যদিও অবশ্য — "নেশাখোরে নেশা খাইয়া হএ হতজ্ঞান
আপনার স্ত্রীকে দেখে মাএর সমান।
মাকে গালি পাড়ে আর বাপকে বলে শালা।"

এবং — বাপে তামাকু খাএ পুত্রে বোলে দেঅ

আর — জামাতা তামাকু খাএ চাহেন শ্বশুরে।

সিত কর্মকারও হুক্কা-তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন, এবং তা শান্তিদাসের দেয়া বিবরণের মতোই। যথা :

ব্রহ্মা দিল কমণ্ডলু হুক্কার কারণ
শিবে দিল শিবলিঙ্গ নৈচার গঠন
সঙ্গে ধুতুরার ফুল করে সমর্পণ
সেই ফুলে কল্কি গোটা করে আরম্ভন।...
নৈচা শিবলিঙ্গ হৈল যেন শিলাস্তম্ভ...
আপনে জাহ্নবী দেবী হুক্কার ভিতর ...
শ্রীহরি দিলেন বংশী নল বানাইতে ...
বাসুকী হইল দেখ গড়ার স্বরূপ।

AMARBOI.COM

উপসংহারে কবি বলেন :

ভারতে জন্মিয়া যেবা তামাকু না খাএ
অন্তকালে সেই পাপী স্বর্গেত না যাএ।
পরলোকে জন্ম হএ শৃগাল উদরে
'হুক্কা হুক্কা' বলি ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে।

অতএব, উভয় পুরাণে তামাকু-দ্বেষী মানুষের পরিণাম-চেতনা অভিন্ন। তবে তামাকু সেবন না-করেও স্বর্গের প্রত্যাশা করা যায়, যদি 'তামাকু পুরাণ এই শুনে কোন্ জনে' এবং 'এক মনে শুনিলে সে স্বর্গপুরে যাএ।'

অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এক অখ্যাত কবি রামপ্রসাদ রচিত তামাকু মাহাত্ম্য-এর পরিচিতি দিয়েছেন। চরণ-সংখ্যা ১২০/লিপিকাল ১২০৮ সন তথা ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ। অতএব রচনাকাল আঠারো শতকের শেষপাদ। তামাকুর জন্মবৃত্তান্তে সামান্য পার্থক্য আছে। এখানে বীজশিব-জটা থেকে স্খলিত। আর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হুকা যথা সেহি সালগ্রাম হয়ে
দুই হুকা লক্ষ্মী নারায়ণ
তিন হুকা যেবা দেখে সেহি যায়ে স্বর্গলোকে
কি কহিব তার পুণ্যফল
চারি হুকা যথা বসি সেহি গঙ্গা বারানসী
সেহি বৃন্দাবন নীলাচল।

তামাকুকে অবজ্ঞা করে সীতা, হরিশচন্দ্র রাজা, বলিরাজা, রাবণ, দুর্যোধন প্রভৃতি হৃতসর্বস্ব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীকে

স্বধর্মে সুস্থির থেকেও যিনি
মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে সবকিছুর
ঊর্ধ্বে ঠাঁই দেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি সত্তার স্বরূপ সন্ধানে

এখনকার দিনে বাঙলাভাষী অঞ্চল বহুবিস্তৃত। উড়িয়া-আসামীকে অন্তর্ভুক্ত করলে গোটা প্রাচ্য-ভারতই বৃহত্তর ও প্রাচীন সংজ্ঞায় অভিন্নভাষী অঞ্চল।

সাম্প্রত-পূর্বকালে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ছিল সামান্য এবং বহুলাংশে অনুমিত। উত্তর ভারতীয় আর্যদৃষ্টিতে এরা দাস, দস্যু, অসুর, পক্ষী তথা বর্বর। এদের ভাষা অবোধ্য, সংস্কৃতি ঘৃণ্য, অবয়ব শ্রীহীন।

সাম্প্রতিক গবেষণায় আমাদের এসব ধারণার প্রায় আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। 'বেস্‌সান্তর জাতক'-এর আলোকে সন্ধান করে জানা গেছে আড়াই হাজার বছর আগেই বৌদ্ধযুগে রাঢ় অঞ্চলে দুটো ক্ষুদ্র সামন্ত বা স্বাধীন রাজ্য ছিল। একটি শিবিরাজ্য—টলেমি বর্ণিত সিব্রিয়াম, অপরটি চেতরাজ্য। শিবিরাজ্য ছিল এখনকার বর্ধমান জেলার অনেকখানি জুড়ে আর এর রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগর (মঙ্গলকোটের নিকটে শিবপুরী)। এর দক্ষিণে ছিল চেতরাজ্য, এর রাজধানী চেতপুরীই সম্ভবত বর্তমান ঘাটাল মহকুমার 'চেতুয়া' এলাকা। দুটো রাজ্যই ছিল কলিঙ্গরাজের সীমান্তে।

এতে বোঝা যায়, মৌর্যবিজয়ের আগেও এ অঞ্চলে সভ্য রাজা, রাজ্য ও প্রশাসন চালু ছিল, অতএব কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যও ছিল। টলেমি প্রমুখ বর্ণিত গঙ্গাহৃদয়কে [গঙ্গারী] গঙ্গাতীরস্থ 'রাঢ়' বলে মেনে নিলে বুঝতে হবে আলেকজান্ডার-শ্রুত গজারোহী সৈন্যবাহিনী রক্ষিত প্রতাপে প্রবল রাজ্য ছিল এই 'রাঢ়'। আর তাম্রলিপ্তি, পুরস্থল [portalis] , গঙ্গা, সমন্দর প্রভৃতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যবন্দরও সুপ্রাচীন।

সভ্য ও সংস্কৃতিবান হওয়ার জন্যে যে বাঙালির জৈন-বৌদ্ধ মতবাদ গ্রহণের কিংবা মৌর্য-শুঙ্গ-কন্ব-গুপ্ত শাসনে থাকার প্রয়োজন ছিল না, বরং উক্ত সাম্রাজ্যবাদীদের শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি যে বাঙালির শাস্ত্র, সংস্কৃতি ও ভাষা বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল, তা বেরাচম্পার হরিনারায়ণপুরে, দেগঙ্গার চন্দ্রকেতুর গড়ে এবং 'পাণ্ডুরাজারঢিবি' উৎখননে প্রাপ্ত নিদর্শনাদিই [প্রায় দেড় হাজার খ্রি. পূর্বাব্দের] প্রমাণ করেছে। উত্তর ভারতীয় শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি বাঙালিকে দু'হাজার বছর ধরে আত্মবিস্মৃত রেখেছে। তাই স্বতন্ত্র সত্তায় পরে আর কোনোদিন আত্মপ্রকাশের স্পৃহাও তাদের মনে জাগেনি। বিজাতির শাস্ত্র, শাসন ও সংস্কৃতি বরণ করে এমনি সত্তা হারিয়েছিল উত্তর আফ্রিকার মিসর-লিবিয়া-মরক্কো-আলজিরিয়া, পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া-ব্যাবিলোনিয়া ও আশশিরিয়া আর ইরান হারিয়েছিল হরফ ও ধর্মমত।

১৯২৮ থেকে ১৯৭০ সন অবধি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নরকঙ্কালাদি নানা প্রত্নবস্তু আবিষ্কারের ফলে এখন প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল বা কাঠামো আভাসিত করা সম্ভব হচ্ছে।

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় এখন এরূপ : আদি অস্ট্রিকরাই (দি অস্ট্রাল) দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা। এরা মূলত ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী। এরা সম্ভবত জলপথে বাঙলায় প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। অথবা স্থলপথে দক্ষিণ উপকূল হয়ে এসে বাঙলায়-উড়িষ্যায় এবং ছোটনাগপুর অবধি পরিব্যাপ্ত হয়। পরে ভূমধ্যসাগরীয় আর একদল উপকূলীয় স্থলপথে বা জলপথে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ও বসবাস করে। তারাই দ্রাবিড় [ভেড্ডিড] নামে পরিচিত। তাদেরও কিছুলোক অস্ট্রিকদের সঙ্গে বাস করে। এবং কালে উভয়ের রক্তমিশ্রণ ঘটে। ফলে তাদের অবয়বে ঘুচে যায় এবং মানসে মুছে যায় তাদের গোত্রীয় স্বাতন্ত্র্য। এর পরে আসে হ্রস্বশির আলপাইনীয় আর্যভাষী জনগোষ্ঠী। এরা সম্ভবত জলপথে কেবল প্রাচ্য ভারতেই প্রবেশ করে। তাই বিহারের উত্তরে এদের কোনো নিদর্শন মেলে না। এর সমসময়ে বা আরো আগে হিমালয় ও লুসাই পর্বতের মালভূমি-অধিত্যকা অঞ্চলে নেমে আসে বিভিন্ন গোত্রের মঙ্গোল জনগোষ্ঠী। তাদের রক্তও মিশ্রিত হয়েছে এ অঞ্চলের অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আলপীয় নরগোষ্ঠীর রক্তের সঙ্গে। পরে আর যেসব বিজেতা ব্যবসায়ী বা যাযাবর এদেশে এসেছে, তাদের রক্তও এদেশী মানুষের মধ্যে রয়েছে বটে, তবে তা সামান্য ও বিরল, তাই দুর্লক্ষ্য। অবশ্য নিগ্রোরক্তের মিশ্রণের কিছু লক্ষণও কিছু মানুষে দুর্লভ নয়। এবং পরবর্তীকালে আঞ্চলিক বা গোত্রীয় ঐতিহ্য বা টোটেম পরিচয়ে তারা পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি গোষ্ঠী নামে অভিহিত হয়। এভাবেই আজকের আসামী বাঙালি-উড়িয়ার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ বগধ চের প্রভৃতি গাঁই [<গ্রাম], গোত্র ও অঞ্চল বাচক নামগুলোও এ সূত্রে স্মর্তব্য।

চোখ-চুল-চোয়াল ও নাক-মুখ-মাথার গড়ন আর দেহের বর্ণ, রক্ত ও আকার ধরেই নৃতাত্ত্বিক শ্রেণী ও পর্যায় নির্ধারণ করা হয়।

১. অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিল রয়েছে বলেই নৃতত্ত্বের পরিভাষায় আমাদের "অস্ট্রিক" (Pro Australoid) বলা হয়। আদি অস্ট্রিকদের দেহ খর্বাকার, মাথা লম্বা ও মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, দেহবর্ণ কালো, মাথার চুল ঢেউ খেলানো কোঁকড়া।

কোল, ভীল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোরওয়া, জুয়াঙ, কোরবু প্রভৃতি প্রায় বিশুদ্ধ অস্ট্রিক এবং আমাদের নিকট-জ্ঞাতি। মুণ্ডা বা মুণ্ডারী ভাষাই আদি অস্ট্রিক ভাষার বিবর্তিত রূপ। অস্ট্রিকরাও মূলত ভূমধ্যসাগরীয় বর্গের নরগোষ্ঠী।

২. ভূমধ্যসাগরীয় অপর বর্গের নরগোষ্ঠী হল দ্রাবিড়রা। এরা 'ভেড্ডিড' নামেও পরিচিত। এরা সম্ভবত স্থলপথে উপকূল ধরে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করে। এরা দেহে মধ্যমাকার, এদের মাথা লম্বা, নাক ছোট, দেহবর্ণ শ্যামল।

৩. আলপাইনীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষী ইরান-ভারতের (ইন্দো-ইরানী) নরগোষ্ঠী একই ভাষী বটে, কিন্তু নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় গোত্রে পৃথক। মূলত আলপাইনীয় বা আলপীয় ও ইন্দো-ইরানী-য়ুরোপীয় আর্যভাষীরা রাশিয়ার উরাল মালভূমি ও দক্ষিণের সমতূল ভূমি থেকে দানিয়ুব নদীর উপত্যকা অবধি ছড়িয়ে বাস করত, তাদের মধ্যে তাই স্থানিক ভাষার সাদৃশ্য রয়েছে। বিদ্বানদের মতে, "আর্য" নামটি তাই ভাষা জ্ঞাপক—'জাতি' বাচক নয়। আলপ্‌স পার্বত্য অঞ্চলে যে-দল ছড়িয়ে পড়ে তারা আলপীয়, আর যারা পশ্চিম য়ুরোপে, মধ্যএশিয়ায়, ইরানে ও ভারতে প্রবেশ করে তারা সম্ভবত অভিন্নবর্গের নরগোষ্ঠী। তারা 'নর্ডিক' বর্গের নরগোষ্ঠী বলে পরিচিত। আলপীয়রা ছিল কৃষিজীবী আর নর্ডিকরা বহুকাল ধরে ছিল যাযাবর ও পশুজীবী। আলপীয় আর্যরা হ্রস্বশির, মধ্যমাকার, মাথার খুলি ছোট ও চওড়া, খুলির পিছনের অংশ গোল, নাক লম্বা, মুখ গোল, দেহবর্ণ-গৌর। আলপীয়রা পরে এশিয়া মাইনর হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা অঞ্চলে এবং পূর্ব উপকূল ধরে বাঙলা-উড়িষ্যায় বাস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. মঙ্গোলীয় বর্গের লোকেরা সাধারণভাবে লেপচা, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজঙ, মুরঙ, মেচ, খাসিয়া, মঘ, ত্রিপুরা, মিজো, মার্মা প্রভৃতি বিভিন্ন গোত্রীয় নামে পরিচিত। দুনিয়ায় এককভাবে মঙ্গোলীয় বর্গের লোকের সংখ্যাই অধিক। জাপান থেকে মধ্য এশিয়া ও রাশিয়া অবধি অঞ্চলে এদের বাস। রক্ত-মিশ্রণের ফলে নৃতত্ত্বের একক মাপে অবশ্য এখন তাদের চিহ্নিত করা যায় না। সাধারণভাবে মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর মাথা গোল, চুল কালো ও ঋজু, মাথার খুলির পিছনের অংশ স্ফীত, গাত্রবর্ণ পীত, ঈষৎ ও ঘন পিঙ্গল, ভ্রূ অনুচ্চ, মুখাবয়ব ছোট বা স্বল্পপরিসর, চিবুকের হাড় উঁচু, নাকের গড়ন মাঝারি ও চ্যাপ্টা, মুখে ও দেহে লোম স্বল্প, চোখের খোল বাঁকা এবং দেহ মধ্যমাকার।

৫. নর্ডিক আর্যরা সাধারণভাবে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ (লম্বা) ও সরুনাসা, দীর্ঘ (লম্বা) শির বা দীর্ঘ কপাল, দেহ দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ।

নর্ডিক আর্যরা প্রাচীনকালে গ্রিসে, ইরানে ও ভারতে এবং এ যুগে য়ুরোপে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে ও কৃৎকৌশলে প্রাধান্য পাওয়ায় দুনিয়ার তাবৎ জাতির ঈর্ষার পাত্র। এজন্যে এশিয়ার ও য়ুরোপের অনার্য বর্গের লোকদের 'আর্য' পরিচয়ের গৌরব লাভের লোভও প্রবল। তাই কিছু কথা বলতে হয়।

আসলে মিসরীয়, আশশিরীয়, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, সিন্ধুদেশীয় কিংবা চৈনিক সভ্যতার কালে আর্যরা ছিল বর্বর ও যাযাবর। উরাল ও দানিয়ুব অঞ্চলে বাসকালে তারা ছিল অন্য বর্বরদের মতো নরমাংসভোজী, পরে অশ্ব, তারপরে ষাঁড়, গাভী, মহিষ, তারপরে মেষ এবং তারও পরে তারা অজভোজী হয়। নরমেধ, অশ্বমেধ, বলিবর্দমেধ, মেষমেধ ও অজমেধ অবধি নীতি ও নিয়ম পরিবর্তিত হতে সমাজ বিবর্তনের ধারায় সময় লেগেছে নিশ্চয়ই কয়েকহাজার বছর। তার প্রমাণ ভারতেও বৈদিক সাহিত্যে রিচিক-পুত্র শুনঃশেপের, কর্ণের, শিবিরাজা প্রভৃতির গল্পে অতিথির ভোজনার্থে পুত্র বা নর বলিদানের কাহিনী রয়েছে। শুক্ল যর্জুবেদে ভূতসিদ্ধির ('অতিষ্ঠা') জন্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা নরমেধ যজ্ঞ করত বলে বর্ণিত রয়েছে। অম্বরীষ, হরিশচন্দ্র ও যযাতি এ যজ্ঞ করেছিলেন। এসব নরমেধ বা প্রাণিমেধ যজ্ঞ প্রজনন ও সন্তান-সম্পদকামী সমাজের আদিম যাদুবিশ্বাস যুগের স্মারক।

পশুজীবী বলে তারা ছিল আরণ্য ও যাযাবর এবং নগর সভ্যতার শত্রু। নর্ডিক আর্যরা নগর সভ্যতা বিনাশে ছিল উৎসাহী। তাদের আদিনিবাস থেকে তারা যখন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারা উন্নততর সভ্যতা ও নগর ধ্বংস করেই—সম্পদ লুট করেই পেয়েছে স্বস্তি। যাযাবর বলেই ওরা লুণ্ঠন করে সম্পদ অর্জনে ছিল উৎসাহী। কেননা যাযাবরের পক্ষে লুণ্ঠনই ছিল ধনপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এখানে অন্ন ও সম্পদের দেবতা বৈদিক ইন্দ্রের লুণ্ঠন কাহিনী স্মর্তব্য। ভারতেও আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা তথা ময়েনজোদারো-হরপ্পা নগর [লোথাল ও কালিবঙ্গনও] ধ্বংস করেছিল। অবশ্য ধ্বংস করেও বর্বর ও যাযাবর আর্য ঐ সভ্যতার প্রভাব এড়াতে পারেনি, বরং শাস্ত্রের, সমাজের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐ প্রভাব গ্রহণ করেই হয়েছিল কৃষিজীবী ও স্থিতিশীল এবং নগর সভ্যতার ধারক। চলমান জীবনে যাযাবরের মানস বা ব্যবহারিক সভ্যতার বিকাশ বাস্তব কারণেই হতে পারে না। স্থায়িনিবাসী ও কৃষিজীবী হওয়ার আগে তাই আর্যরা কোথাও উল্লেখযোগ্য সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রষ্টা ছিল না। আসলে আমরা যাকে বৈদিক আর্য বা ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা বলি, তার চৌদ্দ আনাই আর্যপূর্ব দেশী জনগোষ্ঠীর অবদান। শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা, নারী, বৃক্ষ পশু ও পাখি দেবতা, মূর্তিপূজা, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান, ভক্তিবাদ, অবতারবাদ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের নবীবাদ স্মর্তব্য), জন্মান্তরবাদ, প্রেতলোক, ঔপনিষদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত্ত্ব বা দর্শন, সাংখ্য, যোগ, তন্ত্র এবং স্থাপত্য, ভাস্কর্য সবটাই দেশী। যাযাবর আর্যের স্থাপত্য-ভাস্কর্য জানা থাকার কথা নয়। ইরানের নর্ডি আর্যরাও ইলামী, আশশিরীয়, সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় প্রভাব স্বীকার করেই হয়েছে সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নত।

প্রাচীন বাঙলার নিষাদরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড় আর কিরাতরা ছিল মঙ্গোল। বাঙলার দেশজ মুসলমানরা ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকগুলো (তফসীলী) অস্ট্রিক-দ্রাবিড়। আর সম্ভবত উচ্চবর্ণের হিন্দুর মধ্যে আলপীয় রক্ত বেশি।

নর্ডিক আর্যরক্তের মানুষ বাঙলায় বিরল—নেই বললেই চলে। নর্ডিক আর্য-রক্ত বাঙলায় বিরল বটে, তবে নর্ডিক আর্য শাখার বৈদিক আর্যদের শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি (জৈন-বৌদ্ধসহ) দুহাজার বছর ধরে বাঙালির মন-মনন ও জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করছে। বৈদিক আর্যরা সুরের এবং তাঁদের নিকট জ্ঞাতি ইরানী আর্যরা অসুরের পূজারী। পূজ্যদেবতা নিয়েই হয়তো একসময়ে তাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়, যখন তারা মধ্য এশিয়ার আমু ও শিরদরিয়ার উপত্যকায় বাস করত। তারও আগে একসময়ে উভয় দলের পূজ্য দেবতা ছিল অসুর (অহোর)। পরে ইরানীরা অসুর (অহোরামজদা) এবং ভারতীয় বৈদিক আর্যরা 'দেইবো' 'দইব' বা 'দেব' পূজারী হয়। ফলে ইরানীর কাছে দেব (দেও) হলেন অরি ও অপদেবতা এবং তেমনি অসুর হলেন ভারতীয়দের অরি ও অপদেবতা। তাছাড়া জেন্দাবেস্তার ও ঋগ্বেদের ভাষায় মিলও তাদের অভিন্নত্বের প্রমাণ। কোনো কোনো বিদ্বানের মতে অসুরপন্থীরা ছিল কৃষিজীবী ও উন্নত রুচিসম্পন্ন এবং স্থাপত্যে ভাস্কর্যে নিপুণ, আর সুরপন্থীরা ছিল যাযাবর, দুর্ধর্ষ ও অপরিশীলিত রুচির। অসুরপন্থীদের অন্য প্রধান দেবতা বরুণ আর সুরপন্থীদের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। অহিপ্রতীক বৃত্র (বেতরো) উভয় পক্ষেরই শত্রু।

পাণ্ডুরাজার ঢিবি খননে প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যগুলো ও অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া আমাদের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করেছে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে আমরা চারটি যুগের নিদর্শন পেয়েছি। ফলে রাঢ় অঞ্চল যে অতি প্রাচীন ভূমি, সে-সম্বন্ধে যেমন আমরা নিঃসন্দেহ হয়েছি, তেমনি এখানকার লোকবসতিও যে সুপ্রাচীন, তা নিশ্চিতভাবে স্বীকৃত হল। এ সভ্যতা ময়েনজোদারোর ও হরপ্পার নগর সভ্যতার সঙ্গে তুলনীয়।

নব্যপ্রস্তর যুগের পাথুরে অস্ত্র ও অন্যান্য হাতিয়ার যেমন এখানে মিলেছে, তেমনি তাম্রযুগের ও তাম্রাশ্ম বা ব্রোঞ্জযুগের নিশ্চিত নিদর্শন পাওয়া গেছে। বাঙলার তামা বিদেশে রফতানিও হত। ব্রোঞ্জ যুগেই ময়েনজোদারো-হরপ্পায় নগর-সভ্যতার উদ্ভব। পাণ্ডুরাজার ঢিবির প্রমাণে রাঢ়েও তা' ছিল বলে দাবি করা চলে। রাঢ়ে তখন সুপরিকল্পিতভাবে নগর ও রাস্তা-ঘাট, ঘর ও দুর্গ নির্মিত হত। কৃষি-শিল্প বস্তু বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে সুদূর ক্রীট দ্বীপেও যে রফতানি হত তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। ক্রীট দ্বীপে প্রচলিত প্রাচীন লিপি সম্বলিত একটি গোল সিলমোহর পাওয়া গেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে। রাঢ়ের পণ্য-সামগ্রীর মধ্যে মসলা, তুলা, বস্ত্র হস্তিদন্ত, তাম্র এবং সম্ভবত এখোগুড়ও ছিল [কেননা এখোগুড়ের এলাকা বলেই অঞ্চলের নাম 'গৌড়' হয় বলে কারো কারো বিশ্বাস] বাঙলার এখোগুড় ও চিনি একসময়ে রোমসাম্রাজ্যেও রপ্তানি হত। খ্রিস্টপূর্ব যুগের বাঙলাদেশের বহির্বাণিজ্যের আর একটি সাক্ষ্য হচ্ছে মৃন্ময় লেবেল বা ফলক। এটি পণ্যগর্ভ ঝুড়ির সঙ্গে বাঁধা থাকত। পণ্যের ও মূল্যের হিসেব লেখা থাকত এই মাটির ফলকে।

বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙালির ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গমন এবং সেখানকার বণিকের এদেশে আগমন ছিল আবশ্যিক। তাই ক্রীটবাসীর সঙ্গে প্রাচীন বাঙালির সাংস্কৃতিক যোগও ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাভাবিক। এর প্রমাণও মেলে—যেমন উভয় দেশের মাতৃদেবীর বাহক সিংহ, ক্রীটদ্বীপের নারীরা যেমন দেহের উর্ধ্বাংশ অনাবৃত রাখত, তেমনি বাৎসায়নের 'কামসূত্র' থেকে জানা যায়— অভিজাত নারীরা (রানীরা) শরীরের উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখত। ডক্টর অতুল সুরের মতে ক্রীটে প্রচলিত লিপির সঙ্গে, বাঙলার 'পাঞ্চ মার্কযুক্ত' মুদ্রায় উৎকীর্ণ লিপির সাদৃশ্য ছিল। তাঁর মতে আলপীয় বর্গে (আরামিক?) বণিক "হিট্টি" নামে পরিচিত। প্রাচীন বাঙলায়ও বণিকরা 'হট্টি > হাটি' নামে ছিল আখ্যাত। ডক্টর অতুল সুর বলেন বর্ধমান জেলায় 'হাটী' জাতি এখনো বর্তমান। সমার্থক শ্রেষ্ঠী শব্দ এ সূত্রে স্মর্তব্য। এই 'হাটী' যে বণিক বা বাণিজ্যিক পণ্য বাচক হিট্টি সংপৃক্ত নাম তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। ঋগ্বেদে বণিক 'পণি' নামে অভিহিত, বৌদ্ধ যুগে বণিক ছিল 'সার্থবাহন' পরে হয় 'সাধু' নামে পরিচিত। পণির ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্যই 'পণ্য'। আলপীয় আর্যভাষীরা কি বণিক হিসেবেই এশিয়া মাইনর, আশশিরীয়া, দক্ষিণ ইরান হয়ে অসুরপন্থীরূপে বাঙলায় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেছিল,—যার ফলে এখানে আলপীয় নরগোষ্ঠীর বাহুল্য দেখা যায়? এবং এজন্যেই কি বৈদিক আর্যরা এ অঞ্চলের লোককে অসুর (পূজক) নামে অভিহিত করত? উল্লেখ্য যে অসুর আশশিরীয়দেরও পূজ্য এবং অহোরামজদার উপাসক জোরথুস্ত্রেরও জন্ম আশশিরীয়রাজ্য সীমান্ত ইলাম অঞ্চলে। জর্জ গ্রিয়ার্সন গুজরাটী-মারাটীর সঙ্গে উড়িয়া-বাঙলা-আসামীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। মনে হচ্ছে এ সাদৃশ্য আলাপীয় বর্গের আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর প্রভাবজ। বাঙলার প্রাচীন ভাষাকে অসুর ভাষা বলার মূলেও হয়তো অসুরপন্থী আলপীয়দেরই নির্দেশ করা হত।

প্রত্নপ্রস্তর, নব্যপ্রস্তর তাম্রাশ্ম বা ব্রোঞ্জ যুগেও যে অন্তত রাঢ় অঞ্চলে জনবসতি ছিল, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত পাথুরে হাতিয়ার থেকে তা বিশ্বাস করতে পারি। নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষি ও বয়নশিল্পের উদ্ভবের, পশুপালনের ও যাযাবর জীবনাবসানের আভাস পাই। এ সময়ে এরা মৃতকে কবরস্থ করত এবং খাড়া লম্বা পাথর বসিয়ে চিহ্নিত রাখত—বীরকাঁড় নামের এই খাড়া পাথর মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, হুগলিতে ও অন্যান্য স্থানে মেলে।

ব্রোঞ্জযুগে বাঙালিরা কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক। পাণ্ডুরাজার ঢিবির সঙ্গে মহাভারতীয় পাণ্ডবদের সম্পর্ক থাক বা না থাক আমরা মোটামুটিভাবে আজ থেকে সাড়ে তিন বা চার হাজার বছর আগেকার রাঢ়বাসীর কিছু খবর পাচ্ছি। আমরা দেখলাম বাঙলাদেশে উচ্চবিত্তের বা উচ্চবর্ণের শ্রেণী হচ্ছে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ। আর সবাই নির্দিষ্ট বৃত্তিজীবী। ব্রাহ্মণরা গুপ্ত আমলে রাজশক্তির প্রয়োজনে নগণ্য সংখ্যায় বাঙলায় আসে, তারা যজ্ঞের পৌরোহিত্য জানত না। কিংবদন্তির আদিশূর কিংবা বল্লাল সেন কর্তৃক নতুন করে বেদজ্ঞ ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আনয়নের তাই প্রয়োজন হয় এবং তাদের অনুচর বা ভৃত্য হিসেবে আসে ঘোষ, গুহ, বসু, মিত্র, দত্ত [দত্ত কারো ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে] প্রভৃতি। বাঙলাদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কখনো ছিল না। বাঙলায় ব্রাহ্মণের সংখ্যাধিক্যের আলোকে বিচার করলে মেল-পটিবিন্যাসের সময়ে দেশী লোকও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য হয়েছে বলে মানতে হবে। দাক্ষিণাত্যের অনার্য অবয়বের ব্রাহ্মণদের কথাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। আসলে বাঙলায় বৌদ্ধ বিলুপ্তির সুযোগে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ গড়ে ওঠে সেন-আমলে কৃত্রিম (বল্লালসেনী কৌলীন্য প্রথা) বর্ণ বিন্যাসের ফলে—যার জের চলে জাতিমালা কাচারী, গাঁই-পটি-মেল বিন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে সতেরো শতক অবধি। নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় কিন্তু বাঙলার জনগণের মধ্যে বৈদিক আর্যভাষীর রক্ত কিংবা অবয়ব মেলে না। কোনো কোনো নৃবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তই এ ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে হয়। তাঁদের মতে বাঙলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চবর্ণের লোকগুলো (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা) আর্যভাষী আলপীয় এবং অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের পরে সমুদ্রপথে বাঙলায় উড়িষ্যায় প্রবেশ করে এরা। এরাই প্রভুত্ব করতে থাকে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের ওপর। এদের জীবিকার ও সেবার প্রয়োজনে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের মধ্যে থেকে যাদের এরা সহযোগী ও সেবক হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই হচ্ছে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের শূদ্র—উত্তম ও মধ্যম সঙ্কর তথা স্পর্শযোগ্য বা জলাচারযোগ্য শ্রেণীর নির্দিষ্ট পেশার ও প্রশ্রয়ের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ (সৎশূদ্র ও সদগোপ)। অন্যেরা রইল নির্দিষ্টহীন হীনবৃত্তিজীবীরূপে, চিরনিঃস্ব অস্পৃশ্য হয়ে—যারা 'অন্ত্যজ'রূপে অভিহিত। বৌদ্ধযুগে হয়তো নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির বৌদ্ধরা তেমন অস্পৃশ্য ছিল না।

মোটামুটিভাবে বলতে পারি বৌদ্ধ বিলুপ্তি থেকেই অস্ট্রিক-দ্রাবিড় নর-গোষ্ঠীর তথা আদি বাঙালির দারিদ্র্যের সঙ্গে সামাজিক ঘৃণা ও দুর্ভোগের বৃদ্ধি। আলপীয় যুগেই যারা অরণ্যাশ্রিত হয় তারা কোল-ভীল মুণ্ডা প্রভৃতি গোত্রীয় নামে আজো স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে উপজাতি অভিধায়; এদের নির্বিত্ত নিঃস্ব জ্ঞাতিরা হাড়ি-ডোম-চণ্ডাল-শবর, কাপালি-বাগদী-মুচি-মেথররূপে দাস ও হীনকর্মের লোক। আর মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী তাদের কাছে মোচ্ছ। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের মধ্যে সদ্‌গোপ কৈবর্তরা বৌদ্ধযুগে এবং মল্লরা মধ্যযুগে বাহুবলে কোথাও কোথাও স্থানিক প্রাধান্য লাভ করে। [দিব্যক-রুদ্রক-ভীম কিংবা ইছাই-সোম ঘোষ অথবা মধ্যযুগে রাঢ়ের মল্লদের কথা স্মর্তব্য]।

অতএব, পাণ্ডুরাজার ঢিবি-সভ্যতার স্তর অতিক্রম করার আগেই এখনকার বাঙলাভাষী অঞ্চলে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত প্রচারিত হতে থাকে এবং বাঙলাদেশ পরবর্তী দুই হাজার বছর ধরে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর কবলিত থাকে, ঐ দুই হাজার বছর ধরে তাদের স্বসত্তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কিংবা আত্মবিকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। মৌর্য-শুঙ্গ-কন্ব-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কি-মুঘল-ব্রিটিশ শাসকদের সবাই ছিল বিদেশী। তাদের শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও প্রাশাসনিক শাসনে-শোষণে দেশীলোক আর কখনো সমষ্টিগতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ক্ষুদ্র ও স্বাধীন সামন্ত ও আঞ্চলিক রাজারা—চন্দ্র, বর্মণ, খড়্গ, গুপ্ত, দেবরাও দেশী ছিল না। দেশের আদি অধিবাসী ও আসল মালিকরাই প্রতাপে প্রবল প্রভুদের সেবাদাসরূপে মানবিক অধিকারবঞ্চিত হয়ে প্রায় প্রাণীরূপেই প্রাণে বেঁচে রইল মাত্র। গৃহপালিত পশুর আদর-কদর-যত্নও তারা কোনোদিন পায়নি। তাদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শ্রেণী আলপীয় নরগোষ্ঠীরা এবং কিছু বুদ্ধিমান যোগ্য অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ও ব্যক্তিগতভাবে প্রভুগোষ্ঠীর প্রয়োজনে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হবার সুযোগ রাজনীতিক নিয়মেই লাভ করেছিল নিশ্চয়ই। বিভিন্ন সময়ের ও পর্যায়ের বর্ণবিন্যাসকালে তারাও উচ্চতর বার্ণিক স্তরে উঠেছে অবশ্যই। তাই আজকের বাঙলায় আমরা বর্ণহিন্দুর বহুলতা প্রত্যক্ষ করছি। বাঙালির আবর্তন-বিবর্তন-উন্নয়ন চলেছিল বিদেশী ভাষা-শাস্ত্র-সংস্কৃতি শাসনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ও নিয়ন্ত্রণে। তাই বাঙালির চিন্তা-চেতনায়, জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎ-ভাবনায় একটি অদৃশ্য স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা থাকলেও বাহ্যত তার সবকিছুই অনুকৃত।

বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মী-বিজাতির শাসন তার স্বসত্তা-চেতনার বৃদ্ধি রোধ করেছিল। বাঙালি রইল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের চোখে উত্তম সঙ্কর, মধ্যম সঙ্কর ও অন্ত্যজ নামের কামার-কুমার-চামার-কাঁসার-তাঁতি-হাড়ি-ডোম-জেলে-চাঁড়াল-বাগদী-ধোপা-নাপিত-তেলী-গোপ-কেউট, ক্ষুদ্র বেণে প্রভৃতি অবজ্ঞেয় পেশাজীবী হয়ে। বাঙলা-আসাম-উড়িষ্যা এবং দক্ষিণপূর্ব বিহারের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় মানুষের—দেশজ বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষের দুই হাজার বছর ধরে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল অবস্থা। বস্তুত উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকেই উক্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নির্জিত নির্যাতিত গণমানব বিরুদ্ধ-পরিবেশেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সামান্য সুযোগ পাচ্ছে। বিদেশী প্রভাব ও পরাধীনতা-যে আত্মবিকাশের পথে কী দুলর্জ্ঘ্য বাধা—দু'হাজার বছরের খাঁটি বাঙালিই তার প্রমাণ। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়বর্গের নরগোষ্ঠী বহু বহু কাল উত্তরভারতীয় আর্যভাষীর প্রভাবমুক্ত ছিল বলে আর্যশাস্ত্র গ্রহণ করেও তারা স্বাতন্ত্র্যে ও স্বাধিকারে স্বস্থ ছিল। রাষ্ট্রকূট-চৌল-চালুক্য-পল্লব সাম্রাজ্য ও ভাষাগুলো তার প্রমাণ।

অতএব, বাঙলার প্রচলিত শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতিক ইতিহাসে বাঙালি নেই। সেখানে রয়েছে উত্তরভারতীয় জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ও তুর্কি-মুঘলের কৃষি ও কীর্তির বিবরণ। সে-ইতিহাস পড়ে আমরা-যে কেবল আত্মপরিচয় ভুলি তা নয়, নিজেদের জ্ঞাতিদেরও ঘৃণা করতে শিখি।

অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল বাঙালির পরিচয় মেলে তাদের জীবনচেতনার ও জগৎ-ভাবনার ফসল সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে, কায়াসাধনতত্ত্বে, রজ-শুক্র চর্যায়, দারু-টোনা-বাণ-উচাটন-বশীকরণ শক্তির চর্চায়, ডাক-ডাকিনী যোগী-যোগিনীর মাহাত্ম্য ও প্রভাব শিকারে, তাদের কৃষিতত্ত্বে ও আবহাওয়া চেতনায়; বৌদ্ধমতের মহাযান-সঞ্জাত মন্ত্র-কালচক্র-বজ্র-সহজ যানে, লোকায়ত শাস্ত্রে ও লৌকিক দেবতার উদ্ভাবনে, বৈষ্ণব সহজিয়া মতে, বাউলতত্ত্বে, চৈতন্যের প্রেমবাদে, পীর-নারায়ণ সত্যের উপলব্ধিতে; আর বেদে-তাঁতি-পোদ-কিরাত-নিষাদ প্রভৃতি অন্ত্যজশ্রেণীর আচারে-সংস্কারে এবং তথাকথিত উপজাতির জীবনপদ্ধতিতে। সবচেয়ে বেশি মেলে বাঙালির চেতনার গভীরে জগৎ ও জীবনভাবনায় নারীদেবতার প্রভাব স্বীকারে, চণ্ডী কালী দুর্গা মাতৃকা পূজায়, অরি দেবতারূপেও ওলা ষষ্ঠী শীতলা মনসা প্রভৃতি নারীদেবতা কল্পনায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথের চেতনায়ও নারীই জীবন নিয়ন্ত্রক এবং জগৎ-নিয়ামক শক্তি ও জীবনদেবতা। তাঁর কাব্যে গানে তাঁর এ ধারণাই মুখ্যত অভিব্যক্তি পেয়েছে।

সামন্ত-বুর্জোয়া সমাজে যেমন হয়ে থাকে, আর্থিক ক্ষেত্রে এখানে গণমানুষের অবস্থা তাই ছিল। শ্রম দিত গণমানব, আর ফল ভোগ করত শাহ্-সামন্ত ও তাদের সহযোগী আমলা-মুৎসুদ্দীরা। গণমানবের মানবিক অধিকার ছিল না, তারা ছিল শাসক-প্রশাসক গোষ্ঠীর ও তাদের সহযোগীদের ভোগ-উপভোগ সামগ্রীর যোগানদার ও সেবক। তাই তারা যদিও ধান, সরিষা, মরিচ, হলুদ, ডাল, কার্পাস, আখ [পৌঁড়<পৌণ্ড্র = ইক্ষু] প্রভৃতি চাষ করত, গুড়-চিনি তৈরি করত, কাপড় বানাত এবং সুপারি-নারিকেল আম-জাম-কাঁঠাল-কলা-তেঁতুল, লাউ, কুমড়া, পুঁই, ঝিঙা, বেগুন, কন্দ, আলু, নটে কলমি তাদের ভোগ্য ফল-মূল-পাতা, আর পান ও বরজ বাঙালিরই। তবু ভোগ-উপভোগের অধিকার ছিল না তাদের। তারা এসবের উৎপাদক ও শ্রমিক বটে, কিন্তু এ- যুগের কারখানার কিংবা চা-বাগানের শ্রমিকদের মতোই ছিল তাদের অবস্থা। গামছা থেকে মসলিন অবধি কাপড় কিংবা রেশম তাদের হাতেই তৈরি হত বটে, বেচত বেনেরা, পরত অন্যেরা, লাভ লুটত বেনে-ফড়েরা। ওরা পরত গামছা, কৌপিন আর আঁটধুতিও হয়তো। সুপ্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত, সমন্দর, গঙ্গা, বাঙলায় বটে, এমনকি সপ্তগ্রামে আন্তর্জাতিক পণ্য-বিনিময় তথা ব্যবসা-বাণিজ্য চলত বটে, কিন্তু খাঁটি বাঙালি ব্যবসায়ী ছিল না, পণ্যদ্রব্যাদির অনেকগুলোই বাঙলারও ছিল না। ব্রিটিশ আমলের কোলকাতা বন্দরের বাণিজ্য ও বণিকদের কথা এ সূত্রে স্মর্তব্য। কাজেই খাঁটি বাঙালির দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা কখনো ঘোচেনি। বাঙলার বৃত্তিজীবী ও চাষী মাত্রই ছিল চির-অবজ্ঞেয় ও বঞ্চিত মানুষ। যদিও দরিদ্র ব্রাহ্মণও ছিল কৃষিজীবী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মা, নারী-পশু-পাথর ও বৃক্ষ দেবতা, মূর্তিপূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ (নবীবাদ), কায়াসাধন, মন্ত্রশক্তি ও যাদুবিশ্বাস, শবরোৎসব, নবান্ন, পৌষপার্বণ, চড়ক গাজন প্রভৃতি; শুভকর্মের যাদুপ্রতীক চাউল, খই, কলা, নারিকেল, পান-সুপারি, আম্রসার, হলুদ, দূর্বা, দধি, মাছ, ঘট, আল্পনা, শঙ্খধ্বনি, গোময় ইত্যাদি আর চণ্ডী, মনসা, বাসুলী, ষষ্ঠী, শীতলা, ধর্মঠাকুর, জাঙ্গুলি প্রভৃতি বাঙালির লোকায়ত দেবতা এবং কালিক তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন প্রভৃতিও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মঙ্গোল বাঙালির নিজস্ব।

এসব সংপৃক্ত উপকথা, ব্রতকথা, পুরাণকথা, আচার ও সংস্কার প্রভৃতিও তাই তাদের মন-মনন প্রসূত। পরবর্তীকালের পীর-নারায়ণ সত্য ও তার দেবকল্প অনুচর পীর ও উপদেবতারাও সমকালীন জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা হিসেবে পরিকল্পিত।

কারো গৌরব বা লজ্জা আবিষ্কার আমাদের লক্ষ্য নয়, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি তো নয়ই, আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য বাঙালির গোষ্ঠীগৌরব নিরূপণও নয়।

ক. আর্য-গর্ব ও অনার্য লজ্জা-যে অহেতুক এবং স্বাধীন বিকাশের পরিপন্থী,

খ. আভিজাত্যবোধ কিংবা হীনম্মন্যতা-যে মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ-বিকাশের প্রতিকূল,

গ. জন্মসূত্রে নয়, জ্ঞান-প্রজ্ঞা-কর্ম ও চরণ সূত্রেই-যে মানুষ ছোট বা বড় হয়,

ঘ. গোত্র শাস্ত্র বা স্থানভিত্তিক মানুষের সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা-যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এবং দুর্বলের ওপর পীড়নের ও অপ্রেমের কারণ,

ঙ. সর্বপ্রকার জুলুম মুক্তিতেই-যে দেশ-দুনিয়ার ব্যক্তির ও সমষ্টির নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিহিত ; মানুষের জ্ঞানের, প্রজ্ঞার, মানবিকগুণের ও শ্রেয়োবুদ্ধির বিকাশ-যে সাধন হবে ভবিষ্যৎকালে, অতীত তাকে-যে আর কিছুই দেবে না-তার কল্যাণ-যে সামনে, পেছনে নয় ;

চ. সবার ওপরে মানুষ ও মনুষ্যত্বই-যে মানুষের অভয় শরণ, নির্বিশেষ মানব-চেতনাতেই-যে মানবিক সমস্যার সমাধান নিহিত, এবং মানুষের দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-লাভ-লোভের ইতিকথা-যে এ-শিক্ষাই দেয়—তা জানবার বুঝবার জন্যেই এ আলোচনা আবশ্যিক বলে মেনেছি।

দুই হাজার বছর আগের গ্রামীণ সমাজ

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের অনুপস্থিতি আগের যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে পরিবর্তনের বড় বাধা হয়ে ছিল। তাই মনে-মননে যেমন, ব্যবহারিক জীবনেও তেমনি মানুষ ছিল গতানুগতিক। সে-কারণেই ভারতের মানুষের নিত্যকার জীবনাচরণ মহাভারতের যুগে যেমন ছিল, বৌদ্ধযুগে যেমন ছিল, খ্রিস্টীয় আঠারো শতক অবধি তার কিছু কিছু অবিচল-অবিকৃতভাবে মেলে এবং এই মুহূর্তের গ্রামীণ জীবনেও তা দুর্লভ নয়। কোনো কোনো ফুল-পাখি-প্রেম-প্রকৃতি চিরকালই মানুষ-নির্বিশেষের জীবনে কমবেশি প্রভাব রেখেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনি নানা ঐহিক-পারত্রিক জীবন-জিজ্ঞাসাও মানুষকে বিচলিত করেছে। প্রাণী হিসেবে যা যা মানুষের সহজাত বৃত্তি-প্রকৃতি, তার প্রকাশে-বিকাশেও তারতম্য সামান্য। উৎপাদনব্যবস্থায় ও সামন্তশাসনে কোনো পরিবর্তন ছিল না বলে দুনিয়ার সর্বত্র গ্রামের ও জ্ঞানচক্ষুবঞ্চিত কৃষক-শ্রমিকের জীবনের রূপ প্রায় অভিন্ন। দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, বিশ্বাস ও সংস্কার-নির্ভরতা, নিয়তিতে বা অদৃষ্টে আত্মসমর্পণ প্রভৃতি সর্বত্র অভিন্ন।

হালের গাথাসপ্তশতী সাতশতকে সংকলিত বলে কথিত। কাজেই কিছুসংখ্যক গাথা আরো দুশো বছর আগে রচিত বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। অতএব খ্রিস্টীয় পাঁচশতকের ভারতের বিশেষ করে দক্ষিণাপথের লোকজীবনের সংবাদ মেলে গাথাগুলোতে। কারো কারো মতে হাল খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথমার্ধের লোক। এ তথ্য স্বীকার করলে গাথা-বিধৃত জীবনচিত্র হবে খ্রিস্টপূর্ব ২য়-৩য় শতাব্দীরও।

সেদিনও লাঙল-জোয়াল ছিল, গরু-মোষ দিয়েই কৃষাণ কর্ষণ করত জমি। তিল, ধান, শন, সরিষা সযত্নে উৎপাদিত হত। সেদিন নানা রঙের ও গুণের ধানের চাষ হত—শালি, কলম প্রভৃতি নানা নাম ছিল ধানের। সেদিনও শরতে নতুন চালে নবান্ন-উৎসব হত। নতুন ধান গোলায় তুলে সদ্য খাদ্যাভাবমুক্ত চাষীরা আপাত নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ করত—নাচ-গান-বাজনার আসর বসত গাঁয়ে। সেদিনও চাষীরা সময় বাঁচানোর জন্যে ক্ষেতের ধারে বসেই দুপুরের খাবার খেত—খাবার নিয়ে আসত বউ-ঝিরা কিংবা বুড়ো মা-বাপেরা।

আজকের মতো সেদিনও গরিবের ঘর হত পাতার, খড়ের, খড়ির, কঞ্চির কিংবা বাঁশের বেড়ার ও মাটির। ঘরের চারদিকে ঘিরে আড়াল করা হত বউ-ঝির আব্রু-রক্ষার জন্যে, সেদিনও ঘরে সংসারে নারী-পর্দায় গুরুত্ব ছিল। বধূরা ঘরের বাইরে উৎসব-পার্বণকাল ছাড়া যেতে পারত না। গুরুজনের সুমুখে স্বামীর সঙ্গে কথা বলার রেওয়াজ ছিল না, একান্নবর্তী পরিবারে বধূর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল বহু ও বিবিধ। নীরবে সহ্য করতে হত অনেক অত্যাচার আজো যেমন কোনো কোনো ঘরে করতে হয়। সেদিন গাঁয়ের বটতলাই ছিল বারোয়ারি পার্ক ও মিলনায়তন। সেদিন পদ্ম-পুকুরই গাঁয়ের শোভাবর্ধক উদ্যানের ভূমিকা পালন করত। নারী-অঙ্গের শোভাবর্ধক অলঙ্কার ও প্রসাধন সমগ্রী ছিল ফুল। পদ্ম ছিল নানা জাতের ও নামের—কমল, কন্দট, তামরস, পুণ্ডরীক। অন্যান্য ফুলের মধ্যে প্রিয় ছিল কাশ, কুন্দ, কুবলয়/শাপলা, কুরুবক, কদম্ব, মালতী, বকুল, সপ্তলা, নবমল্লিক, পলাশ, কুসুম্ব, মধুক, শেফালিকা, পাটল, মরুবক প্রভৃতি। বট, নিম, আম, অশোক, মধুক, অঙ্কোট, বদর/বরই, তাল, রক্তপাটল প্রভৃতি বৃক্ষের নাম কাব্যালঙ্কারে ব্যবহৃত হত।

শুক-শারী, ময়ূর, পায়রা, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি ছিল গৃহপালিত পাখি। কাক-বক কাব্যালঙ্কারে বহুল ব্যবহৃত। কাঁকড়া, শামুক, ব্যাঙ, মাকড়সা, কেঁচো, মধুকর/মৌমাছি, ভ্রমর প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণীপতঙ্গ যেমন ;.তেমনি নানা জাতের মৃগ/কৃষ্ণসার, পৃশ্রত/, গাভী, বলদ, ষাঁড়, হাতি, বাঘ, সিংহ, মোষ, বিড়াল, কুকুর, শিয়াল, বানর প্রভৃতিও কাব্যে অবহেলিত হয়নি। গজবধূ, গজকলভ প্রভৃতি কাব্যিক প্রয়োগও লক্ষণীয়। নদীর মধ্যে পাই গোদাবরী, নর্মদা, তাপ্তি, রেবা ও যমুনা।

রাস্তাঘাট ছিল বটে, তবে কাঁচা রাস্তা বর্ষাকালে বিশেষ কেজো থাকত না। গাথায় রাস্তার সাধারণ নাম 'রথ্যাস'। চৌরাস্তাকে বলা হত 'চত্বর'। গাঁয়ে গাঁয়ে কুয়ো-ইন্দারা থাকত। চাকা-যোগে কুয়ো থেকে পানি তোলার ব্যবস্থা ছিল। এ যন্ত্রের নাম 'রহট্ট বা অরহত'। এখোগুড় তৈরির জন্যে ছিল 'গুড় যন্ত্রিকা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সচ্ছল গৃহস্থ বউ-ঝিরা ঘর-সংসারের রান্নাদি গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকত। সচ্ছল ঘরে ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য ও রান্নার উন্নত মান ছিল। গরিব ঘরে আজকের মতোই অশন-বসনের অভাব ছিল। সে-যুগেও ব্যবস্থা-সূত্রে লোক প্রবাসী হত এবং সে-সূত্রেই সাহিত্যে প্রেম ও বিরহ-যন্ত্রণা পরিব্যক্ত। ডাকব্যবস্থা ছিল না বলে লোক মারফত চলত সংবাদ আদান-প্রদান। সে-সংবাদ মুখে বা পত্রযোগে অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রেরিত হত। আজকের মতোই কোনো কোনো প্রোষিতভর্তৃকা ভ্রষ্টা ও কুলত্যাগিনী হত। ঋতুবৈচিত্র্যের প্রভাবে বিরহী-বিরহিনীদেরও মনে বিরহবিকারের মাত্রাভেদ হত। বর্ষায় ও বসন্তে বিরহ-যন্ত্রণা হত প্রবল। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করবার জন্যে আজকের দিনের সাবানের মতোই ব্যবহৃত হত হলুদ। রজস্বলা নারীরাও হলুদ স্নান করেই হত পবিত্র।

গ্রামীণ সমাজে থাকত সমাজপতি। তাকে দাক্ষিণাত্যে বলত 'গ্রামনী' এবং 'ভোজক'—গাঁয়ে তার প্রভাব ও প্রতাপ ছিল অসামান্য। সে-সুযোগে তার সন্তানরাও প্রায়ই উৎপীড়ক ও লম্পট হত। ভোজকের স্ত্রীকে ভোগিনী বলা হত। এ-যুগের মন্ত্রীর সন্তান-শ্যালকদের মতোই ছিল তাদের দর্প ও দাপট এবং ক্ষমতার ও প্রভাবের অপব্যবহার করত তারা। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। কোনো কোনো গ্রামনী ছিল সুশাসক ও গণদরদী। গ্রামনীর ওপরই ছিল গ্রাম-শাসনের ভার। সে ছিল অনেকটা ফৌজদার ও ম্যাজিস্ট্রেট, তার অধীনে থাকত দোসাধীক (চর) পুলিশ। আবার এক-এক গোত্রের গোত্রপতিও থাকত, তাকে বলা হত 'গণাধিপতি'। সেদিনও ঘরোয়া জীবনে শাশুড়ি-বধূর মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ হত। ননদরা ভ্রাতৃজায়াদের কথার খোঁচায় করত ক্ষত-বিক্ষত। সতিনের সংসারে দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ছিলই। সেদিনও দেবর-ভাবীর মধ্যে কোথাও কখনো কখনো অবৈধ প্রণয় ঘটত। সেদিনও স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হলে স্বামীরা স্ত্রী এবং স্ত্রীরা স্বামী ত্যাগ করত। সেদিনও ঘরে ভ্রষ্টা বধূ ও কন্যা দুর্লভ ছিল না। সোমত্ত পুত্র-কন্যারা সেদিনও যৌবন রাগে হত বিচলিত। অবৈধ প্রেম ও লাম্পট্য সেদিনও গাঁয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করত—কঠোর-কঠিন শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। তবু যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধবে কে! বয়োধর্মসঞ্জাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির এ বহির্প্রকাশ মানবসমাজে দেবধর্মের দোহাই, সমাজ-সংস্কৃতির শাসন অতিক্রম করেই ঘটেছে চিরকাল। অসম ও অসবর্ণ অবৈধ প্রেম সেদিনও দুর্লভ ছিল না। বেশ্যাবৃত্তি তো ছিলই। বহুবিবাহ ইতর-ভদ্র সবার মধ্যেই কমবেশি চালু ছিল। চাচি মামি মাসিদের কাছেও মেয়েরা দাম্পত্যপ্রেমের হ্রাসবৃদ্ধি, তারল্য ও গাঢ়তা নিয়ে আলাপ করত। ভদ্রা তিথি ও মঙ্গলবার ছিল যাত্রার পক্ষে অশুভ। দৈবজ্ঞ ও গণকের প্রভাব ছিল অবিচল। নিয়তিতে বা অদৃষ্টে বিশ্বাস ছিল গভীর ও ব্যাপক।

সেকালের সংস্কারগুলো আজো চালু রয়েছে আমাদের মধ্যে। যেমন সাঁজবাতি জ্বালাবার সময়ে কাঁদা বা অশ্রুপাত অমঙ্গলকর, নারীর বাম বা ডান চোখের নাচনজাত শুভাশুভ, নারীকে ভূতে বা জিনে পাওয়া। চাষ করার মুহূর্তে লাঙল জোয়ালে যাদুপ্রতীক চিত্র এঁকে দিত নারীরা, গৃহদ্বারে বসানো হত মঙ্গলঘট, সজল মঙ্গলঘটে আম্রসার থাকত। অভিপ্রেত অতিথিকে বরণ করবার জন্যে গৃহদ্বারে ঝুলিয়ে রাখা হত ফুলের মালাও।

সেদিনও ভিখারি ছিল, গৃহস্থের কল্যাণকামী ভ্রাম্যমাণ নারী-পুরুষও ছিল, এদের বলা হত সুখ-পুছক/কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসু/সুখপুছিকা। মনে হয় এরা শুভকামনার বিনিময়ে জীবিকা সংগ্রহ করত। গাঁয়ে গাঁয়ে বৈদ্য-ওঝাও ছিল। জ্বর আমাশয়ই ছিল বেশি। প্রায় সব ওষুধই হত তেতো। উৎসবে পার্বণে ব্রত উদ্‌যাপনকালে চালের গুঁড়োয় গুড়ে তেলে হত পিঠা পায়েস প্রভৃতি। প্রতিবেশীদের ঘরে মিষ্টি পাঠানোর রীতিও সনাতন। উৎসবে-পার্বণে নৃত্য গীত বাদ্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা ছিল। বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে নারী-পুরুষ বহিরাঙ্গন উৎসবে মিলিত হত এবং মদ্যও পান করত। রঙের বিকল্প হিসেবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়িও ছিল চালু। হোলিও প্রাচীন পার্বণ। নারী পুরুষ সবাই মনে হয় ঘরোয়া জীবনেও হাড়িয়া মদে ছিল আসক্ত। শুঁড়ির দোকানও ছিল অবিরল। তবে প্রাত্যহিক জীবনে গৃহবধূর পর্দা, দায়-দায়িত্ব ও আচার-আচরণ মোটামুটি একালের মতোই ছিল বলে মনে হয়। ওদের সমাজে আজকের মতোই আদর্শ মানুষ ছিল সেই, যে দুঃখে অবিচল, সুখে ঐশ্বর্যে নিরহঙ্কার, বিপদে ধৈর্যশীল ও স্থিতধী ; বুকে মুখে ও কথায় কাজে অভিন্ন এবং সর্বদা ও সর্বথা বিশ্বস্ত ও সংযত।

সেদিনও ভিখারি যেমন ছিল, তেমনি ছিল নিঃস্ব শ্রমনির্ভর গৃহস্থ—যাদের ছিল ভিন্ন বস্ত্র ও জীর্ণ কন্থা, ঘরে ফুটো চালের পানির উপদ্রব। হরিণ চামড়ার/ অজিনাসন/ আসনও ছিল সচ্ছল গৃহস্থ ঘরে। বুটিদার কাঁচুলি যেমন ছিল, তেমনি ছিল মুখ ঢেকে বের হবার মতো টুকরো কাপড়ের বোরখা বা মুখাবরণ। বস্ত্র তখনো নানা রঙের হত। রেশমি বস্ত্রও ছিল। সধবারা অর্থ-বিত্তানুযায়ী অলঙ্কার পরত। সোনা-রুপার কণ্ঠহার, কণ্ঠ গুটিমালা, তার, কাঁকন, বালা, খাড়ু, ছাড়াও ধনীগৃহে দামি পাথরের গজদন্তের ও মুক্তাদির অলঙ্কারও দুর্লভ ছিল না। তবে গরিবের অলঙ্কার হত তালপাতা, জুম কাঠ, পদ্ম প্রভৃতি দিয়ে। সেদিনও কানে নাকে কপালে কণ্ঠে বাহুতে, আঙুলে, কটিতে, পায়ে অলঙ্কার পরত। সেকালেও ফুল বিক্রির পেশা চালু ছিল, মালিনীরা বেচত মালা। মেয়েদের ঠোঁটে মোম মাখার রেওয়াজও ছিল। সেকালেও দাবা পাশা খেলা লোকপ্রিয় ছিল। পুরুষেও পরত হাতে কানে-কণ্ঠে অলঙ্কার।

সেকালেও চিত্রশিল্পের ও নৃত্যগীতবাদ্যের আদর-কদর ও চর্চা ছিল সাধারণের মধ্যে। রেখাচিত্র ও চিত্রার্পিত প্রতিকৃতির উল্লেখও রয়েছে। বাঁশি, ঢোল, খঞ্জনি প্রভৃতি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

অভিজ্ঞতা-সৃষ্ট আপ্তবাক্যগুলো আজো গ্রাহ্য ও ফলপ্রসূ—প্রভুর সদয় আচরণ, প্রেমাস্পদের অভিমান, সবলের সহনশীলতা, বিদ্বানের বাণী, মূর্খের নীরবতা—শোভন। 'আগুন ছাড়া কি ধূম হয়, বিনা মতলবে কি আম্রবনে মৌমাছি ঘোরে'—এমনি আরো মেলে। সে-যুগেও মেয়েদের বিয়ের পূর্বলগ্নে 'বিবাহমঙ্গল' গীতির রেওয়াজ ছিল, নাচত-গাইত মেয়েরাই। সে-গানের বিষয় হত বর-কনের নানা গুণাগুণ এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ-পরিহাসজ্ঞাপক গানও থাকত। তাছাড়া দাম্পত্য সুখ-শান্তির কামনা তো থাকতই। দাম্পত্যজীবনে বর-কনের প্রথম সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটত বিয়ের চতুর্থদিনে যখন কনে আসত বাপের বাড়ি। অসবর্ণ বা অসম না হলে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পছন্দের ও প্রেমের মর্যাদা দেয়া হত। বলাবাহুল্য, দাম্পত্য প্রেম গাঢ় থাকলে নারীর সহমরণে জোর খাটাতে হত না—স্বেচ্ছায় সহমরণে এগিয়ে আসত। সহমরণ কালে স্ত্রীরা বিধবার পোশাক পরত।

চুরি দারি প্রভৃতি অনৈতিক-সামাজিক অপরাধের শাস্তি দেয়া হত প্রকাশ্যে বহুজন সমক্ষে। ঢাক-ঢোল বাজিয়ে লোক জমা করা হত। প্রকাশ্যে নিন্দা রটিয়ে, লজ্জা দিয়ে, সমাজে পতিত করে, কায়িক শাস্তি দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে লোকমনে ভয়-ভরসা জাগিয়ে সামাজিক শাসনশৃঙ্খলা বজায় রাখত সমাজপতিরা। উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের ধনীদের থাকত ক্রীতদাস। এ-যুগের মতো মাস-মাইনের ভিত্তিতে বারোমেসে সুবিন্যস্ত ও সুবিপুল সৈন্যবাহিনী হয়তো তখন ছিল না, তাই মল্লজাতীয় সাহসী যোদ্ধাবীরের ব্যক্তিগত আদর-কদর ছিল সমাজে ও প্রাসাদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-যুগেও 'গাড়া আর মারা' ধনে ধনী হওয়া যেত। অর্থাৎ মাটির নিচে একের পুঁতে রাখা ধন আকস্মিকভাবে ভাগ্যবানের হস্তগত হত ; আর ডাকাতি ও লুণ্ঠনের সুযোগ তো সব যুগে কমবেশি মেলেই।

গাথাসপ্তশতীর একটিমাত্র পদে [১ম শতক ৮৯ সংখ্যক গাথা] রাধার উল্লেখ রয়েছে। আটশতকের আগে রাধা নাম অন্য কোথাও মেলে না, তাই এ পদটি পরবর্তীকালের ও প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। কৃষ্ণলীলার মুখ্যস্থল যমুনা নদীর নামও মেলে একবার মাত্র [৭ম শতক, ৬৯ সং গাথা]। এসব গাথা অবৌদ্ধ-অজৈনের রচনা। তাই জৈন বৌদ্ধের প্রাদুর্ভাব কালেও জৈন বৌদ্ধের অস্তিত্বের সন্ধান মেলে না কোনো প্রসঙ্গে। যদিও একবার মাত্র বুদ্ধচরণে প্রণামরত ভিক্ষুর উল্লেখ [৪র্থ শতক ৮ সংখ্যক গাথা] পাই। এটিও হয়তো প্রক্ষিপ্ত গাথা। সে-যুগেও কাপালিক-কাপালিকা ছিল [৫ম শতক ৮ সংখ্যক] গাথা।

পথের ধারে পথিক-পথচারীর জন্যে পান্থনিবাস বা শ্রান্ত পথিকের জন্যে ছায়াশীতল আশ্রয় নির্মাণ ও জলপূর্ণ ঘট-কলপ রাখাও সুপ্রাচীন পুণ্যকর্ম। একালেও পুণ্যার্থীরা রাস্তার ধারে পথচারীর জন্যে গাছতলায় কলসিভরা পানীয় ও পানপাত্র রাখে, বাঁশ বা সুপারি গাছ দিয়ে পথিকের বিশ্রামের জন্যে আসন তৈরি করে দেয় [অন্তত বিশ বছর আগেও দেখেছি]।

গাহাসত্তসঈ বা গাথাসপ্তশতীর সংকলক হাল দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রের সাতবাহন বংশীয় [আনুঃ ২৩০ খ্রিস্টপূর্ব থেকে ১৩০ খ্রীস্টাব্দ অবধি] সপ্তেদ্রোতম রাজা বলে বায়ু-মৎস্য-ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ-সূত্রে পরিচিত। কিন্তু এ তথ্য সন্দেহাতীত নয়। তবে তাঁকে সাধারণভাবে খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকের সাতবাহন [বাণভট্ট ও হেমচন্দ্রের উল্লেখ ক্রমে এবং ৫ম শতকের ৬৭ সং গাথা সূত্রে] বংশীয় নরপতি হিসেবেই স্বীকার করা হয়, কিন্তু তাঁর সংকলিত গাথাগুলোকে ভাবে ভাষায় [গাথার ভাষায় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের কালগত পার্থক্য স্পষ্ট] ও বিষয়বস্তুতে আরো পরবর্তীকালের বলে মনে হয়। কেউ কেউ হালকে পাঁচশতকের শালবাহন বংশীয় রাজা বলে অনুমান করেন। আমাদের ধারণায় হাল সাত-আট শতকে মহারাষ্ট্র [বা অন্ধ্রের দক্ষিণ-পশ্চিম হায়দরাবাদের] অঞ্চলের কোনো এলাকার [কুন্তল জনপদ-এর] সামন্ত রাজা ছিলেন।

বলেছি, এটি মুখ্যত প্রেম-বিষয়ক কবিতার সংকলন, প্রাসঙ্গিকভাবে তথ্য উপমাদি অলঙ্কার প্রয়োগ-সূত্রে ফুল, পাখি, পশু যেমন এসেছে ; তেমনি জীবন ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি আচার আচরণ উৎসব পার্বণ পথঘাট দেবতা মানুষ সুখ-দুঃখ প্রভৃতির ও আর্থিক জীবনের উল্লেখ মেলে। হর-গৌরী, কৃষ্ণ-গোপী প্রভৃতি ছাড়াও রামায়ণ-মহাভারতের কোনো কোনো চরিত্রও প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখিত। সাতশত গাথার সবগুলোর রচয়িতার নাম মেলে না। গাথাসপ্তশতীর গঙ্গাধর-রচিত টীকা-সূত্রে জানা যায় ২৬১ জন কবির নাম। এঁদের মধ্যে আছেন ছয়-সাতজন মহিলা কবিও। হাল স্বয়ং ৪৪টির রচয়িতা। হাল বলেছেন, কোটি কোটি [অর্থাৎ অসংখ্য] প্রচলিত গাথা থেকে মাত্র সাতশত অলঙ্কার সুষমামণ্ডিত গাথা তিনি তাঁর এই কোষগ্রন্থে সংকলন করেছেন।

গাথাসপ্তশতীর অনুকরণে বারোশতকে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি গোবর্ধন আচার্য রচনা করেন 'আর্যাসপ্তশতী' এবং আরো পরে বিহারের এক কবি রচনা করেন 'বিহারী শতসঈ'। এগুলো মুখ্যত হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণলীলার আবরণে কাম-প্রেম সম্পৃক্ত বৃত্তি-প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি। এগুলোর মধ্যেও সমকালীন জীবন-জীবিকার ও সমাজ-সংস্কৃতির নকশা মেলে। গোবর্ধন আচার্যের আর্যসপ্তশতীর আর্যাগুলোয় প্রেম, প্রকৃতি, লোকচরিত্র, লোকায়ত বিশ্বাস-সংস্কার, ব্যঙ্গবিদ্রূপ-পরিহাস, ঘরোয়াজীবন, দারিদ্র্য, শোষণ-পীড়ন প্রভৃতি প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো দুটো সংস্কৃত সঙ্কলন গ্রন্থেও রয়েছে আপ্তবাক্যের সঙ্গে জগৎ ও জীবন সংক্রান্ত নানা বিষয়ের উল্লেখ ও চিত্র। এদের একটি বিদ্যাকর সংকলিত প্রকীর্ণ কবিতার চয়নিকা 'সুভাষিত রত্নকোষ'। এরই প্রথমাবিষ্কৃত খণ্ডাংশের সম্পাদক-প্রদত্ত নাম ছিল 'কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়'। এতে ১১১ জন কবির ছড়া-শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। বিদ্যাকর সম্ভবত এগারো শতকের লোক।

দ্বিতীয় সঙ্কলন গ্রন্থটির নাম 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। সঙ্কলক ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে মহামাণ্ডলিক বা উচ্চপদস্থ প্রশাসক। সঙ্কলিত পদ-সংখ্যা ২৩৭০টি। এগুলো প্রবাদ, প্রবচন, সুভাষিত উক্তি তথা জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তির সঞ্চয়ন। জীবন, সমাজ, ধর্ম, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক উক্তির মধ্যেও সমকালীন জীবন-জীবিকা ও সমাজ-সংস্কৃতির নানা তথ্য ও চিত্র রয়েছে। কয়েকটি পদে ক্ষুৎ-পিপাসাকাতর শীর্ণদেহ শিশুর, গৃহিণীর ছিন্নবস্ত্রের, সুচের ও অভাবের, জীর্ণঘরের ও ফুটো চালের বেদনা-করুণ বর্ণনা রয়েছে। এ সঙ্কলনে জ্ঞাত কবির সংখ্যা ৪৮৫।

গাথাসপ্তশতী ছাড়াও প্রাকৃতে অপভ্রংশে বা অবহটঠে রচিত গ্রন্থেও জীবন ও সমাজ সম্পর্কিত নানা প্রাসঙ্গিক তথ্য মেলে। পিঙ্গল বা ফণীন্দ্র রচিত ছন্দোশাস্ত্র গ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল', ডাকার্ণব, সুভাষিত সংগ্রহ, দোহাকোষ পঞ্জিকা, সররুহবজ্রের [সরহের] দোহাকোষ, কৃষ্ণাচার্যের [কানুপার] দোহাকোষ, তিলপার দোহাকোষ, চর্যাগীতি, শেখ শুভোদয়া প্রভৃতিতেও প্রাচীন সমাজকে স্বরূপ দেয়ার অজস্র উপকরণ রয়েছে।

পুরাতত্ত্ব আলোচনা কিংবা সমাজচিত্র দান আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমাদের এ প্রয়াসের মূলে রয়েছে একটিমাত্র দ্রষ্টব্য ও বক্তব্য : দেশ-দুনিয়ার বিশেষ করে ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রিত সমাজে ছোট কর্ম বলে নিন্দিত অথচ উৎপাদন-সম্পর্কিত পেশায় নিযুক্ত নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির অজ্ঞ অনক্ষর চিরনিঃস্ব নিষ্পেষিত শাসিত-শোষিত অবনতশির দাস-দুর্বল মানুষ—পাঁচ হাজার বছরে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির এত বিকাশ-বিবর্তন সত্ত্বেও যে আদিম বাধা ও বাধ্যতা অতিক্রম করে দেহে-মনে স্বাভাবিক বিকাশ পায়নি, পায়নি দেহে-মনে সুস্থ ও স্বস্থ হবার সুযোগ ও পরিবেশ শাহ-সামন্ত-শাস্ত্রী-সমাজপতির সনাতনী প্রথা-পদ্ধতির চাপে পড়ে— এ-ই শুধু দেখতে বলতে চেয়েছি। উৎপাদনব্যবস্থায় ও সামন্তশাসনে কোনো বিশেষ পরিবর্তন ছিল না বলেই এই মানুষের জীবনে বিপর্যয় ছিল খরা-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝা-মহামারীর আক্রমণে ও প্রবলের পীড়নে, কিন্তু বিবর্তন বিকাশ ছিল না, আজো যেমন নেই। উচ্চবর্ণের ও উচ্চবিত্তের জীবনধারায় শাস্ত্র-সমাজ-সরকার আবর্তন-বিবর্তন ও বিকাশ দিয়েছে—আর্থিক বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক কিংবা শৈল্পিক সাহিত্যিক দার্শনিক রাজনীতিক উত্থান-পতন এনেছে। কিন্তু দুর্বল-দুস্থ গ্রামীণ এমনকি শহুরে নিরক্ষর বৃত্তিজীবী মানুষের বৈষয়িক জীবন যেমন, মনোজগৎও তেমনি রয়েছে প্রায়-নিশ্চল নিস্তরঙ্গ। বিত্তবান ও শক্তিমানের শ্রেণীস্বার্থ-যে গণমানবের জীবনে কত বড় মানবতাবিরোধী বৈনাশিক অভিশাপ, তা শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মানস ও আর্থিক অবস্থান যাচাই করলেই বোঝা যায়। দেশ-দুনিয়ার গণমানব টবের তরুর মতো প্রাণে বেঁচে থাকে মাত্র। বাড়বিকাশ তার কোনোকালে ছিল না, আজো নেই। যন্ত্র ও কৃৎকৌশলের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে আজ তার ব্যবহারিক জীবনে পরিবর্তন আসছে ও এসেছে বটে, আনুপাতিক হারে মানসজীবন ও চেতনা রয়েছে হাজার বছরে পিছিয়ে। জ্ঞানচক্ষুর অভাবে জীবন ও জগৎ-প্রতিবেশ যাচাই করতে পারছে না বলেই তারা এ দুর্দশার শিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙলার গতর-খাটা মানুষের ইতিকথা

সাম্প্রতকালের নৃতাত্ত্বিক গবেষকদের মতে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসামের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে মুখ্যত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, আলপীয় আর্য এবং মঙ্গোলরক্ত।

অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে বলেই প্রাচ্যভারতের জনগোষ্ঠীর এক অংশকে আদি অস্ট্রাল (Proto Australoid) বর্গের জনগোষ্ঠী বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় তারা 'অস্ট্রিক' নামে পরিচিত। দক্ষিণ-ভারতের জনগোষ্ঠী 'দ্রাবিড়' নামে অভিহিত। মূলত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা [ভেড্ডিড] ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর জ্ঞাতি। সেখান থেকেই তারা জলপথে কিংবা উপকূলীয় স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করে এবং দাক্ষিণাত্যে আর বাঙলা-উড়িষ্যায় বসবাস করে। এখানে এসেছে তারা বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে।

আবার হিমালয়ের মালভূমি ও উপত্যকা অঞ্চল থেকে এবং লুসাই পর্বত বেয়ে এসেছে মঙ্গোল জনগোষ্ঠীর নানা বর্গের মানুষ।

প্রাচীন বাঙলায় উড়িষ্যায় ও ছোট নাগপুর অবধি বিহারে আর যারা প্রাচীনকালে কিন্তু অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের পরে এসে বাস করে তারা আলপাইনীয় বা আলপীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠী। তারাও এসেছে সমুদ্রপথে বাঙলায় ও উড়িষ্যায়। আর সম্ভবত স্থলপথে এসে বালুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মারাঠা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

নিগ্রো বা নেগ্রিটো প্রভৃতি আর যারা নানা কারণে ও প্রয়োজনে এখানে এসেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

অতএব, আজকের বাঙালি-বিহারী-উড়িয়া-আসামী রক্তসঙ্কর জনগোষ্ঠী হলেও কোনো কোনো গোষ্ঠীর ও বর্গের মানুষ মনন-উৎকর্ষের ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। কৃষিজীবী ও বৃত্তিজীবী হয় ওরাই। দুর্বল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়েরা অনেককাল ছিল ফল-মূল-মৃগয়াজীবী ও আরণ্য। তারা ছিল নিষাদ নামে পরিচিত।

কোল-ভিল মুণ্ডা, সাঁওতাল, কোরওয়া প্রভৃতি আরণ্য ও আদিবাসী উপজাতি আমাদের অস্ট্রিক-দ্রাবিড় জ্ঞাতি। কোচ-রাজবংশীরাও আমাদের জ্ঞাতি।

ফল-মূল-মৃগয়াজীবী আরণ্য মঙ্গোলরা অভিহিত হত 'কিরাত' নামে। কোনো কোনো নৃতাত্ত্বিক বিদ্বানের মতে আলপীয় আর্যভাষী বর্গের জনগোষ্ঠীই বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে উন্নত মনন ও আবিষ্কৃত হাতিয়ার প্রয়োগে জীবিকা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে এবং ক্রমে বিবর্তনের ধারায় প্রতাপে প্রবল হয়ে অন্যদের দাসে ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগানদারে পরিণত করে এবং এরাই পরবর্তীকালে বৈদিক আর্যভাষী প্রভাবিতসমাজে পেশানুসারে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থরূপে পরিচিত হয়। এই আলপীয় আর্যভাষীরা বৈদিক আর্যভাষীদের অবজ্ঞেয় ছিল অনেককাল। কিন্তু জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকারভুক্ত হওয়ার পর শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে নিজেরা হয়ে ওঠে শাসক-শোষক গোষ্ঠীর অনুগ্রহজীবী ও শরিক। কালে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজে তারা স্ব তথাকথিত গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

উচ্চবিত্তের ও উচ্চবর্ণের সুখী মানুষ এবং নিম্নবর্ণের নিম্নবৃত্তির ও নিঃস্ববিত্তের দুর্বল অজস্র মানুষের সেব্য ও প্রভু।

আর অস্ট্রিক-দ্রাবিড় বর্গের নরগোষ্ঠীরা রক্তসঙ্কর হয়ে স্বাতন্ত্র্য হারিয়েও আড়াই হাজার বছর ধরে রইল আত্মোন্নয়নের সুযোগবঞ্চিত ও জীবিকা নির্বাচনের অধিকাররিক্ত স্বল্প আয়ের অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী ও অস্পৃশ্য প্রাণী হয়ে।

এদের মধ্যে যারা ঐ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের ঘরে-সংসারে প্রাত্যহিক জীবনের আহার্য ও আবশ্যিক সামগ্রী যোগায় এবং যাদের প্রত্যক্ষ সেবা ও শ্রম ঘরে-সংসারে অপরিহার্য, তারাই পেল জলাচারযোগ্যরূপে কিছুটা অনুগ্রহ। তারাই সদ্গোপ, নাপিত, ধোপা, স্বর্ণকার, কর্মকার, কুম্ভকার, গোপাল প্রভৃতি।

অন্যরা—মুচি, মেথর, চাঁড়াল, বাগদী, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম, কপালী প্রভৃতি রইল অস্পৃশ্য হয়ে।

ইতোমধ্যে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রও এদেরকে সমাজভুক্ত করতে পারেনি।

কৃষিজীবী স্থায়ী ও স্থির নিবাসী সমাজেই সংস্কৃতি-সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। ফল-মূল-মৃগয়াজীবী যাযাবর ও আরণ্য-সমাজে সভ্যতার বিকাশ ঘটতে পারে না। যাযাবর কিংবা পথিক-জীবনে প্রয়োজন সংকুচিত করতে হয়, কেননা বোঝা মাত্রই চলমানতার বাধাস্বরূপ। তাই স্থির ও স্থায়ী নিবাসী না হলে আকাঙ্ক্ষার প্রসার, চাহিদার বিস্তার ও উপকরণের বৃদ্ধি ঘটে না। এজন্যেই কৃষিজীবী মানুষ বা সমাজই একসময় গুণে-মানে-মাহাত্ম্যে ছিল শ্রেষ্ঠ। তাই সংস্কৃতিবাচক শব্দ 'কৃষ্টি' ছিল কর্ষণ-সম্পৃক্ত। ক্রমে সমাজ-বিকাশের ও সমাজ-বিবর্তনের ধারায় হাতিয়ার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে ও বাহুবলে, জনবলে কিংবা বুদ্ধিবলে যারা প্রবল, তাদের প্রভাবে ও প্রতাপে তাদেরকে পরশ্রমজীবী অবসরভোগী সেবাগ্রাহী হবার সুযোগ করে দিল—তারা হয়ে উঠল শোষক ও শাসকশ্রেণী। তখন শ্রমসাধ্য কর্ষণ হল ঘৃণ্য, কিন্তু ভূমির বা জমির মালিক হওয়াটাই হল গৌরবের, গর্বের ও মানের এবং দর্প-দাপটের উৎস। এমনিভাবে চাষী হল প্রজা ও শাসনপাত্র আর ভৌমিক বা জমিদার হল মান্য প্রভু।

আমাদের দেশে এভাবেই গণমানব শাস্ত্রপতির, সমাজসর্দারের ও শাসনকর্তার এবং তাদের গণগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ-পীড়ন-পেষণের পাত্র ও শিকার হয়েছে। শাস্ত্রপতি, সমাজপতি ও শাহ-সামন্তরা ছিল গণমানবের দণ্ডমুণ্ডের মালিক। এ ছিল একপ্রকার দাসপ্রথা। জানে-মানে কোনো অধিকার ছিল না গণমানবের, শাস্ত্র-সমাজ ও সরকার-নির্দিষ্ট গতর-খাটানো বৃত্তিতে নিযুক্ত থেকে কলুর বলদের মতো খেয়ে-না-খেয়ে, বুঝে-না-বুঝে, জেনে-না-জেনে জীবনপাত করতে হত তাদের অকালে। ঋণের দায়, খাজনার দায় ও পীড়নভয় এড়ানোর জন্যে নিঃস্ব নিঃসহায় মানুষ সে-যুগে সপরিবারে পালিয়ে বেড়াত এ-ভৌমিকের ও-ভৌমিকের অধিকারে। প্রভুর কাজে বেগার খাটতে হত সবাইকে, নজর-সম্মানী প্রভৃতি দিতে হত প্রভু-পরিবারের উৎসবে-পার্বণে-বিয়েতে শ্রাদ্ধে ও অন্নপ্রাশনে। তাছাড়া তারা ছিল ঘন ঘন খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-মহামারীর শিকার— তাই জনসংখ্যাও সহজে বৃদ্ধি পেত না।

শাস্ত্র-শাসন-ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল শাস্ত্রপতির, সমাজসর্দারের ও শাসনকর্তার গণ-গোষ্ঠীর হাতে। কামার-কুমার কিংবা হাড়ি-ডোম-তাঁতি-তিলি-চাঁড়াল-বাগদী-কৈবর্তদের এ-যুগের চা-বাগানের কুলি কিংবা খনিমজুরের মতোই ধনী হবার কোনো উপায় ছিল না। পূর্ণ মানব হিসেবে স্বীকৃত নয় বলে তারা প্রভুদের কাছে পেত অমানবিক ব্যবহার। স্বেচ্ছায় কর্মনির্বাচনে বা জীবিকা নির্ধারণে অধিকার ছিল না বলে তাদের আত্মবিকাশের, আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদ-সুখের স্বপ্ন দেখার কোনো সুযোগই ছিল না। আড়াই হাজার বছর ধরে ওরা ছিল গোত্রীয় বৃত্তিতে বদ্ধ এবং পীড়নের, বঞ্চনার ও মৃত্যুর সার্বক্ষণিক শিকার।

কালে কালে ধর্মান্তরিত হয়েও তারা সাধারণভাবে পেশা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ পায়নি। শোষিত-বঞ্চিতের অভিশপ্ত জীবনে ঘটেনি মুক্তি। মধ্যযুগ অবধি তাদের দেহ-মনের দুর্ভোগ-দুর্দিনকে তারা বিধিলিপি বলেই জেনেছে।

প্রতীচ্য জীবনের সঙ্গে পরোক্ষ পরিচয়, যন্ত্রযুগের প্রসাদ, কৃৎকৌশলের প্রসার, কলকারখানার দ্রুত বিস্তার, নগর-জীবনের প্রসার, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহজতা, জীবনোপকরণের চাহিদা বৃদ্ধি, মুদ্রা-মাধ্যমে পণ্য ও শ্রম ক্রয়-বিক্রয়ের ঋজুতা, যন্ত্র-চালিত সংহত পৃথিবীতে দেশ-বিদেশের মানুষের ভাব-চিন্তা-কর্মের সঙ্গে সহজ পরিচয়, জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার তারে-বেতারে ও মুদ্রিত রচনার মাধ্যমে বিনিময়, প্রচার ও প্রসার প্রভৃতি পুরোনো শাস্ত্র-সমাজ-সরকার প্রবর্তিত ও প্রচলিত নিয়ম-নীতি ও রীতি-রেওয়াজ যেমন ভেঙেছে, তেমনি যন্ত্রনির্ভর জীবনে নতুনতর জীবন-পদ্ধতির ও জীবিকা-সংস্থানের প্রয়োজন হয়েছে স্বাভাবিক ও অপ্রতিরোধ্য।

ব্রিটিশ আমলে তাই ধীরে ধীরে শোষণ যেমন হয়েছিল বিচিত্র ও বহুধা, তেমনই আড়াই হাজার বছর ধরে বঞ্চিত-শোষিত বৃত্তিজীবী অস্পৃশ্য অবজ্ঞেয় মানুষেও প্রাতিবেশিক কারণেই প্রায় অবচেতনভাবেই জাগছিল আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষা, ভাগ্যপরিবর্তনের তাগিদ, শোষিত-বঞ্চিতের ক্ষোভ, ধনে-মানে অধিকার লাভের প্রয়াস এবং দ্রোহ ও সংগ্রামের বীজ হচ্ছিল তাদের মনে উপ্ত। গত দুশো বছরে সেই জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে তাদের বিক্ষুব্ধ চিত্তের বিস্ফোরণ ঘটেছে দ্রোহের ও সংগ্রামের আকারে।

১৮৮৬ সনের শিকাগো-হত্যাকাণ্ডের পর থেকে যেমন দেশ-দুনিয়ার শ্রমিকরা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে, কৃষকরা যেমন মাটিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে; অবজ্ঞেয় বৃত্তিজীবী মানুষও তেমনি ধনে-মানে ও প্রাণে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মেতে উঠেছে সর্বত্র। দেশ-দুনিয়ার কোথাও কোথাও কিছু গণমানব স্ব স্ব সংগ্রামে জয়ী হয়েছে ও হচ্ছে, অন্যদের আরো দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তবে দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষ যে একদিন হয়তো এ শতকেরই অন্তিম লগ্নে-স্বপ্রতিষ্ঠ হবেই—আত্মবিকাশের অবাধ অধিকার পাবেই, তা নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করা চলে।

আমাদের দেশে কৃষক-শ্রমিক বা বৃত্তিজীবী মানুষের চিন্তা-চেতনা তথা জীবনচেতনা ও জগৎভাবনা আশানুরূপ স্তরে উন্নীত হয়নি আজো বহির্জগতের সঙ্গে তারে-বেতারে ও মুদ্রিত রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে। তাই আড়াই হাজার বছর ধরে তাদের ঘৃণ্য-দুস্থ অবস্থা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে। জমির রাজস্ব একপঞ্চমাংশ এক-চতুর্থাংশ থেকে ক্রমে আধিবর্গায় যেমন বিবর্তিত হয়েছে, তেমনি দিনমজুরের সংখ্যাও পেয়েছে বৃদ্ধি। তিনশো বছর আগে ত্রিশ টাকা দিয়ে কেনা জমির মালিকানা ক্রেতার বংশধরদের ওপর বর্তায় বটে, কিন্তু চৌদ্দপুরুষ ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে-চাষী চাষ করে তাঁর কোনো অধিকার বর্তায় না জমির বা ফসলের ওপর। ভদ্রলোকের বিরোধিতায় 'তেভাগা' আন্দোলনও সফল হয়নি এদেশে; 'লাঙল যার জমি তার'–নীতিও তাই পাত্তা পায় না। আমাদের দেশের এ-মুহূর্তের সামন্তমানসিকতাদুষ্ট উঠতি বুর্জোয়া মধ্যবিত্তদের মধ্যে থেকে সংবেদনশীল বিবেকমান মানুষ যদি এদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের দুর্ভোগ-দুর্দিন দীর্ঘায়িত হবে।

আজকে বিবেকবান ভদ্রলোকের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে—ওদের সাক্ষর করা, স্বাধিকার চেতনা দেয়া, স্বাধিকার সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা এবং নবজীবন চেতনায় দীক্ষা দেয়া ও নেয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

প্রত্যয়ে ত্রুটি থাকলে প্রত্যাশা পূরণ অসম্ভব। আমরা দু'হাজার বছরের নির্জিত জাতি। আমাদের কোনো প্রত্যয়ও ছিল না, ছিল স্বপ্ন এবং আনন্দিত স্বপ্নের রোমন্থনেই কেবল সুখ। কারণ স্বপ্ন কখনো সত্য হয় না অর্থাৎ প্রত্যাশিত বাস্তব হয়ে ওঠে না।

নির্জিত জাতির আত্মদর্শন প্রয়াস সাধারণত কৃত্রিমতা ও বিকৃতি অতিক্রম করতে পারে না। বাস্তব নিঃস্বতার ও অক্ষমতার গ্লানি ভুলে থাকার জন্যে তাদের প্রয়োজন ঐতিহ্যগর্ব। কাজেই খণ্ড ও আকস্মিক কৃতিকে তারা ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে অনন্য কীর্তি বলে জাহির করে। জীবনে দুর্লভ যে-মর্যাদা তার মানস-চেতনাও তাকে অতীতাশ্রয়ী করে। ফলে নির্জিত মানুষ কিংবা জাতি মাত্রই ঐতিহ্যকে উৎসাহ-উদ্দীপনার কিংবা প্রবোধ ও ভরসার আকর হিসেবে জানে ও মানে। তা নিয়েই সে টিকে থাকতে চায়। পিতৃসম্পদের মতো পিতৃকৃতি-কীর্তিও-যে জীবনের অবক্ষয় রোধ করতে পারে না, অকৃতির শূন্যতা ভরে তুলতে পারে না, তা নির্জিত মানুষ উপলব্ধি করে না। ফলে পূর্বপুরুষের সাফল্যটাই কেবল ঐতিহ্যরূপে গৃহীত ও স্মরণ্য হয়ে থাকে, তাদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা কখনো নজরে পড়ে না। এ কারণেই ঐতিহ্য প্রেরণার ও সংশোধনের উৎস না হয়ে, হয়ে পড়ে আস্ফালন ও আত্মপ্রবঞ্চনার অবলম্বন। এমন মানুষ আত্মরক্ষার বিকৃত প্রয়াসে মিথ্যাভাষণেও উৎসুক হয়, এবং যা নয়, তাও বানায়।

উঠতি মানুষ, সতর্ক মানুষ, সাফল্যকামী স্থিরবুদ্ধি মানুষ নিজের শক্তি ও দুর্বলতা দুটোই সমান গুরুত্বে যাচাই করে, তাতে শক্তির সুপ্রয়োগ যেমন সম্ভব, দুর্বলতার গুরুত্ব ও পরিণাম-চেতনা লাভও তেমনি সহজ।

সেই মানুষই গা-পা বাঁচিয়ে এগুতে পারে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে। আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার কেবল তেমন মানুষের ও জাতির পক্ষেই সম্ভব। আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রয়োজন কর্মপ্রেরণার জন্যেই, তা আস্ফালনের ও কৃতার্থমন্যতার অবলম্বন হলে সর্বনাশের আকর হয়ে দাঁড়ায়। নির্জিত ব্যক্তি বা জাতি আত্মপ্রত্যয়ী নয় বলেই সে শক্তিপূজায় উৎসুক, ব্যক্তিপূজায় তার স্বস্তি। কেননা সে পরশক্তিনির্ভর ও পরকৃতিজীবী— তার হয়ে কেউ কিছু করে দিক এ-ই তার সর্বক্ষণের কামনা। তার শাস্ত্রে, সমাজে ও সাহিত্যে তার এ চরিত্রই প্রতিফলিত। সেদিন তাই ঢাকায় দেখলাম— আল্লাহর ঘর 'মসজিদুল আকসা' ইহুদি-কবলমুক্ত করার জন্যে মুসলমানরা আল্লাহর কাছেই আবেদন জানাচ্ছে। আল্লাহ তাঁর ঘর মুক্ত করবেন কি-না সে আল্লাহই বুঝবেন! অক্ষম বান্দারা আল্লাহকে সে-পরামর্শ দিতে যায় কোন্ বুদ্ধিতে! দু'হাজার বছর ধরে বাঙালির এমনি বিড়ম্বিত প্রত্যয় ও প্রত্যাশা আমরা ইতিহাসের পাতায় লক্ষ্য করছি।

গিরিবেষ্টিত, নদী-হাওরে আকীর্ণ এ প্রত্যন্ত অঞ্চল শুষ্কদেশের ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের ঠেকানোর পক্ষে ছিল প্রাকৃতিক দুর্গ বিশেষ। আবাল্য জলে বিচরণে অভ্যস্ত মানুষ সাগর-শত্রুকেও তেমনি ঠেকাতে পারত। কিন্তু ঠেকানোর বা প্রতিরোধ করার মতো মনোবল ও প্রয়োজন-চেতনা তার ছিল না কখনো। কর্মকুণ্ঠ ভোগকামী ভেতো ও ভীত বাঙালি তোয়াজেতৃপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভুর পদসেবা-প্রসূত প্রসাদেরই ছিল প্রার্থী। তাই দু'হাজার বছর ধরে সে ছিল বিদেশী-বিজাতির সেবক ও শাসনপাত্র। আত্মপ্রত্যয় ছিল না, ছিল না মর্যাদাবোধ, তাই সঙ্ঘশক্তি অর্জনের ও প্রয়োগের প্রেরণা অনুভব করেনি সে কখনো। স্ব স্ব স্বার্থে তারা হাটে জমায়েত হয়েছে, মাঠে একত্রিত হয়েছে, কিন্তু দৈশিক-সামষ্টিক কোনো সাধারণ স্বার্থে তারা মিলিত হয়নি। পরশাসিত ও নির্যাতিত বাঙালি জ্বালা-যন্ত্রণায় কেঁদেছে, তবু প্রতিকার-চেতনা তাদের জাগেনি কখনো। প্রতীচ্য মনের ও জীবনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে নবজাগ্রত আত্মসম্মানবোধ বশে বাঙালি যখন খুঁজে বেড়াচ্ছিল আপন পূর্বপুরুষের কৃতি-কীর্তি, তখন বিব্রত বাঙালি নিঃস্বতার গ্লানি ঢাকবার এক অভিনব উপায় অবলম্বন করল। স্বজাতির অভাবে সে স্বধর্মীর ঐতিহ্যের নির্লজ্জ দাবিদার হয়ে উঠল। হিন্দু বেরুল আর্যাবর্ত, ব্রহ্মাবর্ত, রাজস্থান ও মারাঠারাজ্য পরিক্রমায়, মুসলমান যাত্রা করল স্পেন-মিশর-আরব-ইরান-ইরাক-মধ্য এশিয়া ও তুর্কি-মুঘল ভারত সফরে—সেই গৌরব-গর্বের পুঁজি ও ঐতিহ্যের সন্ধানে। কোনো বাঙালিই তখন অস্ট্রিক-মঙ্গোল নয়, ভৌগোলিক বাঙালি তো নয়ই, তখন তারা কেবল হিন্দু অথবা শুধু মুসলমান।

এ শতকে বাইরে মার-খাওয়া বর্ধিষ্ণু বাঙালি শশাঙ্ক-পাল-গণেশে খুঁজল তার রাজকীয় ঐতিহ্য, স্বাদেশিক স্বাধীনতার ও বলবীর্যের নমুনা সন্ধান করল বারো ভুঁইয়ার কিংবদন্তিতে। দুর্ভাগ্য তাদের—বৈদিক আর্যভাষীরা বা তুর্কি-মুঘলরা তাদের না ছিল জ্ঞাতি, না ছিল কুটুম্ব। বারো-ভুঁইয়াদেরও কেউ বাঙালি ছিল না, নর-কলঙ্ক বাঙালি প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনকালে জাতীয় 'বীর' করতে গিয়েও করা গেল না।

বলেছি, আপাত অবিমৃষ্য উত্তেজনা বশে গণ-আবেগ ও গণ-উচ্ছ্বাস জাগ্রত ও উদ্দীপিত করা বাঙালির স্বভাব। তাই স্বাধীনতা যখন চাইল, তখনো সে স্বস্থ নয়, তার লক্ষ্যও নির্দিষ্ট নয়, ফলে বাঙলার এক অংশ পড়ল দিল্লির কবলে, অন্য অংশ হল করাচির আশ্রিত। আবার পাকিস্তানের কবল-মুক্তি যখন কামনা করল, তখনো তার ছিল না কোনো লক্ষ্য। তাই জনজীবনে বিনাশ-বিপর্যয়ই কেবল আপাত স্থায়ী হয়ে রইল। তার প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায় সঙ্গতি ছিল না, তাই এ পরিণাম ছিল অবশ্যম্ভাবী। আজও তার মোহমুক্তি ঘটেনি, আজো সে আত্মদর্শনে বিমুখ, আজো সে সত্যের ও বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় না। আজো সে অসংখ্য শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও বৈষয়িক ভ্রান্ত ধারণার ও ভুল অঙ্গীকারের শিকার। তাই তার ব্যর্থতা ঘুচবার নয়, তাই তার গতি বৃত্তবদ্ধ-লক্ষ্যনিবদ্ধ নয়। হিন্দুরা আজো ভেবে আশ্বস্ত যে আর্যরক্তের ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তাদেরও। মুসলমানেরা আজো আরব-ইরানী-তুর্কি-মুঘলের জ্ঞাতিত্ব গৌরবে আনন্দিত। বাঙালি মুসলমানের আরো কয়েকটি বদ্ধমূল ধারণা তাদের মানস-স্বাস্থ্যের পরিপন্থী হয়ে রয়েছে— আজ সে-ভুল ধারণা অপনোদনের সময় এসেছে।

১. আমাদের বুঝতে হবে যে, দেশজ মুসলমানরা সাধারণভাবে নিম্নবর্ণের ও নিম্নবৃত্তির হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর। ধর্মান্তরের ফলে তাদের পেশান্তর ঘটেছে কৃচিৎ। লেখাপড়ার ঐতিহ্য তাদেরও ছিল না। তুর্কি-মুঘলরা তাদের শাসিতজন হিসেবেই জানত, যেমন জানত ব্রিটিশেরা দেশী খ্রিস্টানদের। কাজেই তুর্কি-মুঘল আমলে দেশী মুসলমানরা শাসকগোষ্ঠীসুলভ কোনো আর্থিক-সামাজিক সুবিধা ভোগ করেনি। বরং সমকালীন নিয়মানুসারে দেশী মুসলমানরা স্থানীয় সামন্ত-শাসকদেরই অধীনে থাকত। ব্রিটিশ আমলে যেমন গাঁয়ে-গঞ্জে সাহেব ছিল দুর্লভ দুর্লক্ষ্য, তেমনি অবস্থা ছিল তুর্কি-মুঘল যুগেও। রাজস্ব বিভাগ ছিল দেশী হিন্দুর হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদালতে কাজি-উকিল মুসলিম হলেও কায়স্থকুল তথা কেরানিরা ছিল দেশী। সৈন্য বিভাগে ছিল বিদেশী মুসলমান, এ যুগের মতো তাদেরও জনসংযোগ হত দ্রোহ-দমন সূত্রেই। কাজেই গাঁয়ে গাঁয়ে সংখ্যালঘু দেশজ ও স্থায়ী নিবাসী মুসলমানরা ছিল গাঁয়ের ধনী-মানী-সর্দার ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ শ্রেণীর অনুগত ও শাসিত-শোষিত। গ্রামে জমিদার-মহাজন-গ্রামপ্রশাসক ও রাজস্বআদায়কারীরা সেদিনও ছিল হিন্দুরাই, অতএব গাঁয়ে মুসলমান মাত্রই ছিল সাধারণভাবে হিন্দুশাসিত।

উল্লেখ্য যে, বাঙলার হিন্দু-মুসলমান কারো কখনো সৈনিকবৃত্তি জাতীয় পেশা ছিল না। উত্তর ভারতীয়রাই ছিল সৈনিক। কৃচিৎ অনন্যোপায় দুস্থ বাঙালি সৈন্য হত। মীর জাফর, মীর কাসিম, কিংবা মীর জাফর পুত্রদের আমলে যে বাঙালি পল্টন ছিল, তার সিপাহি-সেনাপতিরা ছিল উত্তর-বিহার ও উত্তর-প্রদেশের লোক। বাঙালি পল্টন যখন ইংরেজরা ভেঙে দেয়, তখন ঐ বেকার-বিক্ষুব্ধ অবাঙালি সৈনিকেরা প্রতিশোধবাঞ্ছা বশে বাঙলাদেশে (উত্তরবঙ্গে) প্রতিবছর লুটতরাজ চালাত ফকির-সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে জমিদার মহাজন ও ধনীগৃহস্থ ঘরে। এদেশের গরিবেরাও জুটে যেত লুটতরাজে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কিসসার শুরু ও অপব্যাখ্যার সুযোগ ঘটে এভাবেই। বহুশ্রুত মজনুশাহ ছিল কানপুরবাসী এবং ভবানী পাঠক ছিল ভোজপুরী। সেজন্যেই সুবেহবাঙলার অংশ হলেও তারা তাদের স্বভূম বিহারে-উড়িষ্যায় লুটতরাজ চালাত না। ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল নাগা (নগ্ন-বুরহানী) যোগীবেশী।

২. মুঘল রাজত্বের অবসান-মুহূর্তে এ-যুগের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথা কায়স্থ-ব্রাহ্মণরা অফিসে কর্মচারী রয়ে গেল, কারণ শাসক সরকার বদল হলে অফিসের ছোট কর্মচারীর বদল হয় না। কিন্তু কাজি ও দেশী সেনাপতির পদ বিলুপ্ত হওয়ায় বিদেশাগত মুসলিমরা চাকরি হারাল। এদের অনেকেই উত্তর-ভারতে ও অন্যত্র চলেও গেল। যারা রইল, তারাই ক্ষয়িষ্ণু খান্দানি পরিবার এবং গোটা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে আনুপাতিক হারে বেশি ছিল, আরো বেশি ছিল বিহারে। তাদের অনেকেরই অর্থবিত্ত ছিল এবং ইংরেজিশিক্ষাও তারা প্রথমযুগেই গ্রহণ করেছিল। এ সূত্রে স্মর্তব্য যে, কোলকাতা ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের লোকেরাই [যারা হাঁটাপথে কোলকাতায় একদিনে পৌঁছতে পারত] প্রথমে কোম্পানির দালাল-ফড়িয়া-মুৎসুদ্দি-বানিয়া হয় এবং যেহেতু সরকারি অফিসে আদালতে কেরানি-গোমস্তা-নায়েবের কাজ দেশী লোক হিসেবে [মজুমদার-মহলা-সেহলা নবীশ, খাস্তগীর দস্তিদার সরকার মুনশী প্রভৃতি] তুর্কি-মুঘল আমল থেকেই হিন্দুরাই করত, যেহেতু ইংরেজদের সদাগরি ও সরকারি অফিসে অব্যাহতভাবে তারাই নিযুক্ত হতে থাকে, সেহেতু নবসৃষ্ট মুনসেফ-ম্যাজিস্ট্রেট-কালেক্টর পদও অধিকাংশ হিন্দুর ভাগ্যে পড়ল। ফলে ১৮৩০ সনের দিকে উচ্চপদে মুসলিম বিরল হল এবং কেরানির পদেও ১৮৫০ সনের দিকে মুসলিম দুর্লক্ষ্য হয়ে উঠল। এখানে উল্লেখ্য যে, কোম্পানির বাণিজ্যসূত্রে যারা ব্রিটিশ [এবং পর্তুগিজ-ফরাসি দিনেমারদেরও] সান্নিধ্যে এসেছিল, তারাও প্রভুর প্রিয় হয়ে পদোন্নতির আশায় মনিবের ভাষা জানবার-বুঝবার চেষ্টা করত পলাশী-যুদ্ধের আগে থেকেই। হিন্দু কলেজ তো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে। তাই ১৮৩৫ সনের আইনে ইংরেজি দরবারি ভাষারূপে গৃহীত হবার এবং ১৮৩৮ সনে সে-আইন চালু করার আগেই এদেশে অফিস চালানোর মতো ইংরেজি-জানা লোক ছিল অনেক। এরা সবাই মনিবের মনোমতো যোগ্যতা অর্জন করেছিল অর্থাৎ ইংরেজি শিখেছিল আত্মোন্নয়নের প্রেরণাবশেই। কাজি কিংবা সেনাপতি পরিবারের চক্ষে এসব চাকরির মর্যাদা ছিল না, তাই ঐ চাকরি লক্ষ্যে তখন ইংরেজি শেখার গরজ বোধ করেনি তারা। কিন্তু এ-ও সত্য যে গোড়া থেকেই কিছু সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইংরেজি শিক্ষাদানের চেষ্টা ছিল। নওয়াব-পরিবারের ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদস্থ কর্মচারীদের সন্তানদের জন্যে নওয়াবের আগ্রহে ১৮২৪ সনে কোম্পানি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন মুর্শিদাবাদে। দেশজ সাধারণ মুসলমানদের কিংবা সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী মুসলমানদের-যে ইংরেজ ও ইংরেজি-বিদ্বেষ তেমন প্রবল ছিল না, তার প্রমাণ ভিক্টোরিয়া যখন উপাধি দান করলেন, তখন কেউ তা' গ্রহণ করতে অস্বীকার করেনি। বরং গৌরব ও গর্ববোধ-যে করেছে তার প্রমাণ অনেক। ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র বিহারে পাটনায় যদি ইংরেজি-বিদ্বেষ না থাকে, তা হলে বাঙলাদেশেই বা সে-কারণে ইংরেজিশিক্ষা-বিমুখতা থাকবে কেন? তাছাড়া ওয়াহাবি আন্দোলন মুখ্যত অশিক্ষিতদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল এবং এদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ জাগে ১৮৩০ সনের পরে। তিতুমীর ও সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর মৃত্যুর পরে ওয়াহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের অবসানে এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রভাবে ১৮৭০ সনের দিকে ভারতের দেশজ মুসলিম-মনে ইংরেজ ও ইংরেজিপ্রীতি প্রবল হয়। কিন্তু তখনো শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলে ইংরেজিশিক্ষায় তাদের আগ্রহ তেমন জাগেনি, তাছাড়া মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে স্কুল ছিল দুর্লভ।

৩. অ্যাডামের রিপোর্ট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব, কোলকাতা এবং তার উপকণ্ঠের ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাই প্রথম ইংরেজি শেখার প্রসাদ গ্রহণ করে পূর্বোক্ত কারণে ও সুযোগে। মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়রাই ছিল অগ্রণী এবং বোস-ঘোষ-দত্ত মিত্ররাই ছিল প্রবল; বৈদ্যরা অনেক পরে ইংরেজি শেখে। বাঙলার দেশজ মুসলমানরা যেসব বর্ণের ও বৃত্তির অন্তর্গত ছিল, হিন্দুসমাজে সেসব লোকের বিশ শতকের আগে শিক্ষা বা প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণের মানসপ্রস্তুতি ছিল না। বরং দেশজ মুসলমানরা উনিশ শতকের শেষপাদ থেকেই শুরু করে শিক্ষাক্ষেত্রে তফসিলিদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। শিক্ষাগ্রহণ যে ঐতিহ্য ও খান্দানগত বিষয় তার প্রমাণ বিহারের ও উত্তর প্রদেশের সংখ্যালঘু অভিজাত মুসলমানরা শিক্ষার ও বিত্তের ক্ষেত্রে হিন্দুদের চেয়ে অগ্রসর ছিল, বাঙলায় যেমনটি ছিল সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ কায়স্থরা।

৪. ১৯০৫ সন অবধি সুবেহ্ বাঙলা ছিল বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে। কাজেই কোলকাতার কোম্পানির শাসননীতি ও আইন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সর্বত্রই ছিল প্রযোজ্য। আমরা ব্রিটিশ আমলের বাঙলার কথা যখন বলি, তখন বাঙলা অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবি, তাতে বাস্তব অবস্থার পূর্ণাঙ্গরূপ মেলে না। মুঘল-সাম্রাজ্যভুক্ত প্রদেশ 'সুবেহ বাঙলা'র বিদেশী-বিভাষী সুবাদারের সঙ্গে বাঙালি কোন্ অভিন্ন স্বার্থে একাত্মবোধ করবে, সমকালীন বাঙালির কাছে সিরাজদ্দৌলাই বা আপন হবে কেন, মীর জাফর, মীর কাসিমই বা কেন ঘৃণ্য হবে, দেশদুর্লভ স্বাদেশিক এ জাতীয়তা আকস্মিকভাবে অশিক্ষিত বাঙালি মুসলিম-মনে কেনই বা জাগবে, যেখানে ভারতের হিন্দু-মুসলিম রাজন্যরা ব্রিটিশ-আশ্রিত হবার জন্যে উদগ্রীব, যেখানে ওয়াহাবি আন্দোলনের শুরু ব্রিটিশ-প্রীতি দিয়ে? সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী তাঁর ঘরের পাশের সম্প্রসারমান বিদেশী ব্রিটিশকে শত্রু ভাবেননি, সুদূরের স্বদেশী শিখদের ভেবেছেন ইসলামের শত্রু—এক আদর্শিক জেহাদি উত্তেজনা বশে!

৫. ইদানীং আর একটা তত্ত্ব মুখোমুখি চালু হয়েছে। অবশ্য অন্য অনেক ভুল তত্ত্ব ও তথ্যের মতো এরও ভিত্তি ব্রিটিশ-শাসকেরই অভিমত। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, পাট চাষের ফলেই বাঙালির তথা পূর্ববঙ্গের মুসলমানের হাতে টাকা আসে এবং এই আর্থিক সাচ্ছল্যের ফলেই তাদের সন্তানদের শিক্ষাদান সম্ভব হয়। অর্থাৎ আর্থিক অসঙ্গতিই শিক্ষাক্ষেত্রে দেশজ মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার কারণ। এ তত্ত্বের সত্যতা ও যৌক্তিকতা স্বীকার করতে হলে তার আগে কয়েকটি বিষয়ের মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক. মুঘল আমলে গাঁয়েগঞ্জে মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ছিল।
খ. সংখ্যালঘু দেশজ মুসলমানের হাতে প্রচুর জমি ছিল।
গ. বাঙলাদেশের সর্বত্র পাটচাষ হত।
ঘ. পাটচাষ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাষী-হিন্দুসমাজেও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

মুঘল আমলে দেশজ মুসলিম-সমাজে শিক্ষার ঐতিহ্য কিংবা প্রসার ছিল বলে প্রমাণ নেই, ব্রিটিশ-বিদ্বেষ কিংবা ব্রিটিশ-বিরূপতা বশে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করলেও শিক্ষা গ্রহণের রেওয়াজ থাকলে আরবি-ফারসি শিক্ষিত লোক গাঁয়ে-গঞ্জে সুলভ থাকত। কিন্তু আমরা দেখতে পাই তখনো মুন্সি-মোল্লা-মোয়াজ্জিন-মৌলভী কোটিকে গুটিকও মিলত না। এমনকি হরফনির্ভর কোরআন পাঠকও ছিল সুদুর্লভ। লেখাপড়া কেবল খান্দানী ঘরেই ছিল সীমিত। পাটচাষের ফলে আর্থিক উন্নতি হওয়ার পূর্বশর্ত হল— মুসলমান চাষীর সংবৎসরের খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় জমির অতিরিক্ত জমি থাকা। এ যদি সত্য হয় তাহলে পাটচাষ প্রবর্তন-পূর্বকালে মুসলিম চাষী উদ্বৃত্ত ধান বিক্রয় করে অন্তত প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে পারত। আমরা দেশজ মুসলিম-সমাজে সাধারণভাবে সে-ঐতিহ্যও দেখিনে উনিশ শতকের চতুর্থ পাদের আগে।

পাটচাষ পূর্ব-উত্তর বঙ্গের কয়েকটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। যেখানে পাটচাষ আজও নেই, সেসব অঞ্চলের মুসলমানরা (কুমিল্লা-ফেনী-চট্টগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গ) বরং ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর ছিল।

আমরা দেখেছি, কোলকাতার বাইরে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটতে সঙ্গত কারণেই অনেক সময় লেগেছে। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের প্রয়োজনে ও উদ্যোগে গাঁয়ে-গঞ্জে যখন ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে, তখন স্থানীয় ও অন্যান্য লোকরাও সে-সুযোগ গ্রহণে মন্থরভাবে এগিয়ে আসে। নিম্নবর্ণের নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবিত্তের হিন্দু ও মুসলিম সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটে এভাবেই। তাই বিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদেই মুসলিম সমাজে ও হিন্দুর নিম্নবর্ণের সমাজে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। পাকিস্তান আমলে চাকরিজীবীর নিশ্চিত সৌভাগ্য দর্শনে গরিব লোকও সন্তানকে শিক্ষালয়ে প্রেরণের গরজবোধ করে আর্থিক দুর্ভাগ্য-দুর্ভোগ মুক্তির বাসনায় ও সামাজিক মর্যাদা অর্জনের প্রয়াসে। বর্ণহিন্দুদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটার মুখ্য কারণ ছিল একটি— অফিস-আদালত আত্মীয়-পরিজনের ও স্ববর্ণের লোকের অধিকারে থাকায়, চাকরি পাবার প্রত্যাশায় ও আশ্বাসে তারা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। মুসলমান কিংবা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সে আশা জাগাবার বা আশ্বাসদানের লোক বিরল ছিল অফিসে। তাই শিক্ষাগ্রহণের প্রবল প্রেরণা অনুভব করেনি তারা। আমরা জানি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ অবধি আদালতে ফারসি-শিক্ষিত মুসলিম উকিলের সংখ্যাই ছিল বেশি। এদের সন্তানেরাও ইংরেজি শিখে উকিল হতে চেয়েছে। ১৮৬১-১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৯৮ জন বাঙালি মুসলমান বি.এ. পাস করেছিলেন, এঁদের অনেকেই বি.এল-ও ছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মুসলিম-সমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার দ্রুত হতে থাকে।

অতএব, তুর্কি-মুঘল আমলে দেশী মুসলমান মাত্রেই ধনী ও শিক্ষিত ছিল না। মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অশিক্ষা ব্রিটিশ-ষড়যন্ত্র কিংবা ব্রিটিশ-বিদ্বেষের ফল নয়। মুঘল আমলেও গাঁয়ের-গঞ্জের মুসলমান হিন্দুবহুল প্রশাসনেই ছিল এবং প্রজা ছিল হিন্দু সামন্তেরই। ইংরেজ আমলের শুরুতে আমরা গোটা বাঙলার ছয়টা বড় জমিদারির মধ্যে পাঁচটাই হিন্দুর হাতে দেখতে পাই। মুর্শিদকুলি খানের রাজস্বআদায় ব্যবস্থাও মধ্যস্বত্ব হিন্দুর হাতেই গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুর্কি আমলের বারো ভুঁইয়ার অধিকাংশই ছিল হিন্দু। বাঙালি কখনো জাতীয় পেশা হিসেবে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করেনি, দৈশিক স্বাধীনতার কথাও ভাবেনি কখনো। কাজেই ব্রিটিশ আমলে দেশজ মুসলমান কোনোদিক দিয়েই কোনো নতুন দুর্ভাগ্যের শিকার হয়নি। কেবল বিদেশাগত (কৃচিৎ দেশী) কাজি এবং সৈনিক বংশীয়রাই ব্রিটিশ-রাজত্বে দুর্দশাগ্রস্ত হয়। ১৮২৮ সালের আগে লাখেরাজ-আয়মা সম্পত্তিও মুসলিমদের হাতছাড়া হয়নি। মামলার সুযোগে অনেকে আরো পনেরো-বিশ বছর ধরে [১৮৪৬ সন অবধি] সে-সম্পত্তি ভোগ করেছে।

উল্লেখ্য যে, হিন্দুরাও নতুন করে দেশজ মুসলিমদের সম্পদ কিংবা বৃত্তিবেসাত আত্মসাৎ করেনি। তবে ব্রিটিশ আমলে মুদ্রা-নির্ভর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-সম্পর্কের ও ব্রিটিশ-শোষণ নীতির ফলে মুখ্যত পণ্য-বিনিময় নির্ভর-নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ বৃত্তিজীবী সমাজে ভাঙন ও আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। এ নতুন মুদ্রাপ্রতীক সম্পদ অর্জনে মুসলিম-সমাজ দারুণভাবে ব্যর্থ হয় ইংরেজি শিক্ষার ও শহুরে বাণিজ্যের অভাবে। উনিশ শতকের শেষার্ধই তাই বাঙালি মুসলিমের চরম দুর্ভোগের কাল—আঁধার যুগ।

তবু উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের মোল্লা-মুন্সী-মোয়াজ্জিন-মৌলভী-খোন্দকার কাজি গোমস্তা উকিল ও সচ্ছল গৃহস্থ পরিবারের কিছু কিছু লোক ছিল। তারাই সাহিত্য, সংগীত ও শাস্ত্রচর্চা চালু রেখেছিল। লোকশিক্ষা চলত শ্রুতি-স্মৃতির মাধ্যমে। একজন কথক বা পাঠক বলত, পড়ত, অন্যেরা শুনত। দেশজ মুসলমানদের কেউ দরবারে উজির লস্কর আমির ছিল বলে প্রমাণ মেলে না। কাজেই এদের শিক্ষাগত বা প্রাশাসনিক যোগ্যতা উচ্চমানের ছিল বলে মনে হয় না। নাম দেখেও বোঝা যায়, এদের সাংস্কৃতিক মান শ্রদ্ধেয় ছিল না—ইসলামি তথা শাস্ত্রীয় জীবনও ছিল শিথিল—ইধা, বুধা, কালা, ফেলা, পরান, বানু, পাঞ্জু, লালন, দুদ্দু, কানাই, দোনা, গোপাল; চাঁদ, সুরুজ, মনা নামই ছিল বহুলপ্রচলিত। তুর্কিমুঘল যুগে 'মুসলমান' নামের ব্যবহার ছিল বিরল। তুরুক, মুঘল, খোরাসানী, বোখারী, ইরানী, বলখী, কাবুলী, আফগানী, খালজী, তুঘলক, লোদী প্রভৃতি দেশ বা গোত্রগত নামেই মুসলমানরা পরিচিত হত। যেমন য়ুরোপীয়রা ছিল দেশগত নামে পরিচিত—পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজি প্রভৃতি। ইংরেজরাই 'ভেদনীতির' সাফল্য লক্ষ্যে 'মুসলমান' 'মোহামেডান' নাম চালু করে। ফলে দেশী মুসলমানরা তুর্কি-মুঘলের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে ওঠে। এতে দেশজ মুসলমানের গৌরব- গর্বের সহজ অবলম্বন যেমন মিলল, হিন্দুদের পক্ষেও তেমনি নির্বিশেষ মুসলিমকে পূর্ব প্রভুর বংশধররূপে গ্রহণ করে মুসলিম-বিদ্বেষী হওয়া সম্ভব হল। ১৮৬০ সনের পরে শিক্ষিত হিন্দুর আধিক্যহেতু ব্রিটিশের কৃপা বিতরণ সীমিত ও দুর্লভ হয়ে পড়ল এবং বিশেষ করে মনোমোহন ঘোষের সিভিল সার্ভিসে অসাফল্য ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি এবং ইলবার্টবিল-সঞ্জাত হিন্দু হাকিমের মর্যাদা হানি প্রভৃতির অভিঘাতে তাদের ব্রিটিশ-প্রীতির উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকল। তখন ব্রিটিশ সরকারের মুসলিম-প্রীতি প্রবল হয়ে উঠল এবং মুসলমানের দারিদ্র্য, ইংরেজি শিক্ষায় অনগ্রসরতা প্রভৃতির জন্যে ব্রিটিশের মায়াকান্না শুরু হয়ে গেল। শহরে নবাগত ইংরেজি শিক্ষিত দেশজ বাঙালিরা এ কূটকৌশল বুঝতে পারল না। ব্রিটিশভক্ত সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তারা আক্ষরিকভাবে বিশ্বাস করতে থাকল যে, তাদের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী কেবল হিন্দুরাই। এ বিশ্বাসের পরিণাম বাঙলাদেশে শুভ হয়নি। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ মুসলিমের মন-মানস অসুস্থ করে রেখেছিল, কিছু জমিদার মহাজনের কবলমুক্তির জন্যে কৃত্রিম পাকিস্তান বানাতে হয়েছিল, যে-পাকিস্তানে বাঙলাদেশের বাঙালির ও বাঙলাভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তানী ও পাক জবান নামের চাপে বাঙলার ও বাঙালির নাম-নিশানা বিলোপের উপক্রম হয়েছিল। আবার সে-পাকিস্তান বিকৃত উপায়ে ভাঙতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে বাঙালির সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য হামলার সম্মুখীন হয়। অথচ ব্রিটিশ আমলে বিহারে উত্তরপ্রদেশে পূর্বপাঞ্জাবে মাদ্রাজে সংখ্যালঘু মুসলমানরাই বিদ্যা ও বিত্ত [আসলে আগে থেকেই বিদেশগত অভিজাত পরিবারের সংখ্যা বেশি ছিল বলে] বলে অফিসে আদালতে অর্থাৎ শিক্ষার, চাকরির ও সম্পদের ক্ষেত্রে প্রধান, প্রবল ও সংখ্যাগুরু ছিল। কাজেই বাঙালি মুসলমানের অনগ্রসরতার মূলে ছিল তাদের শিক্ষার ও বিত্তের ঐতিহ্যবিরলতা—হিন্দুর বা ব্রিটিশের দৌরাত্ম্য বা দুরভিসন্ধি নয়। প্রত্যয় ভুল ছিল বলেই আমরা কেবল ক্ষোভে-বিদ্বেষে ঈর্ষায় অসূয়ায় পীড়িত হয়েছি, স্বস্থ সুস্থ হয়ে আত্মকল্যাণের পথ খুঁজে পাইনি। এমনি মিথ্যে তথ্য অঙ্গীকার করে চললে ভবিষ্যতেও বিড়ম্বিত হতে হবে। তাই আমাদের ত্রুটির কথা, লজ্জার কথা, দুর্বলতার ও অসামর্থ্যের কথা আমাদের নিজেদেরই জানতে বুঝতে হবে। মিথ্যে ঐতিহ্যগর্ব করে আত্মোন্নয়ন কখনো সম্ভব হবে না। আমাদের প্রত্যয়ে ও প্রত্যাশায় অকৃত্রিম সঙ্গতি প্রয়োজন।

আমাদের জানতে হবে বাঙালি কর্মকুণ্ঠ ও ভোগলিপ্সু। যে মানুষ ভোগী অথচ কর্মবিমুখ, তার জীবনোপায় মাত্র দুটো—ভিক্ষা অথবা চুরি। তাই দেব-মানবের অনুগ্রহলিপ্সা আর অসদুপায় প্রবণতা তার স্বভাবের গভীরে নিহিত। স্বসৃষ্ট দেবতাপূজা ও তুক-তাক-মন্ত্র-মাদুলি-দরগাহ প্রীতি তার প্রমাণ। দু'হাজার বছর ধরে পরশাসিত ও নিঃস্ব বলে আত্মপ্রত্যয়, প্রতিরোধবাঞ্ছা ও মহৎ আকাঙ্ক্ষা তার ক্ষীণ। তাই সে আত্মরতি বশে আত্মকল্যাণে প্রভু-প্রশ্রয় ও পর-প্রবঞ্চনাকেই সাফল্যের রাজপথ বলে জানে। এ কারণেই বাঙালি বহু জনহিতে, বহুজন সুখে অর্থাৎ সামষ্টিক বা জাতীয় কল্যাণে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধৈর্য, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে দৃঢ়চিত্তে সংকল্পপুষ্ট দীর্ঘকালীন সংগ্রামে অসমর্থ। কালো পিঁপড়ের মতো সে স্ববুদ্ধি চালিত হয়ে স্বস্বার্থে ঘুরে বেড়ায়—লাল পিঁপড়ের মতো যৌথ কর্মে তার উদ্যোগ নেই। [স্বস্বার্থে ও স্বকাজে সৎ সরল দুর্বল বাঙালি অবশ্য খুব পরিশ্রমী।] সে একাই বাঁচতে চায়, তাই অন্যকে প্রথম সুযোগেই ঠকায়—নিয়ম-নীতি-আদর্শ প্রায়ই দলে লাভ-লোভের সামান্য প্ররোচনায়। পরিজন প্রতিবেশীর কল্যাণের ও স্বার্থের মধ্যেই-যে নিজের কল্যাণ, স্বার্থ, নিরাপত্তা, স্বস্তি ও সুখ নিহিত—এ তত্ত্ব বা যুক্তি সে স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না। চোর, প্রতারক, মিথ্যেবাদী, তোষামুদে, ঈর্ষা, সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী, ঝগড়াটে ও মামলাবাজ বলে বারোশো বছর ধরে বিদেশী মাত্রেই বাঙালির নিন্দা করে এসেছে। আমদের চরিত্রের এসব দোষত্রুটি সচেতনভাবে সংশোধন করতে হবে স্ব স্ব জীবনে। দায়িত্বচেতনা ও কর্তব্যবুদ্ধিই চরিত্রের ভিত্তি। সে দায়িত্ব ও কর্তব্য একাধারে নিজের প্রতি ও সমাজের তথা মানুষের প্রতি—যে-মানুষের সঙ্গে সমস্বার্থে স্বাধিকারে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহাবস্থান করা বেঁচেবর্তে থাকার জন্যেই আবশ্যিক।

চেতনা-সংকট

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদর্শনে আত্মা অস্বীকৃত। চেতনাপ্রবাহ অবশ্য স্বীকৃত। কিন্তু তাও একক ও অবিচ্ছিন্ন নয়। চলচ্চিত্রের চিত্রধারার মতো কিংবা জলস্রোতের মতো তা মূলত স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ও একক সত্তারূপে প্রতীয়মান মাত্র। কাজেই ব্যক্তিজীবনের অদ্বৈত প্রবহমানতা প্রাতিভাসিক সত্য মাত্র। জীবন বলতে যা বোঝায়, তা স্বরূপত বিচ্ছিন্ন ও বিচিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভবের বা চেতনার সমষ্টিমাত্র। তাই চেতনাজগতে কোনো একক সত্তার ধারাবাহিকতা নেই। কায়া কিংবা মন-মননও তাই প্রতিমুহূর্তে রূপান্তর লাভ করে— প্রত্যেকটাই পায় নবজন্ম। ফলে বৌদ্ধজীবনে কোনো একক সত্তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই। সবটাই মৌহূর্তিক ও নশ্বর এবং অনিত্য সংস্কার মাত্র। এ তাৎপর্যে বিজ্ঞানবাদীদের কোনো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই। সর্ববিলুপ্তির জন্যে তথা মুক্তির জন্যে তাদের সার্বক্ষণিক সংগ্রাম চলে স্কন্ধের বা সংসারের বিরুদ্ধে, যাতে জয়ী হলে একজন বৌদ্ধ হয় অনস্তিত্বে তথা শূন্যে বিলীন। জাগতিক জীবনে আকাঙ্ক্ষা-রিক্ত বা তৃষ্ণাবিরহী বিজ্ঞানবাদীদের প্রকৃতি ক্ষমা করেনি, তারা লোপ পেয়েছে।

অন্য শাস্ত্রানুসারীরা এ মতে আস্থা রাখে না বটে, কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সবাই প্রায় প্রতিমুহূর্তেই অনুভব করে যে শৈশবের সম্পদ বাল্যে অপ্রযোজ্য, বাল্যের চাহিদা কৈশোরে বিলুপ্ত, কৈশোরের স্বপ্ন যৌবনে তুচ্ছ, যৌবনের সাধ বার্ধক্যে হৃত। কাজেই তথাকথিত এক জীবনেই এক কালের বা স্তরের সম্পদ কিংবা পাথেয় অন্যকালের বা চেতনার প্রয়োজন মিটাতে পারে না। তবু মোহগ্রস্ত মানুষ অতীতকেই জীবনের সঞ্চয় ও পুঁজি বলে মানে। প্রজ্ঞাবিরহী স্থূলদৃষ্টিতে সে দেখে এবং পরিচর্যাবিরহী মনেও মানে যে, বাল্যে অর্জিত বিদ্যা কিংবা জ্ঞানই তার সারাজীবনের পুঁজি। আসলে যে কালিক চেতনাজাত প্রয়োজনবুদ্ধির পরিচালনায় জীবনের বা ব্যক্তির আচরণ ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়, তা বোধগম্য নয় বলেই ছায়াও হয় কায়ারূপে প্রতিভাত, মায়া পায় সত্যরূপে স্বীকৃতি। তাই মানুষ মাত্রই কমবেশি মায়াপ্রপঞ্চের শিকার।

শাস্ত্রানুগত মুসলমানের মনোজগতে ভূগোল এবং বর্তমান-ভবিষ্যৎ থাকে না। তার থাকে কেবল সাড়ে তেরোশো বছরের পুরোনো এক অমোঘ অতীত। স্বধর্মীর জাত-বর্ণ-দেশবিহীন অবিচ্ছেদ্য জাতীয়তায় ও স্বশাস্ত্রের দেশ-কাল-প্রয়োজন নিরপেক্ষ চিরন্তন ও সর্বমানবিক প্রয়োগ-সাফল্যে তার আস্থা প্রস্তরের মতো দৃঢ় এবং হিমালয়ের মতো স্থূল। ফল দাঁড়িয়েছে এই : তেরোশো বছর আগেকার মক্কা-মদিনাবাসীরাই কেবল আব্বাসীয়দের আমল অবধি ইসলামি চেতনার পরিপূর্ণ প্রসাদ-ভোগে ধন্য হয়েছে, অন্যরা এযাবৎ অনুকৃত চর্যায় কেবল বিড়ম্বিতই হয়েছে। তাই ইসলামি ঐতিহ্য ও গৌরব সন্ধান করতে হয় খ্রিস্ট্রীয় চৌদ্দশতকের পূর্বেকার আব্বাসীয় ভুবনে; তা-ই রোমন্থন করে আজকের মুসলমানও গৌরবে, গর্বে, আত্মতুষ্টিতে স্ফীতবুক—যদিও আজকের বিশ্বে যেখানেই মুসলমান, সেখানেই সমাজে অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কন্দল-দৃষ্ট। মুসলমান সমাজ যেন অশিক্ষা, মানসদীনতা ও কন্দলের নামান্তর। আকাঙ্ক্ষাহীন বন্ধ্যাজীবনের পরিণাম এ-ই হয়।

আজো মুসলমান বিশ্বব্যাপী স্বধর্মীর সংখ্যা-বাহুল্যের গর্ব করে, কিন্তু আজকের বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্র তাদের অনুপস্থিতির জন্যে লজ্জা পায় না, ক্ষোভও নেই কারো। বিজ্ঞতম মুসলমানের ধারণাও এরূপ—সাড়ে তেরোশো বছর আগেই সবকিছু হয়ে আছে, 'সিসিমফাঁক ইসম' রয়েছে আমাদের ঠোঁটের ডগায়, কেবল প্রয়োগের, রূপায়ণের ও বাস্তবায়নের উদ্যমেই রয়েছে ঘাটতি। ভাবটা এই, আসল পর্ব তো শেষ, অতএব তৃপ্ত হৃদয়ে আরাম করো। এত তাড়া কিসের, দুনিয়াটা তো আর এখনি উবে যাচ্ছে না। তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষাবিনাশী, কেননা অভাববোধহীনতাই তৃপ্তি। অভাব-চেতনা জাগায় প্রাপ্তিবাঞ্ছা, সেই বাঞ্ছা দেয় উদ্যম, উদ্যম করে উদ্যোগী। ইসলামের সর্বকালীন ও সর্বজনীন উপযোগ-চেতনা মুগ্ধ মুসলমানকে করেছে কাল ও ভূগোল বিমুখ—তথা দেশ-কাল-পরিবেষ্টনীর গুরুত্ববিমুখ। তাদের মতে বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত্যই উন্নতির সোপান, সর্বপ্রকার জাগতিক সমস্যা-মুক্তির উপায়।

এই যন্ত্রযুগে আজকের সংহত সংকীর্ণ বিশ্বে বিভিন্ন জাতের বর্ণের ধর্মের মানুষ অধ্যুষিত রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাকীর্ণ জীবনে অন্য মানুষের সঙ্গে-যে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামি নীতি ও ব্যবস্থায় সহাবস্থান করা চলে না, শুধু ইসলামি কল্যাণবোধ ও মানবতা নির্বর্ণ জাগতিক ও মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যে-যে যথেষ্ট নয় এবং মুসলিমবাঞ্ছিত ইসলামি মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব অমুসলিমের চোখে যে নির্বর্ণ, সর্বজনীন ও সর্বকালীন মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব নয়, তা মুসলমান মানতে চায় না। [কেননা, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ইহুদি প্রভৃতির নীতিচেতনা, মানবতার আদর্শ ও আদর্শ জীবনবোধ অভিন্ন নয়।]

মুসলমানের এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে গত পাঁচশো বছর ধরে য়ুরোপীয়রা মুসলমানদের এ মানসিকতার লালনে উৎসাহ যুগিয়েছে। ভূগোল-চেতনা তথা দেশ-কাল-জাতের ও পরিবেষ্টনীর স্বাতন্ত্র্যচেতনা যাতে মুসলিম মনে উপ্ত না হতে পারে, তার জন্যে 'ইসলামি' শব্দটার বহুল প্রয়োগ য়ুরোপীয় শাসক-শোষকদের প্রয়োজনীয় এবং তাই প্রিয়। দুনিয়ার অন্য সব জাতির সুখ-সম্পদ-শিক্ষা-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি দৈশিক নামে চলে ও স্বতন্ত্রভাবে বিবেচিত ও অভিহিত হয়, কিন্তু সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সব কিছু ইসলামিক নামে পরিচিত [হোটেল, সেলুন, দোকান, নাচ, গান, শিল্প, ব্যাঙ্ক, পোশাক সবকিছুই ইসলামি]। এ অপপ্রয়োগে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্নই হয়, বরং প্রযোজ্য শব্দ হতে পারত 'মুসলিম'। সাধারণ মুসলমানও এতেই আনন্দিত ও তুষ্ট। ইসলাম যেহেতু দেশ-কাল নিরপেক্ষ একটি জীবনতত্ত্ব ও জীবননীতি, সেহেতু 'ইসলামি' নামে অভিহিত চৌদ্দশো বছর পূর্বের আরব-সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে যেন যে-কোনো দেশের ও কালের মুসলিমের রয়েছে পিতৃধনের মতো সহজ ও স্বাভাবিক উত্তরাধিকার। সেই অক্ষয় সম্পদ-চেতনাই তাকে আজ অবধি রেখেছে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিন্ত।

এমনি জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার বশেই এ শতকের প্রথমপাদে আমরা এদেশে জীবনপণ 'খিলাফৎ আন্দোলন' হতে দেখেছি। পড়েছি মুসলিম সম্পাদিত পত্র-পত্রিকায় 'মুসলিম জগতের' বিচিত্র সংবাদ। ইরাকে রেলপথ তৈরির জন্যে এদেশের মুসলমানকে চাঁদা দিতে দেখেছি, — যদিও তাদের গাঁয়েগঞ্জে ছিল ভাঙা সেতু ও গলিত বর্ত্ম। আবার শতকের শেষপাদেও দেখছি প্যান-ইসলামিজমে উৎসাহী, বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যে ও ভ্রাতৃত্বে মুগ্ধ দেশী মুসলমান।

ইসলামের উন্মেষ-যুগে ধর্মপ্রচার ও রাজ্যজয় ছিল একটি অন্যটির পরিপূরক। প্রচার ও যুদ্ধ অভিন্ন উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে পরিচালিত বলে মুসলিম-মনে ও মননে ইমান, পার্থিব সম্পদ, রাজ্য ও জাতীয় উন্নতি অভিন্নার্থক ও অভিন্নতত্ত্বের উৎসার বলে প্রতীয়মান হয়। সে-ধারণা আর কোনোদিন পরিবর্তিত হয়নি— এ মুহূর্ত অবধি বিজ্ঞ ও শিক্ষিত মনেও রয়েছে অবিচল। ফলে শাস্ত্র-সমাজ-দেশ-কাল-রাষ্ট্র-জীবন-জীবিকা-আচরণ ও কর্ম মুমিনের চক্ষে এক ও অভিন্ন; সবটার মূল শাস্ত্রানুগত্য। অথচ সাইরাস, আলেকজান্ডার, প্যাগান রোমক, চেঙ্গিস, হালাকু, কুবলাই কিংবা নেপোলিয়ন-হিটলারকে স্মরণ করলে তারা ভিন্নতর উপলব্ধি বশে ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত। এ অসামর্থ্যের দরুন, তাদের চক্ষে পার্থিব জীবনোন্নয়নের ভিত্তিই হচ্ছে শাস্ত্রানুগত্য। এই একই ধারণার বশে আঠারো শতকের শেষার্ধে লোপোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যে মুসলমানরা শাস্ত্রাচারে শৈথিল্যই দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মেনেছে। তাই শাহ ওয়ালীউল্লাহর নেতৃত্বে শাস্ত্রিক আচারনিষ্ঠাই পতনরোধের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় বলে উত্তর-ভারতে যে-তত্ত্বের প্রচার শুরু হল, তা তাঁর বংশধর আবদুল আজিজ, আবদুল হাই এবং সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, স্যার সৈয়দ আহমদ, ইনায়েত আলী, বেলায়েত আলী, কেরামত আলী, আলতাফ হোসেন হালী, (মসদ্দস), ইকবাল এবং বাঙলার তিতুমীর, শরিয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম, ফররুখ আহমদ অবধি অবসিত হয়নি। শোয়া দুশো বছরেও তাঁদের উদ্যম ও প্রত্যাশা বিচলিত হয়নি।

উত্তর-ভারতে আঠারো শতক থেকে উর্দুর মাধ্যমে আরবের, ইরানের ও মধ্য এশিয়ার এবং ভারতের মুসলিমের অতীত কৃতি ও কীর্তি স্মরণে গৌরব ও বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্যে হাহাকার প্রকাশ করে মুসলমানরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং বিশুদ্ধ ইসলামানুগত্যেই মুক্তির মন্ত্র খুঁজেছে। ফলে হিন্দুরা সে-সাহিত্যে নিজেদের খুঁজে না পেয়ে হিন্দি ভাষায় উনিশ শতক থেকে নিজেদের প্রয়োজনের সাহিত্য সৃষ্টি করতে থাকে। এমনি করে গাঁয়ে গাঁয়ে উর্দু ও হিন্দি ভাষা-সাহিত্য সাম্প্রদায়িক সম্পদ হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের কোলকাতা-কেন্দ্রী সুবেহ বাঙলায় ইংরেজি-মাধ্যমে হিন্দু-মনে জাগে প্রতীচ্য আদলে জীবন ও সমাজ বিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা। যে য়ুরোপের সঙ্গে তাদের কেতাবী পরিচয় ঘটল, তা ছিল চারশো বছর ধরে রেনেসাঁসের প্রসাদপুষ্ট, দুনিয়া-ছাঁকা সম্পদভোগী, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন জিজ্ঞাসু, আবিষ্কারপটু, উদ্ভাবনপ্রবণ প্রাণচঞ্চল বেনে-বুর্জোয়াজীবনরসিকের দেশ। এ নব জীবনবাঞ্ছা বাঙলার নয়, — বাঙালির নয়, ইংরেজ সান্নিধ্যে ধন্য ও প্রসাদে পুষ্ট কোলকাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থের। তাঁরা প্রথমে কোলকাতার স্বসমাজের, পরে বাঙলার স্বসমাজের কল্যাণ সাধনেই ছিলেন নিরত। উনিশ শতকের শেষার্ধে বিশেষ করে শেষপাদেই তাঁরা সর্বভারতীয় স্বধর্মীর সঙ্গে একাত্মবোধ করতে থাকেন।

এর মনস্তাত্ত্বিক ও সঙ্গত কারণ ছিল। বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত থাকলেও আমাদের পরিচিত য়ুরোপ ছিল একক খ্রিস্টান য়রোপ। হোলি রোমান সাম্রাজ্যের ঐক্য-চেতনা বাস্তবে দুর্লভ হলেও তখনো ছিল সাধারণের মানসসম্পদ ও সংস্কার। কাজেই য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনায় ছিল নির্বিশেষ য়ুরোপীয়ের স্বকীয়তার দাবি ও উত্তরাধিকার। তাছাড়া রাষ্ট্রিক না হোক, ভৌগোলিক অখণ্ডতাও এমনি মনোভাব গঠনের ছিল অনুকূল। ফলে য়ুরোপে যে চিন্তা-চেতনা দৈশিক, ভাষাগত কিংবা দেশগত জাতীয় বা রাষ্ট্রিক কল্যাণ কামনার রূপ নিয়েছিল, বিভিন্ন শাস্ত্রানুসারীর ভারতে তা অবিকল অনুকৃত হতে পারেনি।

বাঙলার হিন্দু দেখল দেশটা হিন্দুর নয়, 'জাতি' অর্থেও সবাই এক নামে পরিচিত নয়, দৈশিক পরিচয়ও (বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম) অভিন্ন নয়, রাষ্ট্রিক পরিচয়ও অনুপস্থিত। ভবিষ্যৎ ভেবে দৈশিক বা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার মতো চিন্তা-চেতনার উদ্ভবেরও কোনো কারণ ছিল না তখন। তার ওপর তুর্কি-মুঘলরা যদিও ছিল বিদেশাগত শাসক, কতকটা দেশী মুসলমানের জ্ঞাতিত্ব লোভের ফলে এবং কতকটা হিন্দুর প্রাক্তন বিধর্মী শাসক-বিদ্বেষের কারণে দৈশিক কিংবা ভাষিক জাতীয়তাবোধ পরবর্তীকালে প্রয়োজনের সময়েও গড়ে ওঠেনি।

কাজেই বাঙলার হিন্দু কেবল হিন্দুর কল্যাণেই করল আত্মনিয়োগ। স্কুল-কলেজ, পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি, সাহিত্য-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাস্ত্র-শোধন, সমাজ-সংস্কার, দান-ধর্ম, চাকরি-মজুরি— এমনকি সরকারের আবেদন-নিবেদনও করত কেবল হিন্দুর জন্যে ও হিন্দুর স্বার্থে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান-যে গাঁয়ে-গঞ্জে কেবল পাশাপাশি বাস করে না; অভিন্ন হাটে-বাটে, মাঠে-ঘাটে বেচা-কেনায়, লেনদেনে, সহযোগিতায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে অবিচ্ছেদ্য— এ সত্য এ-সময়কার হিন্দুর ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে অনুপস্থিত। পরে বাঙালি মুসলমানও এ-পন্থাই অনুসরণ করেছে। এ অবাস্তব ও অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও আচরণ পরিণামে কল্যাণকর হয়নি।

উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি হিন্দুরচিত বাঙলা রচনার কোথাও মুসলমানের প্রতি সহানুভূতির আভাসমাত্র না পেয়ে নব্যশিক্ষিত মুসলমানরাও ১৯৩০ সন অবধি বাঙলাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেছে, বরণ করতে চেয়েছে উর্দুকে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মধ্যযুগের মুসলিম-রচিত সাহিত্য আবিষ্কার করে এবং কাজী নজরুল ইসলাম চিত্ত-কাড়া চমকপ্রদ বিপ্লবাত্মক সাহিত্য সৃষ্টি করে মুসলিমদের দ্বিধাহীনচিত্তে মাতৃভাষারূপে বাঙলাভাষা বরণে অনুপ্রাণিত করেন। আগেই বলেছি একই কারণে উত্তর-ভারতে হিন্দুরা উর্দু ছেড়ে হিন্দি ধরেছিল। ফলে ভারতে সর্বত্র বাস্তব প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক মিলন ও ঐক্য-প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল।

রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা মানুষ একসময়ে ভুলে যায়, কিন্তু শিল্পোত্তীর্ণ সাহিত্য দীর্ঘকাল চালু থেকে ব্যক্তি-মন ও সমাজ-মানস প্রভাবিত করে। সেদিক দিয়ে হিন্দু-মুসলিমের স্বাতন্ত্র্যবোধ বৃদ্ধির সহায় হয়েছিল বাঙলা ও উর্দু সাহিত্য— এর চরম ফল দুই রাষ্ট্রের উদ্ভব ও হত্যাকাণ্ড। রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভেদ-বিদ্বেষ তীব্র-তীক্ষ্ণ করেছিল প্রত্যক্ষভাবে অবশ্য দুই সমাজের অসম বিকাশ (বাঙলার হিন্দুর ও উত্তর ভারতের মুসলমানের) ও আর্থিক বৈষম্য। এ অবস্থায় সংখ্যাগুরুর হাতে পীড়ন-ভীতি দুই রাষ্ট্রের উদ্ভব অমোঘ করে তুলেছিল; যদিও যে-অংশ নিয়ে পাকিস্তান গড়ে উঠল, তাতে হিন্দুর হাতে পীড়নপ্রাপ্তির কোনো আশঙ্কাই কখনো ছিল না, বরং আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব সম্ভাব্য মুসলিম-প্রতিপত্তিমুক্ত হল, আর বাকি অংশের মুসলমানের ভাগ্য রইল সংখ্যাগুরুর মর্জি-নির্ভর। গত চল্লিশ বছরে উত্তর-ভারতে [এবং গুজরাটে-মহারাষ্ট্রে] এরা ছোট বড় কয়েকশো হত্যাকাণ্ডের অবাধ শিকার হয়েছে— যা ব্রিটিশ ভারতে কিংবা অখণ্ড ভারতে হতে পারত না।

উনিশ শতকের প্রবুদ্ধ আত্মজিজ্ঞাসু ভাগ্যোন্নয়নকামী বাঙালি হিন্দুর রচিত সাহিত্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রীতি, শাস্ত্র-সমাজ-সংস্কারের প্রবণতা ও আত্মকল্যাণে প্রতীচ্য আদলে জীবন রচনার বাঞ্ছা প্রকট। আর মুসলিম-রচিত সাহিত্যে প্রাই ভারত-বহির্ভূত ও পনেরো শতকের পূর্বেকার মুসলিম কৃতি-কীর্তি গৌরবের আস্ফালনে ও রোমন্থনে হৃতসর্বস্বের আর্তনাদ ঢাকা দেয়ার প্রয়াস। এরা প্রগতি-ভীরু, কেবল পুরোনো অবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির কাঙ্ক্ষী। আত্মবোধনের নামে এ একপ্রকারের আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বিলাপ ও প্রবোধ দুই-ই। কেননা এ অতীতাশ্রয়ী, এবং সে কারণে সম্মুখদৃষ্টিশূন্য আকাঙ্ক্ষারিক্ত ও ভবিষ্যৎ-বিমুখ। তাই হালীর মসদ্দস, ইকবালের আসরারে খুদি কিংবা শেকোয়া অথবা নজরুলের জিঞ্জির ও ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি বা সিরাজুমমুনিরা আশ্বাসদানের ছলে কান্নাই। এ দেশ-কাল-পরিবেষ্টনী ও প্রয়োজন-চেতনার অভাবেরই সাক্ষ্য। হিন্দুরা চেয়েছে কুসংস্কার পরিহারে প্রতীচ্য-প্রগতি। মুসলমানরা কুসংস্কার পরিহার কামনা করেছে এগিয়ে যাবার শক্তি পাওয়ার জন্যে নয়, অতীত ইসলামি জীবনে স্থিতি পাওয়ার জন্যেই। ঐতিহ্যমুগ্ধ কোনো নায়ক বা লেখকই কোনো দেশে সমকালের সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। পারেনি জীবনের সমকালোত্থিত প্রয়োজন পূরণ করতে। ইতিহাস বলে—পুরোনোর, অতীতের অস্বীকৃতিতেই নতুনের প্রতিষ্ঠা এবং পুরাতন পরিহারই অগ্রগতির ও নতুন পথ আবিষ্কারের পূর্বশর্ত। নতুন সূর্য, নতুন জগৎ, নতুন মানুষ এবং জীবনের ও জীবিকার নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং তা পূরণ করতে হয় স্বকালে ও স্বয়ং। অক্ষম বাঁচে অতীতের সঞ্চয়ে ও স্মৃতির চারণে, শক্তিমান বাঁচে বর্তমানে ও স্বনির্ভরতায় আর বুদ্ধিমান বাঁচে ভবিষ্যতে দৃষ্টি প্রসারিত রেখে। বালকের অবলম্বন স্বপ্ন, যুবকের স্থিতি কর্মে আর বৃদ্ধ বাঁচে স্মৃতিচারণে।

দুনিয়ার সব মানুষ চলছে দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক পরিচয়ে, সব মানুষেরই প্রয়াস স্বদেশে স্বকালে স্বকীয় সম্পদের ও সমস্যার মধ্যে বাঁচার। কিন্তু বাঙালি মুসলমান এ মুহূর্তে তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চায় ইসলামের উদ্ভব-যুগের বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় পরিবেশ। ইসলাম-উত্তর দুনিয়ার সাড়ে তেরোশো বছর বয়স যেন বন্ধ্যা ও বৃথা কেটেছে! তাই তবলিগ ও প্যান-ইসলামিজমই তারা বরণ করেছে সমকালের সমস্যামুক্তির চিরন্তন ও মোক্ষম উপায় হিসেবে। তারা মনে করে মক্কা-মদিনার মুমিন তেরোশো বছর আগে যে উদ্যম, সাহস ও শক্তি পেয়েছিল; বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত জীবনচর্যার আজাকের বাঙালি মুমিনও তেমন শক্তি ও সাফল্য পাবে। পশ্চাদ্দৃষ্টি যে চলার গতি রুদ্ধ করেই, তা মুসলমান মানে না। আগেকার যুগের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীতে হয়তো এমনি মত-পথ নিয়েও একটি রাষ্ট্র চলতে পারত। কিন্তু এই যন্ত্রযুগে নানা জাতের, বর্ণের ও মতের মানুষ-অধ্যুষিত সংহত ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে যন্ত্র-বাণিজ্য-অর্থ ও রাজনীতি জটিল মানসিক ও আচারিক জীবনে কোনো দেশেই কোনো মানুষ স্বধর্ম ও স্বতন্ত্রনীতি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করতে পারে না।

রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কারের ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অপমৃত্যুর পথ রুদ্ধ হয়েছে, তাই জনসংখ্যা বাড়ছে দ্রুত। মানুষে মানুষে আজ পৃথিবী আকীর্ণ। আজ পৃথিবীর মানুষ সর্বব্যাপারে পরস্পর নির্ভরশীল। একালে আন্তর্জাতিক তালে ও প্রয়োজনে বাঁচতে হচ্ছে যখন, তখন এ অতীতপ্রীতি, পশ্চাদ্দৃষ্টি ও স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ইচ্ছামৃত্যু বরণের নামান্তর। আজকের মানুষকে বাঁচতে হবে কালের ও প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দিয়েই— কালের ও প্রয়োজনের নির্দেশ মেনেই এবং তা হচ্ছে বণ্টনে বাঁচার আহ্বান ও নির্দেশ। 'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।' কথায় বলে স্বনামা পুরুষ ধন্য/পিতৃনামা চ মধ্যমঃ/— আর অধমেরা চলে আত্মীয়কুটুম্বের পরিচয়ে। বাঙলায়ও এর তর্জমা রয়েছে— বাপের নামে আধা/দাদার গাধা/স্বনামে শাহজাদা।

আমাদের আত্মকল্যাণের জন্যেই আমাদেরকে স্বদেশে স্বকালে স্বনামে স্বস্থ হয়ে সুস্থ জীবনের, স্বয়ম্ভর জীবিকার ও যুগোপযোগী আন্তর্জাতিক মননের সাধনা করতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা দেহ-মনের স্বাস্থ্য ফিরে পাব। আমাদের যুগপৎ বাঙালি, বাঙলাদেশী, আত্মপ্রত্যয়ী আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও স্বনির্ভর হতেই হবে—আজকের জগতে বাঁচবার গরজেই।

সংকটের মূলে

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাঙলাদেশে শিক্ষার পরিসর ও শিক্ষিতের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ফলে এক দশকের মধ্যেই প্রয়োজনবোধ ও অধিকার-চেতনা রূপান্তর লাভ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে আমাদের চেতনার মুখ্য ধারা ছিল সর্বভারতীয় স্বাধর্ম্যবোধ ও বিধর্মীবিদ্বেষ। তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল কেবল স্থাননিরপেক্ষ মুসলিমহিত : খাইবারপাস থেকে টেকনাফ অবধি ভৌগোলিক পরিসরে যে-কোনো মুসলিমের উন্নতিকেই আমরা তখন আত্মোন্নয়ন বলে মনে করেছি।

বাঙলাদেশে দৃষ্টিগ্রাহ্য একটা শিক্ষিত অথচ প্রায় নিঃস্ব তরুণসমাজ যখন দ্রুত গড়ে উঠল, তখন তাদের জীবিকার ক্ষেত্রে অধিকারবোধ হল তীব্র। আগে অশিক্ষিত বাঙালির তেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজনবোধ ছিল না বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ও সামরিক বিভাগে তারা তাদের ন্যায্য অংশ দাবি করেনি।

ইতোমধ্যে সেখানে জাঁকিয়ে বসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা। ফলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে নামতে হল তাদের সংগ্রামে। কিন্তু তখনো পূর্বের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বিধর্মীর সৌভাগ্যসম্পদে ঈর্ষার স্মৃতি প্রবল ছিল বলে ইসলাম ও উত্তরভারতীয় উর্দুই ছিল জাতীয়তার ভিত্তি। তাই সংখ্যাগুরুর ভাষা 'বাঙলা'কে তারা কখনো একক রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের সঙ্গত দাবিটি উত্থাপন করেনি, কেবল উর্দুর পাশে তার ঠাঁই চেয়েছিল— সম্ভবত চাকরিক্ষেত্রে ঠক্‌বার আশঙ্কা থেকেই। কেননা, মোটামুটিভাবে ১৯৩০ সন অবধি শিক্ষিত বাঙালি মুসলিমের মনে উর্দু-বাঙলার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, এবং ১৯৪৮ সন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় অন্তিমকাল অবধি উর্দু-প্রবণ ও বাঙলা-বিদ্বেষী শিক্ষিত-লোকের সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না— তার প্রমাণ পাচ্ছি ১৯৭৭ সনের এই মুহূর্তে [এবং ১৯৮৬ সনেও] কিছু লোকের 'ইসলামি-বাঙলা' প্রয়োগের ঐকান্তিক আগ্রহ ও 'বেতার বাঙলা' 'রাষ্ট্রপতি' 'জলপথ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার-ভীতি দেখে। সত্য কথা এই, সেদিনকার শহুরে তরুণরাই বাঙলাভাষাকে অন্যতর রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল। বয়স্করা ছিল তিন দলে বিভক্ত : একদল এতে প্রত্যক্ষ করেছিল হিন্দুর পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র, একদল নির্বোধ আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত রাষ্ট্রের ভিত্তি ও বন্ধন-সূত্র ছিল উর্দু, অন্যদলের সমর্থন ছিল দুটোর সহাবস্থানে—তারাও চেয়েছিল 'ইসলামি বাঙলা'। অর্থাৎ তিনটে দলই পাকিস্তানের অস্তিত্ব, পাকিস্তানী সংহতি ও কুফরি-বর্জনের জন্যে উর্দুভাষাকে অপরিহার্য ও আবশ্যিক বলে মনে করেছিল। জীবিকার এবং জীবিকার প্রতীক ও প্রসূন অর্থের সুলভতা-দুর্লভতাই যে ব্যক্তির নৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে—এ চেতনার ঠাঁই ছিল না এদের মানসে।

তাই দু'হাজার বছরের নির্জিত নিরক্ষর নিঃস্ব বাঙালি মুসলিম-ঘরে যখন শিক্ষার আলো দ্রুত প্রবেশ করল, তখন বহু বহু কালের বঞ্চিতমনে ভোগ-উপভোগের বাসনা হল প্রবল, লিপ্সা হল অপ্রতিরোধ্য। জীবিকাক্ষেত্রে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের প্রেরণার উৎস ছিল ভোগবাঞ্ছা। তাই একদিকে মুরুব্বিহীনেরা হল সংগ্রামী, অপরদিকে মুরুব্বিওয়ালা ও মুরুব্বিকামীরা হল দালাল। শতকরা নিরানব্বই জন বাঙালি মুসলমানের পক্ষে এ ছিল ভোগ-উপভোগের নতুন জগৎ। দু'হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম তাদের শিক্ষার ও ধন-ঐশ্বর্যের জগতে স্বাধীন অনুপ্রবেশ। এ ছিল বুভুক্ষুর মিছিল। 'মুক্ত বাঙলা'য় আমরা এ বুভুক্ষুদেরই অবাধ অসংযত ও অসংকোচ লুটপাট, কাড়াকাড়ি, মারামারি, হানাহানি ও ঠেলাঠেলির চরম লীলা প্রত্যক্ষ করেছি। অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে তা শিক্ষিত সমাজে আজ ভিন্নাকারে প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রজ্ঞাবানদের প্রত্যাশা ছিল— দ্বিতীয় পুরুষে লিপ্সা মন্দা হবে, প্রলোভন হবে প্রশমিত, অথবা সমাজব্যবস্থার হবে পরিবর্তন। কিন্তু দেশে আজো দশ কোটি মানুষ এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের ঘরেও দ্রুত তৈরি হচ্ছে নতুন শিক্ষিত বুভুক্ষু। কাজেই আর্থিক-রাষ্ট্রিক এ ব্যবস্থা বহাল থাকলে লুটপাট, কাড়াকাড়ি, হানাহানি বাড়বে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এমনি অবস্থায় সদিচ্ছা, সুবুদ্ধি ও সৎসাহস নিয়ে গণকল্যাণে নামার লোক থাকবে সংখ্যালঘু; কিন্তু জনহিতৈষীর ছদ্মবেশে দাঁও মারার উদ্দেশ্যে রাজনীতির আসর এখনকার মতোই সরগরম রাখবে অন্য সবাই। ঘুষে-ভেজালে-পাচারে-চোরাকারবারে যেমন তা প্রকট, সুযোগসন্ধানী-সুবিধাবাদী-মিথ্যুক-প্রবঞ্চক-প্রতারক-চাটুকারের আধিক্যেও তেমনি তা প্রমাণিত।

অধিকার-চেতনা ও প্রাপ্তির লিপ্সা অভিন্ন নয়, অধিকার-চেতনায় বঞ্চনার বেদনা থাকলেও তাতে নৈতিক শক্তি ও ন্যায়বোধ থাকে প্রবল। কিন্তু শুধু পাওয়ার লোভ মানুষকে করে অন্ধ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবেগ চালিত এবং আত্মসর্বস্ব ও অবিবেচক। দু'হাজার বছরের বঞ্চনাক্লিষ্ট, শোষণপিষ্ট ও দারিদ্র্যদুষ্ট বলে হঠাৎ-পাওয়া সুযোগ তাদের করেছিল দিশেহারা। প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ববোধ কিংবা প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবুদ্ধি জাগতে পারেনি তাদের চিন্তা-চেতনায়। তারা কেবল 'পাই পাই', 'খাই খাই' লক্ষ্যে ছুটোছুটি করেছে, তাদের ধাক্কায়-দলনে পাশের ও সুমুখের মানুষ হয়েছে পর্যুদস্ত ও পীড়িত। এমনি করে গুণ-মান-মাহাত্ম্য তুচ্ছ হয়ে গেল গাড়ি-বাড়ি ও সঞ্চিত অর্থের জৌলুসের পাশে। দর্প ও দাপট পেল গুণ-যশ-শ্রদ্ধার মহিমা। এ হল মধ্যবিত্তের জন্মকালীন পুরোনো সমাজের যন্ত্রণাযুগ। পুরোনো নির্জিত সমাজ থেকে উত্থিত এ মধ্যবিত্তশ্রেণী মাকড়সা-সন্তানের মতো পুরোনো মূল্যবোধের ও নৈতিক চেতনার ভক্ষক। এতে আকস্মিকতা থাকলেও অস্বাভাবিকতা ছিল না— কারণ মুসলিম-সমাজে ইতোপূর্বে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সক্রিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না, যেমন ছিল না উচ্চবিত্তের শ্রেণী।

উপর্যুক্ত কথাগুলোর ভুল ব্যাখ্যার আশঙ্কায় আমরা এ বলতে চাই যে, যে-শ্রেণী থেকে আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আকস্মিক ও প্লাবনিক উদ্ভব তাদের পক্ষে স্বস্থ ও ধীরগতি হওয়া প্রাতিবেশিক কারণেই ছিল অসম্ভব। তারা কটা স্থূল স্বার্থবোধ ও লিপ্সা-বশে জীবিকার ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিচরণ করেছে। তাদের চিন্তা-চেতনায় সুদূরপ্রসারী সুপরিকল্পিত দৈশিক মানব-হিতৈষণা, ভাবী সমস্যাচেতনা, দীর্ঘস্থায়ী ও লক্ষ্যনির্দিষ্ট আদর্শিক প্রেরণা কিংবা সূক্ষ্ম সর্বজনীন শ্রেয়োচিন্তা ছিল না।

আপাত লাভ লোভ ও প্রয়োজন-বুদ্ধিই চালিত করেছে তাদের। অন্যদের মতো আত্মাদর বা আত্মরতি ছিল রাজনীতিকদের মধ্যেও প্রবল এবং এখনো তা অপরিবর্তিত। সবাই যেন 'চলতি হাওয়ার পন্থী'। ব্যতিক্রম ছিল দুর্লক্ষ্য। 'বোল' পাল্টাতে ও 'ভোল' বদলাতে এদের জুড়ি নেই আজো। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবিধাবাদ ও আদর্শহীনতা দেশপ্রেমের ও মানবপ্রীতির পরিপন্থী। এতে দেশে জীবন-জীবিকার স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা ব্যাহত হয়। ব্যক্তিমানুষও হয় প্রাত্যহিক জীবনে অনিশ্চয়তার শিকার।

এমনি অবস্থায় আইনের সম্মান ও গুরুত্ব থাকে না, সাময়িক order ও ordinance-ই হয় প্রশাসনের অবলম্বন, এবং তা প্রযুক্ত হয় সরকারি ব্যক্তির ও দলের স্বার্থে। এবং এসব প্রায়ই 'বুমেরাঙ' হয়ে দাঁড়ায়। অথচ প্রকৃত 'আইনের শাসন' যতই কঠোর হোক, তাতে প্রবোধ মেলে—আইন একা কারো জন্যে নয় বলে। এবং আইন সাধারণত কাকেও বিড়ম্বিত ও প্রতারিত করে না।

পরিণামে আমরা আজ সর্বপ্রকার সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চরিত্র সঙ্কট, অর্থ সঙ্কট, প্রাণ সঙ্কট, আইন সঙ্কট, নীতি সঙ্কট, সংস্কৃতি সঙ্কট প্রভৃতির শিকার হয়ে অস্থির ও অসুস্থ আমরা।

উঠতি মধ্যবিত্তের জীবিকা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং তজ্জাত ঠেলাঠেলির কাড়াকাড়ির ও হানাহানির ফলে দুর্বলের পরাজয়ে ঠিকাদারিতে, ব্যবসাতে, চাকরিতে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে দুর্জন শক্তিমানের ও ধূর্ত বুদ্ধিমানের উদ্বর্তন ঘটল। তাই আজ শহরে বন্দরে হাজার বিশ-ত্রিশ লোকের হাতে অর্থসম্পদ ধরা রয়েছে। এর সবটাই অসদুপায়ে অর্জিত। লুটপাটের ও কাড়াকাড়ির ফলে অপচিত হয়েছে আরো বহুগুণ। নিয়ম-নীতি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হলে এ অবস্থায়ও অন্যরা অন্তত কিছুটা স্বস্তিতে থাকত।

বাহ্যত আজ গণমানবের দুর্ভোগের মূল কারণ ঐ বিশ-ত্রিশ হাজার ঠিকাদার-সদাগর-চাকুরে ও তথাকথিত রাজনীতিক। এদের উচ্ছেদে দৈশিক-সামাজিক জীবনে সাময়িকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্তত নিয়ম-নীতির ও স্বস্তির অস্তিত্ব অনুভূত হবে। দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী সমাধানের উপায় অবশ্যই সমাজতন্ত্র।

দেশে গণমানুষের দুর্ভোগ-দুর্ভাগ্যের আর-এক কারণ সুবিধাবাদী মানুষের তথাকথিত নিরীহতা। তারা সরকারি প্রয়োজনে রাজনৈতিক সভা করতে ও স্লোগান দিতে সদাসম্মত। কিন্তু গণস্বার্থে কোনো দাবি উত্থাপিত হলে তারা রাজনীতি-বিরাগী। চাল-ডাল-নুন-তেল-পিঁয়াজের দাম কমানোর স্লোগান তাদের চোখে রাজনীতি, কিন্তু সরকারি গণভোটে জনগণকে উৎসাহদান তাদের কাছে গণসেবা। এই লুটেরা আর এই বক-বৈরাগীরাই গণভাগ্যোন্নয়নে ও গণসংগ্রামে বড় বাধা। এরাই প্রকৃত গণশত্রু।

বৈষয়িক জীবনে আমরা ছিলাম নিঃস্ব। তাই স্থূল-জীবনের উপকরণই ছিল আমাদের কাম্য। গাড়ি-বাড়ি-ঐশ্বর্য দিয়ে আমরা ধাঁধিয়ে দিতে চেয়েছি প্রতিবেশীকে। ঢাকার ফুলবাড়িয়া স্টেশনে যে-শহরের শেষ ছিল, তা আজ মীরপুর-গুলশান-বাড্ডা-উত্তরা অবধি বিস্তৃত এবং প্রাসাদোপম দালানে দালানে আকীর্ণ। আর সাভার-টঙ্গী-জয়দেবপুর অবধি সব জমি শহুরে ভদ্রলোকদের এখন করতলগত। এমনি রূপ অন্য শহরগুলোরও। এতেই বোঝা যায় গত চল্লিশ বছর ধরে আমাদের কাম্য ছিল কী? কোন্ লক্ষ্যে অপচিত হয়েছে আমাদের শক্তি, অর্থ ও মনন। শহরের শ্রমজীবী থেকে ভিক্ষাজীবী অবধি সবাই অভিন্ন লক্ষ্যে ধাবিত। তাই সব স্তরেই সহজসিদ্ধির সুপথ জনপ্রিয়—তা হচ্ছে দুর্নীতি ও লুণ্ঠন। বলেছি, আরো নয় কোটি পিছিয়ে পড়ে রয়েছে, তাদেরও সাধ এ-ই, এবং তারাও সন্তান স্কুলে-কলেজে ও শহরে পাঠাচ্ছে ভোগ্য-উপভোগ্য বস্তু অর্জন-উদ্দেশ্যেই। প্রতিযোগিতা চলছে লুণ্ঠনের, প্রতারণার ও শোষণের কৌশলে নৈপুণ্য ও উৎকর্ষ লাভের জন্য। তাই সততা ও ন্যায়নিষ্ঠা নির্বুদ্ধিতা বলে উপহাস্য ও অবজ্ঞেয়। ছল-চাতুরী-প্রতারণার নৈপুণ্যই যোগ্যতা। মিথ্যা ভাষণে পটুতা, ষড়যন্ত্রে দক্ষতা এবং জাল-জুয়ায় জাদুকরি উৎকর্ষই চাকুরের, নেতার ও মন্ত্রীর যোগ্যতার পরিমাপক।

এসব কারণেই জীবন-জীবিকার সবক্ষেত্রেই সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, মানবকল্যাণকামী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ দেশে বিরল। স্কুলে-কলেজে জনসেবক ছাত্র স্কাউট রোভার হিসাবে উৎসাহী কর্মী থাকে, উত্তরজীবনে তাদের বাস্তব-হিতৈষণার কোনো নমুনা মেলে না। তেমনি ছাত্রকর্মীকে ও ছাত্রনেতাদেরকেও কর্মজীবনে প্রায়ই অন্যদের মতোই দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর রূপেই দেখতে পাই। কাজেই আমাদের ভুঁইফোড় সমাজে গণসেবাব্রত ত্যাগস্পৃহা ও সংগ্রাম-সংকল্প সবটাই কৃত্রিম ও বুদ্বুদসম ক্ষণজীবী। ভুঁইফোড় মধ্যবিত্তের প্রায় সবাই এখনো জীবিকাক্ষেত্রে ঘুষাদি বিভিন্ন প্রকারের দাঁও মারার ও ফায়দা ওঠানোর সুযোগ পাচ্ছে। তবে আরো কিছুকাল পরে যখন শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, আর বেঁচে থাকার মতো জীবিকা অর্জন কর্মসংস্থানের অভাবেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে, তখন গণমানবের সঙ্গে জুটে যাবে তারা বাঁচার তাগিদেই। অতএব জীবিকাক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে একটা সংখ্যাগুরু নিরুপায় শিক্ষিত দীন মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠলেই কেবল সমাজবিপ্লব ও রূপান্তর হবে সম্ভব এবং আসন্ন।

সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে যেমন, শিল্প-সাহিত্য ক্ষেত্রেও তেমনি চরিত্রহীন সুযোগসন্ধানী ও সুবিধাবাদী চাটুকারের সংখ্যাই বেশি। কৃচিৎ আদর্শ-সচেতন দৃঢ় মেরুর আঁকিয়ে-লিখিয়ে মেলে। তরুণ-সমাদৃত আবুল ফজলকেও তাই 'উপদেষ্টা' হয়ে 'নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের' আর্থিক জীবনে 'ইসলামি নীতির' এবং ছাত্রদের রাজনৈতিক-চেতনা বর্জনের মহিমা বর্ণনায় মুখর হতে দেখি। তাঁর আকস্মিক টুপিপ্রীতিও স্মর্তব্য। আর বাঙলা একাডেমী আয়োজিত বিভিন্ন পার্বণিক সভার বক্তা নির্বাচনে থাকে সরকারি মত-পথের মৌসুমী রূপের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গিত। মুক্ত বাঙলাদেশ যারা চায়নি, সরকারি প্রশ্রয়ে তারাই প্রাশাসনিক পদে জাঁকিয়ে বসেছে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আসর দখল করেছে তারাই। কাজেই শিক্ষিতের সংখ্যার অনুপাতে আঁকিয়ে-লিখিয়ের সংখ্যা বর্ধিষ্ণু বটে, কিন্তু তাদের গা-পা বাঁচিয়ে শাস্ত্র-সমাজ-সরকারের মন-যোগানো ও ইনাম-বাগানো রচনা ক্ষেত্রবিশেষে শিল্প-সুন্দর ও শৈল্পিক উৎকর্ষের নিদর্শন হলেও দৈশিক ও কালিক মানুষের স্বার্থবিরোধীই হচ্ছে।

তার কারণ, সাহিত্য হল জীবনের প্রতিচ্ছবি, ইতিবৃত্ত ও জীবনোন্নয়নের ইঙ্গিত। জীবন অনপেক্ষ নয়—জীবিকা ও পরিবষ্টেনী নির্ভর। বহু বহু কাল আগেই ফল-মূল-মৃগয়া-নির্ভর জীবিকার যুগ অবসিত হয়েছে। সভ্যতার স্রষ্টা তথা হাতিয়ার-উদ্ভাবক মানুষের বুদ্ধির ও হাতিয়ারের ক্রমবিকাশের ফলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন জীবিকার পদ্ধতি ও সংগ্রাম জটাজটিল হয়ে আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে একটা আরণ্যক বাধা ও বিভ্রান্তি। অজ্ঞ-অসমর্থ-শোষিত মানুষ দিশেহারা হয়ে মুক্তির জন্যে, আলোর জন্যে অরণ্য অতিক্রমণের জন্যে ছুটোছুটি করছে। তাই আজ গরিব দেশে জীবন ও জীবিকা যন্ত্রণার ও সংগ্রামের নামান্তর মাত্র।

আজকের কাম্য সাহিত্যও হবে তাই সে-যন্ত্রণার ও সে-সংগ্রামের ইতিকথার ও পদ্ধতির আধার। শোষিত, পীড়িত, নিঃস্ব, নিরক্ষর ও নিঃসহায় গণমানবের দুঃখ-যন্ত্রণা-নৈরাশ্যের এবং আশার, প্রত্যাশার ও আশ্বাসের কথা তাদের দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভোগ মোচন লক্ষ্যে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করা, রঙে-তুলিতে চিত্রিত করা, নাচে ফুটিয়ে তোলা, গানে ধ্বনিত করা, বাজনায় অভিব্যক্তি দেয়া— আজ তাই লিখিয়ে-আঁকিয়ে-নাচিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে সবারই পবিত্র মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। অবশ্য এ দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করার মতো, পালন করার মতো মানুষ এ-সমাজে আরো বহুকাল অবধি কৃচিৎ মিলবে। তা জেনেও হতাশ হলে চলবে না। সচেতন সংবেদনশীল শক্তিমান একজনও এক্ষেত্রে একাই একশোর দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারে—আপাতত এ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকব।

প্রবাসীমন ও সংস্কৃতি

একটা দালানের দেয়াল তুলতে সময় লাগে না, আপাতত মনে হয় দালান উঠেই গেল, কিন্তু খুঁটিনাটি কাজ সেরে বাসযোগ্য করতে কয়েকমাস কেটে যায়। জাতীয় কিংবা সামাজিক জীবনেও শিক্ষা কিংবা বৃত্তিবেসাতের বিস্তার ঘটলেই জাতীয়জীবন বা চরিত্র সুষ্ঠু ও সুষম হয়ে ওঠে না। মন-মননের কালোপযোগী কিংবা জীবনযাত্রার মানানুগ পরিবর্তন ঘটাতে ঐ দালানের মতোই সময় লাগে বিস্তর।

বাহ্যত আমাদের সমাজে শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশ আমলের হিন্দুসমাজের তুলনায় অনেক বেশিই হয়েছে, অবশ্য জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে তা গাঁয়েগঞ্জে এখনো তেমন লক্ষণীয় নয়। যেমন করেই হোক, বর্তমানে শহরে একটা শিক্ষিত সমাজ পেয়েছি আমরা। তাদের ধন-মান জ্ঞান ও অনুকৃত-সংস্কৃতির জৌলুস দেখলে চোখ জুড়ায়। সভ্যতালোভীপ্রতিযোগী মনে জাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মবিশ্বাসও। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এর যতটা প্রাতিভাসিক, ততটা বাস্তবিক নয়। এতে তারল্য বেশি, সার ও শাঁস কম, অশ্লীল করে বললে বলতে হয় এখানেও ভেজাল। তাই আবার মুহূর্তে ম্লান হয়ে আসে চোখের দৃষ্টি এবং মিইয়ে পড়ে মন।

মনে হয় কেবল বিদ্যা ও বিত্ত দিয়ে ব্যক্তি বা জাতি বড় হয় না, আরো কিছু লাগে এবং সেটি শ্রেয়োচেতনা বা মূল্যবোধ, অন্য কথায় হিতবুদ্ধিজাত জীবনদৃষ্টি, সংস্কৃতি ওই বোধের ও দৃষ্টির প্রসূন—যা আমাদের আজো অনায়ত্ত। দুর্নীতির, দুর্ভোগের ও সমস্যার মূল ঐখানেই।

বাবারও যেমন বাবা থাকে, তেমনি মূলেরও থাকে মূল এবং সেই মূলের মূল রয়েছে আরো দূরে ও অজ্ঞাত গভীরে। বাঙালি মুসলমানের কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। তাই তার আত্মসংবাদ তারও অজ্ঞাত। আত্মপরিচয় আত্মপ্রত্যয়ের ও আত্মশক্তির উৎস। ঐটি জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার অন্যতর ভিত্তি। বাঙালি মুসলমানের স্বকল্পিত আত্মপরিচয় জলের ওপরকার শেওলাভিত্তিক—কোনো নির্ণিত বা স্বীকৃত তথ্যভিত্তিক নয়। সে আরব-ইরান-বুখারাবাসীর জ্ঞাতিত্ব-গর্বে ও তাদের ঐতিহ্য-গৌরবে তৃপ্ত। আজকাল কেউ কেউ অস্ট্রিক-মঙ্গোল রক্তসঙ্কর দেশজ মুসলিম বলে আত্মপরিচয় দিতে লজ্জিত নয় বটে, কিন্তু মনে মনে তাদের আরব-ইরানী-সমরখন্দীর জ্ঞাতিত্ব-ঘোর একতিলও কমেনি। দেহের লালন-পোষণ এদেশের জল-বায়ু-মাটি দিয়ে চললেও সেই স্বপ্নের ও আদর্শের মধ্যযুগীয় জগৎ থেকে তারা মন-মননের খোরাক সংগ্রহে আগ্রহী, ফলে দেহের ও মনের, দেশের ও কালের রূঢ় বাস্তবের ও মধুর কল্পনার সুষমসংযোগ ঘটে না কখনো। যে-মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তা তাদের কাছে অর্ধ-বাস্তব মাত্র, তাদের ঈপ্সিত সত্য-সুন্দর রয়েছে পনেরোশতকপূর্ব গোবী-সাহারায়। এবং ঘরেও নয়, গন্তব্যেও নয়, যেজন থাকে মাঝখানে, তার মন-মননের বিমূঢ়তা ঘুচবার নয়—স্বস্থের ও সুস্থের স্বাস্থ্য ও লাবণ্য চেতনা ও কর্ম তার চির অনায়ত্ত। আজ অবধি সাধারণভাবে মুসলমানরা প্রবাসীর মানস-ঔদাসীন্য এবং Nostalgic বেদনা-মধুর কল্পনা নিয়েই স্বদেশ বাঙলায় জীবনধারণ করছে। দেশগত জীবনদৃষ্টি ও জাতিচেতনা আজো অধিকাংশ মুসলিমে দুর্লভ।

বাঙলাদেশের হাজার বছরের ইতিহাসে তাই চিন্তার ও কর্মের কোনো ক্ষেত্রেই বাঙালি মুসলমানের বিচরণের ও কৃতির কোনো নিদর্শন নেই।

আমরা স্বীকার করছি যে অকৃত্রিম আত্মপরিচয়—আত্মসম্বিতের, আত্মপ্রত্যয়ের ও আত্মশক্তির রক্ষক। আত্মপরিচয়ের এ সূত্র সন্ধান করলে আমাদের অসার্থক অস্তিত্বের ও অতীতের স্বরূপ উদঘাটন ও আবিষ্কার হয়তো আজো সম্ভব।

আমরা দেশজ মুসলমান। নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও নিম্নবিত্তের বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধসমাজ থেকে মুসলিমরূপে আমাদের উদ্ভব। মুখ্যত অস্ট্রিক মঙ্গোল রক্তে আমরা সঙ্কর। আমাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী কিংবা বৌদ্ধ পূর্বপুরুষরা যতটা প্যাগান, ততটা দার্শনিকতত্ত্ব সম্পৃক্ত শাস্ত্রানুগত ছিল না। তার কারণ ধনে-মানে-চিত্তে-বিদ্যায় তাদের কোনো অধিকার ছিল না। তারা অবজ্ঞেয় আন্তেবাসী এবং সামন্তিক দাসাধম। তাদের ধর্মান্তর যতটা লাভ-লোভের প্রেরণায় ও হুজুগে ঘটেছে, তত্ত্বোপলব্ধির ফলে ততটা নয়। নগদলাভ হয়েছিল বর্ণাশ্রিত সমাজের অবজ্ঞামুক্তি ও স্বেচ্ছাচারের অধিকার—মুসলিম সমাজে পেশান্তরের অধিকার থাকলেও যান্ত্রিক উৎকর্ষে শিল্পবিপ্লবের মতো কিছু না ঘটায়, বৃত্তিপরিবর্তন ক্বচিৎ লাভজনক ছিল। বৃত্তিজীবীদের মধ্যে লেখাপড়ার ঐতিহ্য না-থাকায়, মুসলিম হয়েও সে-সুযোগ গ্রহণ করার মতো মূল্যবোধ তাদের জাগেনি। ফলে হাড়ি-ডোম-বাগদি-কামার-কুমার-নাপিত-বারুই-জেলে-তাঁতি মুসলিম হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরক্ষর কৈবর্ত-কাহার-শিকারি-কুমার-প্রামাণিক-ছুতার-জোলাই থেকে গেল। ক্বচিৎ কোনো আত্মপ্রত্যয়ী উচ্চাভিলাষী বুদ্ধিমান স্ববৃত্তি ও স্বসমাজকে ছেড়ে মধ্য ও উচ্চবিত্তের সমাজে ঠাঁই নিয়েছিল। কেবল পূর্বেকার কৃষিজীবীরাই সচ্ছল হয়ে আত্মোন্নয়নে আগ্রহী হয়েছিল বেশি। তাদের থেকেই মুন্সী-মোল্লা-মৌলবী-মুৎসদ্দি-উকিল-কাজি-হেকিম-আমিন ও ছোট বেসাতী হত। এই নিম্নবিত্তের ও অবজ্ঞেয় বৃত্তির নির্জিত মানুষেরা দীক্ষিত হয়েছিল বিদেশী দরবেশ-প্রচারকদের মিশনারিসুলভ সেবা-সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে এবং আপৎকালে তাঁদের ফলপ্রসূ দোয়া-দাওয়া-কেরামতির বিস্ময়কর প্রভাবে পড়ে।

এই মানুষগুলোই তুর্কি-মুঘল আমলে বাদশাহের স্বধর্মী বলে গৌরব করে অক্ষমের আত্মপ্রসাদ লাভ করত। কালক্রমে ও মনস্তাত্ত্বিক কারণেই এই অজ্ঞ আত্মবিস্মৃত মানুষেরা স্বধর্মী শুধু, জ্ঞাতিত্বেও বাদশাহ্‌র জাত বলেই নিজেদের ভাবতে থাকে। তখন বাঙালি মুসলমান মাত্রেই নিজেকে আরব-ইরান ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত প্রবাসী বলে বিশ্বাস করতে থাকে। [illegible] সৈয়দ, কাজী, গাজী, কোরাইশী, হাশেমী, ফাতেমী, ওসানী, ফারুকী, হোসাইনী, খোরাসানী, বাগদাদী, মদনী, সমরখন্দী, বুখারী নিদেনপক্ষে দেহলভী হবার বাসনা জাগে ধনে-মানে-বিদ্যায় যারা ঋদ্ধ তাদের মনে। পরিণামে এই দাঁড়িয়েছে যে, এই মুহূর্তে বাঙলার এক জিলায় যত হাশেমী-কোরাইশী আছে, তেরোশো বছরে ওই বংশীয় এত লোকসংখ্যা বাড়াতে বাস্তবে এক একজনকে একশো করে পত্নী গ্রহণ করতে হত। এতে তাদের মান কতটুকু বেড়েছে জানিনে, তবে এই মিথ্যা আত্মপরিচয় তাদের স্বদেশে স্বস্থ হবার পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে রয়েছে আজো। তারা আজো স্পেন থেকে মরুভূমি আরব হয়ে মধ্যএশিয়ার গোবী অবধি স্বধর্মী ও জ্ঞাতি এবং স্বজাতির গৌরব খুঁজে বেড়ায় ও আত্মতৃপ্তি লাভ করে; মনে করে জীবিকা অর্জন করে কায়ারক্ষণ ছাড়া তাদের আর কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

এ কারণেই বাঙলার আটশো বছরের ইতিহাসে দেশজ মুসলিমের কোনো কৃতি বা ভূমিকা দুর্লভ। ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিমের দ্বেষ-দ্বন্দ্বের তীব্রতা বাড়ে ঐ তুর্কি-মুঘল শাসন স্মরণ করেই। মুসলিমরা তুর্কি-মুঘলদের যেমন জ্ঞাতি ও স্বজাতি ভাবে, হিন্দুরাও তেমনি তুর্কি-মুঘল পীড়ন ও পরাধীনতার গ্লানি স্মরণ করে প্রতিবেশী মুসলিমদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ও বিক্ষুব্ধ হয়ে পুরোনো প্রতিশোধবাঞ্ছা জাগ্রত করে। এতে উভয়পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি যা হয়েছে ও হচ্ছে তা অপরিমেয়।

যারা এ চেতনায় চঞ্চল ছিল না বা এখনো নয়, তেমন কিছু অজ্ঞ-অশিক্ষিত-উদাসীন দেশজ মুসলিম বরং গানে-গাথায়-কুটিরশিল্পে-ধর্মতত্ত্বে সাধ্যমতো নিজেদের জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার স্বাক্ষর রেখে গেছে। তাদের নামগুলোও দেশী—পাঁচু, পরান, বানু, দোনা, ইধা, বুধা, গোপাল, কানাই, চাঁদ, সুরুজ, ফুল তোতা, ময়না, বগা ইত্যাদি। আর যাঁরা লেখাপড়া শিখে ঘরে-সংসারে ও নামে-কামে ইসলামি আবহ চালু করেছিলেন, তাঁদের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত অনুকৃত প্রয়াসে ও অনুবাদে সীমিত, মৌলিক সৃষ্টির চিহ্ন দুর্লক্ষ্য। দেশের মাটি ও মানুষ তাঁদের সাহিত্যে-শিল্পে ও সঙ্গীতে অস্বীকৃত, তাই অনুপস্থিত।

তুর্কি-মুঘলরা সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে এদেশ শাসন করেছে বটে, কিন্তু তারা এদেশকে ও দেশবাসীকে চিরকাল বিজিত বিদেশ ও শাসিত প্রজাই ভেবেছে, কখনো স্বদেশ-স্বজাতি বলে বরণ করেনি। ইংরেজরা দেশী খ্রিস্টানদের যেমন সামাজিকভাবে গ্রহণ করেনি কখনো, তুর্কি-মুঘলরাও তেমনি দেশজ মুসলিমদের স্বজাতি বলে ভাবেনি। তাই দেশজ মুসলিমরা গোটা ভারতে কখনো উঁচুপদের রাজপুরুষ হবার সুযোগ পায়নি, মাহমুদ গাওয়ান কিংবা মালিক কাপুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি ব্যতিক্রম মাত্র। অথচ হিন্দুরা যথাযোগ্য পদ ও মর্যাদা পেয়েছে। নিম্নবিত্তের ও নিম্নবৃত্তির নিরক্ষর মানুষ বলেই হয়তো তারা উচ্চপদের যোগ্য ছিল না। তাই বখতিয়ার খলজি থেকে মীর কাসিমের আমল অবধি দরবারে-প্রশাসনে কোনো দেশী মুসলিমের সাক্ষাৎ মেলে না। তুর্কি-মুঘল আমলে যারা এদেশে চাকুরে ও ব্যবসায়ীরূপে আসত, তারা কর্মান্তে চলে যেত, বৃষ্টিবহুল ও নদীহাওর আকীর্ণ এদেশ তাদের বাসযোগ্য ছিল না। সিরাজুদ্দৌলার পতনে একবার এবং মীর কাসিমের পলায়নে দ্বিতীয়বার বিদেশী মুসলিমরা বাঙলা ত্যাগ করে। নানা কারণে যারা রয়ে গেল, তারাই শহুরে কুট্টি এবং গ্রাম-গঞ্জ-নগরের উর্দুভাষী অভিজাত পরিবার। এদের সংখ্যা বেশি নয়। মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম বারভূঁইয়াদের মধ্যে কেবল প্রতাপাদিত্যই ছিলেন বাঙালি সন্তান, আর সব বিদেশী।

কিন্তু ক্রমে উচ্চাভিলাষী খান্দানলোভী কিছু দেশজ ধনী-মানী মুসলিম মিথ্যা পরিচয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। আত্মমর্যাদা বৃদ্ধির এ প্রয়াস একটা মানবিক দুর্বলতা। তাই বৌদ্ধ মাত্রই মাগধী, হিন্দু মাত্রই আর্য, এবং মুসলিম মাত্রই আরব-ইরানী-তুর্কী-মুঘল। ভারতে আগত বিদেশী মুসলিমরা স্বদেশের কিংবা স্ববংশের নাম স্বনামের সঙ্গে যুক্ত রেখে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রয়াসী ছিল। সে-ধারা আজো বজায় রয়েছে। বাঙলার দেশজ উঠতি পরিবারগুলো কোরাইশ, খলিফা এবং খান বংশীয় বলে আত্মপরিচয় দিত। আজো ভুঁইফোড়েরা সে-পথ অনুসরণ করে। এ হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়হীন কাঙাল মনের মানুষের লক্ষণ। বহির্মুখী মন-মননের বীজ এখানেই উপ্ত। স্বাধর্ম্যভিত্তিক স্বাজাত্যবোধ ঐ বৃক্ষেরই ফল। এ যদি ইসলামের প্রভাবজ হত, তাহলে মুসলিম জগতে দৈশিক, ভাষিক, গৌত্রিক চেতনাসম্ভূত দ্বেষ-দ্বন্দ্বের, রাজা-রাজ্যের ও সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ-বিস্তার দুর্লক্ষ্য হত।

স্বভূমে প্রবাসীর মন নিয়ে ব্রিটিশ বাঙলায় বাঙালি মুসলিমের জীবনযাত্রা শুরু। এমনি বিকৃত ও ভেজাল মনভূমে সুষ্ঠু ও সুস্থ রাজনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ অসম্ভব। স্বাধীন সুলতান শাসিত বাঙালির [১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ] আর্থিক দুর্ভোগ-দুর্দিনের শুরু হয় হুমায়ুন-শেরশাহ্‌র বঙ্গবিজয়ের (১৩৩৮-৩৯) ফলেই। মুঘল-সাম্রাজ্যভুক্ত সুবাদার-শাসিত বাঙলায় নানা কারণে শোষণ ও প্রাশাসনিক অব্যবস্থা বাড়ে। ১৫৭৫ সন থেকে বিয়াল্লিশ বছর ধরে স্থানীয় সামন্তের ও মুঘলের দ্বন্দ্বকালীন নৈরাজ্য, মঘ-হার্মাদের দৌরাত্ম্য ও লুটতরাজ, বাঙলার অর্থে আসাম-আরাকান অভিযান, য়ুরোপীয় বেনে-নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য, রাজস্বরূপে বাঙালির অর্থ তেরো নদীর ওপারে দিল্লিতে প্রেরণ প্রভৃতি সামগ্রিকভাবে বাঙালির জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তার ও স্বাচ্ছন্দ্যের স্বস্তি হরণ করে। আওরঙজেবের মৃত্যুর পরে তা চরম আকার ধারণ করে। আওরঙজেবের শাসননীতির ত্রুটি ছাড়াও তাঁর দীর্ঘজীবিতা মুঘল-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়েছিল। আকবর বালকবয়সে রাজত্ব শুরু করেছিলেন, তাতে তাঁর উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বাড়েনি। আওরঙজেব মধ্যবয়সে শুরু করেন রাজত্ব, শেষ যখন করেন তখন তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্ররাও তখতের দাবিদার, তার ওপর ততদিনে দরবারে মুঘল-ইরানীর দ্বন্দ্বও চরম পর্যায়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে মুরশিদকুলি, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ, আলিবর্দী, সিরাজদ্দৌলাহ্‌রা ছিলেন নামে সুবাদার কার্যত স্বাধীন ও স্বৈরাচারী। বর্গীর লুট, যুদ্ধ, প্রাশাসনিক শৈথিল্য, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র প্রভৃতি জনজীবনকে দারিদ্র্যের দুর্নীতির ও জোর-জুলুমের শিকারে পরিণত করে। এমনি অবস্থায় ঘটে পলাশীর প্রহসন। তারপর ইংরেজেরা শাসন করবে, না কেবল লুণ্ঠন-শোষণই করবে, তা স্থির করতে ১৭৯২ সন অবধি কেটে গেল, ১৭৯৩ সন থেকেই তারা শাসন-শোষণের পূর্ণ দায়িত্ব আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। অতএব ১৫৩৮-৩৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে ১৭৯৩ সন অবধি দুশো পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর ধরে বাঙালির জীবন-জীবিকার ওপর হামলা চলেছে। এতে মানস-অবক্ষয় স্বাভাবিক এবং তার সাক্ষ্যও রয়েছে পীর-নারায়ণ 'সত্য' দেবতার ও উপদেবতার কল্পনায় ও প্রতিষ্ঠায়, বাউলসাধনায়, ভারতচন্দ্রের বেপরওয়া বাচালতায়, রামপ্রসাদী বৈরাগ্যে, কবিগানে ও দোভাষী পুঁথিতে।

ব্যবহারিক ও মানস-জীবনের এ-পর্যায়ে উনিশ শতকের শুরু। পূর্বে মুঘল আমলে দেশজ মুসলিমরা ছিল বৃত্তিজীবী। কৃষিজীবী পরিবারের কেউ কেউ মুন্সী-মোল্লা-মোয়াজ্জিন-মৌলবী-নায়েব-গোমস্তা-বেপারী-উকিল, হয়তো কাজীও ছিলেন। বিদেশী ও উত্তরভারতীয় মুসলমানরা চাকরি নিত বিচারবিভাগে ও সৈন্যবিভাগে। কোম্পানি আমলে সৈনিকদের চাকরি যায়। সেনাবিভাগের চাকরি ছিল সম্মানের। ওরা তাই মর্যাদা খুইয়ে অন্য চাকরি নিতে চায়নি, ফলে পদস্থ প্রায় সবাই বাঙলা ত্যাগ করেছে। নানা কারণে যারা রয়ে গেল, তারাও পেশার বা চাকরির প্রত্যাশা নেই বলে সন্তানের কেজো লেখাপড়ায় উদাসীন হয়ে গেল। বিচারবিভাগে ও ওকালতিতে ইংরেজি চালু হবার আগে (১৮৩৮ সনে) পর্যন্ত তারা সংখ্যাগুরু ছিল, অবশ্য তখনো অঘোষিত সরকারি নীতির ফলে মুসলিম কর্মচারীর মৃত্যু বা অবসরজনিত শূন্যপদে হিন্দুই নিযুক্ত হচ্ছিল। এমনি করে ১৮৫০ সনের দিকে বিচারবিভাগও মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও চাকরির প্রেরণা নেই বলে তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানে শৈথিল্য এল। তার ওপর পীরোত্তর, আয়মা, লাখরাজ, জায়গির, মদদে'মাস প্রভৃতি সম্পত্তি ও বৃত্তি থেকে ১৮২৮ সনের পরে নানা অজুহাতে তারা বঞ্চিত হতে থাকল। কাজেই দেশজ মুসলিমের আগের অজ্ঞতা-অক্ষমতার, অশিক্ষার ও অভাবের পরিণাম বৃদ্ধি করল উচ্চ ও মধ্যবিত্তের দেশত্যাগ, দারিদ্র্য ও ইংরেজি-অশিক্ষা। উনিশ শতকের শেষার্ধে তাই বাঙলার মুসলিমদের আত্মিক আঁধারযুগ ও আর্থিক-সঙ্কটকাল। ওয়াহাবিরা-সিপাহিরা শেষবারের মতো এ দুর্ভোগ ঘুচাবার প্রেরণায় মধ্যযুগীয় পন্থায় ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে জান-মাল কুরবান করেছে।

উনিশ-বিশ শতকের ইতিহাস সবারই জানা। হিন্দুরা চেয়েছে হিন্দু-জাগরণ ও হিন্দু-রাজত্ব। মুসলমানরা কামনা করেছে মুসলিম বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা। উভয় পক্ষই স্বধর্মীর জাতীয়তায় আস্থাবান। ব্রাহ্ম-আর্যসমাজী-শুদ্ধি-সনাতনী আন্দোলনের কিংবা অনুশীলন-যুগান্তর সমিতির বা সূর্যসেনী-সুভাষী সংগ্রামের অথবা মহাসভা-কংগ্রেস দলের লক্ষ্য যেমন হিন্দু-কল্যাণ, তেমনি ওয়াহাবি-ফরায়েজি-মুসলিম লীগ আন্দোলনের লক্ষ্যও মুসলিমস্বার্থ রক্ষণ। হিন্দু-মুসলিম হাজার বছর ধরে একত্রে বাস করেছে, ঝড়বৃষ্টি-রোদে সমভাবেই পীড়িত হয়েছে, হাটে-মাঠে-ঘাটে সহযোগী ও সহযাত্রী হয়েছে, প্রাত্যহিক জীবনে লেনদেন করেছে কিন্তু মনে মনে মিলিত হয়নি। তাই একত্রে বাস ও কাজ হলেও একতা হয়নি, জনতাই থেকেছে চিরদিন। তবে অভিন্ন স্বার্থবশে ব্যক্তিক মিল হয়েছে অনেক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা ইংরেজি শিখে ধন-মান-যশের অধিকারী হল, শেষার্ধে বৈদ্যরাও দিল যোগ আর শেষপাদে দেখা দিল কিছু মুসলমানও। বাঙালি হিন্দু শিক্ষিত হয়ে সর্বভারতীয় হিন্দুজাতীয়তায় এবং মুসলিম শিক্ষিত হয়ে বিশ্বমুসলিম জাতীয়তায় দীক্ষিত হয়েছে, কেউ আর বাঙালি থাকেনি। এবং এক্ষেত্রে ব্যক্তিক ব্যতিক্রমও ছিল বিরল। উনিশ ও বিশশতকের প্রথমপাদের বাঙলা সাহিত্যই তার সাক্ষ্য। তাছাড়া ইতোমধ্যে অর্থে ও বিত্তে অগ্রসর হিন্দুর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

হিন্দু-ভাবনার ও মুসলিম-চেতনার এই পটভূমিকায় বিশশতকের শুরু। হিন্দুরা অফিস-আদালত আগেই দখল করেছিল, এখন চাকরিদাতা ইংরেজ নয়—বাঙালি হিন্দু। কাজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহস্থসন্তান যোগ্যতানুসারে পিয়ন-কেরানির চাকরি যেমন পায় না, তেমনি প্রতিকূল প্রতিবেশে উচ্চশিক্ষিত মুসলিমও প্রতিযোগিতায় টেকে না। কাজেই ইংরেজিশিক্ষিত মুসলিম-মনে 'হিন্দুদৌরাত্ম্য' ক্ষোভের সৃষ্টি করল। অপরদিকে ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘু হওয়ায় নওয়াব-জমিদার-সামন্তরা লাটের-বড়লাটের মন্ত্রী-উপদেষ্টা হতে পারেন না। তাঁদের জন্যেও তাই স্বতন্ত্র-বাঁটোয়ারা ও সংরক্ষিত আসন এবং স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রয়োজন। কাজেই নির্বাচনে ও চাকরিতে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সদস্যপদ ও চাকরি নির্ধারণের দাবি জোরদার হল। এই স্বাতন্ত্র্য বা বিচ্ছিন্নতাবাদ পরিণামে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম দিল। কিন্তু তবু হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি। সমাজবাদী ও সমাজতন্ত্রী না-হওয়া অবধি এ চালু থাকবে। দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় এবং সাম্প্রদায়িক হননের পর সংখ্যালঘু হল লঘিষ্ঠ, সংখ্যাগুরু হল গরিষ্ঠ। ফলে অসম দ্বন্দ্বে পীড়ক প্রবলতর হল এবং পীড়ন বাড়ল। সে-পীড়ন কেবল বাহ্য নয়, মানসিকও। পাকিস্তানের উদ্ভব স্বাধর্ম্যভিত্তিক সংহতির ও স্বাজাত্যের অঙ্গীকারে। কিন্তু অন্যসব ক্ষেত্রে পার্থক্য ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এত প্রবল যে, ঐ মিলন-সূত্র ছিন্ন হতে দেরি হল না। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণ একটিই—শোষণ ও বঞ্চনা। যুক্তির জোর বাড়ানোর জন্যে উঠতি বাঙালিরা ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পার্থক্যের কথাও তুলল। পাকিস্তান ভাঙল। বাঙলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নিল।

'বাঙলাদেশ' রাষ্ট্রের বয়স সাড়ে চার বছর হতে মাত্র একমাস বাকি। ইতোমধ্যে ভাষিক স্বাজাত্যের আবেগ, সমাজতন্ত্রের জিগির, ধর্মনিরপেক্ষতার অঙ্গীকার এবং গণতন্ত্রের আশ্বাস উবে গেল। ঢাকার একজন শিক্ষিত লোকও এরজন্যে আফসোস করে না। কিমাশ্চর্য অতঃপরম! [আজ ১৯৮৬ সনের পূর্তিলগ্নেও দেশকাল-নিরপেক্ষ বিশ্বমুসলিম জাতিচেতনা নতুন করে প্রবল হচ্ছে ও প্রচার পাচ্ছে সরকারি প্রচেষ্টায়।]

এখনো যদি স্বভূমে প্রবাসীমন প্রবল না থাকে, তাহলে এমনটি হয় কী করে! আবার সেই বিশ্বমুসলিম জাতীয়তায় উৎসাহ, ব্যবহারিক ও আর্থিক সমস্যার আবার সেই শাস্ত্রীয় সমাধান, আবার শাস্ত্রীয় আইনে অনুরাগ, আবার শাস্ত্রীয় পার্বণের রাষ্ট্রিক উদ্‌যাপন, পাকিস্তানপন্থীর কদর, আয়ুব-ইয়াহিয়ার চাকুরেদের আদর, আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-পড়িয়েদের 'যখন যেমন তখন তেমন নীতি' নিষ্ঠা, ভাড়াটে বুদ্ধিজীবীদের লেখা ও বক্তৃতা প্রভৃতি দেশের মাটির ও মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্যের ও বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিতবাহী। দেশপ্রীতি থাকলে দেশকে নিজের বংশধরেরও বাসভূমি বলে উপলব্ধি করলে, দেশের স্বার্থ রক্ষিত হলে নিজের স্বার্থও নিরাপদ হয়, দেশের সর্বাত্মক উন্নতি হলেই নিজের উন্নতি যথার্থ হয় কিংবা 'নগর পুড়িলে দেবালয়ও এড়ায় না'—এমনি তত্ত্ব বোধগত হলে কোনো মানুষেরই বিচ্ছিন্নভাবে স্বস্বার্থ-চেতনা জাগতে পারে না। বঞ্চনায় বাঁচার প্রয়াস জুয়াড়ির ঝুঁকি নিয়ে বাঁচার যে নামান্তর, সে-তত্ত্ব আজ বোধগত না হলে কারো কল্যাণ নেই, নিস্তারও নেই দুঃখ-যন্ত্রণা-বঞ্চনা থেকে। আমাদের সর্বদুঃখের মূলে রয়েছে চরিত্রহীনতা। অভাব আত্মসম্মানবোধের, প্রয়োজন দায়িত্ব চেতনার ও কর্তব্য-বুদ্ধির। এ তিনটে না থাকলে 'সংস্কৃতি' স্বকীয় হয় না। ফলে জীবনদৃষ্টি তথা মূল্যবোধও স্বচ্ছ হয় না। তখন ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্মে ও আচরণে সঙ্গতি-সামঞ্জস্য থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমকালীন সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি

জীবনযাত্রায় জীবনাচরণের লাবণ্যই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির প্রবাহ স্বাভাবিক ও বিকাশশীল রাখার জন্যে অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। ঐ পরিবেশ যখন যে-কোনো কারণে প্রতিকূল হয়ে ওঠে, সংস্কৃতি তখন বিকৃত এবং রুদ্ধগতি না হয়ে পারে না। শাহ্‌জাহান-শার্লোমেনরা না থাকলে রাজকীয় সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশ হয় না চিত্রে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে। আজ স্বৈরাচারী শাহ্-সামন্ত নেই, তাই শাহী-সামন্তিক সংস্কৃতিও বিলুপ্ত। একটা মানুষ যখন রোগে-শোকে কিংবা ধনে-জনে অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন তার মানস কিংবা ব্যবহারিক সংস্কৃতিও আকস্মিকভাবে ক্ষয় ও লোপ পায়। যে-মানুষ উদারভাবে দান করত, সে এখন অভাবের তাড়নায় নির্লজ্জ নিসংকোচ হয়ে পড়ে কিংবা প্রতারণা করে বেড়ায়। একসময়ে যার সৌজন্য ছিল অনন্য, সে হয়তো অবস্থাবিপর্যয়ে এখন দুর্মুখ দুঃশীল। আর্থিক সাচ্ছল্যকালে যে-লিখিয়ে মনের বনে সঞ্জীবনী সুধা সন্ধানে নিরত থাকত, অর্থাভাবে সেই হয়তো রোজগারের কিংবা ধারের ধান্ধায় নিদ্রাহীন রাতে নতুন নতুন ছল-চাতুরী উদ্ভাবন করে এবং দিনের বেলায় তা প্রয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে বেড়ায়। শ্রমের যোগ্য মূল্য পেলে যে-মজুর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করত, সে লঘু-মূল্যের গুরু-কর্মে ফাঁকির পথ খোঁজে। যথাসময়ে যে-নারী মনের মতো বর পায়, তার ভ্রষ্টা হওয়ার কারণ থাকে না। জীবনযাত্রায় স্বাভাবিকতা ব্যাহত হলে জীবন-চেতনার ও জগৎ-ভাবনার ক্ষেত্রে মানুষের মনে ও আচরণে এমনি করে বিকৃতি আসেই। আপ্তবাণীর প্রলেপে তা অপসৃত হবার নয় বলেই হয় না। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবেই।

প্রাণ আছে বলে আমরা প্রাণী এবং মন আছে বলে মানুষ। প্রাণের প্রয়োজন অন্নে, মনের প্রয়োজন আনন্দে। মানুষও যে প্রাণী এবং প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সে অন্ন চায়, তা আমরা সবসময়ে মনে রাখি না। অন্নে প্রাণ স্বস্থ সুস্থ থাকলেই তবে মনের ক্রিয়া সম্ভব। কাজেই আগে প্রাণ পরে মন। আগে অন্ন পরে আনন্দ। প্রাণের আরাম অন্নে, মনের আরাম আনন্দে। আজো দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষ অন্নের কাঙাল। আনন্দ তো তাদের কাছে বিরল স্বপ্ন। জীবিকালগ্ন জীবনে জীবিকার নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে জীবন স্বাভাবিক প্রবাহ ও বিকাশ পায় না। কাজেই দুস্থ জীবনে বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। যার যাতে ও যেখানে যোগ্যতালভ্য দাবি ও প্রত্যাশা, সে তাতে ও সেখানে প্রতিহত হলে তার প্রাণে-মনে বিকার ঘটবেই এবং তা বীভৎস, ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক হয়ে ব্যক্তিতে তথা সমাজদেহে ফুটে উঠবেই।

সচ্ছল, স্বচ্ছন্দ ও আনন্দিত জীবনের অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। অন্নে নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ও সাচ্ছল্য তাই সংস্কৃতির উন্মেষ বিকাশের পূর্বশর্ত। মার্কস্ এজন্যেই জীবনের আর্থিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরই কেবল গুরুত্ব দিয়েছেন। কাড়তে হলে মেরে বা হেনে কাড়তে হয়। অন্নের উৎপাদনে ও বণ্টনে বৈষম্য থাকায় বিরোধ হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাই বৈনাশিক আকারে সর্বত্র উপস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্নে সাচ্ছল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য এলে নিরুদ্বিগ্ন আনন্দিত মন থাকবে মননে নিরত। তখন নব নব চেতনার উন্মেষে, নব নব চিন্তার উদ্ভাবনে, নব নব আবিষ্কারের ঐশ্বর্যে সংস্কৃতি পাবে উৎকর্ষ। চেতনার, চিন্তার, কর্মের ও আচরণের লাবণ্যই যদি সংস্কৃতি হয়, তা হলে সুস্থ মনেই তার জন্ম সম্ভব। সুস্থ ও স্বস্থ মনে থাকে আনন্দ-অন্বেষা। আনন্দ কল্যাণ ও সুন্দরের প্রসূন। কাজেই আনন্দ-অন্বেষণ ও আনন্দের উপকরণ সৃষ্টিই সংস্কৃতি। এ যদি স্বীকার করি তা হলে আনন্দ-অন্বেষার নামই সংস্কৃতিচর্চা। নিজের এবং সকলের জন্যে মানস ও ব্যবহারিক আনন্দিত পরিবেশ সৃজন এবং রক্ষণই সংস্কৃতিবানতা। তা হলে আরো মানতে হবে যে জীবনের সার্বক্ষণিক ও সামগ্রিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি তা যে-স্তরেরই হোক কিংবা স্বাভাবিক অথবা বিকৃত হোক। অতএব বিকৃত সংস্কৃতি হচ্ছে বিকারগ্রস্ত মনের বিকৃত আনন্দ-অন্বেষামাত্র। কেননা সবাই আনন্দপিপাসু ও আনন্দসন্ধানী। বহুজনহিত ও বহুজনসুখ লক্ষ্যে যে-আনন্দ-অন্বেষা ও যে-আনন্দ-সৃজন, তা-ই জাতীয় সংস্কৃতি! যার চিন্তায়-চেতনায় ও কর্মে-আচরণে এ কল্যাণবুদ্ধি ও সৌন্দর্যরুচি অভিব্যক্তি পায় সে-ই সংস্কৃতিবান। সে-ই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিভূ, সে-সংস্কৃতিই জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক।

এ-কথা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না যে, সংস্কৃতি-জীবিকা সম্পৃক্ত। অতএব হাতিয়ারের ক্রমোৎকর্ষ ও জীবিকা-পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কে জড়িত। গরিব দেশে জীবিকা অনিশ্চিত বলে সংস্কৃতিও বিকৃত, অনুকৃত এবং নিরুদ্দিষ্ট।

আজ আমাদের ছোট-বড় শহরগুলোতে ব্যাঙের ছাতার মতো সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ ও সংস্থা গড়ে উঠেছে। অনুষ্ঠানও হয় অনেক। কিশোর-তরুণেরাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্তা। এরা সাধারণত লিখিয়ে কিংবা গাইয়ে। এদের উদ্যোগে ও আয়োজনে কখনো নাট্যাভিনয়, কখনোবা আলোচনাসভা হয়। অতএব নাচ-গানে-বক্তৃতায় ও অভিনয়ে আর চিত্রশিল্পে ও সাহিত্যে আমাদের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিচর্চা অভিব্যক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে আমরা স্পষ্টত দুটো ধারা দেখছি—একটি প্রতীচ্যের অনুকৃত ধারা, অন্যটি লোক-ঐতিহ্যের অনুসৃত ধারা। বলতে গেলে দুটোই কৃত্রিম। প্রথমটি ধনে-মানে উন্নত জাতির সংস্কৃতি বরণের প্রবণতাপ্রসূত, দ্বিতীয়টি স্বাজাত্যাভিমানের প্রসূন। প্রথমটিতে রাজনীতিক চেতনা অনুপস্থিত, দ্বিতীয় ধারায় রাজনীতিক উদ্দেশ্য প্রবল। দেশের নিরক্ষর চাষী-মজুরদের রাজনীতিক্ষেত্রে সহযাত্রী ও সহকর্মী হিসেবে পাবার প্রত্যাশায় তাদের জীবন-জীবিকা-সম্পৃক্ত বিষয়ে দেশী কায়দায় নাচ-গান-নাটকের অনুষ্ঠান কিংবা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সম্পর্কিত চিত্র, কুটির শিল্প, তৈজস, আসবাব ও উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতির প্রদর্শনীর আয়োজন করে ছদ্ম গৌরববোধ করা রাজনীতিক কর্মসূচির অংশ। তাই গণসাহিত্য, গণশিল্প ও লোক-ঐতিহ্য চর্চায় রাজনীতিক মনই ক্রিয়াশীল।

দুই ধারাই কৃত্রিম বলেছি এজন্যে যে, শিক্ষিতরা নিজেদের জন্যে লোকজীবন ও লোকঐতিহ্য কামনা করে না, করতে পারে না। কারণ সে জীবন, মনন ও সংস্কৃতি অজ্ঞতার অসামর্থ্যের ও দারিদ্র্যের প্রসূন। হাজার বছর আগেও শাহ্-সামন্তের ঘরোয়া জীবনে ও সমাজে উচ্চমানের মানস ও ব্যবহারিক সংস্কৃতি ছিল। নিঃস্ব নিরক্ষর গণমানবের শ্রমেই তা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু সে-যুগের শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার গণমানবের তা ভোগ-উপভোগের অধিকার স্বীকার করত না। তাই মসলিন নির্মাতাকে গামছায়, প্রাসাদ নির্মাতাকে কুটিরে, খাট নির্মাতাকে চাটাইতে, তৈজস নির্মাতাকে হাঁড়ি সানকীতে, সেতার-সারিন্দা নির্মাতাকে একতারায়, কাগজ নির্মাতাকে নিরক্ষরতায় তুষ্ট থাকতে হত। দুর্দিন-দুর্ভাগ্যের সেই নিদর্শনগুলোকে আজ লোক প্রতারণার হাতিয়ার হিসেবে ছদ্ম গৌরবের সামগ্রী করে তোলা অমানবিক। কেননা আমরা কি চাই যে শহুরে ভদ্রলোকের লোকসংস্কৃতি চর্চার জন্যে কিছু লোক চিরকাল নিঃস্ব নিরক্ষর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামার, কুমোর, ছুতার, সাপুড়ে, জেলে হয়ে থাক; হাঁড়ি ডোম বাগ্দি বাউল হয়ে থাক, কুটির-চাটাই-গামছা-লুঙ্গি-শিকা-হাড়ি-সানকী তাদের সম্বল হোক ?

সমাজবিজ্ঞানীর ও ঐতিহাসিকের কাছে এদের ও এসবের নৃতাত্ত্বিক সমাজতাত্ত্বিক মূল্য অনেক। কেননা মানুষের জীবন-জীবিকার তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিবর্তনধারা অনুসরণের এগুলোই উপকরণ। কাজেই ঔপকরণিক মূল্য ছাড়া এগুলোর আর কোনো গুরুত্ব নেই। আজো দেশের সাত কোটি মানুষ নিঃস্ব-নিরক্ষর। এদের পিছিয়ে পড়ার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলা কিংবা লজ্জিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক, তার বদলে আমরা সগৌরবে বাঁদর-নাচের ব্যবস্থা করেছি। লোক ও লোকসংস্কৃতি জিইয়ে রাখাই যেন আমাদের উদ্দেশ্য।

প্রতীচ্যধারাও অনুকৃত ও শহুরে স্ববারি। এদেশের পরিবেশ ও প্রয়োজন থেকে আমাদের সংস্কৃতি হবে স্বতোৎসারিত। এখন শহুরে সব সংস্কৃতির বা লোক-সংস্কৃতির চর্চা করছে শহুরে ভদ্রলোকেরাই। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত উদারতায় জনগণের বা লোকের হয়ে লোক-সংস্কৃতি সৃজন ও রক্ষণ সম্ভব নয়। দয়ার দানে অভাব মেটে না। জনগণকে শিক্ষিত করলেই তাদের জীবিকা-লগ্ন জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন-চেতনা থেকেই অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত সংস্কৃতি জন্ম নেবে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কৃত্রিম অনুশীলনে তা কখনো সম্ভব হবে না।

স্বাভাবিক উন্নয়ন-উৎকর্ষের প্রকাশ সৃজনশীলতায়, কৃত্রিম উন্নয়ন সম্ভব গ্রহণশীলতায়। অনুকরণে অনুসরণে আপাত প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আত্মশক্তির বিকাশ হয় না। আবিষ্কারে উদ্ভাবনে স্বকীয়তাই আত্মশক্তির লক্ষণ। জাপানীরা অনুকরণপটু। কর্মনিষ্ঠাই তাদের চরিত্র। তাই তারা অনুকরণ করেই উন্নত। অনুকরণ-স্পৃহা আমাদেরও রয়েছে, কিন্তু আমাদের উদ্যোগ কম। ফলে আমাদের অনুকরণ প্রায়ই নিরুদ্দিষ্ট বিলাস। তাই আমাদের অনুকৃত সাংস্কৃতিক অঙ্গন উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল উদ্যোগে আয়োজনে বর্ণালী। এর সবটাই মন্দ নয়। যুগপ্রভাবে সমাজের, মনের, সংস্কৃতির ও মননের বিবর্তন-পরিবর্তনের জন্যে এর কিছুটা আবশ্যিক এবং কিছুটা অবশ্যম্ভাবী। যাদের কাছে এ ক্রান্তি ও কালান্তরকালীন রূপান্তর আকস্মিক ও অসহ্য, তাদের সঙ্গে তর্কে লাভ নেই। যেসব কিশোর-তরুণ এ-সংস্কৃতির রূপে মুগ্ধ, তাদেরও এই মুহূর্তে পরিমিতি জ্ঞান দেয়া যাবে না। কাজেই বয়স্কদের উচিত মৌন থাকা।

যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রথম অভিঘাতের একটা আকস্মিকতা ও বিমূঢ়তা যেমন থাকে, তেমনি থাকে উদ্দীপনা ও অনুভূতি। প্রাচীনেরা প্রথমটার শিকার আর তরুণেরা দ্বিতীয়টির। প্রবীণদের দৃষ্টিতে তরুণ-তরুণীরা আজ যৌনতার ও নীতিহীনতার শিকার। এর অনেকটাই প্রাতিভাসিক। কালে কালে জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধ বদলায়। তাতেই মানুষের সঠিক ও সর্বাত্মক উন্নতি হয়েছে। যে যা গ্রহণ করেছে ও আচরণে প্রকাশ করছে, তা সজ্ঞানেই করেছে, সংস্কারবশে নয়। ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েই অর্জনে এগুতে হয়। জ্ঞান প্রতারণা করে না, এবং নতুন পরিণামে কল্যাণকর। দুধের সবটাই ছানা হয় না, অসার মন্থন করেই পাই সার। আসলের সঙ্গে কিছু ভেজাল প্রায়ই থাকে। সযত্নে লালিত শস্য ক্ষেত্রেও সহজে আগাছা জন্মায়। গাছ বাঁচে প্রযত্নে, আগাছা বাড়ে অযত্নে। মরুতেও কাঁটাগুল্ম জন্মে। জীবনযাত্রায় জঞ্জাল এড়ানো যায় না। জীবন-প্রয়াসে ক্ষতির ঝুঁকি থাকেই। পুঁজির ক্ষয়ক্ষতি অঙ্গীকার করেই অর্জন-লক্ষ্যে এগুতে হয়। জীবনে-জীবিকায়, সমাজে সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে এভাবেই। জড়তা জীর্ণতারই নামান্তর। গতির লক্ষ্য গন্তব্য। তাই যে নড়ে সে-ই তরে। অতএব মাভৈঃ। ভালোর অনুকরণ পরিণামে কল্যাণবুদ্ধি প্রখর করবে, অনুশীলনে আত্মবুদ্ধি ও আত্মশক্তি জাগবে, তখন স্বকীয় আবিষ্কার-উদ্ভাবন সম্ভব হবে, বন্ধ্যাত্ব ঘুচবে—আপাতত আমরা এ প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

১

ইদানীং বাঙলাদেশের শিক্ষিত বাঙালির সংস্কৃতি-চেতনা যেন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। সবাই সংস্কৃতির কথা বলছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও বেড়ে গেছে, কোথাও কোথাও পার্বণিক আড়ম্বরে সংস্কৃতিচর্চার আসর বসছে। শাদা চোখে দেখলে মনে হবে বাঙালির মধ্যে আকস্মিক জাগরণের উর্মি জেগেছে। মনে হবে 'উত্থিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্যবরাণিবোধতঃ'—এ আহ্বান যেন তাদের অন্তরোত্থিত। আসলে বোধহয় রাজনীতিক আস্ফালনের অধিকার-বঞ্চিত হয়েই তারা অন্যপথে আত্মপ্রকাশ খুঁজছে।

আমাদের এ-ধারণা যথার্থ বলে মানি যখন দেখি সংস্কৃতির নামে সেই আদিকালের আস্ফালন ও সংকীর্ণ চেতনা সর্বত্র প্রবলভাবে প্রকটিত হচ্ছে। এ সংস্কৃতি-চেতনা পরিবেষ্টনী-প্রসূত নয়, মানসিক রোগের বহিঃপ্রকাশ, নইলে দেশ-কালের পরিবেশে অনুভূত প্রয়োজনপূরক সংস্কৃতির স্বতো উন্মেষ ঘটত, আন্দোলন-আলোচনাও হত নতুনতর।

সংস্কৃতি জীবনেরই অভিব্যক্তি। সংস্কৃতির উৎস জীবিকার ও জীবনযাত্রার পদ্ধতি। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সংস্কৃতি সমাজে ব্যক্তিমানুষের আর্থিক, শৈক্ষিক, শাস্ত্রিক, নৈতিক, ভৌগোলিক অবস্থানজাত প্রাত্যহিক জীবনভাবনা ও জীবনযাত্রারই অভিব্যক্ত রূপ। এ তাৎপর্যে সংস্কৃতি শাস্ত্র-সমাজ-নৈতিক আদর্শ-দেশ-কাল-শ্রেণীভেদে ভিন্ন এবং তাই সু ও অপ সংস্কৃতির সংজ্ঞা আপেক্ষিক। অতএব দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে যা ব্যক্তির অবস্থানগত প্রয়োজনের অনুগত নয়, যা কালিক পরিবর্তন স্বীকার করে না, তথা যুগ-দাবির ভিত্তিতে জীবন রচনার পথ রুদ্ধ রাখে, অর্থাৎ যা সমকালীন জীবনের বিকাশ-বিবর্তন বিরোধী, তা-ই অপসংস্কৃতি। মানুষ বাঁচে স্বকালের সম্পদে ও সমস্যায়। তাই সংস্কৃতির রূপও হবে স্বকালীন।

ফলে এককালের সংস্কৃতি কালান্তরে অপসংস্কৃতি হয়ে দাঁড়ায়। পুরোনো দিয়ে নতুন সাধ পূরণ করা যায় না। পুরোনো কদর পায় না সমকালীনতার জৌলুস ও উপযোগ হারায় বলেই। অতিক্রান্ত যুগের সংস্কৃতি তাই পরিহার্য।

ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে মানুষ সমকালের বস্তুগত ও ব্যবহারগত সংস্কৃতি সহজে ও সাগ্রহে বরণ করে, কিন্তু মনোজগতে পাথুরে কেল্লায় গৃহায়িত জীবন হয় তাদের কাম্য। এ জন্যে বাইরে তারা সর্বপ্রকারে আধুনিক। ভেতরে লালন করে পাঁচশো কি হাজার বছরের পিছিয়ে-পড়া চিন্তা-চেতনা। তাই ঘরে-বাইরে সর্বত্র তাদের ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য সুপ্রকট। দ্বৈতসত্তায় বা বিশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বে তাদের চারিত্র বিকৃত। এজন্যেই তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃতি-চিন্তা শাস্ত্র ও সংস্কার-সংলগ্ন। দুটোই-যে অন্ধবিশ্বাসভিত্তিক তা উচ্চারণের অপেক্ষা রাখে না। আবার উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শহুরে শিক্ষিতশ্রেণীর তথাকথিত সংস্কৃতি হচ্ছে ধনগর্বজ্ঞাপক ও বিলাসবাঞ্ছাপূরক ভোগসর্বস্ব অশ্লীল আত্মপ্রকাশ। তাই শাস্ত্রলগ্ন সংস্কৃতি, শাহী-সামন্তিক সংস্কৃতি, বেনে-সংস্কৃতি, আমলা-সংস্কৃতি, লোক-সংস্কৃতি, দৈশিক সংস্কৃতি আজো উচ্চারিত জিগিরের অবলম্বন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিব্যক্ত জীবনে অর্থাৎ প্রাত্যহিক চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে-আচরণে সমকালীনতার তথা প্রয়োজনবুদ্ধির শোভন ও কল্যাণকর উদ্ভাসই সুসংস্কৃতি।

আজকের যন্ত্রনিয়ন্ত্রিত জীবনে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি, সামন্তসংস্কৃতি, বেনে-সংস্কৃতি, আমলা-সংস্কৃতি নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু জীবনযাত্রার প্রতিকূল। কাজেই সেসব অপসংস্কৃতি। যন্ত্রপ্রভাবিত দৈশিক জীবনে যখন জনগণতন্ত্র কাম্য ও জরুরি হয়ে উঠেছে, তখন পুরোনো লোকসংস্কৃতির উজ্জীবন আমাদের কোন্ শ্রেয়সের সন্ধান দেবে?

অভিন্ন যন্ত্রনির্ভর সংহত পৃথিবীতে দৈশিক কিংবা জাতীয় সংস্কৃতিই বা কী করে স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হবে? বস্তুগত, মানসগত কিংবা আচার-আচরণগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিশীলিত মানুষের ও উন্নত সমাজের বিকাশশীল কল্যাণকর সংস্কৃতি অনুকৃত হবেই। এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতা যে টেকেও না, কেজোও হয় না, বরং ক্ষতির কারণ ঘটায়, ইতিহাস তার সাক্ষ্য। বস্তুত জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা ও আকাঙ্ক্ষাই সংস্কৃতির জনক। নিত্যনতুন উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারই প্রবহমান সংস্কৃতির প্রাণ। এই প্রবাহ রুদ্ধ বা বদ্ধ হলেই সংস্কৃতি হয় পচনশীল ও পরিহার্য অপসংস্কৃতি। জীবিকা ও সমাজ প্রতিবেশে সবার হয়ে ব্যক্তিক মনীষাই হয় উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক। যে-ব্যক্তি যে-দেশ যে-জাতি নতুন চিন্তা-চেতনার উদ্ভাবক, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যদায়ক ও জীবিকার উৎকর্ষসাধক যন্ত্রের নির্মাতা ও বস্তুর আবিষ্কারক; সংস্কৃতির জনকত্ব ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব তারই। হিতবুদ্ধিসম্পন্ন অন্যরা থাকে অনুকারক ও অনুসারক। সংস্কৃতি ও সভ্যতা এগিয়েছে এভাবেই। উদ্ভাবকের সৃষ্ট সংস্কৃতিই অনুকারক-অনুসারকদের আচারিক সংস্কৃতি।

AMARBOI.COM

২

ফল-মূল-মৃগয়া-জীবী মানুষের আদি বা আদিম সমাজে ছিল সাম্যপ্রসূত সংস্কৃতি। তারপর গোত্রপতি-শাসিত সমাজে নেতা-নীত সম্পর্ক যখন গড়ে ওঠে, তখন সুবিধাভোগী প্রতাপান্বিত সর্দারের ও অন্যদের মধ্যে হুকুম-হুমকি-হুঙ্কার-হামলার একটা সম্পর্ক রূপ পেতে থাকে। তারপর শাস্ত্র ও সংস্কারশাসিত সমাজে শাস্ত্রীর ও শাস্ত্রানুগত শ্রেণীর অধিকার ও মর্যাদাগত ব্যবধান সৃষ্টি হল; তারও পরে সভ্যতার এক স্তরে সামন্তপ্রভু ও দাস, ভূমিদাস শ্রেণী গড়ে উঠল, আর এক স্তরে বেনে-বুর্জোয়া দাপটের চাপে পড়ল গণমানব—এমনি করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ আজকের অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। পার্থক্য এই—যন্ত্রনির্ভর জীবনে আগেকার অবচেতন নির্লক্ষ্য, অসংহত ও বিচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রাম আজ লক্ষ্য-নির্দিষ্ট সঙ্ঘবদ্ধ জনতার যুদ্ধের তথা সচেতন গণসংগ্রামের রূপ নিয়েছে।

অতএব এককালের উদর-সর্বস্ব যাযাবর মানুষের সাম্যের সমাজক্রমে ভোগ-উপভোগের সামগ্রীলিপ্সু ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-মর্যাদালুব্ধ প্রবল এবং অধিকাররিক্ত দুর্বল সভ্য মানুষের সমাজে পরিণতি পেল। জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাই এ অসম সমাজ তৈরি করল। শক্তিমান ও বুদ্ধিমান, ধূর্তচতুরের হল জয়। শাসক-শাসিতে শোষক-শোষিতে পীড়ক-পীড়িতে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড দ্বন্দ্ব চলছিলই, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি দুর্বল জয়ী হতে পেরেছে ক্বচিৎ। সংঘর্ষ-সংঘাতে সংহার হওয়াই ছিল সাধারণভাবে তাদের নিয়তি।

সামন্ত-প্রাধান্যের কালে সংস্কৃতি ছিল তাদেরই জীবনযাত্রার ও জীবিকাপদ্ধতির অনুরূপ, বেনে-বুর্জোয়ার প্রয়োজনে সৃষ্ট হল আর এক সাংস্কৃতিক চেতনা, পীর-মোল্লা-গুরু-পুরোহিতের স্বার্থে সৃষ্টি হল ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি। এ সত্ত্বেও ঘরে-গাঁয়ে জীবিকার ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে উঠেছিল শাসিত-শোষিত রিক্ত-অবজ্ঞাত গণমানবের অন্য সংস্কৃতি। কাজেই সংস্কৃতি ছিল সমাজে অবস্থানগত জীবনের অভিব্যক্ত প্রতিরূপ। শাস্ত্রে আস্থা ও অবস্থানভেদে অর্জিত আচরণ ও কর্ম তথা সংস্কৃতি হয়েছে বিভিন্ন। অতএব সংস্কৃতি চিরকালই শ্রেণীক, গভীর তাৎপর্যে সংস্কৃতি কখনো দৈশিক বা জাতিক হয় না। এবং তা চিরকালই জীবিকার স্তরভেদ-প্রসূত। এজন্যেই ধনী-নির্ধন শিক্ষিত-অশিক্ষিত বান্দা-মনিব নির্বিশেষে শাস্ত্রীয় সংস্কৃতিও অভিন্ন হয় না। ক্রমে জীবিকার ক্ষেত্র সীমিত, সংকীর্ণ, জটিল ও প্রতিযোগিতা-সঙ্কুল হল। যোগ্যতরদের হল উদ্বর্তন। সে-যোগ্যতা অবশ্যই বাহুবল, মনোবল, বাগ্বল কৌশল, নৈপুণ্য, অধ্যবসায় ও ছল-চাতুরী-প্রতারণার প্রয়োগসঞ্জাত।

৩

এবার গোড়ার কথায় আসা যাক। আধুনিক দুনিয়ায় লভ্য সবশ্রেণীর মানুষই রয়েছে বাঙলাদেশে। তাই শ্রেণীস্বার্থে শ্রেণীদ্বন্দ্বও আছে। এখানে ভোগ-উপভোগের সুযোগ ও সামগ্রীর অধিকারী আমলা-বুর্জোয়ারা চায় তাদের স্বার্থানুকূল সংস্কৃতি চালু রাখতে, রাজনীতিকরা চায় শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির মিথ্যা জিগির তুলে গণমানবকে ধোঁকা দিয়ে ভোট সংগ্রহ করতে। এবং সুবুদ্ধি কিছু তরুণ অজ্ঞতাবশে গণসংস্কৃতির নামে পুরোনো ও পরিহার্য লোকসংস্কৃতির উজ্জীবন-প্রয়াসী। বাঙলাদেশে নয়কোটি মুসলমানের বাস। এখানে শাস্ত্রিক বিধি-নিষেধ, আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যবোধ আশৈশবের সংস্কাররূপে অবিমোচ্য হয়ে ব্যক্তির মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ঐ নয়কোটির অভিব্যক্ত সংস্কৃতির অনেকাংশ শাস্ত্রজ ও শাস্ত্র নিয়ন্ত্রিত। এবং ঐ নয়কোটি মুসলমানের প্রায় আটকোটিই অপরিশীলিত মনের কিংবা নিরক্ষর ও শাস্ত্রে অজ্ঞ। কাজেই তাদের শাস্ত্রানুগত্য তাৎপর্যরিক্ত ও নির্লক্ষ্য আচারসর্বস্ব। ফলে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণে তার নিষ্ঠা তার আত্মচেতনার কিংবা আত্মবিকাশের সহায়ক নয়। আজন্ম লালিত বিশ্বাস ও সংস্কারজাত তার এই যান্ত্রিক শাস্ত্রানুগত্য তাকে মনুষ্যত্বের কোনো সোপানে উন্নীত করে না, কেবল কখনো কখনো পতন রোধে ডিগদড়ির কাজ করে। এমন নিয়ম-নীতি-নিষ্ঠা সংস্কৃতি নয়, আচার মাত্র। আচার ধরে রাখে, এগিয়ে যাবার শক্তি কাড়ে। আবার ভরেও তোলে না, জীবনকে কেবল সংকীর্ণ সীমায় লাটিমের মতো ঘুরায়—এমন আচারিক সংস্কৃতিতে আত্মবিকাশের, আত্মপ্রসারের সম্ভাবনা অনুপস্থিত। কাজেই শাস্ত্রীয় সংস্কৃতি মানুষের কালিক কিংবা দৈশিক প্রয়োজন পূরণ করতে অসমর্থ। এই শাস্ত্রজ নির্লক্ষ্য সংস্কৃতির অন্ধানুগত্য কালান্তরে অপসংস্কৃতি এবং দেহ-মনের শৃঙ্খলা মাত্র। অথচ সংস্কৃতি নবপল্লবের মতোই মন-মেজাজের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি ঘটায়। এ কারণেই আমরা শাস্ত্রীয় সংস্কৃতিনিষ্ঠার বিরোধী। দৃষ্টান্ত দেয়া বাহুল্য, তবু এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে আধুনিক রাষ্ট্রিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, বৈষয়িক অনেক আবশ্যিক রীতি-রেওয়াজই শাস্ত্র ও ইমান-বিরুদ্ধ।

আজ যদিও শিক্ষিত আমলা-বেনে বুর্জোয়া জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক হয়েও ধনবলে ও বিদ্যাবলে বাহ্যত সর্বশক্তির আধার—শাসন-শোষণ ও জোর-জুলুমের অবাধ অধিকারী; তবু সংখ্যাগুরু গণমানবসম্ভূত জাগ্রত জনতার মোকাবিলায় তাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। কাজেই তাদের গণস্বার্থবিরোধী কৃত্রিম সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতি তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দর্প-দাপট বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হবে। দেশে দেশে তাদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম শুরু হয়েই গেছে। সাফল্যের ও মুক্তির দিন গুনছে গণমানব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের যন্ত্রচালিত জীবিকায় ও জীবনযাত্রায় তথাকথিত কোনো দৈশিক জাতিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব থাকতে কিংবা উদ্ভব ও বিকাশ হতেই পারে না। সংস্কৃতিতে থাকবে মানবাধিকার ও মানবোত্তরাধিকার। যন্ত্রপ্রসাদপুষ্ট মানবজীবন আজ পৃথিবীব্যাপী একাকার হওয়ার পথে। কাজেই সংস্কৃতিও হবে শ্রেণীহীন সমাজের জীবিকা ও জীবনপদ্ধতিসম্পৃক্ত ও প্রয়োজনানুরূপ।

শহুরে শিক্ষিত শাসক শোষক বেনে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রসার প্রতিরোধকল্পে সুবুদ্ধি তরুণেরা আজ লোকসাহিত্যের উজ্জীবনে ও প্রচারে প্রয়াসী। এ উদ্দেশ্যে তাঁরা ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মেয়েলি গান, জারি-সারি-কবিগান-যাত্রা প্রভৃতির সঙ্গে লালন-হাছনরাজার বাউলগানের এবং মাইজভাণ্ডারী মারফতি গানেরও চর্চা এবং প্রচার করছেন।

এসব গান-গাথা গণজাগরণের সহায়ক নয়—বরং পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কারেরই উজ্জীবক। সমকালীন গণসংস্কৃতি প্রচারের কল্যাণকর মাধ্যম হবে একালের গণমানবের জীবনযাত্রা ও জীবিকাসমস্যাভিত্তিক গণসঙ্গীত, গণনাট্য, যাত্রা, কবিগান, ছায়াছবি ও চিত্রশিল্প। তা হলেই গণ-অধিকার চেতনার ও গণসংগ্রামের অনুকূল পরিবেশ দ্রুত তৈরি হবে। তাছাড়া গাঁয়ের মানুষকেও নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করতে হবে, ঘুচাতে হবে গেঁয়ো ও শহুরে সংস্কৃতির ব্যবধান।

স্বচ্ছন্দ সুন্দর জীবন-রচনাই যদি সংস্কৃতির লক্ষ্য হয়, তাহলে জুলুমমুক্তিই সংস্কৃতির শেষ কথা। ঘৃণার জুলুম, হিংসার জুলুম, আভিজাত্যবোধের জুলুম; এমনি শাস্ত্রের, শাসনের, শোষণের, সংস্কারের, পেষণের, পীড়নের, বিশ্বাসের, অশিক্ষার, অন্যায়ের, অবিবেকের, অপ্রেমের, অসত্যের, অসাম্যের, অমর্যাদার, অকর্তব্যের, অবহেলার, অনধিকারের, দুর্নীতির, দারিদ্র্যের, দুর্ভিক্ষের জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার অঙ্গীকার এবং আচরণই সংস্কৃতি।

অতএব সংস্কৃতির প্রসূন হচ্ছে ব্যক্তিজীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, মানসজীবনে শ্রেয়স-বরণের ও সংস্কার বর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্বনিষ্ঠা ও অধিকারচেতনা এবং ব্যক্তিচরিত্রে সমস্বার্থে সহিষ্ণুতায়, সহাবস্থানে ও সহযোগিতায় আগ্রহ অর্জন।

সুতরাং সংস্কৃতিক্ষেত্রে আজকের জিগির হবে : "জুলুমমুক্ত হয়ে নিজে বাঁচো এবং জুলুমমুক্ত করে অন্যকে বাঁচাও।"

বিচিন্তা

সবাই জানে আকাঙ্ক্ষাই প্রাণী মাত্রকেই চালিত করে। অভাববোধ ও প্রাপ্তিবাঞ্ছাই আকাঙ্ক্ষা। অতএব আকাঙ্ক্ষাই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে এবং সেভাবেই প্রাণীর ভাব-চিন্তা ও কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে এবং যখন আকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট, সেখানে ও তখন প্রাণী থাকে নিষ্ক্রিয়, তার চিন্তা-চেতনাও হয় নির্লক্ষ্য অবিন্যস্ত। এমনি অবস্থার নাম মন-মানসের বন্ধ্যাবস্থা। প্রাণ থাকলে মনও থাকে। আবার প্রাণ থাকলে দেহমাত্রই নড়ে তেমনি নিরুদ্দেশ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেও মনও বিচরণ করে। তেমন মন হয় রোমন্থনপ্রিয়, অতীতের স্মৃতিচারী—বর্তমানে তার বিরাগ আর ভবিষ্যৎ তার অচিন্ত্য।

আমাদের আজকের জীবনের বন্ধ্যাত্ব প্রকট। তাই ঐতিহ্যস্মরণে, মৃতের স্মৃতিতর্পণে আর মীমাংসিত বিতর্কের পুনরুত্থাপনে ও স্বীকৃত প্রত্যয়ের পুনরালোচনায় আমাদের উৎসাহ। এ হচ্ছে বন্ধ্যামানসের অস্বস্তি ও যন্ত্রণা এড়ানোর অবচেতন বাসনার ফল।

এরা কখনো সংস্কৃতির সন্ধানে উৎসাহী, কখনো অপসংস্কৃতির প্রসারে ক্ষুব্ধ, কখনো লোকসংস্কৃতি-সঙ্গীতের মুমূর্ষুতায় আকুল, মৃতের স্মৃতিরক্ষায় সমর্পিতচিত্ত, আবার কখনো বা সাহিত্য-শিল্পের নশ্বরতা-আশঙ্কায় ব্যাকুল এবং কখনো কখনো জীবনের তাৎপর্য-চিন্তায় নিমগ্ন।

এ সবকয়টা বিকৃত চেতনার প্রসূন। এর কোনোটাই জাতিক কিংবা আন্তর্জাতিক জীবনে আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে কেজো বিষয় নয়; সমস্যা তো নয়ই।

২

আজকের দুনিয়া একটা পুকুরের মতো। পুকুরে ঢিল ছুড়লে জলের কম্পন যেমন চারদিককার তট স্পর্শ করে, তেমনি আজকের দুনিয়ার চিন্তা-চেতনা, আবিষ্কার-উদ্ভাবন, রীতি-রেওয়াজ, আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সবকিছুই বিশ্বমানবকে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে প্রভাবিত করে। ব্যবহারিক বৈষয়িক বাণিজ্যিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যের ও বিচ্ছিন্নতার যুগ আজ অবসিত। তাই আজকের দিনে জীবন-জীবিকার, চিন্তা-চেতনার কিংবা আচার-আচরণের স্বাতন্ত্র্যচেতনা মাত্রই জীবনবিরোধী-চেতনা এবং তা স্বেচ্ছামৃত্যুপ্রবণতার অন্য নাম মাত্র।

আজকের যন্ত্রনির্ভর জীবনে যন্ত্রসৃষ্ট পরিবেশে যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত জীবিকা-পদ্ধতিতে, চিন্তায়-চেতনায় ও আচারে-আচরণেই আজকের প্রয়োজনানুগ সংস্কৃতির অভিব্যক্তি। জীবনযাত্রার যে-সৌকর্য আজকের কৃৎকৌশল ও যন্ত্রজাত সামগ্রী সৃষ্টি করেছে, তাকে স্বীকার ও বরণ করলে তার আনুষঙ্গিক সবকিছু মেনে নিতেই হবে।

যদিও 'হ্যালো আব্বা' বলা বেআদবি, কিন্তু ফোন ব্যবহার করলে আদব রক্ষা করা যাবে না, মোটরগাড়িতে চালক-চাকরকে পাশে বসার অধিকার দিতেই হয়, টেলিভিশন রাখলে মা-বাপ-ভাইবোনের সঙ্গে শৃঙ্গার-আশ্লেষ রস সমভাবে নীরবে-নিঃসঙ্কোচে উপভোগ করতেই হবে। নারীকে শিক্ষিতা ও চাকুরে করতে চাইলেই পরপুরুষ-সঙ্গ সহ্য করা চাই। বাস্তবানুগ অভিনয়ে দৃষ্টিকটু কিছু থাকবেই। আধুনিক পোশাকে আব্রুর সীমাও হবে সংকুচিত। কাজেই আজকের দিনে পুরোনো শাস্ত্রিক, নৈতিক ও সামাজিক আচার-সংস্কার ও রীতি-রেওয়াজ পরিহার করতেই হচ্ছে। অতএব যা পরিবেশ-পরিবেষ্টনীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তা-ই সংস্কৃতি। যা রক্ষণশীলেরা জোর করে ধরে রাখতে চাইছে, তা-ই অপসংস্কৃতি। এই অপসংস্কৃতি বিলুপ্তি কোনো আবেদনে আন্দোলনে ঠেকানো যাবে না। তেমনি কাম্য সংস্কৃতিও আন্দোলনে আনা চলে না। কেননা, পরিবেষ্টনীগত প্রয়োজনেই সংস্কৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ ও বিকাশ-বিবর্তন ঘটে। মুক্তমন, রুচি, গরজ ও বুদ্ধিই সমকালীন সংস্কৃতির ধারক, বাহক ও বিকাশসাধক। কাজেই দেশে সমাজ-সংস্কৃতির কোনো সমস্যা-সঙ্কট নেই; আছে যা, তা হচ্ছে বদ্ধমন রক্ষণশীলের বেদনা-বিরক্তি, আর মুক্তমন উৎসাহীর আগ্রহের আত্যন্তিকতা। মাঝারি রুচির নিরীহ লোকের কাছে তাই দুটোই দৃষ্টিকটু।

হাজার হাজার বছর ধরে নিরক্ষর গণমানবের কেউ কেউ তাদের সুখ-দুঃখের ও আনন্দ-যন্ত্রণার অনুভূতি তাদের স্ব স্ব বুলির মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। ব্যক্ত করেছে তাদের জীবন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবিকা সংক্রান্ত প্রয়োজনের ও নিরাপত্তার নানা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। যেহেতু পড়ে-পাওয়া বিদ্যা ও জ্ঞান তাদের ছিল না; তারা তাদের পরিবেষ্টনী থেকেই আহরণ করেছে ভাব-চিন্তা-অনুভবের উপকরণ। আর তা প্রকাশ করেছে ছন্দোবদ্ধ গানে-গাথায়-ছড়ায়-প্রবাদে ও প্রবচনে। এবং আরো বানিয়েছে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের চেতনাদানলক্ষ্যে ব্রতকথা, নীতিকথা, উপকথা ও রূপকথা। সেসব কাহিনীর ভিত্তি ও লক্ষ্য মানব-প্রবৃত্তির—কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যের এবং মানুষের পরিশীলিত বৃত্তি–স্নেহ-প্রেম-কৃপা-ক্ষমা-ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যপ্রীতি, ত্যাগ-তিতিক্ষা আদর্শচেতনা প্রভৃতির দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন এবং দুর্ভোগান্তে পরিণামে ন্যায়-সত্য-নীতির ও আদর্শের জয় ও প্রতিষ্ঠা।

এগুলো সেকালের লোকশিক্ষার বাহন ছিল। জগৎ, জীবন, জীবিকা, সমাজ, ধর্ম, রীতি-রেওয়াজ, নীতি-আদর্শ প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, চেতনা ও বিধি-বিধান গণমানব এভাবেই পেত ও শিখত। আঞ্চলিক বুলিতে রচিত বলে এগুলো সাধারণত অঞ্চলের পরিধি অতিক্রম করে অন্যত্র প্রচারিত হতে পারত না। এসব মৌলিক রচনাধৃত খণ্ড দৃষ্টি, খণ্ড জ্ঞান, ভয়, বিস্ময়, দেবভরসা, কল্পনা, বিশ্বাস, দৈব সংস্কার, জাদুতে ও কেরামতিতে আস্থা এবং অভিজ্ঞতা তাদের আশার ও আদর্শের, কাম্য ও সাধ্য চেতনার প্রসূন ও আকর। এ সবই নিরক্ষর প্রকৃতিনির্ভর দৈবচালিত অজ্ঞ অসহায় মানুষের শাস্ত্র, সাহিত্য ও জীবনবেদ। সাহিত্য-শিল্প হিসেবে এগুলো অসামর্থ্যদুষ্ট ও স্থূল এবং বিধৃত জ্ঞান-প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতাও ত্রুটিবহুল। এ হচ্ছে পিছিয়ে-পড়া মন-মানসের অভিব্যক্তি নিদর্শন—এগুলো তাই গৌরবের বা গর্বের অবলম্বন নয়, আমাদের লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয়। কেননা শাস্ত্র সমাজ-সরকার এদের আত্মোন্নয়নের পথ রুদ্ধ রেখেছিল বলেই আজো এরা হাজার বছরের পিছিয়ে-পড়া মানুষ। যেসব শৈক্ষিক, আর্থিক, সামাজিক ও সরকারি সুযোগ পেয়ে আমরা 'মানুষ'রূপে পরিচিত এবং না-পেয়ে ওরা প্রাকৃত জন বা 'লোক' নামে অবজ্ঞেয়, তা শাস্ত্রকারের, সমাজপতির ও নরপতির কারসাজির ফল।

কাজেই লোক-ঐতিহ্য লোক-সহিত্য, লোক-শিল্প, লোক-সংস্কার, লোক-সংস্কৃতি আমাদের অজ্ঞতার, রক্ষণশীলতার ও অক্ষমতার সাক্ষ্যমাত্র। কালস্রোতে বিশেষ দেশের গণমানবের জীবনচেতনার ও জীবিকাভাবনার তথা শাস্ত্র সমাজ-সংস্কৃতির মন্থর ও ক্রমবিবর্তন ধারার ইতিহাসের উপকরণ হিসেবেই এগুলোর মূল্য অশেষ। এগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ আবশ্যিক, বিন্যাস-বিশ্লেষণ ও গবেষণা জরুরি। কিন্তু এগুলো আজকাল রচিত হচ্ছে না বলে, লোকাচার রক্ষিত হচ্ছে না বলে, হাহাকার করা এগুলোই আমাদের মন-মননের ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন বলে মুখরিত হওয়া, এগুলোকে টিকিয়ে রাখার নামে শহুরে শিক্ষিত সংস্কৃতিবিদদের আগ্রহে শিক্ষিত লোকের অনুকৃত বা কৃত্রিম রচনার শহুরে সমাদর প্রভৃতি নির্বোধ নির্লজ্জ বুর্জোয়া বিলাস আমাদের কোন্ শ্রেয়সের সন্ধান দেবে ? আমরা কি চাই যে আমাদের সাংস্কৃতিক বিলাসবাঞ্ছা পূরণের জন্যে দেশের মানুষ চিরকাল নিঃস্ব-নিরন্ন নিরক্ষর গেঁয়ো-অজ্ঞ হাড়ি ডোম জেলে জোলা বেদে মাঝি হয়ে থাক আমাদের জেলে নৃত্য, সাপুড়ে নৃত্য ও বাউল ভাওয়াইয়া ভাটিয়ালি উপহার দেয়ার জন্যে ? এ নিশ্চিতই এক বিকৃতবুদ্ধিপ্রসূত অমানবিক আবদার।

৩

মরামানুষ বাঁচে তার কৃতিতে ও কীর্তিতে। নরদেবতা ও নরদানব উভয়েরই ঠাঁই রয়েছে ইতিহাসে। নরকল্যাণে যারা কাজ করেছে তাদের লোক স্মরণ করে কৃতজ্ঞ ও প্রসন্নচিত্তে, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা নরপীড়নে নিন্দিত তাদের লোক স্মরণ করে ঘৃণার সঙ্গে। প্রীতি ও হিংসা দুটোরই প্রভাব সমান গভীর। বরং এটিলা-চেঙ্গিস-হালাকুরা ছিল বলেই সিকান্দর-সাইরাস-অশোকরা 'মহামতি'রূপে স্মরেণ্য এবং সলোমন-নওশেরোঁয়া-দানিয়াল-ধর্মপাল মহিমান্বিত। নরদানব ও নরদেবতা উভয়েই লোকশিক্ষার সমান অবলম্বন ও দোষ বর্জনের জন্যে সমভাবে উপাদেয়। শিক্ষামাত্রই তুলনায় লভ্য—জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিরোধ-সঞ্জাত, দুঃখ-বেদনা ও শঙ্কা-দৈন্য প্রভৃতির অস্তিত্বই সুখ-আনন্দ-স্বস্তি-সম্পদের গুরুত্ব-চেতনা দিয়েছে মানুষকে।

কাজেই কৃতী মরামানুষ নিয়ে বার্ষিক বিলাপোৎসব কিংবা কৃতজ্ঞহৃদয়ের কৃত্রিম আকুলতা বশে স্মরণোৎসব করা বাহুল্য নয় কেবল, বাতুলতাও। আজ আমরা নিষ্কর্মা বন্ধ্যা লোকেরা সেই বাতুলতার শিকার! আমরা প্রায় প্রত্যহই কাউকে-না-কাউকে পার্বণিক স্মরণের জন্যে সাড়ম্বরে আয়োজন করি, এবং 'দোষ হর গুণ ধর' নীতির বশে বানিয়ে বানিয়ে গুণকথা উচ্চারণ করি, রচনা করি কৃতি বা কীর্তিগাথা। ফলে তুচ্ছ হয় উচ্চ, মিথ্যা পায় সত্যের মর্যাদা ও ঔজ্জ্বল্য। মানুষকে নির্দোষ ফেরেস্তা বানালে সে-মানুষ মানুষের অনুকরণীয় মনুষ্যত্বের আদর্শ হয় না। তাতে সমকালের দুষ্ট অথচ কৃতীলোক প্রশ্রয় পেয়ে ও আশ্বস্ত হয়ে অধিক অপকর্ম সাধনে প্রলুব্ধ হয়। কারণ সে জানে তার চারদিককার লোকগুলো সত্যসন্ধ নয়, তোয়াজ-তোষামোদপটু চাটুকার চরিত্রহীন। আমাদের দেশে রচিত জীবনচরিতগ্রন্থ মাত্রই গুণগ্রাহিতা ও চাটুকারিতার নামান্তর। অন্যদিকে যে জীবিত মানুষ সৎ চিন্তায় ও কর্মে জনসমর্থনের প্রত্যাশী, তার পাশে দাঁড়িয়ে অপ্রিয়তার বা বিপদের ঝুঁকি নেয়ার মানুষ মেলে না। আবার সব কৃতী মরামানুষের জন্যেও কসিদাকার মেলে না, কেবল সরকার-সমর্থিত কিংবা সরকার সম্পর্ক-বিরহিত গোষ্ঠীস্বার্থ সম্পর্কিত মানুষের জন্যেই দেখি প্রশস্তিকারের ভিড়। এসব কর্ম কোনো উঠতি স্বস্থ ও সুস্থ জাতি করে না—তারা ব্যক্তির কৃতি কীর্তি স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ইতিহাসের হাতেই ছেড়ে দেয়—যাতে লোক স্বস্থ বিচার-বিবেক প্রয়োগ করে অনুপ্রাণিত হতে বা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

AMARBOI.COM

৪

সম্প্রতি সাহিত্যে-শিল্পে লিখিয়ে-আঁকিয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও সাহিত্য-শিল্পের চিরন্তনতা সম্বন্ধে নতুন করে প্রশ্ন জেগেছে। এ এক মীমাংসিত বিতর্কের ও তত্ত্বের পুনরুত্থান মাত্র। আঁকিয়ে-লিখিয়ের অমরত্বে লোভ আছে নিশ্চয়ই এবং তার কৃতি অবিনশ্বর তথা চিরমানবের স্মরেণ্য ও বরেণ্য হয়ে থাক—এ কামনা এবং উদ্দেশ্যও নিন্দনীয় নয়। কিন্তু স্বকালের স্বদেশের স্বসমাজের প্রতি আঁকিয়ে-লিখিয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য অস্বীকার করা সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ। কেননা তারাও সমাজসৃষ্ট ও সমাজসদস্য এবং তাদের সাহিত্য-শিল্পের লক্ষ্য পাঠক-দর্শক। তাদের সাহিত্য-শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়ও সমকালের পরিবেশ-পরিবেষ্টনীগত জীব মানুষ-নিসর্গ সম্পর্কিত অনুভব বা অনুভূতিজাত বোধ বা প্রজ্ঞা। কাজেই সমকালীন স্থান-কাল-সমাজের চাহিদাকে ও নতুন পরিবেশকে স্বীকার করেই রচিত হবে সাহিত্য-শিল্প। বিষয় সর্বকালীন ও সর্বজনীন হতেই সাহিত্য-শিল্প চিরন্তনতা পায় না; চিরন্তনতা কিছুটা পায় লিখিয়ে-আঁকিয়ের অনুভবের সুষ্ঠুতায় ও অভিব্যক্তিদানের নৈপুণ্যে।

তবু কালপ্রভাব তথা কালের কবল এড়ানো যায় না। 'কালো ঘসতি ভূতাণি' কাল সব নষ্ট করে—ধরা যাক প্রেমানুভূতি, মানুষ নির্বিশেষের চেতনা-সম্পদ। তাই বলে ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, উষা-পুরুরবা প্রভৃতির প্রেমের প্রাচীন বর্ণনা কি আমাদের সাধ মিটায়, যেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিটায় আধুনিক কোনো উপন্যাস ? এ পার্থক্যের মূলে থাকে অতীত ও সমকালীনতার প্রভাব। আজকের শহুরে কবি যদি বৈষ্ণব, শাক্ত বা বাউল পদ রচনা করে, কিংবা জৈগুন-সোনাভান-সখীসম্বাদ কথা লেখে, তা হবে সমকালের মানুষের চাহিদা ও রুচি বহির্ভূত। এসব রচনা হবে পিছিয়ে-পড়া মনের পরিচায়ক। অতএব দেশ-কাল-পরিবেশ নিরপেক্ষ জগৎচেতনা ও জীবনভাবনা নেই। দেহে মনে মানুষ বাঁচে সমকালে। তাই সমকালীন দেশের-কালের-সমাজের ছাপবিহীন সাহিত্য-শিল্প মন ধরেও রাখতে পারে না, ভরেও তুলতে পারে না— তার এখনকার প্রমাণ তরুণতর সমাজে রবীন্দ্র- নজরুলের গানের চেয়ে সাম্প্রতিক গানের অধিক জনপ্রিয়তা। সমকালে যে সাহিত্য-শিল্প স্রষ্টার অনুভবের ব্যাপকতায়, গভীরতায় ও সুষ্ঠুতায় রসোত্তীর্ণ বলে প্রায় সর্বজনীন স্বীকৃতি পায়, তা-ই স্বকালের পরেও অনেককাল লোকচিত্তে স্থিতি পায় বটে, তবে কালিক দাবি মিটাতে পারে না। কেননা কোনো অতীতই বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। স্বকালেই প্রাগ্রসর স্বসমাজে যা অগ্রাহ্য, কোন্ জাদু তাকে কালোত্তীর্ণ ও কালজয়ী করবে! কাজেই আঁকিয়ে-লিখিয়েকে স্বকালে স্বদেশে স্বসমাজের হয়ে সমাজবদ্ধ কোনো-না-কোনো শ্রেণীর মানুষের কান্না-হাসির ও দ্বন্দ্ব-দাবির কথা উচ্চারণ বা অঙ্কন করতেই হবে; মিটাতে হবে সমকালীন মানুষের জৈব ও মানস প্রয়োজন; দিশা দিতে হবে ভবিষ্যৎ জীবনের; চলার পথ হবে নির্দেশিত; ভয়-ভরসার কারণ থাকবে ব্যাখ্যাত। দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ সাহিত্য-শিল্প তাই হতেই পারে না। সাহিত্য-শিল্প জীবনোত্থিত এবং জীবনের প্রয়োজনে জীবনের জন্যেই। তাই তা ফলিত (applied) বা প্রায়োগিক ও সামকালিক স্বাদেশিক হওয়া আবশ্যিক। মনে রাখা প্রয়োজন নতুন জীবনে নতুন দিনের নতুন চাহিদা নতুন রূপে স্থানিকভাবে মিটাতে হয়।

AMARBOI.COM

৫

দর্শন সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা অনেককাল আগেই বদলে গেছে। কাজেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা-চেতনারও পরিবর্তন হয়েছে। প্রাণ ও মন এখন আর আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক জগৎ সম্পর্কিত নয়; নিতান্তই মর্ত্য ও মাটি নির্ভর। প্রাণ আছে বলেই আমরা প্রাণী। দেহে প্রাণ রেখে ও লালন করে জীবিত থাকতে চাই বলেই 'জীবন'কে গুরুত্ব দিই। প্রাণের পরিচালক বা উপজাত হচ্ছে মন বা চেতনা বা অনুভবশক্তি। প্রাণ-মনের সামষ্টিক ফলই জীবন। প্রাণ-মনের খাদ্য হচ্ছে যথাক্রমে অন্ন ও আনন্দ। জীব মাত্রেরই সব চিন্তা-ভাবনা-প্রয়াস ঐ অন্ন ও আনন্দ যোগাড়ে নিয়োজিত। আজকের সংহত ও সঙ্কীর্ণ বিশ্বে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবনে দেখা দিয়েছে অন্ন ও আনন্দ আহরণের সঙ্কট। মানবসভ্যতার ছয় হাজার বছরের ইতিহাসে আগেও কোনোদিন পরিত্যক্ত ও প্রচলিত উপায়ে স্বল্পসংখ্যক মানুষেরও এ সঙ্কটের সমাধান মেলেনি। কাজেই আজ জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার জন্যেই, অন্নের ও আনন্দের যোগান দেয়ার জন্যেই পার্থিব ও যান্ত্রিক সমাধান আবশ্যিক এবং তা সম্ভব দুনিয়াব্যাপী মানুষের মধ্যে ভূমি ও ভোজ্যের ন্যায়ানুগ ও আনুপাতিক বণ্টন। কেননা, মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে পার্থিব জীবনে ভোগ-উপভোগ। মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা চলছে এই ভোগ-উপভোগের বস্তু নিয়েই। ভোগ-উপভোগের বস্তু স্বল্প ও সীমিত। তাই কাড়াকাড়ি মারামারি ও হানাহানি হয়েছে অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তা পরিহারের উপায় মেলেনি এ শতকের আগে। সেজন্যেই আপোসে বণ্টনে বাঁচার মন তৈরি করা আবশ্যিক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

ঐতিহ্য যে কালান্তরে কোনো প্রভাব-প্রেরণার উৎস হয় না, তার প্রমাণ আকাশের নিচের সর্বপ্রকার প্রাণীর সঙ্গে নির্বিবাদে ও নিরুপদ্রবে সহাবস্থানের দীক্ষাদাতা বর্ধমান মহাবীরের ও গৌতমবুদ্ধের সাধনা ও স্থিতি-ধন্য আধুনিক বিহারের বর্ণ ধর্ম বিদ্বেষ ও দাঙ্গাদুষ্ট সমাজ; সওয়া লক্ষ নবীর আবির্ভাবধন্য আধুনিক লেবানন-ইসরাইল-জর্ডন কিংবা সভ্যতা-সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশভূমি মিশর-এথেন্স-রোম। কাজেই ঐতিহ্য নয়, অতীত নয়, বর্তমানই মানুষের পুঁজি ও পাথেয় এবং ভবিষ্যৎই ভরসা। জ্ঞানের পূর্ণতা, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, সুখ-স্বস্তির অবলম্বন, আয়ুর বৃদ্ধি, সর্বপ্রকার রোগের প্রতিষেধক, যন্ত্রের ও প্রযুক্তির বিচিত্র উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ, সম্পদের রূপান্তর, জীবিকার ও জীবনাচারের বৈচিত্র্য, ভোগ-উপভোগের রকমারি ব্যবস্থা, গ্রহান্তরে স্থিতি ও পরিভ্রমণ প্রভৃতি ঘটবে ও মিলবে কালক্রমে— সবটাই সামনে। দেখা ও ফেলে-আসা পিছনে বাঞ্ছিত কিছুই নেই, দিতেও পারে না কোনো আশ্বাস। ঐতিহ্যস্মৃতি রোমন্থন করা নয়, মানুষের কাঙ্ক্ষা হচ্ছে ইতিহাস সৃষ্টি করা।

৭

কালান্তরে শাস্ত্রমাত্রই তাৎপর্যরিক্ত আচারমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তখন শাস্ত্র কেবলই ধরে রাখে, পিছু টানে। শাস্ত্র হচ্ছে আস্তিক মানুষের মন-বুদ্ধির লাগাম। শাস্ত্রের সঙ্গে মানুষের দেহ মন বুদ্ধি আত্মা বাঁধা থাকে বিশ্বাসের শিকলে। এ অনড় বিশ্বাস ভার হয়ে মনে-মস্তিষ্কে চেপে বসে। তখন মন বুদ্ধি আত্মা চাপা-পড়া-ঘাসের মতোই জীবন্মৃত কিংবা সুপ্ত বা জড় অবস্থায় টিকে থাকে মাত্র, বিকাশ বিস্তার পায় না। তখন বিশ্বাসী মানুষ নিজেকে শাস্ত্রের খোলে কূর্মের মতো আশ্রিত রেখে নিশ্চিন্ত আচারিক জীবনে হয় অভ্যস্ত। তাই শাস্ত্রে আস্থাবান মানুষ যুক্তি বোঝে না, মানে না, সহ্যও করে না; জিজ্ঞাসুর প্রশ্নে ক্ষেপে ওঠে, পরিহারে মারমুখো হয়। শাস্ত্র-মানা মানুষমাত্রই বিধর্মীকে পর ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে। ব্যক্তিগত আকর্ষণে ও স্বার্থেই কেবল বিধর্মীকে লোকে মিত্র, সহযোগী কিংবা জীবনসঙ্গী করে।

জুলুম

ইংরেজি gentle বা gentleman আর বাঙলা ভদ্র ও ভদ্রলোক সমার্থক। একটা অপরটার অনুবাদ নয়। পরস্পর অপরিচিত দুই ভূখণ্ডের দুই ভিন্নভাষীর চিন্তা-চেতনার প্রসূন এই সংস্কৃতি-প্রতীক অর্থগর্ভ শব্দদুটো। gentle শব্দের প্রাচীনতর অভিধা—উদার, মহৎ, সুজন, শান্ত, অমায়িক, বশংবদ প্রভৃতি। আর বর্তমান অর্থ শিক্ষিত সদ্বংশজাত, মান্য, শান্ত, নিরীহ। gentle শব্দের অন্যতম প্রাচীন অর্থ 'অস্ত্র ধারণের অধিকারী'। যে অস্ত্রের সদ্ব্যবহার ও সুপ্রয়োগ করতে জানে বা করে অর্থাৎ জনজীবন-জীবিকার এবং নিয়মের ও নীতির ওপর হামলা প্রতিরোধে যে অস্ত্রপ্রয়োগে অঙ্গীকারাবদ্ধ, সে-ই কেবল অস্ত্রধারণের অধিকারী। অতএব এ তাৎপর্যেও gentle— 'হিতৈষী, সংযত, সুবিবেচক ও সংরক্ষক' অভিধা নির্দেশ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্কৃত 'ভদ্রক' থেকে 'ভদ্র' ও ভাল শব্দের উদ্ভব। আমরা জানি 'ভাল' সে-ই, যার হাতে কারো জীবন-জীবিকা কিংবা স্বার্থ ও সম্মান বিপন্ন হয় না, যার সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে নিরাপত্তার স্বতো-আশ্বাস এবং সাহায্য-সহায়তার ভরসা মেলে। অতএব, ভাল মানুষের সঙ্গ ও প্রতিবেশ বহিরাক্রমণ থেকে নিরাপদ ও নিরুদ্বিগ্ন রাখে। কাজেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ভালো সে-ই, যে কোনো-অবস্থায় অনধিকার চর্চা করে না, স্বাধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে না, যে নিজে বাঁচতে জানে এবং বিপন্ন অসহায় অক্ষমকে বাঁচতে সাহায্য করে, 'Live and let life' যার জীবনের আদর্শ। সুতরাং gentleman বা ভদ্রলোক মাত্রই সংস্কৃতিবান মানুষ হওয়ার কথা। কারণ সংস্কৃতি হচ্ছে মন-মননের অভিব্যক্ত লাবণ্য। ঐতিহ্যের মতো জীবনাচরণের সৌন্দর্যই— সৌজন্যই সংস্কৃতি। তাই ভাব-চিন্তা-কর্মে ও আচরণে যে সৌজন্য, সুরুচি, সদিচ্ছা, ন্যায়বোধ, স্বাধিকার চেতনা, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যবুদ্ধি ও জনহিতৈষণা অভিব্যক্তি পায়; তা-ই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি জীবন-জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন। কাজেই জীবনাচরণ বা জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য তথা অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত। যে-দুঃখ, যে-যন্ত্রণা, যে-ক্ষতি নিজের জন্যে কাম্য নয়, তা অপরের জন্যেও কামনা না করাই সংস্কৃতিপরায়ণতা। দেখতে শুনতে ভাবতে বলতে করতে যা অসুন্দর, যা অকল্যাণকর, তা-ই অসংস্কৃতি; এককথায় জুলুমই অসংস্কৃতি। তাই তা অশোভন, তাই তা অন্যায়, তাই তা ঘৃণ্য, তাই তা অপরাধ, তাই তা পাপ, তাই তা পরিহার্য।

জুলুম কি ? যা অন্যের স্বার্থে আঘাত হানে, তা-ই জুলুম। আমি যদি মিথ্যা বলি, তা হলে কারো ক্ষতি হয়, তা-ই তা জুলুম। আমি যদি চুরি করি, তা হলে কারো সম্পদ হানি হয়, তাই তা জুলুম। আমি যদি নাগরিক দায়িত্ব পালন না করি, তা হলে তা সমাজের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে, তাই তা জুলুম। আমি যদি পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালন না করি, তা হলে পরিবার-পরিজন ঈপ্সিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে, তা-ই তা জুলুম। আমি যদি অবহেলায় কিংবা আলস্যবশে স্বনির্ভর স্বাবলম্বী না হই, তা হলে তা পরিজনের ওপর জুলুম হয়ে দাঁড়ায়। আমার ঘৃণ্যা, ঈর্ষা ও অসূয়াবিষ অন্যের ক্ষতি করে, তা-ই তা জুলুম। চিকিৎসক হয়ে রোগ নির্ণয়ে অসামর্থ্য যদি স্বীকার না করি কিংবা চিকিৎসায় বাঞ্ছিত মনোযোগ না দিই, তা হলে তা হবে রোগীর প্রতি জুলুম। প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যদি আগলে থাকি, তবে তা হবে নির্বিত্ত নিরন্নদের প্রতি জুলুম। রাস্তায় পথিকের চলাচলে বিঘ্ন ঘটানোও জুলুম। না-জেনেও যদি জানি বলি, না-বুঝেও যদি বলি বুঝি, না-মেনেও যদি বলি মানি, তা হলে আস্থাবান লোকের তথা সমাজের প্রতি তা হয় জুলুম। অজ্ঞতার ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে দুর্বলের ইচ্ছার ও স্বার্থের বিরুদ্ধে তার ওপর কিছু চাপিয়ে দেয়াই জুলুম। মজলুম মাত্রই দুর্বল ও দুস্থ। খল ও প্রবলই হয় দুরাত্মা-দুর্জন। এমনি করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্ব-স্বার্থে পর-প্রতারণা মাত্রই জুলুম। কেননা প্রত্যেক কারণেরই ক্রিয়া আছে। মিথ্যার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে সমাজস্বার্থ ও সমাজস্বাস্থ্য নষ্ট করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই অনধিকার চর্চাকারীমাত্রই জালিম।

অতএব দেশে সমাজে রাষ্ট্রে অপ্রাকৃত মানব-দুঃখের মূলে রয়েছে জুলুম। কাজেই মানুষের মধ্যে এই জুলুমচেতনা তথা জুলুমবিরতি ও জুলুমপ্রতিরোধ বুদ্ধি জাগলেই সহজ হবে মানবিক সমস্যার সমাধান। সিদ্ধ হবে মানুষের অভীষ্ট। কেননা ব্যক্তিক, নৈতিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবন জুলুমমুক্ত হলে মানুষের জীবন-জীবিকা ও মন-মনন অপ্রাকৃত তথা মানবসৃষ্ট যন্ত্রণা থেকে পাবে মুক্তি। সুতরাং জুলুমপ্রবৃত্তিবিহীন মানুষই কেবল gentleman বা ভদ্রলোক। অথচ কার্যত জুলুমে সমর্থ মানুষ ও জুলুমবাজই সমাজে 'ভদ্রলোক' নামে পরিচিত এবং সম্মানিত। এই কারণেই বোধহয় ভদ্রলোক এবং ভালোমানুষ এখন আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমার্থক নয়। জুলুমপ্রবৃত্তির ও জুলুমবাজির বিরুদ্ধে সংগ্রামই তাই মনুষ্য-সাধনা। মানবস্বভাবে নিহিত একমাত্র মানবশত্রু এই জুলুম।

অতএব অসংযত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য মাত্রই জুলুম। কাজেই সৌজন্য, শীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সুরুচি, উপচিকীর্ষা, দায়িত্বচেতনা, কর্তব্যবুদ্ধি, নাগরিক-চেতনা, মানবিকবোধ প্রভৃতির অর্জন ও অনুশীলন এবং সমস্বার্থে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের, সহযোগিতার ও বণ্টনে বাঁচার অঙ্গীকার করা এই জুলুমবৃত্তি সংযমনেই সম্ভব।

জুলুমের বিপরীত কোটির নাম সংযম। স্বাধিকারে সন্তুষ্ট থাকাই সংযম। সংযমই জুলুমবৃত্তি নিরোধের সহজ উপায়। তাই ব্যক্তিক, নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে জুলুমের বিরুদ্ধে জুলুম-বিলুপ্তির জন্যে একমুখী সংগ্রামই কাম্য ও কর্তব্য। এ শতকের সূর্য সে-সংগ্রামেই দীক্ষা দিচ্ছে বিশ্বের শোষণ-পীড়িত জনগণকে। তারা জানে gentleman বা ভালোমানুষের সংখ্যাধিক্যেই মানুষের জীবনযাত্রায় কাম্য স্বস্তি ও শান্তি সম্ভব।

মুক্তি-সংগ্রামের স্বরূপ

AMARBOI.COM

প্রাণী হিসেবে প্রাকৃতজীবন পরিহার করে মানুষ যেদিন স্বরচিত ও স্বনির্ভর কৃত্রিম জীবন কামনা করেছে, সেদিন থেকে শুরু হয়েছে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তার স্বেচ্ছাবৃত দায়িত্ব ও কর্তব্য। জীবিকায় নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা এবং জীবনে শান্তি-সুখ ও আনন্দ-আরাম প্রাপ্তি বা রক্ষণ নিশ্চিত করবার জন্যে মানুষের যৌথজীবনে প্রয়োজন হয়েছিল সহানুভূতির, সহিষ্ণুতার ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সহাবস্থানের অঙ্গীকার। এ অঙ্গীকারই সব দায়িত্বের ও কর্তব্যের উৎস। যৌথজীবনে সর্বপ্রকার ব্যক্তিক দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য-চেতনা ব্যক্তির জগৎ-ভাবনা ও জীবন-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করবে ঐ আদি অঙ্গীকার— এমনি এক সরল ও সৎ অভিপ্রায় ও প্রত্যাশা ছিল অঙ্গীকার উচ্চারণের মূলে।

দেখা গেল কৃত্রিম চর্যায় ও চর্চায় মানববৃত্তি-প্রবৃত্তিও সহজাত ঋজুরূপ পরিহার করে সূক্ষ্ম, জটিল, বহু ও বিচিত্রমুখী হয়েছে। যৌথজীবন নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন রাখার জন্যে এখন প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণের।

শুরু হল শাস্ত্রের সমাজের ও সরকারের শৃঙ্খল বেঁধে ব্যক্তির ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত করার প্রয়াস। বাহ্যত এর চেয়ে সুব্যবস্থা হতেই পারে না। কিন্তু কার্যত দেখা গেল—এ এক মাকাল ফল। হাতিয়ারের উৎকর্ষে ও জীবিকাপদ্ধতির বৈচিত্র্যে ততদিনে উৎপাদন-পদ্ধতিতেও ঘটেছে বিবর্তন। শৃঙ্খলসঞ্জাত শৃঙ্খলা এখন অনেকের কাছে নিগড়মাত্র। কেননা শাস্ত্রী, সমাজপতি, সরকার ও শাসক সবাই স্ব স্ব স্বার্থেই তৈরি করে শিকল, নিয়মের নামে অন্যদের করে শৃঙ্খলিত। ফলে অন্যরা হয় জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধিকার বঞ্চিত—অন্য মানুষ যেন সত্তাবর্জিত। অন্য প্রাণীদের মতোই সাধারণ মানুষের পার্থিব স্থিতিও যেন ওদের ভোগ-উপভোগের যোগানদার রূপেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাস্ত্রের, সমাজের ও সরকারের শাসন-শোষণ, পীড়ন-পেষণ ও প্রতারণা-প্রবঞ্চনা থেকে মুক্তিলাভের সংগ্রামও তাই লঘু-গুরুভাবে চলছিল গোড়া থেকেই, সংগ্রামের সুস্পষ্ট ধারণা কিংবা সুনির্দিষ্ট পন্থা জানা ছিল না অবশ্য কারো। তাই গণমানবের মুক্তিসংগ্রাম অভিপ্রেত সাফল্য লাভও করেনি সেকালে। আজ এর স্বীকৃত নাম শ্রেণীসংগ্রাম, এর সুনির্দিষ্ট ভিত্তি গণসংহতি এবং উত্তরণপন্থা হচ্ছে গণবিপ্লব।

ব্যক্তিমানুষের সত্তার স্বাভাবিক বিকাশ যা-কিছু, বা যে-কেউ ব্যাহত বা বিঘ্নিত করে, তার বিরুদ্ধেই এই মানবমুক্তির সংগ্রাম। ব্যক্তিমানুষের সরল ও সৎ জীবিকা অর্জনে ও জীবনযাপনে যা-কিছু বাধাস্বরূপ, তা-ই জুলুম। কাজেই শাস্ত্রের, সমাজের বা সরকারি-শাসনের নামে ব্যক্তির মৌল মানবিক অধিকার-বিরোধী যেসব বিধি-নিষেধ, নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে, সেগুলো জুলুমেরই অন্য নাম মাত্র।

জীবনে স্ব-সত্তার স্বাভাবিক বিকাশে এবং জীবিকার নিরাপত্তায় যে-কোনো মানুষের জন্মগত অধিকার স্বীকৃতি পেলেই কেবল মানুষ জুলুম-মুক্ত হবে।

আজকে আমাদের গণসেবীদের মুখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে— গাঁয়ের গঞ্জের জনগণকে এ জুলুম-চেতনাদান। এ চেতনাদান সহজে সম্ভব নিরক্ষরদের সাক্ষর করার মাধ্যমে। আজ রেডিয়ো-টেলিভিশন গাঁয়ে-গঞ্জেও দ্রুত আত্মবিস্তার করছে। সাক্ষর মানুষ সংবাদপত্রে যা পড়বে, রেডিয়ো-টেলিভিশনে যা শুনবে-দেখবে এবং অন্য নানাসূত্রে যা জানবে, তাতে তাদের অজ্ঞতা ঘুচবে, শুভঙ্করের ফাঁকির ফাঁক বোধগত হবে, আত্মচেতনা জাগবে, শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পারবে, এবং আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি দিয়ে স্বস্বার্থ রক্ষায় ও আত্মমুক্তি লাভে সমর্থ হবে। সেদিন তাদের কেউ জুলুম করবার সাহসও পাবে না; তারা অজ্ঞতার, অবিদ্যার, অভাবের, অসহায়তার, অসহানুভূতির, অসহাবস্থানের জুলুম থেকে মুক্তি নিজেরাই অর্জন করতে পারবে।

আজকের জগতে ব্যক্তিমানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার জন্যে প্রয়োজন—ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সুযোগ, জীবিকা-সম্পৃক্ত কর্মে যোগ্যতানুসারে অধিকার, সমস্বার্থে সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সহানুভূতির, সহিষ্ণুতার ও সহযোগিতার অনুশীলন এবং মানুষের প্রাণের মূল্য, ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও মৌল মানবিক অধিকার ও অর্থসম্পদের সম্ভোগে সর্বমানবিক দাবির স্বীকৃতি আর চাহিদার ভিত্তিতে উৎপাদনে-বণ্টনে আনুপাতিক সমতা রক্ষার নীতি এবং সর্বোপরি নাগরিক হিসেবে সমাজ- সদস্যরূপে ব্যক্তির দায়িত্ববোধ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বাধিকারচেতনার সুষ্ঠুতা।

তাই আজকের জগতে যে গণসংগ্রাম চলছে, তার সাধারণ লক্ষ্য হচ্ছে— জীবিকার ক্ষেত্রে সমসুযোগ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা অর্জন, ব্যক্তিজীবনের মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে স্বীকৃতি, মানস-জীবনে শ্রেয়ঃবরণের ও সংস্কার বর্জনের স্বাধীনতালাভ, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারচেতনা সুষ্ঠুকরণ, আর সমস্বার্থে ব্যক্তিমনে সহিষ্ণুতার, সহাবস্থানের ও সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা।

কোনো রাষ্ট্র স্বাধীন-সার্বভৌম হলেই এবং সরকারপ্রধান স্বদেশী স্বধর্মী স্বভাষী হলেই রাষ্ট্রবাসী মুক্ত ও স্বাধীন হয় না। রাষ্ট্রে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি না হলে, জনগণের ন্যায্য স্বাধিকার স্বীকৃত ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ না-থাকলে; জনগণের শোষণ-শাসন ও পীড়ন-পেষণ থেকে মুক্তি ঘটে না। জীবনে জুলুমমুক্তিই যথার্থ মুক্তি।

তাই আজ দেশ-দুনিয়ার সর্বত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে স্বদেশী, স্বধর্মী, স্বভাষী সামন্ত-বুর্জোয়া-স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধিকার অর্জনের, পীড়ন-শোষণ মুক্তির, বৈষম্যবর্জনের ও সত্তার স্বাধীনতার জন্যে গণসংগ্রাম চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বস্তির পন্থা

আমরা যতই সুখের ও স্বস্তির সন্ধানে ছুটোছুটি করছি, স্বস্তি-সুখ ততই যেন মরীচিকা হয়ে উঠছে। এর কারণ একটিই, তা হচ্ছে আমাদের সামগ্রিক চেতনার ও শ্রেয়োবোধের অভাব। জীবনের চাহিদা একাধারে এবং যুগপৎ পূরণ করতে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে জীবনের প্রয়োজন পূরণ করা চলে না। এ বছর ভাতের যোগাড়, আগামী বছর কাপড়ের ব্যবস্থা, পরের বছর ঘরের সংস্থান, তার পরের বছর রোগের চিকিৎসা করা চলে না। সবটাই একসঙ্গে একই সময়ে দরকার সুষ্ঠু জীবনধারণের জন্যে—অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করার জন্যে যেমন হাঁড়ি-পাতিল, তেল-নুন, চাল-ডাল, লাকড়ি, আগুন-পানি একসঙ্গে একস্থানেই মজুদ রাখা প্রয়োজন। কাজেই এ সমাজ ভেঙে শ্রেণীহীন সমাজ গড়তে না পারলে, সুখ-স্বস্তির সন্ধানে মরীচিকার বিড়ম্বনাই মিলবে। মানবিক সমস্যার সমাধান-পন্থা থাকবে অনায়ত্ত। আমরা আজ গণমানবের জীবন-জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বস্তি খুঁজছি। কিন্তু সরকাররূপ অভিভাবক তাদের আয়ত্তে না-এলে তাদের দুঃখ-যন্ত্রণা অভাব ঘুচবার নয়। শ্রেণীতে বিন্যস্ত ও বিভক্ত সমাজে মানুষ কমবেশি স্বস্বার্থে ও স্বশ্রেণীর স্বার্থে ভাব-চিন্তা-কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে।

শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজে আদিকাল থেকেই ধনবলে, বাহুবলে ও সাহসে প্রবল এবং ছল-চাতুরী-ধূর্ততায় নিপুণ লোকেরাই গণমানবকে সুকৌশলে দাস ও বশ করে পুরুষানুক্রমে গণমানবের ঘাড়ে জগদ্দল হয়ে চেপে বসে আছে। বিত্ত ও বল মানুষকে দর্প ও দাপটলিপ্সু করে, করে জুলুমবাজ। তাই সম্পদ ও শক্তি মানুষকে করে বিবেকরিক্ত ও যুক্তিহীন এবং স্বসুখ ও স্বস্বার্থ লক্ষ্যে গায়ের জোর প্রয়োগে করে প্রলুব্ধ। তাদের অনুগ্রহজীবী গুরু-পুরোহিতরা তখন আসমানী নীতির ও অভিপ্রায়ের দোহাই দিয়ে শোষিত-পীড়িত মানুষকে নিয়তি-নির্ভরতায় ও লীলাবাদে আস্থা রেখে প্রবোধ পেতে প্রবর্তনা দেয়। দুনিয়ার দু-পাঁচটি দেশ ছাড়া সর্বত্র আজো প্রতাপে প্রবল-দুরাত্মা-দুর্জনের অবাধ অত্যাচার চলছে ঐ শাস্ত্রীয় ভোজবাজির প্রভাব প্রয়োগে। জাত-জন্ম-বর্ণ-বিত্তের বৈষম্য ও তজ্জাত শাসন-শোষণ পীড়ন-পেষণ থেকে তাই মুক্তি মেলেনি গণমানবের।

আজো বৃহৎ পৃথিবী শাহ্-সামন্ত স্বার্থে, বেনে-বুর্জোয়া স্বার্থে, আমলা-পুরুতের স্বার্থে শাসিত ও শোষিত। পৃথিবী আজো ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যিক স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত। রাজা তো নিজের জন্যে বটেই, প্রজাও বাঁচে তার প্রয়োজন মিটানোর জন্যেই, বেনের বুর্জোয়া-আমলা প্রভাবিত সমাজেও গণমানবের স্থিতি ওদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যোগান দেয়ার জন্যেই। বিত্ত বলো, বেসাত বলো, ন্যায় বলো, নীতি বলো, বিবেক বলো, কিংবা ভাস্কর্য-স্থাপত্য-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বলো— সবটাই সৃষ্ট তাদেরই ভোগ-উপভোগের জন্যে। রিক্ত, অজ্ঞ, অসহায়, নিরক্ষর ও দুর্বল মানুষ নীরবে মেনে নিয়েছিল তাদের পাঁতি ও নীতি, পোষমানা প্রাণীর মতো নিয়তি বলে জেনেছিল সব বঞ্চনাকে ও পীড়নকে।

কিন্তু একদিন যন্ত্র যুগান্তর ঘটাল। গণমানবে জাগল আত্মচেতনা। বুদ্ধির নিরিখে যাচাই করল নিজের অবস্থান ও দুর্ভাগ্য। জানল ওরা পড়ে গেছে ফাঁকির ফাঁকে। আসমানী নীতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও পার্থিব নিয়মের ধোঁকা দিয়ে প্রজন্মক্রমে ঠকিয়েছে তাদের ঐ প্রতাপে প্রবল প্রতারকরা। তাদের শ্রমের ফল ও ফসল ভোগ-উপভোগ করেছে দুরাত্মা-দুর্জনেরা। তারা প্রতারিত হয়েছে ডিম-পাড়া হাঁস-মুরগির মতো।

তাই আজ দুনিয়াব্যাপী তারা মানবিক ও মৌলিক অধিকারের, সুখের ও স্বস্তির অধিকারের, জীবনে ও জীবিকায় অধিকারের, ভোগে ও উপভোগে অধিকারের, মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে অধিকারের, সাম্যে ও স্বাধীনতায় অধিকারের, সমস্বার্থে সহাবস্থানের ও সহযোগিতার অধিকারের সংগ্রামে নেমেছে। স্বাধিকারকামী গণমানবের এই উর্মিসম আবেগ সংযত করার, সংগ্রামে সাফল্য ঠেকানোর শক্তি কোনো মর্ত্যমানবের নেই। কেননা—

ধূলিকাদামাখা মানুষের শিশু
দলে দলে আজ করিছে ভীড়
আপন প্রাপ্য অধিকার চায়
তার লাগি দেবে লাল রুধির। *[মহীউদ্দীন]*

এমনি সংকল্পে সাফল্য সুনিশ্চিত। জয়তু গণমানব!

স্মর্তব্য যে, ২১শে ফেব্রুয়ারিও এমনি অধিকার আদায়ের সংগ্রামদিবস ছিল। সেদিনও রাজপথে ঝরেছিল এমনি লাল রুধির—যা লক্ষ রক্তবীজ সৃষ্টি করেছে। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারি আমাদের স্মরণীয় ঐতিহ্য নয়—প্রেরণাদায়ক পুঁজি-পাথেয়-সম্পদ। কারণ সংগ্রাম আজো অসমাপ্ত।

AMARBOI.COM

আনন্দ-সুন্দর জীবন লক্ষ্যে

প্রীতিই জীবন-প্রেরণা। কারো প্রতি বা কিছুর প্রতি অনুরাগ না-থাকলে জীবন হয় স্পৃহারিক্ত। সে অবস্থা হয় আত্মহত্যার অবস্থা। আমরা জীবনকে ভালোবাসি। তার মানে এই—আমরা কিছু মানুষকে, প্রকৃতিকে এবং পরিবেষ্টনীকে ভালোবেসে জীবনস্পৃহা জাগিয়ে রেখেছি, তা-ই জীবনে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমরূপে কর্মপ্রেরণা যোগায়। আমরা কারো জন্যে বা কিছুর জন্যে বাঁচি। এভাবেই আমরা জীবনের মূল্য ও জীবনের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করেছি। এই ভালোবাসা জিইয়ে রাখার জন্যেই জীবন-বিকাশের অনুকূল প্রতিবেশ চাই। তাই জীবনের ন্যূনতম দাবি মিটাতে হয়। সে-দাবি অন্নের ও আনন্দের। দেহে প্রাণের স্থিতি সুষ্ঠু করবার জন্যে চাই অন্ন, এবং মনের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রয়োজন আনন্দ। প্রাণের আধার হিসেবেই দেহের গুরুত্ব আর প্রাণের উপজাত হচ্ছে মন। শেষাবধি এ মনই জীবনের প্রভু ও প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই দেহে প্রাণের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্যে যেটুকু খাদ্যের প্রয়োজন, তা দিয়ে মনের বিকাশ সম্ভব হয় না। মন আরো কিছু চায়—মনের পুষ্টির জন্যেই চাই বিস্তৃত কর্মপরিসর, বিচরণের জন্যে দিগন্তহীন জ্ঞানের জগৎ এবং মনের খাদ্য হিসেবে প্রয়োজন বিচিত্র অনুভবের সুযোগ। বেড়া আর চাল কিংবা দেয়াল আর ছাদ যেমন রোদ বৃষ্টি শৈত্য থেকে দেহকে রক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু আনন্দ-আরামের জন্যে আরো কিছু চাই— সে অংশটুকু বাহ্যত অপ্রয়োজনের প্রয়োজন। এর নাম সৌন্দর্য। এ কেবল মনেরই চাহিদা। অতএব সৌন্দর্যই মনের খাদ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দ ঐ সৌন্দর্যেরই প্রসূন এবং মনের পুষ্টিজাত লাবণ্য। গভীর তাৎপর্যে এ সৌন্দর্য-চেতনার নাম আনন্দ এবং এ আনন্দ সন্ধানই একাধারে জীবন-প্রেরণা ও সংস্কৃতিবানতা। সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্মেষের, স্থিতির, ক্রমবিকাশের এবং উৎকর্ষ সাধনের তাই পূর্বশর্ত হচ্ছে—জীবনে-জীবিকায়, বলে-বিত্তে, স্বাধিকারে-স্বাতন্ত্র্যে, সুযোগে-সুবিচারে, আর পালনে-পোষণে, শাস্ত্রে-শিক্ষায়, অশনে-বসনে, নিবাসে-নিরাময়ে ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য ও অধিকারের স্বীকৃতি।

কেননা আনন্দিত অবস্থা হচ্ছে নিরুদ্বিগ্ন, নিরোগ নিঃশঙ্ক নিঃক্ষুৎ জীবন। যে-শ্রেণীর মানুষ এমনি অবস্থানে ছিল, সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ তাদেরই দান। এ কারণেই সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাহিত্য-শিল্প, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি বিত্তবানদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে সৃষ্ট। ফলে নিঃস্ব, নিরন্ন, নিরক্ষর, নিরাশ্রয় দাস দুর্বল মানুষের ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসাদ ভোগ-উপভোগের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না।

হাজার হাজার বছর পরে— বিশেষ করে এ শতকে গণমানবের চোখে ঐ বঞ্চনা ও প্রতারণা ধরা পড়েছে। তাই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানবিক ও মৌলিক অধিকার লাভের জিগির তুলেছে এবং সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে তারা। যেহেতু অধিকাংশ মানুষ ঐ বঞ্চিত শোষিত নির্যাতিত দলের, সেহেতু গণমানবের স্বার্থে ও প্রয়োজনে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস রচিত হওয়ার যৌক্তিকতা ও দাবি উচ্চারিত হচ্ছে সর্বত্র। গণমানবের স্বাচ্ছন্দ্যের ও আনন্দের অধিকার আদায়ের এ সংগ্রামে প্রতাপে প্রবল সামন্ত-বেনে-বুর্জোয়া-আমলারা দেশে দেশে আজ বিপন্ন বটে, কিন্তু আজো অর্জিত। বঞ্চিত শোষিত নির্যাতিতদের দুর্ভোগের তাই অবসান ঘটেনি আজো।

আজ বিবেকবান আঁকিয়ে লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়েদের পবিত্র দায়িত্ব হচ্ছে— সমাজে বিবেকের ও অন্যায় পীড়ন-শোষণের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরীর এবং কল্যাণ চিন্তায় ও কর্মে দিশারীর ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা এবং আশু কর্তব্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উচ্চকণ্ঠে গণবিরোধী চিন্তার ও কর্মের প্রতিকার চাওয়া, প্রতিবাদ করা এবং আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীদের একুশের এ স্মারক মুহূর্তে এ সংকল্প ও শপথ গ্রহণই বিহিত আচরণ।

আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে— নিরক্ষরদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানের স্পৃহা জাগানো, হতাশ বুকে বাঞ্ছা জাগানো, বঞ্চিত বুকে আশা-প্রত্যাশা জাগিয়ে তাদের আশ্বস্ত করা, সংগ্রামে শামিল হওয়ার জন্যে তাদের প্রাণে প্রেরণা যোগানো, নিষ্ক্রিয়কে সক্রিয় করা, বাঁচার পথ বাৎলে দেয়া, স্বাধিকার লাভে প্রবর্তনা দেয়া। কিন্তু ওরা নিরক্ষর ও গেঁয়ো। আমাদের আবেদন ওদের কানে পৌঁছানোর জন্যে বর্ণমালার মাধ্যম (ওরা নিরক্ষর বলে) অকেজো, পরোক্ষে অনুভূতি বিনিময়ের ভাষাও নেই, চিন্তার ও চেতনার সঞ্চার ও বিনিময় তাই কষ্টসাধ্য কিংবা মন্থর। প্রত্যক্ষভাব নিরক্ষর জনগণের মধ্যে চিন্তাচেতনা সঞ্চারের ও প্রচারের মাধ্যম হতে পারত রেডিয়ো, টেলিভিশন, ছায়াছবি, যাত্রা, কবিগান, সঙ্গীত প্রভৃতি। কিন্তু প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এগুলো সরকার নিয়ন্ত্রিত। তাই সরকারি মত, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে উক্ত মাধ্যমগুলো উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকবে। আর জনগণের নিয়ন্ত্রণে আসবে যেদিন এই সমাজ ও সরকার, সেদিন আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ফুরাবে। কেননা তখন তো গণমানবের মুক্তিসংগ্রাম থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেই আজ আমাদের বক্তব্যের বিষয় গণমানবের মুক্তি-সমস্যা হলেও আমাদের শ্রোতা গণমানব নয়— শিক্ষিত শহুরে মধ্য ও উচ্চ বিত্তের মানুষ। আমাদের আবেদনের লক্ষ্যও তারা। গণমানবের হয়ে তাদেরই বিবেক জাগানোর জন্যে, তাদের মনে অপরাধের গ্লানি জাগানোর জন্যে, মানবতার খাতিরে শ্রেণীস্বার্থ ভুলে গণমানবের হয়ে গণমুক্তিসংগ্রামে শামিল হবার জন্যে তাদের আহ্বান জানানোর লক্ষ্যেই আমাদের আঁকা-লেখার ও গান-বাজনার এ প্রয়াস প্রবল, গভীর ও ব্যাপক হওয়া আবশ্যিক।

ভালোবাসার দায়

প্রাণীর বাঁচার জন্যে একটা তাগিদ চাই— সে-তাগিদ নামান্তরে অনুরাগ। এই অনুরাগই বেঁচে থাকার আগ্রহ জাগায়—জীবনের প্রতি মমতা জাগায়। কাউকে বা কিছুকে ভালো না বাসলে এ তাগিদ, এ অনুরাগ জন্মায় না। এ তাৎপর্যে মানুষ বাঁচে ভালোবাসার জন্যে—ভালোবাসা দেবার জন্যে ও পাবার জন্যে। অতএব ভালোবাসার পাত্র বা অবলম্বনই বাঁচার এবং তৎসংশ্লিষ্ট ভাব-চিন্তা-কর্মের উৎস। এ-ই হচ্ছে 'কার জন্যে—কী জন্যে বাঁচব' প্রশ্নের উত্তর। এ উত্তর যার মনে অনুপস্থিত সে জীবন্মৃত, আত্মহত্যাপ্রবণ।

AMARBOI.COM

চোর-ডাকাত-প্রতারকের ভাব-চিন্তার ও কর্মপ্রয়াসের উৎসও ঐ ভালোবাসা। সেও মা-বাপ-ভাই-বোনকে, সঙ্গিনী-সন্তানকে ভালোবাসে বলেই তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্যে করে ডাকাতি-চুরি-হত্যা ও প্রতারণা। তার এই ভালোবাসা সংকীর্ণ ও সীমিত বলেই সে প্রসারিত ও উন্নত চিন্তা-চেতনার মানুষের কাছে ঘৃণ্য। যে-মানুষ কেবল নিজের জন্যে বাঁচে, তাকে বলি অমানুষ। তেমনি যে-মানুষ কেবল স্ত্রী-পুত্রের জন্যে বাঁচে, তাকেও আমরা নিন্দা করি স্বার্থপর ও সংকীর্ণচিত্ত বলে। যে-প্রতিবেশীর জন্যেও বাঁচে তাকে আমরা স্বাভাবিক সামাজিক মানুষ বলেই জানি, যে পরার্থে বাঁচে তাকে বলি মহৎ মানুষ। মহত্তর মানুষ সে-ই, যে একাধারে যুগপৎ নিজের জন্যে এবং দেশ-জাত-মানুষের হয়ে মানুষের জন্যে এবং মানুষের সামগ্রিক স্বার্থে বাঁচতে চায় ও বাঁচতে জানে।

আমরা জানি, নিঃসঙ্গতায় জীবন নেই— নেই নিরবলম্ব জীবনও। অতএব মানুষ অন্তত অন্য কোনো একটি মানুষকে ভালোবেসে, বিশ্বাস করে, নির্ভর করে ও ভরসা করে বাঁচে। আবার তার চাওয়া-পাওয়ার অভিব্যক্তি দানের জন্যেও চাই দর্শক ও শ্রোতা মানুষ। সুতরাং স্নেহে ঘৃণায় প্রেমে বিদ্বেষে শ্রদ্ধায় ঈর্ষায় প্রীতিতে অসূয়ায় উপেক্ষায় রিরংসায় ত্যাগে দ্বন্দ্বে প্রতিযোগিতায় প্রতিহিংসায় রাগে বিরাগে সম্প্রীতিতে সংঘর্ষে সমবেদনায় নির্মমতায় বাঁচতে চায় মানুষ। যেভাবেই হোক সর্বাবস্থায় মানুষ অন্য মানুষের মধ্যেই অন্য মানুষ সম্পর্কে বাঁচে। কাজেই প্রাণিমাত্রেরই আপেক্ষিক জীবন।

মনুষ্যজগতে এই যৌথজীবন সহজ, সুন্দর ও কল্যাণকর করবার জন্যেই মানুষ আবহমানকাল ধরে নানা নিয়ম-নীতি আচার-আচরণ উদ্ভাবন করেছে। গড়েছে শাস্ত্র-সমাজ-সরকার। এমনি করে প্রয়োজনের তাগিদে তৈরি ও চালু হয়েছে দাম্পত্য, আর পারিজনিক, পারিবারিক, প্রাতিবেশিক, শাস্ত্রিক, সামাজিক ও প্রাশাসনিক রীতি-রেওয়াজ, বিধি-নিষেধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে এসব ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেই আত্মপ্রসারে হয়েছে আগ্রহী। অর্থাৎ কাউকে ভালোবাসার স্বীকৃতির ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার অঙ্গীকার। সে-কিছু স্বরূপে ভোগ্য বা উপভোগ্য কিছু— যা ধন-মান-যশ কিংবা গুণ-জ্ঞান-মাহাত্ম্য অথবা প্রভাব-প্রতাপ-প্রমোদরূপে কাম্য ও প্রাপ্য হয়ে ওঠে কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী মানুষের। অন্যরা ইহাকে সংকীর্ণ ও সীমিত রাখে। তারাই নিরীহ কিংবা 'ইতর' বলে উপেক্ষিত ও অনাদৃত।

তাই দুনিয়াটা এ তাৎপর্যে কিছু লোকেরই লীলাক্ষেত্র। শাস্ত্র-সমাজ-সরকার তাদেরই ইচ্ছায়, স্বার্থে ও প্রয়োজনে উদ্ভাবিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়।

এ শ্রেণীর মানুষ থেকেই শাস্ত্রকার, সমাজ-সরদার ও রাষ্ট্রনেতার উদ্ভব। তাদেরই গুণ-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-চারিত্র্য অনুযায়ী গণকল্যাণ লক্ষ্যে তারা নীতি-আদর্শ স্থির করে তার বাস্তবায়নে হয় অগ্রসর।

স্বদেশ-স্বধর্ম-স্বজাতি ও স্বরাষ্ট্রে তারা স্ব স্ব চিন্তা-চেতনা-মন-বুদ্ধি অনুগ করে গড়তে কিংবা মেরামত করতে চায়। আত্মপ্রত্যয় বেশি বলে স্ববুদ্ধির স্বল্পতা সম্বন্ধে তারা সচেতন থাকে না, তাই তাদের হিতবুদ্ধি প্রায়ই বিপরীত ফল দান করে। লক্ষ্য যদি দেশ-কাল-জাত-ধর্মগত হয়—নিরবধিকালের নির্বিশেষ মানবহিতৈষণা যদি অঙ্গীকারভূত না হয়—অর্থাৎ দৃষ্টি ও লক্ষ্য যদি মানবিক ও সামগ্রিক না হয়— তা হলে এ ভুল এড়ানো কোনো মর্ত্যমানবের পক্ষেই সম্ভব নয়।

কুরআনের শিক্ষায় পার্থিব বিষয়ে সামাজিক জীবনে মানবিক সম্পর্ক ও সমস্যা এবং ব্যক্তির মানব-সম্পর্কিত প্রাত্যহিক কর্ম ও আচরণ মুখ্য হওয়ায়, এবং ওহি নাজেলের সমকালে নবমতাবলম্বীর বৈষয়িক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি সমান্তরাল হওয়ায়, উপরন্তু রসুলও গৃহীমানুষ হওয়ায় উত্তরকালের মুসলিম মনে শাস্ত্রানুগত্য এবং বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উন্নতি অভিন্নার্থক বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে মুসলমানরা শাস্ত্রানুগত্য জাগতিক জীবনে চাওয়া-পাওয়া-সম্পৃক্ত সমস্যার স্বতোসমাধান বলেই মানে। তাই বৈষয়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে শঙ্কা-সঙ্কট সমস্যা অনুভূত হলেই ক্রুশাশ্রয়ী খ্রিস্টানের মতো মুসলমানরাও উদ্ভব-যুগের শাস্ত্রানুগত মুসলিমের সৌভাগ্য-সুখ স্মরণ করে। আর তারই পুনরাবর্তন কামনা করে—অর্থাৎ তারা অতীত পরিবেশেই স্বস্তি কামনা করে— ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন দেখে না। কিন্তু এর মধ্যে যে একটা মস্ত ভুলের বীজ ও ফাঁকির ফাঁক থেকে যায়, তা তাদের দৃষ্টি এড়ায়; অতীত যেমন কখনো বর্তমানের নবোদ্ভূত চাহিদা পূরণ করতে পারে না, তেমনি পারে না ভবিষ্যতের পথ তৈরি করতে। সম্মুখে দেখার ও চলার জন্যে—অগ্রগতির জন্যেই চোখের দৃষ্টি ও পায়ের পাতা সামনের দিকে স্বতো-প্রসারিত।

অন্য প্রসঙ্গে আবু সায়ীদ আইয়ুবের একটি মন্তব্য অতীতপ্রীতি ও ঐতিহ্যাভিভূতির এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তিনি বলেন : "কিন্তু বর্তমান পুরুষের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনের দর্শন সাধনার আদি এবং অন্ত যদি হয় পূর্বপুরুষের মহৎ সৃষ্টির উদঘাটন এবং প্রচার, তবে সেটা বড় করুণ ব্যাপার হবে— কোনো পঞ্চাশ-উত্তর বিগতরূপার আপন পঁচিশ বছর বয়সের প্রশংসনীয় রূপলাবণ্যের কথা প্রসঙ্গত ও অপ্রসঙ্গত বলা এবং সেই বয়সের ফিকে হয়ে আসা ফোটোখানা এ্যালবাম থেকে খুঁজে বার করে সবাইকে দেখানোর মতনই নিষ্করুণ।" (পথের শেষ কোথায়, P. 15)

আমাদের স্বদেশে স্বকালে স্বসমস্যার তথায় স্ব-চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই বাঁচার অবলম্বন ও উপলক্ষ নির্দিষ্ট করে বাঁচার অঙ্গীকার গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল আমরা বাঁচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিপ্রেত পথ খুঁজে পাব। প্রত্যয় ও প্রত্যাশারিক্ত জীবন জীবন নয়—জীবনের ভৌতিক ছায়া মাত্র। জিজ্ঞাসা ও তৃষ্ণাই জীবনের প্রতি অনুরাগ বাড়ায়, শক্তি যোগায়, আনন্দিত প্রেরণা জাগায়। যাদেরকে এবং যে-কিছুকে আমরা ভালোবাসি; যাদের এবং যে-কিছুর হয়ে ও জন্যে আমরা বাঁচি; তাদের এবং সে-কিছুর জন্যেই এ আবশ্যিক।

আর্তমানবতার প্রতি মানববাদীর দায়িত্ব

আন্তর্জাতিক রাজনীতিক সংজ্ঞায় আমাদের রাষ্ট্র হচ্ছে উন্নয়নকামী একটি অনুন্নত দেশ এবং আর্থিক সংজ্ঞায় আমাদের রাষ্ট্র বিশ্বের দরিদ্রতম দেশ। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক শাসনে ছিল বলে এদেশের নগণ্য সংখ্যক মানুষ প্রতীচ্য জীবন-ভাবনার ও জীবনযাত্রার অনুসারী হয়েছে। তারা শাস্ত্র-শাসিত জীবনে মধ্যযুগীয়, দর্প-দাপটে সামন্তিক এবং সংস্কৃতি সেবায় বুর্জোয়া। ফলে এখানকার শিক্ষিত মাত্রই বিশ্লিষ্ট সত্তার (split personality-র) শিকার।

এখানে ধনীরাই রাজনীতি করে। কিছু বিদ্যা, কিছু বুদ্ধি, অশেষ লোভ এবং অপরিমেয় আত্মাদর নিয়ে এরা আসরে নামে। পৈতৃক সম্পদ কিংবা স্বোপার্জিত ধনের বলে এখানে যারা য়ুরোপীয় আদলে গণতান্ত্রিক কিংবা একনায়কত্বমূলক শাসন চালায়, তারা সাধারণত সামন্ত ঔপনিবেশিক মানসের উত্তরাধিকারী। এদের লিপ্সা ধনে-যশে মানে। কিন্তু তা যে বহুজন হিতে এবং বহুজন সেবায় লভ্য, তা তাদের বোধগত নয়। তারা আপাত সহজ সাধক। নিঃস্ব, নিরক্ষর, নিরন্ন মানুষদের কাউকে কথায়, কাউকে অঙ্গীকারে বশ ও বিভ্রান্ত করে, মানুষের মনে স্বপ্ন ও আশা জাগিয়ে, তাদের দুঃখ মোচনের আশ্বাস দিয়ে এরা ভোট যোগাড় করে। এরা স্বভাবে শঠ, পেশায় প্রতারক এবং শ্রেণী হিসেবে শোষক। এরা ছদ্ম দেশপ্রেমিক, এরা ভণ্ড গণসেবক, এদের বুকে আত্মরতি, মুখে পরপ্রীতির বুলি। 'বোল' ও 'ভোল' এদের রাজনৈতিক মূলধন। এদের রাজনীতির পুঁজি গণমানবের দুঃখে মায়াকান্না, সরকারি অপকর্মে কৃত্রিম ক্ষোভ এবং সর্বদুঃখ মোচনের উচ্চারিত অঙ্গীকার। বাকব্রহ্মের সাহায্যে ক্ষোভের উত্তেজনা সঞ্চার করে, আশার মরীচিকা জাগিয়ে আশ্বাসের বীজ বুনে, মোহের 'চার' ছড়িয়ে এরা জনপ্রিয় নেতা হয়। একবার শাসনক্ষমতা পেলে আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির বেড়া ভেঙে এরা সকলে স্বজনে মিলে অর্থ-সম্পদ ও আয়-উন্নতি কাড়াকাড়ি ও ভাগাভাগি করে লুট করে। তারপর ক্ষমতায় আসে আর-একদল। শাসনক্ষমতা আবর্তিত হয় সামরিক ও বেসামরিক দলের মধ্যে।

যেহেতু উন্নয়নকামী দেশগুলো অর্থে ও অস্ত্রে দুর্বল ও নিঃস্ব, তাদের মুরুব্বি হয় যে-কোনো এক সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি। তাই দেশী শাসকের প্রকাশ্য দর্প-দাপটের অভিনয়ের নেপথ্যে থাকে সূত্রধর বিদেশী প্রভু, স্বেচ্ছা-নৃত্যের আড়ালে থাকে প্রযোজক ও পরিচালক প্রভু। বিশেষ দেশ-কাল-মানুষ এই রাজনীতিকদের চিন্তার ও কর্মের নিমিত্ত ও উপলক্ষ বটে, কিন্তু তাদের মতিগতি ও মতলব দেশ-কাল-মানুষ নিরপেক্ষ। তারা কেবল স্ব ও স্বজনের জন্যেই বাঁচে।

এইজন্যেই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতি থাকলেও রাষ্ট্রচিন্তা থাকে না। এখানে নিয়ম আছে, নীতি নেই; আইন ছাপিয়ে আদেশ ও অধ্যাদেশ হয় প্রবল। এখানে প্রবলদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসনে অধিকার থাকে, পালনের দায়িত্ব থাকে না; শোষণের অধিকার থাকে, পোষণের দায় থাকে না। কাজেই দেশের মানুষ তাদের চোখে ভোগ্য-উপভোগ্যের যোগানদার মাত্র এবং কৃচিৎ কোনোদিন ভোটার।

সাম্রাজ্যবাদীর অনুগ্রহলুব্ধ এমন রাজনীতিক দল বা সাম্রাজ্যবাদীর অর্থপুষ্ট ও অস্ত্রনির্ভর এমন শাসকগোষ্ঠী তথা সরকার কখনো রাষ্ট্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ়, আমলাকে নীতিনিষ্ঠ, শাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দেশকে অর্থসম্পদে স্বয়ম্ভর এবং মানুষের জীবন-জীবিকাকে নিরাপদ সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ করতে পারে না। পারে না মানুষের মৌলিক ও মানবিক অধিকার অবাধ করতে, পারে না বিরুদ্ধ মতাদর্শ সহ্য করতে, পারে না আত্মস্থিতি সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হতে। তাই এমন দেশে গণমানবের কোনো দুঃখই ঘুচে না, কোনো শঙ্কাই দূর হয় না। কোনো সঙ্কটই কাটে না। অন্ন সঙ্কট, প্রাণ সঙ্কট, অর্থ সঙ্কট, শাসন সঙ্কট, স্বস্তি সঙ্কট, চরিত্র সঙ্কট— সব রকমেরই জীবন-সঙ্কট জগদ্দল হয়ে চেপে বসে। এমন পরিবেশ মানুষের নৈতিক, আর্থিক, সামাজিক, মানবিক, ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিকাশ-বিবর্তন প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। নিরক্ষরতায় পঙ্গু তথাকথিত উন্নয়নশীল অনুন্নত দেশে লুঠেরা শাসকশ্রেণীর প্রশ্রয়ে গাঁ থেকে আসা নব শিক্ষিতদেরও লুটপাটের সুযোগ থাকে প্রায় অবাধ। তাই দুর্নীতিবাজের ও শোষকের দল ভারী থাকে এবং শহুরে শিক্ষিতের শাসিত-শোষিত এমন দেশে ভূঁইফোড় শিক্ষিতমাত্রই গেঁয়ো স্বজনের জ্ঞাতিত্ব ভুলে ধনী-মানী লোকের সান্নিধ্য ও স্বীকৃতি লোভে মরিয়া হয়ে ধন-মান বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় নামে। এমন মানুষ বিবেকদ্রোহী না হয়েই পারে না।

তবু শিক্ষিতদের যে-কয়জন বিবেকের নির্দেশে, প্রীতমানবতার আহ্বানে মানবপ্রীতি-বশে ধন-মান-যশের লোভ ত্যাগ করে দুঃখ, লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে বহুজনহিতে ও বহুজনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, তারা সংখ্যায় নগণ্য বলেই প্রবলপ্রতাপ প্রতারকদের মোকাবেলা করতে পারে না। তরুণ বয়সে যুঝে যুঝে ক্লান্ত, বিরক্ত ও ব্যর্থ হয়ে অনেকেই ধৈর্য হারিয়ে সরে পড়ে, কেউ কেউ দুরাত্মা দলে জুটেও যায় আত্মরতি বশে।

বাকি থাকে নগণ্য সংখ্যার উৎসর্গিতপ্রাণ সংগ্রামী, তারা জানে—জীবন মানে দুরাত্মা-দুর্নীতির সঙ্গে সন্ধি নয়, জীবন মানে দুর্জন ও অকল্যাণ বিনাশী সংগ্রাম; জীবন মানে অন্যায়-পীড়ন-শোষণের সঙ্গে সহাবস্থান নয়, জীবন মানে পীড়ন-শোষণ-অপ্রেম প্রতিরোধ, জীবন মানে অন্নে-আনন্দে-নিবাসে-নিদানে স্বচ্ছন্দে বাঁচা, জীবন মানে নিজের ও পরের হয়ে নিজের ও পরের জন্যে, নিজের ও পরের স্বার্থে সহিষ্ণুতায় ও সহযোগিতায় সহানুভূতির ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে বাঁচা।

মনে ও মননে, কর্মে ও আচরণে এ প্রয়োজন-চেতনার উদ্ভাসই সংস্কৃতি। এ লক্ষ্যে নিয়োজিত ও অভিব্যক্ত ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণই সংস্কৃতিমানতা। কাজেই ঘরে-ঘাটে, সমাজে-সরকারে, জীবিকায়-জীবনযাত্রায়, নীতি-নিয়মে, রীতি-রেওয়াজে, মনে-মননে, কর্মে-আচরণে অনধিকার বর্জনের ও স্বাধিকার বৃত্তে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ও রক্ষার দায়িত্ব ও গরজ হচ্ছে মানববাদী ও সমাজকর্মীর ও সংস্কৃতিসেবকের। সে-গুরুদায়িত্ব পালনের তাগিদেই আমাদের এই সংস্কৃতি ফ্রন্ট গঠন ও সংগ্রামী সংকল্প গ্রহণ। প্রতিকারে-প্রতিবাদে-প্রতিরোধে-প্রতিরক্ষায় কোনো সংগ্রাম শেষ হতে পারে না। তাই গঠনে নির্মাণে আবিষ্কারে উদ্ভাবনে জীবনের সম্ভাবনার, বিকাশের ও প্রসারের দিগন্ত বিস্তৃত করাও লক্ষ্য আমাদের। আঁকিয়ে-লিখিয়ে-গাইয়ে-বাজিয়ে-লড়িয়ে ছাড়াও যে-কোনো জীবিকার মানববাদী মাত্রকেই জনজীবনযাত্রার শরিক হিসাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সংস্কৃতিসেবী ও সংগ্রামী হতে হবে। এই অমানবিক দুর্ভোগ থেকে 'নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকার ও নিদান

মানসিকতার দিক দিয়ে সামন্ত ও বেনে-বুর্জোয়ার মধ্যে পার্থক্য সামান্য এবং সে-পার্থক্যের মূলে রয়েছে সংখ্যাল্পতা ও সংখ্যাধিক্য। সামন্ত ছিল লক্ষ-কোটিতে এক, তাই তার দর্প-দাপট ও হুকুম-হুমকি ছিল প্রকট ও বেপরোয়া। আর বেনে-বুর্জোয়া আছে লক্ষ লক্ষ, তাই দেশ-জাত-মানুষ-রাষ্ট্র বলতে ঐ শ্রেণীই হয় নির্দেশিত এবং দেশসুদ্ধ গণমানবের স্থিতি যেন ওদের ভোগ-উপভোগের যোগান দেয়ার জন্যেই।

সামন্তের নিজের এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগী ছিল না, সে ছিল স্বরাট। বেনে-বুর্জোয়ারা পাশাপাশি ও ঘেঁষাঘেঁষি করে বাস করে, তাই তাদের মধ্যে নিত্য-দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা। ভোগ-উপভোগের সুযোগ-সুবিধা ও সামগ্রী নিয়ে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি এড়ানো সম্ভব হয় না। তাই প্রবল বঞ্চকের লোভের হস্তের সম্প্রসারণ সীমিত রাখার লক্ষ্যে দুর্বল বঞ্চকরা কিছু ন্যায়-নীতি-আদর্শের কথা উচ্চারণ করে এবং মেনে চলারও অঙ্গীকার করে। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা পেলে প্রবল ও দুর্বল বঞ্চক সমভাবে লঙ্ঘন করে সে-অঙ্গীকার। দুনিয়ার সর্বত্র সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানী স্বার্থপর দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রভ্রষ্ট বিবেকরিক্ত মানুষ চিরদিন ছিল ও থাকবে। পারিবেশিক ও প্রাশাসনিক কারণে কোথাও তারা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়, কোথাও আবার সুযোগের অভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। আজকে উন্নয়নশীল দেশে গণমানবের অজ্ঞতার, নিরক্ষরতার ও নিঃস্বতার সুযোগ নিয়ে মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত অথচ গণমানবশ্রেণী থেকে উত্থিত ভূঁইফোড় ও বিশ্লিষ্ট উঠতি শিক্ষিত শহুরে বেনে-বুর্জোয়ারা ক্ষুধিত শ্বাপদের মতো সম্পদ-সংগ্রহে প্রলুব্ধ ও অমনচিত্ত। তাই লুটপাট, কাড়াকাড়ি এবং তজ্জাত রেষারেষি মারামারি প্রবল ও প্রকট। ফলে পাপভীরু ও দ্বন্দ্ব-কাতর কিছু লোক ছাড়া সবাই সম্পদ ও সম্মান আহরণে তৎপর। গণমানব ও দ্বন্দ্বভীরু মধ্যবিত্ত তাদের শোষণ-পীড়নের শিকার। এজন্যেই দুর্নীতি আর আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার রাষ্ট্রিক সংস্থা অভিন্নার্থক। এই ক্ষুধিত ও লিপ্সু বেনে-বুর্জোয়া-আমলা-ঠিকাদার সম্বন্ধে জনমত ও গণসিদ্ধান্ত তাই দুনিয়ার সর্বত্র নিম্নরূপ :

- দেশের দুর্দশার জন্যে শিক্ষিত লোকেরাই সবচেয়ে বেশি দায়ী।
- শিক্ষিত লোকদের কোনো চরিত্র নেই।
- শিক্ষিত লোকেরা সংকীর্ণচিত্ত, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব।
- শিক্ষিত লোকেরাই খারাপ কাজ সবচেয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে করে।
- পশুপ্রবৃত্তি শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই প্রবল।
- চাকরিজীবীরা দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন।
- আমলারা অমানুষ।
- বুদ্ধিজীবীরা আত্মবিক্রীত।
- সাংবাদিকেরা ধূর্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- অধ্যাপকেরা জ্ঞানপাপী, লোভী, দুর্নীতিবাজ, নীচমনা।
- কবি-শিল্পীরা মেরুদণ্ডহীন, বারবর্ণিতা তুল্য।
- রাজনীতিকরা ভাঁওতাবাজ, প্রতারক, স্বার্থশিকারী, সুবিধাবাদী।

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বিধৃত ('পারাপার' পত্রিকা, ১ম সংখ্যা ১৯৭৮, পৃ. ৯) এই 'গণরায়' সন্দেহের কিংবা তর্কের অবকাশ রাখে না যে বাঙলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীতে সৎমানুষ আজ নগণ্য ও দুর্লক্ষ্য। এর কারণসমূহ অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয় :

- মধ্যযুগে বাঙলাদেশ ছিল হিন্দু ভূঁইয়া-বেনে, আমলা-মহাজন শাসিত ও শোষিত।
- ব্রিটিশ আমলে বর্ধিষ্ণু অফিস-আদালতে, কলকারখানায় ও ব্যবসায়-ঠিকাদারিতে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর আধিপত্য ছিল অনুগামী মুসলিম অনুপ্রবেশের পক্ষে প্রবল বাধা।
- ফলে মধ্যযুগ থেকে ব্রিটিশ আমল অবধি বাঙলার দেশজ মুসলমান রইল নিঃস্ব, নিরক্ষর ও নির্জিত।
- পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা আকস্মিকভাবে ঐ শিক্ষিত স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের সম্পদ ও সম্মান আহরণ নির্দ্বন্দ্ব ও নির্বিঘ্ন করে দিল। ঐ শিক্ষিতরা ছিল দু'হাজার বছরে বঞ্চিত-শোষিত নিঃস্ব নিরক্ষর গণমানব ঘরের সন্তান কিন্তু জ্ঞাতিত্ব বিস্মৃত বা জ্ঞাতিত্ব বর্জনকামী। এই প্রথমবারের মতো তারা ভোগ্য-উপভোগ্য সামগ্রীসম্পদের অধিকার পাচ্ছিল, তাই ক্ষুধিত শ্বাপদের গরজে ও লিপ্সা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সম্পদ সংগ্রহে। এবং তারা হল জ্ঞাতিত্ববর্জনকামী শহুরে। ন্যায়-নীতি, ভালো-মন্দ, বিবেক-বিচার কোনোদিকেই সে লুব্ধচিত্ত ও প্রাপ্তি-সুখপ্রয়াসীরা লক্ষ্য করবার মতো স্বস্থ ছিল না।
- পাকিস্তানে যারা শিক্ষিত হয়ে শহরে আসছিল, তারা দেখল লুটপাট প্রায় শেষ এবং সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র সংকুচিত ও সীমিত হয়ে আসছে। তাই দাবির নবতরঙ্গ কম্পন জাগাল রাজনীতিতে এবং স্বাধিকার-চেতনা হল প্রবল। বাঙলাদেশে শিক্ষিতের স্বল্পতার সুযোগে পশ্চিমারা শিল্প-বাণিজ্যে, সামরিক বিভাগে ও অন্যান্য দপ্তরে জেঁকে বসেছিল। এবার উঠতি বাঙালিরা দাবি করল তাদের প্রাপ্য অংশ। বাঙলাদেশ হল।
- সুযোগ-বঞ্চিত শিক্ষিতরাও এবার বাঙলাদেশে তাদের অগ্রগামীদের অনুসরণে নামল লুটপাটে ও কাড়াকাড়িতে। আগে সুযোগ এসেছিল বিধর্মীদের দেশ ত্যাগের ফলে, এবার শহরের ও কলকারখানার সামান্যসংখ্যক বিভাষী বিতাড়নের সুযোগ ছাড়া তেমন কোনো সুযোগ ছিল না, অথচ শিক্ষিতেরা সংখ্যাধিক্যের দরুন সম্পদের প্রয়োজন ও লুঠের গরজ ছিল বহুগুণ বেশি; তাই স্বদেশে তথাকথিত স্বজনদেরই অন্ন ও আনন্দ, জান ও মাল হরণে হল তারা তৎপর।

এমনি অবস্থায় পরম যোগীও হয় প্রলুব্ধ। তাই শিক্ষিতমাত্রই হল সুযোগসন্ধানী, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও সম্পদলোভী। তাছাড়া ঐ লুঠবিরান, নিয়ম-শৃঙ্খলাবিরল সমাজে প্রাণ-পোষণের জন্যেও অসদুপায় গ্রহণের গরজ অনুভব করে, প্ররোচনা পায় পাপভীরু দ্বন্দ্ব-কাতর নিরীহ লোকেরাও।

তরঙ্গের মতো প্রতিবছরই গাঁ থেকে শিক্ষিত হয়ে সম্পদপ্রত্যাশী লোক আসবে শহরে। তারাও কিছু কিছু সুযোগ পাবে স্বল্পসময়ে সম্পদসংগ্রহের। তারও পরে যখন গণমানবের সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা অধিকাংশ হবে শিক্ষিত, তখন লুটপাটের সামগ্রী হবে দুর্লভ ও দুর্লক্ষ্য। তখন 'কাকের মাংস কাকে খাওয়ার' অবস্থা হবে সৃষ্ট, তখন রক্তলাল বিপ্লব হবে অবধারিত এবং তখন 'রক্তেই ফুটবে নবজীবনের ফুল', দল মেলবে নব সমাজের কিশলয়।

কিন্তু সে-অবস্থা এখনো অদূর কিংবা সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে এ অবস্থার আশু পরিবর্তন চাইলে জান-মাল ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে রাজনীতির মাঠে নামতে হবে মানববাদীদের কিংবা হিতবাদীদের।

চল্লিশোত্তর বাঙলায় সদ্য ও স্বল্পশিক্ষিত মুসলিম-সমাজে বামপন্থী রাজনীতি অনুপ্রবেশ করলেও বেকার শিক্ষিতের অভাবে তা' প্রসার লাভ করতে পারেনি। এমনকি যেসব কিশোর-তরুণ মানবিক আবেগবশে কিংবা আদর্শিক প্রেরণাবশে এ পথে পা বাড়িয়েছিল, তারাও সহজলভ্য সুখ-সম্পদের লোভের বশে কিংবা পারিবারিক দুঃখ-দৈন্যের তাগিদে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল— আপোস করেছিল সনাতন নিয়ম-নীতির সঙ্গে। কাজেই এতকাল মুসলিম-সমাজ বামপন্থায় রাজনীতির অনুকূল ছিল না। অকালে কৃত্রিম উপায়ে অপক্ব কলা-কাঁঠাল পাকানো সম্ভব হলেও সব ক্ষেত্রে সে-নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া কোনো কৃত্রিম উপায়ই অভীষ্ট স্বাভাবিক ফল দেয় না। তাই আজ অবধি স্বল্পসংখ্যার বামপন্থীরা কেবল খণ্ড ও ক্ষুদ্র হয়েছে, কোন্দল করেছে, আন্তরিক অভিপ্রায় সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারেনি।

আজ দেশে স্বল্পশিক্ষিত ও শিক্ষিত বেকার অনেক। মানবিক ও আদর্শিক প্রেরণায় এদের প্রবুদ্ধ করাও দুঃসাধ্য নয়। বাস্তব পরিবেশ অনুকূল, তেমন আন্তরিক ও সর্বাত্মক চেষ্টা হলে লক্ষ প্রাণে সংগ্রামী-চেতনা সঞ্চার করে দেয়া কঠিন কিছু নয়। প্রলুব্ধ করে নয়, প্রবর্তনা দিয়ে আহ্বান জানানো হবে— জেল জুলুম ও মৃত্যুবরণের পথে। কেননা প্রয়োজনমতো যে মরতে প্রস্তুত—বাঁচবার ও বাঁচাবার সামর্থ্য ও অধিকার কেবল তারই।

AMARBOI.COM

পয়লা মে'র ভাবনা

'প্রাণধারণ' আর 'জীবন' সমার্থক নয়। জীবনের অভিধা এক শব্দে নিরূপিত হতে পারে না। জীবন চিন্তা-চেতনার ও অভিব্যক্তির গতিময়তার ও প্রবহমানতার দ্যোতক। জীবন তাই অতুল্য সম্পদ ও সাধনাসাপেক্ষ শিল্প। অনুভূতির নিত্য বিকাশে জীবনের প্রসার ও সার্থকতা। তাই জীবন রচনার ও পরিচর্যার অপেক্ষা রাখে। অবহেলায় অরণ্য গড়ে ওঠে, কিন্তু বাগান পরিকল্পনা ও বিন্যাস-সৃষ্ট। অনভিপ্রেত ঘাস-গুল্ম সহজে জন্মে কিন্তু অভিপ্রেত তরুলতা প্রয়াস প্রযত্নের প্রসূন।

আজ বেঁচে থাকাই একটা সংগ্রাম-সাধ্য সমস্যা। বিপন্ন অস্তিত্বে জীবনের অর্থ ও জৌলুস অনুপস্থিত। তাই প্রাণধারণ একটা নির্লক্ষ্য বিড়ম্বনা মাত্র। জীবন আজ যন্ত্রণার আকর। অথচ দুঃখ-দুশ্চিন্তা-মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবন কত আনন্দের, আরামের ও সুখের! এমন সুন্দর জীবন যার, সে-ই চায় অমৃত, বলে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' আর বঞ্চিত জনেরা ভাবে— 'কী সুখে বাঁচিয়া রব, মরিলে যে স্বর্গ পাব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু জীবন এমনি দুর্বহ দুঃসহ ছিল না। রিরংসা-লালসা দৃপ্ত ভোগবাদী মানুষ একসময়ে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত জীবনে সুখী ছিল। বাহুবল ও মনোবল ছিল তার সম্বল। অরণ্যচারী মানুষ হাতিয়ার হাতে বাঘ-সিংহের মোকাবেলা করত। সেই বেপরোয়া জীবনে মানুষ খাবার প্রেরণায় খেত, আনন্দিত স্বপ্নে নিত্য নাচত-গাইত, আর মরবার সময়ে নির্ভীক চিত্তে মরতে জানত। প্রমাণে ও অনুমানে স্বীকৃত সাম্যের সেই কৌম ও গোত্রগত জীবন স্থূল ছিল বটে, দ্বন্দ্ব ও বিঘ্নবহুল ছিল বটে, কিন্তু শোষণ-পীড়ন ও পেষণ-মুক্ত মানুষ জীবনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল না।

তারপর হাতিয়ার ও জীবিকা-পদ্ধতির ক্রমোৎকর্ষ ও ক্রমোন্নয়নে জীবনযাত্রা যখন জটিল হল, তখন ঐ বিবর্তনের ধারায় ধনে-মানে-যশে কিছু বুদ্ধিমান লোকের হল উদ্বর্তন আর নিবর্তিত নির্জিত রইল অন্য সবাই, এই ব্যবস্থারই বহুকীর্তিত নাম সভ্যতা। গণমানবকে শোষণ-পীড়ন-বঞ্চনার অন্য নাম সভ্যতা। এই সভ্যতার উদ্ভাবন ও অবদান হচ্ছে নীতিশাস্ত্র, সমাজ ও সরকার। নৈতিক-শাস্ত্রিক-সামাজিক-প্রাশাসনিক সব নিয়মনীতিই ঐ উদ্বর্তিত মানুষের স্বার্থেই রচিত ও প্রবর্তিত। শাহ-সামন্তের রয়েছে পীড়নে-শোষণে ও হননে অবাধ অধিকার—তাতে নেই কোনো পাপ, নেই কোনো অপরাধ। কেননা বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, শক্তিই ন্যায়, তাই স্রষ্টাও সর্বশক্তিমান। কাজেই শক্তের ভক্ত না হলে বাঁচারও উপায় নেই কারো। শক্তিমানই ঈশ্বর। ঐ জীবিতেশ্বরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ-আরাম, মানব-যশ, গৌরব-গর্ব সেবাদাস গণমানবেরও—নিজের 'দুঃখ কিছু না গণি, তোমার কুশলে কুশল মানি'—এ বোধের উদ্ভব সভ্যতার উন্মেষকালে এবং এর লালন আজো প্রায় অব্যাহত। অবতারসম শাহ-সামন্তের সেবার ও উপভোগের জন্যেই বিশ্বজগৎ সৃষ্ট। কাজেই গণমানবের জীবনে ঈশ্বরের সেই অভিপ্রায় সফল হোক, তাঁর লীলা পূর্ণ হোক, সার্থক হোক—সমর্পিত চিত্ত গণমানবের এ সদিচ্ছাই অভিব্যক্তি পেয়ে আসছে। তাই তারা—

'স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন-খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।'

এমনি করে হাজার বছর কেটে গেছে, প্রতিবাদ করেনি কেউ, প্রতিকার চায়নি কখনো। আজ প্রশ্ন জাগে বঞ্চিত বুকে— সভ্যতা গণমানবকে কী দিয়েছে? তারা আজ উপলব্ধি করে—সভ্যতা গণমানবজীবনে অভিশাপ মাত্র। সে সভ্যতা-সৃষ্টির সহায় মাত্র, ভোক্তা নয়। তাজমহল তার প্রমূর্ত শ্রম বটে, কিন্তু নাম-যশ ও গৌরব-গর্ব শাহজাহানের। ইলিয়াড-ওডেসি-রামায়ণ-মহাভারত-আলেফলায়লায়-শাহনামায় তারা আছে শাহ-সামন্তের লিপ্সা-অসূয়া-রিরংসা চরিতার্থতার সহায় হিসেবে খাটবার ও মরবার জন্যেই। যুদ্ধে বা ঝড়ে, দুর্ভিক্ষে বা মারীতে ওরা লক্ষে লক্ষে মরে যখন, তখন অনুকম্পাবশেও একটি শব্দ উচ্চারণ করেন না কবিরা। তারা বুঝেছে—তাদের সৃষ্ট সভ্যতা-সংস্কৃতি শাহ-সামন্ত ও বুর্জোয়ার বিলাস-প্রসূন। কলা-শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-স্থাপত্য-ভাস্কর্য প্রভৃতি গণমানবের কী উপকারে এসেছে? তাই প্রলুব্ধ গণমানব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ প্রতিবাদে মুখর। প্রতিকারে প্রতিশ্রুত, প্রতিরোধে দুর্বার, প্রতিশোধে দুর্মদ। প্রত্যয়-দৃঢ় ও সংগ্রাম-দৃপ্ত কণ্ঠে তাদের উচ্চারিত হচ্ছে প্রত্যাশার বাণী–

'অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।'

মানবকাম্য আজ আর অমৃত নয়, মোক্ষ নয়, স্বর্গ সুখ নয়—কেবল অন্ন ও আনন্দ। মানবভোগ্য অন্ন ও আনন্দ যারা কাড়ে তাদের আর নিস্তার নেই। কারণ–

'ধূলি-কাদা-মাখা মানুষের শিশু
দলে দলে আজ করিছে ভীড়,
আপন প্রাপ্য অধিকার চায়
তার লাগি দিবে লাল রুধির।

—অতএব জয় সুনিশ্চিত।

আগেও কোনো কোনো শোষিত পীড়িত বুদ্ধিমান মানুষ বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। কোনো কোনো মানুষ সভ্যতার এ যাঁতাকলের পেষণ-কৌশল জেনেছে, পেষণ-যন্ত্রণাও মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। এর অমোঘতা বুঝেই সেসব নিরুপায় মানুষই উচ্চারণ করেছে একটি তত্ত্ব—জীবনই সংগ্রাম। দুর্বলচিত্ত বুদ্ধিমানের উপলব্ধির প্রসূন হচ্ছে– জীবনে আপোস প্রয়োজন, নইলে চলে না। সে আপোস হচ্ছে শাসন-শোষণ-পেষণের সঙ্গে, অন্যায়-অপ্রেম-অসত্যের সঙ্গে, জোর-জুলুম-যন্ত্রণার সঙ্গে। নইলে অস্তিত্বই থাকে সেক্ষেত্রে বিপন্ন, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে জীবিকার সংগ্রাম নিরর্থক।

আমরা এযাবৎ দেখেছি, life is struggle—জীবন নামান্তরে সংগ্রাম মাত্র। struggle for existence—অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই; কিংবা Life is a compromise between good and evil, right and wrong, truth and falsehood—ভালো-মন্দের, ন্যায়-অন্যায়ের ও সত্য-মিথ্যার আপোসভিত্তিক জীবন। এসব তত্ত্ব অঙ্গীকার করেও মানুষ নিরুপদ্রবে বাঁচতে পারেনি।

আজ নতুন প্রত্যয় প্রয়োজন, আজ জানতে ও মানতে হবে যে—Life is protest, life is resistence against oppression and exploitation—আজ প্রতিবাদে-প্রতিরোধে বাঁচতে হবে। প্রতিকার-প্রতিশোধ মিলবে কেবল ঐ তত্ত্ব অঙ্গীকার করেই। আজকের প্রতিবাদ-প্রতিশোধ চলবে দৌরাত্ম্যের, দুর্বলতার ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম-অসৌজন্য-অমানবিকতার বিরুদ্ধে। আত্মশক্তিতে আস্থাই ঐ প্রতিকার-প্রতিরোধ-বাঞ্ছার ও প্রয়াসের উৎস। আজ প্রত্যয়-দৃঢ় উচ্চকণ্ঠে তাদের—

'ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে
যখনই জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার;
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ শাসক-শোষকরাও জানে—'দিনে দিনে বাড়িতেছে দেনা/শুধিতে হইবে ঋণ।' কাজেই মানস-প্রস্তুতি তাদেরও রয়েছে। মেহনতি মানুষের রক্তলাল প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ঐতিহ্যের স্মারক মে-দিবসে গণমানবের জীবনচেতনার বিকাশ ও সংগ্রামী প্রত্যয়ের দৃঢ়তা কামনা করি।

আজকের তৃতীয় বিশ্ব

আমরা চার বছর কাটিয়েছি স্বাধীন হয়েছি—এ আনন্দে। দু'বছর কাটালাম আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন— এ ধুয়া তুলে। ইতোমধ্যে চার বছর অতিবাহিত করেছি দুর্জন দুরাত্মার লুটপাট, কাড়াকাড়ি ও হানাহানির শিকার হয়ে। দু'বছর চলে গেল বহিঃশত্রুর হামলার আশঙ্কায় ও অভ্যন্তরীণ ত্রাসে ও অনিশ্চয়তায়। আর তার ফাঁকে ফাঁকে জেঁকে বসেছে মর্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা।

চার বছর আমাদের স্বাধীনতা-পাইয়ে-দেয়া মুরুব্বি ছিল রুশ-ভারত। গত দু'বছর ধরে আমাদের খোরপোষের মালিক ও মুরুব্বি হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। রুশ-ভারত আজ আমাদের স্বাধীনতার ও সার্বভৌম সত্তার শত্রু। মার্কিনেরা আজ আমাদের দরদী অভিভাবক। এতে অন্যায়-অসঙ্গতি অবশ্যই কিছু নেই। কেননা রাজনীতিতে চিরমিত্র কিংবা চিরশত্রু বলে কেউ নেই।

তবু অনুগত দেশের এ কৃতঘ্নতায় রুশ-ভারত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট। তাই তাদের ষড়যন্ত্র দেশের প্রতি হুমকিস্বরূপ। আজকের আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল। তাই এসব দেশ একমুহূর্তও মুরুব্বিশূন্য থাকতে পারে না। জলবায়ুর মতোই বিনা আহ্বানে প্রাকৃতিক নিয়মেই এক পরাশক্তির বিদায়ে অন্য পরাশক্তি প্রায় উড়ে এসে ঘাড় জুড়ে বসে।

এর কারণ প্রাক্তন সামন্ত-ঔপনিবেশিক শোষণ-পেষণমুক্ত কিন্তু অশিক্ষা ও দারিদ্র্যদুষ্ট এসব রাষ্ট্রে যারা রাজনীতি করে এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তারা ছদ্ম দেশপ্রেমিক ও সামন্ত-ঔপনিবেশিক মানসের উত্তরাধিকারী এবং মান-যশ ও দর্প-দাপটলিপ্সু কতগুলো বিবেকহীন মানুষ। দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে যে নগণ্যসংখ্যক শিক্ষিত মানববাদী দেশকর্মী থাকে, তারা আন্দোলন করে বটে, কিন্তু ঐ ক্ষমতাপ্রিয় বাক্‌পটু নির্মম ধনী প্রতারকদের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

তারা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন তারা মানুষ বেচাকেনার দোকান খোলে এবং লাভ-লোভ-প্রলোভনের ফাঁদ পাতে। এর জন্যে দরকার অর্থের, সে-অর্থ আসে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি থেকে। এ পরাশক্তি রাজনীতি-ক্ষেত্রে একাধারে বেনে ও মহাজন, টাউট ও আনুগত্যকামী ক্ষমতালিপ্সু মনিব। কাজেই অনুন্নত রাষ্ট্রের সরকার ও শাসক হয় বিদেশী প্রভুর ও মুরুব্বির পুতুল। প্রকাশ্য মঞ্চে স্বদেশী শাসকের অভিনয় ও অভিব্যক্তি দেখা যায় বটে, কিন্তু সূত্র ও কণ্ঠ থাকে নেপথ্যে।

দেশপ্রেম তথা মানবপ্রেম নেই বলে এসব দেশের সরকার হিতৈষণার হিতবুদ্ধি দিয়ে চালিত হয় না। স্বস্বার্থে যখন-তখন যার-তার কাছে আত্মবিক্রয় করে, তাই মুরুব্বির অভিপ্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ইঙ্গিত অনুসারে ক্ষণে ক্ষণে তারা 'ভোল' পাল্টায় ও 'বোল' বদলায়। তারা পরিণামের পরওয়া করে না, কেবল উমর খৈয়ামী দর্শনে আস্থা রাখে—'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও। বাকির খাতায় শূন্য থাক।' ফলে এসব দেশের গণমানব জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্লক্ষ্য অনিশ্চয়তারও কালিক বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং জনজীবন কেবলই আবর্তিত হয়, অগ্রসর হয় না কখনো। শিক্ষিত গণদরদীদের আন্দোলনে কখনো কিছুদিনের জন্যে গণপ্রতিনিধির গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও যেহেতু নির্বাচনে বিত্তবান প্রতারণাকুশল বাক্‌পটু ছদ্মগণসেবকরাই প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, সেহেতু শাসক হওয়ামাত্রই তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের ধনলিপ্সা মেটানো, তাদের মান-যশের দাবি স্বীকার করা, জুলুম-হুমকির চোট সহ্য করা, তাদের স্বেচ্ছাচারের চাপ বহন করা গণমানবের পক্ষে অল্পকালের মধ্যেই অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন গণ-অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে সামরিক শক্তি শাসনক্ষমতা হাতে নেয় এবং সেই শুভমুহূর্তেই ঘোষণা করে—"ছয় মাস কিংবা বছরকালের মধ্যেই আদর্শ এক নতুন সংবিধান বা শাসনতন্ত্র তৈরি করে নির্বাচন দিয়ে জনগণের হাতে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দেয়া হবে।"

তারপর বছরের পর বছর ধরে চলে ছলচাতুরীর লীলা—নানা অযৌক্তিক অজুহাত। ফলে সামরিক শাসন আর সাময়িক থাকে না। এর মধ্যে কোথাও কোথাও এবং কখনো কখনো প্রতি-অভ্যুত্থানও ঘটে নিজেদের মধ্যে। ফলে হয় সবকিছুর পুনরাবৃত্তি। 'খাড়া বড়ি-থোর আর থোর-বড়ি খাড়া'-র সেই বৃত্তান্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামে সামন্ত-ঔপনিবেশিক প্রতিবেশে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রগুলোর সর্বত্র এ নীতি বা রীতি অমোঘ হয়ে আবর্তিত হচ্ছে—ব্যতিক্রম দুর্লক্ষ্য এবং এ অবস্থার লালনে-পোষণে সামন্ত-বুর্জোয়ারা সদাসতর্ক, কারণ তারা কেবল নিজেদের স্বার্থে নিজেদের জন্যে বাঁচে। অভিন্ন স্বার্থে ও অভিন্ন লক্ষ্যে সামন্ত-বেনে-বুর্জোয়ারা হাত মিলায়। সৈনিকে আমলায় ঘটে মিতালি। এর মূলে যে-তত্ত্ব রয়েছে তা এই—সামন্ত-বেনে-বুর্জোয়া-আমলারা স্ব-স্বার্থেই প্রাচীন স্বৈরাচারী রাজার ঐতিহ্য চালু রাখায় থাকে আগ্রহী, আর শিক্ষিত স্বল্পবিত্তের গণমানব আধুনিক প্রতীচ্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে মানবিক ও মৌলিক অধিকার লাভে হয় উৎসাহী। যেহেতু স্বাধিকারকামী বিক্ষুব্ধ শিক্ষিতের সংখ্যা অনুন্নত দেশে আজো আনুপাতিক হারে নগণ্য, সেহেতু ধনবলে ক্রীত জনবলে বলীয়ান হয়ে কায়েমী স্বার্থবাদী দুর্জন-দুরাত্মাই থাকে প্রবল ও প্রতিপত্তির অধিকারী এবং স্ব-স্বার্থেই তারা হয় বিদেশী শক্তির আজ্ঞাবহ মুৎসুদ্দি বা কম্প্রেডর। তাদের এই অভিন্ন চিত্র, চারিত্র্য ও অবস্থান আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্র মেলে। তাদের এ অবস্থান অবিচল রাখার লক্ষ্যেই তারা বিদেশী প্রভুর ইঙ্গিতে ও পরামর্শে জনগণকে নিরক্ষর রাখায় সদাসচেষ্ট।

এমনকি অনুন্নত দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আর্থিক, সামরিক, সামাজিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক উন্নয়নের পদ্ধতি-পরিকল্পনাও অভিন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও তার অনুগত রাষ্ট্ররাশির কবলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও তার শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে ও প্রত্যক্ষভাবে যেসব তথাকথিত ঋণ, দান ও অনুদান মেলে তার বাহ্যাড়ম্বর চোখ ধাঁধানোর ও কৃতজ্ঞতায় মনগলানোর মতো বটে, কিন্তু তাতে থাকে টাউট-মহাজনসুলভ লিপ্সা ও প্রতারণার রাজনীতি। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বকে এরা অর্থে-বিত্তে বাঁচাতেও চায় না, মারতেও চায় না—কেবল কম্যুনিজমের প্রসার ঠেকানোর মতো করে গণমানবকে তথা রাষ্ট্রকে জীবন্মৃত অবস্থায় রাখতে প্রয়াসী। এজন্যেই মার্কিনরা দানে দেয় গম, অনুদানে গড়ায় বিলাস-ব্যসনের ব্যবস্থা আর ঋণ খাটায় অনুৎপাদক অথচ আপাত-রম্য নানা প্রকল্পে। গ্রাম-ইউনিয়ন-থানা উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষিঋণ, জন্মনিয়ন্ত্রণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Non-formal education. প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা না করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, শহরে-গ্রামে-গঞ্জে নানা অপ্রয়োজনীয় সেমিনার, সম্মেলন, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, শাস্ত্রানুগত্যে উৎসাহ দান প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত। ফলে দালানে দপ্তরে শিক্ষিতজনের চাকরি সংস্থানে তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলো আধুনিক বটে, কিন্তু আর্থিক শৈক্ষিক সামরিক উন্নতি থাকে অলভ্য।

সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তের ও আমলাদের অর্থাগমের ব্যবস্থা ও সুযোগ করে দিয়ে তাদেরকে ভোগে-উপভোগে মগ্ন রাখা আর গাঁয়ের গঞ্জের সচ্ছল চাষী ও সাক্ষর স্বল্পবিত্ত মাতব্বর শ্রেণীর টাউটদের অর্থ আত্মসাতের নানা সুযোগ করে দিয়ে তুষ্ট রাখা। এই সুবিধাভোগীদের দিয়েই গরিবের বিদ্রোহ-বিপ্লব ঠেকানো সম্ভব বলেই তারা মানে। তৃতীয় বিশ্বের শহরগুলো উঠতি বেনে-বুর্জোয়া-আমলা-ঠিকাদারদের গাড়িতে বাড়িতে আকীর্ণ। ভোগ্যপণ্য মাত্রই আমদানি হয় তাদের প্রয়োজনেই।—সবটাই প্রত্যক্ষে পরোক্ষে মার্কিনদের দান। তুলনায় গণমানব আজো নিঃস্ব ও আরণ্য। সম্প্রতি মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াও অনুন্নত দেশে এ পথ ধরেছে; ১৯৭১-উত্তর বাঙলাদেশে লুটপাটে প্রশ্রয়দানই তার নজির। উঠতেও দেবে না, পড়তেও দেবে না—বন্ধুর আবেগে আলিঙ্গন-ছলে অজগর-অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে পেঁচিয়ে এমন হাড়-মাংস গুঁড়ো করে-দেয়া প্রেম অতুল্য ও অভাবিত বটে! অপকার করেও অপরিহার্য হয়ে ওঠার এমন অত্যাশ্চর্য ও সূক্ষ্ম নৈপুণ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে মুখ্যত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই অবদান।

মনে হয় এর চেয়ে প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শাসনই ছিল ভালো। দাস-বশ রূপে নিঃস্ব কিন্তু দেশ-দশের প্রতি দায়িত্বহীন প্রভুনির্ভর নিশ্চিত ছিল সে-জীবন।

শাসন-শোষণের অধিকারের সঙ্গে পালন-পোষণের ন্যূনতম দায়িত্বও তাদের স্বীকার করতে হত। পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদীরা সে-দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তথাকথিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দায়ে ত্রাস-শঙ্কা যন্ত্রণা-দীর্ণ, উদ্বেগ-উপদ্রবক্লিষ্ট, হুকুম-হুমকি লাঞ্ছিত, অন্ন-আনন্দরিক্ত গণজীবন আজ দুর্বহ।

AMARBOI.COM

সরকারের আহ্বানেই আসে সাম্রাজ্যবাদী শোষকরা। সরকারের প্রশ্রয়েই গড়ে ওঠে টাউট মুৎসুদ্দিরা। এ মুহূর্তেই বাঙলাদেশ শাসন-শোষণ করছে ২০/৩০ হাজার মানুষ। তারাই বেনে-আমলা-ঠিকাদার এবং সব অর্থসম্পদের ধারক, নিয়ামক ও মালিক। সাম্রাজ্যবাদীদের এজন্যে দুযে লাভ নেই। তৃতীয় বিশ্বের গণমানবের দুর্ভোগের মূলে রয়েছে দেশী অপ্রেমিকদের দেশের ওপর কর্তৃত্ব। এদের দমন বা নির্মূল করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদীদের সাধ্য থাকবে না দেশে প্রবেশ করার! আজ তাই তাদের সর্বাগ্রে সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে সেই কম্প্রেডর-এজেন্ট প্রভোকেট্যুরের বিরুদ্ধে। গণমানবের মুক্তি আসবে সে-পথেই।

শুভঙ্করের ফাঁকি

য়ুরোপীয় বুর্জোয়া অর্থনীতিকরা 'জাতীয় সম্পদ' ও 'মাথাপিছু আয়ের গড়'— এ দুটো মনভুলানো তত্ত্ব দুনিয়াব্যাপী জনপ্রিয় করেছেন। —উদ্দেশ্য গণমানবকে প্রতারিত করা। ব্রিটিশ আমলে আমার এক ভাই এ সূত্র ধরে বিদ্রূপ করে বলতেন—নিজাম, আগাখান ও আগাখানীদের বদৌলতে ভারতের মুসলমানের জাতীয় সম্পদ হিন্দুর সম্পদের ছয় গুণ, কাজেই ছাগলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় বাচ্চার মতো উল্লাসে নৃত্য করো। আজো বুর্জোয়া শাসক ও অর্থনীতিকরা দেশে দেশে Per Capita Income-এর হিসেব কষে এবং দেশ দুনিয়ার হাওয়াই আর্থিক সৌধ ও সম্পদ-মিনার তৈরি করে অজ্ঞ মানুষের জন্যে শুভঙ্করের ফাঁদ পাতে।

আমাদের জাতীয় সম্পদ এবং মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের বার্ষিক হিসেব হয়। যে-দেশে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ বছরে কয়েকমাস অর্ধাহারে বাঁচে, যে-দেশে কোটিখানেক লোকের প্রায় অনাহারে দিন কাটে, যেদেশে কয়েক বছর অন্তর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়, যে-দেশে সাত-আট লক্ষ মানুষ ভিক্ষাজীবী, যে-দেশে হাজার হাজার পুষ্টিরিক্ত মানুষ নিতান্ত সাধারণ রোগে বিনা চিকিৎসায় অকালে অপমৃত্যুর শিকার হয় এবং যে দেশে কয়েক হাজার লোক শোষণে-বাণিজ্যে-লুণ্ঠনে কিংবা বিদেশীর দানে-অনুদানে যদি অর্থসম্পদ বৃদ্ধিও করে এবং মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের হিসেবে যদি নিরন্ন ভিখারীরও কাগুজে আয় বৃদ্ধি পায়, তাহলে কি সমস্যা মেটে? অথচ এভাবেই আর্থিক ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতি-অবনতির চিত্র দেয়া হয়।

কিন্তু বাস্তব অবস্থা কী ? এ-মুহূর্তেও বাঙলাদেশে অন্তত সাত-আট লাখ ভিক্ষাজীবী মানুষ রয়েছে। শৈশব থেকেই যাদের আল্লাহর কাছে একমাত্র ও সার্বক্ষণিক প্রার্থনা 'আজ যেন ভিক্ষা মেলে, যেন অন্ন জোটে',— ধন-মান-যশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনন্দ প্রাপ্তির কল্পনা করাও যাদের জীবনে কখনো সম্ভব হয় না। সারাজীবন ধরে খাদ্যের অভাবে প্রাণ হারানোর এমন সার্বক্ষণিক শঙ্কায় শঙ্কিত আর কোন্ প্রাণী থাকে, এই নিঃস্ব মানুষ ছাড়া ? 'Man does not live by bread alone'—এ আপ্তবাক্য কি এদের জন্যেও উচ্চারিত ?

আজো আমাদের লক্ষ-কোটি ছাপোষা দিন-মজুরের ফজরের প্রার্থনা—'আল্লাহ, আজ যেন কাজ মেলে।' এবং বলা বাহুল্য এসব প্রার্থনা প্রায়ই পূরণ হয় না এবং প্রায়ই তাদের সপরিবার একবেলা উপোসে কিংবা দুবেলা আধপেটা খেয়ে বাঁচতে হয়। এবং এসব পুষ্টিহীন স্বল্পায়ু মানুষ অকালে অপমৃত্যুর আশ্রিত হয়। যে-কোনো হিসেবে দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষের স্বল্পকালীন জীবন কাটে এভাবেই এবং এ-খবর আমাদের এত জানা এবং পুরোনো বলেই তা আমাদের অনুভবে কিংবা মননে আর ঠাঁই পায় না।

তাই আমরা দেশ বলতে, জাত বলতে কিংবা মানুষ বলতে শিক্ষিত বিত্তবান কিংবা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদেরই নির্দেশ করি। আর সব মানুষের স্থিতি যেন এদেরই প্রয়োজন মেটানোর জন্যে— এদেরই ভোগ-উপভোগের যোগান দেয়ার জন্যে। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রকল্পে আমাদের আমদানিকৃত সামগ্রীর তালিকায় এ মানসিকতাই প্রকট। আমাদের প্রয়াস-প্রযত্ন শহর-সাজানোতেই নিবদ্ধ, গ্রামোন্নয়ন মিটিংকা বাত মাত্র। আমরা যখন রাজনীতি-কূটনীতির কথা বলি, আমরা যখন জাতীয় সম্পদ ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের কথা ভাবি, আমরা যখন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি-ইতিহাস-দর্শন-বিজ্ঞানের কথা আলোচনা করি, আমরা যখন মৌলিক অধিকারের দাবি জানাই, তখন ঐ বিত্তবান শহুরে শিক্ষিতজনের প্রয়োজনে ও স্বার্থেই তা করি।

আমাদর মন-মানস সামন্ত-যুগের। সে-যুগে রাজার স্ত্রী ও শ্রী, আর্তি ও ঋদ্ধি, শোক ও সুখ, যন্ত্রণা ও আনন্দ কাঙ্ক্ষারিক্ত প্রজারা রাজার হয়েই দর্শকরূপে অনুভব করে তুষ্ট থাকত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রূপকথাগুলো তার প্রমাণ। দাস-প্রভুতে বান্দা-মনিবে বিন্যস্ত সমাজে তা-ই ছিল স্বাভাবিক। রাজার দিগ্বিজয়ে, দর্প-দাপটে, রূপসী সম্ভোগে, নৃত্য-গীত-বাদ্য উপভোগে, মৃগয়াবিলাসে, পুষ্পিত উদ্যান ও ঊর্মি-সুন্দর সরোবর বেষ্টিত প্রাসাদজীবনের সুখে-ঐশ্বর্যে, হীরা-মণি-মুক্তা বিজড়িত পরিচ্ছদের ঝলকিত রূপে—অধিকার-চেতনা-বিরহী প্রজারা কল্পিত সুখ অনুভব করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজো শিক্ষিতদেরও অনেকেই সে-মানসিকতা লালন করে। তাই দেশের শাসক স্বাধীন ও সার্বভৌম হলেই তারা নিজেদের স্বাধীন মনে করে। বেনে-বুর্জোয়া-আমলা-ঠিকাদারদের ধনবৃদ্ধি জাতীয় ঋদ্ধি বলে মানে। Per Capita Income বৃদ্ধির কিংবা রপ্তানি বৃদ্ধির Index দেখে এ-শ্রেণীর নির্বোধ মানুষ হয় খুশি, স্বদেশের শোষক-শোষিত পীড়ক-পীড়িত সম্পর্কের কথা তাদের মনে জাগে না—একে তারা সৃষ্টির নিয়ম বলেই মানে।

শোষক-শোষিতের বঞ্চক-বঞ্চিতের দুর্জন-দুর্বলের অঘোষিত অবচেতন চিরকালীন দ্বন্দ্ব আজ সচেতন সংগ্রামে পরিণত হয়েছে, লড়াইও হয়েছে তীব্র, তবু তা তারা অনুভব না-করারই ভান করে। আজ যদিও স্বদেশী স্বজাতি স্বধর্মী শাসক শোষকের বিরুদ্ধে গণমানবের সুপরিকল্পিত সংগ্রাম দেশে দেশে শুরু হয়ে গেছে এবং আজ যে লড়াই জীবিকাক্ষেত্রেই নিবদ্ধ—এ তথ্য তবু তারা পরম তাচ্ছিল্যে উপেক্ষাই করে।

জাতীয় সম্পদের ও মাথাপিছু আয়ের Index যারা তৈরি করে, সে-অর্থনীতিকরা মনকে চোখ ঠাওরায়, স্বশ্রেণীর স্বার্থেই তারা ফাঁকির ফাঁক গোঁজামিলে পূরণ করতে চায়। তাদের Index-এর স্বরূপ 'মেসালে' এরূপ শহরের দালানগুলোতে প্রযুক্ত ইটগুলো গুনে মাথাপিছু ভাগ দেখিয়ে বলা প্রতিটি বাঙালি সত্তরখানা ইটের মালিক। অতএব বাঙালি মাত্রেরই গৃহনির্মাণের কিছু উপকরণ ইষ্টক। সুতরাং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। ইস্পাহানীর বাড়ির তিন ভৃত্য ও মালিকের মাথাপিছু মাসিক আয় যেমন গড়ে পনেরো লক্ষ টাকা বলে স্বীকার করা।

কিন্তু এ কুয়াশা বেনে-বুর্জোয়া-আমলা কতকাল আর টিকিয়ে রাখবে, সোনার পাথরবাটি তৈরির আশ্বাস দিয়ে, গণঅসন্তোষ আর কতদিন ঠেকিয়ে রাখবে, প্রতারণার পেশা কি চিরকাল চলে?

আজ মানুষ নিরক্ষর ও নিঃস্ব বটে, কিন্তু নির্বোধ নেই কেউ, এখন তারা জেনেছে তাদের দুর্ভোগের মূলে কী এবং কারা ? উৎপাদনে শ্রম কার, উৎপন্নে উপভোগাধিকার কার ? আজ সামন্তসমাজ বিলুপ্ত। ব্যক্তিজীবনে ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব আজ যুগদাবি। উৎপাদন, উৎপাদক ও উৎপন্নের গুরুত্ব ও সম্পর্ক-চেতনাই হবে আজ সামাজিক ন্যায়-নীতির ভিত্তি ও উৎস। কাজেই দেশ-জাত-সমাজ-রাষ্ট্রের নামে বিশেষ শ্রেণীর সমৃদ্ধি নয়—ব্যক্তিমানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই আজকের গণমানবের দাবি। এজন্যে চাই জনজীবনযাত্রায় আত্মপ্রসারের সমাধিকার, জীবিকার্জনের জন্যে যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থান —অন্নে আনন্দে নিবাসে নিদানে মানবাধিকার। মানববাদী মাত্রেরই আপাত-দায়িত্ব ও কর্তব্য তাই সাম্রাজ্যবাদীর ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা এবং মানবদুর্ভোগ মোচনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

অসাফল্যের গোড়ার কথা
[একটি বিশ্বজরিপ]

হাতিয়ারই-যে অন্য প্রাণী থেকে মানুষকে স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ করেছে সে-তথ্য আজ আর অস্বীকৃত নয়। মনুষ্যসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিকথাও যে নামান্তরে হাতিয়ারের তথা জীবনযাত্রার উপকরণের ও জীবিকাপদ্ধতির বিবর্তন ধারারই ইতিবৃত্ত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উনিশ-বিশ শতকের প্রতীচ্যজগতের বা দুনিয়ার ইতিহাসই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাববাদী কবি রবীন্দ্রনাথও অবচেতন মনে এ-সময়কার পরিবর্তন অনুভব করেছিলেন, কিন্তু হাতিয়ারতত্ত্বে ও শ্রেণীদ্বন্দ্বের বিশ্বাসী ছিলেন না বলে তিনি কারণ-কার্য উপলব্ধি করেননি, কেবল অশুভ চেতনায় ব্যথিত হয়েছিলেন মাত্র। যেমন :

১. শক্তিদম্ভ স্বার্থ লোভ মারীর মতন
দেখিতে দেখিতে ঘিরিছে ভুবন।

—*নৈবেদ্য*, ৯২ সং কবিতা

২. শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী
ভয়ঙ্করী ...
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম। — ঐ ৬৪ সং ,,

৩. স্বার্থ যত পূর্ণ হয় লোভক্ষুধা
তত তার বেড়ে উঠে। — ঐ ৬৪ সং ,,

৪. আজ বরষার মেঘ হেরি মানবের মাঝে।—*গীতাঞ্জলি* ১০০ সং কবিতা।

আতঙ্কিত কবি এর অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধি করেননি। যেখনে সামন্ত ছিল এক, শিল্পবিপ্লবের ফলে সেখানে বুর্জোয়া হল লক্ষ; আর কৃৎকৌশলের ও যন্ত্রের উদ্ভাবনের, প্রসারের ও সর্বাত্মক ব্যবহারের ফলে স্বাধিকার-সচেতন গণমানুষ হল কোটি। হাতিয়ারের উৎকর্ষে ও প্রসারে জীবিকাক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন এল, তা-ই সামন্ত রীতি-রেওয়াজ ও সামন্তসমাজ ধ্বংস করল। দর্পদাপটের আধার এক সামন্তের স্থলে প্রভাব-প্রতিপত্তির আকর লক্ষ ধনীর সৃষ্টি হল। ভস্মীভূত মদনের মতো শক্তি হল বিকেন্দ্রী, বহু, বিবিধ ও বিচিত্র। এক রক্তবীজের বিনাশে হল লক্ষ রক্তবীজ। এরা হল ধন মান যশ ও বিত্ত-বেসাতের ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞান-প্রজ্ঞা বিদ্যা-বুদ্ধি এবং দর্প-দাপটও হল তাদের কাম্য।

আগে যা-কিছু হত শাহ-সামন্তের স্বার্থে ও অভিপ্রায়ে, একালে তা ঘটে বুর্জোয়াদের প্রয়োজনে ও অভিলাষে। যেহেতু বুর্জোয়া বা পুঁজিপতিরা সংখ্যায় বহু, তা-ই তাদের প্রয়োজন এবং অভিলাষও বহু, বিবিধ ও বিচিত্র। ফলে আবিষ্কার-উদ্ভাবন আর প্রয়োগ-প্রয়াসও হয়েছে প্রতিযোগিতামূলক।

এসব কারণে বলতে গেলে উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশেষ করে ১৮৭০ সনের পরের থেকে য়ুরোপে সামাজিক বিবর্তন দ্রুত এবং তজ্জাত রাজনীতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত তীব্রতর হচ্ছিল।

১. এ সময় থেকে রোগপ্রতিষেধক আবিষ্কারের ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি দ্রুততর হয় আর তার ফলে জীবিকার ও চাহিদার আনুপাতিক প্রসার ঘটে।

২. রোগ-বন্যা-খরা-ঝঞ্ঝা-দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধক্ষমতার বৃদ্ধি, কৃৎকৌশলের বিচিত্র বিকাশ, দূরত্বের ও অগম্যতার অবসান, বিশ্বচেতনার প্রসারপ্রসূত আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রের ও জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন এবং রাজনীতি ও সমাজক্ষেত্রে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মানবিক শক্তির ও সম্ভাবনার অসীম দিগন্ত মানুষকে সুখকর জীবনের প্রত্যাশী করে তোলে, আর তা পূরণের জন্যে সরকারকে আর্থিক উন্নতির পথ বেছে নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. আগ্নেয় অস্ত্রের উৎকর্ষ, কলকারখানার প্রসারসঞ্জাত পণ্যবৃদ্ধি, অর্থ-বিত্ত-বেসাতের প্রসারবাঞ্ছা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় শক্তির লিপ্সা ও দাপট বৃদ্ধি করায় রাষ্ট্রে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ জনপ্রিয় হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রাভ্যন্তরে ধন ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতার শ্রেণীগত অধিকারপ্রবণতা প্রবল হয়েছে। তাই ধনলিপ্সাজাত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ধনী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পৃথিবীগ্রাসের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে প্রবল আর তাই প্রতিযোগিতা, কূটনীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে তীব্র, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম; এরই ফলে সৈন্যবৃদ্ধি, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা, রাজনীতিক চাল, আর্থিক সাহায্য দুর্বলরাষ্ট্রে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্যে হয়েছে আবশ্যিক।

৪. শিল্প-বিপ্লবের অনুষঙ্গী হিসেবে সনাতন বৃত্তিজীবী সমাজে তথা কৃষক-শ্রমিক ও অন্যান্য মেহনতী শোষিত-বঞ্চিত-নিপীড়িত জনগণের মধ্যে শ্রেণীলভ্য-স্বাধিকারবোধ ও দাবি তীব্র ও তীক্ষ্ণ হচ্ছে, উনিশ শতকে এর উন্মেষ হলেও বিশ শতকে তা শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীসংগ্রাম রূপে দেশ-দুনিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

৫. ফলে সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে জীবনদৃষ্টির হয়েছে পরিবর্তন। তাই স্ব স্ব শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার গরজেই মানুষ একই স্থানে কালে বাস করেও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অসম, অসঙ্গত, বিপরীতধর্মী এমনকি স্ববিরোধী জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা অভিব্যক্ত করেছে। এ হচ্ছে দ্বান্দ্বিক সহাবস্থানের প্রসূন ও সাক্ষ্য। তাই জাতীয়তাবাদ, শাস্ত্রিক জীবনবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ, সমাজবাদ, একনায়কত্ববাদ, গণতন্ত্রবাদ, পুঁজিবাদ, শ্রেণী-শাসনবাদ প্রভৃতি যেমন চালু হয়েছে ও রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রে সামাজিক দায়িত্বের বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক কর্তব্যচেতনা, জাতীয়তাবোধে স্বরাষ্ট্রানুগত্যে প্রবণতা ও তজ্জাত আমলাতন্ত্রের প্রসার প্রভৃতি ব্যক্তিমানুষকে করেছে রাজনীতি ও অর্থনীতিসচেতন নাগরিক।

৬. এ সময়-পরিসরে ডারুইন-উদ্ভাবিত বিবর্তন-তত্ত্ব, প্রাকৃতবিজ্ঞানের তথ্য, সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যের প্রয়োগ প্রভৃতি সাধারণভাবে শিক্ষিত সচেতন মানুষের বিশ্বাসে-সংস্কারে বিচলন ঘটায়। ফলে নতুন চিন্তা-চেতনা মানুষকে চঞ্চল করে তোলে। এতে শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা, বিজ্ঞানে ভরসা, শিক্ষায় অনুরাগ, গণতন্ত্রে আগ্রহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে গুরুত্ব আর স্বায়ত্তশাসনে মুক্তির আশ্বাস জাগে। এ সময়েই সমাজ-নীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে মার্কসীয় দর্শন ও ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান; এগুলোর প্রতি পরোক্ষ আগ্রহ বৃদ্ধি করে নীটশে প্রচারিত নবমূল্যবোধের প্রয়োজনতত্ত্ব। তিনি জীবনে-সমাজে পুরোনো নীতি ও মূল্যবোধের পরিহার প্রয়োজনীয়তার ও নবযুগে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার আবশ্যিকতার উদ্‌গাতা। তাছাড়া রোগপ্রতিরোধের ঔষধাদির আবিষ্কার আর বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, যন্ত্রে অভাবিত উৎকর্ষ, যানবাহনের উৎকর্ষ ও বিচিত্র বিকাশ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী করে তোলে।

৭. ফলে পুরোনো রীতিনীতির আনুগত্য, প্রাশাসনিক দৌরাত্ম্য, শাস্ত্রপতির প্রভাব প্রভৃতি অতিক্রম করে শিক্ষিত সচেতন মানুষ সাহিত্যে-শিল্পে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে-রাজনীতিতে-সমাজচেতনায়-দর্শনে নবনব তত্ত্ব ও তথ্য প্রয়োগে নতুন ধ্যান-ধারণার ও মন-মতের সৃষ্টি করে।

৮. এমনি করে মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে-আচরণে যে আলোড়ন-আন্দোলন এল, তাতে উনিশ শতকের সূর্যোদয়কালীন জীবন শতকের সূর্যাস্তকালে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। তখন য়ুরোপে বাহ্যত সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, মার্কসবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ ও অভিব্যক্তিবাদ পেয়েছিল প্রাধান্য। যেসব ব্যক্তির মনীষা মনে-মননে জীবনে-জীবিকায় এ পরিবর্তনের বিশেষ সহায়ক হয়েছে, তাঁরা হলেন ডারুইন, নীটশে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালমার্কস, ফ্রয়েড এবং স্টফেনসন, এডিসন, বেল, রাইটভ্রাতৃদ্বয়, ঔষধ আবিষ্কারক পাস্তুর, কুরী ও যুদ্ধোপকরণ উদ্ভাবক বিজ্ঞানীরা।

উনিশ শতকের অবসান মুহূর্তে য়ুরোপে যা ছিল ও হল তা সংক্ষেপে এই :

ক. বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ায় আশ্বস্ত ও উৎসাহিত মানুষ সচ্ছল-স্বচ্ছন্দ জীবন প্রত্যাশায় যেমন হল উন্মুখ, তেমনি আপাত লাভ-লোভের প্রেরণায় হল উদ্বেল। রাষ্ট্রিক জীবনে তাই হল প্রকট। তখন চীন, তুর্কি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্পেন হচ্ছে অবক্ষয়গ্রস্ত সাম্রাজ্যিক শক্তি; আর জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও রাশিয়া হচ্ছে উঠতি ও প্রসারমান রাষ্ট্র। ব্রিটিশ ও ফরাসিরা তখন প্রৌঢ়-প্রবল সাম্রাজ্যিক শক্তি। জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া তখন সাম্রাজ্য প্রসারে; উপনিবেশ গ্রাসে ক্ষুধার্ত বাঘের মতো উন্মুখ।

খ. বক্সারযুদ্ধ ও সানইয়াৎ সেনের উত্থান, জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়, বোয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ বর্বরতা প্রভৃতি ছাড়াও বলকান অঞ্চলে, এশিয়ায়, আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায় সাম্রাজ্য বিস্তারে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ, ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণ, রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীন দখল প্রভৃতি রাজনীতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। অন্যদিকে সংবাদপত্র, রেডিয়ো, ডাকবিভাগ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রিক নৈকট্য; রেলওয়ে, স্টিমার প্রভৃতির বদৌলতে দেশ-দুনিয়ার সর্বত্র যাতায়াতের ও পণ্য বিনিময়ের সহজতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, Joint Stock Trading-এর সুবিধে, ব্যাঙ্ক ও বীমার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ও আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার বিলুপ্তি দুনিয়ার চেহারা বদলে দিল।

গ. এ সময় আন্তর্জাতিক ডাকচলাচল ব্যবস্থা, রেডক্রস, আন্তর্জাতিক বিচারালয়, ট্রেড ইউনিয়ন, লৌহ ও ইস্পাত কারখানার বিস্তৃতি, আন্তর্জাতিক সংবাদগর্ভ খবরের কাগজ, পণ্য হিসেবে তৈরি পাটজাত খাদ্যের ব্যবহার, টেলিফোন, রেডিয়ো, টাইপরাইটার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বিভিন্ন প্রয়োগ, মোটরগাড়ি প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের কারণ হয়ে ওঠে। কৃৎকৌশলের, যন্ত্রের ও কারখানার প্রসারের ফলে শহরে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এ সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে য়ুরোপীয় উপনিবেশে ও সাম্রাজ্যে শিক্ষিত মানুষে প্রতীচ্য-চেতনার প্রসার ঘটে এবং তাদের মনেও জাগে আত্মবিকাশের স্বপ্ন ও সংকল্প। বিশেষত ম্যাজিনি, সানয়াৎসেন প্রমুখ জাতীয়বীরদের আদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষেরা ভারতে-আয়ারল্যান্ডে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে।

ঘ. য়ুরোপে ১৮৮০-৯০ সন থেকে মার্কসীয় তত্ত্ব, ১৮৮৯ সন থেকে নীটশে রচনাবলি, ১৮৯৯ সনে প্রকাশিত ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষিতজনের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজে যখন কিছুলোকের মধ্যে অগ্রসর চিন্তা-চেতনার সঞ্চার হয়েছে, বৃত্তিজীবী ও শ্রমিকমনে যখন ভাগ্য বদলানোর আকাঙ্ক্ষা জেগেছে, বুর্জোয়া জীবন ও সমাজ যখন বিকাশের ও স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণতার পরে অবক্ষয়ের পথে দ্রুত অগ্রসরমান; তখনো রাষ্ট্রের স্বাপ্নিক কর্ণধারেরা সাম্রাজ্যবৃদ্ধির মোহে দ্বন্দ্ব-সংঘাতপ্রবণ—যা ১৯১৪ সনে বৈনাশিক বিশ্বযুদ্ধে রূপ নেয়। এর আগে ব্রিটিশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাম্রাজ্যলিপ্সু জার্মানি লৌহ-ইস্পাত শিল্পের প্রসার যেমন ঘটায়, তেমনি নৌশক্তিতেও ব্রিটেনকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় থাকে ব্যাপৃত।

ঙ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা য়ুরোপ ষোলো শতক থেকেই অনুভব করে না। আবিষ্কৃত আমেরিকা-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড য়ুরোপকে সে-সমস্যা থেকে মুক্ত রেখেছে। তবু উনিশ শতকের শেষপাদে সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনহিতৈষণামূলক দায়িত্বের প্রসার (জনস্বাস্থ্য), শহরে গৃহসংস্থান, শিক্ষাব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতির দরুন সরকারি চাকরির সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ফলে জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীনতার প্রতীকরূপে জনমনেও রাষ্ট্রানুগত্য বৃদ্ধি পায়— যার পরিণামে আমলার ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পেল। সমাজবাদীরাও জাতীয়তাবাদী ও রাষ্ট্রানুগত্য থাকার প্রবণতা দেখায়—জনকল্যাণ রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হয়ে।

চ. তবু কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা প্রবল হতে থাকে। শোষণ মুক্তির জন্যে তাদের আন্দোলন পুঁজিপতি শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে চালিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করতে থাকে। মার্কসের শ্রেণীতত্ত্বে অনুপ্রাণিত সমাজবাদীরাও বিশ্বাস করত সামন্তসমাজ ভেঙে যেমন বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছে, যন্ত্রের ও কৃৎকৌশলের উৎকর্ষে তেমনি নতুন পরিবেশে বুর্জোয়াপ্রাধান্যের বিলোপে প্রাধান্য পাবে পোলেতারিয়েত শ্রেণী। তাই তাদের দাবি ছিল শ্রমিকের কাজের সময় সীমিতকরণ, নাগরিক মাত্রেরই ভোটাধিকার, নাগরিকের মৌলিক অধিকার, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সনাতনী নিয়ম-নীতির সংস্কার ও বর্জন প্রভৃতি। বুদ্ধিজীবীরাও শ্রেণীগত শোষণতত্ত্ব উপলব্ধি করে আর্থিক বৈষম্যই মানব-দুঃখের ও দুস্থতার কারণ বলে স্বীকার করলেন।

ফলে য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র লঘু-গুরুভাবে সমাজবাদও সরকারের সাম্রাজ্যবাদী মত্ততার পাশাপাশি গণমনে শিকড় বিস্তার করতে থাকে।

ছ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যে রাষ্ট্রাভ্যন্তরেও যুদ্ধে গণসমর্থন মিলেছিল, তারও মূলে ছিল গণজীবন-জীবিকায় পরিবর্তন-প্রত্যাশা। এই গণমনোভাব প্রত্যক্ষ করেই চার্চিল (১৯০১ সনে) বলেছিলেন : 'Democracis morey vindictive than Cabinets, The wars of Peoples will be more terrible than those of kings.'

AMARBOI.COM

যদিও যুদ্ধাবসানে য়ুরোপে মানুষের আর্থিক দুঃখ-দুর্দশা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সমাজ ও সাম্যবাদী আন্দোলনও জার্মানিতে ইটালিতে ফ্রান্সে ইংল্যান্ডে এমনকি আমেরিকায়ও প্রবল হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, তবু তা হল না। প্রথমত দুস্থ লোকেরা দেশত্যাগ করে অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে ও আমেরিকায় ঠাঁই করে নেয়। দ্বিতীয়ত যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রেও দ্রুত পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়—যাতে নারীরাও জীবিকা অর্জনে এগিয়ে আসে। ফলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে নারীর সঙ্কোচ, স্বাতন্ত্র্য, ব্রীড়া এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের দূরত্ব ঘুচে যায়— সতীত্বের ধারণাও শিথিল হয় এবং সমাজ উদারতার ও সহনশীলতার সঙ্গে তা গ্রহণ করে। ফলে নারীর পোশাকে ও আচরণে তথা জীবনদৃষ্টিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে, জীবিকার ক্ষেত্রও হয় বিস্তৃত।

ঝ. ভার্সাই চুক্তির ক্ষতি ও অপমান হৃতসর্বস্ব জার্মানিকে দলিত ফণিনীর মতো ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট রাখে, ফলে মরিয়া হয়ে জার্মানি আবার বিশ বছর পরে যুদ্ধে নামে।

প্রথম যুদ্ধের কারণ ছিল সাম্রাজ্যলিপ্সা। কিন্তু পরিণামে য়ুরোপীয়দের সাম্রাজ্যের সর্বত্র শাসিত জাতির মনে জাগে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার, স্বায়ত্তশাসনের ও স্বাধীনতার স্পৃহা। এখন থেকে দ্রোহের বীজ উপ্ত হচ্ছিল আর সাম্রাজ্যিক শাসন-শোষণের পথে বাধা সৃষ্টি হচ্ছিল নানাভাবে। শাসিত জাতির মধ্যে শিক্ষার ও স্বাধিকার চেতনার প্রসার হচ্ছিল দ্রুত, জীবনযাত্রায় চাহিদারও ঘটছিল বিস্তৃতি। তাই বঞ্চিতের ক্ষোভও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ঞ. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে স্থূল ও প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদের বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন হয়ে ওঠে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের ডালেস-মার্শালের নীতি প্রয়োগে সূক্ষ্ম, পরোক্ষ ও মারাত্মক হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরুজ্জীবিত হবার জন্যেই। এবার বন্ধুর বেশে সাহায্যের নামে পয়সা ছিটিয়ে দাস ও বশ করে আর্থিক ক্ষেত্রে কৌশলে পঙ্গু ও পরনির্ভর রেখে শাসানো ও শোষণ করাই লক্ষ্য; ঋণে-দানে-অনুদানে ক্রীতদাসের মতো অনুগত রেখে হুকুম-হুমকি চালানোই উদ্দেশ্য। রাশিয়াও সে মহাজনপন্থা অনুসরণ করে আজ কৃতার্থ। দৈন্যক্লিষ্ট তৃতীয়বিশ্ব বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের ও রাশিয়ার কবলিত। যুক্তরাষ্ট্রের এ অপকর্মের সহায় কানাডা ব্রিটেন ফ্রান্স পশ্চিমজার্মানি ও জাপান আর রাশিয়ার সমর্থক তেমনি কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনাম। দেশ দুনিয়া আজ এই দুই পরাশক্তির দর্প-দাপটে, প্রভাবে-প্রতাপে শঙ্কিত ও কম্পিত।

২

ইরানের এক বাদশাহ বলেছিলেন—রাজ্য রাখতে শক্তি চাই, শক্তির জন্যে সৈন্য চাই, সৈন্যের জন্যে অর্থ আবশ্যিক; অর্থের জন্যে প্রজা দরকার আর প্রজার জন্যে ফসল দরকার।

হাতিয়ারই সে-শক্তি। বিজ্ঞান সে-হাতিয়ারই সৃষ্টি করেছে যার নাম বৈদ্যুতিক ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র—যা সৃষ্টিতে ও বিনাশে সমনৈপুণ্যে ও দক্ষতায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এই যন্ত্রই জীবন-জীবিকার সনাতন পদ্ধতি পালটে দিয়েছে, সমভাবে বিবর্তিত হয়েছে চিন্তা-চেতনার জগৎ ও মন-মত। ফলে পুরোনো শাস্ত্র, সমাজ, সরকার, নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ ও কর্ম-আচরণ হারিয়েছে উপযোগ। অতএব চিরকালই মানুষের হাতের হাতিয়ারই তার জাগতিক জীবন-জীবিকা ভাব-চিন্তা কর্ম-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করছে ও করবে। আজ অনিচ্ছায়ও চির-অবজ্ঞেয় চালক চাকরকে মোটরের পাশে বসাতে হয়, বাপকেও ফোনে 'হ্যালো' বলতে হয়, টেলিভিশনে সসন্তান আদিরসাত্মক সিনেমা দেখতে হয়, যোগ্য মুচি-চাঁড়ালের প্রভুত্ব-কর্তৃত্ব মানতে হয়।

আঠারো শতকে নতুন তাঁত দিয়ে শিল্পবিপ্লবের শুরু। তারপর একে একে নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের ও চেতনাজগতের ধারা পালটে দিল।

আমাদেরও ব্যবহারিক ও চেতনাজগৎ নিয়ন্ত্রণ করছে য়ুরোপে আবিষ্কৃত যন্ত্র ও য়ুরোপে উদ্ভূত চিন্তা, চেতনা, মন ও মত। আমরা নিজেরা কিছুই আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিনি; আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সব উপকরণ ও মননের সব সূত্রই গ্রহণে-বরণে, অনুকরণে অনুসরণে য়ুরোপ থেকে পাওয়া। প্রতীচ্যে যা বাস্তব প্রতিবেশে ও প্রয়োজনে উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত, তা কৃত্রিম উপায়ে এখানে অনুকৃত। 'প্রয়োজনই আবিষ্কার উদ্ভাবনের জনক' (Necessity is the Mother of Invention) বলে যে-বিলেতি আপ্তবাক্যটির সঙ্গে শ্রুতিযোগে আমাদের পরিচয়, তেমন কোনো প্রয়োজন বা প্রতিবেশচেতনা আমাদের মর্মধৃত নয়। তাই য়ুরোপে যেসব সমস্যা ও জিজ্ঞাসা বস্তুজগতে আবিষ্ক্রিয়ায় ও মনোজগতে নতুন ভাব-চিন্তায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে; শাস্ত্র-সমাজ-সরকার, বিশ্বাস-সংস্কার ও রীতি-নীতির বদল অবশ্যম্ভাবী ও স্বতঃস্ফূর্ত করেছে; আমরা আজো সে-স্তরে উন্নীত হইনি।

অনুকৃতি আজো আমাদের দেহে-মনে আবরণ-আভরণের মতোই নির্মোক আত্মিক নয়—তাই আমাদের সমাজচিন্তা, সংস্কৃতিচেতনা রাজনীতি এবং জীবন ও জগৎ বিষয়ক চিন্তা-চেতনা ভাব-ভাবনা কৃত্রিম অনুশীলনের বিষয়; আত্মগত প্রয়োজনবুদ্ধির প্রসূন নয়। য়ুরোপে যা বাস্তব ও স্বাভাবিক, আমাদের কাছে তা আদর্শ ও কাঙ্ক্ষ্য মাত্র।

তাই আমরা আদর্শে নই অবিচল, সংকল্পে নই দৃঢ়, প্রত্যয়ে নই নিঃসংশয়, আচরণে নই অভিন্ন, কর্মে নই নিষ্ঠ, সাহসে নই অবিচল; আমরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই অর্ধশতাব্দী ধরে আমরা গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদী হলেও আমাদের গতি লাটিমের মতোই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলতা কিংবা প্রগতিবাদিতা—দু-ই প্রতীচ্যের দান— কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এগুনোর কিংবা সাফল্যের কোনো নিদর্শন নেই। জনগণের নিরক্ষরতা ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে অজ্ঞতাও হয়তো এজন্যে আংশিকভাবে দায়ী। য়ুরোপে ব্রিটেন-ফ্রান্স-পশ্চিম জার্মানি-ইটালি-স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ মানুষের আর্থিক সাচ্ছল্যের সুযোগ অব্যাহত থাকায়, ভাগ্যবিড়ম্বিতদের শ্বেত-অধ্যুষিত দেশে অর্থকর কিছু করার সুবিধে থাকায় সমাজবাদ বা সাম্যবাদ প্রভাব-প্রতাপ লাভ করেনি, কিন্তু দৈন্যক্লিষ্ট তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রের দেশে সমাজবাদ বা সাম্যবাদ যে জনপ্রিয়তা আশানুরূপ অর্জন করেনি, শিক্ষিত উঠতি মধ্যবিত্তের দোলাচল মনোবৃত্তিই তার মুখ্য কারণ— তাদের অভিপ্রায় অকৃত্রিম ও মর্মোত্থিত প্রয়োজনসঞ্জাত না হলে সাফল্য থাকবে অনায়ত্ত। রাশিয়ায়-চীনে কিংবা অন্য ক্ষুদ্র দেশে তা সম্ভব হচ্ছে ত্যাগপ্রবণ নির্ভীক, সংকল্প-দৃঢ় মনীষাসম্পন্ন আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বের অবিচল নেতৃত্বে, প্রেরণায় ও আকর্ষণে। আমাদের দেশে আজো তেমন মানুষ দুর্লক্ষ্য।

অবশ্য এ-ও স্মর্তব্য যে প্রথম মহাযুদ্ধ রাশিয়ায়, চীন-জাপানযুদ্ধ চীনে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে রাশিয়া-আমেরিকার ভাগাভাগির ফলে কোনো কোনো দেশে কৃত্রিমভাবে সমাজতন্ত্র প্রবর্তন সম্ভব হয়েছিল। আমাদেরও কি তেমন সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে!

AMARBOI.COM

শিক্ষার কথা

১

সরকারি উদ্যোগে এবং বেসরকারি উৎসাহে বছর বছর শিক্ষা-সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বহু শিক্ষা সম্মেলন, আলোচনা চক্র ও সভা। কিছু শিক্ষক ও শিক্ষাবিভাগের কিছু কর্মচারী শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও বুদ্ধিলব্ধ অনেক শ্রুতিমধুর বাণী উচ্চারণ করেন ঐসব অনুষ্ঠানে। অবশ্য লক্ষ্য থাকে সরকারি অভিপ্রায় পূরণের দিকেই। আর না বললেও চলে সবাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট এবং প্রাক্তন প্রভু ব্রিটিশকে এজন্যে দায়ী করে দায় সারেন। কিন্তু ত্রুটি যে কী এবং কোথায় তা কেউ সাধারণত নির্দেশ করতে পারেন না। কেবল য়ুরোপ-আমেরিকার ব্যয়বহুল বাহ্য ব্যবস্থা এখানেও প্রবর্তনের সুপারিশ করে উন্নয়নের পরামর্শ দেন। সরকার-ঘেঁষারা এই সুযোগে সরকারি অভিপ্রায়ক্রমে জাতির কল্যাণে অনুগত প্রজা সৃষ্টির দাওয়াও বাতলে দিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তাই সরকারি প্রয়োজনের ও সামর্থ্যের আনুপাতিক হারে স্কুলের, কলেজের ও ছাত্রের সংখ্যা নির্ধারণ, ছাত্রশাসন ও পাঠ্যসূচি নিরূপণের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ দিয়ে তাঁরা প্রভুতুষ্টির সাফল্যে আনন্দিত। ফলে আমাদের শিক্ষাচিন্তা একটা পার্বণিক পবিত্রতায় ও গতানুগতিক অনুষ্ঠানে অবসিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা কী কী এবং কোন্ পথে সন্ধান করতে হবে সমাধান, তা যে সরকারি শিক্ষাবিদদের অজানা কিংবা ধারণাতীত, তা নয়। কেউ কেউ সব জানেন এবং বোঝেন। তাছাড়া আজকের দুনিয়ায় প্যাটেন্ট ওষুধের মতো নানা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমাধান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বটিকাও সহজেই এখানে প্রয়োগের ব্যবস্থা হতে পারে। আসলে চরিত্র নেই বলেই সেসব সমাধানপন্থা কেউ নির্দেশ করেন না, কেবল বাহ্যপ্রলেপের ব্যবস্থাপত্রই দান করেন। ফলে শিক্ষাসমস্যা ও শিক্ষাসপ্তাহ দুটোই সমগুরুত্বে বছর বছর আবর্তিত হয়।

২

আজকাল গাঁয়ের ছোট-বড় সব গৃহস্থই সন্তানকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠায়। পাঠায় বিদ্যার মূল্য বুঝে নয়—বাজার-দর জেনেই। তারা জানে ও বোঝে একালে তক্‌দির বদলাতে হলে পেশান্তর প্রয়োজন এবং তা সম্ভব ও সহজ কেবল লেখাপড়ার জোরে অফিসে চাকরি পাওয়াতেই। তাই তারা ছেলে পাঠায় স্কুলে। কিন্তু অকর্ষিত ভূঁইয়ে ছড়ানো বীজের মতোই অনুকূল ঘরোয়া পরিবেশের অভাবে শতকরা পঁচানব্বই জন ছাত্রের অধ্যয়নে আগ্রহ জন্মায় না। শৈশবে-বাল্যে লেখাপড়াকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। যেখানে ঠেকে যায় সেখানে মমতার মাধুর্য ও ধাঁধা সমাধানের কৌতূহল ও আনন্দ সৃষ্টি করে দিতে হয়। পরিবারে মা-বাবা-ভাই-বোনের সেই সামর্থ্যের অভাবে এবং পাড়ায় লেখাপড়ার পরিবেশের অনুপস্থিতির ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীরা তা পায় না কখনো। ফলে অধ্যয়ন একটা দুরূহ পর্বতারোহণের মতো দুঃসাধ্য কর্ম কিংবা বন্ধুর ও অন্ধকার অরণ্যে নিরুদ্দিষ্ট বিচরণ বলেই মনে হয়। এতে মন হয় বিরূপ এবং বইভীরু। এই কারণেই শতকরা পঁচানব্বই জন প্রাথমিক বিদ্যালয়েই বিদ্যা এড়িয়ে চলে। যারা তারপরেও চালিয়ে যায় তারা ব্যতিক্রম; মানসিক গঠনে অনন্য এবং অধ্যবসায়ে অসাধারণ। সেসব ছাত্রই কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে।

শিক্ষার পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক আনুকূল্যের অভাবে তাদের বিদ্যা থাকে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত প্রশ্নোত্তরে সীমিত। চিন্তা-চেতনার পরিসর থাকে নিতান্ত সংকীর্ণ, জীবন-চেতনা ও জগৎভাবনা থাকে অপরিস্ফুট। ফলে তারা চাকুরে হবার যোগ্য হয় বটে, কিন্তু মানবিক শক্তির সন্ধান থাকে তাদের অলভ্য। তারা স্বার্থ-সচেতন প্রাণী হয়ে প্রিয়-পরিজনের জন্যে খাটে ও বাঁচে। কিন্তু জীবন-যে একটা ঐশ্বর্য এবং সাধনা-সাপেক্ষ শিল্প, মানসশক্তির বিকাশ-সম্ভাবনা যে অশেষ, তা জীবনে কখনো উপলব্ধি করার অবকাশ পায় না। মানুষের জীবন-জীবিকা যে যৌথ প্রয়াসনির্ভর —দেশ ঋদ্ধ হলে, রাষ্ট্র সুশাসিত হলে, সমাজ সুশৃঙ্খল হলে, প্রয়াস সমবেত হলে এবং জীবনযাত্রা নিরাপত্তা, সহিষ্ণুতা, সহাবস্থান ও সহযোগিতাভিত্তিক হলে, তবেই-যে ব্যক্তিজীবনও অভাব ও শঙ্কামুক্ত হয়, তা তাদের বোধগত হয় না। তাই ঠুলি-আঁটা ঘোড়ার মতো কেবল স্ব-স্বার্থের লোভের ও লাভের সহজ পথই ঐ ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্য হয়ে ওঠে। তখন মানুষ বাহুবলে বুদ্ধিবলে কেবল অপরকে কেড়ে মেরে হেনে বাঁচাই বাঁচার একমাত্র পথ বলে জানে ও মানে। ফলে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানিই জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নিয়ম বলে প্রতীয়মান হয়। এতে কাম্যবস্তু ভাঙে, ছেঁড়ে এবং অপচিত হয়।

তা ছাড়া মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত গড়ে ওঠে ঘরেই। বাইরের বাতাসে চরিত্র গঠিত হয় না কখনো। বিদ্যাও মানুষকে জ্ঞানী করে, চরিত্র দান করে না। জ্ঞানও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে প্রজ্ঞায় রূপান্তর না-পেলে বন্ধ্যাই থেকে যায়। কাজেই বিদ্যালয় বিদ্যা তথা জ্ঞানদানের আলয়, চরিত্র গড়ার কারখানা নয়। শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকই পড়ান, নীতিবাক্য আওড়ানোর সুযোগ তাঁর ক্বচিৎ মেলে। পাঠ্যপুস্তকে নীতি শিক্ষা দিলে তাও হয়ে যায় পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের মধ্যে সীমিত। ঘরে লব্ধ আজন্ম লালিত বিশ্বাস-সংস্কারই নিয়ন্ত্রণ করে সাধারণ মানুষের জীবন ও মনন। কাজেই পড়ে-পাওয়া জ্ঞানকে ভাব-চিন্তার ক্ষেত্রে আচরণের অঙ্গীভূত করে না মানুষ। তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিধর্মী-বিজাতি-বিদেশী-বিভাষীর পড়ে-পাওয়া বিশ্বাস-সংস্কার কেউ মনে গ্রহণ করে না। তা ছাড়া চরিত্র কেবল নীতিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল নয়। চেতনার গভীরে গ্রহণ না করলে কোনো লব্ধ জ্ঞান বা নীতিবোধ আচরণসাধ্য হয় না। অধিকন্তু প্রলোভন প্রবল হলে কোনো পাপচেতনাই তা প্রতিরোধ করবার শক্তি রাখে না। কেননা আল্লাহ্‌র মার প্রত্যক্ষও নয়, অব্যবহিতও নয়। তাই সামাজিক নিন্দার এবং সরকারি শাস্তির ভীতিই সাধারণভাবে অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত রাখে মানুষকে।

ব্রিটিশ আমলে চাকরি লক্ষ্যেই লেখাপড়া করত লোকে। ঔপনিবেশিক সে-প্রভাব আমাদের মধ্যে আজো প্রবল। তাই পরীক্ষা পাস করিয়ে সন্তানকে চাকরির যোগ্য করাই পরম ও চরম সাফল্য বলে মনে করি আমরা। এজন্যেই আমাদের চেতনায় সন্তান মানুষ হওয়া মানে জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া—চরিত্রবান কিংবা জ্ঞানবান হওয়া নয়। কাজেই 'চরিত্র' গড়ার অভিপ্রায় অভিভাবকেরও নেই।

৩

আজকের দেশপ্রেম, জাতি-চেতনা, রাষ্ট্র-ভাবনা, ঐতিহ্যপ্রীতি, সংস্কৃতি-গর্ব প্রভৃতি হচ্ছে আধুনিক প্রতীচ্য শিক্ষার প্রসূন। কাজেই এই যুগে রাজনীতি শিক্ষিত লোকের নেশা ও পেশা। তাঁদের স্বার্থেই গণমানবকে নির্বাচন ও আন্দোলন কালে রাজনৈতিক কর্মে ও অপকর্মে জড়ান তাঁরা। ওরাও না-বুঝেই সাড়া দেয়। নিরক্ষরতা-দুষ্ট দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা নগণ্য। তাই শিক্ষিতমাত্রই চাকুরে বা বৃত্তিজীবী। স্বাধীন পেশা বলে অভিহিত ডাক্তারি, ওকালতি, ঠিকাদারি, সওদাগরিও গরিব-গৃহস্থ ঘরের ভূঁইফোড় শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিতদের হাতে বলে তারাও অন্নচিন্তা ও ঋদ্ধি-লিপ্সা ত্যাগ করে প্রয়োজনীয় সাহস নিয়ে বিপদসংকুল রাজনীতির জুয়ায় এগিয়ে আসতে দ্বিধা করে। উল্লেখ্য যে, অশিক্ষায় অভিশপ্ত অনুন্নত দেশে রাজনীতি করতে হুলুল মারের জেলের ও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই নামতে হয়। কাজেই আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত স্বাধীন দেশে রাজনীতি মারামারি-হানাহানির নামান্তর মাত্র। যেহেতু রাজনীতি শিক্ষিত লোকেরই পেশা আর নেশা, যেহেতু শিক্ষিত সাধারণ ছাপোষা চাকুরে ও বৃত্তিজীবী, যেহেতু ছাত্র ছাড়া লোক মেলে না সভা ডাকবার, শ্রোতা হবার, আন্দোলন করবার, ভোট যোগাড় করবার, স্লোগান দেবার কিংবা ইস্তেহার বিলি করবার; সেহেতু অশিক্ষিত-অনুন্নতের দেশে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল মাত্রই ছাত্র-প্রধান, ছাত্র-নির্ভর ও ছাত্রসর্বস্ব, নেতারাই কেবল বয়স্ক। আর বয়স্ক থাকে নির্বাচনপ্রার্থী মৌসুমী রাজনীতিকরাই। এরা বসন্তের কোকিল—সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। এরা নিজেরা এবং এদের মন-মতো বেচাকেনার পণ্য।

যেহেতু রাজনীতি শিক্ষিত-চেতনার প্রসূন, সেহেতু যতদিন-না আফ্রো-এশিয়ার ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোতে গণশিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে, ততদিন ছাত্রেরাই রাজনীতি করবে এবং তাদের রাজনীতি করতে দিতে হবে—যদি গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র চাই, তবে তাদের ঠেকানো যাবে না, এবং ঠেকানোর চেষ্টাও হবে অমানবিক ও নৈতিক অপরাধ। বিশ্বের যে-কয়টি দেশে সর্বজনীন তথা গণশিক্ষা চালু রয়েছে এবং আর্থিক অবস্থাও অন্ন-বস্ত্রের সমস্যাসঙ্কুল নয়, সেইসব দেশে রাজনীতি বয়স্ক-লোকেরাই করে এবং সেখানে প্রতিপক্ষকে পীড়ন-শোষণ-হনন-নির্যাতনের রাজনীতি তেমন নেই। উল্লেখ্য যে, জনগণের রুজি-রুটির ব্যবস্থা করতে পারলে কোনো সরকারই গণ-দুশমন হয় না—রাজনীতিও তখন সরকারের পক্ষে মারাত্মক হয়ে ওঠে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

অনুন্নত দেশে গণশিক্ষা দানে সরকারের ভীতিপ্রসূত অনীহা থাকেই। যে কয়জন শিক্ষিত থাকে তাদের বেকারত্ব ঘুচিয়ে, তাদের ন্যায়-অন্যায় আব্দার মিটিয়েও, গণ-স্বার্থবিরোধী সুযোগসুবিধা দিয়েও যখন সরকারি গদি নিরঙ্কুশ, নিরাপদ ও স্থায়ী রাখা যায় না—তখন সবাইকে চক্ষুষ্মান তথা দায়দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার-সচেতন করে তুললে গদির কাছে ঘেঁষাও অসম্ভব হবে—জেনেই ক্ষমতালিপ্সু সামন্ত-বুর্জোয়া মধ্যবিত্তেরা জনশিক্ষাভীরু। নতুন যে উঠল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বয়ে সেও তার জ্ঞাতিকে ওঠাতে চায় না। অতএব 'ছাত্ররাজনীতি' আরো বহুকাল চলবে এদেশে।

যেহেতু সামন্ত-বুর্জোয়া মানসধারী উচ্চমধ্যবিত্তরাই রাজনৈতিক নেতা, সেহেতু নেতারা সাধারণভাবে নীতিহীন সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী। কাজেই তাঁরা মানুষের কল্যাণ লক্ষ্যে কোনো স্থায়ী নীতির অনুসারক নন। মন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন্ত্রীরা ছাত্রদের উপদেশ দেন রাজনীতি ছেড়ে অধ্যয়নে মনোযোগী হতে। কিন্তু বিরোধীদলের কোনো নেতা বা সদস্য কখনো তা বলেন না। আজকাল ছাত্র নিয়ে রাজনীতি করা স্ব-স্বার্থে ছাত্র লেলানো শিক্ষকরাও উত্তম ও সফল পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এমনকি প্রশাসকরাও। সরকার-সমর্থিত ছাত্রদলই উচ্ছৃঙ্খল হবার ও দুর্নীতি গ্রহণ করার উৎসাহ ও অবাধ সুযোগ পায়।

৫

গণশিক্ষার ব্যবস্থা এই পুঁজিবাদী সুবিধাভোগী মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব করবেই না যখন, তখন দুকূল রক্ষার একটা উপায় উদ্ভাবন করতেই হবে। আর আমাদের মতে তা হচ্ছে—বিদ্যালয় অঙ্গনে, হলে, হস্টেলে রাজনীতিক দল গঠন বা সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা। তার বদলে তাদের জন্যে শহরে-বন্দরে গাঁয়ে-গঞ্জে, বিদ্যালয়-সংলগ্ন এলাকায়, হাইড পার্কের মতো নির্দিষ্ট মাঠ-ময়দান রাখতে হবে। যেখানে নেতার প্রয়োজনে ও ইঙ্গিতে তারা ইচ্ছেমতো রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আন্দোলন করবার অবাধ সুযোগ পাবে। রাস্তায়ও প্রয়োজনমতো মিছিল করতে পারবে ক্ষোভে ও দাবি জানাবার জন্যে। এ ব্যবস্থা হলেই কেবল শিক্ষালয়গুলোতে স্বস্তি-শান্তির মধ্যে নির্বিঘ্নে পড়া পড়ানো সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনের কথা—স্বার্থের কথা বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষকে জানাবে দরখাস্তের মাধ্যমে। প্রতিবাদ-প্রতিকারের জন্যে সভা করবে ঐ মাঠে-ময়দানে। প্রয়োজনবোধে ধর্মঘট করবে এবং মিছিল করেও যেতে পারবে সরকারের কাছে। এমনকি মামলাও চলতে পারবে আদালতে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ঘেরাও কিংবা দুই বিরুদ্ধ পক্ষের মধ্যে মারামারি করতে দেওয়া হবে না বিদ্যালয়ের এলাকায়। ভর্তির সময়ে এইসব শর্ত মেনে ভর্তির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করবেন ছাত্র ও অভিভাবক। মূল কথা হল, শিক্ষকের বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বা বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে কোনো আন্দোলন বা দ্রোহের অধিকার থাকবে না শিক্ষার্থীদের। এরকম একটা চুক্তি ছাত্রদল ও জাতীয়দলের নেতাদের সঙ্গে শিক্ষালয়-কর্তৃপক্ষের করা অবাস্তব অসম্ভব নাও হতে পারে। যতদিন গণমানব সাক্ষর না হচ্ছে, ততদিন এমনি কোনো বিধি-বিধানের ব্যবস্থা করতেই হবে। অথবা নাগরিকের অন্ন বস্ত্র, গৃহ, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা জীবন-জীবিকার সার্বিক দায়িত্ব কোনো সমাজতান্ত্রিক সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই কেবল শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা সম্পৃক্ত কোনো সমস্যাই থাকবে না বা নিতান্ত সামান্য থাকবে।

AMARBOI.COM

৬

য়ুরোপীয় জীবন-জীবিকায় নানা জটিলতা দেখা দিয়েছে—শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, প্রকৌশলে ও কৃৎকৌশলে বিস্ময়কর বিকাশের ফলে। সেখানে শিক্ষার ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, বৃত্তি নির্দেশ করতে হয়, ব্যক্তিমানুষের জীবন-জীবিকায় স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরপত্তা দানের দায়িত্ব সরকারের বলেই। আমাদের নিরক্ষরতা, নিরন্নতা, নিরাশ্রয়তা-দুষ্ট দেশে ও সমাজে শিক্ষাবিষয়ে কোনো জটিলতাই নেই। এখানে শিক্ষা কমিশন, শিক্ষা সম্মেলন, শিক্ষা সেমিনার প্রভৃতি লোক-ঠেকানো অনুকৃত বিলাস মাত্র। আমাদের দরকার গণমানবকে পড়তে, লিখতে ও গুণতে (Knowledge of three R's) শেখানো এবং প্রকৌশলে ও কৃৎকৌশলে প্রাথমিক জ্ঞান দিয়ে কলকারখানায় উৎপাদক রূপে নিয়োগ করা। আজ আমাদের দেশে মোটামুটি প্রতিবছর তিনকোটির মতো মানবশ্রম অপচিত হচ্ছে। এই অব্যবহৃত শ্রম হচ্ছে অকর্মা ভদ্রসন্তানের, গৃহস্থ নারীর ও সচ্ছল কৃষিজীবী প্রভৃতির।

গণশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষা দিতে হবে মাত্র একবারই। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের পর বয়স্কশিক্ষার আর প্রয়োজন থাকবে না। এইজন্যে গাঁয়ের স্বল্পশিক্ষিত লোকদের মাসিক ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পারিশ্রমিক দিলেই তারা বিকেলে বা সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা করে পড়িয়ে বয়স্কদের ছয়মাসের মধ্যেই খবরের কাগজ পড়াবার মতো যোগ্য করে তুলতে পারবে। পুঁজি হিসেবে জনপ্রতি একখানা শ্লেট ও একখানা পুস্তিকা মাত্র প্রয়োজন। প্রতি গাঁয়ে এইজন্যে দশ হাজার করে খরচ হলে আটষট্টি হাজার গাঁয়ের জন্যে ব্যয় হবে আটষট্টি কোটি টাকা। এ টাকা বেশি নয়। বিশেষ করে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রচারণায় সরকার যে-অর্থ প্রতিবছর ব্যয় করেন, সেইসব খাতে অর্থব্যয়ের কোনো প্রয়োজন হবে না। গণশিক্ষার পরে কেবল প্রচারপত্র (Leaflet) ছড়িয়ে ছিটিয়েই উদ্দেশ্য সাধন হবে। এর পরে Non formal শিক্ষা বলে পরিচিত গণমানবের জীবিকা সম্পৃক্ত প্রশিক্ষণ দান সম্ভব ও সার্থক হবে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে গত সাতাশ [এখন উনচল্লিশ] বছরে সাতাশখানা গাঁয়ে অথবা ইউনিয়নে কিংবা সাতাশটি থানায় অন্তত গণশিক্ষা বা বয়স্কশিক্ষা দান করা সম্ভব হত। গোটা দেশে করা যাবে না বলে কোথাও করব না—এই যুক্তি বা নীতি নিতান্তই অভিসন্ধিমূলক।

৭

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মুরুব্বির প্রেরণায় ও অর্থসাহায্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মতো আজ আমাদের দেশেও শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রহসন চলছে। যারা বাপের বা শ্বশুরের অর্থে লেখাপড়া করছে, তাদের কল্যাণের জন্যে সরকারের ও শিক্ষাবিদদের চিন্তাভাবনার সীমা-শেষ নেই। সাতকোটির অধিকার অস্বীকার করে শিক্ষিত সমাজের মন-যোগানোই এই অভিসন্ধির লক্ষ্য। তাই কাজে ও কথায় সঙ্গতি থাকে না এবং ফাঁকির ফাঁক হয়ে ওঠে স্পষ্ট। যে দেশে শতকরা আশিজন অভিভাবক শিক্ষার্থীর বই-খাতা-কাপড়-খোরাকি স্বচ্ছন্দে যোগাতে পারে না, যে দেশে স্কুলে কলেজে অর্থসাহায্য বৃদ্ধি না করে শহরের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিক ছাত্রদেরকে খেলাধূলার নামে অর্থ দিয়ে বশে রাখার ফাঁদ পাতা কল্যাণকর নয় কারো পক্ষেই। এতে কিছু ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়বে মাত্র, অন্য ছাত্রদের রাজনীতি কমবে না। ফলে অর্থের অকাজে অপচয় ঘটে মাত্র। সুবিধাবাদী ক্ষমতালিপ্সু নেতার ও সরকারের ইঙ্গিতে ও প্রশ্রয়ে ছাত্রেরা অরাজনৈতিক কারণেও শিক্ষাঙ্গনে আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে। মানব-হিতৈষণাভিত্তিক সুষ্ঠু রাজনীতিক আদর্শে যারা উদ্বুদ্ধ নয়, তেমন সুযোগসন্ধানী গদিকামী নেতারাই চরিত্রহীন ছাত্রদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থে ও স্বার্থ-চেতনায় প্রলুব্ধ করে উচ্ছৃঙ্খল হতে উস্‌কানি দেয় রাজনীতিতে ছাত্র-সমর্থন লাভের আশায়।

৮

কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা মার্কিন বা য়ুরোপীয় উন্নত দেশের তুলনায় যে সুষ্ঠু নয় —তা পাঠ্যসূচির ত্রুটি বা অপকর্ষের কারণে নয়। দেশের মানুষের অশিক্ষিত পরিবেশ, দারিদ্র্য, সরকারের অর্থাভাব, শিল্পে-বাণিজ্যে-উৎপাদনে অনগ্রসরতা, কৃৎকৌশলে দেশের ব্যক্তি-মানসের অজ্ঞতা ও অনধিকার, মানব-শ্রমের অপচয়, কৃষিকর্মে যান্ত্রিক পদ্ধতির অপ্রয়োগ প্রভৃতি নানা কারণই তার জন্যে দায়। শিক্ষায়, শিল্পে, বাণিজ্যে, উৎপাদনে, বণ্টনে সার্বিক-সর্বাত্মক ও সামগ্রিক বিকাশ-বিস্তার না-ঘটলে উন্নতদেশের বিচ্ছিন্ন ও বিখণ্ডিত অনুকৃতিতে কোনো ক্ষেত্রেই উন্নতি কিংবা উৎকর্ষ সম্ভব নয়। বরং এতে অসঙ্গতি ও বিকৃতি বাড়বে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করলেও সমস্যা বাড়বে, যদি না প্রকৌশল, কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও যন্ত্রবিজ্ঞান কাজে লাগাবার ক্ষেত্র সমপরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

ব্রিটিশ আমলে যেমন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-কেরানিদের সন্তানদের হিতার্থে শহরে শহরে সরকারি স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজো তেমনি শহুরে শিক্ষিতদের তুষ্ট রাখার নীতি অব্যাহত রয়েছে। এমনকি, শহরে সরকারি স্কুল-কলেজ বেড়েছে। [উপজিলায়ও সে কারণেই সরকারি স্কুল-কলেজ হয়েছে] বড়লোকের সন্তানদের বিদেশে পড়ানোর টাকাও যোগায় সরকার বিদেশী মুদ্রায়। দেশেও তাদেরই জন্যে গড়েছে ব্যয়বহুল বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ। এত করার পরও চাকুরে ও বিত্তশালীদের সন্তান বিদ্বান হয় ক্বচিৎ। প্রায়ই হয় স্নব কিংবা চালবাজ। শিক্ষাক্ষেত্রে এ বৈষম্য অবাঞ্ছিত, গণবিরোধী ও অমানবিক। শিক্ষার সার্বিক সুযোগ সবার জন্যে অবারিত হওয়া আবশ্যিক। তাই সব স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় হয় সরকারি না-হয় বেসরকারি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

AMARBOI.COM

৯

সরকার ও সরকারি শিক্ষাবিদেরা গাঁয়ে-গঞ্জে স্কুল-কলেজ বৃদ্ধির বিরোধী। তাঁরা এগুলোকে ব্যাঙের ছাতা বলে অবজ্ঞা-উপহাস করেন। সত্য বটে এগুলোর আর্থিক অবস্থা ও শৈক্ষিক মান সন্তোষজনক নয়। দরিদ্র নিরক্ষর মানুষের সন্তানদের জন্যে গরিব দেশে এমনি নীচুমানের শিক্ষাও শিক্ষাবিস্তারের এবং পরিণামে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক। এ না হলে দরিদ্রের সন্তান শহরে-বন্দরে গিয়ে পড়তে পারত না। ফলে দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরো কম হত। কাজেই প্রতীচ্য-দেশের তুলনায় আমাদের শিক্ষালয়ের ও শিক্ষাপদ্ধতির নিম্নমানের জন্যে দুঃখ করা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলা অনুচিত। আমাদের মতে আগে বিদ্যালয়ে আসতে দাও, আর পাস বা ফেল করিয়ে পড়ুয়ার পরিবেশ গড়ে তোলো। পরে পণ্ডিত সহজেই তৈরি হবে। চাঁদ-সূর্যের আলোর ব্যবস্থা করা গেল না বলে কি মাটির প্রদীপ জ্বালব না! কাজেই গাঁ-গঞ্জের স্কুল-কলেজের প্রতি উন্নাসিকতা ক্ষতিকর ও নিন্দনীয়।

'কে লইবে মোর কার্য কহে সন্ধ্যা রবি...।
মাটির প্রদীপ ছিল সে কহিল স্বামি
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ কথাও স্মর্তব্য যে, পরিবেশ পেলেও সব শিক্ষার্থী বিদ্বান হবে না—হয় না—শিক্ষার সাধারণ মান উন্নত হয় মাত্র। ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের যে-ছাত্র গাঁ-গঞ্জের স্কুলে-কলেজে ভালো ফল করে; সে পরে অক্সফোর্ডে, কেমব্রিজে হার্ভার্ডেও কৃতিত্ব দেখায়।

শিক্ষিত লোক বেকার হলে সরকারবিরোধী হয়, রাজনীতি করে, আন্দোলন-মিছিল ঘন ঘন হয়। তাই শিক্ষিতদের কাজ দিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করতে সরকার সদা উদ্বিগ্ন। কারণ সরকার জানে চালাক জনগণের রুজি-রুটির ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলে সরকার কখনো জন-দুশমন হয় না।

১০

শৈশবে-বাল্যে ঘরে কিংবা বিদ্যালয়ে সন্তানেরা কেবল শেখে, অনুকরণও করে এবং তাতেই মনে বিশ্বাস-সংস্কারের অবিমোচ্য ভিত গড়ে ওঠে—তাৎপর্য-চেতনার অভাবে কিছুই বোঝে না তখন। প্রাথমিক স্তরে তাই ঘরে ও বিদ্যালয়ে শিশুদের নীতিকথা শেখানো যায়, কিন্তু নীতিবোধ জাগানো যায় না কখনো। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর বাহুতে অঙ্কিত প্রথম টিকার মতো চিত্তলোকে উৎকীর্ণ বিশ্বাস-সংস্কার ও আচারপদ্ধতি তার ভাব-চিন্তা-কর্মে তথা চেতনায় ও আচরণে প্রকট হতে থাকে এবং ওতেই সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় সীমিত। পরে যেসব চেতনা ও আচরণ অর্জিত হয়, তা বাহ্যপ্রলেপ মাত্র—ত্বকের ওপরে তার ঠাঁই, অর্থাৎ তা কৃত্রিম লৌকিকতা মাত্র যা সামাজিকতা নামে পরিচিত। কাজেই নীতিশিক্ষাও জোর করে চাপানো যায় না মনের ওপর। মানসপ্রবণতা অনুসারে মানুষ যা দেখে-শোনে-বোঝে, তার কোনোটা গ্রহণ করে, কোনোটা বা এড়িয়ে চলে। এইজন্যে পারিবারিক আচার-রীতি-নীতি-শাস্ত্র-সংস্কারই সাধারণ মানুষের সমগ্র জীবন-জিজ্ঞাসা ও জগৎ-ভাবনা নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজেই মাধ্যমিক কিংবা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় নীতিশিক্ষা দেয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হবেই। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের এই মুহূর্তের দুর্নীতিজাত জীবন-যন্ত্রণা ঐ তথাকথিত শাস্ত্রীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষিতদেরই সৃষ্টি। জানামি ধর্মং ন চ প্রবৃত্তি/জানামি অর্ধমং ন চ নিবৃত্তি—এ রোগের ওষুধ নেই। মানস-প্রবণতার মধ্যেই এর কারণ-ক্রিয়া নিহিত এবং এ প্রবণতা সাধারণত ঘরোয়া পরিবেশেরই দান। কাজেই অভিভাবকের তথা সমাজের বয়স্কদের চরিত্র উন্নত না হলে, শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন প্রায় অসম্ভব। শিক্ষালব্ধ আত্মমর্যদাবোধের সামাজিক তথা কৃত্রিম অনুশীলনও পতন রোধ করে, যেমন করে কঠোর আদালতি শাস্তি। নিন্দা-শাস্তির ভীতি মানুষকে স্থানে-কালে সংযত রাখে, যদিও প্রবৃত্তি বদলায় না। জনসমাজে নীতিনিষ্ঠা প্রবল হলে নীতিহীনতা দুর্লভ হবে ছাত্রসমাজেও। তাছাড়া সমাজে-সংস্কৃতিতে-শিক্ষায়-রাজনীতিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে দুর্নীতি এসেছে ও বেড়েছে মুখ্যত অর্থাভাবে। বাঁচার তাগিদেই অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। প্রচুর অর্থ থাকলে মানুষ সাধারণত সমাজে আত্মসম্মান রক্ষার ও বৃদ্ধির গরজেই নিন্দনীয় ও শাস্তিযোগ্য অপকর্ম করে না। অর্থব্যয় সম্ভব হলে ভালো ছাত্রদের সরকারি ব্যয়ে প্রবণতা অনুসারে বিভিন্ন শাখায় স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা ও বিদ্যাদান করা সম্ভব। প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা সম্ভব হলে গাঁয়ে-গঞ্জেও যোগ্য শিক্ষক দিয়ে উচ্চমানের শিক্ষাদান সহজ। জনগণের আর্থিক সাচ্ছল্য থাকলে তাদের মানসিকতা তথা রুচি-সংস্কৃতির মানও থাকে উন্নত। ফলে সমাজও মুক্ত থাকে বহু গ্লানি ও অবক্ষয় থেকে। অর্থই তো নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করে জীবন-জীবিকায়। কেননা অর্থের প্রাচুর্যেই অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-প্রমোদ-বিলাস প্রভৃতি মানবকাম্য সব উপকরণেরই নিশ্চয়তা প্রাপ্তি সম্ভব। এর পরে অসন্তোষ ও দ্বন্দ্বের কারণ সামান্যই বাকি থাকে এবং সেসব গুরুত্বের কিংবা সর্বজনীন ও সর্বাত্মক হয় না কখনো। অর্থের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রাচুর্য বাস্তবে কখনো আয়ত্তে আসবে না। কাজেই থেকে যাবে সমস্যাও, সমাধানের চেষ্টাও হবে অন্য পথে।

১১

শিক্ষার মাধ্যমিক স্তর হচ্ছে মুখ্যত জানার। তখনো তাৎপর্য-চেতনা সাধারণ শিক্ষার্থীতে থাকে দুর্লভ। জ্ঞান বন্ধ্যা। জ্ঞান মাত্রই তাই ফলপ্রসূ নয়। তাৎপর্যচেতনাবিহীন জ্ঞান প্রয়োগ-প্রেরণা জাগায় না। উচ্চশিক্ষা হচ্ছে উপলব্ধির ক্ষেত্র। যা জানবে তাই বোধগত হবে। এ-স্তরেই তাৎপর্যমণ্ডিত জ্ঞান প্রজ্ঞায় হয় উন্নীত। এর নামই যথার্থ বিদ্যা। কাজেই শিক্ষা ও বিদ্যা অভিন্ন নয়। যা শিখি তা-ই শিক্ষা, যা কারণ-ক্রিয়া সমেত জানি, তা-ই বিদ্যা। কাজেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শেখার নয়—জানা-বোঝার স্থান। ওখানে নীতিশাস্ত্র শেখানোর কিংবা চরিত্রগঠনের বাসনা অবোধ মানুষের অবুঝ আকুতি মাত্র। বিদ্যার্থীর মানস-প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুনিয়মিত অথচ অবাধ অধিকার দিতে হবে। নিরুদ্দিষ্ট উচ্চশিক্ষা অবাঞ্ছিত। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সরকারই কেবল তা কার্যকর করার অধিকার রাখে। কেননা যার পড়ার সামর্থ্য বা যোগ্যতা নেই, তাকে জীবিকাক্ষেত্রে নিয়োগ দান করতে হবে। বাপের পয়সায় পড়তেও দেবে না, আবার জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাও করে দেবে না, তা হয় না। কবির ভাষায় : 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে।' - খোর-পোষের দায়িত্ব না নিলে অভিভাবকত্বের অধিকার মেলে না।

AMARBOI.COM

১২

অতএব শিক্ষাকমিশন, শিক্ষা আলোচনাচক্র, শিক্ষা সভা-সম্মেলন কিছুরই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন গণশিক্ষার —যার ফলে আনাড়ি শ্রমিক কুশল শ্রমিকে উন্নীত হবে। তার জীবনবোধ হবে প্রসারিত, আকাঙ্ক্ষা হবে উঁচু। আত্মোন্নয়নে হবে আগ্রহী, তখন তারা নির্বোধ শ্রমিকমাত্র থাকবে না, হবে এক-একজন জীবিকা-উদ্ভাবক উদ্যোগী মানুষ। ফলে গড্ডলিকা-স্বভাব হবে অন্তর্হিত। এরজন্যে দরকার সদিচ্ছা ও অর্থ—বিশেষজ্ঞ বা পরিকল্পনা নয়। 'গণশিক্ষা'র ফলে সমস্যা কমবে, তা নয়, তবে সমস্যার সমাধান ব্যক্তিক সহযোগিতায় ও সামর্থ্যে সহজ হবে এবং পীড়ন-শোষণ-বঞ্চনা অবাধ থাকবে না।

সরকার ও সরকারি শিক্ষাবিদের জন্য প্রয়োজন—সামন্ত-বুর্জোয়া-মধ্যবিত্তের দর্প-দাপটের ও প্রবঞ্চনার যুগ দ্রুত অপসৃত হচ্ছে এবং গণমানব আজ 'আপন প্রাপ্য অধিকার চায়। তার লাগি দিবে লাল রুধির।' —এ হুঙ্কার নয়, হুমকিরও নয়—অবশ্যম্ভাবী। গণমানবের পক্ষেও আর আশ্বাস নয়, প্রত্যাশা নয়— অপ্রতিরোধ্য দাবি।

কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালি

বাঙালি মুসলমান

১. রিজলি, বিভার্লি হান্টার প্রভৃতি নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, নিম্নবিত্তের হিন্দু-বৌদ্ধ থেকেই দেশজ মুসলিম-সমাজ গড়ে উঠেছে। এস.বি. গুহ ও নীহার রায় বাঙালিতে আর্য-রক্তের অভাব স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। অতএব, বাঙলার বর্ণহিন্দুর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের একাংশ বিদ্যায় ও বিত্তে, প্রভাবে ও প্রতাপে, সমাজে ও প্রশাসনে নিয়ামক নিয়ন্ত্রক ছিল বটে, কিন্তু আর্য ছিল না। কারো কারো মতে তারা আলপীয় আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর কোন বর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাঙলা-উড়িষ্যা-বিহারে এসে বসবাসের আগে। আদিশুর-বল্লাল সেন ঐতিহ্যের ব্রাহ্মণের সংখ্যাও বাঙলায় নিতান্তই নগণ্য।

২. তুর্কি মুঘল আমলে শাসকরা ছিল অবাঙালি। খুব কমসংখ্যক অবাঙালিই এদেশের গাঁয়ে-গঞ্জে স্থায়ী নিবাস করেছে। গৌড়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, মুর্শিদাবাদ, কোলকাতা ও হুগলি প্রভৃতির শহর-বন্দর এলাকায় অবাঙালি বাসিন্দা সীমিত। অবাঙালির এখানে বাস করার অনীহার প্রমাণ শাহজাহানপুত্র সুবাহদার সুজার ঠাঁই পরিবর্তনের আবেদন এবং 'দোজখ-ই-পুর-নেয়ামত' থেকে তুর্কি মুঘল চাকুরেদের চাকরির মেয়াদ অন্তে আর পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে বিদেশী মুসলিমের বাঙলাদেশ ত্যাগ প্রভৃতি।

৩. মুঘল আমল থেকে ১৯০৫ সন অবধি বাঙলা বলতে বিহার-উড়িষ্যাকেও বুঝতে হবে। তুর্কি-মুঘল আমলেও দেশজ মুসলমান উচ্চপদে ছিল বলে প্রমাণ মেলে না। এমনকি ১৮৬০ সন অবধি কোলকাতায় যাঁরা রাজসরকারের নানা কাজে মুসলমানের হয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁরা ছিলেন বাঙলা না-জানা মুসলমান। তাই আমরা রামমোহন প্রভৃতির সমকালে কিংবা রাজনারায়ণ, দেবেন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমকালে ইংরেজিশিক্ষিত আবদুল লতিফকেই কেবল বাঙলা-জানা উর্দুভাষীরূপে পাচ্ছি। মীর মশাররফ হোসেনের পিতা গ্রামে নিবাসী অবাঙালির বংশধর, তিনি বাঙলায় কথা বলতেন কিন্তু শিক্ষিত হয়েও বাঙলা বর্ণমালা শেখেননি।

৪. দেশজ মুসলমান মোল্লা, খোন্দকার, মৌলবী, মুয়াজ্জিন, উকিল [মুনশী], কাজী, কেরানি গোমস্তা প্রভৃতির ওপরে কোনো কাজে নিযুক্ত ছিল না। সিপাই কেউ কেউ হয়তো ছিল, কিন্তু ফৌজদার প্রভৃতি নিশ্চয়ই দুর্লভ ছিল। মীর কাসিম পরবর্তী মীরজাফর পুত্রদের আমলেও বাঙালি পল্টনের উত্তর বিহার ও উত্তর প্রদেশের লোকই দেখতে পাই। অবাঙালি মজনুশাহর কিংবা ভবানী পাঠকের ফকির-সন্ন্যাসী দলই তার প্রমাণ। এমনকি, একশ বছর পরেও ১৮৫৭ সনে ব্যারাকপুরে সেনানিবাসে আমরা বাঙালি সৈনিক পাইনে।

৫. কাজেই নিম্নবিত্তের নাথযোগী (তাঁতি), বৌদ্ধ ও নমঃশূদ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যসমাজ থেকেই মুখ্যত দেশী মুসলিমসমাজ গঠিত। ধর্মান্তরে এদের অনেকের পেশান্তর ঘটেনি। জোলা, কৈবর্ত, কাহার, মুলুঙ্গী, কুমার, বেদে, কাগজী, নিকারী, বারুই প্রভৃতি তার প্রমাণ। তাদের শিক্ষার ঐতিহ্যই ছিল না। মুসলিম হয়েও তাই তারা শিক্ষার পথে তুর্কি-মুঘল আমলে যায়নি। তবু শাস্ত্রশিক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক বাধার অনুপস্থিতির ফলে উচ্চাভিলাষীরা আরবি, ফারসি ও বাঙলা কিছু শিখেছিল। এদের সর্বোচ্চ পেশা ও পদ ছিল উকিলের (মুনশীর) ও কাজীর।

৬. এসব শিক্ষিত পরিবারে প্রতীচ্য শিক্ষার প্রতি বিরূপতার বিশেষ প্রমাণ নেই। সৈয়দ আমীর হোসেন ১৮৮০ সনে তাঁর মুসলিম শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তিকায় মুসলিমদের জন্যে কোলকাতা মাদ্রাসা অঙ্গনেই বি.এ. কলেজ স্থাপনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথাপ্রসঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষা তখন মুসলিমসমাজে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। নওয়াব আবদুল লতিফ [১৮২৮-৯৩] রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মুসলিমদের ১৮৬৩ সনেই ইংরেজি শিক্ষামুখী করতে চেয়েছেন। তিনি ১৮৬৮ সনে মুসলমানদের জন্যে তিন প্রকার শিক্ষাপদ্ধতির সুপারিশ করেছিলেন—ইংরেজি শিক্ষায় অনিচ্ছুকদের জন্যে কেবল আরবি মাদ্রাসা, অন্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে এ্যাঙলো-পার্সিয়ান এবং তার সঙ্গে চারবছর মেয়াদি বিশুদ্ধ কলেজীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকবে ইচ্ছুকদের জন্যে। কলেজ কোলকাতা মদ্রাসার সঙ্গে যুক্ত হয়নি বটে, তবে নওয়াব লতিফের চেষ্টায় ১৮৭৩ সন থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে (প্রাক্তন হিন্দু কলেজে) মুসলিম ছাত্রদের পড়ার অধিকার দেয়া হয়।

৭. কোলকাতায় যারা হাঁটাপথে আসতে পারত, তারাই কোলকাতার কোম্পানির প্রসাদ ও ইংরেজি শিক্ষা গোড়া থেকেই গ্রহণ করেছে। এরা কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ও শূদ্ররা আর দেশী মুসলমানরা সাধারণত এ সুযোগ গ্রহণ করেনি। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও ইংরেজি শিক্ষাবিরোধী পরিবার ছিল, বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস তার প্রমাণ।

৮. শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন মুসলমান পরিবারে বিশেষ করে উকিল ও কাজী পরিবারে ইংরেজিশিক্ষা গোড়া থেকেই ছিল। ১৮২৪ সনে নওয়াবের আগ্রহে নওয়াব পরিবারের ও পদস্থ কর্মচারীদের সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্যে কোম্পানি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মুর্শিদাবাদে। কাজেই ইংরেজির প্রতি অনীহার ও ইংরেজি বর্জনের প্রমাণ নেই স্বয়ং হৃতরাজ্য ও হৃতপ্রভাব শাসকদের মধ্যেও। শেখ এহতেশামউদ্দিনের 'বেলায়েত নামা' [১৭৮০] সূত্রে জানা যায় তিনিসহ অন্তত আট জন মুসলিমও কোলকাতার ইংরেজ ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গোমস্তা ছিলেন। এবং আমরা জানি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গোড়া থেকেই ত্রিশোর্ধ্ব শিক্ষিত মুসলিম নিযুক্ত ছিলেন। অন্য প্রমাণ নওয়াব আবদুল লতিফ [১৮২৮-৯৩] ও সৈয়দ আমীর আলী [১৮৪৯-১৯২৮] এবং ১৮৬৩ সন থেকে মুসলিম গ্রেজুয়েটদের আইন পড়ার প্রবণতা। অন্যদের ঐতিহ্য ছিল না। কোলকাতার চারপাশে মুসলিম বাসিন্দার স্বল্পতাও মুসলিমসমাজে শিক্ষার প্রসার রুদ্ধ থাকার অন্যতম কারণ। দেশী মুসলমানদের যদি শিক্ষার ঐতিহ্য থাকত তাহলে আমরা মুসলিমসমাজে সাক্ষর বা আরবি-ফারসি শিক্ষিত (তা যতই নিম্নমানের হোক) অনেক লোক পেতাম। উল্লেখ্য যে, স্যার সৈয়দ আহমদ খানের [১৮১৭-৯৮] প্রবর্তনায় ১৮৭০ সনের দিকে ভারতের মুসলিম-মনে ব্রিটিশপ্রীতি জাগে, কিন্তু তখনো ঐতিহ্যের ও গাঁয়ে স্কুলের অভাবে ইংরেজিশিক্ষার প্রতি প্রত্যাশিত আগ্রহ জাগেনি দেশজ মুসলিম-মনে।

৯. যেসব অবাঙালি প্রশাসনে ও সৈন্যবাহিনীতে চাকরি করত তারা আভিজাত্যাভিমানবশে অন্য চাকরি গ্রহণ করেনি, এবং তাদের মধ্যেই হয়তো শ্রেণী হিসাবে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও তজ্জাত ইংরেজিশিক্ষায় অনীহা ছিল। (অবশ্য তাদের অধিকাংশই উত্তরভারতের দিকে হিজরত করে) এদের মধ্যে বাঙালি থাকলে তাকে ব্যতিক্রম বলতে হবে এবং সে-ব্যতিক্রম হিন্দুদের মধ্যেও দুর্লভ ছিল না। কিন্তু দেখা যায় শাসকগোষ্ঠীর মুসলিমদের মধ্যেও ইংরেজ-বিদ্বেষ দুর্লভ ছিল, প্রমাণ আজিমুদ্দিনের ও এহতেশামউদ্দিনের বিলেত যাত্রা।

১০. হিন্দুদের মধ্যে সামাজিক ও শাস্ত্রিক যোগাযোগের প্রভাবে দেশের গাঁ-গঞ্জের হিন্দুরাও কোলকাতার চাকরির লোভে ও ঐশ্বর্য-লিপ্সাবশে দ্রুত ইংরেজি শিখতে থাকে। কিন্তু মুসলিম-বিরল কোলকাতায় মুসলিমসমাজকে আকৃষ্ট করবার মতো পরিবেশ ছিল না। মুর্শিদাবাদ রাজধানীর মর্যাদা হারাবার ফলে মুর্শিদাবাদী বৃত্তিজীবীরা জীবিকার গরজে কোলকাতায় আসে। তারাই কোলকাতার উর্দুভাষী মুসলিম বাসিন্দা। কিন্তু ইংরেজিশিক্ষায় তাদের আগ্রহ ছিল না। আবদুল লতিফ ছিলেন কোলকাতার উর্দুভাষী উকিলের সন্তান।

১১. রসুলের ইসলাম প্রচার কালেই একেশ্বরবাদ, সাম্য, যুদ্ধ, রাজ্য প্রতিষ্ঠান, ওহি ও দীক্ষিত মুসলিমে সঞ্চারিত আল্লাহ্‌তে ও আত্মশক্তিতে অটল বিশ্বাস সাধারণ মুসলিম মনে ইমান, শাস্ত্রীয় আচরণ ও পার্থিব উন্নতি অভিন্ন করে তুলেছিল। এই বিভ্রান্তির জের থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ মুসলিমরা আজো মুক্ত নয়। তাই দুর্দিনে এরা উন্মেষ-যুগের মুসলিম-জীবন, বিশ্বাস ও আচারিক বিশুদ্ধতাই সব পার্থিব উন্নতির কারণ হিসেবে স্মরণ করে। মনে করে ইমানের জোরই এবং আচারিক বিশুদ্ধতাই সব পার্থিব দৈন্য ঘুচাতে পারে। কেননা মুমিন কখনো দুর্ভোগের-দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারে না। আগের যুগের রেওয়াজ অনুসারে আঠারো শতকের ভারতীয় মুসলিমরা তাই তাদের রাজনীতিক ও আর্থিক দুর্ভাগ্যের জন্যে শাস্ত্রানুগত্যে শৈথিল্যকে ও আচার-বিকৃতিকেই দায়ী করে। ফলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ [১৭০২-৬২] থেকে সৌভাগ্য ও শক্তি পুনঃপ্রাপ্তি লক্ষ্যে সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়, এ আন্দোলন প্রবল হয় আরবের মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব [১৭০২-৯১] প্রভাবিত হাজী সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর [১৭৮৬-১৮৩১] নেতৃত্বে। এ সময়ে পাঞ্জাবের শিখ রাজার শাসনে মুসলমানরা 'আজান' দেয়া, গো-হত্যার ও অন্যান্য শাস্ত্রীয় পার্বণিক অনুষ্ঠানের অধিকার হারায়। তাছাড়া, আর্থিক জীবনেও শিখ জমিদার-মহাজনের কাছে ঋণী মুসলমানকেও ঋণের ও খাজনার দায়ে বউ-ঝিকে ও ছেলেকে দাসী-দাসরূপে ঋণ আদায় সাপেক্ষে বন্ধক রাখতে হত। সাতশো বছরের শাসক মুসলমান এতে অপমানিত বোধ করে। তাই মুসলিম রাজশক্তির পুনরুত্থান লক্ষ্যে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ শিখ-রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ পরাজিত ও নিহত হন [১৮৩১ সনে]। সৈয়দ আহমদ শিখযুদ্ধে কোলকাতার ব্রিটিশ শাসকদেরও নৈতিক সমর্থন পেয়েছিলেন, কেননা শিখরা ব্রিটিশের ছিল ভাবী শত্রু। ওয়াহাবীদের ব্রিটিশ বিদ্বেষ জাগে আরো পরে। বাঙলাদেশের ওয়াহাবি তিতুমীরও [১৭৮২-১৮৩২] গোড়ায় ব্রিটিশ-বিদ্বেষী ছিলেন না, শিখদের মতো হিন্দু জমিদার-মহাজনদের মুসলিম শাস্ত্রাচারে বাধাদান, দাড়ি-কর প্রভৃতিই ছিল তিতুমীরের জমিদার-বিদ্বেষের সচেতন ও প্রত্যক্ষ কারণ, যদিও মূলকারণ ছিল ওদের আর্থিক শোষণ ও পীড়ন। তিতুমীর ও ওয়াহাবিরা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হন সরকার জমিদার সমর্থক হল বলেই। শরীয়তউল্লাহ [১৭৬৪-১৮৪০] ও তাঁর পুত্র দুদুমিয়া (মহসীনউদ্দীন) [১৮১৯-৮২] ফরায়েজী আন্দোলনের আবরণে ঐ জমিদার-মহাজন ও ব্রিটিশ-বিদ্বেষ কিছুকাল চালু রাখেন। বলা বাহুল্য, ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয়। এবং অশিক্ষিত মুসলমানরাই ছিল মুখ্যত এ চাষী উত্তেজনার শিকার ও আন্দোলনের মূলশক্তি। বাঙলাদেশের নিরক্ষর পরিবারের হাজার হাজার তরুণ স্বেচ্ছায় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর, তিতুমীরের ও দুদুমিয়ার আহ্বানে মুজাহিদের মৃত্যুবরণ করেছিল। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে লঘু-গুরুভাবে চলে এ আন্দোলন, অবশেষে [১৮৬৪-১৮৬৮] সনের ওয়াহাবি বিচারে আন্দোলনের রাজনীতিক লক্ষ্য অবসিত হয়, এবং তা রূপ নেয়।

কাজেই ওয়াহাবি আন্দোলন নিরক্ষর গ্রাম্য মুসলিম-মনে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ জাগালেও, শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন পরিবারে ইংরেজিশিক্ষায় তেমন অনীহা জাগাতে পারেনি, ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র বিহারে ইংরেজিশিক্ষার বহুল প্রসারই তার প্রমাণ এবং আমাদের মীর মশাররফ হোসেন, [১৮৪৭-১৯১২], কায়কোবাদ, [১৮৫৮-১৯৫২] আবদুল লতিফ [১৮২৮-৯৩]; আমীর আলী [১৮৪৯-১৯২৮] প্রভৃতির বিদেশাগত মুসলিম বংশধর বলে পরিচিত পরিবারে ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণের আগ্রহই তার প্রমাণ। [সে সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে হিন্দুর তুলনায় মুসলিম জনসংখ্যাও (৩০%) কম ছিল] উনিশ শতকের শেষপাদে ও বিশ শতকের প্রথমপাদে পূর্ববঙ্গে সংখ্যা বেড়ে মুসলমানও গ্রাজুয়েট হচ্ছিল, তবে পড়ুয়ার সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি হয়তো উপর্যুক্ত কারণেই।

১৮৬১ -৭০ = ৯ জন

১৮৭১ - ৮০ = ১০ জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৮১-৯০ = ৬৩ জন

১৮৯১- ১৯০০ = ১১৬ জন

মোট ১৯৮ জন মুসলিম উনিশ শতকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন। এদের অধিকাংশই উর্দুভাষী এবং বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধিবাসী, কেবল বাঙলার নয়। কাজেই নিচের স্তরে কয়েক কয়েক হাজার পাস-ফেল ইংরেজি-জানা লোক সমাজে ছিল। এদের পারিবারিক, শৈক্ষিক, সাংস্কৃতিক পটভূমি সন্ধান করলে জানা যাবে হিন্দুর তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও ইংরেজিশিক্ষার প্রতি তখনকার ভদ্র পরিবারের কোনো বিরূপতা ছিল না। এ সময়ে হিন্দুসমাজের বৈদ্য ও শূদ্র শ্রেণী মুসলমানদের চেয়েও পিছিয়ে ছিল। চিরকালে চাকুরে কায়স্থ ও ব্রাক্ষণদের মধ্যে ঘোষ, বোস, গুহ, দত্ত, মিত্র এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়রা বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা দ্রুত গ্রহণ করে। অতএব, এ্যাডামের বা আজিজুর রহমান মল্লিকের সিদ্ধান্তে পুরো সত্য নিহিত নেই। সেকালের গ্রামীণ পরিবেশে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠালেই সন্তান শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহী হত না; শিক্ষকের রূঢ় নির্মম শাসন, কায়িক শাস্তি প্রভৃতি বিদ্যালয়পালানো ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। সাধারণ স্বল্পমেধার ছাত্রদের কাছে লেখাপড়া ছিল তিক্ত ওষুধের চেয়েও ভয়াবহ এবং পর্বতারোহণের মতো দুঃসাধ্য।

২

১. বলেছি, আঠারো শতক ভারতীয় মুসলমান-রাজশক্তির পতনকাল। ওয়াহাবি আন্দোলন সে-পতনের জন্যে আত্মসমালোচনার, অনুশোচনার ও পতনরোধের প্রয়াস-প্রতীক। কিন্তু য়ুরোপীয়দের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, শিল্পবিপ্লব, উন্নত কৃৎকৌশল, অস্ত্র ও যুদ্ধবিদ্যার উৎকর্ষ, প্রাশাসনিক সৌকর্য প্রভৃতির মুখে তাদের তথা প্রাচ্যের সর্বত্র মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনাসঞ্জাত প্রয়াস ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। রাজশক্তির পুনরুদ্ধারের ওয়াহাবি-প্রয়াস ছিল ধর্মীয় উত্তেজনা-নির্ভর। অবশ্য এর সকারণ কালিক প্রয়োজনও ছিল ঃ

ক. " Sikh nation has long held sway in Lahore and other places. Their oppressions have exceeded all bounds. Thousands of Muhommedans have they unjustly killed and on thousands they have heaped disgrace. No longer do they allow call for prayer from the Mosques and the killing of cows they have entirely prohibited." —হান্টারের এ উক্তিতে কিছুমাত্র সত্য থাকলেও তা যুদ্ধ বাধার পক্ষে যথেষ্ট। কাজেই সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ১৮২৬ সনের একুশে ডিসেম্বরে জিহাদ করেন স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের নিয়ে।

খ. তিতুমীরের সংগ্রামের ও জীবনের অবসান ঘটে ১৮৩১ সনে ব্রিটিশ-সৈন্যদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে। তিতুর সংগ্রামের কারণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে —Tito belonged to the Wahhabi sect of the Muhammedan fanatics and was excited to rebellion in 1831 by a Beard Tax imposed by Hindu Landholders.[১]

গ. ব্রিটিশবিরোধী ওয়াহাবিরা ব্রিটিশশাসিত ভারতকে 'দারুল হরব' বলে ঘোষণা করে এবং হিযরত করে মুসলিমশাসিত আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্যে মুসলিমদের প্ররোচিত করে। পরাজয়ের গ্লানি ও ক্ষোভ ভুলবার এ ছিল এক অক্ষম আত্মবিনাশী মনোভাব ও কর্মপন্থা।

১ Imperial Gazetter, Vol-XXIV p.71

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. ওয়াহাবি বিচারের (১৮৬৮ সন) পরে এবং ব্রিটিশপ্রেমী স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে ও প্রবর্তনায় উচ্চবিত্তের মুসলমানের মনে ব্রিটিশপ্রীতি এবং আনুগত্য দ্রুত প্রসার লাভ করে। তখন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজিশিক্ষিত মুসলিম-মনে ব্রিটিশপ্রীতি ও হিন্দু-বিদ্বেষ সাধারণভাবে বাড়তে থাকে। ফলে ধর্ম-আচরণে বাধা নেই—এ তথ্যের স্বীকৃতিতে ভারতকে 'দারুল হরব' বলা অযৌক্তিক বলে উপলব্ধ হয়।

ঙ. সিপাহী বিদ্রোহ দিল্লির বাহাদুর শাহর নেতৃত্বে হওয়ায় ওয়াহাবিরা সিপাহী বিদ্রোহে প্রধান বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করে। মুসলিমদের প্রতি ব্রিটিশ-বিরূপতার এ সুযোগ নিয়ে মুসলিমদেরকে, বাঙলা সুবাহ্র সরকারি চাকুরি থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয় ব্রিটিশ ও হিন্দু চাকুরেরা।

১৮৬৯ সনে ফারসি সংবাদপত্র 'দূরবীন'-এ প্রকাশিত এক পত্রের সূত্রে (এ সম্বন্ধে কোনো সরকারি প্রতিবাদ বা বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি) প্রকাশ পায় :

> "All sorts of employments, great and small are being snatched away from the Muhammedans and bestowed on men of other races, particularly the Hindus.....it (Govt) singles out the Muhammedans in its Gazette for exclusion from official posts. Recently when several vacancies occured in the office of the Sunderban's Commissionner, that official, in advertising them in Govt. Gazette stated that the appointments should be given to none but Hindus, etc".

চ. ওয়াহাবি দমনের পরে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী কোলকাতায় নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর হোসেন ও সৈয়দ আমীর আলী ব্রিটিশ-আনুগত্যে মুসলিম-কল্যাণ কামনা করতে থাকেন—উত্তর-ভারতে তখন এ কাজই করছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। এসময়ে বাঙলাদেশে মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন, ১৮৫৫ সনে আঞ্জুমান, ও ১৮৬৩ সনে মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

ছ. শোনা যায়, বারাণসীর হিন্দু পণ্ডিতেরা (১৮৬৭ সনে) উত্তর-ভারতীয় ভাষাকে নাগরী হরফে ও হিন্দি নামে চালু করার আন্দোলন শুরু করলে, ফারসি হরফে উর্দু নামের সমর্থক সৈয়দ আহমদ খান স্ব-সমাজের স্বার্থে হিন্দুকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন।[১] উল্লেখ্য যে, উর্দু ভাষায় ও রচনায় হিন্দুরা নিজেদের খুঁজে পায়নি বলেই উর্দু বর্জনে ও হিন্দি গ্রহণে উৎসুক হয়েছিল, বাঙালি মুসলমান যেমন উনিশ শতকে বাঙলা ভাষায় ও রচনায় নিজেদের কথা না-দেখে 'হিন্দুর ভাষা' পরিহার করে নিজেদের জন্যে উর্দু-ফারসি ভাষা কামনা করেছিল স্বাতন্ত্র্য রক্ষার গরজেই।

৩

১. ষোলো শতক থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে য়ুরোপীয়রা বহির্বিশ্বে ভাগ্যান্বেষণে বের হতে বাধ্য হয়। বাঁচার গরজবোধই তাদের আবিষ্কারের ও সৃষ্টিশীলতার জনক। কাজেই চিন্তায়, চেতনায়, উদ্যোগে, আয়োজনে, হাতিয়ারে, সাহসে, বাণিজ্যে, অস্ত্রে, সমরবিদ্যায় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তারা এশিয়াবাসীদের ছাড়িয়ে গেল। কাজেই তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে যে-

---

১ স্যার সৈয়দ আহমদ : সৈয়দ আলতাফ হোসেন হালী : মৌলনা মুজিবুর রহমান অনূদিত, পৃ ১৪৮-৫৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো আফ্রো-এশীয় রাজশক্তির পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। অতএব পলাশীর যুদ্ধ তা এ অঞ্চলে সূচনা করে মাত্র। এ-কারণেই একশো বছর সময় পেয়েও ভারতীয় কোনো রাজন্য ব্রিটিশকে প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

২. পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশ-প্রাবল্য স্বীকৃতি পেল মাত্র! কিন্তু পলাশীযুদ্ধই ব্রিটিশ কোম্পানিকে সুবেহ-বাঙলার কর্তৃত্ব দেয়নি। হয়তো মীর কাসিমের মতো পরে কেউ ব্রিটিশকে বাঙলা থেকে উৎখাত করতে পারত, কিন্তু দিল্লির সম্রাট-নিযুক্ত দেওয়ান রূপেই বাঙলায় তথা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিহত ও রণজিৎ শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেল। বস্তুত ১৮৫৭ সন অবধি কোম্পানি জনসাধারণের কাছে দিল্লি-সম্রাটের দেওয়ান রূপেই ছিল পরিচিত, যদিও ১৭৬৫ সন থেকে কোম্পানিই স্বাধিকারে ছিল সার্বভৌম।

হান্টার বলেছেন : "The English obtained Bengal simply as the Chief Revenue Officer of the Delhi emperor. Instead of buying the appointment by a flat bribe, we won it by sword. But our legal title was simply that of the Dewan of Chief Revenue Officer [See the 'Firman' of the 12th August in Mr. Aitchison's Treatises/or in the Quarto Collecion put forth by the East India Company in 1812, XVI to XX] As Such the Muhammedans hold that we (the English) were bound to carry out the system which we then undertook to administer, There can be little doubt, I think, that both parties to the treaty at the time understood this. For some years the English maintained these Muhammedan officers in their posts, and when they began to venture upon reform they did so with a caution bordering on timidity."

৩. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিব্যবস্থা (১৭৯৩ সনে). সমাজে ভূকম্পনের মতো একটা ওলটপালট অবস্থার সৃষ্টি করল। এতে পুরোনো ভূস্বামী ও ভূ-চাষী সবাই হল ক্ষতিগ্রস্ত, সনাতন জীবনযাত্রায় এল বিপর্যয়, রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায়ও এল আমূল পরিবর্তন। James O. Kincaly বলেছেন "By it (permannent Settlement of 1793) we (the English) usurped the functions of those higher Mussalman officers who had formerly subsisted between the actual Collector and the Govt...... Instead of Mussalman Revenue Farmers.... we placed an English Collector in each District......it most seriously damaged the position of the Great Muhammedan houses....it elevated the Hindu Collectors who upto that held but unimportant posts to the position of landholders." [এদের মধ্যে বাঙালি মুসলিমও ছিল কি-না জানা নেই।]

৪. আরো পরে ১৮২৮ সনের আইনে দেবোত্তর ও আয়মা তথা লাখরাজ সম্পত্তিতে রাজস্ব তথা ভূমি-কর বসিয়ে মোল্লা, খোন্দকার, মুয়াজ্জিন, শিক্ষক, দরগাহর-মুতোয়াল্লিরূপে এবং পীরালী বা রাজানুগ্রহ-সূত্রে পাওয়া লাখরাজ ভূসম্পদ কেড়ে নেয়ায় বসে-খাওয়া উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বহু মুসলমান হল সর্বস্বান্ত (১৮২৮-৪৬ সনের মধ্যে)। হিন্দুর দেবোত্তরও গেল বটে, কিন্তু তারা সে-ক্ষতি পুষিয়ে নিল কোম্পানির ব্যবসায় ও প্রাশাসনিক কাজে নিয়োগ পেয়ে, অসদুপায়ে সহজে লভ্য কাঁচা টাকা আয় করে। এতে পুরোনো শিক্ষালয় চালু রাখা এবং দরগাহ, মসজিদ প্রভৃতির সংরক্ষণ অসম্ভব হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র। অতএব ১৯২৮ সনের পূর্বে কোম্পানি আমলের প্রায় ষাট-আশি বছর অবধি মুসলিম পরিবারগুলো আয়মা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পত্তি ভোগ করেছে। কিন্তু এসব মুসলমানদের যারা সহি দলিল দেখাতে পেরেছে, তাদের ওয়াকফ সম্পত্তি ভোগে বাধা হয়নি। তাছাড়া এদের মধ্যে দেশজ মুসলিমের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

৫. ইংরেজিশিক্ষাকে মিশনারিদের প্রচার-আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণভাবে দেশীয় লোকেরা ভয়ের ও সন্দেহের চক্ষে দেখেছে বটে, কিন্তু লাভের-লোভের ও প্রয়োজনের মুখে সে ভয়-বাধা টেকেনি হিন্দুর ক্ষেত্রে। মুসলমানের ক্ষেত্রেও আসলে টেকেনি। মুসলমান পিছিয়ে পড়ল অন্য কারণে। মুঘল-আমলেও রাজস্ব অফিসে (তখনকার একমাত্র প্রধান কার্যালয়) বেশি সংখ্যায় কাজ করত হিন্দুরা। মুসলমান ছিল বিচারালয়ে কাজী ও উকিল হিসেবে, আর সৈন্যবিভাগে (সাধারণভাবে অবাঙালি)। তাই কোম্পানির ব্যবসায়ে ও অফিসে অজস্র রোজগারের লোভে কোলকাতায় হিন্দুরা উনিশ শতকের (স্মর্তব্য যে সতেরো-আঠারো শতকেও হিন্দুরাই কোলকাতায় কোম্পানির গোমস্তা, বানিয়া, মুন্সী, মুৎসুদ্দি ও কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছে এবং সামান্য মৌখিক ও লিখিত ইংরেজি শিখেছে)। গোড়া থেকেই মৌখিক ও লিখিত ইংরেজি শেখা শুরু করে পরম আগ্রহে—নতুন যুগে তারা দ্রুত ধনী হতে চেয়েছে ধর্মহানির ভয় উপেক্ষা করে। কোলকাতায় সে-শ্রেণীর দেশী মুসলমান উপস্থিত ছিল না। মুর্শিদাবাদ থেকে শহুরে বৃত্তিজীবীরাই কেবল নতুন শাসনকেন্দ্র বন্দর-শহর কোলকাতায় জীবিকা অর্জনের গরজে এসেছিল। তাই ইংরেজি শিক্ষায় এবং কোম্পানির চাকরিক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়ল মুসলমানরা। দেশজ আতরাফ-আজলাফ নিম্নবৃত্তিজীবী মুসলিমদের শিক্ষার ঐতিহ্য ছিল না বলে, আর দেশজ অন্য মুসলিমরা কোলকাতা থেকে দূরে ছিল বলেই ইংরেজিশিক্ষা ও চাকরিক্ষেত্রে বঞ্চিত রইল—ইংরেজ ও ইংরেজি বিদ্বেষের ফলে নয়।

৬. অতএব হিন্দুরা যখন ব্যক্তিগত আগ্রহে ও সামষ্টিক প্রয়াসে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে (হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত ১৮১৭ সনে) ইংরেজিশিক্ষায় প্রায় পঞ্চাশ বছরে অগ্রসর, তখনও মুসলমান কোলকাতায় গিয়ে স্থিতধী ও কর্তব্য-সচেতন হতে পারছিল না। যদিও ১৭৮০ সনেই কোলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, এই মাদ্রাসায় শিক্ষার সুযোগ নিয়েছে অবাঙালি মুসলমানরাই। শিক্ষকদের মধ্যেও কেউ বাঙালি ছিলেন না। দেশের অন্যান্য মাদ্রাসায়ও মুঘল আমল থেকে প্রায় ১৯৩০ সন অবধি বাঙলা হরফও শেখানো হত না। মাদ্রাসাশিক্ষিতদের জন্যেই চট্টগ্রামে আরবি হরফে বাঙলা বইয়ের প্রতিলিপি তৈরি করা হত, প্রমাণ সৈয়দ সুলতান রচিত 'জয়কুমরাজার লড়াই' পুঁথির লিপিকারের উক্তি :

> হীন আফতাবুদ্দিন কহে আল্লা নবী
> পূর্বের বাঙ্গালা অক্ষর আমি করিলাম আরবী।

নসরুল্লাহ্ খোন্দকারের 'শরীয়তনামা'য়ও লিপিকর বলেন ঃ

> কন্ হরফে কন্ লফজন বুজিএ অর্থ
> বাঙ্গালা অক্ষর হেরি আরবীর পুস্ত।

মাদ্রাসাশিক্ষিতরা ১৮৩২ সনের ডেপুটিগিরির সুযোগ পেলেও ১৮৩৮ সনের শিক্ষার ও শাসনের ইংরেজিমাধ্যমের সুযোগ তারা পায়নি। বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানরা ধর্মহানির পরওয়া না করেও ইংরেজি শিখত, কিন্তু কোলকাতা-কেন্দ্রী বাস্তব পরিবেশ তাদের অনুকূল ছিল না। মুসলমানরা আদালতে কাজীগিরি হারাল বটে, কিন্তু ওকালতি ব্যবসায়ে তারা ইংরেজিশিক্ষিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উকিল সৃষ্টি হওয়ার আগে পর্যন্ত মোটামুটিভাবে ১৮৬০ সন অবধি সংখ্যাগুরুই ছিল। ঐটিই তখন তাদের শহুরে রোজগারের একমাত্র উপায়। বাঙালি ফৌজদারদের বা অবাঙালি সেনাদের যারা দেশে রয়ে গেল, তারাও আত্মসম্মানের কারণে অফিসের চাকরি নিজেদের বা তাদের সন্তানদের জন্যে কামনা করেনি। সৈন্যবিভাগের চাকরির মর্যাদা তখন বেশি ছিল।[১] অতএব ১৮৩২-৩৩ সনে ডেপুটি নিয়োগকালে ও কাজী কমিশনারের বদলে 'মুন্সেফ' পদ সৃষ্টিকাল থেকে [১৮৩৮?] মুসলমানরা সরকারি অফিস-আদালত মুসলিম-শূন্য বা মুসলিম-বিরল হতে থাকে।

৭. অবশ্য ১৮৬০ সন থেকে বিশেষ করে ১৮৬৮ সনে ওয়াহাবি বিপ্লবের অবসানে ব্রিটিশপ্রীতি নীতির প্রভাবে আর্থিকজীবন উন্নত করার লক্ষ্যে শিক্ষার ঐতিহ্যসম্পন্ন মুসলমানরা ইংরেজিশিক্ষায় মনোযোগী হয়। প্রথমত সেই শ্রেণীর মুসলমানের সংখ্যা দেশে বেশি ছিল না, দ্বিতীয়ত স্কুলে পাঠালেও পরিবেশের, প্রেরণার ও আগ্রহের অভাবে অধিকাংশের শিক্ষা স্কুলের নিম্নশ্রেণীতেই হয়েছে অবসিত। মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক কিংবা শেখ আবদুল রহিম প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের জীবনচরিত এ সাক্ষ্যই যখন দান করে, তখন অজ্ঞাত অসংখ্য ভদ্রসন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চিত অনুমান করা চলে; তবু উনিশ শতকেই আমরা ১৯৮ জন গ্র্যাজুয়েট, কিছু উকিল, কিছু ডেপুটি, কিছু মুন্সেফ ও অন্যান্য চাকুরে এবং কয়েক হাজার স্কুলে-পড়া, পাস ও ফেল এনট্রান্স এফ.এ. ও বি.এ. শিক্ষার্থী পেয়েছি। এরা সমাজে পতিত হয়নি, সগৌরবে প্রতিষ্ঠাই পেয়েছিল। কাজেই রাজ্যহারাদের [রাজ্য হারাল মুঘল সুবাদার, বাঙালি মুসলমান নয় এবং স্বধর্মী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে শাসিত দেশজ মুসলিমের কোনো আত্মিক বা আত্মীয়তার যোগ ছিল না] ব্রিটিশ-দ্বেষণা বা ইংরেজি-বিদ্বেষ তত্ত্বে কোনো সত্যই নেই। হিন্দু-অধিকৃত অফিস-আদালতে সামাজিক কারণেই মুসলিমদের চাকরি পাওয়া ছিল দুঃসাধ্য। কাজেই মুসলমানরা সে-কারণেও উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথম পাদে সন্তানকে ইংরাজি শিক্ষা দানে বিশেষ যত্নবান ছিল না। তা'ছাড়া মুঘল আমলে গাঁয়ের মুসলিম সমাজে (আতরাফদের মধ্যে তো নয়ই) বাঙলা ও আরবি-ফারসিতে সাক্ষর লোকের সংখ্যা উনিশ-বিশ শতকের চেয়ে বেশি ছিল বলে প্রমাণ নেই। উচ্চ-শিক্ষিত আলেম বা মুন্সী সব গাঁয়ে ছিল না। মোল্লা, খোন্দকার, ইমাম, মুয়াজ্জিন, পণ্ডিত, হেকিমও সব গাঁয়ে ছিল বলে ঐতিহ্যপরম্পরায় কিংবা শ্রুতিস্মৃতি সূত্রে জানা যায় না। তবে সাক্ষর লোক দু-চারজন ছিলই। এই সচ্ছল সাক্ষর পরিবারগুলোই গাঁয়ের খানদানি পরিবার। উল্লেখ্য যে, দেশজ মুসলিম নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের হিন্দু থেকেই দীক্ষিত। কাজেই তাদের না ছিল সম্পদ, না ছিল সাক্ষরতা; মুসলমান হয়েই তারা সাক্ষরতার সুযোগ পায়, কিন্তু ঐশ্বর্যে অধিকার পাওয়ার কারণ ঘটেনি। তুর্কি-মুঘল আমলেও জমিজমা ও অর্থবিত্তের মালিক ছিল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থরা। সুতরাং ধর্মান্তরের ফলে তাদের কৃচিৎ কারো পেশান্তর ঘটেছে এবং দারিদ্র্য ঘুচেছে।

৮. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলেও কোলকাতায় এরাই চাকুরে গোমস্তা, ফড়ে, বেনে হিসেবে কাঁচা টাকার মালিক হয়। আবার ১৭৯৩ সনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামের ভূমি বা রাজস্ব ব্যবস্থায় বর্ণ-হিন্দুরাই লাভ-ক্ষতি সমভাবে ভোগ করে, জমিদারি নিলাম হল হিন্দু-জমিদারের, ক্রয়ও করল উঠতি গোমস্তা, বানিয়া, ফড়িয়ারা। তুর্কি-মুঘল আমলেও অস্থায়ী মুসলিম চাকুরে জায়গিরদার থাকলেও, স্থায়ী জমিদারও ছিল সাধারণভাবে হিন্দুরাই। স্মর্তব্য

১ Transition in Bengal [১৭৬৫-৭২] Dr. A. Majed Khan.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, মুর্শিদকুলি খাঁ হিন্দু-ইজারাদার ও পদস্থ হিন্দু-চাকুরে সৃষ্টি করে পরিণামে হিন্দু-জমিদারের ও ধনীহিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। বাঙলার বড় পনেরোটি জমিদারির মধ্যে দুটো এবং ছোট একুশটি জমিদারির মধ্যে দুটো ছিল মাত্র উর্দুভাষী মুসলিমের হাতে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অন্য চাষীর সঙ্গে মুসলিম চাষীরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়, আর উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে আয়মা-লাখরাজ-ওয়াক্ফ সম্পত্তি হারিয়ে কিছুসংখ্যক মুসলিম ভদ্র পরিবার আকস্মিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রেও দেশের মুদ্রানির্ভর শিল্প-বাণিজ্য ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ায় দেশের মানুষের বেকারত্ব ও দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ফলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদেই নতুন অর্থে, বিত্তে, বিদ্যায় ও চাকরিতে মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ে—যা বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূরণ করার জন্যে মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে প্রয়াসী হয়।

৯. ইংরেজ আমলে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থার ফলে ও রাজস্ব বৃদ্ধির কারণে মহাজন ও দুর্ভিক্ষ-কবলিত চাষীরা বাঁচার তাগিদেই মরিয়া হয়েই স্থানিকভাবে তাৎক্ষণিক উত্তেজনাবশে কখনো কখনো বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এভাবে এবং কালান্তরে নানা কারণে যে-চেতনা সঞ্চারিত হয়, শোষণ ও স্বাধিকার সম্বন্ধে যে-অস্পষ্ট ধারণা দানা বাঁধতে থাকে, এবং পরে পরে শহুরে লোকদের মধ্যে প্রতীচ্যশিক্ষা প্রভাবে যে স্বধর্মীয় স্বাজাত্যবোধ জাগে, তাতেই জমিদার-মহাজনকে শোষকশ্রেণীরূপে চিহ্নিত না করে ব্রিটিশের পরোক্ষ প্ররোচনায় ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করেই দ্বন্দ্ব-সংঘাত-সংগ্রামকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করা হয়। ফলে হিন্দুরা শোষক জাতি ও মুসলিমরা বাঙলায় শোষিত জাতি হিসেবে পরস্পর সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষবাষ্পে আত্মহনন করছিল।

এবার সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই কোম্পানি আমলের শেষাবধি সুবাহ-ই-বাঙ্গালার তথা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গাঁয়ের-গঞ্জের মানুষের মানস-জীবনে কিংবা সামাজিক সংস্কারে ও রীতি-রেওয়াজে তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। কোম্পানির নতুন ভূমিব্যবস্থার ও বাণিজ্যনীতির প্রভাবে তাদের আর্থিক জীবনে আকস্মিক ও অভাবিত বিপর্যয় ঘটে। কেবল কোলকাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাই বানিয়া-ফড়িয়া-গোমস্তা-চাকুরেরূপে বিত্তে এবং পরে বিদ্যায় প্রবল হয়ে কোম্পানির কর্মচারীদের সহযোগীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এ সময়কার কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরা উৎকোচ-উপঢৌকন গ্রহণে ও অন্য অসদুপায়ে অর্থোপার্জনে ছিল একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও সহযোগী—এ সুযোগ কোলকাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও পেয়েছিল। কোম্পানির শোষণের ও দেশী প্রশাসক-ভূস্বামীর পীড়ন-শোষণের ক্ষতি ও দুর্ভোগ বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষই ভোগ করেছে। দেশজ মুসলমানরা সাধারণভাবে নিরক্ষর, দরিদ্র ও বৃত্তিজীবী এবং প্রান্তিক চাষী ছিল শূদ্র-সদ্‌গোপ হিন্দুদের মতোই। কোলকাতার কোম্পানির সহযোগী ও চাকুরে স্বল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য ব্যতীত জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষই জমিদার-মহাজনের শোষণে এবং কুটিরশিল্প-বিধ্বংসী কোম্পানির আমদানিকৃত পণ্যের চাপে দারুণ জীবিকাসংকটে পড়ে।

কিন্তু ১৮১৮ সন অবধি কোলকাতার বিত্তবান লোকেরাও প্রতীচ্য মানসের অধিকারী হয়নি, তার প্রমাণ এর আগে অর্ধশতক ধরে কোম্পানির রাজত্বে থেকেও তারা ইংরেজিশিক্ষার কিংবা সংবাদপত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি। বিদ্যা ও বিত্ত একে অপরের পরিপূরক ও নামান্তর হল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। তখন বিদ্বান হলেই প্রশাসক ও বিত্তবান হয়ে উচ্চবিত্তের সংস্কৃতিবান সমাজ-সদস্য হওয়া যেত। এ সময়েই বিদ্যায় ও বিত্তে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ বিপুল-কলেবর হয়ে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে ১৮৭০ সন অবধি মুসলিমসমাজ কোলকাতায় কোম্পানি বিতরিত অর্থ-বিত্তরূপ কৃপা মোটেই পায়নি। কোম্পানির বাণিজ্যগদির কোনো চাকুরেই—গোমস্তা-বানিয়া-ফড়িয়া-সেবন্দী—মুসলমান ছিল না [যদিও আটজন ইংরেজের ব্যক্তিগত আটজন মুসলিম মুনশির বা গোমস্তার নাম পাওয়া যায়] কোম্পানির বাণিজ্য ও শাসনকেন্দ্র কোলকাতা-মদ্রাজ-বোম্বাই ছিল শিক্ষিত মুসলিম-অধ্যুষিত দিল্লি-আগ্রা-মুর্শিদাবাদ থেকে দূরে। তাই বাঙালি-অবাঙালি কোনো মুসলমানই হিন্দু-আকীর্ণ কোম্পানির সদাগরি অফিসে পরেও ঠাঁই করে নিতে পারেনি। তাই বলতে গেলে আঠারো-উনিশ শতকের সুবাহ-ই-বাঙ্গালায় মুসলমানরা কোম্পানির আন্তর্জাতিক বাণিজ্যসঞ্জাত কাঁচা পয়সার কপর্দকও পায়নি—পেয়েছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যরা চাকুরে ও ব্যবসায়ীরূপে। একে বিশ শতকের শিক্ষিত ক্ষুব্ধ মুসলমানরা ব্রিটিশ-হিন্দুর সুপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রজাত বঞ্চনা বলে জেনেছে—ভুল ধারণার ও সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্বের উৎস এ-ই।

আঠারো শতকের শেষপাদ থেকে ১৮৭০ সন অবধি প্রাশাসনিক, শৈক্ষিক প্রভৃতি নানা ব্যাপারে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ ও অভিমত গ্রহণ করত কোম্পানি সরকার। জমিদার-ব্যবসায়ীরাই দিত এ পরামর্শ ও অভিমত। এসময়ে মুসলিমসমাজের প্রতিধিনিত্ব যাঁরা করেছেন কোলকাতায়, তাঁরা কেউ বাঙালি ছিলেন না, তাঁদের সঙ্গে দেশজ ও গ্রামীণ বাঙালি মুসলমানের ভাষিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এমনকি বৈষয়িক যোগও ছিল না; তাঁদের আত্মীয়রা আগেই উত্তরভারতে হিযরত করেছিল। নানা কারণে যাঁরা এখানে আটকে পড়েছিলেন, তাঁরা তাই বাঙালি মুসলিমদের প্রয়োজনের কথা, দাবির কথা হিন্দুদের মতো বলতে পারেননি—জানতেন না বলেই এবং জানার গরজবোধও করেননি বলেই। ১৮৩০ সনের আগে ওয়াহাবিরাও ব্রিটিশ-বিরোধী ছিল না। কাজেই গোটা কোম্পানি আমলের একশো বছর ধরে মুসলমান মাত্রই ছিল প্রতীচ্য কোম্পানির বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রভাবপ্রসূত দ্রুত পরিবর্তমান আর্থিক, বাণিজ্যিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনভাবনার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ও বঞ্চিত। এ ব্রিটিশ-হিন্দুর ষড়যন্ত্রসঞ্জাত নয়—ঐতিহাসিক ও প্রাতিবেশিক প্রতিকূলতাপ্রসূত।

গোড়া থেকেই প্রশাসনে ও পণ্যসংগ্রহে ব্রিটিশ কোম্পানির সহযোগী ও ব্রিটিশ কৃপাপুষ্ট হিন্দুরা ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের দয়ার দান বলে জানল ও মানল মোটামুটি হিন্দুমেলার [১৮৬৭] পূর্বাবধি। আর কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক কারণে ও কিছুটা ব্রিটিশ-প্ররোচনায় স্বকালের বাস্তব জীবন-জীবিকাক্ষেত্রে অপসৃয়মাণ ও অপসৃত পূর্বশাসকগোষ্ঠী তুর্কি-মুঘলের স্বধর্মী নির্বিশেষ মুসলমানের প্রতি—বর্তমানে অমূলক-অপ্রয়োজনীয় হলেও—বিদ্বেষ-চেতনা জিইয়ে রাখা শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে নীতি-নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসী জাতীয়তাবোধের উন্মেষ-মুহূর্ত অবধি। আবার এ সময় থেকেই [১৮৭০-১৯১৮] [অবাঙালি নেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী [১৭৮৬-১৮৩১], স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-৯৮) ও হিন্দুবিদ্বেষবশে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালি মুসলিমরাও ব্রিটিশ শাসনকে আল্লাহর রহমত বলে ভাবতে থাকে। অতএব, প্রথম একশো বছর [১৭৬৫-১৮৬৬] হিন্দুদের এবং শেষ আটচল্লিশ বছর [১৮৭০-১৯১৮] খেলাফত আন্দোলনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কিংবা ১৯৪৭ সন অবধি মুসলিমদের নিরঙ্কুশ অনুগত্য পেয়েছে ব্রিটিশ। এবং এ পুরো কালপরিসরে হিন্দু-মুসলিম পরস্পর ছিল মানস এবং কখনো কখনো সক্রিয় দ্বেষ-দ্বন্দ্বের শিকার। উনিশ শতকে হিন্দুরা কেবল হিন্দু-ঐতিহ্যের স্মরণে ও অনুশীলনে আধুনিক হিন্দুজাতি গড়ে তোলার সাধনা করেছে, মুসলিমরাও জাতিসত্তার সংরক্ষণ লক্ষ্যে কেবল দেশ-কাল নিরপেক্ষ মুসলিম-ঐতিহ্য ও ইসলাম-চেতনাআশ্রয়ী থেকে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন। হিন্দু-মুসলিমের সাহিত্যাদি রচনাই তার প্রমাণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি হিন্দুর সুবিধা ও সমস্যা

বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবাহ্-ই-বাঙ্গালা ব্রিটিশ আমলে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' নামে হল পরিচিত। এর মধ্যে বাঙালি মুসলিমরা উনিশ শতকে ধর্মীয় জাতিসত্তা সম্বন্ধে যতই চেতনা লাভ করতে থাকে, ততই তার স্বধর্মীর ঐতিহ্য-ঐশ্বর্যগর্ব যেমন একদিকে বাড়তে থাকে, অপরদিকে শিক্ষা-সম্পদ-চাকরি ও আর্থিক ক্ষেত্রে নিজেদের হীনাবস্থার জন্যে ব্রিটিশের ও হিন্দুর দুশমনীকে দায়ী করে নিষ্ক্রিয় বিক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করতে থাকে।

বাঙলার বর্ণহিন্দুরাই ঐতিহাসিক যুগে দেশের শিক্ষা-সম্পদের ও অর্থবিত্তের মালিক। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের অনেকের মধ্যে জীবিকার প্রয়োজনেই সাক্ষরতা চালু ছিল বলে মনে করা হয়, যদিও কোনো কোনো বর্গের কিছু ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের মধ্যে শাস্ত্রীয় উচ্চশিক্ষা চিরকালই ছিল দুর্লভ। সে-যুগের রাজকার্যে ও বৈষয়িক জীবনে কাঠাকালি-মণকিয়া-পণকিয়া অবধি জ্ঞান থাকলেই সাধারণের কাজ চলত। সংস্কৃত ও ফারসি-শিক্ষিত লোকেরাই সমাজে প্রাধান্য পেত।

দেশের জমিজমা ধনসম্পদ যেমন বর্ণহিন্দুদের অধিকার ছিল, তেমনি রাজস্ব আদায় প্রভৃতি প্রাশাসনিক কাজ গোড়া থেকে তাদেরই একচেটিয়া ছিল। অভ্যন্তরীণ খুচরো ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল তাদের হাতে। ইকতাদার-লস্কর-উজির-ফৌজদার-কাজী-বক্সী প্রভৃতি মুসলিম প্রশাসকদের জায়গির প্রভৃতি ছিল বটে, তবে তাঁরা বিদেশী ছিলেন বলে তাঁরা জমির সাময়িক মালিক ছিলেন মাত্র।

জমিদার-ইজারাদার-তালুকদার-তরফদার-হাওলাদার-দেওয়ান-মজুমদার-খাস্তগীর-দস্তিদার-ওহেদাদার-নায়েব-গোমস্তারা ছিল সাধারণভাবে হিন্দুই। কাজেই উজির-লস্কর-ফৌজদার-মনসবদার-আমীর প্রভৃতি পদ সাধারণভাবে বিদেশী মুসলমানরাই পেত বটে, আর দেশী মুসলিমরা সাধারণভাবে কাজী-উকিল মোল্লা-মুয়াজ্জিন-খোন্দকার প্রভৃতি হত বটে, অন্য সব কাজ ও পেশা ছিল দেশী হিন্দুর অধিকারে।

এ কারণেই গোড়া থেকেই য়ুরোপীয় কোম্পানির ব্যবসার সহায় ছিল দেশী হিন্দুরাই। গোটা সতেরো-আঠারো-উনিশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোমস্তা-ফড়িয়া মাত্রই ছিল হিন্দু। এমনকি সেবন্দীরাও ছিল প্রায় হিন্দু। কাজেই পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে মুসলিম সামরিক ও বিচারক কর্মচারীদেরই পদচ্যুতি ঘটে এবং এদের অধিকাংশই অবাঙালি। এসব পদে বাঙালির সংখ্যা ছিল নগণ্য। অতএব, পলাশী যুদ্ধোত্তরকালে তথা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে চাকরিক্ষেত্রে দেশী মুসলিমের সর্বনাশ হয়নি। আয়মা-লাখরাজ-ওয়াক্ফ সম্পত্তি হারিয়ে বহু পরিবার নিঃস্ব হয় ১৮২৮ সনের পরে। এদেরও সবাই দেশজ মুসলমান ছিল না। রামমোহন [১৭৭৪-১৮৩৩], রাধাকান্তদেব [১৭৮৪-১৮৬৭] প্রমুখ যখন প্রাশাসনিক ও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে সরকারের সঙ্গে হিন্দুর পক্ষে কথা বলেছেন, তখন মুসলমানের স্বার্থে যাঁরা কথা বলেছেন, তাঁদের একজনও বাঙলাভাষী দেশজ বাঙালি ছিলেন না। বস্তুত বিশ শতকের প্রথমপাদ অবধি দেশজ বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করেছেন বিদেশাগতদের বংশধর উর্দুভাষী সামন্তরা ও চাকুরেরা—যাঁদের সঙ্গে দেশী মুসলমানের কোনো সামাজিক সম্পর্কই ছিল না। এ কারণেই ১৭৬৫ থেকে ১৮৬০ সন অবধি সরকার ও মুসলিম সমস্যা সম্বন্ধে কোনো তথ্য আমরা পাইনে, যেমন পাই সরকার ও হিন্দুপ্রজা সম্পর্কিত নানা তথ্য। অথচ সেকালের বিচার, শাসন, আইন, শিক্ষা প্রভৃতি সরকারি সব বিষয়েই প্রয়োজনবোধে সরকার হিন্দুর ও মুসলমানের মতামত ও পরামর্শ জানতে চেয়েছে। আজ আমরা সেইসব মুসলিম-নেতার নাম ও কৃতির কিছুই জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফারসি দলিলপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলে তাঁদের ভূমিকা নিশ্চয়ই জানা যাবে। সে-কাজ আজ অবধি কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে করেননি। তাই আমরা ১৭৬৫ থেকে ১৮৬০ অবধি সবক্ষেত্রে কেবল হিন্দু ও ইংরেজদের দেখি, মুসলিমদের খুঁজে পাইনে। ফলে মুসলমানরা কেবল বঞ্চনার জ্বালাবোধ করে, নিজের ঘরের খবর জানে না বলে অনেক কাল্পনিক সম্পদ, সুযোগ ও অধিকার হারানোর ক্ষোভ ও বেদনা বহন করে।

মুঘল-আমলে মুসলিম জমিদার-তালুকদার ছিল নগণ্যসংখ্যক। বীরভূমের জমিদারই ছিল সবচেয়ে বড় মুসলিম জমিদার। অন্যরা দিনাজপুরের কৃষ্ণনগরের, নাটোরের, বর্ধমানের, বিষ্ণুপুরের সামন্ত জমিদাররাই ছিল বাঙলার অধিকাংশ ভূমির মালিক। ১৭৯৩ সনের ভূমিব্যবস্থায় বা তৎপূর্বে সূর্যাস্ত-আইনে রাজস্ব আদায়ব্যবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত হল অধিক সংখ্যায় হিন্দু জমিদারই [বিশেষ করে বর্ধমানের, দিনাজপুরের ও রাজশাহীর]। তবে তাদের সান্ত্বনা এই নিলামে বিক্রীত জমিদারি যারা ক্রয় করল তারাও ছিল হিন্দু দেওয়ান, গোমস্তা ও কোলকাতার কাঁচা পয়সাওয়ালা বানিয়া-ফড়িয়ারা। কেবল দুটো বড় জমিদারি ক্রয় করল দুই বিদেশী—ইংরেজ ও মুসলমান। ফলে হাতবদল হল বটে, বর্ণহিন্দুর হাতেই রইল সম্পদ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লুণ্ঠন-শোষণমূলক নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যনীতির ও ভূমি-ব্যবস্থার ফলে যারা নিঃস্ব, বেকার কিংবা দরিদ্র হল, তারা ছিল দেশের বৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষ—ভদ্র গৃহস্থ, কৃষক ও বৃত্তিজীবী কুটিরশিল্পী—বিশেষ করে তাঁতি—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। কেননা গুরুত্বে কৃষির পরেই ছিল তাঁতশিল্প। কিন্তু যেহেতু ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা কোম্পানির ও সরকারের কাজে যোগ দিয়ে ও খুচরো ব্যবসা করে অসদুপায়ে আশাতীত অপরিমেয় অর্থ সহজে অর্জন করছিল, এবং যেহেতু উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বৃত্তিতে আর কাউকেই তারা স্বজাতি বলে ভাবত না; সেহেতু দেশের নিম্নবর্ণের হিন্দুর ও মুসলিমদের দুর্দশায় তাদের কোনো সহানুভূতি বা বিচলন ছিল না। ফলে তারা তখন কামধেনুস্বরূপ কোম্পানি-প্রভুর জয়গানে মুখর, কৃপা-লোভে অনুগত, দয়ার দানে ও প্রশ্রয়ে কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ।

১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সন অবধি কোলকাতার সচ্ছল বর্ণহিন্দুর সুখের-আনন্দের-আকাঙ্ক্ষার এবং ইংরেজের প্রতি আনুগত্যের ও কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। অথচ এ সময়ে দেশের গণমানব খরা-বন্যা-ঝঞ্ঝা-মহামারীর শিকার হয়ে জানে-মালে বিপর্যস্ত হচ্ছিল। পরিবার ও গ্রাম হচ্ছিল উজাড়। আর রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবং কুটিরশিল্পের বাজার মন্দা কিংবা বন্ধ হওয়াতে গণমানব দ্রুত দারিদ্র্যের, নিঃস্বতার, বেকারত্বের ও দুর্ভিক্ষের শিকার হচ্ছিল। ১৭৯৩ সনে সরকার ভূমি-রাজস্ব পেত তিন কোটি, ১৮৮৬ সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় আঠারো কোটি টাকা[১]। ভূমি-রাজস্ব কোনো কোনো অঞ্চলে শতকরা ষাট ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া তুলা, রেশম, লবণ এবং ১৮৩৪ সন থেকে চা, কফি, নীল প্রভৃতির বাজার কোম্পানির ও সরকারের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হত। ১৮৩৫ সনে Transit -করও তুলে দেয়ার ফলে বিলাতের কলে তৈরি পণ্য এখানকার বাজার ছেয়ে ফেলে। ১৮৪০ সনে মন্টেগোমারী মার্টিন স্বীকার করেন যে, "We have during this period (upto 1840 A.D) compelled the Indian territories to receive our manufactures, our woolen duty free, our cottons at $2\frac{1}{2}$ p.c. while we have continued during that period to levy prohibitory duties from 10 to 100 p.c. upon articles they produce from our territories --a free trade from this country not a free trade between India and this country". আবার যখন পার্সীরা উনিশ শতকের শেষ দশকে বোম্বেতে আহমদাবাদে কাপড়ের কলাদি শিল্প-কারখানা স্থাপন করে, তখন ল্যাঙ্কাশায়ারের পণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানোর জন্যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৯৪ ও ১৮৯৭ সনে কর বসিয়ে দেশী শিল্প প্রসারের পথ রোধ করে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে এবং পরেও বাঙলাদেশ প্রতি তিন-চার বছর অন্তর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়েছে, লোক মরেছে লক্ষে লক্ষে। তাছাড়া আঞ্চলিক মহামারী তো ছিলই। ১৮৬৯ সনের পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ ছাড়াও প্রতি ৩/৪/৫ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষ হয়েছে আঠারো শতকেও। তাছাড়া দেশী মুদ্রা-বিনিময়-মানেও ঘটেছে ঘন ঘন পরিবর্তন; যার ফলে কৃষকরা, বৃত্তিজীবীরা ও ক্ষুদ্র বেনেরা হয়েছে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ১৮৩২ সনের কটকের বন্যা, ১৮৬১ সনের উত্তরভারতের দুর্ভিক্ষ , ১৮৬৬ সনের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, ১৮৮৫ সনের বীরভূম-নলহাটির দুর্ভিক্ষ, ১৮৮৭ সনের ত্রিপুরার এবং ১৮৮৮ সনের ঢাকার, ১৮৯২ সনের চব্বিশ পরগণার, ১৮৯৩ সনের বিক্রমপুরের,
১৮৯৪ সনের মাদারীপুরের এবং ১৮৯৭ সনের টাঙ্গাইলের দুর্ভিক্ষ নিতান্ত আঞ্চলিক ও সামান্য ছিল না।[১]

যেহেতু সমাজে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক তথা জীবিকাগত ও মানসিক পরিবর্তন আসে উৎপাদন-সম্পৃক্ত হাতিয়ারের উৎকর্ষে বা পরিবর্তনে এবং যেহেতু আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে হাতিয়ারের কিংবা উৎপাদনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসেনি এবং যেহেতু বিদেশী শাসক তাদের হাতিয়ার ও কৃৎকৌশলজাত পণ্যের বাজার হিসেবে এখানে জবর-দখল চালায়, সেহেতু আমাদের দেশের গণমানবের জীবনে সমাজে ও আর্থিক ক্ষেত্রে কেবল অবক্ষয়ী বিপর্যয়ই ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে শাসক-সহযোগীর একটা লুটেরা শ্রেণী গড়ে উঠল, যারা প্রতীচ্য শিক্ষা-সংস্কৃতি কৃত্রিমভাবে আয়ত্ত করে জাতিদ্রোহীর ও কৃপাজীবীর সুখী শহুরে-সমাজ গড়ে তুলল। ১৭৯৩ থেকে ১৮৫৯ সনের মধ্যে এদের অর্থ-বিত্ত ও প্রভাব-প্রতাপ নির্দ্বন্দ্ব নির্বিঘ্ন ছিল। ১৭৭৫ থেকে ১৭৮২ সনের মধ্যেই সূর্যাস্ত-আইনের বদৌলতে বাঙলার দুই-তৃতীয়াংশ জমির মালিকানা কোম্পানির বানিয়া-ফড়িয়ার হাতে চলে যায়।[২] ১৭৫৭ সন থেকে ১৭৮৬ সন অবধি কোলকাতায় (ইংরেজদের) ব্যবসা-বাণিজ্য চালাত উচ্চবর্ণের বাঙালি হিন্দুরাই—মুখার্জী-ব্যানার্জী-শর্মা-ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা এবং দত্ত-মিত্র-ঘোষ প্রভৃতি কায়স্থরা এবং সেন প্রভৃতি বৈদ্যরা। বেনিয়া বা বানিয়ারা ছিল কোম্পানির দোভাষী, প্রধান হিসাবরক্ষক, সেক্রেটারি, প্রধান দালাল, অর্থের যোগানদার ও খাজাঞ্চি। আঠারো শতকের শেষার্ধে যাঁরা কোম্পানির বানিয়া হিসেবে অর্থ-বিত্ত ও মান-যশ অর্জন করে সমাজে প্রভাব প্রতাপ বিস্তার করেন তাঁরা হচ্ছেন রাধাকৃষ্ণ রায়, গোকুল ঘোষাল, বারাণসী ঘোষ, হিদারাম বানার্জী, অক্রূর দত্ত, মনোহর মুখার্জী, রাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী (কান্তমুদী) প্রভৃতি। এ-সময়ে বাণিজ্যজাহাজের মালিক হলেন পাঁচুদত্ত, রামগোপাল মল্লিক, মদন দত্ত ও রামদুলাল দে। বলতে গেলে উনিশ শতকের প্রথমপাদের দিকেই তারা ক্ষতি স্বীকার করে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে ক্রমে সরে যায়। কারণ লর্ড কর্নওয়ালিশ দেশী বানিয়ার পরিবর্তে ব্রিটিশ বানিয়াদের agent নিযুক্ত করায় এবং ব্যাঙ্ক-ঋণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করায় দেশী ব্যবসায়ীরা পুঁজি দিয়ে জমি কেনা শুরু করে। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সুযোগ দিয়ে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে দেশী প্রতিদ্বন্দ্বী

---

১ B.M. Bhatia, Historical & Social Development, vol. I Elites in Modern India, p. 203 f.n.

২ B.M. Bhatia, 'Historical & Social Development, Vol. I, Elites in Modern India P-349.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতাড়নও নতুন ভূমি-ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কর্নওয়ালিশের উক্তি থেকে তা জানা যায়—'ভূমি-ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের আশ্বাস পেলেই দেশী লোকেরা ভূ-সম্পত্তিতেই পুঁজি খাটাবে।' চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তে প্রজারা শুধু করভারে পীড়িত হল না— ভূমিদাসেই পরিণত হল। মুঘল আমলে কোনো অবস্থাতেই জমির ওপর প্রজাস্বত্ব ক্ষুণ্ন হত না। খাজনাও বৃদ্ধি করা যেত না। আবার ১৮৩৩ সন থেকে ডেপুটি কালেক্টর ও ১৮৪৩ সন থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ করে বাবুদের কোম্পানি সরকার নতুন পথে কৃপা বিতরণ শুরু করে। উচ্চপদের দ্বার এভাবেই হল উন্মুক্ত। তবু আই-সি-এস পদে নিযুক্তির জন্যে ১৮৫৩ সনে আইন হলেও কার্যকর করতে ১৮৬১ সন এল। এতে বাবুদের মর্যাদা সামন্তদের প্রায় সমানই হয়ে গেল।

শিক্ষার প্রসারের ফলে হিন্দুসমাজে চাকরি ও অনুগ্রহপ্রার্থীর সংখ্যা যখন বেড়ে গেল, সরকারের পক্ষেও তখন যথেচ্ছ প্রসাদ বিতরণ অসম্ভব হয়ে পড়ল। তখন থেকে—মোটামুটি ১৮৬৫ সনের পর থেকে, হিন্দুসমাজে ব্রিটিশ-বিরূপতা লঘু ও মন্থরভাবে দানা বাঁধতে থাকে। সে-বিষয় পরে আলোচ্য। আলোচ্য সময়ে দেশের কৃষক ও বৃত্তিজীবী গণমানবের অবস্থার সহ্যাতীতভাবে অবনতি ঘটেছিল। নতুন জমিদারেরা ও তাদের গোমস্তারা কেবল খাজনা বাড়িয়ে সন্তুষ্ট থাকত না; আবওয়াব, সালামী, বাট্টা, ধিয়াদার, মানগুণ, বেগার, ফরমাশ, পার্বণি, ভিক্ষা, বিয়ের কর (জুড়ি কর), অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ, বিয়ে প্রভৃতি উপলক্ষে নজর চাঁদা এমনকি দাড়ি-কর অবধি নানা অজুহাতে-অছিলায় প্রজাকে শোষণ করত—সবটারই অনুষঙ্গ ছিল হুকুম, হুমকি ও পীড়ন। অসহ্য হলে দেয়ালে পিঠ করে দুস্থ মানবতা বিক্ষোভে বিদ্রোহে ফেটে পড়ত আর পরিণামে জানে-মালে হত সর্বস্বান্ত।

উত্তরভারতীয় সৈনিক দিয়ে গঠিত 'বাঙালী পল্টন' যখন ভেঙে দেয়া হল তখন মিথিলা-বেনারসের বিক্ষুব্ধ বেকার সৈনিক মজনুশাহের [মৃ.১৭৮৭] ও ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে প্রাক্তন ও বেকার সৈনিকরা [স্ব-ভূমি বিহার-উড়িষ্যা বাদ দিয়ে] বছরে একবার বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে লুট করতে আসত। এরাই ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহী নামে পরিচিত। লুটের সময়ে স্থানীয় লোকও তাদের সঙ্গে জুটে যেত। ১৭৭০ [১৭৬০?] থেকে ১৭৯০ [৯৭?] সন অবধি এরা কোচবিহার, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, ময়মনসিংহ অঞ্চলে দস্যুবৃত্তি চালিয়েছে।

এ সময়ে প্রধান কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল ১৭৮৩ সনে রংপুরে, ১৭৮৯ সনে বিষ্ণুপুরে, মেদিনীপুরে, বাঁকুড়ায়, বীরভূমে, বারাসতে, ফরিদপুরে, ঢাকায়, সাঁওতাল পরগনায় এবং ১৭৯৫-৯৯ সনে ঘটে চোয়াড় বিদ্রোহ। আবার ১৮৩১ সনে তিতুমীর, ১৮৩৮-৪৭ সনে দুদুমিয়া, ১৮৫৫ সনে সাঁওতালরা, ১৮৫৮/৬০/৬২ সনে নীল চাষীরা বিদ্রোহ করে। পাবনা-বগুড়ায় কৃষক-বিদ্রোহ ঘটে ১৮৭২/৭৩ সনে। এগুলো ছিল কখনো স্বতঃস্ফূর্ত, কখনোবা কারো নেতৃত্বে সুপরিকল্পিত। কিন্তু সবগুলোই ছিল স্থানিক ও তাৎক্ষণিক। ১৭৭২-৮০ সনের মধ্যেও জমিদারবিদ্রোহ ঘটেছিল কয়েকটি। কাজেই ব্যর্থ হলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ ও বিদ্রোহ গাঁয়ে-গঞ্জে ছিলই সব সময়।

এবার ভদ্রলোকদের কথা বলি। ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা নিজেরাই একটা জাতি। শূদ্র-সদ্‌গোপদের তারা নিজেদের সমাজভুক্ত বলে কখনো মনে করেনি। এই বর্ণহিন্দুরা চিরকালই শাসকদের সহযোগী-সহকারী হিসেবে, সচ্ছল গৃহস্থ কিংবা সামন্ত হিসেবে অথবা সাক্ষর কর্মচারী হিসেবে ছিল সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত ও সমাজ নিয়ন্ত্রক। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কি-মুঘল আমলে যেমন, ইংরেজ আমলেও তেমনি তারাই ছিল সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধাভোগী। হাঁটাপথে যারা কোলকাতায় আসতে পারত, তারাই অর্থাৎ হুগলি, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমান,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকই পলাশীযুদ্ধের আগে ও পরে কোলকাতায় কোম্পানির কাজে যোগ দেয়। সাধারণ মুসলিমদের দুর্ভাগ্য এসব অঞ্চলে তাদের সংখ্যা ছিল কম। তাছাড়া কোম্পানি-সৃষ্ট কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ শহর ছিল মুঘল-সৃষ্ট শহরগুলো থেকে দূরে। মুসলমানরা পরে এসে দেখে ঠাঁই নেই তাদের, হিন্দুরা সব দখল করে নিয়েছে আগেই। শিক্ষিতলোকের অর্থসম্পদ অর্জনের পন্থা চাকরি নিয়েই তাই সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শুরু উনিশ শতকে।

স্মরণ্য যে, কোম্পানি-আমলে প্রথম পঞ্চাশ বছর (১৭৬৫-১৮১৫ খ্রি.) য়ুরোপীয়দের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যনীতির প্রসারে কাঁচা টাকার স্ফীতি ঘটে আর ভূমি-রাজস্ব-নীতির ফলে সুবাহ্-ই-বাঙ্গালার সর্বত্র গাঁয়ে-গঞ্জে গার্হস্থ্য জীবনে আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। কিন্তু প্রতীচ্য প্রভাব তখনো কোলকাতার বাইরে তো নয়ই—কোলকাতায়ও ছিল দুর্লক্ষ্য রামমোহনের কোলকাতা-বাসের [১৮১৫] পূর্বে। মানুষের মনোলোকে তখনো নিস্তরঙ্গ মধ্যযুগ চলছিল। এসময়কার কোলকাতা ছিল কেবল অর্থ-বিত্তবানদের দর্প-দাপটের ও বিলাসলীলার স্বর্গলোক। আঠারো শতকের অরুণোদয়কালে কোলকাতায় ইংরেজিভাষা শিক্ষার শুরু এবং হিন্দুকলেজে তার পূর্ণতা—ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রই কোলকাতাবাসীকে প্রতীচ্য জীবন-চেতনায় ও জগৎভাবনায় দীক্ষা দেয়। ১৮৪৩ সনে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে কিংবা ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) শিষ্যদের বয়স্থ হবার আগে প্রতীচ্যরুচি আত্মস্থ হয়নি কারো। তাই অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবেই কেবল প্রতীচ্য-মানসের সংস্কৃতিবান মানুষের সংখ্যা বাড়তে থাকে কোলকাতায়। ১৮৬০ সনের পূর্বেকার ভুঁইফোড়দের জীবনের ও আচরণের অসঙ্গতির চিত্র মেলে নববাবুবিলাস, নববিবিবিলাস, কলিকাতা কমলালয়, আলালের ঘরের দুলাল, মদ খাওয়া বড় দায় জাত রাখার কি উপায়, হুতোম প্যাঁচার নকশা প্রভৃতি পুস্তকে।

অতএব, কোলকাতায় বিত্তের সঙ্গে প্রতীচ্যবিদ্যার ও রুচির সংযোগ ঘটতে থাকে ১৮২০ সনের পরে এবং প্রতীচ্য আদলে শিক্ষিতের ও সংস্কৃতিবানের সমাজ স্থিতি পায় ১৮৫৭ সনের পরে। এসময় থেকে কোলকাতার বাইরেও শহরে শহরে ইংরেজিশিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটে। কাজেই এই অর্থে য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি মন-মনন এদেশে আসে কোম্পানি আমলের অবসান-মুহূর্তে। রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩) অবশ্যই ব্যতিক্রম। ত্রিশের ও চল্লিশের দশক ছিল এর বীজ উপ্ত হওয়ার কাল।

মনিবের মন-যোগানোর জন্যে হিন্দুরা ইংরেজিভাষাও আয়ত্ত করার চেষ্টা করে গোড়া থেকেই। দেওয়ানি লাভ করে কোম্পানি যখন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন কোলকাতায় শাব্দিক ইংরেজি শেখা-শেখানোর ধুম পড়ে গেল। ইংরেজি ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে ও দর্শনে কোম্পানি আমলের প্রথম অর্ধশতাব্দীতে প্রথম ও প্রধান শিক্ষিত ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। কোম্পানিশাসন কালে প্রাচ্য-প্রতীচ্য মন-মননের ও সমাজ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক পরিচয় ও তজ্জাত সমস্যা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। যেহেতু প্রতীচ্য-প্রভাবিত তাঁর নতুন চিন্তা-চেতনা ছিল পড়ে-পাওয়া— দৈশিক প্রয়োজনে আত্মোত্থিত নয়; সেহেতু তাঁর সমাধান ছিল কিছুটা কৃত্রিম ও অসমঞ্জস। খ্রিস্টানধর্মের ও সমাজের মোকাবেলায় তাই তিনি মেরামতের মাধ্যমেই তাঁর বিত্তবান শিক্ষিত-শহুরে স্বধর্মীকে য়ুরোপীয় আদলে আধুনিক করবার পথ খুঁজে নিলেন। খ্রিস্টান হওয়ার পথ রোধ করলেন বটে, কিন্তু বেদ-উপনিষদ-বাইবেল-কোরআনের কোনোটাই তাঁর নবমতের ভিত্তি দৃঢ় করল না। কারণ তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্রোহী নন—ভাঙার জন্যে নয়, রাখার জন্যেই করলেন আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য চেতনার সংযোগ। সংস্কারক মাত্রই মূলত রক্ষণশীল, পুরাতনকে ভালোবাসেন বলেই তাকে মেরামত করে নতুন বাহ্যাকার দিয়ে রঙের ও রূপের জৌলুস সৃষ্টি করে কেজো ও সচল করাই সংস্কারের লক্ষ্য—তাই পুরোনো পরিহারে তাঁর অনীহা এবং নতুনকে পুরোপুরি গ্রহণে সংকোচ। দেবেন ঠাকুর-কেশব সেন-শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ তাই ব্রাহ্মমত শাস্ত্রীয় কিংবা জনপ্রিয় করতে পারলেন না! কাজেই ব্রাহ্মমত রেনেসাঁস-প্রসূত নয়—শঙ্কাসঞ্জাত বিচলন জাত।

রামমোহনের রক্ষণশীলতার প্রমাণ—তিনি নৈতিক আবেদনে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ চেয়েছিলেন—আইন বলে নয়। তাই আইন হওয়ার পর তিনিই লর্ড বেন্টিঙ্কের কাছে পত্রযোগে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া রামমোহন তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণে ছিলেন স্বশ্রেণীরই হিতকামী চিন্তানায়ক, ভিন্নশ্রেণীর মানুষের সমস্যামনস্ক বা সচেতন ছিলেন না তিনি। বিলেত যাওয়ার সময় গরু, রসুই বামুন ও পৈতা নেয়া তাঁর গোঁড়ামি প্রদর্শনপ্রীতির আর-এক নিদর্শন। যদিও ব্যক্তিগত জীবনে অসদুপায়ে অর্থার্জন থেকে মদে মেয়েমানুষে আসক্তি প্রভৃতি সমকালীন ধনীলোকের সবদোষই তাঁকে স্পর্শ করেছিল, তবু রামমোহন ছিলেন সেকালের বাঙলায় অনন্য অসামান্য পুরুষ। তিনি ছিলেন একমাত্র বাঙালি যিনি সমকালীন য়ুরোপীয় রাজনীতিক ও মানবিক চিন্তা-চেতনায় একজন য়ুরোপীয় শিক্ষিত সংস্কৃতিবান বুর্জোয়া নাগরিকের মতোই ছিলেন ঋদ্ধ। ১৮৬০ সন অবধি আমরা বাঙলায় তেমন বিশ্বপথিক আর কাউকে পাইনে। দুনিয়ার ধর্মশাস্ত্রেও তাঁর জ্ঞান ছিল সমকালীন বাঙলায় অতুল্য। তিনি তাঁর সমকালীন য়ুরোপীয় সমাজের ও রাষ্ট্রের গতি-প্রকৃতি বুঝতেন, সমকালীন মানবকাম্য সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তাও তাঁর ছিল। রামমোহন আইনের শাসনে, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ও নাগরিকের স্বাধীনতায় আস্থাবান ছিলেন। দেশীলোকের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না আশঙ্কায় তিনি আইন পরিষদ গঠনেরও বিরোধিতা করেন। শাসন ব্যাপারে দেশীলোকের মত প্রকাশের অধিকার লাভ লক্ষ্যে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায়ও গুরুত্ব আরোপ করতেন। প্রশাসনে ত্রুটি দুর্নীতি যাচাই করবার জন্যে তিনি গুণী-মানী ব্যক্তি নিয়ে কমিশন গঠনের প্রস্তাবও দান করেন। তাই রামমোহন স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উৎসব করেন, ফ্রান্সের দ্বিতীয় বিপ্লবে আনন্দিত হন, এমনকি আজকের জাতিসঙ্ঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানেরও স্বপ্ন দেখেন। স্বাধীনতাবিরোধী ও স্বৈরাচারী শাসকেও তাঁর ছিল ঘৃণা। স্বদেশে কিন্তু তিনি সবটাই স্বধর্মীর জন্যেও নয়, স্বকালের স্বশ্রেণীর (ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থের) বিত্তবান শিক্ষিত শহুরে লোকের জন্যেই ভাবতে ও করতে চেয়েছেন। তাই হিন্দুর ব্যাপারে আইন করবার আগে বর্ধমান, বিহার ও বারাণসীর রাজাদের এবং মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের, পাটনার বৈজুনাথের, বারাণসীর মোহন দাস প্রভৃতি প্রভাবশালী বণিকদের মত জানার জন্যে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। সামন্ত ও পুঁজিপতিরাই তাঁর মতে সমাজপতি। তাই যদিও তিনি ১৭৯৩ সনের ভূমি ব্যবস্থার কুফল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং রায়তওয়ারি বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন, আর চাষীর ও ক্ষেতমজুরের দুর্দশাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি এবং ১৮৩২ সনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তিনি সব কথা বলেওছেন; তবু এক্ষেত্রে ঐকান্তিক চেষ্টা তিনি করেননি। চিন্তাবিদ মন্টেগু, ব্ল্যাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাব ছিল তাঁর চিন্তা-চেতনায়—পড়ে-পাওয়া প্রভাব তাঁর বাক্যে-ব্যক্ত হলেও কাজে প্রকাশ পায়নি। আবার পরাধীনতা মন্দ জেনেও তিনি পরোক্ষে দেশে শাসকরূপে ব্রিটিশস্থিতি ও বসবাস কামনা করেছেন : 'The Greater our intercourse with European gentleman, the greater will be our improvement in literary, social and political

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

affairs'. —যদিও এ ধারণা অবশ্যই যথার্থ। রামমোহনের কয়েকখানা পত্রেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন রয়েছে। নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষকালে অবশ্য এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও চাওয়া-পাওয়ার অসঙ্গতি থাকেই। লক্ষণীয় যে, ১৭৫৭ থেকে ১৮১৭ সন অবধি কোলকাতার ভদ্রলোকেরা প্রতীচ্য-বিদ্যার বা মানসের প্রসাদ তেমন পায়নি, সংবাদপত্রের প্রয়োজনও তাই বোধ করেনি। রামমোহনই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

a. Ram Mohun says 'It is necessary that some change should take place in their (Hindu's) religion. at least for the sake of their political advantage and social comfort" —letter written to James Silk Buckingham. Jan. 18. 1818.

b. Letter Written to Minister of Foreign Affairs of France— 'All mankind are one great family. Hence enlightened men in all countries feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race."

c. Letter to Reformer (run by Prasanna Kr. Tagore) from London : "... Though it is impossible for a thinking man not to feel the evils of political subjugation and dependence on foreign people. yet when we reflect on the advantages which we have derived from our connetion with Great Britain. we may be reconciled to the present state of things which promises permanent benefit to our posterity". এইরূপ অভিমত অভিব্যক্ত হয়েছে Victor Jacquemont-কে লিখিত পত্রেও — 'India requires many more years of English domination so that the might not have many things to lose' etc.

d. "A class of society has sprang into existence. that were before unknown. these are placed between aristocracy and the poor and are daily forming a most influential class .... it is a dawn of new Era-whenever such an order of men has been created....... these middle class of inhabitants in Bengal. afford the most cheering indication of any that exists at the present moment." (Bengal Herald. June 13, 1829—Ram Mohun's article).

শাসিত হিসেবে বাঙালির সঙ্গে শাসক ইংরেজের পরিচয়-মুহূর্তে মিশনারিরা চেয়েছিল খ্রিস্টধর্মের মহিমায় বাঙালিকে মুগ্ধ করিয়ে বশ করতে। কিন্তু কম বাঙালিই হল মুগ্ধ—শঙ্কিত হল সবাই। বহুদিন এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-বিতর্ক চলেছে, তার প্রমাণ সে-যুগে রামমোহনের হিন্দু সনাতনীর. ইয়ং বেঙ্গলের ও মিশনারির পত্রপত্রিকাস্থ রচনা ও গ্রন্থ। এক্ষেত্রে আলেকজান্ডার ডাফের স্বীকারোক্তি স্মর্তব্য :

"The prevalent idea seemed to be. that by fair means or foul—by bribery of magical influence—by—denunciation or corporeal restraint —we were determined to force the youngman (Derozians) to be come christians' (Duff-Scottish Missionary and Educationist). Enquirer-এ ডিরোজিয়োর বক্তব্যও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। ইয়ং বেঙ্গলের সমর্থনে ও রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে তাঁর উচ্চারিত বাণী এই — "The bigots are in a rage. let them burst forth in a flame. Let the liberal voice be like that of the Romans. Roman Knows not only to act but to suffer... If the opposition is violent and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

insurmountable, let us rather aspire to martyrdom then desert a single inch of the ground we have possessed. A people can never be reformed without noise and confusion."

উনিশ শতকের তৃতীয় দশক অবধি এই বাদ-প্রতিবাদ ও দ্বন্দ্ব-কোন্দল চলে বটে কোলকাতা শহরে, কিন্তু কোনো পক্ষেরই কোনো লাভ হয়নি। খ্রিস্টধর্ম প্রচার বন্ধ হয়েছিল সাম্রাজ্যিক স্বার্থে। ব্রাহ্মদেরও কথা শোনার লোক কম ছিল; ইয়ং বেঙ্গলও চল্লিশোত্তর জীবনে নিষ্ঠ ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান বা হিন্দু হয়ে গিয়েছিল; সনাতনীরাও হয়েছিল স্থির, কিছুটা সহনশীল ও গ্রহণমুখী। উনিশ শতকের শেষপাদে কোঁতে-প্রভাবিত রামকৃষ্ণ পরমহংস কালীমাতায় ও সেবাধর্মে সমগুরুত্ব দিয়ে বরং ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায় হন। আর্য শাস্ত্র-সমাজ-সভ্যতাগর্বী বিবেকানন্দও (১৮৬২-১৯০২) ছিলেন নবব্যাখ্যা-বিশোধিত, নবতাৎপর্য ও মহিমামণ্ডিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের ও আদর্শের উজ্জীবনকামী।

১৮৩৮ সনে ইংরেজি সরকারি ভাষারূপে চালু হলে উনিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে অনেক স্থিতধী বাঙালি হিন্দুর আবির্ভাব ঘটে। তখন বিদ্যাসাগরের শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্ত (১৮৪১ সন)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-অক্ষয়কুমার দত্ত-বিদ্যাসাগর তত্ত্ববোধিনীতে যুক্তিযোগে নানা বিষয়ের অবতারণা করেছেন। উচ্ছৃঙ্খল বলে নিন্দিত ইয়ং বেঙ্গলরা জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, চরিত্রে ও শ্রেয়স্কর চিন্তা-চেতনায় শ্রদ্ধেয়—এখন যিশুর বাণী বাদ দিয়ে অর্থাৎ শাস্ত্রসম্পৃক্ত অংশ ব্যতীত য়ুরোপের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাই শিক্ষিত বাঙালির মন হরণ করেছে। পড়ে-পাওয়া প্রতীচ্য চিন্তা-চেতনার অধিকারী এখন অনেকেই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ সন) ছিলেন দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী সাহসী, জেদী, কর্মনিষ্ঠ এবং সংকল্পে ও সিদ্ধান্তে স্থির এবং সর্বোপরি নিঃসঙ্গ ও নির্দল। বিদ্যাসাগরের শ্রদ্ধা ছিল ব্রাহ্মদের ও ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি। কিন্তু সংকল্প ও আদর্শচ্যুতির ভয়ে নাস্তিক ও জেদী বিদ্যাসাগর তাদের সাহায্য-সহায়তা কামনা করেননি কখনো। শিক্ষাবিস্তারে, বহুবিবাহের ও বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-নারীর দুঃখ মোচনে এবং বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে পরিস্রুত রুচি-শৈলীর ভিত্তি স্থাপনে ও নির্মাণে ছিলেন তিনি সদা নিরত। তিনি ছিলেন অবয়বে-পরিচ্ছদে বাঙালি, চিন্তা-চেতনায় শ্রেয়োবাদী ও মানববাদী নাস্তিক।

ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ সন) ছিলেন মধ্যপন্থী। যদিও তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, বর্ণসাম্যে, শিক্ষার মূল্যে, যুক্তিবাদে আস্থাবান; তবু আবেগ ও আগ্রহই তাঁর চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করত। তা ছাড়া তাঁর কথায় ও কাজে যুক্তিতে ও বিশ্বাসে সঙ্গতি ছিল কম। যদিও তাঁর সদিচ্ছা ছিল সন্দেহাতীত।

প্রতীচ্যের বুর্জোয়ার উদার মানবতা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও দর্শন স্বাধীনতাপ্রীতি ও স্বাতন্ত্র্যবোধ, যুক্তিবাদ ও স্বাধিকার-চেতনা শিক্ষিত বাঙালিকে স্বাপ্নিক ও বাক্‌পটু করে তোলে। কিন্তু পড়ে-পাওয়া সমকালীন য়ুরোপীয় চিন্তা-চেতনার স্বরূপ কিংবা তাৎপর্য ছিল তাদের অনায়ত্ত। তাই ফরাসি বিপ্লবের মর্মকথা তারা মুখে ব্যাখ্যা করত, কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখত না; য়ুরোপের দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তার দৃষ্টান্ত তাদেরকে বিকৃতভাবে স্বধর্মীর জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ করে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদেরকে শাস্ত্রে ও আচারে বিজ্ঞান ও যুক্তিসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। অসামান্য মনীষাধর বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং হলেন এ বিভ্রান্তি ও বিকৃতির শিকার। হিন্দু জাতিসত্তা নির্মাণে ও হিন্দুত্বের আদর্শ নিরূপণে বঙ্কিম আত্মনিয়োগ করেন, তাই বারোশো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে উনিশশো অবধি গোটা মধ্যযুগ হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের বিষয়বস্তু। অথচ ইয়ং বেঙ্গলদের জ্যোতিষ্ক রামগোপাল ঘোষ [১৮১৫-৬৮] বলতেন : "He who will not reason is a bigot, he who cannot, is a fool, he who does not, is a slave." তবু এ সমাজেই বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬], কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য [১৮৪০-১৯৩২] প্রভৃতি নাস্তিক এবং অনেকেই প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) হয়েছিলেন। আসলে কোলকাতায় চিন্তা-চেতনাক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির উদ্গাতা যুগপ্রবর্তক ডিরোজিয়োর [১৮০৯-৩১] প্রতীচ্য বিদ্যার প্রবর্তন মুহূর্তে শিক্ষকতাই ছিল অলক্ষ্যে সবকিছুর উৎস। তাঁর উচ্চারিত বাণীর অভিঘাতে ভক্ত ও বিরোধী উভয়পক্ষই জাগল, ভাবল এবং মননের ও কর্তব্যের ক্ষেত্র বেছে নিল। মাধবকৃষ্ণ মল্লিক [If there is anything that we hate from the bottom of our heart it is Hinduism] রসিককৃষ্ণ মল্লিক [১৮১০-৫৮] [I do not believe in the sacredness of the Ganges], প্রভৃতি রুষ্ট, ক্ষুব্ধ বা আনন্দিত বাঙালিকে যুগান্তর সংবাদে আশ্বস্ত করেছিলেন তিনি। আবার বলি এটি রেনেসাঁস নয়—য়ুরোপীয় চিন্তার অভিঘাতে নিদ্রাভঙ্গ মাত্র। মধ্যযুগের অবসান ঘোষিত হল মাত্র। অনুকৃত সূর্যের আলোয় কিছুটা দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে ও অস্পষ্টতায় আত্মদর্শনের ও আত্মগড়নের আগ্রহ জাগল মাত্র। ইয়ং বেঙ্গলরা ছিল কোঁৎ, বেন্থাম, মিল ও এ্যাডাম স্মিথের ভক্ত। রামকৃষ্ণ (১৮৩৬-৮৬) কোঁতের সেবাধর্ম প্রভাবিত আস্তিক ও তাঁর অধ্যাত্মবাদী শিষ্য বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু আর্য-হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনকামী।

১৮৩১ সনে রামমোহন বিলেত গেলেন, তাঁর মৃত্যু হল ১৮৩৩ সনে। ডিরোজিয়ো পদচ্যুত হয়ে বেশিদিন বাঁচেননি, ১৮৩১ সনে হল তাঁর জীবনাবসান। কাজেই চতুর্থ দশকে দ্রোহী ও সংস্কারক ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মরা হল নিরবলম্ব, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে তবু স্থিতধী কিছু লোক পাওয়া গেল যাঁরা লঘু-গুরুভাবে সংস্কার আন্দোলন ও জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রাখলেন। পার্থিয়ান (১৮৩০ সন), সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩), হিন্দু পাইওনিয়ার (১৮৪২), বেঙ্গল স্পেক্টেটর (১৮৪২) ইনকোয়ারার, বেঙ্গল হরকরা, ইন্ডিয়া গ্যাজেট প্রভৃতি যেমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সেতুর কাজ করছিল; তেমনি একাডেমী, এসোসিয়েশন (১৮২৮ সন), জ্ঞানান্বেষণ সভা প্রভৃতিও তারুণ্য ও তত্ত্বচিন্তা সচল রেখেছিল। তারাচাঁদ চক্রবর্তী [১৮০৬-৫৭], দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী [১৮১৪-৭৪], রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ [১৮২৭-৯৪], প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮১৪-৮৩] প্রভৃতি যেমন; তেমনি রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখার্জী, অক্ষয় দত্ত, দেবেন ঠাকুর [১৮১৭-১৯০৫], রামনারায়ণ [১৮২২-৮৬] বিদ্যাসাগর প্রমুখ একমতের ও একপথের না হলেও চিন্তা-জগতে তাঁরাই দিচ্ছিলেন নেতৃত্ব।

এদিকে সরকারের কাছে জমিদারদের আবেদন-নিবেদন জানাবার জন্যে কোলকাতায় গঠিত হল জমিদার সভা (১৮৩৭), ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) , ল্যান্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন (১৮৩৮) ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রভৃতি।

য়ুরোপীয় ইতিহাস-দর্শন পাঠের ফলে এবং ফরাসি বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কোলকাতার শিক্ষিত লোকেরা মাঝে-মধ্যে দু'চারটা সরকারি অন্যায়ের কথা, শাসিতজনের দাবির কথা অনির্দেশ্যভাবে উচ্চারণ করতেন। রামমোহন থেকে তারও শুরু— জমিদার-রায়তদের কথা, শিক্ষার কথা, আইন-কানুনের ত্রুটির কথা, উচ্চতর পদে দেশীলোক নিয়োগের দাবি প্রভৃতি। কিন্তু সবকিছু ছিল প্রায় ব্যক্তিগত; সামষ্টিক দাবি বা আন্দোলনের পর্যায়ে যায়নি কোনোটাই ১৮৬৫ সনের পূর্বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেমন রসিককৃষ্ণ মল্লিক বলেছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হচ্ছে "Utter neglect of the rights of the humbler classes". India under Foreigners নামের দ্রোহের সুরে একদিন Hindu Pioneer পত্রিকা লিখল— "The people have no voice in the council of legislative, heavy taxation, monopoly of state services by the British, deprivation of natives from share and service of the Govt., transfer of weatlh to England by service holders no commerial, no political benefits can authorise of justify".

হরিশচন্দ্র মুখার্জী [১৮২৪-৬১] লিখেছিলেন ১৮৫৮ সনের ১৪ই জানুয়ারি তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে — "The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians" —এগুলো হচ্ছে নির্লক্ষ্য আদর্শিক উচ্চারণ। তার প্রমাণ, কেশবচন্দ্র সেন বলেন— "Let us all unite for the glory of India and England". Sir Charles Trevelyan (1835-40) বলেছেন—যেখানে দিল্লিবাসীরা ব্রিটিশ বিতাড়নের স্বপ্ন দেখে, সেখানে বাঙালিরা সরকারি কাজে অংশীদার হয়েই তুষ্ট। নবগোপাল মিত্র [১৮৪০-৯৪] সবসময় national চেতনার ও দাবির কথা বলতেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'ন্যাশন্যাল নবগোপাল'।

১৮৫৭ সনের ২৪শে জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হল কোলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয় আর সেদিনই উত্তরভারতীয় সৈনিকেরা ব্যারাকপুরে করল বিদ্রোহ। এতে কোনো বাঙালি হিন্দুর সমর্থন ছিল না, বরং ব্রিটিশ উচ্ছেদের শঙ্কাবশে নিন্দা করেছেন ঈশ্বরগুপ্ত থেকে হরিশ মুখার্জী অবধি সবাই। তাই এ-সময়কার উচ্চারিত সব বাঞ্ছা, দাবি ও আন্দোলন ছিল কোলকাতার শিক্ষিত বিত্তবান লোকের শখের ও শৌখিন রাজনীতির এবং সংস্কৃতিবান ও প্রগতিশীল বলে পরিচিত হওয়ার পন্থা। কোনোটাই ছিল না প্রয়োজন-বুদ্ধি প্রসূত।

বলেছি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত কৃপাই পেয়েছিল 'বাবু' নামের ভদ্রলোক বাঙালি হিন্দুরা। তাই সিপাহী বিপ্লবে তারা ছিল ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বকামী। একশো বছরে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সে-হারে কৃপাকামীর সংখ্যাও বেড়েছে। কোম্পানির পক্ষে সম্ভব ছিল না সবাইকে চাকরি দেয়া। কিন্তু কৃপাপ্রার্থীরা তা বুঝল না, তারা মনে করল সরকার কৃপার প্রবাহ অন্যখাতে চালিত করবার মানসেই তাদের বঞ্চিত করছে। এরূপ মনে করবার সামান্য কারণও ছিল।

সিপাহী বিপ্লবের অবসানে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাহায্যের ও প্রতিশ্রুতির স্বীকৃতি স্বরূপ এবং হতবল ওয়াহাবি বিরূপতার অবসানকল্পে ভিক্টোরিয়া সরকার মুসলিমদের কৃপা-বিতরণের নীতি গ্রহণ করল। সিবিলিয়ান W. W. Hunterকে দিয়ে প্রচারমূলক গ্রন্থও রচনা করাল, সে-গ্রন্থের নামও ছিল আকর্ষণীয়—'The Indian Mussalmans—Are they bound in conscience to rebel against the Queen?. ১৮৬১ সন থেকে বাঙলার মুসলমানরাও মন্থর গতিতে ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করছিল । অতএব ১৮৬০ সনের পর থেকে এবং ১৮৬৮ সনে ওয়াহাবি বিচারের অবসানে সৈয়দ আহমদ খানের প্রবর্তনায় শিক্ষিত মুসলিম মাত্রই ব্রিটিশ আনুকূল্য লোভে ব্রিটিশানুগত্য কর্মে ও আচরণে প্রকাশ করতে থাকে। হিন্দুরাও অফিস-আদালতে নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপ্রবেশের সুনিশ্চিত আশঙ্কায় ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হল প্রায় অবচেতনভাবেই বলা চলে সহজাত বৃত্তির প্ররোচনাতেই। তবু তা যতটা চিন্তায় ও আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল, ততটা সক্রিয় ছিল না, কারণ তখনো তাদের একচেটিয়া অধিকারে হামলা আসন্ন ছিল না—তার জন্যে এক প্রজন্মকাল সময় প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত তখনো জমি-জমা অর্থ-সম্পদ শিক্ষা ও ব্যবসায় তাদের হাতেই! কাজেই আশঙ্কা যতটা মানসিক, তার পয়সা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিমাণও বাস্তবে আপাতত ছিল না। তাই এবারও ব্রিটিশ-বিদ্বেষমূলক বাণী উচ্চারিত হলেও কণ্ঠে জোর ছিল না, —অভিযোগের, অনুযোগের ও আবদারের আকারেই করছিল আত্মপ্রকাশ।

জাতীয়তার বা জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের ও মর্যাদার কথা গা পা বাঁচিয়ে বলবার চেষ্টা হচ্ছিল। কারণ যারা কোলকাতায় এসব স্বদেশী উত্তেজনাবোধ করত তারা ছিল জমিদার বিত্তবান ব্যবসায়ী উচ্চবিত্তের ও মধ্যবিত্তের সচ্ছল-সুখী পরিবারের সন্তান ও স্বাধীন পেশার বা অবসরভোগী মানুষ। ভিতরে তাগিদ ছিল না, কারণ প্রয়োজন ছিল না, তাই জ্বালাও ছিল না, ফলে সাহসেরও দরকার হয়নি। ১৮৬৭ সনের 'হিন্দুমেলা' দিয়ে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুর 'হিন্দু জাতীয়তা' ও হিন্দু-স্বাদেশিকতাবোধের প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

ইতোপূর্বে শাস্ত্রিক তথা প্রাচ্যবিদ্যায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ওয়াহাবিরা চেয়েছিল ভারতে মুসলিম-শাসনের ও সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা; আর্যসমাজীরা যেমন চেয়েছিল স্বধর্মীর সংহতি ও জাতীয় সত্তার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। জাতীয়তাবোধটা য়ুরোপীয়, স্বাধর্মটা সনাতন-চেতনা—বিকৃত তাৎপর্যে দুটোই অভিন্ন অভিধা লাভ করেছিল ওয়াহাবি-আর্যসমাজীর মানসে ও আন্দোলনে।

ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দুরাও কিন্তু য়ুরোপের গোত্রীয় কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাকে স্বধর্মীর সংহতি-চেতনার নামান্তর বলেই গ্রহণ করল। ফলে রামমোহন থেকে যে-হিন্দু চেতনার শুরু তা-ই কালে পূর্ণতা পেল। কংগ্রেসের সভায় ধর্মীয় জাতীয়তা অস্বীকারের চেষ্টা থাকলেও ভারতের হিন্দু-মুসলমান কারো মনে-মননে কখনো দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ ঠাঁই পায়নি। অথচ আমেরিকা মহাদেশের সর্বত্র তাঁদের সমকালে দৈশিক-রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবোধ গড়ে উঠেছিল ও দৃঢ়মূল হয়েছিল।

আট দশকে ইংরেজিশিক্ষিত হিন্দু-বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তাছাড়া এখন আর কেবল ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা নয়, জার-বিরোধী গুপ্ত সমিতি, আমেরিকার স্বাধীনতা, ম্যাজিনি-গ্যারিবল্‌ডি-কোঁতে-বেন্থামের বাণীই তাঁদের প্রেরণার উৎস। হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনীসভা, পাবনার কৃষক সমিতি (১৮৭৩), মনোমোহন ঘোষের সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় বয়সগত বাধা, সিবিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি, ১৮৭৪ সনে ভোলানাথ চন্দ্রের ব্রিটিশ পণ্য বর্জন প্রস্তাব, অবমাননাকর ইলবার্ট বিল (১৮৮২), ভার্নাক্যুলার প্রেস আইন (১৮৭৮), আগ্নেয়াস্ত্র আইন (১৮৭৮), ইন্ডিয়া লীগ ও ন্যাশন্যাল কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা, ম্যাজিনি-ভক্ত আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভা (১৮৭৫), বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ (১৮৮২), আরো পরে বিবেকানন্দের রচনা, 'ইন্দু প্রকাশে' অরবিন্দ ঘোষের জ্বালাকর ও বিদ্রোহাত্মক প্রবন্ধাবলি, মারাঠা বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী বাসুদেও বলবন্ত পাদকের দ্বীপান্তর (১৮৮০), দামোদর চোপেকারের ও বালকৃষ্ণ চোপেকারের ফাঁসি (১৮৯৭) প্রভৃতি অনেক ঘটনা শিক্ষিত হিন্দুদের লঘুগুরুভাবে ব্রিটিশবিরোধী হতে বাধ্য করেছিল। তবু ক্বচিৎ কয় ব্যক্তি ব্যতীত অন্যদের মনে যে জ্বালা বা ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ছিল না, তার প্রমাণ ১৮৮৫ সনে Scotsman, Allan Octavian hume-এর আহ্বানে শাসক-শাসিতের সমঝোতা ও সহযোগিতা লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসে হিন্দুদের সানন্দে যোগদান। আমাদের এ সিদ্ধান্তের সমর্থন রয়েছে বিপিন পালের [১৮৫৫-১৯৩২] মন্তব্যে Culcutta students community was honeycombed with 'Secret organisation' তাদের মধ্যে সন্ত্রাসমূলক কাজের কোনো পরিকল্পনা ছিল না, তাদের শৌখিন "thought and imagination were of a revolutionary character." গোপাল হালদারও বলেন, গুপ্তসভার 'Hindu-nationalism revivalism were the main trend, French revolution, Mazzini and young Italy, Garibaldi, Anti-Czarist secret societies, American war of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Independence. Irish Revolutionary Movements and Comte. Bentham etc. wree the sources of political inspiration which were mostly intellectual exercise of the Bhadraloks: (Bipin pal commemoration volume pp 244-37)। এ ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'। একালে সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন পাল (বিপিনচন্দ্র), বাল (গঙ্গাধর তিলক) ও লাল (লালা লাজপৎ) [১৮৫৬-১৯২৮]। তাঁরা ছিলেন মধ্যপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক। তিলকই গণপতিপূজা ও শিবাজী উৎসব (১৮৯৫) প্রবর্তন করেন।

গুপ্ত সমিতির সদস্যরা দেশমাতৃকার প্রতীক কালীমাতার ও গীতার নামে শপথ ও সংকল্প গ্রহণ করতেন। হিন্দু নেতারা হিন্দু-রাজত্বের স্বপ্ন দেখতেন, কাজেই ভারতীয় তথা নির্বিশেষ বাঙালি জনগণের ধর্মবিশ্বাস নিরপেক্ষ জাতীয়তা গঠনে কারো আন্তরিক আগ্রহ ছিল না। ব্রিটিশ আমলে উদ্ভূত উনিশ-বিশ শতকের সামন্ত জমিদার এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বুর্জোয়াশ্রেণী সংখ্যায়, শিক্ষায়, সামর্থ্যে অর্থে-বিত্তে প্রভাবে-প্রতাপে, নেতৃত্বে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল। কাজেই তারা মুসলমানকে বন্ধু ও বশ করবার গরজ বোধ বা চেষ্টাও করেনি কখনো, কেবল কংগ্রেস মাধ্যমে রাজনীতিক 'বোলচাল' হিসেবেই 'মিলনবাঞ্ছা' প্রকাশ করেছে। আর বিক্ষুব্ধ ও সংখ্যালঘু দুর্বল মুসলমান ঠকবার আশঙ্কায় সব সময় সভয়ে লক্ষ্য করেছে হিন্দু-রাজনীতি, চেষ্টা করেছে নিজেদের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার জন্যে। এটি ছিল বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও স্বার্থসিদ্ধির যুগ, প্রতীচ্য শিক্ষা তাদের আধুনিক বুলি ও পন্থা বাতলে দিয়েছিল মাত্র। একে 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। কেননা এ সময়ে মানুষের প্রতীচ্য-জীবনধারার প্রভাবে কৃত্রিম উপায়ে চোখ খুলেছে মাত্র। মন-মানসের মুক্তি ঘটেনি, সম্ভাবনার দিগন্তও হয়নি উন্মোচিত আবিষ্কারে-উদ্ভাবনে কিংবা নতুনতর জীবন-চেতনায় ও জগৎ-ভাবনায়। ব্রাহ্ম-ওয়াহাবি-আর্যসমাজী মানসের ও আন্দোলনের সঙ্গে রেনেসাঁসের পার্থক্য মর্মগত ও গুণগত— লক্ষ্যগত নয়।

এভাবেই ভদ্রলোকদের রাজনীতির মানসিক ব্যায়াম হয়তো চলত। কিন্তু লর্ড কার্জন 'বঙ্গবিভাগ' করে হিন্দু-মানসে চরম আঘাত হানলেন; সে অভিঘাতের আন্দোলন চলল ১৯১১ অবধি। 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' নামের দলদুটোরই সন্ত্রাসবাদীরা এবার দৃঢ়সংকল্প নিয়ে নামলেন সংগ্রামে। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেন। তাতেও হয়তো গণসমর্থনের অভাবে গুরুতর কিছু হতে পারত না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে জড়িত ব্রিটিশ সরকারের দুর্বলতার সুযোগে স্বাধিকার দাবির অভিলাষ আন্তরিক ও প্রবল হল বুর্জোয়া-মনে। তবে ভীরুতাও ছিল, তাই অরবিন্দ ঘোষ অসহযোগ ও অহিংসনীতির কথা বললেন ১৯০৬ সনে, যা পরে গান্ধীও গ্রহণ করলেন। অরবিন্দ বললেন : "Our methods are those of selfhelp and passive resistance. The policy of passive resistance was evolved partly as the necessary complement of selfhelp. partly as a means of putting pressure on govt. The assence of the policy is the refusal of co-operation etc." উল্লেখ্য যে, এ অহিংসনীতির উদ্ভাবক ও আদি প্রবক্তারা হচ্ছেন প্রতীচ্য মনীষীরা—থরো (১৮১৭-৬২), টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ডিক (১৮০৩-৬৭) ও পার্নেল (মৃ. ১৮৯১) প্রমুখ।

যুদ্ধোত্তরকালে স্বায়ত্তশাসনের দাবিও হল প্রবল। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন যুদ্ধপীড়িত সরকারের আর্থিক-মানসিক দুর্বলতার কারণে আশাতীতভাবে হল সফল আর সরকারি দুর্বলতার সুযোগে ত্রিশোত্তর রাজনীতি পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্যে হল পরিচালিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সাফল্য করল ত্বরান্বিত—যদিও হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব তীব্রতর ও সংঘাতসংকুল করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ টিকিয়ে রাখার চেষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না সরকার পক্ষের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়েই ছিল ১৯০৫ সন অবধি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তবু বাঙলাভাষী অঞ্চলের সমস্যা ও সম্পদ নিয়েই আমরা আলোচনায় অভ্যস্ত। সব অঞ্চলের সমস্যা বা রূপ নিশ্চয়ই অভিন্ন ছিল না। বন্দর নগর কোলকাতাই কোম্পানির রাজধানী হওয়ায় এবং বহির্জগৎ ও বহির্বাণিজ্য কোলকাতার মধ্যেই আমাদের কাছে পরিচিত হওয়ায় আর কোলকাতা হিন্দু-অধ্যুষিত হওয়ায়; প্রতীচ্য, শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনা বাঙালি হিন্দুর মাধ্যমে আসায়; গোটা প্রেসিডেন্সির অর্থ, সম্পদ, চাকরি ও শিক্ষা প্রভৃতির সুযোগ তারাই পেয়েছে। বিহার ও উড়িষ্যা এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ থেকে বহু সংখ্যায় কোলকাতা যাওয়া যানবাহন-বিরল সে-যুগে সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই কোলকাতার চারপাশের হিন্দুরাই সবটা দখল করে বসেছিল। সেখানে বিহারী উড়িয়া কিংবা মুসলিমরা পরে ঠাঁই পায়নি। পাটনায় কটকে অবস্থা এরূপ ছিল না, সেজন্যে সেখানে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বও সেভাবে প্রকট হয়নি, অর্থাৎ জমিদার-মহাজন-চাকুরে সব এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল না। বস্তুত বিহারে সংখ্যালঘু মুসলিমরা শিক্ষায় ও সম্পদে হিন্দুদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। বিহারে-উড়িষ্যায় তাই কোম্পানি আমলে বা ভিক্টোরিয়া শাসনে রাজনীতিক সমস্যা দ্বন্দ্ব-কন্দল সঙ্কুল ছিল না।

দিল্লি-আগ্রা-লাহোর প্রভৃতি পুরোনো শাসনকেন্দ্র ছিল কোলকাতা থেকে দূরে, মুর্শিদাবাদের পতনের পরে সেখানকার শিক্ষিত বিত্তবান অবাঙালি মুসলিমরা উত্তরভারতে চলে যায়, তারা কোলকাতায় বেশি সংখ্যায় এলে কোম্পানি-কৃপায় ভাগ বসাতে পারত, যেমন ভারতের অন্যত্র কোম্পানি-কৃপা মুসলমানরা কোথাও অস্বীকার করেছে বলে প্রমাণ নেই। বস্তুত উড়িষ্যায়, বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, বেরারে, উত্তর প্রদেশে, কিংবা দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজে সংখ্যানুপাতে চাকরিক্ষেত্রে মুসলমান বেশি অংশ পেয়েছে।[১]

অতএব, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিসেব করলে কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে সংখ্যালঘু মুসলিমরা চাকরিক্ষেত্রে সামান্যই বঞ্চিত হয়েছে। ১৮৭১ বা ১৮৮৬ সনে জনসংখ্যার (শতকরা ২৩ ভাগ) তুলনায় মুসলিমরা সরকারি চাকরি বেশি পেয়েছিল (৩১.৩ ভাগ)। ১৯১১ সনে মুসলিম জনসংখ্যা ছিল ২৩.৫ ভাগ, চাকরি করত ১৯.৪ ভাগ (১৯১৩)।[২] ১৯১৩ সনেও জনসংখ্যার তুলনায় মুসলিম চাকুরের সংখ্যা বেশি থাকত, উত্তরপ্রদেশের মুসলিমদের আইনশাস্ত্রে অনীহাজাত বিচারবিভাগে অনুপস্থিতির দরুন আনুপাতিকহারে মুসলিমদের প্রাপ্য চাকরির সামান্য ঘাটতি পড়ে ছিল।[১] এ সময়ে তফশিলি হিন্দুরা বলতে গেলে মোটেই কোনো চাকরি পায়নি। ঐতিহাসিক যুগে বর্ণহিন্দুরা সবকালেই এ সুযোগসুবিধা পেয়ে আসছিল। ব্রিটিশ আমলের প্রথম শতকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি, এ-ই যা। কাজেই সর্বভারতীয় হিসেবে মুসলমানদের ক্ষোভ করবার কোনো কারণ ছিল না। উনিশ শতকের শেষপাদ থেকে স্থানিকভাবে বাঙালি মুসলমানদের মনে ঈর্ষা, ক্ষোভ ও বেদনা জাগল এবং বাড়ল ইতিহাসজ্ঞানের অভাবে ও আত্মোন্নয়নবাসনার প্রাবল্যে।

ভারতে বর্ণহিন্দুর সংখ্যা যখন বেশি, তখন বিত্তে বৃত্তিতে সেবাতে বিদ্যায় ও চাকরিতে তারাই প্রবল ও সংখ্যাগুরু থাকবে এবং সামাজিক ও আর্থিক জীবনেও-যে তারাই প্রতাপে-প্রভাবে দর্পে-দাপটে প্রধান হবে—এতে অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছুই নেই।

---

১ Indian Muslims and the public Service 1871-1915 by Zafarul Islam and Raymond L. Jensen—JASP Vol IX no I. June 1964 PP-85-149, 88-901.

২ ibid pp 88-90, 104-05, 119-22, 128-30

১ ibid P. 147

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনিশ শতকের শেষপাদে বাঙলায় যখন মুসলিমরা চাকরিক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছে, তখন (১৮৭১ সনের আদমশুমারি অনুসারে) বাঙলায় তাদের জনসংখ্যা শতকরা ৩২ ভাগ মাত্র।[২] এবং মাত্র ১৯১১ সনে তাদের জনসংখ্যা শতকরা ৫২.৭ ভাগে দাঁড়ায়।[৩] বাঙলায় মুসলিমদের চাকরিক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার কারণ তাদের শিক্ষার ঐতিহ্যহীনতা ও কোলকাতা থেকে দূরে পূর্ববঙ্গে তাদের অধিকসংখ্যায় অবস্থিতি।

পূর্ববঙ্গে মুসলমান ছিল সংখ্যায় হিন্দুর চেয়ে সামান্য কিছু বেশি শতকরা ২/৩ ভাগ]। কিন্তু তাদের অধিকাংশের শিক্ষার বা উচ্চবিত্তের ঐতিহ্য ছিল না, তাছাড়া কোলকাতা ছিল রেলওয়ে হওয়ার আগে দুরধিগম্য। ফলে বাঙলার মুসলিমরা মুঘল আমলের মতোই রইল নিরক্ষর ও দরিদ্র। কিন্তু পরে তাদের কারো কারো সন্তান যখন কেরানি হওয়ার মতো শিক্ষিত হল, তখন বড়বাবুরা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। কাজেই তাদের অসন্তোষ ক্ষোভের ও বিদ্বেষের রূপ নিল, তাছাড়া আবাল্য-দেখা হিন্দু জমিদার-মহাজনের পীড়নও তাদের নতুন ক্ষোভে ও বিদ্বেষে ইন্ধন যুগিয়েছে। ফলে বাঙলায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিশেষ রূপ গ্রহণ করে—মুসলিম লীগের বাঙলায় জনপ্রিয়তার বিশেষ কারণ এ-ই।

মুঘল আমল অবধি গ্রামীণ জীবন-জীবিকা ও লেন-দেন ছিল সরল ও সামান্য। পণ্য বিনিময়ে মুদ্রার প্রয়োজনও ছিল সামান্য ও নিম্নমানের। কড়ি হলেই চলত। কাজেই আর্থিক ক্ষেত্রে জীবন ছিল প্রায় অবিচল।

সবকাজই ছিল গতর খাটা-খাটানো সাপেক্ষ। কারিগরি কল ছিল না। এই মন্থর ও চিরন্তন জীবনে নাড়া দিল য়ুরোপীয় কোম্পানিগুলোর আবির্ভাব। আকস্মিক বিপ্লব-বিপর্যয় ঘটাল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন। তারা আমাদের পণ্যের ওপর, কুটির শিল্পের ওপর, জমির ফসলের ওপর, কাঁচামালের ওপর, জমির স্বত্বের ওপর হামলা করল। আমাদের ছিল হস্তশিল্প, তাদের ছিল ক্রম বর্ধমান কলজাত সামগ্রী, বাজার-বাণিজ্য গেল তাদের নিয়ন্ত্রণে, তারা তাদের প্রয়োজনে যা নিত জোর করেই নিত, যা আনত তার চাহিদাও জোর করেই সৃষ্টি করত—অপরিহার্য ও আবশ্যিক করে তুলত তাদের পণ্য, শোষণ লক্ষ্যে ছিল তাদের শাসন।

এই পরিবর্তন বা বিপর্যয়ের জন্যে প্রস্তুতি ছিল না আমাদের—পরিবেশও ছিল না। কারণ তা দৈশিক প্রয়োজনে ও দৈশিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি—সবটাই আরোপিত বা চাপানো, এবং সবটাই ছিল জোর করে নির্মমভাবে দস্যুর মতো হরণমূলক। শুধু নেয়াই ছিল—কেবল কাড়াই ছিল, দায়িত্ববোধে কিংবা করুণাবশে কিছু দেয়ার কথা ভাবেনি তারা। ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে-জীবিকায়, জীবনপদ্ধতিতে, অর্থে-সম্পদে, ঘরে-সমাজে সর্বত্র এল আকস্মিক ও কল্পনাতীত বিপর্যয়। আগে সীমিত ও ক্ষুদ্র আশা-প্রত্যাশা নিয়ে বাঁচত গাঁয়ের মানুষ, সেখানে ছিল একটা সনাতন নিয়মপদ্ধতি। খরা-ঝড়-বন্যা-মহামারীকে আল্লাহর মার বলেই তারা জানত ও মানত। তাই নিরুপায়ের প্রবোধ ছিল এতে। কিন্তু প্রবল দুরাত্মা শাসন-শোষকের মারে প্রবোধ ছিল না। আবার নতুন জীবনপদ্ধতি হল শহর-বন্দর নির্ভর জীবন। তাকে ঠেকানোর সাহস-শক্তিও ছিল না কারো। কাজেই যতই অভাব, দারিদ্র্য ও নিঃস্বতা বাড়ছিল, ততই কাঙাল ভিখারিদের মতো অর্থ-সম্পদের ক্ষেত্রে গাঁয়ে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে অফিসে-আদালতে সর্বত্র মানুষ নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ

২ ibid P. 89
৩ ibid P. 130

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িয়েছে। শোষকশ্রেণী চিহ্নিত করতে জানেনি, তাই জাতধর্মই হয়েছে শত্রু-মিত্র বিচারের মাপকাঠি। তাই শূদ্ররা স্বধর্মী বলেই কখনো জমিদার-মহাজন বিদ্বেষী হয়নি, অথচ চাষী ও বৃত্তিজীবী হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই হয়েছে শোষিত। হিন্দু বলেই জমিদার মহাজন-চাকুরে খাজনা-সুদ-ঘুষ থেকে হিন্দুকে রেহাই দেয়নি। ইংরেজি শিক্ষার, কোম্পানির চাকরির কিংবা বানিয়া-ফড়িয়া-গোমস্তার চাকরির সুযোগ-সুবিধা বা প্রসাদ বাঙালি মুসলিমের মতো বিরাট শূদ্রসমাজও পায়নি ইংরেজ আমলে কখনো। মানুষ যতই কাঙাল হচ্ছিল, প্রত্যাশা আর লিপ্সাও ততই বাড়ছিল, বাঁচার গরজেই প্রভুশক্তির তোয়াজপ্রবণতা সে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল একশ্রেণীর লোকের মধ্যে। তাই সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী যত ছিল, স্বাধীনতাকামী সংগ্রাম ছিল না তার হাজার ভাগের এক ভাগও।

আর একটি কথা। মার্কসীয় তত্ত্ব অঙ্গীকার করার পূর্বে আস্তিক মানুষ কেবল স্বগোত্রের, স্বধর্মীর, স্বসমাজের ও স্বদেশের স্বার্থচিন্তা করেছে, হিত কামনা করেছে। নির্বিশেষ মানুষের কল্যাণকামনা করেছে ব্যক্তিগতভাবে ক্বচিৎ কোনো উদারপ্রাণ দুর্বল মানুষ। মার্কসীয়তত্ত্বে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরাই পৃথিবীতে এবং আমাদের দেশেও প্রথম জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিশেষ মানুষের জন্যে মানবিক ন্যায়, সাম্য ও স্বাধিকার দাবি করে। এই প্রথম সুস্পষ্টভাবে শোষক-শোষিত শ্রেণী-চেতনা জাগল। এর আগে পৃথিবীর সর্বত্র যেমন, আমাদের দেশেও তেমনি চিরকাল স্বগোত্রের, স্বকৌমের, স্বধর্মীর, স্বজাতির, স্বসম্প্রদায়ের বা স্বদেশের স্বার্থে মানুষ প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে-কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে, সংঘর্ষে-সংগ্রামে মতেছে। কাজেই মার্কস-পূর্ব পৃথিবীর সর্বত্র দ্বন্দ্ব-সংগ্রামের ইতিহাস অভিন্ন। এ-ও উল্লেখ্য যে, বাঙলাদেশের মার্কসবাদীরাই প্রথম স্থানিক-কালিক অবস্থানের স্বীকৃতিতে গণমানুষের সঙ্গে অভিন্ন স্বার্থবোধে একাত্মতা অনুভব করে। বাঙলাদেশে তারাই দ্বিধাহীন চিত্তে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে এ-মুহূর্তে একজন জার্মানের, কোরিওর কিংবা ইয়ামনীর যেমন দ্বৈত পরিচয়, তেমনি তারাও সত্তার (entity-তে) বাঙালি, রাষ্ট্রিক পরিচয়ে (identity-তে) বাঙলাদেশী এবং চেতনায় আন্তর্জাতিক ও মানববাদী। অন্যরা আজো হিন্দু-বাঙালি কিংবা মুসলিম-বাঙালি, বড়জোর বাঙালি-হিন্দু কিংবা বাঙালি-মুসলিম—পৃথিবীর অন্যান্য মানুষেও এমনি মনোভাব আজো প্রবল।

বঙ্কিম-বীক্ষা : অন্য নিরিখে

১

প্রথমে কোলকাতার ইংরেজ-কোম্পানির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কতগুলো ভাগ্য-বিতাড়িত, চরিত্রভ্রষ্ট, ধূর্ত, পলাতক, অল্পশিক্ষিত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বানিয়া-মুৎসুদ্দি-গোমস্তা-কেরানি-ফড়িয়া-দালাল-দেওয়ানরূপে অবাধে অঢেল-অজস্র কাঁচা টাকা অর্জনের ও সঞ্চয়ের দেদার সুযোগ পেয়ে ইংরেজের এদেশে উপস্থিতিকে ভগবানের কৃপা-করুণার দান বলে জানল ও মানল— যদিও তুর্কি মুঘল আমলেও রাজানুগ্রহ, চাকরি ও ব্যবসায়িক সুবিধে তারাই ভোগ করছিল বহুলাংশে। তুর্কি-মুঘল শাসনকে স্বজাতির তথা স্বধর্মীর শাসন বলে ভাবতে পারত না বলে শাসক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলটাকে সহজভাবে গ্রহণ করে নতুন প্রভুর কৃপাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। তাই তাদের ইংরেজ-ভক্তি, ইংরেজের ক্ষমতা-বৃদ্ধিতে উল্লাসবোধ এবং ইংরেজানুগত্য ছিল সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কারণ ইংরেজের সহচর্যে ও কৃপায় তাদের ধনে-যশে-মানে-সুখে ও শক্তিতে অবাধ অধিকার লব্ধ ও লভ্য। তাদের সন্তানেরা এবং কোলকাতার ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের তাদের জ্ঞাতিরা ইংরেজের দয়ার ও দানের সে অবাধ-অঢেল সুযোগপ্রাপ্তির আনন্দে এবং ব্যবসা, চাকরি ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে তার বিকাশ ও বিস্তার-প্রত্যাশায় এবং ব্রিটিশের বাড়ন্ত আশ্রয়-প্রশ্রয় লোভে ইংরেজ ও ইংরেজিবিদ্যা-প্রীতিকে চতুর্বর্গফল লাভের উপায় বলে গণ্য করল। ধনে-মানে-যশে-দর্পে-দাপটে যখন কোলকাতায় ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগ্রহপুষ্ট বিত্তবান সুখী একটা সমাজ গড়ে উঠল, তখন তাদের অর্থাভাবমুক্ত প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রাপ্ত সন্তানদের মধ্যে প্রতীচ্য-আদলের জ্ঞানপিপাসার, জগৎ-ভাবনার ও জীবনচেতনার এবং আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ হল। এঁরা ব্রিটিশাশ্রিত দ্বিতীয় স্তরের বা দ্বিতীয় প্রজন্মের লোক। এঁদের মধ্যে থেকেই আবির্ভূত হলেন উনিশ শতকের জ্ঞানী-কর্মী-মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-দার্শনিক-ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানী-সাংবাদিক-স্বাদেশিক প্রভৃতি। প্রাচ্য-দ্বেষণা ও প্রতীচ্য-এষণা তথা প্রাচ্যে অবজ্ঞা ও প্রতীচ্যে শ্রদ্ধা নিয়েই এঁদের প্রথমজীবনে ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের শুরু; কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে আবার এঁরাই হলেন কিছুটা স্বস্থ ও সুস্থ সনাতনী এবং স্বাদেশিক-স্বাজাতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনার অনুশীলনে নিষ্ঠ। যদিও ইংরেজ-রাজত্বই যে এঁদের এই নবলব্ধ ধন-মন-মননের উৎস, তাও এঁদের মনে সদা-জাগরূক ছিল। তখন এঁদের কাছে ইংরেজপ্রীতি ইংরেজশাসন, ইংরেজিবিদ্যা আর উন্নতি সমার্থক। তাই এঁদের স্বাজাতিক স্বাতন্ত্র্যচেতনা ও ইংরেজপ্রীতি চিত্তলোকে সৎ-প্রতিবেশীর মতো সহাবস্থান করত প্রিয়কুটুম্বরূপে। উনিশশতকী হিন্দু বুদ্ধিজীবীর চিন্তায়, কর্মে ও আচরণে স্ববিরোধের কারণ এ-ই।

AMARBOI.COM

২

য়ুরোপীয় বিদ্যার ঐশ্বর্যের ও সংস্কৃতির চোখধাঁধানো-মনভোলানো প্রথম অভিঘাতে ভাঙার পালা শেষে দ্বিতীয় স্তরের বা প্রজন্মের প্রতীচ্যবিদ্যাপ্রাপ্ত ঐ স্থিতধী গঠনকামীদের অন্যতম ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রতীচ্যবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনকালে মিল-বেন্থাম-কোঁতের হিতবাদ-মানববাদের প্রভাবে অভিভূত ছিলেন। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার ও সহানুভূতির ভিত্তিতেই তাঁর মানসকুসুমের বিকাশ। মানুষের কল্যাণবাঞ্ছাই ছিল তাঁর সব ভাব-চিন্তা-কর্মের উৎস। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত স্বচ্ছ ও উদার ধারণা নিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু। তাই স্ত্রীর বড়বোনের সঙ্গে সমাজ-নিন্দিত প্রণয়সম্পর্ক নিয়ে রচিত হয় তার প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহন'স ওয়াইফ'। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে লাম্পট্যদুষ্ট অভিরামস্বামী ও বীরেন্দ্রসিংহ, এবং তাঁদের অবৈধ সন্তান বিমলা-তিলোত্তমাই তাঁর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি-পাওয়া মানুষ। স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ, দিগন্তবিসারী দৃষ্টি ছিল তাঁর। সে-দৃষ্টিতে জগতের ও জীবনের অন্ধি-সন্ধি সূক্ষ্ম, নির্ভুল ও নিরপেক্ষভাবে প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ সামর্থ্যও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভাগ্য তিনি নাস্তিক থাকতে পারেননি। সন্ত অগাস্তিন থেকে আমাদের ফররুখ আহমদ অবধি সব আস্তিক মানুষই যে-মোহের শিকার হয়ে জীবনের ঐকান্তিক সাধনা বিপথে চালিত করে ব্যর্থকাম হয়েছেন, বঙ্কিমও ছিলেন সেই 'ধর্মভাবের কথা শাস্ত্রানুগত্যের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় কল্যাণ'সাধনের প্রত্যাশী ও প্রয়াসী। স্বজাতির কল্যাণবাঞ্ছাবশে স্বেচ্ছায় বিবেককে ও বুদ্ধিকে শাস্ত্রের ও সংস্কারের খাঁচায় বন্দি করলেন তিনি। এমনি করে তাঁর দিগন্তবিসারী দৃষ্টি দিয়ে জগৎকে ও জীবনকে উদার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশের নিচে বিশাল পরিসরে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে তিনি গাড়িটানা ঘোড়ার মতো ঠুলি গ্রহণ করে পরমানন্দে সমাজটানার দায়িত্ব বহনের কৃতার্থমন্যতা লাভ করলেন, কিংবা যেন অসীম সমুদ্রে অবগাহনের আনন্দ ছেড়ে পুণ্যকামীর ন্যায় তীর্থস্নানে কৃতার্থমন্য হবার লিপ্সা জাগল তাঁর। উনিশ শতকে বঙ্কিমই-যে কেবল এ ভ্রান্তির শিকার ছিলেন তা নয়; বিদ্যাসাগর ব্যতীত সবাই—রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-শ্রদ্ধানন্দ, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, সৈয়দ আহমদ খান, জামালউদ্দিন আফগানী, হালী-তিতুমীর-শরীয়তুল্লাহ, কেরামত আলী, ইকবাল প্রভৃতি শাস্ত্রেই খুঁজেছেন নবজীবনের আবেহায়াত। অন্ধ চেতনা ও বন্ধ্যা বাঞ্ছা-যে নতুন প্রতিবেশ থেকেই জেগেছে, তা তাঁরা স্বরূপে কখনো উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই শ্রেয়স্ খুঁজেছেন তাঁরা শাস্ত্রের বর্মে ও বিবরে। তবু বঙ্কিম যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বের প্রথমদিকে কখনো দ্বিধামুক্ত হতে পারেননি। মানুষ ও মনুষ্যত্ব তাঁকে বারবার অভিভূত করেছে; শাস্ত্রের সমাজের ও স্বজাতির প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের বিস্মৃতি ঘটেছে প্রায় ক্ষণে ক্ষণে ও স্থানে স্থানে। তাঁর সেবকসত্তা ও হিতৈষণা তাঁর সংবেদনশীলতার ও শিল্পীসত্তার কাছে পুনঃপুনঃ হার মেনেছে। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধাবোধকে ব্যাহত করেছে তাঁর শাস্ত্র ও সমাজ-আনুগত্য।

বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর রচনায় আমরা চার স্বরূপে দেখতে পাই। মুক্তমনের নিরপেক্ষ বঙ্কিমের বেপরওয়া ভাবনা-চিন্তা, জীবনদৃষ্টি ও জগৎভাবনা রয়েছে লোকরহস্যে ও কমলাকান্তের দপ্তরে। হিতবাদী বিবেকবান পরিবেশসচেতন বঙ্কিমকে পাই প্রবন্ধাবলিতে। আর উপন্যাসে পাই দুইস্বরূপে—মৃণালিনী অবধি এক স্বরূপে এবং পরবর্তী উপন্যাসে অন্যস্বরূপে—যেখানে জাতিসত্তা নির্মাণে ও জাতীয় শ্রেয়স সন্ধানে তিনি নিষ্ঠ—যদিও ক্ষণে ক্ষণে ব্রতভ্রষ্ট।

যে আপাত-সংকল্প নিয়ে তিনি এক-একটি উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন রচনাকালে তার বিস্মৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে। গ্রন্থমধ্যে শিল্পে ও সংকল্পে বিরোধ বেধেছে এবং তার কোথাও নিরসন হয়নি। এজন্যে প্রায়ই তাঁর দেয়া গ্রন্থনাম অসার্থক ও অনর্থক হয়েছে। শিল্পী তাই জয়ী এবং সংকল্প লক্ষ্যভ্রষ্ট ও দিশেহারা। দুর্গেশনন্দিনীতে দুর্গেশনন্দিনী আছে বটে, তবে সে তিলোত্তমা নয়—কেল্লাপতি-কন্যা আয়েষা। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস যে-কোনো মাপে—চরিত্র-চিত্রণে কিংবা ঘটনার গুরুত্বে বা কাহিনীর চমৎকারিত্বে বিমলা-আয়েষা-ওসমানের কাহিনী। নামেই প্রকাশ—এ কখনো তাঁর উদ্দিষ্ট কিংবা লক্ষ্য ছিল না। বিমলা তো প্রেমাস্পদকে পাবার জন্যেই পরিচারিকার ও উপপত্নীর লজ্জা, অমর্যাদা ও নিন্দা স্বেচ্ছায় বরণ করেছিল। এ ত্যাগ অতুল্য।

কপালকুণ্ডলাতে পরিসমাপ্তি করুণ-মধুর-ট্র্যাজেডি নয়। কেননা, এখানেও আত্মবিসর্জনের পূর্বমুহূর্তে নবকুমার-কপালকুণ্ডলার পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছিল। 'কাঁপিতেছ কেন? —কাঁদিতে পারিতেছি না এই ক্ষোভে কাঁপিতেছি... তুমি তো জানতে চাওনি'—ইত্যাদি উক্তিতে উভয়ের মন পরিষ্কার হয়ে গেছে, —অসূয়া-বিষের কণামাত্রও আর থাকেনি—মৃত্যুটা আকস্মিক ও দৈব। আপাতত ওথেলো-ডেসডিমনা ধরনের হলেও এ রোমান্টিক পরিণাম মধুর ও মহিমময়। ঔপন্যাসিক নবকুমারের স্বেচ্ছামৃত্যু বরণে সেই ইঙ্গিতই দান করেছেন। অন্যদিকে বাঞ্ছাহত হিন্দুনারী আজন্মের সতীত্বের ও স্বামীত্বের মহিমার পুনর্জাগ্রত সংস্কারবশে দিল্লির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ঐশ্বর্য ও স্বাধীনতা পায়ে দলে গেঁয়ো বামুন-স্বামীর পদাশ্রিত হবার ঐকান্তিক বাসনায় পদ্মাবতী-সত্তায় কষিত-কাঞ্চনের বিশুদ্ধতা এবং অস্পৃষ্ট ও অনাঘ্রাত কুসুমের পবিত্রতা চিত্তে সঞ্চারিত করে নতুন জীবন রচনায় প্রয়াসিনী হল। প্রতীচ্য একপত্নীত্বরীতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তাবক ও হিন্দুর সামাজিক সংস্কারের সমর্থক ঔপন্যাসিক স্বেচ্ছাচারদুষ্ট মতিবিবির মধ্যে হিন্দু পদ্মাবতী-সত্তার মরীচিকা জাগরূক করেও তাকে নির্মমভাবে মরুতৃষ্ণার শিকার করেছেন। কপালকুণ্ডলা একটি ট্রাজেডি-এবং সে ট্র্যাজেডি মতিবিবির জীবনেই আমরা প্রত্যক্ষ করি। - এখানেও সবাইকে এবং সবকিছুকে ছাপিয়ে, লেখকের অজ্ঞাতেই, মতিবিবিই প্রধানা। ভোগলিপ্সু বলে তাকে তাচ্ছিল্য বা নিন্দিত করা চলে না। কেননা, সম্ভোগপিপাসা চরিতার্থ করবার তার অন্য উপায়ও ছিল। এখানেও গ্রন্থনাম অসার্থক এবং বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্যভ্রষ্ট।

আর-একটি গ্রন্থের নাম মৃণালিনী বটে, কিন্তু কাহিনীর হেমচন্দ্র-মৃণালিনী নিতান্তই নিষ্প্রাণ পুতুলই রয়ে গেছে—পশুপতি-মনোরমাই জীবন্ত মানুষ হিসেবে অবিমোচ্য হয়ে থাকে পাঠকস্মৃতিতে। বঙ্কিম-সাহিত্যে মাধবাচার্যই প্রথম দেশপ্রেমিক যিনি স্বাধীনতা উদ্ধারের বা রক্ষার ব্রত গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে জগৎসিংহ মুঘল-সেনাপতি। তখনো বঙ্কিম-মনে হিন্দুয়ানী প্রবল হয়নি।

এমনিভাবে দেখি হীরা, কুন্দ ও রোহিণীকে অবজ্ঞেয় করে আঁকতে যেয়েও লেখক ব্যর্থ হয়েছেন বিষবৃক্ষে ও কৃষ্ণকান্তের উইলে। তাঁর আদর্শ নারী ও পুরুষ সূর্যমুখী ও ভ্রমর নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল কেবল হিন্দু বলেই বন্দ্য ও অনিন্দ্য; নইলে সূর্যমুখী ও ভ্রমর অস্থির অভিমানিনী ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলাল দয়ালু দুর্বল মানুষ মাত্র—পুরষ নয়। তবু বেন্থাম-কোঁতের ভক্ত বঙ্কিম ঐ দ্বিচারিণীদের অবহেলা করতে পারেননি। রিরংসাপ্রসূত অসূয়া ও অতৃপ্ত বাসনার শিকার যৌবনবতী হীরাকে তিনি পাগল করে ছেড়েছেন বটে, কিন্তু হীরাই বঙ্কিমের অজ্ঞাতে বাঙলাসাহিত্যে শাস্ত্রের, সমাজের ও নিয়তির বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহিণী। তার জীবনের এই ট্রাজিক পরিণাম হৃদয়বান মানুষকে বিচলিত করে; কৃত্রিম ও অসঙ্গতভাবে প্রায় অকারণে যখন 'কুন্দ কুসুম শুকাইল', তখন বিবেকবান পাঠক অসীম বেদনাবোধ করে, বিষবৃক্ষের মারাত্মকতা তখন কেউ স্মরণে রাখে না। আর দেশসুদ্ধ লোক তো রোহিণীর পক্ষে রয়েইছে। কেননা নিশাকরের প্রতি আসক্তির কারণ মেলে না রোহিণীর দয়িত গোবিন্দ-প্রাপ্তিপ্রসূত তৃপ্ত হৃদয়ে; —যদিও জিগীষু নারীসুলভ কৌতূহলের দোহাই দিয়েছেন লেখক। দ্বিধাগ্রস্ত বিবেকবান বঙ্কিম তাই নিশাকর-রোহিনী সম্বাদ অসমাপ্ত ও রহস্যাবৃত রেখেছেন। হীরা কিরণময়ীর চেয়ে উঁচু, উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক।

মনে হয় সদাচারী বিদ্বান স্থিতধী আদর্শ ব্রাহ্মণ-চরিত্র অঙ্কনই ছিল বঙ্কিমের উদ্দেশ্য। নইলে নিবীর্য-নিরভিমান নির্বিকার কাপুরুষ বিদ্যাবাহী চন্দ্রশেখরের নামে কেন হবে গ্রন্থনাম! অসাধারণ প্রেমিক-সপ্রতিভ সুন্দরী নারী শৈবলিনী বাঙলাসাহিত্যে বঙ্কিমের অতুল্য অবদান। বিনোদিনী-বিমলা-কিরণময়ী-অচলা-কমল কেউ শৈবলিনীর তুল্য নয়। শৈবলিনীর অরণ্য-প্রবেশে গ্রন্থ সমাপ্ত হলে এ চিরকালের একটি নিখুঁত সৃষ্টি হতে পারত। হিন্দুনারীর অতিস্থূল সতীত্ব-গৌরব প্রচারের অপপ্রয়াস সব পণ্ড করেছে। সতীত্ব কী এবং কোথায়? পরপুরুষ অস্পৃষ্ট দেহ বা দেহে, না মন বা মনে? শৈবলিনী, অচলা, রাজলক্ষ্মী, বিমলা, বিনোদিনীরা সতী না অসতী। এই গ্রন্থের দলনীও একটি চিরস্মরণীয় সৃষ্টি। দুর্বল প্রচারক বঙ্কিমের সবল প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী বঙ্কিমের এই এক নিখুঁত মানস-কন্যা—এক প্রমূর্ত নারী-মহিমা। নিশ্চয়ই 'দলনী' সৃষ্টির জন্যে 'চন্দ্রশেখর'-রচনা পরিকল্পিত হয়নি, তবু।

হিন্দুর বাহুবল দেখাবার জন্যে 'রাজসিংহ' রচিত। কার্যত রাজসিংহে আমরা মবারক-জেবুন্নিসা-দরিয়ার এবং আওরঙজীব-নির্মলকুমারীর কাহিনীই পাই। রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী বা মানিকলাল-কথা যেন উপকাহিনী মাত্র। এখানে প্রচারক-প্রবক্তা বঙ্কিমের অনভিপ্রেত লঘুকাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরু এবং মূলকাহিনী লঘু হয়ে উঠেছে। নায়কোচিত ক্রিয়া সম্পাদনের জন্যে রাজসিংহের মবারক-সম সমস্যা ও কর্মবহুল জীবন থাকা, নিদেনপক্ষে মানিকলালের মতো হওয়া কাম্য ছিল। গ্রন্থপাঠে মনে হয় রাজসিংহ-চঞ্চলকুমারী উপলক্ষ মাত্র। মবারক-জেবুন্নিসা-দরিয়ার জীবন-সমস্যাই মুখ্য চিত্র। এমনটি কেন হল? আমরা আগেই জেনেছি হিন্দু-মহিমার উদ্গাতা বঙ্কিম কাহিনীর মধ্যে আত্মবিস্মৃত, সংকল্পবিচ্যুত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানব-মনোবৃত্তির গতি-প্রকৃতিজিজ্ঞাসু শিল্পী বঙ্কিমে পরিণত হন। তখন লীলাচঞ্চল জীবন তাঁকে মুগ্ধ ও অভিভূত রাখে। তাই কেবল উদ্দেশ্যদুষ্ট সচেতন অশিল্পী বঙ্কিমই (বিক্ষুব্ধ হিন্দুর হয়ে) কাহিনী বহির্ভূত মন্তব্যের মধ্যে মুসলমানেরা [তথা মুঘলের, তুর্কিরও নয়—রাজসিংহে, আনন্দমঠে, দেবী চৌধুরানীতে] অশ্লীল-অসংযত ভাষায় নিন্দা করেছেন। 'রাজসিংহে'ও আওরঙজেব-শাহ্জাহানের প্রতি বিক্ষুব্ধ মনের অসংযত কটূক্তি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এখানে বঙ্কিম রাজসিংহের মন্ত্রী দয়ালসাহকেও প্রতিহিংসাপরায়ণ বর্বররূপে চিত্রিত করেছেন। দয়ালসাহ 'মালবে মুসলমানদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। ..... কোরান দেখলেই কুয়ায় ফেলিয়া দিতে লাগিলেন।' কিন্তু নির্মলকুমারী সম্পর্কে আওরঙজেব একজন শ্রদ্ধেয় সুন্দর মানুষ। '(আমি) কখনও কাহাকেও ভালোবাসি নাই, এ জন্মে কেবল তোমাকে ভালোবাসিয়াছি।' এখানে আওরঙজেব অতি উৎকৃষ্ট রুচি-সংস্কৃতিসম্পন্ন হৃদয়বান অতুল্য মানুষ। বস্তুত, বিন্যস্ত কাহিনীর মধ্যে আওরঙজেব শুধু অনিন্দ্য প্রেমিক নন—মহৎ সুহৃদও বটে। মবারক ধর্মভীরু কিন্তু রূপবহ্নির শিকার। যদিও বঙ্কিম হয়তো সচেতনভাবেই জেবুন্নিসা-মবারকের সম্পর্ক কামজ বলে বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন—অন্তত পাঠকের তাই মনে হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে গোড়া থেকেই-যে হৃদয়জাত প্রেম দানা বাঁধতে ছিল তা মবারকের মৃত্যুসংবাদের পরেই প্রমাণিত হল। জেবুন্নেসা অনুভব করল —বাদশাহজাদীরাও ভালোবাসে।.... বাদশাহ্জাদীও নারী। জেবুন্নেসা পঙ্ক থেকে পঙ্কজ হয়ে, প্রেমিক চিরন্তন-নারী হয়ে অপূর্ব মহিমায় ও সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। 'বাদশাহজাদী আর বাদশাহজাদী নহে, মানুষী মাত্র'— এ উপলব্ধি তাকে প্রেমধন্যা সাধনা-সুন্দর আদর্শ নারীরূপে আমাদের চিত্তলোকে শ্রদ্ধার আসনে বাসায়। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন '(রাজসিংহে) 'নায়ক কে জানি না। কিন্তু নায়িকা জেবুন্নেসা।' জেবুন্নেসা যখন বলে— 'শাহজাদীদের বিয়ে হয় না', তখন শাস্ত্রভীরু মবারক তাৎপর্য না-বুঝে কানে আঙুল দেয় বটে, কিন্তু আমরা জানি কত মর্মছেঁড়া গভীর বেদনার বিদ্রূপাত্মক অভিব্যক্তি তা। বাবরের কন্যা গুলবদন-গুলচায়না থেকে জাহানআরা অবধি অনেক মুঘল-রাজকন্যারই বিয়ে হয়নি। আভিজাত্যগর্বী মুঘল-বাদশাহ্রা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ব্যতীত কোনো প্রজার কাছে কন্যাদান করতে চাননি। তাই বাদশাহজাদীরা শাহজাদা ভিন্ন বিবাহ করে না।

আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরানী দুটোই তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন। যদিও দেবী চৌধুরানীর শেষাংশ রূপকথা পর্যায়ে নেমে গেছে। আনন্দমঠের প্রথম প্রকাশকালের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলেছেন (অবশ্য সরকারের ভয়ে কিনা বলা যাবে না) —'সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়নমাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ইংরেজরা বাঙ্গলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছে। এই সকল কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল।" এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সাপ্তাহিক Liberal (April 8. 1882.) থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বেকার বক্তব্যের সমর্থনে গ্রন্থসমালোচকের নিম্নোক্ত মত উদ্ধৃত করে দিয়েছিলেন :

This passage (শেষ পরিচ্ছেদ যেখানে বৃথা সংগ্রাম ত্যাগ করে প্রতীচ্য শিক্ষা গ্রহণ করে স্বাধীনতার যোগ্য হওয়ার উপদেশ রয়েছে) embodies the most recent and the most

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already froms the creed of English education.

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় (11th edition vol. VI, p. 910) রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "Owing to the advice of mysterious physician.... to abandon further resistance, since a temporary submission to the British rule is a necessity .... The general moral of the AnandaMath, then, is that British rule and the British eucation are to be accepted as the only alternative to Mussalman oppression, a moral which Bankimchandra developed also in his Dharmatattva...before they could hope to compete on equal terms with the British and the Mahommedans. But though the AnandaMath is in form an apology for the loyal acceptance or British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration sooner or later, of a Hindu Kingdom in India." বঙ্কিম গ্রন্থমধ্যেও বলেছেন—'ইংরেজ-যে ভারতবর্ষের উদ্ধার সাধনের জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তখন তাহা বুঝে নাই।' অতএব নব্যশিক্ষিত-মনে ইংরেজপ্রীতি ও ইংরেজানুগত্য জাগানো-লক্ষ্যেই এ গ্রন্থ রচিত, যাতে তারা য়ুরোপীয় আদলে তখনই স্বাধীনতাস্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিচলিত না করে। ইংরেজ কৃপাপুষ্ট উঠতি সমাজের পক্ষে বঙ্কিম সদ্য জাতীয়চেতনাপ্রাপ্ত নব্য ইংরেজিশিক্ষিতদের বলতে চান—স্বাদেশিক স্বাতন্ত্র্য কামনার কিংবা স্বাধীনতা বাঞ্ছার সময় এখনো আসেনি। স্বাধীনতা-স্বপ্নের ব্যর্থতা দেখিয়ে তিনি যুবকদের মনোবল ভেঙে দিলেন। দেবী চৌধুরানীরও শেষ কথা—দস্যুবৃত্তি দিয়ে লোকহিত করা যায় না। কেবল ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নন, প্রাবন্ধিক বঙ্কিমও ইংরেজশাসনের স্থায়িত্ব চান—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরম উপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। সেইসকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। ... তাহার মধ্যে দুইটি—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা।" (*ভারতকলঙ্ক*)। 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা' প্রবন্ধে ইংরেজ শাসনকে সমর্থন করেছেন বঙ্কিম, "ভিন্ন জাতীয় রাজা হইলেই—রাজ্য পরতন্ত্র বা পরাধীন হইল না। ভিন্ন জাতীয় (সুশাসক) রাজার অধীনে রাজ্যকেও স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বলা যাইতে পারে।" রবীন্দ্রনাথেরও এমনি মনোভাব স্মর্তব্য। [*সভ্যতার সঙ্কট*] কোম্পানির স্বার্থে সরকার-সমর্থক হিসেবেই বস্তুত ব্রিটিশ জমিদার ও চাকুরে শ্রেণীর সৃষ্টি করেছিল।

তবু-যে উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ অবধি 'আনন্দমঠ' স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রের গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয় এবং বঙ্কিমচন্দ্রও দীক্ষাদাতা 'ঋষি' বলে পরিকীর্তিত হতে থাকেন, তার কারণ তখন ফরাসি-বিপ্লবের মাধুর্যমুগ্ধ ইংরেজিশিক্ষিত শহুরে লোকগুলো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'র একটা সাংস্কৃতিক গরজ অনুভব করেছিল। বস্তুত ১৯০৫ সনের পূর্বাবধি বাঙালি হিন্দু মাত্রই ইংরেজ প্রীতিতে কৃতার্থ। তার আগে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা কিংবা ইন্ডিয়ান লীগ অথবা ন্যাশন্যাল কনফারেন্স প্রভৃতি সবগুলোই ছিল প্রতীচ্য বিদ্যাপ্রাপ্ত কোলকাতাবাসী ভদ্রলোকদের (জমিদার-ব্যবসায়ী-উকিল-ডাক্তার শিক্ষক ও বড় চাকুরে) প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক-সামাজিক বিলাস মাত্র। এমনকি কংগ্রেসেরও জন্ম হয় ব্রিটিশ-স্বার্থে লর্ড ডাফরিনের অভিপ্রায়ক্রমে এলান অকটোভিয়ান হিউমের উদ্যোগে উঠতি ভদ্রলোকদের বশে-রাখার ফাঁদ হিসেবেই। কাজেই বঙ্গবিভক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বাবধি ইংরেজের অনুগ্রহপুষ্ট মধ্য ও উচ্চবিত্তের হিন্দুমাত্রই রাজভক্ত। এই শতকের কোলকাতার হিন্দুরা শাসন-প্রত্যাশী। এমনকি সিপাহী বিদ্রোহে কাবু ব্রিটিশের প্রতিও বাঙালির শ্রদ্ধায় ও আনুগত্যে মৌখিক বিচলনও ঘটেনি। বঙ্কিমেরও জন্ম ইংরেজের শিক্ষা ও অনুগ্রহপুষ্ট সমাজে ও পরিবারে। তাছাড়া তিনি ছিলেন সে যুগের বাঙালির প্রাপ্য সর্বোচ্চ চাকরির অধিকারী ডেপুটির পুত্র, ভাই এবং ডেপুটি। তাঁদের চোখে শাসক হিসেবে ভারতে ব্রিটিশের উপস্থিতি দৈবানুগ্রহ ও আশীর্বাদ। নির্জিত নিপীড়িত বৌদ্ধেরাও একদিন তুর্কিবিজয়ীকে এমনি মুক্তির আশ্বাসরূপে অভিনন্দিত করেছিল (নিরঞ্জনের রুস্মা ও উমাপতিধরের আর্যা স্মর্তব্য)। অতএব, আনন্দমঠের ও দেবী চৌধুরানীর প্রথমাংশে পূর্বোক্ত উত্তেজনার আগুন পোহানোর ইন্ধন ছিল। নিষ্কাম কর্ম, মাতারূপে মাটিকে অভিহিতকরণ ও 'বন্দেমাতরম' নামের সংস্কৃত-বাঙলা মিশ্রিত সঙ্গীত তাঁর অনন্য দান। তাই ও-দুটো গ্রন্থ ছিল হিন্দুর খুব প্রিয় এবং বঙ্কিম ছিলেন অগ্নিপুরুষ ঋষি। উচ্চশিক্ষিত ও বিত্তবান শহুরে ভদ্রলোকদের পূর্বোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল নবজাগ্রত আত্মসম্মানবোধ-প্রসূত স্বজাতি-হিতৈষণার ও সংস্কৃতিচর্চার প্রতীক। এঁদের জাতিচেতনা মৃদু জাতিবৈর প্রকাশের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্যসুখে ছিল তৃপ্ত। বঙ্কিমও ছিলেন এই দলে; তাঁর নিজে ভাষায় : "যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-বিজেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যতদিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্বগৌরব মনে রাখিব, ততদিন জাতিবৈর শমতার সম্ভাবনা নাই।... যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, ততদিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে, ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণেই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি।" ইংরেজের প্রজা ও চাকুরে অনন্যোপায় বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে জাতিবৈর অতীতের মরাহাতি—মুসলমানদের প্রতি প্রয়োগ করে রাজনীতি ও সমাজক্ষেত্রে অনেক অনর্থ ঘটিয়েছেন! যদিও বিবেকবান বঙ্কিম জানতেন 'যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল।" (উপসংহার-রাজসিংহ)। বঙ্কিম স্বয়ং বলেছেন : "আমার ইচ্ছা হয় একবার সে চরিত্র (ঝাঁসির রানী) চিত্র করি, কিন্তু এক আনন্দমঠেই সাহেবেরা চটিয়াছে, তা হলে রক্ষে থাকবে না।" [*বঙ্কিম প্রসঙ্গে*, সুরেশ সমাজপতি সংকলিত, ১৯৭ পৃ. *বঙ্কিম-মানস* পৃ. ১৪৮, উল্লেখ্য যে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত আনন্দমঠের পাঠে ইংরেজ- দ্বেষণার লক্ষণ ছিল।]

৩

বস্তুত ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের আঘাতেই হিন্দু প্রথম আন্তরিকভাবে ইংরেজের বৈরী হল। তবু ১৯৩০ সন অবধি তারা স্বাধীনতা কামনা করেনি। আবার ১৯০৫ সনের পরেও অন্যগ্রন্থের অভাবে আনন্দমঠকেই উত্তেজনাপ্রাপ্তির অবলম্বন করে। কাজেই ব্রিটিশ-শাসন পোক্ত করার প্রয়াসীই জাতীয় স্বাধীনতার উদ্গাতা বলে বন্দিত হলেন। একেই বলে ভাগ্য! এখানেও উপন্যাসের নায়ক ব্রতভ্রষ্ট ভবানন্দ,-রূপবহ্নিতে তার মর্মান্তিক দাহনই সব নীতি, সংযম ও সংগ্রামের বাণীকে ছাপিয়ে উঠেছে। আনন্দমঠে ও দেবীচৌধুরানীতে মুসলিমের প্রতি নিন্দা, বিদ্রূপ এবং অশালীন কটূক্তি বর্ষিত হয়েছে। মুসলমান বিদ্বেষবশে করলে দুর্গেশনন্দিনী-মৃণালিনী-চন্দ্রশেখর-সীতরামেও তা' থাকত। এর কারণ আরো গভীরে। মুরশিদকুলি খানের পরে কখনো বাঙলায় নানা কারণে মানুষের জীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। মুঘল কেন্দ্রীয় শক্তির দ্রুত ক্ষয়িষ্ণুতা, বর্গীর লুণ্ঠন, নওয়াবের অযোগ্যতা, সামন্ত স্বৈরাচারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে য়ুরোপীয় বেনেদের প্রাবল্য প্রভৃতি জনজীবনে দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব, নিরাপত্তাহীনতা, চারিত্রিক শৈথিল্য, প্রাশাসনিক পীড়ন প্রভৃতি অনিবার্য ও ক্রমবর্ধমান করে তোলে। যে নওয়াবের ও সরকারের ওপর জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তা দানের দায়িত্ব রয়েছে, সে-সরকার যদি তা' পালনে উদাসীন বা অসমর্থ হয়, তাহলে জনজীবনে সর্বদুঃখের কারণস্বরূপ সেই রাজশক্তি ও সরকারের প্রতি মানুষ ক্ষিপ্ত, বিরক্ত ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ তখন অক্ষম অসহায় মানুষ নিন্দা-গালিতেই মেটায়। "বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।... যেখানে মুসলমানের গ্রাম পায়, দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।... ২০/২৫ জন (হিন্দু) জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়।" (*আনন্দমঠ*) "মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দুপ্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী ইংরেজদের হইয়া লড়িয়া হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল।' (*ধর্মতত্ত্ব*)।

যদিও বঙ্কিমের মতে দেশরক্ষাই শ্রেষ্ঠধর্ম, তবু তাঁর ছিল ইংরেজশাসনপ্রীতি। এ স্ববিরোধ-ইংরেজ-অনুগ্রহপুষ্ট উঠতি হিন্দুমাত্রেই লক্ষণীয়। এ ছিল যুগধর্ম। তখন ইংরেজ প্রশ্রয়ে ধন-মান-বিদ্যা-যশ-সুখ-শান্তি-আনন্দ-আরাম হিন্দুর পক্ষে অনায়াসলভ্য সম্পদ। এ মোহ তাকে অভিভূত রাখে। এ স্ববিরোধ তাই উনিশ শতকের হিন্দুসমাজের ও মানসের পক্ষে যুগধর্ম। বঙ্কিম কৃষকের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে যেয়ে ইংরেজদের সম্মানের ও জমিদারের স্বার্থের কথাও বিস্মৃত হননি। জনগণের আর্থিক জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ক্ষতি উপলব্ধি করেও তার পরিবর্তন চাননি [চাকরির খাতিরে নয় শুধু]। তিনি কেবল নবশিক্ষা-সভ্যতার, চিন্তা-চেতনার ও সৌভাগ্যের বাহক ইংরেজের এদেশী লোকের কল্যাণে এদেশে স্থিতি কামনা করেন বলেই। স্বাধীনতা (*আনন্দমঠ*) সমাজ বিপ্লব (*দেবী চৌধুরানী*) বা 'জমিদার দর্পণের প্রচার কামনা করেননি ঐ একই কারণে। তাছাড়া পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে নির্মমভাবে বিদ্রোহীপ্রজা দমনের ভয়ঙ্কর চিত্রও তাঁর মানসপটে ছিল। প্রস্তুতিবিহীন প্রয়াস তিনি অনর্থক বলেই জেনেছেন। বস্তুত বঙ্কিমের মনে সর্বত্র একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব বর্তমান। মেকলেউদ্দিষ্ট এ্যাংলোবেঙ্গলীর প্রতিভু বঙ্কিমের তথা উনিশশতকী প্রতীচ্যবিদ্যাপ্রাপ্ত সরকারপোষ্য বাঙালি হিন্দুর মানস-স্বরূপ এ-ই।

এখনকার যুগে যেমন এমনি নৈরাজ্য অবস্থায় আমরা স্বদেশী-স্বজাতি-স্বধর্মী স্বভাষীর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, তাদের নিন্দা করি;* আঠারো-উনিশ শতকের বাঙালি হিন্দুও ছিল তেমনি সেদিনের নৈরাজ্য ও নৈরাজ্য-পীড়নের স্মৃতিপ্রসূত ক্ষোভ-জেদের শিকার। তাই জনজীবনে ও জীবিকায় নিরাপত্তাদানে অসমর্থ তুর্কি-মুঘল হল ঘৃণ্য এবং ইংরেজি হল বন্দ্য। হিন্দুর ব্রিটিশ-প্রীতির মনস্তাত্ত্বিক কারণ এ-ই। আবার একশো বছর পরে যখন ইংরেজিশিক্ষিত উঠতি মধ্য ও উচ্চবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল,

* ১৯৭১ সনে আমরা যেমন এককালের প্রিয় স্বধর্মী-স্বদেশী পাঞ্জাবির শাসনে-শোষণে-পীড়নে-পেষণে বিক্ষুব্ধ হয়ে তাদের বিতাড়নের জন্যে এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী-শত্রু-কল্প বিধর্মী-বিজাতির দেশ ভারতকে আহ্বান করেছি বাঙলাদেশ আমাদের হয়ে জয় করে নিতে-সেদিন দেশের বুকে ভারতীয় বাহিনীর পদার্পণকে আমরাও আল্লাহ্‌র রহমত বলে অভিনন্দিত করেছি। পাঞ্জাবির উপর রুষ্ট হয়ে ইসলামের ও পাকিস্তানের নামে এদেশে আশ্রিত বিহারীদের অকারণে হত্যা করে পরোক্ষে অমানুষিক প্রতিশোধবাঞ্ছা মিটিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন তারা বাণিজ্যে-চাকরিতে ও মর্যাদায় যথাপ্রাপ্য অধিকার চেয়ে বাধা পেল, তখন আবার ব্রিটিশের প্রতি বিরূপ হতে থাকে—এবং বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে যখন ব্রিটিশের কাছে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই রইল না (এবং যা পেয়েছে তারও কিছু নবপ্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানের জন্যে ছিনিয়ে নেয়ার আশঙ্কা প্রকট হয়ে উঠল) তখন তারা স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম শুরু করল।

আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরানীর আমল হচ্ছে দ্বৈত-শাসনের দুর্ভোগের কাল। বাস্তবে দ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীরা [এরা উত্তর বিহারী ও ভোজপুরী বাঙালি পল্টনের পদচ্যুত সৈনিক, তাই স্বদেশ- বিহারে ধনলুট না করে করত বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।]—নওয়াব না ইংরেজ—কার ওপর বেশি খেপেছিল তা আমাদের জানা নেই; তবে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত ক্ষোভ ও নিন্দা বাস্তবেও মিথ্যে ছিল না। তুর্কি-মুঘলের জ্ঞাতিত্ব-গর্বী দেশী মুসলমান অকারণে এ-নিন্দাগালি নিজেদের গায়ে মাখে। 'মুসলমান'-এর স্থলে 'মুঘল' লিখলে হয়তো তাদের গায়ে এতটা লাগত না।

শেষ উপন্যাস 'সীতারামে'ও হিন্দু বাঙালির বাহুবল ও বীরত্ব দেখানোর জন্যে লেখনী ধারণ করেও হয়তো ব্রিটিশ-প্রজা বঙ্কিম আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরানীর আদলে জ্ঞান-ভক্তি-প্রেম ও সকাম-নিষ্কাম তত্ত্বের ফাঁদে ফেলে হিন্দুবীর সীতারামের পতন ঘটিয়ে ব্রিটিশ শাসন-পোক্ত রাখার সহায়তা করে আর-একবার রাজভক্তি দেখিয়েছেন। এ উপন্যাসে সব অন্যায় অপকর্ম দুর্নীতির নায়ক হিন্দু। গোড়ায় গোঁয়ার মুসলমান ও শেষের দিকের চাঁদশা ফকির চরিত্রে দোষ-গুণের সমতা রক্ষিত হয়েছে। চঞ্চলকুমারীর আওরঙজেবের তসবিরে পদাঘাত আর মুসলিম গোঁয়ারের রাস্তা প্রতিরোধ—মানুষের একই নীচপ্রবৃত্তির প্রকাশ। লক্ষণীয়, চঞ্চলকুমারী আকবর-জাহাঙ্গীরের ছবির প্রতি শ্রদ্ধাশীলা, কাজেই এ জাতি-বিদ্বেষ নয়, স্বকালীন শাসক-বিদ্বেষ।

সাধারণভাবে বঙ্কিম যৌবনে বৃত্তচ্যুতিকেই জীবনে সমস্যা, যন্ত্রণা ও ট্র্যাজেডির কারণ রূপে নির্দেশ করেছেন, শাস্ত্র ও সমাজশাসিত জীবনে স্বীকৃত ও চিরাচরিত নিয়মনীতি মেনে চললে নিস্তরঙ্গ পোষমানা জীবনে দ্বন্দ্ব-দুঃখ থাকে না, এ-ই যেন তাঁর ধারণা। মানুষের জীবনে যৌবনই সঙ্কটকাল। এ সময়েই রূপবহ্নি ও অসূয়াবিষ মনুষ্যহৃদয় মথিত করে ও বৃত্তচ্যুতি ঘটায়। সংযমের ও সহনশীলতার সঙ্গে নিয়মনীতি নিয়ন্ত্রিত সংসারবৃত্ত-লগ্ন গতি যে বজায় রাখতে পারে, সে-ই বেঁচে ও বর্তে যায়, অন্যরা জীবনে নিয়তিকে অমোঘ করে তোলে। তাই বঙ্কিম জীবনে নিয়তির লীলা স্বীকার করেও নর-নারীর আচরণকেই নিয়তির অমোঘ কার্যকরতার জন্যে দায়ী করেছেন—এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ কুন্দ ও উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য কপালকুণ্ডলা। বঙ্কিম তাঁর সবকয়টি উপন্যাসে এই রূপবহ্নি, অসূয়াবিষ ও নিয়তি-শেলকেই যৌবনে নর-নারীর বৃত্তচ্যুতি ও জীবনে অশুভ-পরিণামের কারণরূপে নির্দেশ করেছেন। এজন্যেই বঙ্কিমের আদর্শ মানুষ নিষ্কাম যোগী-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী (রবীন্দ্রনাথেরও—বিশেষ করে নাট্যসাহিত্য স্মর্তব্য)। বিষয়ী মানুষও-যে সমাজ-সচেতন এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন আদর্শ সামাজিক মানুষ হতে পারেন, এ ছিল তাঁদের প্রায় ধারণাতীত। এদিক দিয়ে শরৎচন্দ্র বরং সুরেশ-বিপ্রদাস চরিত্রে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন।

৪

স্বদেশের ও স্বজাতির প্রেমিক ও সেবক বঙ্কিম প্রতীচ্য-আদলে জাতিগঠনের দায়িত্ব স্বেচ্ছায়, সানন্দে ও সাগ্রহে নিজের হাতে গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্কিমের লেখনী তাই স্বজাতির চিত্তবোধন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিতসাধন, লক্ষ্যচিন্তন ও গৌরবকথন কর্মে উৎসর্গিত হয়েছিল। কৈশোরে যৌবনে যিনি বিশ্বমানবের হিতবাদী ও মনুষ্যত্বপূজারী, সে-বঙ্কিম নিজের দেশ-কাল ও শাস্ত্র-সমাজের বেষ্টনীর মধ্যে তাঁর ভাব-চিন্তা-কর্ম সীমিত রাখলেন। যিনি সমুদ্র-সাঁতারের সামর্থ্য রাখতেন, তিনি বদ্ধ সরে তরঙ্গ সৃষ্টির সাধনায় হলেন নিরত ও তৃপ্ত। অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্ব তাঁকে পেয়ে বসল। এ কারণেই তিনি 'সাম্য'-এর মুদ্রণ ও প্রচার বন্ধ করে দিলেন।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মূলত জগৎ ও জীবনরসিক এবং সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন পর্যবেক্ষক। মানুষে ও পরিবেষ্টনীতে ছিল তাঁর অসীম কৌতূহল। তাই তিনি দেশ-জাতির ও শাস্ত্র-সমাজের নীতি-প্রবক্তার, হিতকামীর ও মঙ্গল-সাধকের পবিত্রকঠোর দায়িত্ব ও সংকল্প নিয়ে নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন বটে; কিন্তু কাহিনীর শুরু থেকে সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বাবধি তিনি তাঁর সৃষ্ট নর-নারীর স্বচ্ছন্দ জীবনলীলার কৌতূহলী দর্শক ও নিশি-পাওয়া অভিভূত ব্যক্তির মতো অনুসারকমাত্র থাকেন। তখন তিনি একজন আপনহারা নিবিষ্টচিত্ত নিপুণ শিল্পীমাত্র। তারপর তাঁর অঙ্কিত জীবনচিত্রের সমাপ্তিমুখে তিনি সম্বিৎ ফিরে পান; তখন দায়িত্ব ও কর্তব্যসচেতন হিন্দু বঙ্কিম তাঁর উদ্দিষ্ট বক্তব্য আকস্মিক ও অসঙ্গতভাবে শেষ কয় পরিচ্ছেদে যেমন-তেমন করে পুরে দেন। তাই কুন্দ-রোহিণীর পরিণাম অসঙ্গত ও অসমঞ্জস। তাই শৈবলিনীর সতীত্ব প্রমাণের এমন অশিল্পীজনোচিত স্থূল ও বিসদৃশ ঘটা, তাই প্রফুল্লের স্বামীঘরে প্রতিষ্ঠা ও থালা মাজার আগ্রহ, তাই মনোরমার চিতারোহণ, তাই রূপবহ্নিতে দগ্ধ লম্পট সীতারামের অন্তিম-অকুতোভয়তা, বীরেন্দ্র সিংহের আস্ফালন ও মৃত্যুবরণ, সতী ভ্রমরের বাক্যসিদ্ধি ও পতিকোলে মাথা রেখে মরার সৌভাগ্য, অনুতপ্ত গোবিন্দলালের স্ত্রী-নিষ্ঠা ও সন্ন্যাস, শান্তির সংযম-মহিমা, লবঙ্গলতার সতীত্বের ও স্বামীত্বের অকারণ আস্ফালন, চঞ্চলকুমারীর বর্বর উক্তি ও আচরণ এবং কিছু মুসলিম-নিন্দা প্রভৃতি হিন্দুয়ানী উদ্দীপক অশৈল্পিক স্থূলযোজনা। আদর্শানুগত্যবশে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ট্র্যাজেডিগুলোতে নায়ক-নায়িকার জীবনে অযৌক্তিক অসঙ্গত ও আকস্মিক পরিণাম ঘটিয়ে তাঁর শিল্পীসত্তার ও বিবেকী আত্মার অবমাননা করেছেন। কেবল দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও রাজসিংহ-ই সমাপ্তি-সুন্দর উপন্যাস। বঙ্কিমের অনেক নায়ক-নায়িকায় মুখ্যচরিত্রসুলভ গুণের ও কৃতির অভাব; কেবল কপালকুণ্ডলা, শৈবলিনী, ইন্দিরা, প্রফুল্ল ও সীতারামই ব্যতিক্রম।

তাঁর সৃষ্ট জীবন্ত ও স্মরেণ্য সব মানুষ হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্শ্বচরিত্র কিংবা উপনায়ক-উপনায়িকা ও উপকাহিনীর পাত্র-পাত্রী। তাই আমরা বিমলা, আয়েষা, ওসমান, প্রতাপ, হীরা, দেবেন্দ্র, লবঙ্গলতা, অমরনাথ, মবারক, দরিয়া, জেবউন্নিসা, নির্মলকুমারী, আওরঙজেব, মানিকলাল, ভবানন্দ, শান্তিভবানী, মতিবিবি ও জয়ন্তীকে স্মরণ করি—তাঁর নায়ক-নায়িকাদের নয়। প্রেমাস্পদের জন্যে বিমলা বরণ করেছে নিন্দা, কলঙ্ক, পরিচারিকার কর্ম, ত্যাগ করেছে পত্নীর মর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা। বিমলা অনন্যা।

আশ্চর্য, রাজনৈতিক কারণে এতকাল অস্বীকৃত হলেও মানতেই হবে যে বঙ্কিম-সাহিত্যে মুসলিম চরিত্র মাত্রই (আমাদের মতে বিতর্কিত জেবউন্নিসাও) সাধারণভাবে অনিন্দ্য নয় শুধু, এদের কেউ কেউ উঁচুমানের ও অনন্য মানুষ। আয়েষা, ওসমান, কৎলু খাঁ, মেহেরুন্নিসা, সেলিম, মহম্মদ আলী, মীরকাসিম, দলনী, মবারক, দরিয়া, আওরঙ্গজেব, জেবউন্নিসা, চাঁদ শা—এদের মধ্যে আয়েষা, ওসমান, মহম্মদ আলী, দলনী, মবারক, দরিয়া অনন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্কিমের ধারণা ছিল তুর্কিরা কখনো গোটা বাঙলাদেশ দখল করতে পারেনি এবং যা দখল করেছিল, তাতেও হিন্দু সামন্তরাই প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য চালাতেন। কাজেই স্বাধীন তুর্কি (পাঠান) শাসনে বাঙলার নৈতিক, মানসিক ও বৈষয়িক উন্নতি হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী মুঘলের দিল্লিকেন্দ্রিক শাসন-শোষণেই বাঙালির দারিদ্র্য-দুর্ভোগ-অবক্ষয় শুরু হয়। এজন্যে তিনি মনে করেন 'রাজা ভিন্নজাতীয় (পাঠান) হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলিতে পারা যায় না। ... পাঠান-শাসনকালে বাঙালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।... তিনিই (আকবর) প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গলাকে পরাধীন করেন। সেইদিন হইতে বাঙ্গালির শ্রীহানির আরম্ভ।... মোঘলই আমাদের শত্রু, পাঠান আমাদের মিত্র।' (*বাঙ্গালার ইতিহাস*)

৬

হিতবাদ অঙ্গীকারে মানবকল্যাণ লক্ষ্যে মুক্তবুদ্ধি বঙ্কিম মানবজীবনের রহস্য-আবিষ্কারের প্রেরণায় সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কিন্তু ক্রমে তিনি বিশ্বের ও বিশ্বমানবের উদার অঙ্গন ত্যাগ করে স্বদেশের ও স্বজাতির সংকীর্ণ সীমায় স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করে তৃপ্ত ও কৃতার্থমন্য হতে থাকেন। তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এভাবে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিরূপে স্বল্পালোকিত স্বসমাজ-সঙ্কটে নিবদ্ধ হল। যুগসৃষ্ট বঙ্কিম যুগোত্তর প্রতিভা নিয়েও যুগপ্রভাব অতিক্রম করে যুগস্রষ্টা হবার গৌরব থেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে নিজেকে বঞ্চিত রাখলেন। হিন্দুবন্দ্য ঋষি হবার লোভে তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বমানবের শ্রদ্ধেয় প্রতিভূ-প্রতিনিধির আসন ত্যাগ করলেন; বঙ্কিম ইকবাল এভাবে আমাদের বঞ্চিত ও নিজেদের বঞ্চনা করেছেন। এই বিড়ম্বিত ব্যর্থতার কারণ খুঁজলে দেখা যাবে—পাশ্চাত্য শিক্ষার ও মননের বিকৃত প্রভাবই রয়েছে এর মূলে। য়ুরোপ তাঁদের মধ্যে যে-জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা জাগাল তা ছিল কৃত্রিম ও অস্পষ্ট। তাই প্রতীচ্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তা, স্বাধীনতা-প্রীতি, হিতবাদ, প্রগতি, পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতির কোনোটাই তাদের আত্মোপলব্ধ ছিল না—পড়ে-পাওয়া বুলির সম্পদ হিসেবেই রইল। য়ুরোপে যা ছিল স্বাভাবিক ও জীবনের পক্ষে আবশ্যিক, এখানে তাই হল বিলাস-বাঞ্ছার, শিক্ষার, সুরুচির, সংস্কৃতির ও প্রগতি-প্রবণতার লোক-দেখানো নগ্নরে অবলম্বন—কোনোটাই স্বরূপে উপলব্ধি করার সামর্থ্য ছিল না তাদের। তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচারিতাকে, প্রগতির নামে নির্লক্ষ্য দ্রোহকেই বরণ করেছিল তারা। লোকহিত ছিল তাদের কাছে স্বশ্রেণীর কল্যাণবাঞ্ছা ও স্বার্থরক্ষারই অন্য নাম। য়ুরোপে যখন ভাষিক, আঞ্চলিক কিংবা গৌত্রিক জাতীয়তার অঙ্গীকার ও স্বীকৃতিতে, 'এক জাতির এক রাষ্ট্র' (Mono-national state) প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সংগ্রাম চলছে, তখন জাতীয়তা এদের কাছে স্থানকালহীন স্বধর্মীর সংহতি মাত্র। য়ুরোপে দেখল রাষ্ট্রিক জাতীয়তা, কিন্তু নিজেদের জন্যে তা কাম্য হল না, কাম্য হল ধর্মীয় জাতিসত্তার উপলব্ধি ও স্বধর্মীর ঐক্য। ফরাসি বিপ্লবপ্রসূত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার জিগির তাদের মুগ্ধ করল বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে তারা এর কোনোটাই কামনা করেনি। তাই সমর্থন পায়নি সিপাহী বিপ্লব। অথবা নারী-পুরুষের সাম্য, বহুবিবাহ-নিরোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, বর্ণভেদ লোপ কিংবা অস্পৃশ্যতা বিদূরণ প্রভৃতি কোনোটাই তাদের আন্তরিক প্রয়াসের অঙ্গ হয়নি। বেন্থাম কোঁতে-মিলের হিতবাদ, মানববাদ, কিংবা নাস্তিক্য শিক্ষিত বাঙালির বৈঠকী আলোচনার বিষয় হল বটে, কিন্তু নাস্তিক রইল দুর্লভ, গণমানবের হিতকামনা রইল উচ্চারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দে নিবদ্ধ। জমিদারসমিতি ও হিন্দুমেলা গড়ে উঠল, কৃষক সমিতি তৈরি হল না। তাই রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ স্বশ্রেণী ও স্বসমাজ-সীমা অতিক্রম করে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণচিন্তায় আত্মনিয়োগ করতে পারেননি।

৭

উনিশ শতকের য়ুরোপের ব্যক্তিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানসিক জীবনের চোখধাঁধানো ও মনমাতানো বিস্ময়কর বিকাশ প্রতীচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত বাঙালিকে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল, বাস্তব প্রতিবেশ ও সামর্থ্য না-থাকলেও তাদেরও জেগেছিল সে-বঞ্চিত জীবনের, সমাজের, সংস্কৃতির ও ঐশ্বর্যের কামনা। এই আবেগবহুল বাঞ্ছাই রামমোহনকেও উচ্ছৃঙ্খল ও দ্রোহী করেছিল, এজুদের করেছিল চঞ্চল, দিয়েছিল কালাপাহাড়ী মত্ততা—এনেছিল উচ্ছল প্রাণবন্যা—এ প্রাণশক্তির নাম 'ইয়ং বেঙ্গল'। আবেগের ধর্মই হচ্ছে ক্ষণিকতা, তাই চল্লিশোত্তর জীবনে সবাই হলেন বিগত-আবেগ স্থিতধী ব্রাহ্ম বা সনাতনী হিন্দু কিংবা নিষ্ঠ খ্রিস্টান। তবু রুশো-ভলটেয়ার-লক্-হবস্-বেন্থাম-কোঁতে-মিল রয়ে গেলেন তাঁদের স্বপ্নের ও সাধের জগতে। জনসেবায়-সমাজসংস্কারে-জাতিচেতনায় সাহিত্য-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাসচর্চায় নবলব্ধ আত্মসম্মান বোধের বশে এগিয়ে এলেন তাঁরা। কোলকাতা শহরেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে একটা নকল য়ুরোপ তৈরির প্রয়াসী হলেন। সে য়ুরোপে যা-কিছু পশ্চিমী তা-ই গ্রহণীয় ও বরণীয় হল। তাঁরা যে কিতাবী য়ুরোপের ধ্যান করেছিলেন, তাকে অতিক্রম করে বাস্তবে এ সময়ে য়ুরোপে যে শুধু ভাষা ও গোত্রভিত্তিক নরজাতি ও রাষ্ট্রচেতনা প্রবল হয়েছিল, তা নয়, সে-সঙ্গে নতুনতর আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের বিন্যাসভাবনার বীজও বপন করেছিলেন মার্কস্-এঙ্গেলস্। আগেই বলেছি 'য়ুরোপীয়চিত্ত' তাঁদের জানা ছিল না—বাইরের আভরণটাই তাঁদের প্রলুব্ধ করেছিল, মন ভুলিয়েছিল ঐশ্বর্য ও পৌরুষ। তারই বিকৃত প্রকাশ ঘটেছিল উনিশ শতকী কোলকাতায়—কেননা ইংরেজিশিক্ষার ও সংস্কৃতির কেন্দ্র তখন ব্রিটিশ-রাজধানী কোলকাতা এবং শিক্ষিতের নিবাসও তখন ঐ শহরেই নিবদ্ধ। এই নকল য়ুরোপের বর্ধিষ্ণু ব্রিটনরা নব-অনুভূত আত্মমর্যাদা-সুখ লালনের তাগিদে এবং ব্যবসায়ে, চাকরিতে ও প্রশাসনে স্বার্থবৃদ্ধির গরজে ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, হিন্দুমেলা, ইন্ডিয়ান লীগ, ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রভৃতি সংস্থা গড়ে তুলে তার মাধ্যমে আবেদন-নিবেদনের অনুযোগ-আবদারের আকারে চাকরি আইন, বিচারপদ্ধতি, শিক্ষাব্যবস্থা খাজনার হার ও নীলকুঠিয়ালের পীড়ন প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে পাঠিয়ে পলিটিক্স্ ক্রীড়ার আনন্দ-আমোদ অনুভব করতে থাকেন।

এর মধ্যে মনোমোহন ঘোষের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি, ইংরেজ ও দেশীয় লোকদের আদালতী বিচারপদ্ধতির বৈষম্য, 'ইলবার্ট বিল'-এ দেশীয় চাকুরের ক্ষমতা ও মর্যাদা হ্রাস, প্রেস আইনে বাক্স্বাধীনতা হরণ প্রভৃতি ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঙালি শিক্ষিতদের মনে মৃদু ক্ষোভ জাগায় বটে কিন্তু তখনও মোহমুক্তি ঘটেনি। তখনো ব্রিটিশ-শাসন তাদের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ। পরে বঙ্গভঙ্গ আইনই তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে আর ব্রিটিশপ্রীতি তখন থেকেই দ্রুত উবে যেতে থাকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে শিক্ষিতের সংখ্যাগুরু বেকার অংশের যখন ব্রিটিশের কাছে চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকল না, তখন ব্রিটিশ-শাসনরূপ আশীর্বাদ অভিশাপরূপে প্রতীয়মান হল এবং ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ও বিরোধ তখন থেকে তীব্র হতে থাকে এবং বিশ শতকের দ্বিতীয়পাদে তা স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁদের মন ছিল, প্রতিবেশ ছিল না। তাই তাঁরা সংখ্যাগুরুর খপ্পরে পড়ে তলিয়ে গেলেন। বাঙলাদেশে স্বচ্ছদৃষ্টির এই তিনজন মানুষ ছিলেন, যাঁরা হয়তো রেনেসাঁসের মতো একটা মৃদু আবহ অন্তত তৈরি করতে পারতেন। সে সম্ভাবনার আভাস ছিল তাঁদের চরিত্রে ও সামর্থ্যে; কিন্তু কার্যত তাঁরা হলেন Revivalist ও Reformer, কেননা তাঁরা adjustment and accomodation-এর—মেরামতেরই পক্ষপাতী ছিলেন—নতুন নির্মাণে আগ্রহী ছিলেন না।

৮

বঙ্কিম চল্লিশোত্তর জীবনে খাঁটি হিন্দু হবার সাধনায় দেহ-মন-আত্মা নিয়োজিত করলেন। বলা হয় ১৮৮২ সনে শোভাবাজার রাজবাটীর এক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান প্রসঙ্গে তখনকার জেনারেল এসেম্ব্লির (বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজের) অধ্যক্ষ পাদরি হেস্টি হিন্দুধর্মের নিন্দা করলে বঙ্কিম 'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন। এই সূত্রেই শাস্ত্রচর্চায় তিনি গভীর ও একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরেই সৃজনশীল রচনা বন্ধ করে হিন্দুর সনাতনশাস্ত্র, নীতি, আদর্শ, জীবনতত্ত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতির মৌলিকতা, বৈজ্ঞানিকতা, সারবত্তা, অভ্রান্ততা, উপযোগিতা, কল্যাণকারিতা এবং শ্রেষ্ঠতা বিশ্লেষণে ও প্রদর্শনে বাকি জীবন ব্যয় করেন। তখন সত্যের ও ধর্মের উদঘাটন ও প্রতিষ্ঠাই তাঁর রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই মানবজীবন-রহস্যানুসরণমূলক উপন্যাস রচনা—তথা 'মনুষ্যজাতির মঙ্গল সাধনা বা সৌন্দর্য সৃষ্টি' —সময়ের অপচয় বা পাপ বলেই যেন বিবেচিত হয়। স্বদেশের স্বধর্মের ও স্বজাতির (হিন্দুর) মঙ্গল সাধনই তাঁর ব্রত ও ধ্যান হয়ে উঠল। যিনি ছিলেন কোঁতে-বেন্থাম-মিলের ভাবশিষ্যরূপে হিতবাদ, সেবাবাদ ও বিশ্বমানবতাবাদের ধারক ও বাহক; তিনি স্বাজাত্যবশে দৈশিক, কালিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবনায় আত্মপ্রসাদ খুঁজলেন। ইতোপূর্বে দুর্গেশনন্দিনী থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল, কিংবা লোকরহস্য থেকে মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত অবধি স্বচ্ছদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ রসিক-মন নিয়ে জীবন-জিজ্ঞাসায় ও জগৎ-ভাবনায় ছিলেন তিনি নিরত; তাতে তাঁর স্বাভাবিক ও প্রাতিবেশিক বিশ্বাস-সংস্কার ও শ্রেয়োবোধের আভাস ও প্রকাশ ছিল বটে—কিন্তু ব্রতবদ্ধ নন বলেই তা কখনো উগ্রভাবে প্রকট হয়ে ওঠেনি। রাজসিংহে-আনন্দমঠে-দেবীচৌধুরানীতে ও সীতারামে দেখি স্বাজাত্যে স্বধর্মে নবদীক্ষিত বঙ্কিম তখনো দ্বিধামুক্ত নন। যদিও জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমের ও নিষ্কাম কর্মের ও ধর্মমাহাত্ম্যের ভূত তাঁকে রাহুর মতো গ্রাস করেছে। তাঁর উপলব্ধ শাস্ত্রের ও তত্ত্বের প্রথম প্রয়োগ দেখি আনন্দমঠে, দেবীচৌধুরানীতে ও সীতারামে।

পঁয়তাল্লিশোত্তর জীবনে বঙ্কিম একেবারে অন্য মানুষ। সে-মানুষ 'সাম্য' রচনার জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত এবং পুনর্মুদ্রণে নারাজ। "একসময় মিলের আমার উপর প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে। —সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" এর মুখ্য কারণ—যে-সনাতন শাস্ত্রের মহিমা প্রচারে তিনি বদ্ধপরিকর, সেই শাস্ত্র-শাসিত সমাজে বর্ণভেদ-প্রসূত পীড়নের কথা ছিল 'সাম্যে'। এখন পূর্বনিন্দিত শাস্ত্র-সমাজের বন্দনা রচনাকালে পূর্ব-নিন্দন-স্মৃতি লোপ করতেই হয়। এমনিতেই মানুষের জীবনে স্ববিরোধিতা থাকেই, তাছাড়া উনিশ শতক ছিল নব্যবঙ্গের অস্থিরতার ও স্ববিরোধের কাল। শেষ দশ বছরের বঙ্কিম 'যতি'। যখন তিনি 'চিত্তশুদ্ধি' নামক অমৃতের সন্ধানী। কেননা "যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোনো ধর্ম নাই। এই চিত্তশুদ্ধি আসে ধর্মবোধ ও ধর্মভাব থেকে। তাই তাঁর মতে "মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের প্রকৃত মর্ম।" তাই "কেবল হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মই সম্পূর্ণ ধর্ম।" —ইনি কি সেই বঙ্কিম যিনি একদিন উদাত্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস। যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু!" কয়েক বছর আগেকার বঙ্কিম জানতেন, "সমগ্র বাঙালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোনো মঙ্গল নাই," (*বঙ্গদর্শন*, বৈশাখ ১২৭৯ সন)। একদিন এ বঙ্কিমই 'সাম্যে' মানবপ্রেমিক ও সাম্য-সংস্থাপক বলে বুদ্ধ, যিশু ও রুশোর প্রশস্তি গেয়েছিলেন।

৯

কিন্তু বঙ্কিম কি সত্যসত্যই বদলে গিয়েছিলেন—মনে হয় না। আসলে তিনি কৈশোরাবধি নব্য-য়ুরোপেরই মানস-সন্তান। রামমোহনের মতো তিনিও Reformer. য়ুরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি-মনন-পৌরুষ-ঐশ্বর্য ও শক্তি তাঁদের মনে আত্মকল্যাণের যে মোহ ও প্রেরণা জাগিয়েছিল, তা-ই হয়ে দাঁড়াল স্বাজাত্যাভিমানবশে স্বদেশের ও স্বজাতির শাস্ত্রীয় ও আচারিক আবরণ গ্রহণের এক অপপ্রয়াসমাত্র। আস্তিক মানুষ মাত্রই এরূপ হয়, তা আমরা সন্ত অগাস্তিন থেকে শ্রদ্ধানন্দ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-সৈয়দ আহমদ-জামালুদ্দীন আফগানী-রবীন্দ্রনাথ-শশধর তর্কচূড়ামণি-হালী-ইকবাল-ফররুখ আহমদ প্রভৃতি স্বধর্ম ও স্বজাতিগর্বী সব দেশী-বিদেশী আস্তিক মনীষী-কর্মীর মধ্যেই আজো দেখতে পাই। শ্রেয়োলোভী রক্ষণশীল মানুষের এ এক মনস্তাত্ত্বিক আচরণ।

স্বশাস্ত্রে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ যেমন ইসলামের সংস্পর্শেই আবিষ্কৃত, সুফিতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে যেমন উত্তরভারতীয় ভক্তিবাদী সন্তমতের ও গৌড়ে চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের উন্মেষ—তেমনি খ্রিস্টান য়ুরোপের মোকাবেলায় রামমোহনের নিরাকার ঈশ্বরতত্ত্বের শাস্ত্রীয় উদ্ভব। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাধর্মও নব্যয়ুরোপীয় সমাজ-দর্শন থেকে উদ্ভূত। স্বশাস্ত্রীয় মহিমা-স্বীকৃতির অঙ্গীকারে নব্যয়ুরোপীয় আদলে জ্ঞান-পৌরুষ-শক্তি ও ঐশ্বর্য আত্মসম্মান রক্ষা করে অর্জনের উপায় হিসেবে শাস্ত্রীয়তত্ত্বের আনুকূল্য আবিষ্কারে ও প্রচারে রত ছিলেন বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ-দয়ানন্দ-শ্রদ্ধানন্দ-সৈয়দ আহমদ-হালী-আফগানী-রবীন্দ্রনাথ-ইকবাল-প্রভৃতি সবাই [রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুর ঐক্য ও ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধদুটো কিংবা ভারতবর্ষের ইতিহাসমূলক প্রবন্ধাদি স্মর্তব্য।] এই ছিল তাঁদের Revivalism-রেনেসাঁস-রিফরমের মূল প্রেরণা। য়ুরোপীয় জীবন ও জীবিকা-মুগ্ধ বঙ্কিমও এ পথেই য়ুরোপীয় দীক্ষা শাস্ত্রীয় শিক্ষার আবরণে গ্রহণে-বরণে-আবিষ্কারে ও প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন; তাই তাঁর আবিষ্কৃত 'কৃষ্ণ' আদর্শমানব—অবতার নন, তাই তাঁর ধর্মতত্ত্বে কোঁতে-বেন্থাম-মিল-মার্কসের তত্ত্বও অনুপস্থিত নয়। কোঁতের মতো বঙ্কিমও সমাজের অসীম গুরুত্ব স্বীকার করতেন এবং মানুষের প্রতিও ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাই তাঁর সাহিত্যে পাপ-ভীতি আছে বটে, কিন্তু তাঁর পাপীর প্রতি ঘৃণা নেই, বরং অনুকম্পা আছে। কিন্তু সবটাই হল দেশী-বিদেশী তত্ত্বের ও আদর্শের ভেজাল। কোনো ভেজালই অভীষ্ট ফল দেয় না। এক্ষেত্রেও হয়েছে তা-ই। বঙ্কিমচন্দ্র মানবকল্যাণেই লেখনী ধারণ করেছিলেন, শেষাবধি সে-মানুষ কেবল হিন্দু হয়ে উঠল। এভাবে য়ুরোপীয় চেতনাপুষ্ট রামমোহন সৃষ্টি করেছেন দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ তৈরি করেছেন বিবেকানন্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে তৈরি হয়েছিল কালীমাতার সন্তান কিছু সন্ত্রাসবাদী ও মোহিতলাল মজুমদার'প্রমুখ কিছু হিন্দুত্বগর্বী বুদ্ধিজীবী। কিন্তু সবটাই ক্ষণপ্রভা ও ক্ষণস্থায়ী —তাঁদের মনীষা কোনো স্থায়ী কল্যাণ আনেনি, দেয়নি কোনো পথের দিশা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্নধর্মালম্বী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে ভাব-চিন্তা-কর্মের ক্ষেত্রে অস্বীকৃতির ফল পরিণামে বাস্তব ও বৈষয়িক জীবনে প্রায় বৈনাশিক হয়ে উঠেছিল।

বঙ্কিমের প্রতিভা ছিল অসামান্য। জ্ঞান-পিপাসাও ছিল অসাধারণ। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্যে. দর্শনে ও ধর্মতত্ত্বে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রশ্নাতীতরূপে গভীর ও ব্যাপক। ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানেও ছিল তাঁর কৌতূহল। বঙ্কিম-রচনায় বঙ্কিমকে আমরা সর্ববিদ্যাবিশারদরূপেই পাই। এমনটি আজো ক্বচিৎ দেখা যায়। বঙ্কিম নিজেই বলেছেন—"অতি তরুণ বয়স হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত—এ জীবন লইয়া কী করিব? লইয়া কী করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিতেছি। ...যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। ....এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এতটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?' —এই প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি।" (ধর্মতত্ত্ব-ঈশ্বরে ভক্তি)। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত জিজ্ঞাসু 'মানুষ' হিসাবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাঁটি 'হিন্দু' হিসেবে।

১০

অতএব বঙ্কিম-সাহিত্য হচ্ছে মানুষ-বঙ্কিমের হিন্দু-বঙ্কিমে ক্রমপরিণতির ইতিবৃত্ত ও আলেখ্য। তাঁর মতে 'ধর্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত এবং হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোনো ধর্মের নাই; হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম *(দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম)*। দেশের মহত্তম মনীষী রবীন্দ্রনাথও একসময়ে 'হিন্দুর ঐক্য' ও 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা'র মতো প্রবন্ধ লিখেছিলেন অনুরূপভাবে ভাবিত হয়েই। কেন এমন হল? যে বঙ্কিম প্রতীচ্যবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন, ফরাসিবিপ্লবের মানস-আবহে যাঁর লালন, য়ুরোপীয় নাস্তিক্যবাদী-সংশয়বাদী-হিতবাদী-সুখবাদী-মানববাদী দর্শন যাঁর মজ্জাগত, সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতা যাঁর জিগির, কার্লমার্কসের বিশ বছর পরে যাঁর জন্ম, যিনি অনেকের মতো আশি বছর আয়ু পেলে প্রথম মহাযুদ্ধ ও সোভিয়েত রাশিয়া দেখে যেতে পারতেন, যিনি সাম্যের গুরুত্ব ও গণমানবের আর্থিক যন্ত্রণা আজকের যে-কোনো তরুণের চেয়েও গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন—তিনি কেন মধ্যযুগীয় তাত্ত্বিকতার চোরাবালিতে স্বেচ্ছায় পা রাখলেন, মরমিয়াসুলভ ভক্তিতত্ত্বে অভিভূত হলেন, মনুষ্যত্বের অধ্যাত্ম-মরীচিকার শিকার হলেন? আমাদের মনে হয় 'ইলবার্টবিল' প্রভৃতির ব্যাপারে জাতিবৈরের প্রাবল্য, সি. অকল্যান্ডের এবং ই.ভি. ওয়েস্টমেকটের সঙ্গে বিরোধ, পাদ্রী হেস্টির হিন্দুধর্ম নিন্দাপ্রসূত স্বধর্মাভিমানের জাগরণ, সাধারণভাবে সনাতনশাস্ত্রের ও সমাজের উপর ব্রাহ্ম ও খ্রিস্টান-প্রচারকদের হামলা, হাঁপানি ও বহুমূত্রজাত শারীরিক যন্ত্রণা ও তজ্জাত মানসিক উৎকণ্ঠা, ঘরোয়া অনৈক্য ও বৈষয়িক বিবাদ, আর্থিক অসাচ্ছল্য, পুত্রসন্তানের অভাবজাত মনস্তাত্ত্বিক অসহায়তা ও দাম্ভিকতাপ্রসূত নিঃসঙ্গতা প্রভৃতি ভগ্নস্বাস্থ্য, নিরানন্দ, প্রৌঢ় বঙ্কিমচন্দ্রকে শান্তি-সুখের আশায় জীবনের শাস্ত্রীয় 'সত্য' ও তাৎপর্য সন্ধানে প্রলুব্ধ করেছিল। এভাবেই তিনি সংসার-মরুর মাঝখানে 'ভক্তি'বারিতে অবগাহন করে আশ্বস্ত, আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন এবং পূর্বাভ্যাসবশে তা তাঁর স্বধর্মীর জন্যেও কামনা করেছেন এবং ঐ তত্ত্বে দীক্ষিত হয়ে তাদেরও জীবনযন্ত্রণামুক্ত করতে ও আশ্বস্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এককালে মদ্য-মাংসে যাঁর আগ্রহ ছিল, সেই মানুষ চিত্তশুদ্ধির নামে গেরুয়া পরে নিরামিষভোজী হয়ে বহুমূত্র বৃদ্ধি করে মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিলেন। জীবনসায়াহ্নে নৈরাশ্যগ্রস্ত, হতোদ্যম, নিরুপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষমাত্রই জীবনবিমুখ ও মুমুক্ষু ধার্মিক হয়। তবু যৌবনে যিনি নাস্তিক পুরুষসিংহ, সেই অমিতমনীষা ভগ্নস্বাস্থ্য প্রৌঢ় বঙ্কিম ভীরু-হৃদয় সাধারণের মতো ধর্মভাবের দুর্গে আশ্রিত হয়েছিলেন, ভাবতে দুঃখ হয়—আফসোস বাড়ে।

বাঙলা সাহিত্যে জীবনদৃষ্টির বিবর্তন

মানুষ মাত্রেরই জীবন-জিজ্ঞাসা ও জগৎ-ভাবনা থাকে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত এই লব্ধ বা অনুশীলিত চিন্তা-চেতনার নাম যদি হয় জীবনদৃষ্টি তাহলে প্রত্যেক মানুষেরই স্বীয়, দৃশ্য দৃষ্ট ও দ্রষ্টব্য জীবন ও জগৎ এবং দর্শনক্রিয়ার সার্বক্ষণিক, সামগ্রিক আচরণগত ও আচারিক অভিব্যক্তিই ব্যক্তিক জীবনদর্শন। আমরা অনৈয়ায়িকরা একে দর্শন না বলে বলি জীবনদৃষ্টি।

কবি ও দার্শনিক উভয়েই অনেকের হয়ে ইন্দ্রিয় দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীতকে জানবার বুঝবার ও অনুভব করবার চেষ্টা করেন। কবি করেন আবেগতাড়িত চৈতন্যের প্রেরণায়, তাই তাঁর উপলব্ধ তত্ত্ব আনুভূতিক—ফলে খণ্ডিত ও মৌহূর্তিক। দার্শনিক একটা আঙ্কিক সঙ্গতি ও পারম্পর্য রক্ষা করে ইন্দ্রিয়াতীতের একটা বোধগত অবয়ব তৈরি করেন। অতএব, কবির অভিজ্ঞতা আবেগময় খণ্ডদৃষ্টির প্রসূন আর দার্শনিকের প্রজ্ঞা-সচেতন বিশ্লেষণ ও যুক্তিপ্রসূত। তাই কবিরা সাহিত্যিকরা দার্শনিক নন এবং দার্শনিকও কবি হতে পারেন না। তবে যেহেতু মানুষমাত্রই স্ব স্ব জীবনের ও জগতের দার্শনিক, সেহেতু কবিরও স্বকীয় জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা রয়েছে এবং সাধারণ সংজ্ঞায় তা-ই দর্শন। আর এই অর্থেই আমরা 'দার্শনিক কবি' ও 'কবি-দার্শনিক' স্বীকার করি।

দুধ থেকে যেমন ঘি, তেমনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান থেকেই জন্মে প্রজ্ঞা। আবার ঘিকে যেমন দুধে ফিরিয়ে আনা যায় না, প্রজ্ঞাকেও তেমনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা চলে না। জ্ঞান তত্ত্ব বা তাৎপর্যমণ্ডিত হলেই পরিণতি পায় প্রজ্ঞায়। অতএব প্রজ্ঞা জ্ঞানের নির্যাস। এই প্রজ্ঞাপ্রীতি ও প্রজ্ঞা-সাধনই 'ফিলসফি'।

২

আদিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টাতত্ত্ব এবং জীবনের ও জগতের পরিণাম জানার ও বোঝার প্রয়াসেই সীমিত ছিল মানবচিন্তা—এরই পারিভাষিক নাম অধিবিদ্যা। জীবনের তাৎপর্য খোঁজা, সে-উদ্দেশ্যে এর আদি-অন্তের সন্ধান নেয়া এবং জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করাই ছিল আদি সাহিত্যের বিষয়। ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য এবং স্রষ্টার ও সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যচেতনা এবং শ্রেয়সচিন্তা দানই ছিল আদি সাহিত্যের লক্ষ্য। আদি সাহিত্যের মেদ-মজ্জা তাই নীতিশাস্ত্রিক। বলা বাহুল্য নীতিশাস্ত্র হচ্ছে বহুজনহিত ও বহুজনসুখকামী মনীষাসম্পন্ন ভূয়োদর্শী মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রসূন।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে আমরা তাই শাস্ত্রানুগত সাহিত্যই পাই। শাস্ত্রেও জীবনতত্ত্ব এক ও অভিন্ন নয়। বিভিন্নপথে জীবনের উত্তরণ ঘটে পরমে কিংবা জীবন পায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণাম-সুন্দর পরিণতি। তাই মানুষ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি বা প্রেম-মার্গে করেছে জীবনে সাফল্য সন্ধান। তথাকথিত বাঙলা চর্যাগীতি থেকে শুরু করে মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব পদাবলীতে, রামায়ণে-মহাভারতে-হরিবংশে-চৈতন্যচরিতে বা রসুলচরিতে ঐ জ্ঞান, কর্ম কিংবা ভক্তির পথেই শ্রেয়স সন্ধান করা হয়েছে। পরহিতৈষণায়, সত্যে, সততায়, ত্যাগে ও তিতিক্ষায় যে-পৌরুষ ও সাফল্য নিহিত, তা সর্বত্রই পষ্টভাবে পরিব্যক্ত হয়েছে। দৈবশক্তির নিয়ন্ত্রণ-অঙ্গীকারে যোগ, তন্ত্র ও মন্ত্রনির্ভর দেহচর্যায় ভক্তিতে বা প্রেমানুশীলনে, ন্যায়কর্মে ও পরার্থপরতায় অথবা জীবন ও জগৎ-কারণ চেতনায় যে-মোক্ষ বা সিদ্ধি লভ্য তা কেউ অবিশ্বাস করেনি। এমনকি প্রণয়োপাখ্যানগুলোতেও নায়ক দৈবানুগৃহীত, নীতিনিষ্ঠ ও পরার্থপর। পৌরুষ, মনোবল, বিলাসবাঞ্ছা, রূপতৃষ্ণা, জিগীষা ও দুঃসাহস সম্বল করে প্রেম ও পরমার্থ, রাগ ও বিরাগ, পৌরুষ ও দৈবশক্তি এসব গ্রন্থে একটা তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা লাভ করত। রূপবহ্নি, অসূয়াবিষ ও নিয়তিলীলা যে-নায়কজীবন তথা মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছন্দ জীবনে বৃত্তচ্যুতি ঘটিয়ে যে-বিপর্যয় আনে আর পরিণামে যে-সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার লয় এবং পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় ঘটে—তা-ই চূড়ান্তরূপে প্রতিপাদিত হয়। অতএব মধ্যযুগের সাহিত্যে দৈবানুমোদিত নীতিশাস্ত্রের মাহাত্ম্যই বিঘোষিত। এবং জীবনের মহিমা ও সার্থকতা-যে ভোগে ও বিলাসে নয়—ত্যাগে ও তিতিক্ষায়, আনন্দে ও আরামে নয়—বেদনায় ও যন্ত্রণায়, অসূয়ায় ও রিরংসায় নয়—ক্ষমায় ও প্রেমে লভ্য, তাও সর্বত্র স্বীকৃত। মানুষের জীবনে ভগবানের ইচ্ছা ও লীলাই প্রতিফলিত, নিয়তি বা অদৃষ্টই জীবনের নিয়ামক—মানুষ পুতুলসম নিমিত্ত মাত্র—এ-ই ছিল মধ্যযুগীয় জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শন। এ হচ্ছে সামন্তযুগের সাহিত্য। সাহিত্যে এ যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। তার কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াজাত যান্ত্রিক উৎকর্ষের অভাবে উৎপাদনে ও পণ্যবিনিময়ে বিকাশ-বিস্তার ছিল মন্থর—শিল্পবিপ্লব ছিল অসম্ভব। কাজেই ব্যবহারিক ও মানসজীবনে কেবল আবর্তন ছিল, অনুবর্তন ছিল, বিবর্তন-পরিবর্তন ছিল দুঃসাধ্য। ফলে জগৎ-জীবনতত্ত্বও সামান্য ব্যক্তিক ইতর-বিশেষ নিয়ে আবর্তিত হয়েছে বাঁধা নিয়মে ও স্বীকৃত বৃত্তে। পারত্রিক চিন্তাপ্রধান এই ঐহিক জীবন-চেতনা তাই বৈচিত্র্যহীন এবং জীবনদৃষ্টিতে তথা দর্শনেও ছিল না ঔজ্জ্বল্য কিংবা রূপান্তর।

৩

জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার ও পদ্ধতির সঙ্গে জীবনদৃষ্টির সম্পর্ক বীজ ও ফলের মতো। এই প্রসূতি-প্রসূন সম্পর্ক রয়েছে বলেই জীবিকা-উৎপাদনের হাতিয়ার ও পদ্ধতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শনও বদলায়। জীবিকাসম্পৃক্ত জীবনে তাই জীবনদর্শন বিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। আগেকার দিনে কারণ-ক্রিয়া বোধ প্রখর ছিল না বলে, যদিও পরিবর্তনটা অনুভব করত কিন্তু কারণ-করণ সচেতনভাবে উপলব্ধি করতে পারত না। তবু চেতনায় ও আচরণে এর স্বতোপ্রকাশ ঘটত, আজো ঘটে। কাজেই গোত্রীয় শাস্ত্রীয়, ধনতন্ত্রীয় ও সমাজতন্ত্রীয় জীবনে ও সমাজে জীবনদৃষ্টি বা জীবনদর্শন অভিন্ন নয়। আদিকালের মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলপ্রসূত জিজ্ঞাসার উত্তরে যে-তত্ত্বচেতনার বা দর্শনের উদ্ভব, তার বিচার এককালে মুখ্যত অধিবিদ্যায় ছিল সীমিত। নগররাষ্ট্রভুক্ত জীবনে নাগরিকের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার-চেতনা গ্রিক দার্শনিকদের ঐহিক ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে। ফলে গ্রিকদর্শন ব্যক্তির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও শৈল্পিক জীবনসম্পৃক্ত সর্বপ্রকার চিন্তাভাবনায় আধার হয়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রিকদর্শনই তাই দর্শনশাস্ত্রের ভিত্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতেও ঘটেছিল দার্শনিক চিন্তার বিস্ময়কর বিকাশ। কিন্তু সে-দর্শনে জগৎকারণ এবং ব্যক্তিসত্তার ও আত্মার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণাম-চেতনাই কেবল প্রাধান্য পেয়েছে। আরব-দর্শনে খণ্ড খণ্ড তত্ত্বচিন্তা অসামান্য সূক্ষ্মতায় বিশ্লেষিত হলেও সামগ্রিক জীবনতত্ত্ব গুরুত্ব পায়নি। ফলে সর্বজনীন ও সর্বাত্মক মানবদর্শনের স্রষ্টা হিসেবে সক্রেটিস, প্লেটো ও এ্যারিস্টটলই জগদ্‌গুরু হয়ে রইলেন।

জীবিকা-সম্পৃক্ত হাতিয়ারের ও পদ্ধতির দ্রুত পরিবর্তন, উৎকর্ষ ও প্রসারের ফলে যন্ত্র, জীবিকা, ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি এবং মানুষের বৈষয়িক, ব্যবহারিক, নৈতিক, আর্থিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে আজকের দর্শনের প্রতিজ্ঞা (Premise) -ও আলোচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই জীবিকা, সমাজ ও রাষ্ট্র-সম্পৃক্ত মানুষের ব্যক্তিক, নৈতিক, আর্থিক ও আত্মিক জীবনের জটিলতা, সমস্যা ও সমাধানপন্থা নির্দেশনা আজ দর্শনের এলাকায়।

সাহিত্য যেহেতু জীবনের ও জীবন-চেতনার প্রতিচ্ছবি, সেহেতু সাহিত্যেও দর্শন প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তবে সাহিত্যক্ষেত্রে একে দর্শন না বলে জীবনদৃষ্টির বা মূল্যবোধের বিবর্তন বলাই সঙ্গত।

এতক্ষণ আমরা মার্কসীয় তত্ত্বের অনুসরণে জীবনদৃষ্টির বা জীবনদর্শনের বিবর্তনতত্ত্ব বর্ণনা করছিলাম। কিন্তু এর পাশাপাশি অন্যান্য তত্ত্বও রয়েছে। মার্কস যেমন পরিবর্তন ও বৈপরীত্যের মূলে দেখেছেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার প্রভাব তথা আর্থিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি, ফ্রয়েডও তেমনি যৌনচেতনাই জীবন-নিয়ন্ত্রক বলে জেনেছেন। যৌনচেতনা বা ক্ষুধা তাঁর কাছে আনন্দ-অন্বেষা মাত্র। তাঁর মতে মানুষ হচ্ছে আনন্দাকাঙ্ক্ষী প্রাণ। সে সর্বদাই আনন্দ চায় এবং বেদনা এড়িয়ে চলার প্রয়াস পায়। তাঁর মতে এ-পথে বাধা কিংবা সুগমতাই জীবনদৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ফ্রয়েড বলেন—মানবজীবন যৌনচেতনা চালিত এবং মানুষের চিন্তা-কর্ম-আচরণ ঐ যৌনবোধেরই প্রসূন। এমিল দুরখেইম, আলফ্রেড নর্থ, হোয়াইটহেড, টালকট, পারসন্স প্রমুখ বিদ্বানদের মতে আধুনিক সমাজে জনবৃদ্ধির ও জীবিকাপদ্ধতির জটিলতা ও বিকাশের সাথে জীবনদৃষ্টির বা মূল্যবোধের বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। টালকট, পারসন্স, আলফ্রেড নর্থ, হোয়াইটহেড, অসওয়াল্ড, স্পেঙলার, হার্বার্ট স্পেনসার, ম্যাক্স ওয়েবার এবং এমনি আরো অনেক সমাজবিজ্ঞানী ও মনীষী জীবনদৃষ্টির ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের বা বিবর্তনের জন্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শাস্ত্রিক, সাংস্কৃতিক এবং যৌনজীবন-প্রতিবেশই দায়ী বলে জেনেছেন। এদেশের সাধারণ বুদ্ধিজীবীরাও জনসংখ্যাবৃদ্ধি, বেকারত্ব, বৈচিত্র্য ও রোমান্সহীনতা, অর্থনীতিক রাজনীতিক অস্থিরতা, প্রতীচ্যপ্রভাব ও অনুকৃতি অনুন্নতদেশে মূল্যবোধের সঙ্কট সৃষ্টি করছে বলে মনে করেন।

৪

উনিশ শতকে ইংরেজিশিক্ষার মাধ্যমে প্রতীচ্য প্রভাবপ্রসূত আধুনিক সাহিত্যের শুরু হয় আমাদের দেশে। য়ুরোপে জীবিকাসম্পৃক্ত জীবনের স্বাভাবিক উদ্বর্তনে ও উৎকর্ষে যে-চিন্তা-চেতনার উদ্ভব ও বিকাশ তার আকস্মিক অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও অনুকৃত প্রভাব আমাদের জীবন-ভাবনায় ও জগৎ-চেতনায় যে অভিঘাত হানল, তা সঙ্গত কারণেই সুসংহত, সুসংযত ও সুসমঞ্জস ঊর্মি-সুন্দর প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের উদ্যম, শিল্পবিপ্লবের প্রসাদ, ফরাসিবিপ্লবের চেতনা, নব্যদার্শনিকের যুক্তির জোর, বুর্জোয়া মানবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভৃতি কোনোটাই অবিকৃত ও আন্তরিক হয়ে ধরা দিল না আমাদের মানসলোকে। ফলে বিদ্যুৎপ্রভার বিভ্রান্তিরই নিয়তি হয়ে রইল, স্থির শিখার দীপ্তির দানে উপকৃত ও উন্নত হতে পারলাম না আমরা। য়ুরোপীয় শিল্পসামগ্রী ও সওদাগরি পণ্য আমাদের শাহ-সামন্তশাসিত গ্রামীণ সমাজে বাজার সৃষ্টি করল। আমাদের পণ্য বিনিময় পদ্ধতির স্থান নিল বিনিময় মাধ্যম মুদ্রা। অথচ আমাদের কৃষি শিল্প-বাণিজ্য রীতি রইল স্থির। না হল কলকারখানা, না হল বহির্বাণিজ্য, না মিলল কোনো উপনিবেশ। ফলে বিপর্যয় এল বৈষয়িক ব্যবহারিক ও মানসিক জীবনে: এর ফাঁকে এই কৃত্রিম আকস্মিক যুগান্তর লগ্নে ইংরেজি বিদ্যাপ্রাপ্তদের মনে চাঞ্চল্য ও উদ্যম জাগল, আশা ও আশ্বাসের দীপও জ্বলল, কিন্তু স্থিতধী ব্যক্তির সামগ্রিক দৃষ্টি লাভ করল না কেউ। খণ্ডদৃষ্টির ও আপাতলিপ্সার শিকার হয়ে রইল সবাই। তাই রেনেসাঁস-প্রতিম যে চিন্তা-চেতনা ও চাঞ্চল্য এল বলে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী হিন্দুরা অস্পষ্টভাবে অনুভব করলেন, তা ছিল আসলে য়ুরোপীয় বুর্জোয়া জীবনের ঐশ্বর্য, ঔদার্য ও বিলাসের দ্যুতি-মুগ্ধতা এবং তজ্জাত কৃত্রিম অনুকরণ-বাঞ্ছা। তারই ফলে আমাদের দ্রোহ উচ্ছৃঙ্খলতায়, য়ুরোপীয় ভাষিক ও রাষ্ট্রিক জাতীয়তা স্বধর্মীর জাতীয়তায়, ঐশ্বর্য ও বিলাসলিপ্সা চাকরি ও উপরি প্রবণতায়, স্বাধীনতার স্পৃহা স্বাজাত্যভিমানে এবং বিজ্ঞান ও দর্শনানুরাগ শাস্ত্র ও সমাজ-সংস্কারের প্রেরণায় আবদ্ধ রইল। এ বিকৃত অনুকৃতি শাস্ত্রে-সমাজে-জীবনে বিচলন আনল বটে, কিন্তু রেনেসাঁস-সুলভ কোনো ব্যবহারিক কিংবা মানসিক রূপান্তর-যুগান্তর ঘটাল না। একে যদি নতুন বন্দর-শহরের ভাববিপ্লবও বলি, তাহলেও তা অতি সীমিত অর্থে এবং সংকীর্ণ পরিসরে এ ভাবের জোয়ার অগভীর খাতে ক্ষণ প্রবাহিত। প্রথম পরিচয়ের বিস্ময়ের ও অভিঘাতের দোলায় অবসানে আমরা তাই সেই বহুখ্যাত ইয়ং বেঙ্গলদের চল্লিশোত্তর জীবনে দেখি নিষ্ঠ ব্রাহ্ম, গোঁড়া হিন্দু কিংবা ভক্ত খ্রিস্টানরূপে। এঁদের খণ্ডদৃষ্টির ও আপাত লক্ষ্যের পরিচয় মেলে এঁদের কর্মে। রামমোহন মনে করলেন পৌত্তলিকতা লোপ করলেই বুঝি হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি আধুনিক ও গতিশীল হবে। বিদ্যাসাগর ভাবলেন বহুবিবাহ নিরোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনেই আধুনিক সমাজ গড়ে উঠবে। অক্ষয় দত্ত ভাবলেন শাস্ত্রীয় আচারে ঔদাসীন্য ও বিজ্ঞানচর্চাই সমাজকে আধুনিক করবে। মধুসূদন বুঝলেন বিলেত গেলেই মহাকবি হওয়া যাবে। প্যারীচাঁদের মতো অনেকেই ভাবলেন সমাজ সংস্কারে এবং নীতিনিষ্ঠায় ও অধ্যাত্মচিন্তায় বুঝি শ্রেয়ঃ নিহিত। আর অন্য অনেকেই ভাবলেন হিন্দুয়ানী আচারে অবজ্ঞা ও বিলেতি আচরণে অনুরাগই প্রগতি ও সংস্কৃতির লক্ষণ। সবাই মেরামতপন্থী কেউ নতুন নির্মাণে আগ্রহী নন। কারণ এঁরা অন্তরে রক্ষণশীল, বাইরে পোশাকী রূপলিপ্সু এবং এঁদের স্বপ্ন ও কর্ম কোলকাতাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছিল। মিল-বেন্থাম-কঁতের প্রভাবে কেউ কেউ নাস্তিক্য, প্রত্যক্ষবাদ, সংশয়বাদ বিলাসীও ছিলেন। ব্রিটিশ-আনুগত্য দৃঢ় রেখেও এঁরা ব্যক্তিক ও জাতিক মর্যাদায় ও সম্মানবোধে প্রবুদ্ধ হবার দুটো কৃত্রিম অবলম্বন পেয়েছিলেন—ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়ান। ওতে থিয়েটারী আবেগ, আনন্দ ও সন্তোষ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোক-রহস্য' গ্রন্থে শিক্ষিত বাবু-জীবনের ও চরিত্রের সার্বিক ও প্রায় সর্বাত্মক চিত্র চিরন্তন করে রেখেছেন! অতএব বঙ্কিমচন্দ্র-পূর্ব আধুনিক লেখকদের জীবনদৃষ্টি ছিল য়ুরোপমুখী। শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে-শিল্পে-বাণিজ্যে ঐশ্বর্যে-বিলাসে-সৌজন্যে-মানবতায় য়ুরোপীয় মানুষ আর বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে-শিল্পে উজ্জ্বল ও উন্নত য়ুরোপীয় বিদ্যা তাঁদের বৈদ্যুতিক চমকে চকিত, বিস্মিত, বিভ্রান্ত, আশ্বস্ত ও লিপ্সু করেছিল। অনুকৃতিই উন্নতির সোপান বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই মধুসূদনে পেলাম বিষয়ে প্রাচীন ভারত এবং ভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের য়ুরোপ। একালের প্রধান সাহিত্য নাটক-প্রহসন, তাতেও রয়েছে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষণশীলতা ও নৈতিক চেতনার সাথে য়ুরোপীয় আদলে ঘরোয়া জীবনে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্ববর্তী যে-কোনো মনীষী বুদ্ধিজীবীর চেয়ে য়ুরোপীয় চিন্তাচেতনায় বেশি প্রবুদ্ধ ও অগ্রসর ছিলেন। তবু তাঁর লক্ষ্য ছিল মেরামত। তাই যদিও তাঁর নারী-পুরুষের আদর্শ ছিল ইংরেজ সিবিলিয়ান ও সিবিলিয়ান-পত্নী, যদিও মিল-বেন্থাম-কঁতের প্রভাব স্বীকার করেছেন তিনি সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায়; যদিও তাঁর মন-মনন-মানবতা ছিল য়ুরোপীয়, যদিও দেশী কলেবরে ও আবরণে য়ুরোপীয় প্রাণের ও মনের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন তিনি; যদিও দেশী অবতারে, শাস্ত্রে ও জীবনচর্যায় তিনি য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ, সেবায়, নৈতিক দার্ঢ্য, উপযোগবাদ, হিতবাদ, সাম্যবাদ, ও সিভালরিতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন; তবু স্বাজাত্যাভিমান বশে দোহাই দিয়েছেন গীতার-ভাগবতের-নিষ্কামধর্মের-ভক্তির-পৌরুষের-যোগের-ব্রহ্মচর্যের ও কৃচ্ছ্রতার। তাই বঙ্কিমও বন্দিত ও পরিচিত রইলেন আদর্শ ব্রাহ্মণ্যবাদীরূপে, তাঁর উদ্দিষ্ট য়ুরোপীয় জীবন-দৃষ্টি ও জগৎ-চেতনা আচ্ছন্ন রইল স্বশাস্ত্রগর্বের ও স্বাজাত্যভিমানের ফেনপুঞ্জে। এর ফলেই হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশঘোষ প্রমুখ গদ্যে-পদ্যে হিন্দু-ঐতিহ্যগর্ব জাগিয়ে জাতিবৈর সৃষ্টি করেই কৃতার্থ থাকলেন। এতে প্রাচীন-প্রীতি বাড়ল এবং গ্রহণ-ভীতি জাগল। ফল হল এই, পুরোনোও ফিরে এল না, নতুনও রইল অধরা। তাই তাঁদের জীবনদৃষ্টি অস্বচ্ছ ও অসমঞ্জস। ইতোমধ্যে কিছু স্বল্পপ্রতিভার কবি রোম্যান্টিক ইংরেজ-কবিদের অনুকরণে রূপতৃষ্ণা ও প্রেম-চৈতন্যের কৃত্রিম অনুশীলনে গীতিকবিতা রচনায় ব্রতী হলেন— এঁরা হলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয় কুমার বড়াল প্রমুখ।

তুচ্ছ ব্যতিক্রম বাদ দিলে রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা বুর্জোয়া উদারতার ও মানবতার শ্রেষ্ঠ আর মহত্তম বিকাশ ও প্রকাশ দেখি। রবীন্দ্রনাথ যদিও ভাববাদী এবং আস্তিক ও ব্রাহ্ম, তবু সাতচল্লিশোত্তর বয়সে তিনি আদর্শচেতনাবশে নির্বিশেষ মানবধর্মে ও মানবমর্যাদায় আস্থাবান ছিলেন। যদিও এখানকার বৌদ্ধ সুপ্রাচীন এবং বৈষ্ণব ঐতিহ্যও সুপরিজ্ঞাত, তবু এ জীবনদৃষ্টি ঐতিহ্যও এদেশে তাঁর পূর্বে দুর্লভ ছিল। রবীন্দ্রনাথের মানস-বিচরণের ক্ষেত্র ছিল প্রাচীন ভারত ও আধুনিক য়ুরোপ। তাই তাঁর জীবনদৃষ্টি কালোপযোগী বাস্তব ও ব্যবহারিক ছিল না, তিনি ছিলেন হিতকামী স্বাপ্নিক ও তাত্ত্বিক।

বাঙলা সাহিত্যের অত্যন্ত জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নারীজাতির মঙ্গলগানে মুখর, কিন্তু তাঁর শাস্ত্র, সমাজ ও ঐতিহ্যমানা মর্মে দৃঢ়-মূল ছিল রক্ষণশীলতা বা সনাতন শাস্ত্র ও সংস্কৃতি-প্রীতি। তাই তাঁর উপচিকীর্ষা নারীর উপকারে পরিণত হয়নি। গৃহগত জীবনে বৃন্তচ্যুত যৌবনবতী নারীর জীবনের ও মর্যাদার সমস্যাই তাঁর সাহিত্যের বক্তব্য। তাঁর জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা ছিল সংকীর্ণ, বিস্তৃত পরিসরে জীবনকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস বা আগ্রহ ছিল না তাঁর। তাই তাঁর সাহিত্যে জীবন আছে, জীবনবৈচিত্র্য নেই; রস আছে, রস বৈচিত্র্য নেই; সমস্যা আছে, সমস্যার বহুলতা নেই; সমাধান নির্দেশের সাহস কিংবা উদারতাও তাই এ সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য। তবু তাঁর সাহিত্যে পরিব্যক্ত ক্ষোভ, বেদনা ও সমস্যা পাঠকহৃদয়ে যে-কারুণ্য ও সহানুভূতি জাগায়, তা-ই পরিণামে পাপ ও পাপী সম্বন্ধে পাঠককে তথা সমাজকে উদার ও সহিষ্ণু করে তোলে। তাঁর লক্ষ্য ছিল সনাতন শাস্ত্র ও সমাজ মেরামত, ভাঙা বা নতুন করে গড়া নয়। তিনি আসলে বিড়ম্বিত যৌবনবতী নারীর জন্যে ক্ষমাও নয়, কূচিৎ কখনো সমাজের প্রশ্রয় ও অনুকম্পা দাবি করেছেন নিতান্তই করুণাবশে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে লালিত হয়েও দুজন কবি ত্রিশ-পূর্ব কালে স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। একজন মোহিতলাল যিনি মর্ত্যজীবনে শারীর সম্ভোগ-সুখকে গুরুত্ব দিতেন, অপরজন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত যিনি বাঙলাসাহিত্যে দুঃখবাদ প্রচার করেন। 'কল্লোল-কালিকলম' পত্রিকাশ্রিত ত্রিশোত্তর কবি-সাহিত্যিকদের দ্রোহ স্থায়ী হয়নি, যদিও সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে ও আদলে স্বীকৃত নৈতিক সামাজিক জীবনের বাঁধন-ছেঁড়ার তরুণ-সুলভ আগ্রহ জেগেছিল তাঁদের। তাঁরা কিছুকালের মধ্যেই প্রায় স্বস্থ ও সুস্থ হয়ে ওঠেন। তাঁদের কিছু ক্ষোভ, কিছু দ্রোহ প্রকাশ পায় যৌন-সংকোচ পরিহারে, প্রচলিত শ্রেয়োবোধের ও নীতিনিষ্ঠার প্রতি অনাস্থায়, কাব্যের ছন্দ ও সাহিত্যের আঙ্গিক পরিবর্তন প্রবণতায়, পরাবাস্তবপ্রীতিতে ও মনোসমীক্ষণে। এক্ষেত্রে নেতৃত্ব যাঁর ছিল, সেই বুদ্ধদেব বসুই সবার আগে এ দ্রোহ বর্জন করেন। তবু নরেশ সেনগুপ্ত , বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ স্বকীয় জীবনদৃষ্টির জন্যে প্রশংসিত। এঁদের সমকালীন হয়েও ব্যতিক্রম হচ্ছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি দরিদ্র-শোষিত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তিগান রচনায় ব্রতী হন। নানা অসঙ্গতি সত্ত্বেও তিনি পীড়ন, শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত সমাজকামী ছিলেন। মূলত তিনিও ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী—সাম্যবাদী নন।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদরদী এবং কংগ্রেসী গণআন্দোলন ও জনসেবা অঙ্গীকার করে সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি প্রায় শরৎচন্দ্রের মতোই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, কবি, নাগিনীকন্যার কাহিনী, ধাত্রীদেবতা ও আরোগ্য নিকেতন নানা কারণে বিশিষ্ট। তবে বিলীয়মান সামন্ত ও সনাতন সমাজের প্রতি তাঁর যেন একটা মমতার ও বেদনার প্রশ্রয় ছিল। এর পরের স্তরে মার্ক্সবাদ, পরাবাস্তববাদ, অস্তিত্ববাদ, দুঃখবাদ, শ্রেণী-সংগ্রামবাদ প্রভৃতি সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়েছে। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সুবোধ ঘোষ, সমরেশ বসু, বিমল কর, সন্তোষকুমার ঘোষ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ মনস্তত্ত্ব, চেতনাপ্রবাহ তত্ত্ব, অস্তিত্ববাদ, পরাবাস্তবতা ইত্যাদি সঞ্চারিত করে বাঙলাসাহিত্যে মন-মননের দিগন্ত ও সম্ভাবনা প্রসারিত করেছেন।

নাট্যশাখাই বিশেষ করে তত্ত্বপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ থেকেই মোটামুটিভাবে রূপক-সাংকেতিক নাটকের শুরু। আজকাল তত্ত্বপ্রধান নাটক অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাতে অধ্যাত্মতত্ত্ব থেকে দাদাতত্ত্ব এবং মার্কসীয় তত্ত্ব প্রভৃতি সব মেলে। কাব্যক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রামের কথা, নিরাশ্রয় নিরানন্দ জীবনের কথা, অস্তিত্বের কথা, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণার কথা তথা একটা সামগ্রিক বিক্ষোভ-বেদনার ও নৈরাশ্যের প্রারম্ভে যেন করুণ-কঠোর সুরে ধ্বনিত। মার্কসবাদী প্রতীচ্য কবিদের ছাড়াও বোদলেয়ার, র‍্যাবোঁ, রিলকে প্রভৃতির প্রভাব একদল কবির ওপর প্রবল।

৬

দর্শন জীবনচেতনা ও জগৎ-ভাবনারই অভিব্যক্তি। যাকে আমরা দর্শন বলি, তা আসলে জগৎ-কারণ ও সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে জীবন সম্পর্কে লব্ধ সার্বিক ও সর্বাত্মক জ্ঞান ও বোধি। এই বোধিই জীবনাচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই বোধি যখন আচরণে অভিব্যক্ত হয়, তার সামগ্রিক নাম দিই জীবনদৃষ্টি। আবার ঐ বোধিই যখন জীবন-প্রতিবেশ ও জীবনোপকরণের ঐহিক ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মূল্য নিরূপণ করে, তখন স্বীকার পেতেই হবে যে জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিন্ন। এই বোধ শাস্ত্রের ও সরকারের তথা শাস্ত্রিক, নৈতিক, শৈক্ষিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও আচারিক প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। অতএব মূল্যবোধ স্থান-কাল-পাত্র ভিত্তিক। তাই Axiology বা মূল্যবোধতত্ত্ব মাত্রই আপেক্ষিক—অনক্ষেপ নয়। জীবন মানেই অবিচ্ছিন্ন গতিধারা। গতি মাত্রই নতুনের ও অজানার মোকাবেলা, এতে নতুন জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, চেতনা-চিন্তা, সংশয়-বিতর্ক, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব জাগবেই—পরিবর্তন আসে এভাবেই। কাজেই দর্শন বদলায়, দৃষ্টি নতুনতর হয় এবং মূল্যচেতনাও পাল্টায়। জীবনের দৌড় যার শেষ, সেই বৃদ্ধই বলে অতীতের কথা, কারণ রোমন্থন ছাড়া তার বন্ধ্যা স্থবির চেতনা ধরে রাখার উপায় নেই। একজন তরুণ বলে তার ভবিষ্যতের কথা, তার জীবন-স্বপ্নের কথা, কেননা তার জীবন গতিময়, তার চিন্তা-চেতনা প্রবহমান। সেই প্রবাহ বহন করে তার উদ্যম ও স্বপ্ন।

আজকের দুনিয়ায় একদিকে বিলাসিতায়, কৃত্রিমতায় ও যান্ত্রিকতায় হাঁপিয়ে ওঠা যুবসমাজ নেশায়-নৈরাশ্যে-নগ্নতায় দ্রোহ প্রকাশ করছে, অন্যদিকে অভাব-শোষণ-বঞ্চনাক্লিষ্ট স্বপ্নহীন তারুণ্য ক্ষোভে-জ্বালায় মারমুখী। বলেছি জীবিকার হাতিয়ার ও পদ্ধতিজাত জটিলতা, জনসংখ্যাবৃদ্ধিজাত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার অসঙ্গতি, আইন, যুদ্ধ, ঝড়, বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, কৃৎকৌশল ও প্রকৌশলবিদ্যার উৎকর্ষ ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রের আনুপাতিক অভাব এবং প্রভাব ও মনন-বৈচিত্র্য দর্শন বা জীবনদৃষ্টি বা মূল্যবোধ বদলায়। তাই আজ দার্শনিক ও ব্যক্তিমানুষ নানা নতুন মতবাদে স্বস্তি ও শান্তি লক্ষ্যে দেশগত ও মানসগত সমস্যায় ও যন্ত্রণার সমাধান খুঁজছে।

আগেও আমরা জীবনদর্শনের ও জীবনাদর্শের এমনি বিবর্তন লক্ষ্য করেছি; একসময়ে যখন জনসংখ্যা কম ছিল, খাদ্যসংগ্রহ সমস্যার বা শ্রমের বিষয় ছিল না, মানুষে মানুষে তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল বিরল, জীবনে যন্ত্রণা ছিল কৃচিৎ। তখন মানুষ কামনা করত দীর্ঘজীবন—অমরত্ব। তাই অমৃতসন্ধানী ছিল তারা। তারপর জীবিকার ক্ষেত্রে যখন যখন সমস্যা দেখা দিল, মৃত্যু যখন অপ্রতিরোধ্য হল, তখন মানুষ কামনা করেছে মোক্ষ, তখন ঐহিক সুখে বঞ্চিত মানুষ পারত্রিক সুখের স্বপ্ন রচনা করে আশ্বস্ত হতে চেয়েছে। তারপরে জীবনসমস্যা আরো কঠিন ও অসমাধ্য হয়েছে যখন, তখন কামনা করেছে অন্ন। আজ মানুষের কাম্য অমৃত নয়, মোক্ষ নয়, স্বর্গ নয়—পার্থিব অন্ন ও আনন্দ। মানুষের আচরণে ও সাহিত্যে-শিল্পে আজ তাই অন্ন-চিন্তা ও আনন্দ-অন্বেষা প্রকট।

সাহিত্যে যুগ-যন্ত্রণা

জীবন জীবিকা-নির্ভর। জীবিকা প্রতিবেশ-ভিত্তিক। সে-প্রতিবেশ প্রাকৃতিক ও সামাজিক। কাজেই মানুষকে চিরকাল প্রতিবেশের অনুগত থেকেই জীবন রচন ও ধারণ করতে হয়েছে। তাই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দ-অন্বেষাই মানুষের লক্ষ্য হলেও সে প্রাতিবেশিক দুঃখ-যন্ত্রণা-বিপদ কখনো এড়াতে পারেনি। ফলে জীবন হয়েছে যন্ত্রণা-সঙ্কুল, সে-যন্ত্রণা বহু ও বিচিত্র। কারো ভাত-কাপড়ের অভাবজাত যন্ত্রণা, কারো দাসত্বের বন্ধন-পীড়নপ্রসূত যন্ত্রণা, কারো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোগ-শোকের যন্ত্রণা, কারো বিচ্ছেদ-বিরহের যন্ত্রণা, কারো হতবাঞ্ছার যন্ত্রণা, কারো পরাজয়-অপমানের কারো বা ঈর্ষা-অসূয়া-ঘৃণার যন্ত্রণা। অতএব জীবনে যন্ত্রণা আছেই। কারো বা বেশি, কারো বা কম, কারো জীবনব্যাপী, কারো ক্ষণস্থায়ী এ-ই যা তফাৎ। এই আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা থেকে মানুষ নানাভাবে চিরকালই মুক্তি খুঁজেছে বটে, কিন্তু প্রয়াস পুরো সফল হয়নি। সে বোধ-বুদ্ধিতে যতই আত্মবিকাশ ঘটিয়েছে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ও মননে যতই এগিয়েছে, তার যন্ত্রণাও ততই সুক্ষ্মতীব্র ও বহুমুখী হয়েছে। তার যন্ত্রণা-মুক্তির অন্বেষা তাকে জটিল জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

বাত্যা-বন্যা-বহ্নি ও বিমারের উপদ্রব নিরুপায় মানুষ মেনে নিয়েছিল, কিন্তু জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও নিরুপদ্রব জীবন লক্ষ্যে সে যে শাস্ত্র সমাজ ও সরকার বানাল, তাও-যে একদিন তার কাল হয়ে দাঁড়াবে, তা কি সে কখনো ভাবতে পেরেছিল! পণ্য বিনিময়ের সহজ মাধ্যম হিসেবে সে একদিন কত আশা নিয়ে মুদ্রা চালু করেছিল, মনে করেছিল বুঝি একটা বড় সমস্যারই সমাধান হল। সে-মুদ্রাই আজ সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো তার ঘাড়ে চেপে বসেছে। সে-মুদ্রার অভাব কিংবা প্রাচুর্য মানুষের মনুষ্যত্ব বিপন্ন করেছে।

সাহিত্য জীবনেরই চাওয়া ও পাওয়া-না-পাওয়ার ইতিবৃত্তান্ত, জীবনের জন্য জীবন নিয়েই সাহিত্য। অতএব, সাহিত্য জীবন থেকেই উৎসারিত। মানুষ মনে করে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার প্রাপ্য। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে তার জন্মগত অধিকার। সুখ তার প্রত্যাশিত বলেই দুঃখ-যন্ত্রণায় সে হয় বিচলিত। দুঃখ-যন্ত্রণার শঙ্কায় কাতর মানুষ অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি-সুখে হয় আনন্দ-চঞ্চল। সাহিত্যে যদিও জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণা, সমস্যা-সম্পদ, জ্ঞান-বোধি-আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতি সবকিছুই সাধারণভাবে বিধৃত হয়, তবু অবাঞ্ছিত দুঃখ-যন্ত্রণার কথাই সাহিত্যের মূল অবলম্বন। তাই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মাত্রই করুণরসাত্মক ও ট্র্যাজিক। সুখকে স্বাভাবিক মনে করে বলেই সুখে সংবেদনশীলতা কম। এ কারণে সূচিত সুবিন্যস্ত শব্দে সুবর্ণিত যন্ত্রণা-করুণ অনুভূতি বা কাহিনীই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

AMARBOI.COM

আগেই কালের অজ্ঞ-অসহায় মানুষ জীবনে নিয়তির লীলা স্বীকার করত। তাই শাস্ত্রপতি, সমাজপতি ও শাসনপতির দেয়া দুঃখ-যন্ত্রণা তক্‌দিরের ছলনা মনে করে নীরবে সয়ে যেত। স্পার্টাকাসের মতো কেউ কেউ বিদ্রোহও করত, কিংবা সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টটলের মতো কেউ কেউ তত্ত্ব-প্রচারে নিরত থাকত। গৌতমবুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ অবধি কত কত মনীষী-মহাপুরুষ দুঃখ-যন্ত্রণা নিরোধের কত উপায় বাতলে দিয়েছেন, কিন্তু কারণ-ক্রিয়া চেতনাবিরহী নিয়তিবাদী মানুষ কোনো উপায় খুঁজে পায়নি, শাসনে-শোষণে-পীড়নে-পেষণে জর্জরিত মানুষ কেবল অপমৃত্যুতেই জীবন-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তাই আদিকালের সাহিত্যে কেবল যন্ত্রণার বিবৃতিই রয়েছে, যন্ত্রণার কারণ কিংবা বিমোচনের উপায় চিহ্নিত হয়নি।

সেই রূপকথার আমলে অপহৃতা রাজকন্যার, ষড়যন্ত্রের শিকার সুয়োরানীর দুঃখ-লাঞ্ছনার কথা শুনেছি অথবা ফুল্লরার দারিদ্র্যদুঃখ দেখেছি। এমনি করে হাজার হাজার বছর কেটে গেছে; শাস্ত্র-শাসনে, সমাজ-পীড়নে, সরকার-পেষণে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করছে, মাঝে মধ্যে নির্লক্ষ্য দ্রোহ দেখা দিয়েছে। তবু কিন্তু মানুষ ক্রমে যন্ত্রণামুক্তির চেতনালাভ করতে থাকে। তার ফলেই মানুষ যে জন্মসূত্রে স্বাধীন তা অস্পষ্টভাবে বোধগত হতে থাকে। তারপর থেকে মানুষ দাসত্বের, কুসংস্কারের, বর্ণভেদের, জাতভেদের, ঔপনিবেশিকতার, পরাধীনতার, বাকবদ্ধতার, শোষণের, শাসনের, দারিদ্র্যের, অপ্রেমের, পীড়নের ও বৈষম্যের যন্ত্রণামুক্তির মানসিক ও বাস্তব আকুতি প্রকাশ করতে থাকে এবং সে আকুতি সাহিত্যের বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাখায় প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। তবু মার্কস-পূর্বকালে তা ছিল সংবেদনশীলতায় ও কারুণ্যে নিবদ্ধ। গণমনে সংগ্রামী চেতনা, জিগীষা ও জিঘাংসা জাগে উনিশশতকের শেষার্ধ থেকে এবং যন্ত্রণামুক্তির বাস্তব প্রয়াস দেখা দেয় ও সাফল্য আসতে থাকে প্রথম মহাসমরের পরে এবং দ্বিতীয় মহাসমর এই যন্ত্রণামুক্তি ত্বরান্বিত করে পৃথিবীর নানা দেশে।

আমাদের দেশেও সেই রূপকথার আমল থেকেই বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন যন্ত্রণার কথা সাহিত্যের নানা শাখায় বিবৃত হয়েছে। শাসক-শাসিতের দ্বন্দ্বজাত যন্ত্রণা, জাতিবৈর, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাতজাত যন্ত্রণা, বর্ণভেদ-অস্পৃশ্যতাপ্রসূত যন্ত্রণা, পরাধীনতা ও শোষণ-পীড়নজাত যন্ত্রণা এবং অশন-বসন-নিবাস-নিদানের অভাবপ্রসূত যন্ত্রণার কথা ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল নিরুদ্দেশ্য বর্ণনা মাত্র। হর-পার্বতীর দারিদ্র্য দুঃখ থেকে পথের পাঁচালীর অপু-পরিবারের দারিদ্র্য-যন্ত্রণা অবধি যন্ত্রণামুক্তির উপায়-চিন্তা ছিল না। উপায়-চিন্তা আমাদের সাহিত্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে প্রথম মহাযুদ্ধের কালে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নজরুল ইসলাম হয়ে সুভাষে-সুকান্তে প্রবল ও আজকের তরুণ-কবিদের মধ্যে এই যুগ-যন্ত্রণা প্রবলতরভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। তেমনি গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেও শৈলজানন্দ-নজরুল-গোপাল হালদার-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-সত্যেন সেন-মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য হয়ে আজকের লেখকদের প্রধান অবলম্বন হয়েছে এ যুগ-যন্ত্রণার ইতিবৃত্ত। প্রবন্ধকাররাও যুগ-সমস্যা-জাত যন্ত্রণার কথাই বলছেন। আজকের দিনে এই যুগ-যন্ত্রণার উৎস হচ্ছে আর্থিক বৈষম্য। যোগ্যতমের উদ্বর্তন তত্ত্বের কিংবা অদৃষ্টবাদের চাতুরী দিয়ে আজ আর মানুষকে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত করা চলছে না। আগের নীতি ছিল 'দুর্জনেরে রক্ষা করো, দুর্বলেরে হানো'। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে এতবড় প্রবঞ্চনা বহুকাল শাসক-শোষকেরা চালিয়ে নিয়েছিল বটে, কিন্তু প্রবুদ্ধ জনতা জানে—সরকার শাসকসংস্থা নয়, গণপোষক সেবকসংস্থা মাত্র। মানুষের জীবনে-জীবিকার নিরাপত্তা ও সুযোগদানই এর লক্ষ্য। মানুষ আজ নিঃসংশয়ে জেনেছে কাড়াকাড়ি, মারামারি ও হানাহানি করে বাঁচা যায় না—সহিষ্ণুতার ও সহাবস্থানের অঙ্গীকারে সমস্বার্থে সহযোগিতার ও সমবেত প্রয়াসের মাধ্যমে সম্পদের আনুপাতিক বণ্টনই বাঁচার একমাত্র দৃষ্টিগ্রাহ্য পথ। এছাড়া গণমানবের অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে না। আজকের সাহিত্যিকের মুখ্য প্রবণতায় এবং তাই সাহিত্যের মূলধারায় এই আর্থিক জীবনসৃষ্ট যুগ-যন্ত্রণার ও যন্ত্রণামুক্তির উপায়-চিন্তাই প্রাধান্য পাচ্ছে। এই সাহিত্যের সংগ্রামী অগ্রধারার নাম 'গণ-সাহিত্য' এবং নরম বা মধ্যপন্থী ধারাকে বলা যায় 'মানববাদী সাহিত্য।' দেশে দেশে গণমানবের বৈষয়িক জীবন দুর্বহ হয়েছে বলেই আজকের সাহিত্যকে যুগ-যন্ত্রণার প্রতিবেদন-স্বরূপ হতেই হয়েছে। নান্দনিক সৌকর্য এতে যতই ব্যাহত হোক কিংবা সর্বজনীন মানব-চেতনার চিরন্তনত্ব যতই অবহেলিত হোক, আজকের গণমানবের জীবনের দুর্যোগ-দুর্ভোগ-দুর্দিন মোকাবেলার জন্যেই ফলিত (applied) সাহিত্যের বড় প্রয়োজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থ পরিচিতি

সৈয়দ সুলতান—তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ

সৈয়দ সুলতান – তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ' আহমদ শরীফের গবেষণা অভিসন্দর্ভ এবং এই অভিসন্দর্ভ লিখে আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৭ সনে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। আহমদ শরীফ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন ১৯৫০ সনে। সেই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের দেওয়া পুঁথিগুলো তাঁর গবেষণার উপকরণ হয়। অচিরেই পুঁথি গবেষণায় আহমদ শরীফ পারঙ্গমতার পরিচয় দেন এবং মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রখ্যাতি লাভ করেন। সুতরাং সৈয়দ সুলতানের ওপর তাঁর উচ্চতর গবেষণা তাঁর বিশেষ বিদ্যা চর্চার সঙ্গেই সম্পৃক্ত। চট্টগ্রামবাসী সৈয়দ সুলতান মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট কবি। সুফী ও পীর হিসেবেও তিনি পরিচিত। তাঁর সুরুচি, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্ম ভাব সাধনার চমৎকার নিদর্শন। সৈয়দ সুলতানকে কেন আহমেদ শরীফ গবেষণার বিষয় হিসেবে নিলেন সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই রকম—

> বহুদিন ধরে মধ্যযুগের মুসলিম রচিত বাঙলা সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। সে সূত্রে অনুভব করেছি সমাজ মনে ও সমকালীন কবি চিত্তে সৈয়দ সুলতানের রচনার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব। এর কারণ ও স্বরূপ জানবার, বুঝবার আগ্রহ জেগেছিল আমার।

পড়াশোনায় ও অনুসন্ধানে যতই অগ্রসর হয়েছি ততই মনে হয়েছে সৈয়দ সুলতান কবি মাত্র নন, তিনি চট্টগ্রামবাসী মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক যুগন্ধর ও যুগস্রষ্টা।

অন্যত্র গ্রন্থের প্রস্তাবনায়ও আহমদ শরীফ সৈয়দ সুলতানকে কবি, পীর, সুফী, সাধক, শাস্ত্রবেত্তা, আদর্শ মুসলমান, যুগ-সংস্কৃতির প্রতিভূ, সমাজ-মানসের প্রতিনিধি স্থানীয় চিত্রকর, লোক মনীষার ধারক ও ভাষ্যকার ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত করে তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার উপযোগিতার কথা বলেছেন –"তাঁর রচনার পরিসরে তাঁর মানস উপাদান বিশ্লেষণ করে আমরা ষোল শতকের বাঙলার অন্তত বাঙলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চল– চট্টগ্রামের মুসলমানদের জগৎ ও জীবন ভাবনার স্বরূপ উদঘাটন করতে পারি– এ বিশ্বাসই সৈয়দ সুলতানের কাব্য পাঠে আমাকে উৎসুক করেছে।" প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। সৈয়দ সুলতানের ওপর পূর্ণ গবেষণা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ সৈয়দ সুলতানের কালের চট্টগ্রাম অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সমাজনীতি, ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। বস্তুত, এ গবেষণার মান সমুন্নত। গবেষণা গ্রন্থটির প্রসঙ্গ কথায় বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক মাযহারুল ইসলাম বলেছেন—

> ডক্টর শরীফ মধ্যযুগের গবেষণাকর্মে যতগুলো গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থটি বিশিষ্টতম বলে দাবি করতে পারে।

সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ, গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী ১৯৭২ সনে (নভেম্বর ১৯৭২, অগ্রহায়ণ : ১৩৭৯)। প্রকাশক ফজলে রাব্বি; প্রকাশন মুদ্রণ বিক্রয় বিভাগ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা– ২। মুদ্রাকর : আলমগীর মোহাম্মদ আদেল, আলতাফ প্রেস ১১ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোড, ঢাকা-১। বিখ্যাত চিত্রী রফিকুন্নবী বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৩৪।

সৈয়দ সুলতানের জীবন, কর্ম, কবিত্ব ও দেশকাল বিষয়ে গবেষণার ফল হল সৈয়দ সুলতান তাঁর গ্রন্থাবলি ও তাঁর যুগ, কেবল পরিচিতি অংশ। সৈয়দ সুলতান রচিত পুঁথিগুলি এই খণ্ড থেকে বিযুক্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

যুগ যন্ত্রণা

যুগ-যন্ত্রণার প্রকাশকাল জুন, ১৯৭৪। এ গ্রন্থটির প্রকাশক আনোয়ার আলম চৌধুরী; কথাকলি ৩৪ মনির হোসেন লেন, ঢাকা-১। গ্রন্থটির মুদ্রাকর আলেকজাণ্ডা এস. এম. প্রেস; নবাবপুর, ঢাকা। প্রচ্ছদ এঁকেছেন কথাকলি এ্যাডভার্টাইজার্স। মূল্য : ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা; পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১২।

আহমদ শরীফ এই গ্রন্থটি তাঁর ভাই আহমদ কবিরকে উৎসর্গ করেন। আহমদ কবির চার ভাইয়ের মধ্যে সকলের বড়। উৎসর্গপত্র এই রকম–

জ্যেষ্ঠভ্রাতা
মরহুম আহমদ কবির স্মরণে
–যাঁর সোহাগে-শাসনে
আমার বাল্য-কৈশোর নিয়ন্ত্রিত।

'যুগ-যন্ত্রণায় আছে মোট ১৮টি প্রবন্ধ। সমকালীন দেশজ রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলো আহমদ শরীফের প্রয়োগ চেতনার প্রকাশকও। বাঙলার ও বাঙালির ইতিহাসের কোনো কোনো ঘটনা প্রসঙ্গে ডক্টর শরীফ নিজের অভিমতও ব্যক্ত করেছেন। তেমন একটি প্রবন্ধ হল, 'বাঙালি সত্তার বিলোপ প্রয়াসে ১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র। বাংলা সাহিত্যের তিন স্বনামধন্যকে নিয়ে ডক্টর শরীফের তিনটি সুন্দর ছোট প্রবন্ধও এ সংকলনভুক্ত হয়েছে। এরা হলেন বিদ্যাসাগর, সাহিত্য বিশারদ ও কাজী আবদুল ওদুদ। একটি প্রশস্তি কবিতা মধ্যযুগের একটি ক্ষুদ্র পুঁথির পরিচায়িকা। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত এই পুঁথির নাম 'জগদীশ্বর স্তোত্র', রচয়িতা জনৈক জিনাত আলী। পরিচায়িকার সঙ্গে মূল পুঁথিটিও দেওয়া হয়েছে। যুগ-যন্ত্রণা প্রবন্ধ সংকলনে এই রচনাটি বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। এই রচনাটি যুক্ত হয়েছে এর অভিনবত্বের কারণে। আহমদ শরীফ বলেছেন, এ প্রশস্তি কবিতাটি নানাগুণে অনন্য। ললিত মধুর ছন্দের লাবণ্যে, কবিতার আঙ্গিক সৌন্দর্যে, উচ্চ দার্শনিক চিন্তার অবতারণায়, আল্লাহর অনির্বচনীয় মহিমার অনুধ্যানে, মুসলিম ঐতিহ্যের অনবরত সুপ্রয়োগে মনের সুস্থতার চৈত্তিক ঔদার্যে বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতায় সিদ্ধান্তের ঋজুতায় এবং পরিশ্রুত মননের সামগ্রিক প্রতিফলনে কবিতাটি বিশিষ্ট।'

উল্লেখ্য, আহমদ শরীফ যুগ-যন্ত্রণা ভুক্ত প্রবন্ধগুলির বেশির ভাগই লিখেছিলেন ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন তিনি এক পর্যায়ে ঢাকার কোনো গোপন আবাসে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঐ উদ্বেগাকুল অস্বস্তিকর সময়ে লেখাও ছিল কষ্টকর ব্যাপার, তবু আহমদ শরীফ দেশ ও মানুষকে নিয়ে লিখেছিলেন কিছু প্রবন্ধ। একটি প্রবন্ধ (বিশ্রামাগার) লিখেছিলেন উনিশ শ সত্তরের অক্টোবর মাসে। দু'টি প্রবন্ধ (কল্যাণবাদ, লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি) লিখেছিলেন সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে।

সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলির রচনাকাল :

বাক স্বাধীনতা – ২৫/২৬.৯.১৯৭১
বিকার ও প্রতিকার – ২৩.১০.১৯৭১
সামাজিক উপদ্রব ও রাজনৈতিক উপসর্গ– ২৯.৯.১৯৭১
আঁধি – ২৭.১০.১৯৭১
মনুষ্যত্বের আর এক নাম – ১৮.১০.১৯৭১
নাগরিক সহিষ্ণুতা – ২৬.১১.১৯৭১
সমস্যা ও সহিষ্ণুতা – ৩০.৯.১৯৭১
লোকায়ত রাষ্ট্রের ভিত্তি – ৮.২.১৯৭২
ব্যক্তিত্বের প্রভাব – ১.১০.১৯৭১
কল্যাণবাদ – ২৩.১.১৯৭২
ভবিষ্যতের বাঙলা – ২৩.৩.১৯৭১
নিরীহ – ২২.১১.১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতীক ও প্রতিম – ১১.১১.১৯৭১
বাঙালি সত্তার বিলোপ প্রয়াসে ১৯০৫ সনের ষড়যন্ত্র – ২৯.১০.১৯৭১
বিদ্যাসাগর – ১.১০.১৯৭০
সাহিত্য বিশারদ – ২৬.৯.১৯৭১
কাজী আবদুল ওদুদ – ৬.১১.১৯৭১

কালিক ভাবনা

কালিক ভাবনা প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এর অক্টোবরে। প্রকাশ করেছেন চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ),৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা-১। বইটির মুদ্রাকর মুক্তধারার পক্ষে প্রভাংশুরঞ্জন সাহা। বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিখ্যাত চিত্রী হাশেম খান। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫, মূল্য নয় টাকা।

আহমদ শরীফ কালিক ভাবনা উৎসর্গ করেছেন একাধিক ব্যক্তিকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের বিপন্ন দিনগুলোতে তাঁকে সহায়তা দিয়েছিলেন। বইটির প্রকাশ উপলক্ষে এইসব ব্যক্তির অপরিশোধ্য ঋণের কথাও তিনি স্মরণ করেছেন। একরাশ নাম – রেণু বানু, চন্দন-দলিল, স্বপন, রহিমা রহমান-আহমদুর রহমান, মানিক-বখতিয়ার, মাহমুদ নূরুল হুদা, আবু রশিদ মাহমুদ, আহমদ সোবহান, ইব্রাহিম হোসেন, মানিক হাবিব, ডক্টর এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

'কালিক ভাবনা' মোট ২৪টি প্রবন্ধের সংকলন। মুদ্রণ প্রমাদজনিত একটি শুদ্ধিপত্রও সংযোজিত। প্রবন্ধগুলোর বিষয়বস্তু সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। বিশেষ করে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ যে চিন্তা ও চেতনার সম্মুখীন তার সম্বন্ধে আহমদ শরীফ তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন বিবেকী বুদ্ধিজীবীর ভূমিকায়। একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্যে তিনিও ছিলেন প্রবল আশাবাদী। একাত্তরের অক্টোবরে রচিত মাভৈ: নামের প্রবন্ধে তিনি এ অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এই রকমভাবে —

> গণমানবের আহবে দুরাত্মা দানবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর প্রভাব প্রতাপ খর্ব হবেই। মুক্তি আসন্ন! সামনে নতুন দিন পলাশলাল অরুণ পূর্বাশা রাঙা করে তুলছে। অতএব মাভৈ:। নেপথ্যে নবসূর্যের আশ্বাস শোনা যাচ্ছে: ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। কাজেই নাহি ভয়, হবে জয়। অতএব তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ অবশেষে জয় পেল এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হল। নতুন রাষ্ট্রে বাংলাদেশীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কীরকম হবে সে বিষয় স্বাধীনতার দায় নামক প্রবন্ধে আহমদ শরীফের মনোভাব এইরূপ —

> স্বাধীনতা উপভোগের জন্য অনুকূল প্রতিবেশ সৃজন করতে হয়– যে প্রতিবেশে থাকবে ব্যক্তি জীবনে মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য, সামাজিক জীবনে সাম্য ও স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেয় বরণের ও সংস্কার বর্জনের প্রবণতা, জীবিকার ক্ষেত্রে সমসংযোগ ও সুবিচার, রাষ্ট্রিক জীবনে দায়িত্ব নিষ্ঠা ও অধিকার চেতনা।

নতুন রাষ্ট্রে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের নতুন তাৎপর্যও নির্দেশিত হয়েছে। আহমদ শরীফ বলেছেন – 'যদি নতুন কিছু ভাবা কিংবা করা সম্ভব না-ই হয়, তাহলে অন্তত ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আজকের এই মুহূর্তের চলতি শোষণ-পীড়ন, অন্যায়-অশুভ, অভাব-আপদের প্রতিকার প্রতিরোধ বা প্রতিশোধ দিবসরূপে উদযাপন করাই বাঞ্ছনীয়।' (একুশের ভাবনা)

কালিক ভাবনায় শিক্ষা বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষাতন্ত্রের গোড়ার তত্ত্ব নামক জ্ঞানগর্ভ আলোচনাটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত সেমিনারে (২৯.৬.৭২) পঠিত হয়েছিল। বাঙালীর মনন ধারার বৈশিষ্ট্য অভিভাষণটি (২১.১.১৯৭৪ তারিখে ঢাকার দর্শন সম্মেলনে প্রদত্ত) আহমদ শরীফের বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব এক নিদর্শন। কালিক ভাবনার অন্য প্রবন্ধগুলি সাহিত্য বিষয়ক। এগুলোতে বাংলার লোকসাহিত্য, বাউলসাহিত্য এবং অন্যান্য তত্ত্বসাহিত্য প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা আছে। বিহারীলাল ও কায়কোবাদ সম্বন্ধে দু'টি রচনাই বেতার কথিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকলিত প্রবন্ধগুলোর রচনাকাল :

মাভৈঃ – ৩০.১০.১৯৭১
নিষিদ্ধ চিন্তা – ১২/১৩.৪.১৯৭২
ইতিহাস তত্ত্ব –
জিগির তত্ত্ব – ১৫.৫.১৯৭৩
গোড়ার গলদ – ১২.১২.১৯৭১
পৈশাচিক জিগীষা – ৫.১১.১৯৭১
বিড়ম্বিত প্রত্যাশা – ২.১১.১৯৭৩। গনকণ্ঠ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
আজকের ভাবনা – ১৭.৩.১৯৭৩
স্বাধীনতার দায় – ১৭.৩.১৯৭৩
একগুচ্ছ প্রশ্ন – ২৬.১.১৯৭৪
বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য– অভিভাষণটির নাম ছিল বাঙালির মনন ধারার বৈশিষ্ট্য। দর্শন সম্মেলনে পঠিত ২১.১.১৯৭৪।
শিক্ষাতত্ত্বের গোড়ার তত্ত্ব – ২২.৮.১৯৭২
শিক্ষা সম্বন্ধে আজকের ভাবনা – ২৮.১১.১৯৭৩। গণকণ্ঠ (২১শে ফেব্রুয়ারি ১৩৮০)
সংঘাত প্রসূন – বঙ্গবার্তা, ঈদসংখ্যা ২৬.১০.১৯৭৩
জনবৃদ্ধি : বিশ্বের আতঙ্ক – ২৪.৯.১৯৭১
একুশের ভাবনা – সংবাদ, ১১.২.১৯৭৪
কবি বিহারীলাল – বেতার কথিকা, ২০.১১.১৯৭২
কবি কায়কোবাদ – বেতার কথিকা, ৯.৭.১৯৭৩
আজকের সাহিত্যের পরিধি – ২৬.১০.১৯৭৩। দিগন্ত, ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯৭৪
সাহিত্যের বিবর্তন – ২৫.৫.১৯৭৩
সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের ব্যবহার – এটিও একটি বেতার কথিকা। ১.২.১৯৭৩। কথিকা হিসেবে নাম ছিল সাম্প্রতিক সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের ব্যবহার।
বাঙলায় তত্ত্বসাহিত্য – ২.১২.৭২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের পত্রিকা মননে প্রকাশিত, ১৯৭৩।
বাংলাদেশের 'সঙ্গ' সাহিত্য প্রসঙ্গে –১৩.১.১৯৭৪। ইতিহাস পত্রিকা, ১৪.১.১৯৭৪ ধীরেশ্বর বন্দোপাধ্যায় রচিত বাংলাদেশের সঙ্গ প্রসঙ্গে গ্রন্থের সমালোচনা। গ্রন্থটি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর মনোগ্রাফ সিরিজ ভুক্ত; কলিকাতা, ১৯৭২।
বাউল কবি ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে – এটি আবুল আহসান চৌধুরীর গ্রন্থের ভূমিকা রূপে 'বাউল সাহিত্য : কবি ও তত্ত্ব' নামে রচিত হয়েছিল। ১৮.৯.১৯৭৩।

AMARBOI.COM

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ। ডক্টর আহমদ শরীফের একটি সুখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৯৭৭-এর এপ্রিলে। গ্রন্থটির প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা, মুক্তধারা [স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ], ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১ এবং গ্রন্থটির মুদ্রাকর ঐ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রভাংশুরঞ্জন সাহা। মোহাম্মদ ইদ্রিস গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন। মূল্য : বিশ টাকা। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৭৭।

২০০০ সনের নভেম্বর মাসে সময় প্রকাশন এ গ্রন্থ আবার প্রকাশ করেছে। প্রকাশক ফরিদ আহমদ, সময় প্রকাশন, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা মুদ্রণ-সালমানী মুদ্রণ, নয়াবাজার, ঢাকা; বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন বিখ্যাত চিত্রী কাইয়ুম চৌধুরী; মূল্য : ২০০ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৩।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর আহমদ শরীফ এই বই প্রধানত উৎসর্গ করেছেন তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী, তাঁর শ্রদ্ধেয় অতি প্রিয় মানুষ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও ইতিহাসবিদ ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহকে। উৎসর্গপত্রটি এই রকম—

শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহকে আর যারা সত্যকে, স্বদেশকে ও মানুষকে ভালবাসেন তাঁদেরকে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ। বৃহৎ কলেবর গবেষণা পুস্তক। ডক্টর আহমদ শরীফ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিশেষজ্ঞ। এক্ষেত্রে তাঁর প্রখ্যাতি সুবিদিত। দীর্ঘদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্যযুগের সাহিত্য পড়িয়েছেন, গভীরভাবে ভেবেছেন বিষয়টি নিয়ে এবং প্রভূতভাবে গবেষণা করেছেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথির ওপর গবেষণা তাঁকে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি অনালোকিত দিক উন্মোচনে বিপুল সাহায্য করেছে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রণোদনা দিয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ডক্টর আহমদ শরীফের একাধিক গ্রন্থ এবং বহু আলোচনা ও নিবন্ধ আছে। সেগুলোর কোনো কোনোটি যেমন গভীর বিশ্লেষণাত্মক তেমনি প্রামাণ্যও। 'মধ্যযুগের সাহিত্যের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' তেমনি একটি গবেষণামূলক প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই পুস্তকে আহমদ শরীফ মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন চিত্র উন্মোচনের জন্য মধ্যযুগের সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কেবল পুঁথি সাহিত্য ব্যবহার করেছেন, মধ্যযুগের সুপরিচিত সাহিত্য ধারাগুলোকে নয়। গ্রন্থের ভূমিকায় আহমদ শরীফ এ সম্পর্কে বলেছেন—

মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য চরিত ও বৈষ্ণব চরিতাখ্যান প্রভৃতি থেকে সমকালীন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যাদি অনেক আগেই সংগৃহীত ও আলোচিত হয়েছে নানা গ্রন্থে ও বিভিন্ন প্রবন্ধে। যে সব গ্রন্থে উক্ত বিষয়ক তথ্যাদি এ যাবৎ সযত্নে সংগৃহীত কিংবা গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়নি, সে-সব গ্রন্থের মুখ্য কয়েকটি থেকে জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্ব আমরা ও গ্রন্থে সংকলন করে দিলাম। এতেও মধ্যযুগের মানুষের জীবন-জীবিকা, চিন্তা-চেতনা, জগৎ-ভাবনা, জীবন-জিজ্ঞাসা ও জীবন প্রতিবেশ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লভ্য হবে না বটে, কিন্তু তথ্যের সঞ্চয় বাড়বে, আলোচনার পরিসরও হবে বিস্তৃত, এ বিশ্বাসে ও প্রত্যাশায় আমাদের এ গ্রন্থনা।

'মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ' গ্রন্থের সূচনা হয়েছে সমাজ সংস্কৃতির বিকাশ বিবর্তনের ধারা প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা দিয়ে। এরপর ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হয়েছে 'বাংলার মৌল ধর্ম' 'বাংলায় সুফী প্রভাব', 'বাংলা ভাষার ভক্তি অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ' এবং 'মধ্যযুগে জাতিবৈর ও তার স্বরূপ' নামের প্রবন্ধ। এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আহমদ শরীফ আগেও আলোচনা করেছেন এবং বাংলার ধর্ম দর্শন, ভাবচিন্তা ও সমাজ-সম্প্রদায় নিয়ে মৌলিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সমাজ সংস্কৃতির রূপ দেখাতে গিয়ে আহমদ শরীফ মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের দু'টি বিভাজন করেছেন—এক, নীতি শাস্ত্র গ্রন্থ; দুই, প্রণয়োপাখ্যান। প্রণয়োপাখ্যানেরও শতক ওয়ারি বিভাজন আছে ষোল, সতের ও আঠার শতক। উল্লেখ্য এসব পুঁথির সবই আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংগৃহীত। নীতিশাস্ত্র গ্রন্থের পর্যায়ে আছে মুহম্মদ খানের 'সত্য কলি বিবাদ সম্বাদ', মুজাম্মিলের 'নীতিশাস্ত্রবাতা বা আয়াৎনামা', নসরুল্লাহ খন্দকারের 'শরীয়তনামা', আলউনের 'তোহফা' (১৬৬৪)। বাংলা সুফী সাহিত্য পর্যায়ে আছে ষোল থেকে আঠার শতকে রচিত সুফীতত্ত্বের বিভিন্ন ভাষ্যকারের বিবরণ যেমন— ষোল শতকের কবি ফয়জুল্লাহ (গোরক্ষ বিজয়), সৈয়দ সুলতান (জ্ঞান প্রদীপ, জ্ঞান চৌতিশা), সতের শতকের কবি শেখ চাঁদ (হরগৌরী সম্বাদ, তালিব নামা'), হাজী মুহম্মদ (নূরজামাল) মীর মুহম্মদ সুফী (নুরনামা), শেখ জাহিদ (আদ্য পরিচয়); আঠার শতকের কবি শেখ মনসুর (সির্নামা), আলি রাজা (আগম জ্ঞান সাগর) প্রমুখ। অন্যান্য সুফী কবির মধ্যে আছেন আব্দুল হাকিম (চারি মোকামভেদ, সিহাবুদ্দীন পীরনামা), বালক ফকির (জ্ঞান চৌতিশা) নেয়াজ (যোগ কলন্দর), মোহসেন আলী (মোকাম-মঞ্জিলের কথা), শেখ জেবু (আগম), রমজান আলী (আদ্যব্যক্ত) রহিমুল্লাহ (তনতেলাওত), সিরাজুল্লাহ (যুগীকাচ) এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের (যোগ কলন্দর)। বাঙালার সুফী সাহিত্য নামের গ্রন্থ আহমদ শরীফেরই রচনা (১৯৬৯)।

সতের থেকে উনিশ শতক অবধি মধ্যযুগের সংগীত শাস্ত্রকারদের রচনার সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন আহমদ শরীফ 'মধ্যযুগের রাগ-তালনামা' নামে। এ রচনাগুলোতেও মধ্যযুগের সামাজিক রুচি ও সংগীত চর্চার চিত্র পাওয়া যায়। সঙ্গীত শাস্ত্রকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন— ষোল শতকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর ফয়জুল্লাহ, সতের শতকের আলাওল; আঠার শতকের ফাজিল নাসির মাহমুদ, কাজী দানিশ, আলী রাজা, চম্পা গাজী, মুজফফর তাহির মাহমুদ, দ্বিজ রঘুনাথ পঞ্চানন, ভবানন্দ তনু, দ্বিজ রামতনু, রামগোপাল, মুহম্মদ পরান, চামারু, উনিশ শতকের দেবান আলী, সন্ত খাঁ, মুহম্মদ আজিম, জীবন আলী প্রমুখ।

প্রণয়োপাখ্যান ধারার শতকওয়ারি নির্বাচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে –

ষোল শতক– শাহ মুহম্মদ সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা', সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ' মুহম্মদ কবীরের 'মনোহর মধুমালতী', দৌলত উজির বাহরাম খানের লায়লী মজনু' ও ইমাম বিজয়', শেখ ফয়জুল্লাহর গোরক্ষ বিজয়', শাবারিদ খানের বিদ্যাসুন্দর, রসূল বিজয়, ও 'হানিফার দ্বিগ্বিজয়, জায়েন উদ্দিনের' রসুলবিজয়।

সতের শতক– কাজী দৌলতের 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী', মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' আলাওলের 'পদ্মাবতী সিকান্দারনামা' দোনা গাজীর সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' আবদুল হাকিমের লালমতি-সয়ফুল মুলুক' সৈয়দ মুহম্মদ আকবরের জেবল মুলুক-শামারোখ' রকিউদ্দিনের 'জেবল মুলুক শামারোখ।'

আঠার শতক–নওয়াজিসের 'গুলে বকাউলি, শেখ সাদীর-গদা মালিকা সম্বাদ' শুকুর মাহমুদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' আফজল আলীর 'নসিয়ত নামা' দোভাষী শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ (ইউসুফ জোলেখা, জঙ্গনামা, সোনাভান, আমির-হামজা' সত্যপীরের পুঁথি), আইনুদ্দীনের 'বিবাহ মঙ্গল নিকাহ মঙ্গল' আখের জুলুয়া' 'গেরোয়া খেলা' মুহম্মদ রাজার তমিম গোলাল চতুর্থ ছিলাল' ফয়জুল্লাহর 'সত্যপীর' শেখ মনোহরের 'শমসের গাজী নামা' সিত কর্মকার প্রমুখের 'তামাকু পুরাণ'।
শেষোক্ত কিছু গ্রন্থকে ঠিক প্রণয়োপাখ্যান বলা যাবে না, তবে এগুলোতে সমাজচিত্র অবশ্যই লভ্য।

উল্লেখ্য যে, উপযুক্ত পুঁথিগুলোর কিছু কিছু সম্পাদনা করেছেন আহমদ শরীফ। এই পুঁথিগুলোতে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাজভুক্ত মানুষের জীবনাচরণ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রথা-পদ্ধতি, বিশ্বাস, সংস্কার, স্বভাব-অভ্যাস, পেশা-বৃত্তি-জীবিকা-উৎসব-আনন্দ ক্রীড়া ইত্যাদির রূপ চমৎকারভাবে পাওয়া যায়। বর্ণনা ও বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাসঙ্গিক উৎকলনগুলো। ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র সুস্পষ্ট হয়েছে।

আহমদ শরীফ তাঁর গবেষণা গ্রন্থটি তাঁর পত্নী ও তিন পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন।

AMARBOI.COM

প্রত্যয় ও প্রত্যাশা

প্রথম সংস্করণ : ২৫ শে বৈশাখ ১৩৮৬ মে ১৯৭৯,
স্বকাল প্রকাশনী ১৫০ বনগ্রাম রোড ঢাকা।
মুদ্রাকর : সূচনা প্রিন্টার্স ঢাকা
প্রচ্ছদ : আবদুর রউফ সরকার
মূল্য : ২০ টাকা
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২০

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৯৩, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
পৃষ্ঠা সংখ্যা : ১৯৪
দাম : শোভন সংস্করণ ৬৪ টাকা, লেখক সংস্করণ ৪৮ টাকা।
দ্বিতীয় সংস্করণের
প্রকাশক : সৈয়দ ফয়েজুর রহমান, অক্ষর, ৪ নিউ সারকুলার রোড, ঢাকা-১৭
মুদ্রাকর : আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১
প্রচ্ছদ : সরদার জয়নুল আবেদীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডক্টর আহমদ শরীফ 'প্রত্যয় ও প্রত্যাশা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন তাঁর শিক্ষক জনার্দন চক্রবর্তীকে। জনার্দন চক্রবর্তী চট্টগ্রাম কলেজে ডক্টর শরীফের শিক্ষক ছিলেন। তিনি বাংলা পড়াতেন।

উৎসর্গ পত্রটি এইরূপ –

শিক্ষা গুরু
অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তীকে
– স্বধর্মে সুস্থির থেকেও যিনি
মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে সবকিছুর
ঊর্ধ্বে ঠাঁই দেন।

উৎসর্গপত্রে ডক্টর শরীফ আরাকান রাজসভার কবি কাজী দৌলতের এবং সহজিয়া চণ্ডীদাসের বিখ্যাত কাব্যোদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন শিক্ষকের মনুষ্যত্বধর্ম সংকেতিত করার জন্য। ডক্টর শরীফও সবকিছুর ঊর্ধ্বে মানুষকেই ঠাঁই দিয়েছেন।

কাজী দৌলত – নর বিনে চিন নাহি কিতাব কোরান
নর সে পরম দেব মন্ত্র-তন্ত্র জ্ঞান।
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর।

চণ্ডীদাস– শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ২৬টি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ। কিছু প্রবন্ধের মধ্যে বাঙালি সত্তা, বাংলার সামাজিক জীবন, বাংলার শ্রমজীবী মানুষ ইত্যাদি নিয়ে ইতিহাসমূলক বিবরণ আছে। কিছু প্রবন্ধে সংস্কৃতি, কিছু প্রবন্ধে লেখকের মানবতাবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। এই সংকলনে আহমদ শরীফের দুটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে– একটি 'কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালি' অন্যটি 'বঙ্কিম বীক্ষা' অন্য নিরিখে। এ দেশের ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সময়ের পর্যালোচনায় এবং ঐ কালের একজন যুগন্ধর সাহিত্যিক পুরুষের মূল্যায়নে ডক্টর শরীফ দারুণ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশেষ করে শেষোক্ত প্রবন্ধটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। বাংলাদেশে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্য বিচারে এটি সুখ্যাতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ অঞ্চলে এর আগে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে এমন বিস্তৃত ও গভীর আলোচনা রচিত হয়নি। অবশ্য বিচিত চিন্তা গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে ডক্টর শরীফেরই একাধিক সুন্দর প্রবন্ধ আছে।

সংকলিত প্রবন্ধগুলোর কিছু সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। অধিকাংশ প্রবন্ধ রচিত হওয়ার পরে পত্রভুক্ত হয়নি, সরাসরি এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সবগুলো প্রবন্ধের রচনাকাল দেওয়া হল।

বাঙালি সত্তার স্বরূপ সন্ধানে – ২০.১২.৭৮
দু'হাজার বছর আগের গ্রামীণ সমাজ – পদধ্বনি, ২৯.১০.৭৮
বাঙলার গতর খাটা মানুষের ইতিকথা – ১৩.১.১৯৭৯
প্রত্যয় ও প্রত্যাশা – ২৪.৮.১৯৭৬
চেতনা সংকট – ২০.১০.১৯৭৭
সঙ্কটের মূলে – ৮/৯.১১.১৯৭৭
প্রবাসী মন ও সংস্কৃতি – ১৪.৫.১৯৭৬
সমকালীন সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতি – ১/২.৫.১৯৭৬
সংস্কৃতি প্রসঙ্গে – ৫.২.১৯৭৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিন্তা – ২২/২৩.১০.১৯৭৭
জুলুম – ১৬.২.১৯৭৭
মুক্তিসংগ্রামের স্বরূপ – কাশবন, ১২.১২.১৯৭৮
স্বস্তির পন্থা –১০.২.১৯৭৮
আনন্দ সুন্দর জীবন লক্ষ্যে –১২.২.১৯৭৮
ভালোবাসার দায় –৯.১২.১৯৭৭
আত্মমানবতার প্রতি মানববাদীর দায়িত্ব –২৬.৩.১৯৭৮
বিকার ও নিদান –৬.৩.১৯৭৮
পয়লা মের ভাবনা – ২৯.৪.১৯৭৬
আজকের তৃতীয় বিশ্ব – ১৯/২০.২.১৯৭৮
শুভঙ্করের ফাঁকি – ১৯.৩.১৯৭৮
অসাফল্যের গোড়ার কথা – ২৭.১.১৯৭৯
শিক্ষার কথা–৪.৪.১৯৭৬ রবিবার জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা সমিতি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।
কোম্পানি আমলে ও ভিক্টোরিয়া শাসনে বাঙালি–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,জুন ১৯৭৯ রচনা ১২.২.১৯৭৯।
বঙ্কিম বীক্ষা : অন্য নিরিখে– ভাষা সাহিত্য পত্র (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকা) ১৯৭৫।
বাঙলা সাহিত্যে জীবন দৃষ্টির বিবর্তন– ১৮.৪.১৯৭৬
সাহিত্যে যুগ যন্ত্রণা–৬.২.১৯৭৫। বেতার কথিকা, পরে 'অনন্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~